“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষান্মাসিক সূচীপত্র

১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ জানুয়ারি—জুন, ১৯৫৩

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী

জানুয়ারি হইতে জুন : ১৯৫৩

(খ)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষান্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারি হইতে জুন : ১৯৫৩

চিত্র-সূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষান্মাসিক সূচীপত্র
১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ : জুলাই—ডিসেম্বর, ১৯৫৩

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়-সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর ঃ ১৯৫৩

(১)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর : ১৯৫৩

চিত্র-সূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | জানুয়ারি—১৯৫৩ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষ্যে আমরা পত্রিকার প্রত্যেক শুভানুধ্যায়ীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ তাঁহাদের সকলের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা ব্যতিরেকে পত্রিকার এই অগ্রগতি সম্ভব হইয়া উঠিত না।

জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তুলিবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিবেশন করাই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অনিচ্ছাকৃত নানারকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য গত পাঁচ বৎসর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তবে এই প্রচেষ্টার ফলে পত্রিকা কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। গ্রাহক এবং সদস্য সংখ্যা মোটামুটি সমান থাকিলেও মনে হয়, মোটের উপর পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; বিশেষ করিয়া কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরের প্রবন্ধাদি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের অভিভাবকদের মধ্যেও উৎসাহ ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগে প্রকাশিত সহজ ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় পাঠ করিয়া কিশোর বিজ্ঞানীরা যে সব যন্ত্রপাতি নিজের হাতে তৈয়ারী করিয়াছে তাহাতে খুবই আশা করা যায় যে, আমাদের উদ্যম ক্রমশই অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

যাহাহউক, এই সব ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ প্রবন্ধাদির উৎকর্ষ-অপকর্ষের উপরই পত্রিকার সাফল্য নির্ভর করে। এই জন্য আমাদের লেখক-লেখিকাদের পূর্বেও অনুরোধ জানাইয়াছি এবং এখনও জানাইতেছি যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি অবিকৃত রাখিয়া তাঁহারা যেন প্রবন্ধাদি জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর সুখবোধ্য করিবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। মোটের উপর জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রচার করিতে হইলে লেখককে একাধারে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক হইতে হইবে; অন্যথায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিলম্বিত হইবারই কথা।

গণিতের আদি ইতিহাস—ব্যাবিলন ও মিশর

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

গণিত ও জ্যোতিষের আবির্ভাবের সহিত কৃষিনির্ভর সভ্যতা ও অর্থনীতির সম্বন্ধ অতি নিবিড়। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ঋতুপরিবর্তন ও তাহার সময় নির্ণয়, অর্থাৎ একপ্রকার প্রাথমিক পঞ্জিকার বিশেষ প্রয়োজন। গণনা পদ্ধতি যথেষ্ট উন্নত না হইলে ঋতুপরিবর্তন প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনার হিসাব রাখা অসম্ভব। কৃষি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আদিম জাতিদের মধ্যে ঋতুপরিবর্তনের জ্ঞান অতি অল্পই দেখা যায়। খৃঃ পূঃ ৫৭০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে সুমের অঞ্চলের প্রাচীনতম কৃষিজীবী অধিবাসীদের মহাবিষুব (vernal equinox) হইতে বৎসরারম্ভের হিসাব রাখিতে দেখা যায়।* ইহার প্রায় এক হাজার বৎসর পরে (খৃঃ পূঃ ৪০০০) সুমেরীয়রা বৃষের নামানুসারে বৎসরের প্রথম মাসকে অভিহিত করিতে আরম্ভ করে। বৃষ-তারামণ্ডলে মহাবিষুবে তখন সূর্যের অবস্থিতি। প্রাথমিক পাটীগণিতে বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ না ঘটিলে এইরূপ নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নয়।

আদিম পূর্তবিদ্যাও গাণিতিক অগ্রগতির বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। গৃহাদি ও নগর নির্মাণে এবং সেচসংক্রান্ত পূর্তবিদ্যায় প্রাচীনকালে ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও ভারতীয়দের আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শনের নানা প্রমাণ আজও বিদ্যমান। এই সকল পূর্তকার্যের সাফল্য গাণিতিক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার গাণিতিক অগ্রগতির আর একটি কারণ। সুমের, এলাম, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি শত সহস্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত নানা জনপদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের নানা প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে গণিতের, বিশেষতঃ পাটীগণিতের, নানা মৌলিক আবিষ্কারের অনুকূল হইয়াছিল।

ব্যাবিলন

ব্যাবিলনীয়রা নরম মাটির চাকৃতি, সিলিণ্ডার বা প্রিজ্‌মের উপর কাঠির সরু অগ্রভাগের দ্বারা অনেকটা কীলকের আকারে দেখিতে একপ্রকার লিপির সাহায্যে তাহাদের হিসাব-নিকাশ, গাণিতিক পদ্ধতি ইত্যাদি লিখিয়া রাখিত। পরে এই চাকৃতি, সিলিণ্ডার বা প্রিজ্‌ম্‌গুলিকে পোড়াইয়া লিপির স্থায়িত্ব সম্পাদন করিত। বলাবাহুল্য কিউনিফর্ম লিপিসম্বলিত এই চাকৃতিগুলিই তখনকার দিনের মূল্যবান ব্যাবিলনীয় গ্রন্থ। অসুরবণিপালের (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৬২৬ অব্দ) গ্রন্থাগারে ২২,০০০ কিউনিফর্ম লিপির চাকৃতি পাওয়া গিয়াছে; এইগুলি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। নিপ্‌পুর মন্দিরের গ্রন্থাগারে খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ৪৫০ অব্দের মধ্যে লিখিত প্রায় ৫০,০০০ কিউনিফর্ম লিপির মৃন্ময় চাকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।* গণিত সংক্রান্ত ব্যাবিলনীয় লিপির অস্তিত্বকাল প্রায় দুই হাজার বৎসর—আনুমানিক প্রথম ব্যাবিলনীয় রাজবংশের আমল (খৃঃ পূঃ ২১৮৬-১৯৬১)

* The Development of Mathematics—E. T. Bell, 1940. পৃঃ ২৫

* Science in Antiquity—Benjamin Farrington, 1936. পৃঃ ২২

হইতে খৃষ্টীয় শকাব্দের সূচনা পর্যন্ত। ইহার মধ্যে খৃঃপূঃ ২০০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত এই আট শত বৎসর গাণিতিক তৎপরতার জন্য প্রসিদ্ধ—গণিত সংক্রান্ত অধিকাংশ মৃন্ময় লিপি এই সময়ে রচিত হয়।

কিউনিফর্ম লিপির সাহায্যে সংখ্যার অঙ্কপাতন প্রণিধানযোগ্য। এক, দশ ও একশ লেখা হইত যথাক্রমে Y, < ও Y> দ্বারা। এইরূপ অঙ্কপাতনের দ্বারা বড় বড় সংখ্যা, যেমন সহস্র, দশ সহস্র ইত্যাদি প্রকাশ করাও কিছু মাত্র কঠিন ছিল না। যোগ ও গুণের ধারণা প্রয়োগ করিয়া উপরোক্ত প্রতীকের সাহায্যে যে কোন বড় সংখ্যা লিখিত হইত। যেমন :—

৩ = YYY ; ৩০ = <<< এইগুলিতে যোগের ধারণা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

১০০০ = <Y>, অর্থাৎ একশ'র দশগুণ;
১০,০০০ = <<Y>, অর্থাৎ এক হাজারের দশগুণ (একশ'র বিশগুণ নহে); } এইগুলিতে গুণনের ধারণা প্রয়োগ করা হইয়াছে

উপরোক্ত অঙ্কপাতন দশমিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। সম্ভবতঃ হাতের বা পায়ের দশটি আঙ্গুল হইতে দশমিক পদ্ধতির উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কিন্তু দশমিক পদ্ধতি সুবিধার দিক হইতে আদর্শস্থানীয় নহে। অনেকে এরূপ মন্তব্য পর্যন্ত করিয়াছেন যে, মানুষের যদি দশটির পরিবর্তে হাতে ও পায়ে বারটি করিয়া আঙ্গুল থাকিত, তবে পাটীগণিত অনেক বেশী সহজ হইত। দ্বাদশিক পদ্ধতির (duo-decimal) প্রধান সুবিধা এই যে, ১২ যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৬ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য; ১০ বিভাজ্য কেবলমাত্র ২ ও ৫ সংখ্যার দ্বারা। তথাপি দ্বাদশিক পদ্ধতিও সবদিক দিয়া পুরাপুরি সন্তোষজনক নহে; কারণ ইহা আবার ৫ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য নহে। সম্ভবতঃ এইসব কারণ বিবেচনা করিয়াই ব্যাবিলনীয়রা দশমিক ও দ্বাদশিক এই উভয় পদ্ধতির সুবিধা বজায় রাখিয়া ষষ্টিক (sexagesimal) পদ্ধতি আবিষ্কার করে। দশমিকের যেমন ১০ ও দ্বাদশিকের ১২, সেইরূপ ষষ্টিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির মূলভিত্তি হইল ৬০। ৬০ সংখ্যাটি অন্ততঃ দশটি গুণকের দ্বারা বিভাজ্য—২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ ও ৩০। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দ হইতে ব্যাবিলনীয়দের ষষ্টিক পদ্ধতি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ঘণ্টা অথবা কোণকে ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেণ্ডে ভাগ করিতে এখনও আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকি।

ষষ্টিক পদ্ধতিতে অঙ্কপাতনের কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

(১)
$$১২৩ = ১ \times (১০)^{২} + ২ \times (১০) + ৩ \quad \text{(দশমিক : আধুনিক)}$$
$$= ১ \times (৬০)^{২} + ২ \times (৬০) + ৩ \quad \text{(ষষ্টিক : ব্যাবিলনীয়)}$$

(২)
$$১\cdot২৩ = ১ + \frac{২}{১০} + \frac{৩}{(১০)^{২}} \quad \text{(দশমিক : আধুনিক)}$$
$$= ১ + \frac{২}{৬০} + \frac{৩}{(৬০)^{২}} \quad \text{(ষষ্টিক : ব্যাবিলনীয়)}$$

ব্যাবিলনীয় গাণিতিক লিপি আবিষ্কৃত হইলে প্রথম প্রথম ইহাদের অন্তর্নিহিত গাণিতিক পদ্ধতি একেবারেই ধরা যায় নাই। ১২৩ বলিতে আমরা যে সংখ্যা বুঝি ব্যাবিলনীয়রা তাহা বুঝিত না; তাহারা বুঝিত ৩৭২৩। সেইরূপ, ব্যবিলনীয় মৃন্ময় লিপিতে কতকগুলি বর্গরাশির দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে; যেমন—১'৪=৮২, ১'২১=৯২, ১'৪০=১০২, ২'১=১১২ ইত্যাদি। একমাত্র ষষ্টিক পদ্ধতিতেই ইহাদের তাৎপর্য বোধগম্য। ১'৪ হইতেছে ১×৬০+৪ (=৮২); ১'২১ হইতেছে ১×৬০+২১ (=৯২); ২'১ হইতেছে ২×৬০+১ (=১১২)।

ব্যাবিলনীয় গণিতে 'শূন্য' বলিয়া কিছু ছিল কিনা সে বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। হিন্দুরাই প্রথম 'শূন্যে'র আবিষ্কারক ইহা এখন সর্ববাদীসম্মত। তবে ইহার ধারণা স্বাধীনভাবে অন্যত্র যে আত্মপ্রকাশ করে নাই তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কত আবিষ্কারই তো স্বাধীনভাবে সংঘটিত হইয়া আবার বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালের মানুষকে নূতন করিয়া তাহা পুনরাবিষ্কার করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দের কাছাকাছি কয়েকটি ব্যাবিলনীয় লিপিতে সংখ্যার মধ্যে শূন্য স্থান বা কোন সংখ্যার অস্তিত্ব নির্দেশ করিতে একপ্রকার কৌণিক প্রতীক ≮ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে টলেমী তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'অ্যাল্‌মাজেষ্টে' ষষ্টিক পদ্ধতির ব্যবহার প্রসঙ্গে শূন্যস্থান নির্দেশ করিতে গ্রীক অক্ষর 'o' (ওমিক্রন) ব্যবহার করেন। এই সব নজির হইতে ফ্লোরিয়ান ক্যাজরি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন সংখ্যার অন্তর্বর্তী শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করিতে ব্যাবিলনীয়রা সম্ভবতঃ শূন্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছিল এবং ইহার জন্য এক প্রতীকও তাহারা ব্যবহার করিত; কিন্তু যে কোন কারণেই হউক গণনার কার্যে তাহারা শূন্যের কোন ব্যবহার করে নাই।*

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এইচ. ভি. হিল্‌প্রেট প্রাচীন নিপ্‌পুরে প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্যের ফলে কতকগুলি নামতার তালিকা আবিষ্কার করেন। তালিকাগুলি বিভিন্ন রাশির গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতি নির্ণয় করিবার প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ধারাপাত বিশেষ। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীকে তাড়াতাড়ি গণনা ও হিসাব-নিকাশের সুবিধার জন্য এইসব তালিকা বা নামতা মুখস্থ করিতে হইত।

অবশ্য ব্যাবিলনীয় পাটীগণিতের ইহাই সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। কিন্তু যেটুকু বলা হইল তাহাতে চার হাজার বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনীয়রা পাটীগণিতে যে কিরূপ উন্নত ছিল তাহা বুঝিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট।

অধ্যাপক বেল বীজগণিতে ব্যাবিলনীয় অবদান আরও বেশী মৌলিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাক্‌ প্রতীক বীজগণিতের (pre-symbolic algebra) কালে (ব্যাবিলনীয়দের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে প্রখ্যাত গ্রীক বীজগণিতজ্ঞ ডায়োফ্যাণ্টাস্‌ বীজগণিতে প্রতীক ব্যবহারের চেষ্টা করেন) ব্যাবিলনীয়দের আমরা একঘাত, দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করিতে দেখি। সহ-সমীকরণ সমাধানের কয়েকটি দৃষ্টান্তও আছে। সমীকরণগুলির সমাধান-পদ্ধতির কোন নমুনা অবশ্য পাওয়া যায় নাই; সম্ভবতঃ এইসব সমাধান অতীব গোপনীয় তথ্য হিসাবে জ্ঞান করা হইত। সমীকরণগুলি সবক্ষেত্রেই বিশেষ ধরনের, অর্থাৎ অজ্ঞাত রাশিটি ছাড়া আর সবগুলিই সংখ্যারাশি। বিভিন্ন রাশির গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতির যেসব তালিকার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই তালিকা অবলম্বনে প্রধানতঃ সমীকরণগুলির সমাধান নির্ণীত হইত। কোন সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি হয় আবিষ্কৃত হয় নাই, না হইলেও তাহার কথা কেহ লিখিয়া প্রকাশ করিয়া যায় নাই।

---

* A History of Mathematics—Florian Cajori 1926, পৃঃ ৫।

আঙ্কিক সমাধান নির্ণয়েও তাহারা যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত সহ-সমীকরণ সমাধানের মধ্যে বিদ্যমান :

$$xy = 600$$

$$(ax + by)^2 + cx + dy = e$$

$a, b, c, d,$ ও e'র ৫৫টি বিভিন্ন সংখ্যা প্রয়োগ করিয়া এই সমীকরণটি সমাধান করিবার চেষ্টা দেখা যায়। দ্বিতীয়টি একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মাত্র মূল—ইহাই ব্যাবিলনীয়রা জানিত।

অমূলদ সংখ্যা (irrational number) সম্বন্ধে একরূপ অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাশির বর্গমূল নির্ণয় করিয়া বর্গমূল তালিকা প্রণয়নকল্পে তাহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে, কোন কোন রাশির বর্গমূল পূর্ণসংখ্যা নহে, পূর্ণসংখ্যার কাছাকাছি একটি স্থূল (approximate) সংখ্যা। অমূলদ রাশির স্থূল বর্গমূল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাবিলনীয়দের আমরা দেখি $(a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} = a + \frac{b^2}{2a}$ নিয়মটি ব্যবহার করিতে। দুই হাজার বৎসর পরে আলেকজান্দ্রিয়ার হিরো এই নিয়মটির ব্যবহার করেন। অমূলদ রাশি ২-এর বর্গমূল ($\sqrt{২}$) ব্যাবিলনীয় লিপিতে আমরা পাই ১$\frac{৫}{১২}$; ইহা দশমিকের দুই ঘর পর্যন্ত শুদ্ধ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহুক্ষেত্রে গ্রীকরা ব্যাবিলনীয়দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্যাবিলনীয় বীজগণিত আরও উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, ডায়োফ্যান্টাসের পূর্বে বীজগণিতের প্রাথমিক চর্চা পর্যন্ত গ্রীকদের মধ্যে দেখা যায় না। গণিতের আর একটি বিভাগ জ্যামিতি গ্রীক প্রতিভার স্পর্শে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, অথচ বীজগণিত ও পাটীগণিতে গ্রীকদের শৈশব অবস্থা কোন দিনই কাটে নাই। ইহার কারণ, সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রীকদের দুজ্ঞের্য় দুর্বলতা। নিরালম্ব, অমূর্ত সংখ্যার রাজ্য গ্রীকরা বরাবরই এড়াইয়া গিয়াছে। একমাত্র পিথাগোরাস ও তাঁহার সম্প্রদায় ইহার বিরাট ব্যতিক্রম। কিন্তু গ্রীক বিজ্ঞানে পিথাগোরাসের প্রভাব সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী।

ব্যাবিলনীয় জ্যামিতি, পাটীগণিত ও বীজগণিতের মত এত সমৃদ্ধ নহে। তবু তাহাদের জ্যামিতিক জ্ঞান উপেক্ষণীয় নহে। বৃত্তের জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত। ব্যাসার্ধের সমান জ্যা বৃত্তের কেন্দ্রে যে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে এবং মোটামুটিভাবে এই জ্যা যে বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত সুসম ষড়ভুজের বাহুর সমান, এইরূপ মন্তব্য কয়েকটি লিপিতে পাওয়া যায়। বৃত্তের মধ্যে সুসম ষড়ভুজ অঙ্কনের কতকগুলি দৃষ্টান্তও আছে। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত, অর্থাৎ π-এর মান ব্যাবিলনীয়রা বাহির করে ৩। একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য ৩, ৪, ও ৫ হইলে ইহা একটি সমকোণ ত্রিভুজ হয়, ইহা তাহারা জানিত। এই তথ্য হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, পিথাগোরাসের প্রতিপাদ্যের সহিত তাহাদের পরিচয় থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। ইহা অবশ্য নিছক অনুমান।

মিশর

জোসেফাস্ বলেন, মিশরীয়েরা আব্রাহামের কাছে পাটীগণিত শিক্ষা করে। আব্রাহাম ক্যালডিয়া হইতে জ্যোতিবিদ্যার সঙ্গে পাটীগণিতও মিশরে প্রথম আনয়ন করেন এবং গ্রীকরা পরে মিশরীয়দের কাছে গণিতবিদ্যায় শিক্ষানবিসী করে। মিশরের গণিতবিদ্যা আয়ত্তের আদি ইতিহাস যাহাই হউক, তাহারা যে গ্রীকদের প্রধান শিক্ষক এবং গ্রীকরাও যে অকপটে মুক্তকণ্ঠে এই ঋণ বরাবর স্বীকার করিয়া গিয়াছে, তাহা সত্য। শুধু তাহাই নহে, এই শ্রদ্ধাবশতঃ প্রত্যেক প্রাচীন গ্রীক লেখক একবাক্যে প্রচার করিয়া গিয়াছে যে,

মিশরীয়েরাই গণিতের জন্মদাতা। Phoedrus-এ প্লেটো বলিয়াছেন, "মিশরের নয়ক্রেটিস্ সহরে এক বিখ্যাত বৃদ্ধ দেবতার বাস ছিল, এই দেবতার নাম থয়েট। আইবিস্ নামে পক্ষীটিকে তিনি পবিত্র জ্ঞান করিতেন। এই দেবতাই পাটীগণিত, গণনা, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পাশাখেলা প্রভৃতি বিদ্যার আবিষ্কর্তা। কিন্তু তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার অক্ষরের ব্যবহার।" ইহা মূলতঃ প্রশংসার উক্তি। ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করিতে যাওয়া বৃথা। তবে হিরোডোটাস্, অ্যারিষ্টটল, ডিয়োডোরাস্, ডিয়োজেনেস্ লের্টিয়াস্, আয়াম্‌ব্লিকাস্ প্রমুখ বিখ্যাত প্রাচীন লেখকগণ নিকট জানাইতে হইত। রাজা তখন নদী কতটুকু জমি গ্রাস করিয়াছে তাহা মাপিয়া নূতন করিয়া রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণের জন্য পূর্ত-বিশারদদের পাঠাইতেন। এই ভাবে সে-দেশে প্রথম জ্যামিতির উদ্ভব হয় এবং তথা হইতে পরে এই বিদ্যা হেলাসে পৌঁছায়। ইহা প্রাচীন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের কথা।

তবে প্রাচীন মিশরীয়দের গাণিতিক জ্ঞান কি প্রকার ছিল তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার উপরে নির্ভর করাই উচিত। বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রাইণ্ড সংগ্রহের মধ্যে বিখ্যাত 'আহ্‌মেস্ প্যাপিরাস্' প্রাচীন
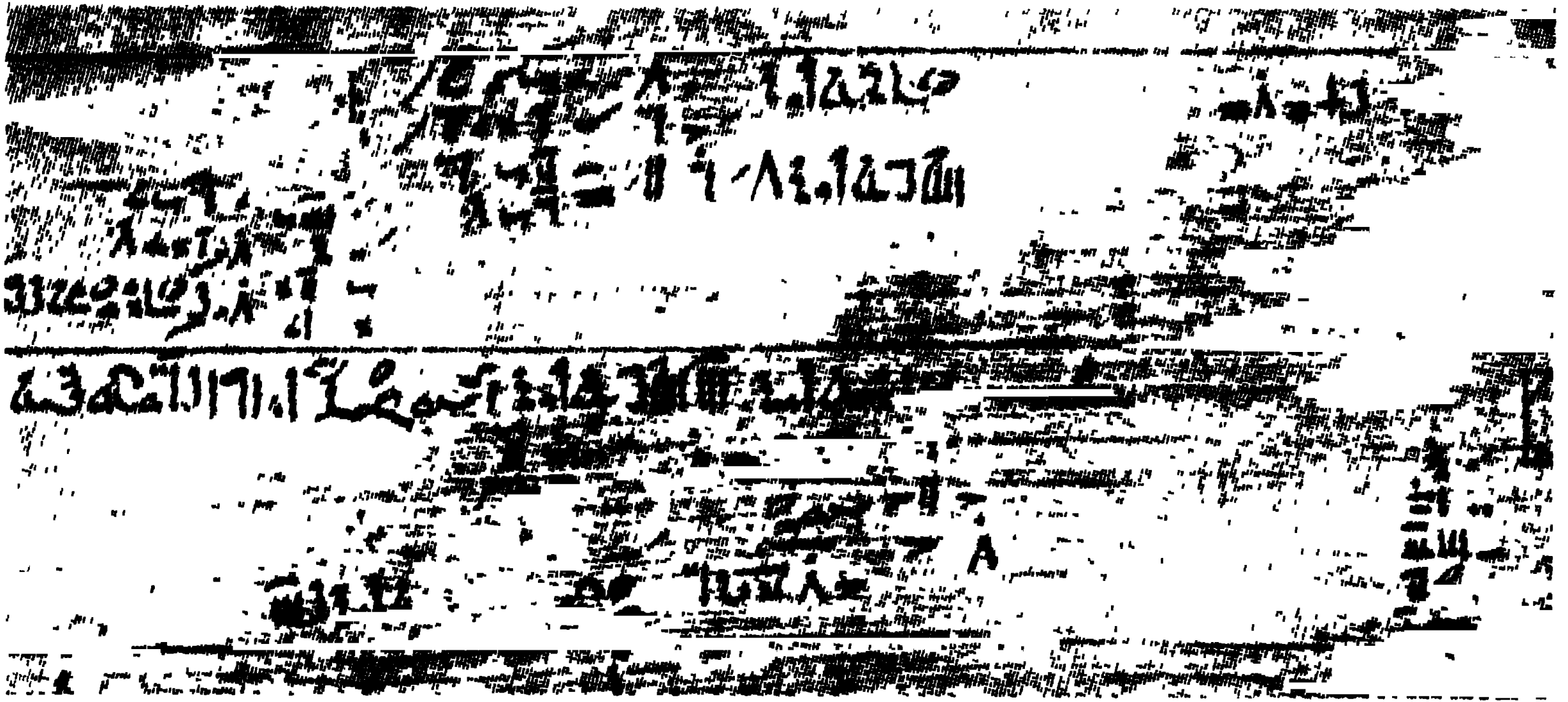
প্যাপিরাসে ব্যবহৃত লিপির অংশবিশেষের নিদর্শন। ইহার লেখা দর্শকের দক্ষিণ দিক হইতে বামে এবং উপর হইতে নীচে পড়িতে হয়

মিশরে জ্যামিতি বিদ্যার উদ্ভব সমর্থন করিয়া যেসব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। হিরোডোটাস্ লিখিয়াছেন, মিশরের রাজারা চতুষ্কোণ করিয়া কাটা খণ্ড খণ্ড জমি প্রজাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া তাহা হইতে দেয় বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করিয়া দিতেন। নদীর ভাঙ্গনের ফলে কোন প্রজার জমি নদীগর্ভে বিলীন হইলে সেই প্রজাকে তাহা রাজার মিশরের গাণিতিক প্রতিভার অকাট্য নিদর্শন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আইসেনলোর এই প্যাপিরাসের মর্মোদ্‌ঘাটন করেন। গ্রন্থটি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৬৫০ অব্দে আহ্‌মেস্ নামে জনৈক পুরোহিত কর্তৃক সঙ্কলিত। আহ্‌মেস্ নিজে ইহা রচনা করেন নাই। তাঁহার বহু শত কি সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে (বার্চ সাহেবের মতে খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দ) আর একজন মিশরীয় পুরোহিতের রচিত

গ্রন্থের ইহা একটি প্রতিলিপি মাত্র। শাঁপোলিয়োঁ, ইয়ং প্রভৃতি পণ্ডিতের চেষ্টায় হিয়েরোগ্লিফিক্ লিপিপাঠ সম্ভব হইলে মিশরীয় অঙ্কপাতন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। সম্প্রতি মস্কো প্যাপিরাসের অনুবাদের ফলে মিশরীয় জ্যামিতির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই
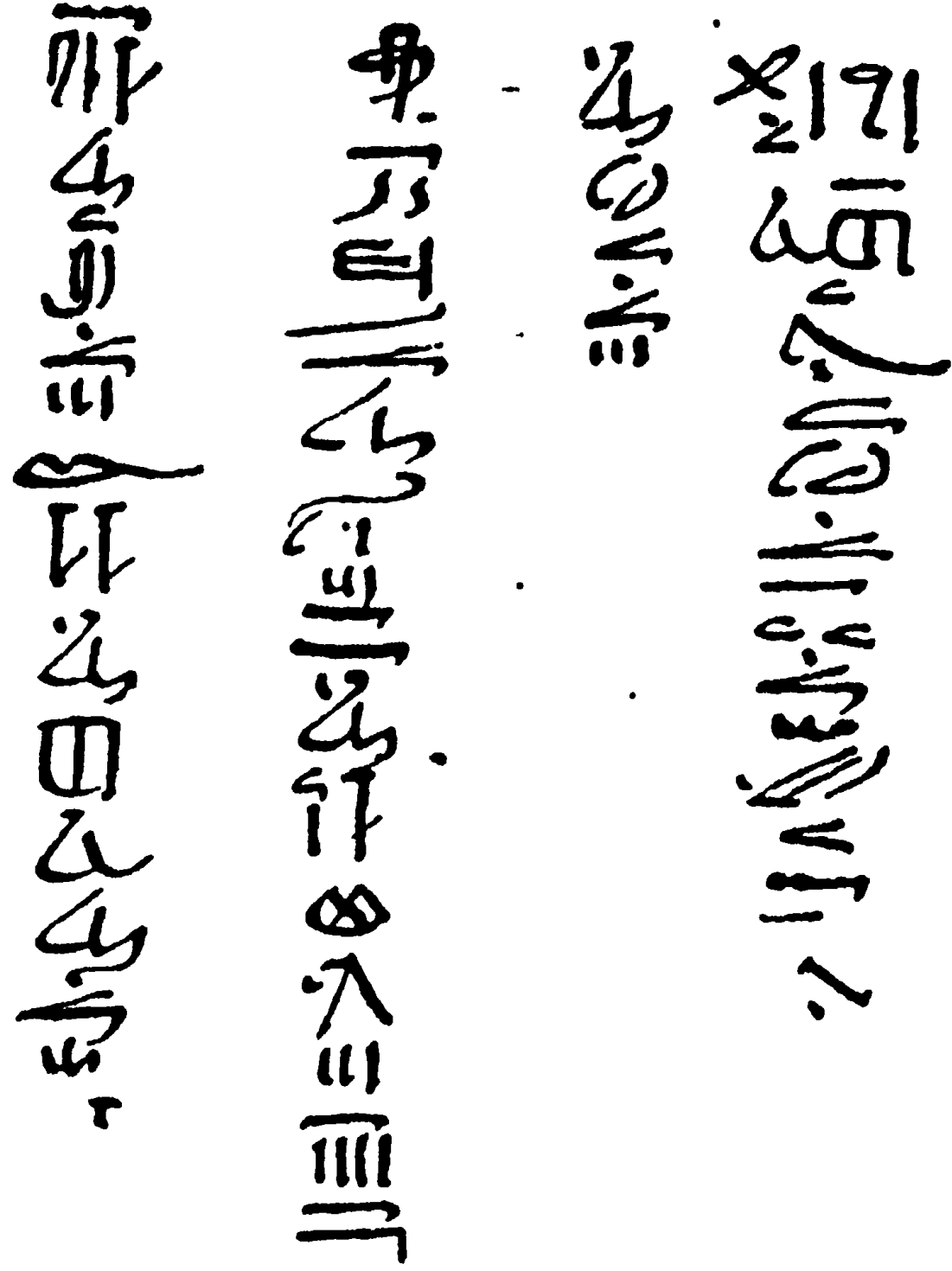
প্যাপিরাসের প্রচ্ছদপটের আংশিক লিপি

সব প্রামাণিক লিপি হইতে প্রাচীন মিশরের গাণিতিক জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

মিশরীয় অঙ্কপাতন পদ্ধতি দশমিক। একক, দশক, শতক, প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করিতে নিম্নলিখিত প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হইত :

এক (১)	= 𓏺	অযুত (১০,০০০)	= 𓂭
দশ (১০)	= 𓎆	লক্ষ (১০০,০০০)	= 𓆐
শত (১০০)	= 𓍢	নিযুত (১,০০০,০০০)	= 𓁨
সহস্র (১০০০)	= 𓆼	কোটি (১০,০০০,০০০)	= 𓍰

প্রতীকগুলি অর্থবোধক। ১ হইল দণ্ডায়মান যষ্ঠি। ১০০০০ অঙ্গুলি; ১০০,০০০ পক্ষী; ১,০০০,০০০ বিস্ময়াভিভূত মানুষ ইত্যাদি। অন্তর্বর্তী সংখ্যা রচনায় যোগের ধারণা প্রযুক্ত দেখা যায়। যেমন ২৩ হইল 𓎆𓎆𓏺𓏺𓏺 (২ দশ+৩ এক)।

এইরূপ বড় বড় সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের নমুনা হইতে বুঝা যায়, মিশরীয়েরা বৃহৎ সংখ্যা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারিত। হিয়েরোগ্লিফিক লিপিতে বহু বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ আছে। যেমন—জনৈক রাজা এক যুদ্ধে জয়ী হইয়া ১,২০,০০০ বন্দী,

৪০০,০০০ বলদ ও ১,৪২২,০০০ ছাগল লাভ করিয়াছিল। সত্য হইলে ইহা সেই যুগের এক বিরাট সাম্রাজ্য বিজয়ের ঘটনা। তারপর প্রায় দেড় মিলিয়ন ছাগলের সংখ্যা গুণিয়া বাহির করা আধুনিক কালেও এক বিরাট ব্যাপার। হয়তো এরূপ সংখ্যা লিপিকারের বা কবির নিছক কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আদিম অসভ্য জাতিরা এইরূপ বিরাট সংখ্যার কথা চিন্তা করিতেও পারে না। এমন কি, সুসভ্য ও উন্নত গ্রীকরা পর্যন্ত বিরাট সংখ্যা কল্পনার ব্যাপারে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে (আর্কিমিডিস ব্যতিক্রম)।

মিশরীয়েরা যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চারি নিয়মের সহিত পরিচিত ছিল। গুণন পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা বিশেষত্ব দেখা যায়। ৫-কে ৩ দিয়া গুণ করিতে আমরা বুঝি ৫-কে ৩ বার লিখিয়া যোগ বাহির করা। গুণ অর্থে মিশরীয়েরা ঠিক তাহা বুঝিত না বা আমরা যে পদ্ধতিতে এখন এই কার্য সমাধা করিয়া থাকি ঠিক সে ভাবেও তাহারা গুণ করিত না। গুণ্য ও গুণককে ক্রমশঃ দ্বিগুণ করিয়া ও গুণ্যের সারিকে যোগ দিয়া ফল নির্ণীত হইত। কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা পদ্ধতিটি বুঝানো সহজ হইবে। মনে করা যাক—(১) ৪০ কে ১৫-র দ্বারা ও (২) ৩৭ কে ১৮-র দ্বারা গুণ করিতে হইবে :

(১)

গুণক	গুণ্য
/১	৪০
/২	৮০
/৪	১৬০
/৮	৩২০
	৬০০ (উঃ)

(২)

গুণক	গুণ্য
১	৩৭
/২	৭৪
৪	১৪৮
৮	২৯৬
/১৬	৫৯২
	৬৬৬ (উঃ)

গুণক ও গুণ্য দুইটি সারিতে প্রথমে গুণকের ঘরে ১ ও গুণ্যের ঘরে প্রদত্ত সংখ্যাকে (উপরোক্ত উদাহরণে ৪০ ও ৩৭) লিখিতে হইবে। তারপর দুই সারির সংখ্যাকেই ক্রমশঃ দ্বিগুণ বাড়াইয়া যাইতে হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণকের সারির দুই বা ততোধিক সংখ্যা মিলিয়া প্রদত্ত গুণকের সমান হয়। গুণকের সারির যে সংখ্যাগুলিকে যোগ করিলে প্রদত্ত গুণকটিকে পাওয়া যায়, গুণ্যের সারিতে তাহাদের বিপরীত সংখ্যাগুলি যোগ করিলেই ইপ্সিত গুণফল পাওয়া যাইবে।

আহ্‌মেস্ প্যাপিরাসে নানাবিধ ভগ্নাংশকে একাধিক ভগ্নাংশে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল ভগ্নাংশটির লব (numerator) ২ এবং ইহাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যাহাতে বিশ্লিষ্ট ভগ্নাংশগুলির প্রত্যেকের লব ১ হয়। যেমন,

$$\frac{২}{৯৭} = \frac{১}{৫৬} + \frac{১}{৬৭৯} + \frac{১}{৭৭৬}$$

এই জাতীয় গণিতের মধ্যে বুদ্ধির খেলা অবশ্য কিছুই নাই।

বীজগণিতীয় সমীকরণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন দ্রব্যের ২/৩, তাহার ১/২, ও তাহার ১/৭ দ্রব্যটির সহিত যোগ করিলে মোট ৩৩ হয়; দ্রব্যটি কত? আমাদের অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে অজ্ঞাত রাশিটিকে x ধরিলে সমীকরণটি দাঁড়ায় :

$$\frac{২}{৩}x + \frac{x}{২} + \frac{x}{৭} + x = ৩৩$$

প্যাপিরাসে প্রদত্ত অজ্ঞাত রাশির মান হইতেছে

$$১৪+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৯৭}+\frac{১}{৫৬}+\frac{১}{৬৭৯}+\frac{১}{৭৭৬}+\frac{১}{১৯৪}+\frac{১}{৩৮৮}$$

সব্‌কিছুই ভগ্নাংশে প্রকাশ করিবার একটা অহেতুক চেষ্টা মিশরীয়দের মধ্যে দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কিছু আগে ভগ্নাংশের বিশ্লেষণের যে নমুনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি ভগ্নাংশই আলোচ্য সমীকরণটির সমাধানে স্থান পাইয়াছে।

সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর (arithmatic and geometric progression) ব্যবহার প্রয়োজন হয় এরূপ কতকগুলি বিবিধ প্রশ্নের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। আহ্‌মেসের একটি প্রশ্নে ৭, ৪৯, ৩৪৩, ২৪০১ ও ১৬৮০৭ সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সংখ্যাগুলির পাশে যথাক্রমে একটি মানুষ, বিড়াল, ইঁদুর, বার্লি ও শস্যের দানা অঙ্কিত আছে। বহুদিন পর্যন্ত এইরূপ পাঁচটি সংখ্যা ও তাহার সহিত কয়েকটি আপাত অসংলগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিবার রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। ক্যাণ্টর সাহেব আহ্‌মেস্ ধাঁধার সমাধান আবিষ্কার করিয়া বলেন যে, ইহা একটি গুণোত্তর শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এবং চিত্র ও সংখ্যাগুলির তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ:— ৭ জন ব্যক্তির প্রত্যেকের ৭টি করিয়া বিড়াল আছে, প্রত্যেকটি বিড়াল ৭টি করিয়া ইঁদুর ধরে, প্রত্যেকটি ইঁদুর ৭টি করিয়া বার্লির শীস খায়, প্রত্যেকটি শীষে ৭টি করিয়া বার্লির দানা আছে; সংখ্যাগুলি ও তাহাদের যোগফল কত? অর্থাৎ ৭+৪৯+৩৪৩+২৪০১+১৬৮০৭=১৯৬০৭।

প্রাচীন মিশরীয়দের পাটীগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত জ্ঞানের দৃষ্টান্ত আমাদের খুব বেশী মুগ্ধ করে না। ইহা নিঃসন্দেহে ব্যাবিলনীয় জ্ঞান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু মিশরীয় জ্যামিতি বাস্তবিকই ব্যাবিলনীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল। ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ও বহুভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, সিলিণ্ডার, পিরামিড প্রভৃতি ঘন যথাযথ ভাবেই তাহাদের আমরা নির্ণয় করিতে দেখি। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে ½ (ভূমি) × (উচ্চতা) নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। বৃত্তের ক্ষেত্র নিরূপণ হইতে মিশরীয়েরা π এর যে মান নির্ণয় করে তাহা ব্যাবিলনীয়দের নির্ণীত মান (৩) অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভুল। আহ্‌মেস্ প্যাপিরাসে উল্লিখিত নিম্নোক্ত প্রশ্নটি প্রণিধানযোগ্য।

"৯ খেত (khet) ব্যাসের একটি বৃত্তাকার ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণের উপায়। ক্ষেত্রফল কত?

ব্যাস হইতে উহার $\frac{১}{৯}$ ভাগ, অর্থাৎ ১ প্রথমে বাদ দিতে হইবে। অবশিষ্ট ৮।

এখন ৮-এর ৮ গুণ বাহির কর। উত্তর হইবে ৬৪। ইহাই ভূমির ক্ষেত্রফল ..."*

বৃত্তের ব্যাস যদি a মনে করা যায়, তবে উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার নিয়ম হইতেছে, $\left(a-\frac{a}{৯}\right)^২$। সুতরাং π-এর মান হইল $\left(\frac{১৬}{৯}\right)^২=৩.১৬$।† π-এর প্রকৃত মান ৩.১৪১৬।

ব্যাবিলনীয়রা পিরামিডের আকারে নির্মিত শস্যাধারে শস্য ভরিয়া রাখিত। শস্যের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য আধারের আয়তন মাপা আবশ্যক। উপরের দিক কাটা এইরূপ পিরামিডের বা ফ্রাস্টামের আয়তন বা ঘন (V) ব্যাবিলনীয়রা বাহির করিত এইভাবে:

$$V=h\left[\frac{(a+b)^২}{২}+\frac{(a-b)^২}{২}\right];$$

* 'Man Makes Himself' by V. Gordon Childe কর্তৃক উদ্ধৃত আহ্‌মেস্ প্যাপিরাসের কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ।

† $\pi\left(\frac{a}{২}\right)^২=\left(a-\frac{a}{৯}\right)^২$;

$$\pi=\frac{৪}{a^২}a^২\left(\frac{৮}{৯}\right)^২=\left(\frac{১৬}{৯}\right)^২$$

h—উচ্চতা ; a—নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য ; b—উপরের ভূমির দৈর্ঘ্য। শস্য মাপিবার কাজে যথেষ্ট হইলেও এই নিয়মে ফ্রাস্টামের নির্ভুল আয়তন পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ারদের পিরামিড বা ফ্রাস্টাম গড়িতে হইলে আরও নির্ভুল পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে। সেইখানে সামান্য ভুলও মারাত্মক। এজন্য স্থাপত্যের প্রয়োজনে মিশরীয়েরা নির্ভুল নিয়ম আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিল। মস্কো প্যাপিরাসে আমরা ফ্রাস্টামের ঘন-এর নিম্নলিখিত নিয়ম পাই :—

$$V = \frac{h}{৩}\left(a^২ + ab + b^২\right)$$

এই প্যাপিরাসে বর্ণিত প্রশ্নের একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

২
৬
১/৩
৫৬
৪
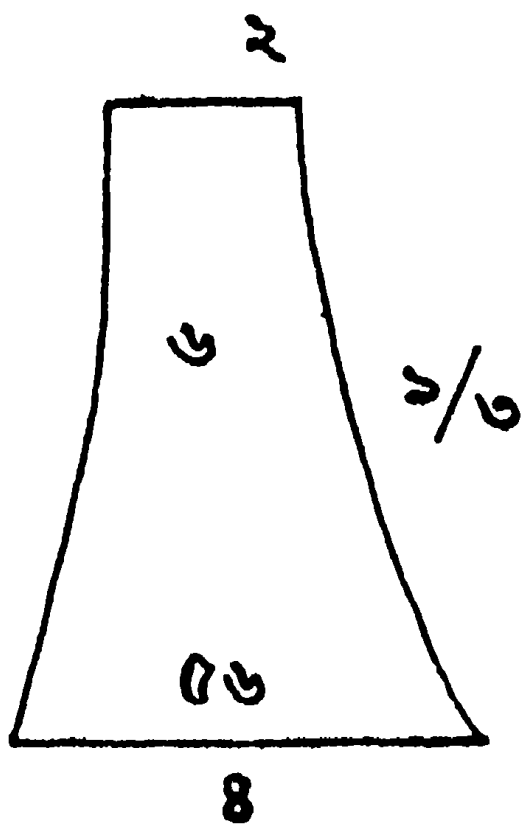
পিরামিডের ফ্রাস্টাম

"উপরের অংশ কাটা গিয়াছে এইরূপ একটি পিরামিডের (ফ্রাস্টাম) আয়তন বাহির করিতে হইবে।

তোমাকে বলা হইল কর্তিত পিরামিডের উচ্চতা ৬ কিউবিট, নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য ৪ কিউবিট, উপরের ভূমির দৈর্ঘ্য ২ কিউবিট।

৪-এর বর্গ বাহির কর ; উত্তর ১৬।

৪-এর দ্বিগুণ বাহির কর ; উত্তর ৮।

২-এর বর্গ বাহির কর ; উত্তর ৪।

১৬ র সহিত ৮ এবং তাহার সহিত ৪ যোগ কর ; যোগফল ২৮।

৬-এর ⅓ বাহির কর ; ফল ২। ২৮-এর দ্বিগুণ বাহির কর, উত্তর হইবে ৫৬।

দেখ, ইহা ৫৬। তুমি উত্তর পাইয়া গিয়াছ।"*

মিশরীয়েরা কি ভাবে এই সূত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা জানা নাই এবং জানা সম্ভবও নয়। নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ কোন গাণিতিক পদ্ধতিতে তাহারা সূত্রটি আবিষ্কার করে নাই, কারণ তাহাতে যে ধরনের গাণিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন সে যুগে তাহা সম্ভবপর ছিল না। ক্যাল্‌কুলাসের সাহায্যে খাঁটি গাণিতিক পদ্ধতিতে এই সূত্র প্রমাণিত হইয়াছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। এমন কি সপ্তদশ শতকে ক্যাভালিয়েরি তথাকথিত অবিভাজ্য পদ্ধতি (method of indivisibles) অবলম্বন করিয়াও এই সূত্র পুরাপুরি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। পিরামিড নির্মাণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে কোন প্রকার তত্ত্বীয় প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহারা এই নির্ভুল সূত্রটি প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ প্রায়োগিক আবিষ্কারের (empirical discovery) উচ্চমূল্য দিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা একেবারেই ভুল বিচার। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রয়োগবাদের প্রভূত মূল্য আছে ; বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তার প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। অধ্যাপক বেল তাই মস্কো প্যাপিরাসে বর্ণিত ফ্রাস্টামের সূত্র সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—Even the empirical discovery of such a process or its verbal equivalent is evidence of extraordinary mathematical insight" (Development of Mathematics, p 41).

---

* Man Makes Himself—গ্রন্থে প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ।

খনিজ তৈল

শ্রীহৃষীকেশ রায়

খনিজ তৈল বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অন্যতম প্রধান প্রতীক। খনিজ তৈল ব্যতীত মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন এবং বিভিন্ন কলকব্জার কাজ চালান যেন এক স্বপ্নাতীত ব্যাপার। ব্যোমপথে এরোপ্লেনের দ্রুতগতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্ময়ে পুলকিত হই; কিন্তু যে শক্তির সহায়তায় এরোপ্লেনের এই দ্রুতগতি, সে শক্তির উৎস সম্বন্ধে আমরা তত বেশী উৎসুক নই। ছোট ছোট সহর বা পল্লীগ্রামের নিভৃত অঞ্চলে যে কেরোসিন অন্ধকারে আলো দান করে, দৈনন্দিন জীবনে যাহার সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত, কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া তাহা আমাদের ব্যবহারযোগ্য হইল সে জ্ঞানও আমাদের সীমাবদ্ধ। ঔষধরূপে তরল প্যারাফিন এবং ভেসিলিন, আলো দান করিতে মোমবাতি ও কেরোসিন, কলকব্জার ক্ষয় নিবারণ করিতে পিচ্ছিল তৈল, রাজপথ নির্মাণে অ্যাসফাল্ট প্রভৃতি সকলই খনিজ তৈলের বিভিন্ন অবস্থার দান।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে সুমেরীয়গণ গৃহনির্মাণ কার্যে অ্যাসফাল্ট ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (জন্ম খৃঃ পূঃ ৪৮০) বলেন, ব্যাবিলন নগরের রাজপথ ও গৃহাদি নির্মাণে অ্যাসফাল্টের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও খনিজ তৈলের রূপান্তর পীচের উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার তাঁহার দিগ্বিজয়ের পথে মেসোপটেমিয়ায় খনিজ তৈল দেখিয়া বিস্মিত হন। মমির পচন নিবারণের জন্য মিশরীয়গণ অন্যান্য বিবিধ উপাদানের সহিত অ্যাসফ্যাল্টের প্রয়োগ করিতেন। এই সকল তথ্য হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন যুগেও খনিজ তৈলের ব্যবহার নানাভাবে অজ্ঞাত ছিল না। খনিজ তৈলের আধুনিক ব্যবহারের সূত্রপাত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তঃপাতী পেনসিল-ভ্যানিয়ায়। তারপর মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খনিজ তৈলের ব্যবহার আশ্চর্যরূপে বর্ধিত হইয়াছে।

খনিজ তৈল (পেট্রোলিয়াম) গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন হাইড্রোকার্বনের পারস্পরিক রাসায়নিক মিলনে ভূগর্ভে পাওয়া যায়। বহুপ্রকারের হাইড্রো-কার্বনের বিভিন্ন প্রকৃতি ও তাহাদের রাসায়নিক মিলনকালীন অনুপাতের তারতম্য অনুসারে তৈলও নানা শ্রেণীর হয়। খনিজ তৈলের মোটামুটি দুইটি শ্রেণী—লঘু ও গুরু। যে সকল তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা অনেক কম তাহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত এবং প্রায় জলের সমান আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্ট খনিজ তৈলকে 'গুরু' বলা হয়। খনিজ তৈলে যে গ্যাসোলিন থাকে, তাহার পরিমাণ অধিক হইলে সে তৈল হয় 'লঘু' এবং তাহার মূল্যও হয় অধিক।

পাললিক শিলাস্তরে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। খনিজ তৈলের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মতবাদের মধ্যে জৈব এবং আগ্নেয় মতবাদই উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র-গর্ভে খনিজ তৈলের উৎপত্তিস্থান অনুমান করিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, কয়লা যেমন ভূ-গর্ভস্থ চাপ ও তাপের ক্রিয়ায় উদ্ভিদের রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন হয়, খনিজ তৈলও সেইরূপ শেল (কাদা জমিয়া পললশিলার রূপান্তর) নামক শিলার মধ্যে অ্যালগি, ডায়েটম প্রভৃতি নিম্নস্তরের নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ মৎস্য ও শম্বুকাদি সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ সন্নিবেশিত হইয়া তথায় ভূ-গর্ভস্থ

প্রবল তাপ ও চাপের অধীনে একপ্রকার বীজাণুর ক্রিয়ায় বিশেষরূপ পাতনের (destructive distillation) ফলে সৃষ্টি হয়। ইহাই জৈব মতবাদ। কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ বলেন, খনিজ তৈল জৈব পদার্থজাত ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কি সেই আদি জৈব পদার্থ—উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণী সে বিষয়ে এখনও তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। এই দলের অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রাণীজ উৎপত্তিরই উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন।

আগ্নেয়মতবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, ভূ-গর্ভস্থ ধাতব অক্সাইড এবং অঙ্গারজ পদার্থ আভ্যন্তরীণ অত্যধিক তাপে ধাতব কারবাইডে পরিবর্তিত হইয়া জলের ক্রিয়ায় গ্যাসীয়, তরল কিংবা কঠিন হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়। কয়লা ও খনিজ তৈল ভূ-নিম্নে সাধারণতঃ একই স্তরে পাওয়া যায় বলিয়া কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন যে, উদ্ভিদের বিকার হইতে তরল অঙ্গারজ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া খনিজ তৈলের সৃষ্টি হয়।

ভূ নিম্নে কয়েকটি বিশেষ অবস্থার সন্নিবেশে বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট খনিজ তৈল এক একটি বিভিন্ন শিলাস্তরে সঞ্চিত হইতে পারে। লবণাক্ত জল-গর্ভসম্ভূত শেলজাতীয় শিলার মধ্যে প্রচুর অঙ্গারজ পদার্থপ্রধান অপুষ্পক শ্রেণীর একপ্রকার উদ্ভিদের বা প্রাণীর দেহাবশেষ খনিজ তৈলের উৎপত্তির সহায়ক। দেখা গিয়াছে—স্বাদু জলগর্ভের যে শিলা, তাহাতে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া যায় না; ইহার কারণ এখনও অজ্ঞাত। খনিজ তৈল ভূ-গর্ভে সঞ্চিত হইবার জন্য আবশ্যক বালুকা-প্রস্তর বা চুনাশিলার ন্যায় প্রবেশ্য শিলাস্তর। প্রথমোক্ত শিলাই এই কার্যে অধিক উপযোগী। উক্ত উভয় প্রকার শিলারই মধ্যবর্তী শূন্যস্থান অন্য প্রকারের শিলা অপেক্ষা আয়তনে অধিক; সেইজন্য ইহারা অধিক তৈলধারণক্ষম। এইরূপ তৈলবাহী শিলাস্তরের উর্ধ্বে ও নিম্নে শেলজাতীয় কর্দমপ্রস্তরের ন্যায় অপ্রবেশ্য শিলাস্তর সন্নিবেশিত না থাকিলে অত্যধিক তরল ও সঞ্চরণশীল উদ্বায়ী খনিজ তৈল অন্যত্র নীত হইতে পারে। সৃষ্টির

১নং চিত্র
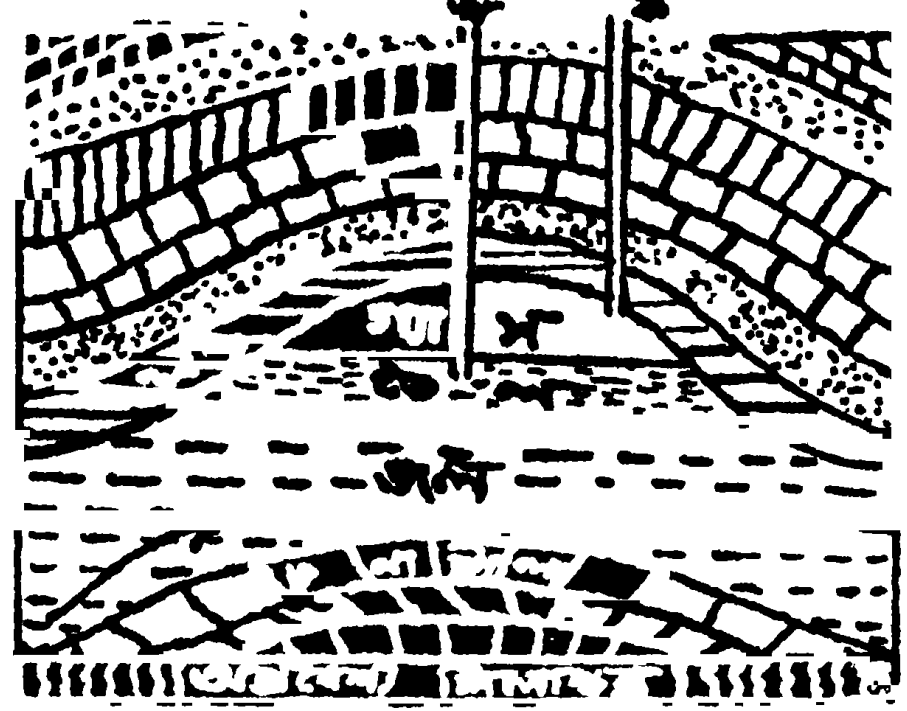
পর খনিজ তৈল একস্থানে সঞ্চিত হইবার অনুকূলে শিলাস্তরগুলি চিত্রে প্রদর্শিতভাবে সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। কুব্জপৃষ্ঠরূপে বিন্যস্ত শিলাস্তরের যেখানে উত্তল ভাঁজ (anticline) হয়, সেইস্থানে তৈল সঞ্চিত হয়; ইহা যেন একটি 'তেল ধরা ফাঁদ'। এই কয়েকটি প্রাথমিক পরিবেশের মধ্যে যে কোন একটির অভাবে একস্থানে প্রচুর তৈল সঞ্চিত হওয়া অসম্ভব। শিলাস্তরের উপরোক্ত বিচিত্র সন্নিবেশের সহায়তায় খনিজ তৈলের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলাস্তরে খনিজ তৈলের উৎপত্তি অসম্ভব।

শিলাস্তরের উত্তল ভাঁজে তৈল যেভাবে সঞ্চিত হয় তাহাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোন কারণে চাপের ন্যূনতা হইলে এই তৈলের উদ্বায়ী গুণের জন্য উর্ধ্বপাতনের ফলে সহজে তৈলবাষ্প তৈয়ারী হওয়ায় ফাঁদ-এর মধ্যে প্রথমে তৈলজাত সহজ-দাহ্য গ্যাস, মধ্যে তৈল ও সর্বনিম্নে লবণাক্ত জল আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে; কিন্তু চাপ অধিক হইলে ঐ গ্যাস অধিক চাপে তৈলে দ্রবীভূত হওয়ায় ফাঁদ-এ কেবল তৈল ও জল পাওয়া যায়। পাললিক শিলাস্তরে জলের এইরূপ কোন উৎস না থাকিলে তৈল উত্তল ভাঁজে সঞ্চিত না হইয়া নিম্নপৃষ্ঠ অবতলে (Syncline) সঞ্চিত হয়।

খনিজ তৈলসঞ্জাত যে তৈলবাষ্প, তাহা সাধারণতঃ মিথেন নামক হাইড্রোকার্বন ও ঐ জাতীয় গ্যাসের সমবায়ে গঠিত। ইহার কতকাংশ ভূ-গর্ভের অতিরিক্ত চাপে তৈলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় খনি হইতে তৈল উত্তোলনের কার্যে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করে। কারণ, তৈলে এই গ্যাস থাকায় শিলার মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে তৈলের আটকাইয়া থাকিবার ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তৈল উত্তোলনের সময়ে এই গ্যাস বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে অধিকাংশ তৈলই খনির মধ্যে রহিয়া যায়।

পূর্বোল্লিখিত ফাঁদ বহু প্রকারের হইয়া থাকে। ভূ-সংক্ষোভের* ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ অবনমিত হয় এবং সেই চাপের প্রতিক্রিয়ায় তৎসংলগ্ন অপর অংশ উন্নত হইতে থাকে। এইরূপ অবনয়ন ও উন্নয়নে শিলাস্তরের স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রম করিলে স্তরসমূহ এক সমতল রেখায় দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায় এবং
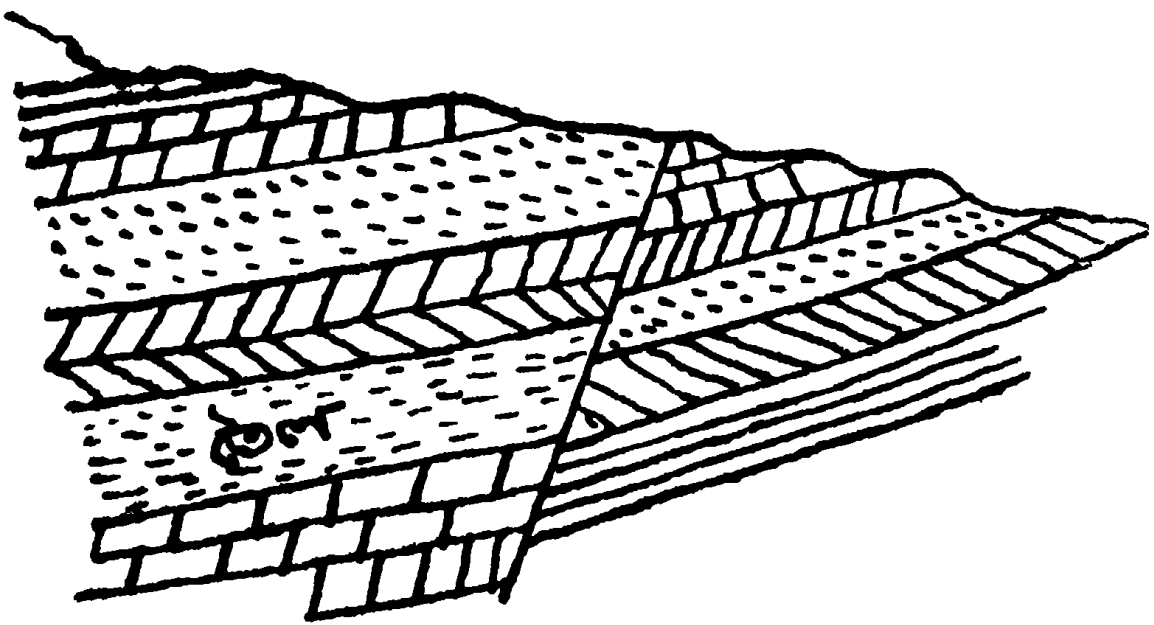
২য় চিত্র

অসমানভাবে সংলগ্ন থাকিয়া ২য় চিত্রের ন্যায় আর একপ্রকার ফাঁদের সৃষ্টি করে। পাললিক শিলাস্তরের গভীরতম প্রদেশের আগ্নেয়শিলা বা লবণজাতীয় শিলার স্তম্ভ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চাপের ক্রিয়ায় কোন কোন স্থানে উল্লম্বভাবে পাললিক শিলার স্তরের মধ্যে বাঁধের ন্যায় অবস্থিত হইয়া আরও একপ্রকার ফাঁদের সৃষ্টি করে।

বর্তমান যুগে ভূ-গর্ভে এই তেল-ধরা ফাঁদ আবিষ্কার করিবার জন্য অভিজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এরোপ্লেনের সাহায্যে নির্দিষ্ট উচ্চতা হইতে সম্ভাব্য স্থানসমূহের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। আলোকচিত্রগুলি একত্রে গ্রথিত করিয়া তাঁহারা সেই ভূ-ভাগের বহিরাকৃতির গঠনপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁহাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোন স্থানে ঐরূপ ফাঁদের সম্ভাবনা আছে কিনা বলিয়া দেন। আলোকচিত্রের সাহায্যে ফাঁদ-এর সম্ভাব্য স্থান নির্ণীত হইলে সেই স্থানে ভূ-গর্ভে তৈল সঞ্চিত আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। তিনটি বিভিন্ন পন্থায় তৈলের সন্ধান করা হয়।

প্রথমতঃ—প্রকম্পনবিধি (Seismic method)। ভূমিকম্পের সময় দেখা যায় যে, ভূস্তর কম্পিত হইয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ভূস্তরের বিভিন্ন উপাদান, ঘনত্ব ও অবস্থানের সহিত এই তরঙ্গের গতিবেগ ও প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ বর্তমান। এই তরঙ্গের গতিবেগ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এমন কি, বহু দূরবর্তী স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পের কেন্দ্রও নির্ণয় করা সম্ভব। যে স্থানে ভূ-নিম্নে তৈলের অবস্থান অনুমান করা যায়, তাহার পার্শ্ববর্তী বিভিন্নস্থানে ডিনামাইটের বিস্ফোরণের দ্বারা ভূ-ত্বকে কৃত্রিম তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। সূক্ষ্ম লিখনযন্ত্রের সাহায্যে ঐ তরঙ্গের ও ভূ-ত্বকের বিভিন্ন স্তর হইতে তাহার প্রতিধ্বনির প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া উত্তল ভাঁজে লুক্কায়িত খনিজ তৈলের ফাঁদ-এর সন্ধান পাওয়া খুব কঠিন নয়। দ্বিতীয়তঃ—মহাকর্ষশক্তির সাহায্যে ফাঁদ-এর অবস্থান নির্ণয় করা। যে সকল

* ভূত্বক (প্রায় ৪০ মাইল গভীর) শীতল হইলেও পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ্যন্তরভাগ নিয়ত তাপ বিকিরণ করিয়া সংকুচিত হইতেছে; এই কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তর ও ত্বকের মধ্যবর্তী স্থানে যে ফাঁকের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে ভূত্বক অবিরত কোথাও অবনমিত ও কোথাও উন্নত হয়। ইহাই ভূ-সংক্ষোভ।

ফাঁদে পূর্ববর্ণিতরূপ বাঁধ থাকে তাহাদের অবস্থান এই উপায়ে বাহির করা যায়। কারণ, বাঁধ ও তাহার পার্শ্ববর্তী শিলার উপাদান ভিন্ন প্রকারের হওয়ায় অতি সামান্ত হইলেও তাহাদের আকর্ষণ-শক্তির কিছু তারতম্য হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন Gravity Balance নামক যন্ত্রের সাহায্যে ফাঁদ-এর অবস্থান সন্ধান করা হয়। যন্ত্রটি একটি সূক্ষ্ম সূত্রে ভূমির সমান্তরালে লম্বিত উভয় প্রান্তে ভারযুক্ত একটি লঘু লৌহদণ্ড। তড়িৎ-শক্তি প্রবাহের দ্বারাও ফাঁদ-এর অবস্থান নির্ণয়ের অপর একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার শিলার তড়িৎশক্তি প্রবাহের রোধ গুণের সহায়তা দ্বারা ইহা কার্যকরী করা হয়।

দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে চীনারা লবণের প্রয়োজনে ভূগর্ভ হইতে যে প্রণালীতে লবণাক্ত জল বাহির করিত, আদিতে সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া খনিজ তৈলও নিষ্কাশন করা হইত। অধুনা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ একপ্রকার খনন যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিতে নলকূপের ন্যায় দশ-পনর হাজার ফুট গভীর ছিদ্র করিয়া সুদৃঢ় লৌহনলের সাহায্যে তৈল উত্তোলন করা হয়। কোন ফাঁদ-এর সন্ধান পাইয়া এইরূপ একবার ছিদ্র করিলেই যে তৈল পাওয়া যাইবে, এমন কোন স্থিরতা নাই; হয়ত প্রোথিত নলের ভূগর্ভের প্রান্তসীমা সঞ্চিত দাহ্য গ্যাস (প্রথম চিত্রে 'ক') অথবা জলের ভাণ্ডারে পৌছিল; তখন পুনরায় পার্শ্ববর্তী নূতন স্থানে ছিদ্র করিয়া প্রোথিত নলের সাহায্যে তৈল ভাণ্ডারের সন্ধান করিতে হইবে। প্রোথিত লৌহনল তৈল ভাণ্ডারে (প্রথম চিত্রে 'খ') পৌছিলে অত্যধিক চাপের (প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০০০ পাউণ্ড) অধীন থাকায় তৈল প্রথম অবস্থায় আপনা হইতেই উপরে উঠিয়া আসে। পরে চাপ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পাম্পের সাহায্যে তৈল উত্তোলন করা হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া কোন স্থানে তৈল খুঁজিয়া বাহির করিতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়।

খনি হইতে এইরূপে যে তৈল পাওয়া গেল তাহা তরল বা অর্ধতরল, দুর্গন্ধযুক্ত, দেখিতে কালো, ঘন বাদামী বা সবুজাভ বাদামী রঙের। ইহাকেই পেট্রোলিয়াম বা মেটে তৈল বলে। দক্ষিণ আমেরিকা, ত্রিনিদাদ, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে অ্যাসফাল্ট বা বিটুমেন এবং হিমালয় প্রদেশে যে শিলাধাতু সংগৃহীত হয় তাহাও এই জাতীয়। খনি হইতে উত্তোলিত তৈল প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহারের অযোগ্য। তৈলক্ষেত্র হইতে বহুদূরে (কোন কোন ক্ষেত্রে সহস্রাধিক মাইল) সমুদ্র-তীরবর্তী স্থানে নলবাহিত হইয়া তৈল শোধনাগারে নীত হয়। নলের মধ্যে তৈলের স্রোত অব্যাহত রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানে পাম্পের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। খনি হইতে প্রাপ্ত গ্যাস বিশেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারোপযোগী করিয়া সম্ভব হইলে কোল গ্যাসের জ্বালানীরূপে কাজে লাগান হয়। শোধনাগারে বহু জটিল যন্ত্রের সাহায্যে আংশিক পাতনক্রিয়ার দ্বারা মেটে তৈলকে বিশুদ্ধ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাপের তারতম্যে ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে মেটে তৈল হইতে স্ফুটনাঙ্ক অনুসারে প্রথমে দাহ্য গ্যাস, ক্রমে পেট্রোলিয়াম ইথার (৩০°-৭০°), পেট্রল ও গ্যাসোলিন (৭০°-১২০°), বেনজিন (১২০°-১৫০°), কেরোসিন (১৫০°-৩০০°), লুব্রিকেটিং তৈল (৩০০°-উচ্চে) ভেসিলিন ও প্যারাফিন (গলনাঙ্ক ৪৮°-৬২°), অ্যাসফাল্ট প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে তৈল ও চর্বি নিষ্কাশন, মোটরগাড়ী চালান ও বস্ত্রাদি শুষ্ক এবং ধৌত করা, দ্রাবক, জ্বালানী ও বীজাণুনাশক, যন্ত্রের ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণ, ঔষধ ও বাতি তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক কার্যে ইহাদের ব্যবহার হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, ইরাক, রাশিয়া,

মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। জাপান, রুমেনিয়া, ব্রহ্মদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানেও এই দেশগুলির তুলনায় সামান্য তৈল পাওয়া যায়। আমেরিকায় ২৫০ কোটি ব্যারেল (১ ব্যারেল = ৪২ গ্যালন) আর ভারতে মাত্র ২৪ লক্ষ ব্যারেল তৈল প্রতি বৎসর পাওয়া যায়; অথচ আমাদের অভাব ইহার ৬ গুণ। আমেরিকার টেক্সাস, ইরাকের মসুল তৈল খনির সহিত ভারতের ডিগবয়, বদরপুর প্রভৃতি তৈল খনিগুলির মোটেই তুলনা চলে না। ব্রহ্মদেশে যে তৈল ভাণ্ডার আছে, প্রাক্ যুদ্ধের যুগে প্রধানতঃ তাহাই আমাদের পেট্রল ও কেরোসিনের অভাব মিটাইত। ভূ বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, হিমালয় প্রদেশে ভবিষ্যতে প্রচুর কেরোসিন পাওয়া যাইতে পারে। অধুনা এরোপ্লেনের দ্বারা জরীপ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তৈলখনি আবিষ্কারের সম্ভাবনার কথা জানা গিয়াছে। আরব দেশেও যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ একটি তৈল ভাণ্ডারের সন্ধান নাকি পাওয়া গিয়াছে।

সৌরকলঙ্কের সর্বাধুনিক গবেষণা

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি কর্তৃক তাপ-তড়িৎ যন্ত্র দ্বারা সৌরকলঙ্কের তাপ ও তাপ-বিকিরণ পরিমাপের প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয়; তৎপরে আরও অনেকেই ঐ যন্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করেন। তাঁহাদের গবেষণায় প্রকাশ পায় যে, সৌরকলঙ্কের কালো অংশ যতই গাঢ় হয় সৌরবিম্বের উজ্জল স্থান অপেক্ষা ঐ অংশ ততই কম তাপ বিকিরণ করে। কিন্তু যখন সৌরকলঙ্কের গাঢ় অংশ (Umbra) প্রধানতঃ শতকরা একেরও কম পরিমাণ আলোক প্রদান করে তখন ঐ স্থান সাধারণতঃ শতকরা পঞ্চাশ পরিমাণ তাপ, পার্শ্ববর্তী সমপরিমাণ আলোক-মণ্ডলের ন্যায় বিকিরণ করে; আর ঐ কলঙ্ক যদি সৌরবিম্বের প্রান্তদেশে থাকে তবে শতকরা হার আরও বেশী হয়। বাস্তবিক ল্যাঙলি ও ফ্রষ্ট দেখিয়াছিলেন যে, কোন কোন স্থানের সৌরকলঙ্কের চতুষ্পার্শ্বস্থ উজ্জল স্থান হইতে তাহাদের তাপ-বিকিরণ প্রকৃতপক্ষে অধিক। এই পর্যবেক্ষণ যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই জটিল। এ-পর্যন্ত প্রধানতঃ অনুমিত হইয়াছে যে, সৌরকলঙ্কের কম তাপ-বিকিরণের একটি লক্ষণ এই যে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ আলোক-মণ্ডল হইতে তাহার তাপ কম, কিন্তু ইহা সর্বথা স্বীকার্য নহে। দুইটি সমতাপের সংযুক্ত কলঙ্ক অথচ তাহাদের গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলে তাহারা তাহাদের জ্যোতিতে ও অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণের শক্তিতে বিভিন্ন হইতে পারে। যেমন 'ওয়ালস্‌বাক' বাতির ম্যাণ্টল ও ম্যাণ্টলবিহীন প্রজ্বলন সমান নহে। অবশ্য ইহা এখনও অনিশ্চিত যে, আলোক মণ্ডলের তাপ হইতে কলঙ্কগুলি উষ্ণ না শীতল।

সৌরকলঙ্ক তাহার পার্শ্ববর্তী আলোক-মণ্ডল হইতে উষ্ণ না শীতল তাহা অনিশ্চিত

সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বতন মত এখানে উল্লেখযোগ্য—

(ক) সার উইলিয়াম হার্শেল মনে করিতেন যে, দুইটি জ্যোতির্ময় স্তর ভেদ করিয়া অবকাশ রূপে সৌরকলঙ্ক উৎপন্ন হয়। ঐ জ্যোতির্ময় স্তরদ্বয় সূর্যের অন্তর্বর্তী মূল গোলককে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার মতে ঐ অন্তর্বর্তী গোলক কালো এবং হয়ত কঠিন।

সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে সার উইলিয়াম হার্শেলের মত

তদুপরিস্থ স্তরদ্বয়ের বাহিরের স্তর অপেক্ষাকৃত অধিক উজ্জ্বল। এই স্তরকে তিনি আলোক-মণ্ডল বলিতেন। এই স্তরের অবকাশ বেশী, এই স্তর ও কালো কঠিন গোলকের অন্তর্বর্তী স্তর কম উজ্জ্বল প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। এই স্তরই তরল ছায়াময় (Penumbra)। তিনি মনে করিতেন, মূল গোলকের অন্তর্নিহিত আগ্নেয় বিস্ফোরণে এই স্তরদ্বয় ভেদ করিয়া যে অবকাশ প্রকাশ পায় তাহাই সৌরকলঙ্ক। উপরের স্তরের অবকাশ বেশী, নিম্নের স্তর কম উজ্জ্বল—এই দুই কারণে সৌরকলঙ্কের 'গাঢ় ও তরল' দুইটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সার উইলিয়াম হার্শেলের এই মত ভ্রমপূর্ণ হইলেও অদ্যাপি কোন কোন পুস্তকে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) আর একটি মত বর্তমানে স্থূলতঃ পরিত্যক্ত; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সেক্কি ও ফেয়ির পরস্পর নিরপেক্ষ প্রস্তাবের ফলে, প্রক্টার তাঁহার 'নূতন ও পুরাতন নক্ষত্রবিদ্যা' নামক গ্রন্থে অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহারা অনুমান করেন যে, আভ্যন্তরীন আবদ্ধ বাষ্পের বহিস্ফোটনের ফলে আলোক-মণ্ডলের ঐ অবকাশ উৎপন্ন হয়। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, কোন নির্দিষ্ট তাপে উত্তপ্ত বাষ্প সেই তাপ হইতে কম তাপ বিকিরণ করে এবং তাহার তরল সমতল অথবা সমপদার্থের অপেক্ষাকৃত কম তাপে সঙ্কোচনের ফলে উৎপন্ন মেঘ হইতে অনেক কম আলোক নির্গত হয়। নিম্ন চাপের বাষ্প সম্বন্ধে এই কথা সত্য; কিন্তু সবিতার গর্ভদেশে বিরাট সঙ্কোচনের ফলে উৎপন্ন বাষ্প সম্বন্ধে এই কথা সত্য নহে। এতদ্ব্যতীত এই অনুমান অনুসারে বাষ্পের কম তাপ-বিকিরণ শক্তি হইলে তাহার শোষণ সামর্থ্যও কম হইবে; ফলে সে বাষ্প স্বচ্ছ হইবে। এমত অবস্থায় সূর্যের বিপরীত দিকের আলোক-মণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগ ঐ অবকাশ পথে দেখা যাইবে এবং বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থল কালো না হইয়া অন্ততঃ সাধারণ পৃষ্ঠদেশ হইতে উজ্জ্বলতর হইবে। অধিকন্তু আলোকের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষার যন্ত্রে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বর্তমানে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কলঙ্কের কেন্দ্রের ঘূর্ণন গতি ভিতরের দিকে থাকে, বাহিরের দিকে নহে।

সেক্কি ও ফেয়ির মত

(গ) পরে ফেয়ি আর একটি প্রস্তাব করেন এবং এখনও তিনি ঐ প্রস্তাব পোষণ করেন। ঐ প্রস্তাবের অনেকগুলি সদ্‌যুক্তি থাকায় অনেকেই উহা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি এই যে, সৌরকলঙ্ক ধরণীপৃষ্ঠের ঘূর্ণী-ঝড়ের সমতুল্য। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সূর্যের নিরক্ষ প্রদেশের আবর্তন উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের আবর্তন হইতে কম সময়ে নিষ্পন্ন হয়। এই অবস্থা আলোক-মণ্ডলে এক আপেক্ষিক গতি উৎপন্ন করে। তাঁহার মতে এই অসমান গতির ফলে পাক বা ঘূর্ণী অথবা আবর্ত উৎপন্ন হয়। দুইটি নদীর সঙ্গমস্থলে অথবা যেখানে জলস্রোত শিলাখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত হয় সেখানে এরূপ পাক বা আবর্ত অনেকেই দেখিয়াছেন। এই পরিকল্পনা হইতে সৌরকলঙ্কের বিন্যাস এবং তাহাদের অনেকগুলির একত্রে বিদ্যমানতার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যেস্থানে বিভিন্ন গতির স্রোত মিলিত হয় সেই স্থানেই কলঙ্কগুলি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সমস্ত সৌরকলঙ্ক ঘূর্ণী-ঝড়ের ফল বলিতে হইবে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কলঙ্কের ঘূর্ণন দক্ষিণাবর্তে ও উত্তর গোলার্ধের কলঙ্কের ঘূর্ণন বামাবর্তে পরিচালিত হইবে। বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে অল্প সংখ্যক কলঙ্কের এইরূপ ঘূর্ণ্যাবর্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু এই পরিকল্পনা মতে তাহাদের ঘূর্ণ্যাবর্তের গতিও ঠিকমত মিলে না।

ফেয়ির দ্বিতীয় পরিকল্পনা

ফেয়ি এই বলিয়া তাঁহার অভিমত সমর্থন করেন যে, আমরা ঘূর্ণীর প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাই না;

আমরা দেখিতে পাই সমপদার্থের আপেক্ষিক কম তাপে সঙ্কোচনের ফলে উৎপন্ন মেঘ, যাহা নিম্নাভিমুখী গতির ফলে ঘূর্ণীর সহিত পাক খায়। প্রকৃত ঘূর্ণী মেঘে ঢাকা থাকে; তথাপি মনে করিতে হইবে যে, এ অবস্থায় মেঘও ঘূরপাক খাইবে। আরও কথা এই যে, তাহা হইলে কলঙ্কের অব্যবহিত পরবর্তী আলোক মণ্ডলের আপেক্ষিক গতি পর্যবেক্ষণের পক্ষে অপ্রচুর হইবে। সূর্যের ২০° উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষরেখায় ১২৩ মাইল দূরবর্তী দুইটি কলঙ্কের দৈনিক গতি মাত্র ৪⅙ মাইল হইবে। এই অকিঞ্চিৎকর গতির ঘূর্ণ্যাবর্ত অনুভবের অযোগ্য।

ফেয়ির নিজমত সমর্থনের চেষ্টা বৃথা

(ঘ) সেক্কি পরে সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্যের পৃষ্ঠদেশের অন্তর্বর্তী স্তরে বিস্ফোরণের ফলে কলঙ্ক উৎপন্ন হয় বটে, তবে বিস্ফোরণ ঠিক কলঙ্কের মধ্যবর্তী নহে, পার্শ্ববর্তী স্থানে হয় এবং উদ্গত পদার্থনিচয় পার্শ্বে আলোক-মণ্ডলের উপর থিতাইয়া পরে। পরন্তু তাহাদের সম্প্রসারণ ও গড়াইয়া যাওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া কালো কলঙ্ক সৃজন করে। এরূপ স্থলে মনে করিতে হইবে যে, একটি মাত্র বিস্ফোরণ নহে, একটি বড় কলঙ্কের চারিদিকে অনেকগুলি বিস্ফোরণ চক্রাকারে ঘটিয়া থাকে এবং সমস্ত বিস্ফোরণের উৎক্ষেপণ একাভিমুখী বা একই কেন্দ্রের দিকে পরিচালিত হয়। যদি কলঙ্ক বিস্ফোরণের মধ্যে উৎপন্ন হয় তবে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করা বড়ই কঠিন। কিন্তু যদি কলঙ্কের ফলে বিস্ফোরণ হয় তবে তাহা বুঝা কঠিন নহে। বস্তুতঃ ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যখন কোন স্থানে কোন বিস্ফোরণ হয় নিকটবর্তী স্থানের আলোক-মণ্ডল, নিম্নের চাপ কমিয়া যাওয়ায় শান্ত হয় ও বসিয়া যায়; ঐ বসিয়া যাওয়া নিম্নস্থান উপরিস্থ শোষিত বাষ্পে বহুদূর পর্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন উহা কালো দেখায়।

সেক্কির পরবর্তী মত

(ঙ) লকইয়ার তাঁহার 'সবিতার দ্রব্যগুণ নির্ণায়ক' গ্রন্থে একটি পুরাতন মতকে নূতন করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ঐ পুরাতন মত প্রথমে সার জন হার্শেল অনুমোদন করেন ও অধ্যাপক পার্সি ঐ মত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মত এই যে, সৌরকলঙ্ক সূর্যের অন্তর্নিহিত কোন ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় না, উপর হইতে নিম্নে পতিত শীতল পদার্থনিচয়ের দ্বারা উহারা গঠিত হয়। ঐ সকল পদার্থ উল্কাজাতীয়। কিন্তু উল্কাগুলি কেন সূর্যের নিরক্ষ প্রদেশেই পতিত হয় তাহার সমাধান করা বড়ই কঠিন। লিক মানমন্দিরের মিঃ শিবার্লি কতকটা এই পদ্ধতিতে উহার একটা মীমাংসা করেন। তাঁহার মতে উপর হইতে যে সকল পদার্থ সূর্যের আলোক-মণ্ডলে পতিত হয়, তাহারা সবিতার দূরে পরিচালন শক্তিবলে লক্ষ লক্ষ মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। উর্ধ্বগামী বেগ কমিয়া গেলে আকর্ষণ শক্তিবলে পুনঃ সূর্যের পৃষ্ঠে পতিত হয়।

লকইয়ার ও শিবার্লির সিদ্ধান্ত

(চ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনার অধ্যাপক ই, অপল্জার একটি নূতন মত প্রচার করেন। এই মতটিও বিবেচনার যোগ্য; যেহেতু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উর্ধ্বগামী স্রোতের তাপের প্রভাব সম্বন্ধে অধুনা যে সকল গবেষণা আমাদের বায়ুবিজ্ঞানবিদ্গণ করিয়া থাকেন তাহারই উপরে এই মত বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠিত। মনে করা হয় যে, এবম্বিধ স্রোত সবিতার মেরুপ্রদেশ হইতে সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে নিরক্ষ প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া থাকে; পরে তাহারা কলঙ্কের সীমার মধ্যে উপনীত হইয়া আলোক-মণ্ডলে পতিত হয়। পতিত হইবার পূর্বেই তাহারা উত্তপ্ত ও শুষ্ক হইয়া থাকে। এইরূপে তাহারা আলোক-মণ্ডলে পতিত হইয়া গর্ত উৎপন্ন করে। ঐ সকল গর্ত ধাতব বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া কলঙ্ক রচনা করে। এই মতে কলঙ্কের তাপ

অপল্জারের সিদ্ধান্ত

তাহার পার্শ্ববর্তী আলোক-মণ্ডল হইতে বেশী। সৌরকলঙ্কের কিরণ লেখার অদ্ভুত আচরণের, স্পোরেরের সৌরকলঙ্কের অক্ষাংশ বিধানের, ল্যাঙলি ও ক্রষ্টের হেঁয়ালিময় বিবরণের সমাধানকল্পে এই মত নানাপ্রকারে অপর সকল মত অপেক্ষা উত্তম। মোটের উপর বলা অসম্ভব যে, সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধীয় মীমাংসা আজিও সন্তোষজনকরূপে সমাধা হইয়াছে। তবে সৌরকলঙ্ক যে সূর্যের গর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত বিস্ফোরণের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সবিতার মণ্ডলের বাহিরের কোন ক্রিয়া হইতে উহারা উৎপন্ন হয় কি না, তাহা আজিও অনিশ্চিত রহিয়াছে।

সূর্যের পৃষ্ঠদেশের তাপ ১০৫০০°; সৌরকলঙ্কের তাপমাত্রা ঐ তাপ হইতে ২০০০° কম। তুলনামূলক দুইটি জ্যোতিষ্কের তাপমাত্রা বা দীপ্তি অন্য হইতে একের কম হইলে কম জ্যোতির জ্যোতিষ্কটি কালো দেখায়। দানবচক্ষু (Algol) নামক যুগল বহুরূপ তারাটির সহচর এই জন্য কালো বলিয়া প্রসিদ্ধ; যেহেতু সহচরটির জ্যোতি প্রধান তারাটি হইতে অনেক কম। এইরূপ নীহারিকার মধ্যেও কালো নীহারিকা আছে। সৌরকলঙ্কগুলির তাপ সবিতার সাধারণ পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা হইতে অনেক কম বলিয়া তাহারা কালো দেখায়। সৌরকলঙ্কের কেন্দ্র (Umbra) ও উপকেন্দ্র (Penumbra) উভয়ের কম তাপের তারতম্য বশতঃ তাহারা গাঢ় কালো ও কম কালো বা কটা দেখায়। সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি সম্বন্ধে নক্ষত্রবিদ্‌গণ সকলে একমত নহেন। যে সকল মূলপদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে সূর্য বিরচিত, সৌরকলঙ্কের রাসায়নিক সংমিশ্রণেও সেই সকল মূলপদার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই মিশ্রণ বিভিন্ন নিম্ন চাপে ঘটিয়া থাকে। পদার্থের অণুসকল, বিশেষতঃ টিটেনিয়াম অক্সাইড এবং

সৌরকলঙ্ক কেন কালো দেখায়

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের হাইড্রাইড্‌স্ সূর্যের অক্ষুব্ধ পৃষ্ঠদেশের অত্যুষ্ণ তাপের জন্য উপরিভাগে দানা বাঁধিতে পারে না, তাহারা সৌরকলঙ্কে বিদ্যমান থাকে। সূর্যের রাসায়নিক মূলপদার্থের শতকরা পরিমাণ ডাঃ হারলো শ্যাপ্‌লির মতে—

হাইড্রোজেন—৮১.৭৬০
হিলিয়াম—১৮.১৭০
কার্বন—০.০০৩
অন্যান্য—০.০৬৭

মোট পরিমাণ ১০০.০০০

সৌরকলঙ্কগুলিকে যাঁহারা প্রচণ্ড ঘূর্ণী-ঝড়ের ন্যায় ভীষণ বাত্যাবর্ত মনে করেন তাঁহাদের অভিমত স্বীকার করিলে সৌরকলঙ্কের কম তাপের একটা সুমীমাংসা হয়। দেখা যায় যে, ধরণীপৃষ্ঠে কোন স্থানের বায়ু কোন কারণ বশতঃ ভীষণ উত্তপ্ত হইলে ঐ উত্তপ্ত বায়ুরাশি ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়; সেই শূন্য স্থান পূরণের জন্য চতুর্দিক হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুপ্রবাহ চক্রাকারে ধাবিত হয় বলিয়া ঘূর্ণী-ঝড় উৎপন্ন হয়। সবিতার পৃষ্ঠদেশের কোন স্থানের বাষ্পরাশি কোন কারণে স্বাভাবিক তাপ হইতে অত্যধিক উত্তপ্ত হইলে ঐ উত্তপ্ত বাষ্পরাশি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। তখন ঐ শূন্য স্থান পূরণের জন্য অপেক্ষাকৃত কম তাপের বাষ্পরাশি চতুর্দিক হইতে চক্রাকারে ধাবিত হইয়া ঘূর্ণী-ঝড় উৎপন্ন করে। ফলে ঐ কেন্দ্রস্থলে সূর্যের পৃষ্ঠদেশের বাষ্পরাশি পাক খাইয়া মোচার আকারে গর্তে পরিণত হয়। এই কারণে সৌরকলঙ্কের মধ্যস্থলের তাপ কম, পার্শ্ববর্তী কটা অংশে তাপ অপেক্ষাকৃত বেশী, তৎপার্শ্ববর্তী অংশের তাপ অত্যধিক। তাপের এবম্প্রকার তারতম্য বশতঃ সৌরকলঙ্কের মধ্যস্থল গাঢ় কালো ও তাহার পার্শ্বদেশ কটা দেখা যায়।

সৌরকলঙ্কের কম তাপের কারণ

বধিরতা অপনোদনের অভিনব উপায়

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখের পরেই কানের স্থান। অন্ধের সমপর্যায়ে না হইলেও বধির লোককেও জীবনে বড় কম দুর্ভোগ ভুগিতে হয় না। আংশিকভাবে দৃষ্টিহানি ঘটিলে চশমা দ্বারা সংশোধনের উপায় আছে। চক্ষু চিকিৎসাও নানা দিক দিয়া খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। ছানি, গ্লুকোমা প্রভৃতি চক্ষুরোগে এখন আর অন্ধ হইবার কাহারও ভয় নাই। এসব ব্যাপারে শৈল্য চিকিৎসা খুব সুলভ ও সরল হইয়াছে। কর্ণিয়া বা চক্ষুর উপরের আবরণ অস্বচ্ছ হওয়ার ফলে অনেক লোক দৃষ্টিহীন হয়। এরূপ অবস্থায় এতকাল কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু বর্তমানে অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা নষ্ট কর্ণিয়া অপসারণ করিয়া সেই স্থানে অন্য কর্ণিয়া জুড়িয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইতেছে। সদ্যমৃত লোকের চক্ষু হইতে এই কর্ণিয়া তুলিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সম্প্রতি এই কর্ণিয়াকে বহুদিন সংরক্ষিত করিয়া রাখার ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ নানা দিক দিয়া দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধারে দিন দিন চক্ষু-চিকিৎসা খুবই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সেই তুলনায় কর্ণ-চিকিৎসাকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বলা চলে। শ্রবণযন্ত্র বিকল হইয়া শ্রবণশক্তির হানি ঘটিলে শ্রবণযন্ত্রের কোনরূপ সংস্কার দ্বারা শ্রবণশক্তির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

শ্রবণযন্ত্রের বিকলতা ব্যতীতও শ্রবণশক্তির হ্রাস পাইতে পারে। কানে ফোড়া বা খোল হইয়া, ময়লা অথবা পুঁজ জমিয়া সাময়িকভাবে শ্রবণশক্তির হ্রাস ঘটিতে পারে। আবার শারীরিক অন্য কোন দুরূহ ব্যাধি বা কোন মানসিক বিপর্যয়ও শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রবণশক্তি উদ্ধারের জন্য নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শ্রবণযন্ত্র কোনরূপ বিকল হইলে তাহার সংশোধন খুবই কঠিন। উহার আভ্যন্তরীণ সুকোমল অংশগুলির কোন ত্রুটি সংস্কারের অথবা উহাদের স্থলে নূতন সংযোজনার দ্বারা কোনরূপ পরিবর্তন সাধনের উপায় এখনও সম্ভব হয় নাই। এইরূপ যান্ত্রিক সংস্কার সম্ভব হয় না বলিয়াই বধিরতা প্রাপ্ত হইলে শ্রবণশক্তির উন্নতি সাধনে অন্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বধির লোকের কর্ণের মধ্যে শক্তিশালী শব্দতরঙ্গের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা দ্বারা শ্রবণশক্তির উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়া থাকে। ইহা দ্বিবিধ উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ণে প্রবেশের পূর্বে যন্ত্র সাহায্যে শব্দকে শক্তিশালী করিয়া গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হয়। অথবা কর্ণনালীতে প্রবেশ করিবার পরেও শব্দকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। শেষোক্ত উপায়ে কর্ণের ভিতরে শব্দকে শক্তিশালী করিতে কৃত্রিম পর্দা ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয় অথবা শ্রবণযন্ত্রের অভ্যন্তরে ছিদ্র করিয়া ভিতরে শব্দ প্রবেশের পথ করিয়া দেওয়া হয়। শ্রবণ যন্ত্রের অভ্যন্তরে এই গবাক্ষ উন্মোচনের ব্যবস্থা ফেনেষ্ট্রেসন্ অপারেশন নামে পরিচিত।

কানের পর্দা নষ্ট হইলে কৃত্রিম পর্দার সাহায্যে শ্রবণশক্তির উন্নতি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু বধিরদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই কানের পর্দা নষ্ট হইয়া শ্রবণ শক্তি লোপ পায়। ফেনেষ্ট্রেসন্ অপারেশন কৃতকার্যতার সহিত সম্পাদিত হইলে

অন্য যে কোন প্রচলিত ব্যবস্থা হইতেই ভাল ফল পওয়া যায়। কিন্তু এইভাবে খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই শ্রবণের উন্নতি হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই অপারেশনে যে শ্রবণশক্তির উন্নতি হয় তাহাও সাময়িক; তাহার ফল অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

কর্ণ নালীতে প্রবেশের পূর্বে শব্দকে শক্তিশালী করিবার জন্য নানারূপ যন্ত্র প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদের শ্রবণশক্তির হানি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৫০ জন এই যন্ত্র ব্যবহারের কোন সার্থকতা অনুভব করে না। কারণ তাহাদের শ্রবণশক্তির হানি ঘটিলেও বিনাযন্ত্রে তাহারা যতটুকু শুনিতে পায় যন্ত্র ব্যবহারে তদপেক্ষা বিশেষ কিছু উন্নতি হয় না। আবার যাহাদের শ্রবণশক্তির গুরুতর হানি ঘটিয়াছে এই সব যন্ত্র ব্যবহারে তাহাদের কোন উপকারই হয় না। অনেকে অবশ্য এইরূপ যন্ত্র ব্যবহারে যথেষ্ট উপকৃত হয়; তবে এই ভাবে অপেক্ষাকৃত ভাল শুনিতে পাইলেও তাহাদের শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক স্তরের অনেক পশ্চাতেই থাকে।

বর্তমানে আমেরিকায় বধিরের শ্রবণশক্তির উন্নতি বিধানের আর একটি উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ যন্ত্রপাতী, ব্যয়সাধ্য ঔষধ পত্র অথবা দুরূহ অপারেশনের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। ইহা একটি নূতন ভাবে শুনিবার প্রণালী; বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অথবা অধ্যাপকের সহায়তায় এই নূতন ভাবে শোনার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হয়। প্রত্যক্ষভাবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত আপন চেষ্টায়ও এই শ্রবণ প্রণালী আয়ত্ত হইতে পারে। নিউইয়র্ক পলিটেক্‌নিক স্কুলের ড': ব্রাউভ এই প্রণালীর উদ্ভাবক। তাঁহার এই প্রণালীটি শ্রবণের পুনঃ শিক্ষা নামে পরিচিত হইয়াছে। আমেরিকায় এই প্রণালীটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রচার লাভ করিয়া বহুলোকের শ্রবণশক্তির পুনরুদ্ধারে কৃতকার্য হইয়াছে। আমেরিকার বহু কর্ণ বিশেষজ্ঞের মতে শ্রবণশক্তির উন্নতি সাধনে অপরাপর ব্যবস্থা হইতে ইহা অনেক বেশী কার্যকরী।

এই অভিনব পন্থায় কানের কোনরূপ যান্ত্রিক বিকলতার উন্নাত বিধানের চেষ্টা করা হয় না। শ্রবণ ব্যবস্থার অপর বিভাগ মস্তিষ্কের সঙ্গেই ইহার একমাত্র প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। এতদিন বধিরতা দূর করিতে শ্রবণ যন্ত্রের উপরই সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং মস্তিষ্কের বিভাগ উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এই উপেক্ষিত বিভাগকেই নূতন ভাবে কাজে লাগান হইয়াছে।

আমরা কানের সাহায্যে শুনিতে পাই বটে, কিন্তু শ্রবণ কার্যটি শুধু কানের মধ্যেই সংঘটিত হয় না। শ্রবণ কার্যের প্রধানতম অংশটি সম্পাদিত হয় আমাদের মস্তিষ্কে। কানের ভিতর দিয়া শব্দতরঙ্গ মস্তিষ্কে পৌছিলে উহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। বধির লোকের মস্তিষ্কে শব্দের প্রতিচ্ছবি গ্রহণ ব্যাপারে কোনরূপ অবনতি ঘটে না এবং শ্রবণ ব্যবস্থার এই অংশে সাধারণ লোকের সঙ্গে তার কোন পার্থক্যও থাকে না।

শ্রবণযন্ত্র বিকল হইলে কতকগুলি সরল শব্দ-তরঙ্গ প্রবেশ পথে বাধা পাইয়া মস্তিষ্কে পৌছিতে পারে না। ক্যামেরা লেন্সের সম্মুখে শোষক (filter) ব্যবহার করিলে যেরূপ কতকগুলি আলোক-তরঙ্গ প্রবেশ পথে বাঁধা পায়, কিন্তু অপর তরঙ্গগুলি নির্বিঘ্নে ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করে, শ্রবণযন্ত্রের বিকলতার ফলেও এইরূপ ৩০০০০০ সরল শব্দতরঙ্গের মধ্যে কতকগুলি কাটা পড়িয়া অপরগুলি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। ইহার ফলে মস্তিষ্কে অন্যরূপ প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়।

এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীর সরল শব্দ-তরঙ্গ হইতেই যে কিছু কিছু কাটা পড়ে এরূপ নয়। কোন কোন শ্রেণীর শব্দতরঙ্গ অবিকৃত অবস্থায়ই মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে, আবার কোন কোন শ্রেণী একেবারেই পারে না। এইরূপ চালুনী

সৃষ্টি হওয়ার ফলে মস্তিষ্কে কোন শব্দের প্রতিচ্ছবি বেশ স্পষ্ট হয়। কতকগুলি শব্দতরঙ্গ মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে না পারায় সেখানে শব্দের কোনরূপ সাড়াই জাগে না। আবার কতকগুলি শব্দের কোন কোন অংশের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হইলেও অপর অংশগুলি শূন্য থাকিয়া যায়।

মস্তিষ্কে শব্দের এইরূপ অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হওয়ার ফলে বধির ব্যক্তি অনেক সাধারণ শব্দকেও বিকৃতভাবে শুনিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি কথোপকথনের শব্দ, নাম, পদধ্বনি, চীৎকার, গাড়ীর শব্দ, বাঁশী ইত্যাদি নানারকম শব্দ বধির হওয়ার পূর্বে যেরূপ শুনিয়া থাকে, বধির হওয়ার পরে ইহারা তাহার শ্রুতিতে অন্যরূপ ধারণ করে।

কতকগুলি শব্দের উচ্চারণের বিভিন্নতা বধির ব্যক্তির কাছে ধরা পড়ে না; সে একইরূপ শুনিয়া থাকে। আবার কতকগুলি শব্দ তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বোধ হইতে পারে। অর্থাৎ তাহার পূর্ব পরিচিত কোন শব্দের সঙ্গেই তার মিল খুঁজিয়া পায় না।

এই সব কারণে বধির ব্যক্তি কতকগুলি শব্দ শুনিতে পাইলেও সেই শব্দগুলিকে চিনিতে পারাই তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। কতকগুলি সম্পূর্ণ অপরিচিত শব্দ মনে হয়, আর কতকগুলি অন্য শব্দ বলিয়া ভুল হয়। এইরূপ কিছুকাল চলিলে ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্ক প্রতিচ্ছবি গ্রহণে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতে থাকে। অর্থাৎ কান শব্দ প্রেরণ করিতে থাকিলেও মস্তিষ্কে সর্বসময় তাহার কোন সাড়া জাগে না।

তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি বলিতে সাধারণতঃ মৃদু শব্দ এবং দূরবর্তী শব্দ শোনার ক্ষমতাকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি বলিতে শব্দকে স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে চিনিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ অন্য শব্দ হইতে শব্দটির যে সূক্ষ্ম প্রভেদ তাহা যথাযথ নির্ণয় করার ক্ষমতাকেই বুঝাইবে। একজন মোটর ড্রাইভার দূরবর্তী কোন মোটর চলার শব্দ অতি সহজে শুনিতে পারে। এমন কি, শব্দ হইতে কি জাতীয় মোটর তাহাও বলিতে পারিবে। কিন্তু একজন ডাক্তারের হয়ত সেই শব্দ কানেই যাইবে না। আবার ডাক্তার হৃদস্পন্দনের যে মৃদু শব্দ হইতে রোগীর অবস্থা যথাযথ উপলব্ধি করিবে, মোটর চালকের কাছে সেই শব্দ ধরাই পড়িবে না। এক্ষেত্রে ডাক্তার ও মোটর চালক বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের শ্রবণের তীক্ষ্ণতা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু সর্ববিষয়ে তাহাদের শ্রবণের তীক্ষ্ণতা সমভাবে নাই বলা চলে।

বধির লোককে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের বসিবার চেয়ারটি অপর লোকের নিকট সরাইয়া লয় এবং বক্তার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। একটি কান বক্তার মুখের কাছে আগাইয়া ধরিয়া কানের পিছন দিকে বাটীর মত আকারে একটি হাত স্থাপন করে। কিন্তু এইরূপ করার ফলে দুইটি কান একযোগে ব্যবহৃত হইলে সে যতখানি শব্দ শুনিতে পাইত তদপেক্ষা অনেক কমই শুনিতে পায়।

প্রকৃতপক্ষে বধির লোকের বক্তার স্বর শুনিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কথাগুলি খুব পরিষ্কার ভাবে কানে ধরা দেয় না। শব্দগুলি অনেক মৃদু ও অনেক দূর হইতে আসিতেছে মনে হয়। এরূপ অবস্থায় বধির লোকের পক্ষে দুইটি মাত্র উপায়ের কথাই মনে হয়—একটি স্বরের উচ্চতা ও অপরটি নিকটত্ব। কিন্তু একমাত্র স্বরের উচ্চতা বা নিকটত্বের উপরেই শব্দ-বোধ নির্ভর করে না। এই জন্যই সাধারণ শোনার পক্ষে খুব অনুকূল অবস্থায়ও বধির ব্যক্তি সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না।

শ্রবণের পুনঃ শিক্ষাব্যবস্থায় বধির ব্যক্তি তার যে নিজস্ব শ্রবণশক্তিকে নিষ্প্রয়োজনীয়বোধে অব্যবহার্য রাখে তাহাকেই কার্যকরী করিয়া তোলা হয়। ব্যবস্থাও খুব সরল। বধির ব্যক্তির নিকটে নানারূপ শব্দে কথা বলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কি শব্দ

বলা হইতেছে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সে কোন শব্দ কিরূপ শুনিতেছে তাহা বুঝিবার জন্য তাহাকে সময় দেওয়া হয়। এইভাবে তাহার মস্তিষ্কে শব্দের যথাযথ প্রতিচ্ছবি সৃষ্ট না হইলেও তাহার নিজস্ব শ্রবণভঙ্গী হইতেই প্রত্যেক কথার সঙ্গে তার নূতন পরিচয় ঘটিবে। এইরূপ নূতন ভাবে শ্রবণ করার অভ্যাস হেতু একবার যদি কতগুলি শব্দের সঙ্গে পরিচয় হইয়া যায়, তবে তাহার শ্রবণ করার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং শীঘ্রই নূতনভাবে আরও শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটিবে।

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একমাত্র শব্দই ব্যবহৃত হয় এবং সেই শব্দ শুধু কানেই শোনা হয়। ঠোঁট নাড়িয়া বা আকার ইঙ্গিতে অনেক সময় বধির লোকের সঙ্গে কথা বলা হয়, কিন্তু এই প্রণালীতে ঐ সব সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কথাবার্তা হয় সেইরকম শব্দই তাহাকে শোনানো হয়। রেকর্ড ইত্যাদি কোন কৃত্রিম শব্দ ব্যবহার করা হয় না। শুধু কথাবার্তার শব্দগুলির সঙ্গেই যে তাহাকে নূতনভাবে পরিচিত করানো হয় তা নয়, অনান্য নানারূপ শব্দের সঙ্গেও তাহাকে সমভাবেই পরিচিত করান হয়। অর্থাৎ তার এই নূতন শোনার পদ্ধতিতে সে যেন বিভিন্ন শব্দের মধ্যে প্রভেদগুলি যথাযথ অনুসরণ করিয়া তার স্মৃতিপটে মুদ্রিত রাখিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

এই শিক্ষালাভ খুব কষ্টসাধ্য বা সময়সাপেক্ষ নয়। সপ্তাহে পাঁচদিন এবং দিনে মাত্র ১০ মিনিট কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ নিয়মিত অভ্যাস ব্যতীত শ্রবণের পুনঃ শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে কতকগুলি নির্দেশও অনুসরণ করিতে হয়। এই নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে নানারূপ শ্রবণের ভুল নিজেরই সংশোধন করিয়া লইবার ক্ষমতা জন্মে।

উদাহরণস্বরূপ শ্রবণের পুনঃশিক্ষা বিষয়ক উপদেশাবলীর কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

কাহারও সঙ্গে কথা বলার সময় তাহার নিকট হইতে সাধারণ দূরত্ব রক্ষা করিয়া বসিবে। মুখামুখি হইয়া চেয়ারে বেশ আরাম করিয়া পিঠ ঠেস দিয়া বসিবে। আলাপ আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবে। প্রতিপদে নিজের শ্রবণশক্তি যাচাই করিয়া লইতে বক্তার বক্তব্য বিষয়ের উপর নিজের মতামত ব্যক্ত কবিবে।

যখনই যেখানে থাক, প্রয়োজন না থাকিলেও লোকের সঙ্গে আলাপ করিবে—লোক তোমার মুখামুখি, পিছনে, পার্শ্বে, অনেকটা দূরে বা অন্য ঘরে যেখানেই থাকুক না কেন।

সর্বদা শব্দের জন্য কান পাতিয়া থাকিবে। নিজে শব্দ উৎপাদন করিবে এবং শব্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে। অপরের কণ্ঠস্বর ও কথোপকথন কান পাতিয়া শুনিবে। নিজে নানারূপ শব্দ উৎপাদন করিয়া ঐসব শব্দের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। থালা, গ্লাস, বাটি ঠুকিয়া, দিয়াশলাই জ্বালাইয়া, জলের কল ছাড়িয়া, পত্রিকা উল্টাইয়া—নানারূপ শব্দ সৃষ্টি করিবে এবং ঐ শব্দ মনোযোগ দিয়া শুনিবে।

বাড়ীতে যখন একা থাকিবে তখনই পড়াশুনা করিতে পার, কিন্তু কোন সঙ্গী জুটিলে পড়াশুনা ছাড়িয়া আলাপ করিবে। বাহিরে গেলে কোন বই পুঁথি সঙ্গে লইবে না। বাহিরে গেলে বক্তৃতা, কথোপকথন ও বাহিরের নানারূপ শব্দ মন দিয়া শুনিবে।

শব্দের দূরত্ববোধ বা মৃদুতা, কানের ভিতরে গোলমালের শব্দ অথবা কান বন্ধ হইয়া আছে এইরূপ অনুভূতি উপেক্ষা করিবে। এইসব প্রতিবন্ধক তোমার শ্রবণ শক্তির মান নিয়ন্ত্রণ করে, ইহা স্বীকার করিবে না এবং ভাল না শুনিবার ওজররূপে কখনও ইহাদের উল্লেখ করিবে না।

এই শিক্ষাগ্রহণ করিয়া যেসব লোক তাহাদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ তাহাদের কয়েকজনের ইতিহাস এখানে বর্ণিত

হইল। এই শিক্ষার কার্যকারিতা উহা হইতে যথাযথ উপলব্ধি হইবে।

একটি বালিকার তিন বৎসর বয়সের সময় তাহার কথার ত্রুটি ধরা পড়ে, কিন্তু সে যে বধির তাহা তখনও বুঝা যায় নাই। ছয় বৎসর বয়সের সময় তাহার বধিরতা ধরা পড়িলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাহার অভিভাবককে তাহার জন্য একটি শ্রবণযন্ত্রের ব্যবস্থা করিতে এবং বাক্য সংশোধনের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাকে কিছুতেই শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করান গেল না। পরে অবশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা ব্যবহার করিলেও তাহার কোন সুবিধাই হইত না। তাহার নয় বৎসর বয়সের সময় অপর একজন ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করেন। তিনি শ্রবণের এই নূতন শিক্ষার কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি বালিকাকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। কয়েক বৎসর এই শিক্ষা গ্রহণ করার পরে বালিকার বধিরত্বের আর কোন চিহ্নই বর্তমান নাই এবং তাহার বাক্যের ত্রুটিও আশ্চর্যরূপে সংশোধিত হইয়াছে।

এক ভদ্রলোককে কোন জনবহুল স্থানে গেলেও চুপচাপ এককোণে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। তাঁহাকে কখনও কখনও বিরক্তির সহিত বলিতে শুনা যাইত যে, লোকেরা কেবল অর্থহীনভাবে অকারণ চীৎকার করে। তাহার যে শ্রবণশক্তির হানি ঘটিয়াছে ইহা তিনি বা তাঁহার বন্ধুরা কেহই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। ঘটনাক্রমে তিনি কানে একটা ঝম্‌ঝম্ শব্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করেন এবং ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হন। তখন প্রকাশ পায়—প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খুব শব্দবহুল স্থানে থাকার ফলে 'বয়লার মেকারস্ ডেফনেস্' নামে তাহার একরূপ বধিরতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জাতীয় বধিরতায় শব্দতরঙ্গ-সমূহের তিন চতুর্থাংশ বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ কাটা পড়ে; ফলে এরূপ ক্ষেত্রে শ্রবণযন্ত্র ব্যবহারে কোন সুবিধাই হয় না। তখনই তিনি নূতনভাবে শ্রবণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বধিরতা ও কানের ঝম্‌ঝম্ শব্দানুভূতি দূর হয় এবং জনসমাজের উপর তাহার পূর্বের বিরক্তিভাবও তিরোহিত হয়।

একটি যুবতী মহিলা তার বধিরতা দূর করিতে ডাক্তারি ও সার্জারি চিকিৎসায় বিফল হইয়া শ্রবণযন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রবণযন্ত্রের সাহায্যে তিনি মোটামুটি ভালই শুনিতে লাগিলেন এবং ব্যবসায় জগতে একটি ভাল চাকরীও যোগাড় করিলেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে শ্রবণযন্ত্র কার্যকরী হইত না। সেই সবক্ষেত্রে তিনি তাঁহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও শ্রবণের চেষ্টায় অতিরিক্ত মনঃসংযোগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এইরূপ ক্রমাগত শ্রবণের চেষ্টায় অতিরিক্ত মনঃসংযোগের ফলে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং ক্রমে শ্রবণযন্ত্র ব্যবহার করিয়াও তিনি শুনিতে পাইতেন না। প্রথমে তিনি শ্রবণযন্ত্রের কোনরূপ ত্রুটির জন্য এইরূপ হইয়াছে মনে করেন। কিন্তু পরে যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, বিকৃতরূপে শব্দ শোনার ফলে শব্দের ভুল অর্থবোধের জন্যই তাঁহার শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটিতেছে এবং যন্ত্রের দ্বারা উহা সংশোধনের উপায় নাই। তখন তিনি শ্রবণের এই নূতন শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করেন। তাঁহার এই শ্রবণ শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরে তাঁহাকে আর কখনও শ্রবণের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই এবং শ্রবণেন্দ্রিয়েও কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই। তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা এই শ্রবণের পুনঃশিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে অবগত ছিলেন না। তাহার শ্রবণের এই অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া আমেরিকার বহু লোক এইভাবে তাহাদের হারান শ্রবণশক্তির

পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইতেছে। তাহাদের দুর্বহ জীবন সুবহ হইয়া উঠিতেছে; সমাজে সকলের সঙ্গে সমানভাবে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিয়া নিজেদের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষাপদ্ধতির কার্যকারিতা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। বধিরের জীবন সর্বদেশেই সমানভাবে দুর্বহ। আমাদের দেশেও বধিরের সংখ্যা কম নাই। এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশে প্রবর্তিত হইলে বহু লোকের আশীর্বাদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

হারানো মৌলের সন্ধান

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বজগতে মৌলিক পদার্থ আছে মোট বিরানব্বইটি। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয় বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ এই মৌলগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ ছকে সাজিয়েছিলেন। বিজ্ঞান-জগতে এই ছক পিরিয়ডিক টেবল নামে পরিচিত। হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর এক ধরে ক্রমবর্ধমান ভর অনুসারে মৌলগুলিকে এই ছকে প্রথমে সাজানো হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ভর অনুপাতে মৌলগুলিকে সাজালে ছকে কিছু অসংগতি থেকে যায়। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন-রহস্য যখন উদ্‌ঘাটিত হলো, এই অসংগতি তখন আর রইলো না।

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে আমরা জানি, পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে ধনাত্মক প্রোটন এবং কেন্দ্রের বাইরে ঘুরে বেড়ায় ঋণাত্মক ইলেকট্রন। পরস্পর বিপরীতধর্মী হলেও এদের বিদ্যুৎ-আধান কিন্তু সমান। স্বাভাবিক পরমাণুর কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন থাকে, কেন্দ্রের বাইরে ইলেকট্রনও থাকে ঠিক ততগুলি। এই কারণে বাইরের দিক থেকে স্বাভাবিক পরমাণুতে বিদ্যুতের কোন আভাস পাওয়া যায় না। পরমাণুর কেন্দ্রের বাইরে যত ইলেকট্রন থাকে তার মোট সংখ্যাকে বলা হয় অ্যাটমিক নাম্বার বা পারমাণবিক সংখ্যা। হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এক; কারণ হাইড্রোজেন পরমাণু একটি মাত্র প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত। হিলিয়াম পরমাণুতে আছে দুটি প্রোটন ও দুটি ইলেকট্রন, হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা তাই দুই। অনুরূপভাবে ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ৯২। বর্তমানে পিরিয়ডিক টেবলে মৌলগুলিকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ীই সাজানো হয়ে থাকে। এর ফলে, ক্রম-বর্ধমান ভর অনুযায়ী মৌলগুলিকে সাজিয়ে ছকে যে অসংগতি দেখা গিয়াছিল তা এখন দুর হয়ে গেছে।

মেণ্ডেলিফ যখন মৌলগুলিকে ছকে সাজিয়েছিলেন, তখন ৯২টি মৌলের সব কটি কিন্তু আবিষ্কৃত হয় নি। এজন্যে ছকে কয়েকটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। মেণ্ডেলিফ বলেছিলেন, এই ফাঁকগুলিতে কয়েকটি অনাবিষ্কৃত মৌল আছে। যে কটি মৌল তখন আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মৌলের গুণাগুণ তুলনা করে মেণ্ডেলিফ সেই মৌলগুলির সম্ভাব্য গুণাবলী সম্বন্ধে আভাসও দিয়ে গিয়েছিলেন। পরে এই মৌলগুলি যখন আবিষ্কৃত হলো তখন দেখা গেল, তাদের গুণাগুণ মেণ্ডেলিফ কথিত গুণাবলীর সঙ্গে প্রায় অনেকখানি মিলে যায়। মেণ্ডেলিফের সময়ে যে কয়টি মৌল অনাবিষ্কৃত ছিল, তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনটি মৌল

আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭৯ সালে নীলসন আবিষ্কার করেন স্ক্যাণ্ডিয়াম, ১৮৭৫ সালে বয়েস্‌বড্রন আবিষ্কার করেন গ্যালিয়াম এবং ১৮৮৬ সালে উইঙ্কলার আবিষ্কার করেন জারমেনিয়াম। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ সাল পর্যন্ত ৪৩; ৬১, ৮৫ ও ৮৭ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট চারটি মৌল অনাবিষ্কৃত ছিল।

১৯৩০ সালের পূর্বে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই চারটি মৌল আবিষ্কার করেছেন বলে তাঁদের দাবী পেশ করেছিলেন এবং তাঁদের আবিষ্কৃত নতুন মৌলগুলির নামও প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ দাবী বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হয় নি, কারণ তাঁদের দাবীর সমর্থনে তাঁরা পর্যাপ্ত প্রমাণ দেখাতে সক্ষম হন নি। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে এই চারটি মৌল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিতে এই মৌলগুলির অস্তিত্ব আছে কিনা, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সংশয় আজও মীমাংসিত হয় নি।

কৃত্রিম উপায়ে মৌল উৎপাদনের প্রণালী হলো, কোন স্থায়ী মৌলকে প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন কণিকার দ্বারা আঘাত করা। বুলেট বা আঘাতকারী হিসাবে ব্যবহার করা হয়—আল্‌ফা কণা, প্রোটন, হাইড্রোজেন কেন্দ্রক ডয়টেরন, দ্রুত ও মন্থরগতির নিউট্রন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই চারটি মৌলের প্রত্যেকটি তেজস্ক্রিয়। কাজেই এগুলিকে স্থায়ী মৌলরূপে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কোন কোন মৌলের তেজস্ক্রিয়াজনিত ভাঙনের গতি এত মৃদু যে, কার্যতঃ সেগুলিকে স্থায়ী মৌলরূপে ধরে নেওয়া চলে।

৪৩ সংখ্যক মৌল—টেক্‌নিসিয়াম

১৯২৫ সালে নোডাক, ট্যাকে ও বার্গ নামক তিনজন বিজ্ঞানী ৪৩ পারমাণবিক সংখ্যক মৌল আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন এবং ম্যাসুরিয়ার (প্রাচীন প্রুশিয়া) নামানুসারে তাঁদের আবিষ্কৃত মৌলটির নাম দেন ম্যাসুরিয়াম। কিন্তু তাঁদের এই দাবী বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হয় নি; কারণ ম্যাসুরিয়ামকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে তার অস্তিত্ব তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে ৪৩ সংখ্যক মৌল আবিষ্কৃত হয় ১৯৩৭ সালে এবং এর আবিষ্কর্তা হচ্ছেন পেরিয়র ও সেগ্‌রে।

মলিবডেনাম মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৪২। সুতরাং মলিবডেনাম পরমাণু থেকে যদি একটি বিটা কণা বেরিয়ে আসে তাহলে ৪৩ সংখ্যক মৌল উৎপন্ন হবে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মলিবডেনাম আইসোটোপ থেকেই পেরিয়র ও সেগ্‌রে ৪৩ সংখ্যক মৌল প্রস্তুত করেছিলেন।

মলিবডেনামের আইসোটোপ প্রস্তুত করা যায় নানা উপায়ে। সাইক্লোট্রন যন্ত্রে মলিবডেনাম পরমাণুকে প্রোটন, আলফা কণা কিংবা ডয়টেরন দিয়ে আঘাত করলে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মলিবডেনাম আইসোটোপ উৎপন্ন হয়। অ্যাটমিক পাইল বা পারমাণবিক চুল্লীতে ইউরেনিয়ামের বিভাজন-ক্রিয়ার ফলেও মলিবডেনাম আইসোটোপ উৎপন্ন হয় এবং তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামে অতি সামান্য পরিমাণ নিষ্ক্রিয় মলিবডেনাম লবণ মিশিয়ে মলিবডেনাম আইসোটোপ পৃথক করা যায়।

মলিবডেনামের কয়েকটি আইসোটোপ বিটাকণা বহিষ্কারী। বিটাকণা বেরিয়ে আসবার ফলে তা থেকে ৪৩ সংখ্যক মৌলের আইসোটোপ উৎপন্ন হয়। সর্বপ্রথম যে আইসোটোপটি পেরিয়র ও সেগ্‌রে পৃথক করেন তার অর্ধেক জীবনকাল ৫·৯ ঘণ্টা। ৬·৭ ঘণ্টা অর্ধজীবন বিশিষ্ট মলিবডেনাম থেকে এই আইসোটোপটি তাঁরা প্রস্তুত করেন এবং এর রাসায়নিক গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন। রুহেনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ এই দুটি মৌলের সঙ্গে ৪৩ সংখ্যক মৌলের অনেকখানি সাদৃশ্য দেখা যায়; তবে শেষোক্ত মৌল অপেক্ষা প্রথমোক্ত মৌলের সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশী। পেরিয়র ও সেগ্‌রে তাঁদের আবিষ্কৃত এই নতুন মৌলটির নামকরণ

করেন টেক্‌নিসিয়াম; গ্রীক ভাষার 'টেকনিটস্' শব্দটি থেকে এই নামকরণ করা হয়। টেক্‌নিটস্ শব্দের অর্থ কৃত্রিম। প্রকৃতিতে অবর্তমান মৌলগুলির মধ্যে টেক্‌নিসিয়ামই হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সর্বপ্রথম মৌল, এই কারণেই তার এই নামকরণ।

১৯৩৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীবোর্গ ও সেগ্‌রে টেক্‌নিসিয়ামের আইসোটোপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। মলিবডেনাম পরমাণুকে মন্থরগতি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে ৯৯ ভর-বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় মলিবডেনাম আইসোটোপ তাঁরা উৎপাদন করেন। ৬৭ ঘণ্টা অর্ধজীবন-বিশিষ্ট এই আইসোটোপটি একটি বিটা কণা বহিষ্কার করে ৯৯ ভরের টেক্‌নিসিয়াম উৎপাদন করে। শেষোক্ত মৌলটিও তেজস্ক্রিয় এবং এর অর্ধজীবন-কাল ৫.৯ ঘণ্টা। এই মৌলটি ভেঙে গিয়ে একটি আইসোটোপ সৃষ্টি করে, যার অর্ধজীবন কাল হলো ৪ লক্ষ বছরেরও বেশী। মলিবডেনামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে অতি সামান্য পরিমাণ টেক্‌নিসিয়াম প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে পারমাণবিক চুল্লীতে ইউরেনিয়ামের বিভাজন-জনিত মিশ্রণ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ টেক্‌নিসিয়াম পাওয়া যায়।

পেরিয়র ও সেগ্‌রে তেজস্ক্রিয়া সংক্রান্ত প্রণালী অনুসরণ করে ৪৩ সংখ্যক মৌল সনাক্ত করেছিলেন। আশা করা যায়, কালক্রমে এই মৌলটি কমপক্ষে এক গ্রাম পরিমাণ উৎপাদন করা যাবে, তখন টেক্‌নিসিয়ামের গুণাবলী সবিস্তারে পর্যালোচনার সুবিধা হবে।

৬১ সংখ্যক মৌল—প্রমিথিয়াম

এই মৌলটি আবিষ্কারের চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা বহু দিন যাবৎ ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯২৬ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হপ্‌কিনস্, ইন্তেমা ও হ্যারিস এক্স্-রে বর্ণালী পর্যবেক্ষণ কালে যে তথ্য সংগ্রহ করেন তা থেকে তাঁদের ধারণা হয়, ৬১ সংখ্যক মৌল তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। ইলিনোজ প্রদেশের নামানুকরণে তাঁরা এই মৌলটির নাম দেন ইলিনিয়াম। এর কিছুকাল পরে রোলা ও ফারন্যাণ্ডিস এই মৌলটি আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন। তাঁরা এর নামকরণ করেন ফ্লোরেন-সিয়াম। বহু গবেষণা সত্ত্বেও প্রকৃতিতে এই মৌলটির অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে নির্ধারিত হয় নি। বর্তমানে এই মৌলের তেজস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, প্রকৃতিতে এই মৌলটি না থাকারই সম্ভাবনা বেশী।

১৯৩৮-৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুল, কারবটিভ, কুইল এবং তাঁদের সহকর্মীরা নিওডিনিয়াম ও প্র্যাসিওডিনিয়াম নামক দুটি মৌলের উপর নিউট্রন, প্রোটন, ডয়টেরন ও আলফা কণিকার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার সময় একাধিক তেজস্ক্রিয়ার সন্ধান পান। এর মধ্যে কয়েকটি তেজস্ক্রিয়া ৬১ সংখ্যক মৌল থেকে উৎপন্ন বলে তাঁরা অনুমান করেন। ৬১ সংখ্যক মৌলের আইসোটোপ যে উৎপন্ন হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু রাসায়নিক প্রণালীতে আইসোটোপগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পৃথক না করে তাদের তেজস্ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছিল। এই কারণে তাঁরা যে সকল অনুমান করেছিলেন তার সবগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হয় নি।

৬১ সংখ্যক মৌলটিকে সন্দেহাতীতরূপে পৃথক ও সনাক্ত করেন ম্যারিন্স্কী ও গ্লেনডেনিন। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় আয়ন-বিনিময় কৌশল অনুসরণ করে ইউরেনিয়ামের বিভাজন-উপজাত পদার্থ-সমূহের মধ্য থেকে তাঁরা এই মৌলটি পৃথক করেন। ৬১ সংখ্যক মৌলের তেজস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা নির্ধারণ করেন, এর অর্ধজীবন-কাল ৩.৭ বৎসর এবং এটি হচ্ছে বিটাকণা-বহিষ্কারী।

নিওডিনিয়াম মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা

৬০ এবং তার কয়েকটি আইসোটোপ আছে। ১৪৭ ভরবিশিষ্ট একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে, যার অর্ধজীবন-কাল হচ্ছে ১১ দিন। এই আইসোটোপটি একটি বিটাকণা বের করে ১৪৭ ভর-বিশিষ্ট ৬১ সংখ্যক মৌলে পরিণত হয়। এই ভর যে সঠিক তা ভরলিপি যন্ত্রে সরাসরি মেপে প্রমাণিত হয়েছে। ৬১ সংখ্যক মৌলের আইসোটোপগুলির মধ্যে উপরোক্ত ৩·৭ বৎসর অর্ধজীবন-বিশিষ্ট আইসোটোপটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখন পর্যন্ত যতগুলি আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এটিই হলো সব চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

পিরিয়ডিক টেবলে নিওডিনিয়াম ও সমরিয়াম নামক বিরলমৃত্তিক মৌল দুটির মধ্যে এতদিন যে ফাঁক ছিল, ৬১ সংখ্যক মৌল আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই ফাঁকটি পূর্ণ হয়েছে। ৬১ সংখ্যক মৌলটি বিরলমৃত্তিক শ্রেণীভুক্ত হবে বলে পূর্বাহ্নে অনুমান করা হয়েছিল এবং কার্যতঃ দেখা গেছে, এটি হচ্ছে তা-ই।

৬১ সংখ্যক মৌলের কয়েকটি আইসোটোপ সন্দেহাতীতরূপে সনাক্ত করা গেছে, অপর কয়েকটি সম্বন্ধে এখনও সন্দেহের অবকাশ আছে। ইউরেনিয়ামের বিভাজন-উপজাত পদার্থসমূহের মধ্যে ৪৭ ঘণ্টা অর্ধ-জীবনবিশিষ্ট ১৪৯ ভরের একটি আইসোটোপ পাওয়া গেছে। এটি খুব সম্ভব ১·৭ ঘণ্টা অর্ধ-জীবনবিশিষ্ট ১৪৯ ভরের নিওডিনিয়াম থেকে বিটাকণা নির্গমনের ফলে উৎপন্ন হয়। ১৪৮ ভরের নিওডিনিয়ামকে মন্থরগতি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে ১৪৯ ভরের নিওডিনিয়াম আইসোটোপ উৎপন্ন হয় এবং সেটি আবার ভেঙ্গে গিয়ে ৪৭ ঘণ্টা অর্ধ-জীবনবিশিষ্ট ৬১ সংখ্যক মৌলের একটি আইসোটোপ উৎপাদন করে। ১৪৮ ভরের নিওডিনিয়াম থেকে ৫·৩ দিন অর্ধ-জীবনবিশিষ্ট ১৪৮ ভরের ৬১ সংখ্যক মৌলের একটি আইসোটোপ পাওয়া গেছে। বিভাজন-উপজাত পদার্থসমূহের মধ্যে এটি কিন্তু পাওয়া যায় না।

৬১ সংখ্যক মৌলের ১৪১ ভরবিশিষ্ট আইসোটোপটি একটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আইসোটোপটি প্রকৃতিতে পাওয়া যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। নিওডিনিয়ামকে প্রোটন, ডয়টেরন ও আলফা কণিকা দিয়ে আঘাত করে ২৭ ঘণ্টা অর্ধ-জীবন ও ১৪৫ ভরবিশিষ্ট ৬১ সংখ্যক মৌলের একটি আইসোটোপ পেয়েছেন বলে কেউ কেউ দাবী করেন, কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে এই দাবী স্বীকৃত হয় নি। তবে এই আইসোটোপটির অর্ধজীবন-কাল কয়েক ঘণ্টার বেশী হবে বলে সকলেই অনুমান করেন।

৬১ সংখ্যক মৌলের নামকরণ নিয়ে অনেক দিন ধরে বাদানুবাদ চলছিল। সাইক্লোট্রন যন্ত্রে নিওডিনিয়াম পরমাণুকে প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন কণিকা দিয়ে আঘাত করলে ৬১ সংখ্যক মৌল পাওয়া যায়। এই হেতু পুল ও কুইল এর নাম প্রস্তাব করেন সাইক্লোনিয়াম। ম্যারিনস্কী ও গ্লেনডিনিন সর্বপ্রথম ইউরেনিয়ামের বিভাজন উপজাত পদার্থসমূহের মধ্য থেকে ৬১ সংখ্যক মৌল বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করেন। তাঁরা এই মৌলের নাম প্রস্তাব করেন 'প্রমিথিয়াম'। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে—প্রমিথিউস মানুষের ব্যবহারের জন্যে আগুন বস্তুটি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এনেছিলেন। অনুরূপভাবে বিভাজন ক্রিয়া পরমাণুর কেন্দ্রনিহিত শক্তি সদ্ব্যবহারের সুযোগ মানুষকে এনে দিয়েছে। এই ঘটনার সূত্র ধরে প্রমিথিয়াম নামটি প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক রাসায়নিক সঙ্ঘের সভায় ম্যারিনস্কী ও গ্লেনডিনিন-এর দাবী স্বীকার করে ৬১ সংখ্যক মৌলের প্রমিথিয়াম নামটিই গৃহীত হয়।

৮৫ সংখ্যক মৌল—অ্যাস্টাটাইন

১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করসন্ ম্যাকেঞ্জী ও সেগ্‌রে সর্বপ্রথম এই মৌলটির সন্ধান পান। তাঁরা লক্ষ্য করেন, বিসমাথ পরমাণুকে সাইক্লোট্রন যন্ত্রে প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন আলফা কণা দিয়ে আঘাত

করলে ৭'৫ ঘণ্টা অর্ধ-জীবনবিশিষ্ট একটি তেজস্ক্রিয় মৌল উৎপন্ন হয় এবং সংমিশ্রিত মৌলগুলি থেকে এটিকে পৃথক করা যায়।

বিসমাথের পারমাণবিক সংখ্যা ৮৩। সুতরাং বিসমাথকে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করলে যে মৌল উৎপন্ন হবে তার পারমাণবিক সংখ্যা হবে ৮৫। পরীক্ষা করে তা-ই দেখা গেছে। ৮৫ সংখ্যক মৌলের আবিষ্কারকগণ এর নাম দেন অ্যাস্টাটাইন। গ্রীক ভাষায় অ্যাস্টাটস্ কথাটির অর্থ—অস্থায়ী। অ্যাস্টাটাইন মৌলের কোন স্থায়ী আইসোটোপ না থাকায় তার এইরকম নামকরণ হয়েছে।

ট্রেসার প্রণালীতে অ্যাস্টাটাইনের রাসায়নিক গুণাবলী বিচার করে দেখা গেছে, এই মৌলটি হ্যালোজেন সম্প্রদায়ভুক্ত; অর্থাৎ ফ্লুরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিনের সমগোত্রীয়। তবে হ্যালোজেন থেকে এর কিছু পার্থক্যও আছে। হ্যালোজেন সম্প্রদায়ভুক্ত মৌলগুলি প্রধানতঃ ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী এবং এই ঋণাত্মক বিদ্যুতের মাত্রা ফ্লুরিন থেকে আয়োডিনে ক্রমশ কমে আসে। ঋণাত্মক বিদ্যুতের মাত্রা যেমন কমতে থাকে সেই অনুপাতে ধনাত্মক বিদ্যুতের মাত্রা বেড়ে চলে। আয়োডিনে তাই ধনাত্মক বিদ্যুতের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যাস্টাটাইনে ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্ম বেশ ভালভাবেই প্রকাশিত। আয়োডিনের সঙ্গে অ্যাস্টাটাইনের আরও সাদৃশ্য আছে। আয়োডিনের মত অ্যাস্টাটাইনও গলগ্রন্থিতে সঞ্চিত হয়।

২১৮ ভরের পলোনিয়াম মৌলটি তেজস্ক্রিয়। তেজস্ক্রিয়াজনিত ভাঙনের ফলে বিটা কণা বেরিয়ে আসে এবং ২১৮, ২১৬ ও ২১৫ ভরের অ্যাস্টাটাইন আইসোটোপ উৎপন্ন হয় বলে অনুমান। ১৯৪৩ সালে কার্বলিক ও বারনেট এই আইসোটোপগুলিকে সনাক্ত করেন। তাঁরা বলেন, এই আইসোটোপগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং এদের প্রত্যেকটি একটি আলফা কণিকা বহিষ্কার করে ভেঙে যায়। ২১৭ ভরের একটি আইসোটোপ আছে, সেটি নেপচুনিয়াম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

৮৭ সংখ্যক মৌল—ফ্রান্সিয়াম

১৯৩৯ সালে ফ্রান্সে পারসী ২২৭ ভরের অ্যাক্টিনিয়াম থেকে এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। অ্যাক্টিনিয়ামের ভাঙন দেখা যায় দুই ভাবে—শতকরা ৯৯ ভাগ বিটা কণা বহিষ্কার করে রেডিও-অ্যাক্টিনিয়ামে এবং শতকরা ১ ভাগ মাত্র আলফা কণা বহিষ্কার করে ৮৭ সংখ্যক মৌলে রূপান্তরিত হয়। পারসী স্বীয় জন্মভূমি ফ্রান্সের নামানুসরণে তাঁর আবিষ্কৃত মৌলটির নাম দেন ফ্রান্সিয়াম।

২২৭ ভর ও ৮৯ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট অ্যাক্টিনিয়াম থেকে একটি আলফা কণা নির্গমনের ফলে নবজাত মৌলের ভর ৪ ধাপ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ২ ধাপ কমে যায় এবং তার ফলে ২২৩ ভরের ৮৭ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট ফ্রান্সিয়াম উৎপন্ন হয়। ফ্রান্সিয়াম মৌল তেজস্ক্রিয় এবং এর অর্ধ-জীবন-কাল ২১ মিনিট। ফ্রান্সিয়াম একটি বিটা কণা বহিষ্কার করে অ্যাক্টিনিয়াম-X-এ পরিণত হয়।

২২৩ ভরের ফ্রান্সিয়াম ছাড়া কমপক্ষে ইহার আরও চারটি আইসোটোপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা গেছে। এদের মধ্যে ২২১ ভরের আইসোটোপটি নেপচুনিয়াম সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এর অর্ধজীবন-কাল ৫ মিনিট কাল মাত্র। এটি আলফা কণা বহিষ্কার করে ২১৭ ভরের অ্যাস্টাটাইন মৌলে পরিণত হয়। ২১৮, ২১৯ ও ২২০ ভরের অপর তিনটি আইসোটোপ অপরাপর তেজস্ক্রিয় মৌলের ভাঙনপর্যায়ে উদ্ভূত। এখন পর্যন্ত যতদূর গবেষণা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, ফ্রান্সিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম ক্ষারজাতীয় ধাতুসমূহের অনুরূপ।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪০তম অধিবেশনের সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

গত ২রা হইতে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত কলিকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর সভাপতিত্বে লক্ষ্মৌয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চত্বারিংশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ষোলশত প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে লক্ষ্মৌয়ে এইবার লইয়া তিনবার অধিবেশন হইল। বিগত ১৯১৬ ও ১৯২৩ সালে এইখানেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল।

এখানে মূল সভাপতি এবং বিভিন্ন শাখার সভাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

মূল সভাপতিঃ ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে এক বৎসর গবেষণা করেন। ১৯০৭ সালে তিনি ক্যাম্ব্রিজে যান এবং ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরীতে জে. জে. টমসনের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯১২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানে ঘোষ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তিনি জার্মাণীতে যান এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভের পর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর তিনি সার সি. ভি. রামনের পরে পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং এখনও তিনি এই পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু ১৯২৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। এই বৎসরেই তিনি ইতালীতে ভল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থ বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করেন।

ডাঃ বসু পারমাণবিক কেন্দ্রিনের সংঘর্ষজনিত বিবিধ গবেষণা μ মেসনের ভর নির্ণয়, প্যারাম্যাগ্নেটিক এবং বিরলমৃত্তিক আয়নসমন্বিত বিভিন্ন মিশ্রণের ধর্ম নির্ণয় প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে গবেষণা করিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদানের পর বিভিন্ন দিক হইতে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত গবেষণা প্রসারিত করিবার উদ্দেশে তিনি বিবিধ গবেষণা পরিচালনা করিতেছেন।

গণিত শাখার সভাপতিঃ অধ্যাপক ভি. ভি. নারলিকার

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক বিষ্ণু বসুদেব নারলিকার ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯২৮ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং ক্যাম্ব্রিজে ভর্তি হন। ১৯৩০ সালে তিনি ক্যাম্ব্রিজের বি. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বি. ষ্টার
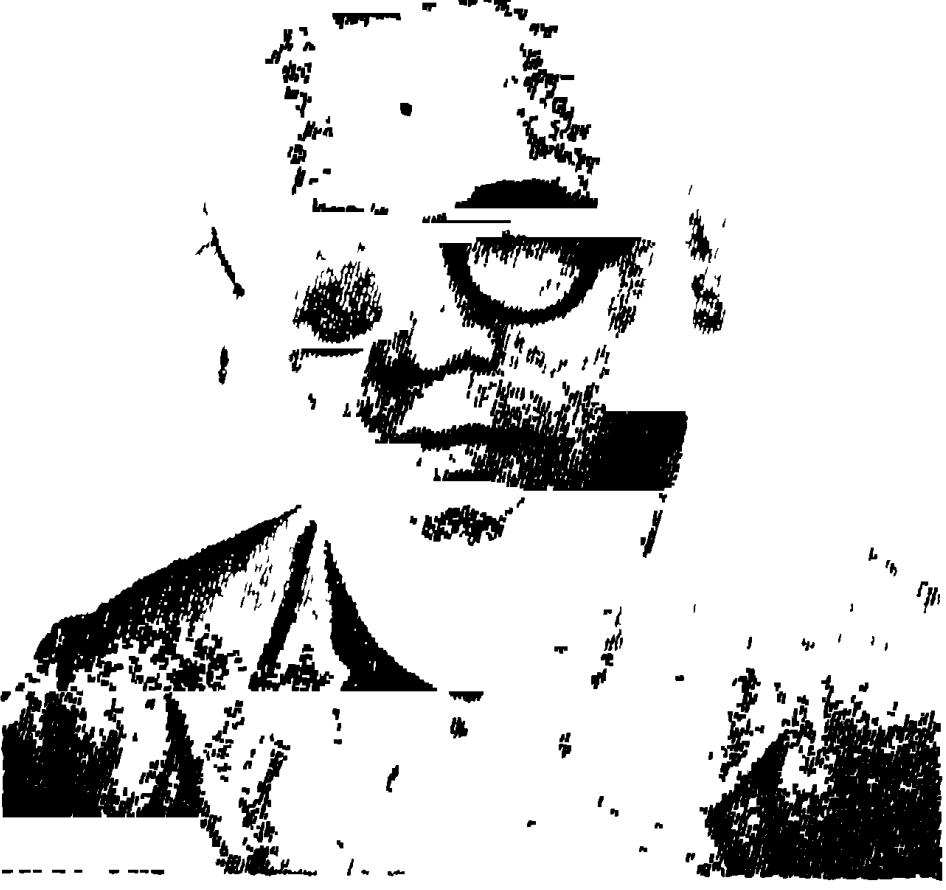
ভি. ভি. নারলিকার

ব্র্যাঙ্গলার হন। ১৯৩০-৩২ সালে তিনি আইজাক নিউটন বৃত্তি লাভ করিয়া ক্যাম্ব্রিজে অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণা করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রীনউইচ মানমন্দিরে যোগদান করেন এবং সার আর্থার এডিংটন, সার জোসেফ লারমার প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯৩২ সালে তাঁহাকে র্যালে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বৎসরেই তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আপেক্ষিকতাবাদ, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ ও তরঙ্গ-গতি সম্পর্কে মূল্যবান বক্তৃতা দিয়াছেন। এ সকল বিষয়ে তাঁহার উল্লেখযোগ্য গবেষণার ফলাফল বহু দেশী ও বিদেশী বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। শ্রী নারলিকারের বয়স ৪৪ বৎসর।

পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি: ডাঃ এইচ. সিংহ

ডাঃ হরিশচন্দ্র সিংহ ১৮৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ
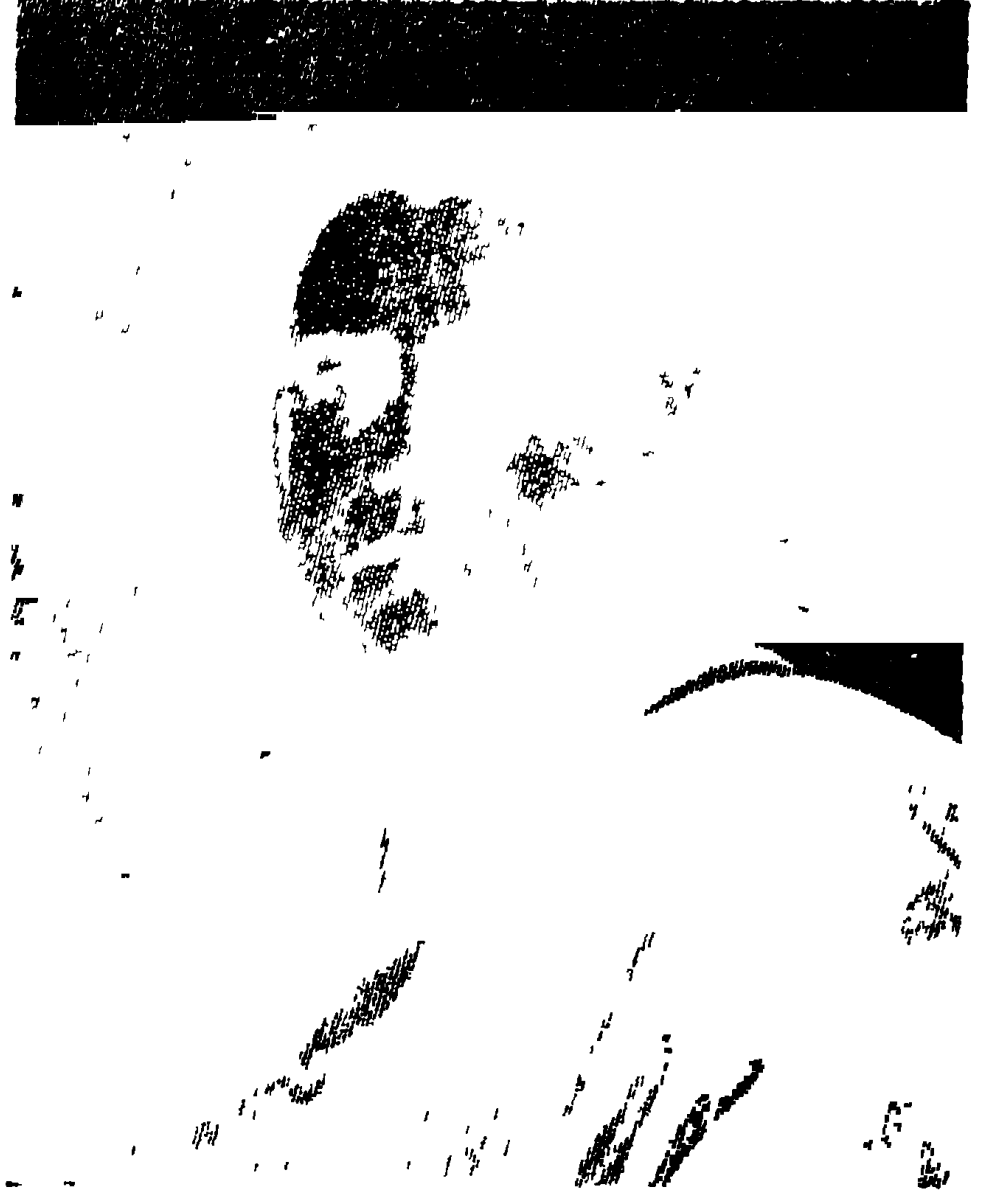
ডাঃ এইচ. সিংহ

বি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ভারত আইন অমান্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরে তিনি ফলিত গণিতশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি টাটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কে যোগদান করেন এবং ১৯১৯-২২ সাল পর্যন্ত সেখানে নিযুক্ত থাকেন। যদিও অঙ্কশাস্ত্রেই তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু এ সময় তিনি ব্যাঙ্কিং ও অর্থনীতি সম্পর্কে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে পি এইচ. ডি ডিগ্রী দ্বারা ভূষিত করে। ১৯২৪সাল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্স ও কমার্সের লেকচারাররূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং আর্থিক ও অর্থনীতিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা করেন। 'ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলো' হিসাবে তিনি ১৯৩৩ ৩৪

সালে ক্যাম্ব্রিজের মার্শাল সোসাইটি, লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও রয়েল স্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন।

ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলন, পরিসংখ্যান সম্মেলন ও অন্য কয়েকটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি: ডাঃ ভাওদে

নানাসাহেব রামদি তাওদে ১৮৯৮ সালে রত্নগিরি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি ডিগ্রীও লাভ করেন। চাকুরী জীবনে প্রথম তিনি ডিমনষ্ট্রেটররূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু ক্রমশ তিনি বোম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এ পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে তিনি বোম্বাইয়ে একটি গবেষণা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান করেন। সৌর বর্ণলিপি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি বিপুল খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ডাঃ এন. আর. তাওদে

ডাঃ তাওদে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদেরও একজন সদস্য।

রাসায়ন শাখার সভাপতি: ডাঃ ইউ. পি. বসু

ডাঃ ইউ. পি. বসু ১৯০৩ সালে বরিশাল জেলার লক্ষ্মণকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস সি ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি গবেষণায় রত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তিনি 'ডক্টরেট' ডিগ্রী ও প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারাররূপেও চার বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া তিনি প্রধান রাসায়নিক ও গবেষণাগারের অফিসার-ইন-চার্জরূপে বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ এ যোগদান করেন। বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানী গবেষণা মন্দির গঠন করিলে তিনি উহার ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

ডাঃ ইউ. পি. বসু

ভারতীয় শিল্প-বিজ্ঞান পরিষদ ও বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে এই গবেষণাগারে ডাঃ বসুর নেতৃত্বে বহু মূল্যবান গবেষণা চলিতেছে। ভেষজ শিল্প ও ভেষজ বিজ্ঞান শিল্প-রসায়নের ক্ষেত্রে ডাঃ বসুর বিপুল অবদান রহিয়াছে। ভারতের ও বিদেশের

উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ঃ ডাঃ আর. শকসেনা

ডাঃ রামকুমার শকসেনা ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদ ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৯২২ সালে তিনি এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন।

১৯৩২ সালে তিনি প্যারিসে গিয়া ছত্রাক সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' ডিগ্রী দেওয়া হয়।

ডাঃ আর. শকসেনা

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে তিনি ছত্রাক সম্পর্কেই গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

প্রাণী-বিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি ঃ ডাঃ এন. পাণিকর

ডাঃ এন. কে. পাণিকর ১৯১৩ সালে ত্রিবাঙ্কুরের কোয়াট্টমে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে মাদ্রাজ

বিজ্ঞান সংক্রান্ত সাময়িক পত্রসমূহে ডাঃ বসুর আড়াই শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি ঃ অধ্যাপক এন. এল. শর্মা

অধ্যাপক নিরঞ্জনলাল শর্মা ১৯০১ সালে উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং সেখান হইতে

অধ্যাপক এন. এল. শর্মা

ভূতত্ত্বের এম. এস সি ডিগ্রী লাভ করেন। আড়াই বৎসর কাল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ১৯২৭ সালে ধানবাদে 'ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস-এ ভূতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি লিভারপুলে প্রফেসর এইচ. এইচ. রেডের অধীনে কোডারমার পাহাড় ও বিহারের অভ্রখনি সম্পর্কে গবেষণা চালান এবং ১৯৩৮ সালে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ঝরিয়া কয়লা খনিসমূহে তিনি এক নূতন ধরনের স্ফটিকপ্রস্তর আবিষ্কার করেন। 'ধানবাদ স্কুল অব মাইনস'-এর ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ এস. কে. রায়ের নামানুসারে উহার নাম রায়-প্রস্তর রাখা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ ডিগ্রী লাভ করিয়া নবগঠিত প্রাণীতত্ব গবেষণাগারে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯৩৮ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস-সি ডিগ্রী প্রদান করে।

ডাঃ এন. পাণিকর

১৯৩৮ সালে তিনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে এবং প্লিমাউথের সামুদ্রিক প্রাণী গবেষণাগারে প্রেরিত হন।

১৯৩৩ সালে তিনি ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী-বিজ্ঞান গবেষণাগারের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

১৯৪৬ সালে তিনি মৎস্য-চাষ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারত সরকারের স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সাল হইতে তিনি কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

নৃতত্ব ও প্রত্নবিদ্যা শাখার সভাপতি : পণ্ডিত এম. এস. ভাট্‌স

পণ্ডিত মাধোস্বরূপ ভাট্‌স ১৮৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লুধিয়ানা ও লাহোরে শিক্ষালাভের পর ১৯১৮ সালে তিনি এপিগ্রাফিষ্ট হিসাবে পাটনা যাদুঘরে যোগদান করেন।

১৯২০ সালে তিনি গবেষক ছাত্র হিসাবে ভারতীয় প্রত্নবিদ্যা-সমীক্ষা বিভাগে যোগদান করেন।

প্রত্নবিদ্যার সকল বিভাগে তাঁহার কর্মদক্ষতার বিপুল পরিচয় রহিয়াছে। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; তাহার ফলে ভারতের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। হরাপ্পা খননকার্য সম্পর্কে ১৯৪০ সালে দুই খণ্ডে তিনি পুস্তক প্রণয়ন করেন। গোল গম্বুজ, এলিফান্টা গুহা, তাজ, ফতেপুরসিক্রী, নির্বাণ ধামেক স্তূপের মেরামতী কার্যও তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়াছেন। জম্মু-কাশ্মীরের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য রক্ষার এক বৃহৎ পরিকল্পনারও তিনি রচয়িতা।

পণ্ডিত এম. এস. ভাট্‌স

১৯৫০ সাল হইতে তিনি ভারত সরকারের প্রত্ন-বিদ্যা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল-এর পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারই নেতৃত্বাধীনে কোণারকের সূর্যমন্দির রক্ষার পরিকল্পনাও প্রণীত হইয়াছে।

চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার সভাপতিঃ মেজর এস. দত্ত

মেজর এস. দত্ত ১৮৯৯ সালে শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজসাহী কলেজ হইতে ১৯২১ সালে বি. এস-সি পাশ করিয়া তিনি কলিকাতা সায়েন্স কলেজে ভর্তি হন।

মেজর এস. দত্ত

পরলোকগত সার পি. সি. রায়ের পরামর্শক্রমে তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি লইয়া লণ্ডনে পশু চিকিৎসা কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং ১৯২৫ সালে এম. আর. সি. ভি. এস. ডিগ্রী পান। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বঙ্গীয় পশু চিকিৎসা কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হন। সে সময় স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে তিনি পরলোকগত কর্ণেল অ্যাকটনের সহিত একযোগে কাজ করিবার সুযোগ পান।

১৯৩০ সালে তিনি ভারতীয় পশু চিকিৎসা গবেষণা পরিষদে যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি পুনরায় বৃটেনে যান এবং এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডি. এস-সি ও ডি. টি. ভি. এম. ডিগ্রী লাভ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় ভারতীয় পশু চিকিৎসা গবেষণা পরিষদে যোগদান করেন এবং উহার ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ভারতীয়গণের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিজ্ঞান শাখার সভাপতিঃ অধ্যক্ষ যমুনা প্রসাদ

অধ্যক্ষ যমুনা প্রসাদ ১৮৯৮ সালে গয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি বিহার সরকারের বৃত্তি লইয়া ক্যাম্বিজে অধ্যয়ন করিতে

অধ্যক্ষ যমুনা প্রসাদ

যান এবং ১৯২৫ সালে নীতি বিজ্ঞানে ট্রাইপস লইয়া উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েই পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন।

১৯২৬ সালে তিনি পাটনা কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এই সময় তিনি সেখানে একটি মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগারও স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি রাঁচী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গুজবের মনস্তত্ত্ব (১৯৩৪ সালের বিহারের ভূমিকম্প সম্পর্কে) মনের সজ্ঞান, অজ্ঞান ও অর্ধ-জ্ঞান অবস্থা, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণের সম্পর্ক, শ্রেণী বৈশিষ্ট্য জ্ঞান (হিন্দু-মুসলিম সমস্যা) প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গবেষণা মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করিয়াছে।

শারীরবৃত্ত শাখার সভাপতি ঃ ডাঃ এন. ডি. কেহার

অধ্যক্ষ ডাঃ নারায়ণদাস কেহার ১৯০২ সালে লক্ষ্ণৌয়ে জন্মগ্রহণ করেন। লাহোরের এফ. সি. কলেজ হইতে এম. এস-সি পাশ করিয়া শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সে সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য দেশের বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরীসমূহ পরিদর্শন করেন।

ডাঃ এন. ডি. কেহার

১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এস-সি ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি কসৌলীর ম্যালেরিয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জৈব রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডাঃ কেহার বর্তমানে ভারত সরকারের শারীর-পুষ্টি গবেষণাগারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফলে ঘৃত, উদ্ভিজ্জ তৈল ও বনস্পতির উপযোগিতা, মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ঘাস ও পাতার পুষ্টিক্ষমতা—প্রভৃতি বিষয়ে নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

কৃষি বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ঃ ডাঃ পার্থসারথি

ডাঃ পার্থসারথি ১৯০০ সালে মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন। কোয়েম্বাটুর কৃষি কলেজে শিক্ষা

ডাঃ পার্থসারথি

সমাপ্ত করিয়া ১৯২৩ সালে তিনি মাদ্রাজ সরকারের কৃষি বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৩৬-৩৮ সালে তিনি লণ্ডনের কিংস কলেজে চাউল উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণায় নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কোয়েম্বাটুরে ইক্ষু চাষ গবেষণা কেন্দ্রে যোগদান করেন।

১৯৪৭ সালে তিনি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি উক্ত পরিষদের উদ্ভিদ শাখা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তৈল বীজ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা তাঁহাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখার সভাপতি : ডাঃ এস. কে. সরকার

ডাঃ এস. কে. সরকার ১৯২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়া ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজীতে ভর্তি হন। উক্ত সালেই কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফুয়েল টেক্‌নোলজি সম্পর্কে বিদ্যা অর্জন করিতে থাকেন। কলেজের ডিপ্লোমা লাভ করিয়া তিনি প্রফেসর বোনের অধীনে অত্যধিক চাপে গ্যাসের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁহার এই গবেষণা বিজ্ঞানী সমাজের বিপুল প্রশংসা অর্জন করে। গ্যাসের প্রবাহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৯৩২ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ডাঃ এস. কে. সরকার

১৯৩৫ সালে তিনি কুসুণ্ডায় বাড়রী কোক কোং লিঃ-এ যোগদান করেন এবং বর্তমানে সেখানেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। কয়লা হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন।*

* প্রবন্ধের ব্লকগুলি Science & Culture'-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত। —স.

সঞ্চয়ন

খাদ্যশস্যের উৎকর্ষ সাধনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

আমাদের শরীর পোষণের জন্যে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, কিছু খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের প্রয়োজন। উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে আমরা শরীর পোষণোপযোগী পদার্থগুলি পেতে পারি। বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিভিন্ন উদ্ভিদে এগুলি কমবেশী উৎপাদিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনরকমে যদি উদ্ভিদদেহে আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি উৎপাদন করা যায় তবে বর্তমান যুগের গুরুতর খাদ্যসমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে প্রথমতঃ জানা দরকার—উদ্ভিদ কেমন করে, কোন্ কোন্ পদার্থের সহায়তায় আমাদের দেহের পক্ষে পুষ্টিকর পদার্থগুলি উৎপাদন করে থাকে। উদ্ভিদেরও জৈবপঙ্ক, অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম্ উৎপাদনের জন্যে প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন। কতকগুলি কাঁচা মাল থেকে তারা জিনিষগুলি তৈরি করে নেয়। এই কাঁচা মালগুলি হচ্ছে প্রধানতঃ—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম এবং কিছু ফস্ফরাস, গন্ধক ও লৌহ প্রভৃতি। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ এগুলি সংগ্রহ করে থাকে। বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস থেকে উদ্ভিদেরা পাতার সাহায্যে কার্বন সংগ্রহ করে এবং শিকড়ের সাহায্যে জল মিশ্রিত অন্যান্য পদার্থগুলি টেনে নেয়। তারা জল থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এবং মাটির মধ্যে জলমিশ্রিত নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন এবং সালফেট, ফসফেট প্রভৃতি জিনিষ থেকে অন্যান্য পদার্থ সংগ্রহ করে। এগুলিকে দেহসাৎ করবার প্রক্রিয়ায় তাপ, আলোক, শৈত্য, আর্দ্রতা প্রভৃতির প্রভাব অপরিসীম।

কোন বিশেষ উদ্ভিদে কোন বিশেষ পদার্থের উৎকর্ষ বা আধিক্যের কারণ নির্ণয় করতে হলে দেখা দরকার—এতগুলি পদার্থের মধ্যে কি কি পরিমাণে, কোন্ কোন্ পদার্থের সহায়তায় এবং কিরূপ পরিবেশের মধ্যে তারা ওরূপ করতে পেরেছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ টোমাটো বা সয়াবিনের কথা ধরা যাক। টোমাটোর মধ্যে ভিটামিন বা সয়াবিনের মধ্যে প্রোটিনের আধিক্যের কারণ নির্ণয় করতে হলে ওই জাতের গাছগুলিকে প্রথমতঃ মৃত্তিকাবর্জিত পরিশুদ্ধ বালির মধ্যে জন্মানো দরকার। তারপর উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থগুলির এক-একটিকে বিভিন্ন মাত্রায় সেই বালির মধ্যে দিয়ে গাছের বৃদ্ধি এবং পরিণতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এরূপে আলোক উত্তাপ ও আর্দ্রতার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে উদ্ভিদের উন্নতি সাধনের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যেতে পারে।

কিছুকাল পূর্বে নিউ ইয়র্কের পূর্বাঞ্চলে ইথাকার কৃষি গবেষণাগারে এ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভিদ ও শস্যাদির ভিটামিন এবং পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি বা উৎকর্ষ সাধনের জন্যে মাটি, আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তন করে তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—কোন মিডিয়ামের মধ্যে ভিটামিন B, অর্থাৎ থিয়ামিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তাতে ক্যাইকোমাইসেস জাতের এক রকমের ছত্রাক প্রচুর পরিমাণে

জন্মায়। এ থেকেই এই গবেষণাগারের কর্মীরা ইউনাইটেড ষ্টেট্সের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত গমের মধ্যে থিয়ামিনের পরিমাণ নির্ধারণে মনোনিবেশ করেন। তারপর চেষ্টা হয়েছে কেমন করে গমের মধ্যে এই থিয়ামিনের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে। কতকগুলি গাছকে বালির পরিবর্তে কাচের গুঁড়ার মধ্যে জন্মানো হয়েছিল। গাছের পক্ষে অপরিহার্য খনিজ পদার্থগুলিকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে আধ ঘণ্টা পর পর কাচের গুঁড়ার মধ্যে ঢেলে দিয়ে যে রাসায়নিক পদার্থটার বিষয় পরীক্ষা করা দরকার সেটাকে একভাগ থেকে কোটি ভাগের বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে। এই গবেষণাগারে বিশেষ বিশেষ খনিজ পদার্থ সামান্য মাত্রায় প্রয়োগ করে উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পাশাপাশি পরীক্ষা করবারও ব্যবস্থা হয়েছিল। দুটা খরগোসকে একই রকম খাদ্য দেওয়া হয়, কিন্তু একটার খাদ্যে একটু ম্যাঙ্গানিজ দেওয়া হতো; অপরটার খাদ্যে ম্যাঙ্গানিজ দেওয়া হতো না। ফলে দেখা গেল, এই সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজের অভাবে খরগোসটার সামনের পা দুটা বেঁকে গেছে, অপরটি কিন্তু বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ আরও অন্যান্য বহুবিধ পরীক্ষার ফলে এ বিষয়ে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে।

শবদাহ প্রথা

শ্রীবিক্রমকেশরী রায়বর্মণ

যতদূর জানা যায়, প্রস্তরযুগে মানুষের মৃতদেহ পোড়ানো হতো না। হয় কবর দেওয়া হতো, নয়তো কোন খালি জায়গায় বা গুহায় শুইয়ে দিয়ে মাথার কাছে খাবার, হাতিয়ার প্রভৃতি রেখে আত্মীয়স্বজনেরা চলে যেত। যে সব সমাজ এখনো অতি আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে, তাদের মধ্যে এই ধরনের প্রথা এখনো বর্তমান আছে, যেমন—সিংহলের ভেদ্দাজাতীয় আদিম অধিবাসীরা। এরা চাষ-আবাদ জানে না, পশুপালন করে না, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় খাদ্যের অন্বেষণে। ভেদ্দাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে গুহার মধ্যে শুইয়ে রেখে খাবারাদি দিয়ে গ্রামসুদ্ধ লোক স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

শবদাহের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রথমে ব্রোঞ্জ যুগে। পৃথিবীর নানা দেশে এই সময়ে তৈরি হাতিয়ার ও জিনিষপত্রের সঙ্গে পাওয়া যায় মাটির হাড়িতে সংরক্ষিত পোড়া হাড় ও ছাই। কিন্তু মৃতেরা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েও নিস্তার পায় নি। নৃ-তাত্ত্বিকেরা এদের নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছেন—কেন এদের পোড়ান হলো। আগে যারা মারা যেত তারা কেমন দিব্যি মাটির নীচে পচে গলে কঙ্কাল মাত্রে পর্যবসিত হতো। এজন্যে এদের মাথার খুলি আর করোটির বিভিন্ন অংশে যন্ত্র বসিয়ে মাপ-জোক নেওয়ার কত সুবিধা ছিল নৃ-তাত্ত্বিকের পক্ষে!

শবদাহ প্রথার কেন প্রচলন হয়, সে সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ বিভিন্নভাবে মত প্রকাশ করেছেন।

নিল্সন বলেছেন—আদিম মানুষ মৃত্যুর আসল কারণ জানত না—তাদের ধারণা ছিল, মৃত্যুটা ঘটে কোন অপদেবতার কারসাজির ফলে। এই অপদেবতারা মানুষকে মেরেই যে কেবল ক্ষান্ত হতো তা নয়, মরার পরেও অনিষ্ট করতে ছাড়তো না। যে মানুষটা মরে গেল, তার আত্মাকে এই অপদেবতারা নিজদের দলে ভিড়িয়ে নিত; ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মাও পরিণত হতো একটি হিংস্র অপদেবতায়।

জীবিত অবস্থায় যে মমতাময়ী মাতা সন্তানকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের প্রাণ দিতে পারত, মৃত্যুর পর সেই মাতাই হন্যে হয়ে বেড়াত সন্তানের সর্বনাশের চেষ্টায়। তাই মানুষ মরে গেলে আত্মীয়-স্বজনদের প্রথম চেষ্টাই থাকত মৃত আত্মার খপ্পর থেকে কি করে আত্মরক্ষা করা যায়। এই চেষ্টার ফলেই সৃষ্টি হলো শবদাহ প্রথা। নিল্‌সনের মতে মোটামুটি এরকমের বিশ্বাস থেকে তারা এভাবে দেহটাকে পুড়িয়ে ফেলত। দেহটাকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেললে অপদেবতাটি নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে, কাজেই জীবিত মানুষের অনিষ্ট করবার আর তার কোন ক্ষমতাই থাকবে না। তাছাড়া কোন কোন সমাজে আর একটি বিশ্বাসের সৃষ্টি হলো—দেহটাকে পোড়াবার সময় যে ধোঁয়া উপরের দিকে ওঠে যায় সেই সঙ্গে মৃতের আত্মাও উর্ধ্বলোকে গমন করে এবং মানুষের অনিষ্ট করবার জন্যে আর এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে না। এই বিশ্বাসের ফলে দ্বিতীয় একটি যুক্তিও মিলে গেল। কারণ এর ফলে কেবল যে মৃতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেল তা নয়, তার আত্মার সদ্গতিরও একটা ব্যবস্থা হলো।

নিল্‌সনের এই মতবাদ কিন্তু সকল নৃ-তত্ত্ববিদ স্বীকার করে নেন নি। কার্স্টেনের মতে—মৃতের দেহ ধ্বংস করে তার অনিষ্টকারী আত্মার হাত থেকে নিস্তার পাওয়াই যদি শবদাহ প্রথার গোড়ার কারণ হয়, তবে ভস্মীভূত হাড় ও ছাই সংরক্ষিত হতো কেন? গারোদের মধ্যে এখনো দেখা যায়—অর্ধপোড়া হাড় ও ছাই একটি ঝুড়িতে সংগ্রহ করে জঙ্গলে রেখে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—যাতে মৃতের আত্মা সেখানে ফিরে এসে আশ্রয় নিতে পারে। গারোরা যখন কোন অপরাধের বিচার করতে বসে তখন তারা বিশ্বাস করে যে, মৃত পূর্ব-পুরুষদের আত্মারা এসে তাদের বিচার পরিচালিত করছে। মৃতের আত্মার প্রতি অন্ধ ভয় তো তাদের নেই! কার্স্টেন বলছেন—মৃতের প্রতি ভয় নয়, মৃতের প্রতি মমতারই দরুণই শবদাহ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। আদিম মানুষ লক্ষ্য করেছিল, দেহটাকে কবর দিলেও অনেক সময় বন্য জীবজন্তু কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বের করে খেয়ে ফেলে। তা-ছাড়া দেখা যেত—দেহটি কবর দিতে দেরী হলে তা পচে নষ্ট হয়ে যায়। বস্তু জগতের নিয়মে যে দেহ এই ভাবে নষ্ট হয় তা তারা বুঝতে পারতো না, তারা ভাবতো—কোন অপদেবতা এসে দেহটাকে খেয়ে নষ্ট করে দিয়ে থাকে; অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দেহের এই অসম্মান এবং ক্ষতি তারা সহ্য করতে পারতো না। এ-থেকেই শবদাহ প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। কারণ দেহটাকে একবার আগুনে ভস্মীভূত করে নিলে তার আর কোন অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। অতি সহজে এই ছাই সংরক্ষণ করাও চলে এবং ছাই-এর মধ্যে মৃতের আত্মা আশ্রয় পেয়ে চিরদিনের জন্যে নিরাপদ থাকতে পারে। অগ্নিতে দেহ সমর্পণের মধ্যে যে একটি মমতার বন্ধন থাকতো তা আর্যদের শবদাহ মন্ত্র থেকে অনুমান করা যায়। তাঁরা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করতেন, হে অগ্নি, আমার প্রিয়জনকে আজ তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। তুমি সদয় হয়ে তাকে গ্রহণ কর এবং সকল প্রকার আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা কর।

কিন্তু শবদাহের এই সুন্দর মন্ত্র সত্ত্বেও মৃতের প্রতি কেবল মমতা ছাড়া আর কিছু আমাদের মধ্যে নেই, একথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বস্তু-জগতের নিয়ম ও কারণের উপর আধুনিক বিজ্ঞান যথেষ্ট আলোক সম্পাত করা সত্ত্বেও ভূতের ভয়ে আমরা এখনো আঁৎকে উঠি। আদিম সমাজে এই ভয় যে আরও অনেক বেশী ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই শবদাহ প্রথার মূলে ভয় এবং মমতা দুটিই ক্রিয়া করে থাকবে।

রেয়ন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র

তুলা, পশম এবং রেশম এই কয়েকটি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ আঁশ দ্বারা এতদিন প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। ক্রমে কয়েক প্রকার কৃত্রিম আঁশ প্রস্তুত হওয়ায় বস্ত্রশিল্পে বৈচিত্র্য এসেছে ও বস্ত্রের রকমারি ব্যবহার বেড়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় রেয়ন বা কৃত্রিম রেশম। পাট, তুলা, শণ ইত্যাদির মূল উপাদান সেলুলোজ। সেলুলোজ-বহুল জিনিষ হইতেই রেয়ন প্রস্তুত হয়। সেই জন্য রেয়নকে ঠিক কৃত্রিম তন্তু বলা চলে না; কারণ ইহার মূল উপাদান প্রাকৃতিক সেলুলোজ।

১৭৪৫-৪৬ সালে ফ্রান্সের রেমার নামে এক বিজ্ঞানী রেশম কীটের জীবনী পর্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, রেশম কীট কোন এক বিশেষ গাছের পাতা খাইয়া হজম করিয়া লালা বাহির করে এবং সেই লালা শুকাইয়া আপনা হইতেই তন্তুতে পরিণত হয়। এইরূপ দেখেই তিনি প্রচার করেন যে, কীটের উদরে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেইরূপ কোন বিশেষ গাছ বা উদ্ভিজ্জ বস্তু হইতে সার পদার্থ নিষ্কাশন করিয়া তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম আকারে পরিণত করিয়া শুকাইতে পারিলে মানুষ নিজেই রেশম তৈয়ারী করিতে পারিবে এবং তখন প্রকৃতির উপর আর নির্ভর করিতে হইবে না। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৮৯ সালে ফ্রান্সে আর একজন বিজ্ঞানী উদ্ভিজ্জসার হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করেন। তারপর হইতেই বিজ্ঞানী-দের ক্রমাগত চেষ্টায় প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রেয়ন প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তিন প্রকার পদ্ধতির দ্বারা সাধারণতঃ রেশম প্রস্তুত হয়—(১) ভিস্কোজ পদ্ধতি (২) সেলুলোজ অ্যাসিটেট পদ্ধতি (৩) কিউপ্রামোনিয়াম্ পদ্ধতি। সাধারণতঃ এক বিশেষ রকমের নরম কাঠ, ছেঁড়া কাপড় বা খারাপ তুলা ইত্যাদি রেয়ন প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত পদ্ধতিতেই প্রথমে বিশুদ্ধ সেলুলোজের প্রয়োজন। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির দ্বারা বেশীর ভাগ রেয়ন প্রস্তুত হয়। নিম্নে তিনটি পদ্ধতির মোটামুটি প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

(১) ভিস্কোজ পদ্ধাত—এই পদ্ধতিতে এক বিশেষ নরম কাঠ ব্যবহার করা হয়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং উত্তর আমেরিকাতে এই কাঠ বেশীর ভাগ পাওয়া যায়। এই কাঠের ছাল ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বিশুদ্ধ সেলুলোজ প্রস্তুত করা হয়। এর পর সেলুলোজকে শুক্লীকরণ বা ব্লিচিং পদ্ধতির দ্বারা পরিষ্কার করা হয় এবং তারপর এক বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহার জলীয় অংশ নিষ্কাশন করিয়া মোটা ব্লটিং কাগজের আকারে পরিণত করা হয়; অর্থাৎ সেলুলোজের চাদর প্রস্তুত করা হয়। এই সেলুলোজের চাদরকে পুনরায় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ১৮% কষ্টিক সোডা দ্রবণে ২০° সেন্টিগ্রেডে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখা হয়। তারপর কষ্টিক দ্রবণ হইতে নিংড়াইয়া ঐ পদার্থটিকে একটি ইস্পাতের পাত্রে নির্দিষ্ট তাপে ২।১ দিন ঢাকিয়া রাখা হয়। এর ফলে সেলুলোজের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'এজিং'। এইবার এই পদার্থটিকে একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামে রাখিয়া উহার সহিত কার্বন-ডাইসালফাইড নামে একটি রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নিয়ন্ত্রিত তাপে কিছুক্ষণ রাখা হয়। তখন ইহার রং হয় কমলালেবুর মত এবং ইহাকে বলা হয় সেলুলোজ

জ্যান্‌থেট। সেলুলোজ জ্যান্‌থেটকে পুনরায় কষ্টিক সোডা দ্রবণে মিশ্রিত করিয়া নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়। এই অবস্থায় এই পদার্থকে বলা হয় ভিস্কোজ। এই ভিস্কোজ দ্রবণকে খুব ভালভাবে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া বয়নোপযোগী করিবার জন্য বড় বড় পাত্রে ঢালিয়া নির্দিষ্ট সময় রাখা হয় বা পাকিতে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রাইপেনিং'। এরপর ভিস্কোজ দ্রবণকে খুব চাপে স্পিনারেট নামক যন্ত্রের মধ্য দিয়া নির্গত করা হয়। স্পিনারেটটি এমন ধাতু দিয়া তৈরি যাহাতে কোনরূপ অ্যাসিড বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ ইহাকে নষ্ট করিতে না পারে। পূর্বে বিশুদ্ধ প্ল্যাটিনাম ধাতু, প্ল্যাটিনাম-স্বর্ণ ধাতু কিংবা কাচ ব্যবহার করা হইত। বর্তমানে ট্যান্‌টেলাম ধাতু ব্যবহৃত হইতেছে। স্পিনারেটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। অবিচ্ছিন্ন তন্তুর জন্য স্পিনারেটে ১৮ হইতে ১২০টি পর্যন্ত এবং ষ্টেপ্‌ল্ তন্তুর জন্য প্রায় ৫০০ হইতে ২০০০ ছিদ্র থাকে। ছিদ্রগুলির ব্যাস প্রায় '০৮-১'০ মিলি-মিটার। সমস্ত ছিদ্রগুলির ব্যাস সমান হওয়া চাই; তাহা না হইলে সুতার সূক্ষ্মতা সমান হইবে না। স্পিনারেটে যতগুলি ছিদ্র থাকিবে ততগুলি ফিলামেণ্ট বয়ন করা যাইবে। স্পিনারেট যন্ত্র হইতে দ্রবণ বাহির হইবামাত্র সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ফেলা হয় এবং উহা তৎক্ষণাৎ জমিয়া খুব সূক্ষ্ম তন্তুব আকারে পরিণত হয়। অবিচ্ছিন্ন তন্তু প্রস্তুত করিবার জন্য একটি ঘূর্ণায়মান কাচের চাকার উপর দিয়া একটি বালতিতে সংগ্রহ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বালতিটিকেও খুব জোরে ঘোরান হয়। ফলে সুতায় পাক খায় এবং অবশেষে কেক-এর আকারে গুটানো হয়। তারপর কেকটিকে ধুইয়া, শুকাইয়া কাটিমে জড়ানো হয় এবং এইরূপে কলে বয়নোপযোগী করা হয়। অবিচ্ছিন্ন তন্তু প্রয়োজনমত হাজার হাজার গজ লম্বা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার সহিত অন্য তন্তু মিশ্রিত করা খুব অসুবিধাজনক। অন্য তন্তু ইহার সহিত মিশাইয়া কাজ করিবার জন্য ষ্টেপল তন্তুর প্রয়োজন। ষ্টেপল তন্তু প্রস্তুত করিতে হইলে এক সঙ্গে অনেকগুলি স্পিনারেট হইতে সূক্ষ্ম তন্তু বাহির করিয়া পাক না দিয়া প্রয়োজনানুযায়ী নির্দিষ্ট মাপ করিয়া কাটা হয়। ষ্টেপল তন্তুর দৈর্ঘ্য, ব্যাস ইচ্ছামত করা যায়। তারপর তন্তুগুলি ধুইয়া, ব্লিচিং করিয়া শুকান হয়। এইবার তুলা, রেশম, পশম প্রভৃতি তন্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাকে বয়ন করা যাইতে পারে।

(২) অ্যাসিটেট পদ্ধতি—ভিস্কোজ পদ্ধতির ন্যায় প্রথমে বিশুদ্ধ সেলুলোজ প্রস্তুত করা হয়। বিশুদ্ধ সেলুলোজকে অ্যাসেটিক্ অ্যাসিডে কয়েকদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ইহার সহিত অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড নামে আর একটি রাসায়নিক পদার্থ মিশাইয়া সেলুলোজ অ্যাসিটেটের ঘন দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। এই দ্রবণটিকে কয়েকদিন রাখিয়া জলে ঢালিয়া ফ্লেক্স আকারে পরিণত করা হয়; পরে ভালভাবে ধুইয়া শুষ্ক করা হয়। এইবার ইহার সহিত অ্যাসিটোন মিশাইয়া বয়নোপ-যোগী ঘন দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। এই দ্রবণকে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া খুব জোরে স্পিনারেট যন্ত্রের মধ্য দিয়া তন্তুর আকারে নির্গত করা হয়। স্পিনারেট যন্ত্রের মধ্যে একটি বৃত্তাকারে কতকগুলি ছিদ্র আছে। অ্যাসিটোনে ভিজানো এক টুকরা কাপড় দিয়া স্পিনারেটের ছিদ্রগুলি পরিষ্কার করা হয় যাহাতে দ্রবণ ভালভাবে বাহির হইতে পারে। যখন দ্রবণটি তন্তুর আকারে নীচের পাত্রে পড়ে তখন নীচ হইতে ৪৮°-৫৮° সেন্টিগ্রেডে উপর দিকে বাতাস যাইবার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা তন্তুগুলি গরম বাতাসের সংযোগে আসে এবং অ্যাসিটোনকে বাষ্পীভবনের দ্বারা অন্য স্থানে উদ্ধার করা হয় এবং পুনরায় কাজে লাগান হয়। ইতি-মধ্যে তন্তুগুলি ক্রমে শুকাইয়া শক্ত হইয়া যায় এবং পরস্পরের গায়ে লাগে না। তারপর সব সুতা একসঙ্গে করিয়া তৈলাক্ত করা হয় এবং পাকাইয়া

ঝাটিমে গুটানো হয়। এইভাবে বয়নোপযোগী এবং অ্যাসিটেট পদ্ধতি ছবির সাহায্যে মোটামুটি সূতা প্রস্তুত করা হয়। নিম্নে ভিস্কোজ পদ্ধতি বুঝানো হইল।

কাঠের মণ্ড
সেলুলোজ
কষ্টিক সোডা
সোডা সেলুলোজ
কার্বন-ডাইসালফাইড
সেলুলোজ জ্যানথেট
কষ্টিক সোডা
ভিস্কোজ
বয়নোপযোগী দ্রবণ
সালফিউরিক অ্যাসিড
সূতা
সালফিউরিক অ্যাসিড
সোডিয়াম সালফেট
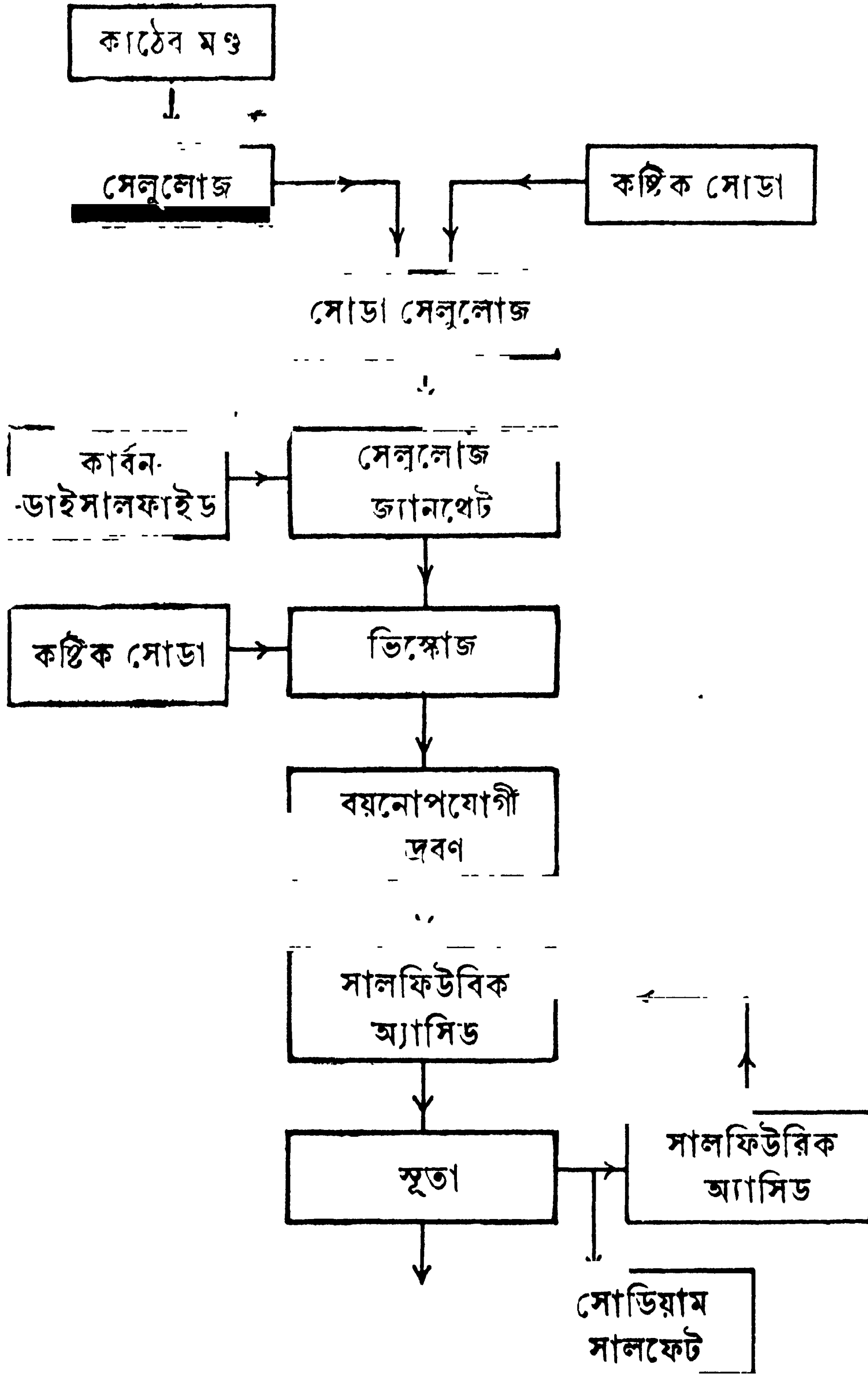
ভিস্কোজ পদ্ধতি

(৩) কিউপ্রামোনিয়াম পদ্ধতি :—এই পদ্ধতিতেও প্রথমে বিশুদ্ধ সেলুলোজ প্রস্তুত করিতে হয়। কপার সালফেটের (তুঁতের) সহিত প্রয়োজন মত অ্যামোনিয়া মিশ্রিত করিয়া কিউপ্রামোনিয়াম দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। এই দ্রবণে সেলুলোজ দিলে গলিয়া যায়। এইভাবে সেলুলোজ দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তারপর ইহাকে ছাঁকিয়া স্পিনারেট যন্ত্রের মধ্য দিয়া খুব

জোরে বাহির করিয়া অ্যাসিডের মধ্যে ফেলিলে উহা জমিয়া সূক্ষ্ম ফিলামেন্টের আকারে পরিণত হয়। তারপর শুকাইয়া বয়নোপযোগী করা হয়।

ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া, তুলা ইত্যাদি
ইথাইল অ্যালকোহল
অ্যাসেটিক অ্যাসিড
শুক্রীকরণ পদ্ধতি
অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড
অ্যাসেটিক অ্যাসিড
বিশুদ্ধ সেলুলোজ
সেলুলোজ + অ্যাসেটিক অ্যাসিড + অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড
অ্যাসিটোন
উদ্ধার করা অ্যাসিটোন
বয়নোপযোগী দ্রবণ
ছাঁট সূতা
সূতা
বস্ত্র

অ্যাসিটেট পদ্ধতি

অ্যাসিটেট এবং ভিস্কোজ পদ্ধতির তুলনা ঃ—

অ্যাসিটেট এবং ভিস্কোজ পদ্ধতিতে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। অ্যাসিটেট পদ্ধাতকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। অ্যাসিটেট পদ্ধতিতে সেলুলোজ অ্যাসিটেট ফ্লেক্স প্রস্তুত হইলেই রাসায়নিক ক্রিয়া শেষ হইয়া যায়। সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্রস্তুত করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত রাখিতে পারা যায় বা প্রয়োজনমত অন্যকে বিক্রয় করা যায়। অ্যাসিটেট ফ্লেক্স প্রস্তুত করিবার কারখানা এবং তাহা হইতে সূতা বা বস্ত্র বয়ন করিবার কারখানা বিভিন্ন স্থানে হইতে পারে। কিন্তু ভিস্কোজ পদ্ধতিতে একেবারে সূতা বয়ন পর্যন্ত শেষ করিতে হয়। অ্যাসিটেট পদ্ধতিতে সেলুলোজ, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং অ্যাসি-

টোনের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং অ্যাসিটোন উদ্ধার করিয়া পুনরায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। অ্যাসেটিক অ্যাসিড হইতে আবার অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড প্রস্তুত করা যাইতে পারে। একই কারখানায় অ্যালকোহল হইতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং অ্যাসিটোন প্রস্তুত হইতে পারে এবং বিশুদ্ধ সেলুলোজও প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতি খুব জটিল বলিয়া মনে হইলেও বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এ সমস্ত উপাদানগুলি প্রস্তুত করা বা পুনরায় উদ্ধার করিয়া ব্যবহারযোগ্য করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। অ্যাসেটেট পদ্ধতিতে স্পিনারেট হইতে সুতা বাহির হইবার পর গরম বাতাসের সংস্পর্শে আসায় অ্যাসিটোন পুনরায় পাওয়া যায় এবং সুতাও সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া যায় এবং তখনই কাটিমে বা অন্য কোন জিনিষে জড়ানো যায়। ভিস্কোজ পদ্ধতিতে স্পিনারেট হইতে সুতা বাহির হইয়া শক্ত হইবার পর পরিষ্কার করিয়া পুনরায় শুকাইতে হইবে। অ্যাসিটেট পদ্ধতিতে ঝরতি-পড়তি বা রদ্দি বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যা কিছু অ্যাসিটেট সুতা শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয় বা ছিঁড়িয়া যায় কিংবা ফেলিয়া দেবার মত হয় সেগুলিকে পুনরায় অ্যাসিটোনে দ্রব করিয়া তাহা হইতে নূতন সুতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অ্যাসিটেট মিনিটে প্রায় ৮০০।৯০০ গজ বয়ন করা যায়; গড়ে প্রায় ৩০০ গজ হয়। ভিস্কোজ পদ্ধতিতে মিনিটে ১২০ গজের বেশী সাধারণতঃ হয় না; গড়ে প্রায় ৮০ গজ বয়ন করা যাইতে পারে। ভিস্কোজ পদ্ধতিতেও চারটি প্রধান উপাদান, সেলুলোজ, কষ্টিক সোডা, কার্বন-ডাইসালফাইড এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রয়োজন। একই কারখানায় এই রাসায়নিক উপাদানগুলি প্রস্তুত করা বড় অসুবিধা। এই সমস্ত কারণের জন্য অ্যাসিটেট পদ্ধতি ব্যবহার বোধহয় সুবিধাজনক। অ্যাসিটেট পদ্ধতি অপেক্ষা ভিস্কোজ পদ্ধতিতে খরচও অনেক বেশী পড়ে; তাছাড়া ইহা খুব জটিলও বটে।

ধর্ম ও গুণ:—রেয়ন দেখিতে পশমের মত উজ্জ্বল এবং চিক্কণ। অ্যাসিটেট বস্ত্র ভিস্কোজ বস্ত্রের তুলনায় দেখিতে সুন্দর এবং উজ্জ্বল; এতে ভাঁজ পড়ে না। ভিস্কোজ বস্ত্র নরম এবং খুব শীঘ্রই ভাঁজ পড়ে বলিয়া অনেকে পছন্দ করে না। রেয়নের স্থিতিস্থাপকতা খুব কম; সেইজন্য গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করা চলে না। অ্যাসিটেট এবং ভিস্কোজ দ্রবণকে পাকা রং করিয়া নানাপ্রকার রঙীন বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। রেয়ন রং করিয়া সুন্দর ছাতার কাপড় প্রস্তুত হয়। শুষ্ক অবস্থায় রেয়নের ভারসহন ক্ষমতা পশম অপেক্ষা বেশী, তবে সাধারণতঃ তূলা, নাইলন এবং ভাল রেশম অপেক্ষা কম। ভিজা অবস্থায় রেয়নের ভারসহন ক্ষমতা অন্যান্য তন্তুর তুলনায় বেশ হ্রাস পায়, অবশ্য প্রোটিন তন্তু ছাড়া। ভিজা অবস্থায় তূলার ভারসহনক্ষমতা শুষ্ক অবস্থায় ভারসহনক্ষমতা অপেক্ষা বেশী। রেয়ন সুতায় যত বেশী ফিলামেণ্ট থাকিবে সুতা তত বেশী শক্ত হইবে এবং বস্ত্রও বেশী মজবুত হইবে। ভিস্কোজ প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ এবং অ্যাসিটেট প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ জল ধারণ করিতে পারে। অ্যাসিটেট রেয়ন ভিস্কোজের তুলনায় তাড়াতাড়ি শুকায়। ভিস্কোজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫ এবং অ্যাসিটেটের ও রেশমের যথাক্রমে ১.৩ ও ১.২৫। সাধারণতঃ রেয়ন সুতা যথেচ্ছ-পরিমাণে হাজার হাজার গজ লম্বা করা যাইতে পারে এবং প্রয়োজনানুযায়ী সূক্ষ্মতাও দান করা যাইতে পারে। অবিচ্ছিন্ন তন্তুর কাটছাট অংশ হইতে প্রয়োজনমত ষ্টেপল তন্তু প্রস্তুত করিয়া পশম, রেশম এবং তূলা ইত্যাদি তন্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ষ্টেপল তন্তুর দামও কম এবং তূলা ও পশমের কলে বয়ন করা যাইতে পারে। ষ্টেপল তন্তু পশমের সহিত মিশাইয়া ফ্লানেল, টুইড ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। সার্ট,

পায়জামা, রুমাল, নেকটাই, কম্বল, তোয়ালে, টেবিল ক্লথ এবং কার্পেট ইত্যাদি বহু কাজে ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিটেট ষ্টেপল কার্পেট এবং কম্বলের জন্য খুব উপযোগী।

অ্যাসিটেট তন্তু হইতে তাপ্তা, সাটিন, ক্রেপ, জর্জেট এবং ভয়েল ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত হয়। কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন ফিলামেণ্ট খুব সূক্ষ্ম এবং এতে ভাল রং করা যায়; ইহা গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে। তুলার সহিত রেয়ন ব্যবহার করিবার একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, এই কাপড় বেশ গরম হয় অথচ তুলার কাপড় বা রেয়নের কাপড় গরম নয়। বর্তমানে উন্নত ধরনেব খুব শক্ত রেয়ন প্রস্তুত সম্ভব হওয়ায় টায়ারের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। রেয়নের এত গুণ থাকা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক বা কীটজাত রেশম রেয়ন অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃতিক রেশমের বস্ত্রাদির স্থায়িত্ব কৃত্রিম রেশমের স্থায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। রেশমী কাপড়, গরদ, তসর, মটকা, মুগা, এণ্ডি প্রভৃতি একটু যত্ন করিয়া রাখিলে কয়েক বৎসর ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে সস্তায় রেশম ব্যবহার করিতে হইলে রেয়ন ব্যবহারই সুবিধাজনক।

বর্তমান রেয়ন পৃথিবীর নানা দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। গত যুদ্ধের পর বস্ত্রাদির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, প্রাকৃতিক তন্তু ও কৃত্রিম তন্তু উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াও অভাব মিটিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে রেয়নের উৎপাদন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকা এ বিষয়ে অগ্রণী। ১৯ ৯ সালে পৃথিবীতে রেয়নের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৭০,২০ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯৫০ সালে বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৩৪৯,৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯৫১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৩৯৬০০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক তন্তুর বিশেষ অভাব রহিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু টাকার রেয়ন আমদানী করে। বর্তমানে দৈনিক প্রয়োজন প্রায় ৭০ টন রেয়ন সূতা। সুতরাং আমাদের দেশে রেয়ন শিল্পপ্রসারের একটা বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তারপর রেয়ন প্রস্তুতের জন্য কাঁচা মালের অভাব দেশে নাই; বিশেষতঃ অ্যাসিটেট পদ্ধতিতে।

ভারতবর্ষ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রেয়ন প্রস্তুতের দিকে মনোযোগ দিয়াছে। অতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চারটি রেয়ন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে The Travancore Rayons Ltd, ভিস্কোজ রেয়ন, বোম্বাইয়ে The National Rayon Corporation, ভিস্কোজ রেয়ন এবং হায়দ্রাবাদে Sirsilk Ltd. অ্যাসিটেট রেয়ন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মধ্য ভারতে Gwalior Rayon Silk Manufacturing (Weaving) Co. Ltd. রেয়ন ষ্টেপল তন্তু প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছে। The Travancore Rayons Ltd-এর কারখানাতে ভিস্কোজ রেয়ন প্রস্তুত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ স্বচ্ছ কাগজও প্রস্তুত হইতেছে। ভিস্কোজ পদ্ধতিতে যে বিশেষ নরম কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা অবশ্য বর্তমানে আমদানী করা হইতেছে; তবে ভবিষ্যতে এর পরিবর্তে হয়ত আমাদের দেশের বাঁশ ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। সালফিউরিক অ্যাসিড এবং কার্বন-ডাইসালফাইড প্রস্তুত করিবার জন্য সালফার বা গন্ধক বিদেশ হইতে আনিতেই হইবে। কষ্টিক সোডার জন্য বিদেশের উপর বেশী দিন নির্ভর করিতে হইবে না। অ্যাসিটেট পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাঁচা মাল আমাদের দেশেই পাওয়া যায়। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে রেয়ন শিল্প ভারতের বাজারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ

৮ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু লোকসভা ও রাজ্য পরিষদে চূড়ান্তরূপে ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা পেশ করেন।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে পরিকল্পনা কমিশন খসড়া রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। খসড়া রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ পত্রাদি রিপোর্ট সম্বন্ধে নানা মতামত প্রকাশ করেন। তারপরে কমিশন ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকার ও তাহাদের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন।

বর্তমান রিপোর্টটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যের দিকে জাতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই খণ্ডের শেষ দিকে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ইহার লক্ষ্য যোগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত করিবার ব্যবস্থা ও জনসাধারণের সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় অংশে প্রস্তাবিত কার্যসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন পরিকল্পনার সারমর্ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্বতন্ত্র একখানি পুস্তকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রধান প্রধান কাজের বিবরণ স্থান পাইয়াছে। খসড়া পরিকল্পনায় কোন কোন অংশে যে দুর্বলতা ছিল অতিরিক্ত প্রস্তাবগুলির দ্বারা তাহা সংশোধনের চেষ্টা হইয়াছে। খসড়া পরিকল্পনায় দুইটি পর্যায়ে অর্থ বিনিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছিল। প্রথম পর্যায়ে ১৪৯৩ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩০০ কোটি টাকা। চূড়ান্ত রিপোর্টে সমস্ত কর্মসূচী একই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ২০৬৯ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে।

চূড়ান্ত ও খসড়া পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান খাতে ব্যয়বরাদ্দের পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	১৯৫১-১৯৫৬ সালে ব্যয়বরাদ্দ		ব্যয়বরাদ্দের শতকরা হিসাব	
	চূড়ান্ত পরিকল্পনা কোটি টাকা	খসড়া পরিকল্পনা কোটি টাকা	চূড়ান্ত পরিকল্পনা	খসড়া পরিকল্পনা
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন—	৩৬০.৪৩	১৯১'৬৯	১৭'৪	১২ ৮
সেচ ও বিদ্যুৎ	৫৬১'৪১	৪৫০'৩৬	২৭'২	৩০'২
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪৯৭'১০	৩৩৮'১২	২৪ ০	২৬'১
শিল্প	১৬৭'০৭	১০০'৯৯	৮'৪	৬'৭
সমাজ কল্যাণ	৩৩৯'৮১	২৫৪'২২	১৬'৪	১৭
পুনর্বাসন	৮৫	৭৯	৪'১	৫'৩
বিবিধ	৫১'৯৯	২৮'৫৪	২'৫	১'৯
মোট	২০৬৮'৭৮	১৪৯২'৯২	১০০	১০০

গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত পরিকল্পনা

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ৯০ কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা ও জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ ও সংস্থাপনের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কতকগুলি নূতন নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার জন্যও অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে।

শিল্পের জন্য যে অর্থ খসড়া পরিকল্পনায় বরাদ্দ হইয়াছিল তাহা অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শিল্পের জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ও খনিজ উন্নয়নের জন্য মোট ৫০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৫ কোটি হইতে বাড়াইয়া ১৫ কোটি করা হইয়াছে।

সমাজ কল্যাণ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা রহিয়াছে। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ১০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ৪৯ কোটি টাকার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত তপশীলী ও অপরাধপ্রবণ জাতির উন্নয়নের জন্য ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য অতিরিক্ত টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে।

খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলের সাহায্যের জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনায় ১৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সহজে স্থানীয় অধিবাসীগণের সাহায্য লাভের জন্য পরিকল্পনাগুলিকে জেলা ও মহকুমার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। যে সব অধিবাসী নিজ অঞ্চলের পরিকল্পনায় কাজ করিবে তাহাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রথম তিন বৎসরের জন্য ১৫ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যে সকল সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করিবে তাহাদের জন্য ৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা থাকিবে।

পরিকল্পনা নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতি

কমিশন সুপারিশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক নীতি নির্ধারণ নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতি। এক্ষণে যে লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইল, কার্যক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে, তাহার পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইতে পারে। নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রাখিয়া চলিতে হইবে। কমিশন বলিয়াছেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রত্যেক নাগরিককে সমানভাবে ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে এবং সমগ্র জাতির প্রচেষ্টা ও সম্পদ ইহার পিছনে নিয়োগ করিতে হইবে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও কার্যকরী উপায়

জনগণের জীবনধারণের মান উন্নয়ন এবং তাহাদিগকে উন্নততর ও বৈচিত্র্য-ময় জীবন যাপনের সুযোগ প্রদানই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির উপরই জোর দিতে হইবে। সমাজের সকল লোকের জন্য ক্রমে ক্রমে পূর্ণ কর্মসংস্থান, শিক্ষা, পীড়া-প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করিয়া নূতন ভাবে গড়িতে হইবে। সকল ক্ষেত্রে যুগপৎ অগ্রসর হওয়াই পরিকল্পনার সার কথা। প্রতিক্ষেত্রে সম্পদগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে কাজে লাগাইতে হইবে।

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশ অনুযায়ী গণতান্ত্রিক উপায়েই পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র সমাজের উৎসাহের দ্বারা ইহার সুপ্ত শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবার উপরই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিবে। নেতৃত্বই এখানে প্রধান সমস্যা; শুধু উচ্চতম স্তরের নেতৃত্ব নহে

সকল স্তরের নেতা অগ্রসর হইয়া আসিলেই ইহা সফল হওয়া সম্ভব।

মূলধন গঠন

উৎপাদনের স্তর এবং কোন দেশের উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভর করে ইহার মূলধন সরবরাহের যোগ্যতার উপর—জনপ্রতি যে পরিমাণ জমি আছে এবং কারখানা, ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, সেচের সুবিধা, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার যেসব সুবিধা আছে তাহার উপর।

বর্তমানে এই দেশের জনপ্রতি আয় অতি অল্প। কমিশনের মতে যথাসম্ভব আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া অন্ততঃ দ্বিগুণ করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন: (১) জনসংখ্যার গতি —প্রতি বৎসর শতকরা ১¼ জন হিসাবে লোক বৃদ্ধি, (২) অর্থ বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পারস্পরিক হার এবং (৩) জাতীয় উৎপাদনের কত অংশ পুনরায় উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা যায়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর অতিরিক্ত জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ করিয়া মূলধন বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে জাতীয় আয় বাড়িয়া প্রায় ১০০০০ কোটি টাকা হইবে; অর্থাৎ উহা প্রায় ১১ শতাংশ বাড়িবে। যদি ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে প্রতিবৎসর অতিরিক্ত উৎপাদনের ৫০ শতাংশ হারে অর্থ বিনিয়োগে বাড়িয়া যায় তবে ২৭ বৎসরে, অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের মধ্যে জন প্রতি আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব হইবে।

কর্ম সংস্থান

ভারতে কোনও পরিকল্পনা করিতে হইলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। বেকার সমস্যার সমাধান সময় সাপেক্ষ; পরিকল্পনা কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নূতন নূতন শিল্পে মূলধন নিয়োগ কালে কোন্ শিল্পে কত বেশী সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দিতে হইবে এবং অধিকতর শ্রমিক নিয়োগের সুযোগের প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন, পূর্ণ কর্ম-সংস্থান, অর্থনৈতিক সমতা বিধান এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার গৃহীত আদর্শ।

রাষ্ট্রের ভূমিকা

কমিশনের মতে এই সকল পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। সকল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণ অথবা কৃষি, ব্যবসায়, বা উৎপাদন শিল্পে বেসরকারী ব্যক্তি বা সংস্থার বিলোপ সাধন কমিশন সুপারিস করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিধি সম্প্রসারণ এবং সুপরিকল্পিত অর্থনীতিক ভিত্তিতে বেসরকারী ব্যক্তি বা সংস্থার শিল্পে আত্মনিয়োগ অবশ্যই কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। কমিশনের মতে সুপরিকল্পিত অর্থনীতিক শিল্পের রাষ্ট্রীয় অংশও বেসরকারী অংশের গুরুত্ব আপেক্ষিক মাত্র; উভয়ে একই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ।

পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় গৃহ নির্মাণ এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ে সমবায় সংস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

পরিকল্পনায় জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া উৎপাদনে উৎসাহ দিবার জন্য কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়ার নির্দেশ রহিয়াছে।

আয় ও সঞ্চয়ের অসাম্য যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে মৃত্যু-কর ধার্য, আয়করের হার এবং আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সম্পদ ইচ্ছানুরূপ বন্টন করিতে, মূল্য কম রাখিতে এবং ন্যায্য হারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পণ্যবিনিময় অব্যাহত রাখিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

অগ্রাধিকার

দেশের আশু প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর কালের প্রথম দিকে সেচ ও বিদ্যুৎ সহ কৃষি ব্যবস্থাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কৃষি ব্যতীত সেচ, বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করিতেই সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত টাকার বেশীর ভাগ ব্যয় হইয়া যাইবে। কাজেই শিল্পের উন্নয়ন বেসরকারী উদ্যোগের উপরেই নির্ভর করিবে। তবে লৌহ, ইস্পাত, শিল্পে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্পের উন্নয়নে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব থাকায় পরিকল্পনার প্রথম দিকেই ঐ সব শিল্প উন্নয়নে হাত দিতে হইবে।

সম্পদের হিসাব নিকাশ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিতে গিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে, ইহার জন্য ২০৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হইলেও বেসরকারী ক্ষেত্রে যাহাতে উন্নয়ন ব্যাহত না হয় তাহার উপযোগী অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি করিতে হইবে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের একটি মাত্র ক্ষেত্র রহিয়াছে। কাজেই অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিয়া সংগৃহীত অর্থ নির্ধারিত অগ্রাধিকার অনুসারে উভয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে হইবে।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, পরিকল্পনা কালে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে মোট ৭৩৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রভৃতি বাবদ ৫২০ কোটি টাকা আসিবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আয়ের এই দুইটি প্রধান সূত্র হইতে মোট বরাদ্দ ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ১২৪৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

বাকী ৮১১ টাকা বৈদেশিক সূত্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি সূত্র হইতে ১৫৬ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। বাকী ৬৫৫ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সূত্র হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহা না পাওয়া গেলে কর ধার্য করিয়া বা ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। অনুমান ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি লইয়া কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে।

অর্থবিনিয়োগ ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

বরাদ্দকৃত ২০৬৯ কোটি টাকা উন্নয়ন কার্যাদিতে ব্যয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উহার ফলে দেশে উন্নয়ন যন্ত্রাদি বিশেষ সুলভ হইবে এবং ঐ সকল যন্ত্রাদির সাহায্যে পরবর্তীকালে উন্নয়ন কার্যাবলী ক্রমেই বিস্তার লাভ করিবে। এই ব্যয়ের বরাদ্দ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের উন্নয়ন কার্যাদিতে নিয়োজিত মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে— ... ১১৯৯ কোটি টাকা

২। বে-সরকারী নিয়োজিত মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে—

(ক) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বাবদ ... ২৪৪ " "

(খ) শিল্প ও পরিবহন বাবদ ঋণ ... ৪৭ " "

(গ) স্থানীয় উন্নয়ন কার্যাদিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান বাবদ ১০৫ " "

৩। সমাজসেবা কার্যাদির মূলধন বাবদ	...	৪২৫ কোটি টাকা
৪। অভাবগ্রস্ত অঞ্চল ও অন্যান্য অনির্দিষ্ট কার্য বাবদ	...	৪৯ „ „
	মোট	২০৬৯ „ „

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অর্থ বণ্টনের হার :—

কেন্দ্রীয় সরকার (রেলওয়ে সহ)	...	১২৪১ কোটি টাকা
(ক) তপসিলভুক্ত রাজ্যসমূহে	...	৬১০ „ „
(খ) „ „	...	১৭৩ „ „
(গ) „ „	...	৩২ „ „
জম্মু ও কাশ্মীর	...	১৩ „ „
	মোট	২০৬৯ „ „

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতাত ঐ অর্থ নিম্নোক্ত খাতে ব্যয় হইবে :—

কোটি টাকায়

	কেন্দ্রীয় সরকার	(ক) তপসিল রাজ্যসমূহ	(খ) তপসিল রাজ্যসমূহ	(গ) তপসিল রাজ্যসমূহ
কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন	১৮৬'৩	১২৭'৩	৩৭'৬	৮'৭
সেচ ও শক্তি	২৬৫'৯	২০৬'১	৮১'৫	৩'৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪০৯'৫	৫৬'৫	১৭'৪	৮'৮
শিল্প	১৪৬'৭	১৭'৯	৭'১	০'৫
পুনর্বাসন ও সমাজসেবা	১৯১'৪	১৯২'৩	২৮'৯	১০'৪
বিবিধ	৪০'৭	১০'০	০'৭	—
	১২৪০'৫	৬১০'১	১৭৩'২	৩১'৯

জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ঐ অর্থ নিম্নরূপ হারে ব্যয় হইবে :—

কোটি টাকায়

(ক) তপসিলভুক্ত রাজ্যসমূহ		(খ) তপসিলভুক্ত রাজ্যসমূহ		(গ) তপসিলভুক্ত রাজ্যসমূহ	
আসাম	১৭'৪৯	হায়দরাবাদ	৪১'৫৫	আজমীঢ়	১'৫৭
বিহার	৫৭'২৯	মধ্যভারত	২২'৪২	ভূপাল	৩'৯০
বোম্বাই	১৪৬'৪৭	মহীশূর	৩৬'৬০	বিলাসপুর	০'৫৭

মধ্যপ্রদেশ	৪৩'০৮	পেপস্থ	৮'১৪	কুর্গ	০'৭৩
মাদ্রাজ	১৪০'৪৮	রাজস্থান	১৬'৮২	দিল্লী	৭'৪৮
উড়িষ্যা	১৭'৮৪	সৌরাষ্ট্র	২০'৬১	হিমাচল প্রদেশ	৪'৫৫
পাঞ্জাব	২০'২১	ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	২৭'৩২	কচ্ছ	৩'০৫
উত্তর প্রদেশ	৯৭'৮৩			মণিপুর	১'৫৫
পশ্চিমবঙ্গ	৬৯'১০			ত্রিপুরা	২'০৭
				বিন্ধ্য প্রদেশ	৬'৩৯
মোট	৬১০'১২		১৭৩'২৬		৩১'৮৬

উন্নয়ন পরিকল্পনার কতকগুলি ফলাফল কিরূপ হইতে পারে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬
১। কৃষি		
খাদ্যশস্য—ডালসহ (লক্ষ টন)	৫২৭	৬১৬
তুলা (লক্ষ গাইট)	২৯'৭	৪২'২
পাট (লক্ষ গাইট)	৩৩'০	৫৩'৯
ইক্ষু (লক্ষ টন)	৫৬'০	৬৩'০
তৈলবীজ (লক্ষ টন)	৫১'০	৫৫'০
২। সেচ ও শক্তি		
সেচ ব্যবস্থা (লক্ষ একর)	৫০০	১১২০
বৈদ্যুতিক শক্তি	২৩	৩৫
৩। লৌহ ও ইস্পাত (লক্ষ টন)		
কাঁচা লৌহ	৩'৫	৬৬
তৈয়ারী ইস্পাত	৯'৮	১৩'৭
সিমেণ্ট	২৬'৯	৪৮'০
অ্যামোনিয়াম সালফেট (সহস্র টন)	৪৬'৩	৪৫০'০
সুপার ফস্‌ফেট „	৫৫'১	১৮০'০
রেল ইঞ্জিন	—	১৭০
পেট্রোল—সংশোধিত (লক্ষ গ্যালন)	—	৪০৩'০
সুতা (লক্ষ পাউণ্ড)	১১৭৯০	১৬৪০০
সুতী কাপড় (লক্ষ গজ)	৩৭১৮০	৪৭০০০
তাঁতের কাপড় (লক্ষ গজ)	৮১০০	১৭০০০
পাটজাত দ্রব্যাদি (সহস্র টন)	৮৯২	১২০০

শক্তি-চালিত পাম্প (সহস্র)	৩৪·৩	৮৫·০
বাইসাইকেল (সহস্র)	১০১·০	৫৩০·০
সুরাসার (লক্ষ গ্যালন)	৪৭·০	১৮০·০
৪। পরিবহন		
বিদেশগামী জাহাজ (সহস্র টন)	১৭৩·৫	২৮৩·০
উপকূলচারী " "	২১১·০	৩৫৩·০
রাজ্য সড়ক (সহস্র মাইল)	১৭·৬	২০·৬
৫। শিক্ষা		
প্রাথমিক বিদ্যালয় (লক্ষ)	১৫১·১	১৮৭·৯
প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় (লক্ষ)	২৯·০	৫২·৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (লক্ষ)	৪৩·৯	৫৭·৮
শিল্প বিদ্যালয় (সহস্র)	১৪·৮	২১·৮
অন্যান্য কারিগরী ও পেশাদারী বিদ্যালয় (সহস্র)	২৬·৭	৪৩·৬
৬। স্বাস্থ্য		
হাসপাতাল (বেডের সংখ্যা সহস্র)	১০৬·৫	১১৭·২
চিকিৎসালয় (সহরাঞ্চলে)	১৩৫৮	১৬১৫
" (গ্রামাঞ্চলে)	৫২২৯	৫৮৪০
৭। উন্নয়নমূলক কেন্দ্র		
পঞ্চায়েৎ (সহস্র)	৫৫·১	৬৯·১
সমবায় সমিতি (পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, হায়দরাবাদ, পেপসু এবং 'গ' তপসিলভুক্ত অধিকাংশ রাজ্য ব্যতীত)		
ঋণ (সহস্র)	৮৭·৮	১১২·৫
ক্রয়-বিক্রয় (সহস্র)	১৪·৭	২০·৭
সেচ	১৯২·০	৫১৪·০
কৃষি ক্ষেত্র	৩৫২·০	৯৭৫·০
বহুমুখী (সহস্র)	৩১·৫	৪০·৫
অন্যান্য (সহস্র)	২৭·৩	৩৫·৮
মোট (সহস্র)	১৬১·৯	২১১·১

পল্লী-উন্নয়ন ও গ্রাম সংস্কার

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রায় ৩০০টি গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্র গঠিত হইবে। ইহাতে প্রায় ১৫৪০০০ একর জমি এবং প্রায় ২০০০০০ জন লোক থাকিবে। প্রতি কেন্দ্র তিনটি উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত হইবে এবং প্রতি ব্লকে ১০০টি গ্রাম এবং ৬০ হইতে ৭০ হাজার লোক থাকিবে। পল্লী-উন্নয়নের কর্মসূচী—কৃষি ও আনুসঙ্গিক কাজ, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসর-কালীন কর্মসংস্থান, গৃহনির্মাণ, শিক্ষা, সমাজ-কল্যাণ। একটি গ্রামীন সমাজ-পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে ৩ বৎসরে ৬৫ লক্ষ টাকা এবং একটি শহর কেন্দ্র সংযুক্ত গ্রামীন পরিকল্পনায় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

খাদ্যনীতি

দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, খাদ্যশস্য সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা এবং ক্রমে ক্রমে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর প্রয়োজনীয়তা দূর করাই পরিকল্পনার খাদ্যনীতির লক্ষ্য।

কমিশন খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের মূল ব্যবস্থা পরিকল্পনার অন্তর্গত সময়ে অক্ষুন্ন রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন; তবে দেশে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইলে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা যাইতে পারে বা তার প্রয়োগ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

সেচ ও বিদ্যুৎ

পরিকল্পনা কমিশন সেচ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে যে কর্মসূচী সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে আছে বহুমুখী সেচ পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, নলকূপ নির্মাণ ও জলসম্পদ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন।

কমিশনের হিসাবে প্রয়োজনীয় সমস্ত সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ৪২ কোটি একর জমিতে সেচ কার্য চলিবে এবং প্রায় ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু দেশের সম্পদ অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার হিসাবে সর্বনিম্ন কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ১৯৫১ সালে যে সব সেচ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ কার্য হইতেছে সেইগুলি সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা আছে। ১৯৫১ সালের মার্চ পর্যন্ত এই সকল পরিকল্পনায় ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম তিন বৎসর নূতন কোন পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইবে না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষের দিকে কোশী, কয়না, কৃষ্ণা, চম্বল এবং বিহানদ্ এই কয়টি নূতন পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনাগুলিতে সাকুল্যে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে; কিন্তু পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসর বহুমুখী পরিকল্পনা হইতে অতিরিক্ত ১০ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ কার্যে খসড়া পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার ফলে ৭৯ একর জমিতে জলসেচ হইবে বলা হইয়াছিল। কমিশন এই খাতে আরও ৩০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

কমিশন প্রত্যেক রাজ্য একটি সেচ-উন্নয়ন ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজস্ব হইতে ঋণ অথবা সঞ্চয়, কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত সাহায্য বা ঋণ, জলকর, উন্নয়ন কর বাবদ সংগৃহীত সমস্ত অর্থ ভাণ্ডারে জমা হইবে। উহা হইতে সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ মিটান হইবে।

শিল্প

পরিকল্পনায় শিল্পের উন্নয়ন সাধনে সরকারী ও

বেসরকারী সংস্থাসমূহ কোন্ কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহা বিবৃত হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র ও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং রেলওয়ে পরিবহন, পরিচালন প্রভৃতি শিল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বেতারযন্ত্র নির্মাণ খনিজ তৈল উৎপাদন প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকিবে। শিল্পের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অবাধ অধিকার থাকিবে। তবে বেসরকারী পরিচালনায় কোন শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইলে রাষ্ট্র তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের মোট ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বেসরকারী শিল্প সম্প্রসারণের জন্য ২৩৩ কোটি টাকা লাগিবে। তন্মধ্যে লৌহ ইস্পাত ৩৪ কোটি, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ৬৪ কোটি।

সিমেণ্ট ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ, অ্যালুমিনিয়াম ৯ কোটি, কৃত্রিম সার, সুরাসার এবং শিল্প-ব্যবহার্য রসায়ন ১২ কোটি, বেসরকারী শিল্পে ব্যবহার্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পের জন্য ৯৪ কোটি ও বেসরকারী শিল্পের জন্য ২৩৩ কোটি টাকা ব্যতীত যন্ত্রপাতির সংস্কার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রভৃতি বাবদ আরও ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

শ্রম

শ্রমিক-কল্যাণে কমিশন শ্রমিকদের মূল অভাব (খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় সম্পর্কে) দূর করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা, সামাজিক নিরপত্তা প্রভৃতির ব্যবস্থাও করিতে বলিয়াছেন। শ্রমিকদের নিজ নিজ অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় সংঘবদ্ধ হইবার ও বৈধ উপায় অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা দিতে বলা হইয়াছে। শিল্প ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে স্বীকার করিয়া সেগুলিকে সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। শিল্পের অবস্থা ও পরিচালনার সহিত যাহাতে তাহাদের যোগাযোগ থাকে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে, বলা হইয়াছে।

বেতন সম্পর্কিত নীতির বিষয়ে কমিশন বলিয়াছেন যে, জাতীয় আয়ের ব্যাপারে শ্রমিকেরা অবশ্যই তাহার ন্যায্য পাওনা পাইবে এবং বেতনের নির্দিষ্ট মান বাড়াইতে হইবে। বিভিন্ন প্রকার কাজের মধ্যে বেতনের পার্থক্য যতটা সম্ভব কমাইতে হইবে। উদ্বৃত্ত শ্রমিকদিগকে অন্যান্য বিভাগে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। শ্রমিকেরা যাহাতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে তজ্জন্য গ্র্যাচুইটি দিতে হইবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

এই কর্মসূচীর চার পঞ্চমাংশের কিছুকম রেলওয়েসমূহের জন্যই ব্যয় হইবে। রেলওয়ের জন্য মোট ব্যয় ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে ; রেলওয়ে গুলি নিজ সম্পদ হইতে ৩২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবে।

ইঞ্জিন সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চিত্তরঞ্জনে একটি রেলওয়ে ইঞ্জিনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। পরিকল্পনার অন্তর্গত কালে এই কারখানা ২০০টি ইঞ্জিন সরবরাহ করিবে।

জাহাজ চলাচল কর্মসূচী কার্যকরী হইলে উপকূল ও বিদেশগামী জাহাজের মোট পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬০০০০০ টন বাড়িয়া যাইবে। জাহাজ কোম্পানীগুলিকে জাহাজ কিনিবার জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। কান্দলা বন্দরের উন্নতির জন্য ১২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। তৈল শোধনাগার প্রভৃতির জন্য বন্দরাদির সুবিধা

রিয়া দিতে ৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বোম্বাই, লিকাতা, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্ ও কোচিন, পাঁচটি বন্দরে উন্নয়নের জন্য ৫ বৎসরে কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় রাজপথ উন্নয়নে পাঁচ বৎসরে ২৪ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। বিভিন্ন রাজ্যে রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের জন্য ৭৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনায় ৪৫০ মাইল নূতন রাস্তা, ৪৩টি বড় পুল ও অনেক ছোট পুল নির্মাণের ব্যবস্থা আছে; তদুপরি ২২০০ মাইল রাস্তার উন্নতিসাধন করা হইবে।

বিমান পরিবহন কোম্পানীগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি সংস্থা গঠনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। চলতি বিমান কোম্পানিগুলিকে ক্ষতি-পূরণ বাবদ ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরিকল্পনায় কমিশন একটি ৫০ কোটি টাকার ডাক, তার ও টেলিফোন উন্নয়নের কর্মসূচী সুপারিশ করিয়াছেন।

শিক্ষা

পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৫৪ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬৯ কোটি ২ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সূচী বাবদ ব্যয় হইবে। এই অর্থের অধিকাংশ উচ্চতর শিক্ষা ব্যতীত প্রধানতঃ কারিগরি ও বুনিয়াদি শিক্ষায় এবং গবেষণাদিতে ব্যয় হইবে।

রাজ্যসমূহের কর্মসূচী বাবদ মোট ১১৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকার অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, ও কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষায় ব্যয় হইবে।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যোন্নয়ন কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয় হইবে ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকারের মোট ব্যয় হইবে ৮০ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

চিকিৎসা-সূচীতে ব্যয় হইবে ৪৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। ইহার ভিতর ৫০ শতাংশ হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারী বাবদ, ৪০ শতাংশ চিকিৎসা ও শিক্ষা বাবদ ব্যয় হইবে।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে; তন্মধ্যে ১০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করিবেন। ম্যালেরিয়ার পরেই যক্ষ্মা নিরোধ পরিকল্পনায় অধিক টাকা ব্যয় হইবে।

গৃহনির্মাণ

পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ বাবদ মোট ৪৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে; তন্মধ্যে কেন্দ্রের ব্যয় হইবে ৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

কমিশন একটি জাতীয় গৃহনির্মাণ সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গৃহনির্মাণ বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন।

শিল্প-শ্রমিকদের সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতিগুলিকে গৃহনির্মাণ ব্যয়ের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত সাহায্য দানের সুপারিশ আছে।

খনিজসমূহ

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, খনিসংস্থা এবং জাতীয় গবেষণা মন্দিরগুলির দ্বারা দেশের গুরুত্ব-পূর্ণ খনিজসম্পদ সম্পর্কে সুসংহত পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান কার্য চালাইবার ব্যবস্থা পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। খনিজসম্পদ আহরণ ও অর্থনীতিক উপায়ে ব্যবহার বিষয়ে একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় নীতি প্রবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কয়লা, লৌহপিণ্ড, ম্যাঙ্গানীজপিণ্ড, মাইকা প্রভৃতি কতক-গুলি প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যের উন্নয়নকল্পে কতক-গুলি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হইয়াছে। —আ—

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, বর্তমান পরিবর্তনের সময় আমরা এশিয়াবাসীরা এক সঙ্কটময় অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছি।

চীন ও ভারতের দুইটি প্রতিবেশী সভ্যতা গত তিন হাজার বৎসর কিংবা আরও অধিককাল নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও একান্তভাবে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ভাবধারার প্রভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় ক্রমশঃ বহু পরিবর্তনর দেখা দিয়াছে। এই পরিবর্তনের ফল বর্তমান সভ্য সমাজে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করিবে।

বর্তমানে আমাদের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে, পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের দ্বারা গৃহীত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কারিগরী পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক ভাবধারার সাহায্যে বর্তমান আভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান আর্থিক অনটন ও বাহিরের প্রতিযোগিতা এবং সম্ভাব্য বৈদেশিক প্রভাবের চাপের মধ্যে আমাদের পুঞ্জীভুত অনড় প্রথা ও সংস্কারমুক্ত হইয়া ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও অসুবিধার মধ্যে আমাদের সভ্যতাকে বিশ্ব সভায় আসন লাভের উপযোগী করিয়া নূতন রূপ দেওয়া সম্ভব কি না।

রোমানদের ন্যায় বৃটিশেরাও শাসনক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন জাতি। সেই হেতু তাঁহারা তাঁহাদের শাসনাধীন বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষেত্রোপযোগী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের ফল আলোচনা করিয়া ডাঃ বসু বলেন যে, প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া মানব কল্যাণে সেই জ্ঞান নিয়োগ করিবার শক্তি মানুষের আছে বলিয়া পাশ্চাত্যের এই আস্থা আমরা বৃটিশ শাসনের ফলে লাভ করিয়াছি। ১৯৪৭ সাল হইতে ভারত-বাসী এক দিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও অন্যদিকে খাদ্য এবং যন্ত্রপাতি ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অভাবের মধ্যে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবার সংগ্রামে লিপ্ত আছে।

সভাপতি বলেন, আমাদের প্রধান মন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্ভব। মধ্যযুগের প্রথম দিকে আমাদের দেশে যে মনোভাব ছিল, বর্তমান মনোভাব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লেখ করিয়া ডাঃ বসু বলেন যে, দেশের পুনর্গঠনে বৈজ্ঞানিকদের স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইয়া এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য যথাশক্তি কাজ করিতে হইবে।

ডাঃ বসু তাঁহার ভাষণে বৈজ্ঞানিক আলোচনার অংশে দেখাইয়াছেন যে, অনুমানের উপর যথাসম্ভব কম নির্ভর করিয়া অনুভূতির সাহায্যে তথ্যের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারি—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ,—প্রথম সংখ্যা

৪০-তম

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি

ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু

বসু বিজ্ঞান মন্দিরেব ডিরেক্টর ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পবিষদের সারস্বত
সংঘের সভাপতি

করে দেখ

বৈদ্যুতিক চক্র

সামান্য কয়েকটি জিনিষ দিয়েই এই বৈদ্যুতিক চক্রটি তৈরি করা যায়। এর পরিচিত নাম হচ্ছে—বার্লো'জ হুইল। ব্যাটারীর সঙ্গে যোগকরা মাত্রই চক্রটি দ্রুত বেগে ঘুরতে সুরু করে। আমি যেরূপ সহজ উপায়ে এই যন্ত্রটি তৈরি করে দেখেছি—সেকথাই আজ তোমাদের বলে দিচ্ছি। ইচ্ছা করলে তোমরাও অনায়াসেই এটি তৈরি করে দেখতে পারবে।

যন্ত্রটা তৈরি করতে হলে ১½" ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা টিনের চাক্‌তি, ৬½" ইঞ্চি লম্বা একটা সরু লোহার শলা, ঘোড়ার নালের মত একটা স্থায়ী চুম্বক, একটা ব্যাটারী, একখানা কাঠের তক্তা, এক টুক্‌রা লম্বা কাঠ, কিছু পারা এবং কিছু পেরেক দরকার।
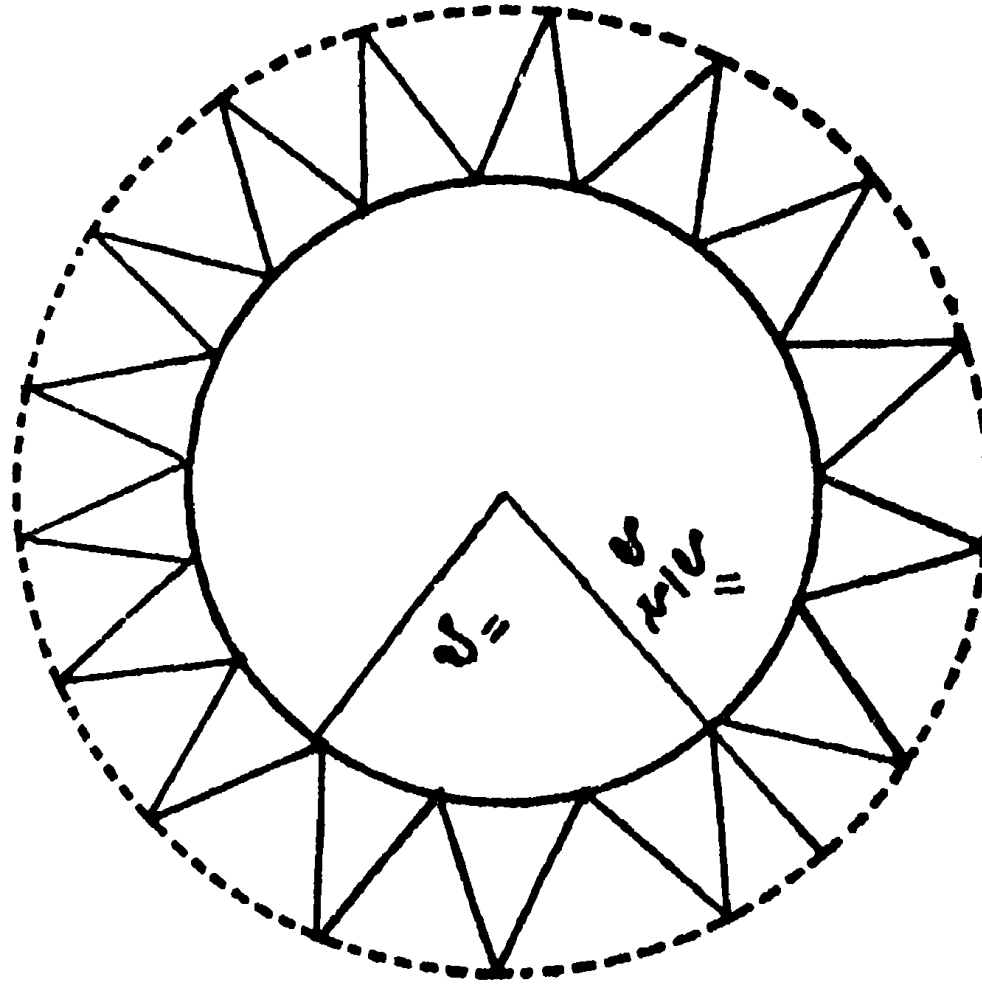
১নং চিত্র

প্রথমে টিনের চাক্‌তিটাকে এক নম্বর চিত্রের মত ব্যবস্থায় করাতের দাঁতের মত কেটে নাও। টিনের চাক্‌তি থেকে তৈরি এই চক্রটার কেন্দ্রস্থলে সরু একটি ছিদ্র করে দিতে হবে।

এই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে লম্বা লোহার শলাটা গলিয়ে দিয়ে সেটাকে U অক্ষরের মত বাঁকিয়ে ২ নম্বর চিত্রের মত দাঁড় করানো লম্বা কাঠখানার গায়ে এমনভাবে আটকে দাও যাতে টিনের চক্রটা একই জায়গায় থেকে সহজভাবে ঘুরতে পারে। এখন চক্রটার ঠিক তলায় শয়ান তক্তা খানার গায়ে ছুরি বা বাটালি দিয়ে বাটির মত ছোট্ট একটু গর্ত্ত করে নাও। ওই গর্তের মধ্যে পারা ভর্তি কর। চুম্বকটাকে ছবির মত করে শয়ান তক্তাখানার উপর বসিয়ে দাও। সরু তামার তারের একমুখ পরিষ্কার করে বাঁকিয়ে দিয়ে

পারার মধ্যে ডুবিয়ে দাও, অপর মুখ তক্তার গায়ে সরু টিনের ফালির সঙ্গে এঁটে দিতে হবে। আর একটা সরু তামার তার খাড়া কাঠ খানার গায়ে বসানো লোহার শলার সঙ্গে
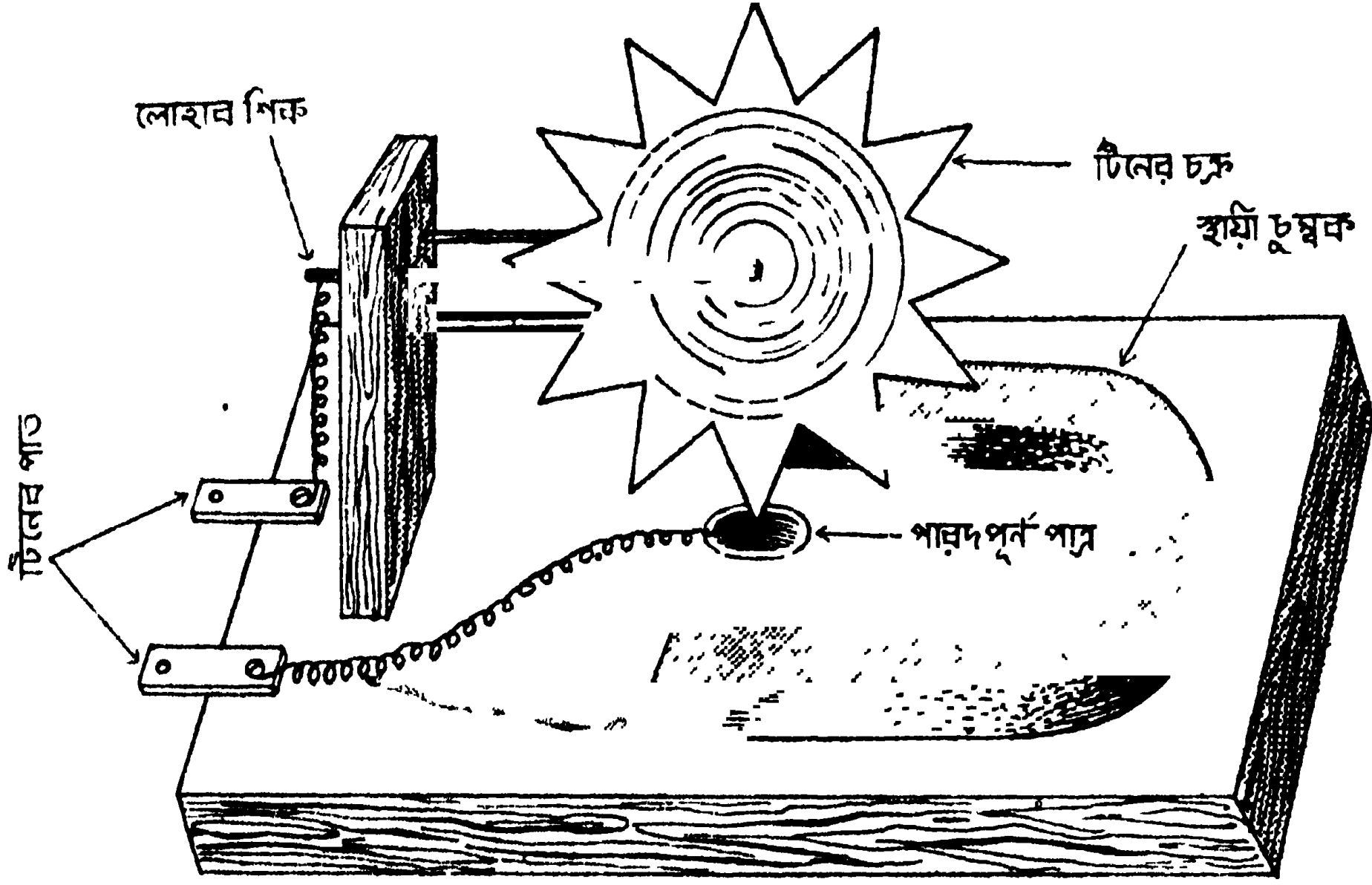
২নং চিত্র

সংযোগ করে অপর প্রান্তটা আর এক খানা সরু টিনের ফালির সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। ছবি দেখে নাও। এবার ব্যাটারির দু-প্রান্ত টিনের পাত দুটির সঙ্গে যোগ করলেই চক্রটা জোরে ঘুরতে আরম্ভ করবে।

শ্রীবিনোদ রক্ষিত

জেনে রাখ

আগ্নেয়গিরির কথা

প্রাচীন রোমানদের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর তলায় থাকেন অগ্নিদেব ভলক্যান। পৃথিবীর গোপন গর্ভে তাঁর কারখানা। মাঝে মাঝে যখন পৃথিবীর পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসত গরম হাওয়া আর বিবিধ গলিত পদার্থ তখন তাঁরা মনে করতেন, এ সেই দেবতার কাজ। তাঁর কারখানা আছে এটনা পাহাড়ের তলায়—সিসিলি দ্বীপের পূর্বতীরে। তাঁরই নাম থেকে ইংরেজি ভলক্যান কথাটা এসেছে।

কিন্তু আজ তো আর মানুষ একথা বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞানী খুঁজে বের করেছে এর প্রকৃত কারণ। এ যুগের মানুষ জানে যে, অগ্ন্যুৎপাতের মূলকারণ—তাপাধিক্য। কিন্তু এই তাপ নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। প্রশ্ন জেগেছে—কেমন করে এই তাপ বেশী হয়? কেমন করে এই সমস্ত গলিত পদার্থ বেরিয়ে আসে?

কেউ কেউ বলেছেন যে, এই আগ্নেয়গিরির তাপ হয়ত আদিম পৃথিবীর ভীষণ গরম আর গলিত দেহের তাপের একাংশ। এই মতটিই আজ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, পাথরের বিরাট বিরাট খণ্ডাংশের মধ্যে ঘর্ষণ, পেষণ বা স্বতঃতেজবিকিরণকারী ধাতুর অস্তিত্বের ফলেও এই তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। আবার সমস্ত গলিত ধাতু, পাথর এবং আরও কত বিচিত্র জিনিষ নিয়ে গড়ে উঠেছে Magma ; বাংলায় বলা যেতে পারে ভূ-বীর্য। তাও যে কেমন করে গড়ে উঠল, সে বিষয়েও আলোচনা চলেছে পণ্ডিতদের মধ্যে। পৃথিবীর কোন্ নিভৃত অন্দরে যে তার জন্ম তা কে জানে? তবুও তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু জানা গেছে।

কেউ বা বেরিয়ে আসে পৃথিবীর ওপরে লাভারূপে। ব্যাসাল্টের স্তর, গ্র্যানাইটের স্তর এবং আরো কত নানা স্তরে এক একটির জন্ম। লাভাপ্রবাহ আর ভূ-বীর্যের তফাৎটা একটু বলা দরকার। ভূ-বীর্য একরকম গলিত শিলা. কিন্তু তা পৃথিবীর তলাতেই থাকে—কিন্তু লাভা বেরিয়ে এসেছে পৃথিবীর ওপরে। তরল বা কঠিন যে অবস্থাতেই হোক না কেন, শিলারা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু জল সঞ্চয় করে রাখে নিজেদের কঠিন দেহের অভ্যন্তরে। ভূ-বীর্য আবার তা থেকেই সংগ্রহ করে জলকণা। আর সে থেকেই আগ্নেয়গিরির তলায় তৈরি হয় নানা গ্যাস। এই সমস্ত গ্যাসের মধ্যে অজস্র জলীয় বাষ্প থাকে ; আর কিছু থাকে অঙ্গারাম্ল।

প্রায় সমস্ত আগ্নেয় পাহাড়েরই কোণাকৃতি শীর্ষদেশ থাকে। তবে সকলেরই শীর্ষদেশ যে কোণাকৃতি, এমন কোন কথা নেই। আগ্নেয়গিরির শীর্ষদেশ নানান রকম হয়। যেমন—Cinder Cones, Spatter Cones ইত্যাদি। যে ফাটল দিয়ে আগ্নেয় পদার্থ-সমূহ বেরিয়ে আসে তার নাম দেওয়া হয়েছে জ্বালামুখ। এই জ্বালামুখ আবার অনেকটা নীচে নেমে গেছে সরু হয়ে। তাকে বলা হয়েছে আগ্নেয়গিরির গলা। লাভা থেকে শিলা উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত লাভা মাটির তলাতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তারা তৈরি করে প্লুটোনিক শিলা। আর যে সমস্ত লাভা মাটির ওপরে এসে ঠাণ্ডা হয়, এরূপ শিলার নাম দেওয়া হয়েছে ভলক্যানিক শিলা।

ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা প্রান্তে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ছড়িয়ে আছে। তাদের সংখ্যা পাঁচ শ-এর কম নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে আগ্নেয়-গিরির এক বিস্ময়কর সমারোহ। এদের নামকরণ করা হয়েছে 'অগ্নি মেখলা'। টিয়েরা ডেল ফুয়েগো থেকে সুরু করে অ্যাণ্ডিজের ধার দিয়ে মধ্য আমেরিকার পশ্চিম-তীর ঘুরে পৌঁচেছে মেক্সিকোতে। সেখান থেকে আলাস্কায়। আলাস্কা ঘুরে অ্যালিউপিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে কামচাট্কা, জাপান, ফিলিপাইন আর নিউজীল্যাণ্ডে ফিরে এসেছে।

অনেক পাহাড়ই ঐতিহাসিক কালের মধ্যে গড়ে উঠেছে। গত দু-শতাব্দীতে অনেক নতুন আগ্নেয়গিরি গড়ে উঠেছে মধ্য আমেরিকা আর মেক্সিকোতে। অন্যান্য

পাহাড়ের মত আগ্নেয় পাহাড়ের চলে নগ্নীভবন আর ক্ষয়ীভবন। নানা বিচিত্র আকার ধারণ করে পাহাড়ের গাত্র। আগ্নেয়গিরি যখন সক্রিয় থাকে তখন তার কোণাকৃতি শিখর পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষয়ীভবনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে আগ্নেয়গিরি।

অগ্ন্যুৎপাত আবার নানারকম। সাধারণতঃ এগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা—ভীষণ উদ্গারী, শান্ত উদ্গারী এবং এদের মাঝামাঝি একটি। অনেক আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ ভয়াবহ। যেমন ভিসুভিয়াসের কথা ধরা যেতে পারে। আবার কতকগুলি আগ্নেয়গিরি শান্ত। তারা শুধু লাভা ঢেলে দেয় ধীরে ধীরে। সিলিকার (Silica) ভাগ যে সমস্ত লাভায় কম তারা বেশী সিলিকা-ভরা লাভার চেয়ে তরল। ভূ-বীর্যের মধ্যে প্রচুর বাষ্প আর অন্যান্য গ্যাস মিলে লাভাকে আরও তরল করে। তার ফলে বিস্ফোরণের সময় কোন রকম আলোড়নের সৃষ্টি হয় না। 'ভূমধ্যসাগরের আলো-দিশারী' ষ্ট্রম্বলীকে বলা যেতে পারে মাঝামাঝি রকমের উদ্গারী।

এইবার বলা যাক লাভাপ্রবাহের কথা। কঠিনীভূত লাভার আকার তার ভিতরের গ্যাস ও চাপ সহ্যের ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তরল লাভার ওপরের আচ্ছাদনের নাম হলো পাহোহো। যে সমস্ত তরল লাভা যেতে যেতে তলার শিলাখণ্ডকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় আর তাদের টেনে দিয়ে চলে সঙ্গে সঙ্গে, তাদের নাম হলো আ-আ প্রবাহ।

যে কোন অগ্ন্যুৎপাতেরই প্রথম ও শেষফল গ্যাসের আগমন। আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত গ্যাসে বিবিধ গ্যাসের মিশ্রণ থাকে। সাধারণতঃ জলীয় বাষ্প, অঙ্গারাম্ল, উদজান, অম্লজান, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড থাকে। এছাড়া কিছু পরিমাণে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডও থাকে।

শুধু উদ্গীরণ ছাড়া তাপাধিক্যের ফলে আরো কতকগুলি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আগ্নেয়-গিরি অঞ্চলে দেখা যায়। তাদের মধ্যে একটির নাম করা যেতে পারে গাইসার। গাইসার একরকম সবিরাম উষ্ণ-ঝরণা। এইগুলির মধ্যে আইসল্যাণ্ড, ইয়োলোষ্টোন পার্ক এবং নিউ-জীল্যাণ্ডের ঝরণাগুলি বিখ্যাত। কোন কোন গাইসার কয়েক মিনিট বা ঘণ্টা অন্তর বাষ্প আর জল শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। আবার কোন কোনটা সপ্তাহ, মাস বা বৎসর অন্তর গরম জল ছোঁড়ে।

শুধু গাইসার নয়, আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে নানারকম উষ্ণ প্রস্রবণেরও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত আগ্নেয়গিরির শক্তি যখন নিঃশেষিত হয় তখন তাদের শুষ্ক জ্বালামুখে সঞ্চিত হয় বৃষ্টির জল। সেই জ্বালামুখ তখন পরিণত হয় হ্রদে।

আগ্নেয়গিরি মানুষের জীবনে একটি অভিশাপ বলা যেতে পারে। বহুদিনের সাধনায় গড়া বহু শতাব্দীর ঐশ্বর্যকে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে তার দুর্নিবার শক্তিতে। তবুও মানুষ তার কাছ থেকে কিছু যে না পায়, এমন নয়। অনেক সময় উদ্গীরণের ফলে ভূমির উর্বরতা বেড়ে যায়। কোন কোন আগ্নেয়গিরিতে প্রচুর গন্ধক পাওয়া যাচ্ছে। আজকাল আবার বোরিক অ্যাসিডও পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে আগ্নেয়গিরি নেই বললেই চলে। বঙ্গোপসাগরের পরিত্যক্ত দ্বীপে একটি আগ্নেয়গিরি তিন বর্গ মাইল জুড়ে রয়েছে; উচ্চতা প্রায় হাজার ফিট। ১৭৯৫ এবং ১৮০৩ অব্দে তার উদ্গীরণ হয়েছিল। ব্রহ্মদেশে আর বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে আছে দু-একটি।

শ্রীশিশিরকুমার দাশ

খাদ্য কেমন করে হজম হয়

খিদে পেলে তোমরা সকলেই খাবার খাও, কিন্তু সেই খাবার পেটের ভিতরে কি ভাবে হজম হয় তা হয়ত অনেকেই জান না। এ সম্বন্ধেই দু-একটি কথা বলছি।

তোমরা হয়ত ভাব যে, খাদ্য হজমের জায়গা বুঝি শুধুই পাকস্থলীটি; কিন্তু তা মোটেই নয়! শুনলে হয়ত অবাক হবে যে, হজমের কাজ সুরু হয় মুখগহ্বর থেকেই। এর পরে ঐ খাদ্য অন্ননালীর মধ্য দিয়ে পৌঁছায় পাকস্থলীতে। তার পর সেখান থেকে প্রায় ২৬ ফিট লম্বা ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে খাদ্যের মধ্যেকার যা গ্রহণীয় বস্তু তা দেহের রক্তস্রোতের সঙ্গে প্রধানতঃ মিশে যায়; আর বাকী অংশ মলরূপে পরিত্যক্ত হয়।

খাবারের স্পর্শ ছাড়াও সুখাদ্য দেখলে, শুঁকলে বা তার কথা ভাবলে মুখের মধ্যে যে জলীয় পদার্থটির আবির্ভাব হয় তার ভিতরেই থাকে জারক রস। ঐ জারক রস নিঃসৃত হয় কান, জিভ ও চোয়ালের তলাকার তিন জোড়া 'স্যালিভারি গ্ল্যাণ্ড' থেকে। প্রধানতঃ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পাচনের কাজ খানিকটা এগিয়ে দেওয়াই হলো এই রসের উদ্দেশ্য।

পাকস্থলীর গা থেকে যে পাচক রস নির্গত হয় তার রাসায়নিক প্রকৃতি হলো অম্লাত্মক। এই রসটির একটি প্রধান উপকরণ হলো, প্রোটিন হজমকারী পেপসিন। পাকস্থলী থেকে অর্ধ তরলাকারে যে আংশিক হজম-হওয়া খাদ্য বেরিয়ে আসে ইংরেজীতে তাকে বলা হয় 'chyme'।

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশের নাম হলো Duodenum। পরিপাক ক্রিয়ার সমাপ্তি এই-খানেই ঘটে থাকে। যকৃৎ (Liver) অগ্ন্যাশয় (Pancreas) ইত্যাদি পাচন যন্ত্রগুলি থেকে নানারূপ শক্তিশালী জারক রস একটি নালী দিয়ে এখানে এসে পৌঁছায়। Duodenum-এর নিজেরও একটি পাচক রস নিঃসরণের ক্ষমতা রয়েছে। এই সব রসের কাজ হলো আমিষ জাতীয়, শ্বেতসার জাতীয় ও চর্বিজাতীয় খাদ্যকে সম্পূর্ণ-রূপে পরিপাক করা।

পরিপাকের ফলে প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডে, চর্বি ফ্যাটি অ্যাসিডে ও শ্বেতসার গ্লুকোজ ইত্যাদিতে পর্যবসিত হয় এবং ঐ অবস্থাতেই খাদ্যের সংগ্রহণ হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের বাকী অংশে ও বৃহদন্ত্রে অজস্র শোষক নালী (Villi) রয়েছে। ঐগুলির মধ্য

দিয়ে তিলে তিলে খাদ্য রক্তে গৃহীত হতে থাকে। খাদ্যের জলীয় অংশ মূলতঃ বৃহদন্ত্রের শোষক নালীগুলিই গ্রহণ করে থাকে। সর্বপ্রকার সংগ্রহণের শেষে যে পরিত্যক্ত অংশ পড়ে থাকে তাকেই 'মল' আখ্যা দেওয়া হয় এবং বহিষ্করণার্থে সেগুলি মলভাণ্ডারে সঞ্চিত হতে থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই সুদীর্ঘ পথ দিয়ে খাদ্যবস্তু কিভাবে চলাফেরা করে? খাওয়ার সময় ঢোঁক গেলার জোরে খাদ্য অন্ননালীর প্রথম দিকের কিছু অংশের বেশী পথ তো অতিক্রম করতে পারে না! তাহলে? এখন দেখা যায় যে, পরিপাক নালীর মাংসল গায়ে সর্বদাই একরকম সংকোচন-প্রসারণ তরঙ্গ ওঠে। এর ফলে এক জায়গার জিনিষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এই ব্যাপারটির নাম হলো Peristalsis।

হজমের আর একটি মূল উপায় হলো, খাদ্যবস্তুর বহিরায়তন (Surface Area) বাড়িয়ে দেওয়া। আয়তন যত বেশী হবে জারক রসের মিশ্রণ ততই ভাল হবে; ফলে পরিপাকক্রিয়াও হবে সুষ্ঠু। খাওয়ার সময়ে তাই ভাল করে দাঁতের ব্যবহার করতে যেন ভুল না হয়।

অরূপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ওকাপি

উনবিংশ শতকের কথা। বিখ্যাত প্রাণিবিদ্ সার হ্যারি জনষ্টন আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছেন অজানার সন্ধানে। যেকোন মুহূর্তে তাঁর জীবন বিপদাপন্ন হতে পারে। কিন্তু সবরকম বিপদ তুচ্ছ করে তিনি আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গলে ঘুরছেন, লক্ষ্য করছেন রকমারি জন্তু-জানোয়ার। অনেক হাঁটাহাটির পর তিনি এসে পৌঁছলেন সেমলিকি জঙ্গলের কাছাকাছি। এই জায়গাটি অ্যালবার্ট ও এডওয়ার্ড হ্রদের মাঝ-খানটায় অবস্থিত। সেখানে পিগ্মীদের কাছ থেকে তিনি এক অদ্ভুত জানোয়ারের গল্প শুনতে পেলেন। ইতুরির জঙ্গলের বাসিন্দা পিগ্মীরা জন্তুটির নাম দিয়েছে ওকাপি। পিগ্মীদের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে তাঁর দেখা কোন জানোয়ারেরই কিন্তু সাদৃশ্য পাওয়া গেল না। ব্যাপার কি? তিনি ভাবতে থাকেন। কিন্তু এর কোন হদিসই করে উঠতে পারছেন না। এটা নিশ্চয় পুরাকালের কোন জন্তু-জানোয়ার হবে। সেযুগের জীব-জন্তুর অস্তিত্ব লোপ পেলেও দৈবাৎ পৃথিবীর বুকে এখানে-ওখানে তাদের বংশধরদের দেখা পাওয়া যায়। তাই জনষ্টন রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এই অদ্ভুত জানোয়ারটাকে খুঁজে বার করবার জন্যে।

প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের বর্ণনায় এক ধরনের এক-শিংওয়ালা প্রাণীর উল্লেখ আছে। সেটি দেখতে ঘোড়ার মত। এর নাম 'ইউনিকর্ন্'। এই প্রাচীন গল্প আফ্রিকার পিগ্মীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। এই অদ্ভুত জন্তু নাকি গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা। তাই এদের দেখবার সৌভাগ্য কারও বড় একটা হয় না। সার হ্যারি

ভাবলেন, এই কিংবদন্তীর মধ্যে কিছু না কিছু সত্য নিশ্চয় আছে। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। পিগ্‌মীদের নির্দেশক্রমে তিনি তাদের আস্তানায় হানা দিলেন। দূর থেকে দু-একটা নজরেও পড়ল। তিনি ভাবলেন, এগুলো ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো—তাই বা হবে কি করে? এরূপ গভীর জঙ্গলে ঘোড়ার তো থাকবার কথা নয়! তাছাড়া ভাল করে পরীক্ষা

জিরাফ নয়, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা ওকাপি

করবার সুযোগই বা পেলেন কোথায়? যদিও বা সন্ধান পেলেন, কিন্তু তাদের নাগাল পাওয়া কি সোজা কথা! মানুষের গন্ধ পেলেই হলো, চোখের নিমেষে একেবারে উধাও! এদের কান ভারী সজাগ। একটু খুট করে শব্দ হলেও এরা তা টের পাবেই। তাছাড়া অনেকদূর থেকে বাতাসে ভেসে-আসা শত্রুর গায়ের গন্ধও এদের ঘ্রাণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারে না। তাই হ্যারিকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো। অবশ্য পরে জানা গেল—এই সব জানোয়ার ওকাপি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আফ্রিকার পিগ্‌মীরা বিষাক্ত তীরের সাহায্যে ওকাপি শিকার করে থাকে। ওকাপির মাংস নাকি এদের ভারী প্রিয়। বিষাক্ত তীর দিয়ে শিকার করলেও কিন্তু নিহত প্রাণীটির মাংস মোটেই অখাদ্য হয় না। এই মাংস খেয়ে কেউ মরেছে বলে জানা যায় নি।

অবশেষে সার জন হ্যারি পিগ্‌মীদের নিকট থেকে একটা পার্শেল পেলেন। পার্শেলের মধ্যে ওকাপির একটা আস্ত ছাল ও দুটা মাথার খুলি পাওয়া গেল। দাঁত পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারলেন—এই অদ্ভুত জানোয়ার জেব্রা অথবা জিরাফ নয়। তবে মাথার খুলির আকার অনেকটা জিরাফেরই মত। ভাগ্যক্রমে একটা ওকাপিও তিনি পিগ্‌মীদের কাছ থেকে উপহার পেলেন। এই ছাল ও আস্ত জানোয়ারটা তিনি পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত প্রাণিবিদ্‌ রে ল্যাঙ্কেষ্টারের কাছে। অনেক গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রাণীটি জিরাফেরই জাত ভাই। নাম ওকাপি। হ্যারি জনষ্টনের নামটি অমর করবার উদ্দেশ্যে তিনি আবিষ্কারকের নামটিও এর সঙ্গে যোগ করে দিলেন। প্রাণিবিদ্যায় এর পরিচয় হলো 'ওকাপিয়া জনষ্টনি'।

ওকাপির গায়ের রংটি অপরূপ। মুখের রং সাদা, গায়ের রং আবার লালচে বাদামী; কিন্তু পিছনের অংশ ও সামনের পা দুটি জেব্রার মতই সাদা, কালো ও কমলা লেবু রঙের ডোরায় ভরতি। এ এক তাজ্জব ব্যাপার। এরকম ডোরাদার হয়ে কিন্তু ওকাপির পক্ষে ভালই হয়েছে। গভীর অরণ্যের ঘন ডালপালা ভেদ করে একটু আধটুকু রোদের আলো যেখানে এসে পৌঁছয় সেখানে এরা বেশ আত্মগোপন করতে পারে। আলোছায়ার সঙ্গে নিজের রংটি মিশিয়ে অনায়াসে এরা শত্রুর চোখে ধূলা দিতে পারে। এজন্যেই গভীর অরণ্যে এদের খুঁজে বার করা ভারী মুশকিল। আত্মগোপনের কৌশলটুকুর অধিকারী না হলে বেচারীদের আর বাঁচবার কোন উপায় ছিল না। কারণ এদের এমন কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে নিজদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে। একজোড়া শিং অবশ্য আছে, তা না থাকারই সামিল। লম্বায় তা একটা আঙুলের সমান। সেটিও আবার চামড়ার নীচে ঢাকা পড়ে থাকে। স্ত্রী-ওকাপির কিন্তু মোটেই শিং গজায় না। তবে এক বিষয়ে এরা ভারী ওস্তাদ। দৌড়পাল্লার বাজিতে এদের হার মানাতে পারে এমন জন্তু কমই দেখা যায়। স্ত্রী-ওকাপি কিন্তু পুরুষ ওকাপির চাইতে আকারে অনেকটা বড় এবং বেশ নাদুসনুদুস। আকারে ওকাপি অনেকটা ঘোড়ার সমান, তবে গলাটা ঘোড়ার চেয়ে অনেক লম্বা। পায়ের খুর আধচেরা।

ওকাপির খাদ্য গ্রহণের ধরনটা ভারী মজার। শুনলে তোমরা বেশ কৌতুক বোধ করবে। এদের জিবটা আকারে বেশ খানিকটা লম্বা। এতে অসুবিধার চাইতে সুবিধাই হয়েছে এদের পক্ষে। এই লম্বাটে জিবের সাহায্যে কচি ডালপালা, পাতা কিংবা ছোট ছোট ফল জড়িয়ে টেনে এনে মুখের ভিতর রপ্তানি করে দেয়।

এহেন কিম্ভূতকিমাকার একটা জানোয়ার আমাদের চিরিয়াখানায় থাকলে বেশ হতো, কি বল?

—ন—

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, বসুবিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ হইতে মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | ফেব্রুয়ারি—১৯৫৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বালুকণার ব্যবহার

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

বালুকণা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্র। বালুকণার রাসায়নিক নাম সিলিকা—সিলিকন ধাতু, অক্সিজেন সংযোগে রূপান্তর গ্রহণ করেছে সিলিকাতে। আপাতদৃষ্টিতে বালুকণা একটি নগণ্য পদার্থ বলে মনে হলেও আজকাল বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের দরুণ এর বহুমুখী রূপটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

বাড়ীঘর, দালান, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি তৈরিতে রাজমিস্ত্রীর একটি প্রয়োজনীয় মশলা হিসাবে বালির ব্যবহার অতি পুরাতন। সিমেণ্টের সঙ্গে এর ব্যবহার চিরদিন অপরিহার্য হয়ে থাকবে। কাচ, এনামেল এবং মৃৎশিল্পে বালুকণা একটি অতি আবশ্যকীয় উপাদান। প্লেট-গ্লাস, আরশি, কাচ-পাত্র, ঝালর, চিনামাটির বাসন, ফুলদানী, কাচের চুড়ি, মালা, বোতাম প্রভৃতি বহু জিনিষ কাচ থেকে তৈরি হয়েছে। যদিও ভারতবর্ষ কাচ শিল্পের জন্মদাতা নয়—কাচের অলঙ্কার ইত্যাদি ১৮৯২ সাল থেকে এদেশে তৈরি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কাচের অলঙ্কার ভারতীয় কাচ শিল্পের একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে। যুদ্ধের আগে ভারতে ১০১টা গ্লাস ফ্যাক্টরী এদের কাচের চাহিদার মাত্র অর্ধাংশ মেটাতে পারতো। ১৯৫০ সালের ভিতর ভারতেই এর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২২৪-এ।

কাচ তৈরিতে সাধারণতঃ বালি, সোডা এবং চুন বা চুনাপাথর ১০:৫:২—এই অনুপাতে দরকার হয়। এছাড়া আরো অনেক জিনিষ বিভিন্ন প্রকার কাচ তৈরিতে প্রয়োজন হয়ে থাকে; যেমন—পটাস, সীসা, ফেল্‌স্‌পার, ক্রায়োলাইট, ফ্লোরস্পার নামক খনিজ পদার্থ এবং ম্যাঙ্গানিজ, বোরোন, দস্তা, তামা, কোবাল্ট প্রভৃতির ধাতব অক্সাইড। বোতল ইত্যাদি সস্তা ধরনের কাচ-পাত্র তৈরিতে নিকৃষ্ট প্রকৃতির বালুকণা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরিস্রুত সিলিকার প্রয়োজনই আজকাল বেশী। কাচ তৈরির উপযোগী বালি ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। রাজমহল পাহাড়ের পাটরা-গাট্টা এবং মঙ্গলহাট নামক স্থানে, মাদ্রাজের উত্তরে ইন্নোরের বেলাভূমিতে, বরোদা রাজ্যের স্যাঙ্খির নামক অঞ্চলে, বিকানীরের মধ নামক

স্থানে, বাগীরাজ্যের বারোদিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কাচ শিল্পের প্রয়োজনীয় বালুকণা এবং বালুকা-প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এলাহাবাদের নিকটবর্তী লোহ্রা এবং বরঘর অঞ্চলের বালুকা-প্রস্তর থেকে নৈনী নামক উৎকৃষ্ট প্রকৃতির বালি পাওয়া যায়। এই প্রস্তরে চীনামাটি ও আরো অনেক আবর্জনা থাকে। এগুলি দূর করবার জন্যে চূর্ণীকৃত প্রস্তরকে অ্যাসিড সোডিয়াম অক্সালেট এবং ফেরাস সালফেটের দ্রাবণে ৮০°-৯০° সে. তাপে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। কাচ শিল্পে প্রয়োজনীয় আরো বহু উপাদান বা কাঁচা মালের অভাব ভারতে নেই। যাদবপুরে গ্লাস ও সিরামিক ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় যে, ভারতে এই কাচ শিল্প খুব শীঘ্রই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

বালুকণা একটি কঠিন পদার্থ। খুব সহজে এর রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করা যায় না। জলে বা কোন অ্যাসিডে এটা দ্রবণীয় নয়। বালুকণাকে নমনীয় করবার উপায় হলো—সোডা ক্ষারের সঙ্গে ১১৫০° সে. তাপে একে গলান; এদ্বারা সোডা-সিলিকেট নামক যে পদার্থটি তৈরি হয় সেটা জলে দ্রবীভূত হয়। এই সোডা সিলিকেট জলে গুলে নিয়ে তাতে একটু অ্যাসিড মিশিয়ে দিলে জল ঘোলাটে হয়ে পাতলা জেলির মত একটা জিনিষ তৈরি হয়। এর নাম সিলিকা-জেল। এই দ্রাবণকে উচ্চ তাপ ও চাপে গরম করলে জলের ভিতর সিলিকা বা বালুকণা নির্গত হয়ে অতি সূক্ষ্মরূপে ভাসমান থাকবে। দুধের মত সাদা এই দ্রাবণে গোলাকার অতি সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি সাধারণ বালির মত দানাদার নয়; বালুকণার সাধারণ দানাদার গঠন ভেঙ্গে গিয়ে সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হয়েছে। এই দ্রাবণকে তাপে শুকিয়ে নিলে পাত্রের তলায় একটা সাদা সরের মত পদার্থ জমবে। এই সিলিকায় আগের বালির মত আর তত ধার নেই। এই সিলিকা-সল আজকাল বস্ত্রবয়ন-শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। পশমের সূতা এই সিলিকা সলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলে সূতা খুব শক্ত হয়, বস্ত্রবয়ন বা উল বোনার সময় সহজে ছিঁড়ে যায় না। পশমী কাপড়, সার্জ, ওষ্টেড প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূতা তৈরিতে সিলিকা সলের ব্যবহার আজকাল খুব বেড়ে গেছে। রেশম, রেয়ন এবং নাইলনের সূতাতেও এই সল ব্যবহার করা হয়। একটা সূতা অন্যটির গায়ে যেন জড়িয়ে না যায় সে জন্যেই সিলিকা-সলের ব্যবহার। ঘরের মেঝে পালিশের কাজেও সিলিকা-সল প্রয়োগ করা হয়; তাতে পালিশ করা মেঝের পিছল বা স্লিপারি ভাবটা অনেক কমে যায়।

বালুকণা থেকে সিলিকা এষ্টার নামক এক জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়ে থাকে। এষ্টারগুলি সাধারণতঃ জৈব লবণ জাতীয় পদার্থ—জৈব অ্যাসিড এবং সুরাসার মিশিয়ে এষ্টার তৈরি হয়। বিশুদ্ধ কোক কয়লার গুঁড়ার সঙ্গে বালি মিশিয়ে চীনা-মাটির নলের ভিতর উচ্চ তাপে গরম করে তার মধ্যে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস প্রবেশ করালে তৈরি হয় সিলিকন টেট্রা-ক্লোরাইড নামক একটি তরল জৈব পদার্থ। বরফের ঠাণ্ডায় এটা তরল থাকে, বাতাস ও তাপের সংস্পর্শে ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়। এই টেট্রা-ক্লোরাইড সুরাসার বা অ্যাল-কোহলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তৈরি করে সিলিকন এষ্টার। দু-রকমের সিলিকন এষ্টার আছে। এক ধরনের এষ্টার জলের সংস্পর্শে এসে ভেঙ্গে গিয়ে আবার সিলিকা বা বালিতে পরিণত হয়। কিন্তু জলের সংস্পর্শে দ্বিতীয় প্রকারের এষ্টারের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইথাইল সিলিকেট প্রথমোক্ত প্রকারের তরল পদার্থ। এ থেকে ইচ্ছামত সিলিকা নির্গত করানো যায়। অনেক সচ্ছিদ্র পদার্থের ভিতর সিলিকা জমানোর জন্যে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রস্তর, কংক্রীট, প্লাষ্টার, সিমেণ্ট ইত্যাদির ওপর ইথাইল সিলিকেট ঢেলে দিলে তাদের ছিদ্রের ভিতর এই তরল পদার্থটি প্রবেশ করে। তারপর জলের সংস্পর্শে

এসে ভেঙ্গে যায় এবং স্বচ্ছ কাচের মত বিশুদ্ধ বালির একটি আস্তরণ ছিদ্রগুলির ভিতর জমে শক্ত হয়ে যায়। বহু দালান, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদিকে জল ও বাতাসের ক্ষয়কারী শক্তির হাত থেকে সুরক্ষিত করবার জন্যে এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। এই এষ্টারগুলি থেকে খুব সহজে বিশুদ্ধ স্বচ্ছ বালুকা আঁঠাল পদার্থের মত ঢেলে দেওয়া যায় বলে এই এষ্টার চীনামাটির জিনিষ, ফায়ার ক্লে, ধাতুর ঢালাই ছাঁচ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এষ্টার থেকে নির্গত সিলিকা শক্ত সিমেন্টের কাজ করে থাকে; তাই এই সমস্ত জিনিষ খুব শক্ত সুন্দর এবং মসৃণ হয়ে থাকে।

বৈদ্যুতিক বাতি তৈরিতেও এই ইথাইল সিলিকেট খুব উপকারে এসেছে। স্বয়ংপ্রভ বাতি বা ফ্লুওরেসেণ্ট টিউব তৈরিতে সেই কাচ নলের গায়ে স্বয়ংপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া হয়। কাচের গায়ে সেই প্রলেপ আটকে রাখা খুব শক্ত ব্যাপার। ইথাইল সিলিকেটের সাহায্যে সেই প্রলেপ লাগালে তা থেকে খুব পাতলা একটা বালুকণার স্তর নিঃসৃত হয়ে শুকাবার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জক পদার্থটিকে কাচের গায়ে আটকে রাখে। ইথাইল সিলিকেটকে উচ্চ তাপে পোড়ালে তা থেকে যে অতি সূক্ষ্ম বালুকণা নির্গত হয়, সেটা আঁঠাল পদার্থের মত কাচের গায়ে লেগে থাকে। অনেক বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভিতর দিকে এই ইথাইল সিলিকেটের একটা প্রলেপ দেওয়া হয়। কাচের গায়ে শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম বালুকণার পাতলা আস্তরণ ভেদ করে যে আলো নির্গত হয়, তা মৃদু, সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত পরিষ্কার। এই বাল্‌বের আলো ফ্রষ্টেড্ বাল্‌বের আলোর চেয়েও শুভ্র এবং স্নিগ্ধ। জল সংযোগে ভেঙ্গে যায় না এরকম সিলিকন-এষ্টারগুলি তাপনিয়ন্ত্রণ, তাপ-বিনিময় ইত্যাদি যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাণী এবং উদ্ভিজ্জ সমস্ত জৈব পদার্থের প্রধান উপকরণ হলো অঙ্গার। এর সঙ্গে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি মিলিত হয়ে সংখ্যাহীন জৈব রাসায়নিক পদার্থ গড়ে তুলেছে। ফ্যাট, প্রোটিন, রজন, প্ল্যাষ্টিক ইত্যাদি জৈব পদার্থ। জৈব রাসায়নিক পদার্থের ভিতর বালুকণা ঢুকিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সর্বপ্রথম সিলিকন ধাতুর জৈব পদার্থ প্রস্তুত করেছিলেন নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিপিং ১৮৯৯-১৯৪৪ সালে। তিনি বহু প্রকারের এবং প্রকৃতির জৈব সিলিকন তৈরি করেছিলেন। আমেরিকাই জৈব সিলিকনের বহুমুখী ব্যবহারের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সিলিকন টেট্রা-ক্লোরাইডের সঙ্গে অসংখ্য প্রকারের জৈব পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই সিলিকনগুলি তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে ইনসুলেটার বা বৈদ্যুতিক-স্রোত প্রতিরোধক হিসাবে অনেক প্রকারের সিলিকন-রজন ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি উচ্চ তাপেও গলে যায় না। তরল সিলিকনের সঙ্গে সূক্ষ্ম বালুকণা বা সাবান মিশিয়ে গ্রীজ বা ভেসিলিন জাতীয় জিনিষ তৈরি হয়। ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাদিকে তৈলাক্ত রাখার কাজে লুব্রিকেটর হিসাবে এদের ব্যবহার হয়ে থাকে। সিলিকন-রজন এবং সিলিকন-রবারও বাজারে বেরিয়েছে। এই রবার ১০০° থেকে ৪০০° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপেও নরম এবং স্থিতিস্থাপক থাকবে; বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতেই প্রধানতঃ এদের ব্যবহার করা হয়। সিলিকন-রজন দিয়ে অনেক প্রকার রং তৈরি হয়ে থাকে। সেই রং ১০০০° ফারেনহাইট তাপেও নষ্ট হবে না।

রুটি তৈরি করবার পাত্রে এক প্রকার সিলিকনের প্রলেপ দেওয়া হয়; তাতে সেঁকার সময় পাত্রের গায়ে রুটি আটকে থাকে না। সিলিকন জল-প্রতিরোধক বা ওয়াটার প্রুফ্ হিসাবেও কাজে লেগেছে। কাচ, এনামেল, ধাতব পাত্র, পশম ও সূতী বস্ত্রাদির গায়ে সিলিকনের প্রলেপ থাকলে সেগুলি সহজে জলে ভিজবে না। নাইলন, রেয়ন প্রভৃতি কৃত্রিম সূতা বা আঁশের গায়েও সিলি-

কনের প্রলেপ দেওয়া হয়। ফেনা বন্ধ করবার কাজেও সিলিকনকে কাজে লাগানো হয়েছে। সাবানের জল নাড়লে ফেনা হয়। কাগজ, রং এবং মদ প্রভৃতি তৈরির কাজে অনেক সময় হঠাৎ ফেনা ওঠে পাত্র ভরিয়ে দিয়ে কাজের অসুবিধা করে। প্রতি হাজার ভাগ তরল পদার্থে ৩ ভাগ সিলিকন থাকলে ফেনা ওঠা বন্ধ হবে। সিলিকন রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-জল সহ্য করবার ক্ষমতা রাখে; কাজেই মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন রং করবার কাজে এবং আসবাবপত্রের পালিশে এর ব্যবহার করা হয়। তাতে সহজে রং বা পালিশ নষ্ট বা নিষ্প্রভ হয় না।

বালুকণা থেকে তৈরি এসব পদার্থ এত রকম ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগছে যে, মনে হবে এসব জিনিষ খুব সস্তা এবং সহজলভ্য। কিন্তু তা মোটেই নয়। এদের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু আশা করা যায় যে, খুব সহজ উপায়ে এগুলি তৈরি করা সম্ভব হলে এদের মহার্ঘতাও কমে যাবে এবং আরো অনেক শিল্পে এদের ব্যবহার অনিবার্য হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা

শ্রীসুপ্রিয়মোহন সেনগুপ্ত

আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রচার ক্রমশই বেড়ে চলেছে—তবুও এদেশে বিজ্ঞানের ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। আমাদের দেশের যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র পাঠ্যজীবনে বিজ্ঞান চর্চা করেন, তাদের মধ্যে একান্ত নগণ্য সংখ্যক ছাত্রের মধ্যেই বিজ্ঞানানুশীলনে প্রকৃতির রহস্য-ভেদের ইচ্ছা জেগে ওঠে। আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হতে পারে না, এ প্রশ্নের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নিবিড়ভাবে জড়িত। শিক্ষাবিদেরা অনেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটি ও তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে দেশের ছাত্রদেরও এ সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটি প্রথমেই চোখে পড়ে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ত্রুটি হচ্ছে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি এ দেশের ছাত্রদের সম্মুখে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্যে শৈশবই সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বলে বিবেচিত হয়। অন্যান্য অনেক দেশেই আজ তাই বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যে শিশুদের সামনে, আমাদের দেশের মত বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বলিত একটি পাঠ্য পুস্তক তুলে ধরা হয় না। রহস্যে ভরা প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের মনের যে স্বাভাবিক কৌতূহল ও বিচারবুদ্ধি থেকে বিজ্ঞানের জন্ম, শিশুকাল থেকেই তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয় সে সব দেশে। এ ধরনের প্রচেষ্টা আমাদেব দেশে অত্যন্ত কম। তাই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞানের অনেক জটিল তথ্য আয়ত্ত করা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি (Fundamentals) সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয় না এবং প্রকৃতির রহস্যভেদের একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে না। নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্যে নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর যে প্রত্যয় থাকা প্রয়োজন, তারও অভাব বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত এ দেশের অনেক

ছাত্রের মধ্যেই দেখা যায়। ফলে এ দেশের ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহের উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশে প্রকৃত বিজ্ঞানসাধনা একেবারেই হয় নি, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। প্রতিকূল পরিবেশেও যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ দেশে হয়েছে, তাতে এ জাতির উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ ধরনের কাজ অত্যন্ত অল্পই হয়েছে এবং অনুকূল পরিবেশে আমাদের মনীষীদের সাধনা ও ছাত্রদের বিজ্ঞানপ্রীতি যে অনেক বেশী কার্যকরী হতে পারত, একথা অবশ্য স্বীকার্য।

প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি সম্ভবতঃ ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের সুযোগের অভাব। এ দেশের বিজ্ঞানের ছাত্রদের কলেজ-জীবনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন করবার জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করা থাকে, তাতে তালিকা-নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলি শেষ করা যায় বটে, কিন্তু বীক্ষণাগারের কলাকৌশল (Laboratory techniques) আয়ত্ত করা যায় না। ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তাদের কোনও প্রকৃত ধারণা হয় না। অথচ নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের জন্যে এ জ্ঞান অপরিহার্য।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে আজ যেভাবে ভাগ করে ফেলা হয়েছে, তাতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান গড়ে উঠছে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদেরও অনেক সময়েই ব্যবহারিক যন্ত্রবিদ্যা ও যন্ত্রশালার (machine shop) কাজকর্ম সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও থাকে না। এর ফলে ব্যবহৃত যন্ত্রে সামান্য গোলযোগেই এ সব ছাত্র নিরুপায় হয়ে পড়েন। ঠিক এই কারণেই স্বীয় গবেষণায় কোনও মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হলেও উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনে সে তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ করাও সম্ভব হয় না এ সব ছাত্রের।

বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার এ সব ত্রুটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থারই একটা অবশ্যম্ভাবী ফল বলে মনে করা যেতে পারে। আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার আগে বিজ্ঞান শিক্ষার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তাতে বোধহয় অনেক ক্ষেত্রেই এ সব ত্রুটি দেখা দিত না।

প্রাচীন কাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞান-সাধকেরা অনেকেই স্বয়ংশিক্ষিত (self taught) ছিলেন। এঁদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ব্যবস্থার মত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত করবার প্রথা প্রচলিত হয় নি। তাই সে যুগের বিজ্ঞানীরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চর্চা—প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি ও প্রক্রিয়া বা টেকনিকও উদ্ভাবন করেছেন। এই স্বয়ংশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের মনীষীদের থেকে আরম্ভ করে গ্যালিলিও, রবার্ট বয়েল ও নিউটন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

বিজ্ঞান শিক্ষার আর এক যুগে দেখি, বিজ্ঞান-প্রবণতাসম্পন্ন তরুণেরা ঈপ্সিত পথে পা বাড়িয়েছেন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে শিক্ষানবিশীর ভিতর দিয়ে। মাইকেল ফ্যারাডে থেকে আরম্ভ করে এ যুগের জে. বি. এস. হ্যালডেন পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানীই এ পথের পথিক। কিভাবে পরিচারকের কাজ নিয়ে একদিন ফ্যারাডে হামফ্রি ডেভির গবেষণাগারে প্রবেশ করেছিলেন, সে গল্প সুপরিচিত। পিতার গবেষণাগারে শিক্ষানবিশীর ভিতর দিয়েই হ্যালডেনের বৈজ্ঞানিক জীবনের সুরু। তাঁর নিজের কথায়—

'যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চেয়ে শিক্ষানবীশ হিসাবে আমার শিক্ষা শ্রেষ্ঠতর হয়েছিল।...

'...আট বছর বয়সে পিতার কাছে আমি বিজ্ঞানের অনেক তথ্যই শিক্ষা করি।... তারপর

বীক্ষণাগারের শিশি-বোতল পরিষ্কার করবার মত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার আমার উপর পড়ে।'

আজ অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক যুগের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষানবিশীর ভিতর দিয়েই বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্পূর্ণতর হতো। যাঁরা বিজ্ঞান মন্দিরের খিড়কীর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আস্তে আস্তে মৌলিক গবেষণা সুরু করেছেন, বীক্ষণাগারের খুঁটিনাটি কলাকৌশল থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলির সব কিছুরই যে সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাঁদের মনে, একথা সহজেই বোঝা যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে এঁরা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা হয়েছে অতুলনীয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার শিক্ষানবিশীর গুরুত্ব সম্বন্ধে তাই বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. ডি. বার্ণেল মন্তব্য করেছেন—

'...বর্তমানে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখাবার ব্যবস্থা থাকে। ...কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষাদির মধ্যেও প্রচলিত পথের বাইরে যাওয়া হয় না। সে সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি, সে সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিতও থাকে না এতে। এভাবে বিজ্ঞানের মত ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না।...

'যে পদ্ধতিতে অতীতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা শিক্ষালাভ করেছেন, তা অনেক বেশী কার্যকরী ছিল। শিক্ষানবিশীর সনাতন নিয়মে বিজ্ঞান শিক্ষার একমাত্র পথ ছিল অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ ও সাহায্য করা। বীক্ষণাগারের পরিবেশে নিজ মনে কোনও সমস্যা সমাধানের যে ইচ্ছা জাগতো (তা অত্যন্ত অযোগ্য হলেও) এবং সে ইচ্ছা থেকে জন্ম নিত যে শিক্ষা—বর্তমানের সর্বোচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি থেকে লব্ধ শিক্ষার চেয়ে সে শিক্ষাই শ্রেষ্ঠতর ছিল।'

বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানবিশীর প্রয়োজনীয়তা কমে এসেছে। এতে বিজ্ঞান শিক্ষা সুলভ ও সহজতর হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ পথে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা বাড়লেও প্রকৃত বিজ্ঞান-সাধকের সংখ্যা বাড়ছে কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পূর্বে বিজ্ঞানে বিশেষ আগ্রহান্বিত তরুণেরাই শিক্ষানবিশীর কঠিন পথে পা বাড়াতেন, কিন্তু এখন অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। আজ অনেক ছাত্রের সম্পর্কেই বিজ্ঞান চর্চা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক পাঠ বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন করাতেই পর্যবসিত হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে নির্দিষ্ট তালিকার বাইরে ছাত্রদের মৌলিক চিন্তা এবং গবেষণার প্রেরণা ও সুযোগ থাকে না, অধ্যাপক বার্ণেলের মন্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সম্ভবতঃ এ জন্যেই বর্তমান যুগের যে সব মনীষী ছাত্রজীবনের শৈশব থেকেই মৌলিক চিন্তা ও গবেষণায় উৎসুক ছিলেন, তাঁরা স্বীয় প্রতিভাকে বিকশিত করবার জন্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে এডিসন, পার্কিন, ওয়েষ্টিংহাউস, রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, হেনরীফোর্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট উদ্ভাবকদের নাম উল্লেখযোগ্য। এমন কি, বার্জেলিয়াস ও আইনষ্টাইনের মত প্রখ্যাত বিজ্ঞান সাধকদেরও বোধহয় এই পর্যায়ে ফেলা চলে।

প্রতিভা বিকাশের জন্যে এঁদের নানারকম পথ গ্রহণ করতে হয়েছে। এদের কেউ প্রাচীনকালের স্বয়ংশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ স্বয়ংশিক্ষিত হলেও আংশিকভাবে শিক্ষানবিশীর দ্বারাও প্রভাবান্বিত। আবার অনেক মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পথ অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে স্থাপিত নিজস্ব বীক্ষণাগারে গবেষণা করেছেন স্বীয় সন্ধানী মনের পরিতৃপ্তির জন্যে। শেষোক্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে উইলিয়াম পার্কিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আঠারো বছর বয়স্ক পার্কিনের নিজস্ব বীক্ষণাগারে গবেষণার ফলেই

কৃত্রিম রঙের আবিষ্কার হয়। জৈব রসায়নে ও সর্বসাধারণের জীবনে এ গবেষণার মূল্য যে যথেষ্ট সে আজ সকলেই জানেন।

উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ্যার পরীক্ষায় অকৃতকার্য বার্জেলিয়াসের নিতান্ত ক্ষুদ্র নিজস্ব গবেষণাগারেই আধুনিক রসায়নবিদ্যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

শিশুকাল থেকেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা উদ্ভাবনের কি বিরাট সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে—এডিসন, পার্কিন, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি উদ্ভাবকদের দৃষ্টান্ত আজ সে বিষয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের সচেতন করেছে। শিক্ষানবিশীর ভিতর দিয়ে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয় এবং বর্তমানে একমাত্র লণ্ডনের যুনিভারসিটি কলেজ ছাড়া ছাত্রজীবনে শিক্ষানবিশীর ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সম্ভবতঃ আর কোথাও নেই।

তাই আজ প্রগতিশীল দেশগুলির শিক্ষকেরা চান এক নতুন উপায়ে পাঠ্যতালিকার বাইরে ছাত্রদের মৌলিক চিন্তা ও গবেষণায় উৎসাহিত করতে। এর ফলে সে সব দেশে অনেক বিজ্ঞান শিক্ষালয়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে ছাত্রদের নিজস্ব গবেষণাগার, যেখানে তরুণ ছাত্রেরা নিজ নিজ শিক্ষার মান অনুযায়ী স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা করতে পারে। স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন করবার উৎসাহ থেকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে ছাত্রের একটা মনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি ছাত্রেরা নিজেদের উৎসাহেই আয়ত্ত করে। স্বাধীন গবেষণায় বীক্ষণাগারের কলাকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় এবং নিজের কর্মশক্তির উপরও একটা প্রত্যয় জন্মায় ছাত্রদের। মোট কথা এ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ছাত্রের প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়।

ছাত্রদের নিজস্ব গবেষণাগারযুক্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথমেই নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ব্রংক্স হাইস্কুল অব সায়েন্স-এর নাম করতে হয়। বিজ্ঞানে বিশেষ আসক্তিসম্পন্ন ছাত্রদের সেখানে অবসর সময়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা ও যন্ত্রোদ্ভাবনের সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যন্ত্রোদ্ভাবনে এখানকার ও ব্রুকলিন টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্রেরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছে। শেষোক্ত স্কুলের ছাত্রেরা নিজেরাই একটি বেতার-কেন্দ্র পরিচালনা করে থাকে।

নিউ ইয়র্কের ছোটদের জ্যোতির্বিদ্যা সভা ও ছাত্রদের বাৎসরিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে অল্পবয়স্ক ছাত্রদের অনেক মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পঠিত হয়। আমেরিকার অসংখ্য অ্যামেচার বা সখের বেতার ও জ্যোতিবিদ্যা চক্রের প্রতিষ্ঠায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, পাঠ্যতালিকার বাইরে বিজ্ঞান চর্চায় সে দেশের ছাত্রদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান।

আমেরিকা ছাড়া আরও অনেক দেশও এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে ছাত্রদের সংগঠিত গবেষণা চক্র আছে। 'তরুণ পদার্থবিদ্ চক্র', 'তরুণ রাসায়নিক চক্র' প্রভৃতি নামে এগুলি পরিচিত। এ-সব প্রতিষ্ঠানের সদস্য প্রত্যেক ছাত্রকে বছরে অন্ততঃ একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হয়।

রাশিয়ার কয়েকটি স্কুলের তরুণ ছাত্রেরা নিজেরাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযোগী উদ্যান (বটানিক্যাল গার্ডেন) গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে উদ্ভিদবিদ্যায় উচ্চ স্তরের জ্ঞান লাভ করেছে।

যে সব ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণ কার্যে অত্যন্ত উৎসাহী এবং স্কুলের 'তরুণ শিক্ষার্থী চক্র' যাদের পর্যাপ্ত শিক্ষা দিতে পারে না, তাদের জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক জেলায় 'জেলা টেক-নিক্যাল কেন্দ্র' আছে। সেখানে সাজসরঞ্জাম-

যুক্ত ঘরে তরুণ শিল্পীরা মনের আনন্দে কাজকর্ম করতে পারে।

যান্ত্রিক নির্মাণকার্যে উৎসাহী বৃটেনের ক্লাবগুলির বিপুল সংখ্যাই সে দেশের ছাত্রদের বিজ্ঞান-প্রীতির নিদর্শন। একমাত্র নকল বিমান বা মডেল প্লেন নির্মাণে উৎসাহী ক্লাবের সংখ্যাই আজ বৃটেনে প্রায় পাঁচ শ'।

প্রায় বছরখানেক আগে বৃটেনের অল্প বয়স্ক ছাত্রেরা আইসল্যাণ্ডে যে শিক্ষামূলক অভিযান করে, তাতে শুধু ছাত্রেরাই উপকৃত হয় নি, ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক নমুনা সংগ্রহের দ্বারা বৃটিশ মিউজিয়াম পর্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে। এ অভিযানে সমস্ত বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম অল্পবয়স্ক ছাত্রেরাই পরিচালনা করে।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলিত নিয়মে দোষক্রটি সমস্ত দেশেই আছে সত্য, কিন্তু অন্যান্য দেশে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের নিজস্ব এ ধরনের বিজ্ঞানচক্র তাদের বিজ্ঞান শিক্ষাকে সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা, আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক ছাত্রদের মৌলিক গবেষণা বা চিন্তায় উৎসাহিত ও সাহায্য করবার মত কোনও প্রতিষ্ঠানই নেই।

আমাদের দেশে ছাত্রজীবনে মৌলিক গবেষণা বা উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন—ছাত্রদের নিজস্ব বীক্ষণাগার বা যন্ত্রশালার অভাবে সময়ে সময়ে চিন্তাকে কার্যে পরিণত করা কি পরিমাণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাজ সম্পূর্ণ হলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিপুল সময় ও শক্তির অপচয় হয়। ক্রমাগত নৈরাশ্যের সংঘাতে মৌলিক চিন্তার ধারা ও ক্ষমতা হ্রাস পাওয়াও অসম্ভব নয়। হয়ত আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই এ ঘটনা ঘটে থাকে।

আজ এজন্যেই আমাদের দেশের ছাত্রদের নিজস্ব বীক্ষণাগার ও যন্ত্রশালার প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষক্রটিগুলি দূর করা বিশেষ সময়সাপেক্ষ। এ ধরনেব বিরাট পরিবর্তনের আশায় বসে না থেকে ছাত্রেরা নিজেরাই যদি নিজেদের জন্যে বিজ্ঞান চক্র (সায়েন্স ক্লাব) গড়ে তোলেন, তবে তাঁদের বিজ্ঞান শিক্ষাই যে সম্পূর্ণতর হবে তাই নয়, সমগ্র দেশ ও জাতি তাঁদের বিজ্ঞান সাধনা থেকে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করে উপকৃত হবে, এ কথা জোর করেই বলা যায়।

পাকস্থলীর ক্ষত বা আলসার

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

পাকস্থলী ও ডিউডেনামের অন্তরাস্তরণের ক্ষয় হইয়া আলসার বা ক্ষত সৃষ্টি হয়। কাহারও এইরূপ আলসার হইয়াছে শুনিলে আমরা আতঙ্কিত হই; কারণ আলসার খুব কষ্টদায়ক ও প্রাণঘাতী ব্যাধি এবং উহার চিকিৎসাও বিশেষ ব্যয়সাধ্য।

আলসার প্রথমাবস্থায় আধ সেন্টিমিটার হইতে এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত এক বা একাধিক ক্ষতরূপে প্রকাশ পায়। প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যেই নিরাময় হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতগুলি বিস্তৃত ও গভীর হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ বা তদপেক্ষাও অধিক স্থান পর্যন্ত ক্ষত ছড়াইয়া পড়িতে পারে। ধমনীর আবরণ ক্ষয়ের ফলেই আলসারের রোগীর রক্ত-ক্ষরণ হয়। ক্ষত গভীর হইলে পাকস্থলী অথবা ডিউডেনামের আবরণ ফুটা হইয়া যাইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় থাকে না। উদরাভ্যন্তর উন্মুক্ত করিয়া ছিদ্রস্থান সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। দীর্ঘস্থায়ী আলসারের রোগীর চিকিৎসা ফলপ্রসূ না হইলেও অস্ত্রোপচার করিয়া আলসারের স্থান কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। ঐরূপ সম্ভব না হইলে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রকে একসঙ্গে জুড়িয়া একটা সরাসরি পথ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে পাকস্থলীর পদার্থ দীর্ঘ সময় পাকস্থলীতে জমা হইয়া থাকিতে পারে না; কাজেই পাকস্থলীতে অম্লের পরিমাণ হ্রাস পায়।

আলসার যে সর্বক্ষেত্রেই খুব কষ্টদায়ক বা প্রাণঘাতী হয় তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, আলসার থাকাতেও বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না। বৎসরে দুই-একবার যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং সেই সময় কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলে অথবা ক্ষারযুক্ত ঔষধ সেবন করিলেই যন্ত্রণার উপশম হয়। অনেক ক্ষেত্রে আলসার থাকিলেও উহার অস্তিত্ব একেবারেই অনুভূত হয় না। কোনরূপ যন্ত্রণা অথবা অজীর্ণতা কোন সময়েই প্রকাশ পায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কোন সময়ে আভ্যন্ত-রীণ রক্তক্ষরণ প্রকাশ পাইলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরীক্ষা অথবা একস্-রে'র সাহায্যে আলসারের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। অনেক সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, ২০।২৫ বৎসর পূর্বে কখনও হয়ত দুই-একবার পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়াছে, তার পরে আর কখনও কোনরূপ যন্ত্রণা বা অজীর্ণতা প্রকাশ পায় নাই। দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ কোন কারণে একস্-রে করিবার ফলে ধরা পড়িয়াছে যে, এক সময় তাহার আলসার ছিল এবং পরে তাহা আপনাআপনিই সারিয়া গিয়াছে। এইরূপ বহুক্ষেত্রে আলসার বিশেষ কষ্টদায়ক হয় না এবং বিনা চিকিৎ-সায় আপনাআপনিই সারিয়া যায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলসার বিশেষ কষ্টদায়ক না হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা খুবই সাংঘাতিকভাবে প্রকাশ পায়। সে সব ক্ষেত্রে রোগী সর্বদা পেটের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করে, তাহার হজম করিবার শক্তি লোপ পায়, রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত হয়। দেখা গিয়াছে, আলসার আবার স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যেই বেশী হয়। স্ত্রীলোকের মধ্যে খুব গুরুতর অবস্থার রোগী খুব কমই দেখা যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পেটে এইরূপ ক্ষত সৃষ্টি হয় কিরূপে। তার উত্তরে শুধু এই বলা চলে যে, পাকস্থলী যখন নিজেকে হজম করিতে সুরু

করে তখনই আলসারের সৃষ্টি হয়। পাকস্থলীতে যে হজমী রস সৃষ্টি হয় তাহার দ্বারা ভোজ্য বস্তু পরিপাক হয়, কিন্তু সেই রস যখন পাকস্থলীর অন্তরাস্তরণের কোন স্থান জীর্ণ করে তখনই ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঠিক কি অবস্থায় এইরূপ ঘটে তাহার যথাযথ উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই।

ডিউডেনামে ক্ষত থাকিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে অম্লাধিক্য থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া এই অম্লাধিক্যতাকে ক্ষত উৎপত্তির একমাত্র কারণ হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে না। কারণ পাকস্থলীতে যাহাদের ক্ষত আছে তাহাদের এই অম্লের পরিমাণ সাধারণের অপেক্ষাও কম থাকে। আবার অনেক লোকের পাকস্থলীতে অম্লের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিগুণ থাকা সত্বেও পেটে ক্ষত হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, খাওয়ার পরে পাকস্থলীতে অম্লক্ষরণ একরূপ না হওয়া সত্বেও পেটে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছে। পাকস্থলীর অম্লরসের সঙ্গে ক্ষত উৎপত্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিরূপণে বাধা থাকিলেও অধিকাংশ চিকিৎসকই মনে করেন যে, পাকস্থলীতে কয়েক সপ্তাহ অম্লোৎপাদন বন্ধ রাখিতে পারিলে বেশীর ভাগ আলসারের রোগীকেই নিরাময় করা যাইতে পারে। মোটের উপর আলসার সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা যাহাই হউক না কেন, সেই অবস্থাধীন সকল লোকেরই আলসার হয় না, কোন কোন লোকেরই হয়।

ব্যক্তিবিশেষের অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্রোধ, আক্রোশ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কায়িক এবং মানসিক গ্লানিকে অনেকে আলসার উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। এইরূপ কায়িক ও মানসিক গ্লানি আলসারের রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাদিগকে আলসার উৎপত্তির কারণ স্বরূপ প্রমাণ করিবার উপায় নাই। গুরুতর কায়িক ও মানসিক গ্লানি বহন করিয়া জীবনপাত করিতেছে, এমন লোকের অভাব নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আলসারের রোগী খুব অল্পই মিলিবে। অনেক রুক্ষ স্বভাবের লোক দেখা যায়—তাহাদের মেজাজ সর্বদাই খুব উগ্রভাব ধারণ করিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেককে হাপানি, অর্শ, বর্ধিত রক্ত-চাপ, গুরুতর মাথাধরা, অম্লশূল প্রভৃতি রোগের কোন না কোনটি আশ্রয় করিয়াছে দেখা যাইবে, কিন্তু আলসারে আক্রান্ত কমই পাওয়া যাইবে।

বিশেষ কোন দৈহিক বা মানসিক অবস্থার সঙ্গে আলসার উৎপত্তির কারণকে সর্বোতোভাবে যুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। এই সমস্যা নিরসন-কল্পে অনেকে আলসার উৎপত্তির কারণকে বংশানুক্রমিক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে আলসারের 'জিন'-এর অধিকারী হইলেই তবে তাহার আলসার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

আলসার উৎপত্তির এই বংশানুক্রমিক মতবাদ বর্তমানে অনেকেই সমর্থন করেন। আমেরিকার আলসার রোগের একজন বড় বিশেষজ্ঞ ডাঃ ওয়ালটার এইরূপ অনেক আলসার রোগগ্রস্ত পরিবারের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি পরিবারের স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আলসার ছিল। তাহাদের দুই পুত্র ১০।১২ বৎসর বয়সের হইলেই আলসার রোগে আক্রান্ত হয়। অপর একটি পরিবারে দুই ভাই ও এক বোন পর পর আলসারে আক্রান্ত হয়। পরে জানা যায়, উহাদের পিতা এবং পিতৃব্যও আলসারের রোগী ছিল। ডাঃ অ্যানড্রু নামে যমজ সম্বন্ধে একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ অনেক-গুলি এক অণ্ডজ যমজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ যমজগুলির মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, যমজের একজনের আলসার হইলে অপরটিও কালে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। একমাত্র বংশানুক্রমিক রোগ হইলেই প্রতিক্ষেত্রে এইরূপ হওয়া সম্ভব।

দেখা গিয়াছে, অনেকের প্রকৃতিতে আবার

আলসার গঠনের দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে। অনেকের হাসপাতাল হইতে একটি আলসার অপারেশনের পরে বাহির হইতে না হইতেই আবার নূতন আলসারের সৃষ্টি হয়। এইসব ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, ঐ জাতীয় লোকের অনেকেই— হয় অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ না, হয় অতিশয় উগ্রপ্রকৃতি বিশিষ্ট। তাহাদের মনে কোন গুরুতর দুঃখ, আনন্দ বা বিরক্তিকর ভাবের উদয় হইলেই নূতন আলসারের সৃষ্টি হইতে পারে অথবা আলসারের যন্ত্রণা খুব বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ডাঃ ওয়ালটার এইরূপ কয়েকজন আলসারের রোগীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একজন ইঞ্জিনীয়ারের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, যতবার তাঁহার কোন নূতন আবিষ্কারের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে ততবারই আলসারের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়া তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। অপর একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তি, স্ত্রীর বক্ষদেশে ক্যানসার হওয়ার খবর পাইয়াই আলসার রোগে আক্রান্ত হয়। তাহাকে অপারেশন করা হইলে আরোগ্য লাভ করে বটে, কিন্তু ছয় মাস পরেই স্ত্রীর রোগবৃদ্ধির খবরে পুনরায় আলসারে আক্রান্ত হয়। সেবারেও অপারেশন হয়, কিন্তু কয়েক মাস পরে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিলে পুনরায় তাহার গুরুতর আলসার হয়। ঐ বার অপারেশনের পরে আবার যখন সে স্ত্রীর বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে মামলায় জড়িত হইয়া পরে তখন আবার অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আলসার প্রকাশ পায়। আর একটি ভাবপ্রবণ ব্যক্তির সম্বন্ধে ডাঃ ওয়ালটার বলিয়াছেন যে, সে তাহার প্রণয়িনীর প্রত্যাখানে প্রথমবার আলসারে আক্রান্ত হয়; পরে তাহার দ্বিতীয় আক্রমণ হয় ভাবীপত্নী যখন অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মতি দান করে এবং খুব জাকজমকে বিবাহ হয়। স্নায়বিক উত্তেজনাই তাহার এই দ্বিতীয় আক্রমণের কারণ। ১৯০৭ সালে পড়তি বাজারে দেউলিয়া হইয়া সে তৃতীয় বার আলসারে আক্রান্ত হয়। এইরূপে ১৯২৯ সালে পুনরায় দেউলিয়া হওয়ার ফলে তাহার চতুর্থবার আক্রমণ ঘটে।

ডাঃ ওয়ালটার একই ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ এইরূপ আলসারে আক্রান্ত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এইসব ব্যক্তির ঘুমন্ত অবস্থায়ও মস্তিষ্ক সজাগ থাকে এবং মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকার ফলে পাকস্থলীতে বার্তা প্রেরিত হইতে থাকে। এইরূপ বার্তা প্রেরণের ফলে গ্রন্থিসমূহ রাত্রিতে বিশ্রাম পায় না এবং অবিরত পাকস্থলীতে হজমী রস নিঃসৃত হইতে থাকে। একদিকে পাকস্থলীতে এইরূপ হজমী রস জমিতে থাকে, অপরদিকে রাত্রিতে পাকস্থলী খালি থাকায় হজমী রসের যথোপযুক্ত ব্যবহার না হওয়ায় তাহা পাকস্থলীর অন্তরাস্তরণকে হজম করিবার সুযোগ পায়।

এই মতবাদের প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁহার কয়েকটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, আলসারের রোগী রাত্রে সুস্থিরভাবে নিদ্রা যাইতে পারে না। কেহ ঘুমের ঘোরে হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, কাহারও বা দন্ত-ঘর্ষণের শব্দ পাওয়া যায়, আবার কেহ কেহ ঘুমের ঘোরে নানারকম কথা বলিয়া থাকে। এই সব কারণে আলসার রোগীর সঙ্গে একঘরে নিদ্রা যাওয়া কষ্টকর। আলসারের রোগীরা অনেক সময় অনুভব করিতে পারে যে, তাহাদের মস্তিষ্ক রাত্রিতে আংশিকভাবে সক্রিয় থাকে।

আলসার রোগবিশিষ্ট কতিপয় ভ্রাম্যমান দালাল সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি একটি বর্ণনা দিয়াছেন। ঐ সব ব্যক্তিরা তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছে যে, ভোরে নিদ্রাত্যাগের পরেই তাহাদের মনে হয় যেন সমস্ত দিনের কর্মসূচী তাহাদের জন্য নির্ধারিত হইয়া আছে এবং ইহা তাহাদের কাছে এত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যেন উর্ধ্বতন কর্মচারীর টাইপ করা নির্দেশ পত্র তাহারা পড়িয়াছে।

তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, যদি

কয়েকটি সুস্থ লোক এবং আলসার বিশিষ্ট রোগীকে রবারের সরু নল পেটে প্রবেশ করাইয়া রাখা হয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় পাকস্থলী হইতে রস শোষণ করিয়া বাহির করা হয় তবে দেখা যাইবে, আলসারের রোগীদের পাকস্থলী-নিঃসৃত রসের পরিমাণ অনেক বেশী হইবে এবং ঐ রসে অম্লের পরিমাণও অনেক বেশী থাকিবে।

ডাঃ ওয়ালটারের মতে রাত্রি দশটা হইতে দুইটা পর্যন্ত সময়ই আলসারের রোগীদের পক্ষে খুব খারাপ সময়। ঐ সময়ে কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলে হজমী রস জমিয়া তাহাদের পাকস্থলী অথবা ডিউডেনামের অন্তরাস্তরণ জীর্ণ হইবার অথবা কোন প্রদাহ সৃষ্টির ভয় থাকে না। হজমী রস ভোজ্য-বস্তু হজম করিতেই নিঃশেষিত হইবে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমেও অনেক সময় আলসার হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ। আমেরিকায় বসন্ত ঋতুতে কৃষকদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। চাষীদের মধ্যে ঐ সময়ই আলসার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। আয়কর ও হিসাব বিভাগের কর্মচারীদের মার্চ মাসেই খুব গুরু পরিশ্রম করিতে হয়। দেখা গিয়াছে যে, ঐ সময়ই তাহাদের মধ্যে আলসার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ডাঃ ওয়ালটারের মতে আলসারের রোগীর পরিশ্রম লাঘব করিয়া তাহার অর্থস্বাচ্ছল্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিনা চিকিৎসাতেই অধিকাংশ রোগীকে নিরাময় করা যাইতে পারে। তিনি এসম্বন্ধে উদাহরণ স্বরূপ একটি রোগীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে দেউলিয়া হওয়ার ফলে তাহার গুরুতর আলসার হয়। কোন ঔষধ বা বিশেষ খাদ্য ব্যবস্থায়ও তাহার রোগের কোনরূপ উপশম সম্ভব হইল না। অনেক দিন এইভাবে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরে হঠাৎ সে একদিন খবর পায় যে, তাহার পিতৃব্য দশ হাজার ডলার তাহার জন্য রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এই খবর পাওয়ার একরূপ সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রোগ নিরাময় হইয়া যায়।

ডাঃ ওয়ালটারের মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীকে তাহার অনভিপ্রেত পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা কর্মস্থল হইতে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই তাহাকে ব্যাধি হইতে মুক্তিদান সম্ভব হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে একটি ব্যবসায়ী দম্পতির উদাহরণ দিয়াছেন। ১৯২৯ সালের পড়তি বাজারে উভয়েই বেকার হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই আলসার রোগে আক্রান্ত হয়। তাহারা তাহাদের একটি শিশু সন্তানসহ একটি ছোট ঘরে থাকিত এবং উভয়ে উভয়কে বিবাহ বিচ্ছেদের ভয় দেখাইয়া সর্বদা ঝগড়া করিত। কিন্তু শিশুর প্রতি উভয়েরই অত্যধিক অনুরক্তির ফলে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। ফলে নিয়ত অভাব ও অসন্তুষ্টির মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহারা ব্যাধি হইতেও মুক্তি পায় নাই।

পূর্বে সার্জনরা আলসার রোগীমাত্রেরই অপারেশনের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু পরে তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পান যে, একবার অপারেশনের পরে একই রোগী গুরুতর আলসার নিয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হয় এবং অপারেশনের ফলে নবগঠিত আলসার উত্তরোত্তর আরও অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। কাজেই বর্তমানে সার্জনরা আলসারমাত্রেই অপারেশন করেন না। বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে রোগীর প্রাণ-সংশয় থাকিতে পারে, যেমন—অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, পাকস্থলীতে ছিদ্র হইয়া যাওয়া অথবা পাকস্থলীতে অবরোধ সৃষ্টি করা ইত্যাদি ক্ষেত্রেই অপারেশন হইয়া থাকে। অবশ্য একবার আলসার অপারেশন করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে পুনঃ পুনঃ আলসার সৃষ্টি হইয়া থাকে এরূপ নয়। তবে অনেকের এরূপ হয়ত দেখা গিয়াছে এবং অপারেশনের পরে পুনরায় আক্রান্ত হইলে তাহা বেশ গুরুতর রকমেরই হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়ালটারের মতে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আলসার অপারেশন করা উচিত নয়। সাধারণ ক্ষেত্রে খাদ্য-ব্যবস্থা ও চিকিৎসার উপরই নির্ভর করিয়া থাকা উচিত।

প্ল্যাষ্টিকের কথা

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্ল্যাষ্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এমনভাবে দখল করে বসেছে যে, এর সঙ্গে পরিচয় না করে উপায় নেই। দাঁত মাজবার টুথ-ব্রাশ, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, মাথা আচড়াবার চিরুণী, চায়ের জন্যে কাপ, ডিস, চামচ থেকে আরম্ভ করে পড়তে বসে পেন্সিল কাটার কল, স্কেল ইত্যাদি এবং ইলেকট্রিক বাতির সুইচ ইত্যাদি, রেডিও ক্যাবিনেট, বাসের জানালার অভঙ্গুর কাচ, ছোটদের খেলনা দ্রব্য, জামা ঝোলাবার হ্যাঙ্গার প্রভৃতি খুটিনাটি যাবতীয় দ্রব্যই আজকাল প্ল্যাষ্টিকের তৈরি।

প্ল্যাষ্টিকের জিনিষ হালকা অথচ শক্ত, যেমনি টেকসই তেমনি আবার অপেক্ষাকৃত সস্তা। যে কোন জটিল আকারের দ্রব্য এ থেকে তৈরি করা সহজেই সম্ভব। জলের সংস্পর্শে অধিকাংশ প্ল্যাষ্টিকই নিজের আকৃতি অটুট রাখতে সক্ষম। যে সব প্ল্যাষ্টিক জলের মত স্বচ্ছ ও নির্মল, তাতে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করলে বস্তুটি নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে। এসব কারণেই প্ল্যাষ্টিক এত জনপ্রিয় হয়েছে।

বাইরের প্রভাবে, যেমন—তাপ বা চাপ উভয়ই প্রয়োগ করে যে সকল পদার্থকে ইচ্ছামত আকার দান করা যায় অথচ বাইরের প্রভাবটি অপসারণ করা সত্ত্বেও নতুন আকারটি অটুট থাকে সেই সব পদার্থকে প্ল্যাষ্টিক বলে; যেমন—মাটির দ্রব্যাদি, কাচ, ইস্পাত, কংক্রিট, রাবার ইত্যাদি। ইস্পাত উপযুক্ত তাপে গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে বা অন্য কোন বাইরের প্রভাবে (যেমন—রোলিং, প্রেসিং ইত্যাদি) নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা যায় এবং তাপ বা বাইরের প্রভাবটি সরিয়ে নিলে, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও নতুন আকারটি অপরিবর্তিত থাকে। এদিক থেকে দেখলেই কাচ, মাটি, কংক্রিট, রাবার ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। সাধারণতঃ যে প্ল্যাষ্টিকের সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলো কাচ, মাটি বা কংক্রিট থেকে তৈরি নয়। এই সকল প্ল্যাষ্টিক জৈব পদার্থ থেকে তৈরি। সুতরাং যে সকল জৈব পদার্থকে বাইরের প্রভাবে (যেমন—তাপ বা চাপ অথবা উভয়ই প্রয়োগ করলে) যে কোন প্রকার আকার দান সম্ভব অথচ বাইরের প্রভাবটি সরিয়ে নিলেও সেই নতুন আকার অপরিবর্তিত থাকে তাদেরই প্ল্যাষ্টিক বলা হয় আজকাল।

রাসায়নিকের দৃষ্টিতে প্ল্যাষ্টিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এদের মূল উপাদান হচ্ছে রেজিন জাতীয় পদার্থ বিশেষ। প্ল্যাষ্টিক শিল্পের প্রধান কাজ এই রেজিনের সংশ্লেষণ (Synthesis) করা।

এই রেজিন ও অন্যান্য পদার্থসমূহ, যথা—ফিলার, লুব্রিক্যাণ্ট, প্ল্যাষ্টিসাইজার ও রঞ্জক দ্রব্যাদি একত্রে খুব মিহি করে গুঁড়ালে 'মোল্ডিং পাউডার' পাওয়া যায়। এই পাউডার যন্ত্র সহযোগে তাপ ও চাপ প্রয়োগে বিভিন্ন দ্রব্যের আকার ধারণ করে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে। বিবিধ গুণাবলী (যথা—তাপ প্রতিরোধ, বিদ্যুৎশক্তি প্রতিরোধ, জল নিরোধ ইত্যাদি) আরোপ করতে ফিলার ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এতে জিনিষের দামও কিছু সস্তা হয়। কাঠের গুঁড়া, সেলুলোজ মণ্ড, অভ্রের গুঁড়া, অ্যাস্‌বেস্‌টস্ চূর্ণ প্রভৃতি ফিলার সাধারণতঃ প্রচলিত। ছাঁচ থেকে যাতে প্ল্যাষ্টিকের বস্তুটি সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে সেজন্যে লুব্রিক্যাণ্টের প্রয়োজন। বিভিন্ন ধাতব ষ্টিয়ারেট এই কাজ সুচারুরূপে করে থাকে। ছাঁচে ফেলে

ঢালাইয়ের সুবিধার্থে রেজিনকে নমনীয় করবার জন্যে প্রায়ই একটি প্ল্যাষ্টিসাইজারের আবশ্যক হয়। বিবিধ জৈব পদার্থ, যেমন—ডাইবুটাইল থ্যালেট, ট্রাই-ক্রেসিল ফস্‌ফেট, কর্পূর ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। রঞ্জক দ্রব্যের উদ্দেশ্য, বস্তুটিকে মনোমত রঞ্জিত করা। বিবিধ অজৈব বর্ণযুক্ত পদার্থ প্রথম শ্রেণীর এবং আলকাতরাজাত বিভিন্ন শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

রেজিন এক প্রকার কঠিন জৈব পদার্থ। এদের অণুগুলি অনিয়মিত ইতস্ততঃ সাজানো, অর্থাৎ এই সজ্জার মধ্যে কোন বিশেষ ভঙ্গিমা অর্থাৎ প্যাটার্ণ নেই। এই সব অণুর চেহারা সচরাচর পরিচিত যে কোন জৈব পদার্থের অণুর চেয়ে বৃহদাকার। রসায়নের ভাষায় এদের নাম 'ম্যাক্রোমলিকিউল্'। বৃহৎ বলেই এরা খুব জটিল নয় বরং ক্ষুদ্র অথচ সরল একাধিক বহু অণুর সমবায়ে গঠিত। যেমন ইটকে কোন এক বিশেষ ভঙ্গিমায় সাজিয়ে গেলে বিরাট এক ইমারত গড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি কতকগুলি সরল ক্ষুদ্র অণুকে রাসায়নিক শক্তির বলে একত্রে জুড়ে দিলে এইরূপ একটি বৃহদায়তন অণুর সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ প্রক্রিয়াটিকে পলিমেরিজেশন্ বলে এবং যে অণুটি পাওয়া গেল তাকে বলা হয়—পলিমার। যেহেতু এই অণুগুলি বৃহৎ, তাই এদের বিশেষ করে হাই-পলিমার বলে। প্রকৃতিতে এইরূপ হাই-পলিমারের সন্ধান প্রচুর পাওয়া যায়। আমাদের পরিচিত সেলুলোজ হাই-পলিমার পরিবারের অন্তর্গত। বহু গ্লুকোজ অণুর সমবায়ে সেলুলোজের একটি অণু গঠিত। [যে কোন সূতী বস্ত্র দাঁত দিয়ে বহুক্ষণ চিবালে সেলুলোজ অণু লালা মধ্যস্থিত টায়ালিনের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে গ্লুকোজ বেরিয়ে আসে, তাই মিষ্ট স্বাদ অনুভব হয়।] রাবার আর একটি উল্লেখযোগ্য হাই-পলিমার। আইসোপ্রিন্ নামে একটি সরল অণুর সমবায়ে প্রাকৃতিক রাবার গঠিত।

রেজিন দুই শ্রেণীর। প্রথম প্রাকৃতিক, যথা—রজন, লাক্ষা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় সংশ্লেষিত। শেষোক্ত শ্রেণীর রেজিনই প্ল্যাষ্টিকের মূল উপাদান। প্ল্যাষ্টিকের যাবতীয় গুণাবলী মূলতঃ রেজিনের অন্তর্গত অণুর বিরাটত্বের উপর নির্ভর করে। এই সব অণুর বিভিন্ন সংস্থানের জন্যেই তাপ প্রয়োগে বিভিন্ন প্ল্যাষ্টিক বিভিন্ন আচরণ করে থাকে। যখন অণুগুলি লম্বালম্বিভাবে শৃঙ্খলের আকারে সংস্থিত থাকে, তাপ প্রয়োগে সেইরূপ রেজিনের তৈরি কোন বস্তুকে পুনরায় নমনীয় করে অন্য কোন নতুন রূপ দেওয়া যায় এবং যতবার ইচ্ছা তাপ প্রয়োগে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব। এই শ্রেণীর প্ল্যাষ্টিকের নাম থার্মো-প্ল্যাষ্টিক। অন্য পক্ষে, যখন অণুগুলি আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত হয়ে একটি ত্রৈমাত্রিক আকার ধারণ করে তখন তাপ প্রয়োগে এই শ্রেণীর প্ল্যাষ্টিকের কোন বস্তুর আকারে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এরূপ প্ল্যাষ্টিকের নাম—থার্মো-হার্ডেনিং বা থার্মো-সেটিং।

বিভিন্ন প্রকৃতির রেজিন দিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাষ্টিক তৈরি। যেমন, ধরা যাক বেকেলাইট। ফিনোল বা কার্বলিক অ্যাসিড ও ফরম্যালডিহাইড—এই দুটি রাসায়নিক পদার্থের পলিমেরিজেশনের ফলে যে রেজিন পাওয়া যায় তা থেকে এই বেকেলাইট তৈরি। এই রেজিনের আবিষ্কারক ডাঃ হেন্‌রী বেকল্যাণ্ডের নামানুসারে বেকেলাইট নাম হয়েছে। বেকেলাইট থার্মো-হার্ডেনিং শ্রেণীর অন্তর্গত।

সাধারণতঃ ফিনোল-ফরম্যালডিহাইডের পলিমার জাতীয় প্ল্যাষ্টিকে ইচ্ছানুযায়ী বর্ণ সমাবেশ করা সম্ভব নয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে, ইউরিয়া ও ফরম্যালডিহাইড পলিমেরাইজ করা হয়ে হয়ে থাকে; ফলে আর এক শ্রেণীর রেজিন পাওয়া যায়। ইহা খুবই স্বচ্ছ এবং ইহাতে বিচিত্র বর্ণ-সুষমা ফোটানো সম্ভব। তাছাড়া বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এলেও ইহা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় না। বাজারে ইহা নানা নামে পরিচিত;

যেমন—বিট্‌ল, প্ল্যাস্কন্‌ ইত্যাদি। ইহারাও থার্মো-হার্ডেনিং শ্রেণীর।

সেলুলোজ ও নাইট্রিক এবং সালফিউরিক এই ছুটি যুক্ত অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করলে সেলুলোজ নাইট্রেট নামে একটি রেজিন পাওয়া যায়। এই রেজিনকে কর্পূর দিয়ে প্ল্যাষ্টি-সাইজ করলে আমাদের অতি পরিচিত সেললুয়েড প্ল্যাষ্টিক পাওয়া যায়। প্ল্যাষ্টিসাইজ অর্থাৎ নমনীয় করা ভিন্নও কর্পূর সেলুলোজ নাইট্রেটের বিস্ফোরণ প্রবৃত্তি হরণ করে। সেলুলয়েডের তৈরি জিনিষে সহজেই আগুন ধরে যায়। সেজন্যে সেলু-লোজের রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে তা থেকে সুবিধামত অদাহ্য রেজিন তৈরির প্রচেষ্টা হয়েছে। এই সব প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ বাজারে সেলুলোজ অ্যাসিটেট, সেলুলোজ ইথার শ্রেণীর প্ল্যাষ্টিকের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। সেলুলোজ অ্যাসিটেট থেকে কৃত্রিম সিল্ক, অর্থাৎ রেয়ন তৈরি হয়েছে; তাছাড়া সিনেমা ও ফটোগ্রাফির ফিল্ম তো আছেই।

কাচের স্বচ্ছতা বজায় রেখে ও তার ভঙ্গুরতা দূর করে রাসায়নবিদেরা এক শ্রেণীর রেজিন আবি-ষ্কার করেছেন। ইহা মিথাই মিথাক্রালাইট নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমার। বাজারে ইহা পার্সপেক্স, প্ল্যাক্সিগ্লাস্‌ প্রভৃতি নামে পরিচিত। সরকারী বাসের জানালায় বা যেখানে সাধারণ কাচের দরকার, সেখানে এই শ্রেণীর প্ল্যাষ্টিকের আজকাল ব্যবহার হচ্ছে। আজকাল রিষ্টওয়াচের কাচের স্থান এই প্ল্যাষ্টিক দ্রুত অধিকার করে বসছে। সহজেই এই প্ল্যাষ্টিকের উপর আঁচড় কাটে; ইহাই একটি প্রধান ত্রুটি।

(নাইলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি টুথব্রাশ, মোজা ও অন্যান্য হোসিয়ারী দ্রব্য এবং শাড়ী ইত্যাদি ব্যবহারের ভিতর দিয়ে।) এডিপিক অ্যাসিড আর হেক্সামিথিলিন টেট্রামিন সংযোগে উৎপন্ন হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামোনিয়াম এডিপেট পলিমেরাইজ করলে নাইলন পাওয়া যায়। নাইলন আবিষ্কারক ডাঃ ক্যারোথার্স-এর গবেষণায় মুক্ত হস্তে অর্থনৈতিক উদারতা দেখিয়েছে আমেরিকার প্রসিদ্ধ রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডু পণ্ট কোম্পানী। নাইলন তন্তু খুবই শক্ত এবং ইহার টান-সহন শক্তি প্রাকৃতিক সিল্কের খুব নিকটবর্তী। সেলুলোজ অ্যাসিটেট কৃত্রিম সিল্ক বা রেয়ন নাইট্রোজেন বিবর্জিত, অথচ নাইলন সিল্কে প্রাকৃতিক সিল্কের ন্যায় নাইট্রোজেন বর্তমান। কাজেই নাইলন ও প্রাকৃতিক সিল্ক পুড়িয়ে গন্ধ শুকে পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই নাইলনকে প্রাকৃতিক সিল্কের পরিবর্তে নকল করে সহজেই বাজারে চালানো যায়। নাইলনের জল শোষণের আসক্তি খুবই কম এবং বিভিন্ন অ্যাসিড ও অ্যালকালির ক্ষয়ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা ভারী চমৎকার।

বাকী আর সব রেজিনের মধ্যে পলিষ্টাইরিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড (বাজারে যা ভিনিলাইট নামে চলতি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দুধের মধ্যে কেজিন নামে যে প্রোটিন আছে তার সঙ্গে ফরম্যালডিহাইড সংযোগ করে গঠিত পদার্থকে পলিমেরাইজ করলে এক প্রকার রেজিন পাওয়া যায়। বাজারে একে আমরা গ্যালালিথ বলে জানি। এই শব্দটির অর্থ 'দুধের-পাথর'। যেহেতু এই রেজিনের কেজিন অংশ দুধ থেকে পাওয়া যায় এবং এ থেকে যে প্ল্যাষ্টিক পাওয়া যায় তা পাথরের মত খুব শক্ত; তাই এই নাম। বিভিন্ন বর্ণের বোতাম তৈরিতে গ্যালালিথ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত যে সব রেজিনের কথা বলা হলো তাদের কোনটাই তেলে গলে না। কিন্তু কয়েক প্রকার রেজিনের প্রকৃতি রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তিত করার ফলে তারা সহজেই তেলে মিশে যায়। এই শ্রেণীর রেজিন ভার্নিশ শিল্পে খুবই মূল্যবান। এই প্রকার রেজিন থেকে যে ফিল্ম [ভার্ণিশ শুকালে যে পাতলা আস্তরণ পড়ে থাকে তার নাম ফিল্ম]

পাওয়া যায় তা খুবই শক্ত, ঘর্ষণেও চাকচিক্য বজায় রাখতে পারে এবং যার উপর ভার্ণিশ লাগান হয় সেখানে খুব শক্তভাবে এঁটে থাকে। গ্লিসারিন ও থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড পলিমেরাইজ করে যে গ্লিপটাল রেজিন পাওয়া যায়, তাকে উপযুক্ত ভার্নিশ তেলের সঙ্গে রাসায়নিক পরিবর্তন (Oil modification) সাধন করলে এই শ্রেণীর রেজিন পাওয়া যায়। জলের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে মাখনের টিনের ভিতরের গায়ে যে এনামেল লাগান হয়, সেই প্রকার এনামেলে এই জাতীয় রেজিনের বিশেষ প্রয়োজন।

আদিম জাতির বিবাহ-প্রথা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ব্যাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে যে সকল পূর্বসূরির নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন, উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু তাঁদের অন্যতম। এই ঋষিতনয়ের প্রসঙ্গে ব্যাৎস্যায়ন বলেন—'তদেব তু পঞ্চভিরধ্যায়-শতৈঃ শ্বেতকেতুরৌদ্দালকিঃ সঙ্ক্ষিপ।' অর্থাৎ—উদ্দালকতনয় ঋষি শ্বেতকেতু [নন্দী প্রণীত আদি] কামশাস্ত্রকে পাঁচ শত অধ্যায়ে সঙ্ক্ষেপিত করেন।

উপনিষদ ও মহাভারতে এই শ্বেতকেতুর চরিত-কথা লিপিবদ্ধ আছে। মহাভারতে স্ত্রীজাতির প্রসঙ্গে একস্থানে এই মর্মে লিখিত আছে যে, 'পূর্বে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অবরোধপ্রথা ছিল না। তারা নিজেদের খেয়ালখুশীতে স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত, স্বামীদের ছেড়ে তারা হতো উন্মার্গগামিনী, কোন অপকর্মের জন্যেই তারা অপরাধিনী বলে গণ্য হতো না, কেননা তা-ই ছিল প্রাচীন কালের রীতি।' কিন্তু উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতুর পক্ষে নারীজাতির এই স্বৈরাচার বরদাস্ত করা সম্ভব হলো না এবং তিনি এই নিয়ম প্রবর্তন করলেন যে, এখন থেকে স্ত্রীলোকেরা যেমন নিজ নিজ স্বামীর প্রতি, তেমনি পতিরাও নিজ নিজ স্ত্রীর পতি বিশ্বস্ত থাকবে।

চীনদেশের প্রাচীন ইতিহাসেও এরূপ লিখিত আছে যে, আদিতে অন্যান্য ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের জীবনযাপন-প্রণালীর কোন পার্থক্য ছিল না। তখন বনে-জঙ্গলে নরনারী ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত এবং স্ত্রীলোকেরা ছিল সাধারণ সম্পত্তি। ফলে ছেলেমেয়েরা তাদের মাকেই শুধু জানত, পিতৃপরিচয় থাকত তাদের নিকট অজ্ঞাত। সম্রাট ফাউ হি স্ত্রী-পুরুষের এই নির্বিচার যৌনসম্পর্ক রহিত করে দিয়ে বিবাহ প্রথার প্রবর্তন করেন।

পৃথিবীর বহু দেশেই মানুষ কল্পনা করে নিয়েছে যে, বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের মূলে রয়েছে কোন-না-কোন ব্যক্তিবিশেষ, রাজা বা দেবতার হাত। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত এই সমস্ত জনশ্রুতি, লৌকিক কাহিনী, প্রাচীন পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সমাজ-তাত্ত্বিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদিম মানব-সমাজে সকল পুরুষেরই সকল নারীর সঙ্গে অবাধ যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হতো, ব্যক্তিগত বিবাহ-প্রথার অস্তিত্ব তখন ছিল না এবং সন্তান-সন্ততিরা ছিল জাতি-গোষ্ঠীর (tribe) সাধারণ সম্পত্তি। জাতিতত্ত্ববিষয়ক তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে ডক্টর টাইলর, স্যার জন লাবক এবং হার্বার্ট স্পেন্সার আদিম সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে

আমাদের পরিচিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন সত্য, কিন্তু আদিম সমাজ এবং ঐতিহ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে এরূপ মতভেদ দেখা যায় যে, তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য কি না, সে সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়।

এডওয়ার্ড ওয়েষ্টারমার্ক বলেন—'কোন স্থানে কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে এখনো এক নারীর বহু পতি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তাই বলে কি এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে হবে যে. একদা সমগ্র মনুষ্য-সমাজে স্ত্রীলোক-মাত্রেই বহু পতি গ্রহণ করত? এটাই ছিল তখনকার দিনে সার্বজনীন বিবাহ-প্রথা? আসলে কিন্তু তা নয়। নৃবিদ্যা আলোচনা করলে দেখা

ওরাওঁ নবদম্পতী

কোন বন্য জাতির সমাজে কোন বিশেষ প্রথা বা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখে যদি এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, একদা সমগ্র মনুষ্য-সমাজে এ সকলের রেওয়াজ ছিল, তাহলে ভুল করা হবে।' যেমন ধরা যাক—বহুপতিত্ব প্রথা। ভারত-বর্ষের টোডাদের সমাজে এবং পৃথিবীর অন্যান্য যায়, বহুপতি প্রথা কেবল মাত্র সেই সকল সমাজেই প্রচলিত যেগুলিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত কম।

ওয়েষ্টারমার্ক তাঁর *The History of Human Marriage* নামক গ্রন্থে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত সমাজতত্ত্ববিদ-

দের সিদ্ধান্তের বিরোধী ; কিন্তু অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। উক্ত গ্রন্থের The Origin of Marriage নামক অধ্যায়ে জীববিদ্যা-সম্পর্কিত নানা তথ্যের আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, অনেক ইতর প্রাণীর মধ্যে বিবাহ-প্রথা বিদ্যমান। এক জাতীয় বানরদের মধ্যে এটা তো সাধারণ নিয়ম এবং মানবজাতির মধ্যে এটা সার্বজনীন। কি ইতর প্রাণীদের মধ্যে, কি আদিম মানব-সমাজে পিতৃকর্তৃত্বের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সন্তান-জন্মের পর তার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব মুখ্যতঃ মাতার। কিন্তু পিতা হচ্ছে পরিবারের রক্ষক ও অভিভাবক। এটা খুবই সম্ভব যে, কোন বানর-জাতীয় পূর্বপুরুষের নিকট থেকেই মানব-সমাজে বিবাহ-প্রথা অনুবর্তিত হয়েছে।* এমন কোন সময়ের কথা কল্পনা করা যায় না, যখন মনুষ্য-সমাজে বিবাহ-প্রথার অস্তিত্ব ছিল না।

আদিমতম মনুষ্য-সমাজে সন্তানের পিতৃপরিচয় বলে কিছু ছিল না, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেবলমাত্র যৌনসম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন বন্ধন ছিল না—এ সকল ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা বহু আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাসমূহ আলোচনা করলে উপলব্ধি হয়। পিতা-মাতা এবং সন্তানসন্ততি নিয়ে গঠিত পরিবার পৃথিবীর সর্বত্র মনুষ্য-সমাজে চিরকাল ধরে প্রচলিত।

জন্মের পর পক্ষীশাবকদের বেঁচে থাকবার জন্যে শুধু মাতার নয়, পিতার উপর কতটা নির্ভর করতে হয়, কোন কোন স্তন্যপায়ী ইতর প্রাণী জীবনধারণের জন্যে শৈশবে পিতার উপর কতটা নির্ভরশীল—এ সমস্ত বিষয় আলোচনা করে ওয়েষ্টারমার্ক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিবাহ শুধু মানুষের নয় অধিকাংশ পক্ষী এবং অনেক পশুসমাজেরও এটা চিরন্তন সংস্কার এবং এর আসল উদ্দেশ্য হলো সন্তানের কল্যাণ-সাধন। তিনি বলেন—'Marriage and family are thus intimately connected with each other ; it is for the benefit of the young that the male and the female continue to live together.'* অর্থাৎ—এমনিভাবে বিবাহ এবং পরিবার এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এবং স্ত্রী-পুরুষ যে একত্রে বাস করতে থাকে তা সন্তানদের কল্যাণের জন্যেই।

এমন অনেক আদিম জাতির লোক আছে একটি সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত যাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত দাম্পত্য-জীবনই আরম্ভ হয় না। কোন কোন জাতির মধ্যে আবার পরিণয়-বহির্ভূত যৌনমিলনের ফলে যদি সন্তানের জন্ম হয় তা হলে ঐ সন্তানের জনক ও জননী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য। ঈষ্টার্ণ গ্রীনল্যাণ্ডার এবং ফুযেজিয়ানদের সমাজে স্ত্রীলোক মাতা না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ বলে গণ্য হয় না। খায়েন, আইনো, ইয়েসো এবং চীনের একটি আদিম জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে তার সঙ্গে বাস করতে যায় এবং একটি সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত কখনো তাকে নিয়ে চলে আসে না। বিল'দের সমাজে বিবাহিতা কন্যা মাতা না হওয়া পর্যন্ত পিতামাতার সঙ্গে থাকতে বাধ্য এবং মাতৃত্বের অধিকারিণী না হলে সারাটা জীবনই তাকে কাটাতে হয় পিতৃগৃহে ; আর স্বামী তার জন্যে যে পরিমাণ টাকা খরচ করেছিল তা ফিরে পায়। দক্ষিণ ভারতের বাড়াগাদের মধ্যে প্রত্যেক বর-কনের দুটি বিবাহ-অনুষ্ঠান হয়। সন্তান-সম্ভাবনার

---

* Human marriage in all probability is an inheritance from some ape-like progenitor. *History of Human Marriage*—P. 538.

* *The History of Human Marriage* —P. 22

কোনরূপ লক্ষণ দেখা না যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় না এবং সন্তান-জন্ম না হলে প্রায়ই এদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে থাকে।

এমিন পাশা মধ্য আফ্রিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, সেখানকার কোন কোন সমাজে কোন কুমারীর যদি সন্তান-সম্ভাবনা হয় তা হলে যে যুবক এর জন্যে দায়ী সে তাকে বিয়ে করতে এবং মেয়েটির পিতাকে প্রথানুযায়ী কন্যাপণ দিতে বাধ্য। বোর্ণিওর বহু বন্য জাতির মধ্যে অবাধ যৌনসংসর্গের রেওয়াজ আছে। কিন্তু এই মিলনের ফলে যদি সন্তান-সম্ভাবনা হয় তা হলেই শুধু বিবাহ প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের টিপরা এবং ইউক্রেনের চাষীদের সমাজে যদি কোন পুরুষ কোন মেয়েকে ফুসলে নিয়ে যায়, আর তার ফলে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা হলে সে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য।

আদিম জাতিসমূহের পারিবারিক জীবনধারা সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সমাজেও পিতার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে পরিবারের পোষ্যদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করা। 'এনকাউণ্টার বে জাতির' মধ্যে সন্তানের প্রতি পিতৃকৃত্য এরূপ অপরিহার্য মনে করা হয় যে, সন্তানের জন্ম হওয়ার আগেই যদি পিতার মৃত্যু হয়, তা হলে সেই সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবার জন্যে কেউ থাকে না বলে মা তাকে মেরে ফেলে। মিঃ পাওয়ার্সের লেখা থেকে জানা যায়, ক্যালিফোর্ণিয়ার উইণ্টানে যার একটি শিশু সন্তান হয়েছে এমন স্ত্রীকে যদি কোন স্বামী পরিত্যাগ করে তা হলেই শিশুর কোন রক্ষক নেই বলে স্ত্রীলোকটির তাকে হত্যা করবার ন্যায্য (?) অধিকার আছে।

পুরুষ পরিবার প্রতিপালন করতে বাধ্য—এই সংস্কার বিবাহ এবং পিতৃত্বের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, কোন কোন আদিম জাতির সমাজে কখনো কখনো দেখা যায়, কোন স্ত্রীর স্বামী যদি তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে তা হলে তার পূর্বস্বামী সেই স্ত্রীলোকের এবং তার সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কতকটা প্রতিপালন করে থাকে। উত্তর-পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন আদিম জাতি এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা এবং কোলদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত। এমনও দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে যৌন-সম্পর্ক ছিন্ন হলে পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করে।

বহু আদিম জাতির সমাজে স্ত্রী বিধবা হলে তার এবং তার সন্তানসন্ততির ভরণপোষণের দায়িত্ব অংশে স্বামীর উত্তরাধিকারীদের উপর। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অসংখ্য আদিম জাতি এবং ভারতের গোন্দ প্রভৃতি বহু আদিবাসীর মধ্যে বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিধবা ভ্রাতৃবধূর পরিণীত হওয়ার যে প্রথা আছে তা—not only a privilege belonging to the man, but among several peoples even a duty.* অর্থাৎ—পুরুষের আয়ত্ত একটি সুবিধামাত্রই নয়, কোন কোন জাতির লোকের মধ্যে এটা একটা কর্তব্য বলেও গণ্য হয়।

পৃথিবীর কোন কোন অংশে আদিম জাতিদের সমাজে অবশ্য বিবাহের পূর্বে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবাধ যৌনসংসর্গ প্রচলিত আছে। এ থেকে অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে দুনিয়ার সর্বত্রই মনুষ্য-সমাজে দলগত (Communal) বিবাহের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেন না অসংখ্য বন্য এবং তথাকথিত অসভ্য জাতির সমাজে পরিণয়বহির্ভূত যৌন-সংসর্গ কদাচিৎ ঘটে থাকে এবং স্ত্রীলোকের

* *History of Human Marriage—P. 19.*

অসতীপনা অবমাননাকর এবং অপরাধ বলে গণ্য হয়।

(২)

এবার আমরা কতকগুলি আদিম জাতির বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিষয় বর্ণনা করব। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে, এদের মধ্যে কোথাও কোথাও বহুপত্নীত্ব বা বহুপতিত্ব প্রথা আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ আদিম সমাজেই এক-পত্নীগ্রহণ প্রথা প্রচলিত।*

আদিম জাতিদের পরিবারের দুটি রূপ ; (১) পিতৃপ্রধান পরিবার (Patriarchy) এবং (২) মাতৃপ্রধান পরিবার (Matriarchy)। পিতৃপ্রধান পরিবারের নিয়ম অনুসারে পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং পিতৃবংশের পরিচয়েই সে হয় পরিচিত। পিতৃপ্রধান পরিবারে পতিই গৃহের কর্তা। বিয়ের পর পত্নীকে চলে আসতে হয় পতিগৃহে।

মাদ্রাজের মালাবার জেলার কুরুম্বাস প্রভৃতি অনেক অনগ্রসর জাতি এবং আসামের গারো ও খাসিয়াদের মধ্যে আজও মাতৃপ্রাধান্য প্রথা প্রচলিত। কোচিন তথা ত্রিবাঙ্কুরের কোন কোন স্থানেও এর প্রচলন আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে পরিবারে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীরই প্রাধান্য। বিয়ের পর পত্নীকে শ্বশুরালয়ে যেতে হয় না, বরং পতিই শ্বশুরের গৃহে এসে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে থাকে। এই প্রথানুসারে সম্পত্তির উত্তরাধি-

মালাবারের কুরুম্বাস দম্পতী

* The vast majority being monogamous. *History of Human Marriage* —P. 547

কারিণী হয় কন্যা; সন্তান পরিচিত হয় মাতৃবংশের নামে।

আসামের খাসিয়াদের অন্যতম শাখা সিন্টিংদের মধ্যে মাতৃপ্রাধান্য প্রথার কড়াকড়ি অপেক্ষাকৃত অধিক। সেখানে স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাস করবার, এমন কি সেখানকার খাদ্য পানীয় পর্যন্ত গ্রহণ করবার অধিকার স্বামীর নেই। সন্ধ্যার পর স্বামীরা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই নিজ নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্তন করে।*

আদিম জাতিদের মধ্যে স্বগোত্র-বিবাহ এবং ভিন্নগোত্র-বিবাহ, এই উভয়বিধ বিবাহেরই রেওয়াজ আছে। টোডা প্রভৃতি কোন কোন আদিম জাতির লোকের তো স্বগোত্র-বিবাহকে পাপকার্য বলেই মনে করে। কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে নিজের মামাতো এবং পিসতুত বোনের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ—এটা তারা অপরাধ বলে মনে করে। সাঁওতাল, হো প্রভৃতি জাতির সমাজে যদি কেউ স্বগোত্রে বিবাহ করে তো তাকে জাতিচ্যুত করা হয়। পতির মৃত্যুর পর তার বিধবা সাধারণতঃ দেবরকে পতিত্বে বরণ করে। কিন্তু দেবর যদি বিবাহিত হয় তো দণ্ডস্বরূপ কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য দিয়ে সেই বিধবার অন্য পুরুষকে বিয়ে করবার অধিকার আছে। এই বিবাহ কিন্তু স্বগোত্রে হওয়াই সামাজিক অনুশাসন। বিধবাবিবাহের রেওয়াজ আমাদের দেশের প্রায় সব আদিম জাতির মধ্যেই আছে, তবে মাদ্রাজেই সব চেয়ে বেশী। কৌরব নামক আদিম জাতির লোকেরা তো কুমারী কন্যা অপেক্ষা বিধবাবিবাহ করাই অধিকতর পছন্দ করে।†

* The Khasis—by Major P. R. T. Gurdon

† কৌরবা লোগ তো কুমারী কন্যা কী অপেক্ষা বিধবা সে শাদী করনা অচ্ছা সমঝতে হৈঁ।—হামারি আদিম জাতিয়াঁ—শ্রীঅখিল বিনয়।

অধিকাংশ আদিম সমাজেই বিয়ের পূর্বে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যুবকেরা নিজেরাই অগ্রণী হয়ে নিজ নিজ জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করে আর বিধিমত এদের বিয়ে হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাপ বা মা নিজেরা পাত্র-পাত্রী দেখে তারপর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে। বিবাহ-ব্যাপারে কিন্তু মেয়ের সম্মতি থাকা আবশ্যক। বিয়ের প্রথম রাত্রিতে স্বামী যদি অবাঞ্ছিত বলে মনে হয় তা হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার অধিকার তামিলনাদের কোটা মেয়েদের আছে এবং সেজন্যে তাদের দশজনের নিকট নিন্দা বা ঘৃণার পাত্রী হতে হয় না। এদের সমাজে একপত্নী গ্রহণই হচ্ছে নিয়ম।*

এবার আমরা ভারতবর্ষের কয়েকটি পিতৃপ্রধান আদিম জাতির বিচিত্র বিবাহ-পদ্ধতির কথা বলছি।

ওরাওঁদের বিবাহ-ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের সমাজে বিবাহের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে এই যে, বর এবং কনের বিবাহিত ভগ্নীদের (যারা বিধবা হয় নাই এবং নিজ নিজ প্রথম স্বামীর সঙ্গে বাস করে) যথাক্রমে বর ও কনের কপালে হলুদ এবং তেল মাখিয়ে দিতে হয় এবং তাদের এমন আরো কতক-গুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয় যা বিবাহিত জীবনে দম্পতির সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করে বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কনের পিতা অথবা বড় ভাইকে গ্রামের কুয়া কিংবা উৎস থেকে বিবাহ-অনুষ্ঠানের জন্যে প্রয়োজনীয় জল নিয়ে আসতে হয়।

* Kota marriage is by consent of the girl who can reject the man after trial on the first night and have no odium attached to her thereby....Monogamy is the rule. *Reprot on the Aboriginal Tribes of Madras*—by Dr. A. Aiyappan, P 119.

ভোরে মোরগ ডেকে উঠবার প্রাক্কালে—সকালে কারুর দ্বারা স্পৃষ্ট হবার পূর্বে, এই জল আনা প্রয়োজন। কলসীর মুখ উপরের দিকে রেখে কলসীটি খাড়া ভাবে জলে ডুবিয়ে দিতে হয়। বিয়ের আসল কৃত্যাদি যখন কনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত-হতে থাকে তখন কনের আপন ভাই এবং খুড়তুত জ্যেঠতুত ভায়েরা এবং যখন বরের পিতৃগৃহে বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে থাকে তখন তার ভায়েরা বর-কনে, বরকর্তা, কন্যাকর্তা প্রভৃতিকে অপরিচিত লোক এবং অপদেবতার কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্যে তাদের চারদিক একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়। কনে যখন প্রথম পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে' স্বামীগৃহে যাত্রা করে, তখন কনের পিতা তার হাতে লোহা-বসানো একটি তীর প্রদান করে। বাপের গাঁয়ের অপদেবতারা যাতে তার পশ্চাদ্ধাবন না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কনে পিতৃপ্রদত্ত এই হাতিয়ারটি সঙ্গে করে নিয়ে যায়।*

* *The Oraons*—by Sarat Chandra Roy M B. p. 362, 363.

কণা ও তরঙ্গ

শ্রীসুহাসচন্দ্র মৌলিক

শক্তির একটা দৃশ্যরূপই হলো আলোক। আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য মতবাদ প্রচার করেন নিউটন। নিউটনের প্রবর্তিত মতবাদে বলা হয়েছে যে, আলোকরশ্মি হলো এক জাতীয় অতি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল কণার স্রোতধারা। উৎস থেকে এই সমস্ত উজ্জ্বল কণা বিপুল বেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পরে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আঘাত করে' আমাদের দৃষ্টির সঞ্চার করে। বিভিন্ন শ্রেণীর আলোক অনুভূতির পক্ষে বিভিন্ন প্রকার কণা রয়েছে। নিউটনের পূর্বেও দেকার্তে প্রভৃতি প্রাচীনেরা আলোকের বিভিন্ন সাধারণ প্রকৃতির (যেমন—ঋজুরেখ গতি, প্রতি-ফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি) সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নিউটনের প্রতিষ্ঠিত কণাবাদের সাহায্যে প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাই নিউটনের কণাবাদের ভিত্তিতে প্রথমে প্রতিষ্ঠা করা হলো আলোকের জ্যামিতিক তত্ত্ব। কিন্তু ক্রমে কতকগুলি পরীক্ষালব্ধ ব্যাপারের সঙ্গে কণাবাদের তত্ত্বগত অংশের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেল। নিউটনের হিসাব অনুযায়ী আলোকের গতি বিরলতর মাধ্যমে হবে কম, ঘনতর মাধ্যমে হবে বেশী। কিন্তু ফুকো পরীক্ষায় পেলেন ঠিক বিপরীত ফল। তাছাড়া লক্ষ্য করা গেল যে, স্বচ্ছ পদার্থের উপর আপতিত আলোক-রশ্মি একই সঙ্গে প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত হয়। কিন্তু উৎস থেকে বিক্ষিপ্ত অনুরূপ কণাশ্রেণী একই স্বচ্ছ পদার্থে হয় প্রতিফলিত হবে, নয় প্রতিসৃত হবে। এরপর ইয়ং-এর পরীক্ষায় জানা গেল যে, দুটা আলোক-রশ্মি কোন বিশেষ অবস্থায় কাটাকাটি করে' অন্ধকার ও উজ্জ্বলতর আলোর সৃষ্টি করতে পারে। আলোক বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে ব্যতিচার বা Interference। নিউটনের কণাবাদের সাহায্যে এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, দুটা আলোক-কণা কোন বিশেষ অবস্থায় কণাহীন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু শক্তি সংরক্ষণ নীতিতে এরূপ ব্যাখ্যার স্থান নেই। আবার ফ্রেণের পরীক্ষায় জানা গেল—পর্দায়

কোন বৃহৎ অনচ্ছ বস্তুর ছায়া স্পষ্টভাবে ধরা যায় বটে, কিন্তু বৃহৎ অনচ্ছ বস্তুর ক্ষেত্রে যদি চুলের মত সূক্ষ্ম কোন অনচ্ছ বস্তু ব্যবহার করা যায় তবে পর্দায় তার স্পষ্ট ছায়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় অন্ধকার—আলোকের এক বিশেষ সজ্জা। আলোক-বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে অতিসৃতি (diffraction)। আলোকের এই প্রকৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আলোকের গতিপথ সব-ক্ষেত্রেই ঋজুরেখ নয়, সূক্ষ্ম অনচ্ছ বস্তুর পাশ কাটানোর বেলায় আলোক যেন কিছু বাঁকা পথে চলে। নিউটনের কণাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আলোকের জ্যামিতিক তত্ত্বে অতিসৃতির কোন ব্যাখ্যা মিলে না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেবেডু, হাল্, নিকল্‌স্ প্রভৃতির পরীক্ষায় যখন জানা গেল যে, আলোকও চাপ দেয় তখন বিজ্ঞানীরা নিউটনের কণাবাদ বর্জন করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য নিউটন তাঁর কণাবাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে' উপরোক্ত ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে লক্ষ্য করা গেল—প্রতিক্ষেত্রেই কণাবাদের কিছু কিছু পরিবর্তনের ফলে এর নিজস্ব সত্তা বলে আর কিছু থাকে না, বরং ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

আলোক-বিজ্ঞানের এমন বিপদের দিনে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হলেন হিগিন্‌স্। তিনি বললেন, আলোক হলো বিশ্বব্যাপী একপ্রকার সূক্ষ্ম মাধ্যমে দোদুল্যমান একপ্রকার দৃশ্য শক্তি এবং এই সূক্ষ্ম মাধ্যম হলো ঈথর ; অর্থাৎ আলোক হলো ঈথর-কম্পন বা ঈথর-তরঙ্গ। বিভিন্ন শ্রেণীর আলোকের পক্ষে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্ক। অয়লার, হার্টলে, ইয়ং, ফ্রেণে প্রভৃতির প্রচেষ্টায় ক্রমে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অতিসৃতি, ব্যতিচার প্রভৃতি আলোক-প্রকৃতির সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল এবং প্রতিষ্ঠিত হলো আলোকের তরঙ্গ-তত্ত্ব। তরঙ্গবাদের আরও অভিনবত্ব এই যে, আলোকের নবাবিষ্কৃত কতকগুলি ধর্ম, যেমন—দ্বৈত পরিবর্তন (Double refraction), সমবর্তন (Polarization) প্রভৃতির যথাযথ ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল। তরঙ্গবাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন ম্যাক্সওয়েল। সম্পূর্ণ আঙ্কিক যুক্তির ভিত্তিতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, আলোক-তত্ত্ব হলো তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্বের একটি শাখা মাত্র এবং তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আলোকের তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্ব। হার্টজের তড়িৎ-চুম্বক বিষয়ক পরীক্ষায় এই তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্বের সত্যতা নিরূপিত হয়। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্বের সাহায্যে আলোকের উপরোক্ত সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃতিতে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। দেখা গেল, কতকগুলি ধাতুফলকের উপর আলোক-রশ্মি সম্পাতে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়। পরমাণু-বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়া। বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আপতিত রশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধিতে, কিন্তু তাদের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সাহায্যে। ম্যাক্সওয়েলের প্রবর্তিত আলোকের তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ-প্রকৃতি স্বীকার করে নিলে ব্যাপারটা হওয়া উচিত সম্পূর্ণ বিপরীত। আইনষ্টাইন এগিয়ে এলেন রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে এবং এই কাযে তিনি ব্যবহার করলেন প্লাঙ্কের যুগান্তকারী বিপ্লববাদী মতবাদ কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। কোয়াণ্টম তত্ত্বের মূল কথা হলো—শক্তি বিকিরণ ও শোষণের ব্যাপারে কোন একটানা ধারাবাহিকতা নেই। বিকিরণ ও শোষণ ঘটে গুচ্ছে গুচ্ছে, কণায় কণায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সূত্রটি হলো—

শক্তি = প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা × কম্পাঙ্ক.. (১)

আইনষ্টাইন ব্যাপারটা আরও এক ধাপ উপরে তোললেন। তিনি বললেন—শুধু শোষণ ও বিকিরণের ব্যাপারেই নয়, উৎস থেকে আলোক আমাদের

দৃষ্টিতে একটানা স্রোতের মত আসে না, আসে টুক্‌রা টুক্‌রা হিসাবে এবং প্রত্যেক 'টুক্‌রা' আলোকের শক্তি নিরূপিত হবে ১নং সূত্র দিয়ে। কম্পন-সংখ্যা যেখানে বেশী, আলোকের টুক্‌রাও সেখানে বড়; আবার কম্পন-সংখ্যা যেখানে কম, টুক্‌রাটাও সেখানে একটু ছোট। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এক এক টুক্‌রা আলোককে বলেছেন ফোটন বা জ্যোতিঃকণা। ফোটনের নির্দিষ্ট ভর ও ভরবেগ আছে; অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভর ও ভরবেগ গুণসম্পন্ন ফোটন বাস্তব সত্তার দাবী রাখে। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র থেকে আমরা জানি—

শক্তি = ভর × আলোকের গতির বর্গ...... (২)

সুতরাং ১নং ও ২নং সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে---

ভর × আলোকের গতির বর্গ = কম্পাঙ্ক × প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা

∴ ফোটনের ভর = $\frac{\text{কম্পাঙ্ক} \times \text{প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা}}{\text{আলোকের গতির বর্গ}}$ ...(৩)

লাল আলোকের কম্পাঙ্ক = ৪×১০^{১৪}, সুতরাং লাল আলোকের ফোটনের ভর = $(৪ \times ১০^{১৪}) \times (৭{\cdot}২৭ \times ১০^{-৪৮}) = ৩ \times ১০^{-৩৩}$ গ্র্যাম। রঞ্জেন রশ্মির কম্পাঙ্ক বেশী, তাই রঞ্জেন রশ্মির ফোটনের ভরও হবে বেশী। রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাপারে ফোটন সমগ্র শক্তি ইলেকট্রনে চালিত করে; ইলেকট্রন ফোটনের সমগ্র শক্তি আত্মসাৎ করে এবং বিচ্ছিন্ন হবার কালে আইনষ্টাইনের প্রতিষ্ঠিত রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়ার সূত্র অনুযায়ী কিছু শক্তি হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়; অর্থাৎ ফোটনের মৃত্যু হয় এবং ইলেকট্রনের জন্ম হয়। সুতরাং যুক্তির কোন গলদ নেই। আলোক ভরবেগ গুণসম্পন্ন কণার স্রোত—এরূপ কল্পনায় কম্পটন হিসাব করে দেখান যে, মুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘাতে ফোটনের শক্তি যাবে কমে; অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। আলোক বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে কম্পটন ক্রিয়া। উইলসনের মেঘকক্ষে কম্পটন ও সাইমন রঞ্জেন রশ্মির ভিতর ইলেকট্রন চালিয়ে ইলেকট্রন-ফোটন সংঘাতের ছবি তুলে এর সত্যতা প্রমাণিত করেন। এরপর রামন-এফেক্ট আবিষ্কারের পর আলোকের নব্য-কণা ধর্ম সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না; অর্থাৎ নব্য-কণাবাদের প্রতিষ্ঠায় নিউটনের কণাবাদ আবার নতুনভাবে নতুনরূপে জন্মলাভ করল। অবশ্য একথা ঠিক যে, নব্য-কণাবাদের ধারণা, নিউটনের কণাবাদের ধারণা অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। আলোক কণা-ধর্মী—এরূপ স্বীকার্যে রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়া, কম্পটন ক্রিয়া, রামন-এফেক্ট প্রভৃতির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আলোকের অতিস্থতি, ব্যতিচার, দ্বৈত পরিবর্তন, সমবর্তন প্রভৃতি থাকে ব্যাখ্যাহীন। আবার আলোকের তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ প্রকৃতির স্বীকার্যে অতিস্থতি, ব্যতিচার প্রভৃতির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও রশ্মি-তড়িৎ ক্রিয়া, কম্পটন ক্রিয়া প্রভৃতি থাকে ব্যাখ্যাহীন। তবে আলোকের প্রকৃত স্বরূপ কি?

ক্যাথোড রশ্মি আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা সাব্যস্ত করলেন যে, ইলেকট্রন সকল পদার্থের পক্ষেই সাধারণ কণা। প্রশ্ন উঠল—ইলেকট্রন কি? ক্রুক্‌স্ প্রশ্নোত্তরে বললেন যে, পদার্থের মাত্র তিনটি অবস্থার সঙ্গেই আমরা এতকাল পরিচিত ছিলাম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদার্থের একটি চতুর্থ অবস্থাও আছে। ইলেকট্রন হলো পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। জিঙ্ক্ সালফাইড ও কাচের গুঁড়া মিশিয়ে তৈরি করা ফলকের উপর ইলেকট্রনের সম্পাতে স্পষ্ট আলোর ফুলকি লক্ষ্য করা গেল। এই পরীক্ষায় সহজেই প্রমাণিত হয় যে, ইলেকট্রন অস্তিমরূপে কণা; অর্থাৎ ইলেকট্রন যেন শক্তিরূপী জড়কণা কিংবা জড়কণারূপী শক্তি। কিন্তু পদার্থ যে কেবলমাত্র ইলেকট্রনের মত ঋণ-বিদ্যুতায়িত জড়কণার সমষ্টি, এরূপ কল্পনা করা সম্ভব নয়; কেননা পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎহীন। এরূপ ধারণার বশবর্তী

হয়ে রাদারফোর্ড, ধন-বিদ্যুতান্বিত প্রোটনের কল্পনা করেন। ক্রমে রাদারফোর্ড, টমসন, বোর, সোমারফেল্ড প্রভৃতির প্রচেষ্টায় পরমাণুর একটা প্রণিধানযোগ্য মডেল গড়ে তোলা সম্ভব হলো। এই পরমাণু মডেল অনুসারে ধন-বিদ্যুতান্বিত প্রোটন সমবায়ে সৃষ্ট কেন্দ্রীনের চতুষ্পার্শ্বে ঋণবিদ্যুতান্বিত ইলেকট্রন বিভিন্ন বৃত্তাকার ও বৃত্তাভাসাকার কক্ষে অবিশ্রান্তভাবে ঘূর্ণায়মান থাকবে এবং অবস্থাবিশেষে ইলেকট্রন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যেতে পারবে। ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বে তড়িৎ-গতি নিয়মের সাহায্যে হিসাব করে দেখান যে, এই ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে স্বতঃই তেজ বিকিরণ ঘটে। কিন্তু পরমাণুর পক্ষে এরূপ তেজ বিকিরণ সম্ভব হলে পরমাণুর জীবনকাল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হওয়া উচিত। তাই বোর প্রভৃতির পরমাণুবাদে স্বীকার করে নেওয়া হলো যে, ইলেকট্রনের কক্ষান্তর গমন প্রক্রিয়ায় শক্তির শোষণ ও বিকিরণ ক্রিয়া চলবে যথাক্রমে এবং শোষণ ও বিকিরণ পর্ব নিয়ন্ত্রিত হবে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে। কিন্তু পরমাণু-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমাধানের ধাপে ধাপে ক্রমে নিউট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো, বিভিন্ন প্রকারের মেসন ও ভি-কণিকা প্রভৃতি মৌলিক কণার আত্মপ্রকাশ ঘটলো। অবশ্য পদার্থ সংগঠনে একই সঙ্গে সবগুলি কণার প্রয়োজন পরীক্ষায় স্বীকৃত হয় নি সত্য, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে পদার্থ যে বিভিন্ন বিদ্যুৎকণার সমষ্টিগত রূপ তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু পদার্থ সংগঠনকারী মূলকণা—ইলেকট্রন, প্রোটন প্রকৃতপক্ষে কণাধর্মী কিনা, সে সন্দেহ নিরসন করেন ফরাসী দেশের তরুণ বিজ্ঞানী প্রিন্স লুই ডি ব্রগলি।

প্রকৃতি দেবী সর্বক্ষেত্রেই স্বল্পতম শ্রমে তাঁর কাজ গুছিয়ে নিতে চান। দেখা গেছে, বিশ্বে কোন জড় বস্তু কোন একটি নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু 'ক' থেকে অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থির বিন্দু 'খ'-তে যাবার পথে সে 'ক' ও 'খ'-এর মাঝখানে সবচেয়ে সহজ পথটুকু বেছে নেয়। ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা অনুসারে 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে সব চাইতে সহজ পথ হলো 'কখ' সরল রেখা। সুতরাং 'ক' থেকে 'খ' তে যাবার কালে জড় বস্তু যাবে 'কখ' সরল রেখায়। প্রকৃতি দেবীর এই শ্রম বিমুখতার নীতিকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন—আলস্যের নীতি। এই নীতি আবিষ্কার করেন মপারটিউস। নিউটনের প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র বিজ্ঞানে এই নীতিই মেনে আসা হচ্ছিল বরাবর। কিন্তু দেখা গেল যে, পরমাণুর সূক্ষ্ম জগতে ইলেকট্রন তার ঘোরাফেরার ব্যাপারে ঠিক এ নীতি মেনে চলে না। ডি ব্রগলি প্রকাশ করলেন—তা মানবেও না যতদিন ইলেকট্রন আমাদের কাছে থাকবে কণারূপী। কিন্তু ইলেকট্রনকে কণা না বলে যদি আমরা বলি তরঙ্গ, তবে আর এমন অসঙ্গতি থাকবে না। আলোক-বিজ্ঞানেও ফারমেট আলস্য নীতির অনুরূপ নীতি লক্ষ্য করেছিলেন অনেক দিন পূর্বে। তরঙ্গরূপী আলোকের মত কণারূপী ইলেকট্রনও যে তরঙ্গ-রূপী হতে পারে, ডি ব্রগলির এরূপ কল্পনা পদার্থ-বিজ্ঞানে এই প্রথম। ডি ব্রগলির মতবাদকে শ্রোডিংগার আরও এক ধাপ উপরে তোললেন এবং প্রতিষ্ঠা করলেন তরঙ্গ-বলবিদ্যা। তিনি বললেন যে, ইলেকট্রন হলো এক দল তরঙ্গের সংযোগে সৃষ্ট তরঙ্গ আবর্ত এবং হিসাব করে জানালেন—ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যাকে ইলেকট্রনের ভরবেগ (ভর × বেগ) দিয়ে ভাগ দিলে। অর্থাৎ—

ইলেকট্রন-তরঙ্গ দৈর্ঘ্য =

$$\frac{\text{প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা}}{\text{ইলেকট্রনের ভর} \times \text{ইলেকট্রনের গতিবেগ}} \quad (৪)$$

৪নং সূত্র থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ইলেকট্রনের গতিবেগ যত বেশী হবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তত কম হবে। কিন্তু ইলেকট্রনের গতিবেগ নির্ভর করে তড়িৎ-

বিভবের উপর। ১০ ভোল্ট তড়িৎ-বিভবে সৃষ্ট ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১.৫ অ্যাংষ্ট্রম।

কিছুদিন পূর্বে লাওয়ে পরীক্ষা করে বলেছিলেন যে, রঞ্জেন রশ্মির সঙ্গে তুলনীয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মি পদার্থ-কেলাসের আভ্যন্তরীণ পরমাণু বিন্যাসের প্রভাবে অতিসৃতি-বৃত্তের (diffraction pattern) সৃষ্টি করতে পারে। আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরীর দু-জন কর্মী, ডাঃ ডেভিসন ও ডাঃ জারমার হাল্কা নিকেল ফলকের উপর দ্রুত গতিশীল ইলেকট্রন সম্পাতে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ইলেকট্রন-অতিসৃতি-বৃত্তের সন্ধান পান। এর কিছু পরে জি. পি. টমসন উন্নততর পরীক্ষা করেন। অদৃশ্যপ্রায় কেলাসিত স্বর্ণ-ফলক এবং সেকেণ্ডে ৫০,০০০ মাইল গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি তিনি পরীক্ষায় ব্যবহার করেন। দেখা গেল—ফটোগ্রাফির প্লেটে ধরা ইলেকট্রন-অতিসৃতি-বৃত্তের ছবি ও অনুরূপ পরীক্ষায় ডেবাই-সিয়েরারের পাওয়া রঞ্জেন রশ্মির অতিসৃতি-বৃত্তের ছবি একরূপ। ডেম্পষ্টার, রূফ্ প্রভৃতির পরীক্ষায় আরও জানা গেল—কেবল মাত্র ইলেকট্রনেই নয়, ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় দু-হাজার গুণ ভারী প্রোটনেও তরঙ্গ-ধর্ম বিদ্যমান; এমন কি, ইলেকট্রন-প্রোটনে গড়া পদার্থ অণু-পরমাণুতেও তরঙ্গ-ধর্ম বিদ্যমান। ইষ্টারম্যান, ষ্টার্ণ, কুনার প্রভৃতি মসৃণ ইস্পাত ও কাচের ফলকের উপর বেগবান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম অণুর সম্পাতে অণুরাজ্যে তরঙ্গ-বৃত্তির সন্ধান পান এবং এলেট, ওলসন প্রভৃতি খনিজ লবণের মসৃণ ফলকের উপর বেগবান পারদ, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক প্রভৃতির পরমাণু সম্পাতে পরমাণুরাজ্যে জড়-তরঙ্গের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন।

তাহলে জড় বলতে আমরা বুঝব—এক দল তরঙ্গের সংযোগে সৃষ্ট তরঙ্গ-আবর্ত। আবর্ত ভেঙ্গে যখন তরঙ্গগুলো কোন ঋজুরেখ পথে ছুটে চলে তখন তরঙ্গ-আবর্তরূপী জড়, তরঙ্গরূপী শক্তি রূপে প্রতিভাত হয়। এইভাবে তরঙ্গ-বলবিদ্যা আপেক্ষিক তত্ত্বের জড়-শক্তির একতা সূত্রের ব্যাখ্যা দিল। প্রশ্ন উঠল—জড় যদি তরঙ্গ-ধর্মী হবে তবে ছড়িয়ে পড়ে না কেন? কোটি কোটি বৎসরের পুরানো জীবাশ্মেও তো লক্ষ্য করা যায় না কোনরূপ বিকৃতি! প্রশ্নোত্তরে বলা হলো—তরঙ্গে ছড়িয়ে-পড়া ধর্ম নির্ভর করে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে তত কম। জড়-তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বেশী, তাই তার ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা থাকে লক্ষ্যের বাইরে; অর্থাৎ ইলেকট্রন-প্রোটনে গড়া জড় বিশ্বের তরঙ্গ সমুদ্রে যেন আমরা সবাই ডুবে আছি। শ্রোডিংগার আরও যুক্তি দেখালেন—বোরের পরমাণু তত্ত্ব অনুসারে—

ইলেকট্রনের ভর × ইলেকট্রনের গতিবেগ × ইলেকট্রনের কক্ষ দৈর্ঘ্য = পূর্ণ সংখ্যা × প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা ..... (৫)

সুতরাং, ইলেকট্রনের কক্ষ দৈর্ঘ্য =

$$\frac{\text{পূর্ণ সংখ্যা} \times \text{প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা}}{\text{ইলেকট্রনের ভর} \times \text{ইলেকট্রনের গতিবেগ}}$$

৪নং সূত্রের সত্যতা স্বীকার্যে

ইলেকট্রনের কক্ষ দৈর্ঘ্য = পূর্ণ সংখ্যা × ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ...(৬); অর্থাৎ প্রোটনের চতুষ্পার্শ্বে ইলেকট্রন যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে তা হলো ইলেকট্রন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পূর্ণ গুণিতক। তাই শ্রোডিংগার বললেন—মনে করা যাক, ইলেকট্রন বলে কিছু নেই। তাই বোর-কল্পিত পরমাণু-মডেলে প্রোটনের চতুষ্পার্শ্বে যেন ইলেকট্রন গতিশীল নয়, ঋণ বিদ্যুৎ ছড়িয়ে আছে; শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক সাম্য রক্ষার্থে ছড়িয়ে-থাকা বিদ্যুতের ঘনত্বে বাড়া-কমার ব্যাপার চলছে মাত্র। এই নতুন তরঙ্গ-বলবিদ্যার উপর নির্ভর করে পরমাণু-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যার আশ্চর্য রকম সমাধান পাওয়া গেল। তাছাড়া বোরের পরমাণু-মডেলের সাহায্যে যে সব সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না সেগুলিরও সমাধান হলো।

তাহলে জড় কণাও বটে, আবার তরঙ্গও বটে ; অর্থাৎ আলোক ও জড়ের জগতে বিজ্ঞানীরা একটা দ্বৈতভাবের সন্ধান পেলেন। কিন্তু একই বস্তুকে কেন্দ্র করে দুটি পরস্পর বিরোধী চিত্র কল্পনা করা মানব বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। অথচ আলোক ও ইলেকট্রনের উভয় রূপই পরীক্ষিত সত্য। তাই এই দ্বৈতরূপের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করা হয়েছে 'নয়া কোয়ান্টাম' তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। এই নয়া কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে—কণারূপ ও তরঙ্গরূপ পরস্পর বিরোধী নয় বরং পরস্পর অনুপূরক। এই বস্তু একই সময়ে কণা ও তরঙ্গ দুই-ই, কিন্তু বস্তুর কণা ও তরঙ্গরূপের অভিব্যক্তি নির্ভর করে পরীক্ষায় নিয়োজিত যন্ত্রের উপর। একই যন্ত্রের সাহায্যে কণা ও তরঙ্গের যুগ্মরূপ প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। কোন বিশেষ যন্ত্রে হয়ত বস্তুর তরঙ্গরূপ ধরা পরে, আবার কোন বিশেষ যন্ত্রে হয়ত কণারূপ ধরা পড়ে। তরঙ্গ ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিবদ্ধ রয়েছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কে এবং কণারূপের বৈশিষ্ট্য নিবদ্ধ রয়েছে ভর ও ভরবেগে ; প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যা (h) এদের মধ্যে সাধারণ। প্লাঙ্কের অব্যয় সংখ্যার মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রায় '০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০৬৬২৪।

প্রথমে ধারণা হয়েছিল—'নয়া কোয়ান্টাম তত্ত্ব' হয়ত পদার্থ-বিজ্ঞানের এই দুর্দিনে নতুন পথ দেখাবে। কিন্তু সে সম্ভাবনায় প্রচণ্ডতম আঘাত হানলো হাইসেনবার্গের 'অনির্দেশ্যবাদ' (Principle of uncertainty)।

তরঙ্গ ছুটে চলে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ছুটে চলে সংঘবদ্ধভাবে, তরঙ্গ-সংঘের আকারে। চলার পথে তরঙ্গ সংঘ ছড়িয়ে পড়বে যে অনুপাতে, তরঙ্গ-সংঘের আভ্যন্তরীণ কণার অবস্থানও বদলে যাবে তদনুপাতে। তাই তরঙ্গ-সংঘের নিজস্ব গতি ও তরঙ্গ-সংঘের আভ্যন্তরীণ কণার গতি হলো পৃথক। কিন্তু কণার গতি জানা যায় একমাত্র তরঙ্গের গতি থেকে। যদি তরঙ্গের সংখ্যা বেড়ে যায় তবে তরঙ্গ সংঘ ছড়িয়ে পড়বে কম। কিন্তু তরঙ্গ সংখ্যার বৃদ্ধিতে তরঙ্গ-সংঘের পরিব্যাপ্তি যাবে বেড়ে। সুতরাং তরঙ্গ সংঘের আভ্যন্তরীণ কণার অবস্থানও যাবে বদলে। আবার তরঙ্গ-সংখ্যা যদি কমে যায় তবে তরঙ্গ-সংঘের পরিব্যাপ্তি যাবে কমে এবং আভ্যন্তরীণ কণার অবস্থিতির নিশ্চয়তা যাবে বেড়ে ; কিন্তু তরঙ্গ-সংখ্যার হ্রাসে তরঙ্গ সংঘ ছড়িয়ে পড়বে বেশী। ফলে আভ্যন্তরীণ কণার অবস্থিতির অনিশ্চয়তা যাবে বেড়ে। সুতরাং একই সঙ্গে তরঙ্গ-সংঘের গতি ও কণার অবস্থিতি জানা সম্ভব নয়, অর্থাৎ একই সঙ্গে কণার গতি ও অবস্থিতি জানা অসম্ভব। অথচ কণার গতি ও স্থিতিতেই রয়েছে তার পূর্ণ পরিচয়। তাই কণার পূর্ণ পরিচয় থাকবে অজ্ঞাত।

আর সব কিছু বাদ দিলেও প্রশ্ন উঠে—ইলেকট্রন কোন মাধ্যমের কম্পন রূপ? আলোকের তরঙ্গরূপ পরিকল্পনায় ঈথর-মাধ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইলেকট্রন-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোক-রশ্মির পক্ষে গতির কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ইলেকট্রন-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ভর করে ইলেকট্রনের গতিবেগের উপর। দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রঞ্জেন রশ্মির সমতুল্য সত্য, কিন্তু পদার্থ ভেদকারী শক্তি রঞ্জেন রশ্মির তুলনায় কিছুই নয়। আলোক-তরঙ্গের মত তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন-তরঙ্গের গতিপথ ঋজুরেখ নয়। সুতরাং একই ঈথরকে আলোক-তরঙ্গ ও ইলেকট্রন-তরঙ্গের মাধ্যম রূপে কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাই ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ পরিকল্পনায় অন্য কোন দ্বিতীয় 'অতি ঈথরের' কল্পনার প্রয়োজন। প্রোটনের বৈদ্যুতিক অবস্থা আবার ইলেকট্রনের বিপরীত ; তাই প্রোটনের জন্যে চাই অন্য কোন তৃতীয় 'অতি

ঈথর'। কিন্তু এরূপ কল্পনা মোটেই আশাপ্রদ নয়, কেননা তাতে বিশ্বাকাশ বিভিন্ন ঈথরের ভীড়ে ক্রমশ কল্পনাতীত হয়ে ওঠে! অবশ্য ম্যাক্স বর্ণ প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেছেন যে, তরঙ্গ-বলবিদ্যার ইলেকট্রন-তরঙ্গের বাস্তব রূপ অস্বীকার করেও এদের সম্ভাব্য-তরঙ্গ বলেও ভাবা যায়। কেননা শ্রোডিংগারের তরঙ্গ সমীকরণকে ভাবা যায়, কোন স্থানে ইলেকট্রনের উপস্থিতির সম্ভাবনার নির্দেশক হিসাবে। কোন স্থানে ইলেকট্রন-তরঙ্গের তীব্রতা ঐ স্থানে ইলেকট্রনের উপস্থিতির সম্ভাবনার পরিমাপক। তাই ইলেকট্রন-অতিসৃতি বৃত্ত হচ্ছে যে সম্ভাবনায় ইলেকট্রন রশ্মি আপতিত হচ্ছে সে সম্ভাবনার পরিমাপের একটা ছাপ।

স্পষ্টই অনুভব করা যায় যে, বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান—জড় ও শক্তির কণা ও তরঙ্গরূপ প্রকাশের মধ্যে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য রয়েছে। আপেক্ষিক তত্ত্বে বলা হয়েছে যে জড় ও শক্তি হচ্ছে কোন 'আদিভূতের' দুটি ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। তাই বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে 'আদিভূত', মানুষের জ্ঞানের মাপ কাঠিতে তার পরিচয় অত্যন্ত অনিশ্চিত। চতুর্মাত্রিক দেশ ও কালের কাঠামোয় একটি মাত্র ইলেকট্রনের রূপ কল্পনা করা যায় স্পষ্টভাবে। কিন্তু একটিমাত্র ইলেকট্রনের কোন পরিচয় নেই; কেননা একটিমাত্র ইলেকট্রন বৈচিত্র্যহীন। বৈচিত্র্যহীন বিশ্বের অস্তিত্ব মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিতে অসম্ভব। কিন্তু দুটি ইলেকট্রনের সাক্ষাতে সৃষ্ট ঘটনা চতুর্মাত্রিক দেশ ও কালের কাঠামোয় সম্ভব নয়; তার জন্যে প্রয়োজন তরঙ্গ-বলবিদ্যার সাত মাত্রার বিশ্ব। কিন্তু সাত মাত্রার বিশ্বের কোন গাণিতিক রূপ থাকলেও তার বাস্তবরূপের প্রশ্ন অত্যন্ত অর্থহীন। তাই জড় কি বা শক্তি কি—এরূপ প্রশ্ন যেন বিজ্ঞানীর পক্ষে অবান্তর। বরং প্রশ্নটা যেন হওয়া উচিত ছিল—জড় কোথায় বা শক্তি কোথায়। বিজ্ঞানী নিল্‌স্ বোর বলেন—প্রকৃতির অন্তঃস্থলে ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে বহুমাত্রার বিশ্বে; তাই বৈজ্ঞানিক মাপ-জোক নেবার সর্বক্ষেত্রেই একটা স্বাভাবিক বিভ্রান্তির প্রকোপে একটা ভুলের গণ্ডী অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের এরূপ দুর্বলতার কারণ যেন মানুষের অক্ষমতা নয়—এ যেন প্রকৃতির অমোঘ বিধান! তাই বিশ্ব-বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের 'সীমাবদ্ধ অসীম' বিশ্বের বিচিত্র শালায় ঘটনা-কণিকার যে অনির্দেশ শোভাযাত্রা, মানুষের বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির সমক্ষে তাদের অভিব্যক্তির প্রকৃত রূপের কতটুকু আত্ম-প্রকাশ করবে, তা অনিশ্চিত। যেন বিশ্বরূপ ব্যক্তকারী ঘটনাবলী আপনার বৈচিত্র্য নিয়ে মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সমক্ষে বেঁচে থাকবে চিরকাল। তাই প্রকৃতির লীলা অনুধাবনে রত পদার্থ-বিজ্ঞানীর মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে—প্রকৃতি কি কোন দিন মানুষের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে?

খুদে বিমানের জনপ্রিয়তা

ইংল্যাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কাউন্টি রাটল্যাণ্ডের জনৈক কৃষক মিঃ জে. ডবলিউ. টমকিন্স্ প্রত্যহ চাষের কাজকর্ম তদারক করবার জন্যে একটি ছোট বিমান ব্যবহার করে থাকেন। বিমানখানির নাম 'মেসেঞ্জার'। এই বিমানে চড়ে তিনি তাঁর বোধ করেন সেখানে নেমে কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। এমন জায়গাতে তিনি নামেন, যেখানে সাধারণ যাত্রীবাহী বিমান চালকেরা মোটেই নামতে ভরসা পেতেন না। মিঃ টমকিন্স্ বলেন যে, মোটরে ঘুরতে তাঁর যে সময় লাগত এবং যে

দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্যে ইংল্যাণ্ডে ছোটখাটো এরোপ্লেন ব্যবহারের রেওয়াজ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আকাশ-ভ্রমণে উৎসাহী ইংল্যাণ্ডের পল্লী-অঞ্চলের জনৈক বর্ধিষ্ণু কৃষিজীবী ছোট্ট এরোপ্লেনে করে তাঁর ৮০০০ একর জমির কাজকর্ম পরিদর্শন করে থাকেন। ছবিতে তাঁর গোলাবাড়ীর সামনে ছোট্ট প্লেনটিকে দেখা যাচ্ছে

৮০০০ একর জমির কোথায় কি কাজ হচ্ছে, তা রোজ পরিদর্শন করে থাকেন। তাঁর গোলাবাড়ির পিছনেই বিমান ওঠানামার একটি জায়গা আছে। আবহাওয়ার অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, তিনি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাঁর খুদে বিমানটিতে চড়ে জমির ওপর ঘোরেন এবং যেখানে দরকার খরচ হতো বিমানে ঘুরে তার অর্ধেক সময়ে ও অনেক কম খরচে তাঁর কাজ হয়।

ডেভিড ব্রাউন নামে লণ্ডনের আর একজন ব্যবসায়ী নিজস্ব একটি ছোট ডি হ্যাভিল্যাণ্ড 'ডভ' প্লেনে চড়ে তাঁর কাজকর্ম তদারক করেন। লণ্ডন ও লণ্ডনের বাইরে তাঁর অনেকগুলি কারখানা আছে।

তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্যে ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত এই ছোট্ট প্লেনে করে কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে
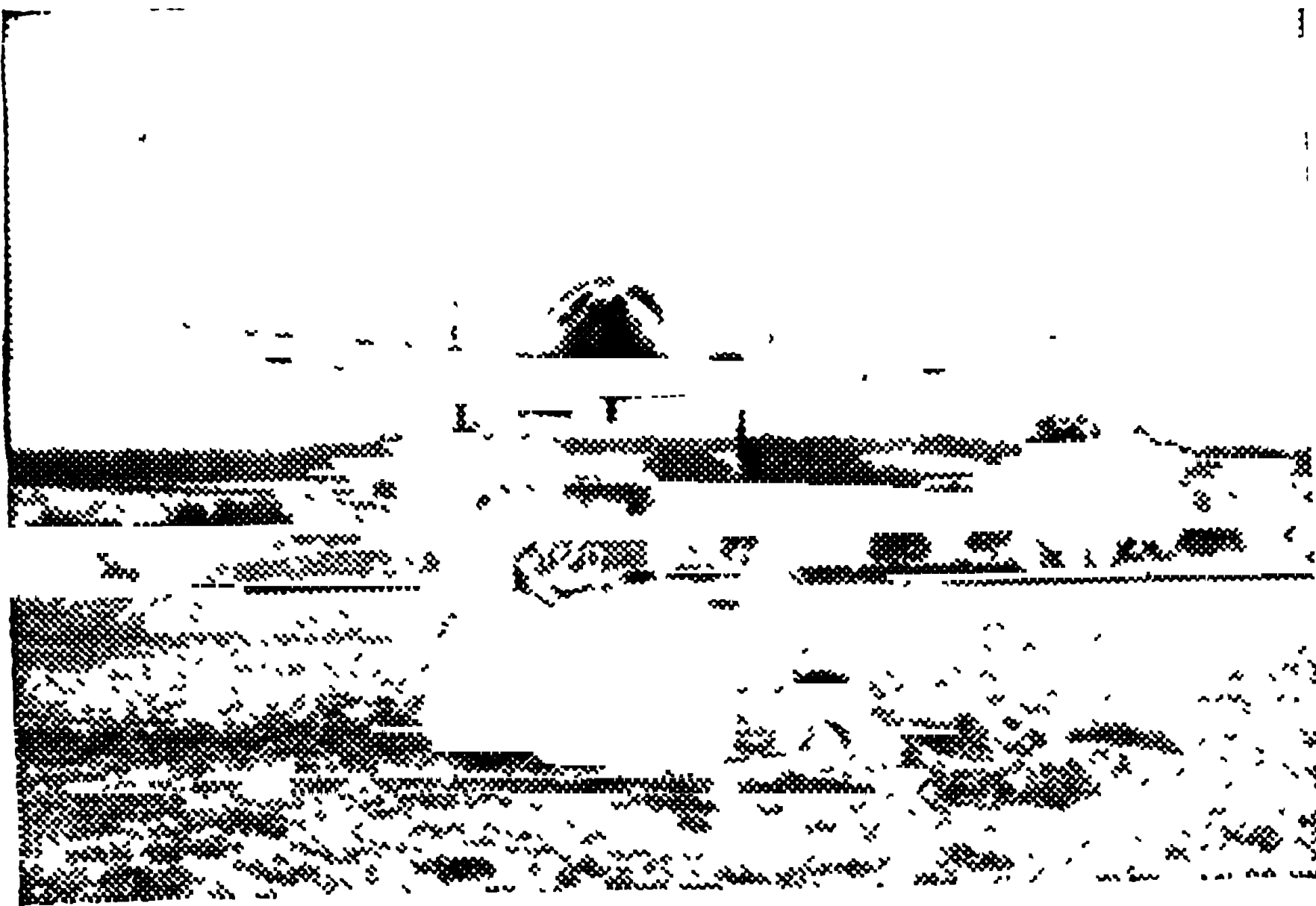
শস্য-সংগ্রহে বড় ট্র্যাক্টরের কাজকর্ম পরিদর্শনের পর এই কৃষিজীবী ভদ্রলোক প্লেনে করে কৃষিক্ষেত্রের অন্যত্র কার্য পরিদর্শনে চলেছেন

৪৭ বছর বয়স্ক মিঃ ব্রাউন তাঁর এই বিমানখানি নিয়ে কার্যোপলক্ষে নিয়মিতভাবে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ান।

ক্যাপ্টেন আর. ই. গিলম্যান বৃটিশ ইউরোপীয়ান এয়ারওয়েজের অধীনে বিমান চালনা শিক্ষা দেন। ইনি প্রতিদিন তাঁর ডেনহামের বাড়ী থেকে একখানি 'এভিয়ান' প্লেনে চড়ে তাঁর কর্মস্থল ক্র্যানফিল্ডে যাতায়াত করেন।

হার্লসডেনের মিঃ আইভর কেণ্ডাল তাঁর নিজস্ব 'অষ্টার' বিমানে চড়ে সপরিবারে প্রায়ই লণ্ডন থেকে সমুদ্রতীরে বেড়াতে যান। এই যাত্রায় তাঁর আধঘণ্টার বেশী সময় লাগে না।

মিঃ টমকিন্‌স্, মিঃ ব্রাউন, ক্যাপ্টেন গিলম্যান ও মিঃ কেণ্ডালের মত বৃটেনের আরও অনেকে ছোট বিমানে চড়ে কাজকর্ম বা ভ্রমণ উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মোটরে ভ্রমণের তুলনায় এতে সময় ও খরচ অনেক কম লাগে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

জীবাণুধ্বংসী শব্দ-তরঙ্গের দ্বারা জল ও দুগ্ধ পরিশোধন ব্যবস্থা

ইলিনয়েস জলসরবরাহ কেন্দ্রের মিস্ লিলিয়ান এ রাসেল, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, সরবরাহ কেন্দ্রের জল এবং দুগ্ধ পরিশোধনের জন্য শক্তিশালী শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শব্দ-তরঙ্গের যে সর্বোচ্চ কম্পন মনুষ্য কর্ণে অনুভূত হয় তাহা অপেক্ষা ৬০ গুণ অধিক কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন তরঙ্গের জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী ক্ষমতা কোয়ার্ট্‌সের কৃত্রিম কর্ণের সাহায্যে পরীক্ষা করা হইতেছে।

অতি দ্রুত কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ প্রয়োগে বহু প্রকার জীবাণু তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায় দেখা গিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সুবিধাজনকভাবে প্রয়োগ করিবার জন্য কত শক্তিশালী তরঙ্গের প্রয়োজন বা কত দ্রুত কম্পন কার্যকরী, উহা পূর্বে পরিমাপ করা হয় নাই। ব্যাপকভাবে এই শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করিতে হইলে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতে হইবে, ব্যবস্থাগুলিকে যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীন রাখিতে হইবে এবং কিরূপ গতিতে পরিশোধন কার্য চলিয়া থাকে তাহাও জানা প্রয়োজন হইবে।

মিস্ রাসেল বলেন, কোয়ার্টস্ ক্রিষ্ট্যালের একটি বিশেষ গুণের সহায়তায় অতি কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদিত হইয়া থাকে। দুই মুখ সমান্তরাল একখানি ফলক কোয়ার্টস্ হইতে বিশেষ কায়দায় কাটিয়া লওয়া হয়। ঐ ফলকের দুই মুখে চাপ পড়িলে ধনতড়িৎ এবং চাপ ছাড়িয়া দিলে ঋণতড়িৎ উৎপন্ন হয়। আবার বিপরীত পক্ষে, ঐ ফলকটিকে অতি কম্পনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে রাখিলে উহার দুই মুখ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কম্পন অনুযায়ী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। ক্রিষ্ট্যাল ফলকটির দ্রুত কম্পনই শব্দ-তরঙ্গ। কিন্তু শব্দ-তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১৬০০০-এর অধিক হইলে উহা আমরা শুনিতে পাই না।

ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটিতে সেকেণ্ডে দশলক্ষ কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করা হইতেছে। এইরূপ অতি কম্পমান অবস্থায় শব্দ-তরঙ্গ আলোক

তরঙ্গের কয়েকটি ধর্ম প্রাপ্ত হয়, যেমন—ঐ শব্দ তরঙ্গ সূক্ষ্ম রশ্মির আকারে কৃষ্ট্যালের দুই মুখ দিয়া লম্বভাবে সার্চ লাইটের ন্যায় প্রবাহিত হয় এবং আলোকরশ্মির মত লেন্স দ্বারা কেন্দ্রীভূত করা যায়। কিন্তু বায়ুতে প্রবাহিত করিলে উহা অল্পদূর গমন করিবার পর উহার অস্তিত্ব লোপ পায়। জলের নিম্নে ঐ শব্দ-তরঙ্গের ধর্ম অন্য রূপ। জলের নিম্নে ঐ তরঙ্গের গতিপথে আঙ্গুল ডুবাইলে প্রথম ভীষণ কম্পন অনুভূত হয় এবং পরে যখন আঙ্গুলের হাড়ের ভিতর দিয়া ঐ তরঙ্গ প্রবাহিত হয় তখন পুড়িয়া যাওয়ার মত যন্ত্রণা হইতে থাকে, অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে গুরুতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

ইলিনয়েসের যন্ত্রটিতে একটি এক ইঞ্চি গোলাকার এক্স-কাট কোয়র্ট্‌স্‌ কৃষ্ট্যাল ফলক খাড়াভাবে বসান আছে এবং বিশেষ ধরনের পাতলা রবার দ্বারা একটি জলাধারের সহিত সংযুক্ত আছে। জলের মধ্যে দিয়া শব্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়া পরে একটি রেড়ির তৈলপূর্ণ পাত্রে উহার শক্তি শোষণ করা হইয়া থাকে। এই ভাবে প্রবাহিত হওয়ায় জলাধারের যে কোন স্থানে শব্দ-তরঙ্গের পরিমাণ এবং জীবাণুর উপর উহার প্রভাব পরীক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে।

ইলিনয়েসের এই কর্ম প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য সরবরাহ কেন্দ্রের জল, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পদার্থের পরিশোধন করা। ব্যাপকভাবে অতি কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্বে উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন; যথা—তরল পদার্থ স্থির অথবা প্রবাহিত অবস্থায় থাকিলে সেই তরল পদার্থের পরিমাণ, জীবাণু সংখ্যা এবং আবহাওয়ার তাপ ও চাপের পরিমাণ অনুযায়ী শব্দ তরঙ্গের শক্তির পরিমাণ, উহার স্থিতিকাল এবং কম্পনের হার কিরূপ প্রয়োগে কার্যকরী হইতে পারে—এই সমস্ত বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি যন্ত্রপাতি নির্মাণের কার্য চলিতেছে।

২৫ মিনিটকাল হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ থাকার পরেও পুনর্জীবন লাভ

আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অস্ত্রোপচারের সময় এক ব্যক্তির হৃদ্‌যন্ত্র ২৫ মিনিটকাল বন্ধ থাকিবার পরেও তাহাকে বাঁচান সম্ভব হইয়াছে।

বোষ্টনের সিটি হাসপাতালের ডাঃ কার্টার যখন একটি লোকের বক্ষস্থলে অস্ত্রোপচার করিতেছিলেন তখন লোকটির হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হইয়া যায় এবং সমস্ত শরীর নীলবর্ণ ধারণ করে। এই অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের মর্দন ও তন্মধ্যে উত্তেজক ঔষধ ইন্‌জেক্‌সন করিয়া এবং কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করিয়া লোকটিকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, মর্দনের সময় হৃদ্‌যন্ত্রের প্রধান ধমনীর কতকাংশ বন্ধ করিয়া মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌যন্ত্রে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল। উক্ত ধমনী আংশিকভাবে অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে রক্ত শরীরের নিম্নদেশে চালিত হইতে পারে নাই এবং মস্তিষ্কের দিকে বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। যে সব ক্ষেত্রে এইরূপ হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয় সেস্থলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে, নচেৎ কোনক্রমে বাঁচিতে সক্ষম হইলেও মস্তিষ্ক বিকল হইয়া যায়।

মর্দন কালে মিনিটে ৫০।৬০ বার হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্কোচন সাধন করা বিশেষ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ঐরূপ করিতে সার্জন ও তাঁহার প্রধান সহকারীকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর হাত বদল করিতে হইয়াছে। রোগী সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হইয়া ১১দিন পরেই হাসপাতাল ত্যাগ করিয়াছে। পরবর্তী পরীক্ষায় তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপ সুস্থ আছে দেখা গিয়াছে।

ডাঃ কার্টারের মতে যে সব ক্ষেত্রে এইরূপ হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয় সেস্থলে হৃদ্‌যন্ত্র মর্দনের সময় ধমনীকে আংশিকভাবে বন্ধ করিয়া লওয়া অবশ্য কর্তব্য।

ঘণ্টায় ২০০ মাইল গতিবিশিষ্ট ট্রেন

জার্মেনীর রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারগণ এক নূতন ধরনের নমুনা ট্রেন নির্মাণের কার্য প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছেন। কৃতকার্য হইলে ইহা ট্রেন ভ্রমণে যুগান্তর আনয়ন করিবে। কোলোনের নিকট বিশেষ ধরনের লৌহবর্ত্মের উপর এই নমুনা ট্রেনটিকে চালান হইবে। কংক্রিটের থামের উপর একটি মাত্র রেল লাইন পাতিয়া এই বর্ত্মটি নির্মিত হইয়াছে। আশাকরা যায়, ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ২০০ মাইল হইবে।

ইঞ্জিনিয়ারগণ বলেন, নমুনা ট্রেনটি আশানুরূপ কার্যকরী হইলে আগামী বৎসর পূর্ণ আকারের ট্রেন লইয়া পরীক্ষা করা হইবে। ট্রেনটি ষ্ট্রীমলাইনিং ব্যবস্থায় নির্মিত এবং বিশেষ ধরনের চাকা সংযুক্ত। ইঞ্জিন ও গাড়িগুলি হাল্‌কা ধাতুর দ্বারা নির্মিত এবং একটি মাত্র রেলবর্ত্মের উপর উভয় পার্শ্বে বাহির হইয়া থাকে।

উদ্ভাবকেরা বলেন—ট্রেনটি এমন কায়দায় প্রস্তুত যে, উল্টাইয়া যাইবার কোনই ভয় নাই। সাধারণ ট্রেনের মতই ইহাতে যাত্রী ও মাল বহন করা চলিবে এবং এরোপ্লেনের গতিতে ধাবিত হইবে। নমুনা ট্রেনটি বিদ্যুৎচালিত, কিন্তু পূর্ণ আকারের ট্রেনটিকে জেট্ ইঞ্জিন দ্বারা চালান হইবে।

দেহের অভ্যন্তরের ফটোগ্রাফ

ইউ. এস. এয়ার ফোর্স স্কুল অব অ্যাভিয়েসন মেডিসিনের ক্যাপটেন হোয়াইট এক নূতন ধরনের ক্যামেরা উদ্ভাবন করিয়াছেন যাহা দ্বারা দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের, যেমন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলা প্রভৃতির ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব হইয়াছে।

বিভিন্ন দেহগহ্বর পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারেরা যে সব সাধারণ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন সেইগুলির সহিত এই ক্যামারাটিকে সংযুক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত নলের মত যন্ত্রের ভিতরে আলোক প্রবেশ করাইয়া ভিতরের অংশটিকে আলোকিত করা হয় এবং ক্যামেরার ক্ষুদ্র লেন্সের সাহায্যে সাধারণ সাদা, কালো, রঙ্গীন অথবা ইন্‌ফ্রা রেড ফটো তোলা যাইতে পারে।

এই ক্যামেরার সহিত আর একটি অতিরিক্ত লেন্স সংযুক্ত করিয়া ইহাকে চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। সাধারণ ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম ব্যবহার করিয়া সুবিধামত টাইম এক্সপোজার বা এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ এক্সপোজার দেওয়া যাইতে পারে।

আণবিক বিস্ফোরণে গৃহপালিত জন্তুর উপর ক্ষতির পরিমাণ

কোন আণবিক বিস্ফোরণের ফলে গৃহপালিত জন্তুর উপর দৃশ্যতঃ কোন ক্ষতির লক্ষণ, যেমন—ক্ষত বা অঙ্গবৈকল্য প্রকাশ না পাইলেও তাহাদের দেহাভ্যন্তরে গুরুতর ক্ষতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে—মেজর জেনারেল ম্লাইসার এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক দিন, এমন কি কয়েক সপ্তাহ পরে জানিতে পারা যাইবে, আমাদের মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহকারী জন্তুদের উপর কি পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

কয়েক দল কুকুর আণবিক বিস্ফোরণের এলাকায় রাখিয়া এক পরীক্ষায় এই বিষয় জানা গিয়াছে। কুকুরগুলি তেজস্ক্রিয় বিকিরণে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকিলেও তাহাদিগকে বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা বিস্ফোরণজনিত প্রচণ্ড উত্তাপ, ঝঞ্ঝা ও প্রক্ষিপ্ত ধাতব খণ্ড হইতে রক্ষা করা হইয়াছিল।

কুকুরগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত সাত প্রকার প্রধান পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছে—

১। লিম্ফ্যাটিক তন্তুগুলির তখন হইতেই ক্ষয় আরম্ভ হয় এবং ক্রমাগত ক্ষয়ের ফলে বৃদ্ধির অবনতি ঘটে। যে কুকুরগুলি কোন প্রকারে সারিয়া উঠে

তাহাদের ঐ তন্তুগুলি অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া স্ফীত হইয়া উঠে।

২। অস্থিমজ্জার মধ্যস্থিত রক্ত উৎপাদনকারী কোষগুলির তখন হইতেই ক্রমাগত কার্যকরী ক্ষমতার অবনতি হইতে থাকে।

৩। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের আস্তরণ প্রথমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু পরে ঐগুলি আবার সারিয়া উঠে।

৪। জননেন্দ্রিয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫। যে সমস্ত তন্তুতে সাধারণতঃ কোষ-বিভাজন অধিক সক্রিয় সেই স্থলে তৎক্ষণাৎ কোষ-বিভাজন বন্ধ হইয়া যায়।

৬। রক্তের লোহিত কণিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৭। ক্ষুদ্র শিরা ও সূক্ষ্ম উপশিরাগুলির ভিতরের আস্তরণ নষ্ট হইয়া যায়।

বর্ধিত রক্তের চাপ প্রশমিত করিবার নূতন ঔষধ

আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির জানালে ডাঃ উল্লে প্রমুখ রক্‌ফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটের রাসায়নিক-গণ বর্ধিত রক্তের চাপ দমনে সক্ষম, এইরূপ এক নূতন ঔষধ আবিষ্কারের সংবাদ দিয়াছেন। ঔষধের নাম 'অ্যালকিল নাইট্রো ইন্‌ডোল' দেওয়া হইয়াছে। এই ঔষধের বিষক্রিয়া একরূপ নাই বলিলেই চলে। ইন্‌জেক্‌সনের প্রয়োজন হয় না, সেবনেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত এই ঔষধ জন্তুর উপরেই পরীক্ষিত হইয়াছে। জন্তুর বর্ধিত রক্তের চাপ দমনে এই ঔষধের কৃতকার্যতা দেখিয়া তাঁহারা আশা করিতেছেন যে, মানুষের উপরও ইহা বিশেষ কার্যকরী হইবে।

বর্ধিত রক্ত-চাপবিশিষ্ট লোকের রক্ত ও মূত্রে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে। উহা সুস্থ জন্তুর দেহে ইন্‌জেক্‌সন করিলে তাহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়—এ তথ্য অনেকদিন হইতেই জানা ছিল। অতীতে লব্ধ এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান আবিষ্কারের পথ সূচিত হইয়াছে।

এইরূপ রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব জানা থাকিলেও পদার্থটির রাসায়নিক গঠন অপরিজ্ঞাত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে ডাঃ র‍্যাপোর্ট ও তাঁহার সহকর্মীগণ জমাট রক্ত হইতে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ বিযুক্ত করিতে সক্ষম হন যাহা দ্বারা রক্তাধারের সঙ্কোচন সম্পাদন করিয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি সম্ভব হয়। সাধারণ লোকের রক্তে এই পদার্থ থাকে না। এই পদার্থটি সেরোটোনিন্‌ নামে পরিচিত।

ডাঃ উল্লে ও তাহার সহকর্মীগণ সেরোটোনিন্‌ অথবা তজ্জাতীয় কোন রাসায়নিক পদার্থই যে রক্তের চাপ বৃদ্ধির জন্য দায়ী তাহা অনুমান করেন এবং সেরোটোনিনের রাসায়নিক গঠনের সামান্য পরি-বর্তন করিয়াই এই নবাবিষ্কৃত ঔষধ লাভ করিয়া-ছেন। এই নূতন ঔষধ রাসায়নিক গঠনের দিক হইতে সেরোটোনিনের সঙ্গে নিকট সম্পর্কিত হইলেও ইহা প্রয়োগে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় না। অপরন্তু ইহা সেরোটোনিন্‌ প্রয়োগে বর্ধিত রক্তের চাপ প্রশমিত করে। তাঁহারা বিশেষ-ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জন্তুকে এই ঔষধ খাওয়াইবার পরে সেরোটোনিন্‌ ইন্‌জেক্‌সন করিলে রক্তের চাপ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না।

ইহা প্রয়োগে সাধারণ অবস্থায় জন্তুর রক্তের চাপ কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। ইহার বিষক্রিয়াও একরূপ নাই বলিলেই চলে। এইসব কারণে ডাঃ উল্লে আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করা চলিবে এবং মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবে।

অঙ্গারাত্মকরণ জনিত শক্তি

সবুজ উদ্ভিদ প্রাণী-জগতের খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য কি কৌশলে সূর্যরশ্মির সাহায্যে

অঙ্গারাত্মকরণ করিয়া থাকে—এই প্রশ্নের সমাধান হইবার আশা দেখা গিয়াছে। ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির রাসায়নিক ডাঃ ক্যালভিন এক বক্তৃতায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

অঙ্গারাত্মকরণে সবুজ উদ্ভিদ সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি সঞ্চয় করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের সাহায্যে প্রাণী-জগতের অপরিহার্য শক্তিপ্রদায়ক বিবিধ খাদ্য উৎপাদন করে, যেমন—প্রোটিন, শ্বেতসার, শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থ।

তেজস্ক্রিয় অঙ্গারের সাহায্যে গবেষণা করিয়া ডাঃ ক্যালভিন এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা অঙ্গারাত্মকরণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছেন; কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান বিষয়, সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি শোষণের কার্যটি কিভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা উদ্ঘাটনের চেষ্টা এতকাল ব্যর্থ হইয়া আসিয়াছে।

উদ্ভিদ ক্লোরোফিল নামক সবুজকণার সাহায্যে সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি শোষণ করে। সূর্যরশ্মিপাতে সবুজকণার ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ বর্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে শক্তি আহরণ করে। এইভাবে অর্জিত শক্তি ক্লোরোফিলের মধ্যে এক সেকেণ্ডের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র সময় সঞ্চিত থাকিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই যে, ঐ শক্তি কিভাবে উদ্ভিদের রাসায়নিক সংশ্লেষণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়?

ডাঃ ক্যালভিন এই সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু আভাস দিয়াছেন। তিনি অধুনা আবিষ্কৃত প্রোটোজেন নামক এক উদ্ভিদ-বর্ধক পদার্থের দুইটি নমুনা প্রাপ্ত হন। উদ্ভিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এই পদার্থ পাওয়া যায়। নমুনা দুইটির মধ্যে একটি ছিল উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত স্বভাবজাত পদার্থ; অপরটি একই পর্যায়-ভুক্ত কৃত্রিম পদার্থ। কিন্তু উহার অণুর মধ্যে পরমাণু-বিন্যাসের সামান্য পার্থক্য ছিল।

ক্যালভিন পরীক্ষা করিয়া দেখেন—স্বভাবজাত প্রোটোজেনে সামান্য পীতবর্ণের আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু কৃত্রিম পদার্থটি বর্ণবিহীন। স্বভাবজাত প্রোটোজেনের ভিতর গন্ধকের পরমাণুর বিশেষ বিন্যাসই এই পীতবর্ণের কারণ বলিয়া তিনি অনুমান করেন। এইরূপ বিন্যাসের জন্য গন্ধকের পরমাণুগুলি আলোকরশ্মির শক্তি দ্বারা বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে। প্রোটোজেন অণুর প্রধান অংশটি সংশ্লেষণ করিয়া ক্যালভিন তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া দেখাইয়াছেন।

ক্যালভিনের মতবাদ তাহা হইলে সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়—প্রোটোজেনের অণুগুলি, ক্লোরোফিলের আধার প্লাষ্টিডের সহিত সংলগ্ন থাকে। ক্লোরোফিল কর্তৃক আহৃত শক্তি প্রোটোজেনের অণুকে আঘাত করিলে উহার গন্ধকের পরমাণুগুলি বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঐ বিভক্ত পরমাণুগুলির ভিতরেই শক্তি সঞ্চিত হয় এবং সহজেই অন্যান্য অণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রোটিন ও অপরাপর শক্তি প্রদায়ক পদার্থের সৃষ্টির সময় উহাদের মধ্যে নিহিত হয়। এইভাবে উদ্ভিদের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হয়।

ডাঃ ক্যালভিন তাঁহার বিবৃতি প্রকাশে একটু সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার গবেষণালব্ধ ফল নির্ভরযোগ্য হইলেও ইহাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলা যায় না। ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণের জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।

উদ্ভিদের সাহায্যে ইউরেনিয়াম খনির স্থান নির্ণয়

আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের বৈজ্ঞানিক ডাঃ ক্যানন বলেন, ইউরেনিয়াম বা ভ্যানেডিয়াম খনির অস্তিত্ব ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদাদির লক্ষণ হইতেই ধরা পড়িতে পারে। ইউরেনিয়াম অথবা ভ্যানেডিয়াম—কোন্ খনির উপর উদ্ভিদগুলি জন্মিয়াছে, পাতার পরীক্ষা দ্বারা তাহা জানা যাইতে পারে। দুই বৎসর যাবৎ আমেরিকার কলোরেডো প্লেটোর বহু উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ক্যানন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

উদ্ভিদ বহু পরিমাণে ইউরেনিয়াম ও ভ্যানেডিয়াম শিকড়-দ্বারা শোষণ করিয়া লয়; ফলে শাখায় ও পাতায় উহার অস্তিত্ব রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে। ইউরেনিয়াম অঞ্চলের উদ্ভিদে দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে দুই হইতে একশত ভাগ ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে; কিন্তু ইউরেনিয়াম শূন্য অঞ্চলে দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ থাকে কিনা সন্দেহ।

মাটিতে অত্যধিক ইউরেনিয়াম থাকিলে উদ্ভিদ অসুস্থ হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে বুঝিতে পারা যায়, খনিজ পদার্থটি মাটির উপরের স্তরেই আছে; কারণ উহা বৃষ্টির জলে গলিয়া উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য হইয়াছে।

সিগারেটের ধূমপান ক্যানসার উৎপত্তির অন্যতম কারণ

নিউ ইয়র্কের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমির এক সভায় ডাঃ এভার্ট এ গ্রেহাম, ডাঃ আর্নেষ্ট এল ওয়াইণ্ডার ও এডিলি বি, ক্রনিঙ্গার প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিগারেটের ধূমপান করিবার সময় যে নিকোটিনের রস নিঃসৃত হয়, সেই রস ইঁদুরের দেহে এক বৎসর যাবৎ প্রয়োগ করিয়া ঐগুলিকে ক্যানসার রোগাক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

সিগারেটের ধূমপানের সহিত ফুস্‌ফুসের ক্যানসার রোগের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এইরূপ মত ডাঃ গ্রেহাম এবং ইংল্যাণ্ডের কতিপয় বৈজ্ঞানিক ইতিপূর্বে একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ গ্রেহাম বলেন, অনেকগুলি ক্যানসার রোগগ্রস্ত রোগীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে, যাহাদের ফুস্‌ফুসে ক্যানসার হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অন্ততঃ বিশ বৎসর যাবৎ অত্যধিক ধূমপান করিতেছেন। যাহারা ধূমপান করেন না তাহাদেব মধ্যে ঐ রোগ বিরল। তিনি আরও বলেন যে, বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ ফুস্‌ফুসে ক্যানসার অত্যধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে পুরুষদের ক্যানসার রোগের মধ্যে ইহাই সাধাবণ।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ,—দ্বিতীয় সংখ্যা
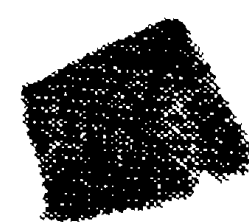
উইলিয়াম হেন্‌রি পার্কিন

জন্ম—১৭ই জুন, ১৮৬০ ... মৃত্যু—১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

করে দেখ

ফুঁ-এর জোর

তোমরা অনেক সময় প্রতিযোগিতা করে ফুঁ-এর জোরের পরীক্ষা করে থাক। ফুঁ দিয়ে বাতি নিবাও, কাগজ প্রভৃতি হাল্‌কা জিনিস ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও। পেন্সিল প্রভৃতি একটু ভারী জিনিষও টেবিলের উপর রেখে ফুঁ দিয়ে কতটা গড়িয়ে নেওয়া যায় তা দিয়ে ফুঁ-এর জোরের পরীক্ষা করে থাক। এরার তোমাদের ফুঁ-এর জোর দেখবার জন্যে খুব সহজ অথচ নতুন একটা পরীক্ষার কথা বলছি।
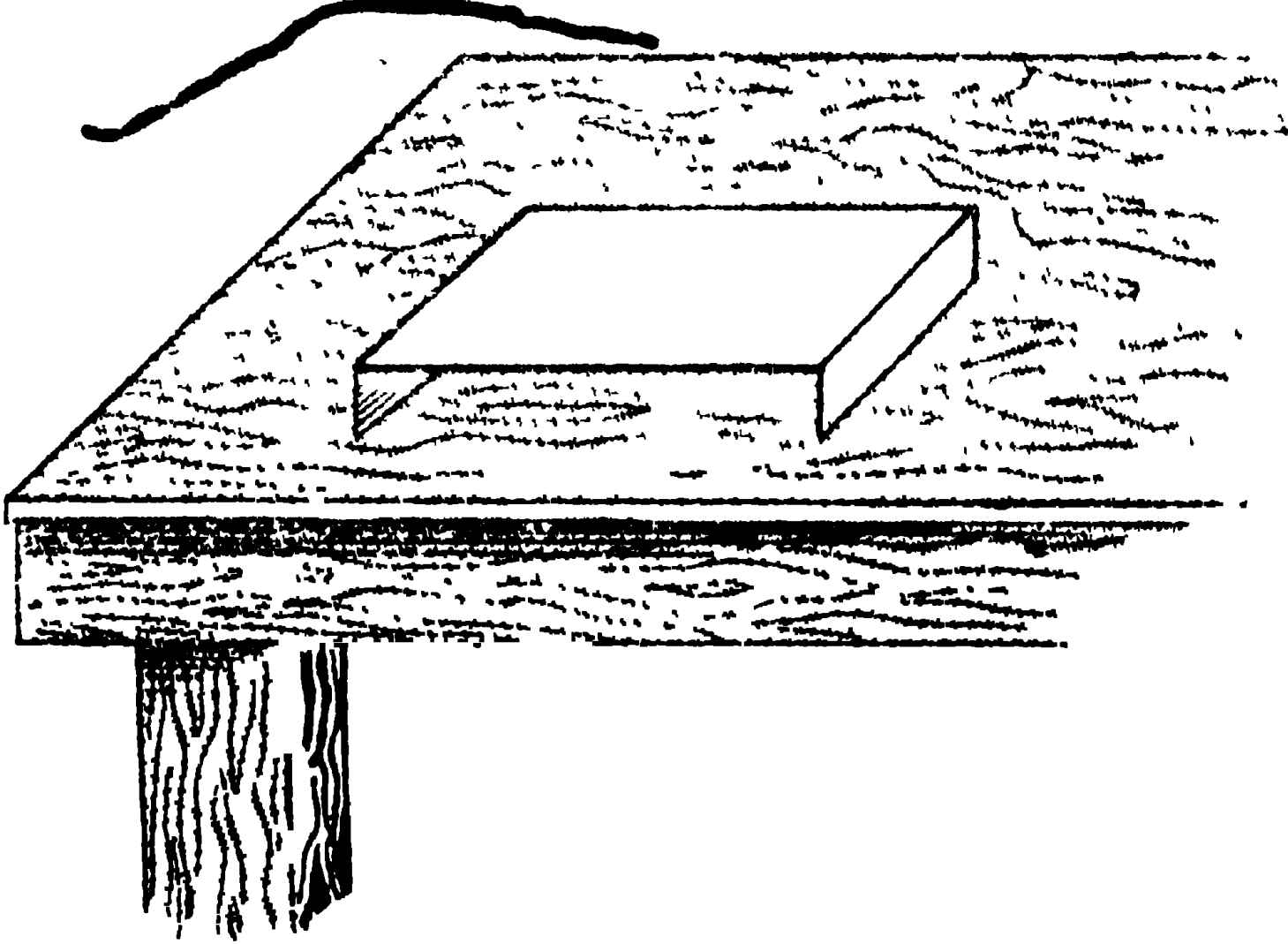
ফুঁ-এব জোরের পরীক্ষাটি যেভাবে করতে হবে

পাতলা একখানা পেষ্ট বোর্ড থেকে ৯।১০ সেন্টিমিটার লম্বা, ৫।৬ সেন্টিমিটার চওড়া একটি টুক্‌রা কেটে নাও। ওটাকে লম্বা দিকে দু-পাশে এক সেন্টিমিটার করে ভাঁজ দিয়ে একটা পিঁড়ের মত তৈরি কর। দু-দিকের ভাঁজ সমান হওয়া চাই, অর্থাৎ পায়া দুটা যেন বেশ সোজা ভাবে বসে। পেষ্টবোর্ডের পিঁড়েটাকে টেবিলের ধার থেকে একটু দূরে রেখে ওই পিঁড়ের ফাঁকের ভিতর দিয়ে জোরে ফুঁ দাও। মনে করছ ওটা ছিট্‌কে পড়ে যাবে, কিন্তু তা হবে না। যত জোরেই ফুঁ দাও না কেন, ওটা আরও ভাল করে চেপে বসবে। যদি মনে কর ওটা ভারী বলে নড়ছে না তবে পিঁড়েখানাকে চিৎ করে রেখে ফুঁ দাও; দেখবে সহজেই সরে যাবে। টেবিলের উপর না রেখে কোন শক্ত মলাটওয়ালা বইয়ের উপর রেখেও এই পরীক্ষা করতে পার। কেন এমন হয় ভাল করে ভেবে দেখ।

—বি—

জেনে রাখ

ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আবিষ্কর্তা

১৯৫২ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যা বিষয়ে রাটগার্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ সেলম্যান এ. ওয়াক্‌স্‌ম্যানকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। ষ্ট্রেপ্‌টো-মাইসিন ও অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কর্তা হিসাবে তিনি ইতিপূর্বেই সুনাম অর্জন করেন। এই যুগান্তকারী ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ পর্যন্ত ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান ত্রিশ লক্ষ ডলারের বেশী অর্থ মাইক্রোবাইওলজি গবেষণায় ব্যয় করিয়াছেন। প্রকাশ, নোবেল পুরস্কারের মোটা অর্থ তিনি নিউ ব্রান্‌স্‌উইকের নব নির্মিত 'ইনষ্টিটিউট অব মাইক্রোবাইওলজি'র জন্য ব্যয় করিবেন।

ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যানের আবিষ্কৃত ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের গুণে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শিশু ও নরনারী নবজীবন লাভ করিয়াছে। জনগণ তাঁহার নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ, তাহার একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। তোমরা হয়তো জান, নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সুইডেনের ষ্টকহলম কনজারভেটরী হল ঘরে। চিরাচরিত প্রথানুসারে এই হল ঘরেই সুইডেনের রাজা গুস্তাভ ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যানকে পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেন। এই সময় একটি ছোট মেয়ে পাঁচটি লাল গোলাপের তৈয়ারী একটি পুষ্প-স্তবক তাঁহাকে উপহার দেয়। এই পুষ্প-স্তবকটি লক্ষ্য করিয়া ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান বলেন—এই উপহারটি তিনি নোবেল পুরস্কার অপেক্ষা অধিকতর সম্মানজনক বলিয়া মনে করেন। পাঁচ বছর আগে যক্ষ্মারোগে এই মেয়েটির নাকি জীবনান্ত হওয়ার উপক্রম হয়। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগে মেয়েটির জীবন রক্ষা পায়। পুষ্প-স্তবকের পাঁচটি গোলাপ মেয়েটির নবলব্ধ জীবনের পাঁচটি বছরের স্মারকচিহ্নরূপে প্রদত্ত হয়।

১৮৮৮ সালের ২৯শে জুলাই ইউক্রেনের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ১৯১৫ সালে রাটগার্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তিনি পি-এইচ্‌. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সময় হইতে সাঁইত্রিশ বছর ধরিয়া তিনি মৃত্তিকা-জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়া আসিতেছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ ও পশুর পক্ষে মারাত্মক, এরূপ জীবাণুর ধ্বংস অথবা তাহার

বংশবৃদ্ধি রোধ করিতে পারে এমন একটি অ্যান্টিবায়োটিকের অনুসন্ধান গত ১৯৩৯ সালে নিউ জার্সির ষ্টেট ইউনিভারসিটিতে শুরু হয়। ১৯৩২ সালে ডাঃ ওয়াক্স্‌ম্যানকে জাতীয় গবেষণা সমিতি (National Research Council) বৃত্তি প্রদান করে। এই বৃত্তি-লাভের পর তিনি যক্ষ্মার জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। মৃত্তিকা-জীবাণুর সংস্পর্শে আসিলে যক্ষ্মার জীবাণুর কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে তিনি তাঁহার গবেষণার ধারা পরিবর্তন করেন। মানুষ এবং পশুর রোগ নিরাময়ে

ডাঃ ওয়াক্স্‌ম্যান জীবাণু-কালচার পরীক্ষা করিতেছেন

এই মৃত্তিকা-জীবাণুর কোন কার্যকরী ক্ষমতা আছে কিনা, তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে মনস্থ করেন।

ডাঃ ওয়াক্স্‌ম্যান তুইটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। প্রথমতঃ এমন একটি জীবাণু আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহা যক্ষ্মার জীবাণু-ধ্বংসী অ্যান্টিবায়োটিক স্থষ্টি করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মানুষ ও পশুর দেহের ভিতরকার টিস্থর পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয়, অথচ মারাত্মক জীবাণুগুলি ধ্বংস করিতে পারে এমন একটি 'মাইক্রোবে'র অনুসন্ধান করা। ১৯১৫ সালে ওয়াক্স্‌ম্যান তাঁহার গবেষণার সুরু হইতেই অ্যাক্‌টিনো-মাইসিটিস নামক ছত্রাকের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। এই সময় নিউ জার্সির কৃষি কলেজের ডীন ডাঃ জেকব লিপম্যানের অধীনে গবেষণার কার্যে

লিপ্ত থাকা কালীন ওয়াক্স্ম্যান এবং আর. ই কার্টিস মৃত্তিকা-জীবাণুগোষ্ঠী হইতে অ্যাক্টিনোমাইসিস্ গ্রিসিয়াস্ পৃথক করিয়া লইতে সমর্থ হন। বর্তমানে ইহা 'ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস' নামে পরিচিত। এই ষ্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস হইতেই অত্যাশ্চর্য ঔষধ ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের উৎপত্তি হয়।

১৯৩৯ সালে এই গবেষণা আরম্ভ হওয়ার ঠিক এক বছর পরেই ইহার ফল পাওয়া যায়। ইহা ডাঃ ওয়াক্স্ম্যানের পুরাতন অ্যাক্টিনোমাইসিটিস হইতে প্রাপ্ত অ্যাক্টিনোমাইসিন। জীবাণু ধ্বংস করিতে ইহার যেমন অদ্ভুত গুণ ছিল, তেমনি আবার ইহা জীবজন্তুর পক্ষে মারাত্মক ছিল। জীবজন্তু বিনাশের জন্য ইহা অনায়াসে বিষ হিসাবে প্রয়োগ করা যাইত। অ্যাক্টিনোমাইসিনের পরেই আবিষ্কৃত হইল ক্ল্যাভাসিন (Clavacin) ও ফিউমিগ্যাসিন (Fumigacin)। কিন্তু ইহারা অত্যধিক বিষক্রিয়াসম্পন্ন এবং নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইল।

১৯৪২ সালে বিভিন্ন জীবাণু-ধ্বংসকারী এবং তাহাদের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন ব্যাহত করিতে পারে এমন একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হইল। ইহার নাম দেওয়া হয় 'ষ্ট্রেপ্টোথ্রাইসিন' (Streptothricin)। গ্র্যাম-নেগেটিভ জীবাণু ধ্বংস করিতে ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। পেনিসিলিন ও টাইরোথ্রাইসিন (Tyrothricin) শুধু গ্র্যাম-পজিটিভ জীবাণুর ক্ষেত্রে কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং ষ্ট্রেপ্টোথ্রাইসিন এক্ষেত্রে পরিপূরক হিসাবে পরিগণিত হয়।

ষ্ট্রেপ্টোথ্রাইসিনের প্রভাব জীবজন্তুর দেহে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেও উত্তরকালে ইহা জীবজন্তুর পক্ষে মারাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হয়। কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পরে দেখা গেল, জীবগুলি ষ্ট্রেপ্টোথ্রাইসিন প্রয়োগের দরুণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ফলে ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ম্লান হইয়া যায়।

ডাঃ ওয়াক্স্ম্যান তাঁহার গবেষণায় দুই রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। খানিকটা মাটির মধ্যে জীবাণুকে প্রকৃতপক্ষে উপবাসী রাখিয়া অন্য এক জাতীয় মারাত্মক জীবাণুকে উহার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া। মৃত্তিকা-জীবাণুগুলি এই সব জীবাণু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাঁচিতে পারে কিনা, তাহা লক্ষ্য করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতি বেশ সময়সাপেক্ষ।

বড় বড় পাত্রে ডাঃ ওয়াক্স্ম্যান মৃত্তিকা-জীবাণুর কালচার করিতে থাকেন। মারাত্মক জীবাণুর চাষ করিয়া তাহাতে ভিন্ন জাতীয় জীবন্ত জীবাণু ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় জীবাণুগোষ্ঠীর চারিধারে কোনপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থের উৎপন্ন হইলে প্রমাণিত হইত যে, মাটিতে ছাড়িয়া দেওয়া জীবাণুগুলি মৃত্তিকা-জীবাণুদের ধ্বংস সাধন করিতেছে।

বহু বছর ধরিয়া এই গবেষণা চলিতে থাকে। এই পদ্ধতির সহায়তায় ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান ও তাঁহার ছাত্র অ্যালবার্ট স্কাজ স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন- গ্রিসিয়াস-কে দুইটি ফলপ্রদ অংশে ভাগ করিতে সক্ষম হন। একটি পাওয়া গেল মোরগ ছানার গলা হইতে এবং আর একটি লাভ হইল বেশ উত্তমরূপে সার দেওয়া জমি হইতে। এই বিভক্ত দুইটি অংশ বেশ কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হয়।

যক্ষ্মা ও গ্র্যাম-নেগেটিভ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করায় এই সব অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা আরও বহুগুণ বর্ধিত হয়। অতঃপর লেবরেটরীর জীবজন্তুর দেহে অ্যান্টিবায়োটিক সৃষ্টি করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইল না। কারণ জীবজন্তুর দেহে উৎপন্ন জীবাণুগোষ্ঠীর মধ্যে সেরূপ অ্যান্টিবায়োটিক ধর্ম পরিলক্ষিত হইল না। তাছাড়া কৃত্রিম উপায়ে জীবজন্তুর দেহে উৎপন্ন এইসব জীবাণুগোষ্ঠী আশানুরূপ স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় নাই।

মৃত্তিকা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবনের পক্ষে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এই স্বতঃসিদ্ধ মতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান উর্বর মৃত্তিকায় জীবাণুর চাষ আরম্ভ করেন। এই সব মৃত্তিকা-জীবাণুর ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকিলেও তিনি পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালাইয়া যাইতে থাকেন। মৃত্তিকা-জীবাণুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হইয়াই তিনি এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন—এই সর্বংসহা কল্যাণময়ী ধরিত্রীর গর্ভেই নিহিত আছে এক অপরূপ যাদু। অবশেষে জীবন্ত কুক্কুট-ভ্রূণ ও শ্বেত ইঁদুরের উপর গবেষণা চালানো হইল। ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যানের গবেষণাগারে প্রাণী-গবেষণার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার পরীক্ষার কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মিল না। নিকটবর্তী পশুপক্ষী পালনের বিভাগগুলি তাহাকে এতদসম্পর্কে সাহায্য করিল। বিষক্রিয়ার পরীক্ষা ও অভীষ্ট ফললাভের পক্ষে এই সকল পরীক্ষা আদর্শ স্থানীয় হইল। অতঃপর গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করা হইল। এইবার কুক্কুট-শাবক ও গিনিপিগের উপর পরীক্ষা চালানো হইল। এমন কি, বিভিন্ন কমার্সিয়াল লেবরেটরীতেও পরীক্ষা কার্য সুরু হইল। মার্ক অ্যাণ্ড কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার ধারা আরও উন্নত করেন। ১৯৪৪ সালে মেয়ো ক্লিনিক চিকিৎসালয়েও তাঁহার আবিষ্কৃত জীবাণুর পরীক্ষা চলিতে থাকে।

অবশেষে ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যানের আবিষ্কৃত স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের গোপন রহস্য এবং আবিষ্কর্তার নাম পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সম্পর্কে ডাঃ ওয়াক্‌স্‌ম্যান বলিয়াছেন—'আমরা প্রথমে দশ হাজার জীবাণু লইয়া পরীক্ষা কার্য সুরু করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—রোগ বহনক্ষম জীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ করিবার ক্ষমতা ইহাদের কতদূর

আছে, তাহা পরীক্ষা করা। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, ইহাদের মধ্যে মাত্র শতকরা দশটি জীবাণুর এই কার্যক্ষমতা রহিয়াছে। তারপর রোগ বহনক্ষম জীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধে সক্ষম এক শতটি জীবাণুকে দশটি রাসায়নিক দ্রব্যে পরিবর্তিত করা হয় এবং এইগুলি বিভিন্ন জন্তুর দেহে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা কার্য চালানো হয়। এই দশটি রাসায়নিক দ্রব্যের একটি অ্যান্টিবায়োটিকের নামকরণ করা হইয়াছে—ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন।'

কিন্তু ষ্ট্রেপটোমাইসিনই এই গবেষণার শেষ নয়। ইহার পরেও গ্রিসেইন (grisein), ষ্ট্রেপ্টোসিন (streptocin) এবং সর্বশেষে নিওমাইসিনের (neomycin) ন্যায় আরও নূতন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিওমাইসিনের ফলাফল হইতে অনুমিত হয়—ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের স্থান অধিকার করিবার মত ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে; কারণ ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের ফলাফল ব্যাহতকারী ব্যাক্টিরিয়ার পক্ষে ইহা অতীব কার্যকরী।

—ন—

তোমাদের স্বপ্ন দেখা

আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি। তোমরাও দেখ। কি দেখ, কি ভাবে দেখ এবং কেনই বা দেখ, তা হয়ত জানতে চাইবে। সে কথাই আজ তোমাদের সংক্ষেপে বলছি।

প্রথমেই জেনে রাখ, স্বপ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও আছে। আমাদের স্বপ্ন তত্ত্ব শুভাশুভ সূচনা করে। যেমন ধর, সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশ বৃদ্ধি হবে ইত্যাদি। গারো এবং নাগারাও স্বপ্নে অত্যন্ত বিশ্বাসী। গারোদের কাছে মাছধরা স্বপ্ন দেখবার মানে ধনদৌলত লাভ করা। আর আদিবাসী নাগাদের মধ্যে কেউ মোষের দ্বারা আক্রান্ত হলে তার বিপদ সুনিশ্চিত বলে মনে করা হয়। এরূপ আরও কত কি যে ধারণা আছে! যাক সেকথা। এই স্বপ্ন সম্পর্কে গবেষণা করে যিনি নতুন আলোকপাত করেছেন, তাঁর নাম ফ্রয়েড। তিনি অনেক জিনিষ দিয়ে গেছেন। তারপরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী তাঁর অবদানকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন। তাই যে মনোরাজ্য এতদিন মানুষের বুদ্ধির বাইরে ছিল, তার ভিতর আজ বিজ্ঞান ঢুকেছে। অন্ধের ন্যায় কোন কিছু মেনে চলবার যুগ আর নেই; কারণ এ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে স্বপ্ন একটা জটিল মনের খেলা—নিজের সুপ্ত বা অবদমিত ইচ্ছার পরিপূরক মাত্র। তোমরা যা চাও বা চিন্তা কর, তা যদি বাস্তব জীবনে সম্ভব না হয়, স্বপ্নে সাফল্য আসবে। আমরা সব সময়ে যে ভাল ভাল চিন্তা করি, তা নয়; খারাপ চিন্তাও আসে। তবে খারাপ চিন্তা সরাসরি স্বপ্নের রাজ্যে তো আসতে পারে না, কেননা আমাদের বিবেক বা Brain Police Man বাধা দেয়।

সেই বাধা দেবার ফলে স্বপ্ন কোন একটা বিশেষ রূপ নিয়ে বিবেককে ফাঁকি দিয়ে গোপনে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব স্বপ্ন প্রথমতঃ খুব সহজ বলে মনে হলেও এর পেছনে সব সময়ে একটা বিরাট অর্থ লুকিয়ে থাকে। মনঃসমীক্ষণ করে এই সব অর্থের সন্ধান মেলে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ—কোন এক মেম সাহেব স্বপ্ন দেখেন যে, উনি তাঁর দুটি ছেলেকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। মা হয়ে ছেলেকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া এক অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়। কিন্তু মন বিশ্লেষণ করে জানা গেল যে, তিনি অন্য একটি লোককে বিয়ে করতে মনস্থ করেছেন। কিন্তু সেই লোকটির অবস্থা খুব খারাপ। দুটি ছেলে জলে ভাসিয়ে দেবার মানে হচ্ছে—যদি ছেলে দুটি চলে যায় এবং পরে যদি দুটি ছেলে হয় তবে সংসারের বাড়তি ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। তাহলে বুঝতে পাচ্ছ, স্বপ্ন কি ভীষণ চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়। এই সব স্বপ্নকে ফ্রয়েড 'টিপিক্যাল ড্রিম' বলেছেন। এরা বিশেষ বিশেষ রূপধারী। তাছাড়া, প্রত্যেক স্বপ্নকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে বাইরের অংশ, যাকে আমরা সাধারণতঃ মনে রাখি আর অপরটি ভিতরের অংশ যা আমরা ভুলে যাই।

বাইরের অংশটুকু আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে, সংক্ষেপণ। যে সব জিনিষের ভিতর বেশী একাত্মবোধ দেখতে পাওয়া যায়, তার উপরে বেশী জোর দেই ; আর বাকীটুকু বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ভাবানুগঠন। স্বপ্ন বলবার সময় আমরা অনেক সময় আসলের চেয়ে বরং বং ফলিয়ে বলে থাকি। যার যার খুসীমত অনেক মালমসলা দিয়ে সাজিয়ে যাই, যাতে নাকি অন্যে আনন্দ পায় বা বিশ্বাস করে। অথচ স্বপ্নে অনেক ছাটকাট থাকে। মনোবিদ্‌গণ এ জিনিষ বেশ বুঝতে পারেন এবং সারটুকু নেন। তৃতীয়টি হচ্ছে, ওলটপালট। আমরা বাস্তব জীবনে যা অভ্যস্ত, স্বপ্নে কিন্তু অনেক জিনিষ উল্‌টে পাল্‌টে আসে। তাই স্বপ্নে সব জিনিষই সম্ভব। চতুর্থটি হচ্ছে, নাটকীয় ভঙ্গী। স্বপ্নে ঘটনাটি নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘটে যায়—প্রবহমান ও গতিশীল। এর দরকার আছে ; কেননা স্বপ্ন আমাদের জীবনে খানিকটা ভারসাম্য রক্ষা করে। সেজন্যে স্বপ্ন বিশ্লেষণ অনেক সময় মানসিক ব্যাধি নিরাময়ে সহায়তা করে। ডাঃ য়ুঙ্গ নামে একজন মনোবিজ্ঞানী একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন 'ফ্রি অ্যাসোসিয়েসন মেথড্'। রোগীকে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হয় এবং প্রতিটি শব্দ থেকে সম্বন্ধযুক্ত অপর একটি শব্দ রোগীকে বলতে হয়। রোগী সম্বন্ধযুক্ত শব্দ বলতে কত সময় নিচ্ছে, তা এক বিশেষ ঘড়ি দ্বারা ধরা হয়। যেসব জায়গায় শব্দ বলতে রোগী বেশী সময় নেয়, সেগুলিকে বিশেষভাবে তলিয়ে দেখলে কোন কোন সময় মনোবিকারের আসল কারণ ধরা পরে।

তাই খারাপ স্বপ্ন দেখলে, ঘাবড়ে যেও না, অথবা আঁৎকে উঠো না। আবার ভাল স্বপ্নও কোন আশার সঞ্চার করে না ; অতএব আশাবাদী হয়ো না। নিজেরাই একটু

বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবে; তাহলে অনেক সময় দুর্ভাবনা কেটে যাবে। তাতেও যদি সুবিধা না হয়, তবে মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিতে দোষ কি?

শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী

উইলিয়াম হেন্‌রি পার্কিন

এক বিশেষ রাসায়নিক পরিবেশে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন তারিখে উইলিয়াম হেন্‌রি পার্কিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সার উইলিয়াম হেন্‌রি পার্কিন রসায়নী হফ্‌ম্যানের ল্যাবরেটরীতে শিক্ষালাভ করেন। মৌলিক গবেষণায় কিছু দিন ব্যাপৃত থাকার পর রং তৈরির অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন। ইংল্যাণ্ডের বাজারে তখন বিদেশী মালের অবাধ আমদানী ছিল। অধ্যাপক হফ্‌ম্যান সার উইলিয়ামকে তাঁব ল্যাববেটরী ছেড়ে যেতে বাবণ করেছিলেন। কিন্তু সার উইলিয়াম পার্কিন তাঁর আবিষ্কারের সাহায্যে গড়ে তোললেন একটা নতুন শিল্প, যা ইংল্যাণ্ডে তখন পর্যন্ত ছিল না। শিগ্‌গিবই তাঁর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেখা দিল। ফরাসী মাল ধীবে ধীবে বাজার থেকে চলে যেতে লাগল; আর সার উইলিয়ামের প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে বিখ্যাত হয়ে পড়ল। সার উইলিয়ামের অন্তর্দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। তাই তিনি তাঁর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পাশেই গড়ে তোললেন একটা মৌলিক গবেষণাগার।

বালক উইলিয়াম হেন্‌রি পার্কিন যখন লেখাপড়া আরম্ভ কবেন তখন লণ্ডনে একটা মাত্র বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। লেখাপড়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পার্কিনের অঙ্কশাস্ত্রে মনোযোগ গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল; তাই তাঁর আর অন্যান্য বিষয়ে খানিকটা মনোযোগের অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। এর জন্যে একবার তাঁকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে হয়েছিল।

এরপর এল কলেজে পড়বার পালা। কলেজে রসায়নের কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি শীঘ্রই সুনাম অর্জন করেন। কলেজের শিক্ষা শেষ হওয়ার পর উইলিয়াম উচ্চতর শিক্ষার অভিলাষে জার্মেনীতে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন; কারণ তখন জার্মেনীতে রসায়নের বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকবৃন্দ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতা এ বিষয়ে আপত্তি করেন। এর পিছনে ছিল তাঁর খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে পুরাপুরি গোঁড়ামি। সে সময় জার্মেনী থেকে সমস্ত রকম বিপ্লব আর পরিবর্তনশীল মতবাদ প্রচারিত হতো; তাই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়, সেখানে গেলে ছেলে হয়ে উঠবে ঘোর নাস্তিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেলের অদম্য উৎসাহের কাছে হার মানতে হয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বিশ বছর বয়সে উইলিয়াম হেনরি পার্কিন ভুর্জবুর্গে এলেন ভিস্‌লিসেনাস্ এর গবেষণাগারে। দু-বছরের মধ্যে তিনি তাঁর গবেষণার জন্যে ডক্‌টরেট উপাধি লাভ করেন। এর পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে হেমন্তের প্রারম্ভে তিনি মিউনিকে অধ্যাপক বেয়ারের গবেষণাগারে যোগদান করেন।

সে সময় অধ্যাপক বেয়ারের গবেষণাগার ছিল রসায়নীদের তীর্থক্ষেত্র; সেখানে গবেষক হিসেবে ছিলেন অটোফিসার, ব্যাম্‌বারজার, ফ্রিডল্যাণ্ডার প্রভৃতি রসায়নবিদ। এছাড়া বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত রসায়নবিদ এমিল ফিসার ও ভিক্টর মেয়ারকে অধ্যাপক বেয়ারের ল্যাবরেটরীতে প্রায়ই দেখা যেত। অল্পদিনের মধ্যেই পার্কিন অন্যতম গবেষক হিসেবে গণ্য হলেন।

ষড়ভুজ জৈব যৌগিকের কথা তখন পর্যন্ত জানা ছিল; কিন্তু পঞ্চভুজ, চতুর্ভুজ আর ত্রিভুজ জৈব যৌগিক ছিল কল্পনার বাইরে। এই বিষয়ে গবেষণা করবেন বলে উদীয়মান বিজ্ঞানী পার্কিন মনস্থ করলেন। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব আর ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের সুদূরপ্রসারী ফলাফলের কথা চিন্তা করে তিনি হয়ে পড়লেন চঞ্চল।

ক্রমশ এই চিন্তা তাঁর স্নায়বিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মনের কথা বিশিষ্ট রসায়নীদের কাছে ব্যক্ত করায় সকলেই তাঁকে যা বললেন, তাতে উৎসাহের বালাই ছিল না। কিন্তু উইলিয়াম পার্কিন ছিলেন তাঁর কর্তব্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পার্কিনের অদম্য অধ্যবসায়ে প্রীত হয়ে অধ্যাপক বেয়ার তাঁর সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে লাগলেন।

এই অভিনব পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে যেতে লাগল। এতদসম্পর্কে আরও কয়েকজন সাধনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েণ্ট একজন। অধ্যাপক বেয়ারের মনোযোগ এই নতুন বিষয়ে আকৃষ্ট হলো। ফ্রয়েণ্ট, পার্কিন প্রভৃতির গবেষণাকে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর Strain মতবাদ।

পার্কিনের গবেষণা শুধুমাত্র বহুভুজী জৈব যৌগিক পদার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপক্ষার, তার্পিন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য সম্বন্ধে তিনি তখন থেকেই বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। রসায়নী কোয়েনিংস-এর কাছ থেকে তিনি উপক্ষার সম্বন্ধে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

সঙ্গীতচর্চায় পার্কিনের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন ভাগ্‌নার এবং মোর্সার্টের একজন বিশেষ সমঝদার। তাই তাঁকে প্রায়ই গানের আসরে দেখতে পাওয়া যেত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হেন্‌রী পার্কিন তাঁর রাসায়নিক গবেষণার মিউনিকের পর্যায় শেষ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন; আর রসায়নীদের দিয়ে এলেন তাঁর অমূল্য রাসায়নিক গবেষণার পূর্বাভাষ।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত হেরিয়ট-ওয়াট কলেজে পার্কিন রসায়নের অধ্যাপক

নিযুক্ত হন। ভোর পাঁচটায় তিনি মিঃ কিপিং-এর সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন জীবন আরম্ভ করতেন। সঙ্গীত তাঁর কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। মিঃ কিপিং-এর সাহচর্য অধ্যাপক পার্কিনের ব্যক্তিগত জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সময়ে মিস্ মীনার সঙ্গে পার্কিনের পরিচয় হয়, আর এই ব্যাপারে মিঃ কিপিং ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে মিস্ মীনাকে পার্কিন বিবাহ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হেন্‌রী পার্কিন এই কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। বহুভুজী যৌগিকের সংশ্লেষণের কাজ এগিয়ে চললো। নতুন ধরনের কাজগুলির মধ্যে বারবেরিনের কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণার ফলে কলেজের বেঞ্চগুলি পর্যন্ত হলদে হয়ে গিয়েছিল; কারণ বারবেরিন উপক্ষারের রং হলদে।

অধ্যাপক সার্লমারের মৃত্যুতে ম্যানচেষ্টারের ওয়েন্‌স্ কলেজের রসায়নের অধ্যাপকের পদ খালি হয়। হেন্‌রী পার্কিন উক্ত পদে নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত হবার অল্পকালের মধ্যেই কলেজের ছাত্রসংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কিছু-দিনের মধ্যে আর একটি নতুন রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে পার্কিনের গবেষণার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। এখান থেকেই তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবন-নাট্যের আরম্ভ।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে তিনি অক্সফোর্ডের অধ্যাপক রূপে কাজ করতে থাকেন। অক্সফোর্ডে যোগদানের পর সেখানকার গবেষণার ধারা গেল পাল্‌টে। অতি সত্বরই ডাইসন পেঁরা নামে একটি ল্যাবরেটরী তৈরি হলো। এই গবেষণাগারটিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং পুরাপুরিভাবে চালু করতে প্রথম মহাযুদ্ধের বছরগুলো কেটে গেল। নতুন ল্যাবরেটরীকে কাজের উপযুক্ত করার পিছনে ছিল পার্কিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত কর্মক্ষমতা, আর তাঁর উপর কর্তৃপক্ষের দৃঢ়বিশ্বাস। এছাড়া এই ল্যাবরেটরীতে শিল্পপতিদের রাসায়নিক সমস্যার গবেষণা করবারও সুবিধা করে দিয়েছিলেন হেন্‌রী পার্কিন।

হেন্‌রী পার্কিনের গবেষণা জৈব রসায়নে নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে; যেমন—বারবেরিন উপক্ষারের রসায়ন। জৈব রসায়নীদের পক্ষে ইহা একটা অমূল্য তথ্য। এই সমস্যার সমাধান যাবতীয় উপক্ষার রসায়নের উপর আলোকপাত করেছে; এ-দ্বারা সমগ্র উপক্ষার রসায়নকে ধারাবাহিক করে নেওয়া গেছে। রঞ্জন তার্পিন আর উপক্ষার রসায়নের সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের দ্বারা পার্কিন নতুন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন জৈব রসায়নে। বলতে গেলে পার্কিনের দান ছাড়া সমস্ত জৈব রসায়ন হয়ে পড়তো পঙ্গু আর তার প্রগতি হতো ব্যাহত।

ব্যক্তিগত চরিত্রের সরলতা আর অনাড়ম্বর জীবন তাঁকে করে তুলেছিল জনসাধারণের কাছে মহিমান্বিত। সঙ্গীতে তাঁর উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল আগে

থেকেই, তাই অনেক সঙ্গীত সমিতিতে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। সৃষ্টির আনন্দ তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেত সব রকমের গঠনমূলক কাজের মধ্যে। তাই গার্হস্থ্য জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যে থেকেও তিনি নিঙড়ে নিয়েছিলেন প্রচুর রস। তিনি ছিলেন কর্মশক্তির মূর্তপ্রতীক। তাই তিনি রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই পৃথিবীকে ভোগ করতে পেরেছিলেন পরিপূর্ণভাবে।

১৯২৯ সালে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অধ্যাপক পার্কিনের শারীরিক দুর্বলতা আরম্ভ হয়। এই সময়ে তিনি ষ্ট্রিক্‌নিন্‌ উপক্ষার নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ডাক্তারেরা সন্দেহ করলেন—উপক্ষারের বিষে তাঁর দেহ হয়ত বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডে হাওয়া পরিবর্তনের জন্যে গেলেন। সেখান থেকে পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

১৯২৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে হঠাৎ উইলিয়াম হেন্‌রী পার্কিনের কর্মময় জীবনের অবসান হয়। উইলিয়াম হেন্‌রী পার্কিনের কর্মপ্রতিভা সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে চিরকালের জন্যে আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাকবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

অগ্ন্যুৎপাতের কাহিনী

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব আগ্নেয়গিরি দেখা যায় তাদের উদ্গীরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাদের কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—হাউই দলীয়, ষ্ট্রম্ব্‌লী দলীয়, ভিসুভিয়াস দলীয়, পীলি দলীয়, প্লিনি দলীয় এবং ভাল্‌কান্‌ দলীয়। এই পাহাড়গুলির কয়েকটির পরিচয় দেওয়া যাক। প্রথমেই ধরা যাক, হাউই দ্বীপের আগ্নেয়গিরির কথা।

সারা হাউই দ্বীপটা ব্যাসাল্ট দিয়ে গড়া। অগ্ন্যুৎপাতের মালমশলা দিয়ে তৈরি সবচেয়ে বড় আর বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপপুঞ্জ। এর পূর্বতীরে গুটিকয়েক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। প্রায় পাঁচটি শিখর দেখা যায় এখানে। তাদের মধ্যে মৌনালোয়া আর কিলাউয়া শিখর দুটি সক্রিয়। মৌনালোয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি। এর দু-তিন মাইল বিস্তৃত প্রকাণ্ড জ্বালামুখ থেকে গলিত লাভা বেরুতে থাকে। গলিত লাভা অনেক সময় প্রবলবেগে উঠে যায় হাজার ফিটেরও ওপরে। লাভার চাপে পাশের দেয়ালে ফাটল ধরে। সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে লাভাস্রোত—গলিত পদার্থের নদীর মত। জ্বালামুখের কাছে তার গতি মানুষের গতির চেয়েও বেশী। যতই সে ঠাণ্ডা হতে থাকে ততই ধীর হয় তার গতি।

উনিশ শ' ছাব্বিশ সালে একবার সমুদ্রের তীরে হুপুলোয়া গ্রাম চাপা পড়ে গিয়েছিল লাভাস্রোতে। হাউঈয়ের রাজধানী হিলো লাভার আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ছ-মাস ধরে সেই লাভা-প্রবাহ নগরের দিকে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ তার গতি শেষ হয়ে গেল নগরের কিছুদূরে। তাই তো সে যাত্রা রক্ষা পেল অসংখ্য লোক। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালে আর একবার এগিয়ে এসেছিল লাভাস্রোত ছু-মাইল বেগে। সেবার বহুকষ্টে বিমান-পোত থেকে নানা উপায়ে লাভার গতিপথে বাধা দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং সে চেষ্টা সার্থকও হয়েছিল। মৌনালোয়াকে তাই বলা হয়েছে আগ্নেয়গিরির সম্রাট। কিলাউয়ার তলায় আছে গলিত ধাতুর এক বিশাল হ্রদ। তাকে বলা হয় 'অনিঃশেষ অগ্নি-আবাস' (House of Everlasting Fire)। বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ডানা বলেছেন যে, একবার বিস্ফোরণের সময় কিলাউয়া থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল—তা আশ্চর্য তেজসমন্বিত। সেই আলোতে চল্লিশ মাইল দূরেও মধ্যরাত্রে কোন লোক অনায়াসেই ছোট অক্ষরে ছাপা বই পড়তে পারতো—এমনই আলোর ঝল্‌কানি!

এবার আসা যাক, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরির কথায়। এই অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাম্বোরাতে যে উদ্গীরণ হয়েছিল, তার তুলনা ইতিহাসে নেই। ছুর্ভাগ্যবশতঃ এই উদ্গীরণের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় নি। তাম্বোরার পরেই কারাকোটার নাম করা যেতে পারে। কারাকোটা একটি দ্বীপ। পাহাড়ের নাম হলো রাকাটা। এটি প্রায় ২৬০০ ফিট উঁচু পাহাড়। সুমাত্রা আর জাভা তার ছু-পাশে। ১৮৩৩ সালের মে মাসে দেখা গেল, সেই পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার মেঘ সমস্ত পাহাড়ের শীর্ষদেশ ঘিরে আছে। তারপরেই তিন মাসের মধ্যে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণ হতে লাগলো—হতে লাগলো ভূকম্পন; তারপর হঠাৎ আরম্ভ হলো উদ্গীরণ। অভাবনীয় উন্মাদনায় সমস্ত দিক প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। বিপুল বেগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পাহাড়ের একাংশ। ঘনঘোর ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন। ধূলিতে বাতাস পূর্ণ। বিস্ফোরণের উৎকট শব্দ ভেসে গেল তিন হাজার মাইল দূরে। এক হাজার মাইল দূরে ব্যাটাভিয়া আর জাভাতে বাতাসের বেগে দরজা ভেঙে হলো চৌচির। ধূলা প্রায় বছরখানেক ছিল বাতাসে। এই ধূলার ফলে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে দেখা যেত, বিচিত্র বর্ণে আকাশ রাঙিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

বিস্ফোরণের শেষে দেখা গেল, সেই দ্বীপের প্রায় ⅔ অংশ উড়ে গেছে। এই দ্বীপে লোকজন ছিল না বললেই চলে। কাজেই বেশী মানুষের মৃত্যু হয় নি; কিন্তু বিস্ফোরণের বেগে সমুদ্রে প্রায় ১০০ ফিট উঁচু ঢেউ উঠেছিল। সেই ঢেউ যখন আছড়ে পড়লো সমুদ্রের ধারে, তখন আশপাশের গ্রামের প্রায় ৩৬০০০ হাজার লোক ডুবে মরেছিল।

এরপরই যে আগ্নেয়গিরির নাম করা যায় তাহলো ভয়াবহ ভিসুভিয়াস। খ্রীষ্টাব্দের

গোড়াতে নেপল্‌স্‌ থেকে সাত মাইল দূরে একটি পাহাড় ছিল। রোমানরা তাকে বলতো সোমা পাহাড়। বহু বছর থেকেই তৃণে-শষ্পে তার শীর্ষদেশ শ্যামল হয়ে উঠেছিল। মানুষের মন থেকে অপসারিত হয়ে গিয়েছিল তার অতীতের ভীষণতার সমস্ত স্মৃতি। তার অভিনব জলহাওয়ার মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর নগর-নগরী গড়ে উঠলো—তার উর্বর মাটিতে ভরে উঠলো ফলের বাগান, দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র প্রভৃতি।

তেষট্টি খ্রীষ্টাব্দে রোমানদের বিলাসনগরী পম্পিয়াই হঠাৎ কেঁপে উঠলো। ভূমিকম্পের জন্যে লোকে কিছুমাত্র চিন্তিত হলো না—আবার তারা গড়তে লাগলো মন্দির, বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট ইত্যাদি। কিন্তু কয়েক বছর পরেই এক ভীষণ বিস্ফোরণে সোমা পাহাড়ের কোণাকৃতি শীর্ষ উড়ে গেল—অসংখ্য শিলাবৃষ্টি হতে লাগলো আশপাশের গ্রামে, নগরে।

প্লিনি এই সময় আঠারো মাইল দূরে মিসেনাম শহরে ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসকে এই অগ্ন্যুৎপাতের একটি আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছিলেন এক চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন—'ছাই আর ধূলায় সারা আকাশ ভরে গিয়েছিল আর তাতে কি ভীষণ অন্ধকারই না হয়েছিল—সে শুধু চন্দ্রালোকহীন মেঘলা রাত্রির অন্ধকার নয়, তা যেন দ্বাররুদ্ধ ঘরের দীপহীন অন্ধকার। সবাই ভেবেছিল—আজই বুঝি শেষ রাত্রি।'

পম্পিয়াইর উপর বিশ-ত্রিশ ফিট পাথর আর ধূলা জমেছিল। পাহাড়ের আরো কাছে ছিল হারকিউলেনিয়াম নগরী। তা-ও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এরপরে আরো অনেক বিস্ফোরণ হয়েছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সবচেয়ে আধুনিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। আজ যাকে ভিসুভিয়াস বলা হয় তা সোমা পাহাড়ের এক অংশের উপর গড়ে উঠেছে। এর উচ্চতা প্রায় ৪০০০ ফিট।

ভিসুভিয়াসের চেয়ে বড় পাহাড় হলো এট্‌না। এইটিই য়ুরোপের সবচেয়ে বড় আগ্নেয় পর্বত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এট্‌না সক্রিয়। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে বোধহয় এর প্রথম বিস্ফোরণ হয়েছিল। সিসিলির উত্তরে ষ্ট্রম্‌ব্‌লী বলে আর একটি পাহাড় আছে। এরও বিস্ফোরণ সুরু হয়েছে ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় থেকে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ভূমধ্যসাগরের আলো-দিশারী' (The light house of the Mediterranean)।

এছাড়াও কাটমই পাহাড়, লাসেন পাহাড় এবং পারিকুটিন পাহাড়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আর একটি পাহাড়ের নাম করা অবশ্য প্রয়োজন। এর নাম পীলী। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই পাহাড় শক্তির পরিচয় দিয়েছে। আপাততঃ পীলী নিস্তব্ধ। ১৯০২ অব্দের মে মাসে এই পাহাড়ে একটা ভীষণ বিস্ফোরণ হয়েছিল। ভীষণ চাপে সমস্ত দেয়ালে ফাটল দেখা দেয়। সেই ফাটল দিয়ে পথ করে নিল গ্যাস আর ভীষণ গরম ধূলা। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হলো এক দারুণ ঘূর্ণীঝড়ের। সেই ঝড়ে ভেঙ্গে গেল বহু বাড়ী,

উল্‌টে গেল বহু টন ওজনের স্তম্ভ। একজন ছাড়া বাকী ৩০,০০০ হাজার অধিবাসী মারা গেল এই উদ্‌গীরণের ফলে।

যে লোকটি বেঁচেছিল সে একটি কয়েদী। সে ছিল মাটির তলার ঘরে। সেখানে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকতে পারে নি বেশী, তাই সে বেঁচে গিয়েছিল।

শ্রীশিশিরকুমার দাশ

উপকারী জীবাণুর কথা

আমরা এতদিন জেনে এসেছি—জীবাণুরা শুধু রোগ উৎপাদন করতে পারে। তারা আমাদের অদৃশ্য শত্রু। আমাদের অলক্ষ্যে কোটি কোটি জীবাণুর দল মৃত্যুদূত রূপে কত সমৃদ্ধশালী অঞ্চলকে শ্মশান করে ফেলেছে। এই ভয়াবহ কাণ্ডের জন্যে আমরা এদের ভয় করি। কিন্তু এই মৃত্যুদূতের দলের মধ্যে কয়েক জাত আবার দলছাড়া হয়ে বেরিয়ে গেছে। তারা মানুষের ক্ষতি তো করেই না বরং নানাপ্রকারে উপকার করে থাকে। মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আজ উপকারী জীবাণুদের উপর গিয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নতুন রূপে এই জীবাণুর দল মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে।

অনেক সময় আস্তাকুড়ের মধ্যে অন্ধকার জায়গায় পচা চিংড়ির খোলার উপর একটা স্নিগ্ধ নীলাভ দ্যুতির বিকিরণ দেখা যায়। ব্যাক্টেরিয়া লুসিফার নামে একজাতীয় জীবাণু এই স্নিগ্ধ আলোক নির্গত করে। এই মৃদু নীলাভ আলোতে বই পড়া যায়, এমন কি ফটোও তোলা যায়; অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে একটানা এক্সপোজার দিতে হয়। বহুপূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় উক্ত জীবাণুর আলোতে ফটো তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই স্নিগ্ধ আলোক সম্বন্ধে গবেষণা যেদিন সাফল্য লাভ করবে সেদিন বড় বড় কাচের পাত্রে রক্ষিত চিংড়ির খোলসে উৎপন্ন জীবাণু থেকে নির্গত সহজ সুলভ আলোর ধারা ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে পড়বে।

রসায়ন-বিজ্ঞানের কাজেও জীবাণুদের লাগানো হয়েছে। কোন কোন সভ্যদেশের বিজ্ঞানীরা সালফার নিষ্কাশনের জন্যে সালফার জীবাণুর গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানেও জীবাণুদের কাজ এগিয়ে গেছে। শোনা যায়, অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে দীর্ঘায়ুলাভের উপায় জানা ছিল। আর বর্তমানকালে সুবিখ্যাত জীবাণু-বিদ্‌ মেচ্‌নিকফ প্রমাণ করেছেন যে, দধি-উৎপাদক ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া দীর্ঘজীবন লাভে সহায়তা করে। ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশের হুনজারা প্রচুর পরিমাণে দধি ও ঘোল খেয়ে থাকে; ফলে তাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকে এবং দীর্ঘায়ু হয়।

বুলগেরিয়ার এক শ্রেণীর লোকেরা প্রচুর পরিমাণে দধি ভক্ষণ করে। তারা সকলেই দীর্ঘজীবী ও বলিষ্ঠ। মেচ্‌নিকফ এই দই বিশ্লেষণ করে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া পেয়েছিলেন এবং পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, তারা পাকস্থলীর উত্তাপ সহ্য করে বেশ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য জীবাণুদের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রাখে। শিশুর অন্ত্রে দধি-উৎপাদক জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে অনেক ক্ষেত্রেই অনিষ্টকারী জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডে বড় বড় দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা সুগন্ধ পনীর তৈরি করবার সময় বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবাণুর সাহায্য নিয়ে থাকেন।

কৃষিকার্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহুদিনের। উদরপূর্তির জন্যে মানুষ কঠিন পরিশ্রম করে মাটির বুকে সোনার ফসল ফলিয়ে থাকে—একথা সত্য; কিন্তু তাদের অলক্ষ্যে অতিক্ষুদ্র জীবাণুর দলও একটানা কাজ করে সহযোগিতা করছে। পাটের গাছ কাটা হয়ে গেলে চাষীরা কিছুদিন ধরে সেগুলিকে জলে ভিজিয়ে রাখে। পাটগুলি পচতে আরম্ভ করলে ওর ছালটা কাণ্ড থেকে শিথিল হয়ে পড়ে। এও একরকম জীবাণুর কাজ।

উদ্ভিদের উপকারে আসে এমন জীবাণুও আছে। মটর গাছের মূলে ছোট ছোট গোলাকার স্ফীতি দেখা যায়। তার মধ্যে ব্যাসিলাস র‍্যাডিকিকোলা নামে এক প্রকার জীবাণু বাস করে। এরা উদ্ভিদকে নাইট্রোজেন যোগান দিয়ে জীবনধারণে সাহায্য করে। মাটিতে গলিত লতাপতা ও পচা জীবজন্তুর দেহ থেকে অ্যামোনিয়ার উৎপত্তি হয়। ব্যাক্টেরিয়াম নাইট্রোসোমোনাস জাতের জীবাণুগুলি অ্যামোনিয়াকে নাইট্রাইট ও ব্যাক্টেরিয়াম নাইট্রোমোনা জাতের জীবাণুগুলি নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে পরিণত করে মাটিকে প্রতিনিয়ত উর্বরা করে তুলছে।

মাটির বুকে জীবাণু-জগতের এক বিশাল রাজ্য রয়েছে। তাদের বিচিত্র ব্যবহার ও অপূর্ব রহস্য এতদিন অজ্ঞাত ছিল; আজ মানুষের হাতে তা ধরা দিয়েছে। জীবাণুবিদ ডক্টর সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান দীর্ঘকাল ধরে মৃত্তিকাবাসী জীবাণু নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। অক্লান্ত গবেষণার ফলে তিনি ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন গ্রিসিয়াস নামে এক প্রকার জীবাণু মাটির মধ্যে আবিষ্কার করেন। সেই জীবাণুকে তিনি ল্যাবোরেটরীতে আগার প্লেটে কালচার করে দেখলেন যে, জীবাণু-নিঃসৃত রস যক্ষ্মা-জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। তিনি এই অ্যান্টিবায়োটিকের নাম দিলেন ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারের ফলে ভেষজ-বিজ্ঞানের এক নতুন দিক খুলে গেছে এবং এই বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা যারা নিজেদের মৃত্যুর হীম-শীতল স্পর্শ অনুভব করবার জন্যে ভয়বিবর্ণ মুখে দিন গুণছিল, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারের ফলে তাদের প্রাণে আজ বাঁচবার বিপুল আশা জেগেছে।

ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ছাড়া আরও কতকগুলি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে।

এদের নাম হলো অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন ও টেরামাইসিটিন। অরিওমাইসিন ও টেরামাইসিন ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া ও ভাইরাসঘটিত রোগে প্রয়োগ করা হয়। টাইফয়েড রোগে আমাদের দেশে ক্লোরোমাইসিটিন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

বিশাল জীবাণু-জগতের রহস্যের দ্বার ক্রমশ উন্মুক্ত হচ্ছে। এমনও একদিন ছিল যেদিন জীবাণুরা মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। আজ বিজ্ঞানীরা শুধু যে রোগৎপাদক জীবাণুদের দমন করেছেন তা নয়, বিভিন্ন প্রকার জীবাণুরা যাতে অন্য কাজে লাগে তার জন্যেও তাঁদের গবেষণার বিরাম নেই।

শ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য

জানবার কথা

(১)

আকাশ নীল কেন?

তোমাদের মনে হতে পারে আকাশে হাওয়া ছাড়া বোধহয় আর কিছুই নেই। কিন্তু আকাশে হাওয়ারই একচ্ছত্র রাজ্যত্ব নয়। হাওয়ার সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে কোটি কোটি সূক্ষ্ম ধূলিকণা। এই ধূলিকণাগুলির কাজ কি জান? ধূলিকণা না থাকলে জলীয় বাষ্প মেঘের আকার ধারণ করতে পারত না। আকাশ যে নীল দেখায় তার মূলে হচ্ছে সূক্ষ্ম ধূলিকণা। সূর্যের সাদা আলো যখন এসব ধূলিকণার উপর পড়ে তখন সূর্যের সাদা আলো থেকে নীল আর বেগুনী রঙের ঢেউগুলি ধূলিকণায় বাধা পায়। কারণ লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি রঙের ঢেউ-এর চাইতে নীল আর বেগুনী রঙের ঢেউগুলি খুব ছোট। ফলে, এই ছোট ঢেউগুলি ধূলিকণায় বাধা পেয়ে ফিরে আসে। আর লাল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি রঙের ঢেউগুলি ধূলিকণাগুলিকে এড়িয়ে চলে যায়। নীল আর বেগুনী রঙের ঢেউগুলি ধূলিকণায় প্রতিফলিত হয়ে যখন আমাদের চোখে পড়ে তখন আমরা আকাশকে নীল দেখতে পাই।

৪০ থেকে ১৩০ মাইল পর্যন্ত হাইড্রোজেন স্ফীয়ার বলে একটা বায়ুর স্তর আছে; নীল আকাশের সীমা সেইখানেই শেষ। তার উপরে উঠলে আকাশকে কালো মনে হবে; কারণ তার উপরে কোন ধূলিকণার অস্তিত্ব নেই।

(২)

রং কোথা থেকে এলো

তোমরা সবাই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে, কেরোসিন তেল, সরিষার তেল,

পেট্রোল ইত্যাদি যখন কোন পাত্রে থাকে, তখন তাথেকে কোন প্রকার রং বের হতে দেখা যায় না। কিন্তু যেই এক ফোঁটা তেল জলে ফেলে দেবে অমনি দেখতে পাবে, সেই একফোঁটা তেল থেকে লাল, নীল প্রভৃতি রং বের হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে—সূর্যের আলো যখন তেলের পর্দার উপর এসে পড়ে তখন আলো কতকটা তেলের পিঠে আর কতকটা জলের পিঠে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। তেলের পর্দার স্থূলতার জন্যে তেলের উপর পিঠ থেকে প্রতিফলিত আলোর ঢেউ নীচেকার জলের পিঠ থেকে প্রতিফলিত ঢেউয়ের চাইতে একটু এগিয়ে থাকে। কিন্তু সূর্যের আলোর সমস্ত রঙের ঢেউ সমান নয়। ফলে আলোর ঢেউগুলি দু-বার প্রতিফলিত হয়ে আসবার সময় কখনও একটার ঢেউয়ের মাথা অন্য ঢেউয়ের পেটে এসে ঠেকে। এর ফলে ঢেউ দুটি কাটাকাটি হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সূর্যের সাত রঙের মধ্যে যে সব রঙের ঢেউগুলি কাটাকাটি করে নষ্ট হতে পারে না সেই রঙগুলি আমরা তেলের পিঠে দেখতে পাই। শুধু যে তেলে দেখা যায় তা নয়, ঝিনুকের বোতামে, সাবানের বুদ্‌বুদে এইপ্রকার বিচিত্র রঙের খেলা দেখতে পাওয়া যায়।

(৩)

কার গতি বেশী ?

(ক) মনে কর একটা লোক দিনে ২৫০০০ মাইল বেগে পূব থেকে পশ্চিম দিকে ছুটছে, আর একটা লোক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন দুজন লোকের কার গতি বেশী, বলতে পার ? তোমরা হয়ত বলবে যে, যে লোক দিনে ২৫০০০ মাইল বেগে পূব থেকে পশ্চিম দিকে ছুটছে তার গতি হবে সব চাইতে বেশী। কিন্তু যে লোকটা দিনে ২৫০০০ মাইল বেগে পূব থেকে পশ্চিম দিকে ছুটছে প্রকৃতপক্ষে তার কোন গতিই নেই। আর যে লোকটা একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে তার গতি হবে দিনে ২৫০০০ মাইল। তোমরা শুনে হয়তো একটু অবাক হয়ে যাবে ; কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই।

তোমরা সবাই জান যে, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে দিনে একবার নিজ অক্ষের উপর প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে ২৫০০০ মাইল। সুতরাং পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূবে দিনে ২৫০০০ মাইল বেগে ঘুরছে। এখন একটা লোক যদি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তবে লোকটার গতি হবে দিনে ২৫০০০ মাইল। কিন্তু আর একটা লোক যদি পূব থেকে পশ্চিম দিকে দিনে ২৫০০০ মাইল বেগে ছুটতে থাকে তবে লোকটার গতি হবে শূন্য ; কারণ একই গতিতে লোকটা পৃথিবীর উপরে পৃথিবী গতির বিপরীত দিকে ছুটছে।

(খ) একটা লোক পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা লোক

পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—দুজনের মধ্যে কার গতি বেশী? তোমরা হয়তো বলে ফেলবে—দু-জন লোকই দাঁড়িয়ে আছে, তবে আবার বেশী কম হবে কেন? কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবে যে, পাহাড়ের উপরে যে লোক দাঁড়িয়ে আছে তার গতি হবে বেশী। কেন গতি বেশী, সেটা তোমরা একটু ভেবে দেখলেই নিজেরা বুঝে নিতে পারবে, আশাকরি। যদি কেউ বুঝতে না পার তবে আমাকে জানিও।

শ্রীবিনোদ রক্ষিত

বিবিধ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

গত ৬ই জানুয়ারি লক্ষ্ণৌয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের সাধারণ পরিষদের এক সভায় ডাঃ এস. এল. হোরা কংগ্রেসের ৪১তম অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আগামী বৎসর হায়দরাবাদে এই অধিবেশন হইবে।

১৯৫৩-৫৪ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন:

অঙ্কশাস্ত্র—ডাঃ এস. কে. চক্রবর্তী (কলিকাতা); পরিসংখ্যান—ডাঃ কে. আর. নায়ার (দেরাদুন), পদার্থবিজ্ঞান—ডাঃ টি. এস. গিল (আলিগড়); রসায়ন—ডাঃ সুব্রাহ্মনিয়াম (মহীশূর); ভূতত্ত্ব ও ভূগোল—ডাঃ এইচ. এল. ছিবরা (বারাণসী), উদ্ভিদবিজ্ঞান—ডাঃ এস. এল. দাশগুপ্ত (লক্ষ্ণৌ); নৃতত্ত্ব ও প্রত্নবিদ্যা—ডাঃ ধরণীধর সেন (লক্ষ্ণৌ) প্রাণিবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব—ডাঃ ভি. ভি. ভাল (বোম্বাই); চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসাবিজ্ঞান—ডাঃ আর. এন. চৌধুরী (কলিকাতা); কৃষিবিজ্ঞান—ডাঃ বি. পি. পাল (নয়াদিল্লী); শারীরতত্ত্ব—ডাঃ পি. বি. সেন (কলিকাতা); মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান—ডাঃ সুহৃৎ সিংহ (কলিকাতা) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং—ডাঃ এইচ. এন. শ্রীবাস্তব (জব্বলপুর)।

বিবর্তনবাদের হারানো খেই

জোহান্সবার্গের এক খবরের প্রকাশ—মাদাগাস্কার দ্বীপের দুইশত মাইল পশ্চিমে এক সুদূর দ্বীপে পাঁচ ফুট দীর্ঘ কোক্লাকান্থ নামে যে দুর্লভ মৎস্য ধরা পড়িয়াছে, প্রাণ থাকিতে থাকিতে তাহাকে লইয়া আসিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা বিমান বহরের এক-খানা ডাকোটা বিমান ঐ দ্বীপে যাত্রা করে। এই মৎস্য যে জাতীয়, পৃথিবীতে ৫ কোটি হইতে ৭ কোটি বৎসর পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল। মানব সমেত প্রাণী জগতের বিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদে এই মৎস্যকে 'হারানো খেই' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী এই সংবাদ অবগত হওয়ার পর তাড়াতাড়ি তথায় বিমান পাঠাইয়া দেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক স্মিথ মাছটিকে জীবিত রাখিবার আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জামাদি লইয়া উক্ত বিমানে গমন করেন; কারণ, উহাকে জীবন্ত অবস্থায় পাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কতকগুলি বিস্ময়কর রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে।

চক্ষুতে অভিনব অস্ত্রোপচার

গত ১৮ই ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতার একটি হাসপাতালে জনৈক রোগীর চক্ষুতে নূতন ধরনের এক

অস্ত্রোপচার করিয়া উহাতে 'প্লাষ্টিক লেন্স' বসাইয়া দেওয়া হয়। ভারতে এরূপ অস্ত্রোপচার ইহাই প্রথম বলিয়া দাবী করা হয়।

ইসলামিয়া হাসপাতালে শ্রীরামপুরের শ্রীফণী ঘোষ নামক ৬২ বৎসরের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চক্ষুর ছানিতে উপরোক্ত নূতন ধরনের অস্ত্রোপচার চালান হয়। শ্রীযুত ঘোষ তাঁহার ছানিপড়া চক্ষুতে উক্তরূপ অস্ত্রোপচার করিয়া উহাতে 'এক্রাইলিক লেন্স' বসাইবার ঐ অভিনব প্রচেষ্টা চালাইতে দিতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হন।

ডাঃ ভি. পি. প্যাটেল ঐ অস্ত্রোপচার করেন। তিনি বলেন—এই নূতন ধরনের অস্ত্রোপচার ও লেন্স বসাইবার সুবিধা এই যে, ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট রোগী পরে উভয় চক্ষু একই সঙ্গে ব্যবহার করিয়া দুই চক্ষুর সম দৃষ্টি লাভের সুযোগ পাইয়া থাকেন। রোগীকে সাধারণতঃ ছানিপড়া চক্ষুর জন্য পরে যে পুরু উচ্চ শক্তির চশমা ব্যবহার করিতে হয়, নূতন ধরনের এই অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁহাকে আর সেরূপ চশমা পরিতে হইবে না। তাছাড়া ইহার দ্বারা রোগীর পরে আর পথ চলাচলে কোন অসুবিধাও বোধ হইবে না। ডাঃ প্যাটেল দাবী করেন যে, ছানিপড়া চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করিয়া প্লাষ্টিক লেন্স বসাইলে তাঁহার চক্ষুতে ছানিপড়ার পূর্বেকার দৃষ্টিই ফিরিয়া আসিবে।

ডাঃ প্যাটেল বলেন যে, ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা সার্জন ডাঃ রিডলে গত কয়েক বৎসর যাবৎ সাফল্যের সহিত এই অভিনব অস্ত্রোপচার চালাইতেছেন। ভারতে ইহাই প্রথম এই ধরনের অস্ত্রোপচার হইল।

ডাঃ প্যাটেল জানান যে, শ্রীযুত ঘোষের অবস্থার বেশ উন্নতিই হইতেছে।

ভারতে অন্ধত্ব ও তাহার প্রতিকার

পৃথিবীর যে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক অন্ধ ব্যক্তি বিদ্যমান। কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীঅমল শাহের একটি বিবৃতি লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনারের অফিসের সরকারী মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান নিউজে' প্রকাশিত হওয়ায়, যাঁহারা চক্ষুতে প্রয়োগের লোশন ও চক্ষু রক্ষাকারী ঔষধপত্রাদির প্রস্তুত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের আগ্রহ নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়াছে। শ্রী শাহ তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারতে দুই লক্ষ লোক অন্ধ এবং এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্ধ ব্যক্তিদিগের মোট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। তিনি বলিয়াছেন যে, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই কুড়ি হাজার অন্ধ আছে এবং এই সংখ্যার তিনগুণ লোক আংশিকভাবে অন্ধ।

ভারতে অন্ধত্বের এই উচ্চ হারে যাঁহারা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত 'আই-বাথ' প্রস্তুতকারক অপট্রেক্স (ওভারসীজ) লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ. এম. সিওয়ার্ড এবং এই প্রতিষ্ঠানের রপ্তানী বিভাগের ম্যানেজার এল. ডব্লু. এইচ. হিলের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগ-দানার্থ এখানে আগত আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখ ও অন্যান্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহেই চক্ষুরোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। প্রবল বায়ু, ধূলাবালি, অতিরিক্ত গরম ও তীব্র আলোকের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রথমে চক্ষু-রোগের লক্ষণসমূহ এত সামান্য ধরনের থাকে যে, যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করিলে রোগের বৃদ্ধি রোধ করা যায় এবং পরবর্তী কালের গুরুতর জটিলতাসমূহ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তৎসমুদয় সম্পর্কে চক্ষুরোগীরা অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ভারতে বর্তমানে 'অপট্রেক্স' অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্পই বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রস্তুত-কারকগণ ভারতেই উহা প্রস্তুত করিবেন বলিয়া আশা করেন।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের ৭ লক্ষ ২০° হাজার একর এবং সাঁওতাল পরগণার ৬০ হাজার একর অনুর্বর জমিতে প্রধানতঃ জলসেচের ব্যবস্থা করিবার জন্য রচিত ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ ধীরে ধীরে হইলেও নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয় হইবে ১৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। উহার আওতায় ১৯৫০-৫১ সালে ৮০ হাজার একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। আগামী বর্ষার সময় মোট দেড় লক্ষ একর জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৫৪ সালের জুন মাসে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সকল কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এজন্য যে ২৭ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান জলপ্লাবিত হইবে, সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঐ তারিখ পিছাইয়া দিতে হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় এপর্যন্ত তিলপাড়া ব্যারাজ ও হেডওয়ার্কস নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। মশানজোড় বাঁধের ভিত্তিভূমির কংক্রীটকরণ এবং দেওয়াল গাঁথুনীর কাজ চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত ছোটখাট ব্যারাজের মধ্যে কোপাই-এর কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আর তিনটি ব্যারাজের কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে। খাল খননের কাজও অগ্রসর হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতে যে সকল নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ জাতীয় গঠন পরিকল্পনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার ৭ লক্ষ ২০ হাজার একর এবং বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণা জেলায় ৬০ হাজার একর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হইবে।

সাঁওতাল পরগণা হইতে উদ্ভূত ময়ূরাক্ষী নদী ১৫০ মাইল দীর্ঘ পথ বাহিয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। এই নদীর জলপ্রবাহের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং সাঁওতাল পরগণায় কৃষিকার্যের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং শিল্পের জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অধীনে নিম্নলিখিত বাঁধ ও খাল নির্মিত হইবে—(ক) সিউড়ি হইতে ২২ মাইল দূরে বিহারের অন্তর্গত মশানজোড় নামক স্থানে ২১৭০ ফুট দীর্ঘ বাঁধ এবং ২৭ বর্গমাইল পরিমিত জলাধার নির্মিত হইবে।

(খ) ময়ূরাক্ষীর উপর নির্মিত ব্যারাজ ও হেড-ওয়ার্কস হইতে দুইটি প্রধান খাল সুরু হইবে।

(গ) ১৪০০ বর্গ মাইল পরিমিত এলাকায় ১০৫৯ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করা হইবে।

(ঘ) ময়ূরাক্ষী হইতে নির্গত কয়েকটি শাখা নদীর উপর দিয়া 'ব্যারাজ', 'একুইডাক্ট', 'সাইফন' নির্মাণ করিয়া আড়াআড়িভাবে কয়েকটি প্রধান পয়ঃপ্রণালী খনন।

এই পরিকল্পনার আওতায় যে এলাকা পড়িয়াছে, তাহার অধিকাংশই উঁচু নীচু জমি। এই অঞ্চলে ফসলের উৎপাদন কম; কারণ এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয় না এবং বৃষ্টির জল সকল অংশে পাওয়া যায় না। এই জন্য এতদঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার একর পরিমাণ কৃষিযোগ্য জমিতে চাষ হয় না। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা দ্বারা সেচের ব্যবস্থা হইলে ঐ এলাকায় ৩ লক্ষ টন ধান এবং ৬০ হাজার টন গম, আলু, ডাইল প্রভৃতি অতিরিক্ত ফলন হইবে।

মশানজোড় বাঁধ হইতে মোট দুই হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহা বাঁধ সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে কুটিরশিল্পের উন্নয়নের

জন্য ব্যবহার করা হইবে। বর্ষার সময় উহা হইতে আরও ২০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহা দ্বারা জল পাম্প করিয়া সেচের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

মশানজোড় বাঁধের খননকার্য স্থরু হয় ১৯৫১ সালের মে মাসে। ১৯৫২ সালের মার্চ মাস হইতে দেওয়ালের গাঁথুনী স্থরু হইয়াছে। প্রায় চার হাজার শ্রমিক এই কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সপ্তাহে এক লক্ষ কিউবিক ফুট গাঁথা হইতেছে। প্রথম বছরে ১৬ লক্ষ কিউবিক ফুট গাঁথা হইয়াছে। মোট প্রয়োজন ১ কোটি কিউবিক ফুটের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৮ লক্ষ কিউবিক ফুট গাঁথা হইয়াছে।

বাঁধ এলাকায় জলপ্লাবনের ফলে ২৭ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের ১৬ হাজার (২ হাজার পরিবার) অধিবাসীকে বাস্তুচ্যুত হইতে হইবে। বাস্তুচ্যুত গ্রামবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটি সহরে ৩০০০ একর এবং বীরভূম জেলার অন্তর্গত রাজনগরে ৬০০০ একর পরিমাণ জমিতে গত বৎসর দুইটি পুনর্বাসন ব্লক নির্মাণ করেন। প্রতি ব্লকে ১০০টি পরিবারের স্থান সঙ্কুলান হইবে। কিন্তু এ পর্যন্ত বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলের কোন অধিবাসী উক্ত দুইটি ব্লকে যাইতে স্বীকৃত হয় নাই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিহার সরকারের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। এই বৎসর ৫ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে এই অঞ্চলের ৯টি গ্রাম জলপ্লাবিত হইবে। ইহার মধ্যে তিনটি গ্রাম সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইবে। জলপ্লাবনের ফলে এতদঞ্চলের ২৭৬ জন লোককে (৪৭টি পরিবার) অন্ততঃপক্ষে সময়িকভাবেও পুনর্বাসন ব্লকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হইতেছে—এই জন্য যথাসম্ভব কায়িক শ্রমের সাহায্য লওয়া হইতেছে। ইহার ইঞ্জিনীয়ারগণ মনে করেন যে, দামোদর পরিকল্পনায় অধিক পরিমাণে যান্ত্রিক সাহায্য লওয়া হইতেছে বলিয়া উহার ব্যয়ের পরিমাণ ৫৫ কোটি টাকা হইতে ৮৯ কোটি টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। কায়িক শ্রম নিয়োগের ফলে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট সংখ্যাকে ছাপাইয়া উঠে নাই।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। বাঁধ, ব্যারাজ প্রভৃতির নক্সা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। খাল নির্মাণের নক্সা ও ডিজাইন প্রভৃতির শতকরা ৮০ ভাগ কাজ শেষ হইয়াছে। ২। মশানজোড় বাঁধের ভিত্তির কংক্রিট করা এবং দেওয়াল গাঁথুনীর একাংশ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ৩। তিলপাড়ায় ব্যারাজ ও হেডওয়ার্কস নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। চারিটি ছোটখাট ব্যারাজের মধ্যে কোপাই ব্যারাজের নির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। বক্রেশ্বরের কাজ আগামী জুন মাসে শেষ হইবে। দ্বারকা ও ব্রাহ্মণীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ৪। খাল খননের কাজ শতকরা ৪০ ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

তিলপাড়া ব্যারাজ ও হেডওয়ার্কস হইতে ১৯৫০-৫১ সালে ৮০ হাজার একর পরিমাণ জমিতে জল দেওয়া হয়। ফলে ঐ এলাকায় ১৯৫১ ৫২ সালে ৪০০০০ টন অতিরিক্ত ধান উৎপন্ন হয়। গত বর্ষার সময় বীরভূম জেলায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় সেচের উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ করার প্রয়োজন হয় নাই। অবশ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার একর পরিমাণ জমিতে সেচের জন্য জল মজুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বীরভূম জেলার কৃষকগণ কর্তৃক জল না লওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে একরপ্রতি ৪৲ টাকা জলকর ধার্যের দাবী সম্পর্কে আন্দোলনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষণে এক বৎসরের জন্য জলকর একর প্রতি ৭৷৷০ টাকা ধার্য আছে। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, প্রয়োজন হইলেই (অর্থাৎ উপযুক্ত বৃষ্টি না হইলে) কৃষকগণ জল লইতে বাধ্য হইবে। অবশ্য কৃষককে জোর করিয়া জল লইতে বাধ্য করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়।

এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের ধারণা যে, একরপ্রতি ১০৲ টাকা জলকর ধার্য করিলে সেচের জন্য অতিরিক্ত ফসলের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকের কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নাই। আগামী বর্ষার সময় ময়ূরাক্ষী ১২৫০০০, কোপাই ১০০০০ এবং দ্বারকা হইতে ১৫০০০—মোট ১৫০০০০ একর জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ চলতি বৎসরে প্রধান ও শাখা খালসমূহে ২৩ কোটি কিউবিক ফুট মাটি উত্তোলন, সাঁওতাল পরগণায় ১১০০ একর কৃষিযোগ্য জমি পুনরুদ্ধার এবং মশানজোড় বাঁধের ভিত্তিভূমি কংক্রীটকরণ এবং দেওয়াল গাঁথুনীর কাজে আরও অগ্রসর হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। চলতি বৎসরে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

সৌরশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

বোষ্টনের এক সংবাদে প্রকাশ—দুইজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সূর্যের শক্তি ব্যবহারের একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা পরিশেষে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে।

ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এ সম্পর্কে গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়। সূর্যের রশ্মির সাহায্যে জলকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত করিয়া পরে গ্যাস দুইটিকে জ্বালাইয়া তাপ উৎপাদন করা হয়। মার্কিন বিজ্ঞান সমিতির মুখপত্র 'সায়েন্স' পত্রিকায় এই প্রক্রিয়াটির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

পদ্ধতিটি এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে রহিয়াছে। তবে পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ভবিষ্যতে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতে পারে।

রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ লরেন্স. জে. হাইট এবং ডাঃ এলেন. এফ. ম্যাকমিলান এই গবেষণাকার্য চালান।

এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান বস্তু হইল 'সিরিয়াম'। সিরিয়াম একটি দুষ্প্রাপ্য খনিজ ধাতু। ইহা জল দ্রবণের মধ্যে দুই রূপে বর্তমান থাকে। সূর্যকিরণের প্রভাবে এই সিরিয়াম এক রূপ হইতে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয় এবং পুনরায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা জলকে উহার মূল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত করা হয়।

বর্তমানে এই উপায়ে অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস উৎপন্ন হয়। তবে ডাঃ হাইট বলেন যে, উত্তাপের সাহায্য না লইয়াও প্রচুর পরিমাণ গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব।

গ্যাস দুইটি উৎপন্ন হওয়ার পর উহাদের জ্বালাইয়া পুনরায় একীভূত করা যায় এবং এই সংযোজনের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহার সাহায্যে ইঞ্জিন চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

সূর্যালোক হইতে খাদ্য

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ—সূর্যালোক হইতে খাদ্য ও শক্তিসংগ্রহের গবেষণার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশান কর্তৃক কংগ্রেসের নিকট প্রদত্ত একটি বিবরণীতে জানা গিয়াছে। সালোক সংশ্লেষণ (Photo-synthesis) বিষয়ে যে গবেষণা করা হইতেছে, তাহারই ইহা অন্যতম ফল।

ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একটি সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক গবেষণা ইহারই নির্দেশে চালানো হয় এবং গবেষণার গুণাগুণ বিচারও এই সংস্থাই করিয়া থাকে। তদুপরি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে গবেষণাকার্যে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই সংস্থাই আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে।

১৯৫৩ সালের আর্থিক বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে এবং হাওয়াই দ্বীপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে

মোট ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলার সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে মোট ২৫ লক্ষ ডলার ইহা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের জন্য মঞ্জুর করিয়াছে।

উপরোক্ত রিপোর্টে আরও প্রকাশ—সকল গাছপালা ও জীবজন্তুর জীবন নির্ভর করে এই সালোক সংশ্লেষণের উপর। এই পদ্ধতিতেই গাছপালা, সূর্যালোক, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চলিতেছে। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ লেভিন ক্যালভিন এই সম্পর্কে গবেষণা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছেন তাহা খুবই আশ্চর্যজনক; তবে তাঁহার মতে সূর্যালোক হইতে খাদ্য সংগ্রহের গবেষণা কিরূপ ফলপ্রসূ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত।

প্রণালীবদ্ধ জীববিদ্যা বিষয়ে এবং জীববিদ্যার অন্যান্য বিভাগের গবেষণা কার্যে এই সংস্থা সাহায্য করিয়া আসিতেছে। উদ্ভিদবর্গ ও প্রাণী-প্রজাতির শ্রেণীবিভাগ করাই এই প্রণালীবদ্ধ জীববিদ্যা গবেষণার উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর টেলিফোন

দেশ	সংখ্যা
আফ্রিকা	
মিশর	১,১৫,৫০০
ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা	৪,৫৮,৮০০
এশিয়া	
সিংহল	১৬,৮০০
চীন	২,৫৫,০০০
ভারতবর্ষ	১,৬৮,৪০০
ইন্দোনেশিয়া	৪৩,০০০
জাপান	১৮,০২,৫০০
পাকিস্তান	১৮,৭০০
তুরস্ক	৬৫,১০০
ওশেনিয়া	
অষ্ট্রেলিয়া	১১,৫৮,২০০
নিউজিল্যাণ্ড	৩,৬৯,৯০০
উত্তর আমেরিকা	
কানাডা	২৯,১১,৯০০
যুক্তরাষ্ট্র	৪,৩০,০৩,৮০০
মধ্য আমেরিকা	
কিউবা	১,২০,৬০০
মেক্সিকো	২,৮৫,৬০০
দক্ষিণ আমেরিকা	
আর্জেন্টিনা	৭,৯৮,৩০০
ব্রেজিল	৫,৪৯,৭০০
চিলি	১,৩৪,৮০০
কলম্বিয়া	১,০০,৮০০
ইউরোপ	
অষ্ট্রিয়া	৪,১২,৩০০
বেলজিয়াম	৬,৮৭,০০০
ডেনমার্ক	৭,২৩,৪০০
ফ্রান্স	২৪,০৫,৮০০
পঃ জার্মানী	২৩,৯৩,০০০
আয়ারল্যাণ্ড	৮২,০০০
ইতালী	১২,৪৪,১০০
নেদারল্যাণ্ড	৭,৮১,৬০০
নরওয়ে	৪,৫১,৭০০
পোল্যাণ্ড	২,৩০,০০০
সুইডেন	১৬,৮৫,২০০
সুইজারল্যাণ্ড	৮,৯৬,৩০০
রাশিয়া	১৫,৭০,০০০
বৃটেন	৫৪,৩৩,০০০

পরিসংখ্যানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বিভিন্ন রাজ্যে কি বাবদ কিরূপ অর্থ ব্যয় হইবে

(লক্ষ টাকায়)

"ক" শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহ

	কৃষি পল্লী উন্নয়ন	প্রধান সেচ ও শক্তি পরিকল্পনা	শিল্প	যানবাহন	সামাজিক কার্য	অন্যান্য
আসাম	৩৯৯·৫	২৮৩·০	২৫·০	২৪৪·৯	৭৯৬·৮	×
বিহার	১৬৭৭·৬	১৬৮২·০	১১৯·২	৮০০·০	১৪৫০·৩	×
বোম্বাই	২৮৭১·৯	৩৩১২·০	৩৫৩·৭	১৩৮৮·৬	৬৭১৭·৩	×
মধ্যপ্রদেশ	১৩৮২·৫	৯০৮·০	২৩৫·৪	২০০·০	১৫৮২·৩	×
মাদ্রাজ	২১৮২·৫	৮৪৩২·০	২০২·০	৫০০·০	২৭৬৭·৬	×
উড়িষ্যা	৩৫২·৯	৬৯১·০	৯২·৯	২২১·০	৪২২·৯	৩·৫
পাঞ্জাব	২৬২·৫	৩৬৪·৪	৬৩·৬	৭৫·১	২৫৫·১	১০০০·০
উত্তর প্রদেশ	২৫৫২·৭	৩৩২৩·০	৫০২·২	৬৪২·৪	২৬৮২·৬	×
পঃ বাঙ্গলা	১০৪৯·১	১৬১৮·৬	১১৬·৭	১৫৭৫·৬	২৫৫৪·৭	×

"খ" শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহ

	কৃষি পল্লী উন্নয়ন	প্রধান সেচ ও শক্তি পরিকল্পনা	শিল্প	যানবাহন	সামাজিক কার্য	অন্যান্য
হায়দরাবাদ	৪৬৩·০	২৭৯৯·৬	২৯৬·৪	১২৮·৬	৪৬৯·৪	×
মধ্য ভারত	৯৫৫·০	৫১৬·০	৫৫·০	১৮৯·০	৪৯৭·০	×
মহীশূর	৫১৫·৫	১৯৮৪·০	১৭০·২	৩২০·১	৫৯০·৪	×
পেপসু	৪৩৫·৯	৬৪·৬	৩১·৭	৯৫·১	১৮৬·৯	×
রাজস্থান	১৬৭·৩	৫৪৪·৪	৩৮·৫	৪০১·০	৫৩০·২	×
সৌরাষ্ট্র	৫২৬·৬	৬৮৭·১	১৪·৮	৩৮৬·০	৩৫৪·৫	৭২·০
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৬৩০·৬	১৫১৩·০	১০৩·৮	২২২·০	২৬১·৫	×

"গ" শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহ

	কৃষি পল্লী উন্নয়ন	প্রধান সেচ ও শক্তি পরিকল্পনা	শিল্প	যানবাহন	সামাজিক কার্য	অন্যান্য
আজমীর	৭৭·০	১১·৩	×	১৫·৯	৫৩·০	×
ভূপাল	২০৭·০	২৭·৯	৫·০	৪০·০	১১০·০	×
বিলাসপুর	১৩·৬	×	০·৫	২৫·০	১৮·০	×
কুর্গ.	৩·০	৩৫·০	×	২০·০	১৫·০	×
দিল্লী	৮৯·০	×	৭·৩	২৪১·০	৪১০·৭	×

হিমাচল প্রদেশ	১২৫'৪	৯৩'৫	২৬'০	১২০'০	৯২'৮	×
কচ্ছ	৭০'৮	১১৪'০	৩৫	৭০'৭	৪৫'৩	×
মণিপুর	৬'৩	১২'০	×	৯১'৮	৪৪'৭	×
ত্রিপুরা	২৭৮	৭'০	৫'৮	১২৮'০	৩৮'৭	×
বিন্ধ্য প্রদেশ	২৪৫'৮	৫০'৫	৬'০	১২৫'৯	২১১'০	×

জম্মু ও কাশ্মীর

৪৭'১	৪৪১'৬	৮১'৮	৪৯৪'৪	১৮৬'২	৪৮'৯

কোন্ শ্রেণীর রাজ্যে কি কি উন্নয়ন বিষয় বাবদ কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইবে

(লক্ষ টাকায়)

বিষয় বাবদ	মোট	কেন্দ্রীয় সরকার	'ক'শ্রেণী রাজ্য	'খ'শ্রেণী রাজ্য	জম্মু ও কাশ্মীর	'গ'শ্রেণী রাজ্য
কৃষি ও জনসঙ্ঘ উন্নয়ন						
কৃষি	১০৪২২'২	৫৯২২'২	৯১০৮'২	২৭৭১'০	২২'২	৫৯৮'৭
পশুপালন	২২২৮'৫	৪১২'০	১৫২৪'৬	১৯৭'৯	১৫'০	৭৯'০
বন	১১৬৯'৫	২০০'০	৫৯৯'৮	২২৪'৭	১০'০	১৩৫'০
সমবায়	৭১১'২	৫০'০	৪৯১'৭	১২৫'২	×	৪৪'৩
মৎস্য	০৬৪'১	৫০'৫	৩৩২'৫	৭২'৯	×	৮'২
পল্লী উন্নয়ন	১০৪৭'১	×	৬৭৪'৪	৩৭২'২	×	০'৪
জনসঙ্ঘ পরিকল্পনা	৯০০০'০	৯০০০'০	×	×	×	×
স্থানীয় কার্য	১৫০০'০	১৫০০'০	×	×	×	×
দুর্গত অঞ্চল	১৫০০'০	১৫০০'০	×	×	×	×
সেচ এবং বিদ্যুৎ						
বহুমুখী পরিকল্পনা	২৬৫৯০'০	২৬৫৯০'০	×	×	×	×
সেচ „	১৬৭৯৬'৫	×	১১২৩৪'৩	৫০১৩'২	৩৬৬'৭	১৮২'৩
শক্তি „	১২৭৫৪'০	×	৯৩৭৪'৭	১৩৫'৫	৭৪ ৯	১৬৮'৯
যানবাহন এবং যোগাযোগ						
রেল	২৫০০০'০	২৫০০০'০	×	×	×	×
রাস্তা	১০৮৮৭'০	৩১২৪'০	৫০৫৯'২	১১৮২'৮	৪৯৪'৪	৬২৭'৪
যানবাহন	৮৯৬'৯	×	৫৬২'৪	৯৬'০	×	২৩৮'৫
জাহাজ	১৮০৫'৮	১৮০৫'৮	×	×	×	×
বেসামরিক বিমানপথ	২২৮৭০	২২৮৭'০	×	×	×	×

পোতাশ্রয়	৩৩০৮'৮	৩২০৬ ৪	২৬'০	৬৩ ০	×	১৩'৪
আভ্যন্তরীণ জলপথ	১০'০	১০'০	×	×	×	×
পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ	৫০০০'০	৫০০০'০	×	×	×	×
বেতার	৩৫২'০	৩৫২'০	×	×	×	×
বৈদেশিক যোগাযোগ	১০০'০	১০০'০	×	×	×	×
ভূতত্ত্ব বিভাগ	৬২'০	৬২'০	×	×	×	×
শিল্প						
বৃহৎ শিল্প	১৪০৩৩'২	১২৬০৪'৩	১০২৫'৮	৩৫২'৫	৫০'৬	×
কুটীর-শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৭০৪'১	১৫০০'০	৭৬৭'৯	৩১৬'৯	৩১'২	৫১'১
বৈজ্ঞানিক গবেষণা	৪৬১'০	৪৬১'০	×	×	×	×
খনি উন্নয়ন	১০৬'১	১০৬'১	×	×	×	×
সামাজিক কার্য						
শিক্ষা	১৫৫৬৬'১	৩১০১'৬	৯৮৮১'০	১২২৭ ৪	৪৬'০	৫১০'১
স্বাস্থ্য	৯৯৫৪'৬	১৭৮৭'৪	৬৩৫০'৩	১২৩৮'১	১২৮'২	৪১০'৬
গৃহনির্মাণ	৪৮৮০'৬	৩৮৫০ ০	৩৮৭৭'১	৮৭'৫	১২'০	৫৫'০
শ্রমিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন	৬৯১'৭	৩৯৭'৩	২৭৩'১	২০'৩	×	১'০
অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন	২৮৮৭'২	৭০০'০	২৮৪৮'১	৩১৬'৬	×	২২'৫
পুনর্বাসন	৮৫০০'০	৮৫০০'০	×	×	×	×
সরকারী ইমারত	১১০২'৩	১১০২ ০	×	×	×	×
অর্থ দপ্তর	৪৩৯'৬	৪৩৯'৬	×	×	×	×
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত	৩০০'০	৩০০'০	×	×	×	×
আন্দামান	৩৮২'৮	৩৮২'৮	×	×	×	×
কর্পোরেশনকে ঋণ	১২০০'০	১২০০'০	×	×	×	×
অন্যান্য	১৭৭৪'৪	১৭৭৪'৪	×	×	×	×
সর্বমোট	২০৬৮৭৮'১	১২৪০৫৪'৩	৬১০১১'৬	১৭৫২১'৭	১৩০০'০	৩১৮৬'৫

পৃথিবীর চিনি উৎপাদন

(অপরিষ্কৃত)

হাজার টন

	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩
বীট চিনি		
পঃ জার্মানী	১০,৭৩	৯,০০
পূঃ জার্মানী	৭,৩৮	৬,৪০
চেকোশ্লোভাকিয়া	৭,১৪	৬,৭০
পোল্যাণ্ড	৯,৩৭	৯,৮৫
ফ্রান্স	১২,৩২	১০,৮০
বেলজিয়াম	২,৬৩	৩,১৫
হল্যাণ্ড	৩,৪৫	৪,১
ডেনমার্ক	৩,৫৭	২ ৬

সুইডেন	২,৮৯	২,৮৫
ইটালী	৭,০৯	৭,১০
ব্রিটেন	৬,৫৯	৬,৩০
রুশ গণতন্ত্র	২৫,৬০	২৭,০০
অপরাপর (ইউরোপ)	১,১২,৫৮	১,১০,২৩
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৩,৬৮	১৩,৭০
সম্মিলিত মোট	১,২৮,৫১	১,২৬,২৮

ইক্ষু চিনি		
কিউবা	৭১,১০	৫০,৭০
সানডোমিঙ্গো	৫,৮০	৬,০০
মেক্সিকো	৭,৪০	৭,৮৫
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩,৭৪	৪,৯৭
হাওয়াই	৯,৪০	৯,৪০
পোর্টোরিকো	১২,১৪	১০,৬২
ফিলিপাইন	৯,৩০	১০,৯২
ব্রিটিশ গায়ানা	২,২৫	২,৪৫
ব্রিঃ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	৬,৭৩	৬,৬৯
দক্ষিণ আফ্রিকা	৪,৭৫	৫,৮৯
অষ্ট্রেলিয়া	৭,২০	৯,০০
ব্রেজিল	১৫,৬৭	১৮,০০
আর্জেণ্টাইনা	৬,৪১	৫,৫০
ভারত ও পাকিস্তান	৪২,০০	৪২,০০
ফরমোসা	৫,০০	৮,০০
অপরাপর সম্মিলিত	২,৪১,৬৭	২,৩২,৪৮
মোট বীট ও ইক্ষু (অপরিষ্কৃত)	৩,৭০,১৮	৩,৫৮,৭৬

বিভিন্ন দেশে পাটকল

১৯৫০-৫১ সালে বিভিন্ন দেশে পাটকলে তাঁত সংখ্যা ও তাহাদের শতকরা অনুপাত নিম্নে দেওয়া হইল—

দেশ	তাঁত	শতকরা
ভারতবর্ষ	৬৮,৪১৬	৫৭·০
জার্মানী	৯,৬০০	৮·০
ইংল্যাণ্ড	৮,৫০০	৭·১
ফ্রান্স	৭,০১০	৫·৮
দঃ আমেরিকা	৬,০০০	৫·০
ইটালী	৫,০০০	৪·১
বেলজিয়াম	৩,০০০	২·৫
উঃ আমেরিকা	২,৭৫০	২·৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	২,০০০	১·৭
পোল্যাণ্ড	১,৬০০	১·৩
জাপান	১,৫০০	১·২
অষ্ট্রিয়া	১,১০০	১·০
অপরাপর	৩,৬০৫	৩·০
মোট	১,২০,০৭১	১০০·০

পৃথিবীর ইস্পাত উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র

(হাজার (মেট্রিক) টনে)

	১৯৫১	১৯৫২
ইউরোপ	৬,৭৬,৩৯	৭,৩৮,৭০
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯,৫৪,৩৭	৮,৪৭,৫০
রুশ গণতন্ত্র	৩,১৩,০০	৩,৫০,০০

ইউরোপে প্রধান ইস্পাত উৎপাদক দেশ

(হাজার (মেট্রিক) টনে)

	১৯৫১	১৯৫২
ব্রিটেন	১,৫৮,৮৯	১,৬৪,০০
পঃ জার্মানী	১,৩৫,০৬	১,৫৮,০০
ফ্রান্স	৯৮,৩৫	১,০৯,০০
বেলজিয়াম	৫০,৯১	৫১,০০
লাক্সেমবুর্গ	৩০,৭৭	৩০,৫০
ইটালী	৩০,০৭	৩৫,০০

সার	২৬,০৩	২৮,০০
অষ্ট্রিয়া	১৫,২৫	১৬,৫০
সুইডেন	১০,২৮	১০,৬০
স্পেন	৮,১২	৮,৯০
অপরাপর সম্মিলিত	৫,৮১,০৩	৬,২৯,৭০
এতদ্ব্যতিরেকে		
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩৩,১২	৩৫,০০
পোল্যাণ্ড	২৭,৯২	৩২,৫০
পঃ জার্মানী	১৫,৫২	২০,০০
হাঙ্গেরী	১২,৩৪	১৪,২৫
রুমানিয়া	৬,৪৬	৭,২৫
মোট	৯৫,৩৬	১,০৯,০০

ভারতবর্ষে ১৯৫১ সালে ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৫২ সালে ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার টন হইয়াছে বলিয়া অনুমান।

বিজ্ঞপ্তি

সারস্বত সংঘের উদ্যোগে

জনপ্রিয় বক্তৃতা

গত ১২ ফেব্রুয়ারি '৫৩ তারিখ অধ্যাপক ডাঃ নন্দলাল ঘোষ মহাশয় 'গণিতের ক্রমবিকাশ' বিষয়ে বঙ্গবাসী কলেজে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা দিয়াছেন।

আগামী বক্তৃতা

মার্চ মাসে

বক্তা—ডাঃ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিষয়—কুইনাইন

এপ্রিল মাসে

বক্তা—ডাঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

বিষয়—কার্বন-১৪ ও কালনির্ণয়

স্থান ও সময় যথাসময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, বসুবিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ হইতে মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | মার্চ—১৯৫৩ | তৃতীয় সংখ্যা

পিথাগোরাস ও পিথাগোরীয় বিজ্ঞান

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

মাইলেটাসের অনতিদূরে উত্তর-পশ্চিমে সামোস্ দ্বীপ। বিখ্যাত আয়োনীয় গ্রীক দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ পিথাগোরাস এই সামোস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। থালেস ও ইউক্লিডের মত তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সম্ভবতঃ ফিনিশীয় ছিলেন। পিথাগোরাসের জন্মসন অনিশ্চিত; ইহা খ্রীষ্টীয় ৫৭২-৭০ পূর্বাব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন; কাহারও মতে ৭৫, কাহারও মতে ৮০ বৎসর বয়সে মেটাপন্টিয়াসে তিনি পরলোক গমন করেন (৪৯৭?)।

পিথাগোরাসের জীবনের তারিখ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কেবল এইটুকু জানা যায় যে, ৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি সামোস্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ইতালীতে ডোরিয়ানদের উপনিবেশ ক্রোটনের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে এক গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘ স্থাপন করেন। ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাই এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সঙ্ঘের সদস্যদের সরল, অনাড়ম্বর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে হইত এবং তাঁহাদের কার্যাবলী ও আলোচনার ফলাফল বাহিরে প্রকাশ করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। পিথাগোরীয়েরা বিশ্বাস করিতেন, আত্মা সাময়িকভাবে দেহপিঞ্জরে বাঁধা পড়ে এবং বারবার আত্মার এইরূপ বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় হইল স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস-জীবনের কৃচ্ছ্র বরণ করা। এই ভ্রাতৃসঙ্ঘ সমাজ সংস্কারমূলক কার্যেও নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিল। ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সমাজের নৈতিক মান উন্নয়ন এবং ক্ষমতালোভী দলের পরিবর্তে প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা রাজ্য পরিচালনের আদর্শ প্রচার করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রচারকার্য সম্পর্কে ভ্রাতৃসঙ্ঘকে নানারূপ রাজনৈতিক বিপাকে পড়িতে হয়। কথিত আছে, আনুমানিক ৫০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভ্রাতৃসঙ্ঘের বিরুদ্ধে প্ররোচিত হইয়া এক উন্মত্ত জনতা সঙ্ঘের বহু ভ্রাতাকে নির্মমভাবে হত্যা ও তাঁহাদের গৃহ-সম্পত্তি অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করে। দলের নেতা পিথাগোরাস ট্যারেন্টামে পলায়ন করিয়া কোনক্রমে প্রাণরক্ষা

করেন। পিথাগোরাসের জীবদ্দশাতেই ভাঙ্গনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলেও খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সঙ্ঘের শেষ অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিথাগোরাসের বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুপ্রেরণার মূল উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তিনি থালেসের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এই প্রখ্যাত দার্শনিকের শিক্ষা ও রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত, থালেস তাঁহার নিজস্ব সঞ্চিত গ্রন্থাদি ও জ্ঞান-ভাণ্ডার পিথাগোরাসকে অর্পণ করিয়া যান এবং থালেসের পরামর্শেই তিনি যৌবনে দীর্ঘকাল মিশর ও ব্যাবিলনে জ্যামিতি ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের উল্লেখও হয়ত অমূলক নহে। পিথাগোরীয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও গণিতে ভারতীয় চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ একান্ত লক্ষণীয়।

পিথাগোরাস তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণার ফল ও নানা মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষা বহু বৎসর পিথাগোরীয় শিষ্যদের মধ্যে মুখে মুখে আলোচিত, সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া আসিয়াছিল। ভ্রাতৃসঙ্ঘের কার্যকলাপ গোপন রাখিবার প্রয়োজন হইতেই পিথাগোরীয়েরা ছাত্র পরম্পরায় এইরূপ মৌখিক শিক্ষা ও আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবেষণার ফল লিখিয়া প্রকাশ করার অপরাধে সঙ্ঘের কোন কোন শিষ্যকে বিশেষ শাস্তি, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি গোলকের অভ্যন্তরে একটি ডোডেকাহেড্রনের অঙ্কনকৌশল প্রকাশ করিবার অপরাধে সঙ্ঘের একজন ছাত্র হিপ্পাসাস্‌কে, কেহ বলেন ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল, কেহ বলেন সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। সক্রেটিস ও ডিমোক্রিটাসের সমসাময়িক থিব্‌স্‌-এর পিথাগোরীয় বিজ্ঞানী ফিলোলাউস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী) সর্বপ্রথম ভ্রাতৃসঙ্ঘের গবেষণা ও মতবাদ সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করেন। ফিলোলাউস নিজেও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এক সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই ফিলোলাউসের রচনাবলীই পিথাগোরাস ও তাঁহার সহকর্মী ও শিষ্যদের গবেষণা সম্বন্ধে জানিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রচনাবলীর মূল সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই নিখোঁজ হইয়াছে। ইউডিমাস, প্রোক্লাস প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় ইহার কিছু কিছু অংশ সংরক্ষিত হইয়াছে। প্লেটো তাঁহার *Timaeus* গ্রন্থের অনেক স্থানে ফিলোলাউসের মতবাদ আলোচনা করিয়াছেন। এইভাবে নানা হাত ঘুরিয়া ও নানাভাবে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়া পরবর্তী-কালে পিথাগোরাসের আবিষ্কার ও মতবাদ বলিয়া যাহা স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে তাহার কতটুকু পিথাগোরাসের নিজস্ব অবদান আর কতটুকু তাঁহার শিষ্যবর্গের সম্মিলিত সাধনার ফল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অ্যারিষ্টটলও এই ধাঁধায় বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন; তাই পিথাগোরীয় দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখের পরিবর্তে তিনি বহুবচনে 'পিথাগোরীয়েরা' শব্দটি বরাবর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও পিথাগোরাস সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে এই রহস্যময় বিজ্ঞানীর অদ্ভুত প্রতিভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এই প্রতিভার স্পর্শে সংখ্যাতত্ত্ব, গণিত, জ্যামিতি, শব্দবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও দর্শন নূতন অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করে। ব্যবহারিক বিদ্যার পর্যায় অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানের এই বিভাগগুলি শুদ্ধ মননশীলতার বিষয় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গণিতে পিথাগোরীয়েরা যে উচ্চ মান ও আদর্শ স্থাপন করেন তাহা পরবর্তী গ্রীক গণিতজ্ঞদের গবেষণার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

সংখ্যাতত্ত্ব ও গণিত

প্রথমে গণিত ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে পিথাগোরীয়দের গবেষণার কথা আলোচনা করা যাক। পিথাগোরীয়েরা সংখ্যাকে বস্তু-নিরপেক্ষ মনে করিতেন না। সংখ্যা নিরালম্ব, অমূর্ত, কাল্পনিক কোন জিনিষ নহে, বস্তুজগতের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; এমন কি নানা বাস্তব গুণাগুণের অধিকারীও ইহারা বটে। পূর্ণ সংখ্যার আপাতঃ রহস্যজনক নানা অর্থ আছে। সংখ্যা ১-এর অর্থ বিন্দু, ২-এর রেখা, ৩-এর ক্ষেত্র, ৪-এর দেশ (space)। এতদ্ব্যতীত ২-এ স্ত্রীজাতির গুণ বিদ্যমান, ৩-এ পুরুষ জাতির এবং ৫-এ বিবাহের; কারণ ২ (স্ত্রীজাতি) + ৩ (পুরুষ) = ৫ (বিবাহ))। ৪ হইল ন্যায়ের প্রতীক; যেহেতু এই সংখ্যা দুইটি সমান গুণকের গুণফল (২×২)। যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যার সহিত পিথাগোরীয়েরা দক্ষিণ ও বাম, অসীম ও সসীম প্রভৃতি নানা ধারণার অবতারণা করিতেন।

সঙ্গীতের সুরলহরী তারা, উদারা, মুদারার (octaves) সহিত সংখ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় পিথাগোরাস ও তাঁহার শিষ্যবর্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তারের যন্ত্রে যে বিবিধ সুরের সঞ্চার হয় তাহার প্রভেদ নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের উপর। তাঁহারা দেখান যে, প্রথম, পঞ্চম ও অকটেভ সুর সৃষ্টির জন্য তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত সব সময়ে ৬ : ৪ : ৩ হইয়া থাকে। সঙ্গীত ও ধ্বনিবিজ্ঞানে ইহা এক মৌলিক আবিষ্কার। সংখ্যার আশ্চর্য মহিমার ইহা আর একটি দৃষ্টান্তও বটে!

পিথাগোরীয়েরা জ্যামিতিক ধারণার সাহায্যেও সংখ্যার মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১, ৩, ৬, ১০, ১৫ ইত্যাদি সংখ্যার নাম দিয়াছিলেন 'ত্রিভুজ সংখ্যা'; কারণ এইরূপ সংখ্যক বিন্দুর সাহায্যে যে কোন সমবাহু ত্রিভুজ আঁকিতে পারা যায় (১নং চিত্র)। সেইরূপ ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫ ইত্যাদি হইল 'বর্গ সংখ্যা'। যে কোন বর্গ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুর সাহায্যে একটি বর্গ রচনা সম্ভবপর (২নং চিত্র)। তারপর তাঁহারা দেখান যে, পরপর যে কোন দুইটি ত্রিভুজ সংখ্যার যোগফল একটি বর্গ সংখ্যা। ২নং চিত্রের পঞ্চম নক্সাটি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

১নং চিত্র

২নং চিত্র

সংখ্যার এই প্রকার মরমীবাদী ও জ্যামিতিক ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক মনে হইবে। কিন্তু পিথাগোরীয়দের কাছে সংখ্যার গুরুত্ব ছিল অন্য প্রকার; সংখ্যা-রহস্যের সহিত প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড ও সৃষ্টি-রহস্যের সম্বন্ধ যে অতি নিবিড় এবং প্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ডকে

বুঝিতে হইলে যে সংখ্যা-রহস্যের কিনারা হওয়া দরকার, পিথাগোরীয়দের ইহাই ছিল ধ্রুব বিশ্বাস। প্লেটো যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, মনই হইল সৃষ্টির গোড়ার কথা এবং বিশ্ব প্রকৃতি এই মন দ্বারাই গঠিত, অথবা ডিমোক্রিটাস প্রমুখ আণবিক দার্শনিকেরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতিতে অণু-পরমাণুরাই একমাত্র সত্য এবং নানাভাবে ইহাদের বিচিত্র খেলাই আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ পিথাগোরীয়দের প্রত্যয় হইয়াছিল যে, জগৎ সংখ্যাময়। অসংখ্য 'মোনাড' বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যাংশের সমন্বয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে, অতএব সংখ্যার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি হইতেই বিশ্বরহস্যের কিনারা করা সম্ভব হইবে।

সংখ্যার গবেষণা সম্পর্কে পিথাগোরীয়দের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল ২-এর বর্গমূলের ($\sqrt{২}$) অমেয়ত্ব উপলব্ধি করা। $\sqrt{২}$ হইল m/n। তাহা হইলে m ও n উভয়েই এক সঙ্গে যুগ্ম সংখ্যা হইতে পারে না।

এখন $2 = \frac{m^2}{n^2}$,

সুতরাং $m^2 = 2n^2$; অতএব m^2, অর্থাৎ m যুগ্ম সংখ্যা।

ধরা যাক, $m = 2p$; $m^2 = 4p^2$;

সুতরাং, $4p^2 = 2n^2$

এবং, $n^2 = 2p^2$; অতএব দেখা যাইতেছে n ও একটি যুগ্ম সংখ্যা।

কিন্তু আমরা বলিয়াছি একইকালে m ও n যুগ্ম সংখ্যা হইতে পারে না। সুতরাং $\sqrt{২}$ -কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে পিথাগোরীয়েরা উপসংহার করেন যে, $\sqrt{২}$ একটি অমেয় রাশি।

সংখ্যার জ্যামিতিক ব্যাখ্যায় পিথাগোরীয়দের প্রচেষ্টার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পিথাগোরীয়
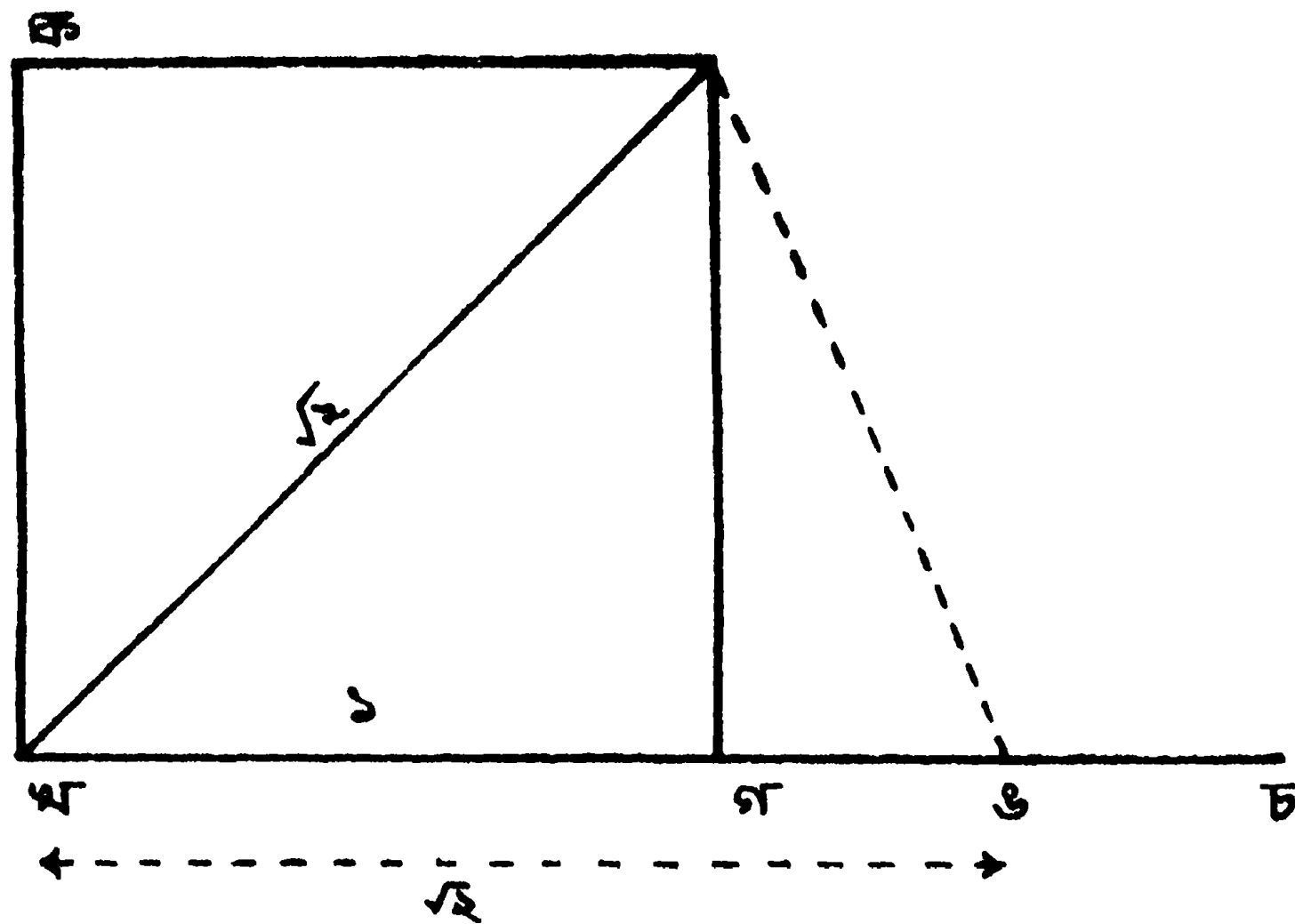
৩নং চিত্র

একটি অমেয় (incommensurable) বা অমূলদ রাশি; অর্থাৎ এই বর্গমূলকে পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহার প্রমাণ খুব সহজ। মনে করা যাক, $\sqrt{২}$ কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভবপর এবং এই ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার উপপাদ্যের সহিত এই আবিষ্কারের তাৎপর্য যাচাই করিতে গিয়া তাঁহারা সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন। $\sqrt{২}$ -এর মান হইল ১'৪১৪২...। এই মানের অর্থ এই যে, $\sqrt{২}$ ১$\frac{৪}{১০}$ অপেক্ষা বড় কিন্তু ১$\frac{৫}{১০}$ হইতে ছোট। দশমিকের দ্বিতীয় ঘর পর্যন্ত ধরিলে

ইহা ১$\frac{৪১}{১০০}$ হইতে বড়, কিন্তু ১$\frac{৪২}{১০০}$ হইতে ছোট, ইত্যাদি। প্রতীকের সাহায্যে এই ব্যাপার আমরা এইভাবে প্রকাশ করিতে পারি :—

$\sqrt{২}$ > ১$\frac{৪}{১০}$, কিন্তু < ১$\frac{৫}{১০}$
> ১$\frac{৪১}{১০০}$, কিন্তু < ১$\frac{৪২}{১০০}$
> ১$\frac{৪১৪}{১০০০}$, কিন্তু < ১$\frac{৪১৫}{১০০০}$
ইত্যাদি।

মনে করা যাক ক খ গ ঘ একটি বর্গ এবং খ ঘ কর্ণ। বর্গের যে কোন বাহুর দৈর্ঘ্য ১ ধরিলে কর্ণের দৈর্ঘ্য হইবে $\sqrt{২}$। খ ঘ কর্ণকে খ চ-এর উপর ন্যস্ত করিতে হইলে কর্ণের ঘ প্রান্তভাগ খ চ-এর উপর ঙ বিন্দুর কাছাকাছি পড়িবে; কিন্তু ঠিক কোন বিন্দুতে? স্থূলভাবে দেখিতে গেলে খ ঙ-এর দূরত্ব হইবে ১$\frac{৪}{১০}$ ও ১$\frac{৫}{১০}$-এর মধ্যে। আরও নিখুঁত মাপ গ্রহণ করিতে গেলে খ ঙ-এব দূরত্ব হওয়া উচিত ১$\frac{৪১}{১০০}$ ও ১$\frac{৪২}{১০০}$ এর মধ্যে। ইহাকে আরও নির্ভুল করিতে হইলে খ ঙ-এর দূরত্ব ১$\frac{৪১৪}{১০০০}$ ও ১$\frac{৪১৫}{১০০০}$-এর মধ্যে হইতে হইবে। এইভাবে আমরা খ ঙ-এর যতই নিখুঁত মাপ লইবার চেষ্টা কবি না কেন, যত সামান্যই হউক, প্রত্যেক বারেই কিছুটা তফাৎ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ ১$\frac{৪}{১০}$ ও ১$\frac{৫}{১০}$-এর দৈর্ঘ্যের মধ্যে অসংখ্য বিন্দুব সমাবেশ সম্ভবপর।

পূর্ণ সংখ্যার উপর পিথাগোরীয়দের গোড়া হইতেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কথা বলিয়াছি। পূর্ণ সংখ্যার ধারণা হইতে তাহাদের মনে হয় যে, রেখা মাত্রই শেষ পর্যন্ত অতি ক্ষুদ্র অথচ সসীম আয়তনের কতকগুলি অংশের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্র অংশগুলিকে যদি বিন্দু বলা হয়, তবে ক্ষুদ্র হইলেও বিন্দুরও একটি নির্দিষ্ট আয়তন আছে। এইরূপ ক্ষুদ্র সসীম বিন্দু বা মোনাডের সাহায্যে তাঁহারা শুধু গণিতরাজ্যের কেন, সমগ্র প্রকৃতি-রাজ্যের এক প্রণালীবদ্ধ ব্যাখ্যা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বিন্দুর ক্ষুদ্রায়তনের কোন নিম্নতম সীমা নাই। ইহাকে যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ভাবা যায়। এইরূপ ভাবিতে গেলে তো বিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাইবার কথা। তবে কি ব্রহ্মাণ্ডের এই বিন্দুতত্ত্ব মিথ্যা, গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই কি অলীক ও মায়া? পিথাগোরীয়দের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, সন্ত্রস্ত হইয়া অমেয় রাশির আবিষ্কারের কথা তাঁহারা বহুকাল গোপন রাখিয়াছিলেন।

অমেয় রাশির জ্যামিতিক ব্যাখ্যায় যে অসঙ্গতির কথা বলা হইল তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর একজন বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ জেনো (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯৫-৪৩৫) একটি চমৎকার উপমা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গণিতের ইতিহাসে ইহা অ্যাকিলিস ও কচ্ছপের দৌড় নামে প্রসিদ্ধ। এই দৌড় প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে কচ্ছপ অ্যাকিলিস হইতে ১০০০ গজ অগ্রগামী: অ্যাকিলিসের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া কি সম্ভব? জেনো দেখাইলেন, পিথাগোরীয়দের দৈর্ঘ্যের ধারণা স্বীকার করিলে অ্যাকিলিস কখনই কচ্ছপকে ধরিতে পারিবে না। মনে করা যাক, অ্যাকিলিস যে সময়ে ১০০০ গজ অতিক্রম করিয়াছে সেই সময়ে কচ্ছপটি অগ্রসর হইয়াছে মাত্র ১০০ গজ। সুতরাং এখনও কচ্ছপটি ১০০ গজ অগ্রগামী। দৌড়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে অ্যাকিলিস ১০০ গজ অতিক্রম করিলে কচ্ছপটি এবারেও ১০ গজ আগাইয়া থাকিবে; পরবর্তী বারে অ্যাকিলিল এই ১০ গজ অতিক্রম করিলে কচ্ছপটি ১ গজ আগাইয়া থাকিবে। এইভাবে অ্যাকিলিস কচ্ছপের যতই নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা করিবে প্রতিবারেই কচ্ছপটি অ্যাকিলিস হইতে কিছুটা অগ্রগামী থাকিবে এবং অনন্তবার চেষ্টা করিয়াও অ্যাকিলিস কচ্ছপটিকে ধরিতে পারিবে না!

জ্যামিতি

সংখ্যাতত্ত্বের পর পিথাগোরীয়দের জ্যামিতিক গবেষণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রেখা, কোণ, তল

প্রভৃতি নানা মৌলিক জ্যামিতিক বিষয়ের সংজ্ঞা তাঁহারাই প্রথম প্রদান করেন। ত্রিভুজের নানা গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁহারাই প্রতিজ্ঞাদি রচনা করেন। ত্রিভুজের তিন কোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান—ইহা তাঁহাদেরই আবিষ্কার। সমান্তরাল রেখার ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহারা কয়েকটি প্রতিজ্ঞা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল আবিষ্কারকেই ম্লান করিয়া দিয়াছে পিথাগোরাসের নামে সুপরিচিত সমকোণী ত্রিভুজের উপপাদ্য।

ইউক্লিড তাঁহার জ্যামিতির ৪৭নং উপপাদ্যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উপপাদ্যটি হইল, এক সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গদ্বয়ের যুক্ত ক্ষেত্রফলের সমান। পিথাগোরাসের নাম জড়িত থাকিলেও তিনিই যে ইহার প্রথম আবিষ্কর্তা তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চৈনিকেরাও সম্ভবতঃ এই উপপাদ্যের কথা অস্পষ্টভাবে জানিতেন। আপস্তম্ভ, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈদিক শুল্বকারগণ এই উপপাদ্যকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের বাহুদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেত্রফলের সমান। হ্যাঙ্কেল, ইয়ুঙ্গে প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে পিথাগোরাস তাঁহার নামে প্রচলিত উপপাদ্যের প্রথম আবিষ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস হীথ এই উপপাদ্য আবিষ্কার সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির দাবীর চুলচেরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাসকে ইহার আবিষ্কর্তারূপে মনে করিবার কোন কারণ নাই; পক্ষান্তরে তাঁহার অভিমত এই যে, ভারতবর্ষে এই উপপাদ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনাই প্রবল। যাহা-হউক এই আবিষ্কারের আদি ইতিহাসের প্রশ্ন এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আমরা যে প্রমাণ পাই তাহা পিথাগোরাসের নহে; পরবর্তী গণিতজ্ঞেরা এই প্রমাণ উদ্ভাবন করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের বেলায়, সহজ অঙ্কনের সাহায্যে এই উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়। ৪নং চিত্রে ক খ গ একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ। বাহু ত্রয়ের উপরে অঙ্কিত বর্গের কর্ণগুলি টানিয়া আমরা যে ক্ষুদ্র ত্রিভুজগুলি দেখাইয়াছি তাহারা প্রত্যেকেই আয়তনে সমান। অতিভুজ খ গ-এর উপর অঙ্কিত বর্গের মধ্যে এইরূপ চারিটি ত্রিভুজ ও অপর বাহুর উপর বর্গের মধ্যে দুইটি করিয়া ত্রিভুজ আছে। পিথাগোরাস সম্ভবতঃ এই জাতীয় অঙ্কনের দ্বারা উপপাদ্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। বর্গ-সংখ্যা লইয়া গবেষণা প্রসঙ্গে পিথাগোরাস এই উপপাদ্যের তাৎপর্য হয়ত আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ বলেন, মিশরীয় রজ্জু-সম্প্রসারকেরা (rope-stretcher) ৩, ৪ ও ৫ অনুপাতের রজ্জুকে বাঁকাইয়া যেভাবে সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উপপাদ্যের সম্ভাবনা পিথাগোরাসের মাথায় প্রথম

৪নং চিত্র

উদিত হয়। সে যাহাই হউক, তিনি এই আবিষ্কারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। অ্যাপোলোডোরাস নামে জনৈক কবির বর্ণনায় জানা যায় যে, পিথাগোরাস এই আবিষ্কার উপলক্ষ্য করিয়া বিশেষ জাঁকজমক সহকারে বৃষবলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যে কোন একটি আয়তক্ষেত্র (rectangle) দেওয়া থাকিলে ইহার ক্ষেত্রফলের সমান একটি বর্গ কিরূপে আঁকিতে পারা যায় পিথাগোরাস নাকি এই সমস্যারও সমাধান করিযাছিলেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক পূর্তবিদ্যায় আয়তক্ষেত্রের সমান বর্গক্ষেত্র রচনার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সমকোণী ত্রিভুজের ধর্ম হইতে অবশ্য ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। ক খ ঘ ত্রিভুজের $\angle$ক সমকোণ (৫নং চিত্র)। ক গ লম্ব টানিলে ক খ গ ও ক গ ঘ ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ হইবে। অর্থাৎ—

$$\frac{\text{ক গ}}{\text{খ গ}} = \frac{\text{ঘ গ}}{\text{ক গ}};$$

$$\text{ক গ}^2 = \text{খ গ} \times \text{ঘ গ}$$
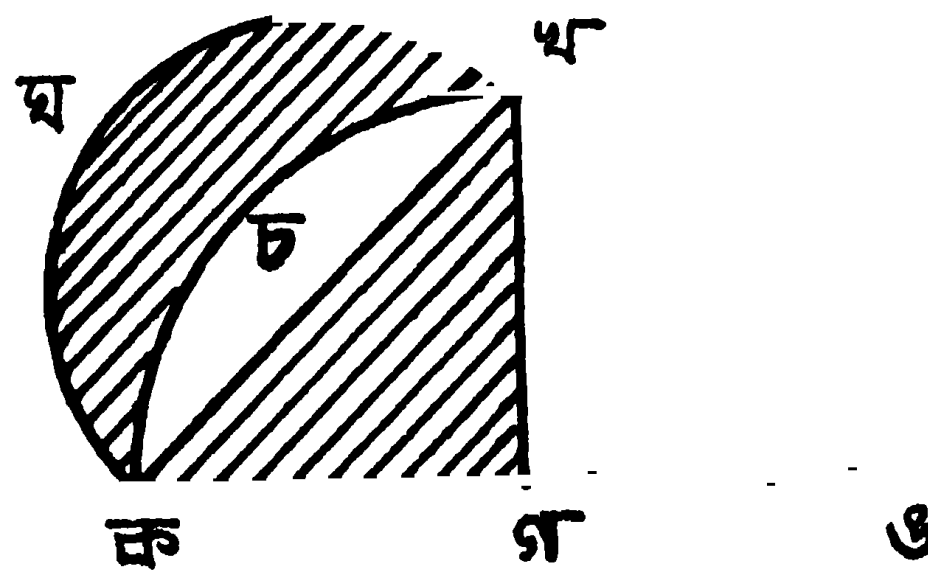
অতএব, ক গ² বর্গক্ষেত্র খ গ × ঘ গ আয়তক্ষেত্রের সমান। পিথাগোরাস ঠিক এইভাবে সমস্যাটির সমাধান করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা যায় না। করিয়া থাকিলে এই একই পদ্ধতিতে পূর্বোক্ত উপপাদ্যটি তাঁহার প্রমাণ করিবার কথা। কারণ তিনি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন যে, এই অঙ্কনে (৫নং চিত্র) ক খ গ, ক ঘ গ ও ক খ ঘ তিনটি ত্রিভুজই সদৃশ। সদৃশ ত্রিভুজের বাহুগুলির পারস্পরিক অনুপাত হইতে সহজেই দেখান যায় যে—

ক খ গ ঘ

৫নং চিত্র

$$\text{ক খ}^2 = \text{খ গ} \times \text{খ ঘ};$$

$$\text{ক ঘ}^2 = \text{ঘ গ} \times \text{খ ঘ এবং}$$

$$\text{ক খ}^2 + \text{ক ঘ}^2 = \text{খ ঘ}(\text{খ গ} + \text{ঘ গ}) = \text{খ ঘ}^2$$

এই সম্পর্কে গ্রীকদের আর একটি বিখ্যাত জ্যামিতিক সমস্যার কথা উল্লেখযোগ্য। ইহা হইল বৃত্তের বর্গকরণ (squaring the circle); অর্থাৎ একটি বৃত্ত দেওয়া থাকিলে তাহার সমান করিয়া একটি বর্গক্ষেত্র রচনা করা। গ্রীকরা এই সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য বলিয়া জানিত। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। তবে হিপোক্রেটিস অব চিওস্ একটি বৃত্তাংশের সমান করিয়া কি ভাবে বর্গক্ষেত্র রচনা করা যায় তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ৬নং চিত্রে ক খ ঙ একটি অর্ধবৃত্ত, ক গ খ সমকোণী ত্রিভুজ এবং ক ঘ খ আর একটি ক্ষুদ্র অর্ধবৃত্ত। হিপোক্রেটিস দেখান যে, বৃত্তাংশ ক ঘ খ চ-এর ক্ষেত্রফল ক খ গ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান; অর্থাৎ $\frac{1}{2}$ ক গ² অথবা $\frac{1}{2}$ খ গ²।

ঘ খ চ ক গ ঙ

৬নং চিত্র

পিথাগোরীয়েরাও নাকি এই ভাবে সমস্যাটির আংশিক সমাধান করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ

জ্যোতির্বিদ্যায়ও পিথাগোরাস ও তাঁহার শিষ্য-বর্গের অনেক অবদান আছে। পৃথিবী, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কদের আকার গোল—পিথাগোরীয়েরা এইরূপ মত পোষণ করিত। পৃথিবী ও জ্যোতিষ্কদের গোলাকৃতির কথা গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরীয়েরাই প্রথম উপলব্ধি করেন। আকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড গোল—সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিষ্কেরাও যে গোল, তাঁহাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে। বিবিধ জ্যামিতিক রেখার মধ্যে বৃত্ত বা গোল রেখা এবং ঘন বস্তুর মধ্যে গোলকই যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুন্দর এইরূপ যুক্তি হইতেও পৃথিবী ও গ্রহদের গোলাকৃতির কথা তাঁহাদের মনে হইতে পারে। অনেকে বলেন, চন্দ্র গ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে গোল ছায়া পড়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া পিথাগোরীয়েরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে এই আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

জ্যোতিষে পিথাগোরীয়দের প্রধান অবদান—আকাশে পৃথিবীর গতি কল্পনা করা। অগ্নিকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে সংস্থাপিত করিয়া তথাকথিত অগ্নি-কেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা পিথাগোরীয়েরাই প্রথম উদ্ভাবন করেন। অনেকে অবশ্য এই পরিকল্পনাকে সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার এক অস্পষ্ট সংস্করণ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সে কথা পরে বলিতেছি। সাধারণভাবে পিথা-গোরীয়দের নামে চলিয়া আসিলেও প্রকৃতপক্ষে ফিলোলাউস ছিলেন এই ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার উদ্যোক্তা। পিথাগোরীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচারক ও লিপিকার হিসাবে ফিলোলাউসের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তিনি পিথাগোরীয় বিজ্ঞানের কেবল একজন সামান্য লিপিকার বা টিকাকারই ছিলেন না; নিজেও ছিলেন একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। তিনি পিথাগোরীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার নানা মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। ভিট্রুভিয়াস তাঁহাকে আরিস্টার্কাস, আর্কিমিডিস্‌, ইরাটোস্থেনিস্‌ প্রমুখ প্রাচীন মনীষীদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ফিলোলাউস সক্রেটিস ও ডিমোক্রিটাসের সম-সাময়িক এবং দুইজনের অপেক্ষাই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে থিব্‌সে তাঁহার কর্মজীবনের আভাস পাওয়া যায়।

অ্যারিষ্টটল, সিম্‌প্লিসিয়াস্‌, এটিয়াস, শিয়াপ্যারেলি প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিত ও লেখকগণ ফিলোলাউসের অগ্নিকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার বিবরণ ও সমালোচনা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সব বিবরণ হইতে পরি-কল্পনাটি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের আকার গোল ও ইহা সসীম। ব্রহ্মাণ্ডের সীমান্ত দেশের বাহিরে অসীম শূন্যতা; এই শূন্যতার জন্য ব্রহ্মাণ্ড শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সক্ষম। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া আছে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড। এই কেন্দ্রীয় অগ্নিই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ, বহন ও পরিচালন করিয়া থাকে, ইহাই প্রাকৃতিক শক্তির উৎস। কেন্দ্রীয় অগ্নির সবচেয়ে নিকটবর্তী কক্ষায় বিপরীত পৃথিবী (antichthon বা counter earth) পরিক্রমণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন কক্ষায় যথাক্রমে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, পাঁচ গ্রহ ও সর্বশেষে স্থির নক্ষত্রেরা কেন্দ্রীয় অগ্নিকে নিয়মিতরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে (৭নং চিত্র)। অগ্নিকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে বসাইবার কারণ এই যে, কেন্দ্রে যোগ্যতম বস্তুরই স্থান হওয়া উচিত এবং মৃত্তিকাময় পৃথিবী অপেক্ষা হুতাশনই এই যোগ্যতার অনেক বেশী অধিকারী—'for they (Pythagorians) consider that the worthiest place is appropriate

to the worthiest occupant and fire is worthier than earth'। *

কেন্দ্রীয় অগ্নি ও সূর্য কি এক? পিথাগোরীয়েরা সে কথা কোথাও বলেন নাই; বরং এই পরিকল্পনায় অগ্নিকে কেন্দ্র করিয়া সূর্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষার (orbit) ব্যবস্থা আমরা দেখিতে পাই। অগ্নির পরিবর্তে সূর্যকে যদি কেন্দ্রে বসান হইত তবে সূর্য-কেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার প্রথম রচয়িতা হিসাবে পিথাগোরীয়েরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনুরূপ সম্মান পাইতেন। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, পিথাগোরীয়েরা কেন্দ্রীয় অগ্নি বলিতে আসলে সূর্যকেই বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা ও ধর্ম সংক্রান্ত জটিলতার আশঙ্কায় প্রকাশ্যে এইরূপ কথা বলিতে সাহস পান নাই।

পিথাগোরীয়েরা বলিতেন, পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে অংশে মানুষের বাস (অর্থাৎ গ্রীক ও গ্রীকদের প্রতিবেশী জাতিদের বাস) সেই অংশ কেন্দ্রীয় অগ্নির বিপরীত দিকে থাকায় এই অগ্নিকে দেখিবার কোন উপায় নাই। নাবিকেরা কিন্তু একথা বহুদিন মনে রাখিল এবং ভূমধ্যসাগর পার হইয়া দক্ষিণে বহুদূরে সমুদ্রপথে পাড়ি দিবার সময় তাহারা অনেকদিন ভাবিয়াছে—এইবার হয়ত কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডের সাক্ষাৎ মিলিবে। দুস্তর সমুদ্র ও নানা অচেনা দেশে অভিযানের সময় বহু আশ্চর্য জিনিষ প্রত্যক্ষ করিবার অভিজ্ঞতা হইলেও কোন নাবিকের মুখে পিথাগোরীয় অগ্নিকুণ্ড দেখিবার গল্প শোনা গেল না।

৩নং চিত্র

তারপর পিথাগোরীয়দের বিপরীত পৃথিবী কল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। অনেকের মতে, গ্রহণের ব্যাখ্যাকল্পে অদৃশ্য ও অস্বচ্ছ বিপরীত পৃথিবী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সংখ্যা সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পিথাগোরীয়েরা আর একটি অদৃশ্য গ্রহের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। তাঁহারা দশ সংখ্যাটিকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত সংখ্যা মনে

* Aristotle, *De caelo*, ii, 13, 293 a; 18-b 30.

করিতেন। কিন্তু পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, পাঁচ গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলকে ধরিয়া মোট সংখ্যা দাঁড়ায়—নয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় নিশ্চয়ই এত বড় খুঁত ইচ্ছা করিয়া রাখেন নাই! তাই দৃষ্টিগোচর না হইলেও এই দশম গ্রহটি হইল বিপরীত পৃথিবী। পিথাগোরীয়দের বিপরীত পৃথিবীর যুক্তি সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটল লিখিয়াছেন: 'They (Pythagorians) conceived that the whole heaven is harmony and number…… For example, regarding as they do the number ten as perfect and embracing the whole nature of numbers, they say that the bodies moving in the heaven are also ten in number, and as those, which we see are only nine, they make the counter-earth a tenth.' *

পিথাগোরীয়েরা শুধু বিপরীত পৃথিবীর কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহারা সঙ্গীতের সুরের সহিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের তুলনা করেন। সঙ্গীতের সুর লহরীতে যেমন সংখ্যার অনুপাত পরিলক্ষিত হয়, কেন্দ্র হইতে গ্রহদের দূরত্বও সেইরূপ একটি বিশিষ্ট আনুপাতিক নিয়মের বশীভূত। এমন কি, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কের অবিশ্রান্ত আকাশ পরিক্রমার ফলে (তাঁহারা ইহাকে বলিয়াছেন গ্রহের নৃত্য) সঙ্গীত ও শব্দ ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়; অতি ক্ষীণ ও মৃদু বলিয়া এই সঙ্গীত অশ্রুত থাকিয়া যায়।

বিপরীত পৃথিবীর পরিকল্পনা, গ্রহদের নৃত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টির ব্যাপারে যত অসঙ্গতিই থাকুক না কেন, পৃথিবীর কেন্দ্রত্ব অস্বীকার করিয়া ও তাহার গতিতে আস্থা স্থাপন করিয়া পিথাগোরীয়েরা স্বল্প কালের জন্য হইলেও সমগ্র জ্যোতিষে এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্লেটো অ্যারিষ্টটল, ইউডক্সাস্ ও অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতদের জোরালো ভূকেন্দ্রীয় মতবাদের চাপে পিথাগোরীয়দের পরিকল্পনা আর মাথা তুলিতে পারে নাই এবং অল্পকালের মধ্যে সাধারণভাবে ইহা বিদ্বজ্জন-সমাজের সমর্থন হারাইয়া ফেলে। দুই একজন জ্যোতির্বিদের রচনায় ইহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যে একেবারেই পাওয়া যায় নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহা নেপথ্যে উঠিয়া নেপথ্যেই মিলাইয়া গিয়াছে। যেমন, সিসেরোর লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সাইরাকিউজের এক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেটাস্ মনে করিতেন, ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পৃথিবীই গতিশীল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি সব নিশ্চল—যে যার স্থানে দাঁড়াইয়া আছে; কেবল পৃথিবী কক্ষে আবর্তিত হইয়া ক্রমাগত আকাশ পথে পরিভ্রমণ করে। আমরা সে গতি বুঝিতে পারি না বলিয়া মনে হয় পৃথিবী ছাড়া আর সব কিছুই গতিশীল ও ভ্রাম্যমান। এই হিসেটাসের কথা কোপার্নিকাসও উল্লেখ করিয়াছেন।

পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও বিদ্যাপীঠের তৎপরতার পরিসমাপ্তির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্লেটোর সময় পর্যন্ত পিথোগোরীয় বিদ্যাপীঠের কর্মীদের বিজ্ঞান-চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। ডিয়ডোরাসের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৬ অব্দেও পিথাগোরীয়েরা সক্রিয় ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য বিস্তার ও চিন্তাজগতে অ্যারিষ্টটলের অধিনায়কত্ব সুরু হইবার পর হইতে পিথাগোরীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্রুত পতন ঘটে।

---

* Aristotle, *Metaphysics*, A. 5, 986 a 2—12.

ফেলে-দেওয়া টিন পুনরুদ্ধার

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

অবশ্য-প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির মধ্যে টিন অন্যতম। পাতলা টিনের পাতের মোড়কে বহুবিধ শিল্পজাত দ্রব্য জড়ানো থাকে, টিনের তৈরি বা টিনের প্রলেপ দেওয়া কৌটা এবং বাক্সের মধ্যে সংরক্ষিত মাছ, মাংস, আচার, জ্যাম, জেলী, ফল, বিস্কুট প্রভৃতি কত রকমের খাদ্যসামগ্রী এবং ওষুধ, রঞ্জক ও রাসায়নিক পদার্থ দেশ-বিদেশে চলাচল করছে। বাড়ীর ছাদের জন্যে লোহার পাতের ওপর টিনের আস্তরণ, পেট্রল, কেরোসিন, তামাক প্রভৃতির আধারস্বরূপ টিনের প্লেটে তৈরি পাত্রের ব্যবহার এবং ব্রোঞ্জ, বেলমেটাল প্রভৃতি টিনযুক্ত মিশ্রধাতু তৈরিতে এই ধাতুটি শিল্পজগতে একটি অপরিহার্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। টিনের অনেক যৌগিক কেমিক্যালেরও বেশ ব্যবহার আছে। টিন ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয় আঁঠা তৈরি ও পালিশ করবার কাজে। চীনামাটির তৈরি টালির সাদা বার্নিশ এবং দুগ্ধশুভ্র কাচ তৈরিতেও এর দরকার হয়। স্ট্যানাস ক্লোরাইড সূতী বস্ত্র রঞ্জনশিল্পে এবং স্ট্যানিক ক্লোরাইড বা 'বাটার অব টিন' রেশমী বস্ত্র রঞ্জনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টিনের প্রচুর ব্যবহার এবং আমাদের দেশে এর স্বল্পতা এই ধাতুটিকে মহার্ঘ করে তুলেছে। হাজারীবাগ এবং ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে খুব অল্প পরিমাণে টিনপ্রস্তর পাওয়া যায়। কাজেই টিনের চাহিদা মেটাতে হয় বিদেশের শরণাপন্ন হয়ে। টিনের অপচয় নিবারণ ও আবর্জনাস্তূপ থেকে টিন উদ্ধার করতে পারলে টিনের অভাব কিছুটা দূর করা যেতে পারে। ফেলে-দেওয়া কাচ, শিশি-বোতল ছেঁড়া কাগজ, পুরানো ভাঙ্গা কাঁসা-পিতল অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি বিক্রি করবার প্রথা আছে। সংগ্রহকারীরা এগুলি কিনে নেয় এবং এ থেকে আবার নতুন জিনিষ তৈরি হয়। কিন্তু পুরানো টিনের জিনিষ, সিগারেটের কৌটা, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি কেউ কেনে না। পুরানো ফেলে-দেওয়া টিন প্রধানতঃ তিনটি স্থান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে: ফল, বিস্কুট, মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের জন্যে কৌটা এবং নানা-প্রকার পাত্র, টিনের খেলনা ইত্যাদি তৈরির ফ্যাক্টরীতে বহু ধাতুর টুক্‌রা, টিনের পাতের কুচি জমে স্তূপাকার হয়ে ওঠে। প্রতিদিন ফ্যাক্টরী থেকে ফেলে-দেওয়া এই পরিষ্কার টিনের কুচির পরিমাণ আমাদের দেশে প্রায় ৫০ টন; বছরে প্রায় ১৫০০০ টনের মত। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এসব কুচিতে মাত্র ২ শতাংশ টিন থাকে এবং এসব জিনিষের তিন চতুর্থাংশ থেকে টিন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, তাহলেও এ থেকে বছরে ২২৫ টন টিন সংগৃহীত হতে পারে। এর মূল্যও খুব কম নয়—প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। কাজেই এই অপচয় অগ্রাহ্য করবার মত নয়।

কারখানায় খনিজ টিন থেকে বিশুদ্ধ টিন তৈরির সময় কিছুটা টিনের অপচয় হয়ে থাকে। পরিশোধন কালে টিনকে ঢালু 'রিভারবারেটরী' চুল্লীর গাত্রে গলান হয়। এই অবিশুদ্ধ টিনে কিছুটা লৌহ, তামা, আর্সেনিক, টাংস্টেন ইত্যাদি ময়লা হিসাবে বিদ্যমান থাকে। গলানোর সময় ২৩২° সেন্টিগ্রেড তাপ উঠলেই টিন গলে যায়; কিন্তু অন্যান্য পদার্থগুলি এই তাপে গলে না। গলিত টিন চুল্লীর গা দিয়ে গড়িয়ে নীচের একটি পাত্রে এসে জমা হয়। কিন্তু অন্যান্য অগলিত পদার্থগুলি এবং তার সঙ্গে কিছুটা টিনও শক্ত হয়ে

চুল্লীর গায়ে আট্‌কে থাকে। এই ময়লা ধাতুগুলি সাধারণতঃ ফেলে দেওয়া হয়, কাজেই এই সঙ্গে কিছুটা টিনও ফেলা যায়। এখান থেকেও টিন উদ্ধার করা সম্ভব।

বড় বড় সহরের অনেক মিউনিসিপালিটি সহরের আবর্জনা থেকে ভাঙ্গা ধাতুর জিনিষ পৃথক করে থাকে। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ভাঙ্গা টিনের পাত্র ও টিনের পাত সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই ফেলে-দেওয়া টিন থেকেও টিন উদ্ধার করা সম্ভব।

পরিষ্কার টিনের পাত ও টিন-প্লেটেড জিনিষ থেকে রাসায়নিক উপায়ে টিন বের করে নেওয়া যায়। এই সব ফেলে-দেওয়া টিনের স্তূপে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস প্রবেশ করালে টিন এই গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন করবে টিন-টেট্রাক্লোরাইড নামক একটি তরল পদার্থ। বাতাসের সংস্পর্শে এলে এ থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। এই জিনিষটি সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় এবং এই দ্রাবণ কিছুক্ষণ রেখে দিলে তা থেকে জলসংযুক্ত বা 'হাইড্রেটেড' স্ট্যানিক অক্সাইড দানাদার পদার্থরূপে বেরিয়ে আসে। এই স্ট্যানিক অক্সাইড স্বভাবজ ও কৃত্রিম রেশম রঞ্জন-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভাঙ্গা টিনের পাত ও জিনিষগুলিকে প্রথমে খুব ভাল করে অ্যাসিড ও কষ্টিক ক্ষার দিয়ে পরিষ্কার করা হয়; ময়লা, আঁঠালো বা তেলতেলে কোন পদার্থ টিনের গায়ে লেগে থাকলে ক্লোরিন গ্যাসে কোন কাজ হবে না। তার পরে সেগুলিকে খুব ভাল করে শুকাতে হবে; কারণ ভাঙ্গা টিনের সঙ্গে যদি কোন লোহার জিনিষ থাকে তাহলে সেই লোহাও ক্লোরিন গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হবে। ভাঙ্গা টিনগুলি লোহার ট্রের ওপর সাজানো হয়। ভিজা থাকলে সেই লোহার তৈরি ট্রেগুলিও গলে যেতে পারে। কাজেই প্রথমে টিনের টুক্‌রা-গুলিকে খুব ভাল করে শুকানো দরকার। লোহার তৈরি সারি সারি অনেকগুলি সিলিণ্ডার টিনের কুচি দিয়ে ভর্তি করে সেগুলির ভিতর ৫৪ পাউণ্ড চাপে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস প্রবেশ করানো হয়। সিলিণ্ডারগুলির ভিতরে উত্তাপ যেন ৩৮° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে না ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এই সিলিণ্ডারগুলির উপরিস্থিত চাপ নির্দেশক যন্ত্রের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সিলিণ্ডারগুলির অভ্যন্তরস্থ চাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এর ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু চাপ যখন আর কমে না, চাপ নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা যখন এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে তখনই বুঝতে হবে যে, রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তারপর পাম্পের সাহায্যে অবশিষ্ট ক্লোরিন গ্যাস বের করে দেওয়া হয়। এরপর সেই ভাঙ্গা টুক্‌রাগুলিকে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলে সেই জলে কিছুক্ষণ পরে টিন-অক্সাইড পৃথক হয়ে পড়ে।

তরল দ্রাবণের সাহায্যে টিন নিষ্কাশন করাও সম্ভব। কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড দিয়ে ভিজিয়ে রাখলেও টিন-ক্লোরাইড তৈরি হবে। অ্যাকার প্রণালীতে (Acker Process) তরল ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। নিউইয়র্ক টিন প্রডাক্টস্‌ কোম্পানী অল্প তাপে ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যেই টিন-ক্লোরাইড তৈরি করে। ক্লোরিনের সাহায্যে টিন উদ্ধারই সবচেয়ে সহজ; একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ভাঙ্গা জিনিষকে টিন-বিমুক্ত করা এই প্রণালীতেই অনায়াসসাধ্য, এতে শ্রমিক ব্যয়ও কম।

বৈদ্যুতিক উপায়েও ভাঙ্গা জিনিষ থেকে টিন উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। মিউনিসিপালিটির সংগ্রহ করা টিনের আবর্জনা এবং টিনের পাতের টুক্‌রা থেকে এই প্রণালীর সাহায্যে টিন বের করে নেওয়া হয়। আমেরিকা থেকে আনীত প্রভৃত টিনের জঞ্জাল থেকে টিন নিষ্কাশনের কাজ

হতো জার্মানীর ইসেন নগরীর ফ্যাক্টরীতে। ডবলিউ. বিষ্টোনের আবিষ্কৃত প্রণালীই এ বিষয়ে খুব কার্যকরী। ভাঙ্গা টিনের আবর্জনা পরিষ্কার করে টুক্‌রা টুক্‌রা করা হয় এবং তারের জাল দিয়ে তৈরি সিলিণ্ডারে ভর্তি করা হয়। এই সিলিণ্ডারটিকে একটি বড় ট্যাঙ্কের মধ্যে ঘোরানো হয়। সেই ট্যাঙ্কে থাকে কষ্টিক সোডা বা পটাসের দ্রাবণ। জালের সিলিণ্ডার দিয়ে ট্যাঙ্কের ভিতর বিদ্যুৎ চালনা করা হয়। নিকেল বা বিশুদ্ধ টিনের প্লেট ট্যাঙ্কের ভিতর এক পাশে ডোবানো থাকে, সেটাকে নেগেটিভ ইলেক্‌ট্রোড করা হয়, অর্থাৎ এই প্লেট দিয়ে তড়িৎ-স্রোত ট্যাঙ্ক থেকে নির্গত হয়ে ডাইনামোতে ফিরে যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে টিনের কুচি থেকে টিনের অণু বের হয়ে দ্রাবণের ভিতর দিয়ে নিকেল বা টিনের প্লেটের ওপর জমতে থাকে এবং ক্রমে সেই প্লেটগুলি টিন জমে জমে বেশ পুরু হয়ে যায়। তারপর এই সব প্লেট থেকে টিনের গুঁড়া চেঁচে তোলা হয়।

আর একপ্রকার উপায়ে টিন উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। সেটা হচ্ছে জৈব অ্যাসিডের সাহায্যে টিন নিষ্কাশন। টারটারিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতিতে টিন দ্রবীভূত হয়। টিনের কুচি ভর্তি একটা তারে জালির সিলিণ্ডার তেঁতুলগোলা জলের ভিতর ডুবিয়ে যদি অনবরত ঘোরানো যায়, তাহলে টিন ক্রমশ সেই জলে গলতে সুরু করবে। তেঁতুলের মধ্যে অনেক জৈব অ্যাসিড আছে—তার মধ্যে টারটারিক অ্যাসিডই প্রধান। তাপ এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ করাও হয়তো দরকার হতে পারে। এই জল ফুটিয়ে শুকিয়ে নিয়ে খুব বেশী তাপে গরম করলে জৈব অংশটি পুড়ে গিয়ে পাত্রের তলায় পড়ে থাকবে শুধু সাদা টিন-অক্সাইডের গুঁড়া। এই প্রক্রিয়াটি এখনো বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয় নি।

ফেলে-দেওয়া টিনের জিনিষ থেকে টিন আহরণ করবার জন্যে ফ্যাক্টরী খুলতে হলে এসব ভাঙ্গা টিন সংগ্রহ করবার কথা আগে ভাবতে হবে। টিনের কৌটা তৈরির ফ্যাক্টরী থেকে টুক্‌রা টিনের পাতের নিয়মিত এবং প্রচুর সরবরাহ পাওয়া চাই। এই সরবরাহ সপ্তাহে ৪ টনেরও বেশী হওয়া আবশ্যক। মিউনিসিপালিটির সঙ্গেও নিয়মিত এই টিনের জঞ্জাল সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকা চাই। পুরানো খবরের কাগজওয়ালাদের মত লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে টিনের কৌটা ইত্যাদি ক্রয়ের জন্যে এজেণ্ট নিযুক্ত করাও প্রয়োজন। নিয়মিত সরবরাহ পেলে এই টিন পুনরুদ্ধার করা একটি লাভজনক ব্যবসায় হতে পারে; কারণ টিনের দাম আমাদের দেশে খুবই বেশী। কিন্তু ছোট স্কেলে এই ব্যবসা খুব বেশী ফলদায়ক হবে বলে মনে হয় না। টিনের কৌটা তৈরির ফ্যাক্টরীগুলিতেই ফেলে-দেওয়া টিনের কুচি থেকে টিন উদ্ধারের জন্যে ছোট ছোট প্ল্যাণ্ট বসানো প্রয়োজন।

টাইটেনিয়াম

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

আজকাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রকারের ধাতব পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই সব ধাতব পদার্থ আবিষ্কারের সার্থকতা নির্ভর করছে তাদের গুণাবলীর উপর যা দ্বারা যন্ত্রবিজ্ঞান আরও সমৃদ্ধশালী হতে পারে। টাইটেনিয়াম এ রকমেরই একটি ধাতব পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থটির সাঙ্কেতিক নাম Ti; পারমাণবিক সংখ্যা ২২ এবং পারমাণবিক ওজন ৪৭.৯০।

টাইটেনিয়াম কচিৎ ঘটিত ধাতু নয়। এর খনিজ বস্তুর নাম ইল্‌মেনাইট ($Fe\ Ti\ O^3$) এবং রুটাইল ($Ti\ O^2$)। এ খনিজ বস্তু দুটিও আধুনিক খনি-বিজ্ঞানীদের এবং শিল্প-বিজ্ঞানীদের কাছে নতুন নয়। এনামেল, পেন্ট এবং ওয়েল্ডিং ইলেক্‌ট্রোড তৈরির কারখানায় ব্যবহৃত টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড (টাইটেনিয়া) এই সকল খনিজ বস্তু থেকেই আহরণ করা হয়। ইলমেনাইট লৌহ খনির মত এক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং রুটাইল পাওয়া যায় প্রক্ষিপ্তভাবে।

সাধারণভাবে ধাতু এবং তার সঙ্কর বা অ্যালয় দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—ফেরাস এবং নন্‌ফেরাস। এই ভাগাভাগি ছাড়াও—ধাতুর ঘনত্ব বা ডেন্‌সিটি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এক্ষেত্রে গুণের কোনও প্রশ্ন ওঠে না; কেবলমাত্র হাল্কা অথবা ভারী এই দুটিই প্রধান কথা। এই ঘনত্ব অনুযায়ী ভাগ করলে অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম সঙ্কর ছাড়া আর সমস্ত এক দিকে পড়ে। যন্ত্রবিজ্ঞানে—যে সব যন্ত্রের আন্দোলন, চলন, ঘর্ষণ ইত্যাদির প্রয়োজন আছে সেখানে হাল্কা অথচ মজবুত ধাতুই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। সেই জন্য যন্ত্রবিজ্ঞানে সঙ্কর ধাতুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। অ্যালুমিনিয়াম ছাড়া বিমান তৈরি হচ্ছে, একথা আজকাল যেন আমরা ভাবতেই পারি না।

খাঁটি ধাতুর আর একটি অপরিবর্তনীয় গুণ হচ্ছে—তার গলনাঙ্ক বা মেল্টিং পয়েন্ট। যেখানে বেশী তাপসহ ধাতুর প্রয়োজন সেখানে নিম্ন-গলনাঙ্কবিশিষ্ট ধাতু দ্বারা সে কাজ করা যায় না। এমনও দেখা যায় উত্তাপ ধাতুটির গলনাঙ্কের কাছাকাছি রয়েছে এবং ধাতু গলে যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ঐ উত্তাপে ধাতুটির শক্তি অনেকখানি কমে যাচ্ছে এবং কাজের পক্ষে তা দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং গলনাঙ্ককে ধাতুর কর্মশক্তির মান নির্ধারণের কাজে বিবেচনা করা অন্যায় নয়। সাধারণতঃ কোনও ধাতুকে উত্তপ্ত করলে ঐ ধাতুর space lattice-এর মধ্যে পারমাণবিক স্পন্দনের বিস্তৃতি বা অ্যাম্‌প্লিটিউড বর্ধিত হয় এবং একটি বিশেষ উত্তাপ-অঙ্কে ধাতুটির দানা গঠনের বন্ধনশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ধাতুটি গলে যায়। সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যে বস্তুর গলনাঙ্ক যত বেশী তার অণুগুলির পরস্পর বন্ধনও তত দৃঢ় এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে কাজে লাগবার যোগ্যতাও তার তত বেশী।

ঘনত্ব বা ডেন্‌সিটির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, অ্যালুমিনিয়ামের ঘনত্ব ২.৭ তারপর অনেক উপরে দস্তার ঘনত্ব ৭.১ এবং লোহার ঘনত্ব ৭.৮। অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের গলনাঙ্ক ৬৫০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। টাইটেনিয়ামের ঘনত্ব হলো ৪.৫; কিন্তু এই রকম একটি হাল্কা ধাতুর গলনাঙ্ক অনেক ধাতুর চেয়ে আশ্চর্য রকমের বেশী। টাইটেনিয়ামের গলনাঙ্ক ১৭৩০° সেন্টিগ্রেড। অ্যালুমিনিয়ামের

তুলনায় এর ঘনত্ব শতকরা ৬০ ভাগ; কিন্তু সঙ্কর ইস্পাতের তুলনায় শতকরা ৫৫ ভাগ। এখন এই ধাতুটির কর্মক্ষমতার উপর বিজ্ঞানীদের বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে এবং সস্তায় বাণিজ্য করবার উপযোগী নিষ্কাশন-প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণাও চলছে।

এখন নিষ্কাশন সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলেছে তবে টাইটেনিয়ামের হ্যালোজেন কম্পাউণ্ডের সাহায্যে এর নিষ্কাশন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। সবচেয়ে পুরাতন উপায় হলো—টাইটেনিয়াম অক্সাইডকে টাইটেনিয়াম আইওডাইডে পরিণত করা। এই আইওডাইড মিশ্রিত বাষ্প থেকে ধাতুটি একটি পাত্রে জমে যায়। পাত্রটি এই সময়ে ১৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখা হয়। আর একটি নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবন করেছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব মাইন্‌স্‌-এর মিঃ ডব্লিউ. জে. ক্রল। মিঃ ক্রলের আবিষ্কৃত প্রণালীতে টাইটেনিয়ামকে টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডে পরিণত করা হয়। পরে এই দ্রাবণকে পরিস্রুত করে একটি তাপসহ উত্তপ্ত ইস্পাতের পাত্রে উদাসীন আবহাওয়ায় ম্যাগ্‌নেসিয়াম দ্বারা প্রতিকৃত করা হয়। এই প্রতিকৃত বস্তুটি নরম বা স্পঞ্জি টাইটেনিয়াম এবং অ্যানহাইড্রাস ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড। ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড গলিত অবস্থাতেই পৃথক করে ফেলা হয় এবং তা ভেঙে ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং ক্লোরিনে পরিণত করা হয় পুনর্ব্যবহারের জন্যে। এই অপরিস্রুত টাইটেনিয়ামকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা পরিস্রুত করা হয়। টাইটেনিয়াম গুঁড়া অথবা নরম ডেলার আকারে পাওয়া যায় এবং তা শতকরা ৯৯'৫ খাঁটি।

স্পঞ্জি টাইটেনিয়াম তৈরি হলো বটে, কিন্তু তার কৌলীন্য রক্ষা করা বড় শক্ত। এই স্পঞ্জি টাইটেনিয়াম চুল্লীর সর্বপ্রকার আভ্যন্তরিক আস্তরণের অর্থাৎ লাইনিং-এর সঙ্গে মিশ খায় এবং গলিত ধাতু হাওয়া থেকে দ্রুত অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন আহরণ করে। সুতরাং সমস্ত গলনকার্য বায়ুশূন্য আধারে করা প্রয়োজন। এই ধাতুর সঙ্গে বাইরের অন্য কোনও বস্তু মিশে গেলে তা পৃথক করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যন্ত্রবিজ্ঞানে যতপ্রকার ধাতু ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে টাইটেনিয়ামের এই দোষটুকুই তার যোগ্যতাকে অনেকখানি খর্ব করছে।

স্পঞ্জি টাইটেনিয়াম গলাবার জন্যে চুল্লী কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত আর্ক এবং ইন্‌ডাক্‌সন—এই দু-রকমের চুল্লী প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

আর্ক-মেল্টিং প্রণালী:—টাইটেনিয়ামের গুঁড়া জল-শীতল তামার পাত্রে ভরে, আরগন গ্যাসের আওতায় পাউডার এবং ইলেক্‌ট্রোডের মধ্যে 'আর্ক' সৃষ্টি করে গলানো হয়। ইলেক্‌ট্রোডটি সাধারণতঃ টাংস্টেন অথবা কার্বনের তৈরি। গলাবার তামার পাত্রটি জলবেষ্টনের দ্বারা সব সময়ে শীতল রাখা হয়। শীতল রাখবার জন্যে টাইটেনিয়াম বাহিরের বস্তুর দ্বারা কলুষিত হতে পারে না। অবশ্য এই 'কন্‌টামিনেশন্‌', ইলেক্‌ট্রোড থেকেও হতে পারে এবং তার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এই উপায়ে সময় সময় টাইটেনিয়াম চূর্ণ উপর থেকে ঢালা হয় এবং নীচ থেকে বের করে নেওয়া হয় গলিত অবস্থায়।

ইন্‌ডাক্‌সন ফার্নেস:— এই চুল্লী অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। যে ধাতুকে গলানো হবে তাকে একটি পাত্রে রেখে চতুর্দিকে একটি তামার তারের কুণ্ডলী জড়ানো হয় এবং ঐ তারের মধ্য দিয়ে খুব বেশী স্পন্দন অর্থাৎ হাই ফ্রিকোয়েন্সির এ. সি কারেণ্ট চালনা করা হয়। এই সময়ে ঐ কারেণ্ট বা বিদ্যুৎপ্রবাহ পাত্রের ভিতরকার ধাতুটিতে আবিষ্ট হয়। এই প্রবাহের গতিপথে বাধার জন্যে ধাতুটিকে উত্তপ্ত করে তোলে, ফলে ধাতু গলে যায়। এই চুল্লীতে ধাতুকে আরগন গ্যাসের আওতায় অথবা বায়ুশূন্য স্থানে গলানো হয়। গলাবার পাত্রগুলি কার্বন দিয়ে তৈরি; কিন্তু

মলিনতা এত কম যে, তা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। থোরিয়া বা জারকোনিয়ার তৈরি পাত্রও ব্যবহার করা যায় বলে অনেকে বলে থাকেন।

টাইটেনিয়াম গলাবার সময় আধার থেকে কলুষিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন, বিনা আধারে টাইটেনিয়ামকে কিভাবে গলানো যায়। তাঁরা একটি অভিনব উপায়ের বিষয় চিন্তা করে দেখেছেন এবং কাজেও নাকি খানিকটা সাফল্যলাভ করেছেন। এই অভিনব উপায়টি হলো—যখন ধাতুকে গলানো হবে তখন ধাতু বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে বিনা অবলম্বনে সব অবস্থাতেই শূন্যে অবস্থান করবে। শুনতে পাওয়া যায়, সামান্য অ্যালুমিনিয়ামকে এভাবে বিনা অবলম্বনে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় গলানো সম্ভব হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে টাইটেনিয়াম গলানোর কাজে ধাতুটির নিষ্কলুষতা বজায় রাখা যাবে।

গুণাবলী :—টাইটেনিয়াম বিনা আয়াসে ফোর্জিং, রোলিং এবং ওয়্যারড্রয়িং করা যায়। বহিষ্করণ একটু শক্ত; কারণ ধাতুটি গরম অবস্থায় খুবই শক্ত, সেজন্যে গলিত কাচ এই ছাঁচের লুব্রিক্যান্ট হিসাবে ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। এটি ফরাসী পদ্ধতি। বাজারে যে টাইটেনিয়াম ধাতু কিনতে পাওয়া যায় তার অবিশুদ্ধতার জন্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং সম্ভবতঃ টাংস্টেন দায়ী। এ ছাড়া শক্তি বাড়াবার জন্যে অন্য অনেক জিনিষ মিশ্রিত করা হয়। যেমন—অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি।

টাইটেনিয়াম সঙ্কর :—লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির সঙ্করের বর্ধিত শক্তির কথা ভাবলে স্বতঃই মনে হয় যে, টাইটেনিয়াম সঙ্করও এমন শক্তিশালী হবে না কেন? খাঁটি ধাতুর চেয়ে সঙ্কর অনেকখানি শক্তিশালী হবে বলে মনে হয়। লোহার সঙ্কর খাঁটি ধাতুর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী, অ্যালুমিনিয়াম আট গুণ। প্রসারণ শক্তি বা টেনসাইল স্ট্রেংথ যদি প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১৯ টন হয় তবে সঙ্কর টাইটেনিয়াম সেই তুলনায় প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১৫০ টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তা যদি হয় তাহলে যন্ত্রনির্মাণের কাজে নিযুক্ত সমস্ত ধাতুই হার মানবে। অবশ্য ঐ রকম টাইটেনিয়াম সঙ্কর তৈরি করা যথেষ্ট গবেষণা, পর্যবেক্ষণ এবং সময়সাপেক্ষ। আপাততঃ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৭০।৭৫ টন শক্তিবিশিষ্ট সঙ্কর তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ৯০ টন শক্তিবিশিষ্ট সঙ্করও তৈরির পথে। আজ যদি বিজ্ঞানীরা ১৫০ টন শক্তির টাইটেনিয়াম তৈরি করতে পারেন তাহলে বিমানে ব্যবহৃত ৪০ টনের অ্যালুমিনিয়াম এবং ১০ টনের লৌহ সঙ্করকে হার মানতে হবে।

ব্যবহারিক যোগ্যতা :—প্রথমেই টাইটেনিয়ামের উচ্চ গলনাঙ্কের যথেষ্ট প্রশংসা করেছি; কিন্তু দেখা গেছে—ধাতুটিকে যদি মাত্র ১০০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বহুক্ষণ ধরে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে ধাতুটির শক্তি ক্ষয় হয়ে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন শোষণ। যাহোক টেন্‌সাইল ফেটিগ এবং ক্রিপ স্ট্রেংথ-এর বিচারে টাইটেনিয়াম সঙ্কর অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্করের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, শুধু সাধারণ আবহাওয়ায় নয় ৪৫০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ পর্যন্ত। এ থেকে অনেক ধাতু-বিশারদ মনে করেন যে, ভবিষ্যতে ২৫০°-৪৫০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে টাইটেনিয়াম ধাতু অন্য সকল ধাতুকে কার্যক্ষেত্রে পরাস্ত করবে। ভবিষ্যতে সুপারসনিক বিমান নির্মাণে টাইটেনিয়াম ধাতু ব্যবহার করতে হবে; কারণ শব্দের গতিবেগের চেয়ে তিনগুণ গতিবেগে বিমানটি চললে হাওয়ার ঘর্ষণে বিমানের উপরকার আবরণের উত্তাপ ৩৫০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হবে। তাতে অ্যালুমিনিয়াম সঙ্করের সুবিধা হবে না। এ ছাড়া জেট ইঞ্জিন কম্প্রেসর যখন ৫০০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে চলবে তখনও এই টাইটেনিয়াম ধাতুই কাজে আসবে।

টাইটেনিয়ামের আর একটি বিশেষ গুণ হলো

সমুদ্রের জলে এবং লোনা আবহাওয়ায় এর কোনও ক্ষতি হয় না; এই গুণের জন্যে টাইটেনিয়াম প্ল্যাটিনামের সমকক্ষ।

উপরের পর্যালোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, টাইটেনিয়াম একটি ব্যবহারোপযোগী ধাতু। এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র টাইটেনিয়াম সম্পর্কিত গবেষণায় পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। সেখানে এই ধাতুর চাদর বা বার ইত্যাদি প্রতি পাউণ্ড ৫ পাউণ্ড থেকে ২৫ পাউণ্ড দরে বিক্রী হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে, তবে এদের গবেষণার সাফল্য নির্ভর করছে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর। কারণ 'ক্রল' প্রণালী অনুযায়ী ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং ক্লোরিনের উদ্ধারকার্যে বিদ্যুতের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

মানুষ ও মানসিক বৃত্তি

শ্রীসুহৃদ্‌চন্দ্র মিত্র

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—'Nearest to the church farthest from God' অর্থাৎ গির্জার সবচেয়ে কাছে যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে সে। এই কথাটি একদিক দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে কিরূপ প্রযোজ্য তা আমরা কখনো ভেবে দেখি না। আমাদের মন আমাদের সবচেয়ে নিকটতম ঘনিষ্ঠ বস্তু, কিন্তু বাইরের এবং দূরের জিনিষের জ্ঞানের তুলনায় এই মন সম্বন্ধে জ্ঞানই আমাদের সবচেয়ে কম। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি বটে যে, অন্ততঃ আমাদের নিজের নিজের মন সম্বন্ধে আমরা সব কথাই জানি; কিন্তু কথাটা ঠিক কি? আপনি কি সত্যিই জানেন যে, কেন অন্য সব বৃত্তি পরিত্যাগ করে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হওয়ার জন্যে আপনি এত তৎপর হয়েছিলেন? আপনি নীল রঙের শাড়ি এত পছন্দ করেন কেন? টিক্‌টিকিতে আপনার এত ভয় কেন? অন্যের সামান্য দোষে আপনি অতটা চটে যান কেন? এ সবের সঠিক জবাব আপনি দিতে পারেন কি?

সঠিক উত্তর দিতে না পারলেও আমাদের সমস্ত মানসিক ঘটনারই সময়োপযোগী একটা ব্যাখ্যা আমরা সব সময় করে নিই। একটু মনোযোগ দিলেই দেখা যায় যে, আমাদের এই সব বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে যথেষ্ট অসামঞ্জস্য থেকে যায়। ব্যাখ্যা যদি বিজ্ঞানসম্মত হতো তা হলে এই অসামঞ্জস্য দেখা যেত না; কারণ বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, তার ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধীতার স্থান থাকে না। পরস্পর বিরোধী ধারণার উপরে নির্ভর করে কোন কাজই সুসম্পন্ন করা যায় না, সুষ্ঠুভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করাও চলে না; তাই মন সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মনোবিদ্যার চর্চা সব দেশেই অতি প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে পৃথকভাবে আলোচিত না হলেও নানাবিধ দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে মন সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব এবং তথ্যের বিবরণ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মনোবিদ্যা চর্চার ধারার একটা আমূল পরিবর্তন হয়। এর আগে মন সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক তত্ত্ব (Theory) সৃষ্টি করবার দিকেই মনোবিদ্‌দের ঝোঁক ছিল বেশী। এখন মন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করাই প্রধান ব্যাপার হয়ে পড়েছে। নানা ঐতিহাসিক কারণে লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর অধুনা পরিবর্তন হয়েছে। সব জিনিষেরই বিচার এখন হয় 'কার্যকারিতার' মাপকাঠিতে, তা সে জিনিষ

ঘটি বাটির মত পার্থিব বস্তুই হোক অথবা সাহিত্য প্রভৃতির ন্যায় কোন কাল্পনিক সৃষ্টিই হোক।

বিজ্ঞান আলোচনার সময়ও লোকে ঐ কথা আজকাল ভাবে। এ বিজ্ঞান আলোচনা করে বাস্তব ক্ষেত্রে কোন লাভ আছে কি? যদি না থাকে তাহলে আলোচনার দরকার নেই। বৈজ্ঞানিকেরাও তাই তাঁদের আবিষ্কারগুলি কেমন করে কাজে লাগানো যায়, সে দিকে আজকাল যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন। এই কাজে লাগানো ব্যাপারটাও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার হয়ে পড়েছে। তাই সব বিজ্ঞানেরই আজ একটা ব্যবহারিক দিক গড়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানেরও তা আছে। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে—মন সম্বন্ধে যা এবং যতটুকু আমরা জানি তা কেমন করে ব্যক্তির জীবনে, সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, তার উপায় উদ্ভাবন করা। জীবনধারণ ব্যাপারটি আজকাল অতিশয় জটিল। প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক সমাজের নিজের নিজের বহুবিধ সমস্যা তো আছেই, তার উপর পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে আবার অনেক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। ভেবে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে, এই জাতীয় অনেক সমস্যার ভিত্তিই হচ্ছে কোন না কোন মানসিক ব্যাপার। গৃহে অশান্তি, সমাজে বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির জন্যে বাইরের অবস্থার বিপর্যয় যেমন দায়ী, মানুষের মানসিক বৃত্তির বিকারও ঠিক তেমনি দায়ী। শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন করলেই এ সব উপসর্গ অপসৃত হয় না, মনের পরিবর্তনও দরকার।

মনের পরিবর্তন কেমন করে করা যায় জানতে হলে, মন সাধারণতঃ কি ভাবে কাজ করে, মনের কি কি বৃত্তি আছে, তাদের স্ফুরণ, ক্রমবিকাশ কি রীতিতে হয়, বহির্জগতের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কি রকম প্রভৃতি তথ্যসমূহের সন্ধান নিতে হয়। মনোবিদ্যা এসব সম্বন্ধেই আলোচনা করে। মন ও তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক নতুন আবিষ্কার মনোবিদ্‌রা সম্প্রতি করেছেন। ব্যবহারিক মনোবিদ্যা সেগুলি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করবার নতুন নতুন পথের সন্ধান করছে।

মনের পরিবর্তন ব্যাপারটি আদৌ সহজসাধ্য নয়। মহাত্মাজী বলে গেছেন—change of heart যতদিন না হচ্ছে ততদিন কোন দিকে কোন উন্নতিই হবে না। তিনি দার্শনিক ছিলেন না, অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। বহুলোকের সঙ্গে কাজ করে বহু অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। সেই সব মূল্যবান অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর চরম উপদেশ দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন—'মনের পরিবর্তন কর'। মনোবিদ্যার একটা অতি সাধারণ কথা (যেটা সকলেই খুব সহজে উপলব্ধি করতে পারেন) হচ্ছে এই যে, কোন অভ্যাস একবার দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করা অতীব দুরূহ কাজ। কাজেই সমাজকে চালিত করবার গুরুভার যে সব শ্রদ্ধেয় প্রৌঢ় বা প্রবীণ নেতার উপর ন্যস্ত আছে তাঁদের বহুদিনের অভ্যাস হঠাৎ আজ পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এ আশা করা সমীচীন নয়। ইচ্ছা হলেও অভ্যাস বদলে ফেলবার ক্ষমতা হয়তো তাঁদের আর নেই। সুতরাং তাঁদের অক্ষমতার জন্যে বৃথা আক্রোশ পোষণ না করে যাদের অভ্যাস এখনও পাকাপাকিভাবে গড়ে ওঠে নি তাদের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং দেখতে হবে যাতে তাদের অভ্যাস ঈপ্সিত ভাবে গড়ে ওঠে; অর্থাৎ ছোট ছেলেমেয়েদের, বড় হয়ে যারা ভবিষ্যতে সমাজনেতা হবে, তাদের অভ্যাস গঠনের দিকে মন দিতে হবে। শিশুদের সহজাত বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে সেগুলিকে উপযুক্তভাবে চালনা করবার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তা হলেই ভবিষ্যতে change of heart-এর ফল প্রতীয়মান হবে।

শারীরিক এবং মানসিক কতকগুলি সম্পদ নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করে। কোন দিক দিয়েই এক শিশু আর একটি শিশুর সম্পূর্ণ সমসম্পদবিশিষ্ট

নয়। শরীরগত পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। একটি শিশু ওজনে ভারী, ফর্সা, লম্বা, আর একটি হাল্কা, কালো, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতিসম্পন্ন। মস্তিষ্কের বাহ্যিক গঠন এবং আভ্যন্তরীণ শক্তি দুটি নবজাত শিশুর একরকম নয়। স্নায়ুর বহন ক্ষমতা এবং বহনের গতিবেগ প্রত্যেক শিশুরই বিভিন্ন। শরীরের সঙ্গে মনের যোগ আছে, কাজেই এই যে আকারগত বৈষম্য শিশুদের মধ্যে জন্মকালে দেখা যায়, এর প্রভাব তাদেব মানসিক গঠন-ভঙ্গীর উপরও কতকটা পড়ে। একটা বড দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ। তাদের শারীরিক গঠনের বৈষম্য জন্মগত। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, শারীরিক গঠনের বিভিন্নতাই মানসিক বিভিন্নতার একমাত্র কারণ নয়। মেয়েলি কণ্ঠস্বর, মেয়েলি মেয়েলি ভাবসম্পন্ন পুরুষ আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। আর পুরুষালি ভাব এবং অভ্যাসসম্পন্ন মেয়েমানুষ সমাজে কি খুব বিরল?

মানসিক বৃত্তিসমূহের প্রভেদও শিশুদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই দেখা যায়। কোন শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি খুব প্রখর আর একটি শিশু হয়তো বা একেবারে জড়-বুদ্ধিসম্পন্ন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকারা সকলের খুব প্রিয়পাত্র হয়। তাদের পিতামাতারা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিশু মনোবিদ্যা অধ্যয়ন করে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি সেই অনুসারে আমি পিতামাতাদের সসম্ভ্রমে অনুরোধ করব যে, তাঁরা নিজেদের যেন একটু সংযত করেন। নিজের ছেলে-মেয়ের বুদ্ধির প্রাখর্য সবাইকে ডেকে ডেকে দেখানোর একটা বিপদ হচ্ছে এই যে, তাতে অনেক সময় তাদের অন্য সব মানসিক বৃত্তি বেশ সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না, ফলে ভবিষ্যতে তাদের ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত বিকাশ হয় না, সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা তাদের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে। গবেষণা এবং বিশ্লেষণের ফলে এই বুদ্ধি সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যের আমরা সন্ধান পেয়েছি। সবাইকার বুদ্ধি কি একরকম ভাবে কাজ করে? দেখা যায়—কোন কোন লোক কর্মক্ষেত্রে তার বুদ্ধির বেশ পরিচয় দেন, কিন্তু কিছু একটা সমস্যার শুধু ভেবে-চিন্তে সমাধান তিনি একেবারেই করতে পারেন না। আবার এর ঠিক বিপরীত ধরনের লোক আছেন যাঁর বুদ্ধি চিন্তার ক্ষেত্রে খুব প্রকাশ পায়, কিন্তু কোন বাস্তব কাজে হাত দিলেই তিনি নিজেকে একেবারে অসহায় বোধ করেন।

শিশুমনের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে তাদের প্রক্ষোভ। বাবা, মা প্রভৃতি যাদের উপর শিশুকে শৈশবাবস্থায় নির্ভর করতে হয় তাদের ব্যবহার শিশুর মনে নানারকম প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে, যার প্রভাব সারা জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। ছেলে-মেয়েরা মা-বাবাকে ভালবাসে এটা কিছু নতুন কথা নয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভালবাসার ক্রম-পরিণতি কত বিভিন্ন আকার ধারণ করে, সে সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষণের পূর্বযুগে আমরা খুব বেশী কিছু জানতাম না। আজ এই কথা বলেই শেষ করি যে, এই ভালবাসার ব্যাপারে শিশুমনে অনেক প্রকারের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। মনের সহজ সরল স্বাভাবিক স্ফুরণ এই সমস্ত দ্বন্দ্বের সুচারু সমাধানের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অন্যথায় ব্যবহারের এক-আধটুকু বিকৃতি থেকে আরম্ভ করে দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধি পর্যন্ত হতে পারে এবং হয়েও থাকে।*

---

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে

মেঘ-বিজ্ঞান

শ্রীসুর্যেন্দুবিকাশ কর

মেঘ যুগে যুগে কবি-হৃদয়ের চিরন্তন খোরাক যুগিয়ে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ মেঘ ও ঝড়-ঝঞ্ঝাকে ভয়ের বশে দেবতা বলে স্বীকার করেছিল, আবার শস্যের জনকরূপে তাকে পূজাও করেছে। ক্রমশ মানুষের অন্তরে প্রকৃতি যখন সুন্দর হয়ে ধরা দিল, কবি-মানস তখন মেঘকে উদ্দেশ করে নতুন নতুন অর্ঘ্য রচনা করেছে। ধূম-জ্যোতি-সলিল-মরুৎ দিয়ে গড়া মেঘকে কবি কখনও বিরহী দয়িতের মর্মবেদনার লিপিবাহক দূতরূপে পাঠিয়েছেন অলকায় প্রিয়ার সান্নিধ্যে, আবার কখনও বা শরতের লঘু-মেঘ বর্ণালীময় বিচিত্র আল্‌পনা এঁকে দিয়েছে তাঁর মানস-পটে।

কিন্তু মেঘকে শুধু সুন্দর ও মঙ্গলময় রূপে দেখেই বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট নন্। কল্পনার রাজ্য থেকে নেমে এসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁরা মেঘের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণায় মেঘের যে কত খুঁটিনাটি খবর পাওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে—মেঘ কি দিয়ে তৈরি? কবিরা যা বলেন বলুন, আসলে কিন্তু মেঘ হলো বাতাসে ভাসমান জলকণা বা হিমকণা। এই জলকণার প্রত্যেকটি হলো অণু থেকে একটু বড়। এই ভাসমান জলকণাগুলি তরল অবস্থায় বা বরফ আকারে, অথবা উভয়ে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। প্রায়ই অতি শীতল অবস্থায় থাকে বলে-৫০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়ও মেঘকণিকার জলীয় অবস্থা বর্তমান থাকতে পারে। এই হলো মেঘের মোটামুটি স্বরূপ। কিন্তু আকাশে যে বহু বিচিত্র মেঘ দেখা যায় তা সব এক রকমের নয়। তাই বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সাধারণতঃ আমাদের ট্রপোস্ফিয়ার অর্থাৎ পৃথিবী-পৃষ্ঠের ঠিক উপরে বায়ুমণ্ডলে যে মেঘ উৎপন্ন হয় তাকে উচ্চতা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ২০০০০ থেকে ৪০০০০ ফুট উর্ধ্বের মেঘকে উচ্চমেঘ বলা হয়। উচ্চমেঘের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী আবার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন সাইরাস্, সাইরোস্ট্রেটাস্, সিরো-কিউমিউলাস্ ইত্যাদি। সাইরাস্ মেঘ পুঞ্জাকারে সাদা রেশমের মত উঁচু আকাশে ছড়িয়ে থাকে। এরা কখনও পালকের মত আবার কখনও বা রেখার মত আকার ধারণ করে। সূর্য চক্রবাল-রেখার কাছাকাছি এলে সাইরাসের সাদা রং লাল বা হলুদে রঙে পরিণত হয়। এই মেঘ সুচ্যাকৃতি বরফের ক্রষ্টাল কণার সমষ্টিরূপে উৎপন্ন হয়। সিরোকিউ-মিউলাস্ মেঘ বিন্দু বিন্দু জলকণারূপে রেখাকারে বা পুঞ্জীভূত হয়ে কখনও বা তরঙ্গের মত উঁচু আকাশে দেখা যায়। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ও ২০০০০ ফুটের মধ্যে যে মধ্যমমেঘ উৎপন্ন হয়, অ্যাল্টোকিউ-মিউলাস্ তাদের প্রধানতম। ছোট ও পাতলা চ্যাপ্টা বিন্দুর মত রেখা, তরঙ্গ বা পুঞ্জাকারে এই মেঘ আকাশে ছড়িয়ে থাকে। আবার এই মেঘকণার প্রত্যন্তদেশে রঙীন ছটা দেখা যায়। অ্যাল্টোকিউমিউলাসের উপস্থিতিতে সূর্য বা চন্দ্রের রঙীন মণ্ডলও (coronae) পরিদৃষ্ট হয়। সিরো-কিউমিউলাস্ প্রভৃতি কয়েকটি মেঘের বেলায়ও এই মণ্ডল বিরল নয়। এই মধ্যম উচ্চতায় আরও যে সব মেঘ উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে অ্যাল্টো ষ্ট্রে টাস্ এর নাম করা যেতে পারে। ধূসর বা নীল ওড়নার মত এই মেঘ সূর্য বা চন্দ্রকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আবৃত করে ফেলে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ

থেকে ৬০০০ ফুটের মধ্যে যে সব মেঘ উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে ষ্ট্র্যাটোকিউমিউলাস্, ফ্র্যাক্‌টোষ্ট্রেটাস্, ফ্রাক্‌টোকিউমিউলাস্, নিম্বোষ্ট্রেটাস প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। ষ্ট্র্যাটোকিউমিউলাস্ মেঘ বৃহদাকার আস্তরণের মত নরম ও ধূসর রঙে তরঙ্গাকারে আকাশে পরিদৃষ্ট হয়। এই মেঘ বর্তমানে প্রায়ই সূর্য বা চন্দ্রের রঙীন মণ্ডল দেখা যায়। নিম্বোষ্ট্রেটাস মেঘ কখনও কালো কখনও বা ধূসর বর্ণের হয়। এই মেঘ থেকে প্রায়ই অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এই সব মেঘ ছাড়া বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মেঘের আরও যে কত সূক্ষ্মরূপ ধরা পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

পৃথিবী-পৃষ্ঠের সমান্তরাল আড়াআড়ি মেঘগুলির কথা উল্লেখ করা হলো মাত্র। আবার কতকগুলি মেঘ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বাধঃ (vertical) নিম্ন ও উচ্চাকাশে ব্যাপ্ত অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে কিউমিউলাস্ সাধারণতঃ পুরু হয় ও মাথাটা চূড়ার মত দেখায়। ঊর্ধ্বাধঃ মেঘের মধ্যে এছাড়া কিউমিউলাস্ হিউমিলিস্, কিউমিউলাস্ কন্‌জেস্‌টাস্, কিউমিউলোনিম্‌বাস্ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

উল্লিখিত মেঘ ছাড়া কতকগুলি বিশেষ ধরনের মেঘ আছে, তাদের কোনও পর্যায়ে ফেলা চলে না। যেমন লেন্টিকুলার মেঘ। চক্রবাল-রেখা থেকে দেখলে এই মেঘ লেন্সের আকারে দৃষ্ট হয়, অথচ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে চ্যাপ্টা থালার মত দেখায়। এই মেঘ সব উচ্চতায়ই উৎপন্ন হতে পারে। পতাকা মেঘও এক বিশেষ ধরনের। পর্বত বর্তমানে বাতাসের স্রোতে এইসব মেঘ উৎপন্ন হয়ে পতাকার মত দেখায়। অবশ্য এসব ছাড়া আরও অনেক বিশেষ আকৃতির মেঘ আছে।

এ পর্যন্ত আমরা ট্রপোস্ফিয়ারের মেঘের কথাই বলেছি। ট্রপোস্ফিয়ারের অধিক উচ্চতায় ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কয়েকটি বিরল মেঘ উৎপন্ন হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে নিশাউজ্জ্বল (noctilucent) নামে যে মেঘ উৎপন্ন হয় তার আকার সাইরাস্ মেঘের মত হলেও মাঝে মাঝে রঙের ছটায় তার স্বাতন্ত্র্য আত্মপ্রকাশ করে। অধিক উচ্চতায় উৎপন্ন হয় বলে সূর্য চক্রবাল-রেখায় উদিত হওয়ার পূর্বেই এই মেঘ আলোকোজ্জ্বল হয়ে পড়ে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ২০।৩০ কিলোমিটার উচ্চে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে আবার যে মুক্তামাতৃক (nacreous) মেঘ উৎপন্ন হয় তার দীপ্তিময় বর্ণচ্ছটা উচ্চাকাশকে আলোকিত করে।

এখন দেখা যাক, কেমন করে মেঘ উৎপন্ন হয়। মেঘ উৎপত্তির প্রথম কথা হলো, জলীয় বাষ্পের তরল বা কঠিন অবস্থায় রূপান্তর। অবশ্য জলীয় বাষ্প শুধু জলকণা বা বরফের কণায় রূপান্তরিত হলেই চলবে না; এই সব কণিকার আশ্রয় নেওয়ার মত উপযুক্ত আধারও বায়ুমণ্ডলে থাকা প্রয়োজন। সূর্যরশ্মিতে যে সব বড় বড় ধূলিকণা দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের এই সব ধূলিকণায় জলকণা মেঘরূপে আশ্রয় নিতে পারে না। অবশ্য এই সব ধূলিকণা আকারে ক্ষুদ্র হলে মেঘের আধার হতে পারে। যে সব বস্তুকণা জলকণা শোষণ করবার (hygroscopic) ক্ষমতা রাখে, তাদের ওপর মেঘের আশ্রয় নেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে, জলীয় বাষ্প জলকণায় রূপান্তরিত হয়ে যে সব বস্তুকণার উপর আশ্রয় নেয় তারা অ্যাসিড জাতীয়। কোনও বায়ব অক্‌সাইড জলীয় বাষ্পের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে এই অ্যাসিড-বিন্দু সৃষ্টি করে। জলীয় বাষ্প উবে গিয়ে যখন বরফাকারে কঠিন মেঘের আকার ধারণ করে তখনই এই মেঘের আধার হয় সাধারণতঃ অদ্রবণীয় কোনও বস্তুকণা। বায়ুমণ্ডলে বরফকণা বর্তমান থাকলে তার উপরেও নতুন মেঘকণা আশ্রয় নিতে পারে।

বিজ্ঞানী কোলারের মতে, বায়ুমণ্ডলে মেঘকণার প্রধান আশ্রয়স্থল লবণজাতীয় পদার্থ।

সাধারণ তাপমাত্রায় সমুদ্র-পৃষ্ঠে বিপুল জলরাশির কিয়দংশ বাষ্পে পরিণত হলে তার সঙ্গে কিছুটা লবণ পদার্থও বায়বাকারে ঊর্ধ্বাকাশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এই লবণ কণার জলীয় বাষ্প শোষণ করবার ক্ষমতা রয়েছে বলে মেঘের আধার হতে পারে। কয়লার ধোঁয়ায় যে সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে সূর্য-রশ্মির প্রভাবে তা সালফার ট্রাইঅক্সাইড-এ পরিণত হয়। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে এই ট্রাইঅক্সাইড সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডকেও মেঘকণার আধার বলে মনে করা হয়। সিম্‌সনের মতে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও নভোরশ্মির আয়নন ক্ষমতার প্রভাবেও বিদ্যুতের (lightning) দ্বারা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প নাইট্রাস অক্সাইডে পরিণত হয়ে মেঘের আশ্রয়স্থল হতে পারে। জলীয় বাষ্প জলকণায় রূপান্তরিত হয়ে যে মেঘ উৎপন্ন করে উল্লিখিত উপায়ে তাদের আধার সহজলভ্য হয়। কিন্তু জলীয় বাষ্পের বরফকণায় রূপান্তরে যে মেঘ উৎপন্ন হয় বালুকণা বা খনিজ বস্তুকণাকে তার আধার বলে মনে করা হয়। পার্বত্য প্রস্তরের চূর্ণ ও মরুভূমি থেকে যথাক্রমে খনিজ বস্তুকণা ও বালুকণা বাতাসের স্রোতে বায়ুমণ্ডলে চালিত হয় এবং কঠিন মেঘকণার আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে।

মেঘকণার আধার ছাড়াও মেঘগঠনের আর একটি উপযুক্ত পরিবেশ বায়ুমণ্ডলে থাকা প্রয়োজন। সেই পরিবেশ হলো বায়ুমণ্ডলের পরিপৃক্ত (saturated) অবস্থা; বায়ুমণ্ডলের এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য বাতাসের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এই সম্প্রসারণ বিভিন্ন উপায়ে ঘটতে পারে। প্রথমতঃ সূর্যরশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠকে সর্বত্র সমানভাবে উত্তপ্ত করতে পারে না। যে সব স্থান বেশী উত্তপ্ত হয় তার উপরিস্থ বায়ুরাশি পার্শ্বস্থিত বায়ু থেকে হাল্কা হয়ে পড়ে ও ঊর্ধ্বদিকে চালিত হয়। আবার ঊর্ধ্বের বায়ুরাশি সেই স্থান পূরণের জন্যে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর অঞ্চলে বায়ুর চাপ ক্রমশ কম। তাই ঊর্ধ্বগামী বায়ুরাশি ক্রমশ উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে সম্প্রসারিত হয়ে শীতলতর হয়ে পড়ে। অধিক উচ্চতায় এই বায়ুরাশি পরিপৃক্ত হয়ে পড়ে। আরও ঊর্ধ্বগামী বায়ু এই উচ্চতায় এসে পড়লে জলীয় বাষ্প মেঘকণার আকারে জমাট বেঁধে যায়। এই বায়ুরাশিতে অধিকতর জলকণা থাকলে পুরু মেঘের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ পাশাপাশি দুটি অঞ্চলের বায়ুর একটি খুব শীতল এবং অপরটি কিছু উত্তপ্ত থাকলে তাদের প্রতি-ক্রিয়ায় মেঘ উৎপন্ন হতে পারে। অবশ্য বায়ু-মণ্ডলের উত্তপ্ত অংশে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকা প্রয়োজন। এই অংশটি ধীরে ধীরে যখন শীতলতর বায়ুমণ্ডলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সাইরাস মেঘের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ এই মেঘ আরও পুরু আকার ধারণ করে সাইরোষ্ট্রেটাস, অ্যাল্টোষ্ট্রেটাস মেঘে পরিণত হয়। অ্যাল্টোষ্ট্রেটাস মেঘ থেকে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এছাড়া দ্রুতগামী বায়ু-রাশি পর্বতে আহত হয়ে ঊর্ধ্বগামী হলে সম্প্রসারিত ও শীতলতর হয়েও মেঘের সৃষ্টি করে। অবশ্য এইরূপ বায়ুরাশির ঊর্ধ্বগতির মাত্রা তার গতিবেগ, পর্বতের আকার ও উচ্চতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। কখনও পরোক্ষ আঘাতে বায়ুরাশি আন্দোলিত হলে তার প্রভাব উচ্চতর স্থির বায়ুরাশিতে ব্যাপ্ত হয় এবং সেই বায়ুরাশি ঊর্ধ্বে চালিত হয়ে সম্প্রসারিত ও শীতল হয়ে পড়ে, ফলে মেঘের সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তরগুলির মিশ্রণের ফলেও মেঘের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠের দ্রুতগামী বায়ু-রাশিতে এই স্তরগুলি যখন বিশেষভাবে আন্দোলিত ও মিশ্রিত হয়ে পড়ে তখন—বিজ্ঞানী ভন্ বেজোল্ড্-এর মতে—কোনও একটি স্তর পরিপৃক্ত অবস্থায় না থাকলেও মিশ্রিত বায়ুরাশি পরিপৃক্ত হয়ে পড়ে এবং মেঘ সৃষ্টি করে। আবার বৃষ্টিবিন্দু পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌঁছুবার পূর্বে যদি পথিস্থ উত্তপ্ত বায়ুরাশি কর্তৃক বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়, তবে সেই

বাড়তি জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে পরিপৃক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে মেঘ উৎপন্ন করতে পারে। যে সব বিভিন্ন মেঘের আকার ও প্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এইরূপ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই সব প্রাকৃতিক মেঘ ছাড়া অ্যারোপ্লেনের গতিপথেও কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি হয়। এই মেঘ উৎপত্তির জন্যে অবশ্য অ্যারোপ্লেনের গতিপথের বায়ুরাশির প্রায় পরিপৃক্ত থাকা প্রয়োজন। এই অবস্থায় অ্যারোপ্লেনের প্রোপেলারের ঘূর্ণনে পার্শ্বস্থ বায়ুর চাপ হ্রাস পায়; ফলে বায়ু শীতলতর হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই মেঘের স্থায়িত্ব খুব কম। তাছাড়া অ্যারোপ্লেনের এঞ্জিন থেকে নির্গত প্রচুর বাষ্প গতিপথের প্রায় পরিপৃক্ত বায়ুরাশিকে শীতলতর করে কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করতে পারে। এই মেঘের স্থায়িত্ব ৩০ মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বায়ুরাশি প্রায় পরিপৃক্ত অবস্থায় না থাকলে মেঘের পরিবর্তে কুয়াসার সৃষ্টি হয়।

ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিশাউজ্জ্বল ও মুক্তামাতৃক মেঘের কথা বলা হয়েছে। নিশাউজ্জ্বল মেঘ রাত্রিতেও আলোকিত থাকে। এই আলোকের তীব্রতা মধ্যরাত্রিতে সবচেয়ে কম হয় ও পরে বাড়তে থাকে। এই মেঘের দীপ্তিতে সাদা, হল্‌দে, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন রং প্রকাশিত হয়। চক্রবাল-রেখার ঊর্ধ্বে এই মেঘ শ্বেত বা নীলাভ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। আরও উচ্চে নীলাভ ধূসর বর্ণের হয়। ধূমকেতুর কক্ষপথে অথবা উল্কা-বৃষ্টিজাত নভোবস্তুর কণিকা এই মেঘের আধার-স্থল বলে মনে করা হয়।

মেঘের উপর আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা অপবর্তন হয়ে আকাশে বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করে। হিমকণা মেঘে আলোর প্রতিসরণ হলে সূর্য বা চন্দ্রের চতুর্দিকে অঙ্গুরীয়াকার মণ্ডলের (halos) সৃষ্টি হয়। মেঘের অক্ষ ঊর্ধ্বাধঃ লম্বিত থাকলে সূর্য বা চন্দ্রের রঙীন ছায়া আকাশে পতিত হয়। মেঘে আলোর অপবর্তনে সূর্য বা চন্দ্রের যে রঙীন মণ্ডল দেখা যায় তাকে 'করোনা' বলে। জলকণা মেঘেই সাধারণতঃ করোনার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও সূর্যমণ্ডলের নীচে বা উপরে পাতলা মেঘের সংস্পর্শে আলোর স্তম্ভ (sun-pillar) দেখা যায়। আলোর বিকিরণে মেঘে যে রামধনু সৃষ্টি হয় তা কারও অবিদিত নেই; আকাশযাত্রীরা আবার মেঘ নীচে ও সূর্য পিছনে থাকলে, আলোর বিকিরণে প্রায়ই একরকম দীপ্ত (glory) দেখতে পান। এই দীপ্তির আকার অঙ্গুরীর মত এবং অ্যারোপ্লেনের ছায়া তার কেন্দ্রে দৃষ্ট হয়।

মেঘ প্রায়ই তড়িতাবিষ্ট অবস্থায় থাকে। দুটি মেঘ বা মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে অসম বৈদ্যুতিক অবস্থার জন্যে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, স্ফুলিঙ্গাকারে বিজলীরূপে আমরা তা দেখতে পাই। এই অবস্থায় বিপুল বৈদ্যুতিক তেজের নির্গমন ধ্বংসাত্মক বজ্রের সৃষ্টি করে। মেঘে কেমন করে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয় বিজ্ঞানীরা তা অনুসন্ধান করে দেখেছেন। সিমসনের মতে, কোন জলকণা একটি কঠিন কণিকার উপর আহত হয়ে চূর্ণিত হলে জলকণায় ধনবিদ্যুৎ ও কঠিন কণিকায় ঋণ-বিদ্যুতাবেশ ঘটে। মেঘের সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী বায়ুরাশির আঘাতে এইরূপ ঘটা অসম্ভব নয়। ফলে ঊর্ধ্বের বায়ুরাশি ও নিম্নস্থ মেঘের বৈদ্যুতিক অসমতায় বজ্রপাত ঘটতে পারে। আবার দুটি হিমকণা মেঘের পরস্পর সংঘর্ষে সংশ্লিষ্ট বায়ুরাশি ধনবিদ্যুৎ ও হিমকণাগুলি ঋণবিদ্যুৎ সমন্বিত হয়ে পড়ে। হিমকণাগুলি যখন নীচে নামে তখন মেঘের উপরের বায়ুরাশির বিপরীত বৈদ্যুতিক অবস্থার জন্যেও বজ্রপাত ঘটে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আকাশে মেঘ উৎপত্তির প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বৈদ্যুতিক মৌলিক কণা মেঘের আধাররূপে ব্যবহার করে বিজ্ঞানী উইল্‌সন্

মেঘকক্ষে কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টি করে যে ছবি পান তাতে এই মৌলিক কণার গতিপথ সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। মৌলিক কণা ও নভোরশ্মির গবেষণায় তাই এই যন্ত্রটি একান্ত প্রয়োজনীয়।

মেঘ-বিজ্ঞানের বহু তথ্য এখনও অবিদিত রয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষাগারে মেঘের গবেষণায় রত আছেন। মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়াও মেঘ-বিজ্ঞানীর কাছে মূল্যবান গবেষণার বস্তু। প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত ছাড়াও কৃত্রিম বৃষ্টিপাত জনকল্যাণে একান্ত প্রয়োজনীয়; তাই মেঘ-বিজ্ঞানের বহুমুখী গবেষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মানব-বংশের স্থায়িত্ব

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

পৃথিবীতে জীব-সৃষ্টির আদি হইতে যুগে যুগে ছোট-বড় বহুবিধ জীবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে; আবার পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে সমান তালে চলিতে না পারিয়া কত যে স্ববংশে লুপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন শৈলস্তরের শিলীভূত কঙ্কাল হইতে অতীত পৃথিবীতে তাহাদের অস্তিত্বের ইতিহাস আমাদের কাছে প্রকট হইয়া থাকে।

ব্রনটোসোর, ডাইনোসোর প্রভৃতি অতিকায় জীবের পদভরে এই পৃথিবী একদিন কম্পিত হইয়াছে; কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে তাহাদের পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য কোন প্রতিনিধি বাঁচিয়া নাই। সুদূর অতীতে স্ববংশে তাহারা কালের গহ্বরে লীন হইয়াছে। অপর দিকে অ্যামিবা, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি এককোষী প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী বহু জাতীয় প্রাণী পৃথিবীর নানা পরিবর্তনের মধ্যেও উহাদের প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে আপন আপন বংশধারা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। পূর্বাপর জীবজগতের ইতিহাস পর্যালোচনায় ইহাই পরিদৃষ্ট হইবে যে, কোন কোন জীব নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আপন আপন বংশধারা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে আবার কোন কোন জীব কোন বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া স্ববংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

পৃথিবীর জীব-সৃষ্টির ইতিহাসে মানব-বংশের আবির্ভাব খুব আধুনিক ব্যাপার হইলেও মানুষ পৃথিবীর সৃষ্ট-জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহার মস্তিষ্কের শক্তির প্রভাবে শুধু সমস্ত জীবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রকৃতিকে পদানত করিবার সাধনায়ও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পৃথিবীর এই শক্তিধর জীবের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা কিরূপ, বর্তমান প্রবন্ধে ইহাই আলোচ্য।

প্রাণী-বিজ্ঞানীর মতে, প্রতিকূল অবস্থায় আত্ম-রক্ষার শক্তির দিক হইতে বিচার করিলে জীব-জগতের অন্য যে কোন প্রাণী অপেক্ষা মানব-বংশের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অধিক। আবার অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য তাহার ধ্বংসের সম্ভাবনাও সর্বাপেক্ষা অধিক রহিয়াছে।

কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অতিরিক্ত-ভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে অন্যরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জীবনধারণ করা বিশেষ অসহনীয় হইয়া পড়ে। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে ইহার বহু নিদর্শন বর্তমান। শীতপ্রধান দেশের অনেক উদ্ভিদ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জন্মানো সম্ভব নয়, আবার গ্রীষ্মপ্রধান

দেশের কোন কোন উদ্ভিদ শীতপ্রধান দেশে জন্মাইবার চেষ্টা করিলে বিফল হইতে হইবে। সেইরূপ আফ্রিকা হইতে গরিলা, শিম্পাঞ্জী ধরিয়া ইউরোপে স্থানান্তরিত করিলে উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে কৃত্রিম উপায়ে আফ্রিকার আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। মেরুপ্রদেশ হইতে শ্বেতভল্লুক আনিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাঁচানও সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীদের মতে কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অতিরিক্তভাবে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ-বংশের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে।

মানুষ পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সহজে তাহার অভ্যাসের পরিবর্তন এবং আত্মরক্ষার নানা উপায় অবলম্বন করিতে পারে। কাজেই পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অন্য জীবের তুলনায় তাহার ধ্বংসের সম্ভাবনা কম, সন্দেহ নাই।

অবয়বের কোন অংশ বা অঙ্গের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনও কোন কোন প্রাণী-বংশের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে। প্রাণী-বিজ্ঞানীর মতে, অতীত যুগের টিটানোথেরাস, ডাইনোসোর প্রভৃতি জীববংশের অবলুপ্তির ইহাই কারণ। টিটানোথেরাসের নাকের উপরে খড়্গের অতিবৃদ্ধি এবং ডাইনোসোরের গাত্রচর্মের অতি পুরুত্বই এই দুই প্রাণীর ধ্বংসের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী আকারে অন্য জীবের তুলনায় যেমন অতিরিক্তভাবে বড়, গুণেও তেমনি অতুলনীয়। মানব-মস্তিষ্কের এইরূপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি ও বিকাশ কিসের প্রতীক—ধ্বংস, না ধ্বংস হইতে চির মুক্তির—জীব-বিজ্ঞানীরা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিউটন, আইনষ্টাইনের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি মানবজাতির পরম সম্পদ সন্দেহ নাই ; কিন্তু এইরূপ অসাধারণ মস্তিষ্কই যখন হিটলার ও মুসোলিনীর মত ব্যক্তির অধিকারে আসে তখন উহাই আবার বিরাট ধ্বংসের রূপ পরিগ্রহ করিয়া মানুষের অপরিসীম আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এই চির পরিবর্তনশীল জগতে চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থেরই নিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। জীবের জন্মের পরে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ও তারপরে মৃত্যু—সমস্ত জীবের জীবনই এই সূত্র অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। জীবের সৃষ্টি ও মৃত্যু একই সূত্রে গ্রথিত। ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে মানুষ পর্যন্ত কোন জীবেরই জীবনধারণোপযোগী অতি অনুকূল অবস্থার মধ্যেও মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। বংশধারা কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ; কিন্তু একক হিসাবে শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক জীব প্রকৃতির পাদমূলে আত্মাহুতি দিতেছে।

গঠনের দিক হইতে জীবন্ত পদার্থকে তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে ভাগ করা চলে। জীবন্ত পদার্থের কোষসমূহ প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ইহারাই জীবনের মূল বনিয়াদ রচনা করে। আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের গঠন ও কার্যকারিতা বিশেষ জটিলতাপূর্ণ। কোটি কোটি কোষ সমন্বিত স্বতন্ত্র জীবদেহ দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি জীবদেহে কোষসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা সুসংবদ্ধ সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। কোষের শ্রেণীসমূহ কার্য-কারিতা ও গঠনবৈচিত্র্যে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও সমস্ত কোষশ্রেণী একটিমাত্র মাতৃকোষ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। জীবদেহের এই কোষ-শ্রেণীসমূহ পরস্পরের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া একমাত্র জীবদেহটির মঙ্গলের জন্য একযোগে কার্যে ব্রতী রহিয়াছে। জীবের শ্রেণী বা গোষ্ঠী তৃতীয় পর্যায়-ভুক্ত। এই শ্রেণীগুলি দুই প্রকারের। কতকগুলি এককোষী সম্প্রদায়ভুক্ত—যেমন জীবাণু এবং বহুকোষ সমন্বিত—যেমন কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী, মানুষ ইত্যাদি। গোষ্ঠী বা শ্রেণীর জীবনের বিস্তৃতি যেমন একক জীব অপেক্ষা অধিক, সেইরূপ প্রতি জীবনের বিস্তৃতিও দেহাবস্থিত প্রতি কোষ অপেক্ষা অধিক। দেহমধ্যে নিয়ত

সংখ্যাতীতভাবে কোষের ধ্বংসক্রিয়া চলিয়াছে, জীবের জীবন তাহাতে বিপন্ন হয় না, জীব বাঁচিয়া থাকে। সেইরূপ প্রতি শ্রেণীতেই নিয়ত জীবের মৃত্যু ঘটিতেছে, কিন্তু শ্রেণীর জীবনধারা তাহাতে ব্যাহত হইতেছে না, কাল অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

মানব-বংশের, এমন কি জাতিগত জীবনধারার বিস্তৃতির তুলনায় শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরই যে ক্ষণস্থায়ী তা নয়, মানুষের রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের জীবনকেও খুব সংক্ষিপ্ত বলা চলে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মৃত্যু হইতেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মানবজাতি অগ্রগতির পথেই চলিয়াছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

প্রতি জীবে এবং শ্রেণীগতভাবে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটিতেছে উহা সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির নিদর্শন না-ও হইতে পারে। অগ্রগতি বলিতে কি বুঝায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলাও কঠিন। কোন কোন জীব-বিজ্ঞানীর মতে জীবের কোন পরিবর্তন হইতে যখন শ্রেণীগত জীবনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা সূচিত হয়, শ্রেণীবিশেষের পক্ষে ঐরূপ পরিবর্তনই অগ্রগতির নির্দেশক। ঐরূপ পরিবর্তনের ফলে ঐ শ্রেণীর জীবের পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে ও অন্যভাবে ঐ জীবের নানা অবনতি ঘটিতে পারে; তৎসত্ত্বেও ঐ পরিবর্তনকে অগ্রগতিই বলিতে হইবে।

ভাইরাসকে ক্ষুদ্রতম জীবন্ত পদার্থ বলা যায়। বিবর্তনের পর্যায়ে যে পরিবর্তনের ফলে ভাইরাসের সৃষ্টি হইয়াছে, বিজ্ঞানীদের মতে গঠনের দিক হইতে জীবন্ত পদার্থটির যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে —কোনরূপ জটিলতা বৃদ্ধি না পাইয়া অধিকতর সরল হইয়াছে। অধিকন্তু এই পরিবর্তনের ফলে উহার পরনির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার জীবন একান্তভাবে আশ্রিত কোষের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এই পরিবর্তন ভাইরাসের পক্ষে অগ্রগতির নির্দেশক; কারণ এই পরিবর্তনের ফলে উহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিবর্তনের পর্যায়ে মানবজাতির অগ্রগতির পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দ্বারা মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে উপলব্ধি বৃদ্ধি পায় এবং পারিপার্শ্বিকের অধীনতা পাশ অতিক্রম করিয়া উহার উপর প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায়, মানুষের পক্ষে সেইরূপ পরিবর্তনই অগ্রগতির নির্দেশক।

জীবের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণায় যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা বিশেষ চমকপ্রদ ও প্রণিধানযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ প্রাণীতাত্ত্বিক পরলোকগত এইচ্. জেনিংস্ বহু বৎসর পূর্বে তাঁহার গবেষণাগারে তাপ পরিমাণ ও খাদ্যের দিক হইতে কোষ-বিভাজনের খুব অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া প্যারামিসিয়া নামক এককোষী জীবাণুর কালচার করিয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় কয়েক বৎসর জীবাণুর বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার খুব ভালভাবে চলিবার পর উহাদের অবনতি ঘটিতে থাকে এবং অবশেষে বংশ বৃদ্ধিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া সবংশে ধ্বংস হয়। উক্ত গবেষণালব্ধ ফল হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, প্যারামিসিয়ার স্বতন্ত্র কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজনের পক্ষে সর্বদিক হইতে অবস্থা দৃশ্যতঃ বিশেষ অনুকূল হইলেও সমষ্টির পক্ষে উহাই মারাত্মক হইয়াছে।

সম্প্রতি অপর এক শ্রেণীর প্যারামিসিয়ার উপর একই প্রকার পরীক্ষা হইতে জেনিংস্-এর সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে। অথচ এই এককোষী প্রাণী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে সর্বদাই পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনধারণের জন্য ইহাদের নিশ্চয়ই নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয় এবং এই সংগ্রামের জন্যই হয়ত উহাদের জীবনে নিষ্ক্রিয় অবস্থা আসে না। অপর দিকে গবেষণাগারে সৃষ্ট কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাপ ও খাদ্যের দিক হইতে এককভাবে

প্যারামিসিয়ার বৃদ্ধি ও কোষ-বিভাজনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক শত্রুর ভয় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলেও প্যারামিসিয়ার বংশ এই অবস্থায় দীর্ঘদিন রক্ষা পায় না। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীতে জীবনধারণের জন্য সর্বদা যে সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হয় গবেষণাগারের কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে জীবনধারণ সর্বদিক হইতে সহজ হওয়াতে সেই সংগ্রামের আর প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে সংগ্রাম-বিমুখ হইবার ফলে ইহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। প্যারামিসিয়ার অবনতি ও ধ্বংসের হয়ত ইহাই কারণ। বাস্তব কারণ যাহাই হউক না কেন—দেখা যাইতেছে যে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্যারামিসিয়ার একক জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল, বংশের স্থায়িত্বের পক্ষে তাহাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইতেছে।

গবেষণাগারে একজাতীয় ফল-মাছি পালন করিয়াও একইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। কৃত্রিম পরিবেষ্টনীতে সৃষ্ট ঐ মাছির ঝাঁক অল্পদিনের মধ্যেই দুর্বল, বিকলাঙ্গ ও অদ্ভুতদর্শন মাছিতে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ঐ মাছিগুলিকে বাহিরে প্রাকৃতিক আবেষ্টনে ছাড়িয়া দিলেও আর উহাদের জীবনধারণ ও বংশবিস্তারের ক্ষমতা থাকে না।

ক্রমে ক্রমে অনেক জীব তাহাদের জীবনধারণের জন্য মানুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ একান্ত নির্ভরশীলতা ঐ সব কোন কোন জীবের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। কিছুদিন পূর্বে একটি খবরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ফ্লোরিডায় সেণ্ট আগাষ্টাইনের নিকটে সামুদ্রিক ঈগলের একটি বৃহৎ দল প্রাচুর্যের মধ্যেও অনশনে মরিতেছে। সামুদ্রিক ঈগল সর্বত্রই মৎস্য শিকার করিয়া জীবনধারণ করে। তথায় সমুদ্রোপকূলে মৎস্যের অভাব নাই ; কিন্তু সেখানকার ঈগলেরা মৎস্য-শিকার ভুলিয়া যাওয়াতেই এই দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ স্থানটি বহুকাল হইতেই একটি বড় মাছের ঘাটি ছিল। জেলে জাহাজের ঝড়্তি-পড়্তি কুড়াইয়া পুরুষানুক্রমে উহারা জীবনধারণ করিয়া আসিয়াছে। এইভাবে মানুষের উপর নির্ভরশীল হইবার ফলে উহাদের জীবনযাত্রা এতদিন বেশ সহজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্বাভাবিক শিকারের শক্তিও লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে ঐ স্থান হইতে মৎস্য ধরিবার ঘাটি অপসারিত হওয়ার ফলে উহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে।

কোন প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিয়ত জীবনধারণ সম্ভবপর নয় ; কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কোন প্রতিকূল অবস্থার অন্তর্ধান হইলে জীবের অধিকতর প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মিতে দেখা গিয়াছে। জীবাণু কালচার করিয়া অধিক তাপে রাখিলে জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কালচার নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ঐ কালচারকে ক্রমান্বয়ে পর পর অধিক তাপ ও স্বাভাবিক তাপে দীর্ঘকাল রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ অবস্থায় জীবাণু ক্রমশঃ অধিক তাপ সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকে।

এইভাবে প্রতিবার বর্ধিত তাপ প্রয়োগের সময় বহুসংখ্যক জীবাণু মরিয়া যায় সত্য, কিন্তু পুনরায় অল্প তাপ প্রয়োগে দুই দিনের মধ্যেই পূর্ব সংখ্যা লাভ করে। যেসব ব্যাক্টিরিয়ার সহনশক্তি কম অধিক তাপে সেইগুলিই ধ্বংস হয় এবং এই ভাবে উত্তরোত্তর অধিকতর সহনশক্তিসম্পন্ন ব্যাক্টিরিয়া কালচারে স্থিতিলাভ করে।

উক্ত গবেষণালব্ধ ফল বিখ্যাত ঐতিহাসিক আরনল্ড টোইনবির মতবাদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি বলিয়াছেন যে, মানব-সভ্যতা সহজ অবস্থার মধ্যে গড়িয়া উঠে নাই, বরং কঠিন অবস্থার মধ্যেই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইলেই সেই অবস্থাকে আয়ত্তে আনিবার প্রয়াসের নিমিত্ত মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যুগে যুগে এইরূপ অবস্থায় শক্তির স্ফুরণ ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির ফলেই মানবসভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমান আণবিক যুগে নানারকম ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানব-বংশ অবলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে কিনা—এই সন্দেহ সমগ্র মানব-সমাজকেই আলোড়িত করিয়াছে। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বাধ্যক্ষ ডাঃ কিস্‌হোলম সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আত্মরক্ষার প্রস্তুতি সমগ্র মানব-বংশের পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর। ডাঃ কিস্‌হোলম হয়তো ইউরোপীয় সভ্যতার কথাই ভাবিয়া থাকিবেন। অনেকের মতে ডাঃ কিস্‌হোলমের সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়; কারণ বিভিন্ন সাম্রাজ্য অথবা সভ্যতার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমগ্রভাবে মানব-বংশের স্থায়িত্বকে বিপর্যস্ত করে না। তবে এই অবস্থা বর্তমান রাষ্ট্র সমূহ, সামাজিক সংগঠন ও বর্তমান জগতের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের স্থায়িত্বের পক্ষে বিশেষ ভীতিপ্রদ সন্দেহ নাই।

জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ফলে অনেক প্রাচীন সমাজের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িতে পারে, কোটি কোটি যুবক-বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করিতে পারে, কিন্তু সেই ধ্বংসের উপর আবার নূতন মানুষের আবির্ভাব ঘটে। নূতন সমাজ, নূতন মানুষ জীবনযুদ্ধে অধিকতর শক্তিশালী হইয়াই আত্মপ্রকাশ করে; মানব ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নাই। প্রাকৃতিক নিয়মে নির্বাচনমূলক বর্জন ও রক্ষণ জীবজগতে সর্বস্তরেই বিদ্যমান। মানুষের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই আমাদের জীবনধারণ সম্ভব হইতেছে। দেহলব্ধ এই জ্ঞান মানুষের সমাজ-জীবনেও হয়তো একদিন সর্বতোভাবে বিস্তারলাভ করিবে। বর্তমান পৃথিবীর অন্য কোন জীবে মানুষের মত স্বজন-হিংসা দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধ, যীশু হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত মহাপুরুষগণ যুগে যুগে স্বজন-হিংসা পরিহারের জন্য বিবিধ বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মহাপুরুষদের বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিলেও সমাজ-জীবনে তাঁহাদের আদর্শ গৃহীত হয় নাই। আরও অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে হয়তো একদিন মানবজাতি সম্যক উপলব্ধি করিবে যে, হিংসা অপেক্ষা পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যেই মানবজাতির বাস্তব কল্যাণ নিহিত। সেদিনের মানুষ বর্তমানের তুলনায় যে অনেক উচ্চস্তরের জীবনে পৌঁছিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া স্বপ্রকৃতি পরিবর্তনে মানুষ খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যখনই নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে, নূতন অভ্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে মানুষ ক্রমশঃ অধিকতর তৎপর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু পরিবেশ অনুযায়ী এই পরিবর্তন অতি অল্প লোকের মধ্যেই বংশানুক্রমিকভাবে স্থিতিলাভ করিতেছে। জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, ক্রমশ অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে এইরূপ পরিবর্তনের বংশানুক্রমিক স্থিতিলাভ হ্রাস পাওয়া মানব-বংশের স্থায়িত্বের অনুকূলে একটি বিশেষ নিদর্শন।

প্রাণী-জগতে একমাত্র মানুষই কথা বলিতে পারে, যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারে, কালের মধ্যে বন্ধন রচনা করিতে পারে, অর্থাৎ অতীতের লোকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করিতে পারে। এই সব গুণের অধিকারী হইতে মানুষকে নানা বিপদ-আপদ, দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইলেও ইহারই ফলে মানুষ আজ প্রকৃতির উপর অসামান্য প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে এবং জৈব বিবর্তনে এক আশ্চর্য সৃষ্টিরূপে বিকশিত হইয়াছে।

জীব বিজ্ঞানীদের অনুশীলনে এখন পর্যন্ত যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সর্বদিক দিয়া মানব-বংশের দীর্ঘ স্থায়িত্বের সম্ভাবনাই সূচিত করে। তবুও যে মস্তিষ্কের প্রভাবে মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে উহারই মধ্যে তাহার ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে কিনা, কে বলিতে পারে?

সঞ্চয়ন

কেনিয়ার কিকুয়ুদের পরিচয়

সম্প্রতি আফ্রিকার কিকুয়ু সম্প্রদায়ভুক্ত মাউ-মাউদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। এই কিকুয়ু উপজাতি সম্বন্ধে সাধারণের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লণ্ডন স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের অধ্যাপক হান্টিংফোর্ড কিকুয়ুদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন।

কিকুয়ু উপজাতীয় লোকের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ, কেনিয়ার সমগ্র আফ্রিকা অধিবাসীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। একক উপজাতি হিসাবে তাহারাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইয়া আছে এবং দেশের কেন্দ্রস্থলে বাস করিতেছে। ১৯৪৮ সালে যখন শেষ আদমসুমারি হয় তখন সমগ্র কিকুয়ু অধিবাসীর চার-পঞ্চমাংশ বাস করিত নেটিভ ল্যাণ্ড ইউনিটে (রিজার্ভ) এবং প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বাস করিত তাহার বাহিরে।

তাহারা তাহাদের বর্তমান দেশে বাস করিতে আরম্ভ করে প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। জমি দখল করিতে থাকে, যুদ্ধ জয় করিয়া নয়, ক্রয় করিয়া এবং অংশতঃ কৌশল করিয়া, ভবঘুরে ডোরোবো উপজাতীয়দের নিকট হইতে। তাহারা বলে, যদি তাহারা এই দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে মৃত ডোরোবোদের আত্মা তাহাদের শাস্তি দিত।

কিকুয়ু যুদ্ধক্ষম উপজাতি নয়, কিন্তু তাহাদের শীঘ্রই সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয় শক্তিশালী প্রতিবেশী মাসাইদের সঙ্গে। এই মাসাই উপজাতীয়দের সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারে, বিশেষ করিয়া সমতল উন্মুক্ত অঞ্চলে, এমন শক্তি তাহাদের ছিল না। ইউরোপীয়েরা এই অঞ্চলে আসিবার পূর্বে কিকুয়ুদের সংঘবদ্ধ করিয়া পরিচালিত করিবার মত কোন জাতীয় সর্দার পর্যন্ত ছিল না। অবশ্য দেখা গিয়াছে, নিজ নিজ অঞ্চলে কোন কোন ক্ষমতাশালী লোক কখনও কখনও নিজেকে সর্দার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। উপজাতীয়দের নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার ছিল স্থানীয় মাতব্বর পরিষদের হস্তে। এই সকল পরিষদ পরিচালিত হইত একদল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অধীনে। পরিষদগুলি বিচার পরিষদ হিসাবেও কাজ করিত।

শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা

বিচার ব্যবস্থায় শপথ গ্রহণের বিশেষ মুল্য ছিল এবং এখনও তাহা আছে। বিশেষভাবে গিথাথি সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য। এই গিথাথি হইল এক রকমের লম্বা প্রস্তরখণ্ড, ইহার মধ্য অংশ ফাঁকা। এই প্রস্তরখণ্ডের উপর যষ্টির আঘাত করিয়া বলিতে হয়—'আমি যদি মিথ্যা বলি এই গিথাথি যেন আমাকে আঘাত করে।' চুরির জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত; জিহ্বা কাটিয়া ফেলা বা পোড়াইয়া মারা কোনটাই অসম্ভব ছিল না।

যদিও এই উপজাতি কতকগুলি বৃহৎ সম্প্রদায়ে এবং সম্প্রদায়গুলি কতকগুলি উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত তথাপি ইহা আরও বিভক্ত হইয়াছে সম্প্রদায় নির্বিশেষে দুইটি গোষ্ঠীতে। ইহার যে কোন একটির সহিত প্রত্যেক লোককে সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইবে। কিকুয়ু গোষ্ঠী ও মাসাই গোষ্ঠীতে সভ্যপদ বংশানুক্রমিক। কিকুয়ু গোষ্ঠীর লোকেরা কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক বেশী আনুষ্ঠানিক, বিশেষভাবে মাসাই গোষ্ঠীর লোকদের তুলনায়। মাসাই গোষ্ঠীর লোকেরা প্রধানতঃ বাস করে মাসাইয়ের

কাছে দক্ষিণ-কিকুয়ুতে এবং সংস্কৃতির প্রভাব তাহাদের উপর অত্যন্ত অধিক।

ইহা লক্ষ্য করিবার মত যে, কিকুয়ু উপজাতীয়েরা যুদ্ধের উপকরণ হিসাবে বহু মাসাই অস্ত্রশস্ত্র এবং কায়দাকানুন গ্রহণ করিয়াছে—বল্লম, ঢাল, শিরস্ত্রাণ ও অলঙ্কার আজ তাহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে, যদিও তাহারা যুদ্ধক্ষম জাতি নয়। ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'প্রাগৈতিহাসিক জাতির সঙ্গে' নামক পুস্তকে লেখা হয় যে, কিকুয়ুদের সামরিক নিয়মানুবর্তিতা, ড্রিল বা আদেশ পালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। যখন তাহাবা সত্যসত্যই যুদ্ধের সম্মুখীন হয় তখন তাহারা প্রথম সুযোগেই অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া পলায়নের সুযোগ গ্রহণ করে এবং নিজেদের কৌশলে যুদ্ধ চালাইবার চেষ্টা করে। এই কৌশলটি হইল শত্রুকে কিকুয়ু দেশের গভীর অরণ্যের মধ্যে টানিয়া আনা এবং বৃক্ষের আড়াল হইতে তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করা।

কিকুয়ু এবং মাসাইদের মধ্যে হানাহানি বজায় থাকিলেও শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের অভাব সকল সময় সেখানে হয় নাই। কিকুয়ুদের নিকট হইতে মাসাইরা ক্রয় করিত সবজী, তণ্ডুল, শস্য ও তামাক (এখনও তাহারা কৃষিকার্য করে না) এবং তাহার পরিবর্তে দিত বন্ধ্যা গাভী, রুগ্ন ছাগ ও গর্দভ। এই ব্যবসায় চলিত প্রধানতঃ উভয় জাতির নারীদের সাহায্যে; তাহারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিনা-বাধায় উপজাতীয় সীমান্ত পার হইবার অধিকার লাভ করিত। তাহার ফলে কিকুয়ু ও মাসাই উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলে আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যাইত। বর্তমান মাসাইদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত প্রগতিসম্পন্ন তাহাদের অনেকেরই মাতা বা পিতা-মহী কিকুয়ু উপজাতীয়।

মৃত্তিকার ক্ষয়-নিরোধ

উপকূল অঞ্চল হইতে যে সমস্ত সেহেলি ব্যবসায়ী সেখানে আসিত এবং শান্তিপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্য লইয়া যে সমস্ত বিদেশী সেখানে গতায়াত করিত তাহাদের প্রতি কিকুয়ুরা কখনও শত্রুতার ভাব দেখায় নাই। তাহারা তাহাদের কাছে তাহাদের দেশের বহু দ্রব্যই সাগ্রহে বিক্রয় করিত। তাহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল, কিন্তু গাভী, মেষ বা ছাগও তাহারা পালন করিত। কয়েকবার চাষের পর তাহারা জমি পরিত্যাগ করিয়া নূতন উর্বর জমির সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যাইত। এই ভাবে অরণ্য অঞ্চল তাহারা প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। এই ব্যবস্থা ছিল ভুল। ইহার ফলে এবং আরও অনেক কারণে মৃত্তিকার ক্ষয় সেখানে অনিবার্য হইয়া উঠে।

ইউরোপীয় শাসনাধীনে কিকুয়ুরা প্রধানতঃ যে জিনিষ লাভ করিয়া উপকৃত হয় তাহা হইল জমি রক্ষা সম্পর্কে উপদেশ। ইহাতে মৃত্তিকার ক্ষয় সম্পর্কে তাহারা সচেতন হয় এবং ইহার ফলও হয় ভাল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯৪৬ সালে কোর্ট হল জেলায় প্রায় ৭,০০০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং পাহাড় অঞ্চলের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া তৃণাস্তরণের ব্যবস্থা করা হয়।

ইহাই সব নয়। বৃটিশ শাসকবর্গ স্থানীয় দায়িত্বশীল কর্মচারীদের সহায়তায় তাহাদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করেন দলের প্রধান। এই প্রধানেরা সকলেই প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং ইহারা সরকারী নির্দেশমত সমাজের বহু কর্তব্য পালন করিয়া থাকে। বহু বৎসর ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় মিশনারীরা কিকুয়ুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে থাকে। কিকুয়ুরা তাহাদের কাছে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে তাহার মূল্য কম নয়। অবশ্য ইতস্ততঃ উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা ছাড়াই স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় কেনিয়ায় সমাজবিরোধী ভাবধারাও কিছুটা প্রসার লাভ করে।

সভ্যতার বিকাশ

কিকুয়ু অঞ্চলের সীমান্তে নাইরবির মত একটা বড় সহর অবস্থিত থাকায় উপজাতীয়দের কোন কোন দলের উপর তাহার প্রভাব পড়ে। অপর পক্ষে নাইরবি নিকটে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদের উৎপন্ন শস্য ইত্যাদি বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ফলে, কিকুয়ুরা আজ সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ব্যবসায়ী জাতি হিসাবে পরিগণিত।

তাহারা স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছে যে, ইউরোপীয় শাসনাধীনে শিক্ষা, চিকিৎসা ও কৃষি সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কি ভাবে একটা উপজাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে। অবশ্য সভ্যতার এই ক্রমবিকাশের জন্যই যে এই মাউ-মাউ আন্দোলনের সূত্রপাত তাহা মনে করা ভুল হইবে। আদিম উপজাতীয়দের মধ্যে আকস্মিক এই ভাবে বিদ্রোহ করিবার ইচ্ছা আশ্চর্যের কিছুই নয়। আশা করা যায় কিকুয়ুদের মধ্যে যাঁহারা কিছুমাত্র বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারা বর্তমান আন্দোলনকে কখনও দীর্ঘস্থায়ী হইতে দিবেন না ; কিকুয়ু উপজাতির অগ্রগতির পথে কোন বাধাই আজ কাহারও কাম্য নয়।

জাপানী পদ্ধতিতে ধানের চাষ

গান্ধী স্মারকনিধির কৃষিবিভাগের সঞ্চালক শ্রীযুক্ত পি. এল. কাপাড়িয়া বোম্বাই সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতারূপে জাপানে ধানচাষ পদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া আসিয়া কোরা গ্রাম উদ্যোগ-কেন্দ্রে গত তিন বৎসর ধরিয়া সাফল্যের সহিত পরীক্ষাকার্য চালাইয়া ইহার ফলাফল সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে খুব ভাল বীজ, প্রচুর পরিমাণ ভাল সার এবং উপযুক্ত যত্ন, পরিশ্রমই সাফল্যের মূল কারণ।

জাপানী প্রথায় ধানচাষে প্রথমে বীজধানগুলিকে লবণমিশ্রিত জলে ভিজাইতে হয়। ডুবিয়া-যাওয়া বীজগুলিকে তুলিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবার পর সেগুলিকে আবার প্যারানেস্ লিকুইড (Paranes Liquid) নামক বীজাণুশোধক ঔষধে ১০ হইতে ২০ মিনিট পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া বীজাণুমুক্ত করিয়া লওয়া দরকার। ৫।৬ সের বীজধানের জন্য প্রায় ২½ আউন্স প্যারানেস্ লিকুইড দরকার। প্যারানেস্ লিকুইডে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবার পর বীজ বুনিবার উপযুক্ত হইবে। এই বীজ হইতে বিশেষভাবে তৈয়ারী ছোট ছোট জমিতে চারা গাছ উৎপাদন করিয়া কিছু বড় হইবার পর সেগুলিকে বৃহৎ জমিতে বোপণ করিতে হয়।

চারাগাছ জন্মাইবার জন্য এই ছোট ছোট জমি-গুলিকে বীজতলা বলা হয়। এক একর জমির জন্য প্রায় ৬ কাঠা জমি বীজতলার জন্য রাখা প্রয়োজন। বীজতলার জন্য রক্ষিত জমিতে ৪ ফুট চওড়া, ৩ ইঞ্চি উঁচু এক একটি হাপর তৈয়ারী করিতে হইবে এবং চারাগাছগুলির তদ্বির করিবার জন্য প্রত্যেক দুইটি সারির মধ্যে ফুটখানেক চওড়া পথ রাখা দরকার।

বীজতলা জমি প্রস্তুত করিবার নিয়ম :—প্রত্যেক ৬ কাঠা জমিতে দুই গাড়ী গোবর অথবা মিশ্রসার (৮ : ২ : ১ হিসাবে খইল, সুপার ফস্ফেট এবং অ্যামোনিয়াম সালফেটের মিশ্রণ) খুব ভালভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। এরূপ সারমিশ্রিত মাটিতে হাপর প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর পাতলা করিয়া এক স্তর মিশ্রসার বিছাইয়া তাহার উপর খানিকটা কাঠ অথবা কয়লার ছাই দিয়া পূর্বোক্ত বীজধানগুলি ছড়াইয়া দিতে হয়। বীজ ছড়াইবার পর তাহার উপর খানিকটা মিশ্রসার ছড়াইয়া আল্তোভাবে চাপড়াইয়া দিতে হইবে। কিছুকাল পরে চারাগুলি

৯।১০ ইঞ্চি লম্বা হইলে তুলিয়া লইয়া জমিতে রোপণ করা দরকার। প্রত্যেক জমিতে একর প্রতি ১০ গাড়ী হিসাবে গোবর অথবা মিশ্রসার মিশাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত সারের অভাবে ধনিচা বীজ লাগাইলেও জমির নাইট্রোজেন সরবরাহ হইতে পারে। চারা লাগাইবার ঠিক পূর্বে ৫০ পাউণ্ড সুপার ফস্‌ফেট এবং ১৫০ পাউণ্ড মিশ্রসার জমিতে মিশাইতে হইবে। চারাগুলি এমনভাবে তোলা দরকার যেন শিকড় কোন রকমে আঘাত না পায়। ১০ ইঞ্চি অন্তর অন্তর দুই-তিনটি চারা একত্রে বসাইতে হইবে। দুইটি লাইনের মধ্যে যেন ১০।১২ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে। পনেরো দিন পর দ্বিতীয় দফায় পূর্বোক্ত পরিমাণ সার দিয়া জমির মাটি নিড়াইয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে মূলের শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িবে। দিন পনেরো পরে আবার জমি নিড়াইয়া দেওয়া দরকার। এই পদ্ধতিতে ধানচাষে বর্তমানে একর প্রতি গড়পড়তা উৎপাদন ৮০০ পাঃ হইতে প্রায় ৩০০০-৪০০০ পাউণ্ডে উঠিয়াছে।

হীরাকুদ জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক

প্রবাদ আছে, প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে বেগবতী মহানদীর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বহু পরিমাণ হীরক জমিয়াছিল। এই মহাসম্পদ আহরণের জন্য বহু নরনারী শত শত মাইল বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া সেখানে উপনীত হইয়াছিল। তাহারা ঐ সম্পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল কিনা তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু ঐ কাল্পনিক হীরক আবিষ্কারের ফলে ঐ দ্বীপটির নাম হয় হীরাকুদ।

আজ হীরাকুদের বিরাট নদী উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য উহার নাম পুনরায় সংবাদপত্রে খবরের শিরোনামার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। বর্তমান সময়ে সেখানে যে বাঁধ নির্মাণ করা হইতেছে তাহাতে উড়িষ্যাবাসী বন্যা ও অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবে এবং জাতি পাইবে অধিকতর পরিমাণ খাদ্য, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য।

মহানদী

মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার সিহাওয়া নামক স্থানের নিকট হইতে মহানদী বহির্গত হইয়াছে এবং উহা ৫৩৩ মাইল অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মহানদী যখন হীরাকুদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন উহা বিলাসপুর ও রায়পুরের ভিতর দিয়া আসিয়াছে এবং ঐ দুই জেলার জল ঐ নদীতে পড়িয়াছে। ফলে সেখানে নদীর বিস্তার হইয়াছে এক মাইল। তারপর নদীটি কয়েকটি স্থানে অত্যন্ত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া পূর্বঘাট পর্বতমালার ১৪ মাইল গিরিখাতের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। পরে নদীর দুর্দাম বারিরাশি ঢোলপুরের পর্বতমালার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কটকের ৭ মাইল দূরে নরাজ নামক স্থানে দুইটি পাহাড়ের মধ্যে উড়িষ্যার অববাহিকায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পরপর উহা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া মিশিয়াছে।

মহানদী প্রতি বৎসর বঙ্গোপসাগরে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ একর ফুট জল ঢালে। উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি নদীর জলরাশির তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু মহানদীর জলের শতকরা ৫ ভাগেরও কম পরিমাণ সেচ কার্যে ব্যবহৃত হয়।

বাঁধ নির্মাণের ফলে মহানদীর যে জল জমিবে তাহাতে প্রধানতঃ উড়িষ্যা রাজ্যেরই উপকার হইবে। রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলি উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ঐ রাজ্যের আয়তন দাঁড়াইয়াছে

৫৯,০১৮ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষের অধিক। কবে এই পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হইবে এবং রাজ্যের শ্রমশীল ও উদ্যোগী যুবকগণ ঐ এলাকার অব্যবহৃত খনিজ ও কৃষি সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে রাজ্যবাসী তাহারই প্রতীক্ষায় আছে।

পূর্বগামী প্রচেষ্টা

বিশাল মহানদী এবং উহার সমান সমান বৈতরণী ও ব্রাহ্মণী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গত ৩০ বৎসরে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সার আর্থার কটন ও শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ার মত বিচক্ষণ ইঞ্জিনীয়ারগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু উল্লেখ-যোগ্য কোন ফল হয় নাই। যে বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছিল তাহাতে বন্যার নিয়ন্ত্রণ সমস্যায় মাত্র হাত দেওয়া হইয়াছিল বলা চলে।

গত ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয়, মধ্য-প্রদেশ ও উড়িষ্যা সরকারত্রয়ের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, নৌ-চলাচল ও জলতাড়িত বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র বহুমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে দ্রুত ও ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় বারি ও বিদ্যুৎ কমিশনকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় জলতাড়িত বিদ্যুৎ, সেচ ও নৌ-চলাচল কমিশনকে অনুরোধ করা হইবে।

কেন্দ্রীয় জলতাড়িত বিদ্যুৎ, সেচ ও নৌ চলাচল কমিশন সিদ্ধান্ত করেন যে, মহানদীর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য হীরাকুদ, টিকাপাড়া ও নারাজ—এই তিন স্থানে তিনটি বাঁধ নির্মাণ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি বাঁধ স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত হইলেও নদীর পূর্ণ উন্নয়নে যোগাযোগ থাকিবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বন্যা নিবারিত হইবে, ২০ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া চলিবে, প্রায় ২ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে এবং মধ্যপ্রদেশের প্রান্ত হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ৩৮০ মাইল নৌ-চলাচলযোগ্য জলপথ পাওয়া যাইবে। ইহাতে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিবে তাহাতে যথাকালে উড়িষ্যার চাঁদবালী বা ধামবার উপকূলে একটি বন্দর স্থাপনের প্রয়োজন হইবে। বিস্তৃত জলাধারগুলি জাহাজের আড্ডা, মৎস্যচাষের পুকুর ও ছুটির দিনে আমোদ উপভোগের জন্য কৃত্রিম হ্রদ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনা

প্রথম পরিকল্পনার কাজ হীরাকুদে আরম্ভ করিতে কমিশন সুপারিশ করেন। মহানদীর একেবারে গোড়ার কাছে হীরাকুদ অবস্থিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও গড়নের দিক দিয়া স্থানটির মধ্যে কিছুমাত্র জটিলতা নাই। এখানে বাঁধ নির্মাণ করিলে অতি সত্বর সুফল পাওয়া যাইবে এবং আর্থিক দিক দিয়া স্বয়ং-নির্ভরশীল হওয়া যাইবে।

কোন দর্শক ঝারসুগুডা হইতে মোটরে করিয়া তরঙ্গায়িত পিচ্‌ঢালা রাস্তা দিয়া বাঁধের দিকে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে দীর্ঘ সরল 'টিল' বৃক্ষ সমাকীর্ণ বিচিত্র গ্রামাঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। বাঁধের ৫.৬ মাইল দূরে ঐ রাস্তাটি কলিকাতা-বোম্বাই সড়কের সহিত মিশিয়াছে এবং তারপর ২.৩ মাইল গিয়া রাস্তাটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া হীরাকুদ কলোনির দিকে চলিয়া গিয়াছে। ঝারসুগুডা হইতে ঘণ্টা দুই যাইবার পর পরিকল্পনা এলাকার উপনগরটি আবছা দেখিতে পাইবেন। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনার কাজকর্ম দেখাইবার জন্য দর্শকের সঙ্গে একজন উপযুক্ত ইঞ্জিনীয়ার দিয়া থাকেন।

অত্যুচ্চ স্থান হইতে দর্শন

দর্শককে খোয়াপাতা ছায়াবহুল রাস্তায় শ্রমিক-দের নবনির্মিত গৃহশ্রেণীর পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তারপর একটি টিলা পাওয়া যায় এবং তাহার

চূড়ায় উঠিয়া বিস্তৃত হীরাকুদ বাঁধের দৃশ্য দেখিতে হয়।

বাঁধটির দৈর্ঘ্য হইবে তিন মাইল এবং নদীর গভীরতম তল হইতে উচ্চতা হইবে ১৯৫ ফুট। এইটি হইবে বিশ্বের দীর্ঘতম বাঁধ। উহা চারভাগে বিভক্ত হইবে, ঠিক নীচে থাকিবে ২২০০ ফুট কংক্রীট বাঁধ। উহার সহিত ১৪৬৮ ফুটের একটি মাটির বাঁধ মিলিত থাকিবে। তারপর বাঁধের প্রধান কংক্রীট অংশটি ১৮৪০ ফুট পর্যন্ত বাড়ান থাকিবে। তারপর ৪৪৪০ ফুট মাটির বাঁধ থাকিবে। গোড়ায় মাটির বাঁধটি প্রায় ৬০০ ফুট এবং কংক্রীট বাঁধটি ১৬৬ ফুট চওড়া হইবে। উপরে বাঁধটি ২৫ ফুট চওড়া হইবে; তাহাতে রাস্তার উপর দিয়া মোটর চলাচল করিতে পারিবে।

ইঞ্জিনীয়ারদের আগ্রহ

নদীর প্রধান স্রোতের সম্মুখীন মাটির বাঁধ যতটা উচ্চ করিলে জল উপ্‌চাইয়া পড়িবে না এবং যতটা চওড়া করিলে বর্ষার স্ফীত জলের চাপে বাঁধ ভাঙিবে না, ইঞ্জিনীয়ারগণ ততটা উচ্চ ও চওড়া বাঁধ নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাজ সফল হইয়াছে। এই বৎসরই প্রথম সর্বাধিক পরিমাণ (৯০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত হইল। এত অধিক বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বাঁধের কোন ক্ষতি হয় নাই। কোন কোন কর্মচারী বর্ষার কয়েক মাস মাটির বাঁধের কোন ফাঁকে জল প্রবেশ করিতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য জীবন বিপন্ন করিয়া হীরাকুদ দ্বীপে গিয়াছেন।

চারিটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। সেগুলিতে ১২৩,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ঐ বিদ্যুৎ রায়পুর, কিওঝরগড়, তালচের, কটক ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কেন্দ্রে সরবরাহ করা হইবে। ঐ ব্যবস্থার সহিত দামোদর উপত্যকা ও মাচকুণ্ডের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ থাকিবে; ফলে বিস্তৃত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে।

আণবিক গবেষণায় ইউরেনিয়াম

শ্রীসলিল বসু

চল্‌তি শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন তেজস্ক্রিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে একটা বিশেষ সাড়া পড়ে গিয়েছিল তখন থেকেই পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞানী-দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তেজস্ক্রিয়ার সঙ্গে আণবিক গঠনের রয়েছে একটা নিবিড় সম্বন্ধ। কোন বিশেষ মৌলিক পদার্থের জটিল সংগঠনের অস্থায়ী নিউ-ক্লিয়াস থাকার ফলে পদার্থটা থেকে যে জাতীয় ব্যবহার দেখা যায় সেইটাই হলো তেজস্ক্রিয়া। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়ামের কৃত্রিম ক্ষয়ীভবন নিয়ে কিছু কিছু গবেষণাও চলেছিল। জার্মানী ও ফ্রান্সের কয়েকজন বিজ্ঞানীই মাত্র এই ইউরেনিয়াম সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই অন্যদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাই ১৯৩৯ সালে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করলো যখন এই মুষ্টিমেয় গবেষণারত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন যে, ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনের ভাঙন (fission) সম্ভব এবং তা থেকে প্রচণ্ড শক্তিও পাওয়া যেতে পারে।

এই 'ইউরেনিয়াম ভাঙন' আবিষ্কার হওয়ার পিছনে রয়েছে ১৯৩০ সালের পরবর্তী বছরগুলির

আণবিক জ্ঞানের অগ্রগতি। এই বিষয়ে মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধীয় গবেষণাগুলি খুবই কার্যকরী হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠের বাইরে অজানা উপায়ে এর উৎপত্তি; কিন্তু আমাদের আজ পর্যন্ত জানা বিকিরণগুলির মধ্যে এটাই হলো সবচাইতে বেশী শক্তিশালী। এই গবেষণার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল হলো পজিট্রন আবিষ্কার (১৯৩২ সাল)। বিভিন্ন রকম আণবিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে এই পজিট্রন। তাই এরই সঙ্গে আর একটা নতুন আবিষ্কারও হলো। এই ব্যাপারে অগ্রণী হলেন সুবিখ্যাত কুরীদম্পতির কন্যা ও জামাতা ম্যাডাম আইরিন কুরী জোলিও ও ফ্রেডারিক জোলিও কুরী। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, পোলোনিয়াম থেকে প্রাপ্ত আল্‌ফা কণা যদি অ্যালুমিনিয়ামের উপর বর্ষণ করা যায় তাহলে ধাতব পদার্থটির গাত্রদেশ থেকে পজিট্রন বিকিরিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, একবার বিকিরণ সুরু হওয়ার পর আল্‌ফা কণার উৎসটাকে সরিয়ে নিলেও বিকিরণ চলতে থাকে। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ থেকে যেমন ঋণাত্মক ইলেকট্রন পাওয়া যায়, পজিট্রন বিকিরণও কতকটা সেই রকমের। এথেকে বুঝা গেল যে, আল্‌ফা কণার সাহায্যে অ্যালুমিনিয়ামকে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় করে তোলা সম্ভব। এটা যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাতে সন্দেহ নেই এবং এ উপায়ে অনেক পদার্থকেই কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়েছে। যদিও তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ীভবনের হার নিয়ন্ত্রণ করা আজও সম্ভব হয় নি তবুও এ সব আবিষ্কারের ফলে আণবিক জ্ঞান যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তেজস্ক্রিয়া নিয়ে তখন পর্যন্তও যে সব গবেষণা হয়েছিল তা থেকে মনে হয়েছিল যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটা আইসোটোপকে আর একটা আইসোটোপ থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। কোন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ বলতে এমন একটা পদার্থ বোঝায় যার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক মৌলিকটির ক্রমাঙ্কেরই সমান; কিন্তু তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব বিভিন্ন। তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম-ডি আর সাধারণ সীসা হলো একটা আইসোটোপ গোষ্ঠীর, অর্থাৎ এদের একটা মিশ্রণ থেকে কাউকেই আর আলাদা করা যাবে না। যদিও রাসায়নিক বিশ্লেষণে সীসার উপস্থিতি ধরা সম্ভব নয়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে সামান্য পরিমাণের রেডিয়াম ডি-এর উপস্থিতি ধরা যায়, এর তেজস্ক্রিয় গুণের জন্যে। কুরী-জোলিওর আবিষ্কারের আগে মৌলান্তরীকৃত নিউক্লিয়াসের রূপটাকে বোঝা খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের পর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এটা বোঝা খুবই সহজসাধ্য হয়ে উঠলো। কুরী-জোলিওর আবিষ্কারের মাত্র কয়েকমাস পরেই রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. ফের্মি অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের মধ্যেই নিউট্রনের সাহায্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আনতে সক্ষম হন। রেডন গ্যাস (আল্‌ফা কণার উৎস) ও বেরিলিয়ামকে খুব ভাল করে মিশিয়ে উপযুক্ত পদার্থের উপর নিউট্রন বর্ষণ করে সেটাকে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় করে তোলা যায়। প্রোটন ও ডয়টারন বর্ষণ করেও কোন কোন পদার্থকে তেজস্ক্রিয় করা সম্ভব। কিন্তু নিউট্রনের সুবিধা হলো এই যে, প্রায় সব মৌলিক পদার্থকেই এর সাহায্যে তেজস্ক্রিয় করা যায়। ফের্মি দেখালেন যে, এটা শুধু সম্ভব নিউট্রনের চার্জ-হীনতার জন্যে। এর ফলে নিউট্রন সব পদার্থের নিউক্লিয়াসের মধ্যেই অবাধে প্রবেশ করতে পারে।

অল্প দিনের মধ্যেই নিউট্রনের আর একটা বিশেষ গুণ জানা গেল। নিউট্রনকে যদি জল বা প্যারাফিনের মত কোন হাইড্রোজেনযুক্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হয় তাহলে এর কর্মদক্ষতা খুবই বেড়ে যায়; অর্থাৎ

উৎপন্ন তেজস্ক্রিয়াটা খুবই তীব্র হয়ে থাকে। এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন যে, মন্দগতির নিউট্রনগুলি সম্বন্ধে নিউক্লিয়াসের কেমন যেন একটা মোহ আছে। নিউক্লিয়াস যখন এই জাতীয় নিউট্রনকে আত্মসাৎ করে ফেলে তখন আর এমন কোন বিশেষ শক্তি অবশিষ্ট থাকে না যাতে ঠিক সেই সময়েই আর একটা কোন অংশ বিচ্ছুরিত হতে পারে। সেই কারণেই অতিরিক্ত শক্তিটা গামারশ্মি রূপে বিকিরিত হয়ে যায়। নিউট্রন আত্মসাতের ফলে মৌলিকটির যে আইসোটোপের সৃষ্টি হয় সেটার গুরুত্ব মৌলিকটি থেকে কিছু বেশী। এই গুরুত্ব পরিবর্তনের জন্যেই নিউক্লিয়াসটা চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তাই পাওয়া যায় তার তেজস্ক্রিয়া। এই নতুন মৌলিকটি স্থায়ী অবস্থায় এসে পৌঁছুতে পারে কেবলমাত্র একটা ইলেকট্রন বা পজিট্রন বিকিরণ করে।

ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস হলো সব চাইতে ভারী। এর পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৯২ আর পারমাণবিক গুরুত্ব হলো ২৩৮.০৭। ফের্মি দেখালেন যে, নিউট্রন কিন্তু এই ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের মধ্যেও প্রবেশ করতে পারে। এই ইউরেনিয়াম স্বভাবতঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোর মধ্যে একটা এবং আল্‌ফা কণা বিকিরণ করেই এর ক্ষয়ীভবন চলতে থাকে; কিন্তু নিউট্রন আত্মসাতের পর এটা বিকিরণ করে একটা ইলেকট্রন। এর ফলে একটার পরমাণু ক্রমাঙ্ক যায় বেড়ে, আর ৯৩ ক্রমাঙ্কের একটা নতুন মৌলিকের সৃষ্টি হয়। নতুন মৌলিক সৃষ্টি কিন্তু এখানেই থেমে যায় না; তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ীভবনের ফলে ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ ক্রমাঙ্কের মৌলিকগুলি জন্ম নেয় একে একে। এই গোষ্ঠীর মৌলিকগুলির একটা বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে Trans-uranic element। সাধারণ আইসোটোপগুলিকে মিশ্রণ থেকে যে-ভাবে পৃথক করা হয়, তার কোনটাই এদের পক্ষে খাটে না। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ফের্মি আবিষ্কৃত পদার্থগুলি সত্যই নবাগত, এদের কোন প্রাচীন ঐতিহ্য নেই।

প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের যেমন একটা বিশেষ সম্প্রদায় রয়েছে, সেই জাতীয় কোন কিছু নবাবিষ্কৃত পদার্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায় কি না, তাই নিয়ে বেশ কিছুদিন রাসায়নিক গবেষণা চললো। ১৯৩৭ সালে বার্লিনের কাইজার উইল্‌হেলম্ ইন্‌ষ্টিট্যুটের কর্মাধ্যক্ষ অটো হ্যান ও তাঁর সহকর্মীদ্বয় কুমারী মেইটনার ও ষ্ট্র্যাস্‌ম্যান্ এই মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা সমতা খুঁজে পেলেন এবং এইগুলিকে তিনটি বিশেষ গোষ্ঠীতে সাজালেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরে প্যারিসে ম্যাদাম কুরী জোলিও নিউট্রন বর্ষিত ইউরেনিয়াম থেকে এমন একটা মৌলিকের খোঁজ পেলেন যেটা ঐ বিশেষ গোষ্ঠীতে পড়ে না। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে অধ্যক্ষ হ্যান নিজেই ঐ পরীক্ষাটা চালালেন। তিনি যে শুধু একটা নতুন পদার্থ পেলেন তাই নয়, তার সঙ্গে পেলেন একটা নতুন সক্রিয়তা। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ায় এ পর্যন্ত শুধু পজিট্রন আর ইলেকট্রনই পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু এই নতুন পদার্থটি থেকে পাওয়া গেল আল্‌ফা কণার বিকিরণ। ইউরেনিয়াম থেকে দুটা আল্‌ফা কণার বিকিরণ হওয়ার পরই রেডিয়ামের সৃষ্টি হতে পারে। নিউট্রন আত্মসাতে এ জাতীয় ব্যাপার ঘটে না বলেই জানা ছিল; কিন্তু এই নতুন আবিষ্কৃত মৌলিকটি হলো একটা রেডিয়াম আইসোটোপ।

স্বল্প পরিমাণ রেডিয়াম পৃথকীকরণের রাসায়নিক উপায় হলো বেরিয়াম সহযোগে এটাকে অন্যান্য পদার্থ থেকে আলাদা করে নেওয়া এবং তারপর রেডিয়ামকে বেরিয়াম থেকে আলাদা করা। এই নবাবিষ্কৃত পদার্থটির বেলায় এই জাতীয় পরীক্ষা হলো; কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে যেমন বেরিয়ামকে আলাদা করবার সময় এল তখন আর সেটা করা সম্ভব হলো না। যদিও রেডিয়ামকে

কোন রকমে কিছুটা পৃথক করা গেল, বেশী পরিমাণে তেজস্ক্রিয় গুণটা কিন্তু রয়ে গেল বেরিয়ামের মধ্যেই। বেরিয়ামের মত হাল্কা নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয়তা খুবই বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। এই থেকে মনে হয় যে, আল্‌ফা কণা বিকিরণের পর ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসটা ঠিক পুরাপুরি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এ হলো ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকের ব্যাপার। ঐ মাসেরই শেষের দিকে কোপেন-হেগেনের ইন্‌ষ্টিটুট অব থিওরেটিক্যাল ফিজিক্সের অধ্যাপক বোরের কর্মাধীনে ফ্রিশ ও কুমারী মাইটনার (জার্মাণী হইতে নির্বাসিত) ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের এই ভেঙ্গে যাওয়ার যুক্তিকে সমর্থন করেন। অত্যধিক গুরুত্বের জন্যে নিউক্লিয়াসের বিশেষ স্থায়িত্ব না থাকায় কেবল মাত্র একটা নিউট্রন দিয়েই এই জাতীয় ভাঙন আনা সম্ভব। এই ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রভূত পরিমাণ শক্তিও পাওয়া যায়। বিভক্ত দুটা অংশের মিলিত গুরুত্বের চাইতে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব যতটা বেশী, সেই অতিরিক্ত পরিমাণটাই রূপান্তরিত হয় শক্তির আকারে। নিউট্রন ছাড়া আরও কতক-গুলি কণা দিয়ে ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মধ্যে ভাঙন আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু থোরিয়ামের চাইতে কম পরমাণু ক্রমাঙ্কের মৌলিকগুলিতে এ জাতীয় ভাঙন সম্ভব হয় নি, তাদের স্থায়িত্বের জন্যে। এই জাতীয় ভাঙনে যে শক্তি পাওয়া যায় সে রকম আর কিছুতেই পাওয়া যায় নি। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পাওয়া যায় ১৪ × ১৬^৬ ইলেকট্রন ভোল্ট আল্‌ফা কণা; সাইক্লোট্রন থেকে পাওয়া যায় ৩২ × ১০^৬ ইলেক-ট্রন ভোল্ট আল্‌ফা কণা, আর ইউরেনিয়াম ভাঙন থেকে পাওয়া গেল ১০ × ১০^৭ ইলেকট্রন ভোল্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিড়িকে সেই সময়ে ইউরোপ থেকে অনেক বিজ্ঞানী নির্বাসিত হয়ে এসে জড়ো হয়েছিলেন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে। কলাম্বিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্থানে এই সব বিষয় নিয়ে গবেষণা চলতে লাগলো। প্রাপ্ত প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে অনেক জনহিতকর কাজ হতে পারে, কিন্তু তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হলাহল মানুষকে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক, অনেক নীচে। ইহারই চরম পরিণতি—হিরোসিমা, নাগাসাকি। তবে আশা করা যায়, হয়তো ভবিষ্যতে এই শক্তি জনকল্যাণে নিয়োজিত হয়ে তাদের সুখশান্তি বৃদ্ধির সহায়তা করবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

শরীর-পুষ্টিতে অ্যান্টিবায়োটিক

অভিনব উদ্দেশ্যে ছত্রাকোৎপন্ন ঔষধ পেনিসিলিন ও অরিয়োমাইসিন ব্যবহারের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইয়াছে। খাদ্যের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিলে এই ঔষধগুলি পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অর্ধভুক্ত ও অর্ধপুষ্ট লোককে স্বাস্থ্য ও আনন্দময় জীবন দান করিতে পারে।

চীন, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অন্নভোজী অঞ্চলে অন্নের সহিত সামান্য কিছু পেনিসিলিন বা অরিয়োমাইসিন সংযোগ করিলে পৃথিবীর খাদ্যসমস্যার বহুল পরিমাণে সমাধান হইতে পারে এবং ইহা বিশ্বশান্তি সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমেরিকান ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউটের ডাঃ মাইকেল্‌সন এক বিবৃতিতে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন, সমগ্র পৃথিবীতে বহুসংখ্যক লোক নিরামিষাশী। কিন্তু শাক-সবজী ও শস্যাদিতে যে প্রোটিন আছে তাহা দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধিত হয় না। শরীরের সম্যক পুষ্টিসাধনের জন্য কিছু মাছ, মাংস, ডিম বা দুগ্ধেরও একান্ত প্রয়োজন।

সম্প্রতি একটি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, অ্যান্টিবায়োটিক শরীরের প্রোটিন চাহিদা হ্রাস করে, অর্থাৎ দৈনিক খাদ্য তালিকায় সামান্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিক সংযোগ করিলে অতি সামান্য পরিমাণ মাছ বা মাংস ব্যবহারেই শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে, যেখানে অধিকাংশ লোকের একমাত্র অন্নের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়, এই অ্যান্টিবায়োটিক সেখানে বিশেষ উপযোগী হইবে।

ডাঃ মাইকেল্‌সন দুই দল ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষা করেন। একদল ইঁদুরের অন্ন-পথ্যের সহিত ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও অল্প পরিমাণ থ্রিয়োনাইন ও লাইসিন সংযোগ করেন (থ্রিয়োনাইন ও লাইসিন শরীরের প্রোটিন চাহিদা মিটাইতে অপরিহার্য)। অপর দলকে অন্ন-পথ্যের সহিত পেনিসিলিন বা অরিয়োমাইসিন খাওয়ান। ঐ দুই দল ইঁদুরের শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিতে কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় নাই।

দেহের ওজন বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনের ক্ষমতা পরিলক্ষিত হওয়ায় সম্প্রতি মুরগী ও শূকরের খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছে।

ডাঃ মাইকেল্‌সন বলেন, মানবের দেহপুষ্টি উন্নয়নে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে। পৃথিবীর বহুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করিয়া জীবনধারণ করে। তাহাদের শরীরের প্রোটিন চাহিদা মিটাইতে অ্যান্টিবায়োটিক কিরূপ কার্যকরী হইতে পারে তাহা আরও গবেষণা দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে।

সায়ানাইড প্রতিষেধক

এক প্রকার রক্তাল্পতা প্রতিষেধক ভিটামিন বি-১২ সায়ানাইড বিষের ক্ষিপ্র প্রতিষেধকরূপে কাজ করিতে পারে। অন্ততঃ ইঁদুরের পক্ষে যে ইহা বিশেষ কার্যকরী, রাথওয়ের মার্ক ইন্‌স্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

ইঁদুরগুলি সায়নাইড প্রয়োগের পর মৃতকল্প হইয়া পড়িলে অর্থাৎ যখন তাহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় এবং স্পর্শ করিলেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না, সেই সময় ঐ ভিটামিন ইন্‌জেক্‌সন করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। অনেক ক্ষেত্রে ঔষধটি পূর্ণমাত্রায়

প্রয়োগ করিবার পূর্বেই উহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস আরম্ভ হইতে দেখা গিয়াছে এবং অনেকে আবার ইন্‌জেক্‌সনের অব্যবহিত পরেই চলাফেরা করিতে থাকে।

ইন্‌জেক্‌সনটি শিরার মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগের চার মিনিট পরেও এই ঔষধ কার্যকরী হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু বিষ প্রয়োগের আট মিনিট পরে ঔষধটি বিফল হয়। সায়ানাইড প্রয়োগের পূর্বে এই ঔষধটি ব্যবহার করিলে ইহা সায়ানাইডের বিষময় ফলের প্রতিরোধ করে।

অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের মরুভূমির গণ্ডী অতিক্রম

প্যারিস মিউজিয়ামের প্রফেসর পি. ই. এল. ভেসিরী এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, মানবের অনিষ্টকারী বহু কীটপতঙ্গ তাহারই যান-বাহনের সাহায্যে স্বাভাবিক আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গমন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ অনুর্বর মরুভূমি অতিক্রম করিতে পারে না; কাজেই তাহাদের ধ্বংসাত্মক কার্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মানবের মরু-যাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সব কীটপতঙ্গ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নূতন স্থানে তাহাদের স্বাভাবিক শত্রু অল্প এবং ঐ স্থানের উদ্ভিদগুলিও তাহাদের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার মত প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে নাই।

মরুভূমির উপর দিয়া বড় বড় মোটরের রাস্তা ও রেল রাস্তা হওয়ায় এবং এরোপ্লেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিক সংখ্যক কীটপতঙ্গ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। এখন ঐ সব অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমন করা একটি বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধ্যাপক ভেসিরী বলেন, নূতন নূতন স্থানে বসতি বিস্তার করিয়া ঐ সব কীটপতঙ্গ এখনই গুরুতর অনিষ্টসাধন করিতেছে।

মৎস্য-শিকারে যুগান্তর

তড়িৎ সাহায্যে মৎস্য-শিকার মৎস্য শিল্পে যুগান্তর আনয়ন করিবে বলিয়া আশা করা যায়। মৎস্যের একটি বিরাট ঝাঁক তড়িতের সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া জাল বা কোন ফাঁদের মধ্যে আটকাইবার কৌশল কতকগুলি দেশে পরীক্ষা করা হইতেছে।

তড়িতের সাহায্যে মৎস্য-শিকারের পরীক্ষায় জার্মান বিজ্ঞানী ডাঃ ক্রুটজারের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি মাইন-তোলা জাহাজের কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া তিনি হেরিং মৎস্যের ঝাঁকের উপর এই পরীক্ষা করেন। ধন-তড়িৎ-প্রান্তের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফল খুব আশাপ্রদ হইয়াছে।

জাহাজের পিছন দিকে একটি বৃহৎ ধাতুফলক ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, উহা ঋণ তড়িৎ-প্রান্ত। জাহাজ হইতে প্রায় ষাট ফুট দূরে বয়ার সাহায্যে ঐরূপ আর একটি ধাতু ফলক ঝুলান হয়, উহা ধন তড়িৎ-প্রান্ত। ঐ ফলক দুইটি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের সহিত ইনসুলেটেড তার দ্বারা সংযুক্ত রাখা হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ডাঃ ক্রুটজার ঐ ধাতুফলক দুইটির মধ্যদেশে এক ঝাঁক হেরিং ছাড়িয়া দেন। যখনই ঐ ধাতুফলক দুইটিতে তড়িৎ সংযোগ করা হয় তখনই দেখা যায়, ঐ মৎস্যের ঝাঁক ধন তড়িৎ-প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, আবার তড়িৎ বিযুক্ত করিলেই উহারা পূর্ব নির্দিষ্ট দিকে চলিতে থাকে।

ডাঃ ক্রুটজার কিন্তু মৎস্যগুলিকে ধরিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলেন, সমুদ্রে স্বাভাবিক পরিবেশে মৎস্যের ঝাঁক যে তড়িতের সাহায্যে আকর্ষণ করা যায়, ইহা প্রমাণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য এবং তিনি তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহার পর

তড়িৎ-প্রান্তটির চতুর্দিকে জাল বেষ্টন করিয়া মৎস্যগুলি ধরা সহজসাধ্য।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ পরীক্ষা চলিয়াছে, তবে উহা এখনও পরীক্ষাগারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ফ্লোরিডা ষ্টেটের ওসেনোগ্রাফিক ইন্‌ষ্টিটিউটের জীবতাত্ত্বিক ডাঃ কেল্‌গ, মুলেট ও অন্যান্য মৎস্যের উপর তাড়িতিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় এক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, জলের মধ্যে ধন তড়িৎ-প্রান্তের অবস্থান পরিবর্তন করিয়া সার্ডিন মৎস্যকে যদৃচ্ছা আঁকাবাঁকা পথে চালিত করা সম্ভব।

সোভিয়েট রাশিয়ার কয়েকটি খবরে প্রকাশ যে, রাশিয়ানরাও তড়িতের সাহায্যে মৎস্য ধরিবার পরীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। সোভিয়েট কায়দার বিশেষত্ব এই যে, মৎস্যগুলিকে তড়িতের সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া পরে শোষণ করিয়া জাহাজের খোলের মধ্যে তুলিয়া ফেলা হয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য এখনই কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ডাঃ ক্রুটজারের কৌশল অনুযায়ী দুই প্রকার যন্ত্র নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমটি হইল, মৎস্যের ঝাঁক তড়িতের সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া পরে জালের সাহায্যে ঘিরিয়া ফেলা। দ্বিতীয়টি হইল, মৎস্য বড়শীর টোপ ধরিলে উহাকে তড়িতের সাহায্যে সম্মোহিত করিয়া টানিয়া তোলা। উত্তর ইউরোপের সমুদ্রে বড়শীর সাহায্যেই সাধারণতঃ টুনা মৎস্য ধরা হয়। ঐ মৎস্য এক একটি ওজনে প্রায় তিন-চার মণ হয়। কাজেই সম্মোহিত করিতে পারিলে উহাকে টানিয়া তোলা সহজসাধ্য হইবে।

একজন মৎস্য-বিশেষজ্ঞ বলেন, বিগত শতাব্দীতে কৃষিশিল্পের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, মৎস্য-শিকারের পদ্ধতি এখনও সেই প্রস্তর যুগেই পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণাগারে ও সমুদ্রবক্ষে তড়িতের সাহায্যে মৎস্য-শিকারের যে সকল গবেষণা চলিয়াছে তাহা হইতে মনে হয়, মৎস্য-শিকার পদ্ধতিতে শীঘ্রই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগে মক্ষিকার জন্মহার বৃদ্ধি

শক্তিশালী কীটনাশক পদার্থ ফল-মক্ষিকার উপর প্রয়োগের পর যে মক্ষিকাগুলি কোন প্রকারে নিস্তার পায় তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে বংশ-বৃদ্ধি করিয়া আংশিকভাবে তাহাদের দলীয় ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ করিতে থাকে।

কিংস্টনের রোড আইল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটির প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ডাঃ নাট্‌সন কীটনাশক পদার্থ প্রয়োগে বংশপরম্পরায় তাহাদের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্য করেন, কীটঘ্ন পদার্থ প্রয়োগের পর শীঘ্রই কীটের সংখ্যা কমিয়া যায়, কিন্তু কিছুদিন পরে উহাদের বংশধরেরা অধিকতর সংখ্যায় আবির্ভূত হইতে থাকে।

খাঁচার মধ্যে ফল-মক্ষিকা রাখিয়া তিনি ডাইলড্রিন নামক তীব্র কীটঘ্ন পদার্থ প্রয়োগ করেন এবং অপর একটি খাঁচায় সমসংখ্যক মক্ষিকা স্বাভাবিক পরিবেশে রাখেন। পরে উভয় খাঁচার মক্ষিকাগুলি তাহাদের জীবদ্দশায় কতগুলি ডিম পাড়ে তাহা গণনা করেন।

ডাঃ নাট্‌সন লক্ষ্য করেন, যে মক্ষিকাগুলি ডাইলড্রিন প্রয়োগের পর কোন প্রকারে পরিত্রাণ পায় তাহারা স্বাভাবিক পরিবেশের মক্ষিকা অপেক্ষা শতকরা পাঁচটি অধিক ডিম পাড়ে।

আপাতদৃষ্টিতে শতকরা পাঁচটি অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও হিসাবে অনেক দাঁড়ায়। একজোড়া মক্ষিকা স্বাভাবিক পরিবেশে, দুই পুরুষে ১৩৬০০০টি বাচ্ছা উৎপন্ন করে এবং এক ঋতুতে চৌদ্দ পুরুষ অতিক্রান্ত হয়। কাজেই, একজোড়া হইতে এক

ঋতুতে কতগুলি মক্ষিকা উৎপন্ন হইতে পারে এবং শতকরা পাঁচটি অধিক হইলে তাহা সংখ্যায় কতগুলি দাঁড়ায় সহজেই অনুমেয়।

অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা

আমেরিকার বহু বড় বড় ব্যবসায়ীর দেশের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত নিজ নিজ বিভিন্ন কেন্দ্রের সহিত দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই কার্যে এক অভিনব উপায়ে অতি ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের সাহায্য লইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই উপায়ে ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে অবস্থিত নিজ নিজ শাখা প্রতিষ্ঠানের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন।

কতকগুলি বিশেষ সুবিধার জন্য অতি ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের ব্যবহার প্রসার লাভ করিতেছে। সর্বপ্রধান সুবিধা এই যে, ইহা বহু দূরে বহুমুখী সংবাদ আদান-প্রদানে নির্ভরযোগ্য এবং ইহার ব্যয় প্রচলিত ব্যবস্থা অপেক্ষা সুলভ। ইহার আর এক সুবিধা এই যে, বৈদ্যুতিক ঝঞ্ঝার সময়েও সংবাদ আদান-প্রদানের কোন অসুবিধা হয় না। উপরন্তু, প্রেরিত সংবাদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও আছে। সংবাদ আদান-প্রদান ব্যতীত প্রয়োজনমত বহু দূর হইতে কোন শিল্প যন্ত্র নিয়ন্ত্রণের কার্যেও ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের ব্যবহার হইতেছে।

ইউনাইটেড ষ্টেটের মধ্যে আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কোম্পানির অতিক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গের ব্যবস্থা বিখ্যাত। ঐ ব্যবস্থায় দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টেলিভিসন ও টেলিফোন বার্তা প্রেরিত হইয়া থাকে। পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানে এক একটি বেতার রিলে-স্তম্ভ স্থাপিত আছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে একস্তম্ভ হইতে অন্য স্তম্ভে বেতার-বার্তা প্রেরিত হইতে পারে।

হাতের তালু হইতে আঙুল গঠন

দুর্ঘটনায় যদি কাহারও দুই হাতের সব কয়টি আঙুল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তবে সার্জনেরা এখন ঐ তালুতে অস্ত্রোপচার করিয়া আবার নূতন আঙুল গঠন করিয়া দিতে পারিবেন। নিউইয়র্কের সোসাইটি অব প্লাষ্টিক অ্যাণ্ড রিকন্সট্রাক্টিং সার্জারির এক সভায় ডাঃ ফ্রাকেল্টন এইরূপ অস্ত্রোপচারের একটি সাফল্যজনক ফলের বর্ণনা করেন।

ম্যারিয়ন কডি নামক বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক ইঞ্জিনিয়ার আলাস্কায় শিকার করিতে যায়। সেখানে তুষারাহত হওয়ার ফলে তাহার দুই হাতের দশটি আঙুল কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। পরে দুই হাতের তালুতে অস্ত্রোপচার করিয়া, তালু চিরিয়া এবং দেহের অন্য স্থান হইতে চামড়া জোড়া লাগাইয়া আবার দশটি আঙুল গঠন করিয়া দেওয়া হয়। সঞ্চালনক্ষম করিবার জন্য অন্য স্থান হইতে টেণ্ডন লইয়া নূতন আঙুলে সংযোগ করা হয়।

কিছুদিন অভ্যাসের পর মিঃ কডি তাহার নূতন আঙুলগুলি এমন সুন্দরভাবে ব্যবহার করিতে শিখে যে, আট মাস পরে সে এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লইতে সক্ষম হয়। অস্ত্রোপচারের পূর্বে সে নিজে খাইতে বা পোষাক পরিতে পারিত না।

ক্ষয়রোগে পি. এ. এস-এর কার্যকারিতা থাইরয়েড বিরোধী ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল

ক্ষয়রোগ দমনে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে পি. এ. এস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পি. এ. এস-এর কার্যকারিতা হয়ত কতক পরিমাণে ইহার থাইরয়েড বিরোধী ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। স্কটল্যাণ্ডের ডাঃ হ্যামিল্টনের মতে পি. এ. এস সংযোগের ফলে বিশেষ করিয়া শরীরের ওজন বৃদ্ধি, তাপমাত্রার হ্রাস এবং নাড়ীর গতির মন্থরতা ইহার থাইরয়েড বিরোধী ক্রিয়ার জন্যই হইয়া থাকে। পি. এ. এস

(প্যারা-অ্যামিনো-সেলিসাইলিক অ্যাসিড) ব্যবহার না করিলে থাইরয়েড গ্রন্থি বৃদ্ধি পায়। গণ্ডরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিদেরও এইরূপ থাইরয়েড গ্রন্থির কার্য-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলেই উহার স্ফীতি ঘটিয়া থাকে। ডাঃ হ্যামিল্টন একটি রোগীর উপর পি. এ. এস-এর সঙ্গে থাইরয়েড এক্সট্রাক্ট প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন, তদবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থির কোনরূপ স্ফীতি হয় না।

পি. এ. এস কোন দ্রাবণ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিন শোষণ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এইভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে আয়োডিন শোষণ করিয়া লইবার ফলেই হয়তো উহার হরমোন উৎপাদনের শক্তি হ্রাস পাইয়া থাকে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

রামন এফেক্ট আবিষ্কারের রজত-জয়ন্তী

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে অধ্যাপক সি. ভি রামন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গবেষণাগারে কতকগুলি তরল জৈব পদার্থ দ্বারা আলোক বিচ্ছুরিত হইলে আলোর ধর্মের কি পরিবর্তন হয় সে বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯২৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তিনি বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালীর মধ্যে কতকগুলি নূতন রেখা লক্ষ্য করেন; ঐ রেখাগুলি আপতন রশ্মির বর্ণালীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বিশেষ পরীক্ষা হইতে প্রকাশ পায় যে, অণুর মধ্যে পরমাণু সংখ্যা ও তাহাদের বিন্যাসের উপর এই নূতন রেখার সংখ্যা এবং আপতন রশ্মির সমতুল্য রেখা হইতে উহাদের অপসারণের পরিমাণ নির্ভর করে। পরে পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে, শুধু তরল অবস্থায়ই নয়, পদার্থের কঠিন ও বায়বীয় অবস্থায়ও এইরূপ ব্যাপার

অধ্যাপক সি. ভি. রামন

সংঘটিত হয়। ১৯২৮ সালেই জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী পিটার প্রিংস্‌হাইম এই ব্যাপারটিকে প্রথম রামন এফেক্ট আখ্যা দেন।

এই আবিষ্কার আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯২৩ সালে রামনাথন সায়েন্স এসোসিয়েশনে গবেষণা কালে লক্ষ্য করেন যে, বিশেষভাবে পরিস্রুত ও পরিশোধিত তরল পদার্থের দ্বারা নীল আলোক বিচ্ছুরিত হইলে তন্মধ্যে সবুজ আলোক প্রকাশ পায়। তিনি এই অতিরিক্ত সবুজ আলোককে প্রতিপ্রভা বা ফ্লুরেসেন্স বলিয়া অনুমান করেন। ১৯২৫ সালে কৃষ্ণানও এই লেবরেটরীতে গবেষণা কালে ৬টি তরল পদার্থের বিচ্ছুরিত আলোকে এইরূপ একটি অতিরিক্ত আলোক রশ্মি দেখিতে পান। তিনিও প্রতিপ্রভা বলিয়াই অনুমান করেন। অধ্যাপক রামন এইসব বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফল পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং স্পেক্ট্রোগ্রাফের সাহায্যে বিচ্ছুরিত আলোক পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হন। ১৯৩০ সালে এই আবিষ্কারের গুরুত্ব স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে পদার্থ-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

১৯৩০ সালে ম্যাক্সেব্যাক প্রথম রামন এফেক্ট সম্বন্ধে পরিমাণগত একটি মতবাদ প্রকাশ করেন। উহা দুই পরমাণুবিশিষ্ট অণুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই মতবাদ পরে প্ল্যাকজেক্ কর্তৃক প্রসারিত হইয়া বহু পরমাণুবিশিষ্ট নন্‌পোলারাইজেব্‌ল্ অণুর ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। প্ল্যাকজেক্ বিভিন্ন অণুর গঠন অনুযায়ী রমন লাইনের পোলারাইজেসন ও প্রখরতা নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণে গ্রুপ থিয়োরী প্রয়োগ করেন। এই সব মতবাদ পুষ্ট হইয়া রামন এফেক্ট পদার্থতত্ত্ববিদ ও রাসায়নিক উভয়কেই সমস্ত প্রকার পরিচিত অণু এবং র‍্যাডিক্যালের গঠন নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বিগত ২৫ বৎসরে পৃথিবীর নানাস্থানের সাময়িক পত্রে রামন এফেক্ট সম্বন্ধে প্রায় ২৯০০ মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আণবিক গঠনের প্রকাশ ব্যতীত রাসায়নিক পদার্থের বিশুদ্ধতা নিরূপণে এবং রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া অনুসরণেও রামন এফেক্ট বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

রামন-রশ্মি

গত ২৫ বৎসর রামন এফেক্ট অনুশীলনে যান্ত্রিক ব্যবস্থার নানারূপ উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে হাই-ডিস্‌পারস্থাল স্পেক্ট্রোগ্রাফের সাহায্যে বর্ণালীর ফটো তুলিতে কয়েক ঘণ্টা-এক্স্‌পোজারের প্রয়োজন হইত। বর্তমানে ফটো-মাল্টিপ্লায়ার টিউব আবিষ্কৃত

হওয়ার ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কার্য সম্পন্ন হইতে পারে।

রামন এফেক্টের আবিষ্কার পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে অন্যতম। ২৫ বৎসর পূর্বে যখন এদেশে বিজ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ ছিল, সেই সময়ে একজন ভারতীয়ের দ্বারা এদেশেরই একটি বিজ্ঞানাগারে এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সমস্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষেই বিশেষ গৌরব ও উদ্দীপনার বিষয় সন্দেহ নাই। ১৯৫৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভারতের বিভিন্ন স্থানের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে রামন এফেক্ট আবিষ্কারের রজত-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে।

'প্রকৃতিতে একটা শৃঙ্খলা আছে, সঙ্গতি আছে। আজ যাহা যেরূপে ঘটে, কালও তাহা সেইরূপে ঘটিয়া থাকে। আবার অনেকগুলা ঘটনা একই রকমে ঘটে। কেন সেই শৃঙ্খলা আছে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আছে, তাহা দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকলা চোখে, মাপকাঠি হাতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, তিনি এই সকল শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করেন। তোমার আমার চোখে যে শৃঙ্খলা ধরা পড়ে না, বৈজ্ঞানিকের চোখে তাহা ধরা পড়ে। তিনি জাগতিক বিধি-বিধানের আবিষ্কার করেন। নারিকেল ফলের গতির যে নিয়ম, চাঁদের গতিরও সেই নিয়ম, গ্রহগণের গতিরও সেই নিয়ম, আবার জোয়ার-ভাটায় মহাসাগরের অম্বুপৃষ্ঠের উত্থান-পতনেও সেই নিয়ম। ইহা নিউটনের পূর্বে কাহারও চোখে পড়ে নাই ; নিউটনের চোখে পড়িয়াছিল, তাহাতেই নিউটনের নিউটনত্ব।'

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এনামেল করিবার অভিনব পদ্ধতি

লণ্ডনের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অভিনব ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক উজ্জ্বল এনামেল করা দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এনামেল করিবার কাজ সম্পন্ন হইতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। যে দ্রব্যগুলির উপর এনামেল করা হইবে সেগুলিকে একটি আধারের মধ্যে রাখিয়া আধারটিকে বায়ুশূন্য করা হয়। অতঃপর আধারটির সময় একটি যন্ত্রের সাহায্যে দ্রব্যটিকে ঘোরানো হয়; ফলে দ্রব্যটির সমস্ত অংশের উপর অ্যালুমিনিয়ামের অণুগুলি সমানভাবে জমা হয়।

ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির সাহায্যে কেবলমাত্র ধাতু-নির্মিত দ্রব্যাদি নয়, কাচ ও প্লাষ্টিক নির্মিত অলঙ্কার, ব্রোচ, পদক প্রভৃতিকেও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল সোনালী বা রূপালী রঙের অলঙ্কারে পরিণত করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠান

হাই ভ্যাকুয়াম প্রক্রিয়ায় এনামেল করিবার জন্য বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইবার পূর্বে ল্যাকার-করা প্লাষ্টিকের অলঙ্কারগুলিকে স্পিণ্ডল-এর গায়ে আঁটিয়া দেওয়া হইতেছে

মধ্যে একখণ্ড অ্যালুমিনিয়ামের তার প্রবেশ করাইয়া বিদ্যুৎ চালনা করা হয়। ইহার ফলে তারটি বাষ্পে পরিণত হয় এবং অ্যালুমিনিয়ামের অণুগুলি ভিতরে রক্ষিত দ্রব্যসমূহের উপর জমা হইয়া একটি উজ্জ্বলশুভ্র সূক্ষ্ম আবরণের সৃষ্টি করে।

গোলাকার দ্রব্যের উপর এনামেল করিবার

একটি বিশেষ মার্কার হুইস্কির বোতলকে ঝক্‌ঝকে শুভ্র এনামেল-করা বোতলে রূপান্তরিত করিতেছেন।

আগামী ২৭শে এপ্রিল হইতে ৮ই মে পর্যন্ত লণ্ডন ও বার্মিংহামে যে বৃটিশ শ্রমশিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হইবে সেখানে উক্ত প্রতিষ্ঠান তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শনের আয়োজন করিতেছেন।
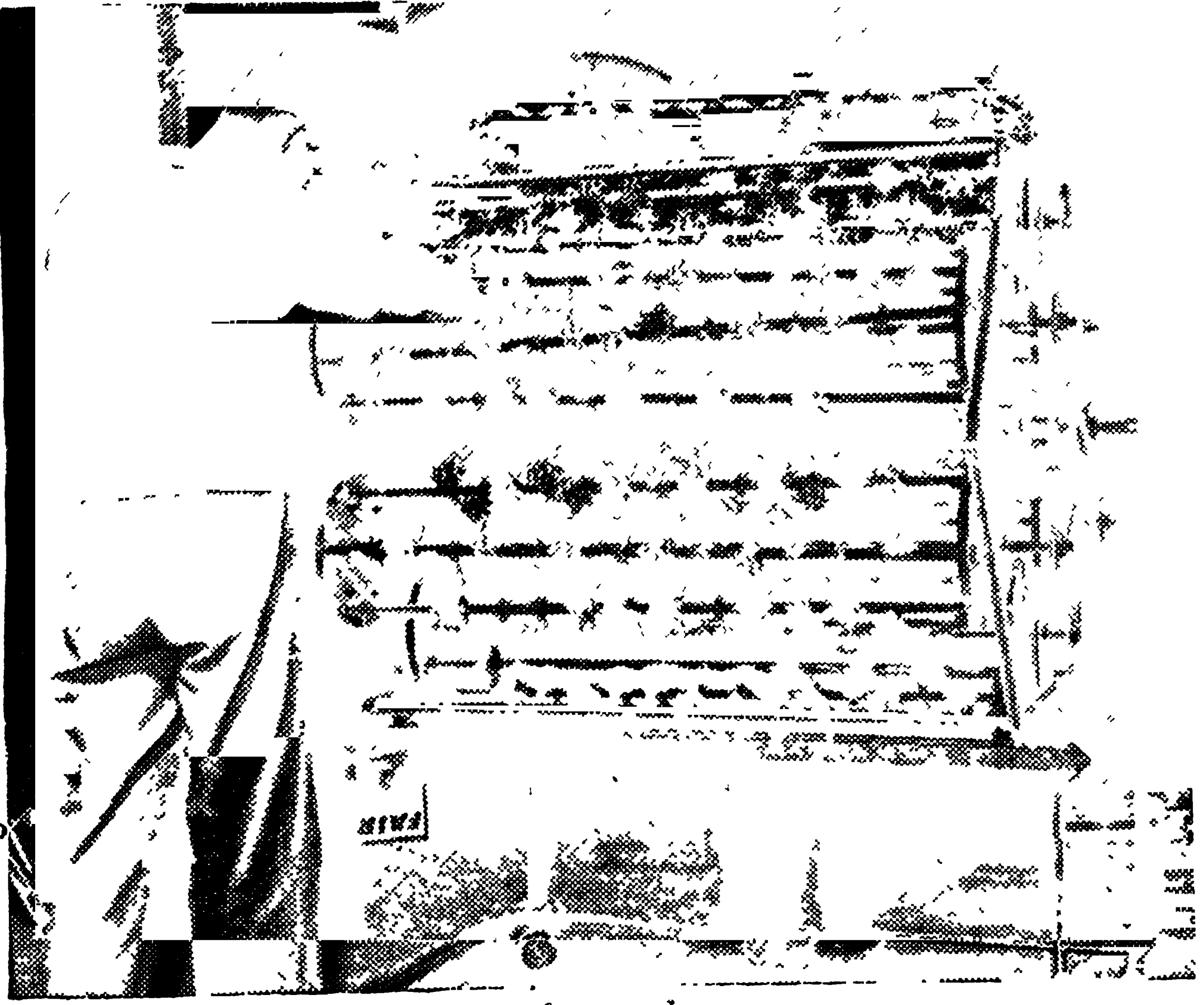
ল্যাকার-করা জিনিসগুলিকে র‍্যাকের মধ্যে সাজান হইয়াছে। এনামেল করিবার জন্য এবার র‍্যাকটিকে বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে বসাইয়া দেওয়া হইবে
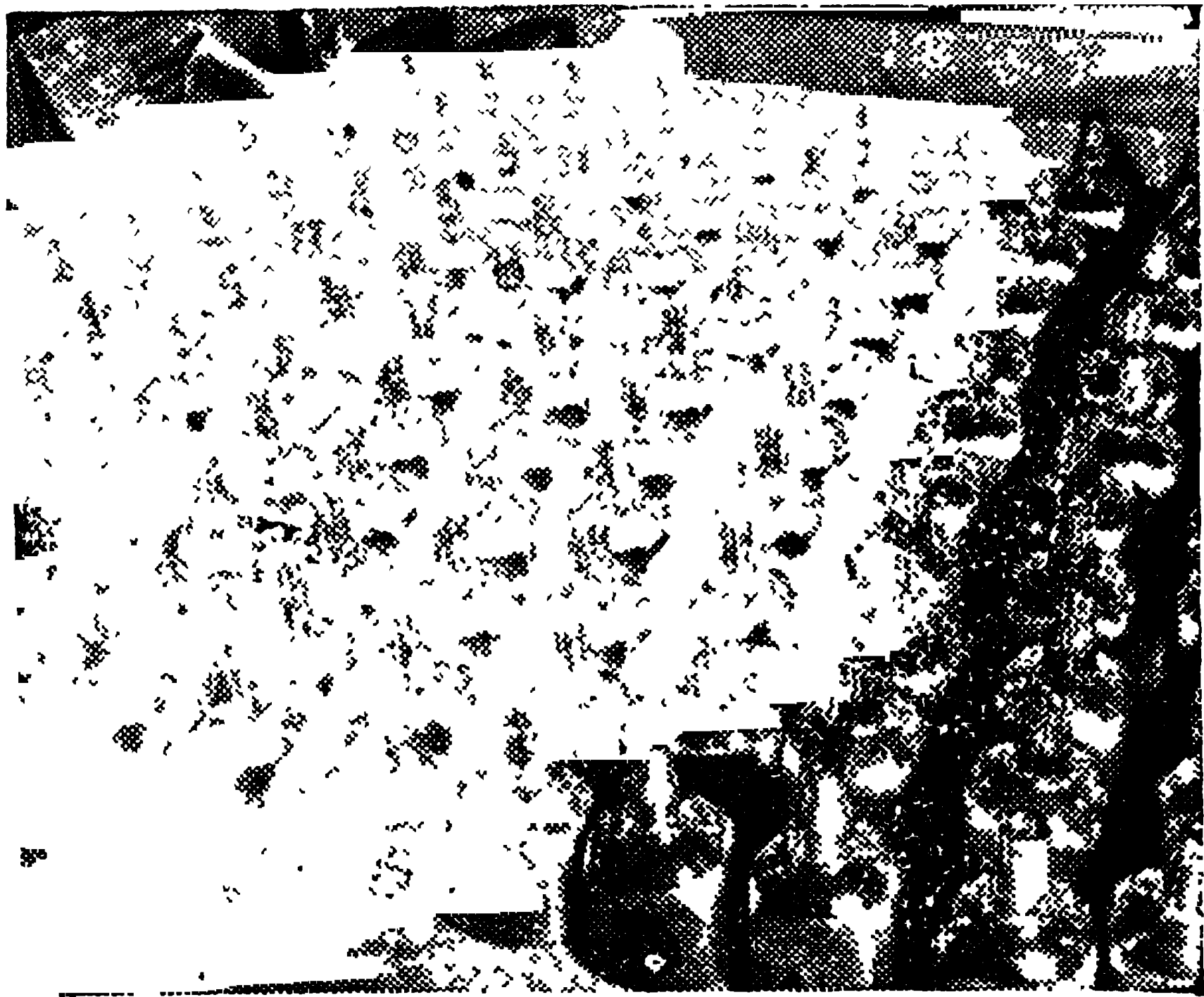
হাই ভ্যাকুয়াম প্রক্রিয়ায় সিলভার এনামেল-করা বোতলের সারি দেখা যাইতেছে

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ্চ—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ,—তৃতীয় সংখ্যা

অ্যান্টনিও লিউয়েনহোয়েক

(১৬৩২—১৭২৩)

করে দেখ

পরীক্ষাগারে কুয়াসা উৎপাদন

শীতকালে মাঝে মাঝে সবাই তোমরা কুয়াসা হতে দেখেছ। সময় সময় কুয়াসা এত ঘন হয় যে, কাছের মানুষও চেনা যায় না। এই কুয়াসা হয় কেন, বলতে পার? জলীয় বাষ্প সমন্বিত বাতাস হঠাৎ ঠাণ্ডা হলেই জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং কুয়াসার সৃষ্টি করে। শিল্পাঞ্চলে যেখানে কলকারখানার ধোঁয়া বেশী অথবা যে সব জায়গায় ধূলাবালির আধিক্য, সেখানেই সাধারণতঃ কুয়াসা খুব ঘন হয়ে থাকে। খুব সহজ ব্যবস্থায় একটা পরীক্ষা করে তোমরাও কুয়াসা সৃষ্টি করে দেখতে পার।

পরীক্ষার জন্যে সরু মুখওয়ালা খুব মোটা একটা কাচের বোতল যোগাড় করতে হবে। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি রাখবার জন্যে সরুমুখ জালার মত এক রকমের বোতল পাওয়া যায়। এই বোতলকে ইংরেজীতে বলে 'কারবয়'। এরকমের একটা কারবয়ের মুখে আঁটবার জন্যে একটা রাবারের ছিপি, চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সরু এক টুক্‌রা কাচের নল এবং খানিকটা রাবারের নল দরকার। আর যোগাড় করতে হবে একটা ফুটবল পাম্প।

রাবারের ছিপিটার মধ্যস্থলে এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে কাচের নলটা পরিয়ে দাও। তারপর কাচের নলের সঙ্গে রাবারের পাইপটি পরিয়ে অপর মুখটি ফুটবল পাম্পের সঙ্গে এঁটে দাও। এবার বোতলটার মধ্যে কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে

কাচের নল-পরানো ছিপিটা বোতলের মুখে এঁটে দিয়ে পাম্পের সাহায্যে বোতলের ভিতরে বেশ খানিকটা হাওয়া ঢুকিয়ে দাও। তারপর বোতলের মুখ থেকে ছিপিটাকে একটানে খুলে নিলেই বোতলের বাতাস অকস্মাৎ প্রসারিত হওয়ার ফলে তাপ কমে যাবে এবং বোতলের ভিতরে জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুর আকার ধারণ করে' কুয়াসার সৃষ্টি করবে। বোতলের ভিতরে যদি সামান্য একটু সিগারেটের ধোঁয়া দেওয়া হয় তাহলে বোতলের ভিতর ঘন কুয়াসার সৃষ্টি হবে।

জেনে রাখ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাছ

কিছুদিন পূর্বে আফ্রিকার উপকূলে একটা অদ্ভুত রকমের মাছ ধরা পড়েছিল—সে খবর তোমরা কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ! মাছটা আধুনিক যুগের কোন মাছের মতই নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ জাতের মাছ নাকি ৫০,০০০,০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীর জলরাশিতে বিচরণ করতো। প্রায় বছর পনেরো পূর্বে অবশ্য এ জাতের আর একটা মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম এ রকমের একটা মাছ ধরা পড়ে। এর ফলে সারা পৃথিবীর মৎস্য-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। কারণ পায়ের মত পাখনাবিশিষ্ট এরকমের মাছ যে অন্ততঃ ৫০,০০০,০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল—সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা নিঃসন্দেহ। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান—লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে এ ধরনের পায়ের মত পাখনাবিশিষ্ট (ক্রোসোপ্‌টেরিজিয়ান) মাছ থেকেই ক্রমবিকাশেব ফলে আংশিক স্থলচর বা উভচর প্রাণীর উৎপত্তি ঘটেছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এসব মাছের যে সব প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাথেকে দেখা যায়—এসব মাছের পাখনাব মধ্যস্থলে শিরদাঁড়ার মত অস্থি বিদ্যমান ছিল। এসব পাখনাই হয়তো পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ উভচর প্রাণীদের পায়ের আকৃতি পরিগ্রহ করেছে। তাছাড়া এসব মাছের দাঁত, শ্বাসযন্ত্রাদিও ছিল সেই প্রাচীন যুগের উভচর প্রাণীদের দাঁত ও শ্বাসযন্ত্রের মত। মোটের উপর এই মাছের সঙ্গে আদি স্থলচর জীবের আরও অনেকাংশেই সাদৃশ্য ছিল। ১৯৩৮ সালে ধৃত এই মাছটা ছিল সেই ৫০,০০০,০০০ বছর পূর্বেকার কোয়েলাকান্ত্‌ জাতীয় মাছের বংশধর। কিন্তু পরীক্ষার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই মাছটা পচে যায়; কাজেই তার শরীরের ভিতরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি; উপরের চামড়া ও কঙ্কালটা সংরক্ষিত হয়েছিল মাত্র। দক্ষিণ আফ্রিকার রোড্‌স্‌ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক স্মিথ কিন্তু এ-রকমের আর একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাছ সংগ্রহ করবার জন্যে উঠেপড়ে লাগেন। এই মাছের ছবিসমেত তিনি ইংরেজী, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় প্রচারপত্র ছাপিয়ে

যাবতীয় মাছ-ধরা প্রতিষ্ঠানের নিকট এই মাছের সন্ধান রাখবার জন্যে আবেদন জানান এবং বেশ মোটা পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই পুরস্কার ঘোষণার চৌদ্দ বছর পর ইপ্সিত ফল পাওয়া গেল। গত ডিসেম্বর মাসে ম্যাডাগাস্কারের কমোরো দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী একজন জেলে বাজারে একটা অদ্ভুত মাছ বিক্রি করিতে নিয়ে আসে। মাছটা ধরা পড়েছিল ম্যাডাগাস্কারের সন্নিহিত ভারত মহাসাগরে। মাছটার ওজন ছিল প্রায় দেড় মণ এবং লম্বায় ৫ ফুট। বাজারে এই মাছটা দেখে অন্য আর একজন লোক উচ্ছ্বসিতভাবে চীৎকার করে তাকে অধ্যাপক স্মিথের ঘোষিত প্রচারপত্র ও পুরস্কারের কথা বলে। অধ্যাপক স্মিথের প্রচারিত মাছের আকৃতি ও পুরস্কারের কথা এই দ্বিতীয় লোকটির স্মরণ ছিল। মাছটির জন্যে জেলে একশত পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করে। ভিতরকার নাড়ীভুঁড়িসহ সুরক্ষিত এই অদ্ভুত মাছটি বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে জীব-জগতের অভিব্যক্তির একটি ধারা অর্থাৎ জল থেকে জীবের স্থলভাগে অগ্রগতির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে যে সাহায্য হবে তা অতুলনীয়।

কোয়েলাকান্থ্ নামক প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাছের জীবিত সংস্করণ

বছর তিনেক আগে ১৯৪৯ সালে ওয়াশিংটনের ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে এই কোয়েলা-কান্থ্ জাতীয় মাছের একটা আঁশ পাওয়া যায়। ফ্লোরিডার টাম্পা নামক জায়গা থেকে কোন স্ত্রীলোক ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামের মৎস্য-বিশেষজ্ঞ ডাঃ আইজাক জিন্‌স্‌বার্গকে এই আঁশটি পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। শিল্পকার্যের জন্যে এই স্ত্রীলোকটি জেলেদের কাছ থেকে মাছের আঁশ সংগ্রহ করতেন। একদিন তিনি প্রায় দেড় ইঞ্চি ব্যাসের অদ্ভুত রকমের অনেকগুলি আঁশ কেনেন। তারই একটা আঁশ তিনি পাঠিয়েছিলেন। স্ত্রীলোকটির আর কোন সন্ধান না পাওয়ায় এ মাছ সম্বন্ধে আর কিছু জানা সম্ভব হয় নি। ডাঃ জিন্‌স্‌বার্গ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা এই আঁশটিকে কোয়েলাকান্থ্ বা অন্য কোন জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক মাছের আঁশ বলেই অনুমান করেন। এই আঁশ পাওয়ার পর তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, আমেরিকায় সমুদ্রের কোথাও হয়তো আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের নিকট অজ্ঞাত কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীর বংশধরের অস্তিত্ব রয়েছে।

জীবজগতের পিগ্‌মী যারা

জীবজগতের বড়দের কথা প্রায় সবাই জানে। কিন্তু ছোটদের নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। তোমরা জান, স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে তিমিই হচ্ছে সব চাইতে বড়, আর পাখীদের মধ্যে উটপাখী। কিন্তু ছোটদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের প্রাণীর সংখ্যা অগণিত। তাদের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা খালি চোখেই দেখতে পাই আর কতকগুলি এতই ছোট যে, আমাদের চোখে তারা অদৃশ্য। মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এই ক্ষুদে প্রাণী-গুলিকেদেখা সম্ভব। তোমাদের কাছে এরকমের কয়েকটি ক্ষুদে প্রাণীর কথা বলছি। শুনলে বেশ কৌতুকবোধ করবে।

প্রথমেই প্রোটোজোয়ার কথা বলা যাক। এই ক্ষুদে প্রাণীগুলির দেহ একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। আকারে ছোট হলে কি হবে, এদের অনেকেই আমাদের সঙ্গে গুরুতর শত্রুতা করে থাকে। ঘুম-রোগের নাম শুনেছ কি? এ রোগে আফ্রিকার বাসিন্দারাই সচরাচর ভুগে থাকে। এ রোগের জন্যে দায়ী হচ্ছে এক জাতীয় ক্ষুদে প্রোটোজোয়া।
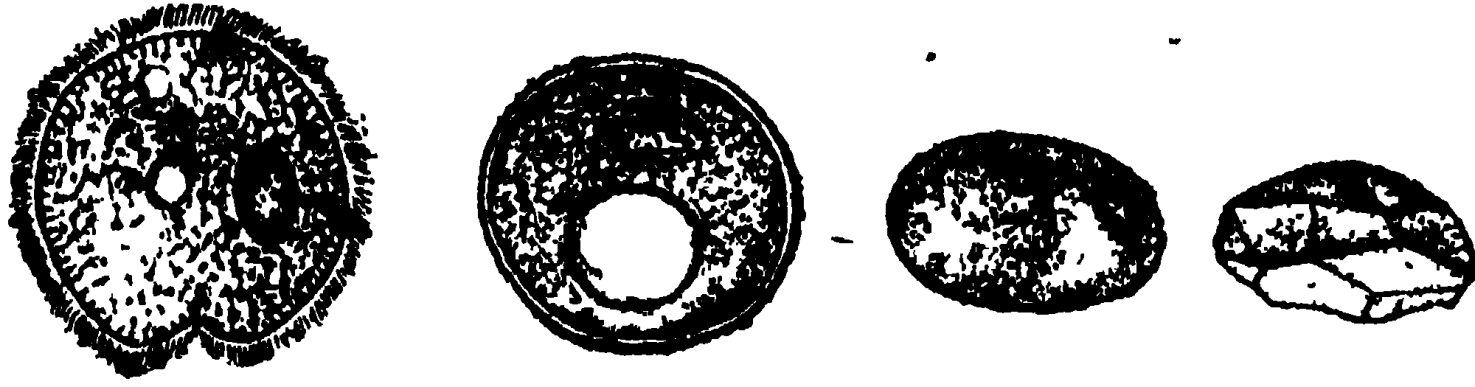
অবস্থাভেদে প্রোটোজোয়ার বিভিন্ন রূপ

তাছাড়া ম্যালেরিয়াও এক রকমের ক্ষুদে প্রোটোজোয়ার দ্বারাই হয়ে থাকে। আশ্চর্যের কথা নয় কি? এক সময়ে মশাকেই ম্যালেরিয়ার জন্যে দায়ী করা হয়েছে। এর মূলে যে আবার অন্য কেউ থাকতে পারে, সে কথা জানতে অনেকদিন সময় লেগেছে। মাইক্র-স্কোপের সাহায্য ছাড়া এদের দেখা যায় না। তাই এদের বলা হয় আণুবীক্ষণিক প্রাণী। এদের দেহে অনবরত রূপান্তর ঘটে থাকে। অনেক সময় মাইক্রস্কোপে এদের এক একটা বালির কণার আকারেও দেখতে পাওয়া যায়। এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগের চাইতেও ছোট একরকমের প্রোটোজোয়া কালাজ্বরের সৃষ্টি করে থাকে। প্রোটোজোয়া শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর সংখ্যা অগণিত। এর মধ্যে অ্যামিবা, ভর্টিসেলা, ইউগ্লেনা, রটিফার, ষ্টেণ্টর প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। লিউয়েনহোয়েক নামক একজন বিজ্ঞানী আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের সর্বপ্রথম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন।

রটিফারের শরীরটা দেখতে অনেকটা টেলিস্কোপের মত। দেহের বিভিন্ন অংশ-গুলি পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে; কিন্তু চলাফেরা করবার সময় সেগুলি প্রসারিত

হতে থাকে। মুখের দু-দিকে বলয়াকার দুটি যন্ত্রের চতুর্দিকে অতি সূক্ষ্ম শোঁয়ার মত কতকগুলি পদার্থ সারবন্দিভাবে সাজানো থাকে। খাদ্য গ্রহণের বেলায় সে দুটি অতি দ্রুত গতিতে নাড়াতে থাকে। মাইক্রস্কোপে তা ঘূর্ণায়মান চক্রের মত প্রতীয়মান হয়। এর

ভর্টিসেল।

সাহায্যে জলের মধ্যে তারা আবর্তের সৃষ্টি করে। স্রোতের টানে বিভিন্ন জাতের আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও উদ্ভিদ ছুটে এসে মুখের ভিতরে ঢুকে যায়। এইভাবেই এরা খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে
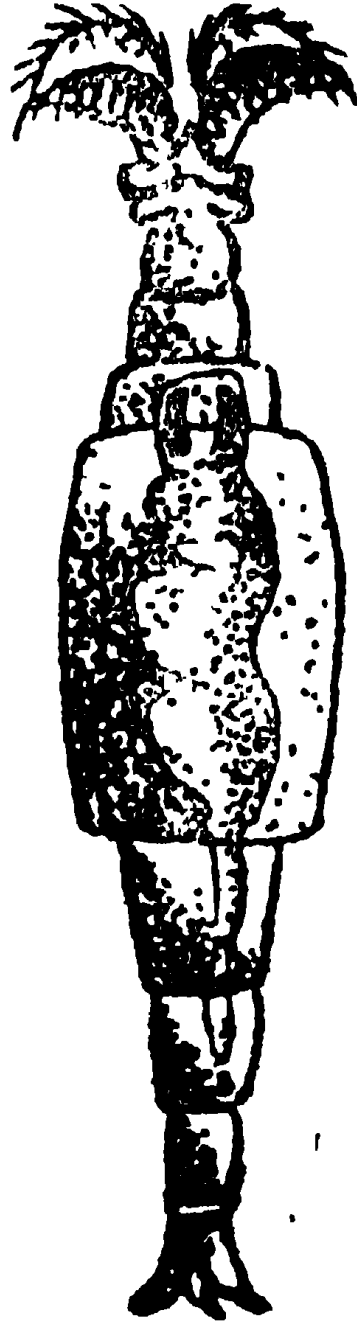
রটিফার

সচরাচর পুরুষ-রটিফারের চেয়ে স্ত্রী-রটিফার দেখতে বেশ নাদুসনুদুস। কোন কোনটার আকার এক ইঞ্চির এক দশমাংশও হয়ে থাকে। আবার পুরুষ-রটিফারের

মধ্যে এমন অনেক জাত আছে, যারা হাজার চেষ্টা করেও আকারে এক ইঞ্চির এক হাজার ভাগের এক ভাগের বেশী লম্বা হতে পারে না।

এবার আর এক জাতের প্রাণীর কথা বলা যাক। এদের 'ওয়ার্ম' বলা হয়। এদের মধ্যে ফ্ল্যাটওয়ার্ম এবং রাউণ্ডওয়ার্মের নাম করা যেতে পারে। এদেরও অবশ্য মাইক্রোস্কোপের সাহায্যেই পরীক্ষা করতে হয়।

খোলবিশিষ্ট প্রাণীর মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র কয়েক জাতের সন্ধান পাওয়া গেছে;
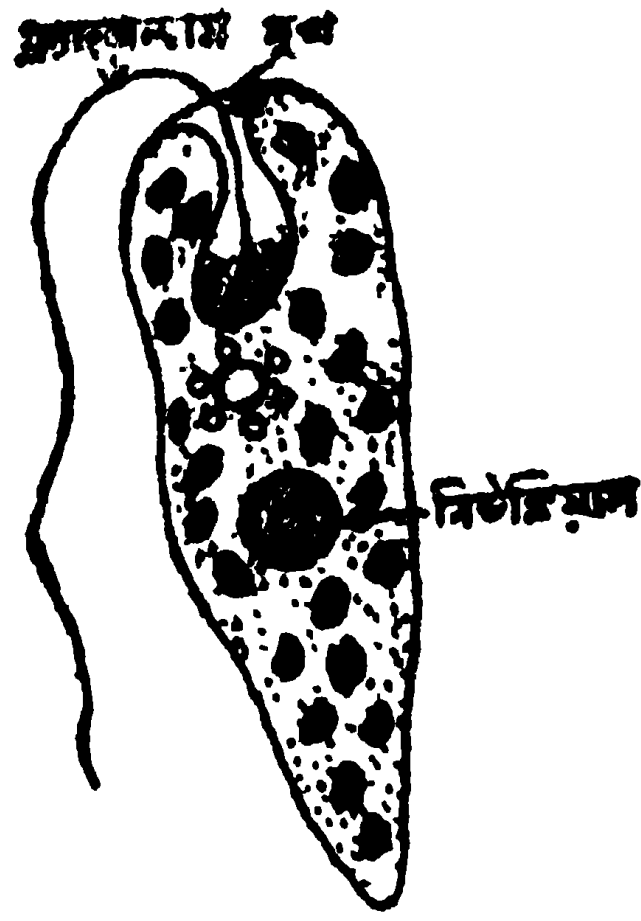
ইউগ্লেনা

সেগুলি নাকি আকারে এক ইঞ্চির একশ' ভাগের এক ভাগ মাত্র। আরও আশ্চর্যের বিষয়—আলপিনের গোড়ারদিকের মত ক্ষুদ্রাকৃতি শামুকের কথাও নাকি জানা গেছে। আবার এক জাতের ঝিনুক আকারে একেও হার মানিয়েছে। এক জাতের পরজীবী বোলতা আছে, যারা নাকি বিভিন্ন কীটপতঙ্গের ডিম আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। এরা আকারে এক ইঞ্চির একশ' ভাগের এক ভাগের চেয়েও ছোট হয়ে থাকে।

আচ্ছা, এবার মেরুদণ্ডী জীব-জন্তুর মধ্যে কেউ ক্ষুদে আছে কিনা দেখা যাক। ফিলিপাইন দ্বীপে একজাতের মাছের কথা শোনা গেছে তারা নাকি অধুনালুপ্ত পুরাকালের কোন এক জাতীয় দুর্লভ মাছের বংশধর। এগুলি আবার বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের মধ্যে সব চাইতে যারা বড়, পরিণত অবস্থায় লম্বায় তারা আধ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না; আর সর্বাপেক্ষা ছোট মাছের আকার হলো—কোয়ার্টার ইঞ্চির চেয়ে সামান্য একটু বড়। সেখানকার বাসিন্দারা এই সব মাছ মসলা সহযোগে উপাদেয় খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

উভচর প্রাণীর মধ্যেও খুব ছোট ব্যাঙের সন্ধান পাওয়া গেছে। গেছো ভূতের নাম হয়তো শুনে থাকবে। কিন্তু গেছো ব্যাঙের কথা জান কি? মধ্য আমেরিকার

কিউবা-তে এক রকমের গেছো ব্যাঙ দেখা যায়; তার শরীরটি নাকি লম্বায় মোটে এক ইঞ্চির আট ভাগের তিন ভাগ মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রে একজাতের ক্ষুদে ব্যাঙ জলার চারধারে বাস করে। নর্থ ক্যারোলিনা থেকে ফ্লোরিডার মাঝামাঝি এদের আস্তানা গড়ে উঠেছে। আকারে এরা এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের তু-ভাগ মাত্র। দেখতে ছোট হলে কি হবে, গলার আওয়াজে কিন্তু এরা কম যায় না। বহু দুর থেকেও এসব ক্ষুদে গায়কের ঐকতান শোনা যায়। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে—'স্মল কোরাস ফ্রগ'।

এবার সরীসৃপের কথায় আসা যাক। পানামায় অতি ক্ষুদ্র আকারের টিকটিকির

গ্রামোফোনের চোঙের মত
দেখতে, আসলে কিন্তু
এটা ষ্টেন্টর

সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু টিকটিকিই নয়, সেখানে এক জাতের অতি ক্ষুদ্র সাপেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মাঝারি আকারের বড়শীতে গেঁথে মাছের টোপ হিসেবে এদের অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। এরা যখন মাটির বুকে কিলবিল করে চলাফেরা করে তখন প্রায়ই এদের কেঁচো বলে ভ্রম হয়। সব চাইতে ছোট্ট যেটি, তার আকার লম্বায় প্রায় চার ইঞ্চি, আর দেহটি হলো একটা সেলাই করবার সূচের মত।

পাখীদের মধ্যে হামিংবার্ড হচ্ছে সব চেয়ে ক্ষুদ্র। আটশ' জাতের হামিংবার্ড আছে বলে শোনা যায়। তার মধ্যে কিউবার 'প্রিন্সেস হেলেনাস্ হামিংবার্ড' হলো ক্ষুদ্রতম; লম্বায় সোয়া তু-ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি। এর ডানা লম্বায় এক ইঞ্চির চেয়ে সামান্ত একটু বেশী, ঠোঁটটি আধ ইঞ্চি। এদের ডিমের আকার কোয়ার্টার ইঞ্চি।

উড়তে উড়তে ফুলের মধ্যে ঠোঁটটি ঢুকিয়ে দিয়ে এরা মধু পান করে। তখন হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন বিলকুল শূন্যে ঝুলছে। ডানা তুটি এত জোরে নাড়ে যে, মোটেই দেখা যায় না। পাখীদের মধ্যে একমাত্র এরাই নাকি পিছন দিকে উড়তে পারে। কেউ

কেউ আবার ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগেও উড়ে থাকে। শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের বাসা রক্ষা করবার জন্যে এরা যেন মৃত্যুপণ ক'রে শত্রুর আকৃতি ও প্রকৃতি এবং শক্তির কথা কিছুমাত্র বিবেচনা না করেই মরিয়া হয়ে তাকে আক্রমণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় ক্ষেত্রেই এরা জয়ী হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং আলাস্কায় যে সব ছোট আকারের ছুঁচা দেখতে পাওয়া যায়,

হামিংবার্ড উড়ন্ত অবস্থায় ফুলের মধুপান করছে

লম্বায় তারা তিন ইঞ্চি। এই যে তিন ইঞ্চির কথা বলছি, এর মধ্যে লেজের দৈর্ঘ্যও ধরতে হবে। লেজটিই প্রায় এক ইঞ্চি। সুতরাং আসলে প্রাণীটি লম্বায় দাঁড়াচ্ছে দু-ইঞ্চি। ওজন হচ্ছে মোটামুটি এক আউন্সের চৌদ্দ ভাগের একভাগ। কিন্তু হিংস্রতায় এরা ভয়ঙ্কর। আকারে এদের চাইতে বহুগুণ বড় ইঁদুরকে আক্রমণ ক'রে ঘায়েল করে দেয়। হিংসা এবং ঝগড়া করা যেন এদের মজ্জাগত স্বভাব। ইঁদুর না পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি সুরু করে দেয়। ভাগ্যিস এরা আকারে বড় নয়। তা হলে আর রক্ষা ছিল না। এদের আক্রমণে মানুষকেও পরিত্রাহি চীৎকার করতে হতো। আমাদের দেশের ছুঁচা কিন্তু এদের বিপরীত। এরা একেবারেই নিরীহ ও গোবেচারী; নর্দমা ও আস্তাকুড় থেকে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

—ন—

অ্যাণ্টনিও লিউয়েনহোয়েক

মেবিয়ার বয়স তখন উনিশ বছর। বাবার কথাবার্তা বেশ শোনে, আর তাকে খুব যত্ন করে। একদিন সকাল বেলা মেবিয়া অবাক হয়ে গেল, পিতা লিউয়েনহোয়েকের কাণ্ড দেখে। তিনি ছুটাছুটি করছিলেন বৃষ্টির জল ধরবার জন্যে। লিউয়েনহোয়েক বৃষ্টির জল ধরে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক ফোঁটা জল পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল সফলতার দীপ্তিতে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন—দেখে যাও, কত জীবাণু এক ফোঁটা জলের মধ্যে! এই সম্বন্ধে তিনি পরে রয়্যাল সোসাইটিতে লিখে পাঠান।

ডেলফ্‌টে সকলেই জানতো যে, এ সহরে একজন নাগরিক আছেন যার মাথায় কি রকম একটু ছিট্ আছে। সে ছোট ছোট পোকামাকড় থেকে আরম্ভ করে অনেক

লিউয়েনহোয়েকের উদ্ভাবিত প্রথম মাইক্রস্কোপটি
দেখতে যেমন ছিল

কিছুই তাঁর অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে। লিউয়েনহোয়েক কিন্তু ওসব কথার দিকে মোটেই কান দিতেন না। বেগনিয়র-ডে-গ্রাফ নামে একজন লোকের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তিনি ছিলেন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির একজন বার্তাপ্রেরক।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে লিউয়েনহোয়েকের জন্ম হয়। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর মাতা তাকে স্কুলে দেন। কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে বালক একটি দোকানে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজে নিযুক্ত হয়। কিছুদিন পরে সে নিজেই এক দোকানের মালিক হয়ে পড়ে। এই সময় থেকে লেন্সের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট জিনিষ দেখবার জন্যে তাঁর

বিশেষ আগ্রহ জন্মে। বলতে গেলে এখান থেকেই আরম্ভ হয় লিউয়েনহোয়েকের জীবনের বৈজ্ঞানিক ধারা।

ছোট ছোট জিনিষ যা খালি চোখে ধরা দেয় না, লেন্সের সাহায্যে তা বেশ বড় দেখা যায়! লিউয়েনহোয়েক দেখে অবাক হয়ে যেতেন। মাছির মস্তকের আকৃতি হয়ে উঠত বিশাল, তাঁর কাচের ভিতর দিয়ে। এই রকম ভাবে তিনি বৈজ্ঞানিকের ধৈর্য নিয়ে চালাতে লাগলেন তাঁর গবেষণা। অজ্ঞাতভাবে গবেষণায় তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের পঁচিশ বছর কেটে গেল।

সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে ইউরোপের সাংস্কৃতিক জগতে নতুন নতুন চিন্তাধারা এসে আলোড়ন সৃষ্টি করে' পুরনো চিন্তাধারার কাঠামোটাকে ভেঙ্গে ফেলবার প্রয়াস পাচ্ছিল। গ্যালিলিও সৃষ্টি করে গেলেন নতুন দার্শনিক ধারা—পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর নির্ভর করে সৃষ্টি হবে দর্শনের সূত্রগুলি। এই ছিল নব দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইংল্যাণ্ডের ছিন্নভিন্ন রাষ্ট্রীয় জীবন দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছিল; কিন্তু

লিউয়েনহোয়েকের উদ্ভাবিত মাইক্রস্কোপে
যেরূপে দেখা হতো

দুর্বার স্রোতের মত সাংস্কৃতিক জীবনের চিন্তাধারা বাধা পেলেই কুল ছাপিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। ডাঃ ওখালিশ এবং অন্যান্য নতুন দর্শনের পথচারীদের নিয়ে সৃষ্টি হলো গুপ্ত বৈজ্ঞানিক সমিতি। এই সমিতি ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি হিসাবে রাজসমাদর পেল দ্বিতীয় চার্লস্‌-এর কাছে। এই রকম বৈজ্ঞানিক সমিতি গঠন হচ্ছে সেই যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা। অ্যাকাডেমি অব্‌ সায়েন্স-এর সৃষ্টি হয় ফরাসী দেশে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে।

লিউয়েনহোয়েক একদিন বেগনিয়রকে তাঁর কতকগুলি আবিষ্কারের কথা জানালেন। বেগনিয়র-ডি-গ্রাফ্ রয়্যাল সোসাইটিতে লিখে পাঠালেন লিউয়েনহোয়েকের আবিষ্কারের কথা। রয়্যাল সোসাইটি থেকে চিঠি এল লিউয়েনহোয়েকের কাছে তাঁর গবেষণার বিষয় জানবার জন্যে। লিউয়েনহোয়েক প্রত্যুত্তরে বেশ বড় একটা চিঠি লিখলেন তাঁর নিজের দেশের ভাষায়। ভাল করে গুছিয়ে চিঠি লেখবার ক্ষমতা তাঁর কমই ছিল; তাছাড়া তিনি বিদেশী কোনও ভাষাই জানতেন না। চিঠিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রকম জীবাণুর পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন। লণ্ডনের সুধীসমাজ চিঠি পেয়ে তাঁকে আরও বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে ভবিষ্যতে লিখতে অনুরোধ করলেন।

একদিন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বৃষ্টির জল পর্যবেক্ষণ কালে তিনি দেখতে পেলেন—এক ফোঁটা জলের মধ্যে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কীট নড়াচড়া করছে। একদিনের পরীক্ষার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, বিভিন্ন উপায়ে বারবার পরীক্ষা করে এক ফোঁটা জলের মধ্যে অজস্র কীটাণু দেখতে পেলেন। সন্দেহের সব রকম অবকাশ যখন ফুরিয়ে গেল তখন তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে লিখে পাঠালেন তাঁর আবিষ্কারের কথা।

চিঠি পাওয়ার পর রয়্যাল সোসাইটিতে হৈ চৈ পড়ে গেল। অনেকে তো অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়েই দিতে চাইলেন লিউয়েনহোয়েকের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু নব দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমিতি গঠিত তার সভ্যেরা অনেকেই জানতে চাইলেন বৈজ্ঞানিক সত্যকে আরও বিশদভাবে। লণ্ডনের বিজ্ঞান সমিতি তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাবার জন্যে চিঠি লিখে পাঠালেন। সমিতি থেকে তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিও চেয়ে পাঠান হলো।

চিঠি পেয়ে ডাচ্ বিজ্ঞানী হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, কেন তাঁরা বিশ্বাস করেন নাই তার আবিষ্কারের কথা। লিউয়েনহোয়েক একটা বিস্তৃত উত্তর দিলেন রয়্যাল সোসাইটিতে; কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিতে রাজী হলেন না।

উত্তর পেয়ে রয়্যাল সোসাইটির সভ্যগণ পরীক্ষামূলকভাবে লিউয়েনহোয়েকের বৈজ্ঞানিক তথ্যের সত্যতা জানবার জন্যে রর্বাট লুককে নিয়ে একটা কমিশন বসালেন। লুক এবং তাঁর সহকর্মীরা মিলে একটি নিখুঁত অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করলেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর রয়্যাল সোসাইটির বিশেষ সভা বসেছে। সভার গুরুগম্ভীর পরিবেশে লুক ঘোষণা করলেন, লিউয়েনহোয়েকের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সত্যতা। রয়্যাল সোসাইটি লিউয়েনহোয়েককে সম্মানিত করলেন সমিতির সভ্য করে। লিউয়েনহোয়েকের কাছে লণ্ডন থেকে একটা রূপার কৌটাতে মানপত্র এল।

লিউয়েনহোয়েকের আর একটি আবিষ্কার ডাঃ হার্ভির রক্তসংবহন তথ্যের পরিপূরক হিসাবে ধরা হয়। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হার্ভি আবিষ্কার করেছিলেন যে, দেহের রক্ত পরিচালিত হয় ধমনী আর শিরাগুলির ভিতর দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু

ধমনী আর শিরা উপশিরাগুলির মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ রয়েছে তা ডাঃ হার্ভি প্রমাণ করতে পারেন নি, ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে। একদিন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লিউয়েনহোয়েক একটি ব্যাঙাচি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ব্যাঙাচির লেজের কাছে জালের মত শিরা-উপশিরাগুলি তাঁর চোখে ধরা পড়ল। তিনি দেখলেন ব্যাঙাচির ধমনী আর শিরাগুলি জালের মত পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। যদিও লিউয়েনহোয়েকের পূর্বে মিলিপিগি দেখতে পেয়েছিলেন ব্যাঙের ফুস্‌ফুসের ভিতর ধমনী আর শিরাগুলি সংযুক্ত রয়েছে তথাপি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে লিউয়েনহোয়েকের পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।
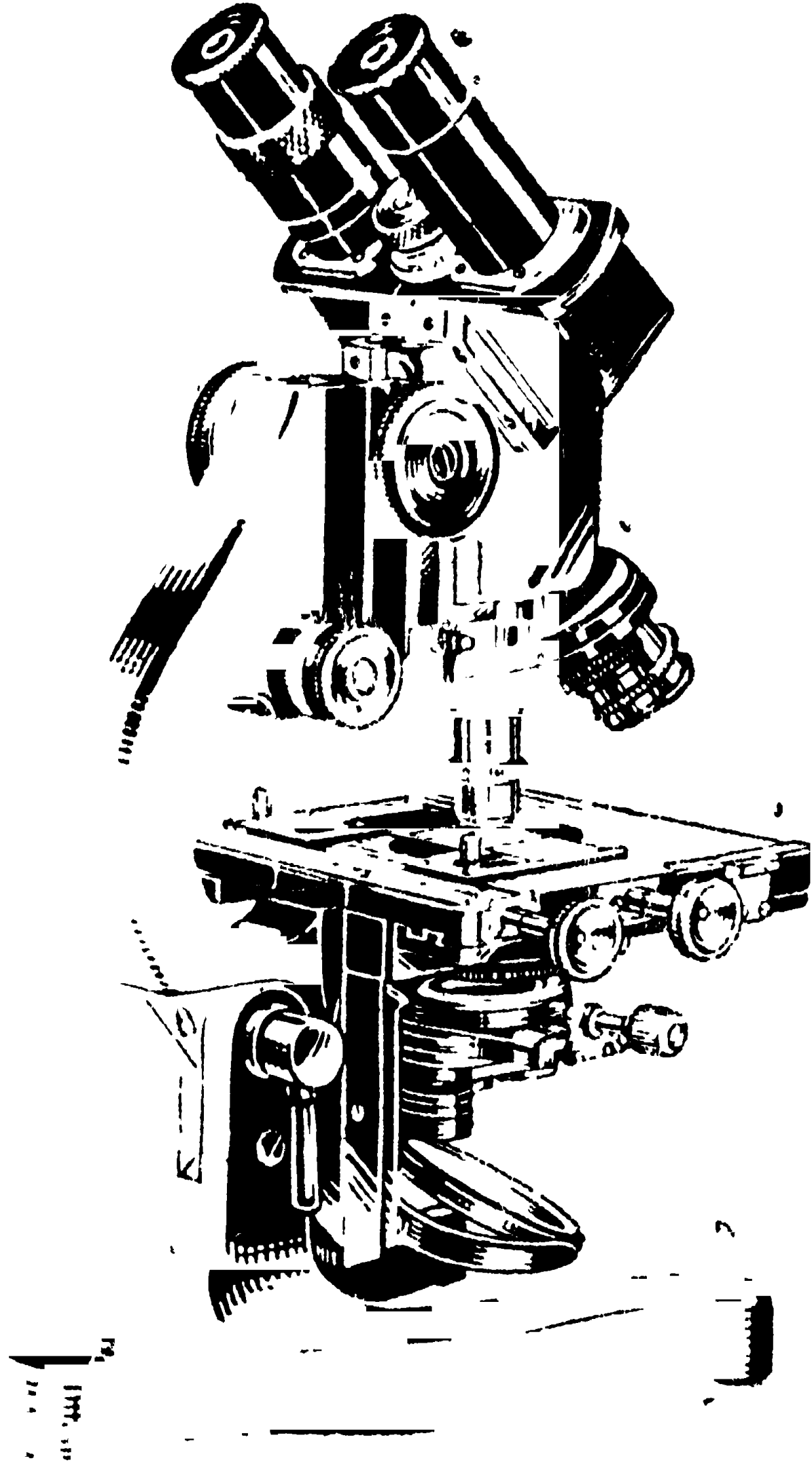
আধুনিক উন্নত ধরনের মাইক্রস্কোপ

লিউয়েনহোয়েকের আরও কতকগুলি আবিষ্কার জীবাণু-বিজ্ঞানের ইতিহাসের গোড়ার বিষয়বস্তু। লিউয়েনহোয়েকের আবিষ্কারের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। রাশিয়ার পিটার-দি-গ্রেট এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর জীবাণু গবেষণার কথা জানবার জন্যে। ইংল্যাণ্ডের রাণীও তার গবেষণাগারে পদার্পণ করেছিলেন।

ব্যক্তিগত চরিত্রে অ্যান্টনিও লিউয়েনহোয়েকের কর্মশক্তি-প্রণোদিত দৃঢ়তাই ছিল তাঁর জীবনের সম্বল। তাছাড়া অবৈজ্ঞানিক পরিবেশে থেকেও বিজ্ঞানীর সমস্ত রকম গুণ তাঁর ছিল। অবৈজ্ঞানিক পরিবেশ থেকে অনেক বিজ্ঞানীই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন সে যুগে। ৮৫ বৎসর বয়সেও তিনি তাঁর কর্তব্যের প্রতি অনুরক্তি আর দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর নিউটন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর ন্যায় তিনিও ছিলেন ভগবদ্বিশ্বাসী। নিউটনের অভিমত ছিল যে, সৃষ্টির যা কিছু বৈচিত্র্য তা সবই ভগবানের দান।

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯১ বছর বয়সে লিউয়েনহোয়েক পরলোক গমন করেন। অ্যান্টনিও লিউয়েনহোয়েকের নশ্বর দেহের শেষ হলো, কিন্তু তিনি সৃষ্টি করে গেলেন বিজ্ঞানের নূতন অধ্যায়। অ্যান্টনিওর আজীবন গবেষণার ফলে গোড়াপত্তন হলো জীবাণু-বিজ্ঞানের। জীবাণু-বিজ্ঞানের ইতিহাস পরবর্তী বিজ্ঞানীদের অবদানে আরও সমৃদ্ধ এবং সমুজ্জ্বল হয়েছে। পাস্তুর রবার্ট কক্, অ্যালেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, ওয়াক্সম্যান প্রভৃতির গবেষণার কাছে লিউয়েন-হোয়েকের গবেষণা ম্রিয়মান মনে হতে পারে, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, জীবাণু-বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারগুলি দাঁড়িয়ে আছে লিউয়েনহোয়েকের সৃষ্ট বনিয়াদের উপর।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

জানবার কথা

বৈজ্ঞানিকের কাল্পনিক রথ

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতত্ত্ব সহজবোধ্য করবার জন্যে দুটা কাল্পনিক রথের কল্পনা করেছিলেন। রথ দুটা বড়ই অদ্ভুত।

প্রথম রথটার গতি হবে আলোর বেগের চাইতে দু-তিন গুণ বেশী; আর তাতে থাকবে একটা কাল্পনিক দূরবীণ যা দিয়ে কোটি কোটি আলোক বছর দূরের দৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে।

এখন মনে কর, তুমি এই রথটায় চড়ে খাবার ও অক্সিজেন নিয়ে অনন্ত কালের জন্যে পৃথিবী ছাড়িয়ে উঠে গেলে। এবার তুমি দূরবীণ দিয়ে পৃথিবীর অতীত ঘটনাগুলি একে একে দেখতে পাবে; অর্থাৎ পৃথিবীতে যা অতীত হয়ে গেছে তা তোমার কাছে হবে ভবিষ্যৎ।

তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে—নিউটন বসে অঙ্ক কষছে, গ্যালিলিও দূরবীণ দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, ইউক্লিড বসে বৃত্ত আঁকছে। এভাবে কিছুক্ষণ দেখবার

পর দেখতে পাবে—অতিকায় জীব-জন্তুর আবির্ভাব ; তখন আর মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। তখন কলকাতার দিকে তাকিয়ে দেখলে, কলকাতাকে আর দেখতে পাবে না। কোথায় থাকবে বসু বিজ্ঞান মন্দির, আর কোথায় থাকবে তোমার জ্ঞান ও বিজ্ঞান অফিস। গঙ্গার সমস্ত ব-দ্বীপটাই মনে হবে যেন কোথায় চলে গেছে। সেখানে জল ভর্তি। তারপর দেখতে পাবে আগ্নেয়গিরির তাণ্ডব নর্তন। পৃথিবীকে মনে হবে, একটা জলন্ত আগুনের মত। তারপর দেখতে পাবে—বিশাল একটা জলন্ত পিণ্ড থেকে কতকগুলি জলন্ত আগুনের টুক্‌রা ঠিকরে বেরিয়ে এসে দুর্দাম বেগে ঘুড়পাক খাচ্ছে। এর পরেই দেখতে পাবে, এক অতিকায় তারা ভীম বেগে সূর্যের দিকে ছুটে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল!

তারপরে যে কি দেখবে, সেটাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। যদি কোন শুভদিনে এই প্রকার কাল্পনিক রথে চড়ে অগস্ত্য যাত্রায় বের হও তবে আর বাকী দৃশ্য দেখতে পাবে।

আইনষ্টাইনের দ্বিতীয় রথটির গতিবেগ হচ্ছে, সেকেণ্ডে ১৫০,০০০ মাইল। এখন মনে কর তুমি এই রথে চড়ে ২০ বছরের খাবার ও অক্সিজেন নিয়ে মহাশূন্যে রওনা হলে। তোমার সঙ্গে একটা ঘড়ি আছে। তুমি ১০ বছর সোজা চলে গিয়ে আবার ফিরে এলে, অর্থাৎ ২০ বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এলে। তুমি এসে দেখলে যে দেশের সমস্ত চেহারাই যেন বদলে গেছে। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখলে যে, পৃথিবীতে ২১৫৩ খ্রীষ্টাব্দ চলছে। একি অদ্ভুত ব্যাপার! তুমি তখন বুঝতে পারলে যে, তোমার ২০ বছরে পৃথিবীতে ২০০ বছর হয়ে গেছে।

এই প্রকার রথটা বেশ মজার নয় কি? মনে কর কোন লোক ২০০ বছর পর কি হবে সে কথা জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে। কিন্তু ২০০ বছর বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি যদি এই রথটিতে করে শূন্যে ২০ বছর ঘুরে আসেন তবে তাঁর আশা পূর্ণ হবে।

শ্রীবিনোদ রক্ষিত

বিবিধ

ঝাড়তি তামাক হইতে নিকোটিন সালফেট

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ—জাতীয় রসায়ন গবেষণা মন্দির (পুণা) ভারতের ঝাড়তি তামাক পাতা হইতে অতি সহজে এবং অল্প ব্যয়ে নিকোটিন সালফেট প্রস্তুত করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

প্রথমে তামাক পাতা গুঁড়া করিয়া চুনের সহিত মেশান হয়। পরে লবণ দ্রবণে মিশ্রিত করিয়া কেরোসিন ঢালিয়া দেওয়া হয়। নিকোটিনের ভাগ কেরোসিনের অংশে চলিয়া আসে। কেরোসিনের অংশ পৃথক করিয়া লইয়া সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া নিকোটিন সালফেট পৃথক করা

হয়। অবশিষ্ট কেরোসিন উদ্ধার করিয়া পুনরায় ব্যবহার করা চলে। এই পন্থায় শতকরা ৯৩ ভাগ নিকোটিন উদ্ধার করা যায়। গবেষণাগারে এবং ক্ষুদ্র কারখানায় পরীক্ষা করিয়া সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। ইহাতে জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।

নিকোটিন সালফেট খুব শক্তিশালী কীটনাশক দ্রব্য। জলে শতকরা ১ ভাগ অথবা অর্ধ ভাগ নিকোটিন সালফেট মিশ্রিত করিয়া কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হয়। ইহা বর্তমানে উচ্চ মূল্যে বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়া থাকে। বৎসরে ভারতে মোট প্রায় ৫৬ কোটি পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে পৌনে চার কোটি পাউণ্ড ঝাড়তি তামাক বাহির হয়। ৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বাকীটা ফেলিয়া দেওয়া হয়। নিকোটিন সালফেট প্রস্তুত করিবার জন্য আড়াই কোটি পাউণ্ড তামাক পাতার ডাঁটা এবং সমস্ত নষ্ট তামাকই পাওয়া যাইতে পারে।

যাহারা এই পদ্ধতিতে নিকোটিন সালফেট উৎপাদন করিতে চাহেন তাঁহারা নয়াদিল্লীতে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের শিল্প-অর্থনীতিবিদের নিকট পত্র লিখিতে পারেন।

ন্যাপথলিন উদ্ধারের নূতন পন্থা

হায়দরাবাদের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির ক্রেয়োজোট তৈল হইতে ন্যাপথলিন উদ্ধারের এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে।

একটি পাত্রে ক্রেয়োজোট তৈল কিছুকাল রাখিয়া দিলে ন্যাপথলিন নীচে তলানি হিসাবে জমিয়া উঠে। কিন্তু উহাতে তৈল এবং অন্যান্য অপমিশ্রণ থাকে বলিয়া উহা ব্যবহার করা চলে না। তাহা ছাড়া তৈল এবং ন্যাপথলিন একই তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হওয়ায় ঊর্ধ্বপাতনে উহাদের পৃথক করা সম্ভব নহে। অন্যান্য যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলিও খুব সন্তোষজনক নহে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অল্প খরচে ন্যাপথলিন পৃথক করা যায়। জর্নাল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এই পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মাছ থেকে ময়দা ও সয়াবিন থেকে দুধ

রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিলের রিপোর্টে জানা যায় যে, সয়াবিন হইতে প্রস্তুত দুগ্ধ এবং মৎস্য হইতে প্রস্তুত ময়দা প্রভৃতি বিচিত্র খাদ্যবস্তুগুলি দ্বারা মানবজাতির দুই তৃতীয়াংশের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাইতে পারে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অনুন্নত দেশসমূহে অবিরাম প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু আমদানী দ্বারা অন্নসংস্থান করা চলে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—ব্যাপক দুগ্ধ আমদানী করা অসম্ভব, কারণ উহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

এরূপ বহু দেশ আছে, যাহারা ডেয়ারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। এই সকল দেশ অন্ততঃ অল্প ব্যয়সাধ্য ও প্রচুর প্রোটিনযুক্ত সয়াবিন প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারে। অনেক দেশে প্রচুর মৎস্য জন্মায়। মৎস্য হইতে ময়দা প্রস্তুত করা যায়। ইহা হইতে পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারী করা যায়।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সয়াবিন ও মৎস্য হইতে প্রস্তুত খাদ্য ইতিমধ্যেই শিশুর খাদ্যতালিকায় স্থানলাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক শিশু তহাবল সতর্ক কবিয়া দিয়াছে যে, শুধুমাত্র যথোপযুক্ত খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিলেই চলিবে না। এই খাদ্যবস্তু প্রয়োজন অনুযায়ী অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রীলোক, শুশ্রূষারত মাতা ও শিশুদের নিকট পৌছাইয়া দিতে হইবে।

রিপোর্টে যে সকল তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা সম্প্রতি রোমে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল, রাষ্ট্রসংঘ সমাজসেবা বিভাগ, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা, রাষ্ট্রসংঘ

শিক্ষা-বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বৈঠকে নির্ধারিত হইয়াছে।"

তৈল শোধনের নূতন ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

নিউইয়র্ক, ১৩ই ফেব্রুয়ারি—রেমিংটন র্যাণ্ড একটি নূতন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা একটি বৃহৎ তৈল শোধনাগারের বহুবিধ কার্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাইবে।

রেমিংটন কোম্পানীর মতে শোধনাগারের কার্য চলাকালে তাপ, সময়, মিশ্রণ, চাপ প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্যাদি এই নূতন যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবে এবং তদনুযায়ী যন্ত্রের কাজ চলিবে।

রেমিংটনের উর্দ্ধতন কর্মচারীরা বলেন যে, এই যন্ত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হইবে। এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উৎপাদনও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

কোম্পানীর মতে বড় বড় বিমানঘাঁটিতে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক ওজন অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে।

এই নূতন যন্ত্রটির ওজন ১০ টন। আগামী বৎসর হইতে যন্ত্রটি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হইবে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বার্ষিক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ১৯৫১ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা আড়াই শত কোটির সামান্য কিছু কম ছিল। হিসাবে দেখা যায় ঐ বৎসর বিশ্বজনসংখ্যা দুই শত ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ ও দুই শত ৪৯ কোটি ৯০ লক্ষের মধ্যে ছিল।

দামোদর উপত্যকা করর্পোরেশনের অগ্রগতি

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু তিলাইয়া বাঁধ ও বোকারো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ইহাতে ভারতের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় হইতেছে তিলাইয়া ও বোকারো।

দামোদর উপত্যকা উন্নয়নে প্রথম পর্যায় অনুসারে যে চারিটি বাঁধ নির্মিত হইবে তিলাইয়া বাঁধ তাহার অন্যতম। অন্যান্য বাঁধগুলির নাম হইবে কোনার, মাইথন ও পঁচেটহিল। ঐ সঙ্গে দুর্গাপুরে একটি জলাশয় এবং সেচ ও নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য ৯০ মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করা হইবে। দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও চারিটি পরিকল্পনা রহিয়াছে। সেগুলি পরে কার্যকরী হইবে। কিন্তু এই প্রথম পর্যায়টি কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামোদরের বন্যাজনিত ধ্বংস-সাধন নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইবে।

সর্বনাশা দামোদর

১৯৪৩ সালে দামোদরের বন্যায় যখন দুই কুল প্লাবিত হইয়া যায় এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় আর প্রায় ২৫ কোটি টাকা মূল্যের সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সময় দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৮২৩ সালে ও ১৯১৩ সালে দামোদরে বন্যা হয়। দামোদর ভারতের অন্যতম সর্বনাশা নদ। বর্ষাকালে ইহার প্লাবন রোধ করা যায় না। গ্রীষ্মের কয়েক মাস ইহাতে আদৌ জল থাকে না। বিহারের হাজারিবাগ জেলা হইতে বহির্গত হইয়া ৩৩৬ মাইল অতিক্রম করিবার পর দামোদর একটি খনিজ সম্পদ পরিপূর্ণ উর্বর এলাকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির অপ্রাচুর্য ও গ্রীষ্মকালে জলের অভাব হেতু এতদিন ঐ এলাকার ভূমি বা খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও দামোদর উপত্যকাটি এদেশের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত এলাকা। কারণ এই এলাকায় ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা, শতকরা ৯৪ ভাগ লৌহ-পিণ্ড, শতকরা ১০০ ভাগ তামা, শতকরা ৭০ ভাগ ক্রোমাইট, শতকরা ৭০ ভাগ অভ্র, শতকরা ১০০ ভাগ কায়ানাইট, শতকরা ৪৫ ভাগ চীনা মাটি ও অ্যাসবেষ্টস্ রহিয়াছে।

এই এলাকার বন্যা নিবারণ, বরাবর সেচের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১৯৪৩ সালে একটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়। ভারত সরকারের

উপদেষ্টাগণ ১৯৪৬ সালে উহা অনুমোদন করেন এবং বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হইবে। পরে আর্থিক সঙ্গতি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া অভিমত সংশোধন করা হয় এবং পরিকল্পনাটি দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে চারিটি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব হয়।

দামোদর উপত্যকা করপোরেশন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন

পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য ১৯৪৮ সালে ভারতের আইন সভায় অনেক বাদানুবাদের পর "দামোদর উপত্যকা করপোরেশন" আইন পাশ হয়।

আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির উপরে ভিত্তি করিয়া ঐ করপোরেশন গঠন করা হইয়াছে। উহাকে বিপুল ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে। সেচ, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, বন্যা নিবারণ, অবণ্য সৃষ্টি, ভূমি সংস্কার, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ বণ্টন ও নৌ-চলাচল সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনা ও কার্যকরী করিবার ক্ষমতা ঐ করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। উপত্যকার উন্নত কৃষি, শিল্পোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও সাধারণ কল্যাণ সাধন সম্পর্কে ঐ করপোরেশন পরিকল্পনা রচনা করিতে পারে।

দামোদর উপত্যকা করপোরেশন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ভারত সরকার, বিহার সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই করপোরেশনের অর্থ সরবরাহ করেন। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারা উহার সেক্রেটারী ও আর্থিক উপদেষ্টা মনোনীত করেন। পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঐ করপোরেশন-কে দুই বারে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

বোকারো বিদ্যুৎ-কেন্দ্র

বোকারো বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসান হইয়াছে। এখানে বর্তমানে ৫০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। জুন মাসের মধ্যে এখানে আরও দুইটি অনুরূপ যন্ত্র বসান হইবে। পরে ঐরূপ আর একটি যন্ত্র স্থাপন করা হইবে।

ঐ স্থানের পাঁচ মাইল দূরবর্তী করপোরেশনের খনি হইতে প্রাপ্ত নিম্নশ্রেণীর কয়লা দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চলিবে। সেখানে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে তাহা প্রায় ২৫ হাজার বর্গ মাইল এলাকায় বণ্টন করা হইবে। বোকারোকে কেন্দ্র করিয়া যে উপনগর গড়িয়া উঠিল তাহাতে হাসপাতাল, ডাকঘর, স্কুল প্রভৃতি আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার সুবিধা থাকিবে।

তিলাইয়া বাঁধ

তিলাইয়ার জলাধার ১৪ হাজার ৬০০ একর জায়গা জুড়িয়া বিস্তৃত। এখানে ৩২০,০০০ একর ফুট জল থাকিবে। রবিশস্যের সময় এখান হইতে জল লইয়া ৭৫ হাজার একর এবং খারিপ শস্যের সময় ২৪ হাজার একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে।

১৯৪৯ সালে বাঁধ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। নদীগর্ভ হইতে সড়ক পর্যন্ত বাঁধটি ৯৪ ফুট উচ্চ। ভিত্তিমূলে বাঁধটি ১২৭ ফুট ও সড়কের উপর উহা ১২½ ফুট চওড়া।

কোনার বাঁধ নির্মাণ

দামোদর ও কোনার নদীর মিলনস্থল হইতে ১৫ মাইল উপরে কোনার বাঁধ নির্মিত হইতেছে। নদীগর্ভ হইতে সড়ক পর্যন্ত উহার উচ্চতা ১৫৬ ফুট। এই বাঁধটি ৮৬০ ফুট লম্বা হইবে। মাটির বাঁধটি একদিকে ৪ হাজার ফুট ও আর একদিকে ৫৮০০ ফুট হইবে। ভিত্তিমূলে উহা ২০০ ফুট ও উপরে উহা ২০ ফুট চওড়া হইবে। জলাধারটি ৬৬০০ একর জায়গা জুড়িয়া থাকিবে এবং উহাতে ২৬০,০০০ একর ফুট জল ধরিবে। উহার জলে ১০৪,০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে। ১৯৫৩ সালের মধ্যেই ঐ বাঁধ নির্মাণের কার্য শেষ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাইথন পরিকল্পনা

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে দামোদর ও বরাবর নদীর মিলনস্থল হইতে ৪ মাইল বরাবর নদীর উপর দিকে মাইথন বাঁধ নির্মিত হইতেছে। উহার নির্মাণ কাজ ১৯৫৪ সালের মধ্যে শেষ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ বাঁধটির কিছুটা হইবে মাটির এবং কিছুটা হইবে কংক্রিটের। মাটির বাঁধের চওড়া হইবে ৯৩০ ফুট। কংক্রিটের বাঁধের চওড়া হইবে ৩৫০ ফুট, বাঁধের উপরিভাগের সড়কের চওড়া হইবে ২৫ ফুট। এখানকার

জলাধারটি ২৬ হাজার ৫২৮ একর জায়গা জুড়িয়া থাকিবে এবং তাহাতে ১১০৪,০০০ একর ফুট জল থাকিবে। এখানকার জলে ২৭০,০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে।

বরাকর নদীর শীতকালীন জল প্রবাহের জন্য একটি সুড়ঙ্গ খনন করা হইয়াছে এবং বর্ষাকালের অতিরিক্ত জলপ্রবাহের জন্য একটি খাল খনন করা হইতেছে। মাইথনকে কেন্দ্র করিয়া যে উপনগরটি গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে বর্তমান যুগের সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

পঁচেটহিল বাঁধ

পঁচেটহিল বাঁধের কাজ এই বৎসরে আরম্ভ করা হইবে। এই বাঁধটিও কংক্রিট ও মাটির হইবে। ইহার উচ্চতা হইবে ১৩৩ ফুট। প্রধান মাটির বাঁধটি হইবে ১৮০০ ফুট লম্বা ও কংক্রিটের বাঁধটি হইবে ৭৫৫ ফুট লম্বা। কংক্রিটের বাঁধটির প্রস্থ ভিত্তিমূলে হইবে ২৫০ ফুট এবং মাটির বাঁধটির হইবে ৮০০ ফুট। এখানে জলাধারটি ২২.৮০০ একর জায়গা জুড়িয়া থাকিবে এবং তাহাতে জল থাকিবে ১২,১৪,০০০ একর ফুট। এখানকার জলে ৬৮৩,৮৫০ একর ফুট জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে। এখানে ৪০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

দুর্গাপুরের জলাশয় ও সেচ ব্যবস্থা

উল্লিখিত পরিকল্পনায় দুর্গাপুরে একটি জলাধার নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। এখানে যে সকল সেচ-খাল আছে সেগুলির দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে। এই জলাধারের জল বাহির করিবার জন্য ৩৪টি গেট ও একটি নৌ-চলাচলের "লক" থাকিবে। ৯০ মাইল দীর্ঘ প্রধান সেচ ও নৌ-চলাচল খালটি দামোদর ও হুগলী নদীকে সংযুক্ত করিবে। ইহার গড় চওড়া হইবে ৬০ ফুট এবং নিম্নতম গভীরতা ৯ ফুট। অপরদিকে প্রধান খালের সংস্কার করা হইবে। সমস্ত পরিকল্পনাটির কাজ ১৯৫৪-৫৫ সালে শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দামোদর পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক ৮৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ফলে ১০২৫,০০০ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইবে এবং ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে নির্দিষ্ট কাজগুলির মধ্যে বোকারো বাষ্পীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও তিলাইয়া বাঁধের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ ও দুর্গাপুর বাঁধের কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে এই সর্বাত্মক পরিকল্পনায় প্রধানতঃ দশ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইবে এবং দুই লক্ষাধিক কিলোওয়াট তড়িৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং অতিরিক্ত খাদ্য ও পাট ফলনের জন্য বৎসরে দেশ প্রায় সওয়া ৩৮ কোটি টাকার সুবিধা লাভ করিবে।

বোকারো পরিকল্পনা

কোনার নদীর উপর এই যে তড়িৎ উৎপাদন-কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে তাহা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম হইবে। বৎসরের সব সময় এই বাষ্পীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের জন্য ঠাণ্ডা জল সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে কোনার নদীর উপর উক্ত উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে বার মাইল উজানে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বোকারোর কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে তিনটি তড়িৎ উৎপাদন যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে। শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রে দুই লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে।

দামোদর পরিকল্পনার এই অন্যতম বিদ্যুৎ-কেন্দ্র হইতে ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিস্তৃত এলাকায় ক্রমবর্ধমান শিল্পাঞ্চলের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে। জামসেদপুর ও হীরাপুরে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, ঘাটশীলার তাম্রখনি, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লা খনি, নূতন সিমেণ্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্র হইতে বিদ্যুতের চাহিদা মিটাইবে।

তিলাইয়া বাঁধ

১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে তিলাইয়া বাঁধের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। ২৬ বর্গ মাইলব্যাপী সংরক্ষিত এলাকায় যে হ্রদের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে ৯৯ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাইবে। বৎসরে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এই বাঁধ পরম সহায়ক হইবে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, বসুবিজ্ঞান মন্দির,

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | এপ্রিল—১৯৫৩ | চতুর্থ সংখ্যা

অ্যালকেমিষ্ট

শ্রীঅণিমা চৌধুরী

কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। অর্থের জন্যই পৃথিবীতে যত অশান্তি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ। কিন্তু অর্থ-লোলুপতা যে মানুষকে সব সময়ে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গেছে, তা নয়। স্বর্ণের প্রতি লোভই রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ। অতি প্রাচীন কাল থেকে স্বর্ণ সব দেশেই মূল্যবান সামগ্রী বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এর কারণ, স্বর্ণের সৌন্দর্য এবং অপ্রাচুর্য। কাজেই সেই প্রাচীনকালের লোকেরাও অল্পমূল্যের ধাতু বা অধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বত্রই এমন এক শ্রেণীর লোক বাস করতেন যাঁরা লোকচক্ষুর অগোচরে স্বর্ণ তৈরীর প্রচেষ্টাতেই জীবন কাটিয়ে গেছেন। এই সব লোকদের বলা হয় অ্যালকেমিষ্ট।* অ্যাল-কেমিষ্টদের জীবনী পড়লে দেখা যায় যে, স্বর্ণ প্রস্তুত যদিও তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তবু তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং অন্য ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীন ছিলেন না। তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

* কোন অ্যালকেমিষ্ট নিকৃষ্ট ধাতুকে সত্য সত্যই উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল কিনা সে বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তখনকার দিনের খ্যাতনামা গবেষণাকারীদের মধ্যে জে. বি. ভ্যান হেলমণ্টই প্রকাশ্যভাবে বলতেন যে, তিনি পারাকে সোনায় পরিবর্তিত করতে পারেন। তার পরে অবশ্য ভণ্ড, প্রতারক ও ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের লোকেরা অনেকে সোনা তৈরীর ক্ষমতার কথা প্রচার করে বেড়াতো। সর্বশেষ ১৭৮২ সালে জেম্‌স্‌ প্রিন্স নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসকের কথা শোনা যায়—তিনি নাকি একরকম সাদা আর লাল গুঁড়ার সাহায্যে পারাকে রূপা এবং সোনায় পরিবর্তন করতে পারতেন এবং পরীক্ষার ফলে সেই সোনা নাকি বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছরে যখন তাঁকে তাঁর পরীক্ষার সত্যতা প্রমাণে আহ্বান করা হয় তখন পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি লাভ করেন। —স

অ্যালকেমিষ্টদের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন গ্রীক দার্শনিকেরা। তাঁরা কল্পনাশক্তির সাহায্যে নানা অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি করতেন। যেমন থ্যালেস্ (৬৪০ খৃঃ পূঃ) কল্পনা করেন যে, জল থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। আবার হেরাক্লিটসের (৫৩০ খৃঃ পূঃ) মতে অগ্নিই সব কিছুর মূল। এম্পেডোকল্স্ (৪৯০ খৃঃ পূঃ) চার মৌলিক পদার্থের মতবাদের সৃষ্টি করেন। তিনি বলতেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল এবং মাটিই হচ্ছে চারটি মৌলিক পদার্থ যা থেকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে। অনুরূপ মতবাদ আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল। এর প্রায় ১০০ বছর পরে অ্যারিষ্টটলই (৩৪৮ খৃঃ পূঃ) সর্বপ্রথম কল্পনা করেন যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। কারণ তিনি মনে করতেন যে, সকল পদার্থই একটি মাত্র প্রাথমিক বস্তু থেকে সৃষ্ট; তবে এই প্রাথমিক বস্তু যে কি, তা তিনি বলেন নি। অন্যান্যের মত তাঁর এই মতবাদও ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু অ্যারিষ্টটলের এই ধারণাই পরে অ্যালকেমিষ্টরা গ্রহণ করেন।

অ্যালকেমিষ্টির প্রথম সূত্রপাত হয় মিশরের প্রসিদ্ধ সহর আলেক্জান্দ্রিয়াতে প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে। প্রাচীন মিশরের শিল্পী ও কারিগরদের সে দেশীয় ভাষায় বলা হতো অ্যাল্খেম্। এ থেকেই অ্যালকেমি এবং অ্যালকেমিষ্টি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। প্রায় ২৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ইউরোপে এই শব্দ দুটির প্রচলন আরম্ভ হয়। কোনও ভাষাতে অ্যালকেমিষ্ট কথাটির পরিভাষা নেই, অথচ প্রাচীন ভারতেও অ্যালকেমিষ্টদের অভাব ছিল:না। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে আমরা দেখতে পাই যে, শক্তি পদার্থের রূপান্তর মাত্র। এই মতবাদ বিংশ শতাব্দীতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের প্রসিদ্ধ দার্শনিক কণাদ (৫০০ খৃঃ পূঃ) পরমাণুবাদের কল্পনা করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রায় একই সময়ে ডিমোক্রিটস্ গ্রীসদেশে পরমাণুবাদ প্রচার করে গেছেন। নাগার্জুন এখন প্রাচীন ভারত, তথা তৎকালীন সমগ্র পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি আনুমানিক ১৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে রসায়নবিদ্যায় ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এই সময়ে দিল্লীতে যে লৌহস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল তার ওজন হচ্ছে প্রায় ১০ টন এবং সেটা পৌনে দুই হাজার বছরের পুরনো হলেও দেখতে প্রায় নতুনেরই মত। অত বড় লৌহস্তম্ভ যে কি করে ঢালাই করা হয়েছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই প্রসঙ্গে চরক ও সুশ্রুতের নামও করা যায়। যদিও তাঁদের গবেষণা ছিল প্রধানতঃ চিকিৎসাশাস্ত্রের উপরে তবুও তাঁরা বহু ধাতু এবং ধাতুঘটিত যৌগিক পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী এবং ওষুধ হিসাবে সেগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন।

আলেক্জান্দ্রিয়াতে আবিষ্কৃত হস্তলিখিত পুঁথি থেকে জানা যায় যে, ১৫০০ বছর পূর্বে ধাতুবিদ্যা সেখানে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। রসায়নবিদ্যার নাম ছিল তখন Divine Art। এই বইখানি লেখা হয়েছিল প্রায় ৪০০ খৃষ্টাব্দে। এই বইখানিতে পূর্ববর্তী কালের বহু অ্যালকেমিষ্টের নাম ও কার্যবিবরণী পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন প্লিনি (২৩-৭৯ খৃঃ), ডিওস্করিডেস্ (৬০ খৃঃ) এবং গালেন (১৩১-২০১ খৃঃ)। মিশরের আর একজন প্রসিদ্ধ অ্যালকেমিষ্ট হচ্ছেন জোসিমস্ (২৫০-৩০০ খৃঃ)। তিনি তাঁর লিখিত গ্রন্থে সর্বপ্রথম Chemeia শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি বহু যন্ত্রপাতি, বিশেষকরে পাতন ক্রিয়ার যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন।

প্রাচীন আরবে বিজ্ঞানচর্চা খুবই প্রসার লাভ করেছিল। আরবীয় অ্যালকেমিষ্টদের মধ্যে গেবার বা জাবির-এর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি ৭২১-৮১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনিই আরব রসায়ন শাস্ত্র আলোচনার সূচনা করেন। তিনি সর্বপ্রথম Milk of sulphur প্রস্তুত করেন। তবে ওষুধ হিসাবে গন্ধকের ব্যবহার পৃথিবীর সব সভ্য-

দেশেই প্রচলিত ছিল। ৫০০০ বছর আগেও মিশরে মমি তৈরী করবার সময়ে গন্ধক ব্যবহৃত হতো। আরবে ইবনসিনা (৯৮০ খৃঃ) এবং রাজি (৯২৫ খৃঃ) নামে দুই জন অ্যালকেমিষ্ট যে বই লিখে গেছেন তা পড়লে বুঝা যায় যে, তাঁদের গবেষণাগারও ছিল। এই আরবদের কাছ থেকে রসায়ন শাস্ত্র প্রথমে স্পেনীয় এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা শিখেছিলেন। তার আগে ইউরোপবাসীরা এই বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

অতি প্রাচীন কাল থেকে চীনদেশে রসায়নের চর্চা সুরু হয়েছিল। ১৫০০ বছর পূর্বে নির্মিত চীনামাটির রঙীন পাত্র এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত নানা দ্রব্য এখনও আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে চীনদেশে লি-সি-চেন নামে একজন অ্যালকেমিষ্ট ছিলেন। তাঁর লিখিত কান-মু গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে তিনি আর্সেনিকের নিষ্কাশন ও ব্যবহার, বিশেষ করে আর্সেনিকঘটিত যৌগিক পদার্থের বিষক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই বইখানি লেখা হয়েছিল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও বিষাক্ত আর্সেনিক সালফাইডের ব্যবহার জানা ছিল। মৌলিক পদার্থ হিসাবে আর্সেনিক প্রথম আবিষ্কার করেন জার্মেনির আলবেরটাস্ ম্যাগনাস্ (১১৯৩-১২৮০ খৃষ্টাব্দ)। ওষুধ হিসাবে আর্সেনিকঘটিত পদার্থ ব্যবহারের প্রচলন করেন প্যারাসেলসাস্।

আগেই বলা হয়েছে যে, আরবেরা স্পেন অধিকার করবার পর থেকেই ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্র আলোচনার সূত্রপাত হয়, প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে। প্রাচীন ইউরোপীয় অ্যালকেমিষ্টদের মধ্যে জার্মেনির আলবেরটাস্ ম্যাগনাস্, ইংল্যাণ্ডের রোজার বেকন, স্পেনের রেমণ্ড লালি (১২৩৫ খৃঃ) এবং ফ্রান্সের আরনল্ড (১২৪০-১৩১১ খৃষ্টাব্দ) বিশেষ প্রসিদ্ধ। হামবুর্গে হেনিগ ব্রাণ্ডের ফস্‌ফরাস আবিষ্কারের কাহিনীও খুব কৌতুহলোদ্দীপক। তিনি মানুষের মূত্র থেকে স্বর্ণ তৈরী করতে গিয়ে ফস্‌ফরাস পেয়েছিলেন।

রবার্ট বয়েলই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের অর্থাৎ কেমিষ্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা বলে সম্মানিত হন। এর দুটি কারণ আছে—প্রথমতঃ বয়েল রসায়নের চর্চা করেছিলেন পদার্থ সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে, স্বর্ণ প্রস্তুতের কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ কেবল পরীক্ষালব্ধ ফলাফলই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করতেন, যেখানে অ্যালকেমিষ্টরা বহু কাল্পনিক বিষয়কেও পরীক্ষা না করেই সত্য বলে মেনে নিতেন। বয়েলই পৃথিবীর প্রথম কেমিষ্ট বা শেষ অ্যালকেমিষ্ট।

অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সফল হওয়ার পথে চলেছে। অ্যারিষ্টটলের কল্পিত পদার্থের রূপান্তর গ্রহণও সম্ভব হয়েছে। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, আল্‌ফা রশ্মির সাহায্যে বোরন, নাইট্রোজেন, সোডিয়াম ইত্যাদি ধাতু ও অধাতুকে আঘাত করে প্রোটন সৃষ্টি সম্ভব। এই ভাবে পারমাণবিক গবেষণার দিনের পর দিন উন্নতি হতে থাকে এবং গত দশ বছরের মধ্যে ছয়টি নতুন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অতি অল্প পরিমাণে পারা থেকে সোনা তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কেবল সোনা নয়, যে কোন মৌলিক পদার্থই প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

ওঁরাও উপজাতির কথা

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক

ছায়াঘেরা ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে শীতের রোদ ঝিকমিক করে মহুয়া গাছের পাতায় পাতায়; বসন্তের মলয়ানীল মৃদু শিহরণ তোলে। যতদূর দৃষ্টি যায় উঁচুনীচু মাঠ, এদিকে ওদিকে পাথরের ঢিবি, আম-বটের সারি আরও কত কি! পাখীর ডাক, কাঠবিড়ালীর নাচন—কিছুই বাদ যায় নি এই দেশে।

এমন সুন্দর পরিবেশের মাঝে খাপরার কুটির বেঁধে বাস করে ওঁরাও উপজাতিরা। বেঁটে চেহারা আর মিশমিশে কালো দেহের রং। নাক ছোট ও চওড়া; ঢেউ খেলানো চুল। এরা হলো ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী; উপজাতি বা আদিবাসী বলে অনেকে। এদের পাশাপাশি আরও অনেক আদিবাসী আছে—হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খাড়িয়া প্রভৃতি।

ওঁরাও-চাষী

এদের ঘরগুলিতে জানালা নেই—আছে একটি মাত্র দরজা। ঘরের মাঝেই রান্না, শোওয়া এবং গো মহিষাদির থাকবার জায়গা; আর একপাশে আছে বীজধান বা অন্যান্য শস্য এবং চাষ আবাদের যন্ত্রপাতি—লাঙল, জোয়াল, কাস্তে ইত্যাদি।

আসবাবের কোন বালাই নেই। বিছানা-বালিশ, বাক্স-তোরঙ্গ বলতে কিছুই নেই এদের—সাধারণভাবে শীতলপাটি বা মাদুর পেতে তারা শুয়ে পড়ে।

পুরুষদের পরনে ছোট ধুতি—জামা বা কোর্তা আছে অনেকের। নব্য ফ্যাশনের যুবকেরা জামা-কাপড়, এমন কি জুতাও ব্যবহার করে থাকে। আর বুড়াদের শৌখিনতার বালাই নেই—কোমরে নেংটি জড়িয়ে নেয়, আর মাথায় বাঁধে পাগড়ী। মেয়েরা পরে ছোট শাড়ী—কোমরে অনেক বার জড়িয়েও নেয়। মাথায় প্রায়ই কাপড় থাকে না। অনেকে আবার শখ করে মাথায় কাপড় দিতেও শিখেছে। মাথার একদিকে চুল বিনুনি করে বাঁধা; তাতে আবার অনেক সময় বুনো ফুল বা চিরুণী গোঁজা থাকে। কানে হরেক রকমের গয়না—তার মধ্যে তালপাতার গয়না এদের বড় আদরের। পিতল বা রূপার গয়না যে নেই তা নয়। আর ছোট ছেলেমেয়েরা থাকে দিগম্বরের বেশে।

ওঁরাওরা সংখ্যায় প্রায় ২৫ হাজারের বেশী। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়—পশ্চিম বাংলায়, আসামের চা-বাগানে, উড়িষ্যায় ও উত্তর-প্রদেশে। এরা দ্রাবিড়ী ভাষায় কথা বলে; নিজেদের কোন হরফ নেই। অনেকের ধারণা—এরা দক্ষিণ-ভারত থেকে এদিকে চলে এসেছে এবং মুণ্ডাদের মধ্যে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে ঠাঁই করে নিয়েছে।

ওঁরাওরা কৃষিজীবী। চাষ-আবাদ হলো এদের প্রধান বৃত্তি। প্রায় প্রত্যেক ওঁরাওরই কিছু না কিছু জায়গা জমি আছে; তাতে নিজেরাই চাষ-আবাদ করে। ঘরের মেয়েদের নিয়ে চলে যায় মাঠে। মেয়েরা কিন্তু লাঙল ছোঁয় না; তবে ধান-কাটা আর রোপনের কাজ সবই হলো মেয়েদের। এদের যত পূজা-পার্বণ তার বেশীর ভাগই চাষ-আবাদকে কেন্দ্র করে। বারো মাসে তের পার্বণের মত এদের উৎসবেরও অন্ত নেই! এদের দেশে পুকুর নেই, আছে দাঁড়ি বা কূয়া। মেয়েরা জল আনতে যায় দু তিনটা কলসী নিয়ে।

ক্ষেতে জন্মে ধান, গম, বাজরা, কলাই—এই হলো এদের প্রধান খাদ্য। মাছ প্রায়ই পাওয়া যায় না; তবে সকল প্রকার মাংসই এরা খায়। অনেকের আবার শিকার করবার যন্ত্রপাতি আছে, যেমন—তীর-ধনু, বর্শা, লেব্‌ড়া প্রভৃতি।

এক একটি গাঁয়ে ৩০।৪০ ঘর ওঁরাও বাস করে। এদের সঙ্গে ঐ সব গাঁয়ে আরও অনেকে থাকে; যেমন—মহালিশ বা মালী; এরা ঝুড়ি বোনে আর অনেক সময় ঢাকঢোলও বাজায়। আর আছে লোহার—তারা লোহার কাজ করে। আহির আছে; তারা গরু-মোষ চরায়। অনেক গাঁয়ে আবার রাজপুত আর মুণ্ডাও আছে।

ওঁরাও গাঁয়ের যে মাতব্বর তাকে বলা হয় মহাতো। মহাতোই গ্রামের ভালমন্দ তদারক করে; জমিদারের লোক খাজনা নিতে এলে সাহায্য করে। এ কাজের জন্যে তাকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দেওয়া হয়। তাছাড়া গ্রামে দেবতা, অপদেবতা, ভূত-প্রেতের শান্তির জন্যে বা পূজার জন্যে আছে পাহান বা পূজার—হিন্দুদের পুরোহিতের মত। তাছাড়া গ্রামের ভালমন্দ হাঁক-ডাকের জন্যে কতোয়ার আছে।

অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে একটা পাড়া হয়। উৎসবে-ব্যসনে পাড়ায় পাড়ায় নিমন্ত্রণ হয়। যাত্রাগানের দিন পাড়ায় রঙীন পতাকা ওড়ে। উত্তেজনায় আলোড়নের সাড়া পড়ে যায়, আর আপদে-বিপদে পরস্পরের জন্যে জানও কবুল করে।

আগের দিনে বিয়ে হতো, মেয়েরা বেশ সেয়ানা হলে; ইদানীং হিন্দুদের দেখাদেখি কচি বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ের আগে মেয়েদের ধাঙড়ী, আর যোয়ান ছেলেদের বলা হয় ধাঙড়। চাষের শেষে অথবা যখন ক্ষেতের ফসল উঠে যায় তখন কাজে আসে শৈথিল্য। ধাঙড়-ধাঙড়ীরা নাচগানের

আয়োজন করে গ্রামের আখড়ায়। ঢাক, মাদল, কাঁসাই বাজে—মুখরিত হয়ে ওঠে পল্লীর আকাশ-বাতাস। একটা অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সমস্ত নর-নারীর দেহ-মন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নাচগান হয়। কখনো হয়তো এক সারিতে মেয়ে-পুরুষ কোমর ধরে নাচে। একটানা সুরে মাদল বাজিয়ে নিশীথ রাত্রির মৌনতা ভেঙ্গে দেয়। মাদলের শব্দে দেহে বইতে থাকে আদিম কালের রক্তের স্রোত, জেগে ওঠে বন্য প্রকৃতি। হাঁড়িয়া খেয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এরা রঙীন দিনের স্বপ্ন দেখে। কতরকম নাচগান—ডোমকাচ, যাত্রা, ডাণ্ডী, সারহুল, করম আরও কত কি!

এমনি মেলামেশার ভিতর দিয়ে একদিন বাঞ্ছিতের দেখা পায় ওঁরাও প্রণয়ী। আগের দিনে বিয়ের পূর্বে ধাঙড়-ধাঙরীরা মিলে একটা ঘরে রাত কাটাতো—পরস্পরের গা টিপে দিত—সোহাগ করতো। সেই ঘরকে বলা হয় ধুমকুড়িয়া বা জোংখ এরপা। অনেক গ্রামে হয়তো এখনও তার নিশানা আছে; কিন্তু ধুমকুড়িয়ার সে জলুস আর নেই।

পৌষ, মাঘ—এ দু-মাস হলো বেঙ্গা বা বিয়ের মাস। বর দেখে আসে কনেকে। তারপর একদিন দশ, বিশ বা ত্রিশ টাকা পণ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হাতিয়ার নিয়ে বর বিয়ে করে বৌ ঘরে নিয়ে আসে।

একই গোত্রে বিয়ে হতে পারে না। ইচ্ছা করলে স্বামী স্ত্রীকে ঘরে না-ও নিতে পারে; আবার স্ত্রীও নতুন এক স্বামী জুটিয়ে নিতে পারে। একই গোত্রে বিয়ে করলে সমাজ থেকে এদের শাস্তি হয় বেত্রাঘাত, জরিমানা—শেষ পর্যন্ত একঘরে। ফলে অনেকে দেশান্তরী হয়ে যায়। ছেলেপুলে না থাকলে পোষ্য নিতে পারে। ঘরজামাই রাখবার রীতিও এদের মধ্যে আছে। অনেকে বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে। এদের সমাজ পিতৃপ্রধান। বাবা মারা গেলে ছেলেরাই হয় বিষয়-আশয়ের মালিক।

ওঁরাও মেয়েরা জল আনতে যাচ্ছে

পূজা-পার্বণে, ভূত-প্রেতকে শান্ত করতে এরা

মোরগ বলি দেয়; অনেক সময় মোরগের ডিমও উৎসর্গ করে। সারহুল হলো এদের বড় পরব। সরন-বুড়িয়া হলো গাঁয়ের প্রধান দেবী। দেবী থাকেন সরনাতে—সরনা হলো আম্রকুঞ্জ। দেবীর গায়ের রং ফর্সা—চুল সাদা শণের মত। বসন্তের চন্দ্রালোকে যখন জগৎ উদ্ভাসিত হয় তখন গাঁয়ের অলি-গলিতে লাঠি হাতে এঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে অনেকে। এঁকে সন্তুষ্ট করতে হয় ওঁরাওদের। তাছাড়া আরও অনেক দেবতা আছে; যেমন—ভগবতী, সুরজ, নারায়ণ ইত্যাদি। শিকারের দেবতা হলেন চণ্ডী। শিকারের আগে চণ্ডীকে মানত করতে হয়। তাছাড়া আরও এক ভীষণ অপদেবতা আছে ওদের দেশে—সে হলো মহা-দানিয়া। মানুষের শোণিত ছাড়া তাঁর তৃপ্তি নেই; তাই চোদ্দ বছর পরে জ্যৈষ্ঠের এক অন্ধকার চতুর্দশী নিশিতে ওঁরাওরা মানুষ ধরে নিয়ে আসে মহাদানিয়ার কাছে বলি দেবার জন্যে। অনাবৃষ্টি বা অজন্মাতে তারা মানুষ বলি দেয় মাঠের মধ্যে। মানুষের রক্ত না ছড়ালে জমি ফসল দিবে কি করে?

অসুখ-বিসুখে আসে ভকত; মন্ত্র পড়ে, জল ছড়ায়, দেবতার নাম জপ করে। এমনি করে অসুখের ভূতকে দূরে সরিয়ে দেয়।

কেউ মরলে নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে। আগের দিনে মাটিতে পুঁতে রেখে দিত। পরে হাড়বোরা পরবের দিনে সেই কবর থেকে হাড় বের করে চিতা সাজিয়ে আগুন দিত। তারপর শেষ অস্থিটুকু গ্রামের বাইরে কুণ্ডীতে নিক্ষেপ করতো। এখন এরা প্রায়ই কবর দেয় না, সরাসরি পুড়িয়ে ফেলে। তারপর তার হাড় কুণ্ডীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিংবদন্তী আছে—কুণ্ডীতে যত লোকের হাড় দেওয়া আছে, মহামারী বা মড়কের দিনে তারা কুণ্ডীর বাইরে এসে তারায় ভরা আকাশের তলায় ভালমন্দের আলোচনা করে।

ওঁরাওরা প্রকৃতির কোলে মানুষ। সভ্য-জগৎ এদের কাছে গেছে। ইংরেজ পল্টন আর রেল নিয়ে এদের আবেষ্টনীর রূপ বদলে দিয়েছে।

বাইরের লোকের অবাধ মেলামেশায় এদের সরল মন একেবারে বিগড়ে গেল—হলো 'ভকত আন্দোলন'—নিজেদের এরা অন্যভাবে অভিব্যক্ত করলো।

এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের জোড়কলম

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

ফুল, ফল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং উৎকর্ষ সাধন করাই কলম করিবার উদ্দেশ্য। কলম দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতীয় ফুল-ফলের গাছের নানা গুণের স্থায়িত্ব রক্ষা সম্ভব হইয়াছে। সর্বপ্রথম বৃক্ষাদির কর্তিত ডালপালা কলম অর্থাৎ লেখনীর অগ্রভাগের আকারে তেরছা করিয়া কাটিয়া অস্বাভাবিক উপায়ে বংশবৃদ্ধি করিবার উপায় প্রবর্তিত হয়। কলমের ন্যায় কাটিয়া লইতে হয় বলিয়াই উহাকে কলম করা বলে। তৎপরে ক্রমশঃ নানাবিধ অস্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বনে বৃক্ষাদির বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু যে প্রণালীতেই বংশবৃদ্ধি করা হউক না কেন, অস্বাভাবিকতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই সকল প্রণালীর সঙ্গেই কলম শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন গুলকলম, জোড়কলম, চোখকলম ইত্যাদি।

কোন গাছের শাখার কর্তিতাংশ সেইজাতীয় কোন চারাগাছের গুঁড়ির কর্তিতাংশের সহিত সম্পূর্ণরূপে স্থায়ীভাবে সম্মিলনের কৌশলকেই জোড় লাগান বলা হয়। মাতৃবৃক্ষ হইতে নির্বাচিত শাখার কিয়দংশ কাটিয়া, অথবা নির্বাচিত শাখা মাতৃবৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া—এই দুই রকম উপায়েই জোড়কলম বাঁধিবার প্রণালী প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত উপায়ে জোড়কলম (inarch graft), জিভকলম (tongue graft), গাদিকলম (saddle graft)—এই তিন প্রকার কলম করা যায়। দ্বিতীয় উপায়ে গুঁড়ি-কলম (crown graft), পার্শ্বকলম (side graft), চাবুককলম (whip graft), গোঁজ-কলম (wedge graft)—এই চারি প্রকার কলম বাঁধিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কলম করিবার প্রণালী অনুযায়ী বিভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও সবই জোড়কলমের অন্তর্ভুক্ত; কারণ দুইটি কাণ্ডাংশের জোড় লাগিবার ফলেই এই সব কলম সৃষ্ট হয়।

ফুল-ফলের যে সব গাছে জোড়কলম করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেগুলি সবই দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ। এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলমের প্রচলন নাই। সাধারণতঃ এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলম করা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় তাহা জানিতে হইলে জোড়কলমে দুইটি কাণ্ডের মধ্যে জোড় কি করিয়া সৃষ্ট হয় সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

জোড়কলমে কাণ্ড দুইটির পরস্পর সংলগ্ন কর্তিত অংশের ক্যাম্বিয়াম-তন্তু হইতে নূতন কোষ সৃষ্ট হয়। উভয় কাণ্ডের সন্ধিস্থলে এইরূপে অগণিত নূতন কোষ সৃষ্টি হওয়ায় পরস্পরের চাপে সংযোগস্থল জুড়িয়া যায়। এইজন্য জোড়-কলম করিতে উভয় কাণ্ডের কর্তিত স্থানের ক্যাম্বিয়াম যাহাতে পরস্পরের সঙ্গে ভালভাবে সংলগ্ন হইতে পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কাণ্ড বিচ্ছিন্ন না করিয়া উভয় কাণ্ডের কিয়দংশ কাটিয়া যখন জোড়কলম সৃষ্ট হয় তখন মাতৃবৃক্ষের শাখাটি স্থূলতায় যাহাতে চারা-গাছের কাণ্ডের অনুরূপ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কাণ্ড দুইটি স্থূলতায় পরস্পর সমান হওয়ার ফলে কাণ্ড দুইটির কর্তিতাংশের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ক্যাম্বিয়াম-তন্তুও পরস্পরের সঙ্গে যথাযথভাবে সংলগ্ন হইতে পারে। পার্শ্ব, গোঁজ ইত্যাদি কলম করিতে যে স্থলে মাতৃবৃক্ষের শাখা বিচ্ছিন্ন করিয়া জোড় দেওয়া হয় সে স্থলে বিশেষ

ধরনে কর্তিত ঐ শাখাটিকে কর্তিত গুঁড়ির পার্শ্বে এমনভাবে বসাইতে হয় যাহাতে উভয় কাণ্ডের ক্যাম্বিয়ামের কতকাংশ পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইতে পারে। উভয় কাণ্ডের কর্তিত অংশের ক্যাম্বিয়ামের পরস্পর সান্নিধ্যের উপরই জোড়ের সাফল্য নির্ভর করে।

উদ্ভিদ-কাণ্ডের ডগার দিকে এবং মূলত্রাণের কাছাকাছি কোষসমূহের মধ্যে কোন তন্তু-বিভেদ নাই এবং ঐ স্থানের সমস্ত কোষই বিভাজন-ক্ষম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ঐ সব কোষে তন্তু-বিভেদ আরম্ভ হয়। প্রথমে পেরিডার্ম, প্রোক্যাম্বিয়াম ও গ্রাউণ্ডটিস্যু—এই তিন প্রকার তন্তুর উদ্ভব হয়। এই অবস্থায়ও সমস্ত কোষগুলিই বিভাজন-ক্ষম থাকে এবং উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশের লম্বালম্বি বৃদ্ধি—অগ্রভাগের কোষের বিভাজনের ফলেই সংঘটিত হয়। উক্ত তিন প্রকার তন্তু হইতেই পরে উদ্ভিদের স্থায়ী তন্তুশ্রেণী গঠিত হয়। স্থায়ী তন্তুর মধ্যে ক্যাম্বিয়াম-তন্তু বিভাজন-ক্ষম ; অপর তন্তুশ্রেণী বিভাজনক্ষম নহে। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদে প্রোক্যাম্বিয়াম হইতে তিন প্রকার তন্তুর উদ্ভব হয়—জাইলেম, ফ্লোয়েম এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ক্যাম্বিয়াম। এই ক্যাম্বিয়াম-কোষের বিভাজনের ফলে জাইলেম ও ফ্লোয়েম. এই দুই প্রকার কোষের সৃষ্টি হইয়া দুই দিকে যুক্ত হয়। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড বেষ্টন করিয়া ত্বকের নীচে জাইলেম ও ফ্লোয়েম সমন্বিত এই ভাস্‌কুলার বাণ্ডল্‌গুলি কিছুদূর অন্তর অন্তর চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। ভাস্‌ক্যুলার বাণ্ডল্‌গুলির অন্তর্বর্তী ক্ষেত্র মেডুলারি-রে'র মধ্যে ক্যাম্বিয়ামের একটি স্তর গঠিত হইয়া ভাস্‌ক্যুলার বাণ্ডল্‌-এ অবস্থিত ক্যাম্বিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কাণ্ডের চতুর্দিকে একটি ক্যাম্বিয়ামের বলয় সৃষ্টি করে। দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের স্থূলতার বৃদ্ধি এই ক্যাম্বিয়ামের বিভাজন দ্বারাই সংঘটিত হয়। অধিকাংশ এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে ক্যাম্বিয়াম থাকে না। প্রোক্যাম্বিয়াম হইতে উৎপন্ন ভাস্‌ক্যুলার বাণ্ডল্‌-এর মধ্যে শুধু জাইলেম ও ফ্লোয়েম থাকে। ভাস্‌ক্যুলার বাণ্ডল্‌গুলিও কাণ্ডের মধ্যে যেখানে সেখানে ছড়ান থাকে, দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের মত চক্রাকারে সজ্জিত থাকে না। এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে ক্যাম্বিয়াম না থাকায় উহার স্থূলতার বৃদ্ধি কেবলমাত্র স্থায়ী কোষের আয়তন বৃদ্ধির দ্বারা সংঘটিত হয়। তবে ড্রেসিনা, এগেইভ প্রভৃতি কতক-
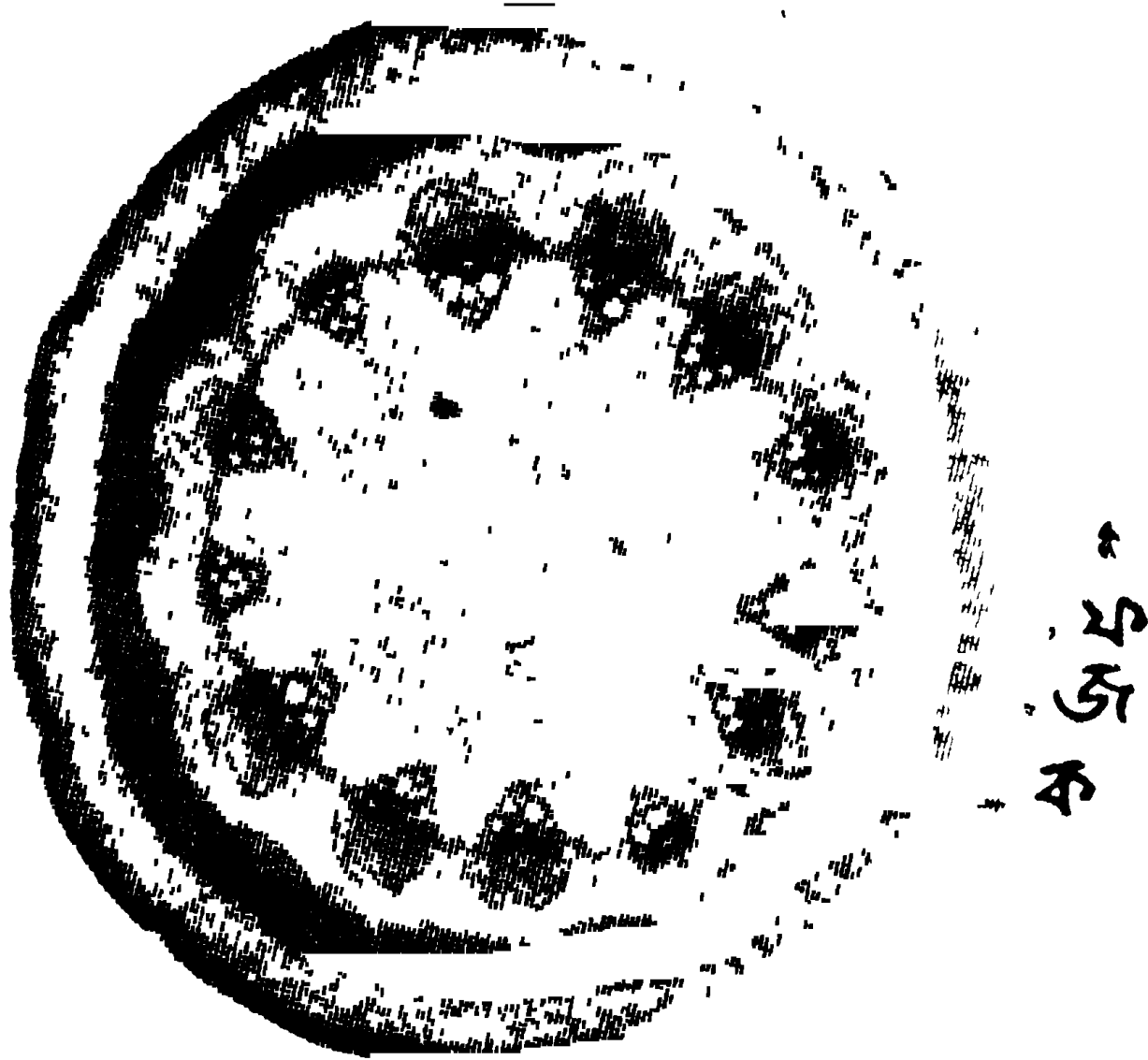
১নং চিত্র
দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ-কাণ্ডের পাশাপাশি কর্তিত সেক্সন।
ক-ক্যাম্বিয়াম ; জ-জাইলেম ; ফ-ফ্লোয়েম

গুলি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে পোরিসাইক্ল্-তন্তুর মধ্যে ক্যাম্বিয়াম সৃষ্ট হয় এবং ঐ ক্যাম্বিয়াম হইতে নূতন কোষ উৎপন্ন হইয়া ঐ সব কাণ্ডের স্থূলতা বৃদ্ধি করে। সাধারণ দ্বি-বীজপত্রী ও এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের তন্তু-বিন্যাস ১নং ও ২নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে ক্যাম্বিয়াম না থাকায় জোড়কলম করা সম্ভব নয়, ইহাই এতকাল জানা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ডাঃ মুজিক ও লা, রু প্রকাশ করিয়াছেন যে, এক-বীজপত্রী উদ্ভিদেও জোড়কলম করা সম্ভব। তাঁহারা বাঁশ, ইক্ষু, গিনিঘাস প্রভৃতি কয়েক প্রকার এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলম তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বে আরও তিন জন বিভিন্ন সময়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় কয়েকটি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২নং চিত্র

একটি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদ-কাণ্ডের পাশাপাশি কতিত সেক্সন।
কালো গোল দাগগুলি ভাস্ক্যুলার বাণ্ডল্

প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে ক্যালডেরেনি এক প্রকার তৃণের সঙ্গে ধান গাছের জোড় সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐরূপ জোড় সম্পাদনের দ্বারা ক্যালডেরেনি এক প্রকার উন্নত ধরনের ধান সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন। ক্যালডেরেনির বিবৃতিতে প্রকাশ যে, ঐরূপ জোড় সৃষ্টির ফলে উভয় জাতীয় উদ্ভিদের গুণের সমাবেশই উন্নত জাতীয় ধান সৃষ্টির কারণ। ঐভাবে উৎপন্ন নূতন প্রকারের ধানের বীজ হইতেও ঐরূপ ধানই উৎপন্ন হইয়া ছিল, অর্থাৎ জোড়-কলমের দ্বারা এক নূতন বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইয়াছিল। জোড়কলমে এইভাবে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি অসম্ভব বোধে ক্যালডেরেনির এই এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়-সৃষ্টির কাজটি উপেক্ষিত হইয়াছে। বর্তমানে রুশীয় বৈজ্ঞানিকদের মতে জোড়কলমের দ্বারা নূতন বর্ণসঙ্করের উদ্ভব সম্ভব বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে প্রট্নিকভ্ যবাদি কয়েক প্রকার এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলম সৃষ্টিতে কৃতকার্য হন। সোল্ভে নামক আর এক ব্যক্তি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের গাঁটের মধ্যে জোড় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

লা, রু প্রথমে ট্র্যাডেস্কেন্সিয়া, জ্যাব্রিনা ও কোম্মেলিনা এই তিন প্রকার ক্ষুদ্র এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড়কলম সৃষ্টিতে সক্ষম হন। সম্প্রতি তিনি মুজিকের সঙ্গে একত্রে বাঁশ, ইক্ষু প্রভৃতি বৃহদাকার কয়েকটি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে জোড় সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

তৃণ, ইক্ষু, বাঁশ প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে পর্বের নীচে গ্রন্থির কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কোষ থাকে। এই কোষগুলি অনেক দিন পর্যন্ত বিভাজনক্ষম দেখা যায়। ফলে এই সব গাছে কাণ্ডের অন্য অংশের বৃদ্ধি থামিয়া যাওয়ার পরেও গ্রন্থিসংলগ্ন অংশ কিছুদিন পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। এক-বীজ-পত্রী কাণ্ডে যেসব স্থলে জোড়কলম করা সম্ভব ডগা একই রূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অন্য ডগাটি ঐ মস্তকবিহীন কাণ্ডের উপর বসাইয়া দিয়া সংযুক্ত স্থান ভালরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সংযোগস্থলে কোনরূপ ফাঁক বা অসমতা না থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং ইহার উপরই জোড় লাগা বিশেষভাবে নির্ভর করে। গাছগুলিও খুব সতেজ ও চারা অবস্থায় থাকা উচিত। এই

৩নং চিত্র

ইক্ষুর জোড়কলমের লম্বালম্বিভাবে কাটা একটি সেক্সন। মাঝখানে জোড়ের স্থানটি দেখা যাইতেছে

হইয়াছে উহা এরূপ অংশে সংযোগ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে।

এইভাবে জোড়কলম করিতে গাছের ডগাটিকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া খুব তাড়াতাড়ি এক ঝাঁকুনিতে ভাঙ্গিয়া লইতে হয়। এরূপভাবে ভাঙ্গিবার ফলে গ্রন্থির উপরে যে স্থানে ঐ বিভাজনক্ষম ক্ষুদ্র কোষগুলি থাকে, অপেক্ষাকৃত নরম হওয়ায় সেই স্থানটিই ভাঙ্গে। স্থূলতায় সমান ঐ জাতীয় আর একটি নিকটবর্তী গাছের উপায়ে সৃষ্ট একটি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের জোড়-কলম ৩নং চিত্রে দেখান হইল।

কি ভাবে জোড় সম্পন্ন হয়, জোড় লাগিবার বিভিন্ন অবস্থায় তাহা কাটিয়া লইয়া অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রথমে সংযোগস্থলে উভয় কাণ্ডাংশের প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র কোষগুলিতে খুব দ্রুত বিভাজন আরম্ভ হয়। উভয় কাণ্ডাংশের বিভক্ত ভাসক্যুলার বাণ্ডলগুলির সান্নিধ্যে ক্যাম্বিয়ামের মত বিভাজনশীল একটি স্তরের

উদ্ভব হয়। ঐ স্তরটি রসবাহী তন্তুতে রূপান্তরিত হইয়া উভয়দিক সংলগ্ন ভাস্ক্যুলার বাণ্ডলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এইভাবে উভয় দিকের ভাস্ক্যুলার বাণ্ডল্‌গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপরই জোড়ের কৃতকার্যতা নির্ভর করিয়া থাকে। ৪ হইতে ৬ সপ্তাহের মধ্যেই ভাস্ক্যুলার বাণ্ডল্‌গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইতে আরম্ভ করে। উপর ও নীচের কাণ্ডের বাণ্ডল্‌গুলি ঠিক মুখামুখিভাবে অবস্থিত না থাকায় অধিকাংশ-ক্ষেত্রে উভয় কাণ্ডের বাণ্ডল্‌গুলি বাঁকাভাবে সংযুক্ত হয়।

দৃঢ়ভাবে জোড়া লাগিবার পূর্ব পর্যন্ত উপরের অংশ সবুজ থাকিলেও উহার কোনরূপ বৃদ্ধি হয় না। ভালভাবে জোড় লাগিবার পরে ডগার কুঁড়িটি বাড়িতে আরম্ভ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক গাছের মতই হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে; অর্থাৎ সেই সব ক্ষেত্রে জোড়কলম স্বাভাবিক গাছের তুলনায় খুব ধীরে ধীরে বাড়িয়া থাকে। ইক্ষু ও গিনিঘাসের জোড়কলমে স্বাভাবিক গাছের মত যথাসময়ে ফুল ধরিতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন ইক্ষুর জোড়কলমে জোড়া স্থান হইতে শিকড় বাহির হইয়া থাকে।

সলোমন দ্বীপে সিণ্ডাপ্‌সাস্ অরিয়াস নামক এক জাতীয় বৃহৎ এক-বীজপত্রী উদ্ভিদে অন্য আর এক উপায়ে জোড়কলম করা হইয়াছে। ঐ সব গাছে ইক্ষু প্রভৃতির মত গ্রন্থির নিকটে বিভাজনশীল তন্তু থাকে না, কিন্তু গাছের ডগার দিকে ৩।৪ পর্ব পর্যন্ত সমস্ত কোষগুলিই দীর্ঘ সময় বিভাজনশীল থাকে। এই জাতীয় গাছের ডগার দিকে কাণ্ডের পাশে সামান্য কাটিয়া সাধারণ জোড়কলমের (inarch graft) মত দুইটি গাছে জোড় লাগাইয়া জোড়কলম করা সম্ভব হইয়াছে। আবার দেখা গিয়াছে, ইক্ষু প্রভৃতির মত ডগাটি ভাঙ্গিয়া লইয়াও মস্তকবিহীন অন্য কাণ্ডের মাথায় বসাইয়া জোড় লাগান যাইতে পারে।

এক-বীজপত্রী অনেক গাছে জোড়কলম করা সম্ভব হইলেও এখন পর্যন্ত কৃতকার্যতার হার খুবই কম। তবে ক্রমশঃ নানা উপায় অবলম্বনে এই হার বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। তখন হয়তো উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধনে নানারূপ এক বীজপত্রী উদ্ভিদের কলমের প্রচলনও হইবে।

ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ধানবাদ। রাসায়নিক গবেষণাগারের একাংশ দেখা যাইতেছে

গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষের ন্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। দেহের বিকার, রোগজনিত যন্ত্রণা, জরা ও মৃত্যুর সহিত মানুষের পরিচয় পৃথিবীতে তাহার আবির্ভাবের পর হইতেই। জৈবধর্মের প্রেরণায় ব্যাধিমুক্ত হইবার ইচ্ছা তাহার স্বাভাবিক। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের উপর এরূপ একান্তভাবে নির্ভরশীল যে, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্ ও জীববিদ্যার উন্নতি একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছান পর্যন্ত এই বিজ্ঞানের প্রাথমিক উন্নতিও সম্ভবপর নয়। অথচ ব্যাধির যন্ত্রণা আজও যেমন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরও তেমনই প্রবল ছিল। অসহায় মানুষ রোগের যন্ত্রণায় অগত্যা বাধ্য হইয়া দেব-দেবী, মন্ত্র ও যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়াছে। তাই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে তুকতাক্, মন্ত্র তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, যাদু-বিদ্যা, কবচ, মাদুলী প্রভৃতির প্রাধান্যই আমরা দেখিতে পাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আজও এই প্রাধান্য অনেকাংশে বর্তমান।

তবু তাহারই মধ্যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কতকগুলি সাধারণ রোগের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করে, তাহাদের লক্ষণগুলি বুঝিতে ও চিনিতে শিখে এবং এইসব রোগে বিবিধ উদ্ভিদের গুণ ও কার্যকারিতা কাজে লাগাইবার উপায় অল্প-বিস্তর আয়ত্ত করে। বহু বৎসরের এই জাতীয় অভিজ্ঞতার ফলে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র। প্রাচীন সভ্যতার কয়েকটি আদি কেন্দ্রে, যেমন ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ ও মহাচীনে চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্কুরোদ্গমের প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।
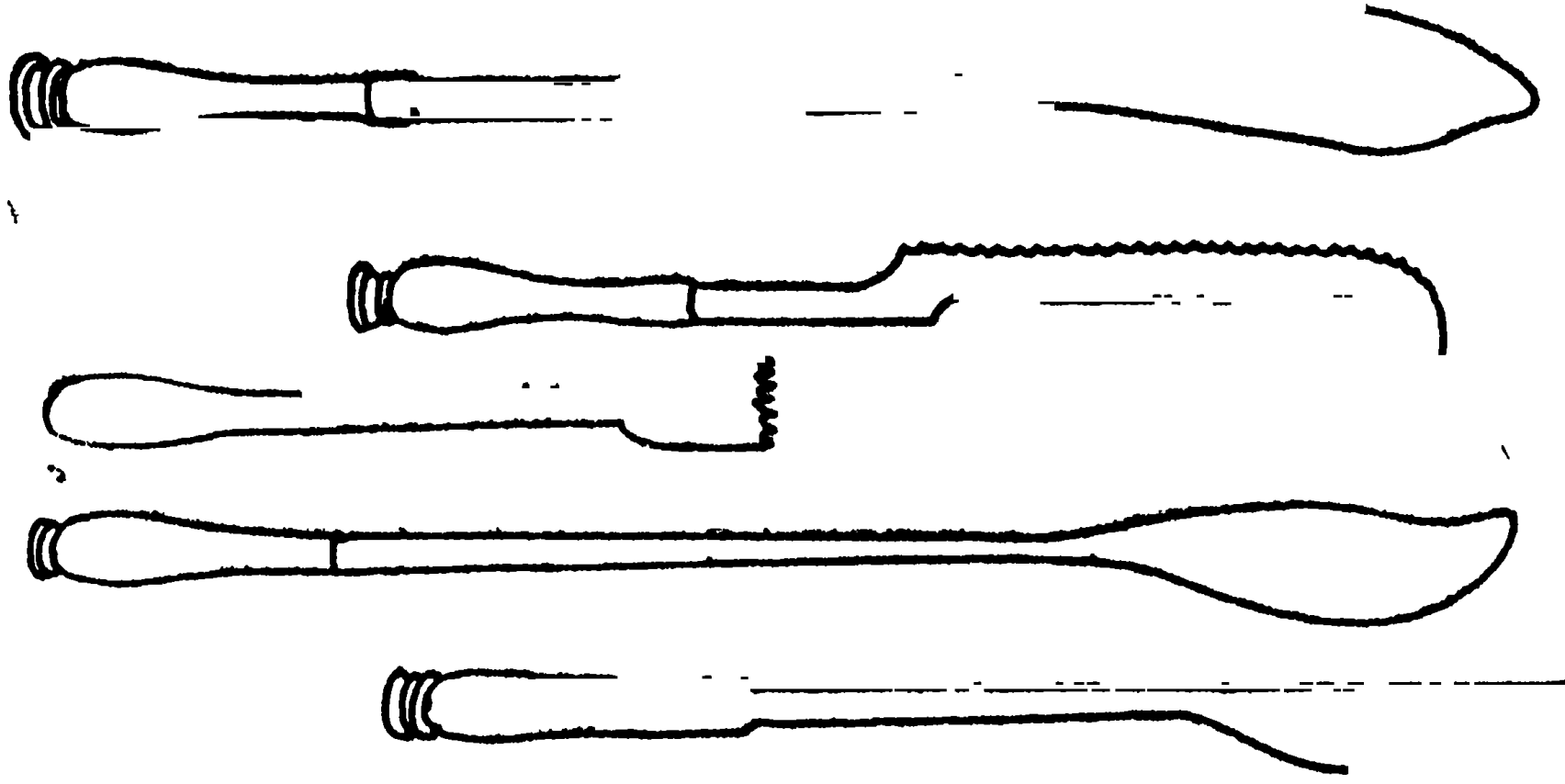
১নং চিত্র

প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা সম্পর্কে নিনেভাতে (ব্যাবিলন) প্রাপ্ত অস্ত্রোপচারের উপযোগী নানাবিধ যন্ত্রপাতি। দুই প্রকার ছুরি, একটি করাত ও এক প্রকার বাটালি এই যন্ত্রপাতির মধ্যে দেখা যাইতেছে। ইয়েনার অধ্যাপক মেয়ার ষ্টাইনেগ প্রাচীন মেসোপোটেমীয় সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ এই যন্ত্রগুলি সংগ্রহ করেন

জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও গণিতের ন্যায়

চিকিৎসাবিদ্যাও গ্রীকরা অর্জন করে গ্রীকপূর্ব প্রাচীন সভ্যজাতির কাছে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টাব্দের দুই শতক পর্যন্ত একটানা আট শত বৎসর গ্রীকরা এই বিদ্যার চর্চা করিয়াছে ও নানাভাবে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অভিমত, গ্রীকদের পূর্বে চিকিৎসাবিদ্যার অস্তিত্বের নজির থাকিলেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রীকদের আমল হইতেই এই বিদ্যার আলোচনা ও চর্চার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি গ্রীকরাই স্থাপন করে।* চিকিৎসা বিজ্ঞানে গ্রীক অবদানের উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গ্রীকজাতির উপর অর্পণ করিবার চেষ্টা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্ততঃ ভারতবর্ষ ও মহাচীনে গ্রীকদের পূর্বে ও গ্রীক প্রাধান্যের কালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসাবিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিসের বহুপূর্বে ভারতীয় চিকিৎসকগণ শল্যবিদ্যায় যে আশ্চর্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, সেকথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেব মধ্যে অনেকেই এখন স্বীকার করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক ক্যাষ্টিগ্‌লিওনি প্রাচীন ভারতে শল্যচিকিৎসার উৎকর্ষতা প্রসঙ্গে মন্তব্য
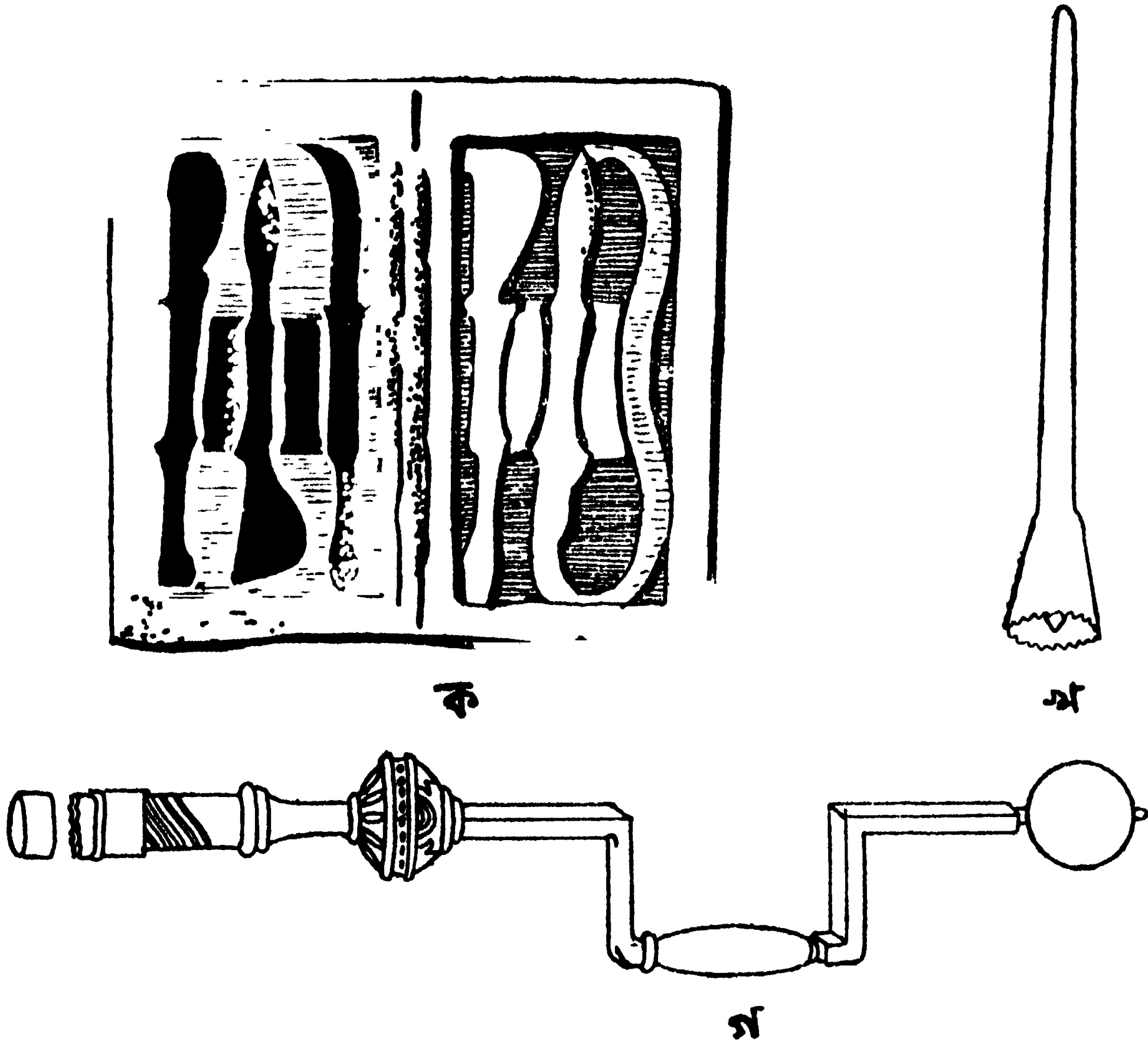
২নং চিত্র

(ক) এথেন্সে এস্‌কুলাপিয়ানের মন্দিরে প্রাচীর গাত্রে এই যন্ত্রপাতিব খোদাই চিত্রটি পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক আমলে ব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের উপযোগী কয়েকটি যন্ত্রপাতির নমুনা এই চিত্র হইতে পাওয়া যায়। (খ) সাধারণ একটি ট্রেফিন যন্ত্র। (গ) আর একটি উন্নত ধরণের ট্রেফিন যন্ত্র

* A Short History of Medicine—Charles Singer, Oxford, pp. 1-2.

করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"In it (surgery) we find proof of the priority of Indian to Hippocratic medicine. Indeed, operations are described in the Indian texts, such as that of anal fistula, which are not named in the Hippocratic writings."*

গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার এই সুনামের প্রধান কারণ এই যে, পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে ইউরোপে নূতন করিয়া এই বিদ্যার চর্চা যখন আরম্ভ হইল তখন ইহা সুযোগ তাহার উপস্থিত হয় নাই। যদি হইত, অথবা ইউরোপীয় মনীষীরাই গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিবর্তে যদি ভারতীয় অথবা চৈনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি হাতে পাইতেন, তাহা হইলে গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে উক্তি আজ সচরাচর করা হয়, ভারতীয় ও চৈনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঠিক সেই উক্তিই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা করিতেন। প্রাচীন কালে বিভিন্ন সভ্যতার আওতায় স্বাধীন-ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহার নিরপেক্ষ বিচার করিতে হইলে এই কথা মনে রাখা
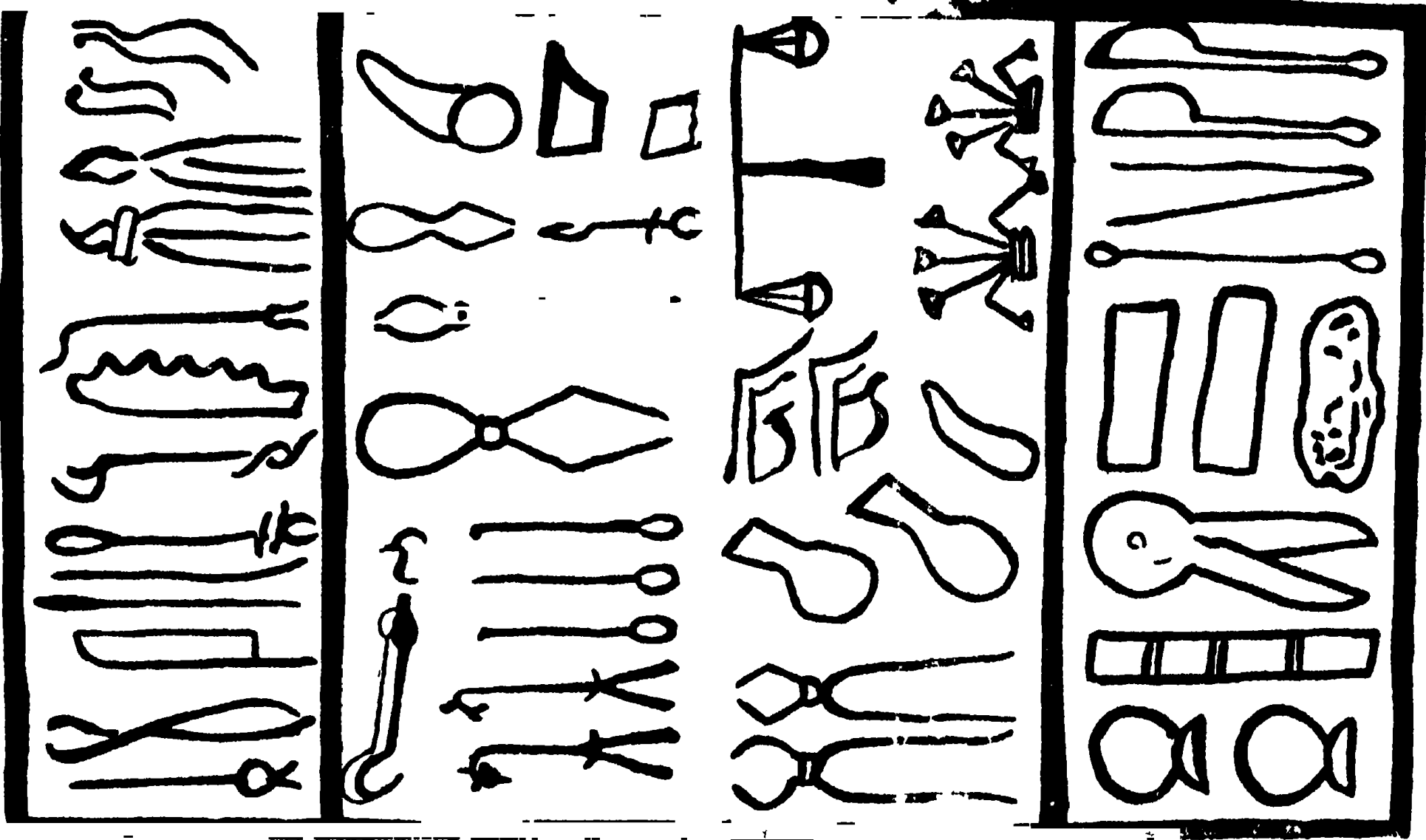
৩নং চিত্র

মিশরে কোম্ ওম্বোস্ মন্দির গাত্রে এই যন্ত্রগুলি খোদিত দেখা যায়। সপ্তম টলেমী (খৃঃ পূঃ ১৮১—১৪৬) এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাধান্যের সময় মিশরে কি ধরনের যন্ত্রপাতি অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত ইহা তাহার একটি নমুনা

প্রধানতঃ গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় মনীষীরা আরবদের মধ্যস্থতায় প্রথম উপকরণ হিসাবে গ্রীক চিকিৎসা-বিদ্যাকেই হাতের কাছে পাইয়াছিলেন। ইউ-রোপের মত ভারতবর্ষে ও মহাচীনে রেনেশাঁস আসে নাই। তাই নিজেদের প্রাচীন বিদ্যাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উন্নতিবিধানে আর কোন একান্ত আবশ্যক।

যাহা হউক আপাততঃ গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়। স্যার চার্লস্ সিঙ্গার এই উৎপত্তির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভূমধ্যসাগরের উপকূল-বর্তী অঞ্চলে মিনোয়ান নামে এক সভ্য জাতির বাস ছিল। প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার ফলে এই মিনোয়ান সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অধুনা

* A History of Medicine—A. Castiglioni, p. 90.

আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হোমারের ইলিয়ডের নূতন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছে। ট্রয় অবরোধের বৃত্তান্ত গ্রীকদের দ্বারা মিনোয়ানদের এক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ঘাঁটি আক্রমণ বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। নবাগত গ্রীকজাতির মধ্যে দুইটি শাখার প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়;—প্রথমতঃ ডোরিক গ্রীক—ইহারা মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ক্রীট, কস্, স্নাইডাস্ প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলিতে গিয়া বসতি স্থাপন করে; দ্বিতীয় শাখা—আয়োনীয় গ্রীকরা এসিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করে। এই ডোরিক ও আয়োনীয় গ্রীক সম্প্রদায় দুইটি শুধু চিকিৎসাবিদ্যার জন্য নহে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নতিবিধানের জন্যও দায়ী। কস্, স্নাইডাস্ ও এসিয়া মাইনরে গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার যে বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয় তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ও ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র গ্রীকজগতে ও পরবর্তীকালে অপরাপর সভ্যতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বিজিত মিনোয়ান সভ্যতার নিকট গ্রীকরা তাহাদের চিকিৎসাবিদ্যার জন্য অনেকাংশে ঋণী। এই বিদ্যার প্রথম অবস্থায় সর্পকে চিকিৎসার প্রতীক হিসাবে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। মিনোয়ান ধর্মে সর্পের এক বিশেষ স্থান ছিল। তাহাদের মধ্যে সর্পপূজার বহু নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং গ্রীক চিকিৎসা বিদ্যার আদি পর্বে সর্পের সহিত চিকিৎসার যে নানা যোগ দৃষ্ট হয় তাহা গ্রীকদের উপর মিনোয়ান সভ্যতার প্রভাবের পরিচায়ক। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান ও ধারণা গ্রীকরা মিনোয়ানদের নিকট অর্জন করে। সহরের আবর্জনা ও ময়লা জল নিকাশের জন্য মিনোয়ানদের অতি চমৎকার ব্যবস্থা ছিল।

৪নং চিত্র

মিনোয়ান সভ্যতার যুগের স্বর্ণখচিত হস্তীদন্ত নির্মিত উল্লসিত নারীমূর্তির উভয় হস্তে ধৃত সর্প-প্রতীক

গ্রীক সভ্যতার উপর অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়

সভ্যতার ছাপও সুপরিস্ফুট। পশ্চিম এসিয়া-মাইনরের ঔপনিবেশিক আয়োনীয় গ্রীকদের সহিত প্রাচীন অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতিস্ উপত্যকার সভ্যজাতিদের পর্যবেক্ষণ-খ্যাতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। বহু বৎসর ধরিয়া আশ্চর্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত ইহারা নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বহু মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করে। প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার ফলে অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা উদ্ভাবিত অস্ত্রোপচারের উপযোগী নানা যন্ত্রপাতির কথা জানা গিয়াছে। প্রাণীদেহের আভ্যন্তরীন গঠন সম্পর্কেও ব্যাবিলনীয়দের অনেক গবেষণা আছে। ভেড়ার যকৃতকে নকল করিয়া নির্মিত ২০০০ বছরের পুরাতন এক মৃত্তিকার ছাঁচ পাওয়া গিয়াছে; বৃটিশ মিউজিয়ামে এই ছাঁচ এক্ষণে সংরক্ষিত আছে। অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের এইরূপ উন্নত চিকিৎসাবিদ্যা স্বভাবতঃই আয়োনীয় গ্রীকদের প্রভাবান্বিত করে। ইহাদের কাছ হইতে গ্রীকরা যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও তথ্যরাজি শিক্ষা করিয়াছিল, সেই সঙ্গে ইহাদের নানারূপ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ছোঁয়াচ হইতেও গ্রীকরা পরিত্রাণ পায় নাই। গ্রীক-বিজ্ঞানে ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানের সহিত ব্যাবিলনীয় কুসংস্কারও একত্রে স্থান পাইয়াছে।

মিনোয়ান ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছাড়া মিশরীয় সভ্যতার নিকটও গ্রীকরা তাহাদের চিকিৎসাবিদ্যার জন্য ঋণী। নানাবিধ ঔষধ ও ভেষজের জ্ঞান গ্রীকরা মিশরীয়দের নিকট আয়ত্ত করে। চিকিৎসা সম্পর্কিত নীতিজ্ঞানও তাহাদের মিশর হইতে ধার করা। গ্রীক চিকিৎসা-বিদ্যার উপর মিশরীয় চিকিৎসাবিদ্যার প্রভাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই যে, মিশরীয়েরা ইম্‌হোটেপ নামক চিকিৎসককে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিল। গ্রীকরাও তাহাদের পৌরাণিক চিকিৎসক এস্‌কুলাপিয়াস্‌কে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। ইম্‌হোটেপ ও এস্‌কুলাপিয়াস্ উভয়েই ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন এবং উভয়েরই দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা গ্রীকদের উপর মিশরীয় সভ্যতার প্রভাবের এক নিদর্শন।

ইম্‌হোটেপ ও এস্‌কুলাপিয়াস্

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর পারসিক ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অল্প বিস্তর প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই প্রভাবের স্বরূপ ও মাত্রা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

এই ভাবে মিনোয়ান, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এসিয়া মাইনরের আয়োনীয় গ্রীকরা এবং ভূমধ্যসাগরীয় কস্, স্নাইডাস্

প্রভৃতি দ্বীপের ডোরিক গ্রীকরা তাহাদের পূর্ববর্তী প্রাচীন সভ্যজাতিদের চিকিৎসা বিষয়ক বিবিধ তথ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই সব বিক্ষিপ্ত তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে একত্র গ্রথিত ও সঙ্কলিত করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বিদ্যায় রূপায়িত করিয়া তুলিবার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে গ্রীকদের প্রাপ্য। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কস্ ও স্নাইডাসে গ্রীকদের আমরা দর্শন ও শাস্ত্র হিসাবে চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারের আলোচনা করিতে দেখি। ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এই বিদ্যা রীতিমত উন্নত এবং সমগ্র গ্রীক চিন্তা ও জ্ঞানজগতে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ধারা ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। গ্রীক চিকিৎসার উপর অন্যান্য সভ্যতার প্রভাব ও এই বিদ্যার ক্রমবিকাশের ধারা নক্সার আকারে দেখান হইল।

মিনোয়ান সভ্যতা

স্বাস্থ্য
মন্দির কেন্দ্রিক চিকিৎসাবিদ্যা
সর্পপূজা
(খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীর পূর্বে)
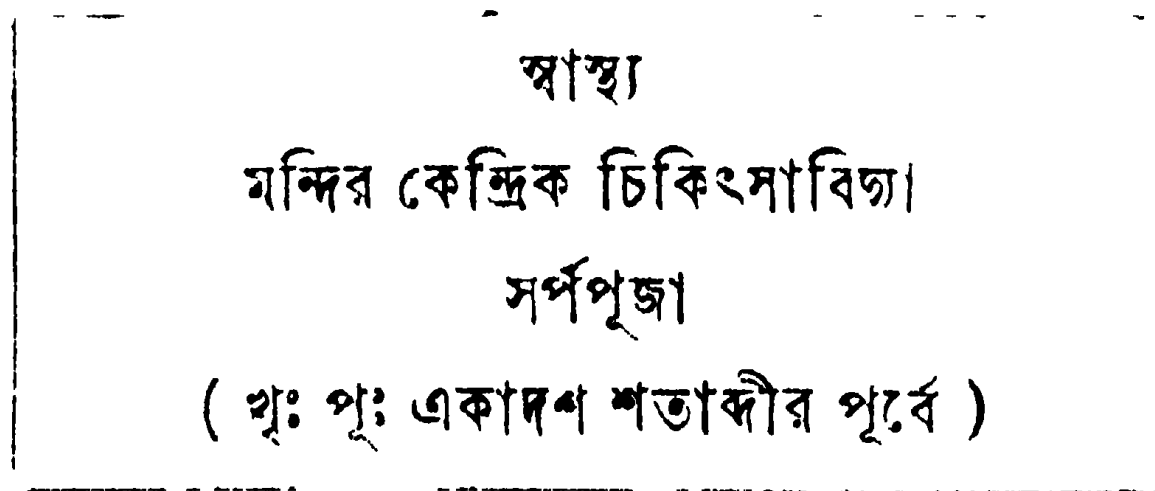
ব্যাবিলনীয় সভ্যতা —
নানারূপ আসুরিক শক্তিতে বিশ্বাস; ভৈষজ্যবিজ্ঞান; জ্যোতিষ ও ভাগ্য-গণনা; চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম আভাস;
(৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী)

— **মিশরীয় সভ্যতা**
ভৈষজ্যবিজ্ঞান;
অস্ত্রোপচার পদ্ধতি;
চিকিৎসকদের দেবতা জ্ঞান;
যাদুবিদ্যা;
(খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী ও তৎপূর্বকাল)

↓ ↓ ↓

আয়নীয় দর্শন
(ষষ্ঠ শতাব্দী)

সিসিলির বিদ্যাপীঠ
চারিপ্রকার মৌলিক পদার্থ;
জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ
(৬ষ্ঠ ও ৫ম শতাব্দী)
↓

↓

হিপোক্রেটিস্ উদ্ভাবিত চিকিৎসা বিজ্ঞান
(পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী)

এথেন্সের বিদ্যাপীঠ ———
অ্যারিষ্টটল্
(৪র্থ শতাব্দী)

——**আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপীঠ**

↓ ↓ ↓

হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ
(খৃঃ পূঃ ৩০০-এর পরবর্তীকাল)

হিপোক্রেটীয় চিকিৎসা বিদ্যার ঐতিহাসিক বিবর্তনের নক্সা

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যা বহু শতবর্ষব্যাপী বহু গ্রীক মনীষীর অক্লান্ত সাধনার ফল। এই সকল মনীষীর অনেকের কথাই বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। আমরা যে অল্প কয়েকজনের কথা জানি তাহাও নানাদিক দিয়া অসম্পূর্ণ। এই অল্প কয়েকজনের মধ্যে আল্‌কমাওন, এম্‌পিডক্লেস ও হিপোক্রেটিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে এই ত্রয়ীই গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার স্থাপয়িতা।

আল্‌কমাওন ও এম্‌পিডক্লেস

ক্রোটনের আল্‌কমাওন (খৃঃ পূঃ ৫০০) ভ্রূণ-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। অস্ত্রোপচার ও জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্যে তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অপ্‌টিক্ নার্ভ বা দৃষ্টিকেন্দ্রে প্রসারিত স্নায়ু তিনি আবিষ্কার করেন। মস্তিষ্কই সমস্ত অনুভূতি ও মনন-শক্তির কেন্দ্র, তিনি এইরূপ মনে করিতেন।

শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে এম্‌পিডক্লেসের কয়েকটি গবেষণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে ও হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তিনি এইরূপ শিক্ষা দিতেন। পদার্থ মাত্রেই জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকা এই চারি মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত—এই সুপ্রাচীন গ্রীক মতবাদ এম্‌পিডক্লেস প্রথমে উদ্ভাবন করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় এই মতবাদ প্রয়োগ করিয়া তিনি বলেন যে, দেহে এই চারি মৌলিক উপাদানের সামঞ্জস্য যথাযথ রক্ষিত হইলে তবেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে; যে কোন কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদ দীর্ঘকাল গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যাকে প্রভাবান্বিত রাখিয়াছিল।

হিপোক্রেটিস ও হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ

হিপোক্রেটিস গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গুরু ও পাশ্চত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক। তাহার প্রদর্শিত নীতি ও পদ্ধতি সর্বকালের জন্য এই বিজ্ঞানের এক অতি উচ্চ মান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। শুধু চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে নহে, সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ক্ষেত্রেও এই মহামনীষী যে আদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া ভার।

হিপোক্রেটিসের রচনা সম্বন্ধে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। তাঁহার নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থ ও রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও কোন্ গ্রন্থগুলি হিপোক্রেটিসের রচিত আর কোন্‌গুলিই বা হিপোক্রেটিস-পন্থী অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের রচিত তাহা ঐতিহাসিকেরা বহু গবেষণা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও এ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে বলিতে সমর্থ হন নাই। হিপো-ক্রেটীয় চিকিৎসা-সংগ্রহ নামে যে বিপুল গ্রন্থরাজি আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা মূলতঃ বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্নদেশের হিপোক্রেটিস-পন্থী চিকিৎসকদিগের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফল। এই সংগ্রহ যে নানা হাতের রচনা, গ্রন্থের বিপরীতাত্মক মতবাদ ও অসংলগ্ন আলোচনা তাহার অকাট্য প্রমাণ। তথাপি আশ্চর্য এই যে, এই সব রচনার অন্তর্নিহিত বাণী, নীতি ও উপদেশ এক; আদর্শও এক। প্রত্যেক গ্রন্থই এক অভিন্ন নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়াছে এবং এই মূল বিষয়ে হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের সংহতি কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় নাই। এই নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতির সহিতই হিপোক্রেটিসের নাম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। হিপোক্রেটিসের স্বরচিত গ্রন্থ বা রচনা সম্বন্ধে যত অনিশ্চয়তাই থাকুক না কেন, তিনিই যে এই সংগ্রহের মূল ও প্রাথমিক অনুপ্রেরণা যোগাইয়া-ছেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

হিপোক্রেটীয় রচনার এই অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও হিপোক্রেটিস্ ঐতিহাসিক পুরুষ। ৪৬০ খৃঃ পূর্বাব্দের অনুরূপ সময়ে তিনি কস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃতুকাল ধার্য হইয়াছে খৃঃ পূঃ ৩৭৭ হইতে ৩৫৯ অব্দের মধ্যে। শেষোক্ত সাল সত্য হইলে হিপো-ক্রেটিসের মৃত্যু ঘটে ১০১ বৎসর বয়সে। চিকিৎস-কের পক্ষে এরূপ দীর্ঘজীবন লাভ অবশ্য অসম্ভব

নহে। হিপোক্রেটিস ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করিতেন। কস্, থেমস্, এথেন্স, থ্রেস, থেসালি প্রভৃতি নানাস্থানে তাঁহার কর্মময় জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার সমসাময়িক ও বয়োকনিষ্ঠ প্লেটো নিজের রচনায় শ্রদ্ধার সহিত হিপোক্রেটিসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হিপোক্রেটিসের শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার দুই পুত্র ও জামাতার নাম পাওয়া যায়। অ্যারিষ্টটল

হিপোক্রেটিস

এই জামাতার কাজের কথা উল্লেখ করেন। থেসালিতে হিপোক্রেটিসের কবরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

হিপোক্রেটিসের জীবিতাবস্থায় রচিত কোন চিত্র বা মর্মর মূর্তি সংরক্ষিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহু পরে গ্রীকরা তাহাদের এই প্রাচীন প্রিয় চিকিৎসকের এক কল্পিত মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিল। আসল হিপোক্রেটিসের সহিত এই কল্পিত মূর্তির কোন সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক, গ্রীকরা তাহাদের প্রিয় ও আদর্শ চিকিৎসককে কিরূপ মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছিল, ইহা তাহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধীর, স্থির, সৌম্যদর্শন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানের প্রতীক এই প্রস্তর মূর্তিটি হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্য দিয়া হিপোক্রেটিস নামক যে মনুষ্য-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই চরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। মানুষ যুগে যুগে এই মূর্তিটির উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবে।

হিপোক্রেটিস কর্তৃক প্রদর্শিত চিকিৎসা পদ্ধতির সার কথা হইল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ প্রবর্তন করিয়া তিনি যুগান্তর আনয়ন করেন। যাদু ও মন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া চিকিৎসাবিদ্যাকে তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানের আদর্শে ঢালিয়া সাজাইলেন। মত ও

তত্ত্বের সহিত পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মিলন ঘটাইলেন। তিনি বলিলেন, শুধু অলীক কল্পনা ও প্রজ্ঞার দ্বারা চিকিৎসা-সমস্যার সমাধান অসম্ভব; তাহার জন্য প্রয়োজন—প্রতিনিয়ত পরীক্ষা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। 'কেন হইতেছে'-এর পরিবর্তে 'কিরূপে হইতেছে'—এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, তিনি এই মত প্রচার করিতেন। যাহারা 'কেন'র প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে চায় তাহাদের তিনি অনধিগম্য নভোমণ্ডল ও ভূগর্ভের জটিল রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় সফলকাম হইতে হইলে বহুদিনের ও বহু লোকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে এই বিদ্যায় যে নির্ভরযোগ্য প্রচুর তথ্যের সমাবেশ হইয়াছে ও অনেক প্রয়োজনীয় নীতি ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে সেই তথ্য ও নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হইতে হইবে। হিপোক্রেটিস তাঁহার নিজের গবেষণা ও রচনায় পরম নিষ্ঠার সহিত এই আদর্শ পালন করিয়া চলিয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটানাভাবে তিনি বহু রোগের গতি, পরিবর্তন ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ করিয়া পরে তাহা নিখুঁত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতিশয়োক্তি ও কুসংস্কারজনিত মন্তব্যবর্জিত রোগের এই বর্ণনাগুলি হিপোক্রেটিসের বৈজ্ঞানিক মনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ নিখুঁত ও নির্ভুল বর্ণনা দুই হাজার বৎসরের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসেও বিরল। এইরূপ বর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

"আরিষ্টিয়নের সহিত যে মহিলাটি বাস করিত তাহার গলার প্রদাহ হইয়াছিল। প্রথমে তাহার জিহ্বার পীড়া দেখা দেয়; স্বর অসংলগ্ন, জিহ্বা রক্তিমবর্ণ ও শুষ্ক। প্রথম দিবস—কম্পন ও দেহে জ্বরের আবির্ভাব। তৃতীয় দিবস—শৈত্য, ভীষণ জ্বর; গলার ও বক্ষের দুই পাশ কঠিন এবং রক্তিম-বর্ণ ধারণ করিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশ ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ, শ্বাস উঠিতেছে; পানীয় নাসারন্ধ্রপথে বাহির হইয়া যাইতেছে, মহিলা গলাধঃকরণে অসমর্থ, অন্ত্র ও মূত্রাশয়ের নিঃসরণ-ক্রিয়া বন্ধ। চতুর্থ দিবস—সমস্ত লক্ষণগুলির প্রবলতর আকার ধারণ। পঞ্চম দিবস—মহিলার মৃত্যু হইল।"*

উপরোক্ত বর্ণনা ডিপথিরিয়া রোগের একটি উদাহরণ। একালের কোন চিকিৎসকের পক্ষেও এই রোগের সংক্ষিপ্ততর ও উৎকৃষ্টতর বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

শল্য-চিকিৎসা সম্বন্ধে হিপোক্রেটীয় সংগ্রহে বিশদ বিবরণ আছে। 'Concerning the Things in Surgery' শীর্ষক একটি ছোট নোট বই-এ অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা ও উপদেশের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এইসব ব্যবস্থায় ও উপদেশে রীতিমত আধুনিকতার ছাপ আছে। অস্ত্রোপচারের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত, সেখানে কি কি ব্যবস্থা অপরিহার্য, শল্য-চিকিৎসকের কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দেখাইতেছি—

'অস্ত্র চিকিৎসার কাজে প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক হইল—রোগী, শল্য চিকিৎসক, সহকারীগণ, যন্ত্রপাতি আলো এবং কোথায় কিভাবে তাহা স্থাপিত হইবে তাহার ব্যবস্থা, রোগীর দেহ ও যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম। উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় অস্ত্র-চিকিৎসককে এরূপ স্থান গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে রোগীর দেহের অস্ত্রোপচারের স্থান আলোর ব্যবস্থার দিক হইতে চিকিৎসকের অবস্থান সুবিধা-জনক হয়। স্বাভাবিকঃ অথবা কৃত্রিম উভয়বিধ আলো সোজা অথবা তীর্যকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।'

অস্ত্রচিকিৎসকের উপরও অনেক মূল্যবান নির্দেশ আছে।

---

* 'A Short History of Science'—Singer; p. 24.

'(চিকিৎসকের) নখ অঙ্গুলী হইতে খুব বেশী বাহির হইয়া থাকা অথবা খুব ছোট থাকাও উচিত নহে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ব্যবহার করিতে অভ্যাস কর। অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত সকল রকম ক্রিয়া একহাতে ও একসঙ্গে দুই হাতে সম্পাদন করিতে অভ্যাস কর। তোমার উদ্দেশ্য হইবে দক্ষতা, দ্রুততা, বেদনাহীনতা, সৌষ্ঠব ও তৎপরতা আয়ত্ত করা। যাহারা রোগীর তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত আছে, চাহিবামাত্র তাহারা যেন অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম তোমার কাছে পৌঁছাইয়া দেয় এবং একই-কালে রোগীর দেহ শক্ত অথচ স্থিরভাবে ধরিয়া রাখে, মৌনতা রক্ষা করে ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের আজ্ঞানুবর্তী থাকে।'

ইহার মধ্যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ বর্তমান। আধুনিককালের অস্ত্রোপচার গৃহের ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের সহিত ইহার কিরূপ ঘনিষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত।

মাথার খুলি বা করোটিতে আঘাতজনিত ক্ষতস্থান অস্ত্রোপচার-সংক্রান্ত বিষয়ে 'On the Wounds of the Head' নামক গ্রন্থে নানা নির্দেশ পাওয়া যায়। গুরুতর আঘাতের ফলে খুলির হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে ভাঙ্গা হাড় খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। এইরূপ অস্ত্রোপচারের নাম ট্রিফাইনিং এবং এই কার্যে ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম ট্রিফিন। ইহা একটি গোলাকৃতি করাত বিশেষ। ইহার মধ্যদেশে একটি তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা সংলগ্ন থাকে। করোটির ক্ষতস্থানে ট্রিফিন স্থাপন করিয়া হাতল ঘুরাইলে করাত গোলভাবে অস্থি কাটিয়া বাহির করিয়া আনিবে। এই কাযে বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। ট্রিফিনের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের সময় শল্য-চিকিৎসকের কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত 'On the Wounds of the Head' নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্যে হিপোক্রেটিসের বচন বা Aphorisms বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বচনগুলি স্বয়ং হিপোক্রেটিস কর্তৃক লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবীণ চিকিৎসকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল এই বচনগুলি। অতি সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে ইহা লিখিত এবং সম্ভবতঃ হিপোক্রেটিসের বৃদ্ধ-বয়সের রচনা। নিম্নে এই বচনগুলির কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল।

"জীবন স্বল্পমেয়াদী এবং কলাকৌশল অর্জনের কাল দীর্ঘ; বিপদ ক্ষণিকের; পরীক্ষার দায় আছে; কর্তব্য নির্ধারণ সুকঠিন। চিকিৎসককে কর্তব্য-পালনের জন্যই যে শুধু প্রস্তুত থাকিতে হইবে তাহা নহে—রোগী, সহকারীবৃন্দ ও বাহ্যিক অবস্থা সব কিছুর উপরেই আরোগ্যলাভ নির্ভর করে।"

"কারণ ছাড়া ক্লান্তি রোগের নির্দেশক।"

"কৃশকায় অপেক্ষা অতিশয় স্থূলকায় ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিকতর প্রবল।"

"রোগে নিদ্রা ক্ষতিকর হইলে ইহা অতি মারাত্মক লক্ষণ বুঝিতে হইবে।"

"দীর্ঘ রোগভোগের পর উত্তমরূপে আহারাদি সত্ত্বেও পুষ্টিসাধন না হওয়া দুর্লক্ষণ।'

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঠারো হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ ঘটে।"

"ধনুষ্টংকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হয় চারদিনের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অথবা এই চার দিন টিকিয়া থাকিলে সে সুস্থ হইয়া উঠিবে।"

"চল্লিশ হইতে যাট বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ন্যাস রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।"

সবশেষে হিপোক্রেটীয় শপথ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চিকিৎসা-বৃত্তিতে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষানবীশকে এই শপথ গ্রহণ কারতে হয়। অদ্যাপি এই শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা সর্বদেশে বলবৎ আছে। হিপোক্রেটীয় শপথ রচনার কাল ঠিক করিয়া বলা যায় না। বর্তমানে যে আকারে এই শপথটি পাওয়া যায় তাহা নিঃসংশয়ে হিপো-

ক্রেটিসের বহু পরবর্তী কালের রচনা। আবার এই শপথের কিছু কিছু অংশ যে হিপোক্রেটিসেরও পূর্বে রচিত হইয়াছিল, পণ্ডিতেরা এইরূপ অভিমতও পোষণ করেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মে মিশরীয় প্যাপিরাসে এই শপথের কিয়দংশ পাওয়া যায়। যে সময়েই রচিত হউক না কেন, হিপোক্রেটিস্-পন্থী চিকিৎসকেরা যে কিরূপ সুমহান আদর্শ ও সেবা-ব্রতের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এই শপথ তাহার একটি প্রমাণ এবং তাহাতেই ইহার গুরুত্ব। চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষানবীশ হইবার পূর্বে ছাত্র বলিতেছে :—

'সমস্ত দেবদেবীকে সাক্ষী মানিয়া সর্বরোগহর এপোলোর নামে আমি শপথ করিতেছি যে, এই শপথ ও ইহার লিখিত সর্তগুলি আমি আমার বিচারবুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য পালন করিব।

'যিনি আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষাদান করিয়াছেন তাঁহাকে আমার নিজ পিতামাতার ন্যায় গণ্য করিব। যদি প্রয়োজন হয় আমার সারবস্তু তাঁহার সহিত ভাগ করিয়া লইব এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিব। তাঁহার সন্তানসন্ততিদের আমি নিজ ভ্রাতৃবৎ দেখিব এবং তাহারা এই বিদ্যা অধ্যয়নে অভিলাষী হইলে বিনা বেতনে বা বিনা সর্তে আমি এই বিদ্যা তাহাদের শিখাইব অনুশাসন, বক্তৃতা ও সর্বপ্রকার অধ্যাপনার সাহায্যে আমার নিজ সন্তানদেরই শুধু নহে, আমার শিক্ষকের সন্তানদেরও এইরূপ শপথ ও চুক্তিতে আবদ্ধ শিষ্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত আইন অনুসারে আমি এই বিদ্যা শিক্ষা দিব।

'আমি যে পথ্যাপথ্য বিধির নির্দেশ দিব তাহা আমার যোগ্যতা ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে রোগীদের উপকারার্থেই নির্ধারিত হইবে, তাহাদের অপকার বা ক্ষতির নিমিত্ত নহে। আমার কাছে চাহিলেও কাহাকেও আমি কোন মারাত্মক ঔষধ বা ঔষধের পরামর্শ দিব না, বিশেষতঃ কোন স্ত্রীলোককে ভ্রূণ হত্যায় সাহায্য করিব না। যে গৃহেই আমি প্রবেশ করি না কেন, সেখানে রোগীর উপকারার্থে আমি যাইব এবং সর্বপ্রকার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা বা ভ্রষ্টতা হইতে, বিশেষতঃ স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস পুরুষ বা স্ত্রীলোককে প্রলুব্ধ করিবার অপচেষ্টা হইতে বিরত থাকিব। রোগীর শুশ্রূষার ব্যাপারে অথবা তাহা ছাড়াও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমি যদি এমন কিছু দেখি বা শুনি যাহা প্রকাশ করা অনুচিত, আমি তাহা গোপন রাখিব এবং এইরূপ বিষয়কে পবিত্র গুপ্ত তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করিব। আমার জীবন ও শাস্ত্রকে আমি বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখিব।

'এই শপথ যদি পালন করিতে পারি ও ইহাতে ভ্রষ্ট না হই, তবে সর্বকালে ও সকল লোকের প্রশংসার পাত্র হইয়া আমি যেন আমার জীবন ও শাস্ত্র সমভাবে উপভোগ করিতে পারি। ইহা লঙ্ঘন করিয়া শপথভ্রষ্ট হইলে আমার ভাগ্যে যেন ইহার বিপরীতটি ঘটে।'

চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ আর কি হইতে পারে? যুগে যুগে এই আদর্শ চিকিৎসককে ন্যায়, সত্য ও সেবার পথে অবিচলিত রাখিয়াছে।

পরীক্ষিত সত্যের উপর হিপোক্রেটিসের ও হিপোক্রেটিস-পন্থী অন্যান্য চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব আরোপের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া হিপোক্রেটিস্ বিজ্ঞানের প্রকৃত রাজপথের সন্ধান দিয়াছিলেন। নির্ভুল পরীক্ষালব্ধ তথ্যের আবিষ্কার ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে সম্ভব নহে হিপোক্রেটিসের এই বাণী ও উপদেশ পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রজ্ঞাবাদের মোহে গ্রীক-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতেকলমে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজকে তাহারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছিলেন। ইহাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়া পড়ে। তথাপি চিন্তাজগতে গ্রীকদের

আধিপত্য যতদিন বজায় ছিল এই আদর্শ ততদিন একেবারে ম্লান হইতে পারে নাই। রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের পর এই আদর্শের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে এবং বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করে যাদুবিদ্যা, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি। ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূত্রপাতও তখন হইতে। রজার বেকন ও রেঁনেশীয় বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় হিপোক্রেটিসের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে বিজ্ঞান আবার নবজীবন লাভ করে এবং অপ্রতিহত গতিতে আবার সুরু হয় তাহার জয়যাত্রা।

আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব হইতেই জানিতে পারা যায়।

সাধারণতঃ ভাবী আবহাওয়ার অবস্থা ব্যারোমিটারের সাহায্যে স্থির করা হয়। এই যন্ত্র গ্যালিলিওর শিষ্য টরিসেলি ইটালীতে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। ইহার গঠন মোটেই জটিল নয়। এক মুখ বন্ধ এক গজ লম্বা একটি কাচের নল পারদপূর্ণ করিয়া উহার খোলা মুখ অপর একটি পারদপূর্ণ পাত্রে সাবধানে উপুড় করিয়া সোজাভাবে রাখিতে হয়। নলের ভিতরের পারদের উচ্চতাই বাতাসের চাপ নির্দেশ করে। পারদস্তম্ভের ঊর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি হইতে আবহাওয়ার পরিবর্তন জানা যায়।

অ্যাডমিরাল ফিজরয়ের মতে, বৃষ্টির দিনে যদি ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে, তাহা হইলে দুই-এক দিনের মধ্যেই বৃষ্টিহীন পরিষ্কার দিন আশা করা যায়; কিন্তু পারদস্তম্ভ যদি হঠাৎ খুব উপরে উঠে যায় তাহা হইলে এই পরিষ্কার আবহাওয়া বেশীক্ষণ স্থায়ী হইবে না। পারদস্তম্ভকে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, খুব পরিষ্কার দিন আগতপ্রায়। খুব গরম দিনে যদি যন্ত্রের ভিতরের পারদ হঠাৎ নামিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ঝড় ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা। বৃষ্টির দিনে পারদ নামিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে, আরও বৃষ্টিপাত হইবে। মেঘশূন্য পরিষ্কার দিনে যদি ব্যারোমিটারের পারদ নীচে নামিয়া সেখানেই থাকে তবে দুই-তিন দিনের মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের দ্রুত পতনের দ্বারা বৃষ্টি বা বাত্যার সম্ভাবনা জানাইয়া দেয়। সমভূমিতে পারদের উচ্চতা অনুসারে আবহাওয়ার কিরূপ পার্থক্য হইবে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল:—

ব্যারোমিটারে পারদের উচ্চতা		আবহাওয়ার অবস্থা
৩১	ইঞ্চি	অত্যন্ত শুষ্ক
৩০½	"	শুষ্ক পরিষ্কার
৩০¼	"	পরিষ্কার
৩০	"	পরিবর্তন
২৯½	"	বৃষ্টি
২৯½	"	অতিবৃষ্টি
২৯	"	ঝড়

বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে সময় সময় আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝিতে পারা যায়। যদি দেখা যায়—বাতাস সমুদ্রের দিক হইতে আসিতেছে, তাহা হইলে আর্দ্র আবহাওয়ার সম্ভাবনা। বাংলা ও বিহারে বৃষ্টির

পূর্বে বাতাসকে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে আসিতে দেখা যায়। কোন শুষ্ক প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকিলে বৃষ্টিহীন পরিষ্কার দিন আশা করা যায়। শীতকালে, বাংলা ও বিহারে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব অথবা উত্তর দিক হইতে বাতাস বহিতে থাকে।

মেঘ হইতেই বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। সুতরাং মেঘের আকৃতি-প্রকৃতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে ঝড়-জলের সম্ভাবনা বুঝিতে পারা যায়। মেঘের আকার ও গঠন বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া হাওয়ার্ড নামে এক বৈজ্ঞানিক মেঘকে চার ভাগে বিভক্ত করেন; যথা—স্তরমেঘ, স্তূপমেঘ, অলকমেঘ ও অম্বুদমেঘ।

স্তরমেঘকে চক্রবাল রেখার সমান্তরালে লম্বা লম্বা স্তরে গঠিত হইতে দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই সূর্যাস্তের সময় গঠিত হইয়া প্রাতঃকাল পর্যন্ত অবস্থান করে এবং সূর্যোদয়ের পর আকাশে মিলাইয়া যায়। এই মেঘ সাধারণতঃ পরিষ্কার আবহাওয়ার লক্ষণ।

অলকমেঘ দেখিতে অনেকটা চামরের শুভ্র কেশগুচ্ছের মত। ইহা বহু উচ্চে অবস্থান করে। এই মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিলে বায়ুপ্রবাহ ও আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা।

স্তূপমেঘ দেখিলে মনে হয় যেন রাশি রাশি ধোনা তূলা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। সাধারণতঃ শরৎকালে স্তূপমেঘ পালকের মত আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়। এ রকম পাতলা সাদা স্তূপমেঘ পরিষ্কার আবহাওয়ার চিহ্ন। কিন্তু বৈশাখ মাসে এবং শরৎকালে কোন কোন দিন এক প্রকার ঘন কালো স্তূপমেঘ আকাশে দেখা যায়। আকাশে এইরূপ কালো মেঘ দেখিতে পাইলে মাঝি-মাল্লারা দুর্যোগের সম্ভাবনা বুঝিয়া সাবধান হয়। বৈশাখ মাসে ঘন কালো স্তূপমেঘ দেখা গেলে প্রায়ই ঝড়-বৃষ্টি হয়; তাই লোকে ইহাকে কালবৈশাখীর মেঘ বলে।

যে মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় তাহাকে অম্বুদমেঘ বলা হয়। এই মেঘের বিশেষ কোন আকৃতি নাই। দেখিলে মনে হয় যেন একটি ধূসর বর্ণের যবনিকা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

সাধারণতঃ মেঘের আকার ও সংখ্যা বর্ধিত হইতে থাকিলে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা স্বাভাবিক; কিন্তু বড় বড় মেঘের গঠন ও পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে পরিষ্কার আবহাওয়া আশা করা অসঙ্গত নয়।

অনেক সময় দুই-তিন রকমের মেঘ মিশিয়া নূতন মেঘের সৃষ্টি হয়। অলকমেঘ ও স্তূপমেঘ মিলিয়া একপ্রকার ধূসর রঙের খণ্ড খণ্ড মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘকে চল্‌তি কথায় কোদালে-কুড়ুলে মেঘ বলে। আকাশে কোদালে-কুড়ুলে মেঘ দেখা গেলে দুই-এক দিনের মধ্যেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাংলাদেশে প্রচলিত খনার বচনে আছে:—

কোদালে-কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
বলগে চাষায় বাঁধতে আল।
আজ না হয় জল হবে কাল॥

অস্তগামী সূর্যের রং লক্ষ্য করিলে আবহাওয়ার অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশে যে রক্তাভ বা কমলাভ বর্ণচ্ছটা দেখা যায়, তাহা পরিষ্কার আবহাওয়ার লক্ষণ; কিন্তু এই সময় আকাশের রং ম্লান পীতাভ বা হরিতাভ বোধ হইলে প্রবল বায়ু কিম্বা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সূর্যের রং অস্বাভাবিক আরক্তিম মনে হইলে প্রায়ই আঁধি হইতে দেখা যায়।

রজতশুভ্র চন্দ্র পরিষ্কার আকাশের চিহ্ন। কিন্তু রাত্রিকালে এই উপগ্রহকে ম্লান বা রক্তাভ বোধ হইলে বৃষ্টি বা বাত্যার আশঙ্কা করা অন্যায় নয়। চন্দ্র বা সূর্যের চতুর্দিকে রামধনু রঙের গোলাকার বৃত্ত বা সভা দেখা দিলে বৃষ্টিপতনের সম্ভাবনা থাকে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক লক্ষণ

হইতে আবহাওয়া পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ঝড়-বৃষ্টির ঠিক পূর্বে সমস্ত প্রকৃতি কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বায়ুমণ্ডল অস্বাভাবিক স্থির ও স্তব্ধ বোধ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শীঘ্রই ঝড়-জল হইবে। দূরের পাহাড়ে মেঘ নামিতে দেখিলে বৃষ্টিপাতের আশা করা যায়।

রাত্রিতে প্রচুর শিশির পড়িলে পরের দিন সাধারণতঃ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

পশু-পক্ষীর আচরণ মন দিয়া লক্ষ্য করিলে অনেক সময় আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। জীবজন্তুরা সহজাত সংস্কারের বশে ঝড়-জলের সম্ভাবনা বুঝিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পূর্বে বিড়াল অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে এবং সুবিধা পাইলে গৃহের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়া নিদ্রা যায়। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা হইলে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরা চঞ্চল হইয়া সভয়ে ডাকিতে থাকে এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করে।

বৃষ্টি বা বাত্যার সম্ভাবনা থাকিলে সমুদ্রের পাখীরা আহার্য অন্বেষণে বহুদূরে না গিয়া সাগর-তীরের খুব নিকটে উড়িতে থাকে। পরিষ্কার দিনে ইহারা সমুদ্রের উপর দিয়া বহুদূরে উড়িয়া যায়।

পরিষ্কার আবহাওয়ায় চাতক খুব উঁচুতে উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি আসন্ন হইলে ইহারা অনেকটা নীচে নামিয়া আসে। কাক ও সারসপাখী খাদ্যান্বেষণে দূরে না গিয়া কোন বৃক্ষে বসিয়া কলরব করিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, ঝড়-জলের সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টিপাতের পূর্বে পায়রা নিজের বাসায় ফিরিয়া আসে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও খুব উঁচুতে চিল উড়িতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নাই। বৃষ্টির পূর্বে ইহারা নীচে নামিয়া আসে।

অকারণে ঘন ঘন ব্যাং ডাকিলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। বৃষ্টি আসন্ন হইলে মাছেরা জলের উপরে ভাসিয়া আনন্দে লাফালাফি করিতে থাকে।

মৌমাছিরা আবহাওয়ার পরিবর্তন সহজেই বুঝিতে পারে। ঝড়-বৃষ্টির সূচনা হইলে ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে চাকে ফিরিয়া আসে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিলে পিপীলিকারা ব্যস্ত হইয়া উঠে। বৃষ্টিপাতের পূর্বে যত শীঘ্র সম্ভব তাহারা সারবন্দিভাবে ডিম ও বাচ্চা মুখে লইয়া কোন শুষ্ক নিরাপদ স্থানে গমন করে।

উল্লিখিত প্রাণীবর্গ ব্যতীত স্কার্লেট, পিম্পার্নেল, ক্যামোসাইল, ড্যাণ্ডেলিয়ন, ডেজি প্রভৃতি বিলাতী পুষ্প আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্বন্ধে এরূপ অনুভূতি সম্পন্ন যে, ঝড়-বৃষ্টি কিম্বা শিলাবৃষ্টির পূর্বে ইহাদের কোমল পাপড়িগুলি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

হর্মোন রসায়নের ধারা

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

১৮৪৯ সালে গোটিংগেনের বিজ্ঞানী অ্যাডল্‌ফ্‌ বার্থল্‌ড্‌ একটা শুক্রাশয়হীন মোরগে শুক্রাশয় পুনঃসংযোগ করে শরীরের ভিতরের অন্তঃক্ষরণের বিষয় অবগত হন এবং গবেষণার ফলে মনুষ্যদেহে অন্তর্নিস্রাবী গ্রন্থিরসের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেন। এই সময় থেকেই হর্মোন বা অন্তঃক্ষরিত গ্রন্থিরস সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ জাগ্রত হতে থাকে।

মৌলিক গবেষণা সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে ডাঃ ল্যাঙারহান অগ্ন্যাশয়ের ভিতরকার কোষের আণুবীক্ষণিক তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, মানুষের অগ্ন্যাশয়ের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধভাবে কতকগুলি কোষ রয়েছে। এইগুলিকে আইলেট্‌স্‌ অব ল্যাঙারহান বলা হয়; এই আইলেটস্‌ অব ল্যাঙারহান থেকে ইন্‌সুলিন নামে একটা হর্মোন ক্ষরিত হয়। ১৮৮৯ সালে ফরাসী ডাক্তার ব্রাউন সেকার ঘোষণা করেন যে, গিনিপিগের শুক্রাশয় থেকে নিষ্কাশিত রস ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে তিনি বার্ধক্যের জরা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ডাঃ ব্রাউনের ঘোষণার বৈজ্ঞানিক মূল্য যা-ই থাকুক না কেন, এর ফলে এই অভিনব বিষয়ের দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

রাসায়নিক যৌগিক হিসাবে অ্যাড্রিন্যালিনের কথাই আসে সর্বপ্রথম। ১৯০১ সালে রসায়নবিদ ট্যাকামিন এবং অ্যালড্রিচের যুক্ত গবেষণার ফলে এই রাসায়নিক যৌগিকের আবিষ্কার হয়। এর পূর্বে ১৮৯৮ সালে অ্যাবেল এই যৌগিকটি আবিষ্কার করেছিলেন এপিনেফ্রিন নাম দিয়ে। ভেড়া, ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুর অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে এই যৌগিকটি তৈরী হয়ে থাকে। আমাদের দেহে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির মেডালাতে এই রাসায়নিক যৌগিকটি প্রস্তুত হয়। ১৯০৪ সালে সোল্‌জ কর্তৃক এই যৌগিকটি সম্পূর্ণভাবে সংশ্লেষিত হয়েছিল। অ্যাড্রিন্যালিনের আবিষ্কার আর তার সংশ্লেষণ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করে দিল যে, দেহের অন্তঃক্ষরিত রসের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক যৌগিক। আমাদের দেহের শর্করা বিপাকে অ্যাড্রিন্যালিন অংশ গ্রহণ করে। আর এটি ইন্‌সুলিন নামক অপর একটি হর্মোনের বিপরীত কাজ করে। অ্যাড্রিন্যালিনের অভাবে নানারকম অসুখ হয়ে থাকে। দেহের ভিতরের টাইরোসিন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যাড্রিন্যালিনে রূপান্তরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেলানিন নামে আর একটি যৌগিকের সৃষ্টি হয়। অ্যাড্রিন্যালিনের স্বল্পতার সঙ্গে সঙ্গে মেলানিনের আধিক্য হয়ে থাকে।

এই সময় থেকে হর্মোন কথাটির প্রচলন সুরু হয়। হর্মোন কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে উত্তেজক রস। মোট কথা কতকগুলি নালীবিহীন গ্রন্থি থেকে যে রাসায়নিক যৌগিক রক্তের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোনও বিশেষ গ্রন্থির কার্যকলাপ পরিচালিত করে তাকে বলা হয় হর্মোন।

১৯১৫ সালে রাসায়নিক কেণ্ডাল ষাঁড়ের থাইরয়েড গ্রন্থি নিষ্কাশন করে আর একটি নতুন হর্মোন আবিষ্কার করেন। তিন টন গ্রন্থি থেকে মাত্র ৩০ গ্রাম থাইরক্সিন প্রস্তুত হয়েছিল। থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন হলো থাইরক্সিন। ১৯২৫ সালে হ্যারিংটন থাইরক্সিনের কার্বন কাঠামোর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন। থাইরক্সিন সংশ্লেষিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে হ্যারিংটন আর বার্জারের যুক্ত গবেষণার ফলে। রেডিও-

আয়োডিন দিয়ে পরীক্ষা করে বিপাকীয় পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা গিয়েছে যে, সম্ভবতঃ দেহের ভিতরকার টাইরোসিন, আয়োডিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডাই-আয়োড্‌টাইরোসিন সৃষ্টি করে। এর দুটা অণু এক সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়াতে অ্যালানিন বলে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড বের করে দিয়ে সৃষ্টি করে থাইরক্সিন।

আইলেট্‌স্‌ অব ল্যাঙারহান থেকে ক্ষরিত হয় ইন্‌সুলিন। এই রাসায়নিক যৌগিকটি আবিষ্কৃত হয় ১৯২৬ সালে; অবশ্য ১৯২১ সালে গ্রন্থির নিষ্কাশন তৈরী হয়েছিল। অ্যাবেল ১৯২৬ সালে এই যৌগিকটি আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন যে, এটা একটা কেলাসিত প্রোটিন এবং এর মধ্যে আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। শতকরা ০.৫ ভাগ দস্তার উপর ইন্‌সুলিনের আণবিক স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এ ছাড়া শতকরা ৩.২ ভাগ গন্ধকও রয়েছে ইন্‌সুলিনে। শর্করা বিপাকে যকৃতের গ্লাইকোজেন থেকে রক্তের গ্লুকোজ তৈরী করতে অ্যাড্রিন্যালিন করে সাহায্য, আর ইন্‌সুলিন করে সেটা প্রতিরোধ। শর্করা জাতীয় পদার্থ থেকে ফসফেটযুক্ত শর্করা সৃষ্টি করতে ইন্‌সুলিন সাহায্য করে।

১৯২৫ সালের পর থেকে হর্মোন রসায়নের দ্রুত অগ্রগতি হয়ে থাকে। বলতে গেলে এই সময় থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৫ সালের মধ্যে যৌন-হর্মোন-সমূহের রাসায়নিক গবেষণার দ্বারা অনেকগুলি নূতন যৌগিক আবিষ্কৃত হয় এবং তাদের আণবিক গঠন সম্বন্ধেও মূল্যবান তথ্য জানা যায়। রাসায়নিক গবেষণার পূর্বেই শারীরবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, শুক্রাশয় আর ডিম্বাশয়ের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় কতকগুলি হার্মোনের দ্বারা। শারীরবিজ্ঞানী-দের গবেষণাসমূহের মধ্যে অ্যাসাম আর জোন্‌-ডাকের তত্ত্বটি রসায়নবিদদের কাছে মূল্যবান। পরীক্ষার ফলে জোন্‌ডাক দেখতে পান যে, পিটুই-টারী গ্রন্থি নিষ্কাশন ছাড়াও স্ত্রী যৌন-হর্মোন গর্ভবতী নারীর মূত্রের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়। যৌন-হর্মোনগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা—এস্‌ট্রোন জাতীয়, প্রজেস্‌টেরন জাতীয় এবং অ্যানড্রোজেন জাতীয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন রসায়নাগারে হর্মোন সম্বন্ধীয় রাসায়নিক গবেষণা চলছিল। তাই ডইশি, বুটেনান্ড্‌ এবং লেকার কর্তৃক ১৯২৯ সালে প্রায় একই সময়ে এস্‌ট্রোন আবিষ্কার হয়। এস্‌ট্রোন জাতীয় হর্মোনগুলির মূল যৌগিক এস্‌ট্রোন। গর্ভবতী নারীর পঁচিশ হাজার লিটার মূত্র থেকে মাত্র ২৫ মিলিগ্রাম হর্মোন তৈরী হয়েছিল। কমপক্ষে এস্‌ট্রোন এবং এই জাতীয় আরও চারটি যৌগিক নারীদেহের যৌনচক্রের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এগুলির নাম হচ্ছে এস্‌ট্রাডাই-অল, এস্‌ট্রাট্রাইঅল, ইকুইলিন এবং ইকুইলেনিন। আণবিক গঠন হিসাবে এরা সমগঠিত। ১৯৪৮ সালে অ্যানা এবং মাইসারের সংশ্লেষণের ফলে এস্‌ট্রোনের আণবিক গঠন সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান হয়েছে। প্রাকৃতিক এস্‌ট্রোন জাতীয় যৌগিক ছাড়াও সংশ্লেষিত এস্‌ট্রোন জাতীয় যৌগিক সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। ষ্টিল্‌বাস্ট্রোল হচ্ছে তাদের একটি। অ্যানিথোল হাইড্রোব্রোমাইড দিয়ে আরম্ভ করে রবিনসন প্রমুখ রাসায়নিকেরা এই যৌগিকটি সংশ্লেষণ করেছেন।

১৯৩৪ সালে পৃথিবীর চারটি গবেষণাগার থেকে নারীদেহের আর এক জাতীয় হর্মোন প্রজেস্‌টেরনের আবিষ্কার হয়। পৃথিবীর বিখ্যাত রাসায়নিকদের মধ্যে বুটেনান্ড্‌ এবং শ্লটা, অ্যালান এবং উইন্‌টের-ষ্টাইনার, হার্টম্যান এবং ভেটেষ্টাইন প্রভৃতি সকলেরই দান ছিল এই আবিষ্কারে। বিভিন্ন উপায়ে এই যৌগিকটি সংশ্লেষিত হয়েছে। বুটেনান্ড্‌ এই যৌগিকটি 3β-হাইড্রক্সি-Δ^5-বিস্‌নরকোলেনিক অ্যাসিড থেকে সংশ্লেষণ করেছিলেন। ব্যাপক উৎপাদনে সয়াবিন তৈল থেকে 3β-হাইড্রক্সি-Δ^5-বিস্‌নরকোলেনিক অ্যাসিড তৈরী করে বুটেনান্ডের

পদ্ধতিতে প্রজেস্টেরন তৈরী করা হয়। এছাড়া মাইষ্টার এবং মাইসারের পদ্ধতিতে প্রজেস্টেরন তৈরী একটা আধুনিক উপায়।

পুরুষদেহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে অ্যানড্রোজেন জাতীয় হর্মোনের উপর। অ্যান্ডেষ্টেরন এই জাতীয়। ১৯৩১ সালে পনেরো মিলিগ্র্যাম অ্যান্ডেষ্টেরন পাওয়া গিয়েছিল পনেরো হাজার লিটার মূত্র থেকে। অ্যান্ডেষ্টেরনের আণবিক গঠনের সমস্যা সমাধান করতে রুজিকা কোলেষ্টেরল থেকে অ্যান্ডেষ্টেরন প্রস্তুত করেন।

পদ্ধতিতে। সংশ্লেষণের ফলে টেস্টোষ্টেরনের আণবিক গঠনের সমস্যা নিয়ে রাসায়নিকদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

অ্যাড্রিন্যাল করটেক্সের হর্মোনগুলির সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হলো ১৯৩৫ সালের পর থেকে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিবিহীন কুকুরের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছিল, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির নিষ্কাশন ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ার পর। এই পরীক্ষামূলক ঘটনা থেকে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির করটেক্সের হর্মোনের রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হয়। কেণ্ডাল, রাইসেষ্টাইন,

থাইরক্সিনের দানাদার রূপ

১৯৩৫ সালে আমষ্টার্ডামের রসায়নবিদ লেকার পুরুষের জননগ্রন্থির হর্মোন টেস্টোষ্টেরন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। প্রথম রাসায়নিক গবেষণায় একশ' কিলোগ্র্যাম ষাড়ের জননগ্রন্থি থেকে মাত্র দশ মিলিগ্র্যাম টেস্টোষ্টেরন প্রস্তুত হয়েছিল। বিভিন্ন উপায়ে টেস্টোষ্টেরন সংশ্লেষিত হয়েছে; তার মধ্যে ম্যামলির পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক। অ্যান্ড্রোজেন জাতীয় একটি যৌগিক ডিহাইড্রোএপি অ্যান্ডেষ্টেরন থেকে জারণ এবং বিজারণ প্রক্রিয়ায় টেস্টোষ্টেরন সংশ্লেষিত হয় এই

উইন্‌টেরষ্টাইনারের গবেষণার ফলে অনেকগুলি হর্মোনের আবিষ্কার হয়। হর্মোনগুলি গ্রন্থির করটেক্সের অন্তঃক্ষরিত যৌগিক; কিন্তু প্রস্তুত-প্রণালীতে সমগ্র অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিকে অ্যাসিটোন দিয়ে নিষ্কাশিত করা হয়। এর ফলে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যায়। অ্যাসিটোন নিষ্কাশনকে জল দিয়ে সিক্ত করা হয়। জলীয় নিষ্কাশন গিরার্ড বিকারকের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে গিরার্ড-যৌগিক সৃষ্টি করে। গিরার্ড-যৌগিককে রঞ্জন বিশ্লেষণ (Chromatography) করে বিভিন্ন হর্মোন আলাদা করা হয়।

এই জাতীয় হার্মোনগুলির মূল যৌগিক কর্টিকোষ্টেরন। এক হাজার পাউণ্ড ষাঁড়ের গ্রন্থি থেকে মাত্র ৩৩৩ মিলিগ্র্যাম কর্টিকোষ্টেরন পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৩৮ সাল থেকে ডেসঅক্সি কর্টিকোষ্টেরন সংশ্লেষিত হবার পর অ্যাড্রিন্যাল করটেক্সের হর্মোনগুলি চিকিৎসা-রসায়নে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই জাতীয় যৌগিকসমূহের মধ্যে কর্টিসোন অন্যতম। আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি ব্যাধিতে কর্টিসোন সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যাড্রিন্যাল করটেক্সের হর্মোনগুলি শর্করা বিপাকে অংশ গ্রহণ করে। দেহের সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম বিপাকের সমতা রক্ষা করতে এই হর্মোনগুলি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। আজকাল বিপাকীয় রসায়ন সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্যাদি জানা গেছে।

আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থি বিশেষভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। ইদানীং প্রতিপন্ন হয়েছে যে, দেহের অনেকগুলি হর্মোন কাজকরে পিটুইটারী থেকে ক্ষরিত হর্মোন দ্বারা উত্তেজিত হয়ে। ১৯৪০ সালের পর কয়েকটি পিটুইটারী হর্মোন স্ফটিক হিসাবে প্রস্তুত হয়েছে আর কতকগুলির স্ফটিক এখনও প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নি। পিটুইটারীর পুরোভাগের ছয়টি হর্মোন আলাদা করা হয়েছে। যৌগিকগুলির প্রত্যেকটিই প্রোটিন জাতীয়। থাইলাক্যানট্রিন বা এফ. এস. এইচ এবং মেটাক্যানট্রিন বা আই. সি. এস্. এইচ যুগ্ম প্রোটিন; অপরগুলি সরল প্রোটিন।

যে সব পিটুইটারী হর্মোনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যৌন হর্মোনগুলি কাজ করে তাদের নাম হচ্ছে থাইলাক্যানট্রিন বা এফ. এস. এইচ, মেটাক্যানট্রিন বা আই. সি. এস. এইচ এবং প্রোল্যাকটিন। স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে প্রোল্যাকটিন অংশ গ্রহণ করে।

থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন পিটুইটারীর থাইরোট্রপিন নামক হর্মোন দ্বারা উত্তেজিত হয়ে কাজ করে। থাইরোট্রপিন স্ফটিক হিসাবে প্রস্তুত হয় নি। পিটুইটারীর গ্রোথ-হর্মোনের দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয় আর এ, সি. টি. এইচ দ্বারা অ্যাড্রিন্যাল করটেক্সের হর্মোন-ক্ষরণ প্রভৃতি প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন, প্যারাথর্মোন গ্রন্থি নিষ্কাশন হিসাবে প্রস্তুত হয়েছে। ক্যালসিয়াম এবং ফস্ফেট বিপাক নিয়ন্ত্রণে প্যারাথর্মোন অংশ গ্রহণ করে। প্যারাথাইরয়েড বিহীন প্রাণীকে প্যারাথর্মোন ইন্জেক্সন দিয়ে রক্তের ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থিবিহীন প্রাণীর রক্তের স্বল্পতা লক্ষিত হয় কিন্তু প্যারাথর্মোন ইন্জেক্সন করলে রক্তের ক্যালসিয়াম পূর্বের ঘনত্বে ফিরে আসে।

এছাড়া পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাদভাগের হর্মোনও আজকাল প্রস্তুত হয়েছে।

জৈব-রসায়নের এই নূতন অধ্যায় গত পঞ্চাশ বছরের গবেষণার ফলে নতুন নতুন তথ্যাদি উদ্ঘাটন করেছে। এর মধ্যে গত সাতাশ বছরের গবেষণা যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর্যায়ে ধরা যেতে পারে। হর্মোন রসায়নের গবেষণার ফলে জটিল সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছে রাসায়নিকদের আর তার সমাধানের ফলে সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ রসায়ন বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন দেশের রসায়নবিদদের যুক্ত প্রচেষ্টায় হর্মোন রসায়নের অনেক সমস্যা সমাধান হয়েছে এবং এতে শারীরবিজ্ঞানীদের দান রয়েছে প্রচুর। মোট কথা শারীরবিজ্ঞানী এবং রসায়নবিজ্ঞানীদের যুক্ত প্রচেষ্টায় দৃঢ় ভিত্তির উপর বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষি-রসায়নের একদিক

শ্রীসুবর্ণকমল রায়

আজকাল পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রাণিবিদ্যা; কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির পরস্পরের মধ্যে সীমা রেখা যেন ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। তত্ত্বগতভাবে একথা যেমন সত্য, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহা সমভাবেই প্রযোজ্য। আজ রাসায়নিক ও কৃষক যদি হাত ধরাধরি করিয়া না চলেন তবে পৃথিবীর খাদ্যাভাবের দুর্গতি কোনদিনই অপনীত হইবে না। একদিন ছিল, কৃষক ক্ষেত চাষ করিয়া জল সেচন ও বীজ বপন করিত। ইহাতেই ফসল হইত, ফল ফলিত। কৃষিবিদ্যার এইটুকুই ছিল পরিচয়। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল, জমির উর্বরতা কমিয়া যাইতেছে। তখন সার প্রয়োগ করিবার কথা উঠিল। কৃষকের মনের মধ্যে রাসায়নিকের বুদ্ধি উঁকি মারিতে লাগিল। গোবর, মাটি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ দ্বারা সারের কাজ চলিতে লাগিল। এদিকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির জয়যাত্রা দিকে দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কৃষক সারের জন্য রাসায়নিকের দ্বারস্থ হইল। উভয়ের মধ্যে এই প্রথম সংযোগ ঘটিল। ভারে ভারে কৃত্রিম সার প্রস্তুত হইয়া কৃষকের ঘরে প্রবেশ লাভ করিল। বর্তমানে রাসায়নিক সার শস্যবৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইহাতে কৃষক আকাঙ্ক্ষিত শস্যবৃদ্ধির পূর্ণযোগ পাইল না। কারণ তাহারা শস্যাদি ও বৃক্ষলতাকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া বিফল মনোরথ হইল। কৃষিবিদ্যার সীমারেখা আবার বিপর্যস্ত হইতে চলিল। কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় হইতে শস্য, ফল ও পুষ্পাদি রক্ষা করিতে হইলে রাসায়নিকের সাহায্য অপরিহার্য। এই শেষোক্ত ব্যাপারে কৃষিবিদ্যায় রসায়নের দান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

পোকা-মাকড় ও পতঙ্গাদি ধ্বংস করিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—লেড আর্সেনেট, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট, গন্ধক, চুন-গন্ধক, বোর্ডো-মিক্‌চার, কেরোসিন তেল ইত্যাদি। বর্তমানে কতকগুলি কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের কার্যকারিতা খুবই বেশী। ইহাদের মধ্যে ডি-ডি-টির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উক্ত পদার্থগুলি প্রয়োগ করিবার প্রণালী বিভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের জলে মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষাদির উপর ছিটাইয়া দেওয়া হয়; অথবা শুষ্ক চূর্ণ হিসাবে ছড়ানো হয়। আজকাল শেষোক্ত প্রণালীটিই বেশী অবলম্বিত হইতেছে। শস্যাদি রক্ষায় এই রাসায়নিক ব্যবস্থা এরূপ সাফল্য অর্জন করিয়াছে যে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা এভাবে রক্ষিত ফল ছাড়া অপর ফল মোটেই পছন্দ করে না।

কীটঘ্ন পদার্থগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—১। পাকস্থলীর বিষ—এই বিষ লতাপাতার সঙ্গে গ্রহণ করিয়া কীট-পতঙ্গেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেমন—ক্যালসিয়াম আর্সেনেট, লেড আর্সেনেট, প্যারিস গ্রিন প্রভৃতি বহু জাতীয় পদার্থ। ২। স্পর্শবিষ—এই বিষের সংস্পর্শে আসিলেই কীটাদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চুন-গন্ধক, নিকোটিন চূর্ণ, কেরোসিন অবদ্রব বা ইমালসন এই পর্যায়ের জিনিষ। ৩। ধূম্রাকার রাসায়নিক পদার্থ—যেসব ক্ষেত্রে অপর জাতীয় পদার্থ ক্রিয়াশীল হয় না (যেমন গোলাঘরে প্রচুর সঞ্চিত শস্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে) সেসব ক্ষেত্রে এগুলিকে ব্যবহার করা হয়। কার্বন ডাইসালফাইড, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ইত্যাদির গ্যাস এসব ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রদর্শন করে।

ক্যালসিয়াম আর্সেনেট ও লেড আর্সেনেটের ব্যবহার আজকাল খুব বেশী চলিয়াছে। এগুলি চূর্ণরূপে এরোপ্লেন হইতে তুলার ক্ষেতে ছড়ানো হয়। কখনও কখনও এই কাযের জন্ত ট্র্যাক্‌টরের সাহায্য লওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টাটাগাট ও আর্কানাস নামক দুইটি স্থানের যুক্ত ব্যবস্থায় একটি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। উহারা ১৮টি উড়োজাহাজের দ্বারা সর্বত্রই এই বিষ ছড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। উড়োজাহাজ হইতে পরিবেশন করিলে চূর্ণ সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সুসম্পন্ন হয়। চূর্ণ ছড়াইবার জন্য উড়োজাহাজগুলি প্রয়োজনবোধে গাছপালা হইতে মাত্র ৩ ফুট উঁচুতেও উড়িয়া থাকে।

১৯৪৪ সালে লেড আর্সেনেট ও ক্যালসিয়াম আর্সেনেট প্রস্তুতির পরিমাণ ছিল, যথাক্রমে ৪৫৩৫'২ টন ও ৬৮৮৪৮ টন। জলমিশ্রিত চূর্ণ ছড়াইবার প্রণালীতে সাধারণতঃ ১ পাউণ্ড চূর্ণ ৫০ গ্যালন জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় (০'২৫ পার্সেন্ট)। এই ব্যাপারে একটা পাম্প ও একটা ট্যাঙ্ক লাগে এবং ট্র্যাকটরের সাহায্যে সর্বত্র পরিবেশিত হয়। কেহ কেহ প্যারিস গ্রিনও ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহার ব্যবহারের পরিমাণ উহাদের চেয়ে কম। আলু রক্ষার জন্ত কোন কোন কৃষক ইহাই বেশী ব্যবহার করে।

স্পর্শবিষ নরম দেহবিশিষ্ট কীট-পতঙ্গের জন্ত ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় বিষ প্রয়োগ করিলে পোকাগুলির চামড়ার ছিদ্র বন্ধ হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। চুন-গন্ধক, নিকোটিন, সাবান জল, কেরোসিন তেল প্রভৃতি এইভাবে ব্যবহৃত হয়। ডি-ডি-টি, রটিনোন, পাইরিথ্রাম প্রভৃতি নব্য রাসায়নিক পদার্থগুলি কীটাদির চর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাদের ধ্বংস করে।

চুন-গন্ধক জলের সঙ্গে স্প্রে হিসাবে অথবা চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। চুনের দুধজলের সঙ্গে গন্ধক মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে একটি পিঙ্গলবর্ণের তরল পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাকে ছাঁকিয়া প্রয়োজনমত জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যায়। চুন-গন্ধকের চূর্ণও ব্যবহৃত হয়। বৎসরে ইহার ব্যবহারের পরিমাণ ১০ মিলিয়ন গ্যালন।

শুষ্ক তামাক পাতা ও ডাঁটা হইতে নিকোটিন সালফেট তৈয়ারী হয়। ইহার শতকরা ৪০ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া বাজারে চালান দেওয়া হয়; কিন্তু ব্যবহারের সময় আরও জল মিশ্রিত করিয়া ইহাকে প্রায় শতকরা ০'০৬ ভাগে পরিণত করিয়া ব্যবহার করা উচিত। এই জিনিষটি ঘরেও তৈয়ার করা যায়। তামাক পাতার ডাঁটা জলে ভিজাইয়া সেই জল প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। আবার ডাঁটা চূর্ণ করিয়া ইহার সঙ্গে জীপসাম, কেয়োলিন বা চুন মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ হিসাবে ব্যবহারের প্রচলন আছে।

সাবান জলের জন্য যে সাবান ব্যবহৃত হয় তাহা সাধারণতঃ মৎস্যতৈল হইতে প্রস্তুত হয়। ১ পাউণ্ড সাবান ৪ গ্যালন জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারের বিধি আছে। সাবান জল সময় সময় নিকোটিন জল ও আর্সেনেটের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহৃত হয়।

কেরোসিন তৈল বা এই জাতীয় অন্যান্য তৈল আজকাল কীটনাশক হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আধ পাউণ্ড সাবান এক গ্যালন জলে মিশ্রিত করিয়া ২ গ্যালন কেরোসিন তৈল গরম অবস্থায় যোগ করিতে হয়। পরে জোরে নাড়াচাড়া দ্বারা অবদ্রব বা ইমালসনে পরিণত করিয়া কার্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

পাইরিথ্রাম, রটিনোন সাধারণতঃ চুন অথবা উহাদের নির্যাস তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ১৯৪৬ সালে পাইরিথ্রাম প্রস্তুতির পরিমাণ ছিল ৬৩৭০ লক্ষ টন। ইহাদের বেশীর ভাগ মার্কিন মুল্লুকে যায়। এই জিনিষটা অতি সত্বর পোকাকে অসাড় করিয়া ফেলে; এইজন্য স্প্রে হিসাবে ইহার

ব্যবহার ডি-ডি-টি হইতেও বেশী। রটিনোন ব্রিটিশ-মালয় ও ইন্দোনেশীয়াতে চাষ হয়। মূলচূর্ণ ট্যালকামের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

ডি-ডি-টি একটি কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ। ইহার দ্রবণ স্প্রে হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা মশা, মাছি প্রভৃতির ভয়ানক শত্রু। ডি-ডি-টি সাধারণতঃ জলে মিশ্রিতাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ইহা পতঙ্গ, লার্ভা, পরজীবী ও অন্যান্য প্রায় সকল প্রকার পোকা-মাকড় ধ্বংস করিতে পারে। গত যুদ্ধে ইহার দ্বারা কত জীবন যে রক্ষা পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সৈন্যদের পোষাক-পরিচ্ছদে ডি-ডি-টি স্প্রে করিয়া দেওয়া হইত, যাহাতে উকুন এবং টাইফাস প্রভৃতি জীবাণু আক্রমণ করিতে না পারে। বদ্ধজলে ইহা ছড়াইয়া দিয়া মশার বাচ্চা ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়ার উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকাতে ১৮৪৮ সালে ইহার প্রস্তুতির পরিমাণ ছিল ১৮,৩৪৬৭২৭ পাউণ্ড।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ধূম্রাকার পদার্থ গম প্রভৃতি স্তূপীকৃত শস্যাদি সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। কার্বন ডাইসালফাইড উহাদের উপর ঢালিয়া সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিলে পোকা-মাকড় ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু বাতাসের সঙ্গে কার্বন ডাইসালফাইডের মিশ্রণ বিস্ফোরক হিসাবে কাজ করে ; সুতরাং ইহার ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হয়। আজকাল ইহার পরিবর্তে ইথাইল অ্যাসিটেট ও কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইডের মিশ্রণ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা অতি সত্বর বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং অনুরূপ ফল প্রদান করে।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড অপর একটি ধূম্রাস্ত্র। ইহা মানুষের পক্ষে ভয়ানক বিষাক্ত হইলেও নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। এই গ্যাসটি সাইট্রাস বা লেবু জাতীয় বৃক্ষাদিতে প্রয়োগ করা হয়।

বিভিন্ন জাতীয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছত্রাক, উদ্ভিদ ও ফলাদির যেরূপ ক্ষতি করে পতঙ্গাদি তত ক্ষতি করিতে পারে না। কারণ একবার রাজত্ব বিস্তার করিলে ইহাদের সমূলে ধ্বংস করা কঠিন। রাসায়নিক পদার্থ পর্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়। আক্রমণের প্রারম্ভে যদি উহাদের নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা যায় তবেই নিশ্চিতভাবে উহাদের দূরীভূত করা সম্ভব। কাজেই ছত্রাক যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট রাখা দরকার। এ সমস্ত কারণে অনেক সময় নার্সারিতে বীজাদির উপরই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হয়। ছত্রাক-নাশকদের মধ্যে গন্ধক, বর্ডো-মিক্‌চার, চুন-গন্ধক, ফরম্যালডিহাইড, কারোসিভ সাব্লিমেট প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ ব্যবহৃত হয়। গন্ধক ব্যবহারের রীতি সব দেশেই আছে। আমেরিকায় বর্ডো-মিক্‌চার সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। ইহা তুঁতে ও চুনের মিশ্রণ। ৪ পাউণ্ড তুঁতে ও ৪ পাউণ্ড সদ্য প্রস্তুত চুন ২৫ গ্যালন জলে আলাদা আলাদা মিশ্রিত করিয়া একত্র করিলে বর্ডো-মিক্‌চার হয়। ইহা প্রয়োজনমত স্প্রে করিয়া ছড়াইতে হয়। ফরম্যালডিহাইড দ্রবণ দ্বারা আলু, ওট্, পিঁয়াজ প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়। এক পাইট ফরম্যালিনে (শতকরা ৪০ ভাগ) ৩০ গ্যালন জল ঢালিয়া দুই ঘণ্টা বীজ ভিজাইয়া রাখিলে বীজগুলি ছত্রাক মুক্ত হয়।

শারীরবিদ্যায় সংজ্ঞান অবস্থা

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত

শারীরবিদ্যায় সংজ্ঞান অবস্থাগুলির বিষয় সাধারণভাবে বিবৃত করিতে হইলে কয়েকটি চিন্তনীয় ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অবস্থান স্থল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে সংজ্ঞান অবস্থার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

কখন কখন এইরূপ বলা হয় যে, যকৃৎকোষের সক্রিয়তা হইতে যেমন পিত্তরসের উদ্ভব হয়, পেশীতন্তুর সক্রিয়তা হইতে যেরূপ সংকোচনের আবির্ভাব হয়, স্নায়ুকোষের সক্রিয়তা হইতেও সেরূপ সংজ্ঞান অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু সম্যক পর্যালোচনার ফলে এরূপ তুলনায় কোন যুক্তি পাওয়া যায় না।

ইহা সত্য যে,

(১) বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্বরূপ প্রকাশ নির্ভর করে গুরুমস্তিষ্কের সর্বোচ্চ স্তরের বিভিন্ন নির্দেশোপযোগী স্থানের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার উপর।

(২) অ্যাল্‌কোহল, ক্যাফিন, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি কতকগুলি ঔষধ সজীব পদার্থের উপর যেসব ক্রিয়া করে তাহার সহিত আমাদের পরিচয় আছে। সংজ্ঞান অবস্থার উপরেও তাহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) মস্তিষ্কের রোগ অথবা অপূর্ণ গঠনের ফলে বুদ্ধির বিলোপ অথবা বিকার ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু যেহেতু সংজ্ঞান অবস্থার স্বরূপ প্রকাশের জন্য স্নায়ুর সহায়তা আবশ্যক, সেহেতু ঐ স্নায়ুগুলিই ঐ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে, এরূপ মনে করা ভুল। বহু দার্শনিক কিন্তু এবিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সজীব পদার্থের সক্রিয়তা হইতে মনের সৃষ্টি: হইয়াছে—এরূপ না ভাবিয়া তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সজীব অথবা নির্জীব সকল পদার্থই মনের সক্রিয়তা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, মন যদি সক্রিয় না থাকিত তাহা হইলে কোন ধারণাও হইত না। এমন কি—শব্দ, বর্ণ, শক্তি, ভার ও কাঠিন্য ইত্যাদি গুণাবলীর অস্তিত্বও উপলব্ধি করা যাইত না।

পিত্তরস যকৃতের দ্বারা ক্ষরিত হয়—এই উক্তি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। এক্ষেত্রে উৎপন্ন বস্তুটি ভৌতিক এবং শরীরের অভ্যন্তরে রাসায়নিক ও ভৌতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইয়াছে। যদি আমরা বলি, সংজ্ঞান মস্তিষ্কের দ্বারা ক্ষরিত হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা দুইটি বিভিন্ন অদ্ভুত ব্যাপারকে একত্র সংযুক্ত করিতে চাহিতেছি; অর্থাৎ মনোবিদ্যা উভয়কে একত্র গ্রথিত করিয়া একটি দুর্বোধ্য সংযোগ সাধনে অগ্রসর হইতেছে।

অতএব দেহের আভ্যন্তরীণ সক্রিয়তা হইতে মনের সক্রিয়তার উদ্ভব হয়—একথা না বলিয়া এইটুকু বলিলেই সমীচীন হইবে যে, উভয়ের ক্রিয়া সমান্তরালভাবে চলিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই দেহ-মনের সহচারবাদের (Psycho-physical parallelism) ধারণা হইতে শারীরবিদ্‌গণ তাঁহাদের কর্মক্ষেত্রে অনেক কিছু অনুমান করিতে পারিয়াছেন। মস্তিষ্ক মনের উপর ক্রিয়া করে, না মনই মস্তিষ্ককে চালনা করে? ইহাদের মধ্যে কে প্রভু এবং কেই বা ভৃত্য? এই প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

শুধু এইটুকু বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, উহাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। শারীরতত্ত্ববিদের কাজ হইল, স্নায়ুতন্ত্রের প্রক্রিয়াগুলির অনুসন্ধান করা এবং স্নায়ু-সংস্থানের কোন্ কোন্ অংশগুলি বিবিধ সংজ্ঞান অবস্থার প্রক্রিয়া বিকশিত করে, তাহা নির্ধারণ করা।

মস্তিষ্কের বিবিধ অংশের কার্যগুলি যত সুষ্ঠু-ভাবেই নির্ধারিত হউক না কেন, শারীরিক এবং মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ নিরূপণ করা এখনও সম্ভব হয় নাই। দেহের প্রত্যেকটি স্নায়ু-কোষের স্বভাবনির্দিষ্ট কার্যগুলি জানা সম্ভব হইলেও স্থুল দেহ ও সূক্ষ্ম মনের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে এতটুকু খর্ব করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। শুধু মস্তিষ্কের কার্যগুলি অনুধাবন করিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেহ ও মনের সমান্তরাল ক্রিয়ার দুইটি বিভিন্ন ধারা যেন তালগোল পাকাইয়া বিভ্রমের সৃষ্টি না করে। মানসিক এবং শারীরিক ধারা এক নয়। দুইয়ের প্রভেদ বুঝিয়া চলিতে হইবে। শারীরবিদ্যা ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক হইল, যেমন একটি বস্তু এবং অপরটি তাহার বিম্ব। বস্তুর সহিত বিম্বের বিভ্রম হওয়া উচিত নহে। স্নায়ু-তন্তুর দ্বারা সংবেদন (উত্তেজনার পরিবর্তে) বাহিত হয়, একথা বলিলে ভুল হইবে এবং দুইটি সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র বিজ্ঞানকে বিভ্রমের দ্বারা অস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

মনোবিদ্‌গণ সংজ্ঞানের স্বরূপ প্রকটনের নিমিত্ত তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ণয় করিয়াছেন। যথা,—(১) জ্ঞানবিষয়ক, (২) রাগবিষয়ক ও (৩) কাম-বিষয়ক। জ্ঞানবিষয়ক পদ্ধতির দ্বারা আমরা কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হই। রাগ-বিষয়ক পদ্ধতির দ্বারা আমাদের সংজ্ঞান অবস্থা—হর্ষ, বিরাগ, বিষাদ ইত্যাদির সহিত সুর বাঁধিয়া লই। কামবিষয়ক পদ্ধতি কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসকালে সূচিত হয়। প্রত্যেক সংজ্ঞান অবস্থায় উপরোক্ত তিনটি ধারা বিদ্যমান থাকে; কিন্তু তাহাদের আপেক্ষিক উত্থিতির তারতম্য সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—অনুভূতি, স্মৃতি এবং কল্পনার মধ্যে জ্ঞান-বিষয়ক উপাদান অগ্রবর্তী থাকে আর প্রেম, দুঃখ ও সংশয় ইত্যাদিতে রাগজনিত উপাদান সমধিক বর্তমান থাকে। অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় কামবিষয়ক উপাদান সহজে দৃষ্ট হয়। শারীরবৃত্তে রাগ এবং কাম সম্বন্ধে আলোচনা করিব না; মনোবিজ্ঞান অথবা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে ইহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবৃতি পাওয়া যাইবে।

কিন্তু সংজ্ঞান অবস্থা বলিতে বহির্বিষয়ক এবং অন্তর্বিষয়ক পার্থক্যের তুলনাও ইহার অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। এই অন্তর্বহিঃ সম্বন্ধের অস্তিত্ব হইতে একটি অহমের (Ego) সক্রিয়তার কথা জানিতে হইবে। অহম্ জ্ঞানী, রাগাসক্ত ও কামী হইয়া সংজ্ঞান অবস্থাগুলিকে ভোগ করিতেছে। বস্তুতঃ কোন সংজ্ঞান অবস্থাই সম্ভব নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অহম্ তাহাকে জানিতে অথবা বুঝিতে পারে। সংজ্ঞান অবস্থা তাহার আত্মপ্রকাশকালে অহম্ অর্থাৎ Ego-র সহিত মিলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া যায়, অথবা Ego র পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা ব্যক্ত হয় এবং স্বয়ং Ego-কেও পরিবর্তন করিয়া দেয়। এইরূপে Ego অর্থাৎ অহম্ নিয়ত পরিবর্তন সাধন করিতেছে ও নিজে স্বীয় সংজ্ঞান অবস্থা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং সংজ্ঞান অবস্থাগুলিকে স্বাধীন এককরূপে গণ্য করা যায় না। মন তাহার সহকর্মী দেহের স্নায়ু-সংস্থানের মত এত জটিল বিশেষত্ব কিংবা বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এককরূপে কাজ করিয়া যাইতেছে।

একদিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে সংজ্ঞানের অবস্থাগুলি বুঝাইয়া বলা সহজ নহে। সংজ্ঞানের সার বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা সংজ্ঞানের

পরিবর্তন এবং ভূত-ভবিষ্যতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। অবস্থা বলিতে একটি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন বিরতি বুঝায়। এই অসুবিধা ছাড়া সংজ্ঞান অবস্থাকে ধারণা করা যাইতে পারে, যেন সে একটি আড়াআড়িভাবে খণ্ডিত প্রবহমান ধারা। এই উপমা অবশ্যই কার্যকরী হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সংজ্ঞান অবস্থার বিভিন্ন স্তরগুলিকে প্রকট করিবার জন্য আমাদিগকে সহায়তা করিবে। যে কোন মুহূর্তে একটি অংশ সর্বদাই আমাদের কেন্দ্রগত অথবা সংজ্ঞার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল থাকে, আবার অপর অংশটিতে আমাদের সংজ্ঞা অস্পষ্ট অথবা অবলুপ্ত থাকে। কিন্তু যে কোনও সময়ে উহার বিষয়ে আমরা সংজ্ঞা পাইতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, এই লাইন কয়টি লিখিবার অথবা পড়িবার কালে ঘরের দেয়ালে ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ কিংবা দাঁতের মধ্যে পাইপের চাপ আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। সংজ্ঞানের ধারা বহিয়া যাইতেছে বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায়; উপরিভাগে উঠিয়া আসিতেছে, আবার অন্য অংশ নিম্নে চলিয়া যাইতেছে, কখনও বা সংজ্ঞানের প্রান্ত ছাড়াইয়া আরও নীচে ডুবিয়া যাইতেছে।

বলিতে গেলে সংজ্ঞানের ধারা এক হিসাবে সঠিক। যে কোন মুহূর্তে, সম্ভবতঃ অগণিত ধারা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রবাহিত হইয়াও একটি একক ধারার রূপ গ্রহণ করিতে পারে। এই পূর্ণাঙ্গীন সক্রিয়তার নাম দেওয়া হইয়াছে Ego বা অহম্‌। বিভিন্ন ধারাগুলি যে কোন সময়ে একটি প্যাটার্নের সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই প্যাটার্ন ধারা প্রবাহের ন্যায় যত্রতত্র বিরামহীন রূপে পরিবর্তিত হইতেছে।

শারীরবৃত্তে এই ধারাগুলির সাদৃশ্য পাই স্নায়বিক উত্তেজনার প্রবাহগুলির মধ্যে, যেগুলি নিয়ত মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া চলাচল করিতেছে। এই ধারাগুলির প্যাটার্ন তেমনিভাবে সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। আমরা ধরিয়া লইতে পারি—কতকগুলি প্যাটার্ন যুগপৎ আবির্ভূত অন্য প্যাটার্নের সহিত খাপ খায় না, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর বিরোধী। এইরূপে আমরা অবতেজনার মূল ভিত্তি সম্বন্ধে একটি শারীরবৃত্তীয় ধারণা উপলব্ধি করিতে পারি। যে প্যাটার্ন অবতেজনা করে এবং যে প্যাটার্ন অবতেজিত হয়, ইহারা উভয়ে একসঙ্গে থাকিতে পারে না। আবেষ্টনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া অথবা মানাইয়া চলিবার জন্য ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে।

আমরা ধরিয়া লইতে পারি, সংজ্ঞানের সম্পর্কে শারীরবৃত্তের অবস্থা হইল প্রতিরোধমূলক, যাহা স্নায়ু প্রবর্তনাকে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। বাধা যখন তীব্র হয়, সংজ্ঞান তখন বিরাজ করে; আবার বাধা চলিয়া গেলে, সংজ্ঞানও থাকে না। নূতন কোন কার্য (যেমন, সাইকেল চড়া অথবা টাইপ করা) শিখিবার সময় প্রতিবন্ধকতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহা তীব্রই হইয়া থাকে। কিন্তু নূতন কার্যটি বারংবার করিতে থাকিলে বাধা কমিয়া যায় এবং উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন সংজ্ঞানের অনুপস্থিতিতেও শিখিবার প্রথম অবস্থায় যেরূপ করা হইত তাহা অপেক্ষা আরও নিশ্চিন্তভাবে ও দ্রুতগতিতে করা যাইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে, এই কম বাধার ধারণাটি বিনা প্রমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা এমন কোন প্রমাণ পাই নাই যাহাতে বলিতে পারি, স্নায়ুর কোন্‌ অংশ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে; কিন্তু বুঝিতে পারি—দুইটি ডেনড্রাইটের বর্ধিত অংশগুলি যেখানে সম্মিলিত হয়, এমনই একটি স্থানে ইহার উৎপত্তি।

পূর্বে বলা হইত, একটি কার্য যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন আর তাহা সংজ্ঞানের সহগামী থাকে না। স্নায়ু-প্রবর্তনাগুলি মস্তিষ্কের উন্নত অংশগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া নিম্নে অথবা সুষুম্না-কাণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লাভ করে। এই ধারণা

ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে, স্নায়ু-প্রবর্তনা নিজের পথ বাহিয়া অবশ্যই মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছায়। সংজ্ঞান কখনও থাকে, আবার কখনও থাকে না।

সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরে সংজ্ঞানের কোন স্থিতি আছে বলিয়া প্রমাণ নাই। ইহার অংশগুলির কাযকারিতাকে প্রতিবর্তিত ক্রিয়া বলে। সংজ্ঞানকে বাদ দিয়া এই ক্রিয়াগুলিকে তুলনা করা যাইতে পারে মস্তিষ্কের উন্নত অংশগুলির ক্রিয়াসমূহের সঙ্গে, যেগুলিকে অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করা হয়।

একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে প্রতিবর্তিত ক্রিয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উক্তি কবিতে পারা যাব। কোনও প্রতিবর্তন তন্ত্রেব একটি অন্তর্মুখ অংশকে যদি একটি পরিচিত উত্তেজনার দ্বারা স্পর্শ করা যায় তবে ঐ উত্তেজনার ফলে বহির্মুখ অংশে কি হইবে তাহা বলা যায়। অপব পক্ষে, সংজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনও অংশ ঐরূপ উত্তেজনায় কি করিতে পারে, তাহার ভবিষ্যৎ উক্তি প্রায়শঃ অসম্ভব। স্নায়ু-সংযোগগুলি এমনই জটিল যে, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। স্নায়ু-প্রবর্তনা নানাদিকে বহিয়া যাইতে থাকে, উহা দ্বারা পূর্ব হইতে কিছু অবধারণা করা সম্ভব নহে। সুতবাং বাহিবের আবেষ্টনেব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষ ঐরূপ এক উত্তেজনাব ফলে কিরূপ আচরণ করিবে তাহা বলা যায় না।

সাধারণতঃ বলা হয়, মৌলিক জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতাই হইল সংবেদন। শারীরবৃত্তেব দিক হইতে সংবেদনের জন্য চাই—

(১) একটি সংবেদীয় বহিরাবরণের দ্বারা আবৃত ইন্দ্রিয়স্থান, যাহা উত্তেজনা গ্রহণ করিবাব জন্য উপযোগী।

(২) সংবেদীয় স্নায়ুপথ, যাহা স্নায়ু-প্রবর্তনাকে বহন করিয়া অবশেষে উপস্থিত হয়—

(৩) মস্তিষ্কের সর্বোচ্চতলে অবস্থিত সংজ্ঞাকেন্দ্রে।

কিন্তু সংশয়ের কথা এই যে, মস্তিষ্কের সর্বোচ্চতলের সংজ্ঞাকেন্দ্রগুলি সংবেদনের স্থান কিনা? ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, তাহারা কেবল স্থান মাত্র; ইহাদের ভিতর দিয়া স্নায়বিক উত্তেজনাগুলি গমন করে; সেজন্য সেই সেই সংবেদনগুলির সৃষ্টি হইতে পারে।

সে যাহা হউক, শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রপথে চলিতে চলিতে খাঁটি সংবেদন অনুভব করা দুরূহ। খাঁটি সংবেদন অর্থে এমন একটা অভিজ্ঞতা বুঝায় যাহার কোন অর্থ নাই এবং ইহা অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। কেবল ইন্দ্রিয়স্থান, স্নায়ুতন্ত্র এবং সংজ্ঞাকেন্দ্রের উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু বহির্জগতের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য আমাদের অভিজ্ঞতাগুলির সৃষ্ট হয়। ইহা সত্য যে, আমাদের শৈশবে সংজ্ঞান অবস্থাগুলি অস্ফুট এবং অনির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু উহারা সবদাই পূর্ব অভিজ্ঞতার সহিত জড়িত এবং কায সম্পাদনের হেতু। তখন হইতেই উহারা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে। উহাদের আভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি বিশেষত্বের মর্যাদা অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে। প্রথমে যাহা ছিল এক জাতীয় ও এক প্রকৃতির, পবে তাহাই হয় বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন প্রকৃতির।

সুতরাং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত সংবেদনগুলি কোনও বস্তুর অনুভূতি প্রদান করিবার জন্য সমষ্টিগত হইয়া যায় এরূপ মনে করা ভুল। সত্য বটে পরিণত বয়সে একটি বস্তুর অনুভব কালে—যেমন কমলালেবুর নির্দিষ্ট বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি সংবেদনগুলি বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়; কিন্তু এক মুহূর্তের অনুধ্যানের দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, কমলালেবুর অনুভূতি সংবেদনগুলির ঘনিষ্ঠ সংশ্লেষণের দ্বারা সমুদ্ভূত হয় নাই। শৈশব হইতে অগ্রপথে চলিতে চলিতে জগৎটা আমাদের নিকট যাবতীয় বস্তুদ্বারা গঠিত বলিয়া মনে হয়। যে সংবেদনগুলিকে লইয়া আমরা এখানে আলোচনা করিতে চাহিতেছি, উহারা 'অহমের' বিশ্লেষণ ক্রিয়ার সমষ্টি।

সংবেদনগুলি আশু অভিজ্ঞতা হইতে সমুদ্ভূত হয় নাই এবং যথার্থ বস্তু-নিরপেক্ষ—এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়া আমরা উহাদের নানাবিধ প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব। সংবেদন-গুলি স্বাভাবিক গুণে এবং প্রকারে পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারাত্মক সংবেদনগুলি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্থান হইতে উদ্ভূত হয়। বিভিন্ন গুণাত্মক সংবেদনগুলির উদ্ভব কিন্তু একই ইন্দ্রিয়স্থান হইতে হইয়া থাকে। নীল ও হরিৎ হইল বিভিন্ন গুণাত্মক সংবেদন—ক্রমশঃ রূপান্তর দ্বারা এক হইতে অন্যটিতে পৌছান সম্ভব। উত্তাপ এবং কোলাহল উভয়ের প্রকার ভেদহেতু ক্রমবর্তন অসম্ভব।

বিশেষ বিশেষ গ্রাহক-ইন্দ্রিয়গুলি বিশেষ বিশেষ প্রবর্তনাগুলিতে সাড়া দিবার জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। কর্ণের গ্রাহক-ইন্দ্রিয় কেবল শব্দতরঙ্গে সাড়া দিতে পারে। নেত্রের গ্রাহক-ইন্দ্রিয়গুলি কেবল আলোকতরঙ্গে সাড়া দিতে পারে। ত্বকের ইন্দ্রিয়গুলি তাপ, শৈত্য, স্পর্শ ও বেদনার প্রবর্তনাতে সাড়া দিতে পারে। একটি গ্রাহক-ইন্দ্রিয় যে উত্তেজনায় সাড়া দিবার জন্য খাপ খাইতে পারে, সেই উত্তেজনাকে গ্রাহক-ইন্দ্রিয়ের পর্যাপ্ত উত্তেজনা বলা হয়। কিন্তু একটি গ্রাহক-ইন্দ্রিয় অন্য উত্তেজনা-গুলিতে সাড়া দিলে তাহাদের নাম হইবে অপর্যাপ্ত উত্তেজনা; যেমন নেত্রে আঘাত লাগিলে আলোকের দীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তপ্ত বস্তুর দ্বারা ত্বকের শীতল স্থান স্পর্শ করিলে শৈত্য অনুভূত হয়। জিহ্বার অনুভূতি স্থানে (papillae) বিদ্যুৎ-প্রবাহের স্পর্শে স্বাদের অনুভূতি হয়।

অতএব সংবেদনের প্রকার উত্তেজনার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। বরং সংবেদী যন্ত্র, যাহাতে উত্তেজনার প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহারই প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই ধারণা জে. মুলর্ তাঁহার 'বিশিষ্ট স্নায়ুশক্তি সূত্রে' আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক সংবেদীয় যন্ত্রের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে এবং সেই শক্তি উত্তেজনার দ্বারা উদ্বোধিত হয়। অবশ্য সেই উত্তেজনাকেও কার্যকরী হইতে হইবে।

শারীরবিজ্ঞানে এমন কোনও প্রমাণ নাই যদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, দৃষ্টিবহ স্নায়ু-তন্তু দিয়া যে প্রবর্তনা প্রবাহিত হয়, তাহার শক্তি শ্রুতিবহ তন্তুপ্রবাহ হইতে বিভিন্ন। ল্যাংলি এবং অন্যান্য গবেষকদের পরীক্ষামূলক কার্যে দেখা গিয়াছে যে, স্নায়বিক উত্তেজনা সকল স্নায়ুতে একইভাবে ঘটিয়া থাকে। সংবেদনের বিশিষ্ট শক্তি মস্তিষ্কের বিভিন্ন সংজ্ঞাকেন্দ্রে অবস্থান করিলে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, ঐ শক্তি তৎসম্পর্কিত ইন্দ্রিয়স্থানে সৃষ্ট হইবার কালে তেমন স্বাধীন নহে। জন্মাবধি একজন মনুষ্যের দৃষ্টি এবং শ্রুতির ইন্দ্রিয়-স্থানগুলি যদি বিকল থাকে তাহা হইলে সে কখনও দেখা অথবা শুনার কাল্পনিক চিত্র অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিতে পারে না, স্বপ্নও দেখে না।

গুণানুসারে বিভিন্ন সংবেদনগুলি বিভিন্ন গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় কিনা অথবা তাহারা একটি বিশেষ গ্রাহক-ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা হইতে সমুদ্ভূত কিনা তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। হয়ত প্রত্যেক গ্রাহক-ইন্দ্রিয়ের জন্য কয়েকটি মৌলিক সংবেদন আছে এবং বহু উপাদানের সংমিশ্রণে সংবেদনের বহু বিভিন্ন গুণাবলী সম্ভব হইয়া থাকে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, উত্তেজনার কম্পন অনুপাতে সংবেদনগুলির গুণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। শব্দলহরীর দ্রুত এবং ধীর কম্পনের দ্বারা তীব্র ও মৃদু সংবেদন হয়। আলোকতরঙ্গের দ্রুত এবং ধীর কম্পনের ফলে যথাক্রমে নীল ও লোহিত সংবেদনের উদ্ভব হয়। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ কম্পনের দ্বারা সম্ভবতঃ ঘ্রাণ, স্বাদ এবং তাপ সম্বন্ধীয় সংবেদনের অনুভূতি জন্মায়।

উত্তেজনা শক্তি (যেমন কম্পনের বিস্তার) দ্বারা সংবেদনের আর একটি প্রকৃতি নিরূপিত হইতে পারে। যেমন প্রাবল্য অথবা আতিশয্য, যাহার

জন্য সংবেদনগুলির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; যেমন শব্দের উচতা, আলোকের ঔজ্জ্বল্য।

সংবেদনের আর একটি প্রকৃতির নাম ব্যাপকতা। গন্ধ, স্বাদ এবং আরও কয়েকটি সংবেদনের ব্যাপকতা নাই। দৃষ্টি এবং স্পর্শ সম্বন্ধীয় সংবেদনে ইহার উদ্ভাবনা দেখিতে পাই। এই দুইটি সংবেদনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহা হইল স্থানীয় বিজ্ঞপ্তি। অক্ষিপট ও চর্মের উপর সর্বস্থানে সংবেদনের বিজ্ঞপ্তি কিংবা নিদর্শন পাওয়া যায় ও পাশাপাশি সংবেদনগুলির অনুভূতি পৃথক করিতে পারা যায়। ব্যাপকতা এবং স্থানীয় বিজ্ঞপ্তি—এই দুইটির উপর সাধারণতঃ আমাদিগের ব্যাপ্তি, আকৃতি ও স্থান সম্বন্ধীয় অনুভব গঠিত হয়।

সংবেদনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল সম্প্রসারণ অথবা প্রস্থতি (Protensity), যাহার উপর অনুভূতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং রাগ সম্বন্ধীয় ভাবের দ্বারা আমরা হর্ষ, বিরাগ কিংবা বিষাদের অভিজ্ঞতা লাভ করি।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি একে অন্যের সহিত নিবিড়ভাবে বিজড়িত। আমরা যদি কোন একটি প্রকৃতিকে পরিবর্তন করিতে চাই তাহা হইলে অপরটির পরিবর্তন পরিহার করিতে পারি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—একটি উগ্র সংবেদনের পরিসর অথবা ব্যাপকতা বাড়াইবার জন্য হাতের অনেকখানি গরমজলে ডুবাইয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে সংবেদনের আতিশয্যও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। কোন দূরবর্তী বর্ণের উত্তেজনার সীমা বাড়াইয়া দিলে ইহার আভাও বদলাইয়া যাইবে। উত্তেজনার আতিশয্য বাড়াইলে বর্ণের আভাও দৃশ্যতঃ বদলাইয়া যায়। কাহারও নিকট শব্দের গভীরতা উচ্চতা বৃদ্ধির সহিত বদলাইয়া যায়।

স্মরণ রাখিতে হইবে, সংবেদনের বৈশিষ্ট্য অথবা প্রকৃতি শুধু উত্তেজনার কম্পনগতি, স্থায়িত্ব ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না, পরন্তু উত্তেজিত সংবেদীয় যন্ত্র এবং পারিপার্শ্বিক সংবেদীয় ক্ষেত্রের তদানীন্তন অবস্থার উপরও নির্ভর করে। সংবেদনের বৈশিষ্ট্য উত্তেজনার কালে স্নায়ুতন্ত্র ও সমগ্র মানসিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে।

সংবেদন কার্যকরী করিতে হইলে উত্তেজনা শক্তি নির্দিষ্ট নিম্নতম পরিমাণের নীচে যেন নামিয়া না যাইতে পারে। অতি লঘু স্পর্শ ও অতি ক্ষীণ শব্দ সংজ্ঞানের উপর কোন ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। একটি সংবেদন সঞ্চারিত করিবার জন্য যতটুকু উত্তেজনাশক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে সমষ্টি-সীমা নির্দেশক পরিমাণ কহে (Absolute thresh-hold)।

একই ভাবে দুইটি উত্তেজনার প্রভেদ একটি নির্দিষ্ট নিম্নতমের নীচে নামিয়া যাওয়া উচিত নহে। দুইটি সঙ্গীত যদি প্রায় এক সুরে বাঁধা হয় এবং দুই বর্ণ যদি একই আভার হয় তাহা হইলে বিভেদ সুস্পষ্ট হইতে পারে না। অতএব উত্তেজনা বিভেদেরও একটি সীমানির্দেশক পরিমাণ আছে যাহাকে বিভেদীয় সীমা নির্দেশক বলে (Differential threshold)।

ওয়েবার সূত্রে বিবৃত হইয়াছে যে, দুইটি উত্তেজনার উপলব্ধির পার্থক্য তাহাদের আয়তন ও প্রভেদের অনুপাতের উপর নির্ভর করে, তাহাদের আয়তনের সমগ্র প্রভেদের উপর নহে। ফেক্‌নার এই সূত্রের সপক্ষে আরও প্রমাণ উপস্থিত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছেন যে, সংবেদনের শক্তি, প্রবর্তনার 'লগারিদমের' সমানুপাতিক। আর এক ভাবে বলিতে গেলে, প্রবর্তনা গুণোত্তর হারে অবশ্য বর্ধিত হইবে, যেহেতু সংবেদনকে সাধারণ সমান্তহারে বর্ধিত হইতে হয়। ফেক্‌নারের দ্বারা ওয়েবারের সূত্রেও সমালোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

ওয়েবারের সূত্রের আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় নিয়ত প্রকাশিত হইতেছে। একটি দীপ অন্ধকার কক্ষকে আলোকিত করিতে পারে, কিন্তু

সূর্যালোকের নিকট তাহার উপস্থিতি অনুভূত হয় না। একটি গৃহকে যদি একশত দীপের দ্বারা আলোকিত করা হয় এবং তদুপরি আরেকটি দীপ আনিয়া তথায় রাখা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত দীপের দ্বারা বর্ধিত দীপ্তি অতি সামান্যই আমাদের চক্ষে প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু একটি গৃহ যদি এক সহস্র দীপের দ্বারা আলোকিত থাকে তাহা হইলে মাত্র একটি অতিরিক্ত দীপের প্রভাবে তেমন কোন ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য অনুভূত হইবে না, উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের জন্য আরও দশটি দীপের প্রয়োজন হইবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংবেদীয় পার্থক্য বুঝিতে হইলে মূল উত্তেজনা শক্তির এক শতাংশ পার্থক্যের প্রয়োজন হয়। ওয়েবারের সূত্র এই অনুসারে ধার্য হইয়াছে।

আলোকরশ্মির জন্য ১/১০০ ভগ্নাংশ; শব্দের জন্য ১/৩; ত্বকস্পর্শের জন্য ১/৩০ হইতে ১/১০ পর্যন্ত; শরীরের বিবিধ অংশের ভারের জন্য ১/১০ হইতে ১/৪০ পর্যন্ত পার্থক্য ধার্য হইয়াছে।

সংবেদন সমুদ্ভূত হইবার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সময়টুকুর কিছু অংশ ইন্দ্রিয়-স্থানে প্রবর্তনক্রিয়ার জন্য ব্যয়িত হয়, কিছু অংশ স্নায়ুপ্রবাহের সংবেদীয় স্নায়ু বহিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যয়িত হয় এবং বাকী অংশ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ব্যয়িত হয়। সংবেদন অনুসারে এই প্রচ্ছন্ন সময়টুকুর দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে; যেমন শব্দ অপেক্ষা দৃষ্টির বেলায় ইহা দীর্ঘ আবার স্পর্শ অপেক্ষা বেদনার বেলায় অধিক।

প্রবর্তনা অথবা উত্তেজনাকে অতিক্রম করিয়া সংবেদন দীর্ঘব্যাপী হয়। অবশ্য মাত্র একটি উত্তেজনা হইতে অনেকগুলি পশ্চাৎ-সংবেদনের সৃষ্টি হইতে পারে। দৃষ্টির সংবেদনে ইহা সবিশেষ লক্ষিত হয়।

যখন একটি সংবেদন এবং উহার পশ্চাৎ-সংবেদনগুলি অপগত হয়, প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতা তখনও অতর্কিতভাবে কিংবা ইচ্ছা-প্রণোদিতরূপে সঞ্জীবিত থাকিতে পারে। এই পুনরভ্যুদয়কে স্মৃতির প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপে যখন কোন একটি সুর আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে তখন আমরা বুঝিতে পারি, পূর্বে যাহা শুনিয়াছিলাম ইহা তাহারই পুনরাবৃত্তি অথবা পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাত্র।

সময় সময়, পুনর্জাগরিত প্রতিরূপ বাহ্য অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট রূপ লইয়া এমনভাবে আমাদের সম্মুখে প্রতীয়মান হয়, যাহাতে তাহাকে আমরা বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস করি, অর্থাৎ আমরা মায়া বা অমূল প্রত্যক্ষের (Hallucination) দ্বারা অভিভূত হই। মায়া স্বভাবতঃ সকল ব্যক্তির মধ্যেই হইতে পারে, কিন্তু বিশেষরূপে নিদ্রা, মস্তিষ্কবিকৃতি এবং প্রলাপের মধ্যে উহার প্রাদুর্ভাব সমধিক বর্তমান।

প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতা ও পুনর্জাগরিত অভিজ্ঞতার মধ্যে বিভেদ, মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সঞ্জাত কিনা, সে সম্বন্ধে এখনও মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কোন কোন শারীরবেত্তা বলেন, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যে স্মৃতিকেন্দ্র আছে তাহার সাহায্যেই সংবেদীয় কেন্দ্রগুলির প্রারম্ভিক উত্তেজনা হয়। কোন দৃশ্যের অথবা সুরের পুনঃস্মৃতি, স্মৃতিকেন্দ্রের যথোপযোগী উত্তেজনার দ্বারা সংঘটিত হয়, যদিও সেই সময়ে তাহার সম্পর্কিত সংবেদীয় কেন্দ্রগুলি কর্মবিরত থাকে। এই মতের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এইটুকু স্বীকার করিয়া লইলেই যথেষ্ট যে, সংবেদন এবং ইহার পুনর্জাগরিত স্মৃতির প্রতিরূপ, উভয়ের অন্তরালে যে শারীরবৃত্তের প্রক্রিয়াগুলি নিহিত রহিয়াছে, তাহারা মোটামুটি এক। অবশ্য একদিকে, সংবেদীয় অভিজ্ঞতা ও মায়া কিংবা অমূল প্রত্যক্ষের পার্থক্য আর অপরদিকে পুনর্জাগরিত অভিজ্ঞতা, ইহাদের সম্পর্কে যে যে শারীরবৃত্তীয় প্রভেদ আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এ পর্যন্ত সেই পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

যখন সাধারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা কোন একটি বস্তুর বাস্তব প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে এবং কোন বিশেষ অবস্থায় উহাকে পৃথকরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে, তখন বলিতে হইবে আমাদের অধ্যাস (Illusion) হইয়াছে। এইরূপে একটি রেখা অথবা নক্‌সা বাস্তব হইতে দীর্ঘ কিংবা ক্ষুদ্র দেখায়, বাস্তব হইতে ভিন্নদিকে যাইতেছে বলিয়া মনে হয়; দুইটি সম ওজনের বস্তুর একটিকে অপেক্ষাকৃত ভারী বোধ হয়। অধ্যাসের উদ্ভব হয় কতক বহিরংশ এবং কতক কেন্দ্রাংশ হইতে। ইহার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান অথবা গবেষণা পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত।

সংজ্ঞানের বিলুপ্তি

Ego অর্থাৎ অহম্ কথাটির যে চরম অর্থই ধরা হউক না কেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মানসিক সক্রিয়তা মেরুমস্তিষ্কের ভৌতিক অখণ্ডতা ও নিউরনের অনুষঙ্গের উপর নির্ভর করে। ব্যাধি ও আঘাতের দ্বারা অনুষঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়। ব্যাধি ও আঘাতের পরিমাণের অনুপাতে মস্তিষ্কের সক্রিয়তায় ব্যাঘাত ঘটে। ভগ্ন উপাদানগুলির পুনর্গঠন না হইলে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নষ্ট উপাদানের অভাব অন্য স্নায়ু-পথগুলির দ্বারা পূর্ণ হইয়া কিছু পরিমাণে সক্রিয়তা আনিতে পারে। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকারিতার অভাব ক্ষণস্থায়ী; যেমন, মস্তিষ্কের আঘাতজনিত আলোড়ন। সকলেই জানেন, দৈব-ঘটিত আঘাত হইতে যে সংজ্ঞা লোপ হয়, তাহা পরে ঠিক হইয়া যায়। এইসব ক্ষেত্রে অনুষঙ্গকৃত নিউরনগুলি ছিন্ন না হইলেও সাময়িকভাবে তাহাদের কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়, যদিও এইরূপ কোন বৃত্তির ক্ষণিক বিলোপনের ভৌতিক কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। এই ধরনের ব্যাপারগুলি লইয়া কয়েক বৎসর যাবত বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, মস্তিষ্কের গুরুতর আলোড়নের ফলে যে ক্ষতি হয় তাহা অতর্কিতভাবে একদিন নিউরন অনুষঙ্গের দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। আবার নষ্ট ক্ষমতাগুলি, যেমন—দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি ইত্যাদি—কোন নূতন মানসিক অথবা দৈহিক আঘাত কিংবা আলোড়নের ফলে কখনও কখনও ফিরিয়া আসে।

ডাক্তার এইচ. জ্যাক্‌সন যাহা প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন, সার এফ. মট্ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে তাহা অনুধাবন করা যাইতে পারে। ইহাতে সংজ্ঞাকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বিবিধ উচ্চ ও নিম্নতলের অনুষঙ্গগুলি প্রতীয়মান হইবে। বিভিন্ন তলের অনুষঙ্গগুলির বিচ্যুতির দ্বারা সংজ্ঞাবিলুপ্তির পর্যায়গুলিও নিরূপিত হইবে। যেখানে অন্তর্মুখ সংবেদীয় নিউরনের (স্নায়ুকোষ) সহিত গুরুমস্তিষ্কের গ্রাহকগুলি (cortical receptors) অর্থাৎ দানাদার স্তরের কোষগুলি অনুষঙ্গ synapsis দ্বারা মিলিত হয়, সেই স্থানকে নিম্নতম তল বলে। এই স্থানের অনুষঙ্গ বিচ্যুতির অর্থ হইল, সংজ্ঞার বিলোপন। দূরবর্তী মস্তিষ্ক-পিণ্ডকগুলি হইতে অন্তর্মুখ অনুষঙ্গ তন্তুসমূহ যেখানে এই দানাগুলির সহিত পরস্পর মিলিত হয়, সেই স্থানকে পরবর্তী তল বলে। এই স্থানের অনুসঙ্গের বিচ্যুতিতে প্রত্যভিজ্ঞার বিলোপ হয়, অর্থাৎ কোন বস্তু অথবা বিষয়ের সাধারণ অনুভূতির সহিত দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির অনুষঙ্গশক্তির অভাব ঘটে। সর্বাপেক্ষা উচ্চ তল (যেখানে পিরামিডের স্তর স্পর্শক অর্থাৎ Tangential অথবা পারমাণবিক স্তরের দ্বারা নিম্নের দানাদার স্তরের সহিত অনুষঙ্গকৃত থাকে) ঐ স্থানের অনুষঙ্গবিচ্যুতি হইলে স্মৃতিশক্তির ন্যায় একটি উচ্চ মনোবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটে।

আকস্মিক সঙ্ঘর্ষজনিত দারুণ কম্পের দ্বারা উপরোক্ত তিনটি স্তরে যে সক্রিয়তার সাময়িক বিচ্যুতি ঘটে তাহা পরে অপসারিত হইয়া যায়।

প্রথমে সর্বনিম্নস্তরের অঙ্গুষঙ্গের পুনঃস্থাপনার সহিত সংজ্ঞান ফিরিয়া আসে। পরে যেমন যেমন দ্বিতীয় স্তরের পুনর্গঠন হইতে থাকে, রোগীর প্রত্যভিজ্ঞাও ফিরিয়া আসে; অর্থাৎ জিনিষ দেখিলে চিনিতে পারে। সর্বোচ্চ স্তরের সংস্কার হয় সকলের শেষে এবং স্মৃতি অনেক ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে অতি ধীরে ধীরে। শারীরবৃত্তের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে প্রক্ষোভ (Emotions) নামক বিষয়টি খুব অল্পই বর্ণিত হইয়াছে; যেহেতু তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও কতকটা কাল্পনিক এবং তেমন সুস্পষ্ট নহে। কিন্তু চিকিৎসকগণ কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রক্ষোভ-জনিত ব্যাধিগুলির সংস্পর্শে আসিতেছেন ও তাহার গুরুত্বও উপলব্ধি করিতেছেন।

ইলেক্‌ট্রন বা বিদ্যুতিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস

পরীক্ষামূলক গবেষণা ক্ষেত্রে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। তিনি আবিষ্কার করেন যে, একটি তারের কুণ্ডলীর নিকট একটি চুম্বক আনিলে এবং সরাইয়া নিলে ঐ কুণ্ডলীর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি হয়। তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে যখন এ সম্বন্ধে তাঁহার পরীক্ষাগুলি দেখাইতেছিলেন তখন জনৈকা ভদ্রমহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা ধরিয়া লইলাম যে, এরূপে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? উত্তরে ফ্যারাডে বলিয়াছিলেন—আপনার নবজাত শিশুটির কি উপযোগিতা আছে তাহা আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? ভদ্রমহিলাটিকে এই প্রতিপ্রশ্নে নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও ফ্যারাডের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন রাজস্বসচিব সেই সভায় ফ্যারাডেকে বলিয়াছিলেন, এই আবিষ্কার হইতে যদি এক শিলিং আয়ও বর্ধিত হইতে পারিত তবে ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিতে পারিতাম। ফ্যারাডে সগর্বে উত্তর দিয়াছিলেন—আজ আপনারা ইহার অর্থকরী উপযোগিতা দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যেদিন ইহার উপর ট্যাক্স বসাইয়া আপনারা বর্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র রাজস্বেরও অধিক অর্থ আদায় করিতে পারিবেন। ফ্যারাডের এই ভবিষদ্বাণী বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছে। যে ডায়নামো যন্ত্রের সাহায্যে আলো, পাখা ও কলকারখানার মোটর প্রভৃতি চালাইবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে, তাহার মূলে ছিল ফ্যারাডের এই আবিষ্কার। আপাতদৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র আবিষ্কার হইতে বহু বিরাট ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই; ইলেকট্রন বা বিদ্যুতিনের আবিষ্কার এরূপ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিপুল বিশ্ব-সৌধের ইষ্টক স্বরূপ এই ক্ষুদ্রতম কণিকা বিগত অর্ধ শতাব্দীর অল্প সময়ের মধ্যে কেবল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাতেই বিপ্লবের সৃষ্টি করে নাই, ব্যবহারিক জগতেও যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে ইলেকট্রন অর্থাৎ বিদ্যুতিনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। বর্তমান সময়ে সবাক চিত্র ও বেতার বার্তা—এই দুই যান্ত্রিক

আবিষ্কার জনসাধারণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া থাকে। ইলেকট্রনই এই আবিষ্কারের মূলাধার এবং ইলেকট্রনের সাহায্যে এরূপ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে যাহা চিকিৎসাবিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ইলেকট্রনের সাহায্যে এরূপ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে যাহাতে যন্ত্র এবং যন্ত্রীর নিরাপত্তা শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে। বর্তমানে একমাত্র আমেরিকাতেই প্রতি বৎসর পাঁচ কোটি ডলার বা বিশ কোটি টাকার মূল্যের ইলেকট্রন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে ইলেকট্রনের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিষয় সম্যক উপলব্ধি হইবে।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সন্ধানই বিজ্ঞানের ধারা। পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষার সাহায্যে প্রকৃতির সম্বন্ধে সত্য ও বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় করাই বিজ্ঞানের সাধনা। বৈজ্ঞানিক যখনই একটি নতুন বস্তু বা শক্তির আবিষ্কার করেন তখনই উহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক বিদ্যুতের সন্ধান বহুপূর্বেই পাইয়াছিলেন। ফ্যারাডে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফলে বিদ্যুৎকে তামার তারে বাঁধিয়া মানুষের কাজে লাগাইবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিষটা যে কি তাহা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল; কাজেই ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রঞ্জেন-রশ্মি, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বতঃবিকিরণশীল পদার্থ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যুতিন বা ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হইল। ফ্যারাডে কর্তৃক তড়িৎ-বিশ্লেষণের তথ্যসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আণবিকতা (atomicity) সম্বন্ধে ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল। আণবিকতা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা কি বুঝাইতে চাহেন এস্থলে একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

একগ্লাস জলকে সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করিলেও উহা জলই থাকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জলের ক্ষুদ্রতম অংশের ওজন বা ভর $\cdot২৯\times১০^{-২৩}$ গ্র্যাম। ইহাই জলের অণু অথবা সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ, এই জলকে বিভাগ করিতে গেলে উহা আর জল থাকিবে না। এইরূপে সমুদয় পদার্থের আণবিকতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। শক্তিরও আণবিকতা থাকিতে পারে এরূপ একটি অনুমান বৈজ্ঞানিকদের মনে স্থান পাইয়াছিল। ফ্যারাডে প্রমাণ করেন যে, জলের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিলে উহার মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে বিশ্লেষণ ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রতি পরমাণুর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুতের সম্পর্ক রহিয়াছে এবং ইহার পরিমাণ পরমাণুর বাহুর (Valency) সংখ্যার উপর নির্ভর করে। হাইড্রোজেন ও অপরাপর এক বাহুবিশিষ্ট পরমাণু সর্বনিম্ন পরিমাণ তড়িৎ বহন করিয়া থাকে। ইহার পরিমাণ—$৪\cdot৭\times১০^{-১০}$ ই. এস. ইউ.। অন্যান্য পরমাণু তাহাদের রাসায়নিক বাহুর সংখ্যানুসারে ইহার দ্বিগুণ, অথবা ত্রিগুণ বিদ্যুৎ বহন করিয়া থাকে। বিদ্যুতের আণবিকতার ইহাই প্রথম সূত্র। সাধারণ বায়ু বিদ্যুৎ-অন্তরক বা Nonconductor; বিরলীকৃত বায়ু বিদ্যুৎ-পরিচালক বা Conductor। বিরল বায়ুতে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিলে উহা বিবিধ বর্ণের আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই প্রকার বিরলবায়ুপূর্ণ নলে বিদ্যুৎ চালনা করিয়া নানাপ্রকার গবেষণা চলিতে থাকে। সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ এই পরীক্ষায় ক্যাথোড রশ্মির সন্ধান পাইলেন। জড় পদার্থের কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিনটি রূপ আছে। ক্রুক্‌স্ এই বিদ্যুৎ-পরিচালক বিরল বায়ুকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই ত্রি-রূপের অতীত জড়বস্তুর এক চতুর্থ অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে আমরা ইহাকে জড় কণিকার তড়িতাবিষ্ট বা আয়োনাইজ্‌ড্ অবস্থা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রঞ্জেন একটি কাচের গোলককে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-

প্রবাহ চালনা করেন। এই পরীক্ষার সময় তাঁহার পরীক্ষাগারে রক্ষিত সাবধানে আচ্ছাদিত আলোকচিত্রের - নিগেটিভ সমূহ আলোকদষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ক্রুক্‌সের পরীক্ষাগারেও এই বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহার প্লেটগুলি অপর গৃহে স্থানান্তরিত করিয়া এ সমস্যার সমাধান করেন; ফলে রঞ্জেন রশ্মি আবিষ্কারের গৌরব হইতে বঞ্চিত হন।

সঞ্চয়ন

আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করবার প্রচেষ্টা

আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে কত সম্পদের যে অপচয় ঘটে থাকে তা আমরা কখনই খেয়াল করি না। আমরা যাকে আবর্জনা বলি, যেমন আখের ছিব্‌ড়া, ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়া, কয়লার ছাই, কমলা, বাদম প্রভৃতির খোসা ইত্যাদি যে কতবড় সম্পদ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা আজ তা দেখিয়েছেন। তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোন জিনিষই ফেলবার নয়।

কয়লার ছাই

কয়লার মধ্যে রং ও চিনি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যেসব সম্পদ লুকানো রয়েছে বিজ্ঞানীরা তার সন্ধান পেয়েছেন এবং ব্যবহারও করছেন। কিন্তু যে কয়লার ছাই আমরা প্রতিদিন ফেলে দেই তা দিয়ে ছোট ছোট ইট তৈরী হয়। আবার সেই ইটকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

কাঠের গুঁড়া

কাঠের গুঁড়া থেকে রসায়নবিদ্ বিজ্ঞানীরা বহু জিনিষ তৈরী করেছেন। কাঠের গুঁড়া থেকে অ্যালকোহল তৈরী ছাড়া রকমারি বোর্ডও তৈরী হয়ে থাকে। আমেরিকার ভার্জিনিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কাঠের গুঁড়া দিয়ে দেড়শো রকমের বোর্ড তৈরীকরেছেন। বহু মার্কিন গৃহের ছাদ বা সিলিং, দেয়াল, পার্টিশন প্রভৃতি এই বোর্ড দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

আখের ছিব্‌ড়া ও ফলের খোসা

আখের ছিব্‌ড়া থেকেও নানা রকমের বোর্ড তৈরী হয়ে থাকে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা-স্টেটে প্রচুর পরিমাণে কমলা লেবু, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের চাষ হয়। পূর্বে এই সকল ফলের খোসা কোন কাজেই লাগতো না। আজ এই খোসা থেকে অতি উত্তম পশু-খাদ্য, সার ও নানা প্রকার তেল প্রস্তুত হয়ে থাকে। তামাক, ধান প্রভৃতি অন্যান্য কৃষির যে অংশ আমরা ফেলে দিই তা দিয়েও বহু মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হয়ে থাকে। তামাকের চারার যে অংশ আমরা ফেলে দিই সেই অংশ থেকে কীটনাশক ওষুধ তৈরী হয়ে থাকে।

ধানের তুষ ও অন্যান্য দ্রব্য

ধানের তুষ থেকেও দেয়ালের বোর্ড, সিমেণ্ট ব্লক এবং ইঞ্জিন পরিষ্কারের জন্যে একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়ে থাকে। টেনেসী স্টেটের ওকরিজের বৈজ্ঞানিকের বলেন যে, পরিত্যক্ত তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদিও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। মাংসের উপর ঐ সকল তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের তেজবিকিরণ হওয়ার পর ঐ মাংস ঘরের আভ্যন্তরীণ তাপে বহুদিন অবিকৃত থাকে, পচে যায় না। ফস্‌ফেট শিল্পেও এতকাল বহু জিনিষ ফেলে দেওয়া হতো। আজ সে সব জিনিষ ইউরেনিয়াম ধাতুর জন্যে স্তূপীকৃত করা হচ্ছে। এই মূল্যবান ইউরেনিয়াম ধাতুটি আণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু।

মার্বেলের গুঁড়া, বালি ইত্যাদি

মার্বেল পাথর ও শ্লেটের গুঁড়া থেকে নানা প্রসাধন সামগ্রী, আঠা. গৃহতলে পাতবার কাপড় বিশেষ, ওয়াল পেপার প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে।

টেনেসীর একটি সিমেণ্ট কোম্পানী পল্লী অঞ্চলে যে সকল ধূলা এতকাল জমা হয়ে থাকতো তা সংগ্রহ করছে। দৈনিক সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় ৭৫ টন। এই ধূলার মধ্যে খুব বেশী পরিমাণ পটাস পাওয়া গেছে। এই পটাস সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পুরনো বেলের বন্ধনী (রেলরোড টাইজ) ও টেলিগ্রাফের থাম থেকে সাদার্ন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাগজ তৈরী হচ্ছে। ঐখানেই পুরনো সরল (পাইন) গাছ ও গাছের গুঁড়ি থেকে নানা প্রকাব তেলও তৈরী হচ্ছে। এই তেল থেকে সাবান, সংক্রামক বোগনাশক ও দুর্গন্ধনাশক বস্তু প্রস্তুত হয়।

পরিত্যক্ত তৈলকূপ

তৈলখনি অঞ্চলে অনেক সময়েই দেখা যায়, যে কূয়া থেকে পেট্রোল বা কেরোসিন তেল উঠানো হয় তা শুকিয়ে গেছে। কুয়ার মুখে তেল না উঠলেও বহু পরিমাণ তেল তখনও মাটিতে থাকে। ঐ কূয়াটি জলে ভর্তি করে দিলেই আবার কিছুটা তেল উপরে ভেসে আসে। তবে সিন্থেটিক সাবান সেই জলে মিশিয়ে নিলে আরও কিছু পরিমাণ তেল সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়া পরিত্যক্ত কূয়ার গ্যাসও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারসমূহে আজ পরিত্যক্ত বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চলছে। মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা লিগ্নিনের ব্যবহারও আবিষ্কার করতে পারবেন বলে আশা করেন। লিগ্নিন থেকে চিনি, পশুর খাদ্য, কোহল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রভৃতি তৈরী হবে। লিগ্নিনে শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ কাঠ আছে এবং পৃথিবীর অত্যধিক পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ইহা অন্যতম।

রঞ্জেন-রশ্মি দূরবীন

ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন রঞ্জেন-রশ্মির যন্ত্রপাতির বহু উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত রঞ্জেন-রশ্মি দূরবীন বা এক্স-রে টেলিস্কোপের সাহায্যে যে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয় তাহা পূর্বের যন্ত্রপাতির সাহায্যে তোলা ছবির তুলনায় দুই শত গুণ উজ্জ্বলতর বা বৃহত্তর হইয়া থাকে। বর্তমানে রঞ্জেন-রশ্মির গবেষণাগার হাসপাতাল এবং ডাক্তারখানা সমূহে রোগনির্ণয়ের প্রধান উপায় হিসাবে এই যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত আলোকচিত্রসমূহ ব্যবহার করা হইতেছে।

রঞ্জেন-রশ্মি বিশারদেরা বলিতেছেন যে, রঞ্জেন-রশ্মি আবিষ্কারের পর ইহার এই প্রকার উন্নতি ইতিপূর্বে আর হয় নাই। ইহাকে বৈদ্যুতিক আলোকচিত্র পরিবর্ধক বা ইলেকট্রিক ইমেজ এমপ্লিফায়ারও বলা হয়।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ঐ যন্ত্রটির প্রয়োগ বিভাগেব ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার চ্যাণ্ডলার এস. ইসোন সম্প্রতি বলেছেন যে, এই যন্ত্রটির সাহায্যে রোগীর যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিকে দুই শত গুণ বড় করা যাইবে এবং ইহার ফলে প্রতিপ্রভ পর্দার পরীক্ষা (fluoroscopic examination) এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রটি বিস্তৃততর হইবে।

বর্তমানে যে রঞ্জেন-রশ্মি চিত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে তা তেমন স্পষ্ট হয় না এবং এই অস্পষ্টতার দরুণ রোগীর আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা চিকিৎসকেরা জানিতে পারেন না। অতি আধুনিক এই উন্নত রঞ্জেন-রশ্মি যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র গ্রহণ সম্ভব হইবে। ফলে, যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতে রোগীর সকল আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া চলচ্চিত্রের ছবির মত দেখা সম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত চিকিৎসকের রঞ্জেন-রশ্মি পর্দার দিকে তাকাইবার জন্য অন্ধকারে

তাহার চক্ষুটিকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবারও কোন প্রয়োজন হইবে না।

বহুদিন হইতেই বৈজ্ঞানিক মহল ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছিলেন। মানুষের চোখের দৃষ্টির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ শক্তিকে পরিবর্ধন করাই এই নূতন যন্ত্রটির কাজ। ইহা ব্যতীত রঞ্জেন রশ্মি সরঞ্জামের আর কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। অতি আধুনিক ফ্লোরোস্কোপের উপরও রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে যে চিত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে তা স্পষ্ট হয় না। সামান্য পড়িবার আলোকে একখানা সাদা কাগজকে যে কোন রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে গৃহীত মানুষের উদরের আলোকচিত্রের সহিত তুলনা করিলে ঐ সাদা কাগজটি ৩০ হাজার গুণ উজ্জ্বলতর দেখাইবে।

তবে চিত্রটিকে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিতে হইলে যে শক্তির সাহায্যে চিত্রটি রূপায়িত হয় তাহাও বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু রঞ্জেন-রশ্মি সম্পর্কে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, নিরাপদে যতটুকু ব্যবহার করা চলে ততটুকু বাড়ানো যায়। সুতরাং যদি আরও বাড়াইতেই হয় তবে রোগীদেহ নির্গত সেই আলোক রেখার শক্তিবৃদ্ধি করাই সঙ্গত।

কিন্তু এইখানে অসুবিধা হইল এই যে, বৈদ্যুতিক পরমাণুগুলিকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ঠিক সেইভাবে রঞ্জেনরশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, অথবা ইহাদিগকে ত্বরান্বিত এবং ফোকাস্‌ও করা যায় না। এই অবস্থায় স্থির হয় যে, রোগীর দেহনির্গত রঞ্জেন-রশ্মিকে অন্য কোন শক্তিতে রূপান্তরিত করা হইবে। তাহা হইলেই সেই শক্তিকে ইচ্ছামত ফোকাস্‌ও করা যাইবে এবং ইহার শক্তিও পুনরায় বাড়ানো যাইবে। তাহাতে রোগীরও কোন প্রকার ক্ষতি হইবে না।

রোগীর দেহনির্গত রঞ্জেন-রশ্মি একটি প্রতিপ্রভ পদায় পতিত হওয়ার ফলে নূতন আলোকরেখা ঐ পর্দা হইতে বিকিরিত হয় এবং ঐ পর্দার অপর পিঠকেও আলোকিত করিয়া তোলে। কারণ আলোকচিত্র গ্রহণের মালমসলাদি প্রতিপ্রভ পর্দার অপর পিঠে থাকে। ফলে ঐ ফটোসেন্‌সিটিভ সারফেস হইতে পরমাণুসমূহ বাহির হইতে থাকে এবং বিদ্যুচ্চালন করিয়া ইহাদের গতি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। গতিবৃদ্ধি হেতু এই সকল পরমাণু আর একটি প্রতিপ্রভ পদায় (ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রিন) যাইয়া ধাক্কা দেয়। উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা বাহির হইয়া আসে এবং বস্তুর ছায়ারূপটি ঐ নলের মধ্যে চিকিৎসকের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

এক ইঞ্চি ব্যাসপরিমিত নলটির মধ্যে এই দ্রুতগতি পরমাণু-ধারা এমনভাবে সংনমিত (কম্‌প্রেস্‌ড্‌) করিতে হয় যাহাতে সেই ছায়ারূপটি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে। মূল রঞ্জেন-রশ্মি ছায়াচিত্রের পাঁচ গুণ ছোট হইয়া থাকে। পরমাণু-ধারা সংনমনের ফলে ঐ তল হইতে প্রতি-বর্গ ইঞ্চি হইতে আরও অলোকরেখা বিকিরিত হয়। ফলে ছায়ারূপটি সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠে। তারপর সেই অতি ক্ষুদ্র সুস্পষ্ট চিত্রটিকে আলোক-বিজ্ঞানের সাহায্যে বড় করা হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ চতুর্থ সংখ্যা

উপরে—বিশাখাপত্তনের জাহাজনির্মাণ কারখানায় ডিজাইনিং অফিসের একটি দৃশ্য

নীচে—বিশাখাপত্তনের জাহাজনির্মাণ কারখানায় একটি জাহাজে সাজসরঞ্জামাদি লাগান হইতেছে

করে দেখ

তরল পদার্থের তল-টানের পরীক্ষা

এক ফোঁটা জল বা এক বিন্দু পারা সর্বদাই গোল হয়ে থাকে কেন? সব রকম তরল পদার্থের উপরিভাগই যেন খুব পাতলা একটা পর্দার মত। এই পর্দা তার আয়তন যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করবার জন্যেই চেষ্টা করে। একেই বলা হয় তল-টান, ইংরেজীতে বলে Surface tension। এই তল-টানের জন্যেই একবিন্দু পারা বা এক ফোঁটা জল গোলাকৃতি ধারণ করে। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে তরল পদার্থের উপরিভাগের এই সঙ্কোচন ক্ষমতা, অর্থাৎ তল-টান প্রত্যক্ষ করতে পার। এই রকমের একটা পরীক্ষার কথা বলছি।
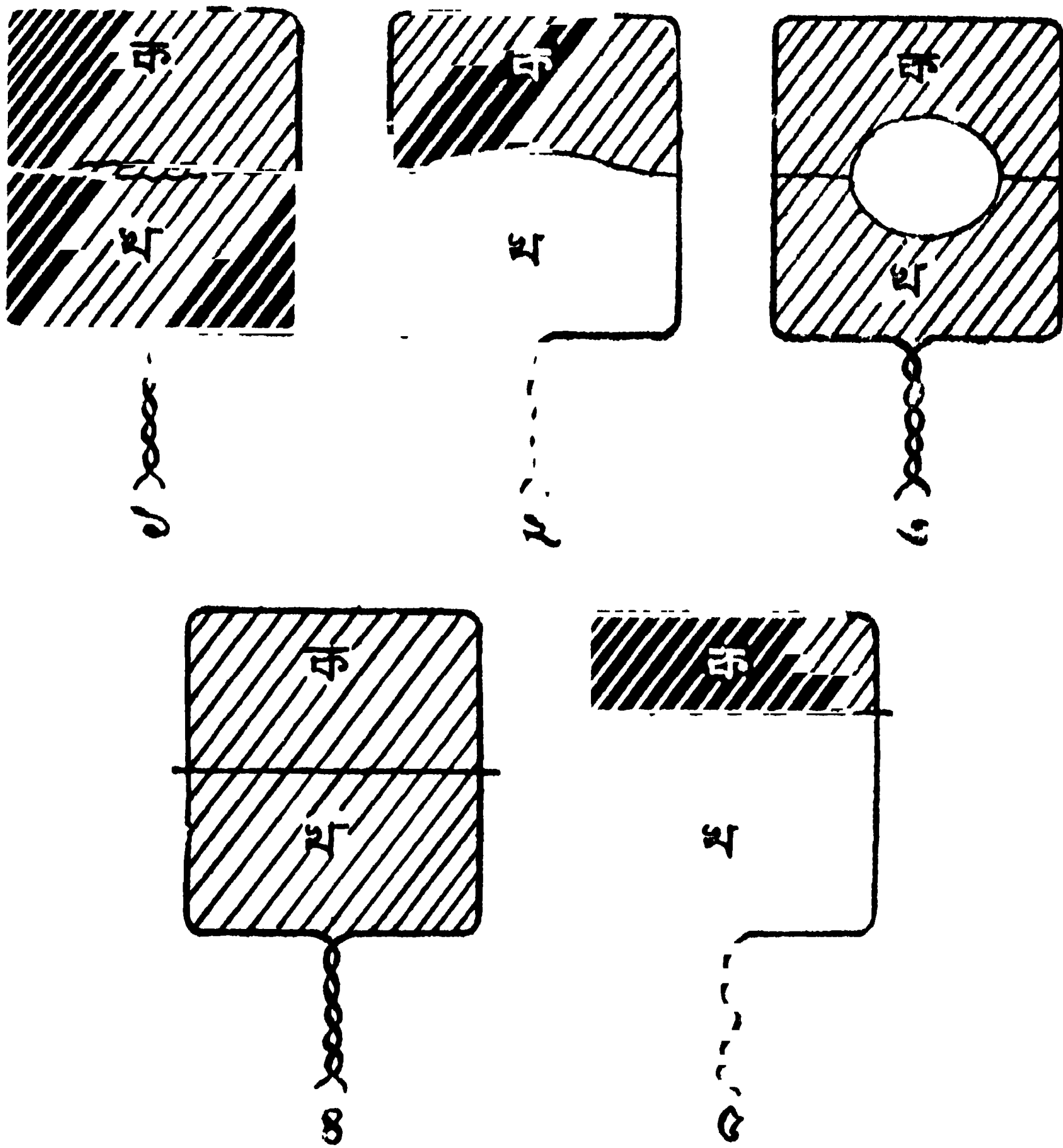
সরু একগাছা তার বাঁকিয়ে ছবির মত করে ছোট্ট একটা ফ্রেম্ তৈরী করে নাও। এবার ফ্রেম্‌টার মাঝামাঝি জায়গায় এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত খুব আল্‌তোভাবে সরু একগাছা সুতা বেঁধে দাও। সুতাটার মাঝখানে আল্‌গা একটা ফাঁস রেখে দেবে। সুতা-

বাঁধা ফ্রেমটাকে সাবানের জলে ডুবিয়ে নিলেই ফ্রেমটা জুড়ে একটা সাবান-জলের পাত্‌লা পর্দা তৈরী হবে। ১নং চিত্রে দেখ। এবার সাবান-জলের পর্দার খ-চিহ্নিত অংশটাকে ছিঁড়ে দাও। দেখবে, ক-চিহ্নিত অংশের সাবান-জলের পর্দা আল্‌তোভাবে-বাঁধা সূতাটাকে টেনে নিয়ে ধনুকের আকারে টান করে বাঁকিয়ে রেখেছে। ২নং চিত্র দেখ।

ফ্রেম্‌টাকে আবার সাবান-জলে ডুবিয়ে নাও। এবার সূতার ফাঁসের ভিতরের অংশটার পর্দা ছিঁড়ে দাও। চারদিক থেকেই পর্দার সমান টানের ফলে সূতার ফাঁসটা এবার গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ৩নং চিত্র দেখ।

ফ্রেমে-বাঁধা সূতাটা এবার খুলে নাও। সাবান-জলে ডুবিয়ে ফ্রেম্‌টার মধ্যে পর্দা তৈরী কর। ফ্রেম্‌টাকে শয়ানভাবে ধরে সূতাটা যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে ফ্রেমের উপর সরু এবং সোজা একখণ্ড তার রাখ। ৪নং চিত্র দেখ। খ-চিহ্নিত অংশের পর্দা ছিঁড়ে দাও। দেখবে, পর্দার টানে তারের টুক্‌রাটা গড়িয়ে গিয়ে ক-চিহ্নিত অংশের আয়তন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে আনছে।

জেনে রাখ

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

গত ১৪ই মার্চ নিউইয়র্কে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালন করা হয়েছে। ১৯৩৩ সালে হিটলারের ইহুদি বিতাড়নের দিনে বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ ইহুদী বিজ্ঞানীকেও শরণার্থীর বেশে নানাদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। বহু প্রখ্যাত ইহুদীর সঙ্গে তিনিও তখন জন্মভূমি জার্মেনী ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। প্রথম এলেন ফ্রান্সে, ফ্রান্স থেকে বেলজিয়ামে তারপর বেলজিয়াম থেকে ইংল্যাণ্ড। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন সহরে অবস্থিত উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা নিকেতনের আজীবন অধ্যাপনার পদ গ্রহণের জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৯৩৩ সালেই তিনি প্রিন্সটনে আসেন। ১৯৪০ সালে তাঁকে আমেরিকার নাগরিক অধিকারও দেওয়া হয়। মার্কিনবার্তা থেকে এই মহামনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস দেওয়া হলো।

থিয়োরী অব রিলেটিভিটি অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়েন্টাম মেকানিক্স অর্থাৎ পরিমাণ বিষয়ক বলবিত্থার মধ্যে যে ব্যবধান সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়নের জন্যে আজও বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের চেষ্টার অন্ত নেই। তাঁর জীবন-সূর্য আজ প্রায় অস্তগমনোন্মুখ; অধ্যাপনার কাজ থেকেও অবসর নিয়েছেন। কিন্তু

অনলস, অবিশ্রান্ত কর্মধারা আজও তাঁর বিরামহীন গতিতেই চলেছে। কেবল বিজ্ঞানই নয়, আজ বিশ্বে কেমন করে শান্তি আসবে, মানুষ গড়ে তুলবে তার মহান ভবিষ্যৎ তাতেও তাঁর চিন্তার অবধি নেই। আজ পৃথিবীর মানুষ এক। সেই বিশ্বমানবের জন্যে একটি মাত্র গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উৎসাহী। তাঁর ধারণা এই পথেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

সারা বিশ্বের বিদগ্ধ মহলে আজ তিনি সুপরিচিত। কিন্তু ষাট বছর আগে শিশু আইনষ্টাইনের ভবিষ্যৎ যে এত উজ্জ্বল, তাঁর মাষ্টার মশায়েরা কিন্তু সেরূপ কোন ধারণা পোষণ করতেন না। ১৮৭৯ সালে জার্মানীর উলম সহরে তাঁর জন্ম হয় এবং মিউনিক

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

সহরেই তাঁর শিশুকাল কাটে। লেখাপড়ায় ভাল ছেলে বলে শিশুকালে তাঁর সুনাম ছিল না। বিদ্যায়তনের বাঁধাধরা নিয়মকানুনের মধ্যে আপনাকে খাপ খাওয়াতে পারেন নি; মনের মুক্তির ক্ষেত্র যে সেখানে সঙ্কুচিত। তাই শিক্ষক মশায় তাঁকে পছন্দ করতেন না।

কিন্তু শিশু আইনষ্টাইন প্রতিদিন অসংখ্য প্রশ্নবাণে তাকে অস্থির করে তোলতেন এবং বহু প্রশ্নেরই তিনি জবাব দিতে পারতেন না। কিন্তু প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গেল তার চৌদ্দ বছর বয়সেই। ঐ বয়সের বালক পাঠ্যপুস্তক পড়ে গণিতশাস্ত্রের সমাকলন (ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস) ও অন্তরকলন (ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস) এবং এনালিটিক্যাল জ্যামিতি শিখে ফেললেন।

মিউনিক থেকে এর কিছুকাল পরেই তাঁর মা-বাবা, মিলানে চলে যান। তিনিও গেলেন তাঁদের কাছে মিলানে। তারপর মিলান থেকে তাঁদেরই সঙ্গে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানকার অ্যারোর কারিগরী বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল স্কুলের লেখাপড়াও শেষ করলেন। তারপর জুরিখের টেকনিক্যাল একাডেমীতে যোগ দিলেন। এই সময় তিনি সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক অধিকারও পেলেন। জুরিখে যখন তিনি বিদ্যার্থী তখনই গণিতে অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন মহিলা মিলেভা ম্যারেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ১৯০১ সালে তাঁদের বিয়ে হয়।

১৯০১ সাল থেকেই শুরু হয় আইনষ্টাইনের কর্মজীবন। ঐ বছরেই উইন্টার-থারের টেকনিক্যাল স্কুলে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। তারপর কিছুদিন শফ হাউসেন-এ প্রাইভেট টিউটার হিসাবে থাকেন।

১৯০২ সালে একটি পেটেন্ট অফিসে তিনি পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। এই সময়েই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদের গবেষণা শুরু হয়। এই সম্পর্কে তাঁর প্রথম পুস্তিকা তড়িৎ-চালিত চলমান বস্তুর গতিবিদ্যা ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি-এইচ. ডি উপাধিতে ভূষিত করে এবং বিশেষকরে তাপ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদটি গ্রহণ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। -এই সময়ে বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটি অধ্যাপকের পদ পেয়েছিলেন।

১৯০৮ সালে অষ্ট্রিয়ার স্যালসবুর্গে সরকারী প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীদের যে সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে বক্তৃতা প্রদানের জন্যে তাঁকেও আমন্ত্রণ করা হয়। এই বক্তৃতার ফলেই প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের সাধারণ অধ্যাপকের পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় (১৯১১-১২ সাল)। কিন্তু দেড় বছর যেতে না যেতেই আবার ডাক আসে জুরিখ থেকে। তবে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্যে নয়, কনফিডারেট পোলিটেকনিক একাডেমীতে অধ্যাপনার জন্যে।

১৯১৪ সালের মধ্যে আইনষ্টাইন খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হলেন। বিশ্ববিখ্যাত অন্যতম পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের চেষ্টায় বার্লিনস্থ প্রুশিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সেস্ নামক প্রতিষ্ঠানে তাঁকে অধ্যাপকের পদ দেওয়া হলো। নাৎসীদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত সুইস নাগরিক হিসাবেই তিনি সেখানে অধ্যাপনা

করে গেছেন। ঐ সময়ে তিনি হল্যাণ্ডের লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়েও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

১৯২১ সালে বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এর পরে কত পুরস্কার আর কত যে খেতাব ও ডিগ্রী পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব পুরস্কার আর ডিগ্রীর কথা অনেকই তাঁর মনে নেই। তবে ১৯২৫ সালে রয়াল সোসাইটি তাঁকে যে কোপলে পদক এবং ১৯৩৫ সালে ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউট যে পদকটি দিয়ে এই বিরাট প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিল তা সযত্নে রক্ষিত আছে। বার্লিনে যখন তিনি ছিলেন তখন প্রায়ই নানা দেশে বেড়াতে যেতেন। ১৯৩১ সালে কয়েক মাসের জন্যে ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলোজিতেও কাটিয়ে গেছেন। জার্মেনীর হাইমার রিপাবলিকের আমলেই বার্লিনে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পদার্থবিজ্ঞানের জন্যে বিশেষকরে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে তাঁকে কাইজার উইলহেলম্ ইনষ্টিটিউটের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টারের পদ গ্রহণ করতে হয়। প্রুশিয়াতে সেই শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিককে নাগরিক অধিকার দেওয়া হলো। কেবল তাই নয়, তাঁর সম্মানার্থে পটস্‌ড্যাম অ্যাষ্ট্রোফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউট তাঁর নামে একটি উচ্চ প্রাসাদও নির্মাণ করেন।

১৯৩৩ সালে নাৎসীদের ইহুদী-বিরোধী নীতির ফলে আইনষ্টাইন জার্মেনী থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তাঁর নাগরিক অধিকার বাতিল করে দেওয়া হয়। তাছাড়া একাডেমী অব সায়েন্স থেকেও তাঁকে বের করে দেওয়া হয় এবং নাৎসী সশস্ত্র বাহিনী তাঁর বাড়ী ঘর লুট করে। অধ্যাপক ও ডিরেক্টারের পদ থেকেও তাঁকে সরানো হয়। তারপর তিনি জার্মেনী ছেড়ে চলে আসেন। নাৎসী গভর্ণমেণ্ট আইনষ্টাইনকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে ২০ হাজার মার্ক মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন।

জন্মভূমি জার্মেনী ছেড়ে এলেন ফ্রান্সে, ফ্রান্স থেকে গেলেন বেলজিয়ামে তারপরে ইংল্যাণ্ডে। এই সময়েই আমেরিকা থেকে প্রিন্সটন উচ্চ বিজ্ঞান-শিক্ষা নিকেতনের আজীবন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। সেই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ সালেই আমেরিকায় আসেন। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মার্কিন নাগরিক অধিকারও লাভ করেন। তারপর ১৯৪৫ সালে প্রিন্সটনের ইনষ্টিটিউট অব অ্যাডভান্স ষ্টাডির অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে প্রিন্সটনেই বসবাস করছেন। ১৯০৫ সালে তিনি গণিতের যে সকল থিয়োরী প্রকাশ করেছিলেন সে সব থিয়োরী নিয়েই তার অবসর সময় কাটে।

আণবিক শক্তি উন্নয়নের কাজের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ না থাকলেও ১৯০৫ সালে তিনি বস্তু ও শক্তি সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁর এই বিবৃতির ভিত্তিতেই আণবিক শক্তি উন্নয়ন সম্ভব য়। ১৯৪৬ সালে পরমাণু-বিজ্ঞানীদের

জরুরী কমিটির সভাপতি পদেও তাঁকেই নির্বাচন করা হয়। এই কমিটি গঠনের দু-বছর পরে তাঁকে 'এক বিশ্ব' নামে যে পুরস্কারটি দেওয়া হয় তা গ্রহণ কালে আইনষ্টাইন বলেছিলেন—'জাতির সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে একটি বিশ্বসংস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তার নির্দেশ।'

বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি ব্যতীত তিনি ইহুদীদের ব্যাপারেও আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

আইনষ্টাইনের সকল রচনাই জার্মান ভাষায়। তবে তাঁর লিখিত পুস্তকের বেশীর ভাগই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে।

১৯১৭ সালে তিনি দ্বিতীয় বার তাঁর আত্মীয় এলসা আইনষ্টাইনকে বিবাহ করেন। ১৯৩৬ সালে এলসার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাহির বিশ্বের সঙ্গে আইনষ্টাইনের যোগাযোগ এলসার মারফতেই হয়েছে।

আজ অনেকেই জানেন না যে আইনষ্টাইন কেবল একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীই নন তিনি চমৎকার বেহালাও বাজান। আর পড়াশুনার দিকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় লেখক হলো শেক্সপীয়ার, সোফোকল্‌স্‌ ও ডষ্টয়েভ্‌স্কী। নদীপথে নৌকায় বা জাহাজে বেড়াতে তিনি খুব ভালবাসেন। পায়ে হেটে বেড়ানোতেও তাঁর খুব আনন্দ। স্বভাবটি তাঁর অতি নম্র ও মধুর। আইনষ্টাইনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অনেকে তাঁকে উৎকেন্দ্রিক বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। জীবনকে সহজ করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য, এই সব হলো তারই প্রচেষ্টা।

আমেরিকার এই পয়লা নম্বর শরণার্থীটি স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে বলে থাকেন—'ব্যক্তিগত ভাবে আমি যা কিছু করেছি তা বড়ই বাড়িয়ে বলা হয়ে থাকে। সত্যিকারের সুন্দর তো হলো বিজ্ঞান। আর কারো যদি সারা জীবন বিজ্ঞান সেবার সুযোগ মিলে তবে তো তিনি ধন্য।' ব্যক্তি স্বাধীনতায় যে তাঁর বিশ্বাস কত দৃঢ় তা এই কয়টি কথায়ই প্রকাশ পেয়েছে—'আমাকে যদি বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয় তবে আমি সেই দেশই বেছে নেব ও সেই দেশেই বসবাস করব যে দেশে রয়েছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আইন।'

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওয়াইজম্যানের মৃত্যুর পর ঐ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর স্বভাব-সুলভ বিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন।

আইনষ্টাইন অজ্ঞেয়বাদী। অবিনশ্বরতা ও ব্যক্তিগত ঈশ্বরবাদে তাঁর বিশ্বাস নেই। ব্যক্তিগত মতামতের দিক থেকে স্পিনোজার সঙ্গেই তাঁর খুব মিল রয়েছে।

দুধ টকে কেন?

দুধ টকে কেন? সাধারণ লোকে এ ব্যাপারটা আগে বুঝতে পারত না। অন্তত: এটা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। এমন তো অনেক ঘটনা হামেশাই ঘটে যার কারণ আমাদের জানা নেই। যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁরাই শুধু দিনের পর দিন গবেষণা করে সেই রহস্য ভেদ করেন। তবে দুধ টকে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ সাধারণ লোকে না জানলেও এটুকু তারা জানতো যে, অনাবৃত অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রাখলে বা বাজ পড়লে দুধ টকে যায়।

জীবাণুতত্ত্বজ্ঞেরা কিন্তু শেষের ধারণাটি মোটেই মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন—দুধের উপর বিদ্যুতের কিছু প্রভাব থাকতে পারে বটে, তবে দুধ টকে যাওয়ার মূলে এর কোন ভিত্তি নেই। যদিও তাঁরা এই পরীক্ষা করে দেখেছেন তবুও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, বাজ পড়বার পর দুধ টকে গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো—হয়তো বিদ্যুৎ বাতাসে 'ওজোন' (Ozone) তৈরী করে এবং ঐ গ্যাসের সঙ্গে দুধের সংস্পর্শ ঘটলে দুধ টকে যায়।

এদিকে আবার কোন কোন জীবাণুবিদের গবেষণায় দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে দুধের উপর ওজোনের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই। তাঁরা চিন্তায় পড়লেন। অবশেষে এর হদিস পাওয়া গেল। এক ফোঁটা টক দুধ কাচের স্লাইডে রেখে মাইক্রস্কোপে তাঁরা দেখতে পেলেন—অসংখ্য অতিক্ষুদ্র জীবাণুর দল তার মধ্যে রয়েছে। তাঁরা ভাবলেন—দুধ টকে যাওয়ার জন্যে এই জীবাণুরাই দায়ী। কিন্তু প্রমাণ করা চাই তো? প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞান-জগতের কোন কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

সুতরাং তাঁরা একটা খুব সরু কাচের মুখওয়ালা টেষ্টটিউবে কিছুটা দুধ নিলেন। তারপর দুধটুকু বার্নারে বেশ ভাল করে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত ও বায়ুশূন্য করে টিউবের মুখটি বার্নারের তাপে গলিয়ে এমন ভাবে বন্ধ করে দিলেন যাতে বাইরের বাতাস একদম ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে।

এবার টেষ্টটিউবটিকে ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষার জন্যে রেখে দিলেন।

এমনিভাবে কয়েক মাস ও বিদ্যুৎ-চমকানো দিনগুলির মধ্যে দিয়ে বছর ঘুরে গেল। কিন্তু তবুও সেই টেষ্টটিউবে-রাখা দুধ অবিকৃত রয়েছে দেখা গেল। তখন জীবাণুবিদ্‌রা নিঃসন্দেহ হলেন যে, মাইক্রস্কোপে দেখা আগেকার জীবাণুগুলিই দুধ টকে যাওয়ার কারণ। এদের নাম দেওয়া হলো ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া বা স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌ ল্যাকটারিয়াস্‌। বাজ পড়লে দুধ যে টকে যায় তার কারণও তাঁরা পরীক্ষা করে স্থির করলেন। দুধের মধ্যে যে সকল জীবাণু বাস করে তারা বিদ্যুতের

প্রভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং দুধের শতকরা চার ভাগ শর্করাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অম্লে পরিণত করে।

এই ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া জাতের জীবাণুদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে। আর তাদের আকৃতি যদিও মোটামুটি এক রকমেরই দেখতে তবুও অতি সামান্য মাত্রায় পার্থক্য আছে।

প্রত্যেক শ্রেণীর জীবাণুকে আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রথায় ল্যাবোরেটরীতে কালচার করে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানাও গেছে।

ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া জাতের কোন কোন জীবাণু দুধকে কিছুক্ষণের মধ্যে টকিয়ে দিতে পারে, আবার কারুর কয়েক দিনও লাগে। এদের মধ্যে আবার কোন কোন জাত একেবারেই পারে না।

শ্রীরণজিৎকুমার ভট্টাচার্য

পৃথিবীর উপরিভাগ ও অভ্যন্তরের কথা

কি বিশাল এই পৃথিবী! ১৯৭,৯৫০,২৮৫ বর্গমাইল তার আয়তন। মানুষের কাছে কত বড়! বিচিত্র বস্তুর সমন্বয়ে নিজেকে সে করে রেখেছে অশেষ বৈচিত্র্যের আধার। প্রাচীন লোকেরা ভাবতেন—এই পৃথিবীই বুঝি সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে। আর তারই চারদিকে পরিক্রমণ করছে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক। কিন্তু গ্যালিলিও আর কোপারনিকাসের সময় থেকেই পৃথিবীর সম্বন্ধে লোকের এই ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে।

পৃথিবীর চেহারা গোলাকার। দুটি শক্তির ক্রিয়ায় পৃথিবীর এই রকম অবস্থা ঘটেছে। একটি তার নিজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, আর অপরটি কেন্দ্রাতিগ শক্তি। ফলে নিরক্ষরেখার কাছে উন্নত হয়েছে পৃথিবী।

ভূপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা (সমুদ্র-পৃষ্ঠের ওপর) আধমাইলের কিছু বেশী। সবচেয়ে বেশী উচ্চতা ৫½ মাইল। সমুদ্রের গড়পড়তা গভীরতা হলো দু-মাইল। সবচেয়ে বেশী গভীরতা ৬¾ মাইল। হিমালয় পাহাড়ের চূড়া এভারেষ্টই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা। উচ্চতায় ২৯,১৪১ ফিট। পৃথিবীর সবচেয়ে নীচু জায়গা হলো ডেড্ সী, সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২৯০ ফিট নীচে। মহাদেশগুলির গড় উচ্চতা ২০০০ ফিটের মত। এশিয়া ৩৩০০ ফিট, ইউরোপ ১১০০ ফিট, আমেরিকা ৩১০০ ফিট, আফ্রিকা ২২০০ ফিট, অস্ট্রেলিয়া ৭০০ ফিট ও অ্যান্টার্টিকা প্রায় ৬০০০ ফিট। সমুদ্রগুলির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর ১৪,০৫০ ফিট, আটলান্টিক ১২,৮৮০, ভারত মহাসাগর ১৩,০০০ ফিট। এই

পৃথিবীকে যদি ছোট করে কল্পনা করা যায়, যেমন মনে করা গেল তার ব্যাস ½ মাইল, তখন তার মহাদেশগুলির গড় উচ্চতা মনে হবে ১ ইঞ্চি। এভারেষ্ট মনে হবে মাত্র দশ ইঞ্চি।

পৃথিবীর কঠিন অংশকে বলা হয়েছে লিথোস্ফিয়ার। লিথো মানে পাথর। জলভাগের নাম দেওয়া হয়েছে হাইড্রোস্ফিয়ার। সমস্ত হ্রদ, নদী, সমুদ্র এবং মাটির তলার জলও এই অংশের অন্তর্গত। আর সারা পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে আছে বায়ুস্তর। তার নাম অ্যাটমস্ফিয়ার। যেমন রহস্যভরা এই পৃথিবীর উপরিভাগ আবার তেমনই তার অভ্যন্তর। তার গোপন গর্ভে কি যে সঞ্চিত আছে তা সঠিক জানা যায় নি। প্রতিনিয়ত কত বিস্ময়কর বস্তু যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে তার অন্ধকার অভ্যন্তরে তার সন্ধান পাওয়া বড় শক্ত।

মানুষ মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেতে পেরেছে মাত্র দেড় মাইল। ৪০০০ মাইল যার ব্যাসার্ধ সেখানে কত তুচ্ছ এই দেড় মাইল! তাই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে আমাদের এখনও তেমন কিছু জ্ঞান হয় নি। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরোক্ষ উপায়ে পৃথিবী-গর্ভের খবর জানবার চেষ্টা করছেন। সেই কথাই আজ তোমাদের কিছু বলব।

আশ্চর্য্য রকম গরম এই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। যতই নীচে যাবে ততই উষ্ণতা বাড়বে। সাধারণ একটা খনির মধ্যে নামলেই বোঝা যায় যে, তাপ বাড়ছে। এই তাপ বাড়বার একটা নির্দিষ্ট হার আছে। প্রতি ৬০ ফিট নামলে ১° ফারেনহাইট্ তাপ বাড়ে। এভাবে বাড়তে বাড়তে পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রস্থলে ফাঃ তাপের মাত্রা হয় প্রায় ৩৫০,০০০°।

যেমন তাপ তেমন চাপ। যতই নীচে যাওয়া যাবে তাপের মত চাপও বেড়ে যাবে। ভূতত্ত্ববিদেরা হিসাব করে দেখেছেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে প্রতি বর্গফুট জায়গায় চাপ পড়ে মিলিয়ন টন।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ কেমন? সে কি গলিত ধাতুতে ভরা? এই প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁরা দেখেছেন যে, পৃথিবীর মধ্যভাগে রয়েছে খুব ভারী ধাতু—লোহা আর নিকেল। গ্রহ আর ধূমকেতুর রাসায়নিক উপাদান প্রায় একই। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার ফলে দেখেছেন যে, ধূমকেতু লোহা আর নিকেলে ভরতি। তাই তাঁরা মনে করেছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগেও এই রকম ভারী পদার্থ আছে। ভূতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর সেই অংশটির নাম দিয়েছেন Nife, বাংলায় বলা যেতে পারে অন্তস্তল। এই অন্তস্তলের ব্যাস প্রায় ২২০০ মাইল। এর পরের স্তরেও আছে কিছু লোহা, নিকেল, সিলিকা আর ম্যাগ্‌নেশিয়াম। এর নাম দেওয়া হয়েছে প্যাল্লাসাইট স্তর। এর ওপর বিস্তৃত রয়েছে সিলিকা স্তর।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ অংশই কি তরল? মোটেই না। তাই যদি হতো তাহলে

চাঁদের আকর্ষণে মাটি ফেঁপে উঠত। চাঁদের টানে সমুদ্রের জল যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে, তেমনি করেই জোয়ার উঠতো পৃথিবীর এই স্তরে স্তরে। অবশ্য চাঁদের টানে মাটিতে স্ফীতি আসে। কিন্তু তা এত কম যে, তুচ্ছ করা চলে।

তারপর ধরা যাক, পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা। সারা পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো গড়ে ৫.৫। পৃথিবীর স্তর অবগুণ্ঠিত হয়ে আছে স্তরীভূত শিলায়। তার তলায় রয়েছে আগ্নেয়শিলার কঠিন আবরণ। এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৭৫। কাজেই পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই এমন পদার্থ আছে যাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ৭।৮।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ বলেন পৃথিবীর ভিতরটা গলিত অবস্থায় রয়েছে। আবার কারো মতে বায়বীয়। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা ভূকম্পন স্রোতের সাহায্যে কিছু কিছু খবর পাচ্ছেন। জলে ঢিল ছুঁড়লে যেমন বৃত্তাকারে ঢেউ উঠে এগিয়ে চলে তেমনিভাবে কম্পন-স্রোত জাগে ভূমিকম্পের সময়। এই স্রোত-গুলি নানা স্তরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। বিশেষজ্ঞেরা এই স্রোতকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম দুটি স্রোত কঠিন পদার্থ ভেদ করে এগিয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় স্রোত কঠিন আবরণের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে না। ইদানীং এই স্রোতগুলির গতি দেখেই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রথম স্রোত দুটি প্রায় ১৮০০ মাইল গভীরে গেছে। ৬০০ মাইলের ওপর থেকেই তাদের গতি বদলাতে থাকে। তাই অনুমান করা হয় যে, ৬০০ মাইলের পর নিশ্চয়ই অন্য কোন স্তর রয়েছে; সেখানে অন্য পদার্থের সমাবেশ। একেবারে মধ্যভাগে পৃথক দুটি স্রোতের সাড়া পাওয়া যায় নি। তাই অনেকে ধারণা করেছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যভাগ গলিত ও তরল অবস্থায় আছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ গুটেনবার্গ আরো বিশদভাবে পরীক্ষা করে মধ্যভাগেও প্রথম স্রোতের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। তাই তিনি মনে করেন—পৃথিবীর কেন্দ্রে নিকেল আর লোহা আছে।

শ্রীশিশিরকুমার দাশ

খাদ্যপ্রাণ-এ

ভিটামিনের আবিষ্কার খুব বেশী দিনের কথা নয়। গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও বিজ্ঞানীরা জানতেন না যে, জীবনধারণের জন্যে এই বস্তুটি অপরিহার্য। সবাই ভাবতেন—শুধু আমিষ, চর্বি, শর্করা, কয়েক রকম রাসায়নিক লবণ (Inorganic Salts) এবং জলই খাদ্যের উপকরণ হওয়া উচিত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লুনিন নামে এক বিজ্ঞানী তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটান। তিনি প্রমাণ করেন যে, এইগুলি ছাড়া খাদ্যে আরও একটি জিনিষ অপরিহার্য। লুনিনের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ একটা সাড়া এনে দিল, যার ফলে বহু বিজ্ঞানী এই নতুন আবিষ্কৃত তথ্যটির খুঁটিনাটি অনুসন্ধানে মেতে উঠলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আবিষ্কৃত হলো ; কিন্তু গবেষণার আজও শেষ হয় নি। আর ওই নতুন জিনিষটির নাম দেওয়া হলো ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

দ্রবণের প্রকৃতি অনুসারে ভিটামিনকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। জলে দ্রবণীয় আর চর্বিতে দ্রবণীয়। আজ পর্যন্ত পুরাপুরিভাবে সাতটি ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি হলো এ, বি কম্‌প্লেক্স, সি, ডি, ই, কে ও পি। এর মধ্যে এ, ডি, ই ও কে ভিটামিনগুলি চর্বিতে দ্রবণীয়। এই প্রবন্ধে ভিটামিন-এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলছি।

প্রধানতঃ শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্যে এই খাদ্যপ্রাণটি অপরিহার্য।

রাসায়নিক প্রকৃতির বিচারে এটিকে ক্যারোটিনয়েড গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যায়। ক্যারোটিন (Carotene) নামক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যকৃতের মধ্যে ক্যারোটিন থেকে এর উৎপত্তি। ক্যারোটিনকে অনেকে সেজন্যে প্রাগ্-ভিটামিন-এ বলে থাকেন। আজকাল অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে ভিটামিন-এ তৈরী করা হচ্ছে।

আগেই বলেছি, এটি জলে দ্রবণীয় নয়। দেখতে অনেকটা বর্ণহীন ঘন তেলের মত। উত্তাপে কিছু হয় না বটে, তবে বাতাসে কিংবা বেগনীপারের আলোয় নষ্ট হয়ে যায় অতি সহজে।

কোথায় পাওয়া যায় তা এবার বলছি। কডলিভার ও হ্যালিবাট লিভার নিঃসৃত তেলে ভিটামিন-এ'র পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। তবে অত্যন্ত মূল্যবান বলে শুধু রোগীর জন্যে এগুলি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ খাদ্যবস্তুর মধ্যে দুধ, মাখন, ডিমের কুসুম, মাছ, গাজর, পালংশাক ইত্যাদিতে এ-খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ যথেষ্ট, অন্ততঃপক্ষে একজন সুস্থ লোকের চাহিদা মিটাতে পারে অনায়াসে। তবে ছোট

ছেলেমেয়েদের, শরীর যাদের বৃদ্ধি হচ্ছে, তাদেরই এই ভিটামিনের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

এখন জানা দরকার এর কাজ কি কি? সর্ববিধ শারীরিক গঠনের কাজে ভিটামিন-এ অদ্বিতীয় বললেও চলে। রাত্রে যাঁরা দেখতে পান না বা অল্প দেখেন তাঁদেরও এই খাদ্যপ্রাণটির প্রয়োজন। শরীরের আচ্ছাদক স্নায়বিক তন্তুগুলিকে (Epithelial Tissue) পোষণ এবং তাদের সবরকম গঠনে সাহায্য করে ভিটামিন-এ। রোগ প্রতিরোধক হিসাবে এর কাজ অবহেলার নয়।

রোজকার খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ এ-খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে নানারকম রোগের আবির্ভাব হয়। আফ্রিকা, চীন ও সিংহলের বহু জেলখানা ও পাগলাগারদে দেখা যায় যে, সেখানকার বন্দীদের গায়ের লোম উঠে যায় আর তার সঙ্গে মর্মগ্রন্থিগুলিও বিনষ্ট হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এর কারণ তাদের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ এ-খাদ্যপ্রাণের অভাব।

আশেপাশে এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁরা কিছুক্ষণ আলোয় থাকবার পর হঠাৎ অন্ধকারে গিয়ে পড়লে একেবারে কিছুই দেখতে পান না। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে তাঁরা লুপ্ত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান বটে; কিন্তু এরকম হয় কেন? এরও কারণ মূলতঃ ওই একই।

সহরের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকের খাদ্যেই সচরাচর ভিটামিন-এ'র অভাব দেখা যায়। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে দুধ, ঘি, মাখন তাঁদের জোটে না, আর সহরে বসে টাট্‌কা শাক-সবজীর প্রত্যাশা করাও বৃথা। কাজেই তাঁরা যথোপযুক্ত এ-খাদ্যপ্রাণ পান না। ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়, আর অল্প আক্রমণেই তাঁরা ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং বহু ক্ষেত্রেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হন।

শ্রীঅরূপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বেতার-তরঙ্গের প্রসারণ

আলোক-তরঙ্গ কোন বাধার সম্মুখীন হলে মণ্ডলাকারে বেঁকে যায় বটে, কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। কিন্তু বেতার-তরঙ্গ যখন কোন বাধার সম্মুখীন হয় তখন তা আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী বেঁকে যায়; কারণ বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বেশী। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি (যেমন বাড়ীঘর, গাছপালা ইত্যাদি) থাকায় বেতার-তরঙ্গ বেঁকে যায়। সুতরাং এ সব জায়গায় বেতার-তরঙ্গ গ্রহণের সময় বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ ... যদি তরঙ্গের মাঝপথে কোন বড় রকম পাহাড়ের

সারি বা খুব উঁচু বাধা থাকে তাহলে কিন্তু এই বেতার-তরঙ্গ ভালভাবে বেঁকে যেতে পারে না। আর তার ফলে ঠিক এই পাহাড়ের সারির পিছনে যে স্থান আছে সেখানে গ্রাহকযন্ত্রে এর ক্ষমতার বেশ খানিকটা হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের বাধা-বিপত্তি ছাড়াও এই সমস্ত বেতার-তরঙ্গের আরও অন্য ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া দিন ও রাত্রির তারতম্য এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্নতা হেতুও বেতার-তরঙ্গ প্রসারণে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বেতার-তরঙ্গের বক্রতা থেকে বোঝা যায় যে, কি ভাবে তারা পৃথিবীর বক্রতাকে অনুসরণ করে। কিন্তু এটা দেখা গেছে যে, অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রেরকযন্ত্র থেকে যে বেতার-সংবাদ প্রেরিত হয়ে থাকে তাকে ভূমণ্ডলের প্রায় বিপরীত অংশ থেকে গ্রহণ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী হওয়ার দরুণ বেতার-তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেঁকে যেতে পারে। কিন্তু শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তারতম্যের জন্যেই এই ব্যাপারটা হওয়া সম্ভব নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কেনেলি এবং হিভিসাইড প্রমাণ করেন যে, উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের কোন কোন জায়গায় পৃথিবীর সঙ্গে এক-কেন্দ্রিক কোন একটা মণ্ডলাকার পরিচলনশীল স্তর আছে। এই স্তর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে তরঙ্গগুলি ফিরে আসে। এই স্তরের নাম হলো কেনেলি-হিভিসাইড স্তর বা কণামণ্ডল। এই স্তরের প্রতিফলন ক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, সূর্যের অতিবেগুনী আলো অথবা অন্যান্য বিকিরিত রশ্মির দ্বারা উচ্চ বায়ুমণ্ডলের কণাস্তরের 'আয়োনাইজেসন'-এর ফলেই এই স্তরের প্রতিফলন ক্ষমতা হয়েছে। আমাদের দেশে এই নিয়ে গবেষণা চলেছে। এই স্তর প্রায় ষাট মাইল উচ্চে অবস্থিত। যে কোন আয়োনাইজড্ গ্যাসই তড়িৎ-পরিচালক হয়ে থাকে এবং এই কারণে তড়িৎ-চুম্বকীয় ঢেউগুলি কিয়দংশে প্রতিফলিত হয়ে আসে; যেমন দেখা যায়—একটা সাধারণ পরিষ্কার কাচের ফলকে ধাক্কা খেয়ে আলো কিয়দংশে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। জল এবং মাটি উভয়েই তড়িৎ-পরিবাহক। এখন পৃথিবী-পৃষ্ঠ ও হিভিসাইড স্তরকে যদি একটা ঘরের পরিবাহক মেঝে ও সেই ঘরের ভিতরকার ছাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, এই ঢেউগুলি যেন এই দুটি পরিবাহক স্তরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হতে হতে ভূপৃষ্ঠের বক্রতাকে অবলম্বন করে মণ্ডলাকারে প্রসারিত হয়ে চলেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের কাছাকাছি কোন পথ ধরে সোজা চলতে চলতে এই ঢেউগুলি শীঘ্রই তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এই ভাবে ঢেউগুলি এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে যেখানে তাদের আর কোন হদিস্ পাওয়া যায় না; অর্থাৎ তাদের আর প্রকাশিত করা যায় না।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি হিভিসাইড স্তরের মধ্য দিয়ে সোজাসুজি চলে

ছেলেমেয়েদের, শরীর যাদের বৃদ্ধি হচ্ছে, তাদেরই এই ভিটামিনের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী।

এখন জানা দরকার এর কাজ কি কি? সর্ববিধ শারীরিক গঠনের কাজে ভিটামিন-এ অদ্বিতীয় বললেও চলে। রাত্রে যাঁরা দেখতে পান না বা অল্প দেখেন তাঁদেরও এই খাদ্যপ্রাণটির প্রয়োজন। শরীরের আচ্ছাদক স্নায়বিক তন্তুগুলিকে (Epithelial Tissue) পোষণ এবং তাদের সবরকম গঠনে সাহায্য করে ভিটামিন-এ। রোগ প্রতিরোধক হিসাবে এর কাজ অবহেলার নয়।

রোজকার খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ এ-খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে নানারকম রোগের আবির্ভাব হয়। আফ্রিকা, চীন ও সিংহলের বহু জেলখানা ও পাগলাগারদে দেখা যায় যে, সেখানকার বন্দীদের গায়ের লোম উঠে যায় আর তার সঙ্গে মর্মগ্রন্থিগুলিও বিনষ্ট হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এর কারণ তাদের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ এ-খাদ্যপ্রাণের অভাব।

আশেপাশে এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁরা কিছুক্ষণ আলোয় থাকবার পর হঠাৎ অন্ধকারে গিয়ে পড়লে একেবারে কিছুই দেখতে পান না। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে তাঁরা লুপ্ত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান বটে; কিন্তু এরকম হয় কেন? এরও কারণ মূলতঃ ওই একই।

সহরের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকের খাদ্যেই সচরাচর ভিটামিন-এ'র অভাব দেখা যায়। আথিক অসচ্ছলতার জন্যে দুধ, ঘি, মাখন তাঁদের জোটে না, আর সহরে বসে টাট্‌কা শাক-সবজীর প্রত্যাশা করাও বৃথা। কাজেই তাঁরা যথোপযুক্ত এ-খাদ্যপ্রাণ পান না। ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়, আর অল্প আক্রমণেই তাঁরা ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং বহু ক্ষেত্রেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হন।

শ্রীঅরূপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বেতার-তরঙ্গের প্রসারণ

আলোক-তরঙ্গ কোন বাধার সম্মুখীন হলে মণ্ডলাকারে বেঁকে যায় বটে, কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। কিন্তু বেতার-তরঙ্গ যখন কোন বাধার সম্মুখীন হয় তখন তা আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী বেঁকে যায়; কারণ বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বেশী। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি (যেমন বাড়ীঘর, গাছপালা ইত্যাদি) থাকায় বেতার-তরঙ্গ বেঁকে যায়। সুতরাং এ সব জায়গায় বেতার-তরঙ্গ গ্রহণের সময় বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ ছোট ধরনের বাধা-বিপত্তি না থেকে যদি তরঙ্গের মাঝপথে কোন বড় রকম পাহাড়ের

সারি বা খুব উঁচু বাধা থাকে তাহলে কিন্তু এই বেতার-তরঙ্গ ভালভাবে বেঁকে যেতে পারে না। আর তার ফলে ঠিক এই পাহাড়ের সারির পিছনে যে স্থান আছে সেখানে গ্রাহকযন্ত্রে এর ক্ষমতার বেশ খানিকটা হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। এই ধবনের বাধা-বিপত্তি ছাড়াও এই সমস্ত বেতার-তরঙ্গের আরও অন্য ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া দিন ও রাত্রির তারতম্য এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্নতা হেতুও বেতার-তরঙ্গ প্রসারণে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বেতার-তরঙ্গের বক্রতা থেকে বোঝা যায় যে, কি ভাবে তারা পৃথিবীর বক্রতাকে অনুসরণ করে। কিন্তু এটা দেখা গেছে যে, অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রেরকযন্ত্র থেকে যে বেতার-সংবাদ প্রেরিত হয়ে থাকে তাকে ভূমণ্ডলের প্রায় বিপরীত অংশ থেকে গ্রহণ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী হওয়ার দরুণ বেতার-তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অধিক পরিমাণে বেঁকে যেতে পারে। কিন্তু শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তারতম্যের জন্যেই এই ব্যাপারটা হওয়া সম্ভব নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কেনেলি এবং হিভিসাইড প্রমাণ করেন যে, উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের কোন কোন জায়গায় পৃথিবীর সঙ্গে এক-কেন্দ্রিক কোন একটা মণ্ডলাকার পরিচলনশীল স্তর আছে। এই স্তর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে তরঙ্গগুলি ফিরে আসে। এই স্তরের নাম হলো কেনেলি-হিভিসাইড স্তর বা কণামণ্ডল। এই স্তরের প্রতিফলন ক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, সূর্যের অতিবেগুনী আলো অথবা অন্যান্য বিকিরিত রশ্মির দ্বারা উচ্চ বায়ুমণ্ডলের কণাস্তরের 'আয়োনাইজেসন'-এর ফলেই এই স্তরের প্রতিফলন ক্ষমতা হয়েছে। আমাদের দেশে এই নিয়ে গবেষণা চলেছে। এই স্তর প্রায় ষাট মাইল উচ্চে অবস্থিত। যে কোন আয়োনাইজড্ গ্যাসই তড়িৎ-পরিচালক হয়ে থাকে এবং এই কারণে তড়িৎ-চুম্বকীয় ঢেউগুলি কিয়দংশে প্রতিফলিত হয়ে আসে; যেমন দেখা যায়—একটা সাধারণ পরিষ্কার কাচের ফলকে ধাক্কা খেয়ে আলো কিয়দংশে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। জল এবং মাটি উভয়েই তড়িৎ-পরিবাহক। এখন পৃথিবী-পৃষ্ঠ ও হিভিসাইড স্তরকে যদি একটা ঘরের পরিবাহক মেঝে ও সেই ঘরের ভিতরকার ছাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, এই ঢেউগুলি যেন এই দুটি পরিবাহক স্তরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হতে হতে ভূপৃষ্ঠের বক্রতাকে অবলম্বন করে মণ্ডলাকারে প্রসারিত হয়ে চলেছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের কাছাকাছি কোন পথ ধরে সোজা চলতে চলতে এই ঢেউগুলি শীঘ্রই তাদের শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এই ভাবে ঢেউগুলি এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে যেখানে তাদের আর কোন হদিস্ পাওয়া যায় না; অর্থাৎ তাদের আর প্রকাশিত করা যায় না।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি হিভিসাইড স্তরের মধ্য দিয়ে সোজাসুজি চলে

যেতে পারে। সুতরাং ধারণা করা যেতে পারে যে, নিশ্চয়ই এই স্তরের উপরে আরও একটা আয়োনাইজড্ বায়ুর স্তর আছে যেখানে ধাক্কা খেয়ে এই তরঙ্গগুলি ফিরে আসে। এই স্তরের নাম হলো অ্যাপল্‌টন স্তর। এই স্তরটা প্রায় ১৫০ মাইল উচ্চে অবস্থান করছে। এই স্তর থেকে যে সমস্ত তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় তাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে। এই স্তরকে অনেক সময় F-স্তর বলা হয়ে থাকে। এই স্তরটি হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ। এর নীচেই হলো E-স্তর বা পূর্বোক্ত হিভিসাইড স্তর। এই স্তর থেকে যে সমস্ত তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে থাকে তাদের দৈর্ঘ্য হলো ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মত। এর নীচে হলো D-স্তর বা ওজোন স্তর; এখান থেকে আরও দীর্ঘতর তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়।

শ্রীসুনীলকুমার বিশ্বাস

শোক-সংবাদ

পরলোকে বিখ্যাত শিল্পপতি

গত ৮ই এপ্রিল বিখ্যাত শিল্পপতি এবং মহারাষ্ট্র বণিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ টাইফয়েড রোগে গুজরাটের মেহাসানা জেলার সিধপুরে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। কিছুদিন যাবৎ তিনি আংশিক পক্ষাঘাতে ভুগিতেছিলেন।

১৮৮২ সালে শোলাপুরে শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদের জন্ম হয়। শোলাপুর, পুণা ও বোম্বাই হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি রেলওয়ে ও সেতুর ঠিকাদার হিসাবে ব্যবসায় জীবন আরম্ভ করেন। ভারতীয় জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের তিনি অগ্রদূত ছিলেন। ভারতের প্রথম ও বর্তমানের শ্রেষ্ঠ জাহাজী প্রতিষ্ঠান সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেন। বিশাখাপত্তনমের জাহাজ-নির্মাণ কারখানাটি প্রতিষ্ঠায় শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। শুধু জাহাজ ব্যবসায়ে ও জাহাজ শিল্পেই তাঁহার প্রেরণা সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতে বিমান তৈয়ারীর জন্যও তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। ভারতের প্রথম মোটর এবং একটি বিমান নির্মাণ কারখানাও তাঁহার উদ্যোগে স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া, তিনি ভারত ও সিংহলে কয়েকটি পাইপ-নির্মাণ কারখানাও স্থাপন করেন। কৃষি প্রগতির এবং মাঝারি শিল্প প্রসারেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত বালচাঁদ নগরে বিভিন্ন ধরনের কারখানা ও কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ব্যবসায় ও নানা ধরনের

শিল্প প্রসারে এরূপ বহুমুখী প্রচেষ্টা এদেশে আর বড় একটা দেখা যায় নাই।

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের তিনি সভাপতি ছিলেন:—ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ (১৯২৭), মহারাষ্ট্র বণিক সঙ্ঘ (১৯২৭), আন্তর্জাতিক বণিক সঙ্ঘের ভারতীয় জাতীয় কমিটি (১৯৩২-৩৩), নিখিল ভারত শিল্প মালিক সমিতি (১৯৩৩-৩৪), প্যারিস্থ আন্তর্জাতিক বণিক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি (১৯৩৪-৩৫) এবং জাতীয় মালিক সমিতি (১৯৩৪-৩৫)।

পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি ভারত সরকারের কৃষি-

শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ

গবেষণা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বার্লিনে এবং ১৯৩৯ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সংঘের কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন।

১৯৩০ সালে যখন তৎকালীন ভারত সরকার সামরিক আইন জারী করেন তখন শেঠ বালচাঁদ হীরাচাঁদ তাহার প্রতিবাদে সি-আই-ই খেতাব বর্জন করেন। এই সার্থককর্মা শিল্পপতি ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

পরলোকে ডাঃ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন কর্মসচিব ডাঃ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২রা বৈশাখ ১৩৬০, আমাদের নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়ন বিভাগে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।
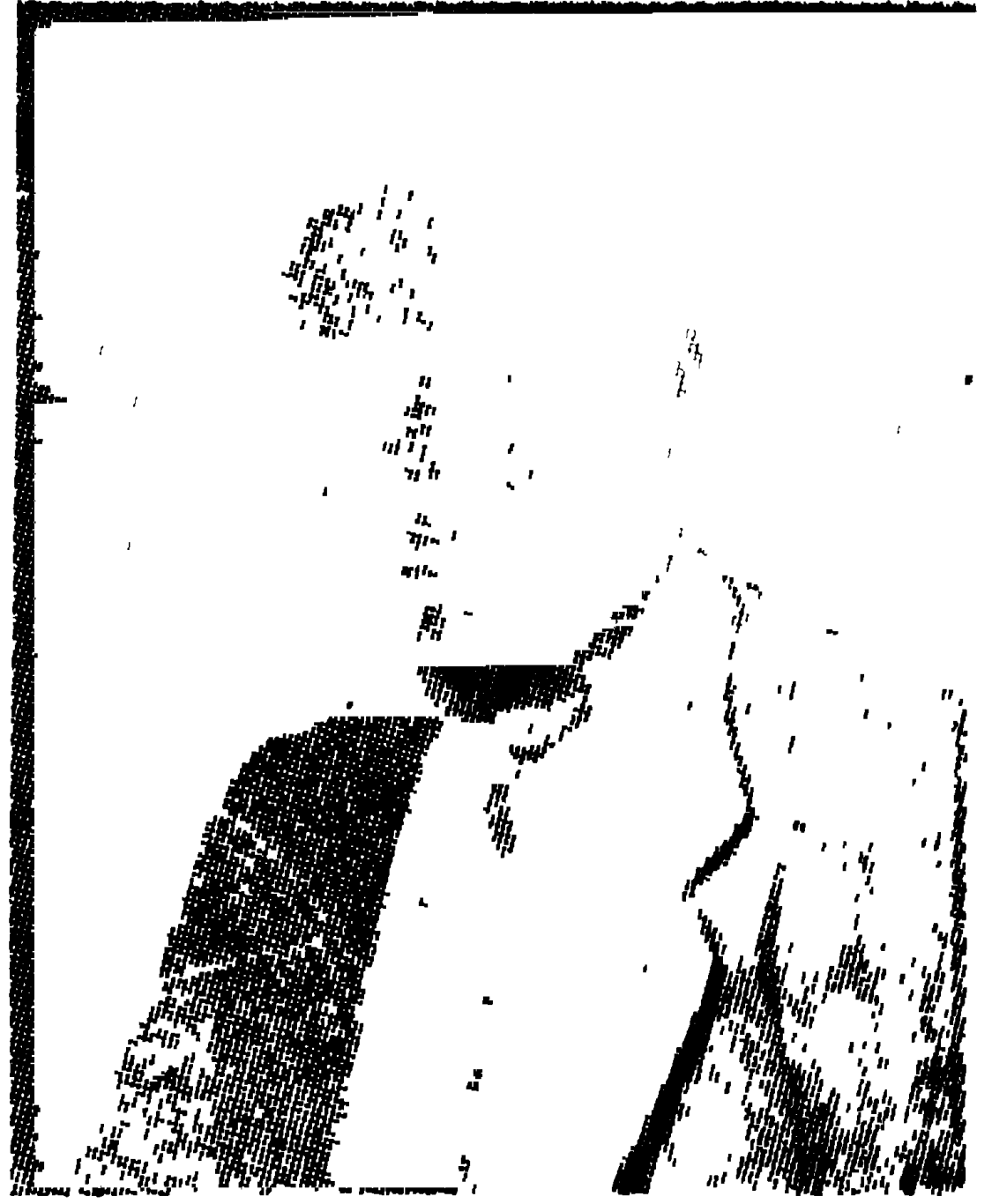
ডাঃ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯৫০ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত গবেষণার কাজে জার্মেনীতে ছিলেন। ১৯৫১ সালের শেষভাগে তিনি জার্মেনী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগের পর শেষ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। অবিচল কর্মনিষ্ঠা, দরদী মন এবং অমায়িক ব্যবহারে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা এবং প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা গভীর দুঃখের সহিত তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন-বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন—১৯৫২

বিজ্ঞান কলেজ — ৩১শে মার্চ, ১৯৫৩

পদার্থবিদ্যা বিভাগের বক্তৃতা গৃহ — মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৫-৩০

পরিষদের এই পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ছত্রিশ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতির দরুণ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সভার কার্য আরম্ভ হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ যথোচিতভাবে আলোচনার পরে সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

কর্মসচিবের বিবরণী

সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ মহাশয় আলোচ্য ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী সভায় পেশ করেন। বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে এই কার্যবিবরণী পঠিত ও মুদ্রিতাকারে সভ্যগণকে প্রদত্ত হয়। এমতা-বস্থায় সভ্যগণ সকলেই এ বিষয়ে সম্যক অবগত আছেন বলিয়া সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এই বার্ষিক কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

উদবৃত্তপত্র ও বাজেট

পরিষদের নির্বাচিত হিসাবপরীক্ষক শ্রীসমীর কুমার মিত্র কর্তৃক ১৯৫২ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী এবং পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক গঠিত ১৯৫৩ সালের ব্যয়-বরাদ্দ মুদ্রিতাকারে সভ্যগণের বিবেচনার জন্য যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী প্রেরিত হইয়াছিল। এই পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও আনুমানিক বাজেট কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভায় পেশ করেন। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এই হিসাব বিবরণী ও বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণ

সভাপতি শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন মহাশয় অতঃপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, পরিষদ পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গত পাঁচ বছরে পরিষদ পরিকল্পিত আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করিয়াছে। আশানুরূপ সাফল্যলাভ করা হয়ত সম্ভব হয় নাই; কিন্তু পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত আমাদের অধিকতর সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি

পরিষদের কার্যকরী সমিতির সুপারিশ ও সাধারণ সভ্যগণের মনোনীত সভ্যগণকে লইয়া ১৯৫৩ সালের জন্য কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি সর্বসম্মতি-ক্রমে নিম্নলিখিতরূপে গঠন করা হয়:—

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	সভাপতি
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	সহঃ সভাপতি
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন	„ „
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী	„ „
শ্রীহিমাদ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়	„ „
শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ	কর্মসচিব

শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়　সহযোগী কর্মসচিব
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়　" "
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ　কোষাধ্যক্ষ

কার্যকরী সমিতির সাধারণ সদস্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়
শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুধাংশুকুমার রায়
শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅরুণকুমার সেন
শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস

এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিষদের নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী সিদ্ধ প্রথম কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ১৯৪৯ সালে গঠিত হয়। এইভাবে ১৯৪৯ সাল হইতে কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর কোন কোন সদস্য পর পর চারিবার নির্বাচিত হইয়া থাকিলে নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৩ সালের জন্য তাঁহারা পঞ্চমবারও নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

সারস্বত সংঘ

সারস্বত সংঘের বিভিন্ন শাখার সভ্যগণ এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্নির্বাচিত হন। সংঘের সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু এবং সংঘ সচিব শ্রীমহাদেব দত্ত যথারীতি স্ব স্ব পদে সর্বসম্মতি-ক্রমে পুনর্নির্বাচিত হইলেন।

হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের ১৯৫৩ সালের হিসাব পরীক্ষার জন্য গত বছরের নির্বাচিত অবৈতনিক হিসাব-পরীক্ষক শ্রীসমীরকুমার মিত্র মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে পুন-নির্বাচিত হন; আরও স্থির হয় যে, হিসাব পরীক্ষার কাজে তাঁহার সহকারীকে পরিষদের ব্যবস্থানুযায়ী কার্যকরী সমিতির অনুমোদিত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে।

অনুমোদক মণ্ডলী

এই বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহ বিধি-সম্মতভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন :—

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী

নিয়মাবলী সংস্কার

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩নং ধারা সংশোধনের প্রস্তাব এই অধিবেশনে উত্থাপনের বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রত্যেক সভ্যের নিকট যথাসময়ে প্রেরিত হইয়াছিল। অতএব অধিবেশনের কার্যসূচীতে বিষয়টির আর পুনরুল্লেখ না হইলেও সংশোধনী প্রস্তাবটি এই অধিবেশনে উত্থাপিত হউক। শ্রীমহাদেব দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। সভাস্থ সভ্যবৃন্দের কোনরূপ আপত্তি না থাকায় সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। নিয়মসংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব হিসাবে জনৈক সভ্য সভাপতি ও কর্মসচিব উভয় ক্ষেত্রেই উক্ত ১৩নং ধারার সংস্কারের জন্য মত প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে সংশোধনী প্রস্তাব না হইয়া কার্যতঃ একটি নূতন প্রস্তাব বলিয়া সভাপতি মহাশয় উহা নাকচ করিয়া দেন।

অতঃপর শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের সমর্থনে নিয়মাবলীর ১৫নং ধারার মূল সংশোধনী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রস্তাবটির সপক্ষে ভোট গণনা করা হয়। উপস্থিত ৩৬ জন সভ্যের মধ্যে ২৪ জন প্রস্তাবটির অনুকূলে ভোট দেন। এইভাবে উপস্থিত সভ্যগণের দুই তৃতীয়াংশের অনুকূল মত অনুসারে সভাপতি মহাশয় নিয়মাবলীর উক্ত ১৫নং ধারার নিম্নরূপ সংস্কার গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন :—

"কোন সভ্য একই কর্মাধ্যক্ষ পদে পর পর অনধিক পাঁচ বার নির্বাচিত হইতে পারিবেন; কেবল মাত্র সভাপতি পদের জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা চলিবে।"

অতঃপর স্থির হয় যে, অত্র গৃহীত সংশোধনী প্রস্তাবটি নিয়মানুযায়ী অন্যূন পনেরো দিন পরে একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিয়া অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হইবে। এবং তারপরে উহা পরিষদের নিয়মতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যথোচিতভাবে গণ্য হইবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গত ১৯৫২ সালের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণকে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে সভার কার্য শেষ হয়।

শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
সভাপতি

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
কর্মসচিব

অনুমোদকমণ্ডলীর স্বাক্ষর :—

১। শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী
২। শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়
৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, বঙ্গবিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ হইতে মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | মে—১৯৫৩ | পঞ্চম সংখ্যা

রোমক আমলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ মাত্র। গ্রীক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে রোমকদের নিজস্ব চিকিৎসাবিদ্যা বলিয়া যাহা ছিল তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির নামগন্ধও ছিল না। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সমগ্র রোমক আমলে ল্যাটিন ভাষাভাষী জাতিদের মধ্যে একজনও খ্যাতনামা চিকিৎসক বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন নাই। এস্‌ল্‌পিয়াডেস্‌, ওরিবেসিয়াস্‌, সেল্‌সাস্‌, গ্যালেন-প্রমুখ যে কয়েকজন প্রথিতযশা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নাম রোমক আমলে পাওয়া যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা ছিলেন গ্রীক। তবে চিকিৎসা-বিদ্যায় ব্যক্তিগতভাবে রোমক প্রতিভার নিদর্শন না থাকিলেও অন্যভাবে রোমকেরা এই বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল। রোমকেরাই ইউরোপে প্রথম হাসপাতাল ব্যবস্থার উদ্ভাবক। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থারও প্রথম প্রবর্তক রোমক জাতি। এই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়া রোমকেরা চিকিৎসা-বিদ্যায় যুগান্তর আনিয়াছিল। চিকিৎসাবিদ্যার বিবর্তনের ইতিহাসে রোমকদের এই অবদান বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। রোমক জাতির সংগঠন ক্ষমতার ইহা একটি অকাট্য নিদর্শন।

এস্‌ল্‌পিয়াডেস্‌ (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৪০)

বিথিনিয়ার গ্রীক চিকিৎসক এস্‌ল্‌পিয়াডেসের সময় হইতে রোমে চিকিৎসা-বিদ্যার আলোচনা ও অধ্যাপনার সূত্রপাত হয়। এস্‌ল্‌পিয়াডেস্‌ রোমক কবি ও দার্শনিক লুক্রেটিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার মত এপিকিউরীয় দর্শন বিশ্বাস করিতেন। ইরাসিস্ট্রেটাসের* অনুকরণে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় আণবিক মতবাদ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন। রোমে চিকিৎসা-বিদ্যা

* আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী)। তিনি নরদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতেন; শারীরবৃত্তে তাহার অনেক মৌলিক অবদান আছে। মস্তিষ্ক, নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারায় স্বকীয়তার ছাপ বর্তমান। তিনি আণবিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে এই মতবাদ প্রয়োগ করেন।

নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন।' তাঁহার মৃত্যুর পরেও এই বিদ্যাপীঠ বহুদিন সক্রিয় ছিল।

এস্‌ল্‌পিয়াডেস্ শুধু সুচিকিৎসক ছিলেন না, সুশিক্ষকও ছিলেন। নানা দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে আসিত। এই শিষ্যবর্গ পরে কয়েকটি সমিতি ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে। এই সমিতি বা চতুষ্পাঠীসমূহে চিকিৎসাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা ও তর্কের ব্যবস্থা করা হইত। প্রায় অল্পকালের মধ্যেই এই আলোচনা-চক্রগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। সম্রাট অগাষ্টাসের রাজত্বের (খৃঃ পূঃ ২৭—খৃঃ অঃ ১৪) শেষের দিকে অথবা সম্রাট টিবেরিয়াসের রাজত্বের (খৃঃ অঃ ১৪-৩৭) সময় এই সমিতিগুলি মিলিত হইয়া রোমের এস্‌কুইলিন পাহাড়ের উপর একটি নাতিবৃহৎ সভাগৃহ নির্মাণ করে। এই সভাগৃহই রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে Schola medicorum নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থাপিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই Schola medicorum রোমক সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থসাহায্য লাভ করে এবং তাহার ফলে এইখানে নিয়মিতভাবে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপনা ও চর্চা সম্ভব হয়। প্রথম প্রথম সভাগৃহের অধ্যাপকেরা ছাত্রদের বেতন হইতেই নিজেদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। সম্রাট ভেস্‌পাসিয়ান (খৃঃ অঃ ৭০—৯) সর্বপ্রথম রাজকোষ হইতে এইসব অধ্যাপকদের মাসহারার বন্দোবস্ত করেন এবং পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম চিকিৎসা-বিদ্যার অধ্যয়ন ও চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। অল্পকালের মধ্যে ইতালীর অন্যান্য সহর রোমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার এইরূপ আলোচনা-চক্র বা সমিতি স্থাপন করে। ক্রমে ইতালীর বাহিরে মার্সেই, বর্দো, আর্ল, নিম্, লিয়োঁ, সারাগোসা প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র ও আলোচনা-চক্র গড়িয়া উঠে। এই সব কেন্দ্রে প্রধানতঃ ব্যবহারিক চিকিৎসাবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। সৈন্যবাহিনীতে চিকিৎসক হিসাবে যোগদানে অভিলাষী ব্যক্তিরা এই কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে আসিত এবং সেই দিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট প্রয়োজন মিটাইতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণার দিক হইতে এই ধরনের কেন্দ্র অবশ্য ফলপ্রসূ হয় নাই।

ওফিডিউস্

সিসিলীয় গ্রীক টাইটাস ওফিডিউস্ ছিলেন এস্‌ল্‌পিয়াডেসের ছাত্র। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে ফারিংটন লিখিয়াছেন—'Aufidius, however, had genius of a rare quality!'* তাঁহার প্রতিভার কথা বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। বিখ্যাত রোমক চিকিৎসক ও গ্রন্থকার সেল্‌সাসের কার্যাবলী বিচার ও সমালোচনা করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, সেল্‌সাস নিজেই তাঁহার রচনা ও গ্রন্থাবলীর জন্য বহুলাংশে ওফিডিউসের নিকট ঋণী। ওফিডিউস্ সুচিকিৎসক ছিলেন; তিনি রোগ অপেক্ষা রোগীর অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতেন। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা-ব্যবস্থা যে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত এবং চিকিৎসা-ব্যাপারে সার্বজনীনতা যে বিশেষ ক্ষতিকর, এই মত তিনি দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতেন। রোগীর পথ্য ও তাহার যথাযথ প্রয়োগের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন,—'উপযুক্ত সময়ে রোগীকে খাদ্য দিতে পারিলে ইহা অপেক্ষা উত্তম ঔষধ আর হয় না। অনেক প্রাচীন চিকিৎ-

* Greek Science. Part 2—B. Farrington, Pelican ; p. 128.

সকের মতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ দিবসের পূর্বে রোগীকে পথ্য দেওয়া উচিত নয়। ···এস্ল্পিয়াডেস্ রোগীকে তিন দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাহারে রাখিয়া চতুর্থ দিন তাহার পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন।···এই সকল কোন নিয়মই সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নহে। প্রয়োজনমত প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। আবার প্রয়োজনমত চতুর্থ বা পঞ্চম দিবস পর্যন্ত পথ্য বন্ধ রাখাও যাইতে পারে।···পথ্য কখন দিতে হইবে তাহা নির্ভর করিবে রোগের স্বরূপ, দেহের অবস্থা, আবহাওয়ার অবস্থা, রোগীর বয়স ও ঋতু প্রভৃতির উপর।' ওফিডিউসের আর একটি মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চিকিৎসকের খুব ঘন ঘন রোগীকে পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান করা উচিত। এই জন্য একাধিক চিকিৎসকের উপর রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ অনুচিত।

সেল্সাস্ (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী)

সেল্সাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থকার। টিবেরিয়াসের রাজত্বকালে চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় তিনি এক বিরাট গ্রন্থ *De re medica* রচনা করেন (আনুমানিক ৩০ খৃষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। সেল্সাসের সময় পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস জানিবার পক্ষে ইহাই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে নানাবিধ রোগ, তাহাদের কারণ, পথ্য ও ঔষধ ও সর্বশেষে শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনা করা হইয়াছে। *De re medica* সেল্সাসের মৌলিক রচনা নহে; ইহা প্রায় পুরাপুরি পূর্ববর্তী গ্রীক চিকিৎসকদের গ্রন্থ ও রচনাবলী হইতে গৃহীত। এই সংগ্রহের কাজে, কাহারও কাহারও মতে, তিনি ওফিডিউসের কাছে ঋণী; অবশ্য তিনি ওফিডিউসের নাম কদাচিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচনা-মাধুর্যের জন্য প্রাচীন গ্রন্থকারদের মধ্যে সেল্সাস

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
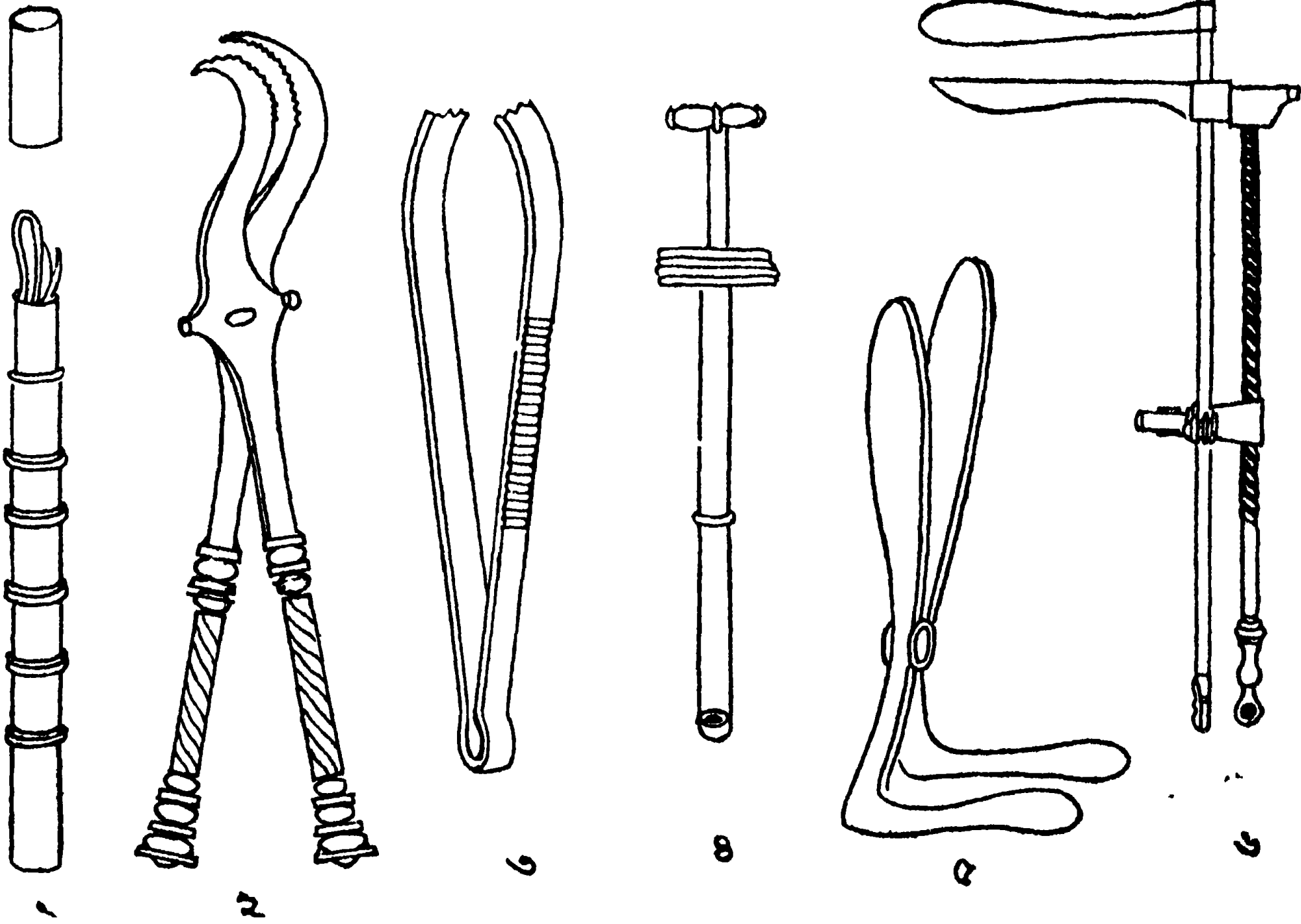
১নং চিত্র
সে যুগের শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি

এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মুদ্রণ-কৌশল আবিষ্কৃত হইলে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে *De re medica*-ই প্রথম মুদ্রিত হয় ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে।

De re medica-এর শল্য চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনাগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। বহু দুরূহ অস্ত্রোপচার ক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গলগণ্ডের অস্ত্রোপচার, টনসিল অস্ত্রোপচার; মুখের অভ্যন্তরস্থ বা মুখ-মণ্ডলের বিকৃতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচার, অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় প্লাস্টিক সার্জারি; অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নাসারন্ধ্রের ঝিল্লী বহিষ্কার করা ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। দন্তরোগ ও দন্ত সম্বন্ধীয় শল্যচিকিৎসারও আলোচনা আছে। তাঁহার সময়ে শল্যচিকিৎসায় কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত সেল্‌সাস্ তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। এই সব যন্ত্রপাতির কিছু কিছু নমুনা পম্পাই-এর ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন; ১নং চিত্রে এইরূপ কয়েকটি নমুনা প্রদর্শিত হইল।

গ্যালেন (১৩০ ২০০ খৃষ্টাব্দ)

প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে হিপোক্রেটিসের পরেই পার্গামামের অধিবাসী গ্যালেনের আসন। জ্যোতিষ ও ভূগোলের ইতিহাসে ক্লডিয়াস টলেমীর যে স্থান, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্লডিয়াস গ্যালেনও অনুরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর গবেষণার ধারায়ও প্রচুর মিল আছে। কোপার্নিকাস্, টাইকোব্রাহি, কেপ্‌লার প্রভৃতি রেনেঁশীয় বিজ্ঞানীরা যেমন টলেমীর জ্যোতিষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা এই বিদ্যার অন্তর্নিহিত ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নূতন জ্যোতিষ ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনার সন্ধান দিলেন, ভেসালিয়াস্, হার্ভি প্রমুখ রেনেঁশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাও তেমনি গ্যালেনের অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্তের নানা ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া সমগ্র শারীরবৃত্তের রূপ ও ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন। টলেমী ও গ্যালেন উভয়েরই কর্মময় জীবন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নিবদ্ধ। উভয়েই নিজ নিজ শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও মতবাদ স্বীয় গবেষণা, দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া সেই সেই শাস্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় সাধনের দ্বারা যে মতবাদ প্রচার করিলেন, পরবর্তী প্রায় দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আর কোন বিজ্ঞানী তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই। এই দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকেরই ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, জ্যোতিষে টলেমী এবং শারীরবৃত্ত ও অ্যানাটমিতে গ্যালেন যাহা প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই হইল শেষ কথা।

১৩০ খৃষ্টাব্দে এসিয়া মইনরের পার্গামামে গ্যালেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন স্থপতি ও গণিতজ্ঞ। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। স্মার্ণা, কোরিন্থ, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি এই বিদ্যা অতীব যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত আয়ত্ত করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালে তিনি একবার একটি নরকঙ্কাল পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর সহিত ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ প্রত্যক্ষ পরিচয়; কারণ মানবদেহ-ব্যবচ্ছেদ তাঁহার সময়ে নিষিদ্ধ ছিল। হিরোফিলাস্ ও ইরাসিস্ট্রেটাসের আমলে আলেকজান্দ্রিয়াতে নরদেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতেও এইরূপ ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সম্বন্ধে জনমত ক্রমশঃ কঠিন ও তীব্র হওয়ায় নরদেহ ব্যবচ্ছেদ ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

এই জন্য অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে গ্যালেন যে মতবাদ পোষণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে গ্যালেন পার্গামামে গ্ল্যাডিয়েটর বা মল্লযোদ্ধাদের শৈল্য-চিকিৎসকের পদে চারি বৎসর অতিবাহিত করেন। তখনকার দিনে প্রদেশের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই ভাগ্যান্বেষণের জন্য রোমে আসিয়া বসবাস করিত। গ্যালেনও রোমে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অনতিকালের মধ্যে রোমের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হন। সম্রাট মার্কাস্ অরেলিয়াস্ গ্যালেনের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজ-চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে গ্যালেন মার্কাসের সঙ্গী হইয়াছিলেন। রাজচিকিৎসকের গুরু দায়িত্ব ও অবসরহীন জীবনের মধ্যেই তিনি সময় করিয়া গবেষণা করিয়াছেন। প্রাণীদেহ ব্যবচ্ছেদ এবং বিশ্বকোষের মত গ্রন্থরাজিও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গ্যালেনের রচনার মধ্যে এপর্যন্ত একশতটি গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৮২১-৩১ সালের মধ্যে কুন গ্যালেনের সমগ্র রচনাবলী সঙ্কলিত করিয়া প্রকাশ করেন। কুড়িটি বৃহৎ খণ্ডে এই সঙ্কলন সমাপ্ত। যে সব রচনা ও গ্রন্থ নিঃসন্দেহে গ্যালেনের লেখনীপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গ্যালেন ইহা অপেক্ষা যে অনেক বেশী লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার গবেষণাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) অ্যানাটমি সংক্রান্ত ও (২) শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত।

অ্যানাটমি সম্বন্ধীয় গবেষণার মধ্যে প্রথমে অস্থি-র কথা ধরা যাক। আলেকজান্দ্রিয়ায় নর-কঙ্কাল পরীক্ষা করিবার পর হইতে মানবদেহের অস্থি সংস্থান সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল প্রথম জাগ্রত হয়। অস্থিগুলি তিনি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন—(১) অভ্যন্তরে বরাবর নলবিশিষ্ট লম্বা অস্থি ও (২) নলবিহীন চ্যাপ্টা অস্থি। তিনি

২নং চিত্র
মানুষ ও Macacus বানরের হাতের পাতার মাংসপেশীর ছবি

২৪টি কশেরুকা বা ভার্টিব্রা চিহ্নিত করিয়া সেগুলির এক নির্ভুল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন; পঞ্জরাস্থি, উরঃফলক, কণ্ঠাস্থি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-র বর্ণনাও তিনি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্ধি ও সন্ধি-বন্ধনীগুলি দুই প্রকার—যথা, গতিবিশিষ্ট ও গতিহীন। এইসব অস্থি ও সন্ধির তিনি যে নামকরণ করেন, অধিকাংশক্ষেত্রে এখনও সেই সব নামই প্রচলিত আছে। *On the bones* নামক পুস্তকে অস্থি-র কথা আলোচিত হইয়াছে।

মাংসপেশীর বর্ণনায় ও শ্রেণী-বিভাগে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই বিষয়ে তিনিই সকলের অগ্রণী। মাংশপেশীর গবেষণা সম্পর্কে গ্যালেন *Macacus inuns* নামে একজাতীয় বানরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন। এই বানবের সহিত মানুষের দেহের অনেক বাহিক সাদৃশ্য আছে; সুতরাং *Macacus* বানরের দেহ-ব্যবচ্ছেদ হইতে ইহার মাংসপেশী সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানা যাইবে তাহা যে মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া গ্যালেন এই জাতীয় বানরকে তাঁহার গবেষণার কাজে বাছিয়া লন। এই বিষয়ে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যে কিরূপ নির্ভুল ছিল তাহা ২নং চিত্রে প্রদত্ত মানুষ ও Macacus বানরের হাতের পাতার মাংসপেশীগুলির সাদৃশ্য হইতেই প্রমাণিত হইবে। প্রাণীদেহ-ব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতা হইতে মানবদেহের মাংসপেশীর গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া গ্যালেন অনেক ক্ষেত্রেই পাঠককে সতর্ক করিয়াছেন যে, তাঁহার এই বর্ণনা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইবে না।

গ্যালেন মস্তিষ্ক ও রক্তবহা নাড়ীসমূহের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য অস্থি ও মাংসপেশীসংক্রান্ত গবেষণা ও বর্ণনার তুলনায় মস্তিষ্ক ও নাড়ীসমূহের বর্ণনা তাঁহার অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, গ্যালেনের এইরূপ গবেষণার ফলে অ্যানাটমি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নরদেহ ব্যবচ্ছেদের সুযোগ পাইলে তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে যে দৈন্য ও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তাহা হয়তো সংশোধিত হইতে পারিত। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। গ্যালেনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াই ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসালিয়াস্ (১৫১৪-৬৪) নরদেহ-ব্যবচ্ছেদেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে গ্যালেনেব ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রথম ধরিতে সমর্থ হন।

নার্ভ-তন্ত্র সম্বন্ধে গ্যালেনের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মেরুরজ্জু বা সুষুম্নাকাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার মধ্যবর্তী মেরুরজ্জুতে আঘাত লাগিলে শ্বাসবোধ ঘটে এবং ষষ্ঠ কশেরুকা ও তার নিম্নবর্তী রজ্জু আঘাত প্রাপ্ত হইলে বক্ষদেশের মাংসপেশীসমূহ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। আরও নিম্নদেশে সংঘটিত হইলে এই আঘাত মূত্রাশয়, অন্ত্র ও নিম্নদিকের প্রত্যঙ্গসমূহে পক্ষাঘাতের কারণ হয়। এইভাবে প্রায় সমগ্র মেরুরজ্জুর জৈবক্রিয়ার বিষয় তিনি বিশদভাবে ও অতীব দক্ষতার সহিত গবেষণা ও বর্ণনা করেন।

গ্যালেন কর্তৃক প্রস্তাবিত বিখ্যাত শারীরবৃত্ত এইবার আলোচনা করিব। শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহাব মতবাদ দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে চিকিৎসাজগতে আধিপত্য কবিয়াছে। এই মতবাদ আংশিকভাবে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ও আংশিকভাবে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের সহিত সমাঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রচিত। গ্যালেনের বহু পূর্ব হইতে জীব-জগতকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল—উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। উদ্ভিদের ধর্ম—বৃদ্ধি, প্রাণীর ধর্ম— বৃদ্ধি ও গতি এবং মানুষের ধর্ম—বৃদ্ধি, গতি ও মনন-শক্তি। স্টোইক দার্শনিকেরা প্রচার করিতেন যে, কস্‌মস্-জাত নিউমা

(pneuma) বা বায়ু উপরোক্ত তিন প্রকার জৈবধর্মের জন্য দায়ী; এই নিউমা-ই জীবনী শক্তির মূল উৎস। নিউমার যে রূপান্তরের ফলে জৈবধর্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় তাহার নাম Natural Spirit বা স্বাভাবিক শক্তি। নিউমার আর এক রূপান্তরের ফলে প্রাণীরা গতিশীল হয়। রূপান্তরিত সেই নিউমার নাম Vital Spirit বা জীবনী শক্তি। নিউমা আবার Animal Spirit বা চিৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হইলে সেই চিৎ-শক্তির প্রভাবে জীবেরা মননশক্তির অধিকারী হয়।

জৈবধর্ম সম্বন্ধে স্টোইকদের এই নিউমা-বাদে গ্যালেন বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদের সহিত দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া গ্যালেন সুকৌশলে এক অতি-মৌলিক পরিকল্পনা দাঁড় করাইলেন। পরিকল্পনাটি হইতেছে এইরূপ—দেহাভ্যন্তরস্থ পরিপাকতন্ত্র, যকৃৎ, শ্বাসতন্ত্র, নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন তন্ত্রের জৈবক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল নিউমাকে স্বাভাবিক শক্তি, জীবনী শক্তি ও চিৎ শক্তিতে

৩নং চিত্র

গ্যালেনের প্রস্তাবিত শোণিত-সঞ্চালন ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় ক্রিয়া পদ্ধতি

পরিণত করা। যকৃতে এই নিউমা স্বাভাবিক শক্তি-রূপে; হৃৎপিণ্ডে জীবনী শক্তি রূপে এবং মস্তিষ্কে চিৎ শক্তিরূপে বিরাজ করে। বিভিন্ন পর্যায়ে রক্ত এই ত্রিবিধ শক্তি অর্জন করিয়া এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া মানুষের বৃদ্ধি, পুষ্টি, গতি ও মননশীলতা সম্ভব করিয়া থাকে। খাদ্যের সারবস্তু অন্ত্র হইতে যকৃতে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রথমতঃ রক্তে পরিণত হয় (৩নং চিত্র)। এই রক্ত আবার যকৃৎস্থিত স্বাভাবিক শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করিবার গুণ অর্জন করে। যকৃতে উৎপন্ন রক্তের কিয়দংশ এইবার হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে এবং এইখানে তাহার দূষিত পদার্থ ফুস্‌ফুসীয় ধমনীপথে ত্যাগ করিয়া শোধিত হয়। রক্তের দূষিত পদার্থ ফুস্‌ফুসীয় ধমনী হইতে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া পরে শ্বাসনালীপথে প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহিরে নির্গত হয়। এইভাবে শোধিত হইবার পর শিরাগুলির মধ্যে রক্ত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। শিরার রক্তের সবটুকুই শিরার মধ্যে থাকিয়া যায় না; ইহার এক ক্ষুদ্র অংশ হৃৎপিণ্ডের দুই নিলয়ের অন্তর্বর্তী সেপ্‌টাম মাংসপেশীর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য ছিদ্রপথে দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের এই বাম নিলয়ে জীবনী শক্তিরূপে নিউমা বিদ্যমান। নিশ্বাসের সহিত গৃহীত বায়ু বা নিউমা শ্বাসনালী হইতে ফুস্‌ফুস ও ফুস্‌ফুসীয় শিরার মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ে প্রবেশ করিয়া সেইখানে জীবনী শক্তিতে পর্যবসিত হয়। রক্ত দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করিবার পর Vital Spirit বা জীবনী শক্তির স্পর্শে নূতন গুণের অধিকারী হইলে জীবনী শক্তি-সম্পন্ন উৎকৃষ্ট রক্ত ধমনীর মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া বিভিন্ন দেহাংশকে ক্রিয়াশীল রাখে। ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের কিয়দংশ আবার মহাধমনী-পথে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কস্থ চিৎ শক্তি অর্জন করে। মস্তিষ্কে রক্তকে চিৎ শক্তির গুণ অর্জন করিতে *rete mirabile* নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নালীর জাল বিশেষভাবে সাহায্য করে। চিৎ শক্তিসম্পন্ন এই সর্বোৎকৃষ্ট রক্ত নার্ভের মধ্যস্থতায় দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি ও অনুভূতির সৃষ্টি করে।

এইভাবে গ্যালেন জৈবক্রিয়ার এক অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। এই ব্যাখ্যা অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্তসংক্রান্ত পরীক্ষা ও পর্য-বেক্ষণলব্ধ বহু তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্যালেন যে দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সত্যতা ও অকাট্যতা যুগে যুগে বহু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষী স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পরবর্তী বহু শতাব্দী যাবৎ তাঁহার এই ব্যাখ্যা নিখুঁত ও অভ্রান্ত বলিয়া যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! অবশ্য আজ আমরা জানি—এই ব্যাখ্যা ভুল; ইহা ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা মৌলিক দোষ-ত্রুটীতে পরিপূর্ণ। যেমন, সেপ্‌টাম্ মাংসপেশী ভেদ করিয়া শিরা হইতে ধমনীতে রক্ত-প্রবাহের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ সেপ্‌টাম্ হৃৎপিণ্ডস্থ দুই নিলয়ের মধ্যে এক কঠিন ও অভেদ্য প্রাচীর বিশেষ। *Rete mirabile* নালীগুলির সাহায্যে মস্তিষ্কে রক্তের চিৎ শক্তি অর্জনের পরিকল্পনা ভ্রান্ত, কারণ এই নালীগুলি মানুষের মস্তিষ্কে থাকে না, গ্যালেন ইহাদের দেখিয়াছিলেন রোমন্থনকারী গবাদি পশুর মস্তিষ্কে। তারপর তিন প্রকার রক্তের কথা উল্লেখ এবং ইহাদের পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি রক্ত-সঞ্চালনের প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি শারীরবৃত্তে উপকার অপেক্ষা অপকারই করিয়া গিয়াছেন বেশী। তাঁহার সহজ সরল ব্যাখ্যার আকর্ষণ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে বহুদিন এই পরিকল্পনার মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। প্রায় দেড়

হাজার বৎসর পরে ইংরাজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭) যুগান্তকারী রক্ত-সংবহন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গ্যালেনের সমগ্র পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করিয়া দেন এবং সমগ্র শারীর-বৃত্তের বনিয়াদ সম্পূর্ণ নূতনরূপে গড়িয়া তোলেন। ফারিংটনের ভাষায়—'Even then it was Galen who had triumphed over Galen, Galen the observer who had triumphed over Galen the philosopher, for it was Galen's technique Harvey had learned at Padua.'*

গ্যালেনের রচনায় ও ভাবধারায় হিপোক্রেটীয় নীতি ও আদর্শের অনেক ছাপ আছে। হিপোক্রেটিসের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্যে এই রচনাবলীর প্রথম প্রণেতার যে সুমহান ছবি, আদর্শবাদী যে এক মহাপুরুষের চরিত্র আমাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে, গ্যালেনের রচনা পাঠে তাহা হয় না। তৎপরিবর্তে এক অতি পরিশ্রমী, কর্মঠ, সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ বৈষয়িক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর চরিত্রের কথা গ্যালেনের রচনা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, গ্যালেন ছিলেন অতিমাত্রায় ধর্মভীরু। প্রাণীদের গঠন-বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সর্বদা ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেখিতে পাইতেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঈশ্বর যে কোন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই, অ্যারিষ্টটল্ প্রবর্তিত এই মতবাদে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।

গ্যালেন কোন চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন নাই। তাঁহার অনুগামী শিষ্যের সংখ্যাও খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। ২০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তিনিই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপিত হইলে ইউরোপ খণ্ডে এই বিজ্ঞানের উপর বহু শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে।

রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা

ব্যক্তিগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও পূর্তবিদ্যাবিশারদ রোমকজাতি তাহাদের অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতা বলে পরোক্ষভাবে চিকিৎসা-ব্যবস্থার যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ রাখিয়া রোমক পূর্তবিদ্যা-বিশারদেরা নগর, গৃহাদি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপ খনন প্রভৃতি কার্যের পরিকল্পনা রচনা করিত। স্বাস্থ্য-প্রীতি রোমকদের একরূপ জাতীয় বিশেষত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটির নীচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ এইরূপ নর্দমার ল্যাটিন নাম cloacae। ক্লোসিয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমের প্রধান ক্লোসিয়ের

৪নং চিত্র
রোমের প্রধান ক্লোসিয়ের নক্সা

* Greek Science—Part II; p. 160

একটি নক্সা ৪নং চিত্রে দেখানো হইল। ইকুইডাক্ট বা পরিবাহের সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। পরিবাহের সাহায্যে প্রত্যহ তিন শত মিলিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ করা হইত। এইরূপ ১৪টি পরিবাহের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এই প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রন্টিনাস (৪০-১০৩) De aquis urbis Romae নামক গ্রন্থে এই সব পরিবাহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রভৃতি ব্যাপারে রোমক রাষ্ট্রপতিরা বহু প্রাচীনকাল হইতেই নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষু গর্ভবতী নারীর শিশুর জীবনরক্ষার্থ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মুক্ত করিবার বিধান রোমক আইনে বহু প্রাচীনকাল হইতে দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জুলিয়াস সিজার এইভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার স্মারক হিসাবে এই অস্ত্রোপচারের নাম আজও সিজারীয় অস্ত্রোপচার নামে পরিচিত।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়িত্ব আছে রোমক রাষ্ট্রপতিদের এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিৎসক নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকারী চিকিৎসকদের বলা হইত আর্কিয়াত্রি (archiatri)। প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের চিকিৎসার জন্য সরকারী চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিয়া জনসাধারণকেও সরকারী চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আনুমানিক ১৬০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট এন্টোনিনাস্ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ধনীর চিকিৎসা অপেক্ষা দরিদ্রের চিকিৎসায় অধিকতর যত্নবান ও মনোযোগী হইতে সরকারী চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। পৌর-প্রতিষ্ঠান হইতে এই সব চিকিৎসকের বেতন দেওয়া হইত। সহরের গুরুত্ব ও লোকসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকদের সংখ্যা নির্ধারিত হইত; যেমন প্রাদেশিক রাজধানী প্রভৃতি বড় বড় সহরে ১০ জন আর্কিয়াত্রির বন্দোবস্ত থাকিত, আদালত আছে এইরূপ সহরে ৭ জন এবং ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র সহরগুলিতে ৫ জন করিয়া আর্কিয়াত্রি থাকিত। আর্কিয়াত্রিদের আয়কর দিতে হইত না।

সামরিক বিভাগে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যাপারেও রোমকরা অগ্রণী ছিল। আলেকজাণ্ডার তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করিতেন। কিন্তু রোমকদের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশী প্রণালীবদ্ধ। একদল চিকিৎসক ও এই কার্যের উপযোগী সহকারী বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক রোমক সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকিত। রোমকদের সামরিক সাফল্যের জন্য এই ব্যবস্থা বড় কম দায়ী নহে। বেসামরিক ও সামরিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলন সত্ত্বেও সাধারণভাবে রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দানে অক্ষমতার এক যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটাই তাহারা বিচার করিয়াছে বেশী। কিন্তু এই শাস্ত্রে নূতনতর জ্ঞানের সন্ধান দেওয়া ও সেই উদ্দেশ্যে গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা রোমকরা কদাপি উপলব্ধি করে নাই বা করিবার চেষ্টাও করে নাই। যে কোন কারণেই হউক আমরা দেখি, সকল প্রকার তত্ত্বীয় জ্ঞানের প্রতিই রোমকজাতি একান্তভাবে বিরূপ ও উদাসীন। অথচ ব্যবহারিক ও ফলিত বিদ্যার্জনে তাহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের অন্ত নাই।

ঠিক একই কারণে হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারেও আমরা রোমকদের আশ্চর্য সংগঠন-

শক্তির পরিচয় পাই। গ্রীকদের হাসপাতাল বলিয়া কিছু ছিল না। চিকিৎসা তাহাদের কাছে নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এস্‌কুলাপিয়াসের মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন গ্রীসের কোন কোন স্থানে অবশ্য ছোট-বড় চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল; তবে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ঠিক হাসপাতাল এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা চলে না। সাধারণতন্ত্রের যুগে রোমকদেরও হাসপাতাল বলিয়া কিছু ছিল না। এই সাধারণতন্ত্রে বহু ক্রীতদাসের বাস ছিল; কিন্তু অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া এই দুর্ভাগাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। গ্রীকদের অনুকরণে সাধারণতন্ত্রী রোমকেরা টিবের দ্বীপে এস্‌কুলাপিয়াসের এক মন্দির নির্মাণ করে। কাজের অযোগ্য অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত ক্রীতদাসদের চিকিৎসার দায়িত্ব ও হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য টিবের দ্বীপের এই মন্দিরে একরূপ আজীবন নির্বাসন দেওয়া হইত। অবশ্য এই দ্বীপে নির্বাসিত হইবার অনতিকালের মধ্যেই অধিকাংশ হতভাগ্য ক্রীতদাসের জীবনান্ত হইত। খৃষ্টীয় ৪১-৫৪ অব্দের মধ্যে সম্রাট ক্লডিয়াস এক আদেশ জারি করিয়া এইরূপ রোগগ্রস্ত ক্রীতদাসদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। সুস্থ হইয়া উঠিলে ইহাদের ভূতপূর্ব প্রভুর নিকট ক্রীতদাসরূপে ফিরিয়া যাইবার আর বাধ্যবাধকতা থাকিত না। যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই এই মন্দির রচিত হউক না কেন, কালক্রমে দরিদ্র, হতভাগ্য, আশ্রয়হীন ক্রীতদাসদের ইহাই একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। অধ্যাপক সিঙ্গারের মতে এস্‌কুলাপিয়াসের মন্দিরকেই সর্বসাধারণের জন্য প্রথম হাসপাতাল হিসাবে মনে করা যাইতে পারে।*
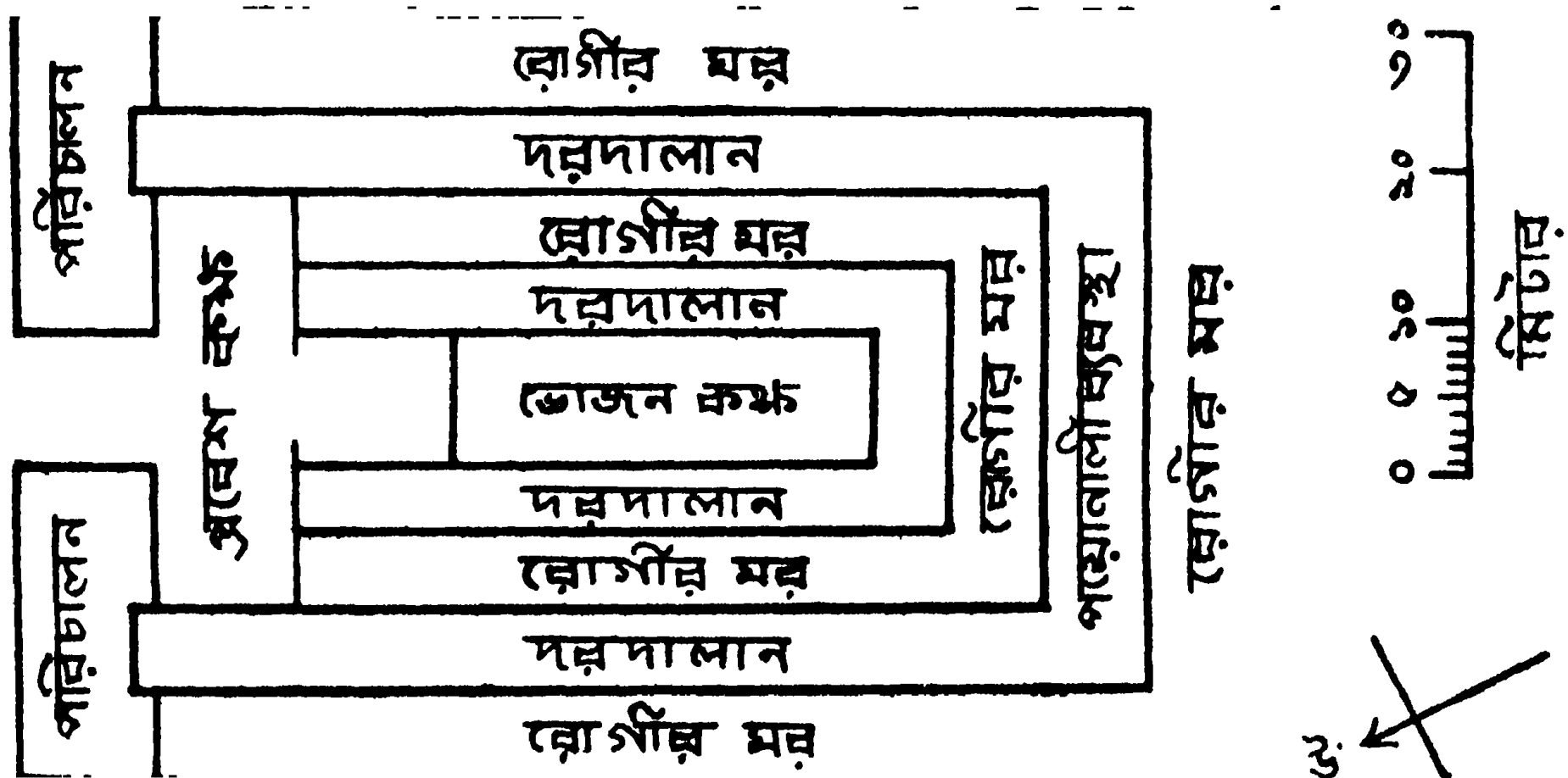
৫নং চিত্র

রোমক আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত সামরিক হাসপাতালের একটি নমুনা

ভেলিটুডিনারিয়া (Valetudinaria) বা একপ্রকার রুগ্নাগারের কথাও জানা যায়। এই রুগ্নাগারে ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তিরাও অসুস্থ হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। তারপর চিকিৎসকেরাও নিজেদের গৃহ এইরূপে নির্মাণ করাইত যাহাতে প্রয়োজনমত সাময়িকভাবে কয়েকজন

* A Short History of Medicine—Singer, p 49.

রোগীকে সবসময়েই চিকিৎসার জন্য আশ্রয় দান করা যায়। আধুনিক কালের নার্সিংহোমের সঙ্গে তৎকালীন চিকিৎসকদের এইজাতীয় গৃহগুলি তুলনীয়। মৃত্তিকা খননে পম্পাই-এর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করিয়া এই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রোমক সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা সম্ভবতঃ বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করে। প্রথমদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যেরা অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে চিকিৎ-সার জন্য তাহাদের স্বীয় নগরে, সহরে বা জন্মস্থানে প্রেরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী সৈন্যদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশে ফিরিবার পরিবর্তে নিকটবর্তী কোন স্থানের রুগ্নাগারে চিকিৎসার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহাতে সৈন্যদের জন্য বিশেষ ধরনের রুগ্নাগার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করিবার পরিকল্পনা সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের মাথায় প্রথম আসে এবং কালক্রমে এইরূপ সামরিক রুগ্নাগার বা হাসপাতাল তাহারা অনুমোদন করেন। ইউ-রোপের বিভিন্ন স্থানে রোমকদের সময়ে নির্মিত এই ধরনের সামরিক হাসপাতালের অনেক ধ্বংসা-বশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ডুসেল-ডর্ফের নিকটে নোভেসিয়াম নামক স্থানে প্রাপ্ত ও আনুমানিক খৃষ্টীয় ১০০ অব্দে স্থাপিত এক সামরিক হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।_এই হাসপালের একটি নক্সা ৫নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। উত্তর দিকে হাসপাতালের প্রবেশ পথ, ইহার দুইপাশে পরিচালন কক্ষ বা অফিস ঘর। ইহার পরেই একটি বড় ঘর আগন্তুকদের বিশ্রাম ও অপেক্ষার জন্য। তারপরেই একটি ছোট দ্বার দিয়া ভোজনকক্ষে পৌছিবার ব্যবস্থা। হাসপাতালের তিন দিকে দুই সারি দরদালান এবং এই দরদালানের উভয় পার্শ্বে সারি সারি রোগীর ঘর। দক্ষিণ দিকে বাহিরের দরদালানের নীচ দিয়া পয়োনালীর ব্যবস্থা; এইখান দিয়া ময়লা নিকাশ হইত। সমগ্র নক্সায় আধুনিকতার ছাপ সুপরিস্ফুট এবং আধুনিক যুগের পূর্বপর্যন্ত ইহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ধরনের সামরিক হাস-পাতাল ব্যবস্থার আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

রহস্যময় ভাইরাস

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আইওয়ানৌস্কি কর্তৃক ভাইরাস আবিষ্কার জীবাণুবিদ্যায় এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিযাছে। ভাইরাসের অস্তিত্ব আণুবীক্ষণিক জীববিজ্ঞানে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। জীব ও জড়ের কয়েকটি সাধারণ গুণ ভাইরাসে পরিলক্ষিত হয়। তাই উহারা জীব না জড়, আবিষ্কারের দিন হইতে এই প্রশ্ন আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মনে কৌতূহল উদ্রেক করিতেছে। উহাদের প্রজনন-রীতি ও সংক্রমণ-ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়ের বস্তু! ভাইরাসের জীবত্ব এবং জড়ত্ব লইয়া যে প্রশ্ন, তাহার আংশিক সমাধান হইলেও ভাইরাসের আচরণ ও প্রকৃতি আজও রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে।

জীবাণুতত্ত্বজ্ঞেরা ভাইরাসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রাতীত পরিশোধনযোগ্য, সংক্রমণশীল জীবকোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আইওয়ানৌস্কি এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বাইজারিক মোজেইক রোগাক্রান্ত তামাক পাতা নিষ্পেষিত রস লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় লক্ষ্য করেন যে, বীজাণুমুক্তকারী ফিল্টারের মধ্য

দিয়া পরিস্রুত করিবার পরেও সেই রসের রোগ সংক্রমণ-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু সেই পরিস্রুত রসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন বীজাণুর অস্তিত্ব লক্ষিত হয় নাই। এই জন্য বাইজারিঙ্ক ঐ রসকে 'Living fluid contagium' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। কারণ এই রস অন্য সুস্থ তামাক পাতার সংস্পর্শে আসিলে সেই পাতায় মোজেইক রোগ সংক্রমিত হইত। কলেরা রোগাক্রান্ত শূকরের দেহের রক্ত জমিয়া যাওয়ার পর উহার জলীয় অংশ বা সিরাম ফিল্টারের সাহায্যে বীজাণুমুক্ত করিয়া অন্য সুস্থ শূকরের দেহে প্রবিষ্ট করাইলে উহারও কলেরা হয়। যতবার ইচ্ছা এইভাবে রোগ-সংক্রামিত করা যাইতে পারে।

আজ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বিভিন্ন ভাইরাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও জীবাণুবিদেরা নিষ্প্রাণ বস্তুতে ভাইরাসের চাষ করিতে পারেন নাই।

ভাইরাসগুলি ক্ষুদ্রতম বীজাণু হইতেও ক্ষুদ্র। উহারা ঊর্ধ্বে ৩০০ মিলিমিউ হইতে নিম্নে ১০ মিলিমিউ পর্যন্ত হইতে পারে। বাইজারিঙ্ক যাহাকে সজীব তরল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহা তরল নহে। ভাইরাসগুলি কণাকৃতি। আল্ট্রা-ফিল্ট্রেশন ও আল্ট্রা-সেণ্ট্রিফিউজের তলানির হার এবং ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ প্রভৃতির সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে উহাদের কণাকৃতি প্রমাণিত হইয়াছে। ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে ত্রিশ হাজার হইতে এক লক্ষ গুণ বাধতাকারে উহাদের কতকগুলি কক্কাস জাতীয় জীবাণুর ন্যায় দানাদার অবস্থায় দেখা যায়।

যত রকমের ভাইরাস আছে তার সব কয়টিই পরনির্ভরশীল বা পরভোজী। উহারা প্রাণবন্ত জীব ও উদ্ভিদকোষেই বাস করে। নিষ্প্রাণ কোষে উহাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই। একই ভাইরাস বিভিন্ন প্রাণীতে বা বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন ভাইরাস-রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। এমন কি, একই উদ্ভিদের বিভিন্ন কোষশ্রেণীতে এক এক জাতীয় ভাইরাস পাওয়া যায়। প্রাণবন্ত কোষে প্রবেশ করাইবা মাত্রই উহারা দ্রুত প্রজনন-ক্ষমতা অর্জন করে। জীবাণু অপেক্ষা ইহাদের প্রজনন-ক্ষমতা অত্যন্ত দ্রুত ও বেশী। প্রজনন-কালে উহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিব্যক্তি (Mutation) লক্ষিত হয়। যেমন ভ্যাক্‌সিনিয়া ভাইরাস সময় সময় ভ্যারিওলা ভাইরাসেও পরিবর্তিত হইতে পারে; পীতজ্বরের ভাইরাস বানরের দেহে স্নায়ুমণ্ডলীর এন্‌সেফালাইটিস্ রোগ উৎপাদনকারী ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়।

দেহে রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টি করা ভাইরাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য। স্লুট্‌জ্ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, জীব অথবা উদ্ভিদের দেহে একবার ভাইরাসের আক্রমণ ঘটিলে সেই দেহে সেই রোগের পুনরাক্রমণ ব্যাহত করিবার ক্ষমতা জন্মে। রোগভেদে এই রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতার মেয়াদ কম-বেশী হয়। যেমন সাধারণ সর্দির প্রতিরোধক ক্ষমতার মেয়াদ অত্যন্ত কম, আবার বসন্তের প্রতিরোধক ক্ষমতার মেয়াদ অতিশয় দীর্ঘ। ভাইরাস-ঘটিত আক্রমণের পর জীবদেহের রক্তে অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয় এবং উহারা সেই ভাইরাসের পুনরাক্রমণ প্রতিরোধ করে। তাই ভাইরাসের তৈয়ারী প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তবে মৃত ভাইরাসের দ্বারা টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই।

অন্যান্য বীজাণুর উপর বীজঘ্ন পদার্থের যে বিষক্রিয়া হয়, ভাইরাসের উপর ঠিক তাহাই হয়। তবে কতকগুলি ভাইরাস আছে যাহাদের উপর বীজঘ্ন পদার্থের ক্রিয়া অত্যন্ত লঘু, আবার এমন ভাইরাসও আছে যাহাদের উপর বীজঘ্ন পদার্থের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত।

মোজেইক রোগাক্রান্ত তামাক পাতা হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যান্‌লি ভাইরাসের নিউক্লিওপ্রোটিন

দানা পাইয়াছেন। এই সকল দানা তখনও সংক্রামক থাকে; এই নিউক্লিওপ্রোটিন দানাকে বীজাণুমুক্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া সুস্থ, সবল তামাক পাতায় মাখাইলে সেই তামাক পাতায়ও মোজেইক রোগ দেখা দেয়। এই রোগাক্রান্ত গাছ হইতে অনুরূপভাবে কেলাসিত করিয়া নিউক্লিওপ্রোটিন পাওয়া যায়। ঠিক এইভাবেই বাউডেন ও পিরি এক রকম টোমাটো গাছ হইতে কেলাসিত অবস্থায় ভাইরাসের নিউক্লিওপ্রোটিন পাইয়াছেন। মোজেইক ভাইরাস হইতে যে নিউক্লিওপ্রোটিন পাওয়া গিয়াছে তাহার আণবিক ওজন অত্যন্ত বেশী। এই আণবিক ওজন ১৭×১০৬ হইতে ৫×১০৮ হইতে পারে। মোজেইক ভাইরাসের নিউক্লিওপ্রোটিনে শতকরা ৬ ভাগ থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড আর বাকী ৯৪ ভাগ থাকে প্রোটিন। এই নিউক্লিক অ্যাসিড ঈষ্টের নিউক্লিক অ্যাসিডেরই মত, তবে ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিডের আণবিক ওজন একটু বেশী (আণবিক ওজন প্রায় ৩×১০৫)। এই সব ভাইরাসে নিউক্লিওপ্রোটিন ছাড়াও অন্যান্য বস্তু পাওয়া গিয়াছে। যেমন প্রায় ২২৫ মিলিমিউ ব্যাসবিশিষ্ট ভ্যাক্‌সিনিয়া ভাইরাসে নিউক্লিও-প্রোটিন ছাড়াও কার্বোহাইড্রেট, ফ্ল্যাভিন, রিবোফ্ল্যাভিন্, ফস্‌ফেটেজ, ক্যাটালেজ প্রভৃতি এবং সামান্য পরিমাণে কপারও (তামা) পাওয়া গিয়াছে।

ভাইরাসগুলি জীবাণু না জড়াণু—ইহা একটি প্রধান ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। উহারা জীব হইলে অস্বাভাবিক গুণসমন্বিত, আবার জড় হইলেও অপ্রত্যাশিত গুণধর। উহারা জীব ও জড়ের উর্ধ্বে নূতন অন্য কিছু হইতে পারে কি? অথবা জড় ও জীবের সমন্বয়ে এক নূতন কিছু?

বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে উহাদের পার্থক্য এই যে, উহারা প্রজনন করিতে পারে এবং উহাদের প্রকৃতিগত পরিব্যক্তি (mutation) ঘটিতে পারে। আর বীজাণুর সঙ্গে উহাদের পার্থক্য এই যে, উহারা বীজাণুর মত নিষ্প্রাণ কোষে প্রজনন করিতে পারে না এবং অন্য সকল বীজাণুর ন্যায় অণুবীক্ষণে দৃষ্ট হয় না।

ভাইরাসকে জীবাণু হিসাবে গ্রহণ করিলে জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি ভাইরাসের থাকা দরকার; যেমন—উত্তেজনা, চলন, বিপাক (metabolism), প্রজনন ও জীবনকাল। সাধারণ প্রাণী বা জীবাণু স্বভাবতঃ ভৌতিক ও রাসায়নিক দ্রব্যে যেভাবে সাড়া দেয় ভাইরাসের ক্ষেত্রেও তাহা পাওয়া যায়। যেমন বীজাণুনাশক পদার্থ, বেগনীপারের আলো, তাপ, শৈত্য ইত্যাদিতে ভাইরাসের সাড়া পাওয়া যায়; অর্থাৎ প্রায় ক্ষেত্রেই উহারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। ভাইরাসগুলি বৈদ্যুতিক নেগেটিভ চার্জ বহন করে এবং ক্যাটাফরেসিসের দ্বারা উহাদের অ্যানোডে একত্রিত করা যায়। ভাইরাস শুধু উচ্চ জীবকোষ এবং উদ্ভিদকোষকেই আক্রমণ করে না, উহারা নিম্নতম বীজাণুকোষকেও আক্রমণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ট্যুয়র্ট ও ডি-হেরেল লক্ষ্য করেন যে, ভাইরাস বীজাণুদের আক্রমণ করিতে পারে। এই সব বীজাণু-আক্রমণশীল ভাইরাসকে ব্যাক্‌টেরিওফাজ বলে। ভাইরাসগুলি কণাকৃতি। অবশ্য বিভিন্ন রকম ভাইরাসের আকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। যে তিনশত ভাইরাস আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের দৈর্ঘ্য বা ব্যাস বিভিন্ন। পোলিওমায়েলাইটিস্-ভাইরাস হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জা-ভাইরাস বড়, ভ্যাক্‌সিনিয়া-ভাইরাস ইহার চেয়ে বড়; ভ্যাক্‌সিনিয়া হইতে ভ্যারিওলা-ভাইরাস বড়। ইলেক্‌ট্রন মাইক্রস্কোপে ভাইরাসের জটিল তথ্য প্রকাশিত হইতেছে এবং উহাতে উহাকে বীজাণুর মতই দেখায়। ভ্যাক্‌সিনিয়া-ভাইরাসগুলি বীজাণুর কাছাকাছি। নির্জীব কোষে চাষ করা সম্ভব হইলে উহাদের জীবাণু হিসাবে গ্রহণ করিবার বাধা দূর হইবে।

ফিল্টারের মধ্যে আটকায় না, এমন অনেক বীজাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরিশোধনযোগ্য

বীজাণুর কথা স্মরণ করিয়া রোজনাও এবং কেণ্ডাল মনে করেন যে, ভাইরাসগুলি বীজাণুর জীবন-চক্রের একটি অবস্থা। এই মতবাদের পক্ষে বলা যায় যে, পোলিওমায়েলাইটিস্ ভাইরাসের বিশুদ্ধ চাষে ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্ জাতীয় বীজাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনুরূপ কারণে কেহ কেহ মনে করেন, পীতজ্বরের ভাইরাস, Lectospira icteroides নামক জীবাণুর পরিশোধনযোগ্য অণুবীক্ষণ-যন্ত্রাতীত অবস্থা। শূকরের কলেরার ভাইরাস অন্য একটি জীবাণুর (B. suipestifer) পরিশোধনযোগ্য অবস্থা। এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা প্রমাণিত হয় নাই। হাল্ডি প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা উহাতে সন্দেহ পোষণ করেন।

অনেকে আবার এই ভাইরাসকে প্রটোজুনের জীবন-চক্রের একটি অবস্থা বলিয়া অনুমান করেন। অনেকে আবার ভাইরাসকে 'মুক্ত নিউক্লিয়াস্' বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে এই 'মুক্ত নিউক্লিয়াস্' জীবন্ত কোষের সংস্পর্শে আসিলেই প্রজনন করিতে পারে।

জীবাণু হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রতিকূল অবস্থাগুলির মধ্যে একটি হইতেছে উহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু। ভাইরাসের স্বাভাবিক মৃত্যু এখনও অজ্ঞাত। শ্বাসপ্রশ্বাস, পরিপাক, পরিত্যজন (Excretion) সম্বন্ধে বলিতে গেলে কিছুই জানা যায় নাই। দশ মিলিমিউ আকৃতিবিশিষ্ট দেহে বিপাকীয় প্রক্রিয়ার এই সব জটিল ক্রিয়াসমূহ কিরূপে সংঘটিত হয় তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার। ভাইরাসের প্রজনন দ্রুত, কিন্তু কোন্ পদ্ধতিতে এই প্রজনন সাধিত হয় তাহা অপরিজ্ঞাত। উহারা কি বীজাণুর মত কোষবিভাজনের দ্বারা প্রজনন করে, না অন্য কোন নূতন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে, তাহা জানা যায় নাই।

মোজেইক ভাইরাসের কেলাসনের সময় উহার নিউক্লিওপ্রোটিনে ন্যূনতম জলের সন্ধানও পাওয়া যায় নাই। ফলে সমস্যা হইতেছে, জলহীন অবস্থায় উহার জটিল বিপাকীয় প্রক্রিয়া (metabolic activity) কি করিয়া সম্ভব হয়?

কতকগুলি দ্রব্য ভাইরাসের দেহে যে পরিব্যক্তি (mutation) আনিতে পারে, সেই পরিব্যক্তি সন্তান-সন্ততিক্রমে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে কিনা জানিবার জন্য ভাইরাসের উপর তেজস্ক্রিয় ফস্ফরাস দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল; কিন্তু তেমন কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

মোজেইক ভাইরাস হইতেছে উচ্চ আণবিক ওজনের নিউক্লিওপ্রোটিন। নিউক্লিওপ্রোটিনের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, যদিও উহারা কোষহীন রাসায়নিক পদার্থ তথাপি প্রাণবন্ত কোষে নূতন ভাইরাস সৃষ্টি করিতে পারে।

অনেকে ভাইরাসকে এনজাইম হিসাবেও গণ্য করেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া হয়তো ভাইরাস-রোগ বিশেষজ্ঞ রিভার্স প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত ভাইরাসকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রথমভাগে ক্ষুদ্র জীবাণু এবং জীবের সমস্ত লক্ষণ না হইলেও অধিকাংশ লক্ষণ পরিদৃশ্যমান। দ্বিতীয় ভাগ হইতেছে জড়াণু—উহাদের মধ্যে জড়ের লক্ষণ বেশী, জীবাণুর গুণাবলী অপরিস্ফুট। আর তৃতীয় ভাগে রহিয়াছে একদল (প্রায় ৫০টি) বিভিন্ন ভাইরাস, যাহারা রোগ সংক্রমণে সক্ষম; কিন্তু উহারা জীবও নয়, জড়ও নয়—হয়তো বা নূতন কিছু।

শর্করা খাদ্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, চরক, দ্রব্যগুণাভিধান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে দ্রব্যের পর্যায় ও গুণাদি-সংগ্রহে দেখা যায় যে, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে গুড় ও চিনি বলিতে কেবলমাত্র ইক্ষুরসজ গুড় ও চিনিকে বুঝায়।

"ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো জায়তে
লোষ্ট্রবদ্ দৃঢ়ঃ।
স গুড়ো গৌড়দেশে তু
মৎস্যণ্ডেব গুড়ো মতঃ॥"

ইক্ষুরস অগ্নিসংযোগে পরিপক্ক হইয়া লোষ্ট্র-সদৃশ কঠিনাকারে পরিণত হইলে তাহাকে গুড় বলে। গৌড় দেশে 'মৎস্যণ্ডী'কে গুড় বলিয়া থাকে। ঈষৎ দ্রবভাবাপন্ন গাঢ়তর পক্ক ইক্ষুরসকে মৎস্যণ্ডী (সার গুড়) বলে। বাংলাদেশই প্রাচীন কালে গৌড় দেশ বলিয়া অভিহিত হইত।

বর্তমানেও ভারতে আখের গুড় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। চিনি ও আখের গুড়ের ব্যবহারিক হিসাব দেওয়া হইল:

(জন প্রতি বাৎসরিক গড় হিসাব)

বৎসর	মোট ব্যবহৃত চিনি (১০০০ টন)	মোট ব্যবহৃত আখের গুড় (১০০০ টন)	জন প্রতি চিনি (পাউণ্ড)	জন প্রতি গুড় (পাউণ্ড)	জন প্রতি চিনি ও গুড়ের হিসাব (পাউণ্ড)
১৯৩১-৩২	৯৮২	২,৭৫৮	৬'২	১৭'২	২৩'৪
১৯৩২-৩৩	১,০০৬	৩,২৪০	৬'৩	২০'২	২৬'৫
১৯৩৩-৩৪	৯৯৬	৩,৪৮৬	৬'১	২১'৫	২৭'৬
১৯৩৪-৩৫	১,০৫৯	৩,৭০১	৬'৫	২২'৬	২৯'১
১৯৩৫-৩৬	১,০৭৪	৪,১০১	৬'৫	২৪'৮	৩১'৩
১৯৩৬-৩৭	১,১৬৭	৪,২৬৮	৭'৩	২৬'৭	৩৪'০
১৯৩৭-৩৮	১,১৫৯	৩,৩৬৪	৭'২	২০'৯	২৮'১
১৯৩৮-৩৯	১,০৭৩	২,১৮৬	৬'৬	১৩'১	১৯'৭
১৯৩৯-৪০	১,০৭৪	১,৯৯৯	৬'৪	১৮'০	২৪'৪
১৯৪০-৪১	১,৩৭৬	২,৮১৭	৮'৫	২০'৬	২৭৩
১৯৪৪-৪৫	১,২৩৬	২,৮২৮	৮'০	২২'১	৩০'১
১৯৪৮-৪৯	১,১৮২	২,৮৩৭	৮'৯৬	১৭'৫	২৬'৫
১৯৪৯-৫০	১,১৮৪	২,৭১৪	৭'০	১৭'২	২৪'২
১৯৫০-৫১	১,১৯৫	৩,১৩২	৭'৬	১৯'৪	২৭'০

আখের গুড়ের ব্যবহারিক পরিমাণ চিনির উর্ধ্বে এবং তাহার উৎপাদনের পরিমাণ ভারতে মোট চিনি উৎপাদনের প্রায় তিন গুণ। নিম্নে উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল :

বৎসর	আনুমানিক গুড় উৎপাদনের পরিমাণ (১০০০ টন)	চিনি উৎপাদনের পরিমাণ (১০০০ টন)
১৯৪৩—৪৪	২,৮৩৩	১,২০১
১৯৪৪—৪৫	২,৮২৮	৯৪২
১৯৪৫—৪৬	২,৭১২	৯২২
১৯৪৬—৪৭	৩,০৫৮	৯০১
১৯৪৭—৪৮	৩,৪৯২	১,০৭৪
১৯৪৮—৪৯	২,৮৩৭	১,০০৮
১৯৪৯—৫০	২,৭১৪	৯৭৯
১৯৫০—৫১	৩,১৩২	১,১১১

শর্করা জাতীয় খাদ্য হিসাবে ভারতবর্ষে আখের চিনি ও আখের গুড় ছাড়াও নিকৃষ্ট ধরনের লাল-চিনি, যেমন—খণ্ড বা খাণ্ড-চিনি ও ভূরা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং গুড় হইতে চিনি এবং চিনি হইতে মিছরি তৈয়ারী হয়। এই সকল শর্করা জাতীয় খাদ্যকে ইক্ষু-রসজ বলা হইবে। বীট-চিনি ভারতবর্ষে প্রস্তুত না হইলেও ইহা আখের চিনির মতই গুণ-সম্পন্ন এবং একই পর্যায়ভুক্ত ; ইহাই আখের চিনির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। পৃথিবীর মোট বীট ও আখের চিনির উৎপাদনের পরিমাণের হিসাব দেওয়া হইল :

(১,০০০ টন—প্রতি টন ২,২৪০ পাউণ্ড হিসাবে।)

বৎসর	বীট-চিনি	আখের চিনি	পৃথিবীর মোট উৎপন্ন চিনির পরিমাণ
১৯১৩—১৪	৮,৬৩৫	৯,৮০২	১৮,৪৩৭
১৯১৯—২০	৩,২৫৯	১২,২৩৬	১৫,৪৯৫
১৯২৩—২৪	৫,৮৬১	১৩,৮৩৮	১৯,৬৯৯
১৯২৪—২৫	৮,১৮৫	১৪,৯৩৪	২৩,১১৯
১৯৩৬—৩৭	১০,২৩১	১৭,৫১৭	২৭,৭৪৮
১৯৩৭—৩৮	১১,০৫৪	১৮,০১৬	২৯,০৭০
১৯৩৯—৪০	১১,৪৫৫	১৮,২৫৬	২৯,৭১১
১৯৪৫—৪৬	৬,০৯৪	১৫,১৯৪	২১,২৮৮
১৯৪৯—৫০	১০,৪৩৩	২০,৭৯৬	৩১,২২৯
১৯৫০—৫১	১৩,২৭৮	২১,৮৪০	৩৫,১১৮

উপরোক্ত হিসাবে বুঝা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন চিনির শতকরা ৩৮'৬ ভাগ বীট-চিনি এবং ৭১'৪ ভাগ আখের চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল ; কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালে বীট-চিনি হিসাবের শতকরা ৩৭'৮ ভাগ এবং আখের চিনি শতকরা ৬২'২ ভাগ। এইরূপে মোট চিনি

উৎপাদনের পরিমাণের হিসাবে আজ পৃথিবীর অবস্থা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের সহজ অবস্থায় আসিয়াছে বলা যায়। এইরূপে বীট-চিনি পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আখের চিনির প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও ভারতে আখের গুড় প্রধানতঃ আখের চিনির প্রতিদ্বন্দ্বী।

ভারতবর্ষে শর্করা জাতীয় খাদ্য আখের রস হইতে প্রস্তুত সাদা দানাদার চিনি, খাণ্ড চিনি, ভূরা, গুড় ও মিছরি ব্যতীত তাল, খেজুর, নারিকেল ও সাগু গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া গুড়, বালুকার মত চিনি ও মিছরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে গাছের রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে সেই গাছের নামানুসারে গুড়ের নাম হয়, যেমন—খেজুরে গুড়, তাল-গুড়, নারিকেল-গুড় ও সাগু-গুড়। আবার তাল-গুড়ের সাহায্যে যে মিছরি প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাকেই প্রধানতঃ তাল-মিছরি বলে।

আয়ুর্বেদে তাল-গুড় ও খেজুরে গুড়ের উল্লেখ না থাকিলেও ইহা সত্য যে, প্রাচীনকালে তাল ও খেজুরের রসের বিবিধ গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি বিদিত ছিল। নারিকেলের বিবিধ গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ থাকিলেও এই গাছের মোচা হইতে রস-সংগ্রহ করা হইত না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রাচীন-কালে নারিকেল গাছের রস সংগ্রহের প্রণালী জানা না থাকিবার ফলেই ইহা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ যাহারা তালগাছের মোচা হইতে রস পাইবার পদ্ধতি জানেন, তাহারা একই প্রণালীতে নারিকেল গাছের মোচা হইতে রস সংগ্রহ করিতে জানিতেন না, ইহা বলা ঠিক হইবে না। উপরন্তু প্রাচীন গ্রন্থে নারিকেল, তাল ও খেজুর মাথির গুণাগুণ পর্যন্ত উল্লিখিত আছে।

"নারিকেরস্য তালস্য খর্জ্জুরস্য শিরাংসি তু।
কষায় স্নিগ্ধমধুর বৃংহণানি গুরুণি চ॥"

নারিকেল, তাল ও খেজুর গাছের মস্তক—কষায়, মধুর রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও গুরু।

অতি প্রয়োজনীয় ডাব, নারিকেল ইত্যাদির ফলন নষ্ট করিয়া বর্তমানে যে নারিকেল গুড় প্রস্তুত হইতেছে তাহার মূলে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বা চিকিৎসা-বিদ্যা ও স্বাস্থ্যতত্ত্বগত কোনও যুক্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ডাবের জলের উপকারিতা ছাড়াও ডাবের শাঁস আমাদের একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য। ডাঃ ভি. এম্ কুলকর্ণী ইহা পরীক্ষা করিয়া অভিমত দিয়াছেন: 'Cocoanut contains phosphates of calcium, iron, potash and soda ; it also contains milky and oily substance, albumen and a little starch. It is very easily assimilated ; more easily than milk and cod-liver oil. The weak and the tubercular patients can safely make use of it both as food and general tonic.'

নারিকেল গুড় ছাড়াও খেজুরে গুড় ও তাল গুড় প্রস্তুত না করিবার কারণ মহানির্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাসে দেখা যায়। সেই সময়ে উত্তম সুরা—গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী—তাল-খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হইত। সেই সময়ে গুড় প্রস্তুত অপেক্ষা এই সকল রসের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইত। ইহা খুবই সত্য যে, যে কোন গুড় ইহার টাটকা রস অপেক্ষা খাদ্য-গুণের দিক দিয়া নিকৃষ্টতর।

খাদ্য হিসাবে চিনি হইতে গুড় উৎকৃষ্ট। গুড়ে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ বর্তমান রহিয়াছে; কিন্তু চিনিতে ইহা থাকে না। সাধারণতঃ কোনও জিনিষের মিষ্টতার তুলনামূলক তারতম্য নির্ণয় করা খুবই কঠিন। শতকরা হারে বিভিন্ন জিনিষের মিষ্টতার পরিমাপ দেখান হইল—সুক্রোজে শতকরা মিষ্টতার ভাগ ১০০, ফ্রুক্টোজে ১৭৩, ডেক্সট্রোজ বা গ্লুকোজে ৭৪ বা ৬২-৮৩, মল্টোজে ৩২, ল্যাক্টোজে ১৬ এবং মধুতে ৭১-৯৪। চিনিতে

কেবল মাত্র সুক্রোজ বর্তমান; কিন্তু গুড়ে সুক্রোজ, গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ বর্তমান থাকে।

খাদ্য হিসাবে গুড় যে চিনি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়াও প্রমাণিত হইয়াছে। রাও বাহাদুর বি. বিশ্বনাথ ইঁদুরকে খাণ্ড-চিনি, গুড় ও রাব গুড় খাওয়াইয়া যে ফল পাইয়াছিলেন তাহা দেখান হইল:

কিরূপ খাদ্য দেওয়া হয়	খাওয়াইবার পূর্বে ওজন (গ্র্যাম হিঃ)	সাত মাস খাওয়াইবার পরের ওজন (গ্র্যাম হিঃ)	সাত মাসে যত ওজন বৃদ্ধি (গ্র্যাম হিঃ)
দৈনিক যে পরিমাণ দুধ খাওয়াইবার প্রয়োজন এবং দুধের পরিপূরক হিসাবে			
খাণ্ড-চিনি	৩৬	১২৫	+৮৯
গুড়	৩৮	১৪৪	+১০৬
রাব	৩৮	১৫০	+১১২

পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, গুড় খাওয়াইবার ফলে ইঁদুর সাত মাসে ১০৬ গ্র্যাম ওজনে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু লাল চিনিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ৮৯ গ্র্যাম। এইরূপ সাদা চিনিতে আরও ওজন কমিয়া থাকিবে। ইহাতে আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, গুড় খাদ্য হিসাবে উন্নত না হইলে ইঁদুরের ওজন একই সময়ের মধ্যে এত বৃদ্ধি পাইত না। অন্যান্য বিবিধ পরীক্ষায় আখের রসের রাব গুড় (molasses) খাদ্য হিসাবে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রক্তশূন্যতা রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা ছাড়া ১৯৩৮ সালে ডাঃ বিশ্বাস পশুর উপর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১০০ গ্র্যাম খেজুরে গুড়ে ২০ ইউনিট ভিটামিন বি, এবং ১৫ ইউনিট ভিটামিন বি₂ বর্তমান থাকে এবং সমপরিমাণ আখের গুড়ে ১০.৪ ইউনিট বি, ও ২.৭ ইউনিট বি₂ খাদ্যপ্রাণ রহিয়াছে। উপরন্তু গুড় কিছু সময়ের জন্য রৌদ্রে রাখিলে ইহাতে ভিটামিন-ডি জন্মাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু চিনিতে ইহার সম্ভাবনা নাই। ১৯৩৩ সালে হাওয়াই দ্বীপে এই সম্পর্কে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, আখের রাব গুড়ে ভিটামিন-বি ও ভিটামিন-ই পাওয়া যায়। পশুদের রক্তাল্পতায় ইহা খাওয়াইলে রক্তশূন্যতা পূরণ হইয়া থাকে।

গুড় এবং গুড় হইতে প্রস্তুত মিছরি খাদ্য হিসাবে উন্নততর হইলেও এই সকল দ্রব্য সহজেই নষ্ট হইতে পারে। এই হিসাবে সাদা চিনি ও দানাদার চিনি হইতে প্রস্তুত মিছরি বহুদিন ঘরে রাখিয়া প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করা চলে। গরমে, রৌদ্রের তাপে, বর্ষায়, বায়ুসংস্পর্শে ও অন্যান্য অবস্থায় থাকিয়াও চিনি ও চিনি হইতে উৎপাদিত মিছরি ভাল থাকে; কিন্তু গুড় ও গুড় হইতে উৎপাদিত মিছরি এইরূপ আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিলেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সুক্রোজ বা চিনিতে শতকরা এক ভাগ জল বর্তমান থাকিলেও ইহা নষ্ট হয় না। আধুনিক চিনিতে ৯৯ ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ সুক্রোজ বর্তমান। কোনও জিনিষে শতকরা ৭০ ভাগ বা আরও

বেশী স্থক্রোজ থাকিলে সেই জিনিষ ছত্রাক ও ঈষ্টের সংক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। সাধারণতঃ বাজারের গুড়ে শতকরা ৫৭-৭৫ ভাগ স্থক্রোজ থাকে; ফলে কিছু গুড় জীবাণু সংক্রামিত হইয়া নষ্ট হয় অর্থাৎ স্থক্রোজের বিপর্যয় ও পচন আরম্ভ হয়। আর যে গুড়ে স্থক্রোজের পরিমাণ ৭০ ভাগ বা তাহার উর্দ্ধে সেই গুড়ের উপরিভাগে স্থক্রোজের পরিমাণ কম থাকে বলিয়া গুড়ে ইনভার্ট স্থগার (অর্থাৎ ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ) এবং খনিজ পদার্থ বর্ত্তমান থাকায় বাহিরের জলীয় পদার্থ আহরণ করে, ফলে গুড় পচিয়া দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়।

আমরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাহাই প্রমাণ করি না কেন, ইহা খুব সত্য যে, চিনি, ভূরা, গুড় ও মিছরি প্রভৃতি দ্রব্য প্রধানতঃ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হিসাবেই জীবনীশক্তিবর্দ্ধক। এই কারণেই অনেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য—চিনি ও গুড়ের উপর অত্যধিক মূল্য দিয়া থাকেন। প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, সমস্ত উন্নত দেশেই চিনির ব্যবহার খুব বেশী, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাবে গ্রেট বৃটেন মাথাপিছু বৎসরে গড়ে ১১২, ইউ-এস-এ ১০৩, ফ্রান্স ৫৪, অষ্ট্রেলিয়া ১১৪, জার্মেনী ৫৯ পাউণ্ড চিনি ব্যবহার করিয়াছিল; সেই অবস্থায় ভারতবর্ষে মাথাপিছু মাত্র ২০ পাউণ্ড (৬·৯ চিনি ও ১৩·১ গুড়) ব্যবহার করিয়াছে।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে মাথাপিছু বৎসরে গড়ে কি পরিমাণ চিনি জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করিয়াছিল তাহা দেখান হইল:

(পাউণ্ড হিসাবে)

	১৯৩৭—৩৮	১৯৩৮—৩৯	১৯৪৮—৪৯	১৯৪৯—৫০
গ্রেট বৃটেন	১১১	১১২	৯০·০	৯২·০
ইউ-এস-এ	৯৫	১০৩	১১৫·০	১০৬·০
ফ্রান্স	৫৫	৫৪	৫৫·০	৬০·০
অষ্ট্রেলিয়া	১১৭	১১৪	১৩০·০	১৪৩·০
জার্মেনী	৫৯	৫৯	৪৪	৫৪
কানাডা	১০১	—	১০১	১১২
ভারতবর্ষ	১৮	২০	২৬·৫	২৪·২

আমাদের দেহের তাপ প্রতিনিয়তই ক্ষয়িত হইতেছে। দেহের তাপের এই ক্ষতির সমতা রক্ষা করিবার জন্যই আমাদের প্রতিদিন এই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। দেহের এই তাপ ক্যালোরি হিসাবে মাপা হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার ক্যালোরি খাদ্য হইতে সংগ্রহ করা দরকার। প্রতি এক গ্র্যাম চিনিতে প্রায় ৪ ক্যালোরি তাপ রক্ষিত হইতে পারে। গুড় ও চিনির তাপ উৎপাদন ক্ষমতার বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল:

	প্রতি পাউণ্ডে ক্যালোরির পরিমাণ	শ্বেতসার (শতকরা ভাগ)	প্রতি গ্র্যামে ক্যালোরির পরিমাণ
স্থক্রোজ (আখের চিনি)	১৭৯৪	১০০	৩·৯৫৫
ফ্রুক্টোজ	১৭০৩	১০০	৩·৭৫৪
গ্লুকোজ	১৬৯৭	১০০	৩·৭৪১

দেখা যায় যে, সুক্রোজ ও গ্লুকোজ এই সকল শ্বেতসার খাদ্য হিসাবে একই রকম তাপ রক্ষা করিতে পারে। অবশ্য সমপরিমাণ চিনি ও গুড় লইলে চিনির তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা বেশী বলা যায়। এইরূপ অবস্থায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চিনি বা গুড আমাদের জীবনীশক্তিবর্ধক হিসাবে একটি অত্যাবশ্যক খাদ্য। মনে হয়, যাহাদের ভাত ও ডাল প্রধান খাদ্য (অর্থাৎ বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, উড়িয়া প্রভৃতি) তাহাদের চিনি বা গুড় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ আমাদের ৩০০০ ক্যালোরি তাপ রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন প্রায় ১১১'৯ গ্রাম প্রোটিন, ১০৭'৮ গ্রাম ফ্যাট ও ৪১৩'০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার) জাতীয় খাদ্যের। যাহারা ১৬ আউন্স ভাত এবং কমপক্ষে ৪ আউন্স ডাল খায় তাহাদের শ্বেতসার খাদ্যের পরিমাণ প্রায় ৪১৭'৪ গ্রাম হওয়া প্রয়োজন। তাহার উপর মাছ, তরিতরকারী রহিয়াছে। এইভাবে যাহারা প্রতিদিনই খাদ্যের বিজ্ঞানসম্মত সমতা রক্ষা না করিয়া কার্বোহাইড্রেট বেশী পরিমাণ খাইতেছে তাহাদের পক্ষে আরও চিনি বা গুড় খাওয়া ক্ষতিকর। এই সকল লোকের পক্ষে চিনি বা গুড জীবনীশক্তিবর্ধক হয় না; কাজেই ইহা সম্ভবমত পরিত্যাগ করা উচিত।

দেহের তাপসহন ক্ষমতা

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

সম্প্রতি কলিকাতার তাপমাত্রা ১০৮° উঠিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে পশ্চিমের কোন কোন স্থানের তাপমাত্রা ১২০° অধিকও উঠিয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলের মরুভূমির তাপ উহা অপেক্ষাও অনেক বেশী হয়। এইরূপ অধিক তাপ অস্বস্তিকর সন্দেহ নাই, দেহ ঘর্মাক্ত হয়, প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায়ও দেহের আভ্যন্তরীণ তাপের কোন তারতম্য ঘটে না। সেইরূপ শীতকালে তাপ যখন খুব কম থাকে, এমন কি শীতপ্রধান দেশে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন শীতে লোক জর্জরিত হয় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ তাপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। দেহের স্বাভাবিক তাপের মাত্রা ৯৮'৪°। ব্যক্তিবিশেষে এই স্বাভাবিক তাপের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়; দিনের বিভিন্ন সময়েও দেহের তাপের কিছু পরিবর্তন হয়। তবে এই ব্যতিক্রম ও পরিবর্তনের মাত্রা খুবই সীমাবদ্ধ। বাহিরের তাপের পরিবর্তনে দেহে এই স্বাভাবিক তাপের সাধারণতঃ কোন পরিবর্তন হয় না। আমাদের দেহ এমন একটি তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় গঠিত যাহার ফলে দেহে এই তাপের সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে। দেহের এই তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাছে মনুষ্যকল্পিত যে কোনরূপ যান্ত্রিক তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে।

শুধু মানুষেরই নয়, স্তন্যপায়ী জীবমাত্রের দেহেরই এইরূপ স্বাভাবিক একটা তাপমাত্রা আছে। যেমন গরু, ঘোড়া ও গাধার দেহের তাপ ৯৯° হইতে ১০০'৪°-র মধ্যে, আবার কুকুর ও বিড়ালের স্বাভাবিক তাপ ১০০° হইতে ১০২°-র মধ্যে। পাখীর দেহেরও এইরূপ একটা স্বাভাবিক তাপমাত্রা আছে। পাখীবিশেষে এই তাপ ১০৭° পর্যন্ত হইয়া থাকে। যে সব জীবের দেহে এইরূপ একটা স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকে তাহাদিগকে উষ্ণ-শোণিত প্রাণী বলা হয়। মৎস্য এবং সরীসৃপ, ভেক, কচ্ছপ প্রভৃতি উভচর প্রাণীদেহে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট তাপ বজায়

থাকে না। পারিপার্শ্বিক তাপের পরিবর্তনে উহাদের দেহে তাপের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। ইহাদিগকে শীতল-শোণিত প্রাণী বলা হয়।

আমাদের দেহে নিয়ত তাপের সৃষ্টি হইতেছে এবং অতিরিক্ত তাপ সঙ্গে সঙ্গে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ব্যবস্থা থাকায় তাপের সমতা রক্ষিত হইতেছে। ত্বক, ফুস্‌ফুস ও মল-মূত্রের মাধ্যমে তাপ নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে।

দেহের আভ্যন্তরীণ তাপ রক্তে শোষিত হয় এবং বিকিরণ ও বাষ্পীভবন দ্বারাই প্রধানতঃ ঐ তাপের মুক্তি ঘটে। অবস্থানুযায়ী এই বিকিরণ ও বাষ্পীভবন আমাদের দেহে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। দেহের এই তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত। মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগের একটি অংশ অর্থাৎ হাইপোথ্যালেমাস এই তাপ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। রক্তাধারে আশ্রিত ভাসো-মোটর নার্ভ ও গ্রন্থির নিঃস্রাব-নিয়ন্ত্রক স্নায়ুর (secretory nerve) সহায়তায় এই কেন্দ্র বছরের পর বছর ধরিয়া দেহাভ্যন্তরীণ তাপের সমতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বাহিরের তাপ পরিবর্তনে এই তাপ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে কোন সাড়া জাগে না, কিন্তু রক্তের তাপ সামান্য বৃদ্ধি পাইলেই তাপ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র সক্রিয় হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ প্রদেশ হইতে অনেক পরিমাণে উষ্ণ রক্ত দেহের উপরিভাগে ত্বকের দিকে সঞ্চালিত হয়। একদিকে অভ্যন্তর প্রদেশের সহস্র সহস্র রক্তাধারগুলি রুদ্ধ করিবার ও সঙ্গে সঙ্গে দেহের বহির্ভাগের অগণিত রক্তাধারগুলির পূর্ণভাবে উন্মোচন করিবারসঙ্কেত কেন্দ্র হইতে প্রেরিত হইবার ফলেই এইরূপ ঘটে। বহির্ভাগের উন্মুক্ত রক্তাধার হইতে রক্তের তাপ ত্বকের মধ্য দিয়া মুক্ত হইয়া যায়। এইভাবে তাপ বিকিরণের ফলে রক্ত অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে।

এই ভাবে দেহের রক্ত শীতলীকরণ ব্যবস্থাকে মোটর গাড়ির তাপ হ্রাস করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। মোটর গাড়ী চলিবার সময় যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা জলে শোষিত হয় এবং ঐ জল রেডিয়েটর বা তাপ-বিকিরক যন্ত্রের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়। রেডিয়েটরের মধ্যে হাওয়ায় তাপ ছাড়িয়া গরম জল শীতল হয়। দেহের মধ্যে ত্বকের রক্তাধারগুলিও মোটরের রেডিয়েটরের মতই কাজ করিয়া থাকে।

দেহের তাপ-ক্ষয়ের দ্বিতীয় ব্যবস্থা ঘর্মোৎপাদন; ইহাও তাপ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের অধীন। ত্বকের উপরিভাগে অজস্র নালা বা ফাটল দেখা যায়। ঐ নালার মধ্য হইতেই রোম বাহির হয়। নালার নীচেই ঘর্ম-গ্রন্থি থাকে। গ্রন্থিগুলি অনেকটা ক্ষুদ্রাকৃতি বাঁকা নলের মত। ত্বকের ভিতর দিয়া একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে উহার মুখের দিকের সঙ্গে বাহিরের সংযোগ আছে, অপর দিক রক্তাধারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই গ্রন্থিগুলি রক্তাধার হইতে জলীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া ছিদ্রমুখে ঢালিয়া দেয়। এইরূপেই ঘর্মের সৃষ্টি হয়। ঘর্মের বাষ্পীভবন দ্বারা ত্বক শীতল হয়। বাষ্পীভবনের তাপ দেহ হইতে গৃহীত হয়। শীতল ত্বক রক্তের তাপ হরণ করে।

ঘর্ম-গ্রন্থিগুলি সিক্রিটারী নার্ভের দ্বারা তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কেন্দ্রের সঙ্কেত পাইলে দেহের এই ঘর্ম-গ্রন্থিগুলি ঘণ্টায় এক গ্যালন পর্যন্ত ঘর্ম নিঃসৃত করিতে পারে। ঘর্মোৎপাদন দ্বারা শীতলীকরণের ব্যবস্থা এত কার্যকরী যে, হাওয়া শুষ্ক ও উহার জল ধারণের ক্ষমতা অধিক থাকিলে আমাদের দেহ অনেক উচ্চ তাপও সহ্য করিতে পারে। ঘর্মোৎপাদন ভাসো-মোটর নার্ভ দ্বারাও অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। ঘর্মের পরিমাণ রক্তাধারের সঙ্কোচন ও প্রসারণের উপর নির্ভর করে।

মানুষের হাতের চেটো ও পায়ের তলায় সর্বাধিক পরিমাণ ঘর্ম-গ্রন্থি থাকে এবং এই সব স্থান হইতে অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক ঘর্ম নিঃসৃত হয়।

মনুষ্যেতর জন্তুর মধ্যে ঘর্ম-নিঃস্রবের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। গরু অপেক্ষা ঘোড়ার ঘর্ম অধিক। ইঁদুর, খরগোস ও ছাগলের ঘর্ম হয় না। শূকরের নাক ঘামে; কুকুর-বিড়ালের পায়ের তলা ঘামে। যে সব জন্তুর ঘর্ম কম, প্রধানতঃ প্রশ্বাসের দ্বারাই তাহাদের দেহের তাপ ক্ষয় হয়। এই জন্যই অধিক গরমে অথবা পরিশ্রান্ত হইলে কুকুরকে হাঁপাইতে দেখা যায়।

তাপ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র দেহের তাপ উৎপাদন ও তাপ ক্ষযের মধ্যে সমতা রক্ষা করে। এই জন্যই আমাদের স্বাভাবিক তাপের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু জ্বর হইলে দেহের তাপ উৎপাদন ও তাপ ক্ষয়ের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয় না। জ্বরের সময় সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিলেও দেহ-তন্তু ধ্বংসের ফলে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অধিক মাত্রায় তাপ উৎপন্ন হয়। তাপের এইরূপ মাত্রাধিক্য গুরু ভোজন বা পরিশ্রমের ফলেও হইতে পারে; কিন্তু তদবস্থায় দেহের স্বাভাবিক তাপের কোন পরিবর্তন ঘটে না। জ্বরেব সময় অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে ঘর্ম-গ্রন্থিও কতকটা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, ফলে ঘর্মোৎপাদন হ্রাস পায়। ঘর্মোৎপাদন হ্রাস পাইলে তাপক্ষয় কম হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক সময় প্রচুর ঘর্ম হওয়া সত্ত্বেও দেহের তাপ কমে না। কাজেই জ্বরের সময় তাপমাত্রার আধিক্য অথবা তাপ-ক্ষয়ের মাত্রা হ্রাস কোনটিই প্রত্যক্ষভাবে তাপবৃদ্ধির কারণ নয়। যে ব্যবস্থা দ্বারা সুস্থ অবস্থায় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় উহার কোনরূপ বিকলতাই প্রধান কারণ।

দৈহিক অসুস্থতায় সহজে বিপর্যস্ত হইলেও আমাদের দেহের এই তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিকূল আবহাওয়ায় তত সহজে বিকল হয় না। পূর্বে বলা হইয়াছে, শরীর সুস্থ থাকিলে অতিরিক্ত গরমেও আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু অবস্থাবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেও দেখা যায়; ফলে অনেক সময় অত্যধিক গরমে হিটষ্ট্রোক অথবা সানষ্ট্রোক হইয়া দেহের তাপ অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং অনেকে এরূপ অবস্থায় প্রাণ হারায়। কিন্তু একটু সতর্ক থাকিয়া কতক-গুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এইসব দুর্ঘটনা হইতে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

অধিক তাপে আবহাওয়ার আর্দ্রতার পরিমাণের উপরই বিশেষভাবে মানুষের তাপসহিষ্ণুতা নির্ভর করে। আর্দ্র অথচ উষ্ণ আবহাওয়ায় ঘর্ম বাতাসে মুক্তি না পাওয়ায় চর্ম শীতল হয় না এবং তদবস্থায় আবহাওয়ার তাপ দেহে সঞ্চারিত হইয়া দেহের তাপ বৃদ্ধি করিতে পারে। এরূপ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করা কঠিন।

অতিরিক্ত ঘর্মক্ষরণে দেহের জল ও লবণ বাহির হইয়া যায়। সাবধানতা অবলম্বন না করিলে শীঘ্রই ইহাদের অভাবজনিত লক্ষণ শরীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শুধু জল পান করাই যথেষ্ট নয়। ঘর্মক্ষরণে দেহে লবণের পরিমাণ হ্রাস পায়। উপযুক্ত পরিমাণ লবণের অভাবে তন্তুর মধ্যে অসাড়তা উপস্থিত হয়, দেহে দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায এবং হাত-পা অবসন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হইলে অর্থাৎ জল ও লবণের অভাব পূরণ না হইলে মানুষ ক্রমে চেতনা হারাইয়া মৃত্যুবরণও করিতে পারে। শুধু জলের পরিবর্তে লবণজল পান করিলে এবং খাদ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণে লবণ গ্রহণ করিলে অত্যধিক গরমে দেহ হইতে লবণেব অপচয় নিবারণ করিয়া ইহার বিষময় ফল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আমেরিকার রোচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এডল্‌ফ্ সম্প্রতি মরু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন অতিরিক্ত তাপ ও প্রখর সূর্যকিরণে মরুচারীর অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে অধিক-ক্ষণ প্রখর রৌদ্রে থাকিলে অনেকের সানষ্ট্রোক হইতে পারে। সানষ্ট্রোকের প্রথমাবস্থায় মাথা ঘোরে, বমির ভাব হয়, মুখ ও ত্বক শুষ্ক হয়, নাড়ী

মোটা ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়। শরীরের তাপ ১০৮° হইতে ১১০ পর্যন্ত উঠে এবং চেতনা লোপ পায়। বয়স্ক, অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ও রুগ্ন ব্যক্তিদেরই সহজে সানষ্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সানষ্ট্রোক হইলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জায়গায় আনিয়া পা ও মাথার দিক সামান্য উঁচু করিয়া চিৎভাবে শোয়াইয়া মাথায় ভিজা কাপড়, বরফের থলি বা বরফ দিতে হয়। তারপরে ঠাণ্ডা জলে শরীর শীতল করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হাত-পা ঘষিয়া ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা দরকার। এইরূপ অবস্থায় কোনরূপ উত্তেজক পদার্থ সেবন নিষিদ্ধ। জ্ঞান থাকিলে শুধু ঠাণ্ডা জল পান করাইতে হয়।

রৌদ্রে যেমন সানষ্ট্রোক হয়, গৃহের মধ্যে অধিক তাপে সেইরূপ হিটষ্ট্রোক হইতে পারে। হিট-ষ্ট্রোকেও প্রথমাবস্থায় বমির ভাব হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত ও ক্ষীণ এবং পেশীর দুর্বলতা অনুভূত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ ফ্যাকাশে দেখায়, শরীর হইতে ঘর্মরূপে অতিরিক্ত জল ও লবণ নির্গত হইতে থাকে এবং ক্রমে চেতনা লোপ পায়।

কোন কোন লোক সহজে হিটষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়, কিন্তু অধিক তাপে সকল লোকই অতিরিক্ত ঘর্ম ও লবণ ক্ষয়ে অবসন্ন হইয়া পড়ে। হিটষ্ট্রোকের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শোয়াইয়া দিয়া লবণ-জল পান করাইতে হয়। জলে ২।৩ চামচ লবণ দেওয়া দরকার। গরম চা বা কফিও দেওয়া চলে। এইভাবে অবস্থার উন্নতি না হইলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

আমেরিকার সামরিক গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, শরীর সুস্থ থাকিলে অত্যধিক তাপেও দেহের স্বাভাবিক তাপ বজায় রাখা কঠিন নয়। শরীরের জলের অভাব পূরণের জন্য মুহুর্মুহু জল পান করিতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পিপাসা বোধ না হইলেও এই সময় জল পান করা উচিত; কারণ অতিরিক্ত জল পানে শরীরের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। শরীরে লবণের ক্ষয়ও সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করিতে হয়। ঐ সময় দিনে অন্ততঃ চায়ের চামচের দুই চামচ লবণ জলের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। খাদ্যের সঙ্গেও অধিক লবণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইরূপ করিলে অতিরিক্ত তাপের বিষময় ক্রিয়া হইতে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়।

অধিক গরমে কিরূপ খাদ্য গ্রহণযোগ্য সে সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা হইয়াছে। অতিরিক্ত গরমে মাংস খাওয়া উচিত নয়, ইহা বহুকালের ধারণা। কিন্তু বর্তমান বিশেষজ্ঞদের মতে সর্বরকম আবহাওয়াতেই দেহে ছানাজাতীয় পদার্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁহাদের মতে গরমের সময় বিশেষ খাদ্য-ব্যবস্থা বা অতিরিক্ত ভিটামিন গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই, সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করিলেই চলে—শুধু পরিমাণে কিছু কম হওয়া উচিত।

গরমের সময় পোষাক-পরিচ্ছদও বিশেষ ধরনের হওয়া দরকার। সাদা পোষাক হইতে আলোক প্রতিফলিত হয়। কালো পোষাক তাপ শোষণ করে। এই কারণে সাদা বা ফিকা রঙের পোষাকই পরা উচিত। পোষাক বেশ ঢিলা, শোষণক্ষম ও হাওয়া চলাচল ব্যবস্থাযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

অভ্যস্ত হইলে সকল লোকই অতিরিক্ত গরমেও অক্লেশে সাধারণভাবে কাজকর্ম করিতে পারে, প্রথম প্রথম কষ্ট হয় সন্দেহ নাই। সুস্থ যুবকেরা কি ভাবে অতিরিক্ত গরমে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমেরিকার ফোর্ট নক্সের ডাঃ লাডউইগ ও তাঁহার সহকর্মীরা নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কয়েকজন যুবককে পর পর নয় দিন ধরিয়া ঠাণ্ডা ও গরম পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কাজ করিতে দিয়া তাহাদের দেহ এবং কর্মশক্তির কি কি পরিবর্তন

ঘটে তাহা সর্বতোভাবে লক্ষ্য করেন। তাহাদের ত্বক ও দেহাভ্যন্তরের তাপ, নাড়ীর স্পন্দন, রক্তের চাপ এবং ওজন হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ করা হয়।

উষ্ণতর পারিপার্শ্বিকে প্রথম দিন তাহাদের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে বিশেষ কষ্ট হয়। কয়েক জন খুবই অবসন্ন হইয়া পড়ে। কর্মরত অবস্থায় তাহাদের হৃদ্‌স্পন্দন, বহির্দেশীয় ও আভ্যন্তরীণ তাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় দিন তাহাদের কর্ম সম্পাদনে অপেক্ষাকৃত কম কষ্ট হয়। নবম দিনে তাহারা নির্দিষ্ট কর্ম খুব স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করে। ঐ সময় তাহাদের হৃদ্‌স্পন্দন, ত্বক ও দেহাভ্যন্তরের তাপও স্বাভাবিক থাকিতে দেখা যায়।

এইভাবে গরম আবহাওয়া অভ্যস্থ হইতে তাহাদের ঘর্ম নির্গমনের আধিক্যই বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ঘর্মের বাষ্পীভবন দ্বারা ত্বকের শীতলতা সম্পাদনেই দেহের তাপের সমতা রক্ষিত হইবার কারণ। শীতল ত্বকের সংস্পর্শে রক্তের তাপ দূরীভূত হইতে দেখা গিয়াছে। জল ও লবণের ক্ষয় লবণ-জল পান করাইয়া পূরণ করা হইয়াছে।

গ্রীষ্মের সময় দেহের তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। সেই ব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখিতে প্রচুর জল ও লবণ গ্রহণ করিলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও কর্মশক্তি অটুট রাখা যায়।

পদার্থের চুম্বক-ধর্ম

শ্রীসুহাসচন্দ্র মৌলিক

বিশেষ এক শ্রেণীর লৌহমাক্ষিকই কেবলমাত্র স্বভাবজ চুম্বক-ধর্মের অধিকারী। রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, এরা হলো লৌহ ও অক্সিজেনের সংযোগে সৃষ্ট এক প্রকার যৌগিক পদার্থ—রসায়নের ভাষায় ট্রাইফেরিক্ টেট্রক্সাইড (Fe_3O_4), বাংলায় অয়স্কান্ত মণি। লৌহের এই বিচিত্র আকর্ষণী শক্তির ব্যাখ্যার নিমিত্ত পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রথম কার্যকরী মতবাদ প্রচার করেন আইপিনাস। আইপিনাস অনুমান করেন যে, লৌহের চুম্বক বৃত্তির কারণ হলো এক অতি-তরল পদার্থ। স্বাভাবিক অবস্থায় লৌহে এই তরল পদার্থ সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং চুম্বকনের অর্থ হলো চুম্বকে সৃষ্ট মেরু দেশে এই অতি তরল পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কমে যাওয়া অথবা বেড়ে যাওয়া। একে বলা হয়েছে চুম্বকের ‘একক তরল তত্ত্ব’ (One fluid theory)। একক তরল তত্ত্বের পরিবর্তন সাধন করে কুলুম্ব প্রচার করেন ‘দ্বি তরল তত্ত্ব’ (Two fluid theory)। কুলুম্ব অনুমান করেন যে, লৌহে বোরাল এবং অ্যাসট্রাল নামে দুই জাতীয় বিপরীত ধর্মী চুম্বকীয় তরল পদার্থ আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই দুই জাতীয় তরল পদার্থ সমান পরিমাণ অবিমিশ্র-ভাবে লৌহের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোন চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে বোরাল এবং অ্যাসট্রাল বিপরীতমুখী হয় এবং চুম্বক দণ্ডের বিপরীত প্রান্তদ্বয়ে সঞ্চিত হয়ে চুম্বক মেরুর সৃষ্টি করে। বিখ্যাত গণিতবিদ্ পয়সান কুলুম্বের এই দ্বি তরল তত্ত্বের সংশোধন করে বলেন যে, চুম্বক-ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বোরাল এবং অ্যাসট্রালের চুম্বকীয় বিয়োজন (magnetic separation) চুম্বকের ঠিক অভ্যন্তরে ঘটে না, ঘটে প্রত্যেক পদার্থের অণুর অভ্যন্তরে। পয়সনের এই সামান্য সংশোধনই পরবর্তী কালে আণবিক চুম্বক-তত্ত্বের (molecular

theory) ইঙ্গিত করে। আণবিক চুম্বক তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন ওয়েবার।

একটা চুম্বক দণ্ডকে যদি ভেঙ্গে দু-টুক্‌রা করা যায় তবে সমশক্তিসম্পন্ন সম্পূর্ণ পৃথক দুটি চুম্বক পাওয়া যায়। এই ভাবে একটা মাত্র চুম্বক থেকে আমরা সমশক্তিসম্পন্ন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বক পেতে পারি। ওয়েবার অনুরূপ যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, একটা সম্পূর্ণ চুম্বক দণ্ডকে যদি ক্রমাগত ভেঙ্গে যাওয়া যায় তবে আমরা নিশ্চয়ই অণুরাজ্যে উপস্থিত হব এবং সেখানে নিশ্চয়ই দেখা যাবে যে, প্রত্যেক অণুই দুই মেরুবিশিষ্ট এক একটি সম্পূর্ণ চুম্বক, অর্থাৎ পূর্ণ চুম্বকটিকে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বক অণুর সমষ্টি হিসাবে ভেবে নিতে পারি এবং এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বক-অণুকে বলা হয়েছে 'ওয়েবারের চুম্বক-অণু' (Weber elements)। লৌহে সাধারণ অবস্থায় এই সমস্ত চুম্বক-অণুর অক্ষরেখা ইতস্ততঃ এমন বিক্ষিপ্তভাবে সাজান থাকে যে, সমশক্তিসম্পন্ন চুম্বক-অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ কাটাকাটি করে লৌহ চুম্বক-ধর্মহীন হয়। কিন্তু কোন চুম্বক-ক্ষেত্র যখন লৌহের উপর ক্রিয়াশীল হয় তখন লৌহের অভ্যন্তরস্থ চুম্বক-অণুগুলি এক বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়।

সমশক্তিসম্পন্ন অসংখ্য চুম্বক-অণু যদি এক সরল রেখায় পরস্পরের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তবে মেরুদ্বয়ের সংযোগস্থলগুলিতে কোনরূপ চুম্বক-ধর্ম থাকা সম্ভব নয়। এই ভাবে পাওয়া একটা সম্পূর্ণ রেখ চুম্বকের বৈশিষ্ট্যই হলো একমাত্র প্রান্তভাগদ্বয় ব্যতীত অন্য যে কোন অংশ চুম্বক-ধর্মহীন। সুতরাং একটি চুম্বক দণ্ডকে আমরা ভেবে নিতে পারি তার অক্ষরেখার সঙ্গে সমান্তরালভাবে সাজান এরূপ অসংখ্য রেখ-চুম্বকের সমষ্টি হিসাবে, কেন না এই ভাবে চুম্বক দণ্ডের প্রান্তভাগদ্বয় হবে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু গুণসম্পন্ন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটি চুম্বক দণ্ডকে লৌহ-চূর্ণের মধ্যে সঞ্চালন করলে দেখা যায় যে, কেবল মাত্র চুম্বকের মূল মেরু-দেশ দুটিতেই নয় পার্শ্ববর্তী প্রদেশেও লৌহ-চূর্ণ যুক্ত হয়; অর্থাৎ চুম্বকের চুম্বকধর্ম কেবল মাত্র প্রান্তদ্বয়েই সীমাবদ্ধ নয়, পার্শ্ববর্তী প্রদেশেও কিছু চুম্বকত্ব থাকে। আদর্শ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ওয়েবার বলেন যে, চুম্বক দণ্ডের অতি-অভ্যন্তর ব্যতীত বাইরের দিকে চুম্বক-অণুর সজ্জা তার অক্ষরেখার সমান্তরাল সরল রেখায় হয় না; অক্ষরেখার দুই পার্শ্বে চুম্বক-অণুর সজ্জা হয় বাইরের দিকে বিপরীত বক্রতায়।

আণবিক চুম্বক-তত্ত্বে চুম্বক-অণুর সজ্জা সম্বন্ধে একটি ভিন্ন পরিকল্পনার প্রচার করেন আয়িং। তিনি বলেন যে, তিন বা ততোধিক চুম্বক-অণু পরস্পরের বিপরীত মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি চৌম্বক শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে। রেখ-চুম্বকের মত এরূপ চৌম্বক শৃঙ্খলের বিপরীত মেরুদ্বয়ের সংযোগ-স্থলগুলি চুম্বক-ধর্মহীন; তাই একটি সম্পূর্ণ চৌম্বক শৃঙ্খলের নিজস্ব কোন চুম্বকত্ব থাকে না। কিন্তু কোন চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে চৌম্বক শৃঙ্খলের কোন সংযোগস্থলে ভাঙ্গন ধরে এবং চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতার ক্রমবৃদ্ধিতে ভগ্ন চৌম্বকীয় শৃঙ্খল ক্রমে চুম্বক দণ্ডের অক্ষরেখার সমন্তরাল রেখ-চুম্বকে পরিণত হয়, অথবা ওয়েবারের নিয়ম অনুযায়ী বক্র-রেখ চুম্বকে পরিণত হয়। সুতরাং লৌহ দণ্ডকে এইরূপ অসংখ্য চৌম্বক শৃঙ্খলের সমষ্টি হিসাবে ভাবা যায়। লৌহের চুম্বকনের অর্থ হলো, চৌম্বক শৃঙ্খলগুলিকে চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে অক্ষ-রেখার সমন্তরাল অথবা বক্র-রেখ চুম্বকে রূপান্তরিত করা।

কিন্তু লৌহের সংগঠনকারী এরূপ চৌম্বক শৃঙ্খলগুলি যদি রেখ-চুম্বকে রূপান্তরিত হয় তবে চুম্বক দণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। পরবর্তী-কালে জুল পরীক্ষা করে দেখান যে, প্রকৃতপক্ষে

চুম্বকনের পর লৌহ দণ্ডের দৈর্ঘ্য $\frac{১}{১২০,০০০}$ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ওয়েবার ও আয়িং প্রবর্তিত আণবিক চুম্বক-তত্ত্বকে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করা যায় না; কেন না মূল চুম্বক-অণুগুলির চুম্বক-ধর্ম সম্পর্কে ওয়েবার এবং আয়িং সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। তবে পরবর্তীকালে যে সমস্ত নতুন চুম্বক-তত্ত্ব প্রচার লাভ করে, তাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল ওয়েবারের চুম্বক-অণুর চুম্বকত্বের ব্যাখ্যা।

ওয়েবারের চুম্বক-অণুর চুম্বক-ধর্মের প্রশ্নে সর্বপ্রথম উত্তর দিলেন অ্যাম্পিয়ার। কিছুদিন পূর্বে অর্স্টেড গতীয় বিদ্যুৎ ও চুম্বকন তত্ত্বের মধ্যে একটি আশ্চর্য রকম সংযোগ আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন বিদ্যুৎ-পরিবাহক যখন বিদ্যুৎ-স্রোত বহন করে তখন তার চতুষ্পার্শ্বে একটি চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ বিদ্যুৎ গতিশীল হলে চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এই উপায়ে সৃষ্ট চুম্বক-ক্ষেত্রের মেরু-ধর্ম নির্ভর করে বিদ্যুতের গতির দিকের উপর। পরীক্ষায় প্রাপ্ত এইরূপ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে অ্যাম্পিয়ার বলেন যে, চুম্বক দণ্ডের সৃষ্টিকারী প্রত্যেক চুম্বক-অণুর চতুষ্পার্শ্বে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যেকটি অণু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের মত ব্যবহার করে; অর্থাৎ ওয়েবারের চুম্বক-ধর্ম স্বভাবজাত নয়, বিদ্যুৎজাত। কিন্তু এরূপ কল্পনায় তিনি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন যে, প্রত্যেক অণুর চতুষ্পার্শ্বে যে পথে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে সে পথ হলো বিদ্যুৎ-বাধাহীন এবং এই পথের বিপরীত দিকে কোন বিদ্যুৎ পরিবাহিত না হলে উক্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ হবে চিরন্তন।

অ্যাম্পিরীয় চিরন্তন বিদ্যুৎ-প্রবাহের ধারণাকে পরিবর্তিত করে গস্ বলেন যে, প্রত্যেক অণুই স্থির বিদ্যুৎ দ্বারা বিদ্যুতায়িত এবং স্থির বিদ্যুতে বিদ্যুতায়িত প্রত্যেক অণুই তার একটি নিজস্ব অক্ষের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান থাকে এবং চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে।

কিন্তু চুম্বক-অণুগুলি যদি নিজেদের ঘোরাফেরার ব্যাপারে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে তবে যে কোন শক্তিসম্পন্ন চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে চুম্বক দণ্ডের চুম্বকত্ব সংপৃক্ত হওয়া উচিত এবং চুম্বক-ক্ষেত্রের শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক দণ্ডের চুম্বকত্ব লুপ্ত হওয়া উচিত। অথচ পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আবেশকারী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা বৃদ্ধি করলে চুম্বকনের তীব্রতাও বৃদ্ধি পায় এবং এক সময়ে স্থিরতা লাভ করে। আবার চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা হ্রাসে চুম্বকনের তীব্রতাও হ্রাস পায়; কিন্তু চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা শূন্যতা প্রাপ্ত হলে চুম্বকনের তীব্রতা শূন্যতা প্রাপ্ত হয় না, কিছু পরিমাণ চুম্বকত্ব সংরক্ষিত থাকে। চুম্বক-তত্ত্বে একে বলা হয়েছে চুম্বকন-প্রলুব্ধতা (Hysterisis)। ম্যাক্সওয়েল, আয়িং প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা আণবিক চুম্বক-তত্ত্বের আরও পরিবর্তন করে বলেন যে, চুম্বক-অণু ঘোরাফেরার পথে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়, কোনরূপ স্থিতিস্থাপক বলের প্রভাবে বাধাগ্রস্ত। আবেশকারী চুম্বক-ক্ষেত্র যখন উপস্থিত থাকে না তখন চুম্বক-অণুগুলির অক্ষরেখা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকে এবং এই অবস্থায় প্রত্যেক চুম্বক-অণুর বেছে নেওয়া স্বাভাবিক দিক হলো তার নিজস্ব দিক। কিন্তু চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে চুম্বক-অণুগুলি নিজস্ব দিক ছেড়ে ক্রমে কোন নির্দিষ্ট দিঙ্‌মুখী হবার চেষ্টা করে এবং ক্রমাগত চুম্বকনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক চুম্বক-অণুর পক্ষে এইরূপ কৌণিক পরিবর্তনের এমন একটি নির্দিষ্ট মাত্রা আছে, কৌণিক পরিবর্তন যার বেশী হলে চুম্বক-অণু চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা শূন্য হলেও আর তার পূর্বের নিজস্ব দিকে ফিরতে পারে না। আণবিক কোনপ্রকার স্থিতিস্থাপক বলের প্রভাবে নিজস্ব দিক ব্যতীত অন্য কোন দিঙ্‌মুখী হয়ে সাম্যাবস্থা লাভ করে; ফলে

কিছু চুম্বকত্ব উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ্য করেন ফ্যারাডে। ফ্যারাডের পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, চুম্বকত্ব লৌহ ও তজ্জাতীয় নিকেল ও কোবাল্টের একটি নিজস্ব প্রকৃতি। শক্তিশালী চুম্বক-ক্ষেত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে ফ্যারাডে দেখান যে, পদার্থ মাত্রেই চুম্বক-ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু ফ্যারাডের পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক লক্ষণীয় বিষয় হলো—সব পদার্থের চুম্বক-ধর্ম অনুরূপ নয়। পদার্থের চুম্বকত্ব তিন প্রকারের। যথা—

১। তিরশ্চুম্বকত্ব (diamagnetism)
২। পরাশ্চুম্বকত্ব (paramagnetism)
৩। অয়শ্চুম্বকত্ব (ferromagnetism)

বিভিন্ন পদার্থের দণ্ড-বিবর্তন কীলকে স্থাপন করে প্রচণ্ড শক্তিশালী চুম্বক-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে তিনি দেখান যে, কতকগুলি পদার্থ—যেমন লৌহ, কোবাল্ট, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, প্ল্যাটিনাম, প্যালাডিয়াম, অক্সিজেন প্রভৃতি আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের দিঙ্মুখী হয়। ফ্যারাডে এগুলিকে বলেন পরাশ্চুম্বক। আবার অ্যান্টিমনি, বিস্মাথ, দস্তা, টিন, পারদ, জল, সুরাসার প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের সঙ্গে সমকোণ উৎপন্ন করে। ফ্যারাডে এগুলির নাম দেন তিরশ্চুম্বক। এই সময় পীয়ের কুরী (মাদাম কুরীর স্বামী) পরীক্ষা করে দেখান যে, তিরশ্চুম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে চুম্বকনের তীব্রতা ও আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতার অনুপাত বা চুম্বকপ্রবণতা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না, অর্থাৎ

$$\text{তিরশ্চুম্বকীয় চুম্বকপ্রবণতা} = \frac{\text{চুম্বকনের তীব্রতা}}{\text{আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}} = \text{বিভিন্ন তাপমাত্রায় ধ্রুব সংখ্যা} \cdots (১)$$

কিন্তু পরাশ্চুম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে চুম্বকপ্রবণতা তাপমাত্রার উর্ধ্বক্রমে ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। অর্থাৎ

$$\text{পরাশ্চুম্বকীয় চুম্বকপ্রবণতা} = \frac{\text{নির্দিষ্ট ধ্রুবসংখ্যা}}{\text{পরম তাপমাত্রা}} \cdots\cdots\cdots (২)$$

পরবর্তীকালে আরও দেখা গেল যে, পরাশ্চুম্বক দলভুক্ত পদার্থের কতকগুলি ঠিক উপরোক্ত নিয়ম মেনে চলে না। তিরশ্চুম্বকত্ব ও পরাশ্চুম্বকত্ব উভয়েই অস্থায়ী, চুম্বক-ক্ষেত্রের অপসারণে উভয়েই লুপ্ত হয়। নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নীচে লৌহ, কোবাল্ট নিকেল, প্রভৃতি স্থায়ী চুম্বক-ধর্মের অধিকারী হয় এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উর্ধ্বে এরা সাধারণ পরাশ্চুম্বক পদার্থের মত ব্যবহার করে। পরাশ্চুম্বকের অন্তর্ভুক্ত এই বিশেষ শ্রেণীর পদার্থগুলিকে বলা হয়েছে অয়শ্চুম্বক এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে বলা হয়েছে, কুরীর তাপমাত্রা। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, অয়শ্চুম্বকের পক্ষে চুম্বকপ্রবণতা ও তাপমাত্রার সম্বন্ধটি হলো—

$$\text{অয়শ্চুম্বকীয় চুম্বকপ্রবণতা} = \frac{\text{নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যা}}{\text{পরম তাপমাত্রা} - \text{কুরীর তাপমাত্রা}} \cdots\cdots (৩)$$

(২) ও (৩) নং সূত্রের নির্দিষ্ট ধ্রুব সংখ্যাদ্বয়কে বলা হয় কুরীর ধ্রুব সংখ্যা।

চুম্বক-তত্ত্বে এরপর নতুন আলোকপাত করেন ল্যাঙ্গেভিন এবং এই কার্যে তিনি সাহায্য নিলেন কুরীর পরীক্ষায় পাওয়া ফলাফল এবং ব্যবহার করেন পরমাণু-বিজ্ঞানের। অ্যাম্পিয়ার কল্পিত আণবিক বিদ্যুৎ-প্রবাহের বাস্তবরূপ হিসাবে ল্যাঙ্গেভিন গ্রহণ করলেন ধন-বিদ্যুয়িতায়িত প্রোটনের সমবায়ে সৃষ্ট কেন্দ্রীনের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান ঋণ-বিদ্যুতায়িত ইলেক্‌ট্রন দলকে। যেহেতু ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রন ও প্রবহমান বিদ্যুতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিদ্যুৎ-প্রবাহ যেমন পরিবাহকের চতুষ্পার্শ্বে

চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রীনের চতুষ্পার্শ্বে গতিশীল ইলেকট্রনও চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি করবে। অণু হলো দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং কোন অণুর চুম্বক-প্রকৃতি নির্ভর করে তার আভ্যন্তরীণ পরমাণুর চুম্বক-প্রকৃতির উপর।

আবার পরমাণুর চুম্বক-প্রকৃতি নির্ভর করে তার পারমাণবিক সংখ্যা, ইলেকট্রনের গতিবেগ, ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ও কক্ষতলের উপর। যেহেতু বিভিন্ন পরমাণুর পক্ষে এগুলি বিভিন্ন, সুতরাং বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর চুম্বক-প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পারমাণবিক সংখ্যা ১ হলে পারমাণবিক চুম্বক-ক্ষেত্র কোন নির্দিষ্ট শক্তি-সম্পন্ন হবে, ২ হলে হয়তো আরও বেশী শক্তিশালী হবে, ৩ হলে হয়তো আরও বেশী হতে পারে। পরমাণু সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎহীন, তাই কেন্দ্রীনে প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যদি পারমাণবিক ওজন বৃদ্ধি পায় তবে পারমাণবিক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যার বৃদ্ধিতে যদি পারমাণবিক চুম্বক ক্ষেত্রের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তবে পারমাণবিক ওজনের বৃদ্ধিতেও পারমাণবিক চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পারমাণবিক ওজন বৃদ্ধি পেলেই পারমাণবিক চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, বিশেষ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে সব সময়েই কেন্দ্রীনের চতুষ্পার্শ্বে ইলেকট্রনের দল একদিকে গতিশীল থাকে না বা একই তলে ভ্রমণ করে না। কতকগুলি ইলেকট্রন ভিন্ন তলে বিপরীত দিকেও গতিশীল থাকে, যাতে পরস্পরের সৃষ্ট চুম্বক-ক্ষেত্র আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে তুলতে পারে।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রোটনের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণকারী ইলেকট্রন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহের সমান।

$$\text{বিদ্যুৎ-প্রবাহ} = \frac{\text{ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{\text{ইলেকট্রনের ভ্রমণের পর্যায়কাল} \times \text{আলোর গতি}} \quad \cdots\cdots(৪)$$

যে কোন চুম্বকের পক্ষে তার স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে তার চৌম্বক বিভ্রমিষার (magnetic moment) উপর। কোন নির্দিষ্ট চুম্বক-পরিবেষ্টনীতে চৌম্বক বিভ্রমিষা কোন বিশেষ দিকে নির্দিষ্ট থাকে এবং হিসাবে দেখান যায়—

$$\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চুম্বকপ্রবণতা} = \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}} \quad \cdots\cdots(৫)$$

গোলাকৃতি জোড়াপাত চুম্বকের পক্ষে চৌম্বক বিভ্রমিষা = বিদ্যুৎ পরিমাণ $\times$ পরিব্যাপ্তি······(৬)

প্রোটনের চতুষ্পার্শ্বে ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান, তাই পরমাণুকে ভাবা যায় একটা জোড়াপাত চুম্বক হিসাবে। সুতরাং ৪নং সূত্র থেকে

$$\text{পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা} = \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ} \times \text{পরিব্যাপ্তি}}{\text{ইঃ ভ্রমণের পর্যায়কাল} \times \text{আলোর গতিবেগ}}$$

$$= \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ} \times \text{ইঃ কৌণিক গতি}}{২ \times \text{আলোর গতিবেগ}} \times (\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^২ \quad \cdots\cdots(৬)$$

$$(\text{অথবা}) = \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{২ \times \text{আলোর গতিবেগ} \times \text{ইঃ ভর}} \times \text{ইঃ কৌণিক ভরবেগ} \quad \cdots\ \cdots\cdots(৭)$$

পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা হলো তার আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনের চৌম্বক বিভ্রমিষার বীজ-গাণিতিক যোগফলের সমান। সুতরাং বিভিন্ন ইলেকট্রনের জন্যে—

$$\text{পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা} = \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{২ \times \text{আলোর গতি} \times \text{ইঃ ভর}} \times \begin{matrix}\text{ইঃ-দের কৌণিক ভরবেগের} \\ \text{বীজগাণিতিক যোগফল}\end{matrix} \cdot (৮)$$

যেহেতু, সাধারণ গতি-বিদ্যা অনুযায়ী,

$$\text{ইঃ কক্ষের পরিব্যাপ্তি} = \pi \times (\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^২$$

$$\text{ইঃ ভ্রমণের পর্যায়কাল} = \frac{২ \times \pi}{\text{ইঃ কৌণিক গতি}}$$

$$\text{এবং ইঃ ভর} \times (\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^২ \times \text{ইঃ কৌণিক গতি} = \text{ইঃ কৌণিক ভরবেগ।}$$

সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক পরমাণুর একটা চৌম্বক সাম্যাবস্থা থাকে। মনে করা যাক্ এমন পরমাণুর কথা যে পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলির পরস্পরের চৌম্বক বিভ্রমিষা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করেছে বা চৌম্বক বিভ্রমিষার বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য। এরূপ পরমাণুর সমবায়ে সৃষ্ট অণুর চতুষ্পার্শ্বে কোন চুম্বক-ক্ষেত্র থাকা সম্ভব নয়। চুম্বক-ক্ষেত্রহীন এমন একটি পরমাণুও যদি বাইরের চুম্বক-ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে কেন্দ্রীনের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনগুলির কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন ঘটে; ফলে পারমাণবিক চৌম্বক বিভ্রামিষারও পরিবর্তন ঘটে। লারমার সর্বপ্রথম হিসাব করে দেখান যে, বাইরের চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে এই পরিবর্তিত কৌণিক গতিকে ভাবা যায়, বাইরের চুম্বক-ক্ষেত্র যে দিকে নির্দিষ্ট থাকে সেই দিকের চতুষ্পার্শ্বে ইলেকট্রনগুলির একটি নির্দিষ্ট কৌণিক গতিকে ঘূর্ণন হিসাবে। পরমাণু-বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে লারমারের অপঘূর্ণন (Larmar precession)। লারমারের হিসাব অনুযায়ী

$$\text{ইঃ অপঘূর্ণন গতিবেগ} = -\frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ} \times \text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}{২ \times \text{ইঃ ভর} \times \text{আলোর গতিবেগ}} \cdots ৯$$

সুতরাং চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর

$$\text{চৌম্বক বিভ্রমিষার পরিবর্তন} = \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ} \times \text{কক্ষ ব্যাসার্ধের বর্গ}}{২ \times \text{আলোর গতিবেগ}} \times \begin{matrix}\text{ইঃ পরিবর্তিত} \\ \text{কৌণিক গতি}\end{matrix}$$

(৬নং সূত্র থেকে)

$$= \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ} \times \text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধের বর্গ}}{২ \times \text{আলোর গতিবেগ}} \times -\frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ} \times \text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}{২ \times \text{ইঃ ভর} \times \text{আলোর গতিবেগ}}$$

$$= -\frac{(\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ})^২ \times \text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}{৪ \times (\text{আলোর গতিবেগ})^২ \times \text{ইঃ ভর}} \times (\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^২ \cdots (১০)$$

পরমাণুর বিভিন্ন ইলেকট্রনের পক্ষে, উপরোক্ত সূত্রের পরিবর্তন করে দেখান যায় যে, পরমাণুর

$$\text{চৌম্বক বিভ্রমিষার পরিবর্তন} = -\frac{(\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ})^২ \times \text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}{৬ \times (\text{আলোর গতিবেগ})^২ \times \text{ইঃ ভর}} \times \begin{matrix}(\text{ইঃ কক্ষের} \\ \text{গড় ব্যাসার্ধ})^২\end{matrix}$$

-এর বীজগাণিতিক যোগফল........(১১)

অথবা

$$\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চুম্বকপ্রবণতার পরিবর্তন} = \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষার পরিবর্তন}}{\text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}$$

$$= -\frac{(\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ})^2 \times (\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^2\text{-এর বীজগাণিতিক যোগফল}}{৬ \times \text{আলোর গতিবেগ} \times \text{ইঃ ভর}},$$

$$\times \text{প্রতি গ্র্যাম অণুতে পরমাণুর সংখ্যা}$$

$$= -২\cdot৮৫ \times ১০^{১০} \times (\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^2\text{-এর বীজগাণিতিক যোগফল}$$

অথবা $\Sigma(\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^2$

অথবা,

$$\Sigma(\text{ইঃ কক্ষের ব্যাসার্ধ})^2 = -\frac{২\cdot৮৫ \times ১০^{১০}}{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর পরিবর্তিত চুম্বকপ্রবণতা}} \cdots(১২)$$

উপরোক্ত ১১নং ও ১২নং সূত্র থেকে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে, বাইরের চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর পরিবর্তিত চৌম্বক বিভ্রমিষা ও চুম্বক-প্রবণতা ঋণাত্মক; তাই পদার্থটি তিরশ্চুম্বক। পরীক্ষাগারে প্রতি গ্র্যাম অণুর চুম্বকপ্রবণতার পরিবর্তন বা তিরশ্চুম্বকীয় চুম্বকপ্রবণতা নির্ণয় করে ১২নং সূত্রের সাহায্যে পরমাণু-কক্ষের ব্যাসার্ধের গড় সহজেই হিসাব করা যায় এবং এই উপায়ে পাওয়া ব্যাসার্ধের মানের সঙ্গে অন্যান্য উপায়ে পাওয়া মান আশ্চর্য রকম সামঞ্জস্য রাখে।

নাম	প্রতি গ্র্যাম অণুর চুম্বকপ্রবণতা	ব্যাসার্ধ
হিলিয়াম	$-১\cdot৯০ \times ১০^{-৬}$	$০\cdot৫৭ \times ১০^{-৮}$ সেঃ
নাইট্রোজেন	$-৬\cdot০ \times ১০^{-৬}$	$০\cdot৫৫ \times ১০^{-৮}$ সেঃ
রৌপ্য	-৩১×১০^{-৬}	$০\cdot৪৮ \times ১০^{-৮}$ সেঃ

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পদার্থের তিরশ্চুম্বকত্ব, চুম্বক-ক্ষেত্র ও পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল মাত্র এবং উপরোক্ত সূত্রের কোন অংশ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না, সেহেতু তিরশ্চুম্বকত্ব তাপে অপরিবর্তনীয়।

এখন মনে করা যাক এমন পরমাণুর কথা যার অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের পরস্পরের চৌম্বক বিভ্রমিষা নিষ্ক্রিয় করে নি; অর্থাৎ প্রত্যেক অণুই স্থায়ী চুম্বক ধর্মের অধিকারী বা প্রত্যেক অণুর প্রকৃতি পূর্ববর্ণিত ওয়েবারের চুম্বক-অণুর অনুরূপ। সুতরাং বাইরের চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে স্থায়ী চুম্বক-ধর্মাবলম্বী অণুগুলি চুম্বক-ক্ষেত্রের দিঙ্মুখী হবে এবং চুম্বকন চুম্বক-ক্ষেত্রের দিঙ্মুখী হবে। এই জাতীয় পদার্থকে বলা হয় পরাশ্চুম্বক।

বাইরের চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে সবগুলি অণুই চুম্বক-ক্ষেত্রের দিঙ্মুখী হবার চেষ্টা করে; কিন্তু অণুর তাপজনিত গতি এই কার্যে যথেষ্ট পরিমাণ বাধা দান করে। ফলে অণুগুলি বাইরের চুম্বক-ক্ষেত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এমন দিঙ্মুখী হয় যেদিকে তাদের চুম্বকীয় সাম্য রক্ষা পায়।

মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে গ্যাসীয় বস্তুর আণবিক সজ্জা নির্ণয়ে ম্যাক্সওয়েলের ব্যবহৃত সূত্র প্রয়োগ করে দেখান যায় যে,

$$\frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর সংপৃক্ত চৌম্বক বিভ্রমিষা}} = \frac{\text{আণবিক চৌম্বক বিভ্রমিষা} \times \text{চুম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা}}{৩ \times \text{গ্যাসীয় ধ্রুব সংখ্যা} \times \text{পরম তাপমাত্রা}} \cdots\cdots\cdots(১৩)$$

এখন

$$\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চুম্বকপ্রবণতা} = \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}$$

$$= \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর সংপৃক্ত চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}} \times \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর সংপৃক্ত চৌম্বক বিভ্রমিষা}}$$

$$= \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর সংপৃক্ত চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}} \times \frac{\text{আণবিক চৌম্বক বিভ্রমিষা} \times \text{চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}{৩ \times \text{গ্যাসীয় ধ্রুব সংখ্যা} \times \text{পরম তাপমাত্রা}}$$

(১৩নং সূত্র থেকে)

$$= \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর সংপৃক্ত চৌম্বক বিভ্রমিষা} \times \text{আণবিক চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{৩ \times \text{গ্যাসীয় ধ্রুব সংখ্যা} \times \text{পরম তাপমাত্রা}}$$

$$= \frac{\text{ধ্রুব সংখ্যা বা কুরীর সংখ্যা}}{\text{পরম তাপমাত্রা}} \quad \cdots (১৪)$$

পরীক্ষানুরূপ ১৪নং সূত্র অনুযায়ী তাপমাত্রার ঊর্ধ্বক্রমে প্রতি গ্র্যাম অণুর চুম্বকপ্রবণতা হ্রাস পেতে থাকবে। উপরোক্ত সূত্রকে বলা হয়েছে কুরীর সূত্র। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তির্যক্‌চুম্বকত্বই বিভিন্ন পদার্থের পক্ষে সাধারণ চুম্বক-ধর্ম। বাইরের আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে যে পরমাণু পরাশ্চুম্বকধর্ম প্রদর্শন করে, সেই একই পরমাণু তির্যক্‌চুম্বকত্বের সৃষ্টি করে, কিন্তু পরাশ্চুম্বকত্ব প্রাধান্য লাভ করে। কেন না পরাশ্চুম্বকত্ব তির্যক্‌চুম্বকত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী।

ভ্বাইস এই মতবাদের সামান্য পরিবর্তন করে বলেন যে, যে চুম্বক-ক্ষেত্রের দ্বারা পদার্থের অণুগুলি প্রভাবান্বিত হয় সেই ক্ষেত্র হলো বাইরের আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্র ও অণুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পদার্থের একটি নিজস্ব চুম্বক-ক্ষেত্রের সমষ্টির সমান; অর্থাৎ পরাশ্চুম্বক পদার্থগুলি চুম্বক-ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলে তার অভ্যন্তরে দ্বিতীয় একটি অতিরিক্ত চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। সুতরাং

অণুপ্রভাবকারী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা = আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা + নিজস্ব অতিরিক্ত চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা.........(১৫)

কিন্তু এই অতিরিক্ত নিজস্ব চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা নির্ভর করে চুম্বকনের তীব্রতার উপর; চুম্বকনের তীব্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে অতিরিক্ত চুম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ

নিজস্ব অতিরিক্ত চুম্বক ক্ষেত্র = ধ্রুব সংখ্যা × চুম্বকনের তীব্রতা .... (১৬)

সুতরাং অণুপ্রভাবকারী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা = আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা + ধ্রুব সংখ্যা × চুম্বকনের তীব্রতা..... ...(১৭)

সুতরাং

$$\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা} = \frac{\text{কুরীর ধ্রুব সংখ্যা}}{\text{পরম তাপমাত্রা}} \times \text{অণুপ্রভাবকারী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}$$

(১৪নং সূত্র থেকে)

$$= \frac{\text{কুরীর ধ্রুব সংখ্যা}}{\text{পরম তাপমাত্রা}} \left(\text{আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা} + \text{ধ্রুব সংখ্যা} \times \text{চুম্বকনের তীব্রতা} \right)$$

(১৭নং সূত্র থেকে)

উপরোক্ত সূত্রের সামান্য পরিবর্তন করে দেখান যায়,

$$\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চুম্বকপ্রবণতা} = \frac{\text{প্রতি গ্র্যাম অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা}}$$

$$= \frac{\text{কুরীর ধ্রুব সংখ্যা}}{\text{পরম তাপমাত্রা} - \text{ধ্রুব সংখ্যা}} \quad \cdots\cdots (১৮)$$

উপরোক্ত সূত্রকে বলা হয়েছে কুরী-হ্বাইস সূত্র এবং উপরোক্ত সূত্রই আমাদের পূর্ববর্ণিত পরাশ্চুম্বক পদার্থের পক্ষে সাধারণ সূত্র এবং ধ্রুব সংখ্যাটিই কুরীর তাপমাত্রা-জ্ঞাপক, যে তাপমাত্রার উর্ধ্বে অয়শ্চুম্বক পদার্থগুলি পরাশ্চুম্বক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। অয়শ্চুম্বক পদার্থের পক্ষে কুরীর তাপমাত্রা ধনাত্মক; কিন্তু পরাশ্চুম্বক পদার্থের পক্ষে কুরীর তাপমাত্রা ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক উভয়ই সম্ভব।

কুরী হ্বাইস সূত্রের ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেন কোটারু হোণ্ডা। তিনি মনে করেন যে, কতকগুলি অণু ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে চুম্বক-অণুর সৃষ্টি করে। চুম্বক-অণুর কোন স্থায়ী আকৃতি নেই, এর আকৃতি নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। চুম্বক-অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা নির্ভর করে তার আকৃতির উপর; তাই তাপের পরিবর্তনে চুম্বক-অণুর চৌম্বক বিভ্রমিষায় পরিবর্তন হবে। অয়শ্চুম্বক পদার্থের চুম্বক-অণুগুলি গোলাকৃতি; কিন্তু তাপমাত্রার উর্ধ্বক্রমে চুম্বক-অণুর আকৃতি রূপান্তরিত হয়ে ডিম্বাকৃতিতে এবং অয়শ্চুম্বক পরাশ্চুম্বকে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টায় সফলকাম হন হ্বাইস। এই পরিবর্তিত মতবাদে বলা হয় যে, অয়শ্চুম্বক পদার্থের সর্বত্র চুম্বকত্ব সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বিশেষ স্থান স্বতঃচুম্বকধর্মসম্পন্ন। এই বিশেষ স্থানগুলিকে বলা হয় চুম্বক-কেন্দ্র। প্রত্যেক চুম্বক-কেন্দ্রে ১০০০,০০০,০০০ থেকে ১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক পরমাণু থাকা সম্ভব। স্থায়ীভাবে চুম্বকিত এই সমস্ত চুম্বক-কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক চুম্বকগুলি বা আণবিক চুম্বকগুলির চৌম্বক বিভ্রমিষা বিশেষ বিশেষ দিকে নির্দিষ্ট থাকে এবং এই নির্দিষ্টতার কারণ হলো পূর্ববর্ণিত হ্বাইসের নিজস্ব চুম্বক-ক্ষেত্র যা চুম্বক-কেন্দ্রের সর্বত্র সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। এই নিজস্ব চুম্বক-ক্ষেত্রই অয়শ্চুম্বক পদার্থের বৈশিষ্ট্য। কুরীর তাপমাত্রার নীচে পরমাণুর তাপজনিত গতি স্বাভাবিক থাকে; তাই কুরীর তাপমাত্রার নীচে চুম্বক কেন্দ্রের চুম্বকত্ব সংপৃক্ত থাকে। কিন্তু কুরীর তাপমাত্রার উর্ধ্বে পরমাণুর তাপজনিত গতি হয় অত্যন্ত বেশী; ফলে নিজস্ব চুম্বক ক্ষেত্র লুপ্ত হয়। চুম্বক-কেন্দ্রের আকৃতি বিকৃত হয়, কিন্তু পরমাণুর নিজস্ব চুম্বকত্ব লুপ্ত হয় না। চুম্বক-কেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ চৌম্বক বিভ্রমিষা বিশেষ বিশেষ দিকে সজ্জিত হলেও চুম্বক-কেন্দ্রের চৌম্বক বিভ্রমিষা বিক্ষিপ্তভাবে সজ্জিত থাকে। তাই সাধারণ অবস্থায় বাইরের কোন চুম্বক-ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে অয়শ্চুম্বক পদার্থে কোন চুম্বক ধর্ম থাকে না। কিন্তু আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে এই চুম্বক-কেন্দ্রের প্রকৃতি হয় ঠিক অয়শ্চুম্বকধর্মী পিরহোটাইট (FeS) কেলাসের মত। পিরহোটাইট কেলাসের চুম্বক প্রকৃতির সুন্দর ব্যাখ্যা করা যায়, যদি মনে করা যায় যে, প্রত্যেকটি পিরহোটাইট কেলাস অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌলিক কেলাসের সমষ্টি। এই মৌলিক কেলাসের প্রত্যেকটিতে এমন একটি চৌম্বক তল থাকে, যে তলের কোন নির্দিষ্ট দিকে মৌলিক কেলাসগুলি সহজেই চুম্বক-ধর্ম লাভ করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকটি কেলাসই সংপৃক্তভাবে চুম্বকিত থাকে। সুতরাং চৌম্বক তলের সেই নির্দিষ্ট দিকে ক্রমবর্ধমান কোন আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্র ক্রিয়াশীল হলেও চুম্বকনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু বিপরীত দিকে কোন চুম্বক ক্রিয়াশীল হলে প্রথমে চুম্বকনের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কোন বিশেষ বিলোপকারী ক্ষেত্রের প্রভাবে চুম্বকনের দিক আকস্মিকভাবে বিপরীত দিঙ্মুখী হয়। এই পরিবর্তিত দিকেও আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় না। বিভিন্ন কেলাসের চুম্বকনের দিক বিভিন্ন; তাই চুম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতার ক্রমবৃদ্ধিতে বিভিন্ন কেলাসের চুম্বকনের দিক বিপরীত হবে। অবশেষে বিভিন্ন

কেলাসের চুম্বকনের দিক আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রাভিমুখী হবে এবং চুম্বকন সংপৃক্ততা লাভ করবে। পরবর্তীকালে বার্কহাউসেন পরীক্ষা করে দেখান যে, প্রকৃতপক্ষে চুম্বক কেন্দ্র আকস্মিকভাবে চুম্বকনের দিক পরিবর্তন করে। চুম্বক-বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে বার্কহাউসেন ক্রিয়া এবং এছাড়া আবিষ্কৃত অয়শ্চুম্বক পদার্থগুলি প্রত্যেকেই কেলাসিত।

বিভিন্ন পদার্থের চুম্বকত্ব কি ভাবে বিভিন্নতা লাভ করবে সে সম্বন্ধে হ্বাইস দেখান যে, যে কোন চুম্বককে নির্দিষ্ট চৌম্বক বিভ্রমিষাসম্পন্ন চুম্বক কণার সমষ্টিরূপে ধরা যায় এবং তিনি হিসাব করে বলেন যে, প্রত্যেক চুম্বক কণার চৌম্বক বিভ্রমিষা হবে $১৮·৫ \times ১০^{-২২}$ গস্ সেন্টিমিটার বা গ্র্যাম-অণুতে ১১২৩·৫ গস্ সেন্টিমিটার; অর্থাৎ যে কোন ক্ষেত্রেই পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা একটি নির্দিষ্ট চৌম্বক বিভ্রমিষার পূর্ণ গুণিতক। এই নির্দিষ্ট চৌম্বক বিভ্রমিষাকে বলা হয়েছে হ্বাইস-ম্যাগ্‌নেটন। পরবর্তীকালে বোর প্রবর্তিত পরমাণুর কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সাহায্যে দেখানো যায় যে, হ্বাইস-ম্যাগ্‌নেটন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধ্রুব সংখ্যার সঙ্গে আশ্চর্যরকম ভাবে সংযুক্ত। বোরের পরমাণুর কোয়াণ্টামবাদে

$$২\pi \times \text{ইঃ কৌণিক ভরবেগ} = \text{পূর্ণসংখ্যা} \times \text{প্ল্যাংকের ধ্রুব সংখ্যা} \quad \cdots\cdots(১৯)$$

$$\therefore \text{পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা} = \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{২ \times \text{ইঃ ভর} \times \text{আলোর গতিবেগ}} \times \frac{\text{পূর্ণসংখ্যা} \times \text{প্ল্যাংকের ধ্রুব সংখ্যা}}{২ \times \pi}$$

(৭ নং সূত্র থেকে)

$$= \text{পূর্ণসংখ্যা} \times \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ} \times \text{প্ল্যাংকের ধ্রুব সংখ্যা}}{৪\pi \times \text{ইঃ ভর} \times \text{আলোর গতি}}$$

$$= \text{পূর্ণসংখ্যা} \times ৯·২৩ \times ১০^{-২১} \quad \cdots\cdots\cdots(২০)$$

$৯·২৩ \times ১০^{-২১}$কে বলা হয় পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষার কোয়াণ্টাম একক বা বোর ম্যাগ্‌নেটন গ্র্যাম-অণুর হিসাবে এর মান ৫৫৯৩। সুতরাং

$$\frac{\text{বোর ম্যাগ্‌নেটন}}{\text{হ্বাইস ম্যাগ্‌নেটন}} = \frac{৫৫৯৩}{১১২৩·৫} = ৪·৯৭৮ \quad \cdots\cdots\cdots(২১)$$

অর্থাৎ বোর-ম্যাগ্‌নেটন, হ্বাইস-ম্যাগ্‌নেটনের প্রায় ৫ গুণ।

পারমাণবিক চুম্বক-তত্ত্বের পরীক্ষামূলক সত্যতার সম্পর্কে এক ইঙ্গিত দান করেন রিচার্ডসন। ৭নং সূত্র থেকে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে, পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা ও কৌণিক ভরবেগ পরস্পর জড়িত; তাই একের পরিবর্তনে অন্যের পরিবর্তন স্বাভাবিক। রিচার্ডসন দেখান, লৌহ দণ্ডকে যদি সহসা চুম্বকিত করা যায় তবে সেই দণ্ড চুম্বকনের দিকের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণীত হবে। কেননা বাইরের আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে ইলেকট্রন-কক্ষের তল পরিবর্তিত হয়। আইনষ্টাইন ও ডি. হ্যাস্ যুগ্মভাবে পরীক্ষায় এই তত্ত্বের সত্যতা নিরূপণ করেন। চুম্বক-তত্ত্বে একে বলা হয়েছে 'আইনস্টাইন-ডি. হ্যাস্ ক্রিয়া'। কিছুদিন পরে বারনেট দেখান যে, কোন চুম্বক-পদার্থ যদি প্রবলবেগে ঘোরান যায় তবে বস্তুটি যে অক্ষের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণীত হবে তার চতুষ্পার্শ্বে একটি আবর্তজনিত চুম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে; কেন না ঘূর্ণনের ফলে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন ঘটে। চুম্বক-বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে 'বারনেট ক্রিয়া' এবং বারনেটের পরীক্ষায় এই সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু বারনেটের পরীক্ষার একটি আশ্চর্যজনক ফল দেখা গেল। এই উপায়ে পাওয়া পরমাণুর চৌম্বিক বিভ্রমিষা ও ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের অনুপাতের পরীক্ষালব্ধ মান, তত্ত্বলব্ধ মানের দ্বিগুণ। অর্থাৎ

$$\frac{\text{পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{ইঃ কৌণিক ভরবেগ}} = \text{ধ্রুব সংখ্যা} \times \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{২ \times \text{ইঃ ভর} \times \text{আলোর গতিবেগ}} \quad \cdots\cdots\cdots(২২)$$

যেখানে ধ্রুব সংখ্যা=২। এই ধ্রুব সংখ্যাটিকে বলা হয় 'ল্যাণ্ডির ধ্রুব সংখ্যা'। এরপর আরও লক্ষ্য করা গেল যে, প্রবল চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে বর্ণালী-রেখা বিশ্লিষ্ট হয়। পরমাণু-বিজ্ঞানে একে বলা হয়েছে জীম্যান ক্রিয়া।

পরমাণু-তত্ত্বের পরিবর্তন সাধন করে এক-যোগে এই সমস্ত ব্যাপারের সমাধান করেন উলেনবাক্ ও গাউডস্মিট। এই নতুন পরিকল্পনায় বলা হলো যে, সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে পৃথিবীর বার্ষিক গতির মত শুধুমাত্র কেন্দ্রীনের চতুষ্পার্শ্বেই ইলেকট্রন-দল ঘূর্ণীত থাকে না, পৃথিবীর আহ্নিক গতির মত ইলেকট্রনদল নিজেরাও নিজস্ব অক্ষের চতুষ্পার্শ্বে ঘূর্ণায়মান থাকবে। ইলেকট্রনের এই নিজস্ব গতির জন্যে একটি পৃথক কৌণিক ভরবেগ এবং চৌম্বক বিভ্রমিষা থাকবে এবং পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষা ও কৌণিক ভরবেগ, ইলেকট্রনদলের অক্ষ গতি ও কক্ষ-গতিজনিত চৌম্বক বিভ্রমিষা ও কৌণিক ভরবেগের বীজগাণিতিক যোগফল বা লব্ধি। কিন্তু এরূপ কল্পনায় তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্বের সাহায্যে হিসাব করে দেখান যায় যে,

$$\frac{\text{ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ}} = ২ \times \frac{\text{ইঃ কক্ষ-গতির জন্যে চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{ইঃ কক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ}} \cdots(২৩)$$

$$\therefore \text{ ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে চৌম্বক বিভ্রমিষা} = ২ \times \frac{\text{ইঃ কক্ষ-গতির জন্যে চৌম্বক বিভ্রমিষা}}{\text{ইঃ কক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ}} \times \text{ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ}$$

$$= ২ \times \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{২ \times \text{ইঃ ভর} \times \text{আলোর গতিবেগ}} \times \text{ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ}$$

(৭ নং সূত্র থেকে)

$$= \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{\text{ইঃ ভর} \times \text{আলোর গতিবেগ}} \times \text{ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ}$$

সুতরাং পরমাণুর বিভিন্ন ইলেকট্রনের পক্ষে পরমাণুর ইলেকট্রন অক্ষ-গতির জন্যে

$$\text{চৌম্বক বিভ্রমিষা} = \frac{\text{ইঃ বিদ্যুৎ পরিমাণ}}{\text{ইঃ ভর} \times \text{আঃ গতিবেগ}} \times \Sigma \text{ ইঃ-দের অক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ} \cdots(২৪)$$

সুতরাং ৮নং ও ২৪নং সূত্রের সাহায্যে পরমাণুর ইঃ কক্ষ-গতি ও ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে চৌম্বক বিভ্রমিষার লব্ধি,

$$\text{পরমাণু চৌম্বক বিভ্রমিষার লব্ধি} = \frac{\text{ইঃ বিঃ পরিমাণ}}{\text{ইঃ ভর} \times \text{আঃ গতিবেগ}} \times \Sigma \left(\text{ইঃ-দের কক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ} + ২ \text{ ইঃ অক্ষ-গতির জন্যে কৌণিক ভরবেগ} \right)$$

যখন ইলেকট্রনের অক্ষ-গতিজনিত চৌম্বক বিভ্রমিষা ও কক্ষ-গতিজনিত চৌম্বক বিভ্রমিষা পরস্পর সমান ও বিপরীত হয় তখন পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষার লব্ধি হয় শূন্য এবং পরমাণু তিরশ্চুম্বকধর্মী হয়। যেমন, হিলিয়ামে ইলেকট্রনগুলির কক্ষ-গতিজনিত চৌম্বক বিভ্রমিষা-গুলি একে অন্যের সমান ও বিপরীতমুখী এবং অক্ষ গতিজনিত চৌম্বক-বিভ্রমিষাগুলি সমান্তরাল ও বিপরীতমুখী। তাই হিলিয়াম পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষার লব্ধি শূন্য, তাই হিলিয়াম তিরশ্চুম্বক। কিন্তু আবার তাম্রের বেলায় অক্ষ-গতি ও কক্ষ-গতিজনিত চৌম্বক

বিভ্রমিষাগুলির দিক এমনভাবে নির্ধারিত যে, তাম্রের পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষার লব্ধি শূন্য হয় না। তাই তাম্র পরাশ্চুম্বক এবং অয়শ্চুম্বকের বেলায় প্রত্যেক চুম্বক কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত পরমাণুগুলি পরাশ্চুম্বক। কেন না দেখা দেখা গেছে—এই বিশেষ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনগুলির কক্ষ-গতিজনিত চৌম্বক বিভ্রমিষা শূন্য হলেও অক্ষ-গতিজনিত চৌম্বক বিভ্রমিষা শূন্য হয় না, অর্থাৎ চুম্বক-কেন্দ্রের পরাশ্চুম্বকত্বের কারণ ইলেকট্রনগুলির অক্ষ-গতি-জনিত চৌম্বক বিভ্রমিষা।

পরমাণবিক চুম্বক-তত্ত্বের ব্যাপারে ১১নং সূত্র থেকে একটি জিনিষ খুবই স্পষ্ট যে, ইলেক্‌ট্রনের বদলে কেন্দ্রীনের প্রোটন যদি পরমাণুর চুম্বকত্বের কারণ হতো তবে বাইরের আবেশী চুম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর চৌম্বক বিভ্রমিষার মান অনেক কমে যেত। কেন না ইলেক্‌ট্রনের তুলনায় প্রোটন প্রায় ২০০০ গুণ ভারী। কিন্তু যেহেতু বিদ্যুৎ পরিমাণের বর্গ, বিদ্যুৎ ঋণ বা ধন উভয় ক্ষেত্রেই ধন সেই হেতু পরিবর্তিত চৌম্বক বিভ্রমিষা প্রোটনের ক্ষেত্রেও ঋণই থাকতো।

পদার্থের চুম্বক-ধর্মের মূল কারণ অনুসন্ধানে কম্পটন, রংলি প্রভৃতি রঞ্জেন-রশ্মি ও চুম্বক-পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পদার্থের চুম্বক-ধর্মের মূল কারণ সম্ভবতঃ পৃথকভাবে ইলেকট্রন অথবা পরমাণুর আভ্যন্তরীণ কোন অজ্ঞাত পারমাণবিক ঘটনা। ডিরাক্‌, টম, কোঠারী, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি স্বতন্ত্রীকৃত চুম্বক-মেরুর অস্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণা করে বলেছেন—নিউট্রনের প্রকৃতি বিবেচনা করলে মনে হয়, নিউট্রনই বিজ্ঞানীদের বহু কল্পিত স্বতন্ত্রীকৃত-চুম্বক-মেরু। তবে এঁরা হিসাব করে দেখান, ভিন্নমুখী স্বতন্ত্রীকৃত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ এত প্রবল যে, স্বতন্ত্রীকৃত চুম্বক মেরুর পক্ষে পৃথক থাকা সম্ভব হয় না এবং এরূপ নিউট্রনীয় স্বতন্ত্রীকৃত চুম্বক মেরুর দৈর্ঘ্য প্রায় $১০^{-১৭}$ সেন্টিমিটার। অবশ্য যদিও স্বতন্ত্রীকৃত চুম্বক মেরুর হিসাবে পাওয়া দৈর্ঘ্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তবুও বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে স্বতন্ত্রীকৃত চুম্বক-মেরু এখনও ধরা পড়ে নাই।

"এই নিরন্ন দেশের দরিদ্র শিক্ষার্থী দর্শন বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য বুঝে না, কাব্যসাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে জানে না, 'বিদ্যার জন্য বিদ্যার গৌরব' করিতে জানে না, ইত্যাদি দীর্ঘচ্ছন্দ কথা বলিয়া যাঁহারা বিদ্রূপ করেন ও টিটকারি দেন, তাঁহারা নিতান্তই হৃদয়হীন।...আমাদের অধিকাংশ দরিদ্র শিক্ষার্থী পরের নিকট ধার-করা জীর্ণ গাউনে কথঞ্চিৎ শরীর আবৃত রাখিয়া ভাইস চ্যান্সেলারের হস্ত হইতে কম্পিত হস্তে সাধের ডিপ্লোমাখানি গ্রহণ করিয়া মুহূর্তের জন্য উৎফুল্ল হয়, কিন্তু তাহার পর সিনেট হাউসের সোপানাবলী অতিক্রম করিয়াই আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন আঁধার দেখে।"

—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের কথা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

খৃঃ পূর্ব ৮০০ শত শতাব্দীতে অশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে আমরা সর্বপ্রথম তুলার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই তুলা বলিতে সিল্ক ও শণ, যাহার সংমিশ্রণে ব্রাহ্মণেরা উপবীত তৈয়ার করিতেন, তাহাই বুঝাইত। ইহা ছাড়া মনুসংহিতায়ও রজক, তন্তুবায় প্রভৃতির কার্য-নির্ধারণ উপলক্ষে তুলার কথা বলা হইয়াছে। সংস্কৃত কার্পাস শব্দ হইতেই গ্রীক কার্পাস্‌ ও ল্যাটিন কার্পাসাস্‌ এবং স্পেনীয় ফ্ল্যাক্‌স্‌ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পশ্চিম-ভারতের মহেঞ্জোদাড়োতে মৃত্তিকা খননের ফলে তুলার বস্ত্রখণ্ড এবং রজ্জুর মত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের (খৃষ্ট পূর্ব তিন হাজার শতাব্দী) 'সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতার' নিদর্শন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক যুগের পূর্বেও দ্রাবিড়গণ তুলার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। সুতার বস্ত্র ভারতে সর্বপ্রথম কোন্‌ সময়ে তৈয়ার হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন; তবে মিশরীয়েরা যখন সবেমাত্র বল্কল-বসন তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে এবং চীনের অধিবাসীরা যখন চিনাংশুক উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভারতীয়েরা সেই সময় সুতা তৈয়ার এবং মিহি সুতী-বস্ত্র বয়নে নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিল।

তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতের নিজস্ব প্রয়োজনীয় বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়াও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দেশেই ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানি হইত। খৃষ্টপূর্ব এক হাজার শতাব্দীরও পূর্বে রাজা সলোমনের প্রার্থনা-কক্ষে ভারতীয় বস্ত্রের ঝালর ব্যবহৃত হইত, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ৩২৭ বৎসর পূর্বে আলেকজাণ্ডার যে পথে ভারত আক্রমণ করেন তাহাই পরে বাণিজ্যপথে পরিণত হয় এবং এই পথে ভারতীয় মশলা, সিল্ক ও তুলা এসিয়া-মাইনর ও গ্রীসে চালান দেওয়া হইত। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরাই বোধহয় সর্বপ্রথম তুলার বীজ ভারতবর্ষ হইতে ভূমধ্যসাগরের তীরে লইয়া যায়।

ভারতীয় তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যের ব্যবসায় ও রপ্তানির কথা 'পেরিপ্লাস্‌ অব দি এরিথ্রিয়ান সি' নামক পুস্তকে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই ব্যবসায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। আরবীয়েরা সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে পণ্যসম্ভার, বিশেষ করিয়া কেলিকো ও মস্‌লিন ক্রয় করিয়া লোহিত সাগরের উপকূলস্থ বন্দরগুলিতে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে এবং পরে ইহা ইউরোপের বহু নগরে সমাদর লাভ করে। আরবীয় 'কুটুন' শব্দ হইতেই ইংরেজী 'কটন্‌' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

ছোট ছোট টাকুর সাহায্যে ভারতেই সর্বপ্রথম তুলা হইতে সুতা তৈয়ার করা হয়। তকলি বা টাকু অপেক্ষা দ্রুত গতিতে ও সমানভাবে সুতা কাটিবার জন্য পরবর্তীকালে টাকুর সঙ্গে একটি চাকা জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাকেই বলা হয় চরকা। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এই চরকা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রচলিত হয় এবং এইভাবে তুলা হইতে সুতা বাহির করিবার ভারতীয় প্রণালীটি সর্বত্র সমাদর লাভ করে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন ইংরেজ সর্বপ্রথম সুতা তৈয়ার

করিবার কল আবিষ্কার করেন। ভারতীয় চরকাই তাঁহার প্রেরণা যোগাইয়া ছিল।

প্রাচীন ভারতের তন্তুবায়দের তাঁত ছিল ভাল এবং তাহাদের বুনন-কৌশল ছিল উচ্চস্তরের। তাহাদের তৈয়ারী বস্ত্রের ৭০ গজের ওজন কদাচিৎ অর্দসেরের বেশী হইত। বর্তমানে আমাদের উন্নতধরনের কলগুলি যে সব মিহি কাপড় উৎপাদন করিতেছে তাহার সব চেয়ে মিহি কাপড়ের তুলনায় ঐ কাপড় পাঁচ গুণেরও বেশী মিহি হইত। প্রবাদ আছে—দিল্লীর একজন বাদশাহ তাঁহার কন্যাকে কম কাপড় পরিধান করিবার জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, অথচ শাহজাদী সেই সময়ে অন্যূন ৫ ফেরতা শাড়ী পরিহিতা ছিলেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশের তাঁতিরা অতিসূক্ষ্ম মস্‌লিন তৈয়ার করিতে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত এখন আর তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষ ও মিশর ইংরেজের করতলগত হইলে ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রের কলগুলিতে তুলার অভাব দূর হয়। তখন হইতে বিলাতী মিলগুলি এত বেশী কাপড় তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে যে, উহার বেশীর ভাগই অবিক্রীত রহিয়া যাইত। এদিকে আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি, যাহারা পূর্বে ইংরেজের নিকট হইতে কাপড় কিনিত, তাহারা ইতিমধ্যেই নিজেদের দেশে তাহাদের চাহিদা মিটাইবার মত মোটামুটি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ইহাতে ইংরেজেরা খুবই চিন্তিত হইয়া পড়ে। তৎকালে ইংরেজদের তুলনায় ভারতীয়েরা অনেক ভাল কাপড় তৈয়ার করিত, কাজেই বিলাতী কাপড় ক্রয় করিবার মত উৎসাহ কোন ভারতীয়েরই ছিল না। ইংরেজেরা তখন আইন করিয়া ভারতীয় তাঁতিদের সূতা ও কাপড় তৈয়ার করা বন্ধ করিয়া দেয়। উপরন্তু আইন অমান্যকারীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া জেলে পুড়িবার ব্যবস্থা করে। তাঁতিদের তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে কারাগারে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এই প্রকারেই ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প বিদেশী শাসকের হাতে পঙ্গু হইয়া যায় এবং ভারতের বাজারে বিলাতী কাপড় আধিপত্য লাভ করে। তাঁতিদের উপর এই অমানুষিক ও নৃশংস অত্যাচার বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাসের বহু কুখ্যাত ঘটনার অন্যতম।

বৃটিশ মূলধনে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়; কিন্তু ইহাতে ভারতীয়দের সমর্থন না থাকায় মিল-মালিকেরা অকৃতকার্য হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ কাওয়াসজী নানাভাই 'বোম্বে স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিল্‌স্' নাম দিয়া ভারতীয় মূলধনে বোম্বাইয়ে একটি কাপড়ের কল স্থাপন করেন। প্রথম অবস্থায় ইহার উন্নতি মন্দগতিতেই চলিতে থাকে, কিন্তু অল্পদিন পরেই ভাগ্যদেবী এতই সুপ্রসন্ন হইলেন যে, শেয়ার মালিকেরা প্রতি পাঁচ হাজার টাকায় এক হাজার টাকা লভ্যাংশ পাইলেন। ফলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ৬০টি মিল স্থাপিত হইল। ইহাতে ৬৫ কোটিরও উপর টাকা খাটিতে লাগিল। পরে আহম্মদাবাদ, কানপুর ও বাংলা দেশে মিল স্থাপিত হইল। গত ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে মাদ্রাজ প্রদেশও এই বিষয়ে বিশেষরূপে অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রতিযোগিতা না থাকায় ভারতের মিলগুলি বহু অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হয় এবং স্থায়ী উন্নতির প্রথম সোপান তৈয়ার হয়। ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যে আরও ৮৪টি মিল স্থাপিত হয়।

আগামী ১৯৫৪ সালে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। ভারতীয় মূলধনে বিদ্যুৎচালিত বস্ত্রকল ঠিক একশত বৎসর পূর্বে বোম্বাইয়ে স্থাপিত হইয়াছিল। এই শত-বার্ষিকী উপলক্ষে একটি 'বস্ত্র-শিল্প প্রদর্শনীর' ব্যবস্থা করা হইবে। এই প্রদর্শনীতে নানা দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ী

ও উৎপাদনকারীগণ যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

বস্ত্র-শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতে এই পর্যন্ত কত কাপড় তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার মূল্য এবং তাহার উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

১৯৩৭ সালে ভারতের মিলগুলি ৪০০ কোটি গজ এবং তাঁত-শিল্পীরা আরও ২০০ কোটি গজ কাপড় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। ঐ বৎসর ৬০ কোটি গজ আমদানি এবং ২০ কোটি গজ কাপড় ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হয়। সুতরাং ভারতের নিজস্ব ব্যয়ের জন্য ৬৪০ কোটি গজ অর্থাৎ মাথা পিছু ১৬ গজ করিয়া কাপড় আমাদের হাতে আসে।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে কাপড়ের মূল্য ছিল অত্যন্ত কম। একটি ধুতি বারো আনা হইতে দুই টাকার মধ্যে এবং একটি শাড়ী এক টাকা হইতে আড়াই টাকার মধ্যেই পাওয়া যাইত। কাপড়ের অভাব বা মূল্যের স্ফীতি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয় নাই। জাপান যুদ্ধে নামিবার পরই কাপড়ের চাহিদা অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যায় এবং জাপানী কাপড়ের আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে ১৯৪২ সালের জুলাই মাস হইতে কাপড়ের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যুদ্ধের পূর্বে ১৯।৮।৩৯ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কাপড়ের মূল্য যদি ১০০ হইয়া থাকে তবে উহা ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে ৪৬৯ এবং ঐ সালেরই জুন মাসে ৫১৩ তে দাঁড়ায়। এই সময়েই ভারত গভর্নমেণ্ট তুলাজাত কাপড় ও সুতার মূল্য নির্ধারণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ১৯৪৩ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১২ প্রকার মিল-জাত কাপড়ের মূল্য নির্ধারিত করেন। এই মূল্য তৎকালীন প্রচলিত বাজার-দর অপেক্ষা টাকা প্রতি ছয় আনা কমে নির্ধারিত হয়। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কাপড়ের উপর পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কাপড় এবং সুতার বাণ্ডিলের উপর নির্ধারিত মূল্যের ছাপ মারিবার জন্য ভারত-গভর্নমেণ্ট কড়া আদেশ জারি করেন। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে বস্ত্র-মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা ২৬২ তে নামিয়া আসে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়, কিন্তু ভারতীয় তুলার প্রধান উৎপত্তি স্থান সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের অংশে পড়ায় ভারতের তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে খুবই ক্ষতি হয়। ইহা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে বস্ত্র ও সুতার উপর যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল তাহা অনেকটা শিথিল করা হইল। মিলের ইচ্ছানুযায়ী মূল্যের ছাপ অবশ্যই কাপড়ের উপর এবং সুতার বাণ্ডিলের উপর দেওয়ার বাধ্য-বাধকতা কিছুদিনের জন্য রহিয়া গেল; কিন্তু পরে ১৯৪৮ সালের ২৪শে এপ্রিল কাপড়ের মূল্য এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হইল।

এই প্রকারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের ফলে চোরাকারবারীরা একত্রিত হইয়া দেশ ও দশের মঙ্গলের কথা ভুলিয়া এই অবস্থাকে নিজেদের স্বার্থ সাধন করিবার জন্যই নিয়োগ করিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের কাপড়ের উপরে যে মূল্য ধার্য ছিল তাহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ হইতে ২০০ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ফলে ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। ইহার পর যদিও সময় সময় কোন কোন বিশেষ কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করা হইয়াছে তথাপি সম্পূর্ণরূপে উহা আর কখনও ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। ঐ সময় হইতে আমাদের জাতীয় সরকার ক্রম-বিনিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৫২ সালের ১৫ই মার্চ পশ্চিম বঙ্গ সরকার এক ব্যবসায়ী

অন্য ব্যবসায়ীর নিকট এবং খুচরা দোকানদার জনসাধারণের নিকট কাপড় বণ্টন বা বিক্রয় করা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দেন। কিন্তু মূল্য ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকে।

ধুতী, শাড়ী, পপ্‌লিন, মল্‌, ভয়েল, ক্রেপ, সার্টিং, ড্রিল, দোসুতি, টিকিন ইত্যাদি কাপড়ের উপর যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ছিল তাহা ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর হইতে তুলিয়া দেন। বর্তমানে মার্কিন, লংক্লথ, ইত্যাদি খুব অল্পসংখ্যক কাপড়ের উপরেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে কাপড় পাঠাইতে হইলে এখনও চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যাইতে হয়। এদিকে কাপড়ের উপর পূর্বের রপ্তানি কর শতকরা ২৫ টাকা হইতে কমাইয়া ১০ টাকা করা হইয়াছে। ইহার ফল ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও রপ্তানীকারীদের পক্ষে খুবই ভাল হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই বৎসর (১৯৫৩) একশত কোটি গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিবেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষে ৫৩৮টি মিলে ৭ লক্ষেরও উপর মজুর কাজ করিতেছে। হাসপাতালের গজ কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া পরিধানের ধুতি, শাড়ী, জুতার ক্যানভাস্‌, মোটরের টায়ার ইত্যাদিতে ১৪২ প্রকারের তুলাজাত দ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগিতেছে। ইহার সবগুলির নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনও নাই আর সম্ভবও নয়।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩০১/২ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হয়। বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় ৮১/২ লক্ষ বেল এবং পাকিস্তান হইতে আসে ৬০ হাজার বেল; কিন্তু ভারতের প্রয়োজনে মোট ৩৬০৬০০০ বেল খরচ হয়। বিদেশী তুলার উপর এই নির্ভরশীলতাই আন্তর্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতের অর্থাভাবের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার অবসান করিতে হইলে ভারতীয় তুলা-চাষের উন্নতির প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতীয় ছোট আঁশের তুলার ক্ষেত্রগুলিকে অতিদ্রুত বড় আঁশের তুলার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। ইহার কৃতকার্যতার উপর ভারতীয় কাপড়ের ব্যবসায়ে বিদেশী বাজারের উপর নির্ভর না করিয়া আত্ম-নির্ভরশীল হইবার পন্থা নির্ভর করিতেছে।

১৯৫২ সালে ৪৬০ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে প্রস্তুত হয়। এই উৎপাদন বিগত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে অথবা ১৯৫১ সালে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা ৬০ কোটি গজ বেশী। ঐ সালে ১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ গজ সুতাও মিলগুলিতে তৈয়ারী হয়। উহা পূর্বের যে কোন বৎসরের উৎপাদন অপেক্ষা বেশী। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে ৪২ কোটি ৪০ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে তৈয়ারী হয়। ইহা ভারতবর্ষে মাসিক উৎপাদনের সর্বোচ্চ সংখ্যা। প্রতিটি মানুষের অন্ততঃ ২০ গজ কাপড় প্রতি বৎসরে প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের ৩৫ কোটি লোকের প্রয়োজন মিটাইতে হইলে অন্ততঃ ৭০০ কোটি গজ কাপড়ের দরকার; কিন্তু এ পর্যন্ত কোন বৎসর আমাদের মিলগুলি বৎসরে ৪৬০ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড়ের বেশী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায়—বস্ত্র-শিল্পে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাছাড়া যে সব কাপড়ের প্রকৃত চাহিদা আছে তাহা অপেক্ষা যে সকল কাপড়ে লাভ বেশী সেই সব কাপড়ই মিল মালিকেরা বেশী প্রস্তুত করিয়া থাকে। যে জিনিষের চাহিদা বেশী তাহার একটিতে লাভের অংশ কম হইলেও মোট লাভ তাহাতেই বেশী—ইহা চিন্তা করা উচিত।

আমাদের দেশে যে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহা দ্বারা দেশের চাহিদাই মিটানো যায় না, তাহার উপর ডলার উপার্জন করিবার জন্য যদি ১০০ কোটি গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিতে হয়

তবে অন্যূন ৮০০ কোটি গজ, অর্থাৎ বর্তমানে ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনের যাহা সর্বোচ্চ বাৎসরিক রেকর্ড তাহা অপেক্ষাও ৩৩৯ কোটি ২০ লক্ষ গজ কাপড় বেশী উৎপাদন করা দরকার।

বেশী লাভের আশাই আমাদের সর্বনাশের মূল। মিল-মালিককে এখন বেশীর ভাগ কাপড়ের উপরই খুসীমত মূল্য গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় সমস্ত প্রকার কাপড়ের মূল্যই উৎপাদন খরচের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য না রাখিয়া দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।

যদি মিল-মালিক, মিল-মজুর এবং জাতীয় সরকার একত্রিত হইয়া বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করেন তবে কটন বা মূল্যের উপর যে কোন প্রকার কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিলেও এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অগ্রগতি

মারাত্মক ব্যাধির কবল হইতে মুক্তির সংগ্রামে মানুষ যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে সম্প্রতি লস্ এঞ্জেল্সে অনুষ্ঠিত মার্কিন রসায়ন সমিতির ১২৩তম অধিবেশনে তাহার বিবরণ প্রদান করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের খ্যাতনামা রসায়নবিদ এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ সহ পাঁচ হাজার লোক রসায়ন সমিতির অধিবেশনে যোগ দান করেন। মূত্রাশয়ের পাথুরি হইতে সুরু করিয়া পাকস্থলীর ক্ষত নিরাময় করা পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের জন্য নূতন যে সকল ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, অধিবেশনে তাহার আলোচনা হয়।

আলোচনার মধ্যে বিশেষভাবে একটি ঔষধের উল্লেখ করা হয়। এই ঔষধটি আবিষ্কৃত হওয়ায় যক্ষ্মায় মৃত্যুর হার বিশেষভাবে হ্রাস পায়। মাত্র এক বৎসর হইল ঔষধটি বাজারে বিক্রয় হইতেছে। শিশুপক্ষাঘাত সম্পর্কে গবেষণা এত আশাপ্রদরূপে চলিয়াছে যে, দুই এক বৎসরের মধ্যেই বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আর একটি নূতন ঔষধ শীঘ্রই বাজারে ছাড়া হইবে। ইহার প্রস্তুতকারকেরা বলেন যে, এই ঔষধটি এক ধরনের মৃগীরোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করিবে।

অ্যামিবাঘটিত আমাশয় রোগের প্রতিকারার্থে একমাস পূর্বে একটি অ্যান্টিবায়োটিক চালু করা হইয়াছে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা যক্ষ্মারোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ করউইন হিন্‌শ বলেন যে, আইসোনিয়াজিড (আই. এন. এইচ) নামক ঔষধটি যক্ষ্মার প্রকোপ হ্রাস করায় সহায়তা করিতেছে। মাত্র বৎসরখানেক হইল ঔষধটি বাজারে পাওয়া যাইতেছে। যক্ষ্মারোগের জন্য অবশ্য আরও দুইটি ঔষধ রহিয়াছে: স্ট্রেপ্‌টো-মাইসিন এবং প্যারা-অ্যামিনো-স্যালিসাইলিক অ্যাসিড।

শিশুপক্ষাঘাত সম্পর্কে আলোচনাকালে রসায়ন সমিতির চিকিৎসা বিষয়ক রসায়ন বিভাগের জনৈক প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন যে, শিশুপক্ষাঘাত রোগ সম্পর্কিত গবেষণা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং ১৯৫৫ সাল বা তাহার পূর্বেই প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শিশুরোগের ঔষধ সম্পর্কে আলোচনাকালে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতি-

ষ্ঠানের রাসায়নিক গবেষণার জনৈক ডিরেক্টর বলেন যে, পেটিটম্যাল রোগ আরোগ্যের জন্য তাঁহার কোম্পানী শীঘ্রই একটি নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা মৃগীরোগেরই একটি রূপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা হইবে প্রায় ৫ লক্ষ।

উক্ত রসায়নবিদ বলেন যে, নূতন ঔষধটির নাম মিলনটিন। ঔষধটি সম্পর্কে গবেষণা সমাপ্ত করিতে ১০ বৎসর সময় লাগিয়াছে। তিনি বলেন, এই ঔষধটি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পেটিটম্যালের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

অপর একটি কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রতিনিধি বলেন যে, ষাঁড়ের অণ্ডকোষ হইতে প্রস্তুত একটি ঔষধের সাহায্যে মূত্রাশয়ের পাথুরিরোগ নিবারণ করা যায়।

অ্যামিবাঘটিত আমাশয় রোগের নূতন ঔষধ ফিউমিডিল মাত্র এক মাস পূর্বে চালু হইয়াছে।

ফেনারসেনাইড

ফেনারসেনাইড (Phenarsenide) নামক একটি নূতন ঔষধ হাঁপানী রোগে প্রয়োগ করিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। পুরাতন হাঁপানী রোগে এই ঔষধটি কার্যকরী।

বিট হইতে চিনি প্রস্তুত

সম্প্রতি লস্ এঞ্জেলসে আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির এক অধিবেশনে ডাঃ এল. ই. ব্রাউনেল বিট হইতে চিনি প্রস্তুতের একটি নূতন ও অধিকতর কার্যকরী পদ্ধতির কথা জানাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক ডাঃ ব্রাউনেল বলেন যে, এই পদ্ধতিটি বর্তমান নিষ্কাশন পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নত। নূতন পদ্ধতিতে বিটের খণ্ডগুলিকে উচ্চ চাপবিশিষ্ট বাষ্পের মধ্যে দেওয়া হয় এবং সহসা চাপ হ্রাস করা হয়। ইহার ফলে বিটের কোষগুলি ফাটিয়া যায় ও অধিক পরিমাণে রস নির্গত হয়।

অত্যধিক রক্তস্রাব নিবারণ

স্বাভাবিক রক্ত হইতে নিষ্কাশিত একটি বিশেষ পদার্থ প্রয়োগ করিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোকের অত্যধিক রক্তস্রাব দ্রুত নিবারণের সাফল্যজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। মিচিগ্যান ষ্টেট মেডিক্যাল সোসাইটির এক বিবৃতিতে ডাঃ টাম্বলিন ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

রক্ত হইতে নিষ্কাশিত পদার্থটির নাম অ্যান্টি-হেমোফাইলিক গ্লোবিউলিন। হেমোফাইলিয়া রোগীর উপর কিন্তু এই পদার্থটি প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় নাই (এই রোগে শরীরের কোন স্থান হইতে একবার রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে উহা সহজে বন্ধ হয় না)। একটি ক্ষেত্রে শরীরের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করাইয়া এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই; শেষে এই পদার্থটি ইন্‌জেক্‌সন্ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রক্তস্রাব বন্ধ হয়। অপর একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের অত্যধিক রক্তস্রাব নিবারণে প্রচলিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রায় পাঁচ দিন পরে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইলে অ্যান্টি-হেমোফাইলিক গ্লোবিউলিন প্রয়োগ করিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যেই রক্তস্রাব বন্ধ হয়। পরে তিনি সুস্থ সন্তান প্রসব করেন।

রোগীদের মধ্যে সকলেই সন্তানসম্ভবা ছিলেন না। কয়েকজনের ক্যানসার ছিল এবং একজনের জরায়ুর মধ্যে আব ছিল। একজনের ক্রমাগত রক্তস্রাব নিবারণে বহু প্রচলিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া এবং শরীরে রক্ত প্রবেশ করাইয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই; পরে দুই মাত্রা অ্যান্টি-হেমোফাইলিক গ্লোবিউলিন প্রয়োগ করিয়া আট ঘণ্টা পরে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

ডাঃ টাম্বলিন বলেন, অ্যান্টি-হেমোফাইলিক

গ্লোবিউলিন প্রয়োগে তিন প্রকার পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়—ফাইব্রোজেন, অ্যাক্সিলারেটার গ্লোবিউলিন এবং অ্যান্টি-হেমোফাইলিন। কিন্তু এইগুলির মধ্যে কোন একটি কার্যকরী অথবা তিনটির মিশ্রণ একত্রে কার্যকরী, তাহা নির্ধারিত হয় নাই। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব নিবারণে এই পদার্থ ব্যবহার করিয়া যেরূপ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় অন্যান্য রক্তস্রাবের ক্ষেত্রেও ইহার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা উচিত।

এক্স-রে দুরবীক্ষণ

ওয়েস্টিং হাউস ইলেক্ট্রিক করপোরেশন সম্প্রতি এক নূতন ধরনের এক্স-রে যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। প্রচলিত এক্স-রে ব্যবস্থায় মানুষের শরীরাভ্যন্তরের ছবি যেরূপ দেখায়, এই নূতন যন্ত্রে তাহা অপেক্ষা দুই শত গুণ উজ্জ্বল দেখা যায়। রেডিয়োলজিষ্টগণ বলেন, এক্স-রে যন্ত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে ইহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। ওয়েস্টিং হাউসের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের এক্স-রে বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ইসন, ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের এক সভায় এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন।

এই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর দেহাভ্যন্তরের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দুই শত গুণ উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করা সম্ভব। রোগীর রোগ সঠিক নির্ধারণে এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া চিকিৎসকগণ দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইবেন। পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থায় যাহা অস্পষ্ট দেখা যাইত এখন তাহা উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় যে কোন দিক হইতে শরীরাভ্যন্তরের যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া ও গতি পর্যবেক্ষণ করা যাইবে। এক্স-রে ছবি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থায় চিকিৎসককে বহুক্ষণ যাবৎ অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্থ করিতে হইত; এখন আর তাহা প্রয়োজন হইবে না।

বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ ঔজ্জ্বল্য বর্ধনকারী এক্স-রে যন্ত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। এক্স-রে যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করার বিশেষ অন্তরায় এই যে, মানুষের শরীরে ঐ শক্তি সহ্য করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বর্ধিত শক্তি প্রয়োগে মানুষের শরীরে গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। আর একটি অন্তরায় হইল, এক্স-রে'র গতিবেগ বর্ধিত করা যায় না বা উহাকে কেন্দ্রীভূত করিবার কোন উপায় নাই। এই জন্য এক্স-রে রোগীর শরীরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর উহাকে যথাযোগ্য বর্ধন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বলকারক যন্ত্রে এক্স-রে রোগীর শরীরের মধ্য দিয়া একটি প্রতিপ্রভ পর্দার উপর পড়িলে উহা হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হইতে থাকে। ঐ আলোকরশ্মি প্রতিপ্রভ পর্দার অপর দিকে স্থাপিত এক আলোকানুভূতি সম্পন্ন আস্তরণের উপর পড়িলে উহা হইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন নির্গত হইতে থাকে। ঐ দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ইহার ফলে প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থান হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ঐ কেন্দ্রীভূত উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি লেন্সের সাহায্যে ইচ্ছানুযায়ী বর্ধিত করিয়া চিকিৎসক পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন।

আকাশে রহস্যজনক বাতাসের সুড়ঙ্গ

আকাশে বহুঃউচ্চে অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন বাতাসের (জেট ষ্ট্রীমের) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকান আবহাওয়া বিশারদেরা এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন এবং ইহাকে

আকাশে রহস্যজনক বাতাসের সুড়ঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আকাশযানের নিরাপত্তা বিধানে এবং আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ধারণে এই জেট ষ্ট্রীমের অবস্থান নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন। নিউইয়র্কের জেনারাল ইলেক্ট্রিক কোম্পানির বিখ্যাত গবেষক ডাঃ সেফার এই সম্বন্ধে তথ্যাথি সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন—ভূপৃষ্ঠ হইতে ২০০০০—৫০০০০ ফুট উচ্চে জেট ষ্ট্রীমের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ হইতে ২০০ মাইল। উচ্চে উড্ডীয়মান আকাশযান জেট ষ্ট্রীমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থা অনুসারে উহার গতিবেগ বহু পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ঋতু পরিবর্তনের সময় জেট ষ্ট্রীমেরও দিক পরিবর্তিত হইতে দেখা গিয়াছে। বেশীর ভাগ সময় ইহাকে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কখনও কখনও পশ্চিম বা উত্তর দিকেও বহিতে দেখা যায়। কোন কোন সময় দুই বা ততোধিক জেট ষ্ট্রীমেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না; জেট ষ্ট্রীমের অবস্থান এবং তাহার মধ্যে বাতাসের বেগ, ইহার কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন। যেমন, ঐ প্রবাহের দ্বারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বাতাস শীতপ্রধান দেশে নীত হইতে পারে, অথবা উহার বিপরীত ঘটনাও ঘটিতে পারে। বহু বন্যা, অনাবৃষ্টি, বা বহুকাল স্থায়ী ঠাণ্ডা বা গরম উহারই প্রভাবে হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয়।

পূর্বে জেট ষ্ট্রীমের অবস্থান জানিবার কোন উপায় ছিল না। এখন ডাঃ সেফার দেখাইয়াছেন যে, দেশের বিভিন্ন স্থানের মেঘের গঠন বৈষম্য পর্যবেক্ষণ করিয়া জেট ষ্ট্রীমের অবস্থান ও প্রবাহের দিক নির্ণয় করা যাইতে পারে।

জেট ষ্ট্রীমের নিকটবর্তী ভূভাগে ঝড়ো বাতাস বহে, বায়ু শুষ্ক ও শীতল থাকে, আকাশে মেঘের পরিমাণের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। হয়ত দেখা গেল, আকাশের অল্প স্থান ব্যাপিয়া মেঘ রহিয়াছে আবার কিছু পরে দেখা যাইবে, আকাশের অধিকাংশ স্থান মেঘাবৃত হইল; এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকবার এইরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হইতে পারে।

অনিদ্রার ঔষধ

অনিদ্রা একটি কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও খুব বিরল নয়। কোন ব্যক্তি হয়ত বেশ সুনিদ্রায় অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল—মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, শয্যায় এপাশ-ওপাশ করেন, কিন্তু কোন প্রকারেই আর নিদ্রা আকর্ষণ করিতে পারেন না। এইরূপ কষ্টকর অবস্থায় ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অনিদ্রা দৈহিক কারণেও ঘটিতে পারে, যেমন—কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা, হাত-পা জ্বালা, অম্লশূল, মাথাধরা ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন প্রকার মানসিক সংঘাতই অনিদ্রার কারণ হইয়া থাকে।

নিউ ইয়র্কের ডাঃ পোর্টার বলেন, অনিদ্রা সাধারণতঃ কোন মানসিক উদ্বেগেরই পরিচায়ক। যে সমস্ত ব্যাধির বহু প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, উহার কোনটিই সর্বতোভাবে কার্যকরী হয় না। অনিদ্রাব্যাধি নিরাময়ের জন্য বহুপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, যেমন—পেটেণ্ট ঔষধ, বিশেষ পথ্য, শয়ন করিবার জন্য বিশেষ শয্যা, কর্ণের আবরণ ইত্যাদি। আবার নিদ্রা আকর্ষণ করিবার জন্য কোন কোন পুস্তক বা বিশেষ ধরনের সঙ্গীতের গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, অনিদ্রা নিরাময়ের জন্য একান্ত নির্ভরযোগ্য কোন চিকিৎসা স্থিরীকৃত হয় নাই। রোগের অবস্থা গুরুতর না হইলে উপরোক্ত কোন

ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে কার্যকরী হইতে পারে। কিন্তু গুরুতর অবস্থায় ঐগুলি তেমন ফলপ্রসূ হয় না।

নিদ্রা আকর্ষণকারী ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে নিদ্রাকর্ষণ হয়, কিন্তু মানসিক উত্তেজনা গুরুতর হইলে রোগী শীঘ্রই ঔষধে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর মাত্রায় ঐ ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয়। এইভাবে ক্রমাগত ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করাও অসম্ভব হইয়া উঠে। মানসিক সাম্য নষ্ট হওয়ার ফলেই এইরূপ গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ইহা নিরাময়ের জন্য মানসিক উদ্বেগেরই চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন জীবাণুধ্বংসী বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান

পার্ক ডেভিস কোম্পানীর একজন অধ্যক্ষ মিঃ ওয়াকার নিউইয়র্কের ঔষধ ব্যবসায়ীদের এক সভায় বলেন, ভবিষ্যতে ছত্রাকোৎপন্ন জীবাণুধ্বংসী ঔষধ রাইফেলের গুলির ন্যায় স্থির লক্ষ্যেই প্রযুক্ত হইবে, ছট্‌রা বন্দুকের ন্যায় কতকটা আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবহার করা হইবে না।

তিনি বলেন, সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক ও ঔষধ ব্যবসায়ীগণ এক বা একাধিক বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুর উপর কার্যকরী হইতে পারে এইরূপ অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান করিতেছেন। বহু প্রকার জীবাণুর উপর প্রযোজ্য একটিমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক এখন আর তাঁহারা পছন্দ করিতেছেন না। মিঃ ওয়াকার প্রকাশ করেন যে, রক্ত ও রক্তগঠনকারী তন্তু সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য পার্ক ডেভিস কোম্পানী বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য আপ্লাষ্টিক রক্তাল্পতার কারণ অনুসন্ধান করা। যাহারা হামেশা বা দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লোরোমাইসেটিন ব্যবহার করেন তাহাদের অনেকের দেহে এইরূপ মারাত্মক রক্তাল্পতা প্রকাশ পায়। আমেরিকান ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এবং ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল সম্প্রতি ক্লোরোমাইসেটিন ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ সহস্র সহস্র রোগীর ইতিহাস সংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত আছেন। বর্তমানে রোগ নির্বিশেষে ব্যবহারের কোন বিশেষ বাধ্য-বাধকতা ব্যতীতই ক্লোরোমাইসেটিন সরবরাহ হইয়া থাকে। অকিঞ্চিৎকর কারণে এবং যথেচ্ছা যেন ইহার ব্যবহার না হয়, কেবল এই নির্দেশ দেওয়া থাকে।

মিঃ ওয়াকারের মতে, এইরূপ রক্তাল্পতার কারণ সম্বন্ধে বিশদভাবে আরও তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক। সাধারণের মধ্যে কত লোক এই রোগাক্রান্ত হয় এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরেই বা কত লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহা যথাযথভাবে নির্ণয় করা আবশ্যক।

হাইড্রাজাইন প্রস্তুতের নূতন পন্থা

আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় উটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসার জুলিন্‌স্কি প্রমুখ তিনজন রাসায়নিক রকেট ইঞ্জিনের ইন্ধন হাইড্রাজাইন প্রস্তুতের এক নূতন পন্থা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রোঃ জুলিন্‌স্কি বলেন, অ্যামোনিয়া গ্যাসের মধ্যে অতি দ্রুত কম্পনশীল বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করিয়া প্রচুর পরিমাণে হাইড্রাজাইন প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

হাইড্রাজাইনের ক্রমবর্ধনশীল চাহিদা মিটাইতে নূতন পন্থাটি যথেষ্ট সাহায্য করিবে। উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়ায় ইহা প্রস্তুতের ব্যয়ও অল্প হইবে। পুরাতন ব্যবস্থায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া গ্যাসকে হাইড্রাজাইনে রূপান্তরিত করা হয়, বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব্যবহার করা হয় না। রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হাইড্রাজাইনে কিছু জল থাকিয়া যায়; ঐ জল বিযুক্ত করা প্রচুর ব্যয়সাধ্য। এইজন্য রাসায়নিকেরা গবেষণা করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে শুষ্ক হাইড্রাজাইন প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বহুকাল হইতে হাইড্রাজাইনের পরিচয় জানা

থাকিলেও সম্প্রতি উহার ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে হাইড্রাজাইন হইতে উদ্ভূত পদার্থের সাধারণ ব্যবহার জানা ছিল। ঐ যুদ্ধের সময় জার্মানরা হাইড্রাজাইনের জেট্ ইঞ্জিনের ইন্ধন রূপে ব্যবহারোপযোগী গুণ আবিষ্কার করে। তখন হইতে অনেকেরই ঐদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার ফলে ইহা ব্যবহারের বহু ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়।

কিরূপ বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব্যবহার করিলে অ্যামোনিয়া হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক হাইড্রাজাইন প্রস্তুত হয় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায়, তাহাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল। তাপমাত্রার উপর হাইড্রাজাইনের স্থায়িত্ব অনেকটা নির্ভর করে; এইজন্য একমুখী বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগ না করিয়া অতি-কম্পনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব্যবহার করিয়া তাপের মাত্রা হ্রাস করা হইয়াছে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

সঞ্চয়ন

কীট-পতঙ্গ ও রোগের আক্রমণে শস্য রক্ষার ব্যবস্থা

একথা আজ সকলেই জানেন যে, কীট-পতঙ্গ, আগাছা এবং রোগের আক্রমণে শস্যের গুরুতর ক্ষতি হয়। কীট পতঙ্গের আক্রমণে শস্যের ক্ষতি বহুকাল ধরেই হয়ে আসছে এবং এ এমন কিছু নূতন ব্যাপার নয়, বাইবেলেও তার উল্লেখ দেখা যায়। পঙ্গপালের আক্রমণ, মিল্‌ডিউ এবং পামার-ওয়ার্মের উল্লেখ বাইবেলে পাওয়া যায়। যাহোক এসব অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গের উপদ্রব প্রতিরোধ সম্পর্কে এফ. জি. অডিশের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

কীট-পতঙ্গ বা ব্যাধির আক্রমণ থেকে শস্যকে বাঁচাবার জন্যে বর্তমান যুগে বিবিধ যান্ত্রিক, জৈব কিংবা রাসায়নিক উপায় অবলম্বনের চেষ্টা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের কর্মীরা এদিক দিয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে, একথা আজ জোর করেই বলা চলে। এই সব কীট-পতঙ্গ বা ব্যাধির বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরেই সংগ্রাম চলছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—গমের এক ধরনের পরজীবী ব্যাধি সম্পর্কে জেথ্রো টাল্ যে অনুসন্ধান কার্য চালান তার ফলে ২০০ বৎসর পূর্বে টিলেটের পক্ষে ফ্রান্সে পরীক্ষা কার্য চালানো সম্ভব হয়। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে জন কার্টিস তাঁর 'ফার্ম ইনসেক্‌টস্' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন এবং প্রায় একই সময়ে বেভারেণ্ড বার্কলে ছত্রাক ব্যাধির মৌলিক প্রকৃতি আবিষ্কার করেন। এর ফলে আলুর পোকা বা অন্যান্য রোগ দমন করা সম্ভব হয়।

১৮৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালসিয়াম আর্সেনেট ব্যবহার করে কোলোরেডো বীট্‌ল্ ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়। এতে নাকি শস্যের কিছুটা ক্ষতি হয় বলে অনেকে মনে করেন। এর পরে ব্যবহৃত হতে থাকে 'লণ্ডন পার্পল্' নামে একরকম পদার্থ, এটি রঞ্জক দ্রব্যের একটি উপজাত পদার্থ এবং অনেক বেশী কার্যকরী। পরবর্তী শতকে চারাগাছ এবং শস্য রক্ষার জন্যে উন্নততর ব্যবস্থাধীনে সংগ্রাম চালানো হয়।

বৃটেনে কৃষি-বোর্ড শস্য-কীট দমন সম্পর্কে বহু পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অধ্যাপক থিওবোল্ড ও সালামানের ন্যায় ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে পুস্তক লেখেন এবং বহু গবেষণামূলক কাজ করেন। ১৯১১ সালে স্কটল্যাণ্ডবাসী অধ্যাপক ডবলিউ-ম্যাকডুগাল কীটঘ্ন হিসাবে ডেরিস রুটের (Derris

root) প্রবর্তন করেন। তা চারাগাছের পক্ষে নিরাপদ এবং ফলপ্রদ হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় খাদ্য-সংকট দেখা দেওয়ায় যুক্তরাজ্যে রোয়া কৃষি ব্যবস্থা প্রসারের নতুন পরিকল্পনা এবং সেই সঙ্গে শস্য রক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। কমনওয়েলথেও এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি কাজের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ডাঃ উভারোভ পঙ্গপালের পর্যায়ক্রমিক অবস্থার কথা ঘোষণা করেন। এর ফলে পঙ্গপালের আক্রমণেব পূর্বেই তাদের দমন করবার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া ফিজিতে জৈব উপায়ে নারকেল বিনষ্টকারী তিন রকমের পোকা দমন করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কঠিন সংকটের মধ্যেও যুক্তরাজ্যের কর্মীরা আরও অনেক কিছু নতুন জিনিষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। প্রথম জিনিষ হলো গ্যামাক্সেন। এটি একটি শক্তিশালী কীটঘ্ন। বীট্‌ল্ দমন সম্পর্কে ডেরিসের বিকল্প হিসাবে এই ভেষজটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। পঙ্গপালের বিরুদ্ধে অভিযানে ইহা বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করে। মানুষ বা জীবজন্তুর পক্ষে এটা আদৌ বিষাক্ত নয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কারটি হলো সংশ্লেষিত হর্মোন; আগাছা বিধ্বংসী হিসাবে তা বেশ ফলপ্রদ, অথচ তৃণের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এই বিশেষ আবিষ্কারের সাহায্যে এক বৃটেনেই প্রতি বৎসর অর্ধ মিলিয়ন টনের অধিক শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

শস্যের উপর কীটঘ্ন ভেষজ ব্যবহারের জন্যে ভাল কার্যকরী যান্ত্রিক উপকরণের প্রয়োজন। এ সম্পর্কে দুটি বৃটিশ ফার্ম পারস্পরিক সহযোগিতায় 'অ্যাগ্রো' বা লো ভলুম স্প্রেয়ার নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে।

যুদ্ধের পর থেকে এ সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা হয়। ডাঃ রিপারের কাজ এসম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি জৈব ফস্‌ফরাস ঘটিত কীটঘ্ন পদার্থ (schradan) নিয়ে কতকগুলি কীটঘ্ন ভেষজ প্রস্তুত করেন। গাছ সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে এই ভেষজগুলি গ্রহণ করে এবং যখনই কোন পোকা-মাকড় তাকে আক্রমণ করে তখনই তার মৃত্যু হয়।

যুক্তরাজ্য আর এক দিক দিয়ে এ সম্পর্কে অনেকটা কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। গাছ রক্ষা করার নিত্য নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে বহু পুস্তক এবং পুস্তিকা লেখা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বিষয়ের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এইবারই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃটেনের কৃষিমন্ত্রী-দপ্তর প্ল্যাণ্ট প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটারিতে যে মূল্যবান কাজ করছে তার উল্লেখ করা যায়। তা ছাড়া ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্যারিসে শস্য রক্ষা সম্পর্কে যে তৃতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তারও গুরুত্ব কম নয়।

বৃটেনের সরকারী গবেষণা-কেন্দ্রগুলির সঙ্গে কৃষকেরা এবং রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পসংস্থাগুলি সহযোগিতা করায় শস্যক্ষয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে এবং গবেষণার কাজও অনেকটা সহজ হয়েছে।

বহু কীটঘ্ন এবং আগাছা বিধ্বংসী ভেষজ যুক্তরাজ্যের বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে। ১৯৫১ সালে মূল্যের দিক দিয়ে এই রপ্তানির পরিমাণ হয় নয় মিলিয়ন পাউণ্ড। এই ভাবে বিশ্বের সর্বত্র ভেষজগুলি কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করছে।

চলচ্চিত্র জগতে নূতন যুগ প্রবর্তন

ত্রৈ-মাত্রিক ছবি যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র জগতে নূতন যুগ প্রবর্তন করেছে। এই ছবির নাম দেওয়া হয়েছে সিনেরামা। সিনেমা বা চলচ্চিত্র এবং প্যানোরামা অর্থাৎ বহু দৃশ্যসমন্বিত সুদীর্ঘ চিত্রাবলী, এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে এই নূতন ধরনের ছবির নামকরণ করা হয়েছে। সবাক চিত্র আবিষ্কারের পর এতবড় আবিষ্কার চিত্রজগতে আর হয় নি।

এতে যে পর্দার উপরে আলোক প্রক্ষেপ করে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় তার আকার, বর্তমানে সাধারণতঃ চলচ্চিত্র গৃহে যে পর্দা ব্যবহৃত হয় তার তুলনায় ছয়গুণ বড়; আর সেই সুবৃহৎ পর্দাটি থাকে বাঁকানো। তিনদিক থেকে তিনটি প্রোজেক্টার বা আলোক-প্রক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিটি সেই পর্দার উপরে একই সময়ে প্রক্ষিপ্ত হয়। তিনটি আলোর ধারা একত্রে মিশে অপূর্ব দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে।

এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সময়ে নাট্যশালার বিভিন্ন স্থানে শব্দসৃষ্টিরও ব্যবস্থা আছে।

শব্দ ও দৃশ্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই নূতন ধরনের চলচ্চিত্র দেখে দর্শকগণের মনে হয়েছিল, তাঁরাও যেন ঘাত-প্রতিঘাতময় ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। অন্ততঃ প্রথম রাত্রির দর্শকগণের তো এই কথাই মনে হয়েছিল।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের উপর দিয়ে হেলিকপ-টার বিমানে ভ্রমণ, ভেনিসের খালেতে নৌকা ভ্রমণ, ম্যাডরিড রঙ্গভূমিতে ষাঁড়ের লড়াই, মিলানের ব্যালেট নাচ প্রভৃতি দৃশ্য প্রথম দেখানো হয়েছিল।

এই ছবির একজন দর্শক বলেন—দূর থেকে আমরা সাধারণতঃ ছবি দেখি। এ ছবিতে তা নয়, এ যেন আমরাই ছবির মাঝখানে বসে আছি। হেলিকপটার বিমান যখন নায়েগ্রার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন মনে হয়েছিল আমরাই যেন সেই হেলিকপটার বিমানে বসে আছি।

আর একজন বলেছেন—ভেনিসের খালে নৌকাটি বয়ে চললো আর আমার মনে হতে লাগলো আমার কাপড়-জামা যেন সব ভিজে গেছে।

হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, সিনেরামা দেখলে পুরনো ধরনের ছবিতে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না; কারণ সেই আকাশ, জল আর দৃশ্যে তো পরিপূর্ণ রূপ ফুটে না! বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ সবই তো তাতে ধরা পড়ে না!

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

সার আইজ্যাক নিউটন

জন্ম—২৫শে ডিসেম্বর, ১৬৪২ মৃত্যু—২০শে মার্চ, ১৭২৭

করে দেখ

কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা

আগুনে পোড়ে না, এমন কোন জিনিষের তৈরী পাত্রে করেই লোকে জল গরম করে—এ ব্যাপার তো তোমরা হামেশাই দেখতে পাও। কিন্তু সহজেই আগুন ধরে যায় এমন কোন জিনিষ, যেমন ধর কাগজ দিয়ে তৈরী কোন পাত্র আগুনের উপর রেখে জল গরম করা যায় কি? কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা যায়, তোমাদের অনেকেই
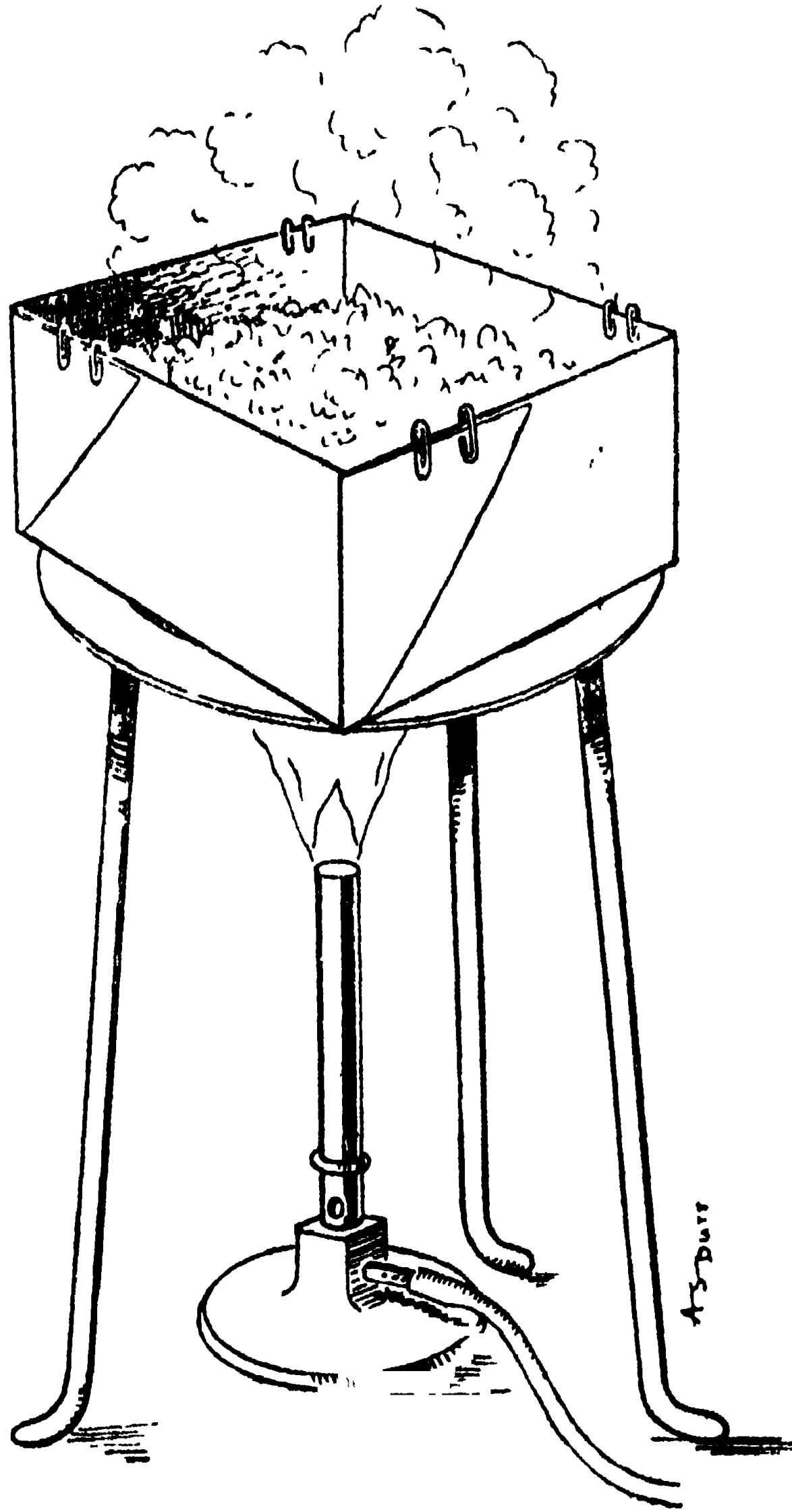
হয়তো একথা বিশ্বাস করবার ভরসা পাবে না; কারণ তোমরা তো আর ঠোঙায় করে জল গরম করবার চেষ্টা করে দেখ নি। কিন্তু এতে অবিশ্বাস করবার মত কিছুই নেই; একবার পরীক্ষা করে দেখলেই সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

একটু মোটা কাগজ ভাঁজ করে চৌকা একটা ঠোঙা তৈরী কর। ঠোঙাটাকে ক্লিপ দিয়ে, না হয় আঠা দিয়েও জুড়তে পার। কিন্তু ক্লিপ ছাড়া আঠা দিয়ে জুড়লে জলে ভিজে ঠোঙা খুলে গিয়ে গরম জল ছড়িয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে। ঠোঙায় জল ভর্তি করে সেটাকে এবার ছবির মত করে একটা ষ্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে দাও। কাগজ ভিজে জলের ভারে ঠোঙার তলা ফেঁসে যাবার আশঙ্কা থাকলে সরু তারের জাল্‌তির উপর সেটাকে বসিয়ে দিতে পার। এবার ঠোঙার নীচে গ্যাস-বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল ফোটাতে থাক। দেখবে, জল ফুটে বাষ্প উঠছে, কিন্তু কাগজের ঠোঙা একটুও পোড়ে নি। যে কোন দাহ্য পদার্থই হোক না কেন, আগুন ধরবার আগে সেটার যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠোঙার যে জায়গাটায় আগুনের আঁচ লাগছে সে জায়গাটা যথেষ্ট উত্তপ্ত হওয়ার পূর্বেই জল তার তাপ সরিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই উপযুক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত হতে না পারায় কাগজের ঠোঙায় আগুন ধরে না।

জেনে রাখ

কীট-পতঙ্গের সমাজ

প্রয়োজনের তাগিদে অথবা অবস্থাবিপর্যয়ে অনেক সময় বিভিন্ন শ্রেণীর পশুপক্ষী এক জায়গায় মিলিত হয়ে থাকে। এইরূপ অস্থায়ী মিলনকে ভীড় বলা চলে; কিন্তু সমাজ বলা চলে না। মৌমাছি, বোলতা, পিপীলিকা প্রভৃতি কয়েক জাতের কীট-পতঙ্গ কিন্তু সমাজবদ্ধ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে।

মানুষ এবং পিপীলিকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মানব-সমাজে যেমন সভ্য ও অসভ্য সম্প্রদায় দেখা যায়, পিপীলিকার মধ্যেও তেমনি দু-রকমের সম্প্রদায় আছে। তারা দস্যুর ন্যায় অপরের খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন এবং চৌর্যবৃত্তির দ্বারা উদরপূর্তি করে থাকে। আবার সভ্য পিপীলিকা সমাজ বাসা তৈরী, উপনিবেশ গড়া, পুরী রক্ষা প্রভৃতি কাজ অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে করে থাকে। এদের কার্যপ্রণালী দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজ তোমাদের পিপীলিকা ও মৌমাছির সমাজ-জীবন সম্বন্ধে কিছু বলছি।

পিপীলিকাদের কোন দলপতি নেই। রাণীরাই হচ্ছে এদের সমাজ-জীবনের প্রাণ-কেন্দ্র। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই রাণীরা ডিম পাড়ে। এসময়ে রাণী ও পুরুষ পিঁপড়েরা বাসা ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়তে থাকে। উড়ন্ত অবস্থাতেই

যৌন-মিলন ঘটে। অনেক পিপীলিকাই পাখী প্রভৃতি শত্রুর কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ভাগ্যক্রমে যারা বেঁচে থাকে, তারা ক্লান্তদেহে মাটিতে পড়ে যায়। অধিকাংশ পুরুষ-পিঁপড়েই মারা যায়। স্ত্রী-পিঁপড়েদের কেউ কেউ বাসায় ফিরে আসে।

রাণী পিপীলিকার জন্যে কর্মীরা খাবার নিয়ে আসে এবং সযত্নে তাদের খাবার খাইয়ে দেয়। রাণী বড় একটা নড়াচড়া করে না। রাণীদের ডিমের সংখ্যা কয়েক
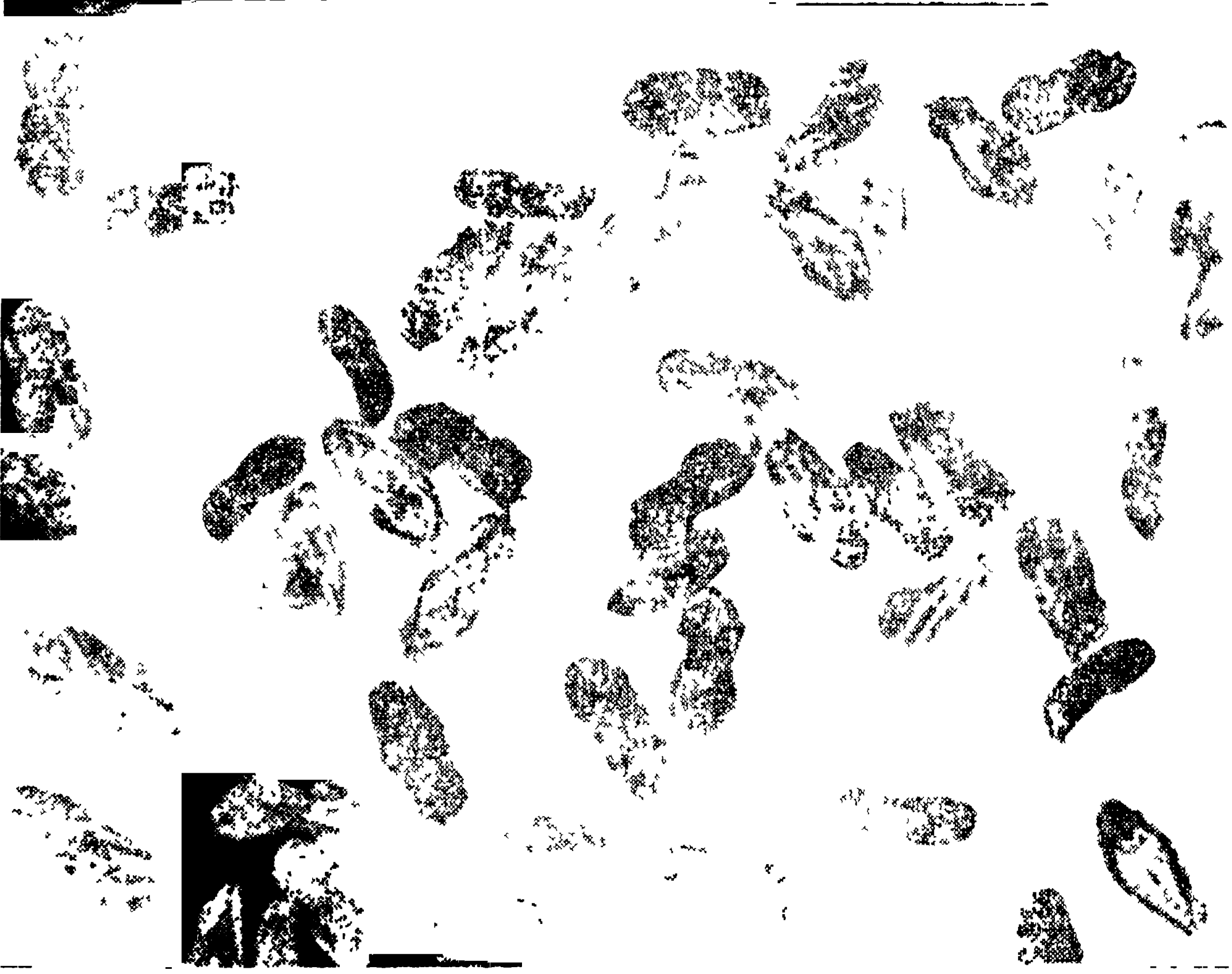
বিভিন্ন বয়সের পিঁপড়ের বাচ্চা

হাজার। কর্মীরা রাণীর কাছ থেকে ডিমগুলি নার্সারিতে নিয়ে যায়। এই সব কর্মীদের ধাত্রী বলা হয়। ডিম ফোটবার পর ধাত্রী-পিপীলিকারা শিশু-পিঁপড়েদের সযত্নে লালন-পালন করতে থাকে। এদের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীর সংখ্যা খুবই কম। কর্মীর সংখ্যাই বেশী। কর্মীদের বিভিন্ন কাজ আছে।

কতিপয় রাণী, পুরুষ ও বহু কর্মী দ্বারা পিপীলিকা সমাজ গঠিত। কর্মীরা না পুরুষ, না স্ত্রী। স্ত্রী ও পুরুষগুলি থাকে অন্তরালে, বাসার ভিতরে। তারা সচরাচর বড় একটা বাইরে বেরোয় না। এদের সংখ্যা খুবই অল্প; খুঁজলে গোটা-কয়েক মাত্র চোখে পড়বে। কর্মীর সংখ্যা অগণিত। পুরুষের চেয়ে স্ত্রী-পিঁপড়ের আকার অনেক বড়। উভয়েরই ডানা থাকে। বংশবৃদ্ধি করাই হচ্ছে এদের একমাত্র কাজ। বাসা তৈরী, খাবার জোগাড়, সন্তান-পালন, শত্রুর সঙ্গে লড়াই প্রভৃতি

যা করবার তা কুমারাই করে। বাসা বদলানোর সময় ডিম, বাচ্চা, এমন কি, স্ত্রী ও পুরুষ-পিঁপড়েদের পর্যন্ত এরা বয়ে নিয়ে যায়। স্ত্রী ও পুরুষ-পিঁপড়েরা যেন আদালের ঘরের দুলাল। কর্মীরা এদের খাবার খাইয়ে দেয়।

রাণী কয়েক দফায় ডিম পাড়ে। অনেকগুলি ডিম একসঙ্গে ডেলা বেঁধে থাকে। এক একটা ডেলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে এক একটা কর্মীর উপর। দু-একদিনের মধ্যেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। তোমরা খবরের কাগজে দেখেছ—স্ত্রী পুরুষে ও পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে—বিশেষ কোন খাদ্য খাওয়ানোর ফলেই খুব সম্ভব এই সব পিঁপড়ের বাচ্চা পুরুষ, স্ত্রী এবং কর্মীতে রূপান্তরিত
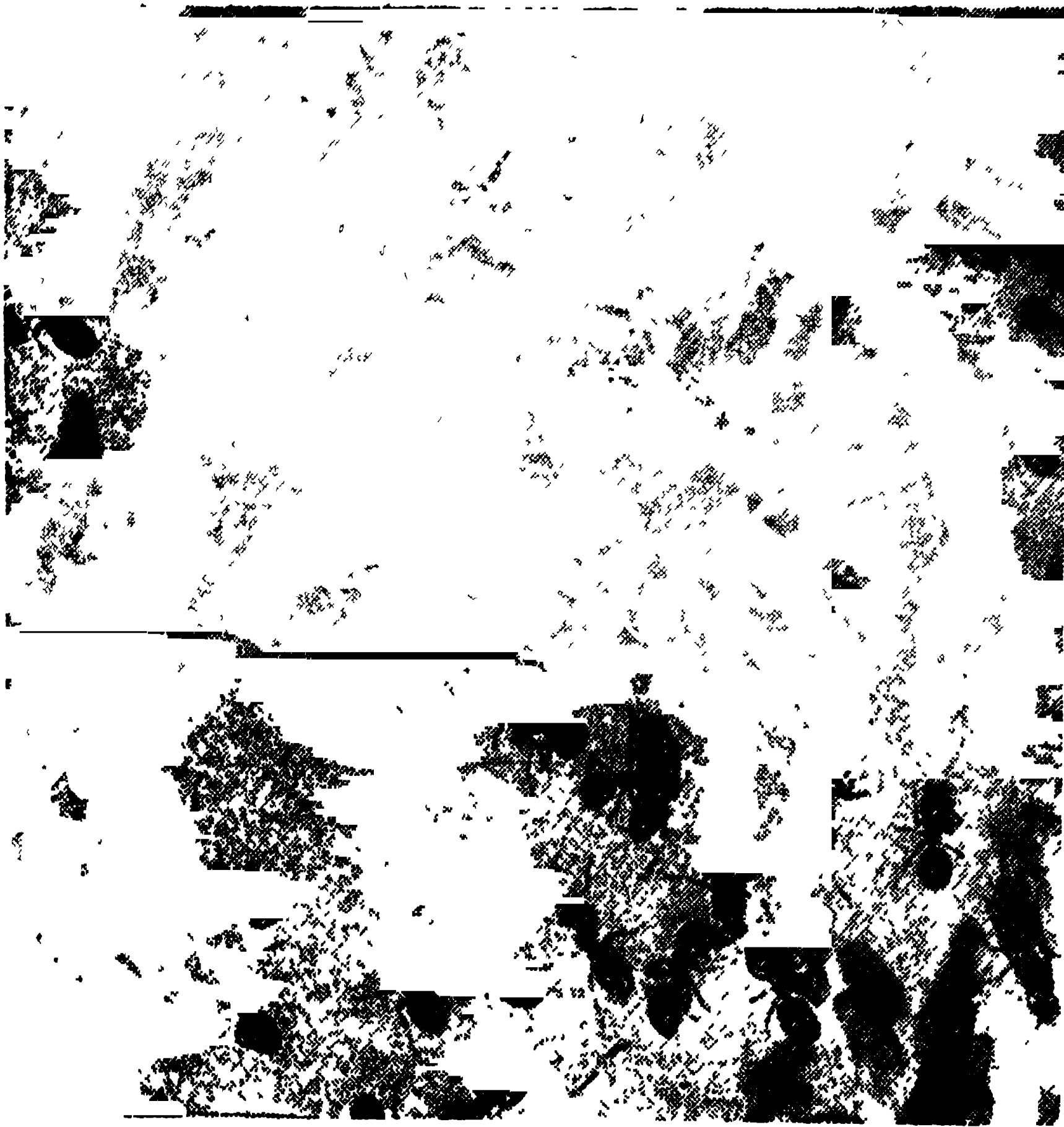
পিপীলিকার আস্তানার ভিতরকার একটি দৃশ্য

হয়ে থাকে। কর্মীরা বড়ই কর্তব্যপরায়ণ। পিঁপড়ে-সমাজকে রক্ষা করবার জন্যে এরা যে কোন রকমের বিপদ বরণ করতে ইতস্ততঃ করে না।

বিভিন্ন জাতের অধিকাংশ পিপীলিকা মাটির নীচে বাস করে। মাটি খুঁড়ে সুরঙ্গ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর তৈরী করে। এই সব ঘর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সবুজ-পতঙ্গ, আঁশ-পোকা প্রভৃতি কয়েকজাতের পোকার দেহ থেকে মিষ্টি রস বেরোয়। এই রস খেতে পিঁপড়েরা খুব ভালবাসে। এজন্যে পিঁপড়েরা এই সব পোকা ধরে এনে সযত্নে পুষে

থাকে। অনেক সময় এই সব পোকার ডিম লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে এবং নির্দিষ্ট কক্ষে রক্ষা করে। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে সযত্নে লালন-পালন করে। এছাড়া ভাঁড়ার ঘর আছে। এসব জায়গায় খাদ্য-শস্য রক্ষা করা হয়। কোন কোন জাতের পিঁপড়ের ভাঁড়ারে মধুভাণ্ড রক্ষিত থাকে। এই মধুভাণ্ড বলতে কিন্তু পিঁপড়ে-সমাজেরই কোন কোন কর্মীকে বুঝায়। কোন জিনিষ খাইয়ে তাদের হজমশক্তি নষ্ট করে দেওয়া হয়; ফলে ক্রমাগত মধুপানের দরুণ এদের দেহ ফেঁপে ওঠে। যখন বাইরের খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে, তখন এই সব জ্যান্ত মধুভাণ্ড খাদ্যের অভাব মিটিয়ে থাকে। পিঁপড়ে-চাষী বিভিন্ন শস্যের কণা
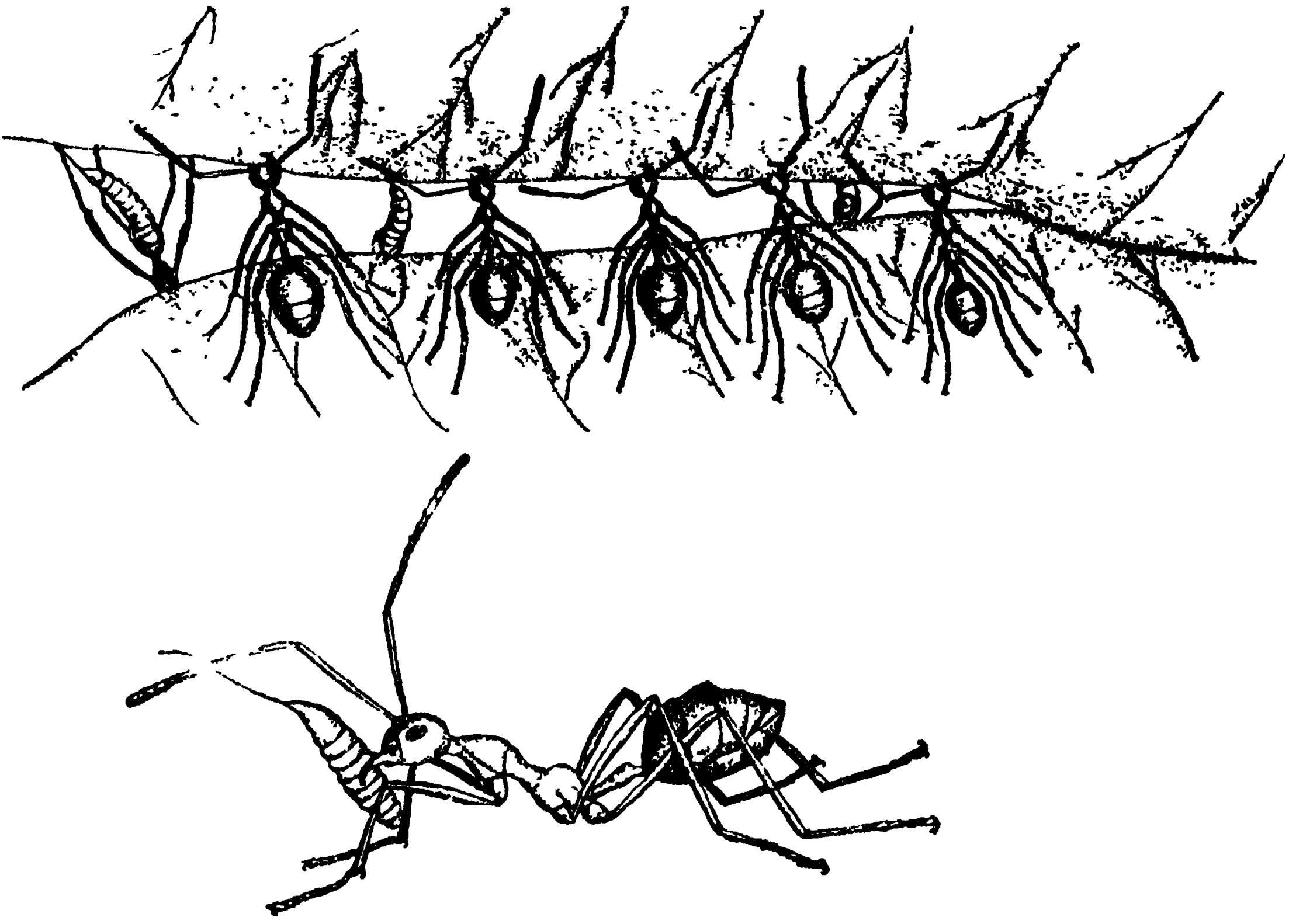
উপরে—লাল-পিঁপড়ের দল পাতা জুড়ে বাসা তৈরী করছে
নীচে—বাচ্চা মুখে নিয়ে এরা যেভাবে সুতা বের করে পাতা জুড়ে দেয়

সংগ্রহ করে ভাঁড়ারে সঞ্চিত করে। তুঁষ সমেতই কিন্তু শস্য ভাঁড়ারে তোলে না। প্রথমে ধান ও অন্যান্য শস্য এনে আস্তানার বাইরে জমা করা হয়। এরপর আরম্ভ হয় তুঁষ ছাড়ানোর পালা। তুঁষ ছাড়ানো হয়ে গেলে শস্য-কণাগুলি ভাঁড়ারে সযত্নে রক্ষিত হয়।

পাতাকাটা-পিঁপড়েরা তাদের ধারালো চোয়ালের সাহায্যে গাছের পাতা গোল করে কেটে বাসায় নিয়ে আসে। এই সব পাতার টুকরা একটি ঘরে গাদা করে রাখা হয়। গাদা করে রাখবার আগে সেগুলি কুঁচি-কুঁচি করে কেটে ফেলা হয়। কিছুদিন বাদে এগুলি পচে গিয়ে তা থেকে ছত্রাক জন্মায়। ছত্রাকগুলি পিপীলিকারা উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

আমাজন-পিঁপড়েরা অপর পিপীলিকাদের বাসা প্রায়ই আক্রমণ করে থাকে। ডিম লুণ্ঠনের জন্যেই এই সব আক্রমণ করা হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে, সেগুলি বড় হয়ে ক্রীতদাসের ন্যায় লুণ্ঠনকারীদের যাবতীয় কাজ করে থাকে। অনেক সময় বড়দেরও বন্দী করে এনে ক্রীতদাসের কাজ করিয়ে নেওয়া হয়।

চালক-পিঁপড়েরা বাসা তৈরী করে না; কিন্তু সব সময় একস্থান থেকে আর একস্থানে শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করে। এই ঘোরাঘুরির ব্যাপারেও তো চাই একটা অস্থায়ী আস্তানা! তাই ভ্রাম্যমাণ পিপীলিকার দল কোন গাছের গর্তে কিংবা পড়ে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ির নীচে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে তারা সুযোগ ও সুবিধা-মত দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালায়।

বাঁ দিক থেকে ডানদিকে—কর্মী, রাণী ও পুরুষ মৌমাছিকে দেখা যাচ্ছে

নির্মাণী-পিপীলিকারা, যেমন লাল-পিঁপড়ে গাছের পাতা সেলাই করে আস্তানা গড়ে। এই ব্যাপারে লার্ভাগুলি বিশেষ কাজে লাগে; কারণ লার্ভাগুলি এক ধরনের চটচটে পদার্থ বের করে। সেগুলি শক্ত হলে সিল্কের সুতার মত হয়। এই সব সুতাই নির্মাণী-পিঁপড়েরা কাজে লাগায়।

চাষী-পিপীলিকারা চাষ-আবাদ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। আস্তানার সংলগ্ন খানিকটা জায়গা তারা পরিষ্কার করে রাখে। অখাদ্য কোন গাছ-গাছড়া সেখানে জমতে পারে না। সব সময়ই তারা নিড়ানের কাজে ব্যস্ত থাকে। একমাত্র খাদ্য-শস্যের উপযোগী উদ্ভিদ রেখে বাকী আগাছা তুলে ফেলে। চাষী-পিঁপড়েরা শস্যকণা সংগ্রহ করে এক জায়গায় জমা করে। তারপর শস্য-কণাগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে তাল তৈরী করতে থাকে। তারপর সেগুলি রোদে শুকিয়ে নিয়ে ভাঁড়ারে তোলা হয়।

কাজের সুবিধার জন্যে কর্মী-পিপীলিকাদের ভাগ করা হয়। পদমর্যাদা অনুযায়ী

তাদের নামকরণ হয়ে থাকে। পিপীলিকার আস্তানা পর্যবেক্ষণ করলেই চোখে পড়বে—সৈনিক, ধাত্রী, মিস্ত্রী, মজুর, রক্ষী ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের জীবন সমাজের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত।

এবার মৌমাছির সমাজ-জীবন সম্বন্ধে কিছু বলছি। বিভিন্ন আকারের মৌমাছি দেখা যায়। প্রত্যেক মৌচাকেই একটা রাণী, কয়েকটি পুরুষ ও অগণিত কর্মী থাকে। অনেক মৌমাছি ডিম পাড়বার আগেই মৌচাকের কুঠরীতে মধু সঞ্চয় করে রাখে। উদ্দেশ্য, যাতে বাচ্চাগুলির খাদ্যাভাব না ঘটে। পুরুষ-মৌমাছিদের প্রয়োজন একমাত্র যৌন-মিলনের জন্যে। যৌন-মিলনের পর তাদের প্রয়োজন শেষ হয়। তাই অনেক সময় দেখা যায়—শীতের সময় কর্মীরা পুরুষ-মৌমাছিদের বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়।
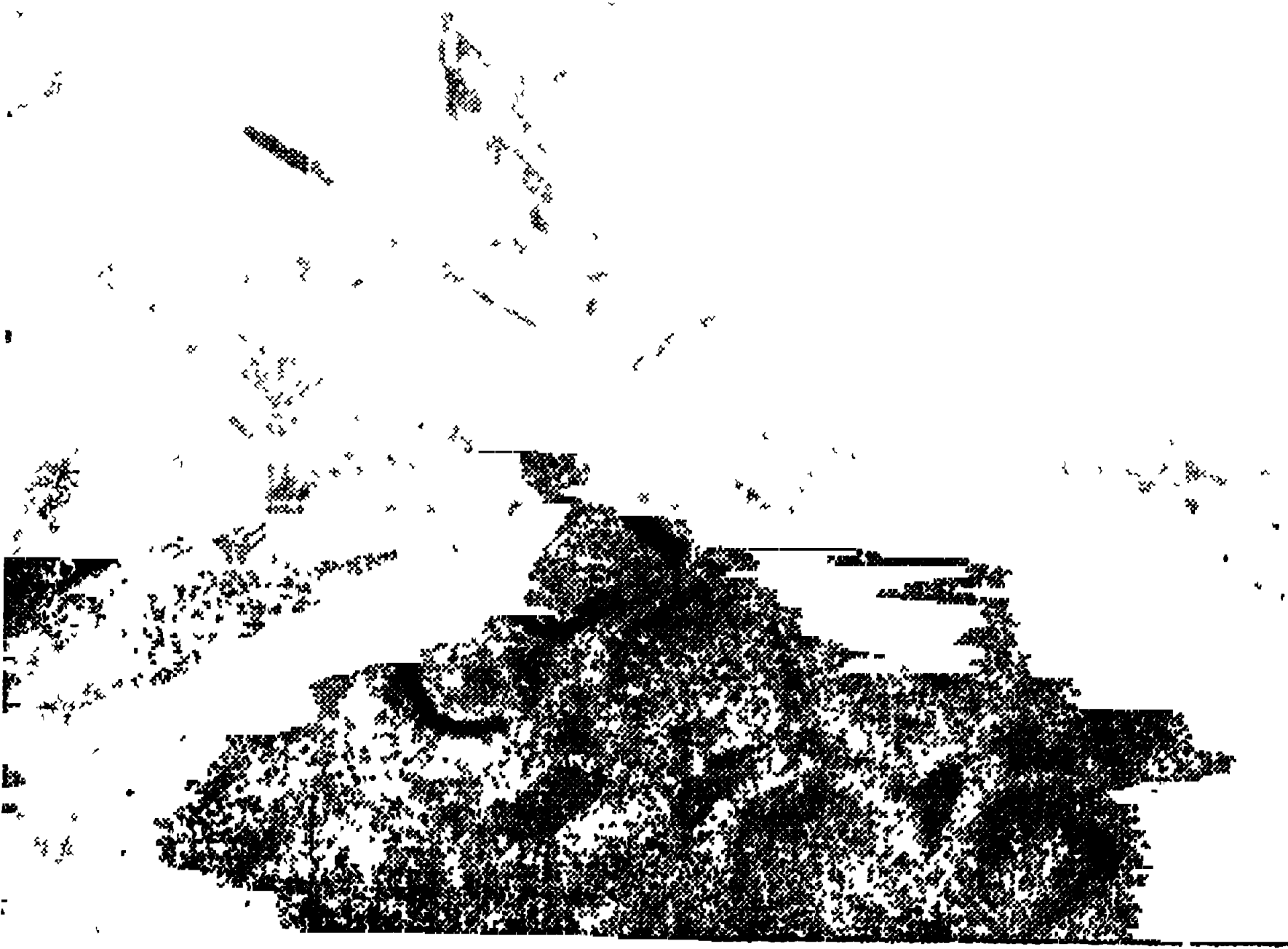
মৌচাকের ভিতরে মৌমাছিরা পরস্পর ভাব বিনিময় করছে

আবার অনেক সময় তাদের মেরেও ফেলে দেয়। এভাবেই কর্মী-মৌমাছিরা খাদ্যের সুরাহা খানিকটা করে থাকে।

মৌচাকে একটি মাত্র রাণী থাকে। রাণী-মৌমাছি ডিম পেড়েই খালাস নয়। মৌচাকের বিভিন্ন কাজেও তাকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। রাণীর মৃত্যুর পর শুধু কয়েকটি শিশু-রাণী বেঁচে থাকে বংশ রক্ষার জন্যে। সমস্ত শীতকাল কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে কাটিয়ে দেয়। তারপর গ্রীষ্মের আগমনে তারা নতুন কলোনী গঠনে আত্মনিয়োগ করে। শরতের আগমনের সঙ্গে কোন বাচ্চা মৌচাকের সেলে পাওয়া গেলে কর্মীরা সেগুলি টেনে বের করে এবং তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলে দেয়।

সামাজিক কীটপতঙ্গেরা তাদের আস্তানা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন মালমশলা দিয়ে

তৈরী করে থাকে। মৌমাছিরা মৌচাক তৈরী করে মোমের সাহায্যে। মৌচাকের কুঠরীগুলি ছয় কোণা করে গঠিত হয়। রাণীর থাকবার জায়গাটি অপেক্ষাকৃত বড়। মৌচাকের মোম মৌমাছিরা নিজেরাই তৈরী করে। ছয়টি খাঁজে মৌমাছির উদর গঠিত। খাঁজগুলির তলদেশে থলের মধ্যে পাতলা আঁশের মত মোম সঞ্চিত থাকে। মৌমাছির দেহ থেকে একপ্রকার রস বেরোয়। এই রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে তারা মোম প্রস্তুত করে। কুলি-মজুরের দল একটির পর একটি মৌচাকে মোম লাগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রীর দল সেগুলি জুড়ে দিয়ে ছয় কোণা ঘর তৈরী করে যায়। রাণী-মৌমাছির দেহে মোম প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তারা মৌচাক প্রস্তুতে কোন অংশ গ্রহণ করে না। যাতে মোমের কিছুমাত্র অপচয় না ঘটে সেদিকে
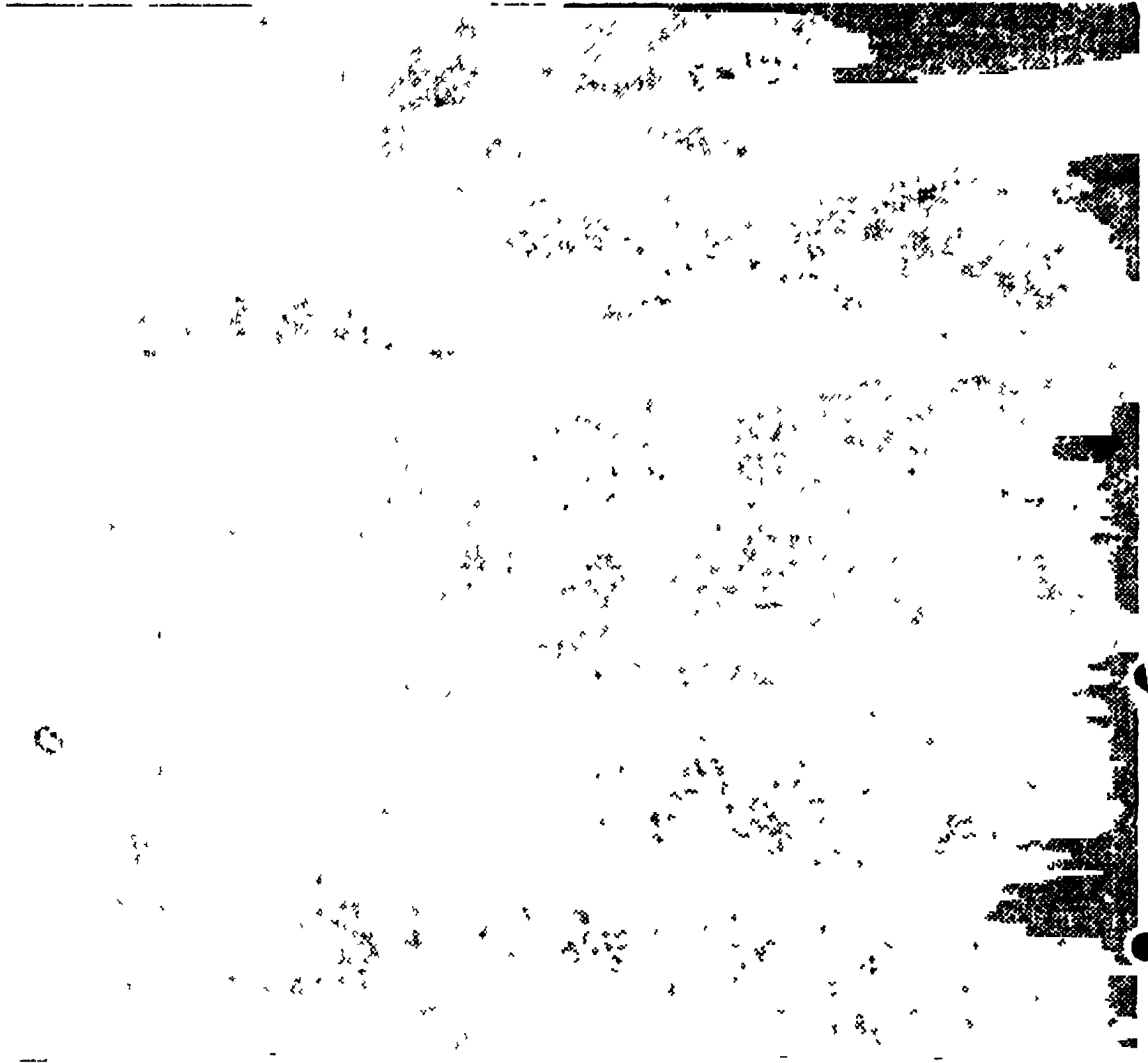
মৌমাছিরা মৌচাকে হাওয়া দিচ্ছে

কর্মীরা বিশেষ নজর দিয়ে থাকে। কারণ এক পাউণ্ড মোম তৈরী করতে একটি কর্মীকে ষোল থেকেবিশ পাউণ্ড মধু পান করতে হয়।

কর্মী-মৌমাছিদের এক এক সময় এক এক রকমের কাজ করতে হয়। গুটি থেকে বেরিয়ে আসার পর শিশু কর্মীদের হাল্কা রকমের কাজে নিযুক্ত করা হয়। প্রথমেই তাকে নার্সারীর কাজ করতে হয়। তিন দিন পর্যন্ত পূর্বে ব্যবহৃত ডিম পাড়বার ঘরগুলি সে পরিষ্কার করে। আর এক দফায় সেগুলিতে রাণী ডিম পাড়ে। একাজে তাকে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। এর পরে কয়েক দিন তাকে ধাত্রীর কাজ

করতে হয়। দিন দশেক বাদে সে কুলীর কাজ সুরু করে। যে সব মৌমাছি বাইরে থেকে মধু নিয়ে আসে, সেই মধু তাদের কাছ থেকে নিয়ে ভাঁড়ারীদের কাছে জমা দেয়। ভাঁড়ারীরা আবার সেগুলি ভাঁড়ারে তুলে রাখে। এর পর তারা অন্যান্য দক্ষ কর্মীদের সঙ্গে মধু ও পরাগ সংগ্রহের কাজে লেগে যায়। বসন্তের আগমনে মৌমাছিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কোন স্থানে মধুর খোঁজ পেলেই মৌমাছিরা সেখান থেকে বাসায় ফিরে এসে বিশেষ অঙ্গভঙ্গী সহকারে বৃত্তাকারে নাচতে থাকে। এই সময় অপরাপর মৌমাছিরা তাকে অনুসরণ করে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তারা দেহের ঘ্রাণ নিয়ে থাকে। সংবাদ-বহনকারী মৌমাছি উড়ে চলে গেলেও নির্দিষ্ট ফুলের সন্ধান করবার জন্যে নতুন দলের মোটেই বেগ পেতে হয় না। কারণ সংবাদ-বহনকারী মৌমাছির গায়ে লেগে-থাকা ফুলের গন্ধই তাদের পথের সন্ধান দিয়ে থাকে। তাছাড়া আবিষ্কারক মৌমাছি নিজের গন্ধ-নিঃসারক গ্রন্থির রস দিয়ে আবিষ্কৃত খাদ্য ও ফুলে চিহ্ন এঁকে দিয়ে আসে। এই গন্ধ, অনুসন্ধানী মৌমাছিদেরও প্রকৃত স্থান বের করতে সাহায্য করে। পরাগের জন্যে যে নৃত্য করা হয়, তা মধু সম্পর্কিত নৃত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। পরাগের সন্ধান জানাবার জন্যে মৌমাছি তার দেহ নৃত্যের ভঙ্গিমায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে।

মৌচাক থেকে যাতে সঞ্চিত মধু চুরি না যায় সেদিকে মৌমাছিদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

মৌমাছির সমাজে বিজ্ঞানীও আছে। কথাটা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ, নয় কি? তোমরা হয়তো বা লক্ষ্য করে থাকবে—মধু কিছুদিন থাকলেই টকে যায় এবং গেঁজে ওঠে। আচ্ছা তাহলে মৌচাকের মধুও তো গেঁজে উঠতে পারে; কিন্তু তা হয় না, তার কারণ—রাসায়নিক মৌমাছিরা তাদের হুলের নিকটবর্তী বিষের থলে থেকে এক কণা ফরমিক অ্যাসিড মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ফলে মধু আর গেঁজে ওঠে না।

বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে পিপীলিকা ও মৌমাছির জীবনের অনেক অদ্ভুত রহস্যের কথা জানা গেছে। তোমরা ইচ্ছা করলে এদের জীবনযাপনের প্রণালী সম্পর্কে অনেক কিছু নিজেরাই দেখতে পার।

—ন—

সার আইজ্যাক নিউটন

তোমরা বোধহয় সকলেই নিউটনের নাম শুনেছ; বিশেষ করে আপেল ফলের গল্পটি। নিউটনের জীবনী আজ তোমাদেব সংক্ষেপে বলছি। ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত উলস্‌থর্প নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সে বছরেই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। নিউটনের জন্মের কয়েকমাস আগেই তাঁর পিতা পরলোকগমন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের কৃষক। তাঁর দিদিমা তাঁকে লালন-পালন করেন। বারো বৎসর বয়সে তাঁকে গ্রান্থামে কিংস্ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ছেলেবেলায় নিউটন অত্যন্ত রোগা ছিলেন। স্কুল ছুটির পর অন্যান্য ছেলেরা যখন খেলায় ব্যস্ত থাকতো তখন তিনি আপন মনে হাতুড়ি, বাটালি, করাত প্রভৃতির সাহায্যে নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করতেন; তাছাড়া মাঝে মাঝে ঘড়ি মেরামতের কাজও করতেন। এই সময় তিনি সূর্য-ঘড়ি ও জল-ঘড়ি প্রস্তুত করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। রাত্রিবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র এবং তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন।

স্কুলের ছাত্র হিসাবে তিনি খুব ভাল ছেলে ছিলেন না। একদিন খেলার সময় এক সহপাঠীর নিকট অত্যন্ত অপমানিত হন। অপমানিত হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—যেমন করে হোক ক্লাসে সেই ছেলেটির উপর টেক্কা দিতেই হবে। সেজন্যে দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সেই ছেলেটিকে তো বটেই, অন্যান্য ছেলেদেরও লেখাপড়ায় ডিঙ্গিয়ে গেলেন। পরিশ্রম করলেই যে তার ফল পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সংশয়ই রইল না। কাজেই তিনি পড়াশুনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তারপর নিউটনের মা তাঁকে দিদিমার নিকট থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ফলে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তাঁর সাংসারিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাই তাঁর মা স্থির করলেন যে, ছেলেকে আর লেখাপড়া না শিখিয়ে চাষ-আবাদের কাজে লাগাতে পারলে হয়তো কোন রকমে নিজের সংসারটা চালিয়ে নিতে পারবেন; উপরন্তু পৈতৃক সম্পত্তিরও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হবে। এই ভেবে তাঁর মা একজন বুড়া চাকরকে ছেলের সঙ্গে দিয়ে ক্ষেতের শাকসব্জী, ফলমূল ইত্যাদি বিক্রী করবার জন্যে হাটে পাঠাতেন। কিন্তু নিউটন চাকরকে হাটে পাঠিয়ে দিয়ে সেই ঝুড়ি থেকে যন্ত্রপাতি বের করে গাছতলায় বসে কাজে লেগে যেতেন অথবা পড়াশুনা করতেন। শেষ পর্যন্ত সেই বুড়া একদিন তাঁর মায়ের কাছে সব ফাঁস করে দিলে। এরপর তাঁর নতুন কাজ হলো গরু, ভেড়া, ছাগল চরান। এতে কিন্তু নিউটনের আরও বেশী সুবিধা হয়ে গেল। গরু, ছাগল আপন মনে চরে বেড়ায়, আর এদিকে নিউটন

নির্জনে বসে বই খুলে পড়েন আর অঙ্ক কষেন। গরু, ভেড়া, ছাগল হয়ত অন্য লোকের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে দিচ্ছে, কিন্তু সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি পড়াতেই ব্যস্ত। অতিষ্ঠ হয়ে ক্ষেত-খামারের মালিকেরা তাঁর মায়ের কাছে নালিশ জানাতে লাগলো।

একদিন শরৎকালে খুব ঝড় উঠেছে। গরু-ছাগলের কথা তাঁর মনেই নেই; তিনি আপন মনে বাতাসের গতি মাপছেন। একবার বাতাসের গতির দিকে লাফিয়ে আর একবার বাতাসের গতির বিপরীত দিকে লাফিয়ে কতটা লাফালেন তা মেপে দেখতেন। এই রকম লাফ মেরে ঠিক করতেন—বাতাসের গতি কখন কম, কখন স্বাভাবিক, কখন বেশী বা কখন ঝড় বইছে। এই ভাবে নানারকম খেলার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতেন। ছেলেব কাণ্ডকারখানা দেখে মা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি শুধু ভাবেন—'এ ছেলে ভবিষ্যতে কি করবে? এ ছেলে কি করে খাবে?' ছেলের এরূপ মতিগতি দেখে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর মাকে পরামর্শ দিলেন—এ ছেলেকে দিয়ে ক্ষেত-খামারের কাজ চলবে না, একে স্কুলে পাঠাও।

উনিশ বছর বয়সে আবার তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন। এই কলেজে ভর্তি হবার পর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি বই হাতে আসে। সেই বইয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি অনেক কিছু লেখা ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে যথেষ্ট ঝোঁক ছিল; কাজেই সেই বইখানি পড়ে তিনি একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝলেন যে, জ্যামিতি ভাল না জানলে জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝা খুবই শক্ত। তাই তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতিখানা পড়ে শেষ করলেন। তার পরে ইউক্লিডের চেয়েও শক্ত ডেকার্টের জ্যামিতি পড়তে আরম্ভ করলেন। ক্রমশঃ অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কালক্রমে তিনি নানারকম দুরূহ জটিল সমস্যার সমাধানে সমর্থ হন। আজও নিউটনের সূত্র অনুসারে অঙ্কশাস্ত্রের অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে।

কেম্ব্রিজে থাকাকালে অনেক রাত জেগে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। তখনকার দিনে যে দূরবীণ ব্যবহৃত হতো তাতে দূরের জিনিষ দেখা যেত বটে, কিন্তু নানা রঙে ঝাপ্সা হয়ে উঠতো। গ্যালিলিও অবশ্য এইরকম দূরবীণের সাহায্যে সূর্যের কলঙ্ক, চাঁদের পাহাড়, উপত্যকা ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। এই সকল অসুবিধা দেখে নিউটন ভাবতে লাগলেন—কেমন করে এর চেয়ে আরও উন্নতধরনের দূরবীণ প্রস্তুত করা যায়। ১৬৬৫ সালে লণ্ডনে মহামারীর আকারে প্লেগ দেখা দিল। কেম্ব্রিজ সহরও বাদ গেল না; ফলে কলেজও বন্ধ হয়ে গেল। নিউটনকেও বাড়ী ফিরে আসতে হলো। কিন্তু বাড়ী এসে তিনি খুবই অসুবিধায় পড়লেন। কারণ এখানে কোন বই পেতেন না বা কোন অধ্যাপকের সাহায্য লাভের উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি দমে যাবার পাত্র ছিলেন না; নিজের চেষ্টাতেই বিজ্ঞান-চর্চায় মনোনিবেশ করলেন।

তিনি আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কেবল জানালার নিকট ছোট্ট একটি ছিদ্র রাখলেন, যাতে খুব সামান্য আলো ঘরের মধ্যে আসতে পারে। সেই ছিদ্রের সামনে একটি প্রিজম্ বা ত্রিশিরা কাচ বসালেন। দেখা গেল, সূর্যের সাদা আলো প্রিজমের ভিতর দিয়ে বিপরীত দিকে দেয়ালে অনেকগুলি রঙে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এই দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, এর মধ্যে সাতটি রং রয়েছে; সেগুলি হচ্ছে বেগুনি (Violet), ঘন নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green) হল্‌দে (Yellow), কমলা (Orange) এবং লাল (Red)। ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয় VIBGYOR। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। ভাবলেন, হয়তো বা তাঁর ব্যবহৃত প্রিজমের কোন দোষ আছে; সেইজন্যে তিনি বিভিন্ন প্রিজম্ নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং প্রত্যেকবারে সেই একই জিনিষ লক্ষ্য করলেন। এরপর তিনি দুটি প্রিজম্ ব্যবহার করেন এবং দ্বিতীয় প্রিজম্‌টিকে উল্টে বসালেন। সূর্যের আলো যখন এরূপ দুটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে দেয়ালে পড়লো তখন আর পূর্বের মত কোন রং-ই দেখা গেল না; মাত্র একটি সাদা আলো চোখে পড়লো। এই সকল পরীক্ষার দ্বারা নিউটন প্রমাণ করেন যে, সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি। সূর্যের আলো যখন প্রথম প্রিজম্ ভেদ করে গেল তখন সাতটি রঙে বিভক্ত হলো; কিন্তু দ্বিতীয় প্রিজমটি উল্টে রাখবার দরুণ সাতটি রং পুনরায় মিশে সাদা আলোতে পরিণত হলো। মেঘলা বা বাদলার দিনে রামধনুর গায়ে এই সাতটি মূল রং দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা অবশ্য সূর্যের আলোতে আরও দুটি রং আবিষ্কার করেছেন। সূর্যের আলোর মধ্যে লাল রং একপ্রান্তে আর বেগুনি রং অপর প্রান্তে অবস্থিত। অন্যান্য রংগুলি মাঝখানে আছে। এই লাল আলোর কাছাকাছি আর একটি আলো আছে। সেটিকে বলা হয় অবলোহিত আলো (Infra-red ray)। আর বেগুনি রঙের উপরের দিকে আর একটি আলো আছে, তার নাম অতিবেগুনি আলো (Ultra-Violet ray)। অবলোহিত ও অতিবেগুনি আলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এই অদৃশ্য আলো ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর ধরা যায়। এ সম্বন্ধে তোমরা বড় হলে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে। নিউটন তাঁর আবিষ্কারের দ্বারা বুঝলেন যে, আলোর এই সব প্রকৃতির জন্যেই দূরবীণের সাহায্যে নানা রঙের ভিতর দিয়ে ঝাপ্‌সা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই দূরবীণের এই সব দোষ দূর করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে একটি ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীণ প্রস্তুত করেন; এতে ছবি খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় এবং জিনিষটিও প্রায় ৪০ গুণ বড় দেখায়। গ্রীনউইচ এবং আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউন্ট উইল্‌সনে যে শক্তিশালী দূরবীণ আছে, সেটি নিউটনের দূরবীণের মডেল অনুসারে তৈরী। এই অদ্ভুত প্রতিভার জন্যে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি

কলেজের সদস্য নির্বাচিত হন। তারপর ১৬৭১ সালে তাঁকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়।

নিউটনের আলোকতত্ত্বের গবেষণার বিষয় ক্রমে তৎকালীন রয়েল সোসাইটির সদস্যদের গোচরীভূত হয়। নিউটন আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারের সত্যতা রয়েল সোসাইটির সমক্ষে প্রমাণ করে দেখান। এই গবেষণার ফলে ১৬৭২ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন এবং তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নিউটনের পূর্বে কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। চাঁদ পৃথিবীব চারদিকে ঘোরে এবং সূর্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। কিন্তু কেন ঘোরে সেকথা গ্যালিলিও প্রমাণ করতে পারেন নি। নিউটনই সর্বপ্রথম এর কারণ বের করে বিজ্ঞানজগতে আর এক নতুন তথ্য প্রকাশ করেন। প্রবাদ আছে—একদিন শরৎকালে সন্ধ্যাবেলায় নিউটন তাঁর বাগানে বসে এই সকল বিষয় চিন্তা করছেন, এমন সময় হঠাৎ টুপ করে একটি আপেল তাঁর সামনে পড়লো। তিনি ভাবলেন—কেন এমন হলো ? আপেলটি তো নীচে না পড়ে উপর দিকেও যেতে পারতো ? মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তাঁর নিজের প্রশ্নের সমাধান পেলেন। পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে; সেইজন্যে পৃথিবী সমস্ত জিনিষকে তার দিকে টানে। তিনি এই শক্তির নাম দিলেন মাধ্যাকর্ষণ। নিউটন প্রকাশ করলেন—প্রত্যেক জিনিষের পরস্পরকে আকর্ষণ করবার একটা শক্তি আছে। বস্তুর আয়তন এবং তাদের উভয়ের দূরত্বের উপরই আকর্ষণ করবার শক্তি নির্ভর করে। একটি দড়িতে ঢিল বেঁধে যদি ঘোরানো যায় তাহলে সেটি বৃত্তাকারে ঘুরবে। দড়ির আকর্ষণেই ঢিলটি বৃত্তাকারে ঘুরবে। পৃথিবী এই রকম সূর্যের আকর্ষণীশক্তির বলে তার চারদিকে লাটিমের মত ঘুরছে এবং চাঁদও তেমনিভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহও একই নিয়ম মেনে চলছে। আর এই আকর্ষণের জন্যেই মহাশূন্যে অবস্থান করেও ওরা কক্ষচ্যুত হয় না। এই সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করে নিউটন আজ বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। নিউটন অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে একেবারে নিখুঁতভাবে প্রমাণ করে দিলেন—গ্রহগুলি কতদূরে, কে কিভাবে ঘুরছে এবং প্রত্যেকের ঘোরার সঙ্গে প্রত্যেকের কি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রমাণ করলেন—প্রত্যেক গ্রহ নির্দিষ্ট নিয়মে, নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অবশ্য বর্তমান যুগে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় নিউটনের মতবাদ বদলে গেছে। তোমরা বড় হলে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ জানতে পারবে।

১৬৮৭ সালে নিউটন তাঁর বিখ্যাত বই 'Principles of Mathematical Philosophy' প্রকাশ করেন। তারপর ১৬৮৮ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

পার্লামেন্টের সভ্য মনোনীত হন। দু-বছর বাদে পুনরায় তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজে ফিরে আসেন। এই বয়সেও তিনি নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণায় ডুবে থাকতেন। বিভিন্ন রকমের গবেষণা এবং জটিল সমস্যা নিয়ে এমনি আত্মহারা হয়ে থাকতেন যে, জীবনের ছোটখাটো অনেক বিষয়ে অনেক সময় হাস্যকর ভুল করতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্পই শোনা যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁর অতিথিদের জন্যে জলখাবার আনতে গিয়ে আর ফেরেন না। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, তিনি আপন ঘরে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছেন; অতিথিদের কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। আর একদিন এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখেন তিনি ঘরে নেই; টেবিলের উপর তাঁর খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। পরে নিউটন ঘরে এসে খাবারের ঢাকনা তুলে দেখেন যে, খাবার নেই। তখন তিনি তাঁর বন্ধুকে বললেন—আমি মনে করেছিলাম যে, খাই নি; কিন্তু এখন দেখছি যে, খেয়েছি। বলাবাহুল্য বন্ধুটিই তাঁর খাবার খেয়ে মজা দেখছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আর একটি মজার গল্প শোনা যায়। তাঁর একটি প্রিয় বিড়াল ছিল। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে যখন কাজ করতেন তখন বিড়ালটিও সেই ঘরে থাকত। বাইরে যাবার জন্যে পাছে চেঁচামেচি করে তাঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, এই ভয়ে তিনি দরজার মধ্যে বিড়ালটির যাতায়াতের জন্যে একটি ফোকর করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদে বিড়ালটির অনেকগুলি বাচ্চা হয়; পাছে বাচ্চাগুলি আবার বাইরে যাবার জন্যে চীৎকার করে সেইজন্যে দরজায় আর একটি ফোকর করে দেন। তাঁর একথা মনেই হলো না যে, আগেকার বড় ফোকরটা দিয়েই বাচ্চাগুলিও যাতায়াত করতে পারবে। এই রকম ঘটনা আরও অনেক শোনা যায়।

এদিকে সারা দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষকালে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। রাত্রে ভাল ঘুম হতো না; খাওয়াও কমে গিয়েছিল। বন্ধুদের পরামর্শে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন বাদে তিনি আবার তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পান। এই সময় তিনি নতুন উদ্যমে এবং নতুন প্রেরণায় দেশের সেবা করবার জন্যে প্রস্তুত হন। সেই সময় ইংল্যাণ্ডে টাকা-পয়সা হরদম জাল হচ্ছিল। নিউটনকে টাকশালের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করা হলো। অধ্যক্ষরূপে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। জলছাপ-দেওয়া নোট তিনিই প্রবর্তন করেন; ফলে মুদ্রাজাল বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর এই সর্বতোমুখী প্রতিভা এবং দক্ষতার পরিচয় পেয়ে ১৭০৫ সালে রাণী অ্যান তাঁকে 'সার' উপাধিতে ভূষিত করেন। এর আগের বছর (১৭০৪ সাল) তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি পদে মনোনীত হন। এইরূপে বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হন এবং সাধারণ মানুষ হিসাবেও সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আশ্চর্যের বিষয় অতবড় একজন জ্ঞানী এবং কৃতী ব্যক্তি হয়েও তাঁর বিন্দু-মাত্র অভিমান ছিল না। তাঁর মত অমায়িক ও বিনয়ী লোক জগতে খুব কমই দেখা যায়।

শেষজীবনে তিনি লণ্ডনে বাস করেন এবং জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বিজ্ঞানের চর্চা করে গেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত রয়েল সোসাইটির সভাপতি পদে প্রত্যেক বছরই মনোনীত হয়েছেন। ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীদের এই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবিতে সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেন—জানি না জগৎ আমাকে কি ভাবে দেখবে ; কিন্তু আমার মনে হয় আমি নিতান্তই বালকের মত জ্ঞান সমুদ্রের তীরে শুধু ঝিনুক আর নুড়ি কুড়িয়ে গেলাম—আমার সামনে সীমাহীন জ্ঞান সমুদ্র তেমনই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র

বিবিধ

১৯৫২-৫৩ সালে পৃথিবীতে সর্বাধিক চাউল উৎপাদনের সম্ভাবনা

১৯৫২ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসের মধ্যে পৃথিবীর চাউল উৎপাদন অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-দপ্তরের সংশোধিত হিসাব অনুসারে ঐ সময় ৩৫ হাজার ৭ শত কোটি পাউণ্ড মোট চাউল উৎপন্ন হইবে। অনুকুল আবহাওয়া এবং চাষ-আবাদ বৃদ্ধিই ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ।

উল্লিখিত হিসাব হইতে আলোচ্য সময়ে, যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ, ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় শতকরা ৬ ভাগ এবং যুদ্ধোত্তর যুগের তুলনায় শতকরা ৪ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

প্রায় সকল মহাদেশেই চাউল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এশিয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এশিয়ায় বিগত বৎসরের তুলনায় গড়ে শতকরা ৬ ভাগ এবং প্রাক্-যুদ্ধযুগের তুলনায় শতকরা ৩ ভাগ চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। চীন দেশকে বাদ দিয়া আলোচ্য বৎসরে কেবল এশিয়াতেই মোট ২২ হাজার ৪ শত কোটি পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হইবে। যে সকল দেশ বিপুল পরিমাণে চাউল বাহির হইতে আমদানী করিত সেই সকল দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের ধানচাষের জমি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাপান, পাকিস্তান. ও কোরিয়ায় চাউল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফিলিপাইনে ১৯৫৩ সাল হইতে চাউল আমদানীর কোন প্রয়োজন হইবে না বরং ফিলিপাইন গবর্ণমেণ্ট ২৫ হাজার টন চাউল বিদেশে বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়াছেন। ঘাট্তির আশঙ্কায় ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ড হইতে গত বৎসরে ঐ পরিমাণ চাউলই ফিলিপাইন আমদানী করিয়াছিল।

১৯৫২-৫৩ সালে ব্রহ্মদেশ. যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি থাইল্যাণ্ড, মিশর ও মেক্সিকো প্রভৃতি চাউল রপ্তানীকারী রাষ্ট্রসমূহেও উৎপাদনের পরিমাণ এক শত কোটি হইতে দুই শত কোটি পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি হইতে জুন মাসের মধ্যে

ব্রহ্ম সরকারের এক ঘোষণায় নিম্নলিখিত দেশসমূহের জন্য এই পরিমাণে কলছাঁটা চাউল বরাদ্দ করা হইয়াছে:—ইণ্ডোনেশিয়া ২৬ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, যুক্তরাজ্য ২০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, জাপান ২০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, সিংহল ২০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড, রিউকু ৬ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ভারত-ব্রহ্ম বাণিজ্যচুক্তি অনুসারে ভারত প্রতিবৎসর পাইবে ৭৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

ব্রহ্মদেশে কলছাঁটা চাউল রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার শতকরা ৮৬ ভাগই ভারত এবং সিংহল সহ এশিয়ার দেশসমূহকে দেওয়া হইবে। থাইল্যাণ্ডের রপ্তানীযোগ্য সকল চাউলই ভারতকে দেওয়া হইবে। ইহার পরিমাণ ৩৭০ কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে।

চাউলের চড়া দরের দরুণ সকল দেশেই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্মিলিত চেষ্টা হওয়াতেই আলোচ্য বৎসরের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাজার তেজীই রহিয়াছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

বিজ্ঞান কলেজ
পদার্থবিদ্যা বিভাগের বক্তৃতা কক্ষ

২৭শে এপ্রিল, ১৯৫৩
সোমবার, অপরাহ্ন ৫-৩০

পরিষদের এই বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩১ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় এই বিশেষ সাধারণ অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তিপত্রের উল্লেখ করিয়া ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ৩১শে মার্চ, ১৯৫৩ তারিখে পরিষদের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের নিয়মাবলীর ১৩নং ধারার একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে ঐ তারিখের অন্যূন পনেরো দিন পরে উক্ত সংশোধন প্রস্তাব পুনরায় একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিয়া অনুমোদন করাইয়া লওয়া আবশ্যক। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে পরিষদের কর্মসচিব মহাশয় উক্ত পূর্বগৃহীত সংশোধন প্রস্তাবটি সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন।

১। ১৩নং ধারা সংশোধিত হইয়া নিম্নলিখিত আকারে গৃহীত হইয়াছিল—

"কোন সভ্য একই কর্মাধ্যক্ষ পদে পর পর অনধিক পাঁচবার নির্বাচিত হইতে পারিবেন; কেবলমাত্র সভাপতি পদের জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।"

এই প্রস্তাব বিষয়ে সভাপতি মহাশয় সভার মতামত আহ্বান করিলে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই প্রস্তাবটির অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।

২। এই বিশেষ সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাব বিধিসম্মতভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্বাচিত হন:—

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুমোদকমণ্ডলীর এই পাঁচজন সভ্য অত্র গৃহীত প্রস্তাবের খসড়া অনুমোদন করিলেই ইহা যথাবিধি অনুমোদিত হইল বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাঃ জিতেন্দ্র মোহন সেন
সভাপতি

স্বাঃ শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
কর্মসচিব

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর:—

স্বাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
স্বাঃ শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাঃ শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাঃ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
স্বাঃ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, বহুবিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ হইতে মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | জুন—১৯৫৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ভিটামিনের কথা

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের নাম আজকাল প্রায় সকলেই জানেন। পুষ্টির অভাবজনিত বিভিন্ন রোগে ভিটামিন যে কত লোককে নিরাময় করে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এই ভিটামিনের আবিষ্কার ও তার বিপুল উন্নতি যে কত আধুনিক সে সম্বন্ধে হয়তো অতি অল্প লোকেরই সঠিক ধারণা আছে। ১৯:৬ সাল পর্যন্তও কয়েকজন বিশিষ্ট খাদ্য-বিজ্ঞানী ভিটামিনের অস্তিত্বের বিষয় অস্বীকার করেছেন। ১৯১২ সালে ভিটামিন কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফুঙ্ক নামে এক বিজ্ঞানী। তখন ভিটামিনকে ভিটামাইন (Vitamine) বলা হতো। ভিটামিন সম্পর্কে তাঁর বইয়ে ফুঙ্ক বলেছেন—'আমার এমন একটি সংজ্ঞানির্ধারক নামের প্রয়োজন যা হবে শ্রুতিমধুর।' তাই ভিটামিন কথাটিকেই তিনি চয়ন করেছিলেন। অবশ্য এই কথাটির প্রচলন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু জানা যায় না।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যে নানারকম রোগের উৎপত্তি হয়, একথা আগে থেকেই জানা ছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন মিশরীয়েরা 'রাতকাণা' রোগের পথ্য হিসাবে গৃহপালিত পশুর যকৃৎ রোগীকে খাওয়াতো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের যুদ্ধে স্কার্ভি-রোগ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। স্কার্ভি-রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে ১৫২০ সালে প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন অষ্ট্রিয়ান চিকিৎসক ক্র্যামার। তিনি বলেন যে, কমলালেবু বা কাগজিলেবুর রস খেলে স্কার্ভি সারতে পারে। অবশ্য সেদিনকার সিদ্ধান্ত ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৫ সাল থেকেই বৃটিশ নৌবাহিনীতে স্কার্ভি প্রতিরোধের জন্যে কাগজিলেবুর আরকের ব্যাপক ব্যবহার সুরু হয়। ১৮৮২ সালে জাপানী অ্যাডমিরাল তাকাগী কেবলমাত্র খাদ্য-তালিকার উন্নতি বিধান করে জাপানী নৌবাহিনীতে বেরিবেরীর প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমিয়েছিলেন।

এসব ঘটনা ঐতিহাসিক বলা চলে। কেন না এসব খাদ্য-উপাদান প্রয়োগ করে দু-একটা ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করবার পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না।

যখন জানা গেল যে, অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে জীব-জন্তুর উপর পরীক্ষা করা চলে তখন থেকেই ভিটামিন সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা শুরু হয়। ভিটামিন সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষার পথপ্রদর্শক হচ্ছেন আইকম্যান। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুরগীর ছানাদের কলছাঁটা চা'ল খেতে দিলে বেরিবেরীর মত একটি রোগ হয়। অথচ চা'ল থেকে ছেঁটে-ফেলা আবরণগুলি খাওয়ালে রোগ সেরে যায়। কিন্তু এই পরীক্ষার সঠিক ধারাটির দিকে তৎকালীন খাদ্য-বিজ্ঞানীরা বিশেষ নজর দেন নি বলেই ভিটামিন সম্পর্কীয় পরীক্ষা চাপা পড়ে যায় কিছুদিনের জন্যে। আনুমানিক ১৮৮০ সালে লুনিন সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, কোন প্রাণীই কেবলমাত্র আমিষ, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে জল এবং লবণজাতীয় জিনিষ খেয়ে বাঁচতে পারে না; এই সব খাদ্য-উপাদানের সঙ্গে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত খাদ্য-উপাদান থাকা দরকার—এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী হপ্‌কিন্স ১৯০৬ সালে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, এই সব খাদ্য-উপাদানের অভাবে স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদানগুলির নাম দেওয়া হয় ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। তবে ১৯১৫ সালের আগে মোটেই জানা যায় নি যে, একাধিক ভিটামিন থাকতে পারে। ঐ সালেই ম্যাক্‌কলাম ও ডেভিস্ প্রমাণ করেন যে, ইঁদুরের সাধারণ পুষ্টির জন্যে দু-রকম অতিরিক্ত খাদ্য-উপাদানের দরকার। প্রথমে এই দুটি উপাদানকে Fat Soluble A ও Water Soluble B নাম দেওয়া হয়। কিন্তু ভিটামিন কথাটি প্রবর্তিত হলে এর নতুন নামকরণ হয় Vitamin A ও Vitamin B। ক্রমশঃ নতুন নতুন ভিটামিনের অস্তিত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও পর পর শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। ভিটামিন B সম্পর্কীয় অন্যান্য উপাদানগুলিকে B_1, B_2 ইত্যাদি নাম দিয়ে ভিটামিন B-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয় ভিটামিন B Complex.

ভিটামিনের সঠিক সংজ্ঞা আজও নির্ণীত হয় নি। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, ভিটামিন বলতে এমন কতকগুলি জৈব উপাদান বুঝায় যেগুলি অতি অল্প পরিমাণে খাদ্যের মাধ্যমে শরীর-গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তবে আমাদের খাদ্যে আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় উপাদানের তুলনায় নেহাৎ অল্প পরিমাণেই ভিটামিনের দরকার হয়। মাত্র এক আউন্স ভিটামিন D প্রায় এক লক্ষ লোকের প্রয়োজন মিটাতে পারে, কিন্তু একজন লোকের দৈনিক কয়েক আউন্স আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য না হলে চলে না। ভিটামিন গোষ্ঠীর মধ্যে ভিটামিন C-এর দৈনিক প্রয়োজন অন্যান্য ভিটামিনের চেয়ে বেশী, তা-ও আবার একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে ৫০ মিলিগ্রাম মাত্র। অল্প পরিমাণ ভিটামিনের এই কার্যকারিতা এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে, ভিটামিন Catalyst-এর কাজ করে' দেহের অন্তর্ভুক্ত কোষগুলির কার্যক্রম বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই ভাবে ভিটামিন আমাদের দেহ-গঠনে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে; তাছাড়া দেহের স্বাভাবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Metabolism) ঠিক রাখবার জন্যেও পরোক্ষভাবে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ ছাড়াও ভিটামিন দেহের Oxidation-reduction প্রক্রিয়ায় এবং Co-enzyme হিসাবেও সাহায্য করে থাকে।

ভিটামিন সম্পর্কিত প্রথম পর্যায়ের গবেষণাগুলি সবই পরীক্ষামূলক। ভিটামিনের অভাবজনিত রোগে কোন্ খাদ্য প্রয়োগ করলে সেই রোগের উপশম হয়—তা-ই ছিল গবেষণার বিষয়। এই ভাবে কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণে প্রয়োজনীয় ভিটামিন আছে তা ক্রমশঃ জানা গেল। আগে ভিটামিনের

রাসায়নিক গঠন ও প্রকৃতি জানা না থাকায় জৈবিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা হতো। এভাবে গবেষণা করে দেখা গেল—পায়রার পলিনিউরাইটিস রোগ সারাতে কিংবা ইঁদুরের স্বাভাবিক দেহ-গঠনে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন দরকার হয়। ইঁদুর, পায়রা, গিনিপিগ্ প্রভৃতি জীব-জন্তুর উপর এই ধরনের আরও পরীক্ষা চালাবার পর ভিটামিনের ইউনিট তৈরী হয়। বর্তমানে প্রায় সব ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন-পদ্ধতি জানা গেছে। এজন্যে আগের তুলনায় রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভিটামিন বিশ্লেষণের কাজও অনেক এগিয়েছে। বর্তমানে সব ভিটামিনের পরিমাণ নির্ধারিত এবং প্রায় সব ভিটামিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজও বেশ নিখুঁতভাবেই হয়েছে। গবেষণার দিক থেকে ভিটামিন সম্পর্কে ব্যাপক কার্যক্রম জানা গেলেও শারীর-বিজ্ঞানে ভিটামিনের কার্যকলাপ বা ভিটামিনের অভাব মানবদেহে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে—সে সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হলেও সব কিছু জানা যায় নি। খাদ্যবিজ্ঞানীরা শরীরের জন্যে ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন এবং ভিটামিন শরীরের পক্ষে অপরিহার্য কেন এবং সেগুলি শরীর-গঠনে কিভাবে সাহায্য করে, সে সম্বন্ধে অদূর ভবিষ্যতে অনেক কিছু জানা যাবে বলে মনে হয়।

ভিটামিন গবেষণার সর্বাধুনিক উন্নতি হয়েছে আরও কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কারের ফলে। সেগুলির রাসায়নিক গঠন ভিটামিনের মতই। কারণ দেখা গেছে—ভিটামিন C-এর রাসায়নিক প্রকৃতি হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের অনুকরণে আরও কতকগুলি পদার্থ তৈরী করা হয়েছে যাদের কার্যপ্রণালী অবিকল ভিটামিন C-এর মত। এই ভাবে দেখা গেছে, ভিটামিন D-এর মত আরও চৌদ্দটি পদার্থ আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন-পদ্ধতি জানা থাকায় কৃত্রিম ভিটামিন তৈরী করা সহজ হয়েছে। আগে স্বাভাবিক উপাদান থেকে জৈবিক বিশ্লেষণের দ্বারা ভিটামিন বার করা হতো। এই পদ্ধতিটি ছিল বিশেষ শ্রমসাধ্য। কিন্তু কৃত্রিম ভিটামিন আজকাল অল্প সময়ে ব্যাপকভাবে তৈরী হচ্ছে। খাদ্যের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগের উপশমে ভিটামিন যাতে সহজলভ্য হয় তার জন্যেই এই প্রচেষ্টা। সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে যে সব ভিটামিন আমাদের শরীর-গঠনে সাহায্য করে, তাদের অভাব ঘটলে ভিটামিন বাইরে থেকেই শরীরে চালান দিতে হয়; কারণ ভিটামিন শরীরের ভিতর তৈরী হয় না।

আগে রাসায়নিক গঠন-পদ্ধতি জানা না থাকায় ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ বর্ণানুক্রমে করা হয়েছিল; যেমন—A, B, C, D ইত্যাদি। তারপর ভিটামিনকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সে দুটি হচ্ছে—Fat Soluble Vitamins যাতে ভিটামিন A, D, E, K পড়ে আর Water Soluble Vitamins যাতে ভিটামিন B complex ও ভিটামিন C থাকে। এই দুটি শ্রেণীর কোন পরিবর্তন আজও করা হয় নি, তবে এদের অন্তর্ভুক্ত ভিটামিনগুলির বর্ণানুক্রমিক নামের পাশে ক্রমশঃ বিজ্ঞানসম্মত নাম স্থান পাচ্ছে। ভিটামিনগুলিকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে মানব-দেহের পক্ষে উপযোগী ভিটামিন, যেমন—ভিটামিন A, ভিটামিন B Complex গোষ্ঠীর থিয়ামিন, নিয়াসিন, রিবোফ্লেভিন, ফোলিক অ্যাসিড, কুব্রামিন, ভিটামিন C, D ও K আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়োটিন, কোলিন (B Complex গোষ্ঠী) ও ভিটামিন E, F ও P-এর মানবদেহের প্রয়োজন সম্বন্ধে এখনও সন্দেহের অবকাশ আছে। আর তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে, পরীক্ষামূলকভাবে যে সব ভিটামিন বিভিন্ন জন্তুর উপর ব্যবহার করা হয়; যেমন—B

Complex গোষ্ঠীর পিরিডক্সিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ইনোসিটল ও প্যারা-অ্যামিনো বেনজোয়িক অ্যাসিড। নীচে ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগের একটা ছক দেওয়া গেল :—

ভিটামিনের নাম	ভিটামিনের মত কাজ করে এমন বিজ্ঞানসম্মত পদার্থ বা ভিটামিনের বৈজ্ঞানিক নাম
Fat Soluble	
(১) ভিটামিন A (ক)	(১) ভিটামিন A বিটা-আইনিনল } (ক)
প্রোভিটামিন A (খ)	আলফা, বিটা, গামা, ক্যারোটিন (খ)
(২) ভিটামিন D	(২) ভিটামিন D_2 বা ক্যালসিফেরল ভিটামিন D_3 ভিটামিন D_4
(৩) ভিটামিন E	(৩) আলফা, বিটা, গামা, টকোফেরল
(৪) ভিটামিন K	(৪) ভিটামিন K_1 বা ফাইলোচিনন ভিটামিন K_2 বা আইওকোল
Water Soluble	
(৫) ভিটামিন B Complex	(৫)
তাপ সহনীয় নয়	
(ক) ভিটামিন B_1	(ক) থিয়ামিন
তাপ সহনীয়	
(খ) ভিটামিন B_2 বা ভিটামিন G	(খ) রিবোফ্লেভিন
(গ) ভিটামিন B_6	(গ) পিরিডক্সিন
(ঘ) পেলেগ্রা প্রতিরোধক ভিটামিন	(ঘ) নিকোটিনিক অ্যাসিড
(ঙ) ভিটামিন H	(ঙ) বায়োটিন
(চ) ভিটামিন B.	(চ) ফোলিক অ্যাসিড
(ছ) ভিটামিন H_1	(ছ) প্যারা-অ্যামিনো বেনজোয়িক অ্যাসিড
(জ) ভিটামিন B_{12}	(জ) কব্রামিন
(৬) ভিটামিন C	(৬) অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড
(৭) ভিটামিন P	(৭) সাইট্রিন বা হেস্পেরিডিন

ছকে B Complex গোষ্ঠীর আটটি ভিটামিনের নাম করা হয়েছে—এছাড়াও এর মধ্যে কোলিন, ইনোসিটল, র‍্যাট পেলেগ্রা ফ্যাক্টর ও প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড আছে।

জৈব-রসায়ন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আইসোটোপ

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের নিজস্ব পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক এবং পারমাণবিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু মৌলিক পদার্থ এমনও হতে পারে যে, তাদের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক এক; কিন্তু পারমাণবিক গুরুত্বের প্রভেদ আছে। হাইড্রোজেন এবং ভারী হাইড্রোজেনের মধ্যে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ১ এবং ভারী হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব ২, কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম এবং পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক উভয়েরই এক। এই রকম মৌলগুলিকে আইসোটোপ অর্থাৎ একস্থানীয় মৌল বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে এই একস্থানীয় মৌলগুলি পাওয়া যায়। সেগুলিকে একস্থানীয় তেজস্ক্রিয় মৌল বলা হয়। তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌলগুলি বর্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আয়োডিন ^{131}—তেজস্ক্রিয় ১৩১ পারমাণবিক গুরুত্বসম্পন্ন আয়োডিন, নাইট্রোজেন ^{15}, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় ১৫ পারমাণবিক গুরুত্বসম্পন্ন নাইট্রোজেন।

তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌল ব্যবহারের ইতিহাসে ২৯ বছর আগে জর্জ হিভ্‌সির নাম সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৯৩২ সালে ভারী জল অর্থাৎ ভারী হাইড্রোজেনযুক্ত জল তৈরী হওয়ার পর থেকে জৈব-রসায়নে তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌলিক পদার্থের ব্যবহার বেড়ে যেতে থাকে।

তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় পরমাণুযুক্ত যৌগিক তৈরী করা হয় সাধারণ যৌগিক থেকে (অর্থাৎ যাতে তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় কোনও পরমাণু নেই)। এর সঙ্গে তেজস্ক্রিয় যৌগিকের বিপরিবর্তিক বিক্রিয়ার ফলে সাধারণ যৌগিকের ভিতর তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌল প্রবেশ করে। এরূপভাবে তৈরী যৌগিককে চিহ্নিত যৌগিক বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, গ্লাইসিনের কথা। গ্লাইসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে নাইট্রোজেন ^{15}-যুক্ত অ্যামোনিয়া, অর্থাৎ ভারী অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ার ফলে গ্লাইসিনের অণুর ভিতর নাইট্রোজেন ^{15}-এর পরমাণু প্রবেশ করে' তেজস্ক্রিয় চিহ্নিত গ্লাইসিন প্রস্তুত হয়। এরপর এই চিহ্নিত যৌগিক দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়ে বিভিন্ন সময়ে দেহনিঃসৃত বিভিন্ন পদার্থ পরীক্ষা করে রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা যায়। চিহ্নিত যৌগিক বিক্রিয়ার ফলে দেহের ভিতর যে নতুন যৌগিক সৃষ্টি করবে তাতে অনেক ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পরমাণু স্থান পাবে। বিক্রিয়াসৃষ্ট নতুন যৌগিকের তেজস্ক্রিয়ার পরিমাপ দ্বারা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। তেজস্ক্রিয়া পরিমাপে গ্যাসীয় আয়নতি প্রণালী অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে; আবার অনেক ক্ষেত্রে গাইগার-মুলার কাউণ্টার ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় চিহ্নিত যৌগিকের ভিতর দুটা তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় পরমাণু প্রবেশ করে। সে সব ক্ষেত্রে দুটা তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিকিরণের তারতম্য থেকে তেজস্ক্রিয়া পরিমাপ করা হয়।

একস্থানীয় তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির সরবরাহের অবস্থা বিদেশে এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে, এ সম্বন্ধে গবেষণার অগ্রগতি নির্ভর করে বিজ্ঞানীর কল্পনাশক্তি এবং কার্যদক্ষতার উপর।

ভারী জল পান করবার কিছুক্ষণ পর পর মূত্র পরীক্ষার দ্বারা হিভ্‌সি এবং হোফার এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, দেহের ভিতর জল প্রায় ১৩ দিন থাকতে পারে।

দেহ-তন্ত্রীগুলির ভিতর রসায়ানিক প্রক্রিয়া চলছে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময় তন্ত্রীসমূহের ভাঙ্গাগড়া চলে। তন্ত্রীগুলি যে প্রক্রিয়াতে গঠিত হয় তাকে বলা হয় অ্যানাবলিজম বা উপচিতি, আর যে প্রক্রিয়াতে তন্ত্রীগুলির ক্ষয় হয় সেটাকে বলা হয় ক্যাটাবলিজম বা অপচিতি। উপচিতি আর অপচিতির সমষ্টি হচ্ছে বিপাক।

প্রোটিন-বিপাকে চিহ্নিত যৌগিক তৈরী করে' বিপাকীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশ খানিকটা জানা গেছে। নাইট্রোজেন ১৫-চিহ্নিত গ্লাইসিন দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন তন্ত্রীর প্রোটিনে নাইট্রোজেন ১৫ প্রবেশ করে। শতকরা ৩০ ভাগ নাইট্রোজেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়! নাইট্রোজেন ১৫-ঘটিত গ্লাইসিন প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্লাজমা অর্থাৎ রক্ত-রসের প্রোটিনেও নাইট্রোজেন ১৫ প্রবেশ করে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেহের ভিতরের প্রোটিন-গুলিতে বাইরের প্রোটিন নিয়মিতভাবে পরিবেশিত হচ্ছে। এইরূপ তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌল দ্বারা গবেষণা করে রিটেনবার্গ এবং সোয়েনহাইমার প্রমাণ করেছেন যে, তন্ত্রীর প্রোটিনের ভাঙ্গাগড়া চলছে অবিরত। আর এ ব্যাপারে সমতা বিদ্যমান থাকায় নাইট্রোজেন গ্রহণ এবং অপসরণের পরিমাণ সাধারণ দেহে প্রায় একই। নানারকমের খাবার খাইয়ে নাইট্রোজেন ১৫ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অধিক প্রোটিন খাদ্য গ্রহণের পর দেহের নাইট্রোজেন অপসরণ বেশী হয়। আবার শুধু শর্করা জাতীয় খাবার খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন-নিঃসৃতির পরিমাণ অনেক কম। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেহের প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্যে যতটুকু নাইট্রোজেন দরকার দেহ ততটুকুই গ্রহণ করে।

দেহের অ-প্রোটিন নাইট্রোজেনের গবেষণায় নাইট্রোজেন ১৫ ব্যবহৃত হয়েছে। রক্তের লাল কণিকার রঞ্জন দ্রব্যের মধ্যে হেম (Haem) বলে একটা যৌগিক আছে। লাল কণিকার আয়ুষ্কাল তিন মাস। এই তিন মাস পরে নতুন লাল কণিকার সৃষ্টি হয়। পুর্নগঠনের সময় পুরনো নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয় না। তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় কার্বন দিয়ে দেখা গেছে যে, দেহের ভিতর গ্লাইসিন থেকে ইউরিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়।

ফস্‌ফরাস ৩২ ব্যবহার করে হিভ্‌সি, মেয়ারহফ্-প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, শরীরের অজৈব ফস্‌ফেট জৈব ফস্‌ফেটে রূপান্তরিত হয়। শর্করা-বিপাকের একটা প্রধান যৌগিক অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্‌ফেট শরীরের কার্যকরী ক্ষমতার প্রধান উৎস। দেহের ভিতর অ্যাডিনোসিন-ট্রাই-ফস্‌ফেট এবং অজৈব ফস্‌ফেটের সমতা রয়েছে।

শরীরের কোলেষ্টেরল সব চেয়ে বেশী সঞ্চিত থাকে মস্তিষ্কে; কিন্তু ভারী হাইড্রোজেনযুক্ত অ্যাসিটেট দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, যকৃতে কোলেষ্টেরল সংশ্লেষিত হচ্ছে। ভারী হাইড্রোজেন ব্যবহার করে জানা গেছে যে, কোলেষ্টেরল থেকে কোলিক অ্যাসিড বলে একটা পিত্তাম্লের সৃষ্টি হয়। ভারী হাইড্রোজেনযুক্ত কোলেষ্টেরল ইনজেক্‌সন দিয়ে শরীর থেকে ভারী হাইড্রোজেনযুক্ত প্রেগ্‌নান্‌-ডাইঅল পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কোলেষ্টেরল থেকে নারীদেহের হর্মোন প্রোজেস্‌টেরন সৃষ্টি হয়; কারণ প্রেগ্‌নান্‌ডাইঅল প্রোজেস্‌টেরন থেকে উদ্ভূত যৌগিক।

ধাতব-বিপাকে এক স্থানীয় মৌল ব্যবহার করে বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ব্যাপার উদ্ঘাটিত হয়েছে। বর্তমানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মলের ক্যালসিয়াম এবং ফস্‌ফেট দেহের পরিত্যক্ত (unabsorbed) খাদ্যদ্রব্য থেকে পাওয়া যায়। রিকেট সম্বন্ধে অনুসন্ধানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে জানা গেছে যে, দেহের ফস্‌ফরাস-স্বল্পতা থেকে রিকেট হয়ে থাকে, কিন্তু এতে শরীরে ফস্‌ফরাস গ্রহণ করবার ক্ষমতা নষ্ট হয় না। এই অবস্থায় শরীরের ক্যালসিয়াম গ্রহণের ক্ষমতা কমে

যায়। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ফস্ফরাস^{৩২}, ক্যালসিয়াম^{৪৫} এবং ষ্ট্রন্সিয়াম^{৮৯} ব্যবহার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেছে। ভিটামিন-ডি রিকেট-রোগ মুক্তিতে দু-রকম কাজ করে: এক হচ্ছে হাড়ের অজৈব ভাগ বাড়িয়ে তোলে, আর পরিপাক প্রক্রিয়া থেকে অধিক ক্যালসিয়াম গ্রহণের ক্ষমতা সৃষ্টি করে। আয়রন্^{৫৫} এবং আয়রন^{৫৯} তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে লৌহ-বিপাক সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য জানা গেছে। রক্তের হেমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে এই লৌহ বার বার ব্যবহৃত হয়। লাল কণিকার রঞ্জন দ্রব্যের ভিতর লৌহ জৈব-যৌগিকের সঙ্গে একটি জটিল যৌগিক সৃষ্টি করে আছে। রক্তের লাল কণিকার পুনর্গঠনের সময় পুরনো লাল কণিকা থেকে লৌহ পুনরায় ব্যবহৃত হয়। এল. হ্যান এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করেছেন যে, ফেরাস আয়রন দেহের রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করতে ফেরিক আয়রন থেকে বেশী কার্যকরী। আয়রন^{৫৫} ব্যবহার করে লৌহ স্বল্পতাগ্রস্ত রক্তহীনতার চিকিৎসায় জানা গেছে যে, দেহের রক্ত, অস্থি-মজ্জা এবং যকৃত লৌহের সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম। প্লীহা লৌহের সদ্ব্যবহারে খানিকটা অংশ গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু দেহের পেশীগুলি এ ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয়। গ্র্যানিক এবং হ্যান প্রমাণ করেছেন যে, লৌহসমৃদ্ধ প্রোটিন হিসাবে এবং ফেরিটিন হিসাবে যকৃতে লৌহ সবচেয়ে বেশী জমা হয়ে থাকে। উইনট্রোব এবং তাঁর সহকারীগণ আয়রন^{৫৯} ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, সংশ্লেষিত হেমোগ্লোবিন অস্থি-মজ্জার পক্ষে সদ্ব্যবহার করা দুষ্কর হয়ে পড়লে হেমোগ্লোবিন সংশ্লেষণ ব্যাহত হয়ে পড়ে, আর এর ফলে রক্তাল্পতার সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে যে, পিরিডক্সিন স্বল্পতাগ্রস্ত জীবের লাল কণার তেজস্ক্রিয় লৌহ গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়; কিন্তু পিরিডক্সিন চিকিৎসায় সে ক্ষমতা বাড়ান যায়।

একস্থানীয় তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহারের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আয়োডিন^{১২৭}-এর কথাই আসে। কিন্তু ১২টি একস্থানীয় তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের মধ্যে আয়োডিন^{১৩১} সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। আয়োডিন-বিপাকে থাইরয়েড গ্রন্থি বিশেষভাবে কাজ করে। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ইন্জেকসন দিয়ে দেখা গেছে যে, দেহের বিভিন্ন অবয়বের চেয়ে থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডিন জমা হয় সবচেয়ে বেশী এবং তার তুলনায় দেহের অন্যান্য অংশে সঞ্চিত আয়োডিন নিতান্তই কম। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন^{১৩১} দিয়ে পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন থাইরক্সিন সংশ্লেষিত হয় দেহের ভিতরকার অ্যামিনো অ্যাসিড টাইরোসিন থেকে। টাইরোসিন আয়োডিনের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি করে ডাই-আয়োডোটাইরোসিন। এর দুটা অণু একসঙ্গে অ্যালানিন নামক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড বের করে দিয়ে সৃষ্টি করে থাইরক্সিন। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন দিয়ে রক্তরসের আয়োডিন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে। অজৈব তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ইন্জেকসন দিয়ে দেখা গেছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে রক্তরসের ভিতরও তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়; কিন্তু থাইরয়েড-বিহীন জন্তুতে এই রকম আয়োডিনের ঘনত্ব বৃদ্ধি নিতান্তই কম। পিটুইটারী গ্রন্থির থাইরয়েড উত্তেজক হর্মোন থাইরোট্রপিন ইন্জেক্সন করে দেখা গেছে যে, দেহের প্রোটিন সংলগ্ন আয়োডিনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া প্রোটিন সংলগ্ন আয়োডিনের যৌগিক রূপ সম্বন্ধে গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, রক্ত-রসের আয়োডিন, থাইরক্সিন জাতীয় কোনও যৌগিকের সঙ্গে আবদ্ধ, আর সেটা রক্ত-রসের প্রোটিনের সঙ্গে কোনও উপায়ে সংযুক্ত রয়েছে।

এ তো গেল বিপাকীয় রসায়নে তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌলিকের ব্যবহারের খানিকটা। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় পরমাণু সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর

মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস নানারকম রক্তদুষ্টি রোগে সন্তোষজনক ফল দিয়েছে। পলিসাইথেমিয়া ভেরা, লিউকেমিয়া এই রোগগুলির অন্যতম। মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থির আকার বৃদ্ধির ফলে গয়টার নামক একরকম অসুখ হয়। গয়টার বিভিন্ন প্রকারের। যে গয়টারের ফলে অত্যধিক থাইরক্সিন ক্ষরণ হয় তাকে হাইপার থাইরয়েডিজম্ বলা হয়। আয়োডিন ১৩০ এবং আয়োডিন ১৩১ দিয়ে চিকিৎসা করে এই অসুখে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। এছাড়া থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসারে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ১৩১ এবং আয়োডিন ১৩০ ব্যবহৃত হচ্ছে।

তেজস্ক্রিয় একস্থানীয় মৌলগুলির চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যবহার খুব সাবধানে করা হয়, কারণ দেহের ভিতর একবার তেজস্ক্রিয় যৌগিক প্রবেশ করলে তার বিকিরণ ঠিকমত হয়ে যাবে। ভুল চিকিৎসা হলে এর কোনও প্রতিষেধক নেই।

পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসলীলার কথায় পৃথিবীর লোক শিউরে উঠে। চোখের উপর হিরোসিমা, নাগাসাকি ধ্বংস হয়ে গেল। পারমাণবিক শক্তির সদ্‌ব্যবহার করে বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্যাদি উদ্‌ঘাটিত হতে পারে, আর অজানার বিরুদ্ধে সংগ্রামও এগিয়ে যেতে পারে। একস্থানীয় মৌলগুলির জৈব-রসায়ন এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যবহার তার একটা সামান্য উদাহরণ মাত্র।

টাক পড়া ও চুল পাকার কারণ কি?

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

চেহারার শ্রী-সম্পাদনে চুল একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। এই জন্য বাল্যকাল হইতেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই চুলের নানা প্রকার পারিপাট্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও চুল উঠিতে থাকিলে বা টাক পড়িতে আরম্ভ করিলে তাহাদের আর দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। চুল পাকিতে আরম্ভ করিলেও মহা দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া পড়ে—যেন বার্ধক্যের শমন-জারী হইল!

চুল সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে। যেমন টুপী পরিলে টাক পড়ে, সূর্যালোক চুলের বৃদ্ধির পক্ষে খুব উপকারী, মস্তক-মুণ্ডনে চুল মোটা ও দৃঢ় হয় এবং তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি।

টুপী পরিলে টাক পড়ে, ত্বকবিশেষজ্ঞদের মতে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। তাঁহাদের মতে টুপী ছাড়া বাহির হইলেই বরং অনেক সময় চুলের অপকার হইতে পারে; চুল খুব শুষ্ক ও ভঙ্গুর হইয়া সহজে খণ্ডিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনে চুলের উপর সূর্যালোকের ক্রিয়া সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে গবেষণা করিয়া দেখা হইয়াছে। অনেক লোককে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে সমুদ্র-উপকূলে বহুক্ষণ রাখার পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের চুলের পরীক্ষা করা হয়। ঐরূপ পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, সূর্যালোক চুলের বৃদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। শুধু চুলই নয়, গোঁপ, দাড়ি এবং শরীরের অন্য স্থানের লোমের বৃদ্ধির উপরও সূর্যালোকের কোন প্রভাব নাই। চুলের উপর মস্তক-মুণ্ডনের প্রভাব সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাও যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক তাহাও উক্ত স্কুল অব মেডিসিন ও অন্যান্য স্থানের পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে।

গাত্র-চর্মের লোমকূপ হইতেই চুল এবং লোম বাহির হয়। যতদিন পর্যন্ত এই লোমকূপগুলি অক্ষত থাকে এবং শরীর হইতে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তের সরবরাহ পায় ততদিন কোন কিছুই চুলের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না। একটি চুল টানিয়া তুলিলে ঐ স্থান হইতে আর একটি চুল বাহির হয়। কিছুদিন পর্যন্ত লোমকূপটি শূন্য মনে হয়, কারণ লোম বৃদ্ধি পাইয়া ত্বকের উপরিভাগে আসিতে অনেক সময় লাগে।

কলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে লোম তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সব স্থান হইতে একই সময়ে নূতন লোম বাহির হয় না। ভ্রূর একটি লোম টানিয়া তুলিলে সেই স্থান হইতে আর একটি নূতন লোম বাহির হইতে প্রায় ৬৪ দিন সময় লাগে; কিন্তু মাথার চুল টানিয়া তুলিলে নূতন চুল গজাইতে উহার প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে। দাড়ি টানিয়া তুলিলে ৯০ দিন এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে নূতন লোম গজাইতে প্রায় ১২০ দিন সময় লাগে। নূতন চুল বাহির হইতে ভ্রূর লোমের দ্বিগুণ সময় লাগিলেও, একবার ত্বকের বাহিরে আসিলে চুল ভ্রূর দ্বিগুণ হারে বাড়ে। ত্বকের উপরে আসিলে বিভিন্ন স্থানের লোম উহার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য অনুযায়ী বাড়ে, অর্থাৎ যে স্থানের লোম স্বভাবতঃ দীর্ঘ তাহার বৃদ্ধির হারও বেশী হয়। পায়ের লোমের বৃদ্ধির হার দাড়ির বৃদ্ধির তুলনায় অর্ধেক।

ত্বকের বাহিরে আসিলে মাথার চুল সর্বাপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রথম ১০০ দিনে মাসে গড়ে প্রায় ½ ইঞ্চি বাড়ে; তারপর এই বৃদ্ধির গতি মন্থর হয়। চুলের গড়পড়তা পরমায়ু মাত্র দুই বৎসরের মত। তারপর চুল ঝরিয়া পড়ে এবং ঐ স্থান হইতে নূতন চুল বাহির হয়। স্ত্রীলোকের চুল পুরুষের চুল অপেক্ষা অনেক দ্রুতগতিতে বাড়ে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চুল-পাকা নিবারণের জন্যও মানুষ অনেক সাধনা করিয়া থাকে। কাজেই চুল পাকিবার কারণ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের শরীরে মেলানিন নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ঐ রঞ্জক পদার্থ হইতেই চুলের রং কালো হইয়া থাকে। বয়স বাড়িতে থাকিলে শরীরে মেলানিনের উৎপাদন হ্রাস পায়; ফলে চুলের রং ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতে থাকে। প্রথমে ধূসর বর্ণ ধারণ করে, পরে সাদা হয়। অনেক সময় অল্প বয়সে বা অকালে চুল পাকিতে দেখা যায়। ঐ সব ক্ষেত্রে কোন কারণে শরীরে মেলানিন উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলেই ঐরূপ হইয়া থাকে। পুরুষানুক্রমিক কোন শারীরিক ত্রুটী অথবা মনের উপর কোন গুরুতর আঘাত বা দুঃশ্চিন্তার ফলে শরীরের মেলানিন উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে। আবার কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগ ভোগের পরেও শরীরে মেলানিন উৎপাদন কমিয়া যাইতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরের মেলানিন উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পাইলে উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কোন উপায় নাই। চুল-পাকা নিবারণ করিতে সক্ষম কোন ভিটামিনও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

অকালে চুল পাকিলে অনেকে কলপ ব্যবহার করিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে চুলের পক্ষে কলপ ব্যবহার অপকারক। ডাঃ ম্যাক আর্থ এবং স্যাবোর‍্যাণ্ড প্রমুখ বিখ্যাত ত্বক-বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কলপ ব্যবহার করিলে শুধু যে চুলের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় ও চুল ভঙ্গুর হইয়া পড়ে তাহাই নয়, কলপ ব্যবহারে চুল খুব তাড়াতাড়ি ঝরিয়াও পড়িতে পারে। ভেষজ কলপ ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক হইলেও বিশেষজ্ঞদের মতে উহা ব্যবহারেও চুলের অবনতি ঘটে; চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়।

অনেকে যন্ত্র সাহায্যে চুলে নানারূপ ঢেউ সৃষ্টি করিয়া চুলের শোভা বৃদ্ধি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে চুলের উপর মমতা থাকিলে ঐরূপ করা সঙ্গত

নয়। নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ করিবার ফলে চুলের জলীয় অংশের হ্রাস ঘটে এবং চুল ভঙ্গুর হইয়া ফাটিয়া যাইতে আরম্ভ করে।

বিজ্ঞানীরা টাক-পড়া সম্বন্ধে অনেকগুলি কারণ দর্শাইয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি শারীরিক আর কতকগুলি মানসিক উত্তেজনাপ্রসূত। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে কোন শারীরিক কারণে চুলের গোড়ায় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিলেই চুল উঠিয়া যাইতে পারে। কাজেই শারীরিক কি কি কারণে চুলের গোড়ায় রক্ত সরবরাহের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বৈজ্ঞানিকেরা তাহার যথাযথ কারণ নির্ণয়ে ব্যাপৃত আছেন।

ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের গবেষণা হইতে এই সম্বন্ধে একটি কারণ নির্দেশিত হইয়াছে। গবেষণায় প্রকাশ—টাকওয়ালা লোকের করোটির উপরে ক্যালসিয়ামের একটি কঠিন স্তর সৃষ্টি হওয়ার ফলে চুলের গোড়ায় রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়। বহু টাকওয়ালা লোকের শবব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহাদের করোটির উপরে একটি শুভ্র স্তরের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। গবেষকদের মতে ক্যালসিয়ামের স্তরই চুলের গোড়ায় রক্ত চলাচলের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই গবেষণা হইতে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের করোটির উপরই অধিক পরিমাণে এইরূপ ক্যালসিয়ামের স্তর সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এই জন্যই পুরুষের মাথায় বেশী টাক দেখা যায়।

কিন্তু শারীরিক কি কারণে করোটির উপর এই ক্যালসিয়াম স্তরের সৃষ্টি হয় তাহা এখনও জানা যায় নাই। বিশেষতঃ এই ক্যালসিয়াম-স্তর সৃষ্টির ফলেই চুলের গোড়ায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়, না রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলেই ক্যালসিয়াম-স্তরের সৃষ্টি হয় তাহাও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে এই গবেষণা হইতে একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে যে, চুলের গোড়ায় যখন রক্ত চলাচল বন্ধ হয়, করোটির উপরিভাগের রক্ত চলাচলের পথগুলিও তখন রুদ্ধ হয়।

পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা হইতে টাক-পড়া সম্বন্ধে অপর একটি কারণ নির্দেশিত হইয়াছে। ত্বকাশ্রিত সিবেসাস গ্রন্থি নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই গবেষণা হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সিবেসাস গ্রন্থি হইতে ঐ সব রাসায়নিক পদার্থের অতিরিক্ত ক্ষরণে চুলের গোড়ায় রক্ত চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইতে পারে। এই গবেষণাগারের পরীক্ষা হইতে আরও জানা গিয়াছে যে, টাকওয়ালা লোকের মাথার উপরের চর্মের ঘর্ম নিষ্কাশন করিয়া খরগোস অথবা ইঁদুরের গায়ে লাগাইলে কয়েক দিনের মধ্যেই উহাদের লোম ঝরিয়া পড়ে এবং একবারের অধিক প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় না।

এই আবিষ্কার হইতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, সিবেসাস গ্রন্থির অতিরিক্ত সক্রিয়তাই টাক পড়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু শরীরের মধ্যে ঠিক কিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে সিবেসাস গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। তবে মানসিক উত্তেজনাকে ইহার একটি কারণ রূপে অনুমান করা হইয়াছে, যেহেতু মানসিক উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডলীতে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ ভয়, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে গ্রন্থি-নিস্রবণ ও রক্ত চলাচলের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বর্তমান—ইহা বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। গুরুতর মানসিক অবস্থা ব্যক্তিবিশেষের চুলের রঙের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম এই সিদ্ধান্তও সর্বতোভাবে গৃহীত হইয়াছে। মানসিক উত্তেজনা শরীরে এমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃজনে সক্ষম কিনা যাহার ফলে চুল ঝরিয়া পড়িতে পারে, তাহাই এখন বিবেচনার বিষয়। এখন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কোন কোন

বৈজ্ঞানিক এই সম্ভাবনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ত্বক-বিশেষজ্ঞ ডাঃ হেলিয়ার তাঁহার বিবিধ অভিজ্ঞতা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাথার স্থানে স্থানে চুল উঠিয়া যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তির জন্য ঘটিয়া থাকে। তিনি তাঁহার বিবৃতিতে অনেক রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের এক-জনের ইতিহাসে প্রকাশ যে, সে তাহার আত্মীয়ার সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ সময়েই তাহার চুল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে ডাঃ হেলিয়ার নিকট অকপটে প্রকাশ করে যে, বাসস্থান ত্যাগ না করিলে অচিরে তাহার টাক পড়িয়া যাইবে ও সে উন্মাদ হইয়া যাইবে। এই রোগীর ইতিহাসের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া ডাঃ হেলিয়ার বলিয়াছেন যে, নিঃসন্দেহে এই লোকটির অবচেতন মনে একটি গভীর দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। লোকটির পরবর্তী ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, বাসস্থান পরিবর্তনের ফলে সত্য সত্যই তাহার মনের অবসাদ দূর হইয়াছে এবং সে টাক-পড়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

সাধারণভাবে টাক-পড়া ব্যতীত নানাপ্রকার অসুখ এবং চর্মরোগের ফলেও মাথার চুল উঠিয়া যাইতে পারে। ক্ষয়, টাইফয়েড প্রভৃতি দীর্ঘস্থায়ী রোগ বা মাথায় কোন গুরুতর আঘাত পাইলেও অনেক ক্ষেত্রে চুল পড়িয়া যায়। আবার টাক-পড়া অনেক ক্ষেত্রে পুরুষানুক্রমিক ভাবেও প্রকাশ পায়।

টাকের কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যথেষ্ট আলোক-সম্পাতে সক্ষম হইলেও টাক নিবারণের কোন উপায় এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। টাক নিবারণের পন্থা আবিষ্কারের জন্য নানা স্থানে গবেষণা চলিয়াছে। অনেক সময় কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগের ফলে মাথার চুল উঠিয়া যায় আবার রোগ মুক্তির পরে আপনা হইতেই মাথায় চুল গজায়।

এখন উপসংহারে মোটামুটিভাবে চুল সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, চুলের গোড়ায় রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি করিতে নিয়মিতভাবে খুব জোরে জোরে চুল আঁচড়ান ও মস্তক মর্দন করা বিশেষ প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে মাথা বা চুল ধুইতে অবহেলা করা উচিত নহে। ত্বক-বিশেষজ্ঞদের মতে মাথার উপরের ত্বক যত পরিষ্কার রাখা যায় চুলের পক্ষে অপকারক কোনরূপ চর্মরোগ সংক্রমণের ভয়ও তত কম থাকে। চুল ভাল রাখিতে শুধু চুলের যত্ন নিলেই চলে না, মনকেও যথাসম্ভব উত্তেজনা-বিমুক্ত রাখা প্রয়োজন। আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় সর্ব-প্রকার যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও চুল রক্ষা করা কঠিন হইতে পারে। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের নানা-প্রকার গবেষণা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, মানুষের মস্তিষ্কের ভিতরে যে প্রতিক্রিয়া চলে তারই প্রতিঘাত মাথার উপরে চুলে প্রকাশ পায়।

গ্রীক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

খৃঃ পূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভূমধ্য সাগরের পূর্বে ঈজিয়ান সমুদ্রাঞ্চলে চিওস্, কস, সামোস্, ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপে, মাইলেটাস্, ইফিসাস প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে ও মূল ভূখণ্ড গ্রীসে সম্পূর্ণ এক নূতন জাতির পরিচালনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য বিকাশ লাভের ব্যাপার বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুবিদিত। এই নূতন জাতি গ্রীক জাতি এবং তাহাদের তৎপরতায় নূতন রূপ, সজীবতা ও প্রাণচাঞ্চল্য লইয়া যে বিজ্ঞানের জন্ম তাহাই গ্রীক বিজ্ঞান। গ্রীক জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্যের ইতিহাস স্বল্পস্থায়ী হইলেও তাহারা সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনে যে ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তক, ধারক ও বাহকরূপে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়, একাদিক্রমে সুদীর্ঘ নয় শত বৎসর তাহা ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে ও মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রকার মননশীলতার অন্তপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপও নির্বাপিত হয়, কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িকভাবে। খৃষ্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে গ্রীকদের প্রদর্শিত পথে ও গ্রীক গ্রন্থাদি অবলম্বনে আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে আশ্চর্য উন্নতি লাভ করে। আরবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই গ্রীক বিজ্ঞান অবলম্বনেই আবার ল্যাটিন ইউরোপীয় জাতিরা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে যত্নবান হয়। সুতরাং প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আদর্শ ও নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছিল তাহার জের টানিয়াই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি—ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই মত কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও অনস্বীকার্য নহে।

গ্রীকদের পূর্বে প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় জাতিরা অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর ধরিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছে। একেবারে প্রথম হইতে গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রাচীন জাতিদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের সৌভাগ্যের কথা প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, ফিনিশীয় এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্রোতধারা-এশিয়া মাইনরের ও ঈজিয়ান সাগরের নানা দ্বীপের গ্রীক উপনিবেশগুলিতে একের পর এক মিলিত হইয়া যে উর্বর ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল, গ্রীক মনীষার স্পর্শে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভিদ-শিশু দেখিতে দেখিতে মুকুলিত হইয়া উঠিল। গ্রীক বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃতির রহস্যপূর্ণ ব্যবহার ও তাহার নিয়মের স্বরূপ বুঝিবার একটি সুস্পষ্ট ও সচেতন প্রয়াস আমরা ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রকৃতির ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন তথ্য আবিষ্কারই যে যথেষ্ট নহে, এই ব্যবহারের পশ্চাতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা নেপথ্যে ক্রিয়াশীল এবং তাহার রহস্যভেদই যে বৈজ্ঞানিক সাধনার চরম লক্ষ্য—বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই আদর্শ গ্রীকরাই প্রথম প্রচার করে। গ্রীকদের বহু পূর্ব হইতে লোকে দাঁড়ি-পাল্লার সাহায্যে জিনিষপত্রের ওজন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ওজন করিবার এই পদ্ধতির পশ্চাতে কিরূপ নীতি বর্তমান তাহা

ব্যাবিলোনীয় বা মিশরীয় পণ্ডিতেরা বুঝিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। গ্রীকদের সময়ে সেই একই পদ্ধতিতে জিনিস পত্র ওজন করা হইত বটে, কিন্তু আর্কিমিডিস্ বলিলেন, দাঁড়ির আলম্বের (fulcrum) উভয়দিকে সমান দূরত্বে সমান ওজন ঝুলাইলেই সাম্য স্থাপিত হইবে, অথবা আলম্বের উভয় দিকে অসমান দূরত্বে যদি অসমান ওজনের বস্তু চাপান যায় তবে সাম্য রক্ষা করিতে হইলে অধিকতর ভারী বস্তুটিকে আলম্ব হইতে কম দূরত্বে রাখিতে হইবে এবং এই দূরত্বের অনুপাত বস্তুদ্বয়ের ওজনের ব্যস্ত অনুপাত (inversely proportional) হইবে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাবিলোনীয়েরা বা মিশরীয়েরা নিশ্চয়ই এই নীতির কথা অস্পষ্টভাবে জানিত, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। গ্রীকরা ঠিক এই জিনিসটা করিয়াই আনন্দ পাইয়াছে ও সকল শ্রম স্বার্থক মনে করিয়াছে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সহিত তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের এইখানেই পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের জন্য ব্যাবিলোনীয় বা মিশরীয় বিজ্ঞান ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। গ্রীকরা সুরু হইতেই তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী।

জরীপের কাজে এক প্রকার জ্যামিতির প্রয়োগ অপরিহার্য। সোজা ও বাঁকা রেখার বিচিত্র সমন্বয়ে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ, বৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত, পরাবৃত্ত প্রভৃতি বহুরকম চিত্রেরই উদ্ভব হয়। প্রাচীনেরা এইরূপ নানা রেখাচিত্রের সহিত পরিচিত ছিল। প্রয়োজনমত কতকগুলি চিত্রের নিয়ম কানুন আবিষ্কারেও তাহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু গ্রীকদের মত রেখার কারসাজি সম্বন্ধে তাহারা কখনও মাতিয়া উঠে নাই। গ্রীকরা পিরামিডও গড়ে নাই, জিগুরাটও বানায় নাই। তথাপি অকেজো রেখার যাদু তাহাদের পাইয়া বসিল। রেখাচিত্রের মধ্যে তাহারা অন্তহীন সমস্যার সন্ধান পাইল অথবা কাল্পনিক সমস্যার সৃষ্টি করিল এবং এই সব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন হইল এক একজন সাধকের সারা জীবনের সাধনা। এই সাধনা হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব।

জ্যোতিষে গ্রীকরা ব্যাবিলোনীয়দের মত পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যের পাহাড় সৃষ্টি করে নাই বটে, কিন্তু জ্যোতিষীয় পরিকল্পনার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম ও শৃঙ্খলা বুঝিবার চেষ্টায় তাহারাই অগ্রণী। ব্যাবিলোনীয়দের নিখুঁত পর্যবেক্ষণের পাশে তাহাদের উদ্ভট ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা চিন্তাশক্তির শোচনীয় দারিদ্র্যই শুধু ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে কাল্পনাপ্রবণ আয়োনীয় গ্রীক দার্শনিকেরা ব্যাবিলোনীয় পর্যবেক্ষণ অবলম্বনে সুরু হইতেই ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে দেখিবার ও বুঝিবার এবং তাহার ঘটনাবলীকে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম। সম্ভবতঃ গ্রীক বিজ্ঞানের এই বিশেষত্ব স্মরণ করিয়াই একদল ঐতিহাসিক গ্রীকদের আমল হইতে বিজ্ঞানে ইতিহাস সুরু করিবার পক্ষপাতী।

গ্রীক বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্য সত্যই বিস্ময়কর। সভ্যজাতি হিসাবে গ্রীকদের আবির্ভাবের প্রাথমিক ইতিহাসের মত তাহাদের মননশীলতার এই বিশেষত্বটুকুও রহস্যাবৃত্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীকদের আদি ইতিহাস বা প্রাক্-ইতিহাস সম্বন্ধে হিরোডোটাসের (৪৮৪-৪২৫ খৃঃ পূঃ) রচনাবলী বা হোমার-হেসিয়ডের পৌরানিক উপাখ্যানে উল্লিখিত তথ্যের বেশী কিছু জানা ছিল না। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে শ্লিম্যান, আর্থার ইভান্সপ্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা হইতে জানা যায় যে, ব্রোঞ্জ যুগে প্রায় সমগ্র ঈজিয়ান অঞ্চলে এক অতি উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। ক্রীটের নোসোস (Knossos) নামক স্থানে স্যার আর্থার ইভান্স যে সব প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, ক্রীট ছিল এই সভ্যতার অগ্রদূত ও আদি কেন্দ্র। ক্রীটের সভ্যতা বিকাশে মিশরের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ক্রীট

হইতে ব্রোঞ্জ সভ্যতা যে ক্রমে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা মিসিনের (Mycenae) প্রত্নতত্ত্বীয় ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। নোৎসাস ও মিসিনের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত পরবর্তীকালের গ্রীক সভ্যতার নানাবিধ মিল লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ঈজিয়ান অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক ব্রোঞ্জ সভ্যতা হইতে গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। মিসিনে অ্যাগামেম্‌ননের রাজপ্রাসাদ, ট্রয়ের নিকট হিসার্‌লিকে ট্রোজান যুদ্ধের প্রত্নতত্ত্বীয় ধ্বংসাবশেষ হইতে এখন জানা গিয়াছে যে, হোমারের মহাকাব্যের ভিত্তি একটি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী। সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ যুগের অবসানে খৃঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দের অনুরূপ সময়ে সমগ্র ঈজিয়ান অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সহিত সম্পূর্ণ এক নূতন জাতির বিরাট ও ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে নোসোস, মিসিনে প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু জনপদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই নবাগত বিজেতা জাতি লৌহের ব্যবহার করিত। হোমারের মহাকাব্যে এই বিজয়ী জাতি অ্যাকিয়ান নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার উইলিয়াম বিজওয়ে ও নৃতাত্ত্বিক ডাঃ হ্যাডনের মতে হোমারের অ্যাকিয়ানরা উত্তর হইতে, সম্ভবতঃ দানিয়ুব উপত্যকা হইতে আগত এক দীর্ঘকায়, গৌড়কেশ, সুদর্শন জাতি। তাহাদের লৌহ অস্ত্রের সঙ্গে ব্রোঞ্জ ব্যবহারকারী নোসোস ও মিসিনের অধিবাসীরা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।

উত্তর হইতে আরও একদল লৌহ ব্যবহারকারী জাতি ডোরিয়ানরা অ্যাকিয়ানদের পরাভূত করিয়া গ্রীসে ঈজিয়ান এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে। সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি জাতি প্রাগৈতিহাসিক কালের বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ঈজিয়ান এলাকাকে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল করিয়া থাকিবে। ব্রোঞ্জ যুগের স্থানীয় অধিবাসী ও উত্তর-পূর্ব প্রভৃতি নানাদিক হইতে আগত অ্যাকিয়ান, ডোরিয়ান, এড্‌লিয়ান প্রভৃতি বহু বিচিত্র জাতির সংমিশ্রণে সম্ভবতঃ গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং গ্রীকরা এক মিশ্র জাতি; গ্রীক সভ্যতা সেই মিশ্র-জাতির স্বাভাবিক, সংস্কারমুক্ত প্রবল তৎপরতার প্রকাশ। খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে হোমার যে বিজয়ী গ্রীক জাতির সমাজ ও জীবনযাত্রার চিত্র (সম্ভবতঃ এই চিত্র হোমারের দুই শত বৎসর আগেকার সমাজের চিত্র) অঙ্কন করেন তাহাতে আমরা এক আনন্দোচ্ছল, সৌন্দর্যপ্রিয়, কর্মপ্রবণ এবং হয়তো কিছু অহঙ্কারী ও উচ্ছৃঙ্খল জাতির পরিচয় পাই—'The picture of a race, false, boastful and licentious perhaps, but with a sense of beauty, a confident joy in life and a warmth of affection that bespeak a gallant, vigorous, open-hearted, conquering people; a people of extraordinarily brilliant intellctual endowment, placed in a land of glorious beauty, where the wine-dark sea brought the trade and knowledge of all the world to their doors.'*

ইলিয়ড ও অডিসিতে গ্রীক সভ্যতার প্রথম পর্বে জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা ও নানা ব্যবহারিক বিদ্যার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে গ্রীকরা এই সব বিদ্যায় ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্যজাতিদের যে বহু পশ্চাতে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুই মহাকাব্যে কতকগুলি নক্ষত্রের নাম, চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার উল্লেখ, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রায় ১৫০টি বিভিন্ন নাম ইত্যাদি অবশ্য পাওয়া যায়। ধাতুশিল্পী, সূত্রধর, কুম্ভকার, চর্মকার প্রভৃতি কারিগরদের এবং সুতাকাটা ও বয়নশিল্প, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, ইস্পাত,

---

* A History of Science—Sir William Cecil Dampier, Cambridge, 1948, p, 11.

পিতল প্রভৃতি ধাতু ব্যবহারেরও অনেক উল্লেখ আছে। ইহা হইতে ব্যবহারিক-বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিশর বা ব্যাবিলনের তুলনায় এক অনগ্রসর দেশের চিত্রই আমরা পাই। কিন্তু যে জন্য মহাকাব্যটি অতুলনীয় তাহা হইল ইহার মানবতার সুর। এক কল্পনাপ্রবণ তরুণ জাতির মনের সহজ অভিব্যক্তি। গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীর ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই মানবতা ও কল্পনাপ্রবণতা তাহাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থেই মূর্ত হইয়াছে। ইলিয়ডের প্রধান মৌলিকতা এই যে, কাব্যের নায়ক-নায়িকারা ঘটনা-স্রোতের অসহায় ক্রীড়নক নহে। তাহাদের বিবিধ চরিত্রই ঘটনাস্রোতকে নির্ধারিত করিয়াছে। কবির কল্পনায় নায়ক-নায়িকারা সব সময় ভাগ্যের খেলার পুতুল নহে, সময়ে সময়ে নিজের ভাগ্যের বিধাতাও তাহারা বটে। তাই নিজের ভাগ্য সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল অ্যাকিলিস। সম্মান ও খ্যাতিহীন দীর্ঘ জীবনের চেয়ে স্বল্পমেয়াদী গৌরবের জীবনও শ্রেয় ইহাই ছিল তাহার আদর্শ। অন্ধ ভাগ্যের পরিবর্তে পুরুষকারে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহাকবির নির্দেশ যেন শেক্সপিয়রের সেই অমর কথাগুলির মধ্যেই পুনর্বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে :

'Men at some time are masters of their fate :
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings' [Julius Caesar]

যাদুবিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্টবাদী মিশরীয় বা ব্যাবিলোনীয় কোন কবির পক্ষে এইরূপ চিন্তা অভাবনীয়। সর্বশক্তিমান পুরোহিত ও রাজন্যবর্গ শাসিত সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার যেখানে পদে পদে ব্যাহত সেখানে ভাগ্যের বিরুদ্ধাচরণের কথা নিরর্থক। গ্রীকদেরও দেব দেবী এবং মন্দির ছিল; কিন্তু সে দেব-দেবীরা মানুষেরই মত দোষে-গুণে পরিকল্পিত অতিমানুষ মাত্র। মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদের সৃষ্টি; মানুষের সুখে তাঁহারা সুখী, দুঃখে তাহাদের সমবেদনা। এইরূপ দেব-দেবীর পরিকল্পনায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

হোমারের মানবতার বাণী পরবর্তীযুগের চারণ কবিদের কাব্যে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আর্চিলোকাস, স্যাফো, অ্যালকিউসপ্রমুখ কবিদের গীতিকাব্যে ও চারণ-গাথায় মানুষের নানাবিধ তৎপরতা, তাহাদের বীরত্ব, আশা, আকাঙ্খা নানাভাবে রূপায়িত হইয়াছে। ইহা দেব-স্তুতি নহে, মানব-বন্দনা। মানুষকে বড় করিয়া দেখিবার এই প্রয়াস হইতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি; কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। 'দিনের আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত কর। আমাদের দেখিতে দাও। আমাদের বিনাশ করাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আলোকের মধ্যে বিনাশ কর।' যুদ্ধক্ষেত্র সহসা গভীর কুয়াশায় ঢাকা পড়িলে বীর শ্রেষ্ঠ অ্যাজাক্স্ এই বলিয়া জিউসের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। অন্ধকারে নয় আলোকে, অজ্ঞানতায় নয়, জ্ঞানের প্রদীপ্ত ছটায় আমরা যেন নিঃশেষিত হই। এই আলোকের সন্ধানেই গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের অভিযান। ফারিংটন লিখিয়াছেন :

'হোমার মানবতার সৃষ্টি করিল, আর সেই মানবতা হইতে উৎপত্তি হইল বিজ্ঞানের। জাতির শৈশবে যে দেব-দেবীর উৎপীড়নের দুঃস্বপ্ন চাপিয়া বসিয়াছিল, হোমার ইলিয়ডের মধ্য দিয়া মানুষকে সেই দুঃস্বপ্নের হাত হইতে মুক্তি দিল। মানুষকে শিখাইল নিজের দিকে ফিরিয়া দেখিতে, নিজেকে কতকটা ভবিতব্যের নিয়ামকরূপে মনে করিতে। জ্ঞানই ক্ষমতার উৎস, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মানুষ জ্ঞানের পথে আগাইয়া চলিল। কিন্তু দোলকের কাঁটা যখন উল্টামুখে মোড় ফিরিল,

মানুষ যখন তাহারই সৃষ্ট মূর্তির কাছে মাথা নত করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহা অপেক্ষাও মারাত্মক—নিজের লিখিত গ্রন্থকে স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্র বাণী বলিয়া মনে করিতে শিখিল, তখনই অবসান হইল মানবতার এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের।'*

* Science in Antiquity—Benjamin Farrington, pp. 37—38.

ফারিংটনের এই উক্তি শুধু গ্রীক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য নহে; বিভিন্ন সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্থান-পতনের ইহা এক প্রধান কারণ। ইতালীয় রেঁনেশার সময় চিত্রকর, ভাস্কর ও সাহিত্যিকদের চেষ্টায় এই মানবতার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেই ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আবার পূর্ণোদ্যমে সুরু হয়। বিগত শতাব্দীতে এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মরা গাঙে আবার জোয়ার আসিয়াছে।

তরঙ্গ বলবিদ্যা

শ্রীদিলীপকুমার ভদ্র

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড ও বোর সর্বপ্রথম পরমাণুর আভ্যন্তরীণ একটি ছবি কল্পনা করেন। সেটা হচ্ছে মোটামুটি এইরূপঃ কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন (যাদের সংখ্যা পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যার সমান) কতকগুলি নির্দিষ্ট চক্রাকার পথে পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এই কেন্দ্রকে আমরা মোটামুটিভাবে স্থির বলে ধরে নিতে পারি। বোর কয়েকটি সরল গাণিতিক সমাধানের পর দেখিয়েছিলেন যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট পথে ইলেকট্রনসমূহ কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে এবং কোন্ ইলেকট্রন কোন্ পথ অনুসরণ করবে তা তার শক্তির উপর নির্ভরশীল হবে। তাছাড়া, সমধর্মী বিদ্যুতাধানের দরুণ ইলেকট্রনগুলি পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে (কুলম্ব আইন অনুসারে) এবং তার ফলে তাদের অনুসৃত গতিপথে একটু গোলমালের সৃষ্টি হবে। ঠিক এ-রকম ব্যাপারই আমাদের সৌরজগতে দেখা যায়। এখানে কিন্তু সকল গ্রহই পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। সেজন্যে অনেকেই পরমাণুর এই ছবিকে প্ল্যানেটারী অ্যাটম্ বলে অভিহিত করে থাকেন।

কিন্তু পরমাণুর এই যে ছবি আমরা ক্ল্যাসিক্যাল বিজ্ঞান অনুসারে কল্পনা করে নিচ্ছি তার বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ আছে যা গ্রহ-উপগ্রহের বেলায় খাটে না। পরমাণুর বেলায় আমরা আগে থেকেই ধরে নিচ্ছি যে, আমরা প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের অবস্থান ও গতিবেগ সুন্দরভাবে নির্দেশ করতে পারি এবং আমরা ইলেকট্রনকে কোনও নির্দিষ্ট পথে তার গতি অনুসরণ করতে পারি, অন্ততঃ আমাদের মতবাদ অনুসারে তা সম্ভব, যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রত্যেক গ্রহকে তার গতিপথে আলাদাভাবে অনুসরণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, উপরোক্ত ধারণা দুটির কোনটাই সত্য নয়।

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হাইসেন্‌বার্গ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রখ্যাত প্রিন্সিপ্‌ল অব আন্‌সার্টেইনটি বা অনির্দেশ্যবাদে দেখিয়েছেন যে, ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনও কণিকা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যা

অনুসারে যতখানি সুনির্দিষ্ট হওয়ার কথা, তা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, আমরা এমন কোনও উপায় জানি না যার দ্বারা পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের গতিবেগ সূক্ষ্মভাবে মাপতে পারি কিংবা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে তার সঠিক অবস্থান জানতে পারি। এই যদি প্রকৃত ব্যাপার হয় তাহলে কোনও পরমাণুকে ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যা অনুসারে অতখানি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবার অধিকার আমাদের নেই এবং সেজন্যে কোনও ইলেকট্রনকে তার গতিপথে অনুসরণ করবার দুরাশা আমাদের ছাড়তে হবে।

সুতরাং আমাদের অন্য কোনও মতবাদের সাহায্যে পরমাণুকে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, দেখতে হবে এবং যাতে পরীক্ষামূলক তথ্যের সঙ্গে সেই মতবাদের মিল সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ঠিক এ-রকমই একটা নতুন মতবাদ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যার নাম দেওয়া হয়েছে, ওয়েভ মেকানিক্স, বাংলায় বলা যায় তরঙ্গ বলবিদ্যা বা সহজ কথায় তরঙ্গবাদ। এই তরঙ্গ বলবিদ্যা আধুনিক পদার্থবিদ্যার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান।

১৯২৬ সালে আরউইন শ্রডিংগার এই মতবাদ সর্বপ্রথম প্রচলন করেন। মোটামুটিভাবে দুটি প্রধান সত্যের উপর এর ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত :

ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম ও আমাদের জ্ঞানের অনির্দেশ্যতা।

কোনও কিছুর বস্তুধর্ম বা তরঙ্গধর্ম বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। তরঙ্গ বা বস্তুর অতি সাধারণ যে সকল ধর্ম তা সকলেরই জানা আছে। কোনও বস্তুখণ্ডের একটি নির্দিষ্ট সীমা বা আয়তন আছে এবং সে সেই আয়তনই ঠিক রাখবার চেষ্টা করে যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইরে থেকে কোনও কিছু ঘটছে। আর তরঙ্গের ধর্ম হচ্ছে যে, সে নিয়ত নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায় এবং নিজের আয়তন ক্রমশঃই বাড়িয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে; বস্তুর যেমন একটা পৃথক সত্তা আছে, তরঙ্গের কিন্তু তা নেই। বস্তু না থাকলে তরঙ্গের অবস্থান অসম্ভব, কেন না বস্তুর ভিতর দিয়েই তরঙ্গের পরিচয়। তরঙ্গ, শক্তি স্থানান্তরের একটি উপায় মাত্র। জলের উপর দিয়ে যখন তরঙ্গ যায় তখন জলের কণিকাগুলি তাদের সাধারণ অবস্থান-বিন্দু থেকে উপরে নীচে আন্দোলিত হতে থাকে ; তরঙ্গ যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে সেদিকে তাদের কোনও গতি থাকে না এবং যেই তরঙ্গটা বয়ে চলে যায় তখনই আবার তারা তাদের পুরনো অবস্থান-বিন্দুতে ফিরে আসে। কিন্তু তরঙ্গ যে শক্তি বয়ে নিয়ে যায় তা কণিকার এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে এক কণিকা থেকে অন্য কণিকায় ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে, এখানে শক্তির স্থানান্তর ঘটছে এবং পদার্থ স্থির আছে। আবার বস্তু নিজেও সঙ্গে করে শক্তি বয়ে নিয়ে যেতে পারে ; যেমন একটি বন্দুকের গুলি। এক্ষেত্রে গুলির গতিবেগের দরুণ একটা শক্তি আছে যা কোথায়ও বাধা পেলে তাপ বা আলো হিসাবে দেখা দিতে পারে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তরঙ্গ শক্তির গতিশীল রূপ মাত্র। তাছাড়া অন্যান্য সাধারণ কতকগুলি গুণাগুণ তরঙ্গকে বস্তু থেকে পৃথক করছে ; যেমন তরঙ্গের বেলায় বিসরণ (Diffraction), সমবর্তন Polarization) ইত্যাদি দেখা যায় ; কিন্তু পদার্থের বেলায় ওসব দেখা যায় না।

ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম আছে, একথা বলতে এটাই বোঝায় যে, অনেকক্ষেত্রে ইলেকট্রনের এমন অনেক গুণাগুণ প্রকাশ পায় যা তরঙ্গের গুণাগুণের সঙ্গে মিলে যায়। তাই বলে একথা আমাদের বলা ঠিক হবে না যে, ইলেকট্রন নিজেই একটি তরঙ্গশ্রেণী। বর্তমানে মানুষের বাস্তবজ্ঞানের মধ্যে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে ইলেকট্রনের প্রকৃতির তুলনা করা চলে।

এখন তরঙ্গবাদের সিদ্ধান্ত দুটির ব্যাপারে ফিরে যাওয়া যাক। ক্ল্যাসিক্যাল চিত্র অনুসারে, ইলেকট্রন একটি কণিকাবিন্দু এবং ইহাকে x, y, z এই তিন মাত্রার সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের গতিকে সময়ের সঙ্গে x, y, z-এর পরিবর্তন দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অনেকদিন আগে, ১৯০৪ সালে বিজ্ঞানী ডি. ব্রগ্‌লী আপেক্ষিকতাবাদমূলক কতকগুলি সূত্রের গাণিতিক অপরিবর্তনীয়তা (Invariance) থেকে দেখিয়েছিলেন যে, চলমান কোনও বস্তুকণিকার সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ ধরনের তরঙ্গ যেন বিজড়িত থাকে। এই সকল তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কণিকাটির ভরবেগের একটি সম্বন্ধ সেই সময় ব্রগ্‌লী আবিষ্কার করেন। এইসকল তরঙ্গের তাৎপর্য কি তা কিন্তু ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অজানাই রয়ে গেল! অবশেষে, ১৯২৭ সালে ডেভিসন ও জারমার এবং ১৯২৮ সালে জি. পি. টমসন পরীক্ষামূলকভাবে দেখান যে, ইলেকট্রনের একটি কিরণ রেখা তরঙ্গধর্ম দেখায় এবং উপযুক্ত একটি গ্রেটিং-এর (সাধারণতঃ একটি কৃষ্ট্যাল) ভিতর দিয়ে এর বিসরণও দেখা যায়। তাছাড়া এ থেকে ইলেকট্রনের যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাওয়া গেল তা ডি. ব্রগ্‌লীর সূত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এই সূত্রটি বস্তুপিণ্ড সম্বন্ধেও খাটে; তবে সে ক্ষেত্রে ভর এত বেশী হয়ে দাঁড়ায় (সুতরাং তরঙ্গদৈর্ঘ্য এত ছোট হয়ে যায়) যে, কোন্ জায়গায় তাদের তরঙ্গধর্ম অপেক্ষাকৃত প্রকট হচ্ছে তা ঠিক করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তবে যে ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বস্তুকণিকাটি যে জায়গায় অবস্থান করছে তার সমমাত্রিক হয় (যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর অভ্যন্তরে একটি ইলেকট্রন) তবে সে ক্ষেত্রে তার তরঙ্গধর্ম তার বস্তুধর্ম অপেক্ষা বেশী প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং তখন তরঙ্গ বলবিদ্যার সাহায্যে নির্ণয় করাই সমীচীন।

যদি তরঙ্গের অস্তিত্ব থাকে তবে তার একটি গাণিতিক সমীকরণও নিশ্চয় থাকবে; কারণ আলোকতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ ইত্যাদি প্রত্যেক রকম তরঙ্গের বেলায় একটি করে গাণিতিক সমীকরণ আছে। সুতরাং এটা ইলেকট্রন-তরঙ্গের বেলায়ও নিশ্চয়ই সত্য হবে। ইলেকট্রন-তরঙ্গের একটি গাণিতিক সমীকরণ প্রথম গড়ে তোলেন শ্রডিংগার। সেই তরঙ্গ-সমীকরণটির তাৎপর্য সম্বন্ধে এখনই কিছু বলে রাখা দরকার। মোটামুটিভাবে সেটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের সম্ভাব্যধর্ম সম্বন্ধে।

তরঙ্গ-সমীকরণের তাৎপর্য

হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ অনুসারে কোনও বস্তুকণিকা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ঠিক কোন্ জায়গায় অবস্থান করছে তা আমরা কখনই জানতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হয় যদি কোনও নির্দিষ্ট ঘনমানের মধ্যে কণিকাটির সম্ভাব্য অবস্থান ঠিক করতে পারি। গাণিতিক প্রথা অনুসারে এই সম্ভাবনাকে আমরা একটি নির্দিষ্ট সম্ভাব্যধর্মী অপেক্ষক (Probability function) দিয়ে নির্দেশ করব। এরূপ একটি অপেক্ষক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মান গ্রহণ করবে এবং এই মান কণিকাটিকে বিভিন্ন জায়গায় পাবার সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করবে। সুতরাং যেখানে এই অপেক্ষকটির মান সর্বাধিক সেখানে কণিকাটিকে পাবার সম্ভাব্যতাও সর্বাধিক। গাণিতিক পদার্থবিদ্যার মধ্যে সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা প্রকৃতির সেই মৌলিক নিয়মই মেনে নিচ্ছি যে, কোনও বস্তুকণিকা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কখনই চূড়ান্ত (absolute) হতে পারে না।

মতবাদগত তাৎপর্য উপস্থিত করবার আগেই এই সমীকরণের সমাধানের একটা চিত্রের উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। তরঙ্গ-সমীকরণের অগণিত সমাধান থাকতে পারে; কিন্তু কোনমতেই তাদের প্রত্যেকটির বস্তুগত তাৎপর্য থাকতে পারে না। যেগুলি

বস্তুগতভাবে সম্ভব নয় সেই সকল সমাধানকে বাদ দেওয়া হয়। যে সকল সমাধানকে স্বীকার করে নেওয়া হয় সেই সকল গ্রাহ্য সমাধান (Eigen function) কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম নিশ্চয়ই মেনে চলবে। পরমাণুতে আবদ্ধ কোনও ইলেকট্রনের বেলায় আমরা বলতে পারি যে, সব জায়গাতেই অপেক্ষকের কেবলমাত্র একটিই মান থাকবে এবং তা অবিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ হবে, তাছাড়া অপেক্ষকের মানের পরিবর্তনের হারও অবিচ্ছিন্ন থাকবে।

এ সব সর্তগুলি যদিও গাণিতিক দিক থেকে খুব সহজ এবং প্রকট তবুও এদের একটা বহুদূরব্যাপী ফলাফল আছে। তরঙ্গ-সমীকরণের মধ্যে ইলেকট্রনের মোট শক্তি নির্দেশক একটি সংখ্যা E আছে; সুতরাং এর সমাধানগুলিও E-র উপর নির্ভরশীল হবে। আমরা আগেই বলেছি যে, এই সকল সমাধানগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রাহ্য সমাধান আছে এবং এ থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, E-র কেবলমাত্র কতকগুলি নির্দিষ্ট মানের জন্যে বস্তুগত তাৎপর্য-বিশিষ্ট কতকগুলি নির্দিষ্ট তরঙ্গধর্মী অপেক্ষক আছে। এগুলিকে সাধারণতঃ ষ্টেশনারী ষ্টেট্ বা সুস্থিত অবস্থা বলা হয়, কারণ এ অবস্থায় বস্তুকণিকার মোট শক্তির মান বাইরে থেকে কোনও রকম পরিবর্তন না ঘট্‌লে সর্বদা একই থাকে। এই রকম অবস্থায় আমরা প্রমাণ করতে পারি যে, তরঙ্গধর্মী অপেক্ষকের বর্গের মান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনও রকমে পরিবর্তিত হবে না; কেবলমাত্র এই সকল সুস্থিত অবস্থাতেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকবে। কোনও নির্দিষ্ট সুস্থিত অবস্থায় থাকবার জন্যে কোনও বস্তুকণিকার যতটুকু শক্তি থাকা প্রয়োজন তাকে ইংরেজীতে আইগেন্ ভ্যালু (Eigen value) বলা হয়।

কোনও বস্তুকণিকার শক্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট মানের জন্যে যেসব নির্দিষ্ট সুস্থিত অবস্থা থাকবে তা তরঙ্গবাদ থেকে আপনাআপনিই এসে যাচ্ছে এবং এতে কোয়াণ্টাম মতবাদের কোনও রকম সর্তের সাহায্যই আমরা নিচ্ছি না, যা বোর তাঁর সর্বপ্রথম মতবাদে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমরা যদি আর একটু অগ্রসর হই তাহলে বোরের কোয়াণ্টাম মতবাদের উপর তরঙ্গবাদের আর এক জায়গায় সাফল্য দেখতে পাব। সেটা হচ্ছে এই: হাইড্রোজেন পরমাণুর বেলায় বোরের মতবাদ ইলেকট্রনের বিভিন্ন শক্তির জন্যে বিভিন্ন কয়েকটি সুস্থিত অবস্থার কথা বলেছিল, যেগুলি পরে পরীক্ষায় সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তরঙ্গবাদও সে সব সুস্থিত অবস্থার কথা সঠিকভাবেই বলেছে। কিন্তু হিলিয়াম পরমাণুর বেলায় যেখানে তরঙ্গবাদ ঠিক ঠিকভাবে তার বিভিন্ন সুস্থিত অবস্থার কথা বলতে পেরেছে সেখানে বোরের মতবাদ অনেকগুলি ভুল করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যতই পরমাণুর আভ্যন্তরীণ জটিলতা বাড়ছে ততই বোরের মতবাদ ভেঙ্গে পড়ছে। সুতরাং এই দিক দিয়ে আমরা ধরে নিতে পারি যে, তরঙ্গবাদ বর্তমানে সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ইলেকট্রনের তড়িতাবিষ্ট মেঘ কল্পনা

অনেক বিজ্ঞানী তরঙ্গধর্মী অপেক্ষকের একটা অন্যরকম বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তরঙ্গবাদ অনুসারে যে কোনও চলমান বস্তুকণিকাকে একটি তরঙ্গ-সমীকরণ দ্বারা বিবৃত করা চলে এবং ঐ সমীকরণের সমাধান হচ্ছে একটি তরঙ্গধর্মী অপেক্ষক। কিন্তু এখন যে ব্যাখ্যাটির কথা বলা হবে সেটা যদিও বস্তুগতভাবে অনেক সহজবোধ্য, তথাপি পদার্থ-বিদ্যার দিক থেকে সেটা কিন্তু ততটা যথার্থ নয়। উদাহরণস্বরূপ একটি ইলেকট্রন নিয়ে এটার ব্যাখ্যা করব। এই নতুন ব্যাখ্যা অনুসারে ধরে নেওয়া হয় যে, ইলেকট্রনটি একটি মেঘখণ্ডের

মত একটু জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এইরূপ একটি মেঘকে আমরা তড়িতাবিষ্ট মেঘ বলতে পারি এবং এই মেঘের কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে বিদ্যুতাধানের যে ঘনত্ব তা সেই অপেক্ষকের বর্গের সমানুপাতিক। যেখানে সেই রাশির মান সর্বাধিক সেখানে বিদ্যুতাধানের ঘনত্বও সর্বাধিক এবং সেই বিন্দুতেই ইলেকট্রনের নেগেটিভ বিদ্যুতাধানের মোটা অংশ রয়েছে। এর সঙ্গে আমাদের পূর্বেকার ব্যাখ্যার পার্থক্য এই যে, যেখানে আমরা আগে গাণিতিক সম্ভাব্যতার ঘনত্বের কথা বলেছি সেখানে এখন বাস্তব বিদ্যুতাধানের ঘনত্বের কথা বলছি। কিন্তু কেবল একটিমাত্র ইলেকট্রনই সমগ্র পরমাণু কিংবা অণুর অভ্যন্তরস্থ সবটা জায়গা (যার ব্যাস হচ্ছে প্রায় $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার) দখল করে থাকতে পারে না; সেজন্যে এই তড়িতাবিষ্ট মেঘ কল্পনা যদিও খুব সাহায্যকারী তবুও সেরূপ সঠিক নয়। বর্তমানে কেবলমাত্র সম্ভাব্যতা সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাটিরই প্রচলন আছে। শেষোক্ত ব্যাখ্যাটির আবিষ্কর্তা হচ্ছেন বোর্ন, পলি, জর্ডান, হাইসেনবার্গ, ডিরাক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু এই দু-রকমের ব্যাখ্যার একটা যোগাযোগ নিম্নলিখিতভাবে গড়ে তোলা যায়। ধরে নেওয়া যাক যে, কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ইলেকট্রনটি ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করছে তা কোনও রকমে বার করতে পেরেছি এবং আমরা তার অবস্থান একটি ত্রি-মাত্রিক ক্ষেত্রে একটি বিন্দুর দ্বারা নির্দেশ করছি। মনে করা যাক, আমরা এই পরীক্ষাটাই অনেক বার ধরে করছি এবং ত্রি-মাত্রিক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের পর পর অবস্থান একটি উপযুক্ত বিন্দুর দ্বারা নির্দেশ করছি।* যদি বিন্দুগুলি এতই ক্ষুদ্র হয় যে, একটা থেকে আর একটাকে আলাদা করে বোঝবার কোনও উপায় নেই, তা হলে সেই ত্রি-মাত্রিক ক্ষেত্রে বিন্দুগুলি মোটামুটি একটি মেঘখণ্ডের মতই দেখাবে। এই মেঘখণ্ডের সেই সেই অংশগুলি সবচেয়ে ঘন হবে যেখানে নির্দেশক বিন্দুর সংখ্যা সর্বাধিক। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে যদি ইলেকট্রনের অবস্থিতি জানবার জন্যে আমরা কোনও একটি পরীক্ষা করি তবে ইলেকট্রনটিকে ঐ সর্বাধিক ঘন অংশে পাবার সম্ভাব্যতা সর্বাপেক্ষা বেশী। সুতরাং, এই মেঘখণ্ডের ঘনত্ব সোজাসুজিভাবেই তরঙ্গধর্মী অপেক্ষকের মান নির্দেশ করছে। ইলেকট্রনের তড়িতাবিষ্ট মেঘ কল্পনা যদিও প্রচলিত নয় তবুও মাঝে মাঝে এটা খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায় যে, কোনও ইলেকট্রনের Ψ কেবলমাত্র পরমাণুর অভ্যন্তরেই আবদ্ধ নয় বরঞ্চ সেটা পরমাণুর কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, পরমাণু থেকে অনেক দূরেও ইলেকট্রনকে পাবার একটি নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা রয়েছে। যদি পরমাণু কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ২×১০^{-৮} কিংবা ৩×১০^{-৮} সেন্টিমিটারের বেশী হয় তবে সেই সম্ভাব্যতার মান অত্যন্ত কমে যায়। সুতরাং নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ইলেকট্রনকে পাবার এই যে সম্ভাব্যতা তার বিশেষ কোনও রকম তাৎপর্য নেই। যদি আমরা এখন ইলেকট্রনের তড়িতাবিষ্ট মেঘ কল্পনাকে কাজে লাগাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে, Ψ-এর জন্যে এমন একটি সীমাসূচক রেখা (Contour) আছে যার অভ্যন্তরভাগেই ইলেকট্রনের মোট বিদ্যুতাধানের ৯০%—৯৯% থাকে। এরূপ একটি সীমাসূচক রেখাকে আমরা কোনও নির্দিষ্ট সুস্থিত অবস্থায় ইলেকট্রনের পরিসীমা বলতে পারি। অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুর বিভিন্ন সংস্থানের উপর ইলেকট্রনের পরিসীমাবিশিষ্ট এই সকল আকৃতির অনেক প্রভাব আছে।

পরমাণু-কেন্দ্রের যে সকল সমস্যায় (যা

* প্রকৃতপক্ষে এরূপ একটি ক্ষেত্রকে ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল বলবিদ্যায় একটি 'ফেজ্ স্পেস্' বলা হয় সাধারণতঃ যার মাত্রা হচ্ছে ৬N যেখানে N-এর মান ১ কিংবা ততোধিক।

ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ একেবারেই পারে নি) তরঙ্গবাদ সফলতা দেখিয়েছে তা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে :

(১) সেই সকল সমস্যা যেখানে কোনও কারণে কেবলমাত্র কেন্দ্রের নিকটবর্তী কুলম্ব আকর্ষণ বা বিকর্ষণই সবচেয়ে প্রকট। এই অংশের মধ্যে আমরা ফেলতে পারি—তেজস্ক্রিয় পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু থেকে আলফা-কণিকার নির্গমন, কেন্দ্রের অভ্যন্তরে গামারশ্মির জন্ম ; এমন কি, কেন্দ্র থেকে বিটা-কণিকার নির্গমন।

(২) সেই সকল সমস্যা যেখানে পরমাণু-কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে পারস্পরিক বলের জন্যে কোনও একটা নির্দিষ্ট অনুমান করে নেওয়া হয় এবং এই অনুমানের ফলাফল জানবার জন্যে তরঙ্গবাদের ব্যবহার করা হয়।

(৩) সেই সকল সমস্যা যেগুলি পরমাণু-কেন্দ্রের বিভিন্ন শক্তিজনিত বিভিন্ন সুস্থিত অবস্থার পার্থক্যকে নিয়ে। এগুলি কেন্দ্রবস্তুর পারস্পরিক বলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না।

এই তো গেল পরমাণু-কেন্দ্রের দিক, তাছাড়া আধুনিক পদার্থবিদ্যার আরও অনেক সমস্যা আছে যা তরঙ্গবাদের সাহায্যে সমাধান করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি অণু সৃষ্টির কথা। কি উপায়ে এবং কেন কতকগুলি নির্দিষ্ট পরমাণু একটি নির্দিষ্ট অণুর সৃষ্টি করে তা তরঙ্গবাদ অনেকখানি সমাধান করেছে। থিয়োরি অব সলিড্‌স্-এর সবটাই তরঙ্গবাদ আবিষ্কারের পর রচিত হয়েছে। কঠিন পদার্থের ভিতরকার অবস্থা এবং কি করে পদার্থের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ চলতে পারে এবং কোনও কোনও পদার্থের উপর আলোক পড়লে কেনই বা ইলেকট্রন নির্গত হয় তারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা তরঙ্গবাদ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল বলবিদ্যার সাহায্যে দিতে পেরেছে। তাছাড়া অন্যান্য যে সকল সমস্যা—যেমন জিম্যান্ এফেক্ট, যেগুলি ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যা আগেই সমাধান করেছিল, সেগুলিও স্পষ্টভাবেই তরঙ্গ বলবিদ্যা সমাধান করেছে।

টানেল এফেক্ট

উপসংহারের পূর্বে টানেল এফেক্ট এর কথা
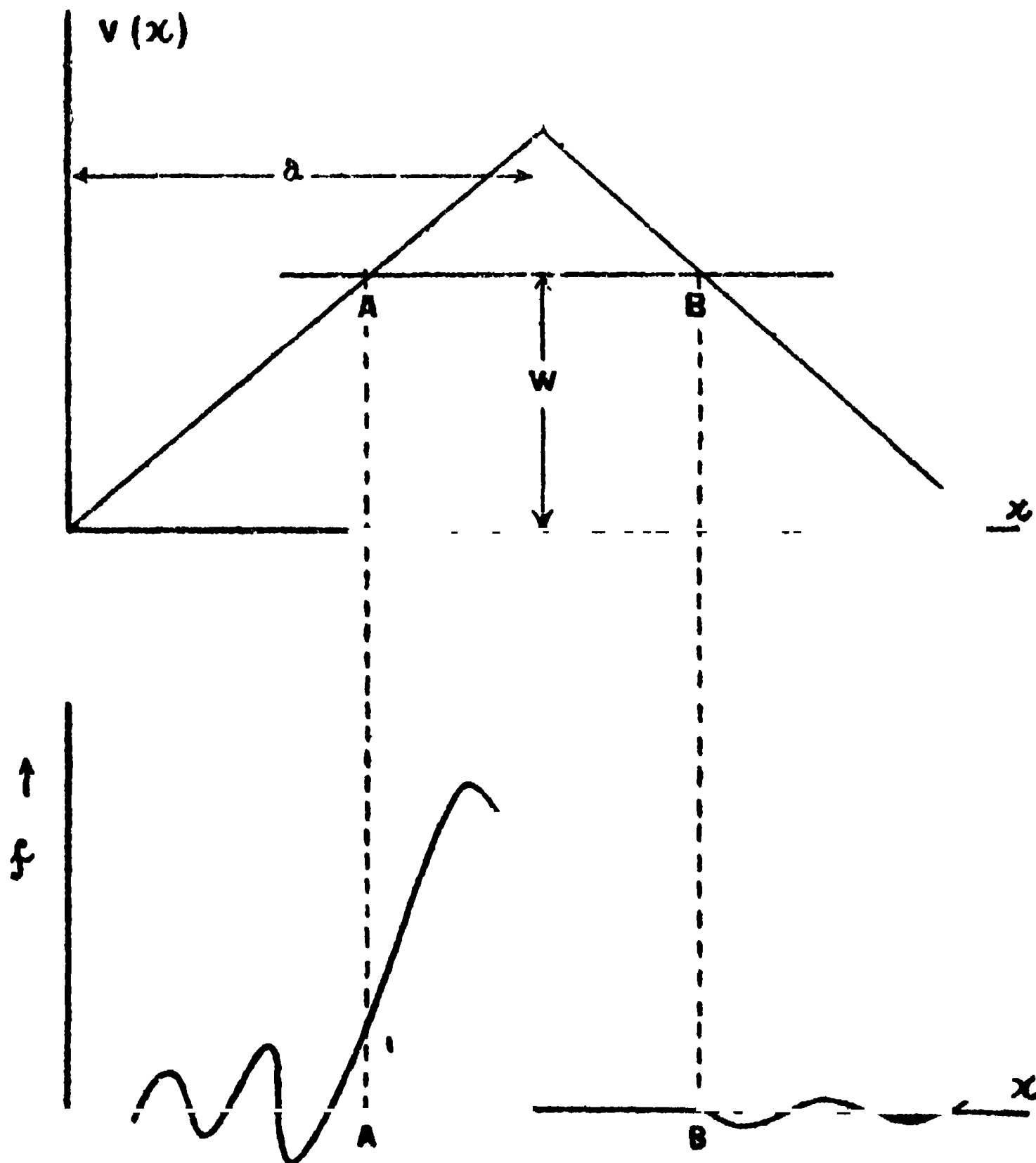
স্থৈতিক বাধার অনুসিদ্ধান্তটি যেরূপ হবে

একটু বল্তে হবে, কারণ তরঙ্গ বলবিদ্যার সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যার একটা মূলীভূত পার্থক্য আছে যা না বললে তরঙ্গবিদ্যার গুরুত্ব সম্যকরূপে বোঝা যায় না। টানেল এফেক্ট বোঝবার আগে স্থৈতিক বাধা (Potential barrier) কি, তা আমাদের বুঝতে হবে।

যদি V এবং W যথাক্রমে ইলেকট্রনের স্থৈতিক শক্তি ও মোট শক্তির মান নির্দেশ করে, তাহলে স্থৈতিক বাধা এমন একটি জায়গা যেখানে V, W-এর থেকে বড় এবং যার দুধারেই V, W-এর চেয়ে ছোট। ছবিতে এটা পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যা অনুসারে এরকম একটি বাধার উপর কোনও কণিকা এসে পড়লে তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাবে। তরঙ্গ বলবিদ্যা অনুসারে কিছুসংখ্যক কণিকা বাধা ভেদ করতে পারবে এবং অপর দিকে বেরিয়ে আসবে। তরঙ্গ বলবিদ্যার এই অনুসিদ্ধান্তকে সাধারণতঃ টানেল এফেক্ট বলা হয়।

এই টানেল এফেক্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তরঙ্গ বলবিদ্যার নানাপ্রকার সমস্যায় একে ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন—

(১) তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কেন্দ্র থেকে আল্ফা কণিকা নির্গমন,

(২) শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাবে ধাতব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নির্গমন ও

(৩) অক্সাইডের আবরণের দ্বারা পৃথকীকৃত দুটি ধাতব পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের গমন ইত্যাদি। তাছাড়া, অধুনা পরমাণু কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুকৃতি স্থির করবার বেলায়ও এই টানেল এফেক্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তরঙ্গ বলবিদ্যার সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল বলবিদ্যার এরূপ অনেক মূলগত পার্থক্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ সর্বাপেক্ষা সহজ টানেল এফেক্টের কথা উল্লেখ করা হলো। তরঙ্গ বলবিদ্যা বর্তমান কয়েক বছরের মধ্যে আশাতীত উন্নতি লাভ করেছে এবং অণু সৃষ্টিতে ও পরমাণু-কেন্দ্রের ব্যাখ্যায় আশাপ্রদ সফলতা লাভ করেছে। তরঙ্গবাদের গাণিতিক ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় কিন্তু অত্যন্ত জটিল, সেজন্যে নানাবিধ ক্ষেত্রে এর চমকপ্রদ সাফল্যের কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

মাতৃ দুগ্ধ বনাম গোদুগ্ধ

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

ভূমিষ্ঠ হইবার পর জীবন ধারণের জন্যে মাতৃস্তন্যই শিশুর একমাত্র অবলম্বন। মাতৃদুগ্ধ পাওয়া সম্ভব না হলে মানব শিশুকে গোদুগ্ধের উপরই নির্ভর করতে হয়। মাতৃদুগ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল উপাদানই কম-বেশী আছে। যেমন কম আছে ভিটামিন-ডি, রিবোফ্ল্যাভিন, লৌহের পরিমাণ আছে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণও প্রয়োজনানুরূপ নয়। তাই আধুনিক পৌষ্টিক বিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা গেছে যে, মাতৃদুগ্ধ মানব-শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুষ্টিকর যে কয়টি উপাদান মানব-শিশুর প্রথম অবস্থায় প্রয়োজন তাদের কয়েকটি হয় তো মাতৃদুগ্ধে ও গো-দুগ্ধেও নেই, অথবা থাকলেও হয়তো প্রয়োজনীয় পরিমাণের কম আছে। কাজেই মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ কোনটিকেই মানব-শিশুর আদর্শ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে একটু আপত্তি আছে। শিশুর বেঁচে থাকা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে শুধু দুধ—তা মাতৃদুগ্ধই হোক, আর গোদুগ্ধই হোক, কখনই আদর্শ খাদ্য নয়। উহাদের মধ্যে যে সব উপাদান নেই বা পরিমাণে কম সেগুলি অন্যান্য খাদ্যের সমবায়ে বা ওষুধরূপে মিশিয়ে নিতে হয়, যাতে সব কয়টি উপাদানই ঠিক ঠিক পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে।

মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ গ্রহণের ফলে এবং উহাদের পৌষ্টিক মানের দিক দিয়ে শারীরিক অবস্থা কেমন হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে তাদের তুলনামূলক আলোচনাই করা হলো।

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন উপাদানের দৈনিক পরিমাণ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, তুলনার সুবিধার জন্যে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো :—

তালিকা ১

বয়স	প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনে খাদ্য তাপ	প্রোটিন গ্র্যাম	ক্যালসিয়াম গ্র্যাম	লৌহ গ্র্যাম	ভিটামিন-এ আন্তঃ ইউনিট	থিয়ামিন মিলিগ্র্যাম	রিবোফ্ল্যাভিন মিলিগ্র্যাম	নিয়াসিন মিলিগ্র্যাম	ভিটামিন-সি মিলিগ্র্যাম	ভিটামিন ডি আন্তঃ ইউনিট
১ বৎসরের কম	১১০	৩.৫/প্রতি কিলোগ্র্যাম	১.০	৬	১৫০০	০.৪	০.৬	৪	৩০	৪০০
১-৩ বৎসর (১২ কিলোগ্র্যাম)	১০০	৪০	১.০	৭	২০০০	০.৬	০.৯	৬	৩৫	৪০০

[আমেরিকার Food and Nutrition Board, National Research Council-এর ১৯৪৮ সালের সংশোধিত তালিকা থেকে গৃহীত।]

মাতৃদুগ্ধ এবং গোদুগ্ধে শতকরা কি পরিমাণ শর্করা, চর্বি এবং প্রোটিন আছে, তা নিম্নে দেওয়া হলো—

তালিকা ২

দুধ	প্রতি আউন্সে খাদ্য-তাপ	শর্করা %	চর্বি %	মোট প্রোটিন %	ল্যাক অ্যাল্‌বুমেন %	কেসিয়ন %
মাতৃ-দুগ্ধ	২০	৬'৮-৭'৫	৩'৫	১'৩৫	০'৭৫	০'৫
গো-দুগ্ধ	২০	৪'৭	৩'৫	৩'৪	০'৫০	৩'০

এ কথা বলা প্রয়োজন যে, দুগ্ধবতী মাতা কিংবা গাভীর আহার্য ও স্বাস্থ্যভেদে এবং দেহস্থ গ্রন্থি-সমূহের গোলযোগের ফলে মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধে প্রায় সব কয়টি উপাদানেরই পরিমাণের কম-বেশী হয়। এমন কি, একই মাতা বা একই গাভীর দুগ্ধ দিনের সব সময়ে এক রকমের হয় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দুধের উপাদানের পরিমাণ কিছু ইতর-বিশেষ হয়।

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যায় যে, খাদ্য-তাপের দিক দিয়ে মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ প্রায় সমান। খাদ্য-তাপের দিক দিয়ে মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধের পার্থক্য এই যে, মাতৃদুগ্ধের সম্পূর্ণ খাদ্য-তাপের প্রায় ৫০% পাওয়া যায় উহার চর্বি থেকে, আর গোদুগ্ধের মোট খাদ্য-তাপের প্রায় ৩৫% পাওয়া যায় উহার চর্বি থেকে।

শর্করার দিক থেকে উহাদের পার্থক্য হয় শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে। উভয় দুগ্ধের শর্করা ল্যাকটোজরূপে আছে।

মাতৃদুগ্ধে চর্বির পরিমাণ কম-বেশী হয়। উহা কমপক্ষে ২'৪% এবং ঊর্ধ্বপক্ষে ৬'২% পর্যন্তও হতে পারে। শিশুর জন্মের পর প্রথম কয়েকদিন মাতৃদুগ্ধে চর্বির পরিমাণ কম থাকে। যতই দিন যায়, ক্রমশঃ এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। তাই মাতৃদুগ্ধে উহা গড়ে ৩'৫% ভাগ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। আর গোদুগ্ধের চর্বিও কম-বেশী হয়। গাভীর প্রসব সংখ্যা যতই বাড়ে, চর্বির পরিমাণ ততই বেশী হয়; অর্থাৎ বয়স্ক গাভীর দুধে চর্বির পরিমাণ বেশী থাকে। গোদুগ্ধে মাতৃ-দুগ্ধ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে (পামিটিক ও ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড বেশী থাকে; কিন্তু ওলেয়িক অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে)। মাতৃদুগ্ধের চর্বি গোদুগ্ধের চর্বি অপেক্ষা সহজ-পাচ্য। কারণ গোদুগ্ধের চর্বির বিন্দুগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং ফলে উহারা কম শোষিত হয় এবং পরিপাক নালীর নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করে।

শিশুর বৃদ্ধির জন্যে যে পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড এবং প্রোটিন দরকার তা মাতৃদুগ্ধে ও গোদুগ্ধে আছে। তবে জৈবিক ক্ষমতার দিক দিয়ে মাতৃদুগ্ধের প্রোটিন গোদুগ্ধের প্রোটিন অপেক্ষা সমৃদ্ধ। মাতৃদুগ্ধের প্রোটিনের প্রায় তিন পঞ্চমাংশ ল্যাকঅ্যালবুমেন, বাকীটা কেসিয়ন; আর গোদুগ্ধের চার-পঞ্চাংশ কেসিয়ন এবং বাকীটা ল্যাক্‌অ্যালবুমেন।

মাতৃদুগ্ধের প্রোটিন দ্বারাই বর্ধিষ্ণু শিশুর প্রোটিন-প্রয়োজন সাধিত হয়। প্রতি কিলোগ্র্যাম দেহের ওজনে শিশু মাতৃদুগ্ধ থেকে প্রায় ২-২'৫ গ্র্যাম করে প্রোটিন পায়। যেহেতু দেহে নাইট্রোজেন প্রোটিন ছাড়া অন্য কোন যৌগিক সহযোগে থাকে না সেহেতু অধিক প্রোটিনযুক্ত গোদুগ্ধ গ্রহণের ফলে দেহে নাইট্রোজেনের পরিমাণ

বেশ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়—মাতৃগর্ভে থাকবার অবস্থা থেকে ক্রমে বাড়তে থাকে। কিন্তু কম প্রোটিনযুক্ত মাতৃদুগ্ধ গ্রহণ করলে দেহের নাইট্রোজেনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না বরং কমতে থাকে। গো-দুগ্ধপায়ী শিশুর দেহ-পেশীতে প্রোটিন বেশী থাকে। খুব বেশী পরিমাণে গোদুগ্ধ গ্রহণকারী শিশুর পেশীতে মাতৃস্তনপায়ী শিশুর পেশী অপেক্ষা কখনও কখনও প্রায় ২৫% বেশী প্রোটিন থাকে।

মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধে শতকরা কি পরিমাণ খনিজ দ্রব্য আছে তার একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হলো :—

তালিকা ৩

দুগ্ধ	মোট খনিজ	ক্যালসিয়াম	ম্যাগ্নেসিয়াম	পটাসিয়াম	সোডিয়াম	ফস্‌ফরাস	সালফার বা গন্ধক	ক্লোরিন	আয়রন বা লৌহ	কপার বা তাম্র
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
মাতৃদুগ্ধ	০'২০	০'০৩৪	০'০০৫	০'০৪৮	০ ০১১	০ ০১৫	০'০০৩৬	০ ০৩৬	০'০০০১	০'০০০০৩
গোদুগ্ধ	০ ৭৫	০'১২২	০'০১৩	০'১৫৪	০'০৬০	০'০৯০	০'০৩১	০'১১৬	০ ০০০০৪	০'০০০০২

মাতৃদুগ্ধের চেয়ে গোদুগ্ধে প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশী খনিজ দ্রব্য আছে। তবে প্রায় ৩।৪ মাস পর্যন্ত শিশুর যে পরিমাণ খনিজদ্রব্য দরকার তা মাতৃদুগ্ধ থেকেই পাওয়া যায়। তারপর অন্যান্য খাদ্যের সহযোগে খনিজদ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো দরকার।

যদিও গোদুগ্ধে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী ক্যালসিয়াম থাকে তবুও শিশু মাতৃদুগ্ধ থেকেই গোদুগ্ধের চেয়ে বেশী ক্যালসিয়াম শোষণ করে থাকে। কিন্তু গোদুগ্ধ গ্রহণের পরিমাণ বেশী বলে গোদুগ্ধ থেকেই দেহে বেশী ক্যালসিয়াম সঞ্চিত হয়। জন্মের পর প্রায় দু মাস যাবৎ উভয় প্রকার দুধেই শিশুর দেহে পূর্বসঞ্চিত ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে। কিন্তু এভাবে কমা হ্রাস পায় গো-দুগ্ধের বেলায়, মাতৃদুগ্ধের বেলায় নয়। যে সব শিশু অকালে জন্মায় তাদের দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কম থাকে এবং তাদের কোমলাস্থি বা রিকেট্‌স্‌ হওয়ার সম্ভাবনা। শিশুর জন্যে ক্যালসিয়াম-প্রধান খাদ্যের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধের এ অভাব দূর করা সম্ভব নয়। গো-দুগ্ধ পানের ফলে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়। এই ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি দেহের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, বরং অসুখে-বিসুখে এই সঞ্চিত ক্যালসিয়াম ব্যয়িত হতে পারে। তবে মাতৃস্তনপায়ী শিশু কম ক্যালসিয়াম নিয়েও বেশ স্বাভাবিকভাবে বাড়ে—বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।

গোদুগ্ধে মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা প্রায় ৬ গুণ বেশী ফস্‌ফরাস আছে। তবে মাতৃদুগ্ধ থেকে শিশু অপেক্ষাকৃত বেশী ফস্‌ফরাস শোষণ করতে পারে। দেহের প্রয়োজনীয় ফস্‌ফরাসের পরিমাণ গৃহীত ক্যালসিয়াম এবং নাইট্রোজেনের উপর নির্ভরশীল। মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণ ফস্‌ফরাস আছে তাই শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। মাতৃদুগ্ধ থেকে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও নাইট্রোজেন গৃহীত হয় তার জন্যে যতটুকু ফস্‌ফরাস দরকার তা মাতৃদুগ্ধ থেকেই পাওয়া যায়। গোদুগ্ধে ফস্‌ফরাস বেশী আছে বলে যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশী গৃহীত হয় এবং প্রস্রাবের সঙ্গে বেশীটুকু বেরিয়ে যায়। প্রায় ৬০-৭০% ফস্‌ফরাস

গোদুগ্ধপায়ী শিশুর প্রস্রাবের সঙ্গে বার হয়। পক্ষান্তরে মাতৃস্তনপায়ী শিশুর প্রস্রাবে সামান্য পরিমাণেও ফস্‌ফরাস বাহির হয় না।

গোদুগ্ধ অপেক্ষা মাতৃদুগ্ধে প্রায় আড়াই গুণ বেশী লৌহ থাকে। জন্মের সঙ্গে যে পরিমাণ লৌহ থাকে তাতে প্রায় তিন মাস লৌহ গ্রহণ না করলেও চলে। তবে তিন মাস পরে গোদুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করলেও দেহে সঞ্চয়ের পরিমাণ কিছুই বাড়ে না। পক্ষান্তরে মাতৃদুগ্ধ গ্রহণের ফলে লৌহের পরিমাণ বাড়ে এবং রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তবে ৬ মাস পরে লৌহ-প্রধান খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। উভয় প্রকার দুগ্ধ পানের ফলে খুব কম ক্ষেত্রেই রক্তাল্পতা দেখা দেয়; কিন্তু গোদুগ্ধপায়ী শিশু অপেক্ষা মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশুর খুব দেরীতে রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন-ডি ছাড়া প্রায় সব ভিটামিনই উভয় দুগ্ধে কম-বেশী থাকে। নিম্নের তালিকাতে এদের তুলনামূলক পরিমাণ দেওয়া হলো:—

তালিকা ৪

প্রতি ১০০ গ্রাম দুধে বিভিন্ন ভিটামিনের পরিমাণ

দুধ	ভিটামিন-এ	ক্যারোটিন	থিয়ামিন	রিবোফ্লাভিন	নিয়াসিন	ভিটামিন সি	ভিটামিন-ডি
	মাইক্রোগ্র্যাম	মাইক্রোগ্র্যাম	মিলিগ্র্যাম	মিলিগ্র্যাম	মিলিগ্র্যাম	মিলিগ্র্যাম	আন্তঃ ইউঃ
মাতৃদুগ্ধ	৬৫	২৫	০·০১৩	০·০৪	০·১	৬·৪	০·৪ — ১০
গোদুগ্ধ	৩৩	৩০	০·০৪৫	০·২০	০·১	১·৮	০·৩ — ৪·৪

তালিকা ৫

অ-প্রধান ভিটামিনসমূহ: (প্রতি ১০০ গ্রাম দুধে)

দুগ্ধ	প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড	পিরিডক্সিন	বায়টিন	ইনিসিটল	ফোলিক অ্যাসিড
	মাইক্রোগ্র্যাম	মাইক্রোগ্র্যাম	মাইক্রোগ্র্যাম	মাইক্রোগ্র্যাম	মাইক্রোগ্র্যাম
মাতৃদুগ্ধ	১৮৩	৪	০ ৮	৩৩	৪৫
গোদুগ্ধ	৮৫	৬৭	৩	১৮	৫

যদিও ৪নং তালিকা অনুসারে মাতৃদুগ্ধে গোদুগ্ধের চেয়ে বেশী ভিটামিন-এ আছে তথাপি প্রসূতির খাদ্যের পুষ্টি-অপুষ্টি অনুসারে মাতৃদুগ্ধে ভিটামিন-এর পরিমাণের তারতম্য হয়। তাই উহাতে গোদুগ্ধের সমান ভিটামিন-এ থাকে বলে ধরা যেতে পারে। খাদ্য-তাপ মিটাবার জন্যে যে পরিমাণ গোদুগ্ধের প্রয়োজন তাতেই ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন মিটে যায়।

ভিটামিন-এ'র মত থিয়ামিনও মায়ের খাদ্যের তারতম্যে কম-বেশী হয়। যে সব মায়ের স্তনে দুধের পরিমাণ বেশী তাদের দুধে থিয়ামিনের পরিমাণ বেশী থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই মাতৃদুগ্ধের থিয়ামিনের পরিমাণ গোদুগ্ধের পরিমাণের সমান হয়। দুগ্ধদানের সময় প্রথম দু-সপ্তাহে মাতৃদুগ্ধে কম থিয়ামিন থাকে (১০০ শত সি. সি তে প্রায় ০·০১০ মিলিগ্র্যাম)। আড়াই বা তিন মাস পরে ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে উহা প্রায় প্রতি ১০০ সি. সি তে ০·০২০ মিলিগ্র্যাম হতে পারে। টাট্‌কা গোদুগ্ধে প্রায় ০·০৪০ থেকে ০·০৪৫ মিলিগ্র্যাম পর্যন্ত থিয়ামিন থাকে। কিন্তু গরম

করা, প্যাষ্টুরাইজ্ করা, বাষ্পীভূত করা এবং শুষ্ক করার ফলে গোদুগ্ধের প্রায় শতকরা ১০ থেকে ২০% থিয়ামিন নষ্ট হয়ে যায়। শিশুর যে পরিমাণ থিয়ামিন দরকার তা টাট্‌কা প্যাষ্টুরাইজড্ দুধ থেকে পাওয়া যেতে পারে, মাতৃদুগ্ধ বা শুষ্ক দুধ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। যে সব মায়ের দুধে থিয়ামিনের পরিমাণ কম তাদের খাদ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণে (দৈনিক প্রায় ১'৫ মিলিগ্রাম) গ্রহণ করলে দুধেও থিয়ামিনের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু যাদের দুধে ভিটামিনের পরিমাণ বেশী তাদের খাদ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত থিয়ামিন গ্রহণ করলেও দুধে তেমন থিয়ামিনের পরিমাণ বাড়ে না।

মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গোদুগ্ধে প্রায় ৫ গুণ বেশী রিবোফ্ল্যাভিন থাকে। মাতার খাদ্যের উপর মাতৃদুগ্ধের রিবোফ্ল্যাভিনের পরিমাণ নির্ভরশীল। এক পাইণ্ট টাট্‌কা গো-দুগ্ধে যে পরিমাণ রিবোফ্ল্যাভিন থাকে, তা শিশুর দৈনিক প্রয়োজনের (প্রায় ০'৬ মিলিগ্রাম) পক্ষে যথেষ্ট। মাতৃদুগ্ধের দ্বারা এ পরিমাণ কোন রকমে যোগান যায়—বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ উভয়েই নিয়াসিনের দিক থেকে নিকৃষ্ট। ৪নং তালিকা অনুসারে মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধে নিয়াসিনের পরিমাণ এক হলেও মাতৃদুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই উভয় রকমের দুধ থেকে শিশু যে পরিমাণ নিয়াসিন গ্রহণ করে তা দৈনিক প্রয়োজনের চেয়ে কম।

থিয়ামিন, রিবোফ্ল্যাভিন এবং নিয়াসিনের উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভিটামিন-বি-সমষ্টির দিক দিয়ে মাতৃদুগ্ধ গোদুগ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যে সকল শিশু কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধই পান করে, তারা কখনই প্রয়োজনীয় ভিটামিন-বি পেতে পারে না। এজন্যে এসব শিশুর খাদ্যে খুব কম মাত্রায় ভিটামিন-বি-সমষ্টির প্রয়োজন। প্রত্যেক দুগ্ধবতী মাতার ভিটামিন-বি-প্রধান মাংসাদি, ডিমের কুসুম, শাকসব্জী যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা দরকার। ৬।৭ মাসের উর্ধ্ববয়স্ক শিশুর খাদ্যে ভিটামিন-বি-প্রধান দ্রব্য সংযোজন করাও যেতে পারে।

ভিটামিন-সি বা অ্যাস্করবিক অ্যাসিডের পরিমাণ মায়ের খাদ্যভেদে তারতম্য হয়; তথাপি তা গোদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী। মাতৃদুগ্ধে ভিটামিন-সি-এর পরিমাণ গোদুগ্ধের চেয়ে প্রায় ৪।৫ গুণ বেশী। শিশুর পক্ষে যে পরিমাণ ভিটামিন-সি প্রয়োজন তা মাতৃদুগ্ধ থেকে পাওয়া যায়। মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ কম হলে বা কৃত্রিম খাদ্য খেলে শিশুকে ভিটামিন-সি-প্রধান অন্যান্য খাদ্য (কমলালেবুর রস ইত্যাদি) দেওয়া দরকার।

কোন দুধেই ভিটামিন-সি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নেই। মাতৃদুগ্ধে রিকেট্‌স্ বড় একটা হয় না, তবে কৃত্রিম খাদ্যে হয়। ভিটামিন-ডি খাদ্যে বেশী দিলে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের সঞ্চয় বাড়তে থাকে।

প্রসবের পর ৩।৪ দিন মাতৃস্তন থেকে যে দুধ (Colostrum) নিঃসৃত হয় তা পরবর্তী দুধ থেকে প্রকৃতিতে অনেক পৃথক। এই জাতীয় প্রাথমিক দুধ শিশুর পক্ষে রেচক (laxative)। এতে বেশী থাকে প্রোটিন আর লবণ, আর কম থাকে শর্করা এবং চর্বি। এতে গ্লোবিউলিনের সমবায়ে প্রোটিন গঠিত বলে মনে হয়। দুগ্ধদানের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত মাতৃ-দুগ্ধে এই প্রাথমিক গুণগুলি কিছু কিছু থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, মাতৃদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ কোনটাই যথার্থ আদর্শ খাদ্য নয়, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান পরিমিতভাবে কোনটাতেই পাওয়া যায় না। সেজন্যে আজকাল স্তন্যপান ও গোদুগ্ধ পানের পরিমাণ পৃথিবীতে কিছু কমে যাচ্ছে—সমস্ত পৌষ্টিক উপাদান সমন্বিত কৃত্রিম খাদ্যের প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে। তবে গোদুগ্ধ ও মাতৃদুগ্ধের মধ্যে মাতৃদুগ্ধই অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। (১) খাদ্যের সরলতা, (২) সহজ পরিপাচ্যতা (৩) বীজাণুহীনতা (গো-দুগ্ধে বেশ পরিমাণে বীজাণু থাকে)

(৪) কম সংক্রমণশীলতা (৫) পরিপাক গোলযোগের অভাব, (৬) মারাত্মক রোগের কম আশঙ্কা, (৭) দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন, (৮) অতিভোজন বা ন্যূন-ভোজনের কম আশঙ্কা, (৯) সম-উত্তাপ (মাতৃদেহে দুগ্ধ প্রায় শিশুর শরীরের সম-উত্তাপে থাকে, তাতে গ্রহণে খুবই সুবিধা হয়)—ইত্যাদি কারণে মাতৃদুগ্ধ আদর্শস্থানীয়।

বলা বাহুল্য, মায়েদের একথা জানা দরকার যে, দুগ্ধদানের ফলে তাদের স্বাস্থ্যের খুব ইতরবিশেষ হয় না; তবে নিঃসৃত দুগ্ধের সঙ্গে যে খাদ্য-তাপ এবং পুষ্টিকর পদার্থ চলে যায় তার জন্যে তাদের একটু বেশী পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। প্রসূতিদের খাদ্য চর্বি, প্রোটিন, শর্করা, নানাবিধ খনিজ ও ভিটামিন-সমৃদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দুগ্ধদানের জন্যে মায়ের মানসিক অবস্থা অনুকূল হওয়া দরকার—কারণ মানসিক অবস্থা দুগ্ধক্ষরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই পূর্ব থেকে দুগ্ধ-দানের জন্যে মাতার মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

বিজ্ঞান সংবাদ

মহাশূন্যে ভ্রমণের সম্ভাব্য বিপদ

রকেট-চালিত যানে চড়িয়া চন্দ্র, মঙ্গল বা শুক্র গ্রহ অভিমুখে যাত্রা করিলে পথে তিনটি প্রধান বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, যেমন, সূর্যরশ্মির বিপদ, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের অভাব জনিত বিপদ এবং উল্কা হইতে বিপদ। ইউ. এস. এয়ার ফোর্স ও আর্মির ছয় জন বিশেষজ্ঞ এই সমস্যাগুলির বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটি হইতে প্রকাশিত 'স্পেস মেডিসিন' নামক পুস্তকে মহাশূন্যে ভ্রমণে মানবদেহের উপর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এলাকার বাহিরে গমন করিলে শূন্য-যাত্রীর কিরূপ অবস্থা হইতে পারে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃথিবীর বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া ভীষণ বেগে রকেট ধাবিত হওয়ার ফলে উহার ধাতুনির্মিত খোল ১১১২° ফারেনহাইট উত্তপ্ত হইবে। তারপর মহাশূন্যে প্রবেশ করিলে আসল বিপদ আরম্ভ হইবে। উল্কাগুলি পৃথিবীর বায়ুস্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সাধারণতঃ জ্বলিয়া উঠে। ঐ উল্কাগুলি রকেটযানের প্রথম বিপদের কারণ হইবে। সাধারণ ছোলা বা মটরের আকারের উল্কা রকেটযানের আবরণ ছিদ্র করিয়া দিতে পারে এবং তাহার ফলে ভিতরের বায়ুর চাপ নষ্ট হইয়া যাইবে। উল্কা বৃহৎ হইলে যানটিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। যাত্রীরা এক অভূতপূর্ব চেতনা অনুভব করিতে থাকিবে। তাহাদের শরীর ভারবিহীন হইবে। তাহাদের চতুষ্পার্শ্বের বায়ু ভারবিহীন এবং গতিহীন হওয়ায় উহা তাহাদের দেহের চারিদিক বাষ্পাকারে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। তাহাদের প্রশ্বাস এক বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করিবে। উহা তাহাদের সম্মুখে বাষ্পাকারে স্থির হইয়া থাকিবে, কাজেই তাহারা এক অদ্ভুত রকমের অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকিবে। কোন ভার না থাকায় তাহাদের চুল খাড়া হইয়া থাকিবে। পোষাক-পরিচ্ছদ দেহের সহিত মিলাইয়া থাকিবে না, এলোমেলোভাবে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে।

সূর্যসম্ভূত এক্স-রে আর এক গুরুতর বিপদের কারণ হইবে। ঐ এক্স-রে সম্ভবতঃ রকেটের ধাতু-নির্মিত আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে। উহাকে নিবারণ করিবার জন্য যদি দেয়ালে সীসার

আস্তরণ দেওয়া থাকে তবে কস্‌মিক কণিকাগুলি উহার উপর পড়িয়া মারাত্মক রশ্মির সৃষ্টি করিবে।

ভূতপূর্ব ভি-২ রকেট বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্রন বলেন যে, রকেটের ইন্ধনের সমস্যা এখন দূর হইয়াছে। ২০০ ফুট উচ্চ এবং ৬০ ফুট ব্যাসযুক্ত তিন স্তরে প্রস্তুত একটি রকেট হইলেই নিকটবর্তী কোন গ্রহে গমনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত বিপদগুলিই এই অভিযানের প্রধান অন্তরায়।

গিরগিটির ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতা

ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির প্রাণিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ সেক্‌ম্যান গিরগিটি জাতীয় প্রাণীর ক্যানসার রোগ প্রতিরোধের অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, যে সব ক্যানসার উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থ প্রযোগে অন্যান্য প্রাণী ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়, তাহাতে গিরগিটির ঐ রোগ উৎপন্ন হয় না। ঐ রাসায়নিক পদার্থ প্রযোগে গুটিকা বা আব উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উহা মারাত্মক হয় না। উহা শরীরের অন্য স্থানে বিস্তার লাভ না করিয়া এক স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, দেহের অত্যাবশ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও কোন বিকৃতি ঘটায় না। গিরগিটির দেহ-যন্ত্রের কোন্ বিশেষত্ব ক্যানসার প্রতিরোধের অনুকূল তাহা জানা যায় নাই। তবে ডাঃ সেক্‌ম্যান অনুমান করেন, উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুনর্গঠনের অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত ক্যানসার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। গিরগিটির লেজ বা একটি পা কোন কারণে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কয়েক মাসের মধ্যেই উহা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

ভাইরাসের জীবনীশক্তি

মিচিগান ইউনিভার্সিটির এক পরীক্ষাগারে এক মারাত্মক ভাইরাসের বীজ ৩৫ বৎসর পড়িয়া থাকার পরেও সক্রিয় অবস্থায় দেখা গিয়াছে। ভাইরাসটি এমনই মারাত্মক যে, সামান্য পরিমাণ প্রয়োগে একটি ইঁদুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া যাইতে পারে। মানুষের পক্ষে উহা কিরূপ মারাত্মক তাহা জানা যায় নাই।

এত দীর্ঘকাল যাবৎ কোনরূপ খাদ্য না পাইয়াও এই ভাইরাস তাহার জীবনীশক্তি অটুট রাখিয়াছে; এইরূপ অদ্ভুত ভাইরাসের সংখ্যা খুবই কম।

ব্যাক্টিরিওলজির ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ নভি তাহার কোন এক গবেষণার সময় ১৯০৯ সালে এই ভাইরাসটি আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি গবেষণাগারটি পরিষ্কার করিবার সময় এই ভাইরাসটি পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে।

যক্ষ্মার নূতন ঔষধ

আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির খবরে প্রকাশ, কালামাজুর মাটি হইতে একপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। উহা যক্ষ্মা রোগীদের উপকারে লাগিবে আশা করা যায়। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার কার্যকরী ক্ষমতা কিছু কম হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর পক্ষে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের ন্যায় ক্ষতিকারক নয়। নূতন অ্যান্টিবায়োটিকটির নাম দেওয়া হইয়াছে—অ্যামিসাইটিন। ইহার কার্য-কারিতা সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা চলিতেছে।

প্রাচীনকালের পৃথিবীতে অজৈব ক্লোরোফিল উৎপত্তি

প্রায় ২০০ কোটি বৎসর পূর্বে যখন পৃথিবীতে উদ্ভিদ বা জীবের আবির্ভাব হয় নাই তখন স্বতস্ফূর্ত-ভাবেই ক্লোরোফিলের উৎপত্তি সম্ভব হইত—ওহিয়ো ইউনিভার্সিটির রাসায়নিকদের এক পরীক্ষা হইতে এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের পূর্বের অবস্থার মত নকল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাসায়নিকরা এক পরীক্ষায় দেখেন যে,

দুইটি সাধারণ গ্যাস এবং জল উত্তপ্ত বালির উপর দিয়া প্রবাহিত করিলে ক্লোরোফিলের গঠনানুরূপ রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

ডাঃ ম্যাক্ নেভিনের উপদেশ অনুসারে বৈজ্ঞানিকরা কার্বন-ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া এবং জল একটি সিলিকার নলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করেন (প্রাচীনকালের পৃথিবীর উত্তপ্ত পাথরের পরিবর্তে উত্তপ্ত সিলিকা নল ব্যবহার করা হইয়াছে)। ইহার ফলে প্রোফাইরিনের কতকগুলি অণু উৎপন্ন হয়। প্রোফাইরিনের মৌলিক গঠন ক্লোরোফিলেরই অনুরূপ।

ক্লোরোফিল এক জটিল রাসায়নিক পদার্থ, ইহারই দ্বারা উদ্ভিদ কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল হইতে সূর্যরশ্মির সাহায্যে জীবের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য সংশ্লেষণ করিয়া থাকে।

আর একটি পরীক্ষায়, পৃথিবীর প্রাচীনকালের অবস্থার অনুরূপ নকল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া মার্স গ্যাসের ভিতর ১০০,০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ প্রয়োগের ফলে রজন জাতীয় এক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই পদার্থটির রাসায়নিক গঠন এমনই জটিল যে, উহার স্বরূপ এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই।

বিদ্যুৎ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর প্রাচীনকালের রাসায়নিক ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করা; কারণ ঐ সময়ে সর্বদাই বজ্রপাত হইত।

তিমি-শিকারে অতিকম্পনশীল শব্দতরঙ্গের ব্যবহার

জাহাজ হইতে তিমি শিকারের সময় উহাদের অবস্থান সম্বন্ধে অনেক সময় সন্দিহান হইতে হয় এবং প্রায়ই ঐ সুযোগে উহারা পলাইয়া দূরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লয়।

সম্প্রতি দক্ষিণ মহাসাগরে বৃটিশের তিমি-শিকার অভিযানে উহাদের অবস্থান জানিবার জন্য অতিকম্পনশীল শব্দতরঙ্গ ব্যবহৃত হইতেছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয়ে যে কৌশল অবলম্বন করা হইত, ইহা তাহারই অনুরূপ। জাহাজ হইতে প্রেরিত অতিকম্পনশীল শব্দতরঙ্গ তিমির দেহে লাগিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া জাহাজে ফিরিয়া আসে এবং বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে তিমির অবস্থান ও দূরত্বের নির্দেশ দেয়। ইউ. এস. ফিস অ্যাণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই যন্ত্রের নির্দেশে জাহাজ হইতে ২০০০ গজ দূরে গতিশীল তিমিকে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করা সম্ভব।

ত্বকের রং নিয়ন্ত্রণ

মানুষের ত্বকের রং নিয়ন্ত্রণে (যেমন কোন স্থানের ত্বকের গাঢ় রং বা ভাইটিলিগো নামক রোগ উদ্ভূত ধবলতা প্রভৃতি দূরীকরণে) সম্প্রতি দুইটি ঔষধ ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ ঔষধগুলির মধ্যে একটি হইল মনোবেঞ্জিলইথার অব হাইড্রোকুইনোন এবং অন্যটির নাম সোরালেক্স। আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি ত্বকের রং নিয়ন্ত্রণে ঐ ঔষধগুলি কার্যকরী বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা চলিতেছে। ত্বকের ধবলতা, জন্মাবধি স্থায়ী ত্বকের কোন স্থানের বিশেষ রং, বহু রোগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত রং পরিবর্তন এবং মেলানোমা নামক ভয়াবহ রঙীন ক্যানসার কি কারণে ঘটিয়া থাকে তাহার সন্ধান করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। গবেষকরা দেখিয়াছেন, নানা কারণে ত্বকের রঙের পরিবর্তন ঘটিতে পারে; যেমন—পথ্য, সূর্যালোক, হরমোন এবং বয়স।

এই সম্বন্ধে তিন প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে—(১) কোন হরমোনের সাহায্য না লইয়া মানুষের ত্বকের রঙের পরিবর্তন সাধন করা। (২) হরমোনের সাহায্যে ফাটা বা খস্‌খসে ত্বক মসৃণ করা। (৩) শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন ত্বকের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করিলে ত্বকের নীচের

কোষগুলির উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাহা পরীক্ষা করা।

স্বাভাবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নকল করিয়া বিজ্ঞানীরা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ত্বক ইচ্ছামত রং-মুক্ত বা রং-যুক্ত করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। জীবন্ত প্রাণীর উপব পরীক্ষা করিয়া তাহাদের পবীক্ষালব্ধ ফল যে সত্য, তাহা কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে।

দেহের মেলানিন নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ ত্বক, চুল ও চোখের বঙের জন্য দায়ী। এই মেলানিন গঠনেব রাসাযনিক প্রক্রিযাব কতকগুলি ধাপ বিজ্ঞানীবা অনুসরণ করিতে সক্ষম হইযাছেন।

ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি

ইউ. এস. ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকাল্চারের উইড কণ্ট্রোল রিসার্চেব অধ্যক্ষ ডাঃ লেভর্ন বলেন, সস্তায় এবং সুবিধাজনক উপাযে ভুট্টাব উৎপাদন বাড়াইতে হইলে কৃষকদের আগাছা-ধ্বংসী ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

চাবাগুলি মাটি ভেদ করিয়া বাহির হইবাব পূর্বে এবং সবেমাত্র বাহির হইয়াছে, এমন সময় ২, ৪-ডি স্প্রে করিয়া প্রয়োগ করিলে পরে আর জমি কর্ষণ করিবার প্রযোজন হয় না এবং ইহাতে ফসলও বৃদ্ধি পায। পরীক্ষা ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, আগাছা-ধ্বংসী ঔষধ প্রয়োগ করিবাব পর পুনরায় জমিকর্ষণ না করিয়াও ফসল দেড় হইতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

চারা বাহির হইবার পূর্বে ২ পাঃ ২, ৪-ডি প্রয়োগে ঘাস জাতীয় আগাছা ধ্বংস হইবে এবং চারা বাহির হইবার এক সপ্তাহ পরে সিকি পাঃ স্প্রে করিলে অন্যান্য আগাছা বিনষ্ট হইবে। দেখা গিয়াছে, আগাছা-ধ্বংসী ঔষধ ব্যবহারের পর আবার জমি কর্ষণ করিলে ফসল আরও বৃদ্ধি পায়। বর্ণসঙ্কর ভুট্টার ২, ৪-ডি সহ্য করিবার ক্ষমতার সামান্য তারতম্য থাকিলেও নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সবগুলিই ইহা সহ্য করিতে পারে।

কোয়ার্টসের ফ্লুরেসেণ্ট ল্যাম্প

ভিতরে কোযার্টসেব নলযুক্ত নূতন ধরনের এক ফ্লুরেসেণ্ট ল্যাম্প প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া জানা গিযাছে। সম পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারকাবী সাধারণ ল্যাম্প অপেক্ষা ইহা আড়াই গুণ অধিক আলোক দেয় এবং পাঁচগুণ অধিক কাল স্থাযী হয়। ওযেষ্টিং হাউসের ল্যাম্প ডিভিসনের মিঃ বেগ্স্ এক সভায ঐ ল্যাম্পের বর্ণনা দিয়া বলেন, নূতন ল্যাম্পটি মাবকারি ল্যাম্প ও ফ্লুরেসেণ্ট ল্যাম্প উভযেব সমন্বয়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জীবনকাল ৫০০০ ঘণ্টা।

মারকাবি ল্যাম্পটি ভিতরের একটি কোযার্টসের নলের মধ্যে জলে। ঐ রশ্মিব মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থাকায় উপরের নলের ভিতরের পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রতিপ্রভ আস্তরণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং মারকারি ল্যাম্পের নীলাভ রশ্মিকে উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে রূপান্তরিত করে।

কারখানায, রঙ্গালয়ে, বড রাস্তায় এবং রেলওযে প্রাঙ্গন ইত্যাদিতে এই নূতন ল্যাম্প ব্যবহারোপযোগী হইবে বলিযা মিঃ বেগ্স্ আশা করেন।

কস্মিক কণায় নৈশ আকাশের দীপ্তি

শক্তিশালী কস্মিক কণাসমূহ মহাশূন্য হইতে পৃথিবীর বায়ুস্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহারা আলোক বিকিরণ করে এবং ইহাদের ক্ষীণপ্রভায় নৈশ আকাশ কিছুটা আলোকিত হইয়া থাকে।

বৃটেনের অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ এস্টাব্লিস্-মেণ্টের দুইজন গবেষক মিঃ গ্যালব্রেথ ও মিঃ জেলি, ফটোমাল্টিপ্লায়ার যন্ত্রের সাহায্যে কস্মিক

রশ্মির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট আলোকের স্পন্দন লক্ষ্য করিয়াছেন।

রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক মঃ সেরেন্‌কভ ১৯৩৭ সালে আবিষ্কার করেন যে, কোন দ্রুতগামী কণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিলে উহা নীলাভ শুভ্র আলোক বিকিরণ করে। সম্প্রাত পরিদৃষ্ট নৈশ আকাশে প্রভা ও সেরেন্‌কভ রেডিয়েশন কণাগুলি আলোকরশ্মি অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বায়ুমণ্ডলে ধাবিত হয়, এইরূপ ধরিয়া লইলে ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নৈশ আকাশের প্রভার দশহাজার ভাগের এক ভাগ এই কারণে হইয়া থাকে বলিয়া পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রোফেসার ব্ল্যাকেট ১৯৪৮ সালে তাহার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অভিনব উপায়ে মিশ্র-ধাতু প্রস্তুত

হারভার্ডের পদার্থতত্ত্ববিদ ডাঃ ব্রিগম্যান তাপের পরিবর্তে উচ্চ চাপ দ্বারা দুইটি ধাতু গলাইয়া মিশ্র-ধাতু প্রস্তুতের এক অভিনব পন্থা প্রকাশ করিয়াছেন। এক বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা দুইটি ধাতু টিন ও বিসমাথকে একত্রে বর্গ-ইঞ্চিতে ৪৫০০০০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হয়। ফলে একটি মিশ্র-ধাতু উৎপন্ন হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ও বৈদ্যুতিক রেজিস্ট্যান্স আসল ধাতুগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডাঃ ব্রিগম্যান বলেন, চলিত পন্থায় যে সব ধাতু একত্রে মিশান সম্ভব নয়, এই নূতন পন্থায় তাহা সম্ভব হইবে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

'মনুষ্যে ও পশুতে এইখানে প্রভেদ, পশু পর্য্যবেক্ষণ করিতে জানে, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে অসমর্থ, মানুষ পর্য্যবেক্ষণও করে, পরীক্ষাও করে। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য মানুষের অবলম্বিত উপায়ই এই। জ্ঞান আর বিজ্ঞান উভয়ই সমার্থক; বিজ্ঞান অর্থে বিশিষ্ট জ্ঞান; বুদ্ধি-পরিচালিত চেষ্টায় উপার্জিত বিশিষ্ট জ্ঞান। পশুরও জ্ঞান আছে; প্রাকৃতিক ক্রিয়ানিচয়ের অবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান আছে; সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিতে না চাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু মানুষ বহুকাল হইতে বৈজ্ঞানিক; কবে হইতে বৈজ্ঞানিক, তাহা ইতিহাসে লেখে না। সে পর্য্যবেক্ষণও করে, পরীক্ষাও করে, সেইজন্য তাহার জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। যে দিন হইতে মানুষ পশুভাব ছাড়িয়া মানুষভাব পাইয়াছে, সেই দিন হইতেই সে বৈজ্ঞানিক।'

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা

চিরতুষারমণ্ডিত এভারেষ্ট

করে দেখ

তাপ সঞ্চালনের পরীক্ষা

লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতব পদার্থমাত্রেরই কম-বেশী তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা আছে। কিন্তু রেশম, পশম, কাঠ, কাগজ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা নেই, অথবা থাকলেও খুবই কম। ধাতব পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতা আছে বলেই খনির মধ্যে বিস্ফোরণ এড়াবার জন্যে তারের জালের সাহায্যে ডেভিস্ সেফ্‌টি ল্যাম্প তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল—একথা বোধহয় তোমরা সবাই জান। ধাতব পদার্থের তাপ সঞ্চালনের ক্ষমতার পরীক্ষা তোমরা অবশ্য অনেক রকমেই করে দেখতে পার; কিন্তু এখন তোমাদের তাপ সঞ্চালনের একটা কৌতুকপ্রদ পরীক্ষাব কথা বলছি। সহজেই তোমরা পরীক্ষাটা করে দেখতে পারবে।
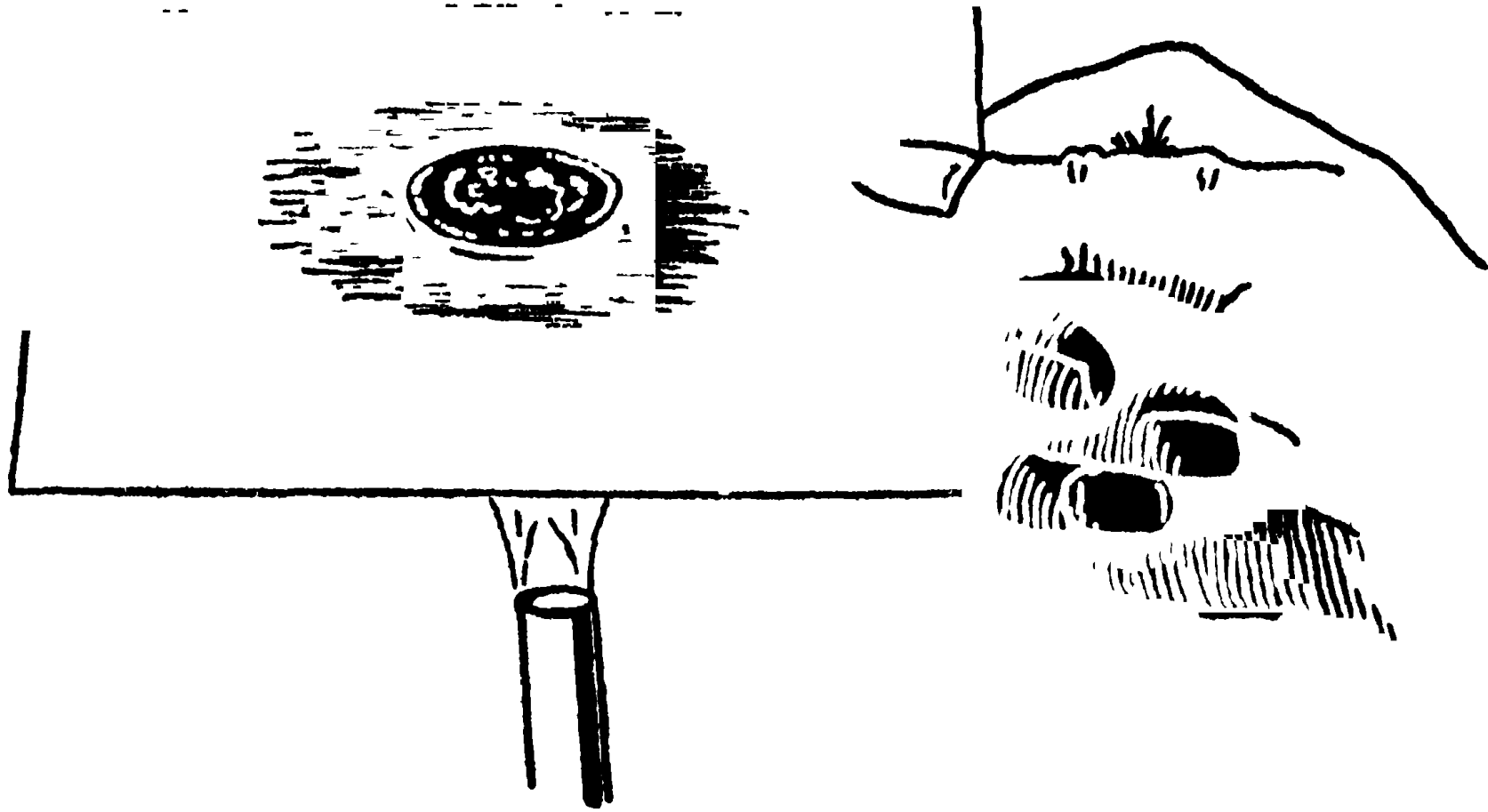
পোষ্টকার্ডের মত একখানা সাদা কাগজের উপর একটা টাকা রাখ। টাকাসমেত কাগজটাকে গ্যাস-বার্ণার বা স্পিরিট ল্যাম্পের খানিকটা উপরে ধরে, এদিক-ওদিক সরিয়ে এমনভাবে পোড়াও যেন আগুন ধরে না যায়, অথচ আগুনের তাপে কাগজটা প্রায় কালো বা বিবর্ণ হয়ে যায়। এবার আগুনের উপর থেকে টাকাটা সরিয়ে নিলেই দেখতে পাবে, সম্পূর্ণ কাগজটা বিবর্ণ হলেও টাকাটা যেখানে ছিল সে জায়গাটা মোটেই পোড়ে নি—সম্পূর্ণ সাদা রয়ে গেছে। ধাতু-নির্মিত টাকার ভিতর দিয়ে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার ফলেই সে জায়গাটা পুড়তে পারে নি। ছবিটা দেখে নাও, পরীক্ষাটা কেমন করে করতে হবে সহজেই বুঝতে পারবে।

জেনে রাখ

পরজীবী

জীবজগতে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা কম-বেশী অপরের উপর নির্ভরশীল। হয় খাবার নয় তো আত্মরক্ষার জন্যে একজন ছাড়া আর একজনের চলে না। এই রকমের যেসব জীব অপর জীবের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনধারণ করে তাদের পরজীবী বলা হয়।

সব পরজীবী কিন্তু অপর জীবের আশ্রয়ে বেঁচে থাকে না। অনেকে চৌর্যবৃত্তির দ্বারা উদরপূর্তি করে থাকে। এসব পরজীবী অপর জীবের আস্তানায় হানা দিয়ে খাদ্যদ্রব্য চুরি করে। এমন কি, সুযোগ পেলে তাদের শাবকদেরও খেয়ে ফেলে। সামাজিক কীট-পতঙ্গেরা এই সব অবাঞ্ছিত অতিথির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে প্রভৃতি এদের দ্বারা সর্বদা উত্যক্ত হয়। বড় পিঁপড়েরা ছোট ছোট কালো পিঁপড়েদের জ্বালায় অস্থির থাকে। এদের পুরীর নিকটেই কালো পিঁপড়েরা আস্তানা তৈরী করে। সেখান থেকে তারা মাটির ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে একেবারে ভাঁড়ারে গিয়ে হাজির হয়। তারপর ধীরেসুস্থে খাদ্রদ্রব্য চুরি করে খেতে থাকে। ধরা পড়বার উপক্রম হলেই পিলপিল করে সুড়ঙ্গ-পথে নেমে পড়ে। বড় পিঁপড়েরা তখন কালো পিঁপড়েদের কোন ক্ষতি করতে পারে না; কারণ সুড়ঙ্গের পথ এত সরু যে এদের দেহ তাতে মোটেই ঢোকে না।

পাখীর মধ্যে কোকিলের বাচ্চাকে পরজীবী বলা চলে। কোকিলের বাচ্চা কাকেরা লালন-পালন করে থাকে। এ এক ভারী মজার ব্যাপার। ডিম পাড়বার সময় হলে স্ত্রী এবং পুরুষ-কোকিল কাকের বাসার কাছে উপনীত হয়। স্ত্রী-কোকিল গাছের ডালের আড়ালে আত্মগোপন করে' সুযোগের অপেক্ষা করে। পুরুষ-কোকিল কাকের বাসার কাছে গিয়ে হাজির হয়। কাকেরা তাকে তাড়া করে। পুরুষ-কোকিল পলায়নের ভান করে। অবসর বুঝে স্ত্রী-কোকিল কাকের শূন্য বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে এবং কাকের ডিম নষ্ট করে ফেলে। কাজ হাসিল করেই সে সরে পড়ে। এদিকে কাকেরা বাসায় ফিরে এসে কোকিলের নষ্টামি বুঝতে না পেরে আগের মতই ডিমে তা দিতে থাকে। তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। চিন্‌তে না পেরে নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত অতিথির সন্তানদেরও লালন-পালন করতে থাকে। বড় হয়ে কোকিলের বাচ্চারা আপন আপন পথ দেখে।

মারমট নামে একজাতের পাহাড়ে ইঁদুর দেখতে অনেকটা গিনিপিগের মত। এরা গর্তে বাস করে। এরা রীতিমত মেহনত করে গর্ত তৈরী করে। কিন্তু ভোগ করবার ভাগ্য হয় না। র‍্যাটল-সাপ এবং পাহাড়ে পেঁচাগুলি একেবারে কুঁড়ের বাদশা। মারমটের গর্ত একবার এদের কারো চোখে পড়লেই হলো, আর যায় কোথায়! বেচারাকে তাড়িয়ে দিয়ে এরা সেখানে কায়েম হয়ে বসবাস করতে থাকে। শুধু কি তাই? মারমটের বাচ্চাদের দিয়েও পেটের জ্বালা মিটিয়ে থাকে। বাধ্য হয়ে বেচারাকে আবার নতুন করে গর্ত খুঁড়তে হয়।

জেলি মাছ

সমুদ্রের বুকে এরূপ বহু ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ বিভিন্ন জাতের জলচর প্রাণীরা বড়দের শরীরে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়ে থাকে। হর্স-ম্যাকারেল নামক একজাতের সামুদ্রিক মৎস্য দলে দলে জেলি মাছের পেটের নীচে ও শুঁড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেলি মাছের আকার দেখতে ব্যাঙের ছাতার মত। মাছগুলি এভাবেই গাংচিলের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে থাকে। জেলি মাছের ছাতার ধার থেকে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝুরির আকারে নামে তা দিয়ে এরা অন্যান্য জলচর প্রাণীর আক্রমণের হাত থেকে আশ্রিত এই সব মাছগুলিকে রক্ষা করে। এই মাছগুলি আশ্রয়দাতার উপকারেও লাগে। শক্ত আবরণবিশিষ্ট ক্ষুদে জলচর প্রাণীরা প্রায়ই জেলি মাছের মুখ থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে খায়। এজন্যে এদের ভারী

অসুবিধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এদের শত্রু হচ্ছে হর্স-ম্যাকারেল। তাই জেলি মাছেরা সানন্দে হর্স-ম্যাকারেলদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। কয়েক জাতের প্রবাল মাছ বড় বড় সি-অ্যানিমোনের খাঁজকাটা অংশে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে। এদের সঙ্গে চিংড়িও থাকে। প্রবাল মাছের ঔজ্জ্বল্য মাংসাশী জলচর প্রাণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিকারের লোভে তারা ছুটে আসে। নাগালের মধ্যে আসা মাত্রই সি-অ্যানিমোন শুঁড়ের সাহায্যে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। এরপর আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতা উভয়েই মহানন্দে ধৃত শিকারের দ্বারা উদর পূর্তি করে। সাকার ফিশ্ নামে একজাতের সামুদ্রিক মাছও ব্লু-শার্কের তলপেটে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে থাকে। ব্লু-শার্ক হচ্ছে এক জাতীয় মানুষ-খেকো হাঙ্গর।
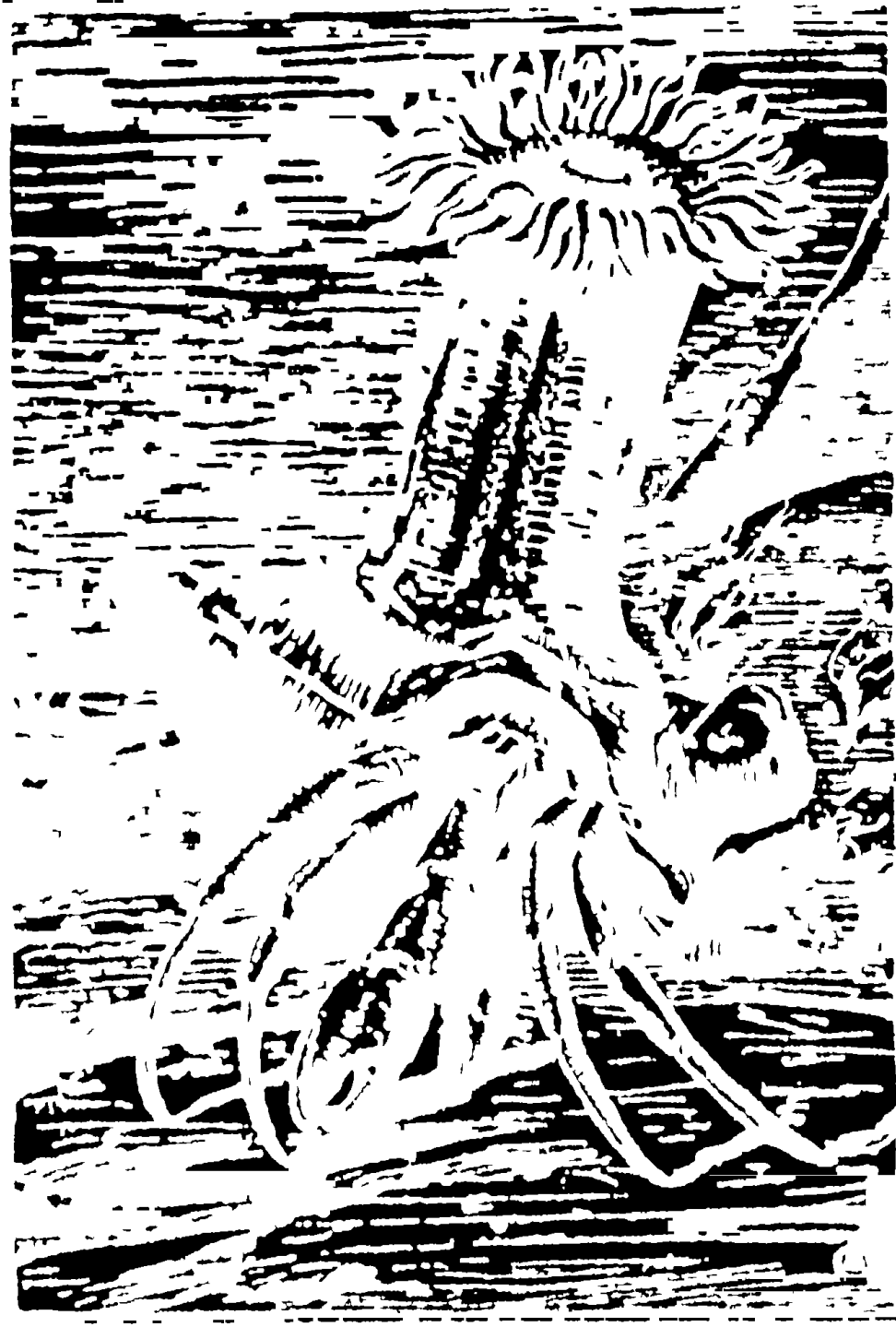
শামুকেব খোলের উপরে সি-অ্যানিমোন
ও ভিতরে সন্ন্যাসী কাঁকড়া দেখা যাচ্ছে

স্পঞ্জ, সি-অ্যানিমোন, প্রভৃতি প্রাণী নিজেদের ইচ্ছামত সাঁতার কাটতে পারে না। তাই তারা বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের দেহাশ্রয়ে চলাফেরা করে থাকে। এইভাবে উভয়েই উপকৃত হয়; কারণ স্পঞ্জ প্রভৃতি প্রাণীবর্গ অন্যের দ্বারা বাহিত হয়ে নতুন নতুন জায়গায় যায় এবং প্রচুর খাদ্যের সন্ধান পায়। অপরপক্ষে এরা নিজেদের দেহের সাহায্যে বাহকদের আচ্ছাদিত করে রাখে। এজন্যে বাহকেরা শত্রুর চোখে অনায়াসে ধূলি দিতে পারে। শঙ্খ, শামুক প্রভৃতির খোলের সাহায্যে সন্ন্যাসী কাঁকড়া নিজের দেহের পিছনের অনাবৃত কোমল অংশ রক্ষা করে। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের অধিকতর বড় খোলে আশ্রয় নিতে হয়। খুব ছোট অবস্থায় কাঁকড়া যখন এসব খোলে আশ্রয় নেয় তখন

খোলের ভিতর বিস্তর জায়গা থাকে। সময় সময় স্পঞ্জও কাঁকড়ার সঙ্গে একই খোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। উভয়ে একত্রে বড় হ'তে থাকে। কালক্রমে উভয়ে যখন বেশ বড়সড় হয়ে ওঠে তখন কাঁকড়া স্পঞ্জের দেহাশ্রয়েই বাস করতে থাকে। তখন এসব অ্যানিমোনের দ্বারাই কাঁকড়া আত্মগোপন ও আত্মরক্ষার কাজ করে। প্রতিদানে কাঁকড়াও এসব অ্যানিমোনকে নতুন জায়গায় বয়ে নিয়ে যায় খাবারের সন্ধানে। অনেক সময় একজাতের ওয়ার্মও কাঁকড়ার আস্তানায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এরা আশপাশের ভাসমান খাদ্যকণিকা আহার করে' জীবনধারণ করে। এসব ওয়ার্মের দেহ খোলের বাইরে শুঁড়ের ন্যায় দেখায়।

গ্রীষ্মমণ্ডলে মিলিয়া নামে একজাতের কাঁকড়া আছে। এদের দাড়া দুটি ছোট এবং ভয়ানক দুর্বল। ফলে দাড়া দুটি শিকারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাই এরা সি-অ্যানিমোনের সাহায্য নিয়ে থাকে। উভয় দাড়াব মধ্যে দুটি সি অ্যানিমোন নিয়ে খাদ্যান্বেষণে ঘোরাঘুরি করে। অ্যানিমোন খাদ্যসংগ্রহে এদের সাহায্য করে; তাছাড়া কাট্‌ল-ফিসের আক্রমণের হাত থেকেও কাঁকড়াগুলিকে রক্ষা করে।
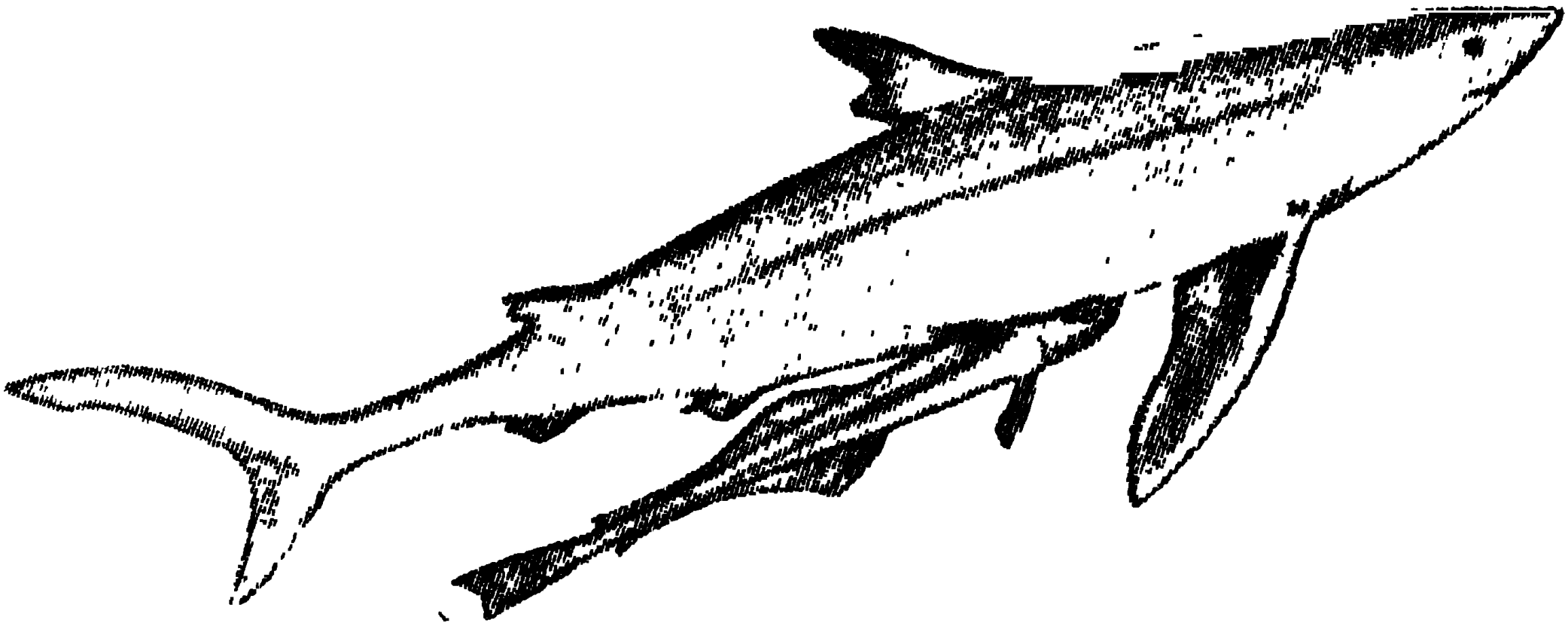
ব্লু-শার্কের তলপেটে লেগে রয়েছে সাকার ফিশ্

কয়েক জাতের ক্ষুদ্র প্রাণী, যেমন এঁটুলি, জোঁক, ওয়ার্ম প্রভৃতি গণ্ডার, জলহস্তী এবং অপরাপর তৃণভোজী প্রাণীদের দেহাশ্রয়ে বেঁচে থাকে। এসব পরজীবীরা এদের চামড়ার মধ্যে বাস করে। এসব পরজীবীদের শত্রু হচ্ছে পাখীরা। তাই জন্তুগুলির দেহে ও মাথায় পাখীরা লাফালাফি করলেও কিছুই বলে না। প্লোভার নামে পাখী হচ্ছে কুমীরের বন্ধু। কুমীরের শরীরে ও দাঁতের গোড়ায় জোঁক থাকে। প্লোভার এসব জোঁক খেয়ে ফেলে। তাছাড়া অনেক সময় মাংসের কণা দাঁতের গোড়ায় আট্‌কে থাকার দরুণ সেগুলি কিছুদিন বাদে পচে ওঠে। পাখী সেগুলিও ঠোঁট দিয়ে টেনে বের করে খেয়ে ফেলে। তাছাড়া কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই পাখীগুলি উচ্চ শব্দ করে উড়ে যায়; তখন কুমীরও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। জলহস্তীরও এক জাতের পাখী-বন্ধু আছে। তারা পুরু চামড়া থেকে এঁটুলি ও কীড়া খুঁটে খুঁটে খায়।

হানি-গাইড নামে একজাতের পাখী মধুপানে ভারী ওস্তাদ। কিন্তু মৌচাক আক্রমণ করবার মত শক্তি বা সাহস নেই মোটেই। তাই কি করে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙা যায় সেই চেষ্টায় থাকে। ব্যাজার নামক এক জাতের প্রাণী মধু খেতে খুব ভালবাসে। এদের পাগুলি খুব ছোট ; তাছাড়া দুর্গম স্থানে ঘোরাঘুরি করে মৌচাকের সন্ধান করা খুবই পরিশ্রমের কাজ। তাই তারা এতটা আয়াস স্বীকার করতে মোটেই রাজী নয়। হানি-গাইড কোন জায়গায় মৌচাকের সন্ধান পেলেই ব্যাজার-বন্ধুকে সংবাদ দেয় এবং তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ব্যাজার মৌচাক ভেঙে মধুপান করে এবং হানি-গাইডও সানন্দে লুণ্ঠনের অংশ গ্রহণ করে।

—ন—

হ্রদ

হ্রদ কাকে বলে, নতুন করে তা আর বোঝাবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু হ্রদ যে কত রকমের আর কেমন করে হয় সে কথা তোমাদের জানবার প্রয়োজন আছে। ধরা যাক ভারতবর্ষের বিখ্যাত হ্রদগুলির কথা। প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূলে চিল্কাহ্রদের কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বঙ্গোপসাগরের কিছুটা জল চারদিকে আটকে গেছে বালির প্রাচীরে। এইভাবে সমুদ্রের জল বালির প্রাচীরে বন্ধ হয়ে হ্রদ তৈরী হয়। শুধু চিল্কা কেন, ঠিক একই উপায়ে ত্রিবাঙ্কুরে কয়াল হ্রদ, মাদ্রাজে পুলিকট হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। হ্রদের মধ্যে ক্যাস্পিয়ান হ্রদ সবচেয়ে বড়। সেই হ্রদও এমনি ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

আগ্নেয়গিরি নিবে গেলে তার জ্বালামুখে জল জমে। তখন হ্রদ সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে এ রকমের হ্রদও আছে। যেমন বেরারে বালডানা জেলায় লোনার হ্রদ। খুব গভীর এই হ্রদটি। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে জল জমে সৃষ্টি হয়েছে লোনার। একদল বিজ্ঞানী কিন্তু এই মতটিকে স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, গ্যাস আর লাভা বেরিয়ে যাওয়ায় পাহাড়ের কোন জায়গা বসে গিয়ে জল জমে হ্রদের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর নানা জায়গায় শিলার নানারকম ক্রিয়া চলেছে। কোন জায়গা উঠছে, কোন জায়গা নামছে, ধ্বসে যাচ্ছে বা চ্যুতি ঘটছে। অনেক সময় এই রকম চ্যুতি ঘটলে নদীর স্রোত আট্‌কে যায়, আর সেখানে হ্রদ সৃষ্টি হয়। কাশ্মীরে এ-রকমের হ্রদ আছে। তবে চ্যুতি ছাড়া অন্যভাবেও নদীর গতি রুদ্ধ হয়। অনেক সময় শাখানদী স্তর ফেলে ফেলে গতি আটকায়। কাশ্মীরে প্যাংকং হ্রদটি এভাবেই উৎপন্ন হয়েছে। নদী যখন এঁকেবেঁকে চলে তখন নিজেও নিজের কিছু কিছু জল স্তর দিয়ে আটকে দেয়। গো-

ক্ষুরাকৃতি হ্রদ হয় নদীর ঐ সর্পিল ভঙ্গীতে। এছাড়া আরো সাত-আট রকমে হ্রদ উৎপন্ন হয়। তবে এগুলিই প্রধান।

হ্রদ শুকিয়ে যায় প্রধানতঃ তিনটি কারণে। অনেক নদী হ্রদে পড়ে। আর যত রাজ্যের মাটি, বালি বয়ে আনে। স্তরের পর স্তর জমতে থাকে হ্রদের তলে। ক্রমশঃ স্তরেই ভর্তি হয়ে যায় হ্রদ। অনেক সময় হ্রদের তলদেশ উঁচু হয়ে ওঠে। ভূকম্পের সময়ও আশেপাশের অবস্থা ভীষণ বদলে যায়। তখন অনেক হ্রদ মজে যায়। শুষ্ক আবহাওয়ারও প্রভাব আছে। বাতাসে আশেপাশের মরুভূমি থেকে বালুকণা ভেসে আসে। ফলে ক্রমশঃ হ্রদের জলও শুকিয়ে যায়।

হ্রদের কাজের সঙ্গে সমুদ্রের কাজের মিল আছে যথেষ্ট। তবে হ্রদের কাজের পরিধি অনেকটা সীমাবদ্ধ। বড় বড় হ্রদ তাদের তীরভূমি ক্ষইয়ে ফেলে সমুদ্রের মত। শীতের সময় অনেক হ্রদের তীরে জল জমে বরফ হয়ে যায়; তাতে তট-ভূমি ক্ষয়ের সুবিধা হয় খুব। হ্রদের জল জমে গেলে প্রায় ৯% বেড়ে যায়। তার ফলে দুই তীরে পার্শ্বচাপও বাড়তে থাকে। তাপ আরো কমলে চাপ আরো বাড়ে। ফলে দু-পাশে ফাটল দেখা দেয়।

সমুদ্রের মত হ্রদেও স্তর পড়ে। বড় বড় শিলা তীরের ধারে জমা হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে গভীরে জমতে থাকে। রাসায়নিক এবং নানারকম উদ্ভিজ্জ পদার্থের স্তর পড়ে। গাছপালা জমা হয়ে পিটে পরিণত হয়। তা থেকেই হয় কয়লা। খুব ছোট এককোষী ডায়াটম নামক একরকম প্রাণী থাকে অনেক হ্রদে। তারা সিলিকা সংগ্রহ করে। তারা মরে গেলে তাদের দেহ সঞ্চিত হয় 'diatomaceous earth' রূপে। পালিশ করবার পাউডার হিসাবে এবং অন্যান্য কাজে এদের ব্যবহার করা হয়। হ্রদে লোহার অক্সাইড পাওয়া যায় প্রচুর। তাছাড়া অসংখ্য রকম লবণও পাওয়া যায় জলে। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগ্নেশিয়াম প্রভৃতি নানা 'মেটালের' লবণ পাওয়া যায়। হ্রদ থেকে যদি বহু সংখ্যক নদী না বেরোয় তাহলেই হ্রদের জল লবণাক্ত হবে। ক্যাস্পিয়ান সাগর, ডেড-সী প্রভৃতি হ্রদের জল লবণাক্ত। কতকগুলি বড় বড় হ্রদের নাম এবং তাদের গভীরতা ও আয়তন দেওয়া হলো—

ক্যাস্পিয়ান সাগর	৩২০০ ফিট	১৭০,০০০ বর্গ মাইল
সুপিরিয়র	১১৮০ ”	৩১,৮১০ ”
ভিক্টোরিয়া	২৭০ ”	২৬,২০০ ”
বৈকাল	৫৪০০ ”	১৩,৩০০ ”
মিচিগান	৮৭০ ”	২২,৪০০ ”
ট্যাঙ্গানিকা	৪৭০০ ”	১২,৭০০ ”
ডেড-সী	১৩০০ ”	৩৬০ ”

শ্রীশিশিরকুমার দাশ

এভারেষ্ট-বিজয়ী শেরপা তেনজিং

১৯৫৩ সাল। এভারেষ্ট-শৃঙ্গ জয়ের একাদশ অভিযান পরিচালনা করেন বৃটিশ পর্বতারোহী দল। এবারের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। গত ২৯শে মে দুর্জয় গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্ট মানুষের নিকট পরাজয় স্বীকার করেছে। সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে দুটি মানুষের নাম—শেরপা তেনজিং এবং ই. পি. হিলারী। একজন এই দেশেরই সন্তান, অপর জন নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী। দুর্লঙ্ঘ্য এভারেষ্টের শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে বিংশশতকের মানুষ আজ বিজয়গর্বে ঘোষণা করেছে—মানুষের অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ সাধনার কাছে দুর্জয় প্রকৃতিকেও পরাভব স্বীকার করতে হয়।

শেরপা তেনজিং-এর গৌরবে আজ আমরা গৌরবান্বিত। কারণ নেপালী হলেও তিনি বর্তমানে ভারতেরই একজন নাগরিক। আনন্দের বিষয় আমাদের তেনজিং-ই সর্বপ্রথম এভারেষ্ট-শৃঙ্গে আরোহণ করেছেন। পরে তিনি হিলারীকে পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করতে সাহায্য করেন।

শেরপা তেনজিং-এর অতুলনীয় কৃতিত্বের জন্যে ইংলণ্ডেশ্বরী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁকে জর্জ পদক দান করবেন বলে শোনা গেছে। বৃটেনে অসামরিক ব্যক্তিদের সাহসিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে এই পদক ; তাছাড়া নেপালের মহারাজ ত্রিভুবন তাঁর বীরত্বের জয়টীকা স্বরূপ তাঁকে 'নেপাল-প্রতাপবর্ধক' নামে সুবর্ণ পদক উপহার দিয়েছেন। এমন কি, বিদেশী অভিযাত্রীরাও তাঁকে নিজেদেরই একজন বলে গ্রহণ করেছেন। সুইস আল্‌পাইন ক্লাব ও হিমালয়ান ক্লাবের তিনি সদস্য মনোনীত হয়েছেন। এই উপলক্ষে শেরপা সম্প্রদায় মহাধুমধামের সঙ্গে এক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শেরপা তেনজিং-এর বয়স চল্লিশ বছর। তিনি 'হিমালয়ের ব্যাঘ্র' নামেও পরিচিত। দুর্ধর্ষ পর্বতারোহী বলে নেপাল সরকার তাঁকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন। তেনজিং জাতিতে শেরপা। শেরপা জাতি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। এই শেরপাদেরই এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯১৪ সালে তাঁর জন্ম হয়। পুরা নাম তেনজিং নোরকে। বাবার নাম মিঙ্‌মা, আর মায়ের নাম হচ্ছে ফিঙ্গিয়ুম। কয়েক বছর আগে তেনজিং-এর বাবা মারা গেছেন। দুটি ভাই ছিল ; তাঁরা আর বেঁচে নেই। দুটি বোন আছে ; কনভেণ্টের ছাত্রী। জন্মভূমি পূর্ব নেপালের সোলো খুম্বো। বর্তমানে দার্জিলিং-এর তুংসুং নামক স্থানে সস্ত্রীক বাস করছেন। স্ত্রীর নাম আব্‌লামু। দুটি মেয়ে আছে—পেমপেম ও নীমা। দুটি বোনই নেপালী গার্ল'স স্কুলে পড়ছে।

ছোটবেলা থেকেই তেনজিং অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। দেহের গড়নটি ছিল

বেশ হৃষ্টপুষ্ট। লেখাপড়ায় মোটেই মনোযোগী ছিলেন না। অভিভাবকেরা তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু সেখানে তাঁর বেদুইন মন কিছুতেই স্থির হতে পারে নি। প্রকৃতির রহস্যময় হাতছানি তাঁর মনকে নিয়ে যেত পাহাড়-পর্বতের চূড়ায়, গিরিকন্দরে ও আরণ্যক জীবনের দুরন্ত আবেষ্টনের মাঝখানে। অবশেষে মাতাপিতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে একদিন তরুণ অভিযাত্রী বেরিয়ে পড়লেন অজানার সন্ধানে। অনেক হাঁটাহাটির পর তিনি এসে পৌঁছুলেন দার্জিলিংয়ে। সেখানে মাঝে মাঝে দু-একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হতে থাকে। এই সব অভিযাত্রী দলের পোর্টারের কাজে সানন্দে নিজেকে নিয়োজিত করতেন। কিন্তু এতে তাঁর অশান্ত প্রকৃতি শান্ত হতে পারে নি। দার্জিলিং-এর বাসিন্দা বৃদ্ধ শেরপাদের কাছে শুনতেন তাদের জীবনের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। হাওয়ার্ড বেরি, ব্রুস, নর্টন প্রভৃতি বৈদেশিক অভিযাত্রীদের সঙ্গে তারা কিভাবে হিমালয় অভিযান করেছিল—তারই উত্তেজনা,

তুষার-ব্যাঘ্র তেনজিং

উদ্দীপনাময় দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার কাহিনী। তেনজিং-এর তরুণ বীর-হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠত—অন্তরে জাগত অদম্য স্পৃহা। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন এভারেষ্ট-জয়ের। সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর বাসনা পূরণের সুযোগ উপস্থিত হলো।

গত ত্রিশ বছর ধরে নগাধিরাজ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট-বিজয়ের অভিযান ক্রমাগত চলতে থাকে। শতবর্ষ আগে ১৮৫২ সালে রাধানাথ শিকদার এভারেষ্ট-শৃঙ্গের উচ্চতা পরিমাপ করেন। সেই থেকেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ বলে এর অস্তিত্ব জানা যায়। এভারেষ্ট পূর্বে পিক-১৫ নামে অভিহিত হতো। পরে রাধানাথ শিকদার এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেন। তদানীন্তন সার্ভেয়ার জেনারেল সার জর্জ এভারেষ্টের

নামানুসারে এই শৃঙ্গের নাম দেওয়া হয়—এভারেষ্ট। পূর্বে এই শৃঙ্গ 'কৈলাস পর্বত' এবং গৌরীশঙ্কর নামে পরিচিত ছিল। ইহা নেপালীদের নিকট 'সাগরমঠ' নামে অভিহিত। তিব্বতীরা 'চোমো লুংমা' বলে; অর্থাৎ হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ।

এগার বার এভারেষ্ট অভিযান হয়। এর মধ্যে তেনজিং নয় বার অভিযানে যান। তাঁর দুঃসাহসিকতা এবং অভিজ্ঞতার জন্যে এভারেষ্ট অভিযানে তিনি অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

১৯৩৫ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী এরিক শিপটনের সঙ্গে তেনজিং পোর্টার হিসাবে হিমালয় অভিযানে গমন করেন।

হিউ রাটলেজ সাহেবের নেতৃত্বে ১৯৩৬ সালের অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানেও শেরপা হিসাবে তেনজিং যোগদান করেন। পার্বত্য শেরপাদের বাদ দিয়ে কোন অভিযানই পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এরা শুধু কাঁধে গুরুভার বোঝা নিয়ে সঙ্গে যায় না, দুর্গম পথের হদিসও দিয়ে থাকে। মালবাহীরূপেই দ্বিতীয়বার তেনজিং এই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যান। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক আগেই বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় এই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯৩৮ সালে মিঃ টিলম্যানের নেতৃত্বে গঠিত একটি বৃটিশ অভিযাত্রী দল এভারেষ্ট অভিযান করেন। এবারের অভিযানেও শেরপা তেনজিং যোগদান করেন। কিন্তু এবার তিনি মালবাহীরূপে যান নি, গিয়াছেন পথ-প্রদর্শকের মর্যাদা নিয়ে। এই পর্বতারোহী দল এভারেষ্টের সাতাশ হাজার তিন শ' ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হলে অনেক দিন হিমালয় ও অন্যান্য অভিযান স্থগিত থাকে।

তেনজিং কিন্তু এই সময় আরামে দিন কাটান নি। স্কিয়িং-এ তিনি বিশেষ পারদর্শী। সামরিক ব্যক্তিদের স্কিয়িং শিক্ষা দেওয়া এবং পর্বতারোহণে গাইড হিসাবে কাজ করবার জন্যে তাঁকে বহুবার কাশ্মীরে যেতে হয়েছিল।

অতঃপর ১৯৫২ সালের বসন্তকালে সুইস অভিযাত্রী রেমণ্ড ল্যাম্বার্টের সঙ্গে তেনজিং চিরতুষারমণ্ডিত এভারেষ্ট অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। এই দলের নেতা ছিলেন ডাঃ উইস-ডুনান্ট। তুষার-শার্দুল তেনজিং ও রেমণ্ড ল্যাম্বার্ট ২৮শে মে (১৯৫২ সাল) এভারেষ্টের আটাশ হাজার দুশো পনেরো ফুট পর্যন্ত পৌছেন। পূর্বে এভারেষ্টের অতদূর পর্যন্ত কোন মানুষেরই পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় নি। এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তেনজিং-এর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে পড়ে। আরও উপরে ওঠবার জন্যে পা বাড়ালেন। সেখান থেকে এভারেষ্ট শৃঙ্গের দূরত্ব সাত শ' সাতাশি ফুট মাত্র। কিন্তু ল্যাম্বার্ট সাহেবের একান্ত অনুরোধে তাঁকে এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতে হয়।

এখান থেকেই অভিযাত্রী দল প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তেনজিং-এর নাম এই সময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটাই তাঁর সপ্তম অভিযান।

সুইস পর্বতারোহী দল ভগ্নোৎসাহ হন নি। বর্ষার শেষে শরৎকালে আবার নতুন উদ্যমে তাঁরা তোড়জোড় আরম্ভ করেন। ১৯৫২ সাল। অক্টোবর মাসে ডাঃ আর. গ্যাব্রিয়েল শেভালির নেতৃত্বে সুইস অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানেও শেরপা তেনজিং ও ল্যাম্বার্ট যোগদান করেন। পিরামিডাকৃতি দুরারোহ এভারেষ্টের নিকট এবারও নতি স্বীকার করে ফিরে এল সুইস অভিযাত্রী দল। ফিরে এসে শেরপা তেনজিং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। রোগ ভোগের পর ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েন।

বর্তমান বছর বৃটিশ অভিযাত্রী দল কর্ণেল এইচ. সি. জন হাণ্টের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই অভিযানে তেরো জন অভিযাত্রী ছিলেন। তেনজিং প্রথমে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অবশেষে একটি সর্তে তিনি রাজি হন। কোন কারণে যদি এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় করা সম্ভব না হয় এবং অভিযাত্রী দল ফিরে আসেন, তাহলেও তাঁকে মূল শৃঙ্গে যেতে দিতে হবে। এককও যদি যেতে হয়, তবু তিনি এবার এভারেষ্ট জয় না করে আর ফিরবেন না—এই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। মনে হয় তাঁর এই দৃঢ় সঙ্কল্পই এবারের অভিযানকে জয়মাল্যে ভূষিত করেছে।

জিজ্ঞাসা

আমাদের দপ্তরে প্রায়ই অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন পাঠিয়ে থাকেন। তার মধ্যে অনেকই থাকে ব্যক্তিগত, কতকগুলি থাকে অতি সাধারণ বিষয় সম্পর্কে। সাধারণতঃ ব্যক্তিগতভাবেই এসব প্রশ্নের জবাব চিঠিতে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যা তোমাদের সকলেরই জানবার প্রয়োজন হতে পারে। এরূপ কয়েকটি মাত্র প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেওয়া হলো।

প্রঃ—মানুষ এ পর্যন্ত পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কতদূর অবধি উঠতে পেরেছে এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যেই বা কতদূরের খবর জানা গেছে?

উঃ—পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডল অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ মাইল উপর পর্যন্ত স্তরকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার। দশ মাইলের পর হলো ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। আরও ঊর্ধ্বে আয়নোস্ফিয়ার। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০ মাইল উঁচুতে হলো হিভিসাইড স্তর। বেতার তরঙ্গ এই স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।

অনেকদিনের চেষ্টার পর মানুষ পায়ে হেঁটে মাত্র সেদিন ২৯০০২ ফুট উঁচু হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে সমর্থ হয়েছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডাঃ গ্লেইসার এবং কক্সওয়েল বেলুনে চড়ে প্রায় ৭ মাইল উপরে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর ফ্রান্সের পিকার্ড বেলুনে চড়ে সাড়ে দশ মাইল উপরে উঠেন। আমেরিকার ষ্টিভেন্স অ্যাণ্ডারসন বেলুনে প্রায় চৌদ্দ
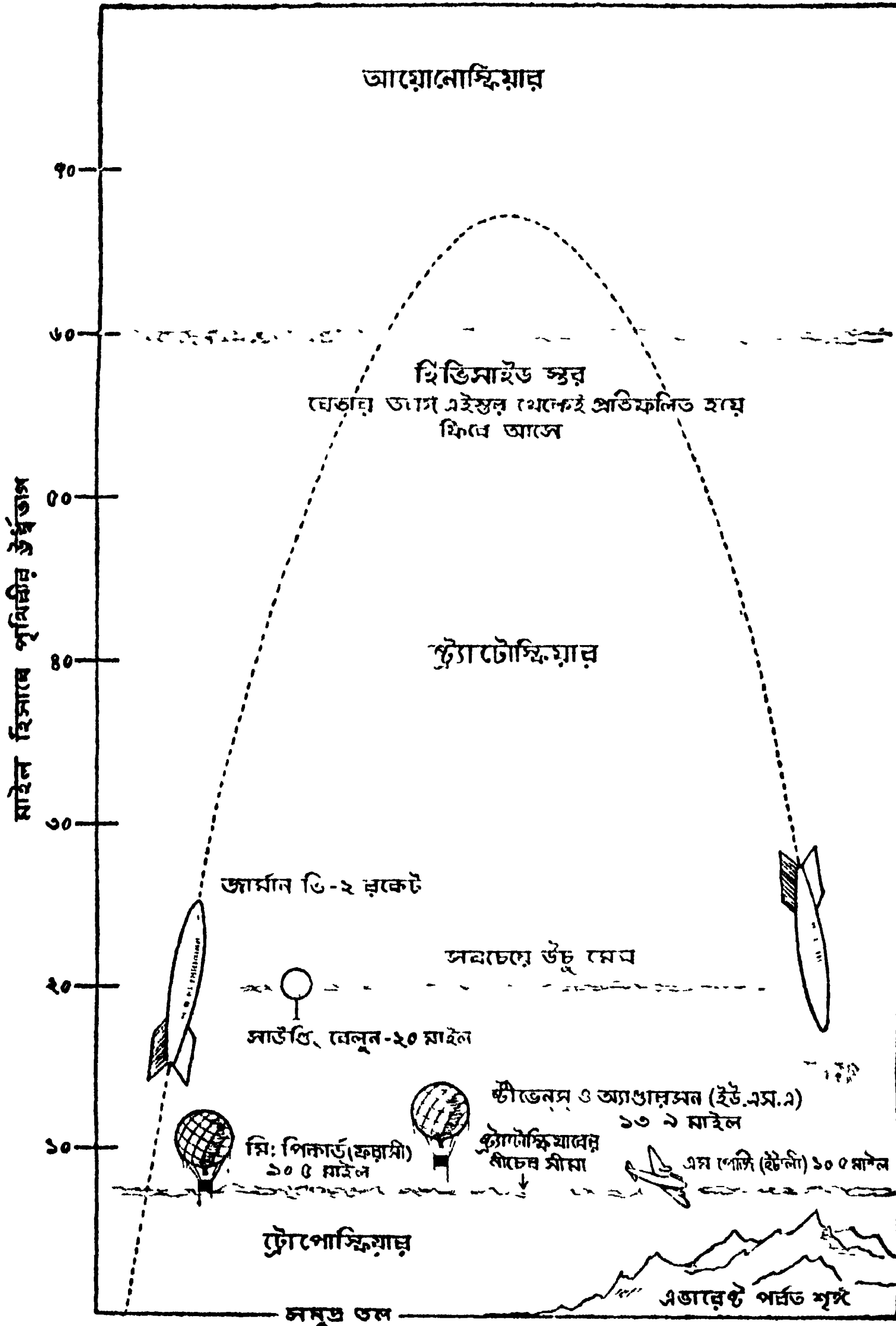
মাইল উপরে উঠতে সমর্থ হন। ইটালীয় পেজি এরোপ্লেনের সাহায্যে সাড়ে দশ মাইল উপরে উঠতে পেরেছিলেন। সাউণ্ডিং বেলুন উঠেছিল প্রায় বিশ মাইল উপরে। জার্মান ভি-২ রকেট আয়োনোস্ফিয়ারে ষাট মাইলেরও উপর উঠেছিল। এসঙ্গে দেওয়া চিত্র থেকে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব স্তরে অগ্রগতির বিষয় সহজেই বুঝতে পারবে।

প্রঃ—বেলুনের সাহায্যে আকাশে বিচরণের উপায় কে প্রথমে উদ্ভাবন করেছিলেন ?

উঃ—প্রথম যাঁরা বেলুন ওড়াবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফরাসী দেশের মণ্টগল্‌ফিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়ের নামই বিশেষ পরিচিত। দু-ভায়ে মিলে লিনেনের সাহায্যে ১০৫ ফুট পরিধির বিরাট্ এক বেলুন তৈরী করেন। খড়-কুটার আগুনের সাহায্যে গরম বাতাস ভর্তি করে বেলুনকে আকাশে ছাড়া হতো। উপরে ওঠবার পর ভিতরের গরম বাতাস ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুন ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসতো।

প্রঃ—উঁচু পাহাড়ে উঠতে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয় কেন ? এরোপ্লেনে অনেক উঁচুতে উঠলেও কি অনুরূপ শ্বাস কষ্ট অনুভূত হয় ?

উঃ—উঁচু পর্বতে আরোহণেব সময় অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকে। কারণ যতই উর্ধ্বে ওঠা যায় বাতাস ততই বিরল হতে থাকে। কাজেই প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মাত্রাও কম থাকে। পূর্বেকার এভারেষ্ট-শৃঙ্গ অভিযাত্রীদের একজন বলেছেন যে, ২৭,০০০ ফুট উর্ধ্বে এক পা এগুতে তাকে প্রায় সাত-আটবার শ্বাস গ্রহণ করতে হয়েছিল। এর জন্যেই পরের বারের অভিযাত্রী দল তাঁদের পিঠে করে অক্সিজেন সিলিণ্ডার বয়ে নিয়ে যান। অতি উর্ধ্বে বিচরণকারী এরোপ্লেনের যাত্রীদের শ্বাসকষ্ট হয়। ১৯৩৯ থেকে '৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আকাশের উর্ধ্ব স্তরে বিচরণকারী বোমারু বিমানের আরোহীরা অতি উচ্চচাপে রাখা অক্সিজেন ব্যবহার করতেন।

প্রঃ— মাঝে মাঝে প্রায়ই আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষার কথা শোনা যায়। পূর্বে নিক্ষিপ্ত বোমা থেকে অধিকতর শক্তিশালী আণবিক বোমা তৈরী হয়েছে কি ?

উঃ—যতদূর খবর পাওয়া যায় তাতে মনে হয় পূর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিসম্পন্ন আণবিক বোমা তৈরী হচ্ছে। কারণ কিছুদিন পূর্বে নেভাদা মরুভূমিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের যে পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায়—এপর্যন্ত যে এগারো বার আণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে এবারের বিস্ফোরণ বৃহত্তম। বিস্ফোরণের ফলে প্রত্যুষে নেভাদা মরুভূমির আকাশ দুই মিনিট পর্যন্ত অগ্নিঝলকে ছেয়ে যায়। অত্যুজ্জ্বল সোনালী রঙের আগুনের গোলা ৩০ সেকেণ্ডেরও বেশী সময় স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত এই মরু অঞ্চলে যত পরীক্ষা হয়েছে এই বিস্ফোরণ নাকি তাদের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মরু অঞ্চল তীব্র আলোকরশ্মিতে ছেয়ে যায়। এই ভয়াবহ শ্বেতাভ আলোকচ্ছটা প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড স্থায়ী হওয়ার পর একটা বিরাট আগুনের গোলার আকার ধারণ করে। দশ মাইল দূর থেকে নাকি এই বিস্ফোরণ সুস্পষ্ট দেখা যায়।

বিবিধ

এভারেষ্ট-শৃঙ্গ বিজয়

গত ১লা জুন লণ্ডন টাইমস পত্রিকার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ অভিযাত্রী দল চিরতুষারমণ্ডিত এভারেষ্ট শৃঙ্গ জয় করিয়াছে। এই বৃটিশ অভিযাত্রী দলের ৩৮ বৎসর বয়স্ক মিঃ ইটস হিলারী এবং ৩৯ বৎসর বয়স্ক শেরপা তেনজিং এভারেষ্ট-শৃঙ্গে আরোহণ করেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মিঃ হিলারী নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং দুর্দ্ধর্ষ পর্বতারোহী শেরপা তেনজিং পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিকবার এভারেষ্ট অভিযানে যোগ দিয়াছেন।

কাঠমাণ্ডুর এক সংবাদে প্রকাশ—শেরপা তেনজিং এবং নিউজিল্যাণ্ডবাসী মিঃ হিলারী কর্তৃক এভারেষ্ট-শৃঙ্গে আরোহণের সংবাদ ২রা জুন পূর্বাহ্নে স্থানীয় বৃটিশ দূতাবাসের একজন মুখপাত্র কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। কর্ণেল হাণ্টের নিকট হইতে রেডিওযোগে সংবাদ আসে—'হিলারী ও তেনজিং ২৯শে মে এভারেষ্ট-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। সকলে সুস্থ আছেন।'

বৃটিশ দূতাবাস ১লা জুন এই সংবাদ গোপন রাখেন। রাণী এলিজাবেথকে তাঁহার রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে জানাইবার জন্য ইহা রেডিওযোগে লণ্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রেরিত হয়।

গত ২৫শে মে ২৭ হাজার ফুট আরোহণের পর প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অভিযাত্রীদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। গত ২৯শে মে ২৯০০২ ফুট উচ্চ এভারেষ্ট-শৃঙ্গ জয়ে তাহারা সফলতা লাভ করে।

৩২ বৎসরের চেষ্টার পর রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক অভিযান চালাইয়া বৃটিশ অভিযাত্রী দল এভারেষ্ট-গিরিশৃঙ্গ জয়ে সমর্থ হইল। এভারেষ্ট-শৃঙ্গ জয়ে বৃটিশ অভিযাত্রী দলের ইহা একাদশ অভিযান।

ইতিপূর্বে যে কয়বার এভারেষ্ট অভিযান হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯২০ সালে দলাই লামা তিব্বত হইতে এভারেষ্ট আরোহণের প্রথম অনুমতি দেন।

১৯২১—বৃটিশ, লেঃ কঃ সি. সি. হাওয়ার্ড বেরীর নেতৃত্বে গঠিত দল ২৩ হাজার ফিট আরোহণ করেন।

১৯২২—বৃটিশ ব্রিগেডিয়ার চার্লস জি ব্রুসের নেতৃত্বে গঠিত দল আরোহণ করেন ২৭,৩০০ ফিট।

১৯২৪—বৃটিশ, লেঃ কঃ ই. এস. নর্টনের নেতৃত্বে গঠিত দল ২৮,১০০ ফিট আরোহণ করেন; এই অভিযানে ম্যালোরী ও আরভিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

১৯৩৩—বৃটিশ, হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে গঠিত দল ২৮,১০০ ফিট আরোহণ করেন।

১৯৩৪—মরিস উইলসন একা আরোহণ করিতে গিয়া প্রাণ হারান।

১৯৩৫—বৃটিশ, এরিক শিপটন কর্তৃক গঠিত দল ২৩ হাজার ফিট আরোহণ করেন।

১৯৩৬—বৃটিশ, মিঃ রাটলেজ কর্তৃক গঠিত দল ২৩ হাজার ফিট আরোহণ করেন।

১৯৩৮—মিঃ টিলম্যানের নেতৃত্বে গঠিত একটি বৃটিশ অভিযাত্রী দল ২৭,৩০০ ফিট আরোহণ করেন।

১৯৫১—বৃটিশ, এই দল ২০ হাজার ফিট আরোহণ করেন।

১৯৫২ সালের বসন্তকাল—সুইস অভিযাত্রী দল ২৮,২১৫ ফিট আরোহণ করেন।

১৯৫২ সালের শরৎকাল—সুইস, আব গ্যাব্রিয়েল শেভ্যালীর নেতৃত্বে গঠিত দল ২৬,৫৭৫ ফিট আরোহণ করিতে সমর্থ হন।

ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী সম্পর্কিত গাণিতিক সমাধান

প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরীর কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণের পূর্ণ সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করা যায় যে, অধ্যাপক বসুর এই আবিষ্কার আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক বসু যে গবেষণা চালাইতেছেন তৎসম্পর্কে তিনি আইনষ্টাইন এবং ডাবলিনের অধ্যাপক স্রডিঙ্গারের সহিত নাকি পত্রালাপ চালাইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা নাকি বিদেশের বিজ্ঞানসম্পর্কিত পত্রিকাদিতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাঁহার একটি প্রবন্ধ ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক স্রডিঙ্গারের মতে ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরীর এমন কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণ আছে যাহার পূর্ণ সমাধান প্রায় অসম্ভব। অধ্যাপক বসু তাঁহার গবেষণার ফলে ঐ সকল সমস্যার নাকি পূর্ণ সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কোয়াণ্টাম ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্-এ মৌলিক অবদানের জন্য ইতিপূর্বেই অধ্যাপক বসু আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এই বিষয়েই তাঁহার নাম অধ্যাপক আইনষ্টাইনের নামের সহিত জড়িত। উক্ত তত্ত্বকে বসু-আইনষ্টাইন ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই বিষয়ে অধ্যাপক বসুর অবদানের গুরুত্বের প্রতি মর্যাদা দিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. এ এম ডিরাক কতকগুলি কণিকার 'বোসন' নামকরণ করিয়াছেন।

জুন মাসে বুডাপেষ্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিমানযোগে বুডাপেষ্টের পথে জেনেভা গিয়াছেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া সম্ভবতঃ আগামী নভেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

বহুমূত্র রোগীর সেবায় ইনসুলিন

জি. ডি. আর্নল্ড-টেলর লিখিয়াছেন—মনোপোলিজ অ্যাণ্ড রেষ্ট্রিকটিভ প্র্যাকটিসেস্ কমিশন সম্প্রতি বৃটিশ ইনসুলিন নির্মাতাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই কমিশনটি স্থাপন করেন একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য। কমিশন ইনসুলিন সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থা জনস্বার্থের অনুকূল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সেই সঙ্গে নির্মাতাদের দক্ষতা, উৎসাহ এবং অভিজ্ঞতার উচ্চ প্রশংসা করেন।

ইনসুলিন সম্পর্কে এপর্যন্ত গবেষণা কম হয় নাই। ইহার পশ্চাতে বৃটিশ বৈজ্ঞানিকদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম রহিয়াছে তাহা নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। বিশ্বব্যাপী বহুমূত্র রোগীরা আজ এই ইনসুলিন ব্যবহার করিতেছে। পেরু হইতে পাকিস্তান, আইসল্যাণ্ড হইতে ভারত, কলাম্বিয়া হইতে সিংহল পর্যন্ত সর্বত্র এই ইনসুলিনের ব্যবহার দেখা যায়।

ইংল্যাণ্ডে মোট ৩,০০০ মিলিয়নের অধিক ইউনিট বৎসরে উৎপন্ন হইতেছে; ৬,০০,০০০ হইতে ৭,০০,০০০ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে তাহা যথেষ্ট।

বৃটেনে বর্তমানে মাত্র চারটি ফার্ম বৃটিশ

ইনসুলিন সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং সরবরাহের এই ব্যবস্থা কমিশন কর্তৃক নিঃসঙ্কোচে সমর্থিত হইয়াছে।

১৯২২ সালে ব্যান্টিং অ্যাণ্ড বেস্ট এবং তাহাদের সহকর্মীরা ক্যানাডায় প্রথম ইনসুলিন আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী বহুমূত্র রোগীদের মধ্যে এক নূতন আশার সঞ্চার করে। কিন্তু প্রায় এক বৎসর পরে ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনটি ফার্ম বৃটিশ তৈয়ারী ইনসুলিনের প্রবর্তন করে।

বৃটিশ নির্মাতাদের মধ্যে ইনসুলিন প্রস্তুত সম্পর্কে যে সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায় তাহাও অনন্যসাধারণ। একটি ফার্ম গ্লোবিন ইনসুলিন প্রস্তুতের পেটেণ্ট গ্রহণ করা সত্ত্বেও অপর একটি ফার্মকে বিনামূল্যে লাইসেন্স দেয় গ্লোবিন ইনসুলিনের জন্য—এই ধরনের ব্যবস্থা যে-কোন শ্রমশিল্পে দুর্লভ।

বৃটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী দপ্তর মনে করেন যে, বৃটিশ ইনসুলিনের গুণ এখনও যে কোন ইনসুলিনের তুলনায় অধিক। লণ্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে ডায়াবেটিক ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ আর. ডি. লরেন্স কমিশনের নিকট সাহায্য দান কালে ইনসুলিনকে প্রথম শ্রেণীর ভেষজ হিসাবে বর্ণনা করেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৃটিশ নির্মাতারা সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট এবং সুলভ ইনসুলিন প্রস্তুত সম্পর্কে এখনও পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের এই কাজে যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিতে হইতেছে। কমিশন নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

আণবিক শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন

আণবিক শক্তি কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, ওকরীজ জাতীয় গবেষণাগারে একটি নূতন ধরনের রিঅ্যাক্টর যন্ত্রের সাহায্যে আণবিক শক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি বৈজ্ঞানিকেরা তাপ উৎপাদনের শক্তিবিশিষ্ট একটি যন্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করেন। এই তাপ হইতে উৎপন্ন বাষ্প অতঃপর টারবাইনের মধ্য দিয়া চালিত করিলে ১৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ৫ খানা ঘরবিশিষ্ট ৫০টি বাড়ী আলোকিত করিবার জন্য এই বিদ্যুৎশক্তিই যথেষ্ট।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য পরিকল্পিত না হইলেও এই রিঅ্যাক্টর যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এখনও বহু সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়াছে। তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, এই যন্ত্র নির্মাণ আণবিক রিঅ্যাক্টরের সাহায্যে সুলভে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

সৈনিকদের জন্য নূতন ধরনের পোষাক

মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা সৈনিকদের জন্য এক নূতন ধরনের বায়ু নিরোধক ইউনিফর্ম প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ ইউনিফর্মের সাহায্যে বিষবাষ্প ও জীবাণুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। অথচ পরিধানকারী কোন প্রকার কষ্ট বোধ করে না বা তাহার কাজকর্মেও কোনও অসুবিধা হয় না। কোনও কোনও রাসায়নিক কারখানার কর্মীদের বর্তমানে উহা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।

বিষবাষ্প ও জীবাণুর আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে গেলে যাহাতে শরীর বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে না আসে তাহা করা দরকার; কিন্তু বায়ুনিরোধক পোষাক পরিধান করিলে বহির্বায়ুর সহিত সংযোগের অভাবে শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং অস্বস্তি বোধ হয়। সেইজন্য পোষাকটির বাহিরের অংশকে জলসিক্ত করিয়া

রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাতে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া থাকে।

পোষাকটি বুটিল রবারে তৈয়ারী, উহা সহজে পুড়িয়াও যায় না। উহার সহিত বায়ুনিরোধক মুখোস, দস্তানা, পাদুকাবরণ প্রভৃতি পরিধান করিলে বিষবাষ্প অথবা জীবাণু আর শরীরের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। পোষাকটি পরিশোধন করা যায় এবং পর্যায়ক্রমে বহুবার ব্যবহার করা যাইতে পারে। অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যই ঐ পোষাক নির্মাণ করা হইয়াছে।

মধ্য যবদ্বীপে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি

কিছুদিন পূর্বের ইন্দোনেশিয়ার খবরে প্রকাশ যে, ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরি ১৮৮৩ সালের পর আবার সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ৭০ মিনিট অন্তর অন্তর ধূম ও অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। ১৮৮৩ সালের ভূকম্পে প্রায় দশ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল এবং ইন্দোনেশিয়া হইতে ভস্ম ব্রেজিল পর্যন্ত গিয়াছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় সম্প্রতি যে চারটি আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তন্মধ্যে ক্রাকাতাউ একটি। প্রকাশ যে, মধ্য যবদ্বীপের প্রায় বিশ লক্ষ অধিবাসী এই আগ্নেয়গিরিটির ধূম ও অগ্নি উদ্গীরণ সুরু হইতে দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

আগ্নেয়গিরিটি ধূম্রজালে আচ্ছাদিত হইয়া আছে এবং মাঝে মাঝে অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।

সুম্বদ্বীপেও নাকি বিস্ফোরণ হইয়াছে এবং ইহার ফলে দুই হাজার গ্রামবাসী গৃহচ্যুত হইয়াছে।

আইসোটোপ ব্যবহার সম্পর্কে শিল্প-মালিক সম্মেলন

গবেষণার অবলম্বনরূপে মার্কিণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ সমস্যা আলোচনার জন্য ওকরিজ আণবিক গবেষণাগার একটি আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করিতেছে।

আমেরিকার ১২০০ রেডিও আইসোটোপ ব্যবহারকারীর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান। ওকরিজ আণবিক গবেষণাগার ঘোষণা করিয়াছে যে, আলোচনা বৈঠকে যোগদানের জন্য শিল্প-মালিক প্রতিনিধিদের আহ্বান জানানো হইয়াছে।

ওকরিজ গবেষণাগার মার্কিন আণবিক শক্তি কমিশনের সহযোগিতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের ১৩০০ বৈজ্ঞানিককে রেডিও আইসোটোপ ব্যবহারের কলা-কৌশল শিক্ষা দেয় এবং আশা করে যে, আলোচনা বৈঠকে শিল্প-মালিকদের পরমাণু-উপজাত বস্তুর প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মতই ওয়াকিবহাল করা হইবে। বহুক্ষেত্রে রেডিও আইসোটোপ অল্প ব্যয়সাধ্য ও কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা সময় বাঁচায় ও শ্রম লাঘব করে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পাইপ লাইনের মধ্য দিয়া কোন্ সময় কি ধরনের অশোধিত তৈল প্রবাহিত হইতেছে তাহা নির্ধারণকল্পে তৈল কোম্পানীগুলি রেডিও আইসোটোপ ও গাইগার কাউন্টারের সাহায্য গ্রহণ করে।

আলোচনা বৈঠকে এই সকল বিশেষ সমস্যা এবং আণবিক শক্তি কমিশনের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি, আইসোটোপ রাসায়নাগারের ব্যয়, আইসোটোপ সংগ্রহ-সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা হইবার কথা।

ভারতীয় শিল্প-পণ্যের উৎপাদন

শিল্প	পরিমাণ	১৯৫১	১৯৫২
সিমেণ্ট	টন	৩১,৯৫,৬০০	৩৫,১২,৯৭৪
কষ্টিক সোডা	”	১৪,৭২৪	১৬,৯৪১
অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট	”	৫২,৭০৫	১,৭৭,১৪৫
কয়লা	”	৩,৪৩,০৮,০০০	৩,৫৯,২৩,৭৩৩
লৌহ, ইস্পাত	”	১০,৭৬,০০০	১০,৮০,৪৪০
কাগজ	”	১,৩১,৯১৬	১,৩৭,৮৬০
বেণ্টিং	”	৬৭৬	৬৯৮
অ্যাস্‌বেস্‌টস্ সিমেণ্ট	”	৮১,৬০০	৮৬,৮৬৭
সাবান	”	৮৩,৪৩৬	৮৫,৪১৪
সীসা	”	৮৫৯	১,১২৬
যৌগিক তন্তু	”	২,০৮৮	৩,৫১৮
তাপসহ মৃত্তিকা	”	২,৩৭,৬০০	২,৪৩,৭৯৯
যানশক্তি-কোহল	গ্যালন	৫৮,০৯,০০০	৮০,২২,২০২
চা-বাক্স (প্লাই উড)	বর্গ গজ	৬,০৬,৪৮,০০০	৭,৮০,৭৬,৭৪১
অপরাপর ”	”	১,০১,৭৬,০০০	১,১৪,৩১,৫২৩
লবণ	হাঃ মণ	৭৪,৩৭৬	৮ ,৪৬৮
কার্পাস সুতা	হাঃ পাউণ্ড	১৩,০৪,৪০০	১৪,৩৫,৬৬৩
” বস্ত্র	হাঃ গজ	৪০,৬৬,৪০০	৪৫,৬৯,০০০
রবার জুতা	সংখ্যা	২,৩০,৪০,০০০	২,৩৪,২৩,৮১৫
শিরীষ	হন্দর	১৪,১১২	১৪,১৮২
স্ক্রু (কাঠের জন্য)	গ্রোস	৭,৯৬,৮০০	১২,০১,৭২১
” (যন্ত্রাদির)	”	১,২৭,২০০	১,৫০,৪৭৭
সেলাই কল	সংখ্যা	৪৪,৪৬০	৪৮,৯৬২
বাইসাইকল্		১,১৪,২৭৬	১,৯১,৮২২
বল্ বেয়ারিং	”	২,৩৪,০০০	৩,৮৯,২৭২
ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প	”	১,৫৫,১৬,০০০	২,০৭,১৬,২৭৪
” মোটর	অঃ শক্তি	১,৪২,০০০	১,৫৮,৮০০
শিরীষ কাগজ	রীম	৩৭,২০০	৪৫,১৮৮
দিয়াশলাই	৫০ গ্রোসের বাক্স	৫,৭৭,২০০	৬,০৪,৩৬৫

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে আমিষ খাদ্যের উৎপাদন

হাজার টন

এশিয়া	মাংস	মাছ	দুধ
ব্রহ্ম	১,০৯	—	১৩৫
সিংহল	২৫	৪০	৫৬
চীন	৩৯,০০	২৭,০০	—
ভারতবর্ষ	৭,৩৮	৫,২০	১,৮০,০০
জাপান	১,৩১	৩৭,৯৭	২,০৬
ইন্দোনেশিয়া	২,১৭	৪,৭২	—
পাকিস্তান	২,৬৪	২,৫০	৫৮,০০
ফিলিপাইন	১,০৪	২,৪৯	৬৬
ইউরোপ			
বেলজিয়াম	৩,০৪	৫৬	৩২,৩০
চেকোশ্লোভাকিয়া	২,৯০	—	২৬,১৯
ডেনমার্ক	৫,২৫		৫৪,০০
ফ্রান্স	১৯,০১	৪,৬৩	১,৫০,০০
পঃ জার্মাণী	১৪,০৪	৬,৮০	১,৪০,০০
ইটালী	৬,১২	১,৯০	৪৯,০০
নরওয়ে	১,০২	১৮,১৮	১৬,১০
সুইডেন	২,৮৬	২,০০	৪,৯০,০০
ব্রিটেন	১১,২৯	১০,৮৫	১,০৫,০০
উত্তর আমেরিকা			
কানাডা	৮,৬৯	৬,৬৩	৭৫,০০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১,০০,০০	২৩,৪৫	৫,৬০,০০
ওশেনিয়া			
অষ্ট্রেলিয়া	১০,২১	৩৯	৫৮,৭৫
নিউজিল্যাণ্ড	৫,৬৫	৩৪	৪৭,৪০

তৈল ও তৈলবীজ

১৯৫১ সালে পৃথিবীতে তৈলবীজ হইতে তৈল ও উদ্ভিজ্জ স্নেহ জাতীয় পদার্থের উৎপাদন, তৈলের ওজনে পরিণত করিলে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন হইয়াছে। ১৯৫০ হইতে ইহা শতকরা ৮ ভাগ ও যুদ্ধপূর্বকাল হইতে ১৩ ভাগ বেশী।

পৃথিবীর খনিজ তৈল

খনিজ তৈলে সমৃদ্ধ কয়েকটি প্রধান দেশের ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালের উৎপাদন নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

লক্ষ (মেট্রিক) টন

	১৯৫১	১৯৫২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩২,৪২	৩৩,১০

ভেনেজুয়েলা	৯,০৮	৯,৫০
সৌদি আরব	৩,৭২	৪,১০
কুওয়েট	২,৮২	৩,৭৭
ইরাক	৮৭	১ ৯০
মেক্সিকো	১,১০	১,১০
কানাডা	৬৪	৮০
পারস্য	১,৬৪ ×	——
মোট	৬১,১০	৬৪,০০

× জানুয়ারি আগষ্ট পর্যন্ত উৎপাদন।

১৯৫০ সালে পারস্যের উৎপাদন ছিল ৩,২৩ লক্ষ টন। এত পরিমাণ তৈল উৎপাদন বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে উৎপাদিত তৈলের মোট পরিমাণ হ্রাস পায় নাই।

পরলোকে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু গত ৩রা জুন বুধবার অপরাহ্ণে তাঁহার পার্শীবাগান লেনের বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। চার বৎসর পূর্বে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল।

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু ১৮৮৭ সালে দ্বারভাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা চন্দ্রশেখর বসু সেখানে দ্বারভাঙ্গা রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ডাঃ বসু ১৯১০ সালে কলিকাতা হইতে এম-বি পাশ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেই বৎসরের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্বাধিক নম্বর পাইয়া মনস্তত্ত্বে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার পরই তিনি পার্ট টাইম অধ্যাপকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই পদ অধিকার করিয়া থাকেন। ঐ বৎসর তিনি উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দুই বার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনস্তত্ত্ব শাখায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এই সমিতির উদ্যোগে তিনি ১৯৪০ সালে মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য লুম্বিনী পার্ক নামে হাসপাতাল স্থাপন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ বসু ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

পরলোকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লী, ২৩শে জুন—নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, গতকল্য শ্রীনগরে রাত্রি প্রায় ৩-৪০ মিনিটে নিখিল ভারত জনসঙ্ঘের সভাপতি ও সংসদ সদস্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে। তিনি প্লুরিসি রোগে ভুগিতেছিলেন।

গতকল্য সকাল ৯ ঘটিকায় ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় অকস্মাৎ তাঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে এবং হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। রাত্রি ১০ ঘটিকায় অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ে এবং শেষ রাত্রি প্রায় ৩-৪০ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার রাত্রি ৮-২৫ মিনিটে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ একখানি বিশেষ বিমানযোগে দমদম বিমানঘাটিতে উপনীত হয়।

গভীর রাত্রে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দেহ ৭৭নং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোডে অবস্থিত তাঁহার বাসভবনে আনীত হয়।

বুধবার সকাল নয় ঘটিকায় উক্ত বাসভবন হইতে শোকযাত্রা করিয়া মহানগরীর বিভিন্ন পথ পরি-

ভ্রমণান্তে ডাঃ মুখোপাধ্যায়েব দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নীত হয় এবং সেখানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত ভাইসচ্যান্সেলাব, কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচাবপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েব দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৯০১ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যে তিনি ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করেন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রবেশিকা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯১৭ সালে প্রথম বিভাগে

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৯২১ সালে বি. এ ডিগ্রীলাভ করেন। তৎপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৩ সালে বাঙ্গলা ভাষায় এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

শ্যামাপ্রসাদ আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি. এল ডিগ্রীলাভ করেন এবং কিছুকাল পর বিলাত যান। সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট উপাধি লাভ করেন।

তিনি ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী ও মেডিকেল কলেজের লেকচারার ডাঃ বেণীমাধব চক্রবর্তীর কন্যা সুধা দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯৩৩ সালে আগষ্ট মাসে সুধা দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম অণুতোষ ও দেবতোষ এবং কন্যাদ্বয়ের নাম সবিতা ও আরতি।

১৯২৪ সালে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে তাঁহাব রাজনৈতিক জীবন সুরু হয় এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে ১৯৩৪ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তিনি দুই বৎসর পব পুনরায় ১৯৩৬ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলাব নিযুক্ত হন। তাঁহার এই চার বৎসরের কার্যকালে বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষাব্যবস্থায় বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

১৯৩৭ সালে গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের তিনি সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং হিন্দু মহাসভার কার্যোপলক্ষে বাঙ্গলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপক সফর করেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মৌলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এই মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের কালে মেদিনীপুরের জনগণের উপর পুলিশ ও সৈনিকেরা অমানুষিক অত্যাচার করে। এই লইয়া তৎকালীন গবর্ণর হার্বার্টের সহিত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রবল

মতবিরোধ হয় এবং তিনি অর্থমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

১৯৪৪ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তাঁহার সভাপতিত্বে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হয়।

১৯৪৭ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতে মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ উক্ত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘকাল হিন্দু মহাসভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হইলে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি লইয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার মতানৈক্য ঘটে এবং তিনি ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য পদও ত্যাগ করেন।

অতঃপর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের স্বার্থ লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ব্যাপক সফর করিতে থাকেন এবং উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গড়িয়া তোলেন।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি 'পিপলস্ পার্টি' বা জনসঙ্ঘ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি বাঙ্গলার রয়াল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচন হয় এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লোকসভায় কলিকাতা দক্ষিণ-পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্র হইতে জনসঙ্ঘের প্রার্থী হিসাবে সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে দিল্লীর চাঁদনীচকে শোভাযাত্রা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে শ্যামাপ্রসাদকে জননিরাপত্তা আইনানুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ভারতভুক্ত করিবার দাবী করিয়া জম্মুর প্রজা পরিষদ যে আন্দোলন চালাইয়াছেন, সেই আন্দোলনেরই সমর্থনে দিল্লীতে সভা শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি দেশরক্ষা বিভাগের প্রবর্তিত পারমিট ব্যবস্থা অমান্য করিয়া ১১ই মে কাশ্মীর প্রবেশ করেন। কাশ্মীর রাজ্যের দুই মাইল অভ্যন্তরস্থ লখিমপুরে প্রবেশ করিলে কাশ্মীর পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং জম্মুতে লইয়া যায়। তাঁহাকে শ্রীনগরে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় ডাল হ্রদের তীরস্থ এক বাটীতে আটক রাখা হয়। এই বাটীকে সাব জেলে পরিণত করা হইয়াছিল।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ রাজনৈতিক কার্য ছাড়াও বহু সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টা-বিংশতিতম অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে বিষ্ণুপুরে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালোর বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গারের সহিত বহু বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের কার্য পরিচালক সভার সদস্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ পঞ্চাশের মন্বন্তর, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগ্‌ল, বঙ্কিম পরিচয় (সম্পাদিত) প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | জুলাই—১৯৫৩ | সপ্তম সংখ্যা

বেতার-তরঙ্গ ও পরমাণু-জগৎ

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

সূক্ষ্ম পরমাণু-জগতের সূক্ষ্মতর ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা উপায় উদ্ভাবন করেছেন। বস্তু-পরমাণু উত্তপ্ত হলে তেজ বিকিরণ করে। তার কারণ হলো পরমাণু-কেন্দ্রীনের বহিঃস্থ ইলেকট্রনগুলি উত্তেজিত হওয়ার ফলে নিম্নের কক্ষ থেকে উর্দ্ধতর কক্ষে চালিত হয় এবং ঐ কক্ষে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না বলেই যখন আগেকার কক্ষে ফিরে আসে তখনই ঐ ইলেকট্রনের তেজটুকু বিকিরিত হয়। পরমাণু-কেন্দ্রীনের বাইরে বৃত্ত বা উপবৃত্তাকার কক্ষগুলিতে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন মাত্রার তেজে বাঁধা থাকে। পরমাণু-কেন্দ্রীনের খুব কাছাকাছি কক্ষের ইলেকট্রনগুলির এই বন্ধন-তেজ তার পরবর্তী কক্ষের ইলেকট্রনদের চাইতে বেশী, কারণ ধনাত্মক বৈদ্যুতিক কেন্দ্রীন ও ঋণাত্মক ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি দূরত্বের উপর নির্ভর করে। তাই অদূরবর্তী ইলেকট্রনগুলির উপর কেন্দ্রীনের টান বেশী; ফলে সেসব ইলেকট্রনের বন্ধন-তেজও বেশী। কেন্দ্রীন থেকে দূরতর কক্ষের বন্ধন-তেজও ক্রমশঃ হ্রাস পায়। পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের তেজ তাই সবচেয়ে কম। ১নং চিত্রে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের যে শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়েছে তা থেকে বিভিন্ন তেজ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও তেজের মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। পরমাণু-কেন্দ্রীনের সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রন উত্তেজিত হলে সাধারণ দৃশ্যআলোক-তরঙ্গ বিকিরণ করে। তাই সাধারণ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে এই ইলেকট্রনগুলির কার্যকলাপ সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায়। পরমাণুর নিম্নতর কক্ষগুলির ইলেকট্রনের বন্ধন-তেজ বেশী—তাই অধিকতর তেজসম্পন্ন এক্স-রে দিয়ে তাদের উত্তেজিত করা সম্ভব। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় তাদের বিকিরিত তেজও এক্স-রে'র শ্রেণীতে পড়ে। পরমাণুর এক্স-রে বর্ণালী দিয়ে তাই পরমাণুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রনগুলির স্থান-বিন্যাস নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তেজিত পরমাণুর বিকিরিত তেজের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও তেজমাত্রা বিভিন্ন। এই তেজমাত্রা দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। প্ল্যাঙ্কের

সমীকরণ দিয়ে জানা যায়—তেজমাত্রা = প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা × তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা। এক সেকেণ্ডে তেজ-তরঙ্গটি যতবার স্পন্দিত হয় তাকে সেই তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা বলা হয়। স্পন্দন-সংখ্যা × তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য = আলোর গতিবেগ।

এই সূত্র থেকে স্পন্দন-সংখ্যা ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সম্বন্ধ বোঝা যাবে। এখন উত্তেজিত পরমাণু কোয়াণ্টা বিকিরণ করে তখন সেই কোয়াণ্টার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্ল্যাঙ্কের সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়। এই কোয়াণ্টার তেজমাত্রা খুব বেশী হলে এক্স-রে বা গামা-রে'র পর্যায়ে পড়ে, আর কম হলে দৃশ্য-আলো বা লালউজানী আলো বোঝায়। সোডিয়াম বাষ্পের প্রদীপে যে আলো দেখা যায়, তা সোডিয়াম পরমাণুর উত্তেজিত ইলেকট্রনের

তেজ স্পন্দনসংখ্যা তরঙ্গদৈর্ঘ্য

$১০^{২৩}$ — ০.০০০৩ আ: — গামারশ্মি
$১০^{২১}$
৪.১৪×১০^{৫} ই: জো: — ০.০৩ আ: — অতিভেদক রঞ্জনরশ্মি
$১০^{১৯}$
৩০ আ: — অল্পভেদক রঞ্জনরশ্মি
$১০^{১৭}$
৩০০ আ: — অতিবেগুনি
৪.১৪ ই: জো: — $১০^{১৫}$ — দৃশ্য
৩০,০০০ আ:
$১০^{১৩}$ — লালউজানী
৩,০০০,০০০ আ:
$১০^{১১}$ — অনুতরঙ্গ
৪.১৪×১০^{-৫} ই: জো: — ৩০ সে:
$১০^{৯}$
৩০০ সে: — বেতারতরঙ্গ
$১০^{৭}$
৩০০ মি:
৪.১৪×১০^{-১০} ই: জো: — $১০^{৫}$
৩০ কি: মি:
$১০^{৩}$ — শ্রুতি বেতার তরঙ্গ
৩,০০০ কি: মি:
১০
৪.১৪×১০^{-১৪} ই: জো: — ১ — ৩০০,০০০ কি: মি:
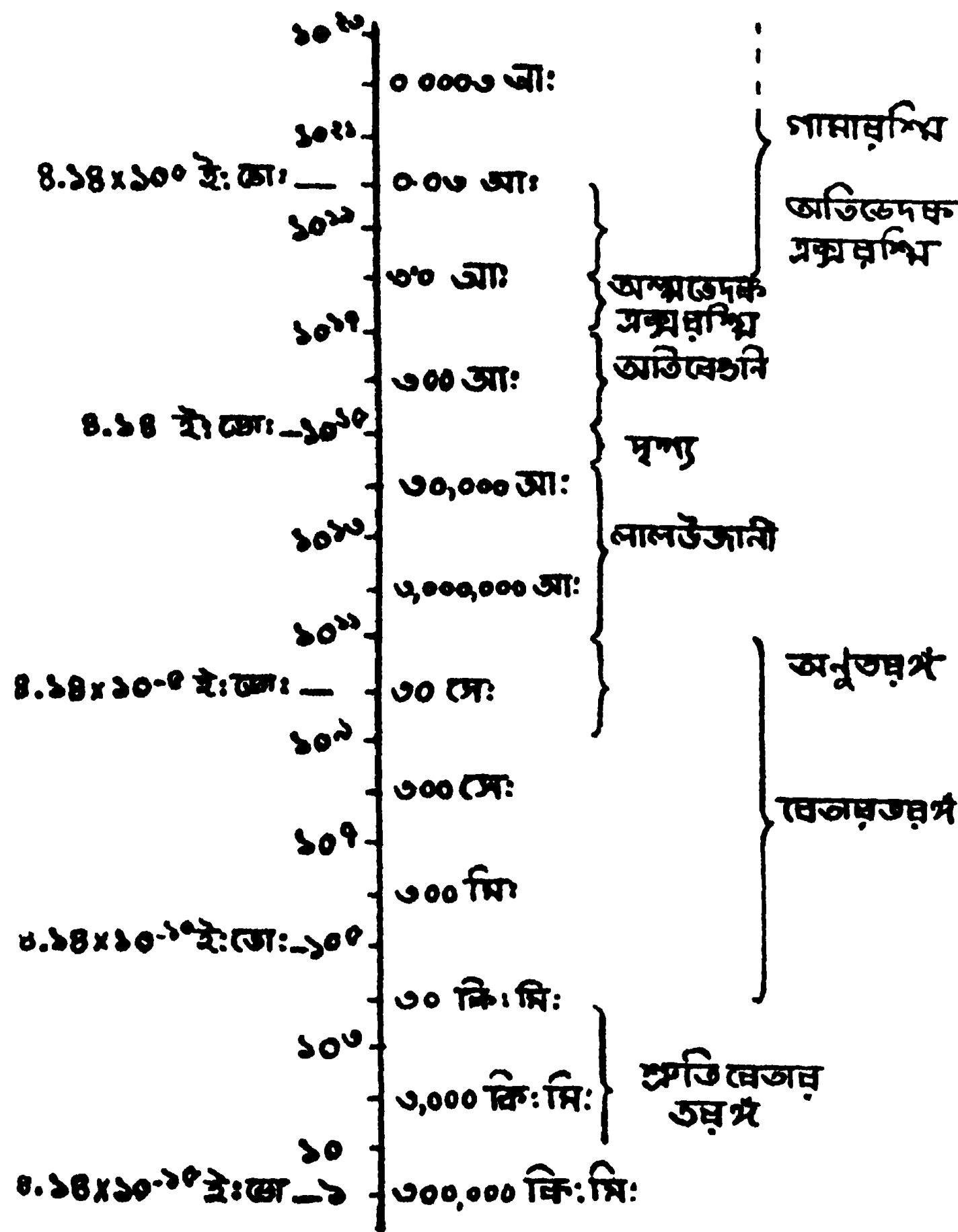
১নং চিত্র

যে তেজ বিকিরণ করলো তার প্রত্যেকটি মাত্রা হলো প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা ও বিকিরিত তেজের স্পন্দন-সংখ্যার গুণফল; অর্থাৎ এই বিশেষ মাত্রার কোন ভগ্নাংশ সেই বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গটি বিকিরণ করতে পারে না। তাই এই মাত্রাটি হলো সেই বিশেষ তেজের একটি কোয়াণ্টা বা তেজ-পরমাণু।

যখন একটি পরমাণু উত্তেজিত অবস্থায় একটি প্রায় ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট তেজ বিকিরণের ফলে ঘটে থাকে। কিন্তু উত্তেজিত পরমাণু যখন এর চেয়ে অনেক কম তেজ বিকিরণ করে তখন তা বেতার-তরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী ও স্পন্দন-সংখ্যা কম, তাই তেজমাত্রাও কম। ১নং চিত্রে বিভিন্ন বেতার-তরঙ্গ ও তেজমাত্রা দেখানো হয়েছে। বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা পরীক্ষায়

খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যায়। তাই পরমাণু-বিকিরিত স্বল্প তেজমাত্রা যখন বেতার-তরঙ্গের আকারে নির্গত হয় তখন তার স্পন্দন-সংখ্যা পরিমাপ করে পরমাণুর সূক্ষ্মতর অবস্থার ক্রিয়া-কলাপ সহজেই বলে দেওয়া যায়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাবি সর্বপ্রথম পরমাণু-কেন্দ্রীনের চুম্বকীয় ও ঘূর্ণন ধর্ম পর্যবেক্ষণে বেতার-তরঙ্গের ব্যবহার করেন। নিউট্রন ও প্রোটন সমবায়ে গঠিত পরমাণু-কেন্দ্রীন লাটিমের মত ঘূর্ণনশীল। এই ঘূর্ণনের কৌণিক গতিবেগকে বলা হয় স্পিন। দৈর্ঘ্য, ওজন ও সময় যেমন ফুট, পাউণ্ড ও সেকেণ্ড একক (unit) ধরে হিসেব করা হয়, সেইরূপ স্পিনের একক হলো

$$\frac{\text{প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা}}{২ \times \text{পাই}} \left(\text{পাই} = \frac{২২}{৭} \right)$$

এই এককে বিভিন্ন পরমাণু-কেন্দ্রীনের স্পিন ০, $\frac{১}{২}$, $\frac{২}{২}$, $\frac{৩}{২}$, $\frac{৪}{২}$, $\frac{৫}{২}$ ইত্যাদি হতে পারে। এই সংখ্যাগুলির অর্থ হলো পরমাণু-কেন্দ্রীন কোনও চুম্বকক্ষেত্রে নীত হলে তার স্পিন যদি ক/২ হয় তবে চুম্বকক্ষেত্রের বলরেখার সঙ্গে বিভিন্ন কোণে ক+১ দিকে নিজের অক্ষরেখা স্থাপিত করতে পারে। বিদ্যুৎভরণ সমন্বিত বলে কেন্দ্রীনের নিজস্ব চুম্বকত্ব রয়েছে; তাই বাইরের চুম্বকক্ষেত্রে তার আচরণ এরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু যে কোনও কোণে কেন্দ্রীনটি অক্ষরেখা স্থাপন করতে পারে না। ২নং চিত্রে $\frac{৬}{২}$ সংখ্যা স্পিন বিশিষ্ট পরমাণু-কেন্দ্রীন চুম্বকক্ষেত্রে যে ৬+১=৭টি বিভিন্ন দিকে অবস্থান করতে পারে তা দেখানো হয়েছে। এই প্রত্যেকটি দিকের অবস্থান কেন্দ্রীনের তেজেরও তারতম্য ঘটায়। এই তারতম্য এত কম যে, তা বেতার তরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। তাই বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে এই তারতম্যটুকু হিসেব করে পরমাণু-কেন্দ্রীনের নিজস্ব চুম্বকশক্তি কতটুকু তা বলে দেওয়া যায়।

ঘূর্ণরত লাটিমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঘূর্ণনের সঙ্গে লাটিমের অক্ষটিও সমগ্রভাবে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। কোনও শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রে পরমাণু-কেন্দ্রীনের ঘূর্ণন-অক্ষটিরও চলন (precession) হয়। ৩নং চিত্রে পরমাণু-কেন্দ্রীনের অক্ষ ক খ চুম্বকক্ষেত্রে যে কোন কোণে অবস্থান করে ঘূর্ণনের সঙ্গে ক চ ও খ ছ বৃত্তে চালিত হয়। প্রতি সেকেণ্ডে কেন্দ্রীনটি যতবার এই বৃত্ত পরিক্রমণ করে সেই চলন সংখ্যাকে N ধরে বাইরের চুম্বকক্ষেত্র, কেন্দ্রীনের নিজস্ব চুম্বকশক্তি (magnetic moment) ও স্পিনের সম্বন্ধ নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়—$N = \frac{KHM}{S}$

H→ বাইরের চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি; M→ কেন্দ্রীনের নিজস্ব চুম্বকশক্তি, S→ স্পিন। K একটি নিত্য-

২নং চিত্র

সংখ্যা যা গণনা করে দেখা হয়েছে, সব কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রেই সমান। বাইরের চুম্বকক্ষেত্রের শক্তি বিভিন্ন উপায়ে সহজে মাপা যায়। কেন্দ্রীনের স্পিন নির্ধারণেরও সহজ উপায় আছে। কিন্তু কেন্দ্রীনের নিজস্ব চুম্বকশক্তি M মাপতে হলে কোনও চুম্বকক্ষেত্রে তার চলন-সংখ্যা N জানা দরকার।

৩নং চিত্র

৪ (১) নং চিত্রে বেতার-তরঙ্গ দিয়ে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীনের চুম্বকশক্তি নিধারণের পরীক্ষাটি দেখানো হয়েছে। প্রথমতঃ একটি চুল্লীতে পরীক্ষণীয় বস্তুকে উত্তপ্ত করে বাষ্পীভূত করা হয়। তখন বস্তু-পরমাণুগুলি তীব্রবেগে চ মুখটিতে প্রবেশ করে। সমগ্র যন্ত্রটি বায়ুশূন্য করা থাকে, তাই এই পরমাণুগুলির গতিবেগ বায়ু-পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। প্রবেশ পথে যে ক ক' চুম্বকটি থাকে তার শক্তি একটি মেরুতে অন্য মেরুর চাইতে অনেক বেশী - অর্থাৎ চুম্বকটির শক্তি অসম। ফলে পরমাণুগুলি বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে
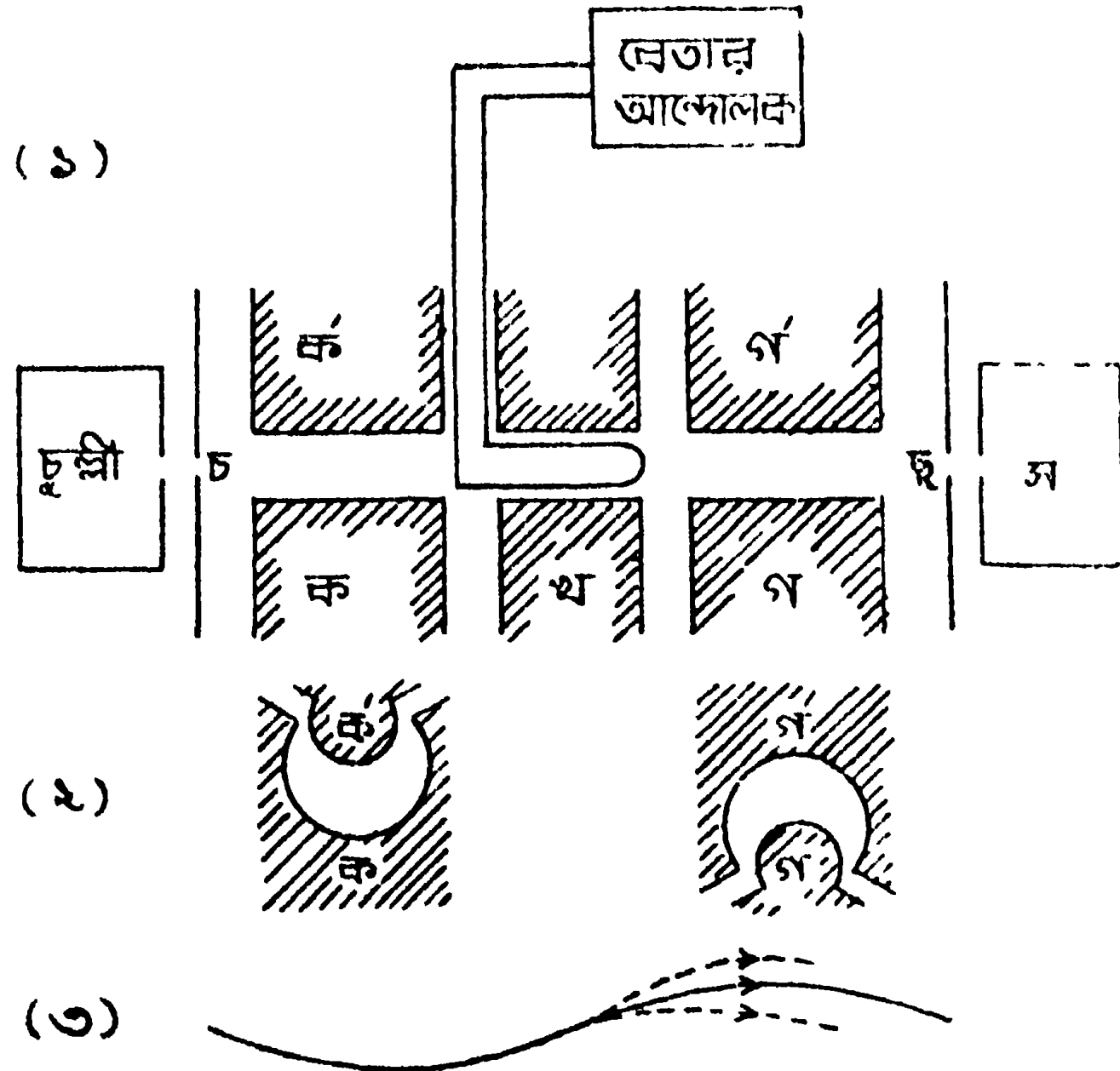
৪নং চিত্র

পড়ে। যে কেন্দ্রীনের অবস্থান ২নং চিত্র অনুযায়ী +৩ বা +২ অবস্থায় থাকে তারা চুম্বক বলরেখার প্রায় সমান্তরাল থাকে বলে অধিক আকৃষ্ট হয়,

তুলনামূলকভাবে ০ বা +১ অবস্থার কেন্দ্রীনগুলি আকৃষ্ট হয় কম। ফলে উভয় মেরুর মধ্যে কেন্দ্রীনগুলি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এখন খ চুম্বক ও বেতার আন্দোলক যদি না থাকে তবে এই কেন্দ্রীনগুলি গ র্গ চুম্বকক্ষেত্রে চালিত হবে। গ র্গ চুম্বক ক্ষেত্রটি ক র্ক চুম্বকের মত অসম হলেও বিপরীত। ৪ (২) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ক র্ক চুম্বকের র্ক মেরুটি যদি বেশী শক্তিশালী হয় তবে গ র্গ এর গ মেরুটি র্গ-এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী রাখা হয়। অথচ ক মেরু র্গ মেরুর সমান শক্তি ধারণ করে। ফলে ক র্ক চুম্বকক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত কেন্দ্রীনগুলি গ র্গ ক্ষেত্রে বিপরীত অথচ সমানভাবে আকৃষ্ট হয়। তাই এই ছড়িয়ে-পড়া কেন্দ্রীনগুলি আবার একত্রিত হয় ও সংযন্ত্রে ধরা দেয়।

এখন ক র্ক ও গ র্গ-এর মধ্যে যদি একটি শক্তিশালী চুম্বক খ রাখা হয়, তবে কেন্দ্রীনগুলির অক্ষ-চলন (precession) ঘটে (৩নং চিত্র)। এই চলন-সংখ্যা কেন্দ্রীনের চুম্বকশক্তি ও খ চুম্বকের শক্তির উপর নির্ভর করে। বেতার আন্দোলক যন্ত্রে বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করে খ চুম্বকের কাছে রাখা হয়। এই বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা কেন্দ্রীনের খ চুম্বকজনিত চলন-সংখ্যার সঙ্গে সমান হলে এই সমতানতার (resonance) ফলে কেন্দ্রীনগুলি উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনায় কেন্দ্রীনগুলি খ-এর বলরেখার সঙ্গে যে যে কোণে অবস্থিত ছিল—সেই সব দিক পরিবর্তন করে। ফলে গ র্গ চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি আর ক র্ক-এর সমান থাকে না। কতকগুলি কেন্দ্রীন দিক পরিবর্তনের ফলে হারিয়ে যায়। তখন সংযন্ত্রে দেখা যায় যে, কতকগুলি কেন্দ্রীন শোষিত হয়েছে। এই শোষণ ক্রিয়াটি যে অবস্থায় ধরা পড়ে, সেই অবস্থায় আন্দোলিত বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যাই কেন্দ্রীনের চলন-সংখ্যা N। পূর্বোক্ত সূত্র অনুযায়ী K, H, S, জানা থাকলে N-এর মান থেকে কেন্দ্রীনের চুম্বকশক্তি M সহজেই গণনা করা যায়।

৫নং চিত্র

কেন্দ্রীনের চুম্বকশক্তি পরিমাপের আরও একটি বিকল্প উপায় আছে। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীনের হ্রাসপ্রাপ্ত পরিমাণ থেকে কেন্দ্রীনের চলন-সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু এই বিকল্প উপায়ে কেন্দ্রীনের চলনকালে তার অক্ষের দিক পরিবর্তনের ফলে যে বেতার তেজ শোষণ বা বিকিরণ করে তার পরিমাপ নেওয়া হয়। ৫নং চিত্রে বেতার-আন্দোলক যন্ত্র, গ তারে এই বেতার-তরঙ্গ পরিচালিত হয়। খ টিউবটিতে পরীক্ষণীয় বস্তুটি রাখা হয়। ঙ একটি বেতার গ্রাহকযন্ত্র। সমগ্র যন্ত্রটি একটি স্থির চুম্বকক্ষেত্রে রাখা হয়। এই চুম্বকক্ষেত্রের ক্রিয়ায় টিউবের মধ্যস্থিত পরমাণু-কেন্দ্রীনগুলির চলন হয়। একটি নির্দিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যার বেতার-তরঙ্গ আন্দোলক যন্ত্রে সৃষ্টি

করে। স্থির চুম্বকক্ষেত্রটির পরিবর্তন করলে চুম্বক-ক্ষেত্রের শক্তির এমন একটি বিশেষ মান পাওয়া যায় যখন কেন্দ্রীনের চলন-সংখ্যা সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যার সঙ্গে মিলে যায়। ফলে কেন্দ্রীনের ঘূর্ণন-অক্ষ দিক পরিবর্তন করে। আন্দোলক যন্ত্র থেকে তখন কিছুটা তেজ কেন্দ্রীন-গুলি শোষণ করে নেয় এবং এ ভাবে বেতার-তরঙ্গের স্রোত কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়। এই স্রোত হ্রাস পেলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চুম্বক-শক্তিতে চলমান কেন্দ্রীনের চলন-সংখ্যা বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার সঙ্গে সমান হয়েছে। এই স্পন্দন-সংখ্যাকে N ধরে পূর্বোক্ত সূত্র অনুযায়ী M গণনা করা হয়। এ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ না করে বেতার গ্রাহক যন্ত্র ও দিয়েও কেন্দ্রীনের চলন-সংখ্যা বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার সমতানতা পর্যবেক্ষণ করা যায়। কারণ কেন্দ্রীন যখন বেতার-তরঙ্গ শোষণ করে পুনরায় বিকিরণ করে তখন গ্রাহক যন্ত্রে তা ধরা পড়ে। গ্রাহক যন্ত্রের বেতার-তরঙ্গস্রোতের পরিমাপ করে বলা যায় কেন্দ্রীনের চলন-সংখ্যার সঙ্গে বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা সমান হয়েছে। এসব প্রক্রিয়ায় বহু পরমাণু-কেন্দ্রীনের চুম্বকশক্তি নির্ণয় করা হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীনের চুম্বকশক্তি ও স্পিন থেকে পরমাণু-কেন্দ্রীনের গঠনপ্রণালী বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়েছে। কেন্দ্রীনের বাইরে ইলেকট্রন বিশেষ নিয়মে বিভিন্ন কক্ষে সাজানো থাকে। তার হুবহু চিত্র যেমন দৃশ্যআলো ও এক্স-রে'র পরীক্ষায় ধরা পড়েছে—তেমনি বেতার তরঙ্গের পরীক্ষায় কেন্দ্রীনের চুম্বকশক্তি পরিমাপ করে দেখা হয়েছে যে, পরমাণু-কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটনগুলিও কোন বিশেষ নিয়মে বিভিন্ন কক্ষে সুসজ্জিত। কেন্দ্রীনকে তরলবিন্দু বা বায়বাকার কল্পনা করে তার যেসব ধর্ম ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি, বেতার-তরঙ্গের পরীক্ষায় তা সহজবোধ্য হয়েছে।

বিভিন্ন ভিটামিনের পারস্পরিক সম্বন্ধ

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

শারীর-বিজ্ঞান ও পুষ্টি-বিজ্ঞানের গবেষণায় নিত্যনতুন বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ভিটামিন আবিষ্কৃত হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের ভিটামিন আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের একটা কৌতূহল হলো যে, এতগুলি ভিটামিনের পরস্পরের মধ্যে কি কোন সম্বন্ধ নেই? একটি ভিটামিনের কার্যকারিতা কি অপর কোন ভিটামিনের কার্যকারিতার উপর নির্ভরশীল? উহাদের একটির অভাবের ফলে অপরের কার্যকারিতা প্রভাবান্বিত হয় কি? একটি অল্প অথবা বেশী মাত্রায় গ্রহণ করবার ফলে অপরটির কার্যকারিতা কি হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়? এ সব প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে তুলেছে এবং তারা এ সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ সব শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে ভিটামিনসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর কিছু আলোকপাত হয়েছে। একটি ভিটামিনের সঙ্গে অন্য একটি ভিটামিনের কি সম্পর্ক আজ তা জানা গেছে, ফলে চিকিৎসক ও পথ্যবিদ্‌দের খাদ্য ব্যবস্থায় বিশেষ সাহায্য হয়েছে।

এ সম্বন্ধে এটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পারস্পরিক সম্বন্ধ বের করবার জন্যে অধিকাংশ গবেষণা হয়েছে ইঁদুর, গিনিপিগ, বানর, খরগোস ইত্যাদি পরীক্ষাগারের জীবজন্তুর উপর। মানুষের উপর পরীক্ষা হয়েছে সামান্য কয়েকটি

ক্ষেত্রে মাত্র। পরীক্ষাগারের জীবজন্তুর উপর পরীক্ষিত ফলাফল যে মানুষের উপর সম্পূর্ণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক সত্য, তা নিশ্চিত। ভবিষ্যতে হয়তো মানুষের উপর বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা হবে এবং বিভিন্ন ভিটামিনের পারস্পরিক সম্বন্ধের চূড়ান্ত ফলাফল জানা যাবে। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত ফলাফল জানা গেছে তা ই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হ'লো।

ভিটামিন-এ'র সঙ্গে ভিটামিন-ডি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে সব খাদ্যে ভিটামিন-এ বেশী থাকে, সে সব খাদ্যে স্বভাবতঃই ভিটামিন-ডি বেশী থাকে। একই খাদ্যে উভয়ের অবস্থিতি ছাড়াও একের কার্যকারিতা অন্যের কার্যকারিতার উপর নির্ভরশীল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মর্গ্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, রঙ্গোত্তর রশ্মি প্রভাবান্বিত অতিমাত্রায় আর্গোষ্টেরলের যে অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা অতিরিক্ত মাত্রায় (স্বাভাবিকের প্রায় ৩০০-১০০০ গুণ বেশী) ভিটামিন-এ গ্রহণ করার ফলে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। আবার অতিরিক্ত ভিটামিন-ডি গ্রহণ করার ফলে যে বিষক্রিয়া হয় তা স্বাভাবিকের কম ভিটামিন-এ গ্রহণ করার ফলে অত্যন্ত বেড়ে যায়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দেখা গিয়াছে যে, ক্রমাগত ভিটামিন-এ অভাবগ্রস্ত ইঁদুর যদি অতিমাত্রায় (প্রায় ৬০০০ আন্তঃ ইউঃ) ভিটামিন-ডি গ্রহণ করে তবে উহার আর্টেরিয়েল ও টিস্যু ক্যালসিফিকেশন দেখা দেয়। প্রথমোক্ত পরীক্ষা থেকে এই প্রমাণিত হয়েছে—যে সমস্ত প্রাণীকে মাছের যকৃৎ-নিঃসৃত গাঢ় ভিটামিন-ডি দেওয়া হয়, তাদের অতিরিক্ত ভিটামিন-এ দেওয়া যেতে পারে; অর্থাৎ অতিরিক্ত ভিটামিন-ডি'র বিষক্রিয়া অতিরিক্ত ভিটামিন-এ প্রশমন করতে সমর্থ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সহকর্মীদের সঙ্গে ডাঃ এ. ডব্লিউ. ডেভিস কতকগুলি ইঁদুরকে ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-ই অভাবে রাখেন। উহাদের কতকগুলিকে dl-আলফা-টকোফেরোল দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, যাদের টকোফেরোল দেওয়া হয় নি তাদের দেহের সঞ্চিত ভিটামিন-এ দ্রুত ব্যয়িত হয়ে গেছে। তেমনি বহুদিন স্থায়ীভাবে খাদ্যে ভিটামিন-ই না দিয়েও দেখা গেছে যে, দেহের বিভিন্ন স্থান তো বটেই, এমন কি যকৃৎ—যেখানে সবচেয়ে বেশী ভিটামিন-এ সঞ্চিত থাকে, সেখান থেকে পর্যন্ত ভিটামিন এ অদৃশ্য হয়ে যায়। কুকুর, খরগোস, গিনিপিগেও তা লক্ষ্য করা হয়েছে। আবার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে দেখা গেছে যে, ভিটামিন-এ অভাবগ্রস্ত ইঁদুরের দৈহিক বৃদ্ধিতে অতিমাত্রায় ভিটামিন-ই'র প্রভাব বিশেষ কার্যকরী। তাই ভিটামিন-এ বা ক্যারোটিন স্বাভাবিকের চেয়ে পরিমাণে কম গ্রহণ করেও যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-ই গ্রহণ করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এই কারণেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যে স্বাভাবিক পরিমাণ ভিটামিন-এ'র সহিত প্রতি কিলোগ্র্যাম দৈহিক ওজনে দৈনিক ০.৬-৩.০ মিলিগ্র্যাম ভিটামিন-ই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৯৩১ সালে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দেহে সঞ্চিত ভিটামিন-এ কম হলেও ভিটামিন-বি'র অভাব উহাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে না।

কোন কোন ক্যানসার রোগীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ভিটামিন-এ র সঙ্গে কোলিনের সম্পর্ক আছে।

ভিটামিন-এ'র অভাবে ইঁদুরের হৃৎপিণ্ড, থাইমাস, কিড্‌নি প্রভৃতিতে অ্যাস্করবিক অ্যাসিডের (বা ভিটামিন-সি) পরিমাণ কমে যায়। এমন কি, জটিল ভিটামিন-এ'র অভাবে অ্যাড্রিন্যাল, থাইরয়েড এবং পিটুইটারী গ্রন্থির অ্যাস্করবিক অ্যাসিডও পরিমাণে কমে যায়। ভিটামিন-এ'র অভাবে প্রস্রাবের সঙ্গে যে ভিটামিন-সি বের হয়,

তাও কমে যায়। ডাঃ পি. এইস. ফিলিপস্ পশু-শালার গো-বৎসের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ভিটামিন-এ'র অভাবে গো-বৎসের টিশুতে ভিটামিন-সি হ্রাস পায়। সুতরাং ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-সি'র সম্বন্ধ বেশ স্পষ্টতর।

ভিটামিন ই'র অভাবে, সবে মাত্র দুধ ছেড়েছে এমন কুকুর, ইঁদুর, গিনিপিগ বা খরগোসের পেশীসমূহের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। ঐ সব প্রাণীর খাদ্যে থিয়ামিন ক্লোরাইড দেওয়ার ফলে সুফল পাওয়া গেছে। তাই মনে হয় থিয়ামিনের সঙ্গে ভিটামিন ই'র সম্বন্ধ আছে।

আবার থিয়ামিনের অভাবে হৃৎপিণ্ড, কিড্‌নি যকৃৎ ও থাইমাসে ভিটামিন-সি কমে যায়। রিবোফ্ল্যাভিনের অভাবে ভিটামিন-সি কমে যায় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। থিয়ামিন ও প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিডের অভাবে পরিপাক ও আত্মীকরণের সময় যকৃতে রিবোফ্ল্যাভিন চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। থিয়ামিন অভাবে রিবোফ্ল্যাভিন বিপাকে বিঘ্ন হয়, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, রিবোফ্ল্যাভিন অভাবে থিয়ামিনের বিপাকে কোন বিঘ্ন হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মানুষের মধ্যে থিয়ামিন গ্রহণ করার ফলে অল্পক্ষণের জন্য প্রস্রাবে রিবোফ্ল্যাভিনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়ামস্ দেখেন যে, মানুষের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিডের ক্রিয়া রিবোফ্ল্যাভিনের উপর নির্ভরশীল। দেহে রিবোফ্ল্যাভিন ইনজেকসন দেওয়ার ফলে রক্তে রিবোফ্ল্যাভিন ছাড়াও প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। মুখ দিয়ে ক্যালসিয়াম প্যাণ্টোথেনেট গ্রহণ করার ফলেও রিবোফ্ল্যাভিন অভাবগ্রস্ত রোগীর দেহে অনুরূপ ফল পাওয়া গেছে। আবার প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড ইনজেকসন করে দেওয়ার পর রক্তে প্রায় ২৫% রিবোফ্ল্যাভিন বেড়ে যায়। সুতরাং রিবোফ্ল্যাভিন ও প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিডের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা নিশ্চিত।

প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিড এবং ইনসিটোলের আন্তঃসম্বন্ধ জ্ঞাতার্থে দৈহিক বৃদ্ধি ও দুগ্ধদানকালে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, একটির অভাবে যে সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয় তা অন্যটি দেওয়ার ফলে প্রশমিত হয়। দুগ্ধদানকালে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, ভিটামিন-বি গোষ্ঠীর দানাদার অন্যান্য ভিটামিনের উপর প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিডের প্রভাব আছে। প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিড এবং ইনসিটোল ইঁদুরের বৃদ্ধির হারকে প্রভাবান্বিত করে—থিয়ামিন প্রয়োজনের সামান্য কম হলেও বিশেষ অনিষ্ট হয় না। এও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিডের উপচিতি বায়োটিন ও ফোলিক অ্যাসিডের প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। আবার, বায়োটিন ও প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড শুধু একই সঙ্গে থাকে না, উহাদের কার্যকারিতার সাধারণ সম্পর্কও আছে।

রক্তনালীর প্রাচীরের স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যে ভিটামিন-সি'র সহযোগীরূপে ভিটামিন-পি (বা সাইট্রিন)-এর দরকার আছে। ভিটামিন-ই'র সঙ্গে ভিটামিন-এফ-এরও সামান্য সম্পর্ক আছে।

আশা করা যায়, পুষ্টি-বিজ্ঞানে নতুন নতুন গবেষণার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ভিটামিনসমূহের অন্যান্য সম্বন্ধের বিষয়ও আবিষ্কৃত হবে।

আমাদের খাদ্য

শ্রীহৃষীকেশ রায়

খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সাধারণতঃ এত সংকীর্ণ যে, এ বিষযে পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও প্রচার করা একান্ত আবশ্যক। খাদ্যের ঘাটতি যখন উৎপন্ন ফসলের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না, তখন বিভিন্ন খাদ্য-বস্তুর উপাদান ও শরীর-গঠনে তাহাদের উপযোগিতা বিচার করিয়া স্ব স্ব রুচি অনুসারে খাদ্য নির্বাচন করিলে শরীরের ক্ষতি হইতে পারে না। একটি প্রবাদ আছে—দুধে ভাতে বাঙ্গালীর শরীর। সেজন্য আমাদের খাদ্য-বস্তুরও পরিবর্তন করিয়া বিকল্প খাদ্য নির্বাচন করা প্রযোজন।

উদরপূর্তির জন্য খাদ্যরূপে যাহা আমরা গ্রহণ করি তাহাতে অখাদ্যও প্রচুর থাকে। শরীরের ক্ষযপূরণ, পুষ্টি এবং শক্তিসঞ্চার ও তাপোৎপাদনের উদ্দেশ্যেই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। রোগ প্রতিরোধক শক্তির উৎসও আমাদের খাদ্য। এই সকল কার্যসাধনে সক্ষম ভোজ্যবস্তুই প্রকৃত খাদ্য নামের যোগ্য।

উপাদানভেদে আমাদের খাদ্য চারি জাতীয়—

১। আমিষ জাতীয়—মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা প্রভৃতি নাইট্রোজেনপ্রধান খাদ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। শরীরের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন, পেশীগঠন, এমন কি শরীরের শক্তিসঞ্চার, তাপোৎপাদন এবং পাচকরস উৎপন্ন করাও এই জাতীয় খাদ্যের কার্য।

২। শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের মধ্যে চাউল, গম, আলু, চিনি, গুড়, যব, অ্যারোরুট আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতির দ্বারা আমাদের শরীরে সামান্য তাপ উৎপাদিত হয় এবং যথেষ্ট মেদ জন্মে।

৩। স্নেহজাতীয—ঘৃত, মাখন, তৈল প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। আবার প্রযোজনাতিরিক্ত আমিষ ও শ্বেতসার জাতীয খাদ্যও স্নেহদ্রব্যে পরিণত হয। শরীরের তাপোৎপাদন, শক্তিসঞ্চার, পেশী প্রভৃতির ক্ষয় রোধ করা এই জাতীয খাদ্যের কার্য।

৪। লবণ জাতীয খাদ্য বলিতে সাধারণতঃ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য লবণকেই বুঝায়। অবশ্য মাছ, মাংস, শাকসব্জী প্রভৃতি খাদ্যবস্তু হইতেও আমরা সামান্য লবণ পাই।

মুখের লালা নিঃসরণে সাহায্য করিয়া লবণ আমাদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন ও পিত্তরস প্রস্তুত করিতে যকৃৎ-কে সহায়তা করে। পাচক-রসের অম্লাংশও লবণ হইতে উৎপন্ন হয়। অস্থি নির্মাণ এবং রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন সংগ্রহের কার্যও লবণের দ্বারা সাধিত হয়।

জলও খাদ্যের অন্যতম উপাদানের মধ্যে পরি-গণিত হয়। বিশুদ্ধ জলই শরীরের উপযোগী। ব্যয়সাধ্য না হইলেও বিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করা আজকাল বহু আয়াসসাধ্য। আমাদের শরীরের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জলীয় পদার্থে গঠিত। জল আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে কোমল ও তরল করিয়া পরিপাকের সহায়তা করে এবং খাদ্যের সারাংশকে রক্তের সহিত মিশিবার উপযোগী করিয়া দেয়। আমাদের শরীরের অভ্যন্তর ধৌত করিয়া শরীরের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করা জলের একটি প্রধান কাজ। এই সকল কার্য সুসম্পন্ন করিতে দৈনিক অন্ততঃ দুই সের জল আমাদিগকে পান করিতে হয়। যে কোটি কোটি কোষের দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত, তাহার প্রধান অংশ

প্রোটোপ্লাজম নামক জেলির মত এক প্রকার হড়হড়ে পদার্থের শক্তি এই জলের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই সকল নানা কারণে জলকে জীবন বলা হয়।

জলসমেত উক্ত পাঁচ প্রকার উপাদান ব্যতীত ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ নামক একপ্রকার পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীরের গঠন ও পোষণ, শরীরকে সুস্থ সবল ও নীরোগ রাখা, শরীরের রক্ত ও স্নায়ুমণ্ডলীর বৃদ্ধিসাধন করা প্রভৃতি কায প্রধানতঃ ভিটামিনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কাঁচা খাদ্যদ্রব্যে ভিটামিন অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু রন্ধনের সময় আগুনের তাপে অনেক ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। অনেক রকম ভিটামিনের মধ্যে ক, খ, গ, ঘ এই চারি শ্রেণীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক-ভিটামিন সাধারণতঃ দুধ, মাখন, ডিম, মৎস্যের যকৃৎ, বাঁধাকপি, পালংশাক প্রভৃতি খাদ্যে বর্তমান থাকিয়া আমাদের শরীর পুষ্ট ও সুগঠিত করে। ক-ভিটামিনের অভাবে চক্ষুরোগ ও অগ্নিমান্দ্য হয় এবং শিশুদিগের অস্থি ও দন্ত সুগঠিত হয় না।

অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মটর, চাউল (আছাঁটা), শাকসব্জী, ফল ও বীজ, তৃণভোজী পশুর মস্তিষ্ক, যকৃৎ এবং দুগ্ধে খ-ভিটামিন থাকিয়া আমাদের শরীর গঠন ও ক্ষয় পূরণ করে। ইহা ব্যতীত খ-ভিটামিন আমাদের স্নায়ু, পেশী, পাকস্থলী ও হৃদযন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে খ-ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগের প্রাবল্য হয়।

রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে গ-ভিটামিন একান্ত আবশ্যক। কাগজীলেবু, পাতিলেবু, কমলালেবু, আমলকী, কাঁচা তরকারী, টোমাটো, পুদিনা, নিমপাতা, সজনাপাতা প্রভৃতিতে এই খাদ্যপ্রাণ প্রচুর থাকে। খাদ্যদ্রব্যে গ-ভিটামিনের অভাবে রক্তাল্পতা, অগ্নিমান্দ্য, দাঁতের যন্ত্রণা ও মুখে দুর্গন্ধযুক্ত স্কার্ভি নামক একপ্রকার রোগ হয়।

দুগ্ধ, মাংস, ডিমের কুসুম, নারিকেল, কড্-লিভার অয়েল প্রভৃতি খাদ্যে অস্থি ও পেশীগঠনকারী ঘ-খাদ্যপ্রাণ বর্তমান। ইহার অভাবে রক্তাল্পতা ও শিশুদিগের রিকেট নামক একপ্রকার রোগ হয়।

খাদ্য সম্বন্ধে উপরের স্থূল আলোচনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, যে সকল খাদ্য গ্রহণ করিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়, বর্তমানে তাহার একান্ত অভাব। শারীর-বিজ্ঞানীর মতে শরীর রক্ষার জন্য প্রত্যেক পরিশ্রমী যুবকের দৈনিক আহার্যরূপে আমিষ জাতীয় খাদ্য ৪'৬ আউন্স, শর্করা জাতীয় খাদ্য ১৪.২৫ আউন্স, স্নেহপদার্থ ৩ আউন্স লবণ জাতীয় পদার্থ ১ আউন্স এবং সের দুই জল গ্রহণ করা আবশ্যক। Nutrition Advisory Committe-র মতে খাদ্যে উক্ত উপাদানগুলি পরিমিতভাবে পাইতে হইলে প্রত্যহ অন্ততঃ চাউল, গম প্রভৃতি সাত ছটাক, ডাল দেড় ছটাক, কন্দ জাতীয় সব্জী দেড় ছটাক, শাক অর্ধ পোয়া, মৎস্য বা মাংস অর্ধ পোয়া, ঘৃত, তৈল এক ছটাক, দুগ্ধ পাঁচ ছটাক এবং একটি ডিম আবশ্যক। নিরামিষাশীর পক্ষে দুগ্ধের মাত্রা বর্ধিত করিয়া অন্ততঃ আধ সের করা উচিত।

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মোটামুট নিম্নলিখিতরূপ খাদ্য আবশ্যক—চাউল দেড় পোয়া হইতে সাত ছটাক, ডাল দেড় হইতে দুই ছটাক, মাছ বা মাংস আধ পোয়া হইতে আড়াই ছটাক, ঘৃত বা তৈল দেড় হইতে তিন কাঁচ্চা, দুধ আধ পোয়া, মশলা আধ কাঁচ্চা, দুধ আধ সের হইতে তিন পোয়া। ডাল বা মাছ এবং তাহার সহিত ঘৃত বা তৈল কম খাওয়া হইলে বেশী দুধ খাওয়া প্রয়োজন। মিষ্টদ্রব্য খাওয়া হইলে চাউল ও ডাল কিঞ্চিৎ কমাইয়া দিতে হয়। কিন্তু মাছ-মাংস যদি না খাওয়া হয় তাহা হইলে মিষ্ট ভোজন হেতু ডালের পরিমাণ না কমাইয়া চাউলের পরিমাণ কিছু কমান আবশ্যক।

Nutrition Advisory Committee বা চিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখাইলেন, কোন্ জাতীয় খাদ্যের কি গুণ ও উপযোগিতা। কিন্তু আজ কয়জন বাঙ্গালী এরূপ খাদ্য খাইতে পান? আজ আমরা যে নানাবিধ রোগের জ্বালায় বিব্রত তাহারও অন্যতম প্রধান কারণ উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। দুই বেলা পেট পুরিয়া শাকান্ন ভোজন করা যাহাদের বিলাসিতার মধ্যে গণ্য হইতে চলিয়াছে তাহাদের সম্মুখে উপরোক্ত খাদ্য-তালিকার দ্বারা খাদ্যতত্ত্ব বুঝান নিষ্ফল।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শরীরের তাপ সংরক্ষণের জন্যও উক্ত পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক। কারণ উপাদানগুলির প্রতি গ্র্যামে, (১ গ্রাম = প্রায় ১৫ গ্রেণ, ১৮০ গ্রেণ = ১ তোলা) শ্বেতসার ও আমিষ জাতীয় খাদ্যে ৪·১ ক্যালোরী (ক্যালোরী—তাপমাত্রা পরিমাপের একক। এক লিটার জলের উত্তাপ এক ডিগ্রী বর্দ্ধিত করিতে হইলে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাহাকে ক্যালোরী বলে) এবং স্নেহজাতীয় খাদ্যে ৯·৩ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হয়। একজন কর্মঠ যুবকের পক্ষে মোট প্রায় ৩০০০ ক্যালোরী তাপমাত্রার দৈনিক প্রয়োজন।

শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য-তালিকা দেখিলে তাহাকে বর্তমান খাদ্যাবস্থায় অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়াই মনে হয়। মাছ, দুধের কথা ভুলিয়া গেলেও অন্নের সংস্থান করিতেই আমরা আর পূর্বের ন্যায় সক্ষম নই। জারের কবলমুক্ত রাশিয়া গত ত্রিশ বৎসরে নানা বিপ্লবের দ্বারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে উন্নতি সাধন করিয়াছে, বিভিন্ন পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া স্বাধীন ভারত তাহার অন্নসমস্যা সমাধান করিয়া জাতির মেরুদণ্ড, সুস্থ-সবল যুবক সম্প্রদায় গঠনের সহায়ক হইবে, ইহা দুরাশা নয়।

সুস্থ-সবল স্বাধীন জাতি গঠনের দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত, দেশের খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য অচিরে কৃষি ও গো-জাতির উন্নতি সাধন করা তাহাদের প্রাথমিক কর্তব্য। কৃষি ও গো-জাতির উন্নতি পরস্পর নির্ভরশীল। কৃষি তথা জন-স্বাস্থ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া আবশ্যক। যে দুগ্ধ আমাদের প্রাণ, আমাদের আলস্য, অবহেলায় সেই দুগ্ধ আমরা প্রত্যেকে দৈনিক গড়ে এক পোয়াও পাই না। অথচ ক্যানাডা, ডেনমার্ক, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা প্রত্যেকে আমাদের অপেক্ষা ছয়গুণ-আটগুণ অধিক দুগ্ধ পান করিয়া সুস্থ-সবল দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে। বিভিন্ন দেশে মাথা-পিছু গড়ে কত দুগ্ধ পান করে, তালিকা দৃষ্টেই তাহা বুঝা যাইবে—ভারতবর্ষ-৬·৬ আউন্স, ক্যানাডা ৫৮·৮ আউন্স, ডেনমার্ক—৪০·৩ আউন্স, গ্রেটবৃটেন —৪০·৭ আউন্স, নিউজিল্যাণ্ড - ৫৫·৬ আউন্স, তাছাড়া ভারতবর্ষের গড় জীবনকাল ২৬·৭৫ বৎসর, ইংল্যাণ্ডের—৫৫·৫৭ বৎসর এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ—৫৫ বৎসর। অথচ সমগ্র জগতে যত গরু আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষে থাকিলেও তাহা নিকৃষ্ট জাতীয়। এই নিকৃষ্ট জাতীয় গরুর উন্নতি বিধান করিতে না পারিলে পুষ্টির আমরা অভাবে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে পতিত হইব।

দেহ ও মনের উপর চন্দ্রের প্রভাব

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

সৌরজগতে চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। চন্দ্র সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নাই। চন্দ্রকে লইয়া বিভিন্ন দেশে যে কত গল্প-কাহিনী রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আদিম মানব সূর্যের প্রচণ্ড তেজে অভিভূত হইলেও চন্দ্রের প্রতিই সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছে।

মানুষের ভাগ্যরচনায় চন্দ্রের প্রভাব আছে বলিয়া বিভিন্ন দেশের লোক বিশ্বাস করে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে জন্মলগ্নে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি হইতে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে চন্দ্র একটি প্রধান গ্রহ, জন্মলগ্নে ইহার অবস্থিতির উপব ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ যথেষ্ট পবিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।

শুধু ভাগ্য নয়, দেহ-মনেব উপবেও চন্দ্রের প্রভাব আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। ব্যাধিবিশেষে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় ইহা কাহারও অজানা নয়, অনেকের পক্ষে বাস্তব অভিজ্ঞতাও বটে। তিথিবিশেষে উন্মাদ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, ইহাও অনেকের ধারণা। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশসমূহেও উন্মাদ রোগীর উপর চন্দ্রের প্রভাবের কথা বহুকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাস প্রচার করেন যে, কৃষ্ণপক্ষে উন্মাদ রোগীর মস্তিষ্কে চন্দ্রের আকর্ষণ প্রবলতর হওয়ায় ঐ সময় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে 'ইনসেন' এবং 'ল্যুনেটিক'-এর মধ্যে বৈষম্য আইনে স্বীকৃত হয়। ল্যুনেটিক কথাটি চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পূর্ণচন্দ্রের প্রভাবে এইসব ব্যক্তির মাথায় পাগলামীর লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় বলিয়াই উঁহারা এইরূপ আখ্যা লাভ করিয়া থাকে।

চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে তিথির নামকরণ হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সর্বকার্যে তিথি মানিয়া চলিবার বিধি দিয়াছেন। কোন্ তিথিতে কি করণীয় এবং কিরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত তাহার তালিকাও পাঁজিতে দেওয়া থাকে।

পার্থিব যাবতীয় পদার্থেব উপর চন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা এতদিন কুসংস্কাবরূপেই পরি-গণিত হইয়া আসিযাছে। কিন্তু বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফলে পাথিব বস্তুর উপর চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়ায সমস্ত প্রাচীন ধারণাকে কুসংস্কার বলিযা বাতিল কবিবার পথ প্রায় বন্ধ হইতে চলিযাছে।

জড পদার্থের উপর চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাব নানাভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া জোযার-ভাটার সৃষ্টি হয—ইহা বহুকাল হইতেই জানা আছে। শুধু সমুদ্রের জলই বিক্ষুব্ধ হয় না, বাযুমণ্ডলেও অনুরূপ জোয়ার-ভাটাব সৃষ্টি হয়। পূর্ণিমা বা অমাবস্যার ৩।৪ দিন পবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গে পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছে। ঐসময় কোন কোন স্থানের তরঙ্গ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতা লাভ করিযা থাকে। ডাঃ গৌটিযারেব মতে, চন্দ্রকলার পরিবর্তনে বাযুমণ্ডলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলেই বেতাব-তবঙ্গে ঐরূপ পবিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর স্থলভাগেরও স্ফীতি হয বলিয়া জানা গিয়াছে। এই স্ফীতি এক স্থানেই স্থির থাকে না, চন্দ্রের গতির সঙ্গে সঙ্গে চক্রাকারে পৃথিবী পরিক্রমণ করে। ভূ-স্তরের কঠিন আবরণে কিভাবে এই স্ফীতির সৃষ্টি হয় তাহার ব্যাখ্যা

কঠিন হইলেও এইরূপ স্ফীতির ফলে কোন কোন সময়ে গ্রীনউইচ্ ও ওয়াশিংটনের দ্রাঘিমার ব্যবধান ৬৩ ফিট হ্রাস পায় বলিয়া জানা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে প্রফেসর ষ্টেট্সন প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভূ-স্তরের উপরে চন্দ্রের এইরূপ আকর্ষণের ফলে অনেক সময় ভূ-কম্পনের সূত্রপাত পর্যন্ত হইতে পারে। ষ্টেট্সন কস্মিক রে সম্পর্কে গবেষণা ব্যাপদেশে আরও বলিয়াছেন যে, কোন কোন বিশেষ সূর্যরশ্মি—যেগুলি সরাসরি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিতে সক্ষম নয়—চন্দ্রের প্রতিফলনে পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে।

উদ্ভিদ ও শস্যের উপর চন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশেই নানাপ্রকার প্রবাদ ও অদ্ভুত অদ্ভুত সংস্কার আছে। এইসব প্রবাদ ও সংস্কারের মূলে কোন সত্য আছে কি না, কখনও যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় মোরিয়া ইরিডয়েড্স্ নামে এক প্রকার গাছ আছে। ঐ গাছের ফুল ফোটার উপর প্রত্যক্ষভাবে চন্দ্রের প্রভাব আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই গাছে প্রত্যেক চান্দ্রমাসে দুইবার ফুল ধরে। একবার শুক্লপক্ষের চতুর্থী হইতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমার আগের দিনই ঝরিয়া পড়ে, দ্বিতীয় বার কৃষ্ণপক্ষের একাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া অমাবস্যার পূর্বেই ঝরিয়া যায়। পূর্ণিমা বা অমবস্যায় এই গাছে কোন ফুল দেখা যায় না।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ইউনিচ ভিরিডিস্ নামে কীট জাতীয় প্রাণীর উপর প্রত্যক্ষভাবে চন্দ্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। এই কীটগুলি একমাত্র পূর্ণিমার দিন জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া ডিম পাড়ে। মনে হয় যেন চন্দ্রকিরণ জলের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার স্পর্শেই কীটগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া জলের উপরে ভাসিয়া উঠে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সর্বক্ষেত্রে চন্দ্রের প্রভাব এইরূপ বাহ্যতঃ প্রকাশ না পাইলেও চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের অভ্যন্তরেই অদৃশ্যভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

সমগ্র প্রাণী-জগৎ, এমন কি উদ্ভিদ ও ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়া পর্যন্ত এক প্রকার তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এবং সমস্ত জীবই তড়িৎ উৎপাদনের স্ব-স্ব একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া চলে—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহাও ধরা পড়িয়াছে। জৈব পদার্থের এই তড়িৎপ্রবাহ তাহার জীবন সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এইরূপ একটি মতবাদও প্রচারিত হইয়াছে।

প্রফেসর বাড়ের মতে যাবতীয় জৈব পদার্থেই একটি ছন্দোবদ্ধ তড়িৎপ্রবাহ আছে এবং ঐ তাড়িতিক ছন্দ তিথি অনুসরণ করিয়া চলে। পরস্পর হইতে পাঁচ ফুট দূরে দুইটি ইলেকট্রোড বৃক্ষকাণ্ডের ক্যাম্বিয়াম পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া তড়িৎ-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে দিনের পর দিন ক্রমাগত কাণ্ডের তড়িৎপ্রবাহ রেকর্ড করা হইয়াছে। এইরূপ পরীক্ষা হইতে তিনি দেখিয়াছেন যে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কাণ্ডের ভিতর তাড়িতিক চাপের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। আবহাওয়ার তাপ, বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতার পরিমাণ বা অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে এই পরিবর্তনের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট নয় তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রাভিজ মানবদেহের তড়িৎপ্রবাহ সম্পর্কে বহুদিন যাবৎ গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমস্ত জীবের মত মানবদেহেও একটি নির্দিষ্ট তড়িৎ-ক্ষেত্র আছে। তিথি অনুসারে আবহাওয়ার তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের এই তড়িৎপ্রবাহেরও পরিবর্তন ঘটে এবং যথাযথভাবে এই পরিবর্তনের মাত্রা নির্ধারণও সম্ভব। তিনি প্রফেসর বাড়ের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রের

উপর পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ডাঃ বার ও র‍্যাভিজের পরীক্ষা হইতে চন্দ্রের প্রভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের তড়িৎ-ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিতে পারে জানা গেলেও কিভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে চন্দ্রের আলোর পরিমাণ যে ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, কারণ প্রখরতার দিক হইতে চন্দ্রের আলো সূর্যের আলোর তুলনায় তিন লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ডাঃ র‍্যাভিজের মূল গবেষণার বিষয় ছিল, মানুষের ভাবাবেগ পরিবর্তনে তাহার দেহের তড়িৎ-ক্ষেত্রের কোন পরিবর্তন ঘটে কি না, তাহা নির্ণয় করা। তিনি একটি মাইক্রোভোল্ট মিটারের সাহায্যে ঐ গবেষণাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি লক্ষ্য করেন যে, চন্দ্রকলার পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের তাড়িতিক ছন্দ পরিবর্তনেরও একটা মিল আছে।

আট মাস পর্যন্ত প্রত্যহ তিনি সতের জন স্ত্রী-পুরুষের তাড়িতিক পরিবর্তন পরিমাপ করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনও লিপিবদ্ধ করেন। তাহাদের জীবন-ইতিহাস এবং কাহারও কোন বিশেষ ভাবাবেগের সঙ্গে কোন ঘটনা জড়িত থাকিলে তাহাও সংগ্রহ করেন। গবেষণার প্রথমদিকে তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করেন নাই। সাধারণভাবে মানসিক পরিবর্তনে দেহের তড়িৎ-ক্ষেত্রের কোন পরিবর্তন হয় কি না তাহা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রত্যেক ১৪ হইতে ১৭ দিনের মধ্যে একদিন যে তড়িতের চাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। পরে দেখিতে পান যে, ঐ বিশেষ দিনটি, হয় পূর্ণিমা, না হয় অমাবস্যা পড়িয়াছে। বৃদ্ধির পরিমাণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে সমান হইয়াছে তাহা নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সময় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস ঘটিতেও দেখা গিয়াছে। ডাঃ র‍্যাভিজ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চন্দ্রের প্রভাব সকল মানুষের উপর সমান নহে, ইহা ব্যক্তিবিশেষের ভাবাবেগ ও তাড়িতিক গঠনের উপর নির্ভর করে।

ডাঃ র‍্যাভিজ লক্ষ্য করেন যে, সাধারণ বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকের মধ্যে পূর্ণিমার সময় একটা গুমট ভাবের সৃষ্টি হয়। তাহারা ঐ সময় অতিরিক্ত অভিমানী ও অল্প কারণে উত্তেজিত হয় এবং লোকের সংস্রব ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করে। এইসব লোক অমাবস্যার কয়েকদিন পরেই সর্বাপেক্ষা ভাল বোধ করে।

খুব বেশী বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকের মধ্যে এইভাবে মানসিক চক্রের পরিবর্তন আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ঐ সময় তাহাদের তাড়িতিক চাপের পরিবর্তনও খুব স্পষ্ট হয়।

ডাঃ র‍্যাভিজের মতে মানুষের মানসিক চক্রের পরিবর্তন মাইক্রোভোল্ট মিটারের নির্দেশ হইতে যথাযথভাবে ধরা যায়। তিনি এই সকল পরীক্ষা হইতে ছাত্রদের মনের অবস্থা কখন ভাল বা কখন মন্দ থাকে তাহা ধরিতে পারেন। শারীরিক কারণে যে এই তাড়িতিক চাপের কোন পরিবর্তন ঘটে না, এবিষয়ে তিনি পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন।

ডাঃ র‍্যাভিজ সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার রোয়ানোক ভেটারেন্স হাসপাতালে মানসিক রোগগ্রস্ত বহু রোগীকে এইভাবে পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন যে, মানসিক রোগগ্রস্ত রোগীর উপর চন্দ্রের প্রভাব বর্তমান। চন্দ্রকলার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রোগের হ্রাস-বৃদ্ধি ও তাড়িতিক চাপের পরিবর্তন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারসেলসাস যখন উন্মাদ রোগীর মস্তিষ্কে চন্দ্রের আকর্ষণের প্রতিক্রিয়ার কথা বলিয়াছিলেন তখন উহা উড়াইয়া দেওয়া সহজ ছিল।

কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে ডাঃ র‍্যাভিজ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বাতিল করা তত সহজ নহে। চন্দ্রের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে যেরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে উহার কোন প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব নহে—ইহা বৈজ্ঞানিকদের কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে আরও অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

দুধের কথা

শ্রীউমাতোষ সরকার

রবিবার। কাজে বাহির হইবার তাড়া নাই। মুখ, হাত ধুইয়া চায়ের কাপে মুখ ডুবাইতেই সমস্ত মুখ যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। দুধ নাই—এক ফোঁটাও দুধ নাই চায়ে। প্রচণ্ড হুঙ্কার দিবার উপক্রম করিতেই দ্বারপ্রান্তে গৃহিণী আবির্ভূতা হইলেন, বলিলেন—কি করব বল, গোয়ালা এখনও দুধ দিয়ে যায় নি।

—তাই বলে কি বিনা দুধে চা খেতে হবে নাকি ?

—কেন তুমিই তো সেদিন বলেছিলে, গোয়ালা যা দুধ দিচ্ছে তা একটাকা সের দিয়ে কেনা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, এবার দুধ বন্ধ করে দোব—বিনা দুধেই কাজকর্ম চালিও। কত দিন বলেছি একটা মিল্ক পাউডার আনতে, তা-ওতো আনবে না !

—এক শো বার বলেছি, মিল্ক পাউডারের কোন উপকারিতা নেই—

—না ! নেই—দেশ শুদ্ধ লোক খাচ্ছে শুধু শুধু !

চৌধুরীজায়া ভুল বলেন নাই। মিল্ক পাউডার বা গুঁড়া দুধেরও যথেষ্ট উপকারিতা আছে। কিন্তু গুঁড়া দুধের প্রসঙ্গে আসিবার পূর্বে একেবারে সাধারণ দুধ হইতে আলোচনা সুরু করা যাউক।

বস্তুতঃ দুধের ন্যায় এমন একটি সম্পূর্ণ খাদ্য আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। দুধের মধ্যে গোদুগ্ধই সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে উপকারী। গোদুগ্ধের স্বাভাবিক রং ঈষৎ হরিদ্রাভ সাদা। সদ্যোদোহিত গোদুগ্ধে একপ্রকার ক্ষীণ জান্তব গন্ধও পাওয়া যায়। Schreiner-এর মতে গন্ধটি হইল দুগ্ধে উপস্থিত সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণ উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিলেই গন্ধটি লুপ্ত হইয়া যায়।

গোদুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণতঃ ১·০২৯ হইতে ১·০৩৩-এর মধ্যে। কিন্তু সর্বোচ্চ ১·০৩৫ এবং সর্বনিম্ন ১·০২৭ আপেক্ষিক গুরুত্বও কোন কোন গোদুগ্ধে পাওয়া গিয়াছে।

গোদুগ্ধে চর্বি, প্রোটিন (কেসিন, অ্যালবুমেন ও গ্লোবিউলিন), শ্বেতসার, নানাপ্রকার জৈব ও অজৈব অ্যাসিড, ভিটামিন, জল, ধাতব পদার্থ ও এনজাইম প্রভৃতি আছে। গোদুগ্ধে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি মোটামুটি পাওয়া যায়—

জল · ৮৭·৩১%

চর্বি · ৩·৬৭%

শ্বেতসার (ল্যাকটোজ)···৪·৭৮%

প্রোটিন··· ৩·৪২%

কেসিন····· ২·৮৬%

অ্যালবুমেন
গ্লোবিউলিন } ······৫৬%

মায়ের দুধ, ছাগের দুধ, ভেড়ার দুধ, ঘোড়ার দুধ

ও গাধার দুধে উপরে প্রদত্ত সব উপাদানগুলিই আছে; তবে দুগ্ধভেদে উপাদনগুলির পরিমাণের তারতম্য আছে। বিশেষ করিয়া রোমন্থক ও অরোমন্থক প্রাণীর দুগ্ধের মধ্যে এই তারতম্য খুব বেশী। সম্ভবতঃ উহাদের গঠনবৈচিত্র্যই ইহার কারণ। নিম্নের তালিকা হইতে গাধা ও ঘোড়ার দুধের সহিত রোমন্থক প্রাণীদের দুধের তারতম্য বুঝা যাইবে:

	গরু	মানুষ	ছাগল	ভেড়া	ঘোড়া	গাধা
আপেক্ষিক গুরুত্ব	১·০৩১৫	১·০৩	১·০৩০৫	১·০৩৪১	১·০৩৪৭	১·০৩৬
জল%	৮৭·২৭	৮৭·৪১	৮৫ ৭১	৮০ ৮২	৯০·৭৮	৮৯·৬৪
কেসিন%	৩·০২	১ ০৩	৩ ২০	৪ ৯৭	১·২৪	·৬৭
অ্যালবুমেন%	·৫৩	১ ২৬	১·০৯	১·৫৫	·৭৫	১·৫৫
চর্বি%	৩·৬৪	৩ ৭৮	৪·৭৮	৬ ৮৬	১·২১	১·৬৪
ল্যাকটোজ%	৪ ৮৮	৬·২১	৪·৪৬	৪ ৯১	৫·৬৭	৫ ৯৯

ধাতব পদার্থও গোদুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দুগ্ধে লৌহের পরিমাণ অবশ্য পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের তুলনায় কম, কিন্তু মানব-শিশুর দৈনন্দিন প্রয়োজনের তিন ভাগের প্রায় এক ভাগ গোদুগ্ধ হইতে পাওয়া যায়।

এক কোয়ার্ট (তিন পোয়া) পরিমাণ গোদুগ্ধে মোটামুটি নিম্নোক্ত উপাদানগুলি পাওয়া যায়—

ক্যালসিয়াম	১·১৬২	গ্র্যাম
ম্যাগ্নেসিয়াম	০ ১১৭	„
পটাসিয়াম	১·৩৯৪	„
সোডিয়াম	·৪৯৭	„
ফস্ফরাস	·৯০৭	„
ক্লোরিন	১·০৩৪	„
সালফার	·৩৩২	„
আয়োডিন	·০০২	„

এতদ্ভিন্ন তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

তাছাড়া দুগ্ধে এ, বি১, সি, ডি এবং ই, এই কয়টি ভিটামিন পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন সমন্বিত বস্তুগুলির মধ্যে প্রোটিন ছাড়াও প্রোটিওজ্, পেপটোন, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ক্রিটীন, ক্রিটীনিন, লিউসিন এবং টাইরোসিনের উপস্থিতির প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

এ ছাড়াও দুগ্ধে কার্বনিক অ্যাসিড, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন প্রভৃতি কয়েকটি গ্যাস খুব অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় আছে।

Winter Blyth-এর মতে দুগ্ধে গ্যালাক্টিন ও ল্যাক্টোক্রোম নামে আরও দুইটি জিনিষ আছে। কিন্তু এই দুইটির উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

গরুর শ্রেণী ও অন্যান্য অবস্থাভেদে দুধের বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে গরু যত বেশী দুধ দেয় সেই গরুর দুধে কঠিন উপাদানগুলি তত কম থাকে। বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল গরুর দুধ বাড়ে এবং বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে চর্বি ও অন্যান্য কঠিন উপাদানগুলির পরিমাণ একই অনুপাতে হ্রাস পাইতে থাকে। দোহন-কার্য সুরু হইবার প্রথমেই গরু যে দুধ দেয় তাহাতে চর্বি সবচেয়ে কম থাকে। তারপর দোহন-কার্যের সময় ক্রমাগত যতই অগ্রসর হইতে থাকে, চর্বির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

সাধারণতঃ দুইবার গাভী দোহন করা হইয়া

থাকে। দুইবার দোহনের সময়ের যত পার্থক্য হয় দুধের পরিমাণ তত বেশী পাওয়া যায় সুতরাং চর্বির পরিমাণও তত কমে। এক্ষেত্রে কিন্তু চর্বি ভিন্ন অন্যান্য কঠিন উপাদানগুলির পরিমাণের কোন তারতম্য হয় না।

দুধের উপাদানগুলির উপর ঋতুরও প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে চর্বি ও অন্যান্য কঠিন উপাদানগুলির পরিমাণ সবচেয়ে কম এবং শীতকালে সবচেয়ে বেশী থাকে।

বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গরুর খাদ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণের পরিবর্তন করিলে চর্বি ও অন্যান্য কঠিন উপাদানগুলির পরিমাণের কোন তারতম্য হয় না।

দুধের উপর রৌদ্রের দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছে—

(১) দুগ্ধের অসম্পৃক্ত স্নেহদ্রব্যের অক্সিজেন সমন্বিত হওয়া।

(২) দুগ্ধে বিদ্যমান অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডের (ভিটামিন-সি) অনুঘটকীয়ভাবে হাইড্রোজেন বিহীন হওয়ার ফলে দুগ্ধের সহিত অক্সিজেনের সমন্বয় ঘটা।

এক পাঁইট দুধ মাত্র তিরিশ মিনিট রৌদ্রে রাখিয়া তারপর অন্ধকারে এক ঘণ্টা রাখিলে উহাতে বিদ্যমান অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডের প্রায় অর্ধেক নষ্ট হইয়া যায়।

পরিশেষে দুগ্ধসংরক্ষণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। গোয়ালারা দুগ্ধসংরক্ষণের জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐগুলির মধ্যে বোরিক অ্যাসিড ও ফর্ম্যালডিহাইডই প্রধান। এক চামচ ফর্ম্যালডিহাইড দ্বারা অত্যন্ত গরমেও দশ গ্যালন দুধ তিন দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু দুগ্ধসংরক্ষণে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ব্যবহার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ইহা দ্বারা দুগ্ধের স্বাদের ও গন্ধের কোন পরিবর্তন হয় না। এক পাঁইট দুধে মাত্র চার গ্রেন স্যালিসাইলিক অ্যাসিড দিলে উহা গ্রীষ্মকালে দুই-তিন দিন এবং শীতকালে চারি-পাঁচ দিন পর্যন্ত দুগ্ধের তঞ্চন রোধ করিতে পারে।

কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা অপেক্ষা দুগ্ধকে শীতল করিয়া সংরক্ষণ করিবার প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। Soxhlet দেখাইয়াছেন যে, বরফ প্রয়োগে শীতল করা দুগ্ধ চৌদ্দ দিন পর্যন্ত স্বাদে, গন্ধে, মিষ্টতায় এবং অন্যান্য প্রায় সকল দিক দিয়াই অপরিবর্তিত থাকে।

কিন্তু দুগ্ধে কোনও প্রকার সংরক্ষক ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে দুগ্ধে নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

বয়ঃসন্ধি

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

আজকাল, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে, এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচিত নন। মানব-জীবনকে মোটামুটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়, যেমন—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালকেই আমরা কিন্তু সাধারণভাবে বয়ঃসন্ধি বলি।

এখন এই যে পাঁচটি অবস্থার বিষয় উল্লেখ করলাম, তাদের প্রত্যেকটিরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন শৈশবে অপরিণত দেহ ও দন্তহীনতা, যৌবনে দৈহিক সবলতা ও পরিপূর্ণতা, বার্ধক্যে পলিত কেশ ও লোলচর্ম ইত্যাদি লক্ষণ-গুলি মিলিয়ে নিয়েই, কে শিশু অথবা কে বৃদ্ধ, সেটা অতি সহজেই আমরা ধরে নিই। কিন্তু মানুষের জীবনে দেহটাই সব নয়, তার আরও একটি অংশ আছে এবং সেটি হচ্ছে মন। এই দেহ ও মন এমন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকে যে, দুয়ের কোন একটিকে বাদ দিয়ে জীবনের কোন অবস্থাবিশেষের পূর্ণ আলোচনা সম্ভব হয় না। অবশ্য শারীরিক কোন পরিবর্তনের লক্ষণগুলি যেমন আমরা চাক্ষুষ উপলব্ধি করি, মনের বেলায় কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। আপনা-দেরও মন আছে, আমারও আছে—সেটা অবশ্য ঠিক; কিন্তু মনের সঙ্গে চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের কারুরই নেই। তা সত্ত্বেও মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মনের যে প্রকাশ হয়, তা থেকে মনের রূপ বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিয়ে থাকি। যেমন ধরুন, শৈশবে পুতুল নিয়ে খেলা, কৈশোরে চঞ্চলতা, যৌবনে আত্মসচেতনতা ও বার্ধক্যে স্থৈর্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাভাবিক ব্যবহার বিভিন্ন অবস্থায় মানসিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করে না কি? অর্থাৎ মনের প্রকাশভঙ্গী থেকেও কে বৃদ্ধ, কে শিশু, তা মোটামুটি আমরা অনুমান করে নিতে পারি। শুধু তাই নয়, গভীর ও কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে মনোবিদ্‌গণ মনের অবস্থা সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং যে সব তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন, বিশদভাবে সে সব আলোচনা না করে উপস্থিত এইটুকু মাত্র বলতে পারা যায় যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে দেহের সমান্তরালে মনেরও বিশিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী ধারাবাহিক পরি-বর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে। এই নিয়মের ব্যাতক্রম যে হয় না, তা নয়, তবে সেটা হলো অস্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন—কিংকঙের মত দানবাকৃতি বিশাল দেহ অথবা তার বিপরীত খর্বাকৃতি বামনের মত দেহ এবং মনের ক্ষেত্রে রামখোকা বা কচিবুড়ার মত ব্যবহার স্বাভাবিক না হলেও অসম্ভব তো নয়!

এবার বয়ঃসন্ধিকালে দেহগত ও মনো-গত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি। ছেলে-দের বারো থেকে সতেরো এবং মেয়েদের এগারো থেকে ষোলো মোটামুটি এই বয়সকালটিকে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকাল বলে ধরা যেতে পারে। এই সময়ে শরীরের আকৃতি ও শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি-লাভ করে তো বটেই, তাছাড়া যৌনসংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনও এসে পড়ে। শরীরের এই যৌনবিষয়ক পরিবর্তন দু-রকমের হয়। প্রথমটি হলো মুখ্য এবং মুখ্য পরিবর্তন প্রকাশ পায় জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশে। আর অপরটি হলো গৌণ, যার জন্যে কতকগুলি গ্রন্থি

(যেমন—অ্যাড্রিন্যাল, পিটুইটারী, থাইরয়েড ইত্যাদি) থেকে নির্গত হরমোন বা রসবিশেষের প্রভাব মূলতঃ দায়ী। এই গৌণ পরিবর্তনের লক্ষণ হলো—ছেলেদের ক্ষেত্রে মুখে দাড়ী ও গোঁফের উন্মেষ, গম্ভীর ও কর্কশ গলার স্বর ইত্যাদি এবং মেয়েদের বেলায় ত্বকের নীচে চবি জমতে স্থরু হওয়ার ফলে দেহে সমতা, মসৃণতা ও পূর্ণতার সঞ্চার।

দেহের কোন পরিবর্তন আবার মনের ওপর রেখাপাত করে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের সম্বন্ধে আগের চেয়ে আত্মসচেতন হয়। দৈহিক স্বাস্থ্য উন্নত বা বলিষ্ঠ হলে মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকৃষ্ট-ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য যদি ক্ষীণ হয় অথবা দেহের গঠনে যদি কোন খুঁত থাকে তাহলে অনেক সময় একটি হীনতাভাব মনকে ভারাক্রান্ত করে। দৈনন্দিন জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। আবার দেহে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে, সেটা যদি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পরিমাণে কার্যকরী হয় তাহলে ব্যক্তি-বিশেষ একটু বেশী রকমের চঞ্চল ও কর্ম-তৎপর হয়। আর পরিমাণ কম হলে মানসিক বিষণ্ণতা ও নিষ্ক্রিয়তা রূপে সেটা প্রকাশ পায়। একটু আগে যে হরমোনের উল্লেখ করেছি তার প্রভাব আবার শরীরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। হরমোন কিভাবে মনকেও কিছুটা প্রভাবান্বিত করে, বিশেষজ্ঞেরা তাহাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা বা পরিহার করে, অথবা একপক্ষ অপরপক্ষকে নানা-প্রকার বাক্যবিন্যাস, ছল, কৌশল প্রভৃতির আশ্রয় নিয়ে আকর্ষণ করার প্রবণতা দেখায়। কিংবা 'বিপদে আপদে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করা পুরুষমাত্রেরই কর্তব্য', কোন কোন ছেলেদের ব্যবহারে এইরকম বীরত্বব্যঞ্জক ভাবের প্রকাশ, বা 'স্ত্রীজাতি রক্ষণেরই বস্তু—তারা পুরুষের কাছ থেকে বিপদে-আপদে রক্ষা পাবার দাবী রাখে' অনেক মেয়েদের ব্যবহারে পরনির্ভরতার এই ভাব—ইত্যাদি, ব্যবহারের এই সব বৈচিত্র্যময় বিশেষত্বের জন্যে হরমোনের কিছুটা দায়িত্ব আছে। যাই হোক বয়ঃসন্ধিকালে দেহের এবং দেহের জন্যে মনের যে সব পরিবর্তন প্রকাশ পায়, সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা গেল। এইবার বলতে হয় মনের কথা।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মন অবিভাজ্য, অর্থাৎ দেহের ন্যায় কতকগুলি অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন কার্যক্ষেত্রে আমাদের মন যে নানারকমে প্রকাশ পায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে মনেরও যে কতক-গুলি মৌলিক অবয়ব বা গুণ আছে মনোবিদগণ তার প্রমাণ পেয়েছেন। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষেত্র বা কার্যবিশেষে বিশিষ্ট নিপুণতা বা বিচক্ষণতা, মেজাজ, বিভিন্ন ভাবানুবর্তিতা ইত্যাদি হলো মানসিক অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রথমেই দেখা যায় যে, বাল্যকাল থেকে স্থরু করে বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রমোন্নতি হতে থাকে, কিন্তু ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তি আর সরাসরি বৃদ্ধিলাভ না করে সাধারণ বিভিন্ন চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েদের কল্পনাপ্রবণতা বিশেষভাবে জাগ্রত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে ভাবরাজ্যেরই বিশেষ প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে। তারপর বলতে হয় তাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কথা। ছোট ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃ সঙ্গপ্রিয় বলে দল বেঁধে খেলা করে। এ থেকে তারা ব্যক্তিগত বহু স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে এবং ব্যক্তিগত অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, সহযোগিতা করা বা অন্যের কোন উপকারে আসবার বিষয়ে তারা একটা স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। খেলাধুলার রকম একই বলে ছেলেমেয়েরা বাল্যকালে একত্রিত হয়ে

খেলাধূলা করে। তারপর ক্রমশঃ খেলার প্রকারে ভিন্নতা আসার জন্যে ছেলেরা ও মেয়েরা কিছুদিন পৃথক দল করে খেলা করে। কিন্তু এই ব্যবধানটি ক্রমশঃ আবার আল্‌গা হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা মিশ্রদল করে খেলাধূলা করবার প্রবণতা দেখায়, যদিও আমাদের সামাজিক অনুশাসনের জন্যে তাদের এই ইচ্ছা সবসময়ে ফলবতী হয় না। যাই হোক এই মেলামেশার ফলে অনেক সময়ে ছেলেদের, মেয়েদের বা ছেলেমেয়ের পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হয়। মেয়েদের মধ্যে সই বা গঙ্গাজল পাতানো, অথবা একপক্ষ অপরপক্ষকে ছেড়ে কোনদিনই থাকতে পারবে না—এইরকম প্রতিজ্ঞা-বদ্ধতা ইত্যাদি নানারকম ব্যবহারের সঙ্গে আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত আছেন। কিন্তু এই সময়ের বন্ধুত্ব আপাতদৃষ্টিতে খুব ঘনিষ্ঠ বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে সেটা যে নিতান্তই বাহ্যিক তার প্রমাণ পরবর্তী জীবনে পাওয়া যায়। সে যাই হোক ছেলে মেয়েদের এই সামাজিক জীবনে কিছু-কালের জন্যে হঠাৎ আবার একটা ভাটা এসে পড়ে। সে কেমন যেন সবসময়ে একরকম আত্মস্থ হয়ে থাকে, নিজেকে পাঁচজনের কাছ থেকে গুটিয়ে নিয়ে একলা থাকতে ভালবাসে—এক কথায় সে রীতিমত অসামাজিক হয়ে ওঠে। এই অবস্থাটি অবশ্য সাময়িক মাত্র। এর পরে সে আবার সামাজিক হয় এবং আগের মত পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আরম্ভ করে। তবে একটু পরিবর্তন হয় এই যে, এখন সে এমন একজনকে খোঁজে যার সঙ্গে সত্যিই বন্ধুত্ব করা চলে, যে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে, যার কাছে সুখ-দুঃখের বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সব কথা বলা চলে, অর্থাৎ এক কথায় যার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা যায়।

তারপর বলতে হয়, নৈতিক চরিত্রের কথা। নৈতিক চরিত্রের সুষ্ঠু ও পূর্ণবিকাশের অর্থই হলো সমাজ-স্বীকৃত নিয়ম বা রুচির অনুবর্তিতা। কোন একটি কাজ ভাল কি মন্দ—আমরা বিচার করি সমাজের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি বা বিধিনিষেধের সঙ্গে ঠিকমত খাপ খেলে বলি ভাল এবং খাপ না খেলে বলি মন্দ। এখন ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ গুরুজনেরা যা শিখিয়ে দেন, বাল্যকালে ছোট ছেলেমেয়েরা সেটি নির্বিবাদে মেনে নেয়। সুতরাং নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিস্থাপন হয় বাল্যকালে। সেই ছেলেমেয়েরা আবার কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে নিজেরাই ভাল-মন্দ বা ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার চেষ্টা করে এবং সেটা তারা করে কার্যবিশেষের ফলাফল দেখে। শুধু তাই নয়—মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখন তারা এই বিচারকার্যে গুরুজনদের চেয়ে বরং নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের মতামতের উপর বেশী আস্থাবান হয়। এটা হলো এই বয়সের ধর্ম এবং এ বিষয়ে পিতামাতা বা শিক্ষকদের অবহিত থাকা উচিত। ছেলেমেয়েরা কথার অবাধ্য হলো মনে করে তাঁরা যদি ক্ষুব্ধ হন বা তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করেন তাহলে তাঁরা কিন্তু মস্ত ভুল করে বস্‌বেন। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ' এই উক্তিটি এ জায়গায় খুবই প্রযোজ্য সন্দেহ নাই।

শারীরিক পরিবর্তনের জন্যে যৌনবোধের যে নতুন অধ্যায় এই সময়ে সুরু হয়, সে কথা আগেই কিছুটা বলেছি। নতুন হলেও যৌনবিষয়ে কৌতূহল অবশ্য কমবেশী সব ছেলেমেয়ের মধ্যেই বাল্যকাল থেকে বর্তমান থাকে এবং তার প্রমাণ তাদের ঐ বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন থেকেই পাওয়া যায়। অশ্লীলতার অজুহাতে এই স্বাভাবিক কৌতূহল বা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাদের দেওয়া তো হয়ই না—উপরন্তু তারা ধমক খায়, কিম্বা এড়িয়ে যাওয়া হয় অথবা ভুল বা মিথ্যা উত্তরে তাদের শান্ত করা হয়। ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না। তারা অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে এর, ওর কাছ থেকে বা আজেবাজে

বই পড়ে তাদের কৌতূহল বা প্রশ্নের সমাধান করে নেয়। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা যৌনবিষয়ে একটি অসম্পূর্ণ, ভুল বা বিকৃত ধারণা নিয়ে বসে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের নিজেদের যখন যৌনজীবন সুরু হয় তখন তারা পূর্বার্জিত ভুল বা বিকৃত ধারণার সঙ্গে আসল ব্যাপার, অর্থাৎ নিজেদের জীবনে এখন যা উপলব্ধি করলো তার কোন মিল খুঁজে পায় না। ফলে তাদেব মনে একটা বিরাট সংঘাত বাঁধে এবং নানারকম অসহনীয় দ্বন্দ্বেব সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, হিষ্টিরিয়া জাতীয় মানসিক ব্যাধি, অব্যবস্থিতচিত্ততা, এমন কি কোন কোন আত্মহত্যার মূলে অনেক সময় এই জাতীয় দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায। বয়সের অনুপাতে ছেলেমেয়েরা যাতে উপযুক্ত যৌনশিক্ষা পায, শিক্ষক বা অভিভাবকদের, বিশেষকরে মায়েদেব সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ কবছি।

এই সময়ে লক্ষ্য করবাব মত আর একটি জিনিয আছে সেটা হচ্ছে—ছেলেমেয়েদেব ব্যবহারে কেমন যেন একটা আলস্য, অস্থিরতা ও চাপা অসন্তোষের প্রকাশ হয—বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই এই ভাবটি বেশী মাত্রায দেখা যায এবং তার কারণও অবশ্য আছে। যাই হোক এ রকম অবস্থাটি বযসোচিত, সুতরাং স্বাভাবিক। ভাল কথায় বা বুঝিয়ে বলে তাদের কাছ থেকে এ সময়ে যেটুকু কাজ বা সহযোগিতা আদায় করা যায় সেই চেষ্টা করা উচিত, কারণ জোর-জবরদস্তির-ফল অনেক ক্ষেত্রে খারাপই হযে থাকে। এই রকম অসামাজিক ভাব বেশীদিন থাকে না—জননেন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশ হবার পর থেকেই এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আবার পূর্বের সুস্থভাব ফিরে আসে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে আমূল ও প্রচণ্ড পরিবর্তন হয় তার মোটামুটি পরিচয় আমরা পেলাম। এই পরিবর্তনের সময় যে উত্তেজক অবস্থার ও উদ্দাম শক্তির সঞ্চার হয় তার সঙ্গে বন্যাস্ফীত নদীর তুলনা করা যেতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা নদীর এই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে রূপান্তরিত করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, কৃষির জন্য জল সরবরাহ ইত্যাদি নানারকম সৃষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত করছেন। তেমনি বয়ঃসন্ধিকালের এই নিহিত শক্তি—যে কোন কারণেই হোক না কেন, সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজেব পক্ষে অনুকূল হয়ে প্রকাশ পায না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করে সে বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক এবং দেশের নেতাদের পূর্ণ দায়িত্ব আছে এবং তার জন্যে তাঁদের একত্র চেষ্টা ও সহযোগিতা যে একান্তই প্রয়োজন সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদেব ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিরন্তন এই আশা ফলবতী করতে হলে বয়ঃসন্ধিকালের এই উদ্দাম শক্তিকে অবরুদ্ধ রাখলে বা অগ্রাহ্য করলে চলবে না। তাকে উচিতমত সৃষ্টিমূলক কাজে লাগাতে হবে, তাকে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ ও দেশের কল্যাণেব জন্যে প্রয়োজনানুযায়ী রূপান্তরিত করতে হবে। কি প্রণালী অবলম্বন করলে বা কোন্ পথে অগ্রসর হলে এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা যায় মনোবিদ্‌গণের গভীর ও ব্যাপক গবেষণা থেকে তার নির্দেশ পাওয়া যায়।*

---

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে

$$g_{\underset{+-}{ik};s} = 0, \qquad \Gamma_i = 0$$

$$R_{\underline{ik}} = 0, \qquad R_{\underset{\vee}{ik},l} + R_{\underset{\vee}{kl},i} + R_{\underset{\vee}{li},k} = 0$$

আইষ্টাইনের সাম্প্রতিক সমীকরণ

[বস্তু-জগৎ সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের ধারণার সংশোধিত রূপ। তাঁহাব বিশ্বাস এই সংশোধিত সমীকরণের সাহায্যে ইউনিফাযেড ফিল্ড থিওরী সম্পর্কে পূর্বেকার অনৈক্যের সমাধান হইবে।]

আইনষ্টাইনের সংশোধিত মতবাদ

(ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী)

তিন বৎসর অনুশীলনেব পর প্রোফেসর আইনষ্টাইন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত তাঁহার জেনারেলাইজ্‌ড্‌ থিওরী সংশোধন করিয়া নূতনভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংশোধনের ফলে একটি মাত্র থিওরীর সাহায্যেই হয়তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও পরমাণু-কেন্দ্রিনের শক্তি, তথা বস্তু-জগতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান কবিবার পথ অধিকতর সুগম হইয়া উঠিতে পারে। বিভিন্ন কয়েকটি সমীকরণ গোষ্ঠীর তুলনামূলক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার এই সংশোবিত মতবাদ গঠিত হইয়াছে। ১৯১০ সালে তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে কয়েক দফা সমীকরণের সাহায্য লওয়া চলিত। কিন্তু বর্তমান সংশোধিত মতবাদে মাত্র এক দফা সমীকরণ বাছাই করিয়া লইলেই চলিতে পারে। এই নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের ফলে ফিল্ড ইকোয়েসম বাছাই সম্পর্কে পূর্বে তাঁহার যে সকল সংশয় ছিল তাহাও দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি গাণিতিক অসুবিধার ফলে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই সংশোধিত মতবাদ যাচাই করিয়া দেখা এখনও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। আইনষ্টাইন কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিয়াছেন—পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া প্রথমেই এমন কথা বলা যায় না যে, এইরূপ একটি তত্ত্ব শক্তিব কণিকারূপকে ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না।

মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত আইনষ্টাইনের সমীকরণগুলির আসন্নিত করার ফলে যে দুইটি সমীকরণ-গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছে তাহার একটি ম্যাক্সওয়েলের প্রখ্যাত তড়িচ্চুম্বকীয় সমীকরণ গোষ্ঠীর সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নহে। আইনষ্টাইন বলিযাছেন—ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদের পূর্বেকাব ধারণায় মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র ও তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র পরস্পর হইতে একরূপ স্বতন্ত্র বোধ হইত কেন। সংশোধিত মতবাদে এই স্বাতন্ত্র্যের ধারণা মোটেই নাই।

এই নূতন মতবাদ পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রচলিত চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহাকে অধিকাংশ পদার্থ-বিজ্ঞানী কর্তৃক সমর্থিত কোয়াণ্টাম থিওরী (কণাবাদ) না বলিয়া বরং ফিল্ড থিওরী বা ক্ষেত্র-তত্ত্ব বলা যায়।

বর্তমান পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রোফেসর আইনষ্টাইন এই অভিমত প্রকাশ করিয়া-

ছেন যে, কোয়াণ্টাম (particle) থিওরীর সাহায্যে বাস্তব অবস্থার প্রকৃত বিবরণ প্রদান করা কখনও সম্ভব নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহাকে অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, কারণ সম্ভাব্যতাবাদের ভিত্তিতে গঠিত কোয়াণ্টাম মতবাদের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া আধুনিক পদার্থবিদেরা কোনও মতবাদের সাহায্যে বাস্তব অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লাভের আশা নিশ্চিতরূপেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বর্তমান অবস্থায় এই সকল অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াই আইনষ্টাইন তাঁহার এই নূতন মতবাদ (Pure field theory) প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু কাজ এখানেই শেষ হয় নাই, শক্তির কণা-ধর্ম বিশ্লেষণের গুরু দায়িত্ব এই নূতন মতবাদকেই পূরণ করিতে হইবে।

১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমরা Space-এর মধ্য দিয়া কিরূপ দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছি, পদার্থ-বিজ্ঞানের পরিচিত নিয়মগুলি হয়তো তাহার উপর নির্ভর করে না। তাঁহার মতে, ইহা নির্ভর করে—কোন পদার্থ আমাদের তুলনায় কত দ্রুতবেগে ছুটিতেছে এবং তাহার ফলে এই গতিশীল পদার্থের উপর যাহা কিছু আছে তাহাদের অবস্থা কিরূপ প্রতীয়মান হইতেছে—তাহার উপর। বিজ্ঞানীরা দেখিলেন যে, এই মতবাদের সাহায্যে অতি উচ্চগতিতে চলমান কোন পদার্থের ধর্ম পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই মতবাদ হইতেই অ্যাটম বোমার মূলতত্ত্ব $E=mc^2$ অর্থাৎ ভর ও শক্তির সমত্বের হদিস পাওয়া গিয়াছিল। প্রায় ১৯২০ সাল হইতেই পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একটা জেনারেলাইজ্‌ড্‌ ফিল্ড থিওরী উদ্ভাবনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল হইতে অনেক কিছু তথ্য সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কেবল একটি মাত্র মতবাদের সাহায্যেই এতদিন সব বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নাই। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাতত্ত্ব এই শতাব্দীর প্রথমার্ধকে যেভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাঁহার এই সংশোধিত মতবাদ পুনরায় এই শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশকেও সেরূপ প্রভাবান্বিত করিবে কিনা—তাহা দেখিবার জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অপরিসীম ঔৎসুক্যে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। প্রোফেসর আইনষ্টাইনকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হইয়াছিল।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দেহের তাপ বিকিরণ হইতে অদৃশ্য মানুষের অবস্থান নির্ণয়

মেরু অঞ্চলে সৈন্যদের বসবাস ও যুদ্ধের সুবিধার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ১০০ ফুট দূরে কুয়াসার অন্তরালে অদৃশ্য মানুষের দেহ-নির্গত তাপ হইতে তাহার অবস্থান জানা যাইবে।

বাতাসের জলীয় বাষ্প সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হইয়া কুয়াসার সৃষ্টি করিয়া থাকে। অনেক সময় মেরু অঞ্চলের কুয়াসার ঐরূপ সূক্ষ্ম জলকণাগুলি ঠাণ্ডায় জমিয়া সূক্ষ্ম তুষার কণায় পরিণত হইয়া যায়। সাধারণ কুয়াসা অপেক্ষা এই কুয়াসা এতই ঘন যে, মাত্র কয়েক ফুট দূরেও কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই জন লোক এক সঙ্গে চলিতে চলিতে মাত্র কয়েক ফুট ব্যবধানে সরিয়া গেলেও উভয়েই উভয়কে হারাইয়া ফেলে। হয়তো বা ঐ কুয়াসার মধ্যে শত্রুপক্ষ অলক্ষিতে সেনানিবাসের সম্মুখে আবির্ভূতও হইতে পারে। মেরুপ্রদেশের ঘন কুয়াসায় হারাইয়া-

যাওয়া মানুষের সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যেই এই অভিনব যন্ত্রটি নির্মিত হইয়াছে।

ইহার বিপরীত অবস্থাও মেরুপ্রদেশে ঘটিয়া থাকে। যেমন, সাদা পোষাক পরিধান করা সত্ত্বেও পরিষ্কার আবহাওয়ায় বহু দূর হইতে মানুষকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই সম্বন্ধেও গবেষণা চলিয়াছে।

পাকাশয়ের ক্ষতের নূতন চিকিৎসা

পাকাশয়ের ক্ষতের এক সহজ চিকিৎসার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। এই চিকিৎসায় ক্ষতের উপর একটি কঠিন আস্তরণ সৃষ্টি করা হইবে। মিচিগান ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ মেডিসিনের দুই জন বৈজ্ঞানিক ডাঃ নিকারসন এবং ডাঃ কারি শিকাগোর এক সভায় বলেন যে, ইঁদুর ও গিনিপিগের উপর এই প্রথায় চিকিৎসার ফলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। কয়েক প্রকার সাইলোক্সেন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে ক্ষতের উপর একটি কঠিন আস্তরণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে পাচকরস ক্ষতের মধ্যে প্রদাহ সৃষ্টি করিতে পারে না এবং ক্ষতটি আর বিস্তার লাভও করে না। এই পরীক্ষায় কতকগুলি ইঁদুরের দেহে হিষ্টামিন ইনজেক্সন করিয়া পাকাশয়ে ক্ষত উৎপন্ন করা হয়। যে ইঁদুরগুলিকে ইহার পর কোন চিকিৎসা করা হয় নাই সেগুলি পাঁচ দিনের মধ্যেই মরিয়া যায়।

বৃটিশ সাবমেরিনের এক ডুবে আতলান্তিক পাড়ি

বৃটিশ সাবমেরিন অ্যানড্রু, বারমুডা হইতে ইংলিস চ্যানেল পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগর এক ডুবে পাড়ি দিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সাবমেরিনের নৌ-সেনাগণ সারা রাস্তা স্নর্ট নামক শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল।

অনেকের মতে সাবমেরিনযোগে আড়াই হাজার মাইল সমুদ্র একডুবে পার হওয়া ইহাই প্রথম। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সাবমেরিনখানি রাজকীয় কানাডীয় নৌ-বহরের সহিত একযোগে জলযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার কম্যাণ্ডিং অফিসার ডাব্লিউ ডি. এস. স্কট ১৯৫১ সালে সাবমেরিন বহরে যোগদান করেন।

আটলান্টিক পার হইতে সাবমেরিনখানির কত সময় লাগিয়াছে তাহা বলিতে নৌ-বাহিনী অস্বীকার করেন। কিন্তু তাহারা বলেন যে, উহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্নর্ট নামক শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্যই এই অভিযান করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে সাবমেরিন জলের উপরিভাগে না ভাসিয়াও ব্যাটারিগুলিকে নূতন করিয়া চার্জ করিয়া লইতে পারে, নাবিকরাও ইহার সাহায্যে বাতাস পায়।

ভবিষ্যৎ কালের নিত্যব্যবহার্য ধাতু টিটেনিয়াম

বৃটেনে মিডলসেক্সের অন্তর্গত টেডিংটনে জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারে ব্যাপকভাবে বিশুদ্ধ টিটেনিয়াম উৎপাদনের গবেষণা চলিয়াছে। এই গবেষণার ফল হইতে মনে হয় ভবিষ্যতে আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিষ, যেমন—বাইসাইকল, মোটর, রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই টিটেনিয়াম ধাতু হইতে নির্মিত হইবে, অর্থাৎ এই টিটেনিয়াম ধাতু হয় তো একদিন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধাতু হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।

টিটেনিয়াম ধাতু অ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষা খুব বেশী ভারী না হইলেও উহা উচ্চশ্রেণীর ইস্পাতের ন্যায় কঠিন। অন্যান্য ধাতু সমুদ্রের লবণাক্ত জলে যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ইহার সেই ক্ষয় প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে এবং ইহার তাপ পরিবহন ক্ষমতাও অল্প। প্রাচুর্যের দিক হইতে পৃথিবীতে ইহার স্থান চতুর্থ।

টিটেনিয়ামের সহিত অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের সামান্য সংমিশ্রণ ধাতুটিকে ভঙ্গুর করে। কাজেই বিশুদ্ধ অবস্থায় ব্যাপকভাবে উৎপন্ন করার উপরই ইহার পরিপূর্ণ ব্যবহার নির্ভর করিতেছে।

একমাত্র টিডিংটনের প্রতিষ্ঠানই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ টিটেনিয়াম উৎপাদন কার্যে কিছুটা সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই কার্য এখনও গবেষণার পর্যায়েই রহিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতে টিটেনিয়াম ধাতুর আকর আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে বৃটেনে এই ধাতুর পরিমাণ অত্যন্ত অল্প সেই বৃটেনেই প্রথম এই ধাতুর আবিষ্কার হয়। ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ায় ইহার পরিমাণ যথেষ্ট। ক্যানাডায় টিটেনিয়াম ধাতুর অনেকগুলি পাহাড়ই আছে। এই ধাতু যে সেখানে আত্মরক্ষার অস্ত্র নির্মাণে একদিন সহায়তা করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভূপৃষ্ঠের ৮০,০০০ ফুট উচ্চ হইতে সূর্যের ফটোগ্রাফ গ্রহণ

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা প্লাস্টিকের একটি অতিকায় বেলুনে দূরবীক্ষণ সংযুক্ত ক্যামেরা বসাইয়া ভূপৃষ্ঠের ৮০,০০০ ফুট উচ্চ হইতে সূর্যের ফটোগ্রাফ লইবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এই নূতন অভিযান আরম্ভ হইবে। সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় উহার চারিদিকে স্বল্প আলোকিত স্থান, করোনার ফটোগ্রাফ তোলাই এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্যের ফটোগ্রাফ লইলে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্পের জন্য ছবি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ৮০,০০০ ফুট উচ্চ হইতে ছবি লইলে ঐ অন্তরায়গুলি দূর হওয়ায় অধিকতর পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাইবে।

ফটোগ্রাফ লওয়ার পর দূরবীক্ষণ ও ক্যামেরা প্যারাসুটের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসিবে, এইরূপ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমুদ্রের মধ্যে পড়িলেও যাহাতে যন্ত্রপাতিগুলি ও ছবি নষ্ট না হয় সেজন্য ঐগুলি জলনিরোধক আবরণে আবৃত থাকিবে। যে কেহ প্যারাসুট ও দূরবীক্ষণ সংযুক্ত ক্যামেরার সন্ধান দিবে তাহাকে পুরস্কার দিবারও ব্যবস্থা আছে।

কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির অ্যাষ্ট্রোফিজিক্সের অধ্যক্ষ প্রফেসর রোডেরিক রেডম্যান দূরবীক্ষণ সংযুক্ত ক্যামেরা ও তাহার আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিবার ভার লইয়াছেন। ১২০ ফুট ব্যাসের অতিকায় প্লাস্টিক বেলুনটি তৈয়ারী করিবার ভার লইয়াছেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ব্রিষ্টল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এফ. পাউয়েল।

অতিকায় বেলুন সহযোগে কস্‌মিক-রে'র গবেষণায় ব্রিষ্টল ইউনিভার্সিটি অগ্রণী হইয়াছে। এইরূপ একটি বেলুনের সাহায্যে সার্ডিনিয়া হইতে সম্প্রতি একটি কস্‌মিক-রে অভিযান চলিতেছে।

প্রফেসর পাউয়েল বলেন, বেলুনের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তর হইতে প্রতি পাঁচ সেকেণ্ডে একটি করিয়া—হাজার হাজার ফটোগ্রাফ তুলিলে উহার মধ্য হইতে অন্ততঃ কয়েকখানি ভাল ছবি পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পশু-খাদ্য হইতে মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আহরণ

মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে টিওসিন্টি নামে একপ্রকার শস্য জাতীয় ঘাস জন্মে। ইহা ভুট্টার সমগোত্রীয় এবং পশু-খাদ্যরূপে ইহা যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, যাহারা শাক-সব্জী খাইয়া জীবনধারণ করে তাহাদের পুষ্টিসাধনে টিওসিন্টি বিশেষ সাহায্য করিবে। ইহার মধ্যে ভুট্টার তুলনায় অনেক বেশী প্রোটিন আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর গঠনকারী অতি পুষ্টিকর পদার্থ এবং সমস্ত জীবকোষের পক্ষে ইহা অতি প্রয়োজনীয়। টিওসিন্টি

ঘাসের প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিড অধিক পরিমাণে আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহাতে ভুট্টার মত অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বিগুণ মেথাইওনিন আছে। পৃথিবীর বহু স্থানেই দেখা গিয়াছে, এই মেথাইওনিনের অভাবেই নিরামিষাশীদের তেমন পুষ্টিসাধন হয় না।

ডাঃ আর্ভিং, ই. মেলহজ, ডাঃ ফ্রান্সিস্‌কো আগুয়ার ও আইওয়া ষ্টেট কলেজের ডাঃ নেভিন এস. ক্রিম্‌স্‌, টিওসিন্টির খাদ্যমূল্য নির্ধারণ করেন। গুয়াটামালাতেই এই বিষয়ে বেশী গবেষণা হয়।

ভুট্টা ও টিওসিন্টি মিলাইয়া নূতন খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের ফলে মেথাই-ওনিন অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

এপর্যন্ত পাঁচ প্রকার বর্ণসঙ্কর শস্য সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। এই নূতন শস্য প্রায় ভুট্টারই মত। ভুট্টার সহিত মিলাইয়া দেখিলে খুব বেশী পার্থক্য নজরে পড়ে না। তবে ভুট্টা ও টিওসিন্টির সংমিশ্রণে ভবিষ্যতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা খুবই পুষ্টিকর হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন।

টিওসিন্টির দানা অন্যান্য শস্যের দানার তুলনায় ছোট। ইহার তুঁষ খুব কঠিন, খাওয়া যায় না। মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোর চাষীরা বহুকাল হইতেই ভুট্টা ও টিওসিন্টির চাষ করিতেছে। প্রধানতঃ গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যই ইহার চাষ হইয়া থাকে। তবে কোন কোন স্থানে ভুট্টার অভাব হইলে চাষীরাও এই শস্য খাইয়া থাকে। এই নূতন শস্যটি যে কতখানি পুষ্টিকর তাহা এতকাল খুব অল্প লোকেরই জানা ছিল।

গুঁড়া টিওসিন্টি, গম বা ভুট্টার ছাতুর সহিত মিশাইয়া রুটি, বিস্কুট ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং নিরামিষাশীদের খাদ্যে এর প্রোটিন কিছু মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর যে সকল স্থানের অধিবাসীরা উপযুক্ত পরিমাণে আমিষজাতীয় প্রোটিন খাদ্য পায় না তাহাদের প্রোটিন খাদ্য যোগাইবার জন্য ঐ সকল স্থানে টিওসিন্টির চাষ প্রয়োজনীয়। বৈজ্ঞানিক মহলে বিশ্বাস, পৃথিবীর খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যার সমাধানে তাহারা এইভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন।

মুরগীর ব্যাধির ঔষধ

ব্রুকলিনের চার্লস ফাইজার কোম্পানির বিবৃতি হইতে প্রকাশ, মুরগীর বাচ্চার শ্বাসযন্ত্রের একটি বিশেষ ব্যাধি টেরামাইসিনের সাহায্যে নিরাময় করা যাইতে পারে। এই রোগে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুরগীর বাচ্চার মৃত্যু হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ঔষধটি একবার মাত্র ইনজেক্‌সন করিয়া তিন হাজার রোগাক্রান্ত মুরগীর বাচ্চা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

টেলিভিশনের সাহায্যে মৎস্যের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ

ক্যানাডার বৈজ্ঞানিকেরা টেলিভিসনের সাহায্যে জলের তলায় মৎস্যের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ৩০০ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ৮০ ফুট জলের তলায়ও ট্রাউট মৎস্যের ডিম দেখা গিয়াছে।

ক্যানাডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ সার্ভিসের ডাঃ কুরিয়ার ওয়াশিংটনের এক সভায় বলেন, মিঠা জলের মৎস্যের জীবনযাত্রাপ্রণালীর গবেষণায় টেলিভিসনের ব্যবহার এতদিন মানুষের কল্পনার মধ্যেই ছিল। আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে।

১৯৫১ সালে সাবমেরিন অ্যাফ্রের সন্ধান করিবার জন্য বৃটিশেরা যে আধ টন ওজনের বিরাট টেলিভিসন যন্ত্র জলের তলায় ব্যবহার করিয়াছিল, কতকটা তাহারই অনুকরণে নির্মিত এই ছোট

যন্ত্রটি মিনিওয়াঙ্কা হ্রদে ব্যবহার করা হইয়াছে। ক্যানাডার যন্ত্রটি দৈর্ঘ্যে তিন ফুট, ব্যাস দেড় ফুট এবং ওজন ৩০০ পাউণ্ড। গভীর জলের তলদেশ আলোকিত করিবার জন্য উহার মধ্যে চারটি বৈদ্যুতিক আলোক বসান আছে এবং টেলিভিসন ক্যামেরার সম্মুখভাগ আধ ইঞ্চি পুরু কাঁচে ঢাকা।. কোন দিক হইতে জল প্রবেশ কবিতে না পারে এরূপ ব্যবস্থা করা আছে। ক্যামেরার মধ্যে পরিবর্তনোপযোগী দুইখানি লেন্স আছে, জলের উপর হইতে ইচ্ছামত উহাদের পরিবর্তন করা যায়।

ক্যামেরার ফোকাসিং ও আলোসম্পাত উপর হইতে নিয়ন্ত্রিত হয়। দুই দিকে দুইখানি প্রোপেলারের সাহায্যে যন্ত্রটিকে যে কোন দিকে চালাইতে বা যে কোন দিকে মুখ করিয়া বসাইতে পারা যায়।

মিনিওয়াঙ্কা হ্রদে ট্রাউট মৎস্য কত গভীর জলে ডিম ছাড়ে তাহাই প্রথম পর্যবেক্ষণ করা হয়। টেলিভিসনের পর্দায় দেখা যায়, জলের ৮০ ফুট নীচেও ট্রাউট মৎস্যের ডিম রহিয়াছে।

মৎস্য-বিশারদদের ধারণা ছিল, হ্রদটির তলদেশ বালি ও কাঁকরে ঢাকিয়া গিয়াছে এবং ইহাতে ছোট মাছের বাসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু টেলিভিসনের সাহায্যে দেখা যায়, ঐ ধারণা সত্য নহে। হ্রদের তলদেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা গিয়াছে। টেলিভিসন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ইহার কিছুই জানা সম্ভব হইত না।

বার্ধক্য-নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক পদার্থ

ওয়াসিংটন ইউনিভার্সিটির ডাঃ ল্যান্সিং-এর পরীক্ষালব্ধ ফল উল্লেখ করিয়া আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি হইতে এক বিবৃতিতে বলা হয়—জৈব-দেহের একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ রিবোস্‌নিউক্লিয়ো-প্রোটিন শরীরের কোষসমূহের বার্ধক্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

ডাঃ ল্যান্সিং তাঁহার পূর্বের গবেষণায় দেখাইয়াছিলেন, ক্যানসার কোষ এবং অন্যান্য দ্রুত বর্ধনশীল কোষে ক্যালসিয়ামের অভাব থাকে। প্রচুর ক্যালসিয়ামযুক্ত কোষগুলি বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ক্যালসিয়ামমুক্ত ক্যানসার কোষগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হইতে থাকে।

কোষগুলিকে ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে বহুগুণ বর্ধিত করিয়া এবং নানা প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ল্যান্সিং দেখেন যে, সাধারণ স্বাভাবিক কোষের উপরিভাগে রিবোস্ নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের একটি পাতলা স্তর থাকে। ঐ স্তরটির সাহায্যেই উহারা পরিবেশ হইতে ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ শোষণ করিয়া থাকে।

রিবোস্‌নিউক্লিয়োপ্রোটিনের স্তর এবং কোষের বাহিরে ও ভিতরে অবস্থিত এনজাইমের মাধ্যমে বার্ধক্য আনয়নকারী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দেহ-গঠনকারী কাঁচা মাল প্রবিষ্ট হয়। ডাঃ ল্যান্সিং রিবোনিউক্লিয়েজ এনজাইম প্রয়োগে ঐ স্তরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া দেখেন যে, কোষগুলি তখন আর ক্যালসিয়াম এবং স্ট্রন্‌সিয়াম গ্রহণ করিতে পারে না।

ডাঃ ল্যান্সিং ক্ল্যাম মাছের ডিম লইয়া এই পরীক্ষা করেন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়, কোসের উপরিভাগ অসমতল এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্তুলে আচ্ছাদিত। বর্তুলাচ্ছাদিত হওয়ায় কোষের উপরিভাগের আয়তন সাধাবণ আয়তন অপেক্ষা দশগুণ বৃদ্ধি পায়।

চুম্বকক্ষেত্রের নূতন ধর্ম আবিষ্কার

শিকাগো ইউনিভার্সিটির পদার্থতত্ত্ববিদ ডাঃ আলেক্‌জাণ্ডার কোলিন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমষ্টি হইতে প্রাণীকোষ, ব্যাক্টিরিয়া এবং সম্ভবতঃ ভাইরাসও পৃথকভাবে বাছিয়া লইবার এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক

প্রবাহের পথে চুম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

ডাঃ কোলিন দেখেন যে, তাড়িতিক নিষ্ক্রিয় কণিকাগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহের পথে চুম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করিলে গতিশীল হইয়া উঠে। বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্র ও চুম্বকক্ষেত্র সমকোণে স্থাপিত হইলে কণিকাগুলি উভয়ের সমকৌণিক পথে ধাবিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাকে ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটো-কাইনেটিক আখ্যা দিয়াছেন।

কণিকাগুলি যে দ্রাবণে রক্ষিত থাকে তাহার বৈদ্যুতিক পরিবহন ক্ষমতার উপর তাহাদের গতি বা গতির দিক নির্ভর করে। ডাঃ কোলিন কতকগুলি শ্বেত সরিসা ও হোয়াইট মাছের ডিম চিনির দ্রাবণে স্থাপন করেন এবং সামান্য পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া দ্রাবণটিকে বিদ্যুৎ-পরিবহনশীল করেন। বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও চুম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, সরিসা ও ডিমগুলি পরস্পর বিপরীত দিকে সেকেণ্ডে আধ ইঞ্চি গতিতে চলিতে থাকে। আবার দেখা গিয়াছে যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলে তাহাদের গতিও বিপরীতমুখী হয়।

আলট্রা সেন্ট্রিফিউজ সাহায্যে কোন মিশ্রণ হইতে বিভিন্ন গুরুত্ববিশিষ্ট কণাগুলিকে সহজে পৃথক করা যায়। কিন্তু এই নূতন উপায়ে কণাগুলি সমগুরুত্ব সম্পন্ন হইলেও শুধুমাত্র তাহাদের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা ভিন্ন হইলেই পৃথক করা চলিবে। ডাঃ কোলিন বলেন, একশত বৎসর পূর্বেও এই বিষয়টি আবিষ্কৃত হইতে পারিত, কিন্তু কেন যে হয় নাই—তাহাই আশ্চর্যের বিষয়।

ডাঃ কোলিনের এই আবিষ্কার দ্বারা প্রাণীতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ও বিবিধ জটিল তত্ত্বের সমাধানে ইহার ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

সঞ্চয়ন

বৈদ্যুতিক শিল্পে গালা

পৃথিবীর বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের জন্য বৎসরে দুই লক্ষ মণ গালার দরকার হয়। অথচ এক একটি গালা বা লাক্ষা কীটের আবরণ হইতে এক আউন্সের ১০ হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগ লাক্ষা পাওয়া যায়। কাজেই পৃথিবীর একমাত্র বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য যে কি বিপুল পরিমাণ লাক্ষা কীটের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ ভারত দ্রুত শিল্পায়নের পথে চলিয়াছে এবং তাহার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নিজস্ব চাহিদাই বহু গুণে বাড়িয়া যাইবে।

তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থ হিসাবে গালা বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শিল্পে ইহার ব্যবহার এত ব্যাপক যে, কোন্ কোন্ বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামে গালা ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ ব্যাপক ব্যবহারের কারণ এই যে, (১) ইহা খুব বেশী তড়িৎ-অপরিচালক (২) ইহা দ্রব্যের উপরিভাগে বার্ণিশের মত কাজ করে, (৩) অভ্রের উপর ভালভাবে লাগিয়া থাকে এবং (৪) অত্যধিক বৈদ্যুতিক চাপেও পরিবহন-ক্ষেত্র বাড়ে না এবং অঙ্গার সৃষ্টি করে না।

অভ্রের গুঁড়ার সহিত গালা মিশাইয়া উহা গরম থাকা কালেই চাপ দিয়া মাইকানাইট নামে একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। বৈদ্যুতিক শিল্পে ইহার চাহিদা খুব

বেশী। বড় বড় আকারের অভ্রের দাম বেশী, কিন্তু তাহার স্থানে মাইকানাইট ব্যবহার করা চলে এবং তাহার দামও অনেক কম। অথচ ইহার শতকরা ৯০ হইতে ৯২ ভাগ অভ্র। খাঁটি অভ্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার তুলনায় এই দ্রব্য বেশ শক্ত এবং সহজেই যে কোন আকারে তৈয়ারী করিয়া লওয়া চলে।

কাগজের সহিত গালা মিশ্রিত করিয়া তড়িৎ-অপরিবাহী নল, বড প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। আবার রেশম বা সূতী বস্ত্রের উপর গালা লাগাইয়া ট্রান্সফরমার, আর্মেচার প্রভৃতির উপযোগী তড়িৎ-অপরিবাহী বস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ভারতের বৈদ্যুতিক শিল্পের উন্নয়নে লাক্ষা গবেষণা মন্দিরেরও যথেষ্ট দান রহিয়াছে। বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বার্ণিশ, বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুতের উন্নত কৌশল তাঁহারাই উদ্ভাবন করিয়াছে। বৈদ্যুতিক সুইচ, ডায়াল, প্লাগ, অ্যাডপ্টার প্রভৃতি সরঞ্জাম নির্মাণে গালা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই গবেষণা মন্দির বৈদ্যুতিক বাল্বে পিতলের ক্যাপ লাগাইবার উপযোগী এক রকমের সিমেণ্ট উদ্ভাবন করিয়াছেন।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় লাক্ষা ভারতে শতকরা ৫ ভাগের বেশী ব্যবহৃত হয় না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ভারতে ১০ লক্ষ কিলোওয়াটেরও অধিক বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম শিল্পেরও সম্প্রসারণ ঘটিবে। তখন ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারও বহু গুণে বিস্তার লাভ করিবে।

খনিজ দ্রব্য ও মানুষের স্বাস্থ্য

জীবনের পক্ষে অপরিহার্য খনিজ দ্রব্যগুলি মাটিতে মিশে আছে। গাছ-লতা মাটি থেকে রস গ্রহণ করেই বাঁচে এবং মাটির রসের সঙ্গে তারা খনিজ দ্রব্যগুলি আহরণ করে থাকে। আবার মানুষ শস্য, তরিতরকারী ও ফলমূলের সঙ্গে সেই খনিজ পদার্থ পেয়ে থাকে। এই খনিজ লবণ রক্তের প্রধান অংশ এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে এগুলি অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে ক্যালসিয়ামের গুরুত্বই সব চেয়ে বেশী। ক্যালসিয়াম শরীর দৃঢ় করে, রক্ত পরিষ্কার করে এবং দাঁত শক্ত করে। দুধ, পনীর, কাঁচা সরিষা, শালগম, বাদাম, ডিমের কুসুম, শুষ্ক বীন, কাঁচা কলাই, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লেটুশ, মূলা, নেবু, কমলানেবু, আঙ্গুর, মেথি ও তিলে ক্যালসিয়াম থাকে।

সোডিয়ামকে পাচক রসায়ন বলা যায়। সোডিয়ামের উপস্থিতিতে শরীর সহজে লৌহ গ্রহণ করতে পারে। ইহা শ্লেষ্মা ও বধিরতা রোধ করে। শুকনো ফল, দুধ, পনীর, ডিম, শশা, আপেল, বাঁধা-কপি, গাজর, তরমুজ, বীট, টমাটো ও জামে এই খনিজ উপাদানটি পাওয়া যায়।

খনিজের মধ্যে ফস্‌ফরাসের গুরুত্বও কম নয়। ফস্‌ফরাস মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সুস্থ রাখে এবং হাড়, দাঁত ও চুলের বৃদ্ধির সহায়তা করে। যারা মস্তিষ্ক চালনা করেন তাদের পক্ষে এটা আরও বেশী দরকারী। ফস্‌ফরাসের অভাবে মানসিক ক্লান্তি ও স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং অস্থির অপুষ্টি দেখা দেয়। কোকো, ডিমের কুসুম, দুধ, বীন, কড়াইশুঁটি, মসুর, গম, আপেল ও মাছে ফস্‌ফরাস যথেষ্ট আছে।

গন্ধক জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে এবং যকৃৎকে অন্যান্য খনিজ দ্রব্য গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া শরীরের ক্লেদ দূর করে সুস্থ করে তোলবার পক্ষেও এর কৃতিত্ব অনেকখানি। গন্ধকের অভাবে শরীরের মধ্যে ক্লেদ জমে ওঠে এবং যকৃতের কাজেও ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। পনীর, ডিম, মাছ, মাংস, বাদাম, ঈষ্ট, বাঁধাকপি, চকোলেট, যব, খেজুর, দুধ, পেঁয়াজ ও গোল আলু থেকে আমরা প্রয়োজনীয় গন্ধক পেতে পারি।

শরীরকে নীরোগ ও সুস্থ রাখতে হলে

পটাসিয়াম চাই। খাদ্যের সঙ্গে পটাসিয়াম গ্রহণ করলে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়; ইহা স্নায়ুগুলিকে স্থিতিস্থাপক এবং যকৃৎকে সবল করে তোলে। পটাসিয়ামের অভাবে কোষ্ঠবদ্ধতা, ব্রণ, যকৃতের গোলমাল দেখা দেয়, এমন কি, ক্ষত নিরাময় দুষ্কর হয়ে ওঠে। পটাসিয়াম পাওয়া যেতে পারে জলপাই, টমাটো, বেগুন, বাদাম, বাঁধাকপি, কমলানেবু, আঙ্গুর, গোল আলু, প্লাম, পীচ, কড়াইশুঁটি, আখরোট, দুধ, বীন, আনারস ও শশায়।

ম্যাগ্‌নেসিয়াম স্নায়ুকে শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়ে থাকে। ইহা সুনিদ্রার সহায়ক আর শরীরকে বেশ ঝরঝরে করে তোলে। ম্যাগ্‌নেসিয়ামের অভাবে অস্থিরতা ও অম্বলের দোষ দেখা দেয়। বাদাম, কোকো, টমাটো, লেটুস, খেজুর, গমের ভূষি, ডুমুর, নেবু, কমলানেবু, বীট, বাঁধাকপি ও আপেলে ম্যাগ্‌নেসিয়াম আছে।

গ্ল্যাণ্ডের পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজন আয়োডিনের। গলগণ্ড রোধে এর যথেষ্ট ক্ষমতা। শরীর থেকে যে সব বিষাক্ত দ্রব্য নিঃসৃত হয় তা থেকে এ মস্তিষ্ককে সযত্নে রক্ষা করে থাকে। আয়োডিনের অভাবে গ্ল্যাণ্ডের দোষ ও বিষক্রিয়ায় সৃষ্টি হতে পারে। টমাটো, গাজর, পাঁঠার মূত্রাশয়, বীন, কড়াইশুঁটি, কলা, লেটুস, গোল আলু ও রসুনে আয়োডিন পাওয়া যায়।

ক্লোরিন মূলতঃ গ্যাস, কিন্তু শরীরের গ্রন্থি ও মাংসপেশীকে কার্যক্ষম রাখতে সাহায্য করে। ইহা দন্তশূল ও অতি মেদ-দোষ নষ্ট করে। শরীরের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করে বলে একে শরীরের ধোবা বলা হয়ে থাকে। দুধ, পনীর, টমাটো, ডিমের শ্বেত অংশ, কলা, খেজুর, মাংস, বাঁধাকপি ও জামে ক্লোরিন আছে।

আরও একটি গ্যাস ফ্লোরিন আমাদের সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে, আর অস্থির ক্ষয় রোধ করে। এর অভাবে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এবং দন্তক্ষয় হতে পারে অথবা সংক্রামক ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে। ফ্লোরিন পাওয়া যেতে পারে পনীর, বীট, রসুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ডিম ও দুধে।

স্নায়ুকে শক্তিশালী করে তোলবার কাজে ম্যাঙ্গানিজের দাম কম নয়। দেহে এর অভাব ঘটলে মূর্ছা রোগ হতে পারে। নেবু, ডিমের কুসুম, বাদাম ও কমলানেবুতে ম্যাঙ্গানিজ বর্তমান।

আবর্জনা থেকে বিবিধ সামগ্রী উৎপাদন

ফল ও তরকারীর খোসা, ভুট্টার ভুতি, খড়, মোরগ ও হাঁসের পালক এবং অন্যান্য আবর্জনা তেমন কোন বিশেষ কাজে লাগে না।

সাধারণতঃ এ সবের স্থান হয় আঁস্তাকুড়ে। কিন্তু আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা আজ এসব আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করছেন। এই সব আবর্জনা থেকে নতুন ধরনের খাদ্য, নানারকম ঔষধ, আরও অনেক রকম শিল্পদ্রব্য তৈরী হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের এই সকল আবিষ্কার বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজে লাগাচ্ছে।

তুলার বীজ, ধানের তুষ, ভুট্টার ভুতি এবং ওটের তুষ থেকে বিজ্ঞানীরা আজ ফারফার্যাল নামে তৈল জাতীয় একটি তরল পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এই ফারফার্যাল নানারকম রং, প্লাষ্টিক, মোটরগাড়ীর টায়ার প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় কোয়েকার ওটস কোম্পানী এই জিনিষটি তৈরী করছেন। প্রচুর পরিমাণে ওটের তুষ তাদের ছিল। এই তুষটি যাতে ফেলা না যায় সেই উদ্দেশ্যে তারা উক্ত রসায়নিক দ্রব্যটি প্রস্তুতের চেষ্টা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের ইঞ্জিন পরিষ্কারের জন্যে এমন একটি জিনিষের

প্রয়োজন হলো, যার সাহায্যে ইঞ্জিন পরিস্কৃত হলেও ইঞ্জিনের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হবে না। বিজ্ঞানীরা এর পরই ধানের তুষ, বাদামের খোসা, ভুট্টার ভূতি নিয়ে গবেষণা করতে লেগে গেলেন। এই গবেষণার ফলে ইদানীং একটি বস্তু তাঁরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন যা দিয়ে বিমান ও মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটারসমূহ পরিষ্কার করা যায়।

তাছাড়া ফল ও তরকারীর আবর্জনা থেকে বিজ্ঞানীরা নানাজাতীয় খাদ্যবস্তু, তেল ও ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। যেমন টিনজাত করবার সময় অনেক ন্যাসপাতির অপচয় হয়। আজ আর তা হয় না, গৃহপালিত জন্তুসমূহের খাদ্যরূপে তা ব্যবহৃত হয়। গবাদি পশুও এর স্বাদ বেশ পছন্দ করে। তাছাড়া এই বস্তুটি খাওয়াবার পর জন্তুটির ওজনও বেশ বেড়ে যায়। এর আগে যে গবেষণা করা হয়েছিল তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে নেবুজাতীয় ফলের বীজ, খোসা, ছিবড়া বেশ উপকারী। এই সব খাওয়ানোর পর দেখা যায়, গবাদি পশু বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। এতেই প্রমাণ হয়, এই সকল বস্তুতে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ রয়েছে।

নানাভাবে কাজের ব্যবহার নিত্যই বাড়ছে। কাগজ দিয়ে বাক্স প্রভৃতি আধার তৈরী হচ্ছে। এসব পুরু কাগজ ও বোর্ড তৈরী হচ্ছে গমের খড় থেকে। সাধারণতঃ এই কাগজ দিয়ে যে বাক্স তৈরী হয় কাঠের তৈরী বাক্সের মত শক্ত না হলেও বেশ মজবুত। ইদানীং সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্যেও এই ধরনের কাগজ ব্যবহৃত হচ্ছে।

এতকাল আমেরিকায় প্রায় বিশ কোটি পাউণ্ড মুরগীর পালক এমনি নষ্ট হতো, কোন কাজে লাগানো হতো না। আজ বিজ্ঞানীরা সেই সব পালক থেকে এক ধরনের সার প্রস্তুত করছেন। তাছাড়া অট্টালিকার পলস্তারা এবং তুলির ব্রাশও এই পালক থেকে তৈরী হয়েছে।

পরিত্যক্ত সরতোলা দুধ থেকেও এমন একটি সামগ্রী প্রস্তুত হয় যা তুলি ও গদির ছিবড়ে রূপে ব্যবহৃত হয়। এই জিনিষটি দেখতে ঠিক ঘোড়ার গায়ের লোমের মত।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-সংস্থা বিভাগের ব্যুরো অব এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমেষ্ট্রি এই সকল আবর্জনাজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এই ব্যুরোর নিম্নলিখিত স্থানসমূহে আঞ্চলিক গবেষণাগার রয়েছে:—উত্তরাঞ্চলে—পিওরিয়া ও ইলিনয়েজ, দাক্ষিণাঞ্চলে—নিউ অরলিয়ান্স ও লুইজিয়ানা, পূর্বাঞ্চলে—ফিলাডেলফিয়া ও পেনসিল্‌ভানিয়া, পশ্চিমাঞ্চলে—অ্যালব্যানি এবং ক্যালিফোরনিয়া। প্রায় ১,২০০ জন লোক এই সকল গবেষণাগারে কাজ করছে। এদের দুই তৃতীয়াংশই হলো পদার্থ-বিজ্ঞানী ও রসায়নিক।

পূর্বাঞ্চলের গবেষণাগার সমূহের ডিরেক্টর পি. এ. ওয়েলস্ বলেন, গত দশ বছরের গবেষণায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে। এ সব গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বৈজ্ঞানিকেরাও বিশেষভাবে উপকৃত হন। তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন জ্ঞানের সঞ্চয় হয় এবং তাঁরা সেই জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন।

মরু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে অভিযান

পঙ্গপাল বিরোধী গবেষণাকেন্দ্রের ডাইরেক্টর ডাঃ বি. পি. উভারভ মরু-পঙ্গপাল ধ্বংসের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলিয়াছেন · মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে পঙ্গপাল সম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন ১৯৫৩ সালে শস্য সম্পর্কে সাবধান হয়। যে শত্রুর আক্রমণে তাহারা এতকাল বিপর্যস্ত হইয়া আসিয়াছে সেই শত্রু, অর্থাৎ মরু-পঙ্গপাল (Schistocerea gregaria) আজ আবার দ্বারে হানা দেবার উপক্রম করিয়াছে।

এই পতঙ্গের কথা বাইবেল এবং অতি প্রাচীন কালের মিশরীয় এবং আসিরীয় বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ এখন আর নিজেকে অসহায় বলে মনে করে না, আত্মরক্ষার পথ সে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে গভর্ণমেণ্ট এবং বিজ্ঞানীরা এই উপদ্রব বন্ধের জন্য তৎপর হন।

প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে স্থির করা হয় যে, আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য ঝাঁকের গতিবিধি সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ প্রদানের চেষ্টা করিবে। গত বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা প্রতি মাসে লণ্ডনের পঙ্গপাল-বিরোধী গবেষণাকেন্দ্রে সংবাদ দিয়া থাকে। এখানে এইসব ঝাঁকের উৎপত্তি এবং গতিবিধি বিশ্লেষণ করা হয়।

ইহাতে পঙ্গপালের আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া গবেষণাকেন্দ্র প্রত্যেক মাসে একটি বিবরণী প্রকাশ করে। এই বিবরণগুলি প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট দেশে প্রেরিত হয়।

ইদানীং পঙ্গপালের আক্রমণ হইতে শস্য রক্ষার ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; এ সম্পর্কে বহু যন্ত্র এবং রাসায়নিক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা হয়। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে বৃষ্টির পর আর্দ্র বালুকায় ডিমগুলি ফুটিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সদ্যজাত পঙ্গপালগুলিকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে। এই সময় শিশু পঙ্গপালগুলির ডানা গজায় না, কিন্তু তাহাদের ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, গমের তুষ তাহাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। এই তুষে বিষ মিশাইয়া খাইতে দিলে তাহারা তাহা তৎক্ষণাৎ খায় এবং মরিয়া যায়।

এই বিষ হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করা হয়। 'বেঞ্জিন'-হেক্সাক্লোরাইড' এদিক দিয়া বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ইহা একটি যৌগিক পদার্থ, পঙ্গপালের পক্ষেই ইহা বিশেষভাবে মারাত্মক, গৃহপালিত পশুর কোনই অনিষ্ট করে না। এই বিষ এবং আরও অন্যান্য বিষ বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে পঙ্গপালের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

যাহাহউক ইহা সত্য যে, এখন পর্যন্ত পঙ্গপালবিধ্বংসী এমন কোন ফলপ্রদ অস্ত্র বাহির হয় নাই, যাহা পঙ্গপাল দমনে পুরাপুরি সাহায্য করিতে পারে। এ সম্পর্কে দক্ষ সংগঠনেরও প্রয়োজন আছে। আধুনিক অভিযানে প্রচুর মোটর যান, সরবরাহ ঘাঁটি এবং সুশিক্ষিত কর্মীর বিশেষ প্রয়োজন।

পূর্ব আফ্রিকার নাইরবিতে এই ধরনের একটি জাতীয় সংগঠন আছে, তাহার নাম—বৃটিশ মরু-পঙ্গপাল দমন সংগঠন। ইহার অধীনে আছে ৪০০ শতের অধিক মোটর যান, প্রায় ১০০ সুশিক্ষিত অফিসার এবং পূর্ব আফ্রিকা, সোমালিল্যাণ্ড্‌স্‌, ইথিওপিয়া ও আরবের চতুর্দিকে অবস্থিত বহু অভিযান ঘাঁটি। বৃটেনের উদ্দেশ্য হইল পূর্ব-আফ্রিকার সীমান্ত হইতে দূরে পঙ্গপালের ধ্বংস করা, যাহাতে তাহারা সরাসরি পূর্ব আফ্রিকায় আক্রমণ চালাইয়া শস্য ধ্বংসের সুযোগ না পায়। এই অভিযানে বৃটেনের ব্যয় হইয়াছে বৎসরে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড, তবে আশার কথা এই যে, এই অর্থ ব্যয় বিফলে যায় নাই। পূর্ব আফ্রিকায় সম্প্রতি যে আক্রমণ হইয়াছিল তাহাতে কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই এবং অন্যান্য দেশও ইহাতে লাভবান হইয়াছে।

ভারত, পাকিস্তান, পারস্য, সুদান, মিশর, জর্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশেও এই ধরনের ব্যবস্থা আছে। পঙ্গপালের ঝাঁকগুলি কখন এক দেশ হইতে আর এক দেশে চলিয়া যাইবে, তাহা জানা না থাকায় পঙ্গপাল-বিরোধী এই সকল প্রচেষ্টাকে সুসংবিদ্ধ করবার প্রয়োজন হয়। এ

সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা যথেষ্ট সাহায্য করে।

কতকগুলি দেশের বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই উপদেষ্টা কমিটির কাজ হইল সুসংবদ্ধভাবে অভিযান পরিচালনা এবং তৎসংক্রান্ত করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা। গত বৎসর এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়। একাধিক দেশ মোটরযান সহ আবরে পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কর্মীদল প্রেরণ করে। তাহাতে ফলও আশানুযায়ী হইয়াছিল।

সংগ্রামে ক্রমশঃ যেভাবে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইয়াছে তাহাতে একটি কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে, সেটি হইল গবেষণার কথা। এই গবেষণার ফলেই একদিন আমাদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে পঙ্গপাল চিরতরে উচ্ছেদ করা সম্ভব হইবে।

ভূমি অবক্ষয়

অনেকেরই ধারণা, মাটি বুঝি চিরস্থায়ী। প্রকৃতি ব্যাপার কিন্তু তা নয়। মাটি একেবারেই স্থির নয়, অক্ষয়ও নয়। জল আর বাতাস যখন মাটির ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন মাটিরও অনেকখানি ধুয়ে নিয়ে যায়। হয়তো সেই স্রোতের ধারা চলে শতেক মাইল, হয়তো বা কিছুদূরে গিয়ে বিরাট বিস্তৃত জলাভূমিতে প্রসারিত হয়ে পড়ে। যে ভাবেই সেই জলধারা প্রবহমান হোক না কেন, উপরিভাগের কিছুটা মাটি জলের ধারায় ধুয়ে যায়। উপরিভাগের মাটিই উর্বর। এই মাটিতেই ফসল ফলে। নীচের মাটিতে অনেক ধাতব জিনিষ থাকলেও সেখানে তেমন ফসল ফলে না।

ভূমির এই যে ক্ষয় তা শুধু কোন চাষী-বিশেষের নয়, ক্ষতি হয় শত সহস্র চাষীর, সমগ্র এলাকার। ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই দেয়। দুর্ধর্ষ রোমানদের আমলে উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমি ও তার পূর্বাঞ্চল কি উর্বরই না ছিল! সোনার ফসল ফলতো সেই দেশের মাঠে-ঘাটে, আনাচে কানাচে সকল স্থানে। আজ সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই! দিগন্ত বিস্তৃত বালি আর বালি, মরুভূমি হাহাকার করছে। সিরিয়ায় বহু শতাব্দী পূর্বে এন্টিয়োক নামে একটি সহর ছিল। আজ সে সহরেরও কোন চিহ্ন নেই। তবে ধূলার স্তর পেরিয়ে মাটির ২৮ ফিট নীচে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সেই সহরের সন্ধান পেয়েছেন। দু-হাজার বছর আগে ইটালীর সমুদ্রোপকূলে ছিল আদ্রিয়া নামে এক সহর। কর্মচঞ্চল মস্ত বড় সহর। সেই সহর আজও আছে, কিন্তু যেখানে ছিল একদিন, সেখানে নেই, সেখান থেকে বহু দূরে সরে গেছে।

গাছপালা যদি না থাকে, তাহলে সে মাটিকে রুখবে কে, জলের ধারায় মাটি সরে যাবেই—ঠেকানো যাবে না। মানুষ সব জঙ্গল কেটে সাফ করে দিয়েছে, পাহাড়ের উপর থেকে নীচ অবধি সব জমি চষে ফেলেছে। সমান্তরালভাবে গাছপালা রেখে তো সে জমি চাষ করে নি। আর সামান্য কুঁড়ি যেমনই জন্মেছে মাটিতে, তাও খেয়ে নিয়েছে চাষীর গৃহপালিত গরু, ভেড়া আর ছাগলেরা। ফলে শূন্য মাটিতে এক একবার ঝড় নেমে এসেছে আর সব মাটি ধুয়ে নিয়ে গেছে নীচের দিকে।

এই যে ভূমিক্ষয়ের সমস্যা তা যে কেবল অতীত দিনেই ছিল তা নয়। আজকের দিনেও এ এক মহাসমস্যা। এই বিশ্বের বহু স্থানেই দেখা যায়, কত জমি এভাবেই বন্ধ্যা হয়ে গেছে।

পৃথিবীর বহু দেশই আজ এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। স্বাধীন বিশ্বের ৫২টি রাষ্ট্রের কৃষিবিদগণ তাঁদের নিজ নিজ দেশের এই ভূমি-সমস্যা সম্পর্কে ভাবছেন। ইতিমধ্যে ২২টি রাষ্ট্রে জমি ও জল রক্ষা-ব্যবস্থার কাজও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। অতীতে যে সব ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল তা নিবারণের ব্যবস্থা তারা করেছেন ও মাটির

উর্বরতা ও তারা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। পৃথিবীর এই ভূমিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিরক্ষা পদ্ধতি শেখবার জন্যে প্রায় এক হাজার ভূমি-বিজ্ঞানবিশারদ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁদের অধীত জ্ঞান নিজ নিজ দেশে প্রয়োগ করবেন। আজ সকলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

কঠোর দুঃখের মধ্য দিয়েই একদিন আমেরিকা-বাসীরা এই ভূমিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে খুব বেশী বৃষ্টি হয় না। মাঠের পর মাঠ রয়েছে। ঘাসে ঢাকা, বৃষ্টিপাত বিরল সেই এলাকার জমি চাষী চাষ করলো। প্রথম প্রথম বেশ ভালই চললো। তার পরেই ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে এল বৃষ্টিহীন শুষ্ক-রুক্ষ দিন।

১৯৩২ সালে এল ধূলার ঝড়। তৃণতরুবিহীন সেই বিরাট প্রান্তরে ঝড়ের বেগ ধূলা উড়িয়ে নিয়ে চললো। আকাশ, পৃথিবী এক হয়ে গেল, সূর্য ঢাকা পড়লো বালির আড়ালে। এক এক জায়গায় ঘরের চাল পর্যন্ত উঁচু বালির ঢিবি জমা হয়ে রইল।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ১৯৩৩ সালে এই সমস্যা সমাধানের জন্যে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে ভূমিরক্ষার জন্যে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হলো। ভূমিরক্ষা বিভাগের কর্মচারীরা সমগ্র দেশ জুড়ে ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলেন। এই কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে রইলেন ভূমি-বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ। এরা সকলেই চাষীকে তার জমি উন্নয়নে সাহায্য করেন।

এই প্রচেষ্টায় অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। বালির ঝড়ে মাটির বুকে যে ক্ষত হয়েছিল, সে ক্ষত আজ নেই। প্রতি বছরেই একদিনকার বন্ধ্যা জমি চমৎকার ফসল দিচ্ছে; আর ২০ বছর আগে যা উৎপন্ন হতো তার তুলনায় আজ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ অধিক ফসল ফলছে সর্বত্রই।

এই কাজের বাহাদুরী পাওয়ার যোগ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের চাষীরা। তারাইতো ভূমি রক্ষার উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছিল ও একত্র করেছিল ২৪০০ জেলাকে। ঐ সব জেলায় পড়ে রয়েছে যুক্ত-রাষ্ট্রের চারভাগের তিনভাগ জমি। তারপর তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নিকট কারিগরী সাহায্য প্রার্থনা করেছে এবং সত্যিকার জমি উন্নয়নের কাজ চাষীরা নিজেরাই করেছে।

গভর্ণমেণ্ট বা সরকারের সঙ্গে জমির মালিকের এই যে সহযোগিতা তা কেবল ব্যক্তিগত চাষীর পক্ষেই নয়, সমগ্র জাতির পক্ষে কল্যাণজনক হয়েছে।

বনসংরক্ষণ ও ভূমি-অবক্ষয়

পার্বত্য অরণ্যের অন্তরেই যে প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান জল সঞ্চিত থাকে তা একমাত্র কৃষি-বিজ্ঞানী ছাড়া আজ অনেকেরই জানা নেই। বিভিন্ন বৃক্ষ ও গুল্মরাজির তলায় এই জলাধার রয়েছে। তা গলে-আসা বরফ ও বৃষ্টির জল শুষে নিয়ে জল সঞ্চয় করে। সেই সঞ্চিত জলের কিছুটা গাছপালাদের পোষণ করে, আর বাকীটুকু ধীরে ধীরে পর্বতের গভীরে চলে যায়। শেষে ঐ জলের ধারা ঝরণা ধারায় এসে মিশে।

জল, মাটি আর বন—এদের একের সঙ্গে অন্যের যে কি সম্পর্ক তা নিয়ে আজ উত্তর ক্যারোলিনার ভূমি আর বারি-বিজ্ঞানীরা গভীর-ভাবে অনুসন্ধানে মগ্ন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি-দপ্তর, ১৯৩৩ সালে এই উদ্দেশ্যে কাউইটা হাই-ড্রোলোজিক ল্যাবোরেটারী নামে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। এই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা পর্বতপৃষ্ঠে চাষ-আবাদ, পার্বত্য ভূমিতে গোচারণ

এবং পার্বত্য বৃক্ষচ্ছেদনের প্রভাব স্রোতস্বিনীর উপর যে কতটুকু তা নিয়ে গবেষণা করছেন। এই গবেষণার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গাছপালা নষ্ট করবার ফলেই উত্তর আমেরিকার কোন কোন অংশে, মধ্য ও দূর প্রাচ্যে এবং ভূমধ্যসাগরীয় কোন কোন এলাকায় দেখা দিয়েছে বিপুল বন্যা ও বিশাল এলাকা জুড়ে ভূমির অবক্ষয়।

অ্যাপেলেশিয়ান পাহাড় অঞ্চলে যে এলাকা জুড়ে জলাধার রয়েছে তার পরিমাণ প্রায় ৫৪০০ একর। ঐ সারা এলাকায়ই গবেষণা চালানো হচ্ছে। পাহাড়ে স্রোতস্বিনীর জলের ধারার পরিমাণ নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে এই গবেষকগণ ২৮টি বাঁধ নির্মাণ করেছেন। মাটির নীচে জলের ধারা নিরীক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে ২৬টি কূপ খনন করা হয়েছে এবং তুষার ও বৃষ্টিপাতের ঠিক ঠিক পরিমাণ নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে ৪২টি পরিমাপ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণা দীর্ঘকাল সাপেক্ষ হলেও ইতিমধ্যে কিছুটা ফল পাওয়া গেছে। পাহাড়ের ১৪৫ একর স্থান জুড়ে ৮টি গবাদি পশু চড়ে বেড়ানোর ফল কি দাঁড়ায় তা এই সব বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। এই সব পশু নয় বছরের মধ্যে কেবল গ্রীষ্মকালে চড়ে বেড়িয়েছে। দু-বছর ঐ এলাকায় ঐ সব পশু চড়ে খাওয়ার পর দেখা গেল যে, যে পরিমাণ ঘাস সেখানে জন্মাচ্ছে তাতে তাদের পোষায় না, বাইরে থেকে খাবার এনে দিতে হয়। সাত বছর পর দেখা গেল—শুঁটি ও কলাই জাতীয় গাছ এবং দু-ভাগে বিভক্ত বীজ থেকে যে সকল বৃক্ষ জন্মায় তা বিলীন হয়ে গেছে এবং সেখানে জন্মেছে এমন তৃণগুল্ম যা পশুর খাদ্য নয়।

পাহাড়ের ঝর্ণা বা স্রোতস্বিনীর জলের ধারায় তেমন কোন পরিবর্তন ঐ আট বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। ছোটখাট পার্বত্য গহ্বর ও সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটে সঞ্চিত জঞ্জাল স্রোতস্বিনীর জলকে শোধন করতে সাহায্য করছে। কিন্তু নবম বৎসরে একটি ঝড়ের পরে সেই পার্বত্য উপত্যকায় পলিমাটি সঞ্চয়ের দিক থেকে দেখা গেল প্রভূত পরিবর্তন।

বিজ্ঞানীদের এই গবেষণার ফলে প্রমাণিত হলো যে, পার্বত্য এলাকায় গবাদি পশু চড়বার ফলে প্রথম দু-এক বছরে তেমন কিছু হয় না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা যায়, সেখানে সুরু হয়েছে বিরাট রকমের ভূমি-অবক্ষয়।

কাউইটার ২৩ একর পার্বত্য জমিতে চাষ-আবাদের প্রভাব স্রোতস্বিনীর স্রোত ধারায় যে কতখানি পড়ে তার পরীক্ষাও বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন। প্রথমতঃ গাছপালা কেটে জমি পরিষ্কার করে চাষের উপযুক্ত করা হয়। তার মধ্যে তিন ভাগ জমি রাখা হয় ফসল ফলাবার জন্যে, আর বাকীটুকু রাখা হয় গোচারণের জন্যে।

প্রথম দু-বছর সেই পার্বত্য জমির সচ্ছিদ্রতা বা পোরাসিটি বেশ বজায় ছিল। তৃতীয় বছরে সুরু হলো ভাঙ্গন, মাটির সব জৈব পদার্থ ধুয়ে মুছে গেল। ফলে মাটির জল সঞ্চয় করবার ক্ষমতা রইল না। ঢালু জমিতে জলের ধারা বয়ে চললো, গাছপালা না থাকায় আটকানো গেল না। গাছপালা কাটবার চার বছর পরে দেখা গেল, পর্বতের নিম্নে অববাহিকায় প্রতিরোজ গড়ে ৭৬৮ পাউণ্ড মাটি এসে জমছে। ১৯৪৯ সালে ঝড়ে এক ঘণ্টায় ১৫২,০০০ পাউণ্ড মাটি ও পাথর পাহাড় থেকে বয়ে নিয়ে গেছে।

কাউইটাতে ভূমি সম্পর্কে বহু গবেষণার মধ্যে মাত্র দুটির কথা এখানে বলা হলো। বিজ্ঞানীরা মাটি ও জলের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা এবং বন ব্যবস্থাপনার বহু দিক সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ করছেন।

সুবিবেচনার সহিত পাহাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ ও জলের ব্যবহার সম্পর্কে আজ পৃথিবীর বহু

জাতিরই সমস্যা রয়েছে। কাউইটার কাজকর্ম পরিদর্শন ও এই কাজে অংশ গ্রহণের জন্যে স্বাধীন বিশ্বের বহু দেশের বারি-বিজ্ঞানী, বন-বিজ্ঞানী ও সরকারী কর্মচারিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিগত চার বছরের মধ্যে ভারত, তুরস্ক, জাভা, সুইডেন, জার্মেনী, ক্যানাডা, বেলজিয়াম, ইটালী, ইরাণ, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ডস্, গ্রেটবৃটেন, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন থেকে বহু ব্যক্তি কাউইটা হাইড্রোলোজিক ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করতে এসেছেন। অন্যান্য দেশের জল-সম্পদ সমস্যা পর্যালোচনা এবং সেই সব দেশকে সাহায্য করবার জন্যে কাউইটার বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মাছের খাদ্য-গুণ বিচার

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

ভোজনবিলাসী বলে বাঙালীর বদনাম থাকলেও বাঙালীর খাদ্যে ভাত আর মাছের সংস্থান হলে আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। মুখরোচক এবং সহজপাচ্য বলে মাছ আমাদের প্রিয় খাদ্য। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে দুধ, ডিম এবং মাংসই প্রধান—এদের পরেই মাছের স্থান। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে প্রথম তিন প্রকার প্রোটিন খাদ্য সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। মাছ অপেক্ষাকৃত সস্তা হলেও বঙ্গ বিভাগের পরে খুবই দুর্লভ হয়ে পড়েছে। উত্তর বাংলায় মাছ একরকম পাওয়া যায় না বললেই চলে। যা পাওয়া যায় তার সবটাই চালানী এবং মাংসের মতই মহার্ঘ। দেহগঠন ও পুষ্টির জন্যে প্রোটিনের ব্যবস্থা আমাদের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই থাকা দরকার। যেখানে মাছ সুলভ সেখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্যাহার প্রয়োজন—যেখানে অভাব সে সব স্থানের পুকুরে মাছের চাষ আরম্ভ করা দরকার। মাছের চাষ একটি লাভজনক ব্যবসায়ও বটে।

খাদ্যের প্রোটিন বা মাংসবর্ধক উপাদান থেকে আমরা পেয়ে থাকি শক্তি। প্রোটিন গড়ে তোলে আমাদের পেশী ও মজ্জা। মাছের প্রোটিন অন্যান্য খাদ্যের প্রোটিনের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়—এই প্রোটিন খুব সহজ পাচ্য। মাংসে যে পরিমাণ প্রোটিন থাকে, অনেক মাছে প্রোটিনের পরিমাণও প্রায় সেই রকমের। বড় বড় মাছে প্রায় ২১'৩ শতাংশ প্রোটিন বিদ্যমান থাকে। এক আউন্স মাংস থেকে তাপ পাওয়া যায় গড়ে ৫৫ ক্যালোরী। সেই পরিমাণ মাছ থেকে প্রায় ২৭ ক্যালোরী তাপ পাওয়া সম্ভব। এর কারণ, মাংসে রয়েছে মাছের চেয়ে অনেক বেশী চর্বি জাতীয় পদার্থ। কয়েকটি মাছের প্রোটিনের পরিমাণ এখানে দেওয়া হলো :

মাছের নাম	প্রোটিনের পরিমাণ (শতাংশ)
মাগুর	১৬'৯৫
কই	১৪'৬৪
সিঙ্গি	১৪'৪৬
ল্যাটা	১৪'৪৭
বাটা	১২'৮১
বেলে	১৪'০৩
ভাঙ্গর	১৪'০৩
ট্যাংরা	১৩'৯১
পুঁটি	১৫'২৫

মাছের প্রোটিনকে ভেঙ্গে সাধারণতঃ টাইরোসিন, আরজিনিন, হিষ্টিডিন, লাইসিন, ট্রিপ্টোফেন ইত্যাদি অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। অনেক গুলি অ্যামিনো অ্যাসিড সমবায়ে তৈরী হয়ে থাকে প্রোটিন। কোন প্রোটিনই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়, কারণ সব প্রোটিনে দরকারী অ্যামিনো অ্যাসিডের সবগুলি বিদ্যমান নেই। পরিপাক ক্রিয়ার সময় খাদ্যস্থিত প্রোটিন ভেঙ্গে গিয়ে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। এগুলি দেহের অন্ত্র থেকে শোষিত হয়ে যকৃতে গিয়ে পৌঁছে। এর কিছুটা নতুন কোষ তৈরী বা ভাঙ্গা কোষ মেরামতের কাজে লাগে। কাজেই প্রোটিনের উপযোগিতা নির্ভর করে সাধারণতঃ তার ভিতরকার অ্যামিনো অ্যাসিডের গুণাগুণের উপর। মাছের প্রোটিন থেকে যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পাওয়া যায় সেগুলি সবই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

ফ্যাট বা স্নেহ-পদার্থ বিভিন্ন মাছে বিভিন্ন পরিমাণে থাকে—কোন মাছ খুবই রুক্ষ আবার কোন মাছ অতিরিক্ত তৈলাক্ত। এই স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ ৬ থেকে ১৬ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। মৎস্য-দেহে এই স্নেহ-পদার্থের হ্রাস ও বৃদ্ধি কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন, কোন কোন ঋতুতে কোন কোন মাছের স্নেহ-পদার্থ বেড়ে যায়। শীত ও বসন্তকালের ইলিশ মাছে অন্যান্য সময় অপেক্ষা অনেক বেশী তেল হয়ে থাকে। ডিম প্রসবের সময় এবং মাছের খাদ্যের উপরও তার স্নেহ-পদার্থের পরিমাণ নির্ভর করে।

মাছে শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় কোন পদার্থ নেই। কিন্তু মাছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ আছে। ফস্ফরাস এবং ক্যালসিয়াম—এ দুটার পরিমাণই মাছে বেশী। প্রতি গ্রাসে মাছের মুড়া বলে আমাদের দেশে একটা কথা আছে। প্রবাদটি খুবই সত্যি। ছোট ছোট মাছ—যেমন কাঁচকী, মৌরলা, ফেসা, ট্যাংরা, চাঁদা ইত্যাদি আস্ত চিবিয়ে গিলে খাওয়া যায় এ সব মাছের কাঁটা তেমন কিছু গলায় লাগে না। শঙ্কর মাছ নামে আর একটি মাছ আছে—এর আকার গোল এবং চ্যাপ্টা। মাছগুলি খুব বড় হয়। এই মাছের হাড় খুবই নরম, চিবিয়ে খাওয়া চলে। এই সব মাছের কাঁটার মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগই ক্যালসিয়াম থাকে। ছোট ছোট মাছ যদি প্রতিদিন ২-৩ আউন্স করে খাওয়া যায় তাহলে আমরা অনেকটা ক্যালসিয়াম সুলভে পেতে পারি। ইলিশ মাছে ফস্ফরাসের পরিমাণ বেশী। অনেক সামুদ্রিক মাছে আয়োডিন বিদ্যমান থাকে, কিন্তু মাছে লৌহের পরিমাণ খুবই কম। বাংলা দেশের মিঠা জলের মাছে বেশ কিছুটা ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস এবং লৌহ বিদ্যমান আছে। তৈলাক্ত মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-ডি আছে। সেটি, মসি, বাওস, কাজুরা, রাঙ্গোলি ইত্যাদি মাছের যকৃতের তেলে ভিটামিন-এ'র পরিমাণ কড্‌লিভার তেলের চেয়েও বেশী। কিন্তু এসব বাংলাদেশের মাছ নয়—ভারতের বিভিন্ন স্থানে এসব মাছ পাওয়া যায়।

মাছের খাদ্য-গুণ রান্নার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। মাছে সংযোগকারী পেশী খুব কম বলে মাছ রান্নার সময় মাংসের মত আয়তনে অত সঙ্কুচিত হয় না। রান্নার সময় মাছের দ্রবণীয় প্রোটিন জমে যায়, কাজেই এর খুব কম অংশেরই অপচয় ঘটে, কিন্তু মাছের কিছুটা লবণ এবং সুগন্ধি উদ্বায়ী তেল নষ্ট হয়ে থাকে। ভাজার সময় মাছের প্রোটিন কিছুটা নষ্ট হয়—ভিনিগার দিয়ে রান্না করলে মাছের প্রোটিন একটুও নষ্ট হয় না। মাছে আছে প্রচুর পরিমাণে জিলাটিন—এটা গরম জলে দ্রবণীয়। কাজেই জলে সিদ্ধ করবার সময় মাছের অনেকটা পুষ্টিকর অংশ জলের সঙ্গে চলে যায়, অবশ্য সেই জলটা ফেলে না দিলে কিছুই নষ্ট হয় না।

বহু প্রকার মাছের সঙ্গে আমরা পরিচিত—

কোন্ কোন্ মাছ বেশী পুষ্টিকর তাহাও মোটামুটি আমরা জানি। তৈলাক্ত মাছের চেয়ে অ-তৈলাক্ত মাছ অনেক ভাল, কারণ সহজে হজম হয়। খুব তৈলাক্ত মাছ বেশী পুষ্টিকর হলেও সহজে হজম হয় না।

মাছের অভাবের দরুণ আজকাল আমরা রুচি অনুযায়ী মাছ নির্বাচন করিতে পারি না। ইচ্ছামত ভাল মাছ পাবার উপায় নেই বলে বাজারে যা পাওয়া যায় তাই আমাদের বাধ্য হয়ে কিনতে হয়। মাছের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে সরকারের সঙ্গে আমাদেরও মাছের চাষে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে ৩২০০ মাইল লম্বা সমুদ্রতীর পড়ে আছে এর মাত্র ৫।১০ মাইল এলাকা মৎস্য-শিকারে ব্যবহৃত হয়।

আজকাল অবশ্য সরকারী প্রচেষ্টায় মাছ-ধরা জাহাজের সাহায্যে সমুদ্র থেকে গভীর জলের কিছু কিছু মাছ ধরা হচ্ছে। নদী, খাল, বিল, পুকুর আমাদের দেশে যথেষ্ট থাকলেও ভারতের মোট উৎপাদিত মৎস্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এসব জলাশয় থেকে পাওয়া যায়; অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ আসে সমুদ্র থেকে। জাপান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মৎস্য উৎপাদন করে করে থাকে। নীচের তালিকা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্যাহার সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক ধারণা পাওয়া যাবে—

দেশ	মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ (হাজার টন)	মাথাপিছু মৎস্যাহার (পাউণ্ড)
চীন	২৭০০	১৫
ভারত	৫২০	৩
পাকিস্তান	২৫০	৭
জাপান	৩৭৯৭	১১১
বৃটেন	১০৮৫	৪৯
আমেরিকা-যুক্তরাজ্য	২৩৪৫	৩৫

আমাদের দেশের অভ্যন্তরে মাছের চাষের উপযোগী প্রচুর জলাশয় আছে। জলসেচনের জন্যে সরকারের বহু পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে—এসব খাল ও জলাধারে মৎস্য-চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্য সম্বন্ধীয় কয়েকটি গবেষণাগারও এদেশে স্থাপিত হয়েছে। ধীবরদের জন্যে শিক্ষালয় স্থাপন করে তাদের মৎস্য-চাষের আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ফিসারীগুলির এদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য। এই খাদ্যসঙ্কটের দিনে মৎস্য-সমস্যার কিছুটা সমাধান হলে আমাদের খাদ্যে কিছুটা প্রোটিনের সংস্থান হতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা

জোসেফ প্রিষ্টেলি

জন্ম—১৩ই মার্চ, ১৭৩৩ মৃত্যু—৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮০৪

কর দেখ

বর্শা ছোড়বার গুল্‌তি

তোমাদের অনেকেরই হয়তো মাছ ধরবার উৎসাহ আছে এবং মাছ ধরবার জন্যে ছিপ ব্যবহার করে থাক। কিন্তু অনেক রকম অসুবিধার জন্যে অনেকে ছিপ ব্যবহার পছন্দ করে না। যারা ছিপ ব্যবহার পছন্দ করে না অথচ মৎস্য-শিকারে উৎসাহী তাদের জন্যে সহজসাধ্য এক রকম যন্ত্র তৈরীর কথা বলছি। প্রায় ফুট দেড়েক লম্বা নলের মত একটা যন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেশ দূর থেকে বর্শা ছুড়ে অতি সহজেই মাছ শিকার করতে পারবে।

যন্ত্রটা বিশেষ কিছুই নয়। ফুট দেড়েক লম্বা গোলাকার একখণ্ড কাঠের ভিতর দিয়ে বরাবর বেশ মোটা একটা ছিদ্র করে নাও। ছিদ্র করবার পর কাঠখানা একটা নল বা পাইপের মত হবে। এই কাঠের নলের এক প্রান্তে কাটিমের মত

বর্শা-ছোড়া গুল্‌তি
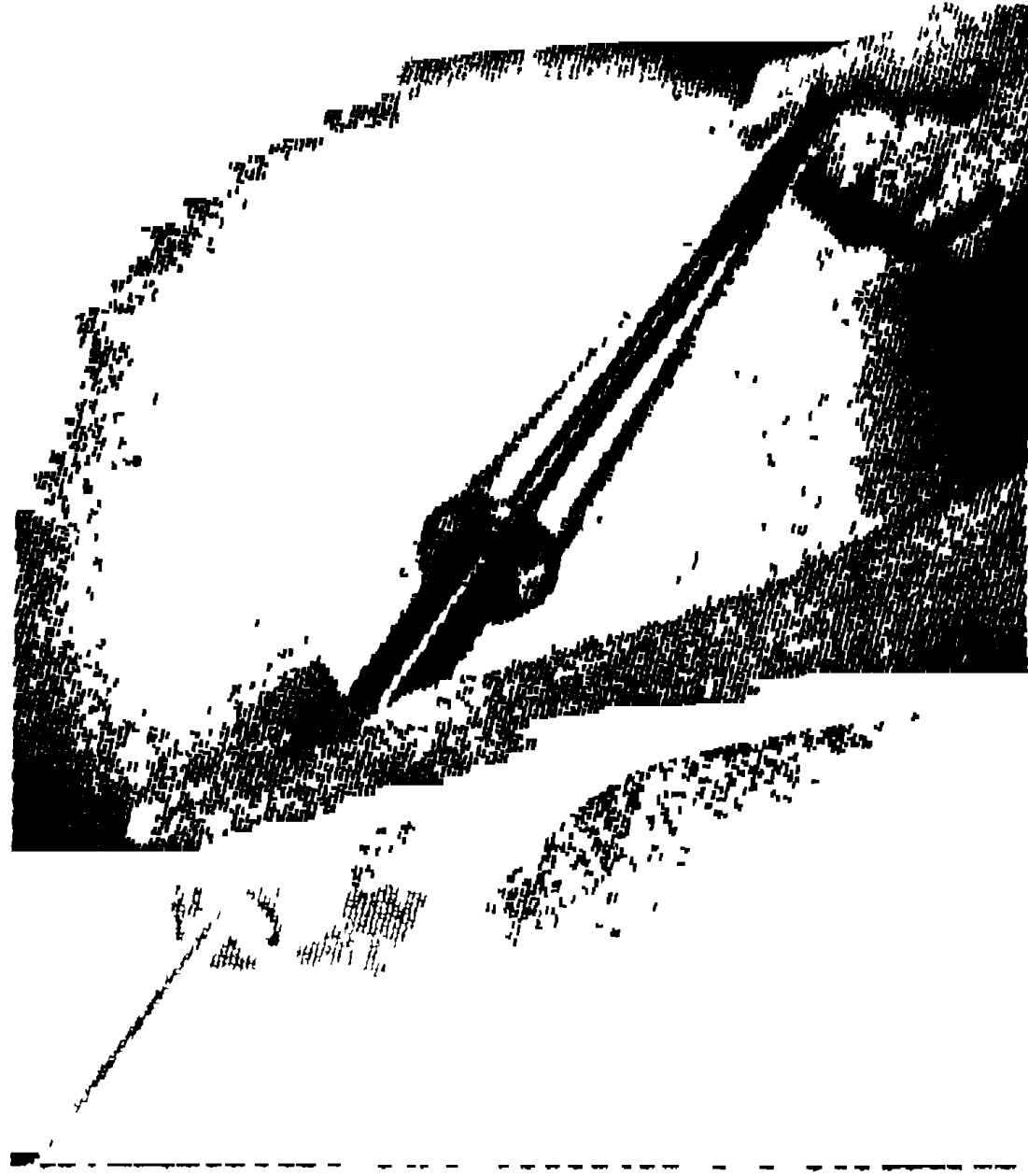
করে ছিদ্র-করা একখানা চাকৃতি জুড়ে দিতে হবে; অথবা সম্পূর্ণ কাঠখানাকে লেদে কেটেও নিতে পার। হাতে ধরবার সুবিধার জন্যে কাঠের নলটার সামনের দিকের খানিকটা অংশ একটু মোটা রাখবে। ছবিটা দেখেই বুঝতে পারবে—নলটা কিভাবে তৈরী করতে হবে। এবার চাকৃতিখানার পিছনে বেশ লম্বা ও পুরু একটা রাবারের ফিতা জুড়ে দাও। এবার ওই নলের ভিতর তীক্ষ্ণমুখ ছোট্ট বর্শা গলিয়ে দিয়ে পাখী-মারা গুল্‌তির মত করে ছুড়ে অনায়াসেই মৎস্য-শিকারে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

জেনে রাখ

ট্র্যান্‌জিষ্টর

ট্র্যান্‌জিষ্টর নামে ইলেকট্রনিক্‌স্‌-এর অপূর্ব যান্ত্রিক কৌশলটি মাত্র অল্প কিছুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত হইলেও বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রশিল্পীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই তাহা দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো বটেই, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইলেকট্রনিক্‌স্‌ সম্পর্কিত ব্যাপারে ট্র্যান্‌জিষ্টরের আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই ট্র্যান্‌জিষ্টরের কথাই অতি সংক্ষেপে তোমাদিগকে বলিতেছি।

ভুট্টার দানার মত ছোট্ট একটি প্লাষ্টিকের আধারে জার্মেনিয়াম ধাতুর অতি ক্ষুদ্র একটি টুক্‌রা দৃঢ়ভাবে বসানো থাকে। এই পদার্থটি অতি অদ্ভুত বৈদ্যুতিক

আসল ট্রান্‌জিষ্টরের প্রায় আড়াই গুণ বর্ধিতাকারের ছবি

গুণসম্পন্ন। ভাল্‌ভ অর্থাৎ ইলেকট্রন টিউব যেভাবে বায়ুশূন্য স্থানে ইলেকট্রন-স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে, ইহাও অনেকটা সেই ভাবেই কঠিন পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু ভাল্‌ভ আর ট্র্যান্‌জিষ্টরের কাজ এক রকমের হইলেও ভাল্‌বের

পরিবর্তে সেখানে একটা ট্র্যান্‌জিষ্টর বসাইয়া দিলেই কাজ চলিবে না। কারণ ট্র্যান্‌জিষ্টরের জন্য ভিন্ন রকমের 'সার্কিট' ও বিদ্যুৎসংক্রান্ত অন্যান্য জিনিষের প্রয়োজন।

ইলেকট্রন টিউবের মত ট্র্যান্‌জিষ্টরও সঙ্কেত আহরণ, পরিবর্ধন এবং স্পন্দন-উৎপাদনে সক্ষম; অথচ ইহাতে ভাল্‌বের মত ফিলামেণ্ট উত্তপ্তকরণ প্রভৃতি ঝঞ্ঝাটের প্রয়োজন নাই। জার্মেনিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ—কয়লা এবং কোন কোন খনিজ আকরের মধ্যে পাওয়া যায়। মূল্যের দিক দিয়া ইহা সোনা এবং প্ল্যাটিনামের মধ্যবর্তী। কিন্তু ট্র্যান্‌জিষ্টরের জন্য যতটুকু জার্মেনিয়াম প্রয়োজন হয় তাহার মূল্য দুই-তিন আনার বেশী নহে। বর্তমানে অ্যাম্‌প্লিফায়ার, ফনোগ্রাফ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার, রেডিও গ্রাহক এবং ছোট্ট প্রেরক যন্ত্র, টেলিভিসন প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে ট্র্যান্‌জিষ্টরের কার্যকারিতার বিষয় পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ছবিটা দেখিলেই ট্র্যান্‌জিষ্টরের ভিতরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে পারিবে। প্রকৃত জিনিষটার প্রায় আড়াই গুণ বড় করিয়া ছবিতে দেখান হইয়াছে।

পাখীর বাসা

নিরাপদে বসবাস করবার জন্যে প্রায় প্রত্যেক প্রাণীই আস্তানা তৈরী করে থাকে। তাছাড়া বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনেও এই আস্তানার মূল্য যথেষ্ট। আজ তোমাদের পাখীর বাসা সম্বন্ধে কিছু বলছি।

সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবীতে যে সব পাখীর আবির্ভাব হয়েছিল তারা খুব সম্ভব সরীসৃপের ন্যায় মাটির উপরে কিংবা ভিতরে ডিম পাড়তো। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পাখীদের ডিমে 'তা' দেওয়ার প্রয়োজন হতো না; কারণ সূর্যের উত্তাপে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতো। কিন্তু শীতপ্রধান অঞ্চলের ব্যাপার ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এখানে স্ত্রী-পাখী ডিম পেড়েই খালাস পেত না। স্ত্রী-পাখীকে ডিম পেড়ে 'তা' দিতে হতো। কাজেই হয়তো গাছের ডাল-পালা সংগ্রহ করে এসব পাখী তার মধ্যে ডিম রক্ষা করতো। কালক্রমে পাখীরা মাটি ছেড়ে উঁচুতে বাসা বাঁধতে সুরু করে। এবার তারা নিজেদের ডিম সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। অবশ্য সব পাখীই যে বাসা তৈরী করে তা নয়। এখনও এমন অনেক পাখী দেখা যায় যারা মোটেই বাসা তৈরী করে না। হাঁস, প্লোভার, গাল্ প্রভৃতি পাখী যেখানে সেখানে ডিম পেড়ে রাখে। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ডিম পাড়বার সময় কাকের ডিমগুলি নষ্ট করে ফেলে, পাছে নিজেদের নষ্টামি ধরা পড়ে, সেজন্যেই এই সাবধানতা।

সব পাখীর বাসা তৈরীর কায়দা এক ধরনের নয়। এমন পাখী আছে যারা কোন রকমে খড়কুটা দিয়ে বাসা তৈরী করেই খালাস। এরা কারু-শিল্পের ধার ধারে না। চিল, কাক প্রভৃতি এই জাতীয় পাখী। কাকের বাসা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে—যত রাজ্যের জিনিষ সেখানে গাদা হয়ে আছে। আবার এমন সব পাখী আছে যাদের বাসা তৈরী কৌশল দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। দক্ষ শিল্পীদেরও এদের কাছে হার মানতে হয়। যাতে বাচ্চাগুলি আরামে থাকতে পারে সেজন্যে বাসার ভিতরে পালক, পশম, তূলা প্রভৃতি দিয়ে আস্তরণ তৈরী করে দেয়। কোথাও আবার বাসার উপরে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ কিংবা মাকড়সার

রিড-ওয়ারবলার নামক পাখীর বাসা

জালের একটা আবরণ থাকে। সচরাচর পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে মিলেমিশে বাসা তৈরী করে। পাখীর এই সহজাত প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে বাচ্চাদের প্রতি এদের স্নেহ-ভালবাসা।

মেরুপ্রদেশের নাম শুনেছ তো। সে এক অদ্ভুত দেশ—গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, বারোমাস শীত। গাছ-পালার কোন বালাই নেই। যেদিকে চাও—শুধু বরফের রাজত্ব। এহেন শীতের দেশে বাস করে একজাতের পাখী। নাম পেংগুইন। ঠিক আস্তানা বলতে এদের কিছু নেই। ডিম পাড়বার সময় হলে বরফের মাঝখানে সামান্য গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে নুড়ি বিছিয়ে স্ত্রী-পেংগুইন দুটি কিংবা একটি ফিকে সবুজ রঙের ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে পালাক্রমে ডিমে ‘তা’ দিয়ে থাকে।

ছু-পায়ের মাঝখানে পকেটের মত একটি জায়গায় ডিমটি রেখে 'তা' দেয়। কোন শত্রুর নিকটে আসবার সম্ভাবনা দেখলে ডিম নিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করে।

আফ্রিকার বয়নকারী পাখীগুলি (বাবুই) এক একটি উপনিবেশ গড়ে মিলেমিশে বাস করে। এদের বাসা বুনো ঘাস দিয়ে তৈরী। বাসার মুখটি নীচের দিকে থাকে। মাছরাঙ্গা পাখী পুষ্করিণী, খানা-ডোবা অথবা কোন জলাশয়ের ধারে গর্তের মধ্যে বাসা বাঁধে। বাওয়ার বার্ড বা কুঞ্জপাখীর বাসা বাঁধবার কায়দা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। শুধু ডিম পাড়বার উদ্দেশ্যেই এরা বাসা নির্মাণ করে না, পুরুষ এবং স্ত্রী-পাখীর মধ্যে প্রণয় নিবেদনের আস্তানা হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। এরা হরেক রকমের ফুল এবং রঙীন পদার্থ দিয়ে কুঞ্জের মত করে বাসাটি পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে। কুঞ্জপাখীর আবার বিভিন্ন জাত আছে। এক এক জাতের সজ্জাভঙ্গী এক এক ধরনের। কোনটার

ওভেন-বার্ডের বাসা

সঙ্গে কোনটার তেমন মিল নেই। সচরাচর ফল, ফুল, শামুক, প্রভৃতির খোলা, পালক ইত্যাদি দিয়ে মনের মত করে বাসা সাজিয়ে থাকে। ফ্লেমিঙ্গো পাখীরা বাচ্চা প্রতিপালনের জন্যে কলোনী গড়ে তোলে। অগভীর জলাভূমিতে মাটি দিয়ে বাসা তৈরী করে। বাসাটি জল থেকে প্রায় বারো ইঞ্চি উঁচু হয় এবং মাঝখানে খাঁজ থাকে ডিম পাড়বার জন্যে। দেখতে বাটির মত। রিড-ওয়ারবলার নামক এক রকমের পাখী চার-পাঁচটা নলখাগড়া একত্র করে তার গায়ে বাসা বাঁধে। বাসাটির মাঝখানটায় বেশ গভীর গর্ত থাকে ; দেখতে টুপির মত। লং টেইল্ড টিট্ নামে একজাতের পাখী আছে ; শেওলা, পশম প্রভৃতি দিয়ে তারা সুন্দর বাসা নির্মাণ করে। বাসার ভিতরে পালক বিছিয়ে দিয়ে গদির মত আরামদায়ক করে তোলে। ওভেন-বার্ড কাদার সঙ্গে কয়েকটা ডালপালা এবং খড়কুটা মিশিয়ে বাসা তৈরী করে। বাসার মধ্যে দুটি কোঠা থাকে। একটি ডিম পাড়বার কোঠা, অপরটি অগ্রকক্ষ।

টেইলর-বার্ড বা দরজী পাখী নামক এক ধরনের পাখী আছে। তারা স্ত্রী-পুরুষে মিলে গাছের দুটি, কি তিনটি পাতার ধার সেলাই করে জুড়ে দেয়। দেখতে অনেকটা থলের মত হয়। এর মধ্যে সরু ঘাস, পেঁজা তুলা এবং চুল বিছিয়ে দেয় এবং তার মধ্যে ডিম পাড়ে। আমাদের দেশে টুনটুনি পাখীরাও ঠিক এমনি করেই ঝোপ-ঝাড়ে ছোট ছোট গাছের দুটি পাতা সেলাই করে বাসা তৈরী করে। এরা তুলা দিয়ে বাসার ধারগুলি সেলাই করে এবং বাসার মধ্যে তুলা বিছিয়ে দেয়। কাঠঠোক্‌রা পাখী আম,
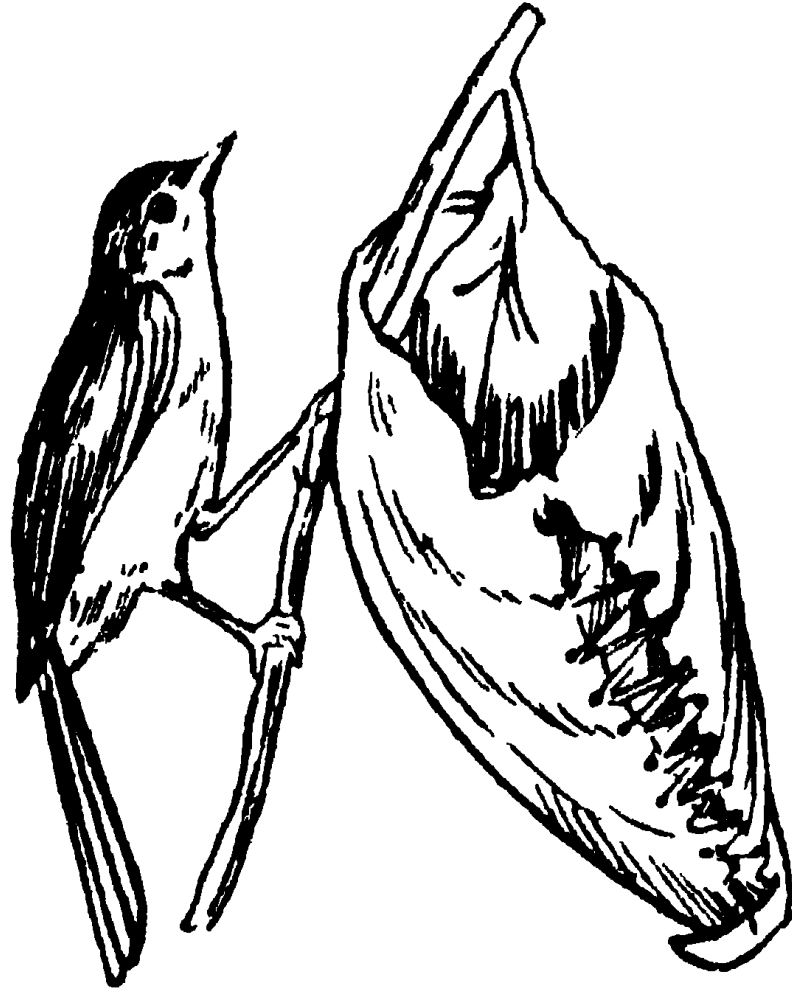
টেইলর-বার্ড-এর বাসা

জাম, প্রভৃতি উঁচু গাছে লম্বা গর্ত করে তার মধ্যে বাসা তৈরী করে। অ্যামাজনের জ্যাপিন্ পাখীরা পশুর লোম দিয়ে চমৎকার বাসা নির্মাণ করে থাকে। চীনদেশে সি-সুইফ্‌ট্ পাখীরা মুখের লালা এবং সামুদ্রিক আগাছা দিয়ে বাসা তৈরি করে। দেখতে চুবড়ির মত। পাহাড়ের উঁচু প্রদেশে বাসাগুলি দেখা যায়। এসব পাখীর বাসা মহাচীন এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সেখানকার অধিবাসীরা সি-সুইফ্‌টের বাসা দিয়ে এক ধরনের মুখরোচক সুপ তৈরী করে থাকে।

সাপুড়েদের বাঁশী তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। বাবুই পাখীর বাসা অনেকটা সাপুড়েদের বাঁশীর মত। শত চেষ্টা করেও তোমরা বাবুই পাখীর মত বাসা বুনতে পারবে না। আশ্চর্য এদের নির্মাণ-কৌশল। তাল বা খেজুর পাতা ঠোঁট দিয়ে সরু সরু করে চিরে নিয়ে সেই সরু তন্তুর সাহায্যে এরা বাসা বুনে থাকে। আমেরিকার হ্যাংনেষ্ট বার্ড তালপাতা ও ঘাসের সাহায্যে বাসা তৈরী করে। বাসাটি গাছের ডালে ঝুলন্ত থাকায় হাওয়ায় দোলা খায়। সময় সময় এরা বাসার উপর বসে আরামে দোল খেয়ে থাকে।

তুর্কিস্থানে রেমেরা নামক একজাতের পাখীর বাসা দেখতে অনেকটা ঘটের মত। ঘাস ও পালক দিয়ে এরা বাসা তৈরী করে।

হামিং বার্ড পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ছোট পাখী। এরা গাছের খুব উঁচুতে সরু ডালে বাসা বাঁধে। তুলা, শণ, পালক ইত্যাদির সাহায্যে এরা বাসা তৈরী করে।

এখানে মাত্র কয়েক জাতের পাখীর বাসার কথা বলা হলো। তোমরা যদি একটু মনোযোগী হও তাহলে এ বিষয়ে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

—ন—

জোসেফ প্রিষ্টলি

১৭৯১ সালের ১৪ই জুলাই। বার্মিংহাম সহরের আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল এক বীভৎস দাঙ্গায়। এক ক্ষিপ্ত জনতা জোসেফ প্রিষ্টলির বাড়ী আক্রমণ করে তাঁর সাধের পাঠাগার, গবেষণাগার, আসবাবপত্র প্রভৃতি ধ্বংস করে ফেললো। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সহায়তায় তিনি কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

১৭৩৩ সালের ১৩ই মার্চ লিড্‌সের নিকট ফিল্ডহেড গ্রামে এক তন্তুবায়ের ঘরে জোসেফ প্রিষ্টলির জন্ম হয়। পিতা জোনাস প্রিষ্টলি একজন গোঁড়া ক্যালভিনিষ্ট ছিলেন। ছয় বছর বয়সে মাতার মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পর বালক জোসেফকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্নেহময়ী পিসিমার তত্ত্বাবধানে প্রিষ্টলি মানুষ হতে থাকেন। কিছুদিন পর প্রিষ্টলির শারীরিক অসুস্থতার জন্যে পড়াশুনায় বাধা সৃষ্টি হয়। স্কুল ছেড়ে দিতে হলো প্রিষ্টলিকে। স্কুলের পড়াশুনা বন্ধ হলেও বাড়ীতে বালক জোসেফের অদম্য উৎসাহে লেখাপড়া চলতে থাকে। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ম্যাক্লরিনের ছাত্র ছিলেন মিঃ হ্যাগারষ্টোন। তিনি জোসেফের বাড়ীর কাছে থাকতেন। তাঁর সাহায্যে প্রিষ্টলি বীজগণিত, জ্যামিতি এবং অঙ্ক-শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন; এ ছাড়া এই সময়ের মধ্যে গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষাও জোসেফ প্রিষ্টলি আয়ত্ত করে ফেলেন।

১৭৫২ সালে ১৯ বছর বয়সে জোসেফ প্রিষ্টলি ড্যাভেনট্রিতে এলেন ধর্মযাজকের বৃত্তি সম্পর্কিত শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে।

তিন বছর পর তিনি নিধাম মার্কেটে চলে এলেন তাঁর বৃত্তি অনুসরণ করবার জন্যে। কিন্তু নিধাম মার্কেটের জীবন তাঁর কাছে নিরানন্দ এবং একঘেঁয়ে হয়ে উঠল। এ ছাড়া আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। অগত্যা ১৭৫৮ সালে তিনি ন্যানটুইচে চলে এলেন। শিক্ষকতায় তিনি আনন্দ পেতেন। এখানেই ক্রমে একজন নামকরা শিক্ষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

১৭৬১ সালের সেপ্টেম্বরে ওয়ারিংটন থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয় শিক্ষকতা

করবার জন্যে। ওয়ারিংটনে তখন বিশিষ্ট শিক্ষকেরা অধ্যাপনা করতেন। এখানে এসে জোসেফ প্রিষ্টলির জীবনের মোড় ঘুরে গেল। ওয়ারিংটন একাডেমিতে তখন মেথ্যু টারনার রসায়নের অধ্যাপনা করতেন। মেথ্যু টারনারের বক্তৃতার প্রভাবে বিজ্ঞানের দিকে তাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত হলো। এখানেই প্রিষ্টলির বৈজ্ঞানিক জীবনের সূত্রপাত। ওয়ারিংটনে অবস্থান কালে মিস্ মেরী উইলকিন্সনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৭৬২ সালে মেরী উইলকিন্সনের সঙ্গে জোসেফ প্রিষ্টলি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মনীষীদের জীবন-তালিকা প্রকাশ করে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টর অব ল উপাধি লাভ করেন। সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনে তিনি প্রতি বছর কিছুদিন কাটাতেন। একবার লণ্ডনে ডাঃ বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। লেখক হিসাবে ইতিমধ্যে প্রিষ্টলির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাঃ বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর তিনি তড়িৎ-বিজ্ঞানের ধারা প্রকাশ করবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি তড়িৎ-বিজ্ঞানের একখানা সুন্দর ইতিহাস প্রকাশ করেন। এই বইখানি তাঁকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের নিকট পরিচিত করে দেয়। ১৭৬৬ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ওয়ারিংটনের কর্তৃপক্ষ আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হলে জোসেফ প্রিষ্টলি লিড্‌সে চলে আসেন।

ধর্মমত সম্বন্ধে তিনি উদার ছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট রক্তমাংসে গড়া মানুষেরই একজন ছিলেন, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এই ধারণা তখনকার বড় বড় গীর্জার ধর্মযাজক এবং অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের কাছে অপ্রিয় এবং ধর্মবিরোধী বলে বিবেচিত হতো। লিড্‌সেই জোসেফ প্রিষ্টলি প্রথম রাসায়নিক পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৭৭২ সালে তিনি জলের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ তৈরী করেন। এই আবিষ্কারের ফলে সোডাওয়াটার তৈরীর অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হয়। তখনকার দিনে জাহাজের নাবিকদের মধ্যে স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল। প্রিষ্টলির আবিষ্কারের পর প্রত্যেক জাহাজে স্কার্ভি রোগ উপশম করবার জন্যে সোডাওয়াটার তৈরীর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই আবিষ্কারের জন্যে রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে মৌলিক গবেষক হিসাবে কোপলি পদক দিয়ে পুরস্কৃত করে।

ছয় বছর লিড্‌সে থাকার পর জোসেফ প্রিষ্টলি লর্ড সেলবার্ণের সহচর নিযুক্ত হন। তিনি তখন ক্যাল্‌নে বাস করতেন। এই সময় তিনি অনেকগুলি আবিষ্কারের বিষয় ঘোষণা করেন এবং লর্ড সেলবার্ণের সহচর হিসাবে ইউরোপ পরিভ্রমণের সুযোগ পান। সে সময় তিনি ম্যাগেলন নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হন। মিঃ ম্যাগেলনের সাহায্যে তিনি বিশিষ্ট ফরাসী বিজ্ঞানীদের সাহচর্য লাভ করেন। ফরাসী দেশের বিশিষ্ট রাসায়নিক ল্যাঁভয়শিয়ারের সঙ্গে তাঁর এই সময় সাক্ষাৎ হয় এবং ল্যাঁভয়শিয়ারের বাড়ীতে তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে অক্সিজেন প্রস্তুত করেন।

১৭৭২ সালে তিনি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস প্রস্তুত করেন। তখন এই রাসায়নিক যৌগিকটি মেরিন অ্যাসিড ওয়াটার নামে পরিচিত ছিল। ১৭৭৩ সালে ভিট্রোলিক অ্যাসিড এয়ার অর্থাৎ সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং ১৭৭৪ সালে তিনি অক্সিজেন বা ডিফ্লজিস্টিকেটেড্ এয়ার আবিষ্কারের ঘোষণা করেন। এই বছর তিনি অ্যালকালাইন এয়ার বা অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করেন। বিদ্যুৎস্ফুরণ দ্বারা তিনি অ্যামোনিয়াকে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনে বিশ্লেষিত করেছিলেন। এছাড়া জোসেফ প্রিষ্টলির রাসায়নিক গবেষণার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাঁর ফ্লজিস্টন মতবাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য।

প্রিষ্টলির রাসায়নিক গবেষণাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে ধারাবাহিক পদ্ধতির অভাব ছিল। এই হিসাবে তিনি তখনকার রাসায়নিক ক্যাভেণ্ডিস এবং সুইডিস বিজ্ঞানী শীলের থেকে আলাদা ছিলেন। এছাড়া রসায়নের মাত্রিক দিকটার উপর তিনি নজর দিয়েছিলেন খুবই কম।

কিছুদিন লণ্ডনে থাকবার পর প্রিষ্টলি বার্মিংহামে চলে আসেন। বার্মিংহামে গীর্জার কাজ ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। বার্মিংহামের লুনার সোসাইটি ছিল সেখানকার সুধী সমাজের সমিতি। সমিতির সভ্যবৃন্দের নিকট থেকে তিনি উৎসাহ পেতেন। সে সময় প্রিষ্টলি ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধে নিজের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এতে শত্রুপক্ষের আক্রোশ তাঁর উপর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষে ১৭৯১ সালে ১৪ই জুলাই এক উত্তেজিত জনতা কর্তৃক তাঁর বাড়ী আক্রান্ত হয়। এরপর প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে জোসেফ প্রিষ্টলি লণ্ডনে চলে আসেন।

তাঁর শত্রুপক্ষ এতেও কিন্তু ক্ষান্ত হলো না। লণ্ডনে প্রিষ্টলির জীবন দুর্বহ হয়ে উঠলো। অনেক সময় জনরব শুনা যেত যে, তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে। আতঙ্কের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তাঁর বন্ধুবান্ধব একে একে তাঁকে ছেড়ে গেল। তিনি রয়্যাল সোসাইটি থেকে পদত্যাগ করলেন। এমন কি, দেশ ছেড়ে যেতে তিনি মনস্থ করলেন; কারণ দেশের আকাশ-বাতাস তাঁর পক্ষে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। ১৭৯৪ সালের ৮ই এপ্রিল তিনি আমেরিকায় তাঁর ছেলের কাছে রওনা হন। পথিমধ্যে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাঁভয়শিয়ারের প্রাণদণ্ডের কথা শুনতে পেলেন। ৪ঠা জুন তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছেন। কিছুদিন ফিলাডেলফিয়াতে অধ্যাপনার পর তিনি নর্দাম্বারল্যাণ্ডে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর মিসেস্ প্রিষ্টলির শরীর ভেঙ্গে পড়ে। ১৭৭৫ সালে মিসেস প্রিষ্টলির মৃত্যু হয়। ১৮০৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রত্যুষে জোসেফ প্রিষ্টলি প্রবাসে মৃত্যু বরণ করেন।

জোসেফ প্রিষ্টলির চরিত্রে বিভিন্ন গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করে স্বীয় তিনি প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করেছিলেন।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যারা জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন তাঁদের অনেকের ভাগ্যেই সামাজিক জীবনের শান্তি আর সমৃদ্ধি জোটে নি। অনেকে প্রচলিত আইন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিদ্রোহী প্রতিপন্ন হয়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেন। তাই ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাঁভয়শিয়ারের ভাগ্যে জুটেছিল প্রাণদণ্ড আর ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিষ্টলির ভাগ্যে প্রবাসে মৃত্যু।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

বস্তু ও শক্তি

বিশ্বপ্রকৃতিতে যাহা কিছু স্থান দখল করিয়া আছে এবং যাহার ওজন আছে তাহাই বস্তু। গাছপালা, পশুপক্ষী, জলবায়ু, পাহাড়পর্বত প্রভৃতি সব কিছুই বস্তুর অন্তর্গত। কিন্তু এই বিরাট বস্তুজগৎ গঠিত হইয়াছে মাত্র ৯২টি মৌলিক পদার্থের বিভিন্নভাবে মিলনে অসংখ্য যৌগিক পদার্থের দ্বারা। কোন নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে যতখানি বস্তু থাকে তাহাকে উহার ভর (mass) বলে। বাহিরের কোন শক্তি যদি পদার্থটির উপর কাজ করে তবে উহার আকার বা আয়তনের পরিবর্তন হইবে, কিন্তু ভরের কোনই পরিবর্তন হইবে না। বস্তু ও ভরের সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য ইহা তাহাই প্রমাণ করে। আবার ইহা হইতে আরও জানা যায় যে, বস্তুর সঙ্গে আকার বা আয়তনের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুকে আমরা বিচার করি ওজন দিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে যাহার ওজন আছে তাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও বস্তুর অন্তর্গত। বায়ু ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বায়ু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু ইহা নির্দিষ্ট স্থান দখল করিয়া থাকে এবং ইহার ওজন আছে। ওজন কিন্তু বস্তুর নিজস্ব নয়। নিউটনের সূত্র হইতে জানা যায় যে, পৃথিবী তাহার উপরিস্থিত সকল বস্তুকেই মহাশক্তি দিয়া নিজের দিকে টানিতেছে এবং আমরা যাহাকে ওজন বলিয়া জানি তাহা এই আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিউটনের সূত্র এই আকর্ষণ দূরত্বের বর্গের সহিত ব্যস্ত আনুপাতিক; অর্থাৎ দূরত্বের বর্গ যত বাড়িবে আকর্ষণ তত কমিবে। পৃথিবী ঠিক গোলাকার না হওয়ায় ইহার কেন্দ্র হইতে সকল স্থানের দূরত্ব সমান নহে এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য বিভিন্ন স্থানের কেন্দ্র-বহির্মুখী বলও (centrifugal force) বিভিন্ন। এই দুইটি কারণে পৃথিবী-পৃষ্ঠে সকল স্থানে এই আকর্ষণ সমান নহে। অতএব পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, যেমন—পর্বতের উপরে অথবা খনিগর্ভে, পদার্থের ওজনের তারতম্য হইবে। কিন্তু ভরের সহিত এই আকর্ষণের কোন সম্পর্ক নাই; তাই ভরের কোন তফাৎ হইবে না, সর্বত্রই সমান হইবে। গণিতের দ্বারা এইরূপ প্রমাণিত

হইয়াছে যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে যেখানে এই আকর্ষণ—শূন্য, সেখানে পদার্থের কোন ওজন থাকিবে না, কিন্তু ভর একই থাকিবে—তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না।

বস্তুর গঠনও আজ বিজ্ঞান আমাদের জানাইয়া দিয়াছে। যদি কোন বস্তুকে ক্রমাগত ভাঙ্গা যায় তবে পরিশেষে এমন অবস্থায় আসে যখন বস্তুত্ব বজায় রাখিয়া আর ভাঙ্গা সম্ভব নয়; তখন তাহাকে বলা হয় অণু। যৌগিক পদার্থের শেষ সীমা এই অণুতেই। কিন্তু মৌলিক পদার্থের অণুকে ভাঙ্গিলে আরও ছোট ছোট অংশ পাওয়া যায়; তাহাদের নাম হইতেছে পরমাণু। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু সংযুক্ত হইয়া একটি যৌগিক পদার্থের অণুর সৃষ্টি করে। পূর্বে জানা ছিল, পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু পরমাণুরও ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর অংশ আছে বলিয়া বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তু অবিনশ্বর; ইহাকে আমরা সৃষ্টিও করিতে পারি না, ধ্বংসও করিতে পারি না। আপাতদৃষ্টিতে আমরা যে সৃষ্টি বা ধ্বংস দেখিতেছি তাহা কেবল বস্তুর পরিবর্তন। তাই উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্ম বা বৃদ্ধি অথবা একটা বাতি পুড়িয়া নিঃশেষিত হইলে কিছুই সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। মাটি, জল, বায়ু হইতে পদার্থ সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধি হয় এবং বাতি পুড়িয়া গ্যাসীয় পদার্থে (Co_2) পরিণত হয়।

শক্তিও সারা বিশ্বপ্রকৃতি ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। বজ্রের ভীষণ নিনাদ আমরা শুনিতে পাইলাম, বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলো চোখ ঝল্সাইয়া দিল, সূর্যের প্রখর উত্তাপ অসহ্য বোধ হইল, কয়েক মিনিটের মধ্যে এরোপ্লেনকে আকাশের এক কোণ হইতে অপর কোণে ছুটিয়া যাইতে দেখিলাম—এই সব-কিছুই শক্তির উদাহরণ। বস্তুর সহিত ইহার বিরাট পার্থক্য এই যে, ইহাকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিতে পারি না এবং ইহার ওজনও নাই। তবে ইহাকে বুঝিব কেমন করিয়া? ইহাকে জানিতে হয় ইহার কাজের মধ্য দিয়া। কাজের সহিত শক্তির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কার্য সম্পাদনের মূলে রহিয়াছে শক্তির ব্যয় এবং সেই হিসাবে ইহাকে কার্যের কারণও বলা যাইতে পারে। শক্তির পরিমাপও হয় কার্যের দ্বারা এবং কার্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী ইহাও হয় বিভিন্ন। শক্তির বিভিন্নতা অনুযায়ী পদার্থ-বিজ্ঞানে বলবিদ্যা, তাপ, আলো, শব্দ, চুম্বক ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। এক শক্তি অপর শক্তিতে পরিবর্তিত হইতে পারে। বস্তুর মত শক্তিরও সৃষ্টি নেই, বৃদ্ধি নেই, হ্রাস নেই, বিনাশ নেই—আছে শুধু পরিবর্তন বা রূপান্তর। পদার্থের মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে তাহা শক্তির স্থৈতিক অবস্থা এবং কাজ করিবার সময় ইহার যে বিকাশ দেখা যায় তাহা গতীয় অবস্থা।

উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এইরূপ ধারণা ছিল যে, শক্তি ও বস্তু বিভিন্ন এবং বস্তু শক্তির বাহক। পদার্থের মাধ্যম ব্যতীত শক্তি কোন কাজ করিবে না এবং শক্তি

ব্যতীত পদার্থও অচল। পদার্থে শক্তি প্রয়োগ করিলে বা তাহা হইতে সরাইয়া লইলে বস্তুর কোন পরিবর্তনই হইবে না। আইনষ্টাইন পূর্ববর্তীদের এই ধারণা একেবারে পাল্টাইয়া দিলেন তাঁহার আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বারা। এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন বস্তুর ভর উহার গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে এবং উহা যখন আলোকের গতি পাইবে তখন ভর ধারণাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইবে। যে ভর আমরা ধারণা করি উহা তাহার গতিশূন্য অবস্থার ভর। যখন গতির পরিবর্তনের সহিত ভর বা বস্তুর পরিবর্তন হইতেছে তখন বস্তু ও শক্তি কখনই সম্পর্কহীন নয়, উহা একেরই বিভিন্ন রূপ। বর্তমানে এইরূপ ধারণা করা হয় যে, বস্তু শক্তির ঘনীভূত অবস্থা এবং শক্তি বস্তুর সূক্ষ্ম অবস্থা। উহাদের পরস্পরেব অবস্থার যে পরিবর্তন হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। বস্তু ও শক্তি যে একেরই বিভিন্ন রূপ তাহা পরমাণু বিভাজনের বিপুল শক্তির বিকাশ হইতেই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফসিল

বহু বহু যুগ আগেও এই পৃথিবীতে নানারকম গাছ ছিল, পশু-পাখী ছিল। অতীতের তরুলতা ও পশুপাখীর দেহের কঠিন অংশ আজও আমরা খুঁজে পাই পৃথিবীর শিলার স্তরে স্তরে। হয়তো বা ঢাকা পড়েছে কোন কোন স্তরের মাঝে। ফসিল কথার মানে হলো যা খুঁড়ে বের করা হয়েছে। আগে তাই পৃথিবীর তলার সমস্ত খনিজ সম্পদকেই ফসিল বলা হতো। আজকাল কথাটির অর্থ সীমাবদ্ধ হয়েছে; শুধু বিগত যুগের প্রাণধারার স্মৃতিচিহ্নের উপর আরোপ করা হয় এই কথাটি।

খুব কম ক্ষেত্রেই সমগ্র দেহ রক্ষিত হয়েছে। তবে দু-এক ক্ষেত্রে সে রকম পাওয়াও গেছে। সাইবেরিয়ার তুষার আস্তরণের নীচে থেকে পাওয়া গেছে একটি মৃত ম্যামথ। তুষারের আস্তরণের ভিতর বেশ তাজা ছিল এই ম্যামথটি। অনেক কীট-পতঙ্গের সমস্ত দেহটাই রক্ষিত হয়েছে, এমনও দেখা গেছে। তবে সাধারণতঃ কঠিন অংশগুলি টিকে যায়—ধীরে ধীরে গলে ঝরে যায় নরম দেহাস্থি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পশুপাখী বা গাছপালা যখন পাথরের গায়ে বসে যায় তখন নানা ধাতু তাদের চারদিক ঘিরে তারই মত আকার সৃষ্টি করে। চারপাশে রচিত হয় কঠিনতর আচ্ছাদন। তারপর হয়তো জল-বৃষ্টি, রোদ-বাতাসে সেই জীবের সমস্ত অংশই মুছে যায়; থেকে যায় শুধু বহিরাকৃতির ফাঁকা ছাঁচটা। সেই ফাঁকা অংশটাতে অন্যান্য ধাতুরা আস্তানা গাড়ে, ফলে শূন্যতা ভরে যায়।

ফসিলের প্রয়োজনীয়তা অনেক। তারা প্রাচীন ইতিহাস রচনার একমাত্র অবলম্বন। যে যুগের সংবাদ কেউ জানে না—তারা সেই যুগের সংবাদবাহী। কেমন ছিল আগেকার আবহাওয়া ও জলবায়ু, কোথায় ছিল স্থল, কোথায় ছিল জল—তা জানা যায় এই ফসিল থেকে।

যদি কিছু ফসিল পাওয়া যায় অনেক বেশী সামুদ্রিক ফসিলের সঙ্গে তবে বুঝতে হবে যে, তারা সমুদ্রে সঞ্চিত হয়েছে বটে, কিন্তু স্থলও খুব দূরে নয়। যদি দেখা যায় এক জায়গায় শুধু ডাঙ্গার জীব আর গাছের ফসিল—তখন বুঝতে হবে, সে জায়গায় ছিল মাটি। আবার প্রবাল প্রভৃতি কীটের অবশেষ যদি পাওয়া যায় কোন স্থানে—তখন ধরে নিতে হবে সেখানে ছিল সমুদ্র। হিমালয় পর্বতের কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে অনেক সামুদ্রিক ফসিল পাওয়া গেছে; তাই বোঝা যায় যে, এককালে হিমালয়ের অনেকটা সমুদ্রের তলায় ছিল। অবশ্য এ সব হিসাবেরও ব্যতিক্রম আছে। যেমন এক জায়গায় প্রচুর সামুদ্রিক ফসিল দেখে ভেবে নেওয়া গেল যে, সেখানে সমুদ্র ছিল; আসলে হয়তো সেখানে সমুদ্র কোন দিনই ছিল না। বড় বড় পাখীরা সমুদ্রের জীবজন্তু ধরে এনেছে সেখানে—দেহের কোমল অংশগুলি খেয়েছে, আর কঠিন শক্ত অংশ ফসিল হয়ে রক্ষিত হয়েছে।

ফসিল থেকে জলবায়ুব অবস্থাও জানা যেতে পারে। ধরা যাক, এক জায়গায় পাওয়া গেল পাম গাছের পাতা, বাঘ, সিংহ, হাতীর দেহাবশেষ। তাহলে বুঝতে হবে সেই জায়গাটা ছিল গ্রীষ্মপ্রধান। আবার যদি দেখ বার্চ আর উইলোর পাতা, হরিণের দেহাবশেষ—তখন ধরে নাও সেই জায়গাটা ছিল শীতপ্রধান জলবায়ু-মণ্ডলে। প্রশ্ন হতে পারে—উইলো, বার্চ না হয় আজ শীতপ্রধান অঞ্চলে জন্মায়; কিন্তু তারা আগেও যে সেসব অঞ্চলে জন্মাতো তার প্রমাণ কি? বিজ্ঞানী বলেন, প্রমাণ নেই—আমাদের বিশ্বাস। আমরা মনে করে নিয়েছি, আজ তারা যে জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠছে, আগেও সেভাবেই বেড়ে উঠত।

একবার মেরুঅঞ্চলে কয়েকটি হাতী ও গণ্ডারের ফসিল পাওয়া গেল। সবাই তখন স্থির করলো যে, মেরুঅঞ্চল একদা উষ্ণপ্রধান অঞ্চলই ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই পাওয়া গেল একটি হাতীর সম্পূর্ণ দেহ। গায়ে তার পশমের মত কোমল লোম। তখন বোঝা গেল যে, এই প্রাণীরা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছিল। প্রথম ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

জীবতত্ত্বের দিক থেকে ফসিলের প্রয়োজনীয়তা অনেক। এর মধ্যেই লেখা আছে বিবর্তনের বিচিত্র কাহিনী। কেমন করে জেলিমাছ থেকে আজকের মানুষ এল, অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে কেমন করে মেরুদণ্ডী প্রাণী এল, আর কেমন করেই বা আদি জাভা মানব (পিথেকানথ্রোপাস ইরেক্টাস) থেকে আধুনিক মানব এল—তার কাহিনী লেখা আছে ফসিলে।

তাছাড়া শিলাস্তরের বয়স জানা যায় ফসিল থেকে। কে প্রাচীনতর—কে নবীন? এইভাবে মানবজাতির ইতিহাস রচনায়, পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় ফসিলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। তাথেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে ইতিহাস—অতীতের কথা।

শ্রীশিশিরকুমার দাশ

মিশরের মমি

তোমরা নিশ্চয়ই মিশরের মমির কথা শুনেছ। শুধু শুনবেই বা কেন, আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজ জড়ানো মরা মানুষের সেই অদ্ভুত ছবি হয়তো অনেকেই দেখে থাকবে! গল্পে, উপন্যাসে, সিনেমায় মমিদের নিয়ে কত অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর কাহিনী তৈরী হয়েছে! সেই সব বই পড়তে পড়তে বা ছবি দেখতে দেখতে তোমাদের হয়তো এই সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার আগ্রহ জাগবে; আজ তাই মমি সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলছি।

যে কয়টি প্রাচীন সভ্যতা পৃথিবীর বুকে একদা বিপুল সম্ভাবনার গোড়া পত্তন করেছিল, মিশর তাদের মধ্যে অন্যতম। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরের পণ্ডিতেরা এমন অনেক বিষয় জানতেন, যা আজকের আণবিক যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

তোমরা জান মানুষের দেহ মৃত্যুর দু-এক দিনের মধ্যেই পচে-গলে বিকৃত হয়ে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। সেকালের মিশরের বৈজ্ঞানিকেরা মৃত মানুষের দেহগুলি একপ্রকার পচন-নিবারক আরক মাখিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে রাখতেন, যার ফলে সেগুলি চিরদিন অবিকৃতভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো। এসব মৃতদেহকে বলা হয় মমি। কয়েক হাজার বছরের পুরনো এইরূপ মমি কলকাতার যাদুঘরেও আছে।

তোমরা এখন নিশ্চয়ই ভাবছ যে, মমি করার এই অদ্ভুত প্রথা মিশরীয়দের মনে এল কেন? প্রাচীন মিশরীয়দের মতে স্বর্গের রাজা হচ্ছেন রা অথবা আমিন-রা, আর মৃত্যুর রাজা অসিরিস। মিশরীয় পুরাণে এই অসিরিসের সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ কাহিনী আছে এবং মিশরের লোকেরা এটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতো বলেই মমি করবার প্রথা একদিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। অসিরিস প্রথমে ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা—একটি রাজ্যের রাজা। তার এক দুষ্ট প্রকৃতির ভাই ছিল; নাম তাঁর সেট। সেট একদিন অসিরিসকে হত্যা করে চৌদ্দ টুকরা করে ফেলেন। অসিরিসের স্ত্রী ও বোন ইসিস্ এই টুকরাগুলি দেখতে পান ও প্রত্যেক টুকরার উপর একটি করে

কবর তৈরী করেন। এরপর তার ছেলে হোরাস অনেক মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে অসিরিসকে আবার বাঁচিয়ে তোলেন ও সেই থেকে অসিরিস মৃতদের রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। মিশরীয়েরা বিশ্বাস করতো যে প্রত্যেক মৃত মানুষই আবার একদিন অসিরিসের মত প্রাণ ফিরে পাবে এবং এক নতুন দেশে নতুনভাবে জীবন-যাপন করবে। তাই আত্মা যেন ভবিষ্যতে দেহের মধ্যে ঢুকতে পারে—সেজন্যে প্রয়োজন হলো মৃতদেহকে অনিবার্য পচন থেকে রক্ষা করে টাট্‌কা রাখবার এবং তারই ফলে আবিষ্কৃত হলো মমি সংরক্ষণের আশ্চর্য প্রথা। এই মমিগুলিকে জীব-জন্তুর উৎপাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তৈরী হলো শক্তিশালী কবর। এসব কবরের কয়েকটিই হলো পিরামিড—যা আজও পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বলে স্বীকৃত হয়ে আস্‌ছে।

গোড়ার দিকে এই প্রথা শুধু বিলাস হিসাবে প্রচলিত ছিল, রাজ্যের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ফ্যারাওদের মধ্যে। ফ্যরাওরা ছিলেন একাধারে শাসনকর্তা, পুরোহিত ও যাদুকর—এক কথায় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। পরে অবশ্য এই প্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে দেশের সাধারণ লোকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। হিসাব করে দেখা গেছে—খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বে ও রোমানদের অভ্যুদয়ের সময়ের মধ্যে প্রায় ৬৩০,০০০,০০০টি মৃতদেহকে মিশরে আরকের সাহায্যে মমি করা হয়েছিল।

এই মমি করা নিয়ে অনেক মজার ব্যাপারও ঘটতো। রাজ-রাজড়া বা কোন বড়লোকের মৃত্যু হলে তাঁদের স্ত্রী, ঝি-চাকর, লোক-লস্কর প্রভৃতি অনেককেই মেরে ফেলা হতো ও সবাইকে মমি করে এক কবরে রাখা হতো। তা না হলে রাজা মশায়ের যখন ঘুম ভাঙ্গবে, অর্থাৎ তাঁর আত্মা যখন আবার দেহে ফিরে আসবে তখন লোকজন, দাস-দাসী ছাড়া তাঁর চলবে কি করে? তাই ভবিষ্যতে যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্যে এই অভিনব ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, অনেক কবরে আবার ধনদৌলত ও নানা আসবাবের সঙ্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যও পাওয়া গেছে। ঘুম ভাঙ্গলেই খিদে পাবে, কাজেই তার ব্যবস্থাও আগে থাকতেই করে রাখা হতো। ভদ্রলোকদের দূরদৃষ্টি ছিল, বলতেই হবে।

এইবার মমি তৈরী করা সম্বন্ধে কিছু বলছি। মমি কথাটি যত ছোট, তৈরী করা কিন্তু তত সোজা ছিল না মোটেই। তার একটু নমুনা শুনলেই বুঝতে পারবে। প্রথমে একটা বাঁকানো লোহা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মাথার ঘিলু খোঁচা দিয়ে দিয়ে বের করে নেওয়া হতো। তারপর শরীরের বাঁ-দিকে চার ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা কেটে ভিতরকার অন্ত্র, যকৃৎ ইত্যাদি বের করে নিয়ে একরকম তেল দিয়ে বেশ করে পরিষ্কার করা হতো। তারপর কতকগুলি লতাপাতা সেই ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেহটাকে সত্তর দিন ডুবিয়ে রাখা হতো একপ্রকার আরকের মধ্যে। সত্তর দিন পর আবার নানান

সুগন্ধি তেল মাখিয়ে অনেক ঔষধ-পত্রের গুঁড়া দিয়ে দেহটাকে আগাগোড়া খুব লম্বা ব্যাণ্ডেজে বেশ করে জড়ানো হতো। একবার ভাব, কি এলাহি কাণ্ড-কারখানা! যে সব লোক এভাবে মমি তৈরী করতো, দেশে তাঁদের কদর ছিল খুব। বংশ-পরম্পরায় তাঁরা এই বৃত্তি চালিয়ে যেত।

মমি রাখবার জন্যে যে কফিন ব্যবহার করা হতো সেগুলিও ছিল সে যুগের শিল্প-কলার অপূর্ব নিদর্শন। শেষের দিকে সুন্দর সুন্দর কারুকার্যখচিত এই কফিনগুলি ঠিক মানুষের আকৃতি অনুযায়ী তৈরী করা হতো। ১৯২২ সালে অপূর্ব এক কফিন আবিষ্কৃত হয়—ফ্যারাও তুঁত-আঁখ-আমিনের কবর থেকে। ফ্যারাওদের মধ্যে প্রবল প্রতিপত্তিশালী এই তুঁত-আখ-আমিন প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশরের সর্বময় শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর কফিনটি ছিল খাঁটি সোনায় তৈরী। সেটা এত ভারী ছিল যে, আটজন শক্তিশালী পুরুষ সেটাকে তুলে ধরতে রীতিমত হিমসিম খেয়ে যেতো।

এই হলো মিশরের মমি সম্বন্ধে মোটামুটি কথা। হাজার হাজার বছর আগেকার সেই সব মনীষীদের অপূর্ব কীর্তির কথা যত জানতে পারছি—ততই শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমাদের মন ভরে উঠছে। বিশেষতঃ তাঁদের কাছে আমরা আরও কৃতজ্ঞ এইজন্যে যে, তাঁদেরই কৃপায় আজ আমরা পাঁচ হাজার বছর আগে যারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে পৃথিবীর আদি সভ্যতার গোড়া পত্তন করেছিলেন—তাঁদের চাক্ষুষ দেখে জীবন সার্থক করতে পারছি, আর তাঁদের প্রাণহীন দেহের পদপ্রান্তে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি।

শ্রীরণবীর মুখোপাধ্যায়

মানুষের জন্ম-বৃত্তান্ত

পৃথিবীর বয়স কত, সঠিক বলা কঠিন। তবে ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর এক একটি স্তরে পর পর ভিন্ন ভিন্ন জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ হইতে পৃথিবীর বয়স প্রায় ২৫০ কোটি বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাবের লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। অনুমান করা হইয়াছে যে, এখন হইতে প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে এশিয়া মহাদেশেরই কোন এক স্থানে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—অথচ পৃথিবীর বয়সের একটি নগণ্য সময় ধরিয়া মাত্র তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর শৈশব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত কি প্রকারে এককোষী

জীব কালক্রমে ধীরে ধীরে বহুকোষী জীবে, অবশেষে মনুষ্যরূপী জীবে অভিব্যক্ত হইল তাহার বিবরণ খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিনিয়াস প্রথমে স্তন্যপায়ী বাদুর, বানর, শিম্পাঞ্জী, গরিলা ইত্যাদি জীবদের মধ্যে মানুষেব স্থান কোথায় তাহা বিশ্লেষণ করেন। হেল্ নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন— প্রথম অবস্থার এককোষী জীবই হাজার হাজার বৎসরের ক্রমোন্নতির ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়। ইহা হইতে পরে মৎস্য ও ভেকের মত জীবের আবির্ভাব ঘটে। এই ক্রমোন্নতির ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে সরীসৃপ জাতীয় এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি হয়। এই স্তন্যপায়ীরা মেরুদণ্ডী জীব এবং মানুষের মতই বায়ু সেবনকারী।

স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে লাঙ্গুলহীন দীর্ঘবাহু গিবন, শিম্পাঞ্জী, ওরাং, গরিলাই প্রধান। ইহাদিগকে বিশেষ করিয়া আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, ইষ্ট-ইণ্ডিজ এবং মালয়েই বেশীব ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গিবন মানুষের মতই হস্ত ও অঙ্গুলী সঞ্চালন কবিতে পারে এবং মানুষের মতই সোজা হইয়া চলিতে সক্ষম। ইহাদের লেজ নাই। সমস্ত অবয়বই প্রায় মানুষের মত। মানুষের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য এই যে, ইহাদের মানুষের মত কথা বলিবার ও কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। গিবনেব তুলনায় ওরাং-এর দেহ অনেক বড়। ওরাং-এর দেহ এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহা গাছে বাস করিবার পক্ষে গিবন হইতে কম উপযোগী হইলেও গরিলা ও শিম্পাঞ্জী হইতে বেশী উপযোগী। গিবন অপেক্ষা শিম্পাঞ্জী শক্তিশালী বটে; কিন্তু ইহারা ওরাং ও গরিলা অপেক্ষা কম বলশালী। এই সব জীবের মধ্যে গরিলাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ইহারা অনেকটা মানুষেরই মত।

মৃত্তিকার স্তরে স্তরে যে সব জন্তু ও মানুষের দেহাবশেষ এবং বিভিন্ন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষের আবির্ভাব ঘটে। সর্বপ্রথম কোথায় মানুষের আবির্ভাব হয় তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে বিশেষজ্ঞেরা সাধারণতঃ মধ্যএশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলকেই মানব জাতির শৈশবের লীলাভূমি বলিয়া অনুমান করেন।

বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এই পাঁচটি মহাদেশ আছে। কিন্তু মানব জাতির শৈশবে মাত্র তিনটি মহাদেশ ছিল—এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। এই তিনটি মহাদেশের শুধু এশিয়াতে গিবন ও ওরাং এবং আফ্রিকাতে শিম্পাঞ্জী দেখা যায়। ইউরোপের কোন জায়গায় ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাটির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যে সব মনুষ্য-সদৃশ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের ড্রাইওপিথেকাস্, শিবপিথেকাস্, রামপিথেকাস্ ইত্যাদি নামকরণ করিয়াছেন। ইহাদের অনেক কিছুই মনুষ্য-সদৃশ। ইহাদের অনেক

কঙ্কালই এশিয়া মহাদেশে পাওয়া গিয়াছিল। ইউরোপ মহাদেশে মাত্র ড্রাইওপিথেকাস্ পাওয়া গিয়াছে। আফ্রিকাতে এদের কিছুই পাওয়া যায় নাই।

অতি প্রাচীন নরকঙ্কাল তিন মহাদেশেই পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এশিয়া মহাদেশের জাভা ও চীন দেশে যথাক্রমে পিথেক্যানথ্রোপাস্ ইরেক্টাস্ ও সিনেন-থ্রোপাস্ নামে যে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পৃথিবীতে প্রধানতঃ ককেসিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, নিগ্রো এবং পূর্ব-দ্রাবিড়িয়ান প্রভৃতি ৪টি জাতি আছে। ইউরোপে শুধু ককেসিয়ান, মঙ্গোলিয়ান এবং আফ্রিকায় শুধু নিগ্রো জাতির বাস; কিন্তু এশিয়া মহাদেশে এই চার জাতির লোকই বসবাস করিতেছে।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ বা মানুষের মত জীব হয়তো এশিয়া মহাদেশেই সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের কোন্ জায়গাটি মানুষের জন্মের পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল তাহা দেখা প্রয়োজন।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর ভৌগোলিক সংস্থান এখনকার মত ছিল না। আজ যেখানে আমরা পাহাড়পর্বত, জায়গাজমি দেখিতেছি তখন ইহার অনেক স্থানই হয়তো মহাসমুদ্র বা বিশাল মরুভূমি পরিবৃত ছিল। আবার যেখানে বর্তমানে আমরা মহাসমুদ্র দেখিতে পাই তাহার অনেক জায়গায়ই হয়তো জমি সংলগ্ন ছিল। যেমন ইউরোপ মহাদেশ আফ্রিকার সঙ্গে জিব্রাল্টার, ইটালী ও সিসিলির নিকট সংলগ্ন ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া হইতে স্থলপথে লোক অনায়াসে অষ্ট্রেলিয়ায় আসিতে পারিত। আর আমেরিকার তখন কোন অস্তিত্বই ছিল না। জলবায়ুও ছিল অতিশীতোষ্ণ।

এক সময়ে এই হিমালয় পর্বতের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেখানে হয়তো এক বিশাল জলরাশি বিদ্যমান ছিল। এই সমুদ্র গর্ভ হইতে হঠাৎ এক সময়ে এই গগনস্পর্শী হিমালয়ের আবির্ভাব হয় এবং এশিয়া মহাদেশের চেহারা বদলাইয়া দেয়। এই ভৌগোলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো জলবায়ু এবং আবহাওয়ারও বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। ইহার ফলে হিমালয় পর্বতের উত্তর দিককার আবহাওয়া উষ্ণ হইয়া উঠে এবং বৃক্ষলতাদিপূর্ণ জঙ্গলসমাকীর্ণ অঞ্চলসমূহ জঙ্গলশূন্য হইয়া যায়; এমন কি, কোন কোন জায়গা মরুভূমিতেও পরিণত হয়। আর দক্ষিণ দিককার আবহাওয়া পূর্ববৎ থাকার দরুণ জঙ্গল সমাকীর্ণই রহিয়া যায়।

হিমালয় পর্বতের উত্তর দিকে মনুষ্য-সদৃশ যে সব জীব গাছে বাস করিত, গাছপালা না থাকায় তাহারা মাটির উপর বিচরণ করিতে বাধ্য হয় এবং ক্রমে মাটির উপর বাসোপযোগী মানুষে পরিণত হয়। এই স্থানের খাদ্য, প্রকৃতি ও চতুর্দিকের আবহাওয়া মানুষের বাঁচিবার পক্ষে খুব অনুকূল হইয়াছিল। এই স্থানটিই দক্ষিণ মধ্য-এশিয়া।

ক্রমেই মানুষের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। পরে খাদ্যের প্রয়োজনে এবং অন্যান্য

কারণে ইহাদের কয়েক দল ইউরোপ, পূর্ব-এশিয়া ও আফ্রিকাতে গমন করে এবং ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়ে। মানুষ দক্ষিণ মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে যুগপৎ অন্য কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিনা, তাহার নিদর্শন আজও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দক্ষিণ মধ্য-এশিয়াই সমগ্র মানব জাতির শৈশবের লীলাভূমি।

১৯৫০ সালের ১৮ই জুলাই UNESCO পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের দিয়া এই সম্বন্ধে আধুনিকতম সিদ্ধান্তপত্র বাহির করে। তাহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া গেল।—

(১) মানুষের জাতিতে জাতিতে (Race) ভেদের মূলে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই এবং একদল লোকের বুদ্ধিমত্তা, বৈশিষ্ট্য অপরদল অপেক্ষা বেশী—ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

(২) সমস্ত জাতির মানসিক ক্ষমতা প্রায় একই।

(৩) জীবতত্ত্বের দিক হইতে জাতির সংমিশ্রণ কোন খারাপ ফলপ্রসূ নয়।

(৪) জীবতত্ত্বের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয় নাই। ইহা ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রয়োজনে কল্পিত সংহিতা মাত্র। ইহাই অনেক স্থলে মানুষের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৫) যাহারা এক ভাষাভাষী অথবা এক দেশবাসী তাহাদের সকলেই যে জাতি গঠন করিয়াছে তাহা বলা যায় না।

(৬) যে কোন জাতির লোককে সমান সুযোগ-সুবিধা দিলে অন্য যে কোন জাতির লোকের মত কাজ করিতে সমর্থ হয়—ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

(৭) সব মানুষের মধ্যেই শিখিবার ইচ্ছা ও স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী নিজকে খাপ খাওয়াইয়া চালাইয়া নেওয়ার মত গুণ বিদ্যমান।

UNESCO-র এই আধুনিকতম সিদ্ধান্ত হইতে আমরা ইহাই বুঝি—মানুষে মানুষে তেমন কোন পার্থক্য নাই এবং ইহারা এক বংশসম্ভূত। কে বলিতে পারে, অভিব্যক্তির ধারায় একদিন এই মানুষই আবার আরও এক উন্নততর জীবে পরিণত হইবে না!

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

পরমাণুর গঠন

পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল মতবাদের ঐতিহাসিক ধারা সম্বন্ধে তোমাদের কাছে আজ কিছু আলোচনা করিব। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ড্যালটনের পূর্বে বৈজ্ঞানিক মহলে ধারণা ছিল যে, প্রত্যেক পদার্থই অণুর সমবায়ে গঠিত এবং পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশই হইল অণু; ইহাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু ড্যালটন রাসায়নিক পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করিলেন যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ অণু নহে—পরমাণু। অণুকেও ভাঙ্গিতে পারা যায়। অণু পরমাণুর সমবায়ে গঠিত (Dalton's Atomic Theory)। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই যে, পরমাণুও পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নহে—নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন প্রভৃতির দ্বারা পরমাণু গঠিত।

পরমাণুর গঠন প্রায় সৌরজগতের মতই। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগুলি যেমন নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিতেছে, পরমাণুতেও ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে ইলেকট্রনগুলি গ্রহের মত বৃত্তাকারে অহরহ ঘুরিতেছে। কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রন

পৃথিবী
বুধ
শুক্র

সৌরজগৎ
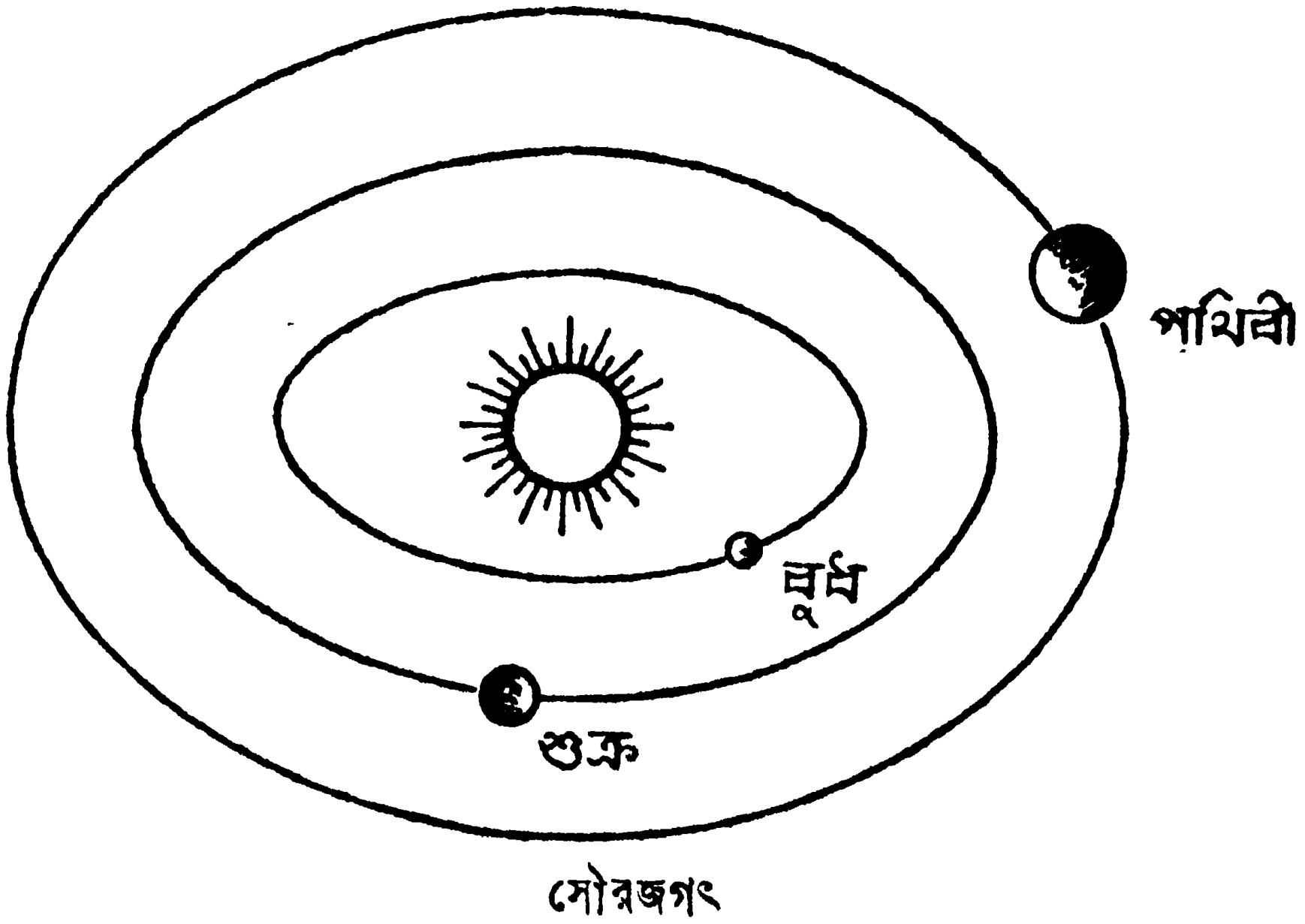
বর্তমান থাকে। প্রোটন ও নিউট্রনের ভর (mass) হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরের প্রায় সমান। হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভর প্রায় 'এক' ধরা হয়। ইহা এক গ্র্যামের ২.৬৭×১০^{-২৪} অংশ। প্রোটন ও ইলেকট্রন 'একক' তড়িৎশক্তি বহন করে; কিন্তু প্রথমটি ধনাত্মক ও দ্বিতীয়টি ঋণাত্মক। ইলেকট্রনের ভর হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরের ১/১৮৪০ ভাগ মাত্র। নিউট্রনের কোন তড়িৎশক্তি নাই। নিউট্রন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে নিউট্রন একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন লইয়া গঠিত। আবার কেহ বলেন যে, একটি প্রোটন হইতে পজিট্রন বাদ দিয়া একটি নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। পজিট্রনের ভর

ইলেকট্রনের ভরের সমান। ইহা একক ধনাত্মক তড়িৎশক্তি বহন করে। কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটন এবং ইহাদের চারিপাশে প্রোটনের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন এমনভাবে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরিয়া থাকে যে, পরমাণুর এই সমস্ত অংশ মিলিয়া পরমাণুকে তড়িৎ-শক্তিবিহীন করে।
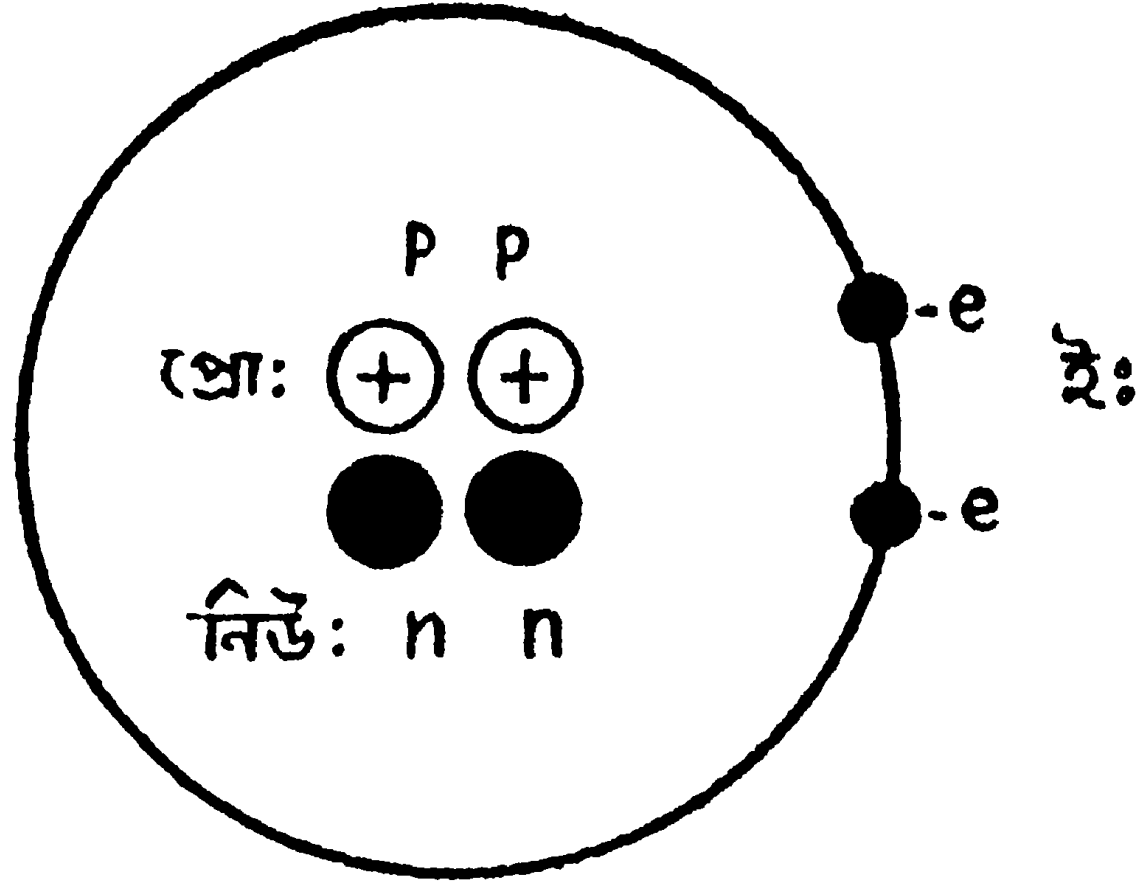
হিলিয়াম পরমাণুর গঠন

উপরের ছবি দুইটিতে সৌরজগত ও হিলিয়াম-পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন দেখান হইয়াছে। হিলিয়াম পরমাণুর ভর ৪, অর্থাৎ ইহা হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা চারগুণ ভারী। ইহার কেন্দ্রীনে দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন আছে এবং দুইটি প্রোটনের জন্য দুইটি ইলেকট্রন বাহিরের কক্ষপথে ঘুরিতেছে। প্রথম কক্ষপথে দুইটির বেশী ইলেকট্রন থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটির বেশী ইলেকট্রন অবস্থান করিতে পারে না। তৃতীয় কক্ষপথে আঠারটির বেশী ইলেকট্রনের স্থান নাই। যেমন, সোডিয়ামের পারমাণবিক ওজন ২৩; অর্থাৎ সোডিয়াম-পরমাণু হাইড্রোজেন-পরমাণুর অপেক্ষা প্রায় ২৩ গুণ ভারী। ইহার পারমাণবিক সংখ্যা ১১। পরমাণু-কেন্দ্রীনের মোট ধনাত্মক তড়িৎশক্তিকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে; অর্থাৎ ইহার কেন্দ্রীনের ধনাত্মক তড়িৎশক্তি হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের ধনাত্মক তড়িৎশক্তি অপেক্ষা ১১ গুণ বেশী। হাইড্রোজেন পরমাণুই সর্বাপেক্ষা লঘু ও ইহার গঠন-প্রকৃতিতেও কোনও প্রকার জটিলতা নাই। ইহার কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন অবস্থান করে ও উহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি ইলেকট্রন ঘুরিয়া থাকে। তাহা হইলে সোডিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রীনে ১১টি প্রোটন ও ১২টি নিউট্রন আছে। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া ১১টি ইলেকট্রন বাহিরের কক্ষপথে ঘোরে। প্রথম কক্ষে ২টি, দ্বিতীয় কক্ষে ৮টি ও তৃতীয় কক্ষে ১টি ইলেকট্রন ঘুরিতেছে।

যাহা হউক, এইসব বিষয়বস্তু বিশদভাবে বুঝিবার ও বোঝাইবার জন্য যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন, তোমরা বড় হইয়া নিশ্চয়ই সেই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবে!

শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

বিবিধ

কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ

রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার অস্থায়ী সাধারণ পরিচালক ডক্টর জন ডব্লিউ. টেলর সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর জন্য বৃটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী ডক্টর জুলিয়ান হাক্সলীকে কলিঙ্গ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

ভারতীয় শিল্পপতি শ্রী এস. পট্টনায়কের দানের টাকায় প্রতিবৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। পুরস্কারের পরিমাণ হাজার পাউণ্ড। সহজ ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। গ্রেট বৃটেনের রয়াল সোসাইটি ও ফ্রান্সের বিজ্ঞান পরিষদ ডক্টর হাক্সলীকে এই পুরস্কার দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছে। ডক্টর হাক্সলী রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার প্রথম সাধারণ পরিচালক নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

মধ্যভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বক্সাইট খনি

মধ্যভারতের অমরকণ্ঠ অঞ্চলে ভারতীয় ভূতত্ত্ব-সমীক্ষা বিভাগ কর্তৃক যে অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হয়, তাহার ফলে বিন্ধ্যপ্রদেশের শাহদল জেলার একটি অঞ্চলে এবং তৎসন্নিহিত মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার একটি এলাকায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বক্সাইট খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উভয় অঞ্চলের খনি হইতে আনুমানিক ৫ লক্ষ টন বক্সাইট পাওয়া যাইবে।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব-সমীক্ষা বিভাগের অনুমান, আবিষ্কৃত খনির দক্ষিণে ও পশ্চিমে নান্দলা ও বিলাসপুর জেলায় বক্সাইটের আরও খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

আবিষ্কৃত বক্সাইট খনি যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহা অ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে উপযোগী।

হিমালয়ের পাঞ্চুলী শৃঙ্গ-বিজয়

আলমোড়ার নিকটবর্তী হিমালয়ের যে সমস্ত শৃঙ্গ এখনও অজেয় আছে নিকোরীর নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় অভিযাত্রী দল তাহার মধ্যে পাঞ্চুলী নামক শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অভিযাত্রী দলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত ২৬ মে তাঁহারা শৃঙ্গটিতে আরোহণ করিয়াছেন।

গত ২৭শে মে তারিখে লিখিত এক পত্রে জানা গিয়াছে যে, ২২শে মে তৃতীয় শিবির স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত পত্রে আরও জানান হইয়াছিল যে, আজীবা নামক একজন কুলী শিবির স্থাপনের জন্য আরও উর্ধ্বে যাইতেছে।

১৯৫০ সালে স্কটিশ-কুমাওনী অভিযাত্রী দল পাঞ্চুলী আরোহণের চেষ্টা করেন। গত বৎসর হারের নামক জনৈক জার্মান এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি ২১ হাজার ৪ শত ফুট উর্ধ্বে উঠিয়া ফিরিয়া আসেন।

বর্তমান অভিযানে আছেন পি. এন. নিকোরী (নেতা), ভি. রামনাথন, কে. এম. রায় ও বিনোদ বিহারী লাল ভাটনগর।

বোকারো হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সার জেমস ডোনাল্ড এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয়ের জন্য কলিকাতা

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সহিত এক সাময়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে।

সার জেমস বলেন যে, ১৯৫৬ সাল হইতে বোকারো হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ২২৫ মাইল দীর্ঘ বৈদ্যুতিক তার সংযোগের সাহায্যে কলিকাতায় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হইবে।

বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র

একটি খবরে প্রকাশ যে, মাদ্রাজের জেমিনি ষ্টুডিওর সঙ্গীত পরিচালক শ্রী বি, দাশগুপ্ত একটি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। ভারতে এই প্রথম সুবৃহৎ লেন্সযুক্ত দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির খোল অ্যালুমিমিনিয়াম দ্বারা নির্মিত এবং ইস্পাতে তৈরী ফ্রেমের উপর স্থাপিত। এই যন্ত্রটি ১৩ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট। দর্শন করিবার যন্ত্রাংশের পরিবর্তন সাধন করিয়া এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সূর্য ও নক্ষত্ররাজি উভয়ই পর্যবেক্ষণ করা চলিবে। ইহার লেন্সের সাহায্যে দূরবর্তী বস্তুসমূহ ১২ হাজার গুণ বর্দ্ধিত আকারে দেখা যায়। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র মুড়িয়া রাখা যায় এবং সেরূপ অবস্থায় ইহার দৈর্ঘ্য মাত্র ১৪ ইঞ্চিতে পরিণত হয়।

এভারেষ্ট বিজয়ের বর্ণনা

বিজয়ী এভারেষ্ট অভিযানকারী দলের নেতা কর্ণেল হাণ্ট রয়টারের সংবাদদাতার নিকট অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছেন। এই সংবাদদাতা খম্বু তুষারপর্বত পর্যন্ত গিয়াছিলেন। মিঃ হাণ্ট বলেন, গত ১লা মে চার্লস ইভান্স, টম বডিলিয়ন, চার্লস উইলি মাইকেল ওয়ার্ড এবং আমি অক্সিজেন ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া লই।

৩৪ বৎসর বয়স্ক ইভান্স লিভারপুলের ডাক্তার, ২৯ বৎসর বয়স্ক বডিলিয়ান একজন রকেট গবেষণা-কারী বৈজ্ঞানিক, উইলি বৃটিশ বাহিনীর একজন মেজর এবং ২৮ বৎসর বয়স্ক ওয়ার্ড অভিযানকারী দলের চিকিৎসক।

আমি ইভান্স এবং বডিলিয়নকে প্রথম চেষ্টার জন্য এবং দ্বিতীয় দলের জন্য হিলারী ও তেনজিংকে নির্বাচন করি। যোগ্যতার দিক হইতে তেনজিং-এর জুড়ি নাই। ইহাদের প্রত্যেক দলেই সাহায্যকারী দল ছিল। প্রথম দলে আমি এবং দুইজন শেরপা ছিল, দ্বিতীয় দলের জন্য আলফ্রেড গ্রেগরী এবং তিনজন শেরপা ছিল। গ্রেগরীর বয়স ৪০ বৎসর। তিনি ব্ল্যাকপুল ট্রেভল এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কর্ণেল হাণ্টের পরই গ্রেগরী অভিযানকারী দলের মধ্যে প্রবীণ।

দক্ষিণ দিকে অগ্রবর্তী দলকে সাহায্য করাই তাহাদের কাজ ছিল। এই সাহায্যকারী দল শিবিরের জন্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র বহন করিত।

পরিকল্পনানুযায়ী সব ব্যবস্থা চলিয়াছে। আমরা পথ ঠিক করিয়া এবং দড়ি লাগাইয়া দিতাম। ২০শে তারিখ ৭ন' শিবির স্থাপন করা হয়। বিশ্রী আবহাওয়া ও বরফপাতের জন্য পাঁচ দিন বিলম্ব হইয়া যায়।

২৫শে মে শেরপাদের বড় দল দক্ষিণে সপ্তম শিবিরের জন্য যাত্রা করে। কুলিরা আর যাইতে চাহে না। একজন শেরপা লইয়া উইলফ্রেড নয়েস অগ্রসর হন। নয়েসের বয়স ৩০ বৎসর। তিনি স্কুল মাষ্টার ও লেখক।

সমগ্র দলই খাদ্য, তাঁবু, জ্বালানি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সহ দক্ষিণ ঘাটিতে অগ্রসর হয়। আবহাওয়া ভাল ছিল এবং প্রথম দল ২২শে মে ৫ম শিবিরে পৌঁছে এবং দক্ষিণ ঘাটিতে যায়। অনেকটা উঠিতে হয় বলিয়া খুবই ক্লান্তি আসে; সুতরাং ২৪ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া যায়।

দ্বিতীয় দল ৪৮ ঘণ্টা পিছনে ছিল এবং ২৬শে মে প্রথম দল উপরে চলিয়া যায় তাহারা দক্ষিণ শৃঙ্গে উঠিয়া যায়, কিন্তু অক্সিজেনের অভাব হইয়া পড়ায় এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য ফিরিয়া আসে।

শেরপা নামগিল এবং আমি বোঝা লইয়া ২৭৩৫০ ফুট পর্যন্ত উঠি এবং দ্বিতীয় সাহায্যকারী দলের জন্য ব্যবস্থা করি। প্রথম দল নামিয়া আসে এবং দ্বিতীয় দল উপরে উঠিয়া যায়। ২৭শে মে রাত্রি খুবই ভীষণ। সাউথ কলের মত ভীষণ স্থান আর নাই। দ্বিতীয় দলের পৌছিতে ২৪ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া যায়।

২৮শে মে সকালটা চমৎকার ছিল। হিলারী, তেনজিং ও সাহায্যকারী দল উঠিয়া যায়। একজন শেরপা ও নিমা ২৭,৯০০ ফুটে উঠে। এই দল অবশিষ্ট সরঞ্জাম লইয়া যায় এবং আমি যাহা ফেলিয়া আসিয়াছি তাহা সঙ্গে নেয়।

তাঁহারা প্রত্যেকে ৫০ হইতে ৬০ পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

২৯শে মে হিলারী এবং তেনজিং শীর্ষে উঠিয়া যান। সময়, অক্সিজেন ও ক্ষমতার দিক হইতে যতক্ষণ থাকা সম্ভব ততক্ষণ তাঁহারা সেখানে ছিলেন। ইহা এক বিরাট উদ্যম এবং খুবই চমকপ্রদ। একটু রদবদল করিয়া সৈন্যদের উপযোগী খাদ্যই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। চতুর্থ শিবির হইতে সাউথ কলে যাওয়ার পথে আমরা সুইস খাদ্য গ্রহণ করি। গত বৎসর সুইস অভিযানকারীরা রুটি, মধু, পনির ও জ্যাম ফেলিয়া আসিয়াছিল। একজন শেরপার আঙ্গুলের কিছু অংশ বরফে নষ্ট হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সকলে ভালই ছিল।

তুষারমানব ও অতিকায় ভল্লুক

শিলং ১৫ই জুন—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর তিব্বত সীমান্তবর্তী পার্বত্য আবর জেলার শেষ সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত এক বেসরকারী সংবাদে প্রাগৈতিহাসিক তুষারমানব ও অতিকায় ভল্লুক সম্পর্কে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ ইহাদের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রায় বারো বৎসর পূর্বে আবর পাহাড়ের সীমান্তে একটি তুষারমানব দেখা গিয়াছিল। প্রকাশ, উহা স্ত্রী জাতীয় ছিল এবং মানুষের ন্যায় হাঁটিতে পারিত। এই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটি উচ্চতায় প্রায় বারো ফুট। ইহা বংশীধ্বনির ন্যায় শব্দ করিত এবং তাহাতে পাহাড় পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত।

অতিকায় ভল্লুক সম্পর্কে উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, উহা তীব্বতীয় অঞ্চলে থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হাঁটে। প্রকাশ এই অতিকায় জন্তুটি ঘোর পিঙ্গল বর্ণের।

এই উভয় প্রকারের জন্তুই পর্বতের যে সমস্ত স্থানে প্রস্তর বেশী সেই সমস্ত স্থানে অথবা খুব উচ্চে পর্বত গহ্বরে থাকে; কিন্তু এ যাবৎ কেহই বলিতে পারেন নাই যে, এই জন্তু এখনও জীবিত আছে কি না। কারণ গত ১২ বৎসরের মধ্যে ইহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

ইতিমধ্যে টোয়াং হইতে প্রাপ্ত এক অসমথিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, হিমালয়ের পাদদেশে ভূটান সীমান্তের নিকট উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চে তুষারমানবের কতকগুলি পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাও স্ত্রী জাতীয় জন্তুর পদচিহ্ন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রকাশ, এই পদচিহ্নগুলি ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং এই জন্তুর উচ্চতা ১৪ ফুট। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি এই জন্তুর হাতে কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পূর্বে কতিপয় পর্বতারোহী হিমালয়ের পাদদেশ নেপাল সীমান্তে তুষারমানবের পদচিহ্ন সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছিলেন। পর্যবেক্ষকদের ধারণা যে, প্রকৃতই যদি কোন তুষারমানবের অস্তিত্ব থাকে তবে তাহারা টোয়াং-এ আশ্রয় লইতে পারে; কারণ নেপাল সীমান্ত দিয়া উচ্চ পর্বত-শিখরে আরোহণের

জন্য প্রায়ই পর্বতারোহীদের আগমনের ফলে তাহারা হয়ত নিরাপদ বোধ করিতেছে না। প্রকাশ, এই প্রাগৈতিহাসিক জন্তু সম্পর্কে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর শাসন দপ্তরের রিসার্চ অফিসারগণ অনুসন্ধান করিতেছেন।

চর্মশোধনে কারাড়ার ছালের ব্যবহার

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ—মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় চর্মশোধনে ওয়াটেল ছালের পরিবর্তে কারাড়ার ছালও সন্তোষজনকভাবেই ব্যবহার করা চলে।

ভারতীয় চর্মশোধন শিল্পে যে ওয়াটেল ছাল ব্যবহৃত হয় তাহা সবই বিদেশের আমদানী। পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বৎসরে ৩০,০০০ টন পরিমাণ ঐ ছাল এদেশে আসিত। বর্তমানে মোট ব্যবহৃত ঐ দ্রব্যের শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ পূর্ব আফ্রিকা হইতে আমদানী করা হয়।

কারাড়া এক ধরনের ছোট গাছ; উহা বোম্বাই ও মহীশূর ব্যতীত ভারতের সব অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজের বিভিন্ন এলাকা হইতে এই ছাল প্রতি বৎসর ১০ হইতে ১২ হাজার টন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব।

শতকরা হিসাবে ওয়াটেল ছালে ৬৪ ভাগ মিশ্র ট্যানিন এবং ৫ ভাগ খাঁটি ট্যানিনের তুলনায় কারাড়া ছালে এই দ্রব্যগুলি যথাক্রমে ৫৭ ও ৫৪ ভাগ বর্তমান। এই ছাল ব্যবহার করিয়া সম্প্রতি ঠিক একই প্রকার গুণসম্পন্ন চামড়া প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। পরীক্ষার ফল হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শিল্পকার্যে আমদানী মালের পরিবর্তে কারাড়া ছাল সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা চলিতে পারে।

প্রবহমান জল-বিজ্ঞানের শিক্ষাদান

গত ১৫ই জুন প্রাতে মহীশূরের মুখ্য মন্ত্রী শ্রী কে. হনুমন্থিয়া 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের' পাওয়ার (বিদ্যুৎ) ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভারতের বৃহত্তম হাইড্রোলিক (প্রবহমান জল সম্বন্ধীয়) ইঞ্জিনীয়ারিং ল্যাবরেটরীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। জল-চালিত যন্ত্র ও পাম্প সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা দানের নিমিত্ত এই ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

শেরপা তেনজিং-এর জর্জ পদক লাভ

গত ১৬ই জুলাই বাকিংহাম প্রাসাদের উদ্যানে রাণী এলিজাবেথ ও তাঁহার স্বামী ডিউক অব এডিনবরা তেনজিং নোরকে ও তাঁহার পত্নীকে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। অন্যান্য এভারেষ্ট বিজয়ীগণও উপস্থিত ছিলেন।

সভান্তে রাণী শেরপা তেনজিংকে জর্জ-পদকে ভূষিত করেন।

রাণী কর্ণেল হান্টকে 'নাইট' উপাধি ও এডমণ্ড হিলারীকে 'নাইট কম্যাণ্ডার অব বৃটিশ এম্পায়ার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তামাকের উৎপাদন

কোটি পাউণ্ড (রসযুক্ত পাতা)

	১৯৩৯	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩
ক্যানাডা	১০'৮	১৫'৪	১৩'৫	...
দঃ রোডেশিয়া	২৩	৮'২	৯'৭	১০৮
দঃ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র	২'৪	৫'৩	৪'১	৩'৭
নায়াসাল্যাণ্ড	১'৫	৩৬	২'০	৩৩
উঃ রোডেশিয়া	'২	১'১	১'০	১'১
ভারতবর্ষ	৭৫'৭	৫৮'৯	৫০'৪	...
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৮৮'১	২৩৩'১	২২০'৮	৩১০'০
তুরস্ক	১৪'২	১৯'৮	২০'১	...
গ্রীস	১২'৫	১৩'৮	৯'১	...

কীটঘ্ন ভেষজ পরীক্ষা সম্পর্কে পঙ্গপাল ব্যবহার

লণ্ডনের নিকটবর্তী একটি গবেষণা কেন্দ্রে

কীটঘ্ন ভেষজ পরীক্ষা সম্পর্কে "গিনিপিগ" হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে ১২,০০০'র অধিক পঙ্গপাল।

এই পঙ্গপালগুলিকে স্বতন্ত্র প্রজনন-কেন্দ্রে রাখা হইয়াছে, ইহারা আসিয়াছে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য প্রাচ্য এবং ভারত হইতে। তাপ নিয়ন্ত্রিত পিঞ্জরের মধ্যে তাহারা ভুট্টা কিংবা রাই ঘাসের পাতা খাইয়া দিন কাটাইতেছে। পূর্ণবয়স্ক পঙ্গপালগুলি বালুকাপূর্ণ নির্দিষ্ট পাত্রে ডিম পাড়িতেছে, এই ডিমগুলিকে পরে যন্ত্রসাহায্যে ফুটাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই সকল বন্দী পঙ্গপালের আবাসস্থল হইল বার্কশায়ারের ইম্পিরীয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজের জিলট্স্ হিল গবেষণা-কেন্দ্রের হুর্থর্ণডেল গবেষণাগারগুলি। এই কেন্দ্রটি গত ২৫ বৎসর ধরিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে।

এই খানেই "মেথক্সোন" ও গ্যামেকসন আবিষ্কৃত হয়—ভেষজগুলি এক্ষণে বিশ্বের সর্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। কেন্দ্রটির প্রধান কাজ হইল কৃষি এবং রাসায়নিক শিল্পের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা, কৃষকদের চাহিদা নির্ণয় এবং চাহিদা অনুযায়ী ইম্পিরীয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীর রসায়ন বিভাগের সহায়তায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

বিন্ধ্যপ্রদেশের কয়লা হইতে গন্ধক উৎপাদন

নয়া—দিল্লীর এক খবরে প্রকাশ বিহারের জিরালগোড়াস্থিত জ্বালানি গবেষণাগারের অনুসন্ধান হইতে জানা যায় যে, বিন্ধ্য প্রদেশের কয়লা হইতে পাইরাইটিক্স বাহির করিয়া ভারতের গন্ধকের প্রয়োজন অনেক পরিমাণে মিটান যাইতে পারে।

ভারতে গন্ধকের তীব্র ঘাটতির কথা বিবেচনা করিয়া গন্ধক উদ্ধারের অনেকগুলি পরিকল্পনা পরীক্ষা করা হইতেছে। যে সকল দ্রব্য হইতে গন্ধক উৎপাদিত হইতে পারে তন্মধ্যে ভারতের গন্ধকবাহী কয়লা অন্যতম। গন্ধক তিন প্রকারে কয়লার মধ্যে থাকে—পাইরাইটিক, সালফেট ও অর্গ্যানিক। এগুলির মধ্যে পাইরাইটিক গন্ধক সহজ উপায়ে বাহির করা যাইতে পারে।

জ্বালানি গবেষণাগারে বিন্ধ্যপ্রদেশের কয়লার যে গবেষণা করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, নওরোজাবাদ খনির কয়লাতে অনেক পরিমাণে (শতকরা ˙৮ হইতে ১˙৩ ভাগ) পাইরাইটিক গন্ধক আছে। পরীক্ষার ফলে আরও জানা যায় যে, কয়লা হইতে শতকরা ৮০ ভাগ পাইরাইটিক গন্ধক বাহির করা যায়। উল্লিখিত খনির ১০০ টন কয়লা হইতে প্রায় ১˙৬ টন পাইরাইট বাহির করা সম্ভব।

ভ্রমসংশোধন

গত জুন সংখ্যায় বিজ্ঞান-সংবাদ-এর ৩৫০ পৃষ্ঠায় 'প্রোফাইরিনের' স্থলে 'পরফাইরিন' বা 'পরফিরিন' হইবে।—স

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | অগাষ্ট—১৯৫৩ | অষ্টম সংখ্যা

রাসায়নিক তন্তু

শ্রীবুদ্ধদেব সেন

মানব সভ্যতার প্রথম যুগে মানবের প্রযোজনের জন্যই হয়তো বস্ত্র এবং গাত্রাবরণের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে আজ আবরণ—আবরণ ও আভরণ দুই-ই। পরিচ্ছদকে আজ প্রয়োজন ও সৌন্দর্য দুইয়েরই দাবী মিটাইতে হয়। আজ এই বস্ত্র-বয়ন শিল্পে কৃত্রিম তন্তুর বর্তমান ভূমিকা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব।

বস্ত্রের আবির্ভাবের প্রথম দিন হইতেই মানুষকে বস্ত্র বয়নযোগ্য তন্তুর জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, তা' সে রেশম, পশম, কার্পাস যাই হউক না কেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এই অবস্থার কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই।

সেলুলোজঘটিত তন্তু

সেলুলোজ এবং সেই জাতীয় পদার্থ হইতে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম কৃত্রিম তন্তু তৈয়ারী হয়। রাসায়নিক পরিভাষায় সেলুলোজ একটি শর্করা জাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট। এর রাসায়নিক ফর্মুলা $(C_6H_{10}O_5)x$। কার্পাস, কাগজ, কাঠ ইত্যাদি জাতীয় দ্রব্যগুলি সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। কতকগুলি বিশেষ ধরনের গাছ এবং বয়নের পক্ষে অনুপযুক্ত কার্পাস হইতেই সাধারণতঃ সেলুলোজঘটিত কৃত্রিম তন্তু তৈয়ারী হয়। ১৮৫৫ সালে অডমার নামক জনৈক ফরাসী নাইট্রোসেলুলোজ হইতে একপ্রকার সূতা তৈয়ার করেন। সেলুলোজের উপর নাইট্রিক্ অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্বারা নাইট্রো-সেলুলোজ তৈয়ারী হয়। সোয়ান, সারদোনে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই নাইট্রোসেলুলোজ পদ্ধতিকে আরও উন্নত করেন। ১৮৯২ সালে ক্রস এবং বিভান সেলুলোজ জেনথেট হইতে কৃত্রিম তন্তু তৈয়ার করেন। কাষ্ঠ-মণ্ড অথবা অতি নিকৃষ্ট স্তরের তুলার সহিত কষ্টিক সোডার বিক্রিয়া দ্বারা যে পদার্থটি পাওয়া যায়, তাহার উপর কার্বন ডাই-সালফাইডের ক্রিয়া দ্বারা যে দ্রব্য তৈয়ারী হয়, তাহা হইতেই সেলুলোজ জেনথেট জাতীয় তন্তু প্রস্তুত হয়। ইহার কিছু পরে ইংল্যাণ্ডের ড্রেফাস

ভ্রাতারা সেলুলোজকে অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং খনিজ অম্ল দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া তাহা হইতে একপ্রকার কৃত্রিম তন্তু তৈয়ার করেন। সেলুলোজ-ঘটিত কৃত্রিম তন্তুগুলিকে সাধারণতঃ এক কথায় রেয়ন বলা হয়। এই সকল পদ্ধতিতেই সেলুলোজ হইতে প্রাপ্ত দ্রবণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাপ প্রয়োগে বাহির করিয়া জল ও বাতাসের সংস্পর্শে সূতায় পরিণত করা হয়। সেলুলোজঘটিত কৃত্রিম তন্তুগুলিকে তাহাদের চাকচিক্য এবং কোমলতার জন্য অনেক সময় কৃত্রিম রেশমও বলা হয়; যদিও এইগুলি রেশম হইতে বহুলাংশে নিকৃষ্ট। কিন্তু কৃত্রিম রেশম সস্তা বলিয়া জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এবং অল্প আয়ের লোকের রেশম পরিবার বাসনা বহুলাংশে চরিতার্থ করে। এই সকল কারণে বিভিন্ন প্রকারের কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র, কার্পাস ও রেশমের বাজারের একটি বৃহদাংশ দখল করিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে আমেরিকায় মোট ১২·০০ কোটি পাউণ্ড কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র, ৫·০০ কোটি পাউণ্ড কার্পাস বস্ত্র এবং অতি সামান্য রেশম ও ২০ কোটি পাউণ্ডের মত পশমী বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছে।

কৃত্রিম-তন্তু

সেলুলোজঘটিত তন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ কৃত্রিম তন্তু নয়। রাসায়নিকেরা এতদিন পর্যন্ত সূতার আকারের এই প্রকারের কোন পলিমার তৈয়ার করিতে পারিতেছিলেন না। পলিমারগুলি ছোট ছোট অণু হইতে গঠিত খুব বড অণু ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জাতীয় একটি বৃহৎ অণুর ভিতর ক্ষুদ্র অণুগুলির প্যাটার্নটিই বারে বারে আবর্তিত হইতে থাকে। সেলুলোজও একটি পলিমার। পলিমার সম্পর্কিত বিষয়গুলি এখন একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। ১৯২০ সালে ক্যারোথার প্রথমে তন্তু জাতীয় শৃঙ্খলের মত অণু গবেষণাগারে তৈয়ার করেন। নাইলন-৬৬-ই ক্ষুদ্র অণু হইতে তৈয়ারী পলিমারঘটিত প্রথম সত্যিকারের কৃত্রিম তন্তু এবং এই পলিমারটির নাম হইল পলিহেক্সামেথিলিন অ্যাডিপামাইড। পলিহেক্সামেথিলিন অ্যাডিপামাইড হেক্সামেথিলিন-ডাইঅ্যামিন এবং অ্যাডিপিক অ্যাসিড নামক দুইটি ক্ষুদ্র অণু হইতে তৈয়ারী হয়। এই দুইটি পদার্থের প্রতিটি অণুতে ৬টি করিয়া কার্বন পরমাণু আছে বলিয়াই এই পলিমারটিকে সাঙ্কেতিক ভাষায় ৬৬ বলে। নীচে তিনটি যৌগিক পদার্থেরই রাসায়নিক ফর্মূলা এবং রাসায়নিক বিক্রিয়াটি দেওয়া হইল।

$$H_2N-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{}{\overset{H}{N}}-H \ +$$

Hexamethylene diamine

$$HO-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}\,OH+H\overset{H}{N}-CH_2$$

Adipic acid

$$\overset{H}{\underset{}{H-N}}-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2$$

Hexamethylene diamine.

$$-CH_2-CH_2-CH_2-\overset{H}{N}-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-\overset{H}{N}-CH_2-CH_2-CH_2-$$

Poly Hexamethylene adipamide
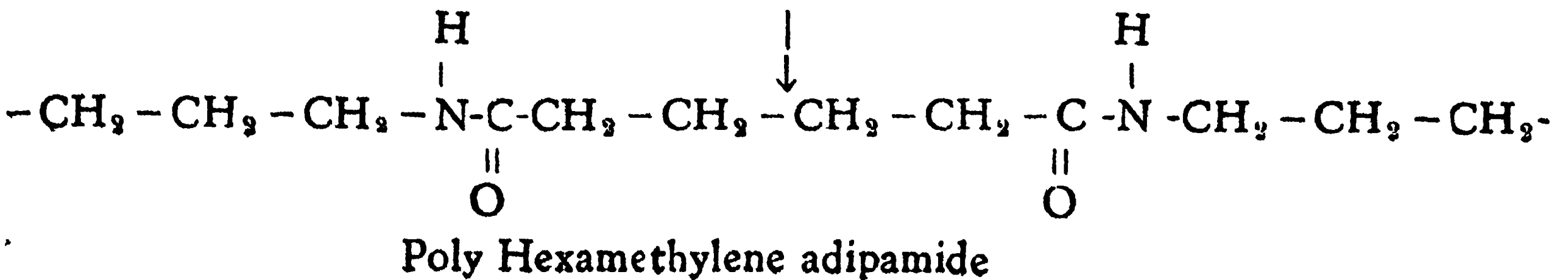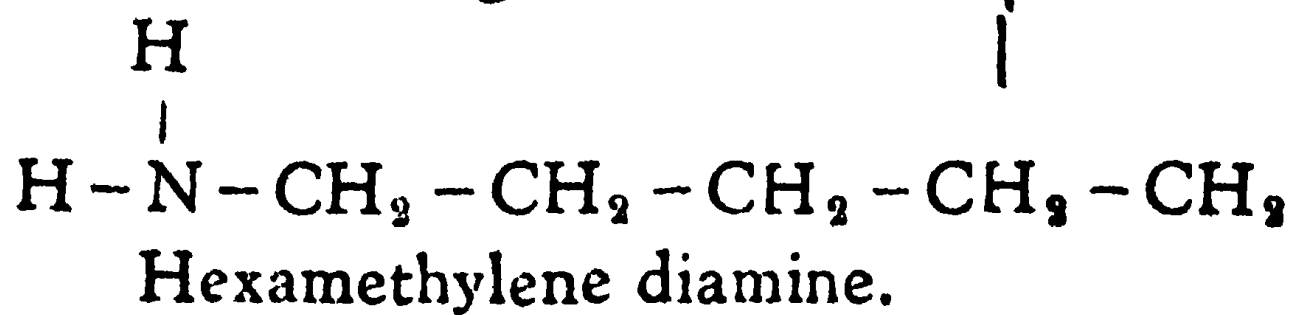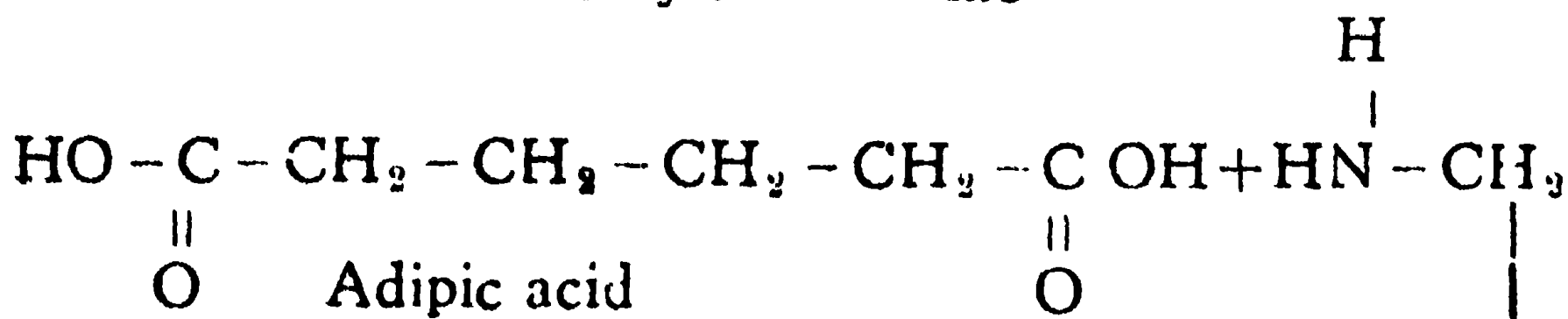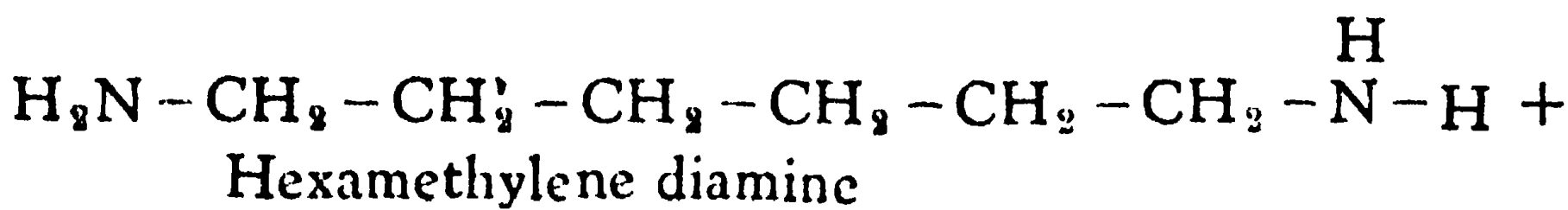
এইভাবে হেক্সামেথিলিন ডাইঅ্যামিন ও অ্যাডিপিক অ্যাসিডের অণুগুলি জুড়িয়া গিয়া পলিমার পলিহেক্সামেথিলিন অ্যাডিপামাইডের সৃষ্টি করে। এই পলিমার হইতেই নাইলন-তন্তু তৈয়ারী হয়। অবস্থার তারতম্য ঘটাইয়া এই পলিমার অণুর দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তরল পলিমারকে জলে ফেলিয়া জমাইবার পর পাতলা পাতলা পাতের আকারে কাটিয়া বিশেষভাবে নির্মিত একটি স্বতন্ত্র পাত্রে তাপের সাহায্যে গলান হয়। এই তরল পলিমারকে পাম্পের সাহায্যে চাপ প্রয়োগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহির করিবার সময় বাতাসের সংস্পর্শে সূতায় পরিণত হয়। এইভাবে প্রাপ্ত সূতায় বিভিন্ন পলিমার অণুগুলি সূতার দৈর্ঘ্যের সহিত সমান্তরাল থাকে না বলিয়া খুব শক্ত হয় না। কিন্তু ড্রইং নামে একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অতি সহজেই অণুগুলিকে সমান্তরাল করা হয়। এই ভাবে প্রাপ্ত পলিমার-তন্তু সম্পূর্ণরূপে বয়নোপযোগী হইয়া থাকে। সূতা তৈয়ার করিতে দীর্ঘাকৃতি পলিমার অণুগুলিকে সমান্তরাল করা একান্ত প্রয়োজন। কার্পাস সূতা তৈয়ারীতে সূতায় পাক দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত পদ্ধতিগুলিই সেলুলোজ পলিমার অণুগুলিকে সমান্তরাল করিবার জন্য অবলম্বিত হয়। ইহা করা হয় কার্ডিং ও ড্রইং মেসিনের সাহায্যে।

নাইলনের টান সহিবার ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা, চাকচিক্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক তন্তু হইতে অনেক বেশী। পলিহেক্সামেথিলিন অ্যাডিপামাইড অণুগুলির গঠনবৈশিষ্ট্য এবং তন্তুর ভিতর পলিমার অণুগুলির সমান্তরাল ও শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থানের ফলেই এইরূপ হইয়া থাকে। নাইলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, বাষ্প বা গরম জলের সাহায্যে নাইলনের পরিচ্ছদে চিরস্থায়ী ভাঁজ দেওয়া যায়। একবার এইরূপ ভাঁজ দিয়া দিলে তাহা পরে আর নষ্ট হয় না এবং ঐ পরিচ্ছদটিকে আর কখনও ইস্ত্রি করিবারও প্রয়োজন হয় না।

নাইলন-৬, নাইলন জাতীয় আর একটি কৃত্রিম তন্তু। ইহা ক্যাপ্রোল্যাক্টাম বা অ্যামিনো-ক্যাপ্রোয়িক অ্যাসিডকে পলিম্যারাইজ করিয়া তৈয়ারী হয়। ক্যাপ্রোল্যাক্টাম বা অ্যামিনো-ক্যাপ্রোয়িক অ্যাসিডের অণুতে ৬টি করিয়া কার্বন পরমাণু আছে বলিয়াই এই কৃত্রিম তন্তুকে নাইলন-৬ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গুণে এবং গঠনের দিক হইতে এই দুই জাতীয় নাইলনই অনেকটা এক রকমের। অ্যাক্রাইলিক জাতীয় কৃত্রিম তন্তুগুলি সাধারণতঃ পলিঅ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল জাতীয় পলিমার হইতে তৈয়ারী হয়। এই পলিমারগুলি অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল হইতে তৈয়ারী হয়। অরলোন এই জাতীয় কৃত্রিম তন্তু। এই তন্তুগুলির বিশেষত্ব এই যে, এগুলি নাইলনের মত শক্ত না হইলেও রেশমের মত কোমল এবং ইহাতে পাকা রং করা সম্ভব। নীচে পলিঅ্যাক্রাইলোনাইট্রাইলের ফর্মূলা দেওয়া হইল।

$$-CH_2-\underset{\underset{N}{\overset{|||}{\underset{|}{C}}}}{\overset{\overset{H}{|}}{C}}-CH_2-\underset{\underset{N}{\overset{|||}{\underset{|}{C}}}}{\overset{\overset{H}{|}}{C}}-CH_2-\underset{\underset{N}{\overset{|||}{\underset{|}{C}}}}{\overset{\overset{H}{|}}{C}}-CH_2-\underset{\underset{N}{\overset{|||}{\underset{|}{C}}}}{\overset{\overset{H}{|}}{C}}-CH_2-$$
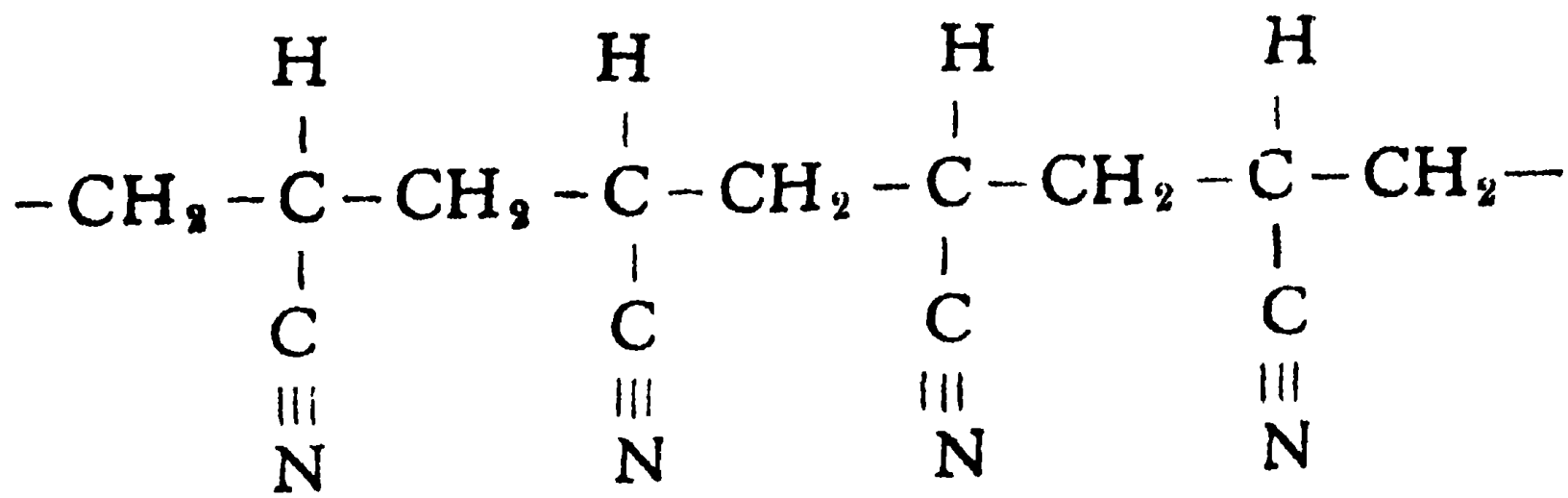
Polyacrylonitrile

নবাবিষ্কৃত ডেক্রন বা টেরীলিন কৃত্রিম তন্তুটি অণুর গঠনপ্রণালীর দিক হইতে উপর্যুক্ত তন্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এই পলিমার অণুটিতে বেনজিন রিং থাকার জন্যই এই বৈষম্য সৃষ্টি

হইয়াছে। তাছাড়া ইহাতে কোন নাইট্রোজেন পরমাণু নাই। ডেক্রনের রাসায়নিক নাম পলিএথিলিন টেরেপথ্যালেট।

এই সমস্ত কৃত্রিম তন্তুতেই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পশমের ন্যায় অনুভূতির সৃষ্টি করাও সম্ভব। কাজেই কৃত্রিম তন্তুগুলি একাধারে কার্পাস, রেশম এবং পশম সমস্ত প্রাকৃতিক তন্তুর গুণের অধিকারী হইতে পারে। অবশ্য তার জন্য যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও বয়ন-পদ্ধতির সামান্য হেরফের করিতে হয়। বিবিধ গুণের অধিকারী এই কৃত্রিম তন্তুগুলি আজ বস্ত্রশিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে আমেরিকায় ১২০০ কোটি পাউণ্ডের উপর কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্র বিক্রয় হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন হয়তো আসিবে যখন কার্পাস, রেশম এবং পশমের বস্ত্রাদি শুধু আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছদ নির্মাণের জন্যই ব্যবহৃত হইবে। পলিমার রসায়নে মৌলিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান হইতে বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে এখন প্রয়োজনানুরূপ গুণসম্পন্ন সুতা তৈয়ারী করা সম্ভব।

নিপা গাছ ও তাহার ব্যবহার

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য

যে গোলপাতায় ঘর ছাওয়া হয় সেই গোলপাতার গাছ গুল্‌গা বা গাব্‌না নামে পরিচিত। ইহার ফলের নাম গোলফল এবং পাতার নাম গোলপাতা। এই জন্য ইহা সাধারণতঃ গোলপাতার গাছ নামে পরিচিত। ইংরাজীতে ইহাকে ওয়াটার কোকোনাট বা নিপা পাম বলে। ইহার ল্যাটিন নাম নিপা ফ্রুটিক্যান্‌স্‌। ব্রহ্মদেশে এই গাছের নাম দানি, সিংহলে গিম্‌পল, আন্দামানে পুথাডা এবং ফিলিপাইনে ইহা নিপা বা সাসা নামে পরিচিত।

পাম গাছের রস-সংগ্রহকারক

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে (১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ) ওলন্দাজ পর্যটক Linschoten ভারতবর্ষে আসিয়া এই গাছের সন্ধান পান এবং এই গাছের মোচা হইতে প্রাপ্ত রস মদ প্রস্তুতের সহায়ক বলিয়া তাঁহার পুস্তকে (অ্যাকাউণ্ট অব এ ভয়েজ টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ) লিপিবদ্ধ করেন। ফিলিপাইনে এই রস

হইতে তাড়ি প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশেও এই গাছের রস হইতে তাড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফিলিপাইনে প্রস্তুত টুবা অর্থাৎ তাড়ি উক্ত পুস্তকে স্পিরিট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্যাড্রে ব্ল্যাঙ্কো তাঁহার 'ফ্লোরা ডি ফিলিপিনোজ' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—তিনি শুনিয়াছেন যে, এই স্পিরিট দিয়া রোজ সকালে চোখ ধুইলে দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকে; ইহা তামাক ও নস্য মতে এই গাছের পাতার বোঁটা দ্বারা বড়শীর ফাতনা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার কচি ফল নারিকেলের মত সুস্বাদু। পক্কফল আয়তনে প্রায় মানুষের মাথার মত হয় এবং ইহার ভিতরে দাঁতের মত সাদা একপ্রকার শক্ত ও স্বচ্ছ পদার্থ জন্মায়। বুজ-এর মতে ইহার ডিম্বাকৃতি বীজ ভেজিটেবল আইভরি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। নিপা গাছের ফল হইতে একপ্রকার

নিপা গাছ, ইহা কতকটা নারিকেল গাছের প্রথম অবস্থার অনুরূপ

সুরভিত করে। ইহার ফলের ভিতরের অংশ নারিকেলের মত খাওয়া যায়।

এই পুস্তক হইতে ইহাও জানা যায় যে, এই নিপা গাছের পাতা বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের দংশন ও ঘায়ের প্রতিষেধক। ইহার পাতার ভস্মে ধাতব লবণযুক্ত একপ্রকার পদার্থ থাকে, যাহা আমাদের বহু উপকারে আসে।

এই গাছের পাতায় চুরুট রাখিবার বাক্স প্রস্তুত হইতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলে ইহার পাতার ডাঁটার সাহায্যে বাঁধিয়া সুন্দরী কাঠ ভাসান হয়। ওয়াট্-এর বোতাম প্রস্তুত করা সম্ভব। ডাঃ আর. এল. দত্ত কিছুদিন পূর্বে সুন্দরবন অঞ্চলে এই বিষয়ে শিল্প বিভাগের পক্ষ হইতে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই গাছের পাতা দিয়া কুটিরের ছাউনি দেওয়া হয়।

এই গাছ যে কত ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তাল ও নারিকেল গাছ হইতে যেভাবে রস বাহির করা হয় ইহার মোচা হইতেও সেইরূপে রস বাহির করিয়া গুড় প্রস্তুত করা যাইতে

পারে। বরিশাল জেলায় (পূঃ পাকিস্তান) এইরূপ গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নিপা গাছ জন্মাইবার ৪।৫ বৎসর হইতেই রস পাইবার উপযুক্ত হয় এবং ইহা প্রায় ৫০ বৎসর পর্যন্ত রস দিয়া থাকে। বৎসরে ছয় মাস রস দেয় ধরিয়া প্রতি গাছ হইতে বৎসরে প্রায় এক মণ রস পাওয়া যায়। প্রতি একর (প্রায় ৩ বিঘা) জমিতে কম পক্ষে একশত এবং উর্ধে তিন শত গাছ জন্মিয়া থাকে।

খেজুর, তাল, নারিকেল ও সাগু গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া গুড় বা নিকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত করার পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে; কিন্তু এই সকল পাম গাছ এবং আখ হইতে রস সংগ্রহ অপেক্ষা নিপা গাছ হইতে রস সংগ্রহ করা বেশী লাভজনক।

মিঃ গিব্‌স বলিয়াছেন—যেহেতু শোধন খরচ ইক্ষু সম্পর্কিত ব্যয়ের তুলনায় কম এবং যেহেতু মদ প্রস্তুতের পক্ষে চিনি একটি ব্যয়বহুল কাঁচা
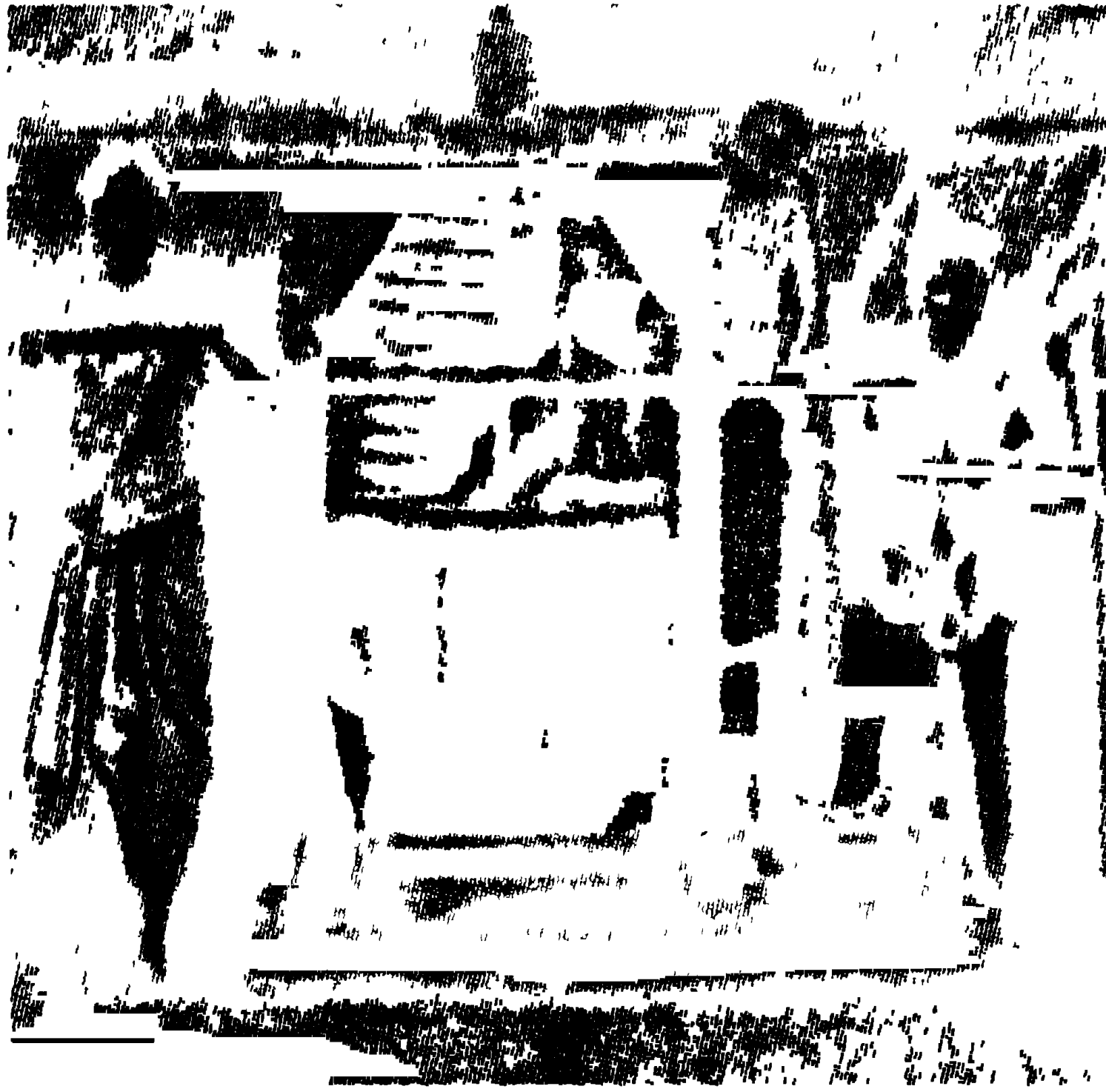
সেন্ট্রিফুগেল, ইহার সাহায্যে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত হয়

নিপা গাছ হইতে প্রাপ্ত টাট্‌কা রসে শতকরা কিরূপ উপাদান থাকে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

সুক্রোজ	১৫˙০
নাইট্রোজেন	০˙০৪৯
অ্যাস্	০˙৬০
সোডিয়াম ক্লোরাইড	০˙৪৫
ইন্‌ভার্ট সুগার	প্রায় নাই

পরীক্ষায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এই রসের বিশুদ্ধতার পরিমাপ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। ৮˙৩ মণ রস হইতে এক মণ পর্যন্ত চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

উপাদান, সেহেতু আমার বদ্ধমূল ধারণা এই যে, মদ্য কারখানা স্থাপন অপেক্ষা নিপা জমিতে চিনি শোধনাগার স্থাপন করিয়া অধিক লাভ করা যায়।

এইরূপ অন্যান্য অনেক বনজ গাছ প্রকৃতির কোলে জন্মিয়া থাকে, যাহা আমাদের অনেক উপকারে আসিতে পারে। কিন্তু তাহাদের ব্যবহারিক মূল্য না জানিবার ফলে সেগুলি আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই এই সকল প্রয়োজনীয় গাছের তথ্য আমাদের সংগ্রহ করা উচিত।

আগ্নেয়গিরি

শ্রীহৃষীকেশ রায়

দুই-তিন শত কোটি বৎসর পূর্বের কথা—অতি বেগবান বিশাল একটা নক্ষত্র তাহার ভ্রমণপথে সূর্যের নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহার আকর্ষণে এক জলন্ত বাষ্পপিণ্ড সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই পিণ্ডটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাপ বিকিরণ করিয়া সংকুচিত হয় এবং বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের সৃষ্টি করে। আরও তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ জীবের বাসোপযোগী হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগ দেখিয়া ইহার ভিতরে অবিরত যে কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে তাহা কল্পনাও করা যায় না। ভূমিকম্পের বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গের প্রকৃতি হইতে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভূ-কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর উপরিভাগ পর্যন্ত প্রায় চার হাজার মাইল গভীরতার মধ্যে উপরের চল্লিশ মাইল মাত্র ঘনীভূত হইয়া কঠিন হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ অর্ধতরল অবস্থায় আছে। অনেকের ধারণা, আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরণ হইতে আমরা তাহার অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম; কিন্তু আগ্নেয়গিরির উৎসের গভীরতা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে এত কম যে, তাহা হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ভূমিকম্পের ঢেউই আমাদিগকে প্রামাণিকভাবে সাহায্য করিয়াছে।

পাললিক শিলা-গঠিত বাংলাদেশের অধিবাসীদের পক্ষে আগ্নেয়গিরির সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সহজ নহে। যে পথে পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উত্তপ্ত গলিত লাভা নির্গত হয় তাহাকে আগ্নেয়গিরি বলে। সাধারণতঃ ইহার বাহিরাকৃতি দেখিতে কতকটা ছিন্নাগ্র শংকু বা মোচার আকৃতিবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায়; পাদদেশ হইতে যত উর্ধ্বে আরোহণ করা যায় ইহার পরিধি ততই কমিয়া আসে। আকাশে মেঘের লেশ না থাকিলেও এই পর্বতশীর্ষে উড্ডীয়মান ধ্বজার ন্যায় অন্তর্নিঃসৃত বাষ্পে সৃষ্ট শুভ্র মেঘজালও দেখা যায়। পর্বতশীর্ষে পেয়ালার আকারের গহ্বরটির নাম জ্বালামুখ, ইহার তলদেশে ম্যাগ্‌মা সঞ্চিত থাকে এবং এই স্থান হইতেই লাভা বাহিরে আসে। গলিত লাভা ও গ্যাসীয় পদার্থের সংমিশ্রণই ম্যাগ্‌মা। গ্যাসীয় পদার্থ, শিলা, লাভা প্রভৃতির বহির্গমনকে অগ্ন্যুৎপাত বলে। আগ্নেয়গিরির এই গহ্বর যেন ভূ-পৃষ্ঠের সহিত ভূগর্ভের সংযোগরক্ষাকারী পথ। জ্বালামুখনিঃসৃত গ্যাসীয় পদার্থ, গলিত শিলা, কঠিন শিলাখণ্ড প্রভৃতির স্বরূপ, বহির্গমনের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা—

বিস্ফোরক—এই প্রকার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভয়াবহ, গ্যাসীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত শিলাচূর্ণের ধূলি এবং ভস্ম আকস্মিকভাবে ভীষণ শব্দে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া দিগন্তবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘের সৃষ্টি করে। যবদ্বীপের নিকটবর্তী সুণ্ডা প্রণালীতে ক্রাকাতোয়া নামক এক ছোট দ্বীপের একটি আগ্নেয়গিরি (দ্বীপের নামানুসারে ইহার নামও ক্রাকাতোয়া) দুই শতাব্দী পর্যন্ত সুপ্ত থাকিবার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠে এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে দ্বীপটি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। গ্যাসীয় পদার্থ বহির্গত হইবার পর গভীর গর্জনে চার ঘন মাইলব্যাপী ধূলি, ভস্ম, শিলাখণ্ড ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আকারে সতেরো মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সূর্যকে আবৃত

করিয়া ফেলে। সূক্ষ্ম ধূলিকণা ত্রিশ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়া কয়েকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে; ফলে প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ধারণ করিত। এই বিস্ফোরণের শব্দ ১৭৫০ মাইল দূরবর্তী অষ্ট্রেলিয়া হইতেও শোনা গিয়াছিল। শতাধিক ফুট উচ্চ সমুদ্র-তরঙ্গ জাভা ও সুমাত্রার উপকূলবর্তী বহু গ্রাম, নগর জলপ্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং ৩৬,০০০ অধিবাসী প্রাণ হারায়।

মাইল এবং ইহার লাভা উদ্গীরণের ক্ষমতাও খুব বেশী। উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের উত্তপ্ত লাভাস্তম্ভ দর্শককে মুগ্ধ করে। মৌনালোয়াকে এইজন্য আগ্নেয়গিরির রাজা বলা হয়।

অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বিস্ফোরক ও শান্ত প্রকৃতির মাঝামাঝি। প্রারম্ভে বিস্ফোরণ সহ এই সকল আগ্নেয়গিরি হইতে প্রায়ই গ্যাসীয় পদার্থের সহিত শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরে তরল লাভাস্রোত জ্বালামুখ দিয়া নিঃসৃত হয়;
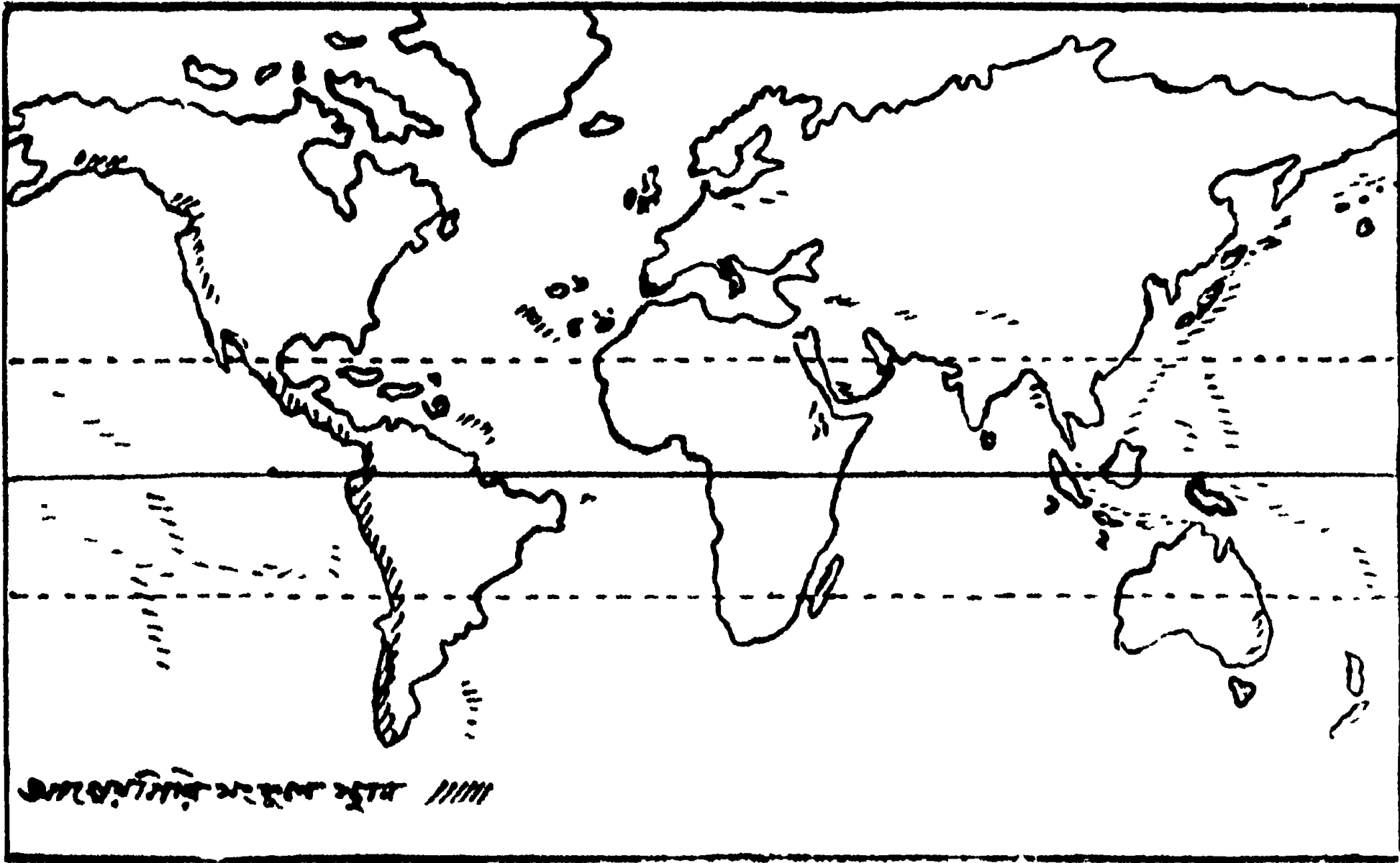
১—সুমাত্রা, ২—জাভা, ৩—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ,
৪—ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ, ৫—এলিউসন দ্বীপপুঞ্জ, ৬—অ্যাজোর্স

শান্ত—এই প্রকৃতির আগ্নেয়গিরিগুলি ক্রিয়াশীল হইলে গ্যাস বা শিলাখণ্ড সবেগে বাহির হইয়া বিস্ফোরণ ঘটায় না, তরল লাভাপ্রবাহ জ্বালামুখের বহিঃপার্শ্ব দিয়া নিম্নে অবতরণ করে। কমবেশী গ্যাসীয় পদার্থ অবিরত বহির্গত হইলেও বিস্ফোরক প্রকৃতির আগ্নেয়গিরির ন্যায় গ্যাস এক্ষেত্রে কোন বিপদের সূচনা করে না। আগ্নেয়গিরিসঙ্কুল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মৌনালোয়া (১৩,৭০০ ফুট) শান্ত প্রকৃতির। ইহার লাভাস্রোত কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চাশ মাইল পথও অতিক্রম করিয়াছে। ইহার প্রধান জ্বালামুখের পরিধি নয় অবশেষে ইহারা শান্তভাব ধারণ করে। লাভা নিঃস্রাবের শক্তি আর না থাকায় গহ্বরে লাভা সঞ্চিত হইতে থাকে এবং কিছুদিনের জন্য আগ্নেয়গিরি যেন সঞ্চয়ন কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নিষ্ক্রিয় হয়। ইতালীর অন্তর্গত নেপল্‌স্‌-এর নিকটবর্তী বিখ্যাত বিসুভিয়াস, আলাস্কা ও অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরিগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুভিয়াস ভীষণভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে এবং আগ্নেয়গিরি হইতে উৎক্ষিপ্ত জলীয় বাষ্প হইতে বারিপাতের ফলে পর্বতগাত্রে সঞ্চিত ভস্মরাশি কর্দম-স্রোতে পরিণত হইয়া তাহার

পার্শ্ববর্তী নগর পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়ামকে কয়েক সহস্র অধিবাসীসহ সমাধিস্থ করে। প্রারম্ভিক বিস্ফোরণের ফলে ইহার প্রাচীন শিখরের অংশ-বিশেষ চূর্ণ হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে ক্রমে ক্রমে লাভা জমিয়া ৪০০০ ফুট উচ্চ আধুনিক বিসুভিয়াসের জন্ম হয়। বিসুভিয়াস এখনও মৃদুভাবে সর্বদাই সক্রিয় আছে; তবে মাঝে মাঝে ইহার বিস্ফোরণ হয় এবং শেষ বিস্ফোরণ হয় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে।

আগ্নেয়গিরির লাভা ও ম্যাগ্মা* এক পদার্থ নয়। গহ্বরের গভীরতর প্রদেশে যে ম্যাগ্মা থাকে তাহাতে কঠিন শিলাগঠনের উপযোগী আকরিক পদার্থের সহিত উচ্চ চাপযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থ, বিশেষতঃ প্রচুর জলীয় বাষ্পও বর্তমান থাকে। ম্যাগ্মা ভূপৃষ্ঠে আসিলে তাহার চাপের হ্রাস হওয়ায় চাপমুক্ত গ্যাসীয় পদার্থ সশব্দে পৃথক হয় এবং আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আগ্নেয়গিরির গহ্বর হইতে ম্যাগ্মা ভূপৃষ্ঠে আসিলে সেই তরল পদার্থ ও তাহা হইতে গঠিত শিলা উভয়কেই লাভা বলে। ম্যাগ্মার বিভিন্ন উপাদানগুলি আগ্নেয়গিরির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ম্যাগ্মার উপাদানভেদে আগ্নেয়গিরির প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের হয়। স্ফটিক বা বালির অন্যতম উপাদান সিলিকা। সিলিকাপ্রধান ম্যাগ্মা ২০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপেও তরল হয় না, অসাধারণ সান্দ্র (Viscous) অবস্থায় থাকে। গহ্বর হইতে ইহা যত উর্ধ্বপথে অগ্রসর হয়, ইহার চাপ তত হ্রাস পায়। ফলে অধিকাংশ গ্যাসীয় পদার্থ মুক্ত হইয়া যায় এবং পূর্বের সেই সান্দ্র অবস্থা ক্রমে অনমনীয়ভাব ধারণ করে। সেই সময় অবশিষ্ট গ্যাসীয় পদার্থ ভয়াবহ বিস্ফোরণসহ বহির্গত হয়। মাউন্ট পিলির ন্যায় সিলিকাপ্রধান লাভা-নিঃস্রাবী আগ্নেয়গিরিগুলি এইরূপ প্রকৃতির। অপর পক্ষে, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সিলিকাযুক্ত ব্যাসাল্ট জাতীয় লাভা প্রায় ৮০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপেও তরল অবস্থায় থাকে। ফলে ইহার গ্যাসীয় পদার্থ বিনা বিস্ফোরণে সহজেই মুক্ত হইয়া যায়। সেজন্য ব্যাসাল্ট জাতীয় লাভা-নিঃস্রাবী আগ্নেয়গিরিগুলি সাধারণতঃ বিস্ফোরণ ঘটায় না, শান্তভাবেই লাভা উদ্গীরণ করে। অবশ্য যদি এইরূপ লাভা কোন আভ্যন্তরীণ কারণে গহ্বরের মধ্যেই শীতল হইতে থাকে তবে তাহা শান্ত অবস্থায় পরিণত হইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় গ্যাসীয় পদার্থ বিস্ফোরণসহ মুক্ত হয়।

আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইলে জ্বালামুখ দিয়া নানা-প্রকার গ্যাসীয় পদার্থের সহিত যে জলীয় বাষ্প প্রথম নির্গত হয়, তৎকালীন সৃষ্ট মেঘের বিশালতা ও উচ্চতা হইতে তাহার পরিমাণ কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়। এই মেঘের সহিত গ্যাসের দ্বারা উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত প্রচুর ধূলি ও ভস্ম থাকে। অগ্ন্যুদ্গীরণের সময় যে বহুবিধ গ্যাসীয় পদার্থ জ্বালামুখ দিয়া বহির্গত হয় তাহাদের স্বরূপ সঠিক নিরূপিত না হইলেও বিভিন্ন আগ্নেয়গিরিতে এবং অগ্ন্যুদ্গীরণের বিভিন্ন সময়ে তাহাদের প্রকৃতি ও পরিমাণের যথেষ্ট পার্থক্য হয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সময়ে জলীয় বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বাহিরে আসে। এটনা আগ্নেয়গিরি এক সময়ে একশত দিনে ছেচল্লিশ কোটি গ্যালন

---

* গহ্বরের অভ্যন্তর হইতে যে গলিত শিলা বাহিরে আসে তাহাতে অতিরিক্ত চাপে প্রচুর গ্যাসীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এই মিশ্রিত পদার্থ যত উর্ধ্বে আসিতে থাকে, তাহার চাপও ক্রমশঃ কমিতে থাকে। অবশেষে চাপ প্রায় সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পাইলে গলিত শিলা কঠিন হইতে আরম্ভ করে। নানারকম গ্যাসীয় পদার্থমিশ্রিত গলিত শিলাকে ম্যাগ্মা বলে। বিভিন্ন আগ্নেয়-গিরির ম্যাগ্মার উপাদান বিভিন্ন রকমের; বিসুভিয়াস ও এটনার ম্যাগ্মার উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্ন।

জল বাষ্পরূপে উদ্গীরণ করে। ৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গীরণের ফলে উৎক্ষিপ্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যে বারিপাত হয়, তাহার দ্বারা পর্বতগাত্রে সঞ্চিত ধূলিরাশি কর্দম-স্রোতে পরিণত হইয়া ধ্বংসলীলা সংঘটিত করে, এ বিষয়ে পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক ও হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস, হাইড্রোজেন প্রভৃতি উক্ত আগ্নেয়-গিরিসম্ভূত গ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। অনেকের মতে ঐ হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেনের মিলনের সময় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হইয়া থাকে। কোন কোন আগ্নেয়গিরি গন্ধক ও গন্ধকঘটিত নানা-প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন প্রভৃতি উদ্গীরণ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইলে তাহাতে প্রচুর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং অন্যান্য আরও অনেক রকমের ক্লোরাইড পাওয়া যায়। সেজন্য অনেকে অনুমান করিয়া-ছিলেন যে, সমুদ্রের জল সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ম্যাগ্মা-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আগ্নেয়গিরিকে সক্রিয় করে; কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত কিলাউয়া আগ্নেয়গিরিতে কোন ক্লোরাইড না পাওয়ায় এই অনুমান পরিত্যক্ত হয়।

জ্বালামুখের অভ্যন্তরে, পার্শ্বে ও উপরে সঞ্চিত কঠিন লাভা এবং সময়ে সময়ে জ্বালামুখের অংশ-বিশেষ অগ্ন্যুদ্গীরণের সময় খণ্ড খণ্ড হইয়া পূর্বোল্লিখিত শিলাখণ্ডে পরিণত হয়। এই সকল খণ্ড বিভিন্ন আকারের হয়। অগ্ন্যুৎপাতের সময় এই ধূলি, গাছপালা ও জীবজন্তুর যথেষ্ট ক্ষতি করিলেও সাররূপে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ।

বিস্ফোরক শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি হইতে প্রথমে গ্যাসীয় পদার্থ বাহির হইয়া পথের বাধা মুক্ত করিলে লাভার প্রবাহ আরম্ভ হয়। জ্বালামুখের অগ্রভাগ সাধারণতঃ দৃঢ় হয় না। সেজন্য বিস্ফোরণ হইলে গ্যাসীয় পদার্থ ও লাভা নির্গমনের সময় চাপে বহু ফাটল উৎপন্ন হয় এবং নিঃসৃত পদার্থ ঐ সকল পথে বাহিরে আসে। যে লাভা বহির্মুখী পথ না পাইয়া ফাটলের মধ্যে আটকাইয়া যায় তাহা বাঁধের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া যায়। লাভার রাসায়নিক উপাদান ইহার বর্ণ ও শ্রেণী নির্দেশ করে; আর ইহার ঘনত্ব নির্ণয় করে লাভা-প্রবাহের গতিবেগ ও প্রবাহপথের দৈর্ঘ্যের উপর। ঘনত্ব যত কম হইবে লাভা-প্রবাহের গতিবেগ ও দৈর্ঘ্য তত বেশী হইবে। লাভা বাহিরে আসিবার সময় এত উত্তপ্ত থাকে যে, ইহা রক্তিম বা শ্বেত বর্ণের হয়। বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে লাভা শীঘ্র তাপ বিকিরণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং কঠিন হইয়া যায়। কোন কোন সময় ম্যাগ্মা এত ঘন হয় এবং ইহাতে গ্যাসীয় পদার্থ এত কম থাকে যে, বাহিরে আসিয়া লাভা স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত না হইয়া স্তূপাকারে সজ্জিত হয়। ফ্রান্স, বোহেমিয়া, জার্মানী প্রভৃতি স্থানে এইরূপ স্তূপাকার লাভা দেখা যায়।

আগ্নেয়গিরি সাধারণতঃ তিন প্রকারের—

(১) জীবন্ত—(ক) সবিরাম—কিছুকাল অন্তর অগ্ন্যুদ্গীরণ করে; যেমন সিসিলি দ্বীপের এটনা। ইহা ২৫০০ বৎসর সক্রিয় আছে। ইহার বিরাট আকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, বর্তমান রূপ পরিগ্রহ কবিতে এটনাব তিন লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে।

(খ) অবিরাম—যেমন লিপারী দ্বীপপুঞ্জের ষ্ট্রম্বলী (উচ্চতা ৩০৩৮ ফিট)। ইহা এযাবৎ কখনও নিষ্ক্রিয় হয় নাই। দশ-পনের মিনিট অন্তর ভাস্বর লাভা উদ্গীবণ করিয়া ক্রিয়াশীল হওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ঐ দ্বীপেরই ভলকান আগ্নেয়গিরির লাভা ষ্ট্রম্বলীর ন্যায় আলোকোজ্জ্বল নয়।

(২) সুপ্ত—বিসুভিয়াসের ন্যায় যে সকল আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও ভবিষ্যতে সক্রিয় হইতে পারে।

(৩) মৃত—ভবিষ্যতে যাহাদের আর সক্রিয় হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

পৃথিবীতে এখন ৪৩০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে।

সুপ্ত ও মৃত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা কয়েক হাজার। কোন আগ্নেয়গিরি সুপ্ত কিম্বা মৃত তাহা সুনিদিষ্ট-ভাবে বলা দুঃসাধ্য। দেখা গিয়াছে—বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি সুদীর্ঘকাল এমনভাবে সুপ্ত ছিল যে, ইহার চারিদিকে নানা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিয়া ইহাকে মৃত প্রতিপন্ন করিয়াছিল। অকস্মাৎ ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে যে অগ্ন্যুদ্গীরণ আরম্ভ হয়, মাঝে মাঝে তাহার বিরতি দেখা গেলেও ইহা এখনও সক্রিয়।

স্থলের ন্যায় সমুদ্রেও, বিশেষতঃ প্রশান্ত মহাসাগরে বহু আগ্নেয়গিরি বর্তমান। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সুপ্ত অথবা মৃত। করাচীর নিকটবর্তী আরব সাগরে সেদিন একটি আগ্নেয়-গিরি আত্মপ্রকাশ করিযাছে। বস্তুতঃ জীবিত আগ্নেয়গিরিগুলির তিন-পঞ্চমাংশ প্রশান্ত মহা-সাগরেই অবস্থিত। সমুদ্রগর্ভে বা হ্রদতলে যে সকল আগ্নেয়গিরি আছে তাহারা এত লাভা উদ্গীরণ করে যে, তাহাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক দ্বীপ এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রে জলীয়বাষ্প এবং ভস্ম নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে বুঝা যায় যে, সমুদ্রগর্ভে কোন আগ্নেয়গিরি সক্রিয় হইযাছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এইরূপে ভূমধ্যসাগরে গ্র্যাহাম দ্বীপের উৎপত্তি হয়; কিন্তু লঘু অঙ্গার-ভস্মে সৃষ্ট এই দ্বীপটি তরঙ্গাঘাতে শীঘ্র ক্ষয় পাইয়া চড়ায় পরিণত হয়। অ্যালুসিয়ান দ্বীপমালায় একশত বৎসরে এইরূপ তিনটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রে প্রবালদ্বীপের সৃষ্টির রহস্যও জলমগ্ন আগ্নেয়গিরিসম্ভূত পর্বতের সহিত সংশ্লিষ্ট। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সমুদ্রগর্ভের বা স্থলভাগের আগ্নেয়গিরির লাভার উপাদানে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই।

আগ্নেয়গিরিগুলি সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে মালার ন্যায় সজ্জিত থাকে। প্রকম্পন কটি-বন্ধের (Earthquake Belts) ন্যায় আগ্নেয়গিরি-শ্রেণী আমেরিকার সমগ্র পশ্চিম উপকূল, অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও এশিয়ার পূর্ব উপকূল ব্যাপিয়া প্রশান্ত মহাসাগরকে একটি অগ্নিময় মালার মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও একটি আগ্নেয়গিরি-শ্রেণী আমেরিকার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্যানারী ও আজোর্স দ্বীপ, ভূমধ্যসাগর, এশিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়া সুমাত্রা ও জাভা অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাসাগরীয় অধিকাংশ দ্বীপ এই সকল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উদ্ভূত। ভারতবর্ষে বর্তমানে কোন ক্রিয়াশীল আগ্নেয়গিরি নাই, তবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বঙ্গোপসাগরের ব্যারেন আইল্যাণ্ড উল্লেখ-যোগ্য। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরিগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের ১৬,০০০ ফিট গভীর প্রদেশ হইতে উদ্ভূত।

প্রকম্পন কটিবন্ধ ও আগ্নেয়গিরিগুলির অবস্থান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই ইহা অভিন্ন। এইজন্য অনেক সময় অগ্ন্যুৎপাত হইলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা থাকে, আবার ভূমিকম্প হইলে নিকটবর্তী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পের মধ্যে যত নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সে সম্বন্ধ তত নিকট নয়; বরং আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের ফলে আভ্যন্তরীণ চাপ হ্রাস পওয়ায় ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কম হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীর অন্তর্গত মেসিনার ভূমিকম্পে নিকটবর্তী এটনা আগ্নেয়গিরির কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই।

আগ্নেয়গিরির উচ্চতা ও আকার বিভিন্ন প্রকারের। দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডর প্রদেশে আণ্ডিজ পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত কাটোপাক্সির উচ্চতা ১৯,৬০০ ফিট। ইহার জ্বালামুখ অর্ধমাইল বিস্তৃত ও ১৫০০ ফিট গভীর। আগ্নেয়গিরির মুখনিঃসৃত পদার্থ সময় সময় পাঁচ মাইল পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং বৃষ্টির জল, বাতাস ও অভিকর্ষের প্রভাবে

ক্রমে ক্রমে ভূপৃষ্ঠে আসিয়া জমে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম আইল্যাণ্ডের হেকলা (উচ্চতা ৫১০৯ ফিট), জাপানের ফুজিয়ামা (উচ্চতা ১২৩৮০ ফিট, সিসিলি দ্বীপের এটনা (উচ্চতা ১০,৭৫০ ফিট), হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনালোয়া, কিলার্ভয়া প্রভৃতি আগ্নেয়গিরিগুলি বিখ্যাত।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অতি উত্তপ্ত; সেজন্য অনেকে অনুমান করেন যে, সেই অতিরিক্ত উত্তাপে গলিত শিলা আগ্নেয়গিরির পথে ভূপৃষ্ঠে আসে। কিন্তু উপরে আসিবার জন্য লাভার যে শক্তির প্রয়োজন তাহা কিভাবে সঞ্চিত হয়? বাষ্প এই শক্তির আধার এবং সেই বাষ্প উৎপন্ন হয় পৃথিবীর শিলাস্তরের ছিদ্রপথে সমুদ্র হইতে কৈশিকার্ষণে প্রবিষ্ট জলের দ্বারা। কিন্তু সত্যই কি ইহা সম্ভব? কটোপাক্সির ন্যায় বহু অগ্নেয়গিরি সমুদ্র হইতে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত; সেক্ষেত্রে এরূপভাবে সমুদ্রজলে বাষ্প উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? আবার অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ভূত্বকের নিম্নে যে গলিত অর্ধ তরল শিলাস্তর আছে, সেই গলিত শিলাই চাপের বৈষম্য হেতু গহ্বরপথে বাহিরে আসে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন উচ্চতার কয়েকটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা একই সময়ে ক্রিয়াশীল হইলেও তাহাদের লাভার প্রকৃতি বিভিন্ন। এই সব নানা-কারণে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি রেডিয়ামধর্মী তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবস্থান হেতু স্বতঃই তাপের উদ্ভব হয় এবং আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে শিলা গলিয়া যায়। যখন কোন ভূখণ্ড কোন কারণে স্তরচ্যুতি বশতঃ বসিয়া যায়, তখন পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড হইতে ইহা পৃথক হয় বলিয়া দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ফাটল উৎপন্ন হয়। এই ফাটলের মধ্য দিয়া নিম্নগামী ভূখণ্ডের নিম্নস্থ তরল শিলারাশি উর্ধ্বে আসে। সে সময় বিরাট চাপ হইতে মুক্তি পাইয়া শিলাগঠনকালীন শিলামধ্যস্থ জল বাষ্পরূপে উর্ধ্বে উঠে এবং গলিত শিলাও তাহার সহিত লাভারূপে নির্গত হইয়া আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করে। আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শেষোক্ত মতবাদই গ্রহণীয়। জলীয়বাষ্প ব্যতীত নানাপ্রকার গ্যাসীয় ও দাহ্য পদার্থও আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত হয়।

এই প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক শক্তির নিকট একেবারে শক্তিহীন হইলেও যাহাতে পূর্ব হইতে সাবধান হইয়া ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে পারে তজ্জন্য মানুষ সর্বদাই সচেষ্ট। মনে হয় যে, চেষ্টা সফলতার পথে কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। হাওয়াই ন্যাশনাল পার্কের ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক ডক্টর ব্যালার্ড আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে গন্ধকঘটিত অঙ্গারাম্ল গ্যাসের অনুপাত নির্ণয় করিয়া তাহার অগ্ন্যুৎপাত সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ উইলার্ড এইচ. ইলার তাঁহার আবিষ্কৃত Clino-graph নামক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেও আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস নির্ণয় করিতে পারেন। তাঁহাদের এই সাফল্যে মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

বর্তমান চিকিৎসা-জগতে কসাইখানার দান

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

মাংস আমাদের প্রিয় ও প্রয়োজনীয় খাদ্য হইলেও কসাইখানার নামে আমাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। কসাইখানা শুধু যে আমাদের মাংসের চাহিদা পূরণ করে তাহাই নহে, বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে অনেক রকম ঔষধের উপাদানও এখান হইতে সরবরাহ হয়। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি প্রধান অংশ এই কসাইখানালব্ধ ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। অধুনা আবিষ্কৃত কর্টিজোন ও এ-সি-টি-এইচ চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে; ইহারাও কসাই-খানারই দান। বর্তমানে কসাইখানায় প্রধানতঃ মাংসের জন্যই পশুবধ হইয়া থাকে, আনুসঙ্গিক হিসাবেই এইসব ঔষধ আমরা লাভ করি। কিন্তু জান্তব দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে যেরূপ দ্রুত নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে মনে হয় এইসব দুষ্প্রাপ্য ঔষধের জন্যই হয়ত একদিন কসাইখানায় পশুবধ অনিবায হইয়া পড়িবে এবং তখন হয়ত এখনকার প্রধান উপকরণ মাংস আনু-সঙ্গিকের আসন লাভ করিবে। তদবস্থায় কসাই-খানা দাওয়াইখানার মর্যাদা লাভ করিবে কিনা কে জানে!

কসাইখানা হইতে ঔষধ সংগ্রহের চেষ্টা খুব বেশীদিনের ব্যাপার নহে। মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইহার আরম্ভ বলা যাইতে পারে। কসাইখানালব্ধ প্রথম ঔষধ পেপ্‌সিন, মাত্র আশী বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা খাদ্য পরিপাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শূকরের পাকস্থলীর আস্তরণ হইতে ইহা সংগৃহীত হয়। প্রথম ইহা অপরিশোধিত অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইত। পরে রাসায়নিক পরিশোধনের ফলে উহা হইতে মিউসিন নামে আর একটি ঔষধ পাওয়া যায়। উহা গ্যাস্ট্রিক আলসারের পক্ষে বিশেষ উপকারী। একভাগ বিশুদ্ধ পেপ্‌সিন তাহার ৩০০০ গুণ অ্যালবুমেন হজম করিতে পারে। ইহা হইতেই পেপ্‌সিনের হজম শক্তির প্রখরতা বুঝা যায়।

গোবৎসের পাকস্থলী হইতে রেনেট নামে একটি পদার্থ সংগৃহীত হয়। এই পদার্থ সংযোগে দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইতে পারে। রুগ্ন ব্যক্তির দধি, পুডিং ইত্যাদি পথ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্যাংক্রিয়াস্ বা ক্লোমযন্ত্র হইতে ইন্‌সুলিন পাওয়া যায়। ইহার সাহায্যে শরীরে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ গৃহীত হইতে পারে। ইহা বহুমূত্র রোগের একমাত্র ঔষধ। ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে ইহা দ্বারা বহু লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

শূকর ও ভেড়ার ক্লোম যন্ত্র হইতে প্যাংক্রিয়েটিন নামে আর একটি পদার্থ পাওয়া যায়। বৃদ্ধলোকের হজমশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার মধ্যে ট্রিপসিন, ডায়েষ্টেজ, লিপেজ প্রভৃতি এন্‌জাইম থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় মানুষের শরীরে এই সব এন্‌জাইমের অভাব ঘটায় হজম শক্তি হ্রাস পায়। প্যাংক্রিয়েটিন ব্যবহারে শরীরে চর্বির পরিমাণেরও হ্রাস ঘটে। কোলেষ্টেরোল নামে একটি স্নেহজাতীয় অম্লের দ্বারা ধমনী প্রাচীরে চর্বির স্তর সৃষ্টি হয়; ফলে উহা অনমনীয় হইয়া পড়ে। প্যাংক্রিয়েটিন ব্যবহারে ধমনী-প্রাচীরের ঐ চর্বির স্তর দূর করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

নিহত পশুর মেরুদণ্ড হইতে ক্লোলেষ্টেরোল সংগৃহীত হইয়া নানারূপ মলমে ব্যবহৃত হয়। ইহা মিশ্রিত হইলে চর্বির জলধারণের ক্ষমতা

জন্মে। পরিশ্রুত অবস্থায় ইহা যৌন সম্বন্ধীয় নানা হরমোন, নানা ভিটামিন ও অন্য ঔষধ প্রস্তুতে আনুসঙ্গিক উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃৎ ও ফুস্‌ফুস হইতে হিপারিন নামক একটি পদার্থ বাহির করা হয়। ইহা রক্তের জমাট বাঁধা নিবারণ, রাসায়নিক সমতা রক্ষায় বিশেষভাবে সাহায্য করে এবং শিরার মধ্যে রক্ত তরল রাখে অথচ ক্ষরণে বাধা দেয়। সন্ন্যাস রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। জমাট রক্তের দানার সৃষ্টির ফলে রক্ত চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়, ইহার প্রয়োগে উহা তরল হইয়া যায়। তুষারদষ্ট ব্যক্তির শরীরেও আক্রান্ত স্থানে রক্ত জমাট বাঁধিয়া নালী ঘায়ের সৃষ্টি হয় ও পচিতে আরম্ভ করে। হিপারিন প্রয়োগে উহা নিবারণ হয়।

১৯২২ সালে পানিসাস এনিমিয়ার প্রতিষেধক রূপে যকৃতের কাযকারিতা আবিষ্কৃত হয়। তদবধি উহা এই রোগনিরাময়ের ঔষধরূপে কসাইখানা হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। উপরন্তু যকৃতে ভিটামিন বি,$_{১২}$ যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং যকৃৎ হইতেই ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। শরীরে এই ভিটামিনের অভাব ঘটিলে যকৃৎ বা যকৃৎলব্ধ এই ভিটামিন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। শূকরের পাকস্থলী শুষ্ক করিয়াও এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগে প্রয়োগ হয়। ইহাও এই রোগে যকৃতের মতই কাযকরী এবং শরীরে ভিটামিন বি,$_{১২}$ গ্রহণেও ইহা সাহায্য করে। শরীরে এই ভিটামিন গ্রহণে সাহায্য করিতে শূকরের ডিউডিনাম হইতে প্রস্তুত ঔষধও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে জীবাণুর গাজন হইতেও ভিটামিন বি,$_{১২}$ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যকৃৎ হইতে প্রস্তুত অপেক্ষা এই নূতন উপায়ে প্রস্তুতে ব্যয়ের পরিমাণও অনেক কমিয়াছে।

কসাইখানা হইতে জন্তুদেহের বিভিন্ন গ্রন্থি নানারূপ ঔষধ প্রস্তুতের জন্য সংগৃহীত হয়। গো, মহিষ, শূকর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জীবের গ্রন্থিতে যে সব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, সমস্ত উচ্চতর স্তন্যপায়ী জীবের দেহে উহাদের ক্রিয়া একইরূপ। গরু, ভেড়ার থাইরয়েড গ্রন্থির নির্যাস প্রয়োগে কুকুর বা মানুষের ক্ষীণতা প্রাপ্ত থাইরয়েড গ্রন্থিকে অধিকতর সক্রিয় করিয়া তোলা যায়। মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তার অবনতি ঘটিলে এখন এই থাইরয়েড নির্যাসই ব্যবহৃত হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যেই প্যারাথাইরয়েডের অবস্থিতি। প্যারাথাইরয়েডঘটিত ঔষধে স্নায়ু-বিক্ষোভ প্রশমিত হয়। শিশুদের তড়কায়ও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। প্যারাথাইরয়েড দেহের ক্যাল-সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।

কসাইখানা হইতে ঔষধের উপাদান রূপে যে সব পদার্থ সংগৃহীত হয়, পিটুইটারী গ্রন্থিকে উহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। ক্ষুদ্রাকার এই গ্রন্থিটি মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত। ইহার মধ্যে বহু রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহাদের সবগুলির কার্যকারিতা এখনও জানা যায় নাই, নূতন নূতন তথ্য ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। বিজ্ঞানীদের মতে পিটুইটারীর অধ্যায় শেষ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

পিটুইটারী গ্রন্থি সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই দুই অংশে বিভক্ত। সম্মুখভাগের পিটুইটারী হইতে যে সব হরমোন সৃষ্টি হয় উহারা দেহের বৃদ্ধি, যৌন উত্তেজনা প্রভৃতি অনেকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পশ্চাৎভাগের পিটুইটারীলব্ধ একটি ঔষধ প্রসবকালে জরায়ু সঙ্কোচনে ব্যবহৃত হয়। অপর একটি ঔষধ অস্ত্রোপচারের পরে অন্ত্র উত্তেজিত করিতে ব্যবহৃত হয়। আর একটি ঔষধে বহুমূত্র রোগীর মূত্র নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়।

পিটুইটারী হরমোনের মধ্যে অধুনা আবিষ্কৃত এ-সি-টি-এইচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ওয়ানডার ড্রাগ বা আশ্চর্য ঔষধ নামে পরিচিত

হইয়াছে। এই ঔষধটি প্রয়োগে বহুবিধ রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইতেছে। শূকরের পিটুইটারীর সম্মুখভাগ হইতে এই ঔষধটি বাহির করা হয়। চাহিদা মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণে এই ঔষধটির উৎপাদন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। পিটুইটারী একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি। ১৩৬০টি শূকরের পিটুইটারী গ্রন্থির ওজন মাত্র এক পাউণ্ড। এই এক পাউণ্ডের মধ্যে এ-সি-টি-এইচ-এর অংশ অতি সামান্য। চার লক্ষ শূকরের পিটুইটারী হইতে মাত্র এক পাউণ্ড এ-সি-টি-এইচ উৎপাদন হইতে পারে। এখন পর্যন্ত বৎসরে মাত্র ৬০ পাউণ্ড উৎপাদন হইতেছে। সম্প্রতি একটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনে ঔষধটির শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই নূতন এ-সি-টি-এইচ-এর কার্যকারিতা পূর্বের তুলনায় আট গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সারাংশ পৃথক করিবার চেষ্টা চলিতেছে। পৃথক করা সম্ভব হইলে রাসায়নিক সংশ্লেষণে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। কর্টিজোন নামক আর একটি হরমোনের উৎপাদনেও এ-সি-টি-এইচ সাহায্য করে।

কর্টিজোন অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিতে উৎপন্ন হয়। বাত-রোগ নিরাময়ে এই কর্টিজোন বিশেষ কার্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির বহিরাবরণে ইহার সৃষ্টি হইলেও ঐ গ্রন্থি হইতে কর্টিজোন গৃহীত হয় না। ষাঁড়ের পিত্ত হইতে এই ঔষধটি পাওয়া যায়। ষাঁড়ের পিত্তে কোলিক অম্ল আছে, উহা ডিসোক্সিকোলিক অম্লে পরিবর্তিত হইলে ঐ ডিসোক্সিকোলিক অম্ল হইতেই কর্টিজোনের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভেড়ার শিশু হইতেও ডিসোক্সিকোলিক অম্ল পাওয়া যায়। কিন্তু শূকরের পিত্তে উক্ত অম্ল দুইটির কোনটিই পাওয়া যায় না।

কর্টিজোনের উৎপাদনও প্রয়োজনের তুলনায় এখন পর্যন্ত খুবই অল্প। এই জন্য ইহার মূল্যও অধিক। ইহার উৎপাদন বৃদ্ধিরও নানা চেষ্টা চলিতেছে। একই পরিমাণ পিত্ত হইতে এখন প্রায় ৫০ গুণ অধিক কর্টিজোন উৎপাদনের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটি বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর ১০ দিনের ঔষধ প্রস্তুত করিতে পূর্বে ৪০০ ষাঁড়ের পিত্ত প্রয়োজন হইত। এখন আটটি ষাঁড়ের পিত্ত হইতেই সেই পরিমাণ কর্টিজোন প্রস্তুত হইতেছে।

উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেও কর্টিজোন উৎপাদনের চেষ্টা চলিয়াছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানীরা মেক্সিকোর ইয়াম (ক্যারেজা ডি নেগ্রা) নামে একটি উদ্ভিদ হইতে কর্টিজোন উৎপাদনের আশা পোষণ করেন। ঐ উদ্ভিদ হইতে ইতিপূর্বে ষ্টেষ্টোষ্টেরন, প্রোজেষ্টেরন প্রভৃতি মানবদেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় কয়েকটি হরমোন উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি ছত্রাকের সাহায্যে প্রোজেষ্টেরনের গাঁজন হইতে কর্টিজোন উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদে প্রকাশ। উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে কর্টিজোন উৎপাদন করিবার উপায় আবিষ্কারের ফলে যথেষ্ট পরিমাণ কর্টিজোনের জন্য ষাঁড়ের পিত্ত সংগ্রহেরও প্রয়োজন থাকিবে না বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অবশ্য এই কারণে নিষ্প্রয়োজন বোধে ষাঁড়ের পিত্ত পরিত্যক্ত হইবে, মনে করিবার কারণ নাই। কারণ কর্টিজোন ব্যতীত এই পিত্ত হইতে হজম সহায়ক ও শরীরে ভিটামিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ গ্রহণে সাহায্যকারী নানা ঔষধও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কসাইখানার সহায়তায় যৌনসংশ্লিষ্ট নানাবিধ হরমোনও প্রস্তুত হয়। অবশ্য এখন এই সব অধিকাংশ হরমোন রাসায়নিক সংশ্লেষণে প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গর্ভিনীর নিরাপত্তায় কর্পাস লুটিয়াম একটি অব্যর্থ ঔষধরূপে প্রয়োগ হয়। গরু, ভেড়ার গর্ভাশয় হইতে ইহা সংগৃহীত হয়।

কোন গুরুতর দুর্ঘটনা বা অস্ত্রোপচারের পরে শারীরিক অবসাদ দূর করিবার জন্য বিফ-প্লাজমা শরীরে ইনজেক্সন করা হয়। ইহা গোমাংস

হইতে সংগৃহীত হয়। বিফ-প্লাজমা একটি প্রোটিন-বহুল খাদ্য। অ্যাটম বোমায় আহত ব্যক্তির যখন সাধারণ খাদ্য গ্রহণের শক্তি থাকে না এবং তাহার পেশীসমূহ দ্রুত ক্ষয় পাইতে থাকে, তখন বিফ-প্লাজমা প্রয়োগ করা হয়।

সম্প্রতি ষাঁড়ের অণ্ডকোষ হইতে হ্যালুরোনিডেইজ নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পদার্থ দেহের মধ্যে একদিকে যেমন ব্যাধির সংক্রমণ বিস্তারে সাহায্য করে আবার সেইরূপ ঔষধের প্রক্রিয়া বিস্তারেও সাহায্য করে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিভাবে এবং কি অবস্থায় ইহার ব্যবহারে সুফল লাভ করা যাইতে পারে, বিজ্ঞানীরা এখনও তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।

এখানে মাত্র কয়েকটি বিশেষ ঔষধের নামই দেওয়া হইল। ইহা ব্যতীত কসাইখানা হইতে আরও বহুপ্রকার ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে এবং এই সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কসাইখানা হইতে কোন নূতন ঔষধ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুরভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভেষজ পদার্থ হইতে বা রাসায়নিক সংশ্লেষণে ঐ ঔষধটি প্রস্তুতের চেষ্টা হইয়া থাকে। এইভাবে কসাইখানা হইতে আবিষ্কৃত অনেক ঔষধ এখন অন্যভাবে প্রস্তুত হইতেছে। একদিকে যেমন অনেক ঔষধ এইরূপে কসাইখানার আওতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে অপর দিকে কসাইখানা হইতে নিত্য নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া সেই স্থান পূর্ণ হইতেছে। অনেক ঔষধ আবার রাসায়নিক গঠনের জটিলতার জন্য সংশ্লেষিত উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। ইন্সুলিন, প্যারাথাইরয়েড হরমোন, পিটুইটারী হরমোন প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ অনেক কাল পূর্বে আবিষ্কৃত হইলেও সংশ্লেষিত উপায়ে ইহাদের প্রস্তুতের ব্যবস্থা রাসায়নিকদের কাছে এখনও সমস্যার বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

জান্তব দেহ একটি স্বভাবজ ঔষধের ভাণ্ডার-রূপে আত্মপ্রকাশ করায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের এখন কসাইখানার দিকে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধের সন্ধানে তাঁহারা এখন কসাইখানা মন্থন করিয়া চলিয়াছেন।

"বর্তমান সভ্যজগতের সমকক্ষ হইতে হইলে আমাদিগকেও তাহাদের মত সাধনা করিয়া শক্তি ও ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে, নতুবা ঐ বিপুল শক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষে আমরা যে অতলে ডুবিয়া যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা করিবার সময় অতীত হইয়াছে, আমাদিগকে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের ন্যায় আমাদিগকেও একনিষ্ঠ ভাবে বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতে হইবে।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

নাইট্রোজেন ও জীব-জগৎ

শ্রীশিবনারায়ণ চক্রবর্তী

আমাদের চারিদিকে আকাশ-বাতাসে, জলে-মাটিতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে বিভিন্নরূপে প্রচুর নাইট্রোজেন রহিয়াছে। বাতাসে আছে নাইট্রোজেন গ্যাস, অর্থাৎ যৌগ নাইট্রোজেন, জলে ও মাটিতে আছে নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম লবণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের প্রোটিন এবং প্রোটোপ্লাজমে আছে যৌগ নাইট্রোজেন। এই প্রোটিন ও প্রোটোপ্লাজমের নাইট্রোজেন যৌগের অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকল প্রকার প্রোটিন ও প্রোটোপ্লাজমের সংযুক্তিতেই আছে নাইট্রোজেন। গাছ তাহার শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে যে রস টানিয়া লয় তাহাতে অন্যান্য অনেক জিনিষের সঙ্গে নাইট্রেট আর অ্যামোনিয়াম লবণও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। গাছের দেহে প্রবেশ করিয়া ঐ নাইট্রেট লবণ সঙ্গে সঙ্গেই বিজারিত হইয়া অ্যামোনিয়াম লবণে পরিণত হয়। তারপর সেই অ্যামোনিয়াম লবণ এবং গাছের পাতায় উৎপন্ন শ্বেতসারের খানিকটা মিশিয়া পাতার মধ্যেই তৈয়ারী হয় অ্যামিনো অ্যাসিড, অর্থাৎ প্রোটিন ও অন্যান্য পদার্থ। প্রাণীদেহের কিন্তু এই অ্যামিনো অ্যাসিড তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা নাই; এজন্য তাহাদের নির্ভর করিতে হয় গাছ-পালার উপর। ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রোটিন ইত্যাদি তৈয়ারীর কারখানা গাছের দেহে অবস্থিত বটে, কিন্তু প্রাণী-জগতেও তাহাদের চাহিদা রহিয়াছে। প্রাণীর দেহে সাধারণতঃ থাকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট প্রভৃতি অজৈব পদার্থের একটা কাঠামো। এই কাঠামোটা সজ্জিত থাকে মাংস, রক্ত, চামড়া, চুল, নখ প্রভৃতি প্রোটিনজাতীয় পদার্থের দ্বারা। কিন্তু ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই প্রোটিন প্রাণীদেহে উৎপন্ন হয় না, ইহা আসে উদ্ভিদ হইতে। কথাটা একটু অদ্ভুত মনে হইবে—কেন না আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, প্রাণীদেহ হইতে উৎপন্ন বস্তু, অর্থাৎ ডিম, দুধ প্রভৃতি অথবা মাছ-মাংস হইতেই আমরা সাধারণতঃ প্রোটিন পাইয়া থাকি, গাছপালা বা শাকপাতা হইতে নহে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমিষাশীরা তৃণভোজী প্রাণীর দেহ হইতে মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি পাইয়া থাকে।

অতএব দেখা যায়—মাটি হইতে নাইট্রোজেন প্রথমে প্রবেশ করে উদ্ভিদের দেহে এবং পরে উদ্ভিদ হইতে যায় প্রাণীদেহে। এই মাটি আবার বিভিন্ন উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেনকে আকর্ষণ করিতে পারে। এই প্রণালীতেই বাতাসের নাইট্রোজেন মাটি ও উদ্ভিদ-জগতের মাধ্যমে প্রাণীদেহের প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়।

গাছের জীবনে নাইট্রোজেনের এই যে রহস্যময় ভূমিকা, ইহা কিন্তু একদিনে ধরা পড়ে নাই। অনেকদিনের চেষ্টা ও পরীক্ষার ফলে আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি—কোন্ কোন্ পথে এবং কিভাবে বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস মাটিতে প্রবেশ করে, কি উপায়ে গাছপালা মাটির এই নাইট্রোজেন তাহাদের দেহে টানিয়া লয় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে এই নাইট্রোজেনের শেষ পরিণতিই বা কি।

সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রকৃতি তাহার পরীক্ষাগারে মানুষের অজ্ঞাতে এই আদান-প্রদান ও ভাঙাগড়া চালাইয়া আসিতেছে; আর মানুষ সহজাত সংস্কারের বশে নিজের প্রয়োজনে ঐ

সকল প্রাকৃতিক পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকাল হইতেই জীব ও উদ্ভিদের গলিত, বিশ্লিষ্ট ও পরিত্যক্ত অংশ, যেমন—শিং, নখ, চুল, মলমূত্র প্রভৃতি জমিতে সার হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে; কিন্তু ঐ সকল বস্তুতে যে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে নাইট্রোজেন যৌগও আছে, তাহা তখন কাহারও জানা ছিল না। মাত্র সপ্তদশ শতকে জে. আর. গ্লবার এবং জন মেও জমিতে সার হিসাবে সোরা, অর্থাৎ নাইট্রোজেন যৌগ ব্যবহার করেন। অ্যামোনিয়াম সালফেটের ব্যবহার সুরু হয় তাহারও অনেক পরে

গ্লবার ও মেও'র পর গাছের নাইট্রোজেন গ্রহণপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেন বৃটিশ রাসায়নিক জোসেফ প্রিষ্টলি। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন কোন গাছকে বদ্ধ জায়গায় রাখিয়া দিলে ৩/৪ সপ্তাহের মধ্যে উহা পাত্রমধ্যস্থিত বাতাসের শতকরা ৮০।৮৫ ভাগ আত্মসাৎ করিয়া লয়; অর্থাৎ ঐ জাতীয় গাছপালা বাতাস হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে জেনেভার কৃষি-বিজ্ঞানী থিওডোর ডি' সমিওর প্রিষ্টলির উপরোক্ত পরীক্ষা ও মতবাদ মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই দুই বিপরীত মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করেন দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত কৃষি-বিশেষজ্ঞ জে. বি বসিংগল্ট। তিনি তাঁহার কৃষিক্ষেত্র ও পাত্রমধ্যস্থিত উদ্ভিদের পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে, মটর ও ক্লোভার জাতীয় কোন কোন উদ্ভিদ বাতাস হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিতে পারে, কিন্তু ধান, গম প্রভৃতি উদ্ভিদ তাহা পারে না। ইহার পরেই জাষ্টাস্ ভন লিবিগ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন যে, গাছপালা তাহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত নাইট্রোজেনই বাতাসের সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়া (নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগ) হইতে গ্রহণ করে; বাতাসের যৌগ নাইট্রোজেন উদ্ভিদের কোন প্রয়োজনেই আসে না।' লিবিগ-এর উপরোক্ত মন্তব্যের একটা কারণ ছিল। কিছুদিন পূর্বে তিনিই প্রমাণ করেন যে, গাছের প্রয়োজনীয় সমস্ত অঙ্গারই বাতাসের সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে আসে। তাই নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে তিনি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

লিবিগ ও তাঁহার পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকদের মতামতের সত্যতা নিরূপণের জন্য জে. বি. লাওয়েস্ ও জে. এইচ. গিলবার্ট নামক দুই ব্যক্তি বিগত শতাব্দীর শেষভাগে একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার অবতারণা করেন। কাচের আধারের মধ্যে পোড়া মাটিতে, জলে ধোওয়া বাতাস ও পরিস্রুত জলের সান্নিধ্যে শীম জাতীয় (লেগিউমিনাস্) এবং নন্ লেগিউমিনাস্ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার চারাগাছ লাগাইয়া তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে, সকল গাছই ঐরূপ অবস্থায় মরিয়া যায়। এই পরীক্ষা হইতে স্থূল সিদ্ধান্ত হয় যে, কোন গাছই বাতাসের মৌল নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া বাঁচিতে পারে না।

কিন্তু এই মন্তব্য শীম জাতীয় গাছপালা ছাড়া অন্য গাছপালার বেলায় সত্য হইলেও শীম জাতীয় গাছের ব্যাপারে ইহা মানিয়া লওয়া চলে না, কেন না ইতিপূর্বে বসিংগল্ট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, মটর, ক্লোভার প্রভৃতি শীম জাতীয় গাছপালা সম্পূর্ণ নাইট্রোজেন-সারহীন জমিতে শুধু যে বাড়িয়া উঠে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের দেহে ও জমিতে প্রচুর নাইট্রোজেন যৌগ সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, কিভাবে কোন্ পথে নাইট্রোজেন গাছে এবং জমিতে প্রবেশ করে। এই প্রশ্নের উত্তর কৃষিবিজ্ঞান অথবা রসায়নশাস্ত্র দিতে পারে নাই; ইহার সমাধান আসিয়াছে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রান্ত বিদ্যা হইতে।

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্যাক্টেরিয়া-বিদ্যার

বিশেষ উন্নতি হয়। তখন প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের পচন, বিকার প্রভৃতি যে সকল (আপাতঃ) স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন লক্ষিত হয় এবং যাহাতে ঐ সকল পদার্থের রাসায়নিক সংযুতি ভাঙ্গিয়া ও নষ্ট হইয়া যায় তাহাদের মূলে আছে ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়া ও প্রভাব। জৈব (উদ্ভিদ্ ও প্রাণীজ) পদার্থের এই ব্যাক্টেরিয়াঘটিত বিযোজনে অনেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ নূতন রাসায়নিক যৌগের সৃষ্টি হয়। ইহারা সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্তন হইতে পৃথক পর্যায়ভুক্ত, কারণ, কেবলমাত্র ব্যাক্টেরিয়ার সংস্পর্শেই ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল পচন ক্ষেত্র হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সোরা সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। লুই পাস্তুর ইতিপূর্বেই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, পচনক্রিয়ায় সোরা উৎপত্তির মূলে আছে ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাব।

পরবর্তী যে পরীক্ষায় সোরা উৎপত্তির (নাইট্রিফিকেসন) রহস্যের উপর আলোকপাত হয় তাহার সঙ্গে কৃষিকার্যের কোন যোগ ছিল না। জমি ও অন্যান্য কঠিন পদার্থের স্তরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া মল-মূত্রবাহী জল কিভাবে নির্দোষ ও পরিষ্কৃত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মান্‌জ্ ও স্লিসিং তাহার পরীক্ষা করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে, ঐরূপ দূষিত জল যদি খুব ধীরে ধীরে বালি ও চুনাপাথরের দীর্ঘ স্তরের ভিতর দিয়া অনেক দিন ধরিয়া প্রবাহিত হয় তবে প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে ঐ জলের অ্যামোনিয়ার কোনই পরিবর্তন হয় না; কিন্তু ২০।২২ দিন পরে ঐ জলে প্রচুর পরিমাণ সোরা (নাইট্রেট) উৎপন্ন হয় এবং আরও কিছুদিন পরে ঐ জল সম্পূর্ণরূপে অ্যামোনিয়া বিহীন ও প্রচুর সোরাবাহী হইয়া পড়ে।

জলে মিশ্রিত অ্যামোনিয়ার এই জারণ-ক্রিয়া, অর্থাৎ অক্সিজেন সংযোগে সোরায় রূপান্তর যদি সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্তন হইত তবে প্রথম হইতেই ঐ জলে পর্যাপ্ত পরিমাণে সোরা পাওয়া যাইত এবং এই জন্য এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত না। এই কারণে মান্‌জ্ ও স্লিসিং উপরোক্ত পরিবর্তনে ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাব অনুমান করেন। তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করেন যে, সামান্য পরিমাণে ক্লোরোফর্ম বাষ্প অ্যামোনিয়া হইতে এই সোরার উৎপত্তি রোধ করিতে পারে। এই ভাবে নাইট্রিফিকেসন, অর্থাৎ জৈব পদার্থ হইতে সোরার উৎপত্তি ব্যাক্টেরিয়াঘটিত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

এক বৎসর পরেই আর. ওয়ারিংটন নামক অপর এক ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডের রোথামষ্টেড কৃষি-ক্ষেত্রে মান্‌জ্ ও স্লিসিং-এর এই আবিষ্কারের প্রয়োগ করেন। প্রয়োগের ফলে দেখা গেল যে—

১। জমিতে ক্লোরোফর্ম ও কার্বন ডাইসাল-ফাইড প্রয়োগ করিলে নাট্রিফিকেসন বন্ধ হইয়া যায়।

২। অ্যামোনিয়াম লবণের দ্রাবণে সামান্য পরিমাণ চাষের জমির মাটি দিলে উহাতে সোরা উৎপন্ন হয়।

ইহার পরের পরীক্ষায় ওয়ারিংটন প্রমাণ করেন যে, দুই ধাপে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় দুই প্রকার জীবাণু দ্বারা অ্যামোনিয়া হইতে সোরার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। প্রথমে অ্যামোনিয়া হইতে জারণ-ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় নাইট্রাইট লবণ এবং পরে ঐ নাইট্রাইট লবণ অধিকতর জারিত হইয়া রূপান্তরিত হয় নাইট্রেট লবণ বা সোরায়। ওয়ারিংটন কিন্তু ঐ দুই প্রকার জীবাণুকে পৃথক করিতে পারেন নাই; উহা সম্ভব হইয়াছিল এস. উইনোগ্রেড্‌স্কি নামক অপর এক ব্যক্তির চেষ্টায়। ওয়ারিংটনের পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, জমিতে অন্য কোন প্রকারের নাইট্রোজেন থাকিলে তাহা অচিরেই সোরায় পরিণত হয়। সুতরাং জমিতে যেভাবেই নাইট্রোজেন যোগ করা হউক না কেন, উদ্ভিদের পক্ষে সোরা গ্রহণ ছাড়া

গত্যন্তর থাকে না। এই ভাবে নন্-লেগিউমিনাস গাছপালার নাইট্রোজেন গ্রহণ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু শীম জাতীয় (লেগিউমিনাস) উদ্ভিদের নাইট্রোজেন প্রাপ্তির জটিল সমস্যাটির সমাধান তখনও বাকী থাকিয়া যায়।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এইচ. হেলরিগেল এবং আর. এইচ উইলকার্থ নামে দুই ব্যক্তি স্যাণ্ড কালচারের পরীক্ষায় লক্ষ্য করেন যে, সোরার সার দিলে ওট, বার্লি প্রভৃতি নন-লেগিউমিনাস গাছপালার বিশেষ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু মটর, ক্লোভার প্রভৃতি শীম জাতীয় গাছ ও ফসলের বৃদ্ধির সঙ্গে নাইট্রেট বা সোরা সার প্রদানের কোন যোগাযোগ নাই। স্যাণ্ড কালচারের পাত্রের বালি এবং উৎপন্ন গাছ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা ইহাও লক্ষ্য করেন যে—ওট এবং বালির নাইট্রোজেনের সমষ্টি প্রদত্ত নাইট্রোজেন অপেক্ষা কম; কিন্তু মটর ও বালির নাইট্রোজেনের সমষ্টি প্রদত্ত নাইট্রোজেন অপেক্ষা অনেক বেশী।

ইহা হইতে তাঁহারা মন্তব্য করেন যে, মটর প্রভৃতি লেগিউমিনাস উদ্ভিদ বাতাস হইতে কোন (অজ্ঞাত) উপায়ে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। অন্য কি উপায়ে গাছে নাইট্রোজেন প্রবেশ করিতে পারে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা পূর্ব্বে দুইটি আবিষ্কারের যোগাযোগ সাধনের চেষ্টা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মার্সেলিন বার্থেলো প্রমাণ করেন যে, জমিতে অবস্থিত কোন কোন ক্ষুদ্র জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন আকর্ষণ ও আত্মসাৎ করিতে পারে। এই ঘটনা হইতে বার্থেলো এবং ই. উল্নি ইহাও মন্তব্য করেন যে, জমির ব্যাক্টেরিয়াসমূহই গাছের খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে। অপরক্ষেত্রে উদ্ভিদবিদেরা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করেন যে, শীম জাতীয় গাছের শিকড়ের গুটিতে ব্যাক্টেরিয়া বাসা বাঁধে। এই দুই আপাতঃ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইতে হেলরিগেল এবং উইলকার্থ মন্তব্য করেন যে, লেগিউমিনাস জাতীয় গাছের শিকড়ের ব্যাক্টেরিয়া বাতাসের নাইট্রোজেন আকর্ষণ করে এবং উৎপন্ন নাইট্রোজেনের কিয়দংশ গাছকে সরবরাহ করে। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে তাঁহাদের এই মন্তব্য পরবর্তীকালে বিশেষ সমর্থন লাভ করে, যেমন—

১। সোরাহীন ও জীবাণু-পরিস্রুত (ষ্টেরিলাইজ্ড্) বালিতে মটর গাছ বাড়িতে পারে না, অথবা তাহাদের শিকড়ে গুটি উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ঐ বালিতে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট দিলে মটর গাছ, ওট, বালি প্রভৃতির ন্যায় বাড়িতে থাকে।

২। ঐরূপ জীবাণু-পরিস্রুত বালিতে সাধারণ চাষ-জমির ধোওয়া জল দিলে মটরগাছ বাড়ে ও শিকড়ে গুটি জন্মায়।

৩। জমির ধোয়া জল অথবা সোরা না দিলেও স্বাভাবিক (আন্ষ্টেরিলাইজড্) বালিতে শীম জাতীয় গাছপালা কখনও কখনও বাড়িয়া থাকে, অবশ্য যদি কোন ভাবে জীবাণু-সংক্রমণ ঘটিয়া যায়। ইহাও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, যে জমি-ধোওয়া জলে মটর গাছ বাড়ে অন্যান্য শীম জাতীয় গাছ তাহাতে বাড়িতে না-ও পারে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জীবাণুগুলি শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন গাছের বৃদ্ধির সাহায্য করে, অর্থাৎ তাহাদের ক্রিয়া নির্ধারিত।

হেলরিগেল ও উইলকার্থের এই আবিষ্কারের ফলে গাছপালা ও নাইট্রোজেনঘটিত সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। এই নূতন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা লাওয়েস্ এবং গিলবার্টের পরীক্ষার ব্যাখ্যা করিতে পারি। নন-লেগিউমিনাস গাছের ন্যায় শীম জাতীয় গাছও বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস আত্মসাৎ করিতে পারে না—পারে তাহাদের শিকড়স্থিত ব্যাক্টেরিয়া। তাঁহাদের পরীক্ষায় অ্যামোনিয়া ও সকল প্রকার নাইট্রোজেন যৌগের সঙ্গে জৈবপদার্থও মাটি হইতে নিঃশেষে বিদূরিত হইয়া যায়। ফলে, গাছের পক্ষে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের কোন উপায়ই থাকে না। তাই পাত্রের

মধ্যস্থিত শীম জাতীয় গাছগুলি নাইট্রোজেন গ্যাসের সংস্পর্শে থাকিয়াও বাঁচিতে পারে নাই।

কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু এরূপ অবস্থা হয় না; কারণ সেখানে জমি যদি কোন কারণে সম্পূর্ণ নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়াম লবণ শূন্য হয় তথাপি বাতাসের নাইট্রোজেন ও মুক্ত জলবায়ু হইতে ব্যাক্টেরিয়ার সংস্পর্শ ও সংক্রমণ খুবই সহজে ঘটিয়া থাকে। সেখানে অন্ততঃ শীম জাতীয় গাছপালার বাঁচিবার ও বাড়িবার কোন অন্তরায়ই থাকে না।

এই সকল বিভিন্ন পথ ও প্রণালীতে বাতাস, জল ও মাটির নাইট্রোজেন উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশ করে। নাইট্রোজেন কিন্তু পথ হারাইয়া সেখানেই বসিয়া থাকে না; জীব-জগৎ হইতে তাহার মুক্তি পাইবারও বিভিন্ন উপায় আছে। জীবজন্তু ও গাছপালার পচন, বিকার, মৃত্যু প্রভৃতিতে নাইট্রোজেন যৌগসমূহ ব্যাক্টেরিয়া এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বিযুক্ত হইয়া পুনরায় নাইট্রোজেন গ্যাসরূপে বাতাসে মিশিয়া যায়। এইভাবে প্রকৃতির ভাণ্ডারে মানুষের স্থূলদৃষ্টির অন্তরালে নাইট্রোজেন যৌগের ভাঙাগড়া চলিতেছে। বিজ্ঞানে ইহাকে বলা হয় নাইট্রোজেন্ সাইক্ল্ বা নাইট্রোজেন বিবর্তন-চক্র।

কোল-গ্যাস

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

অতি সাধারণ জিনিষ কয়লা। এই পদার্থটির সহিত আমাদের পরিচয়ও খুব ঘনিষ্ঠ। তাই ইহার মধ্যে যে কিছু অলৌকিকত্ব থাকিতে পারে, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না।

সাধারণতঃ রন্ধনাদি কার্যে আমরা কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকি। কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যে আশ্চর্য কিছু যে থাকিতে পারে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। অবশ্য কিছুটা বুঝিতে পারা যায়, যখন কয়লা তেজ বিকিরণ করিয়া জ্বলিতে থাকে। কিন্তু কেবল মাত্র ঐ জ্বলন শক্তির মধ্যেই যে উহার গুণ সীমাবদ্ধ তাহা নহে। উহার আরও অনেক কিছু গুণ রহিয়াছে। সেই কথাটাই বলিব।

যে কয়লার সহিত আমরা সাধারণতঃ পরিচিত তাহাকে বলে পোড়া কয়লা। খনি হইতে সরাসরি যে কয়লা তোলা হয় তাহা কাঁচা কয়লা। কাঁচা কয়লার তাপের পরিমাণ পোড়া কয়লার তাপ অপেক্ষা কম। পোড়া কয়লার মধ্যে দৃঢ়সংলগ্ন অঙ্গারের পরিমাণ বেশী, কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ কম। কিন্তু কাঁচা কয়লার মধ্যে গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ অধিক। কাঁচা কয়লা পোড়াইলে হল্‌দে রঙের আলোক নির্গত হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হইতে থাকে। সেই জন্য গৃহস্থালীর কাজে কাঁচা কয়লার প্রচলন নাই। কাঁচা কয়লাকে পোড়াইয়া পোড়া কয়লা প্রস্তুত করা হয়। কোল-গ্যাস, আলকাতরা প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থগুলি এই কাঁচা কয়লার মধ্যে নিহিত থাকে।

বর্তমান বৈদ্যুতিক যুগে কোল-গ্যাসের প্রভাব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইলেও কিছুদিন আগে, অর্থাৎ এই শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকেও ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশী। তখন নগরীকে আলোকিত করিবার কাজে প্রয়োজন হইত কোল-গ্যাসের; রান্নার কাজে উন্নত ধরনের চুল্লীতে লাগিত কোল-গ্যাস; আবার ল্যাবরেটরীর অঙ্গও ছিল এই কোল-গ্যাস। কিন্তু আজকাল বৈদ্যুতিক

শক্তি এই কোল-গ্যাসকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা হইলেও বড় বড় নগরীতে এখনও উহার চাহিদা আছে।

কয়লাকে যদি বায়ুচলাচলহীন পাত্রের মধ্যে রাখিয়া উত্তপ্ত করা যায় তাহা হইলে এক প্রকার গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হয়। এই গ্যাসীয় পদার্থটির নাম কোল-গ্যাস। এই কোল-গ্যাসের সঙ্গে খানিকটা তরল পদার্থও মিশ্রিত থাকে।

কোল-গ্যাস মিথেন এবং অ্যাসিটিলিন গোষ্ঠীর কতকগুলি হাইড্রোকার্বন গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। আর তরল পদার্থটিতে থাকে জল, অ্যামোনিয়া, আলকাতরা প্রভৃতি পদার্থ। কোল-গ্যাসের প্রকৃতি শুধু কয়লার উপর নির্ভর করে না, যে তাপে কয়লাকে উত্তপ্ত করা হয় সেই তাপের উপরও ইহার প্রকৃতি নির্ভরশীল। অল্প তাপে উৎপন্ন গ্যাস পরিমাণে কম হয় বটে, কিন্তু গুণের দিক দিয়া হয় উৎকৃষ্টতর। অধিক তাপে গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তরল পদার্থের পরিমাণ কমে এবং গ্যাসও নিকৃষ্ট ধরনের হইয়া থাকে। কারণ গ্যাসের প্রজ্বলন ক্ষমতা কোন একটি বিশেষ হাইড্রোকার্বনের উপর নির্ভর করে না, কতকগুলি হাইড্রোকার্বন সমষ্টির উপর নির্ভরশীল। তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোকার্বনগুলি ভাঙ্গিয়া অন্য পদার্থে পরিণত হয়, সেই সঙ্গে গ্যাসের প্রজ্বলন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। আজকাল উৎকর্ষতা অপেক্ষা পরিমাণের (অর্থাৎ ১ টন কয়লা হইতে যত ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন হয়) উপর লক্ষ্য বেশী বলিয়া গ্যাসের প্রথমোক্ত গুণটি হ্রাস পাইয়াছে।

কোল-গ্যাস প্রস্তুত করিবার জন্য সব দেশ যে একই প্রণালী অনুসরণ করে, তাহা নহে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রণালী অনুসরণ করিয়া কাজ করে। তবে মোটামুটিভাবে প্রণালীটিকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে—

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোল-গ্যাস প্রস্তুত করা হয় কয়লাকে বায়ুচলাচলহীন পাত্রের মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া। রাসায়নিক ভাষায় এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় শুষ্কপাতন (destructive distillation)। যে পাত্রের সাহায্যে এই প্রক্রিয়াটি করা হয় তাহাকে দেখিতে অনেকটা D ইংরাজি অক্ষরের মত, তবে উল্টা ধরনের 'ডি' (ᗝ)। উহা অগ্নিসহ মৃত্তিকার দ্বারা প্রস্তুত। ইহার গহ্বরে কয়লাকে সমানভাবে বিছাইয়া দেওয়া হয়। এক একটি পাত্রের গহ্বরে আড়াই মণ মাল ধরে। এই রকম সাতটা কিম্বা নয়টা পাত্রকে সারি দিয়া সাজাইয়া এক সঙ্গে লোহার চুল্লীর সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। পাত্রের মুখগুলি এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যে, উহার ভিতর বাতাস প্রবেশের কোন উপায় থাকে না। এইভাবে আবদ্ধ কয়লাকে উত্তপ্ত করিতে থাকিলে উহার মধ্যস্থিত গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হইয়া আসে। এই গ্যাসের মধ্যে নানারকম পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। মিশ্র গ্যাসটিকে প্রথমে অ্যাসেন্সন নামক নল এবং পরে হাইড্রলিক মেন্-এর মধ্য দিয়া প্রেরণ করা হয়। হাইড্রলিক মেন্ হইতে গ্যাসটিকে কন্ডেন্সারের মধ্যে চালান দেওয়া হয়। কন্ডেন্সারটির কয়েক শত ফিট লম্বা নল পর পর বাঁকাইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। এইখানে গ্যাসটি ঠাণ্ডা হইবার সময় আলকাতরা, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি পৃথক হইয়া আসে এবং নিম্নে আলকাতরার কূপে সংগৃহীত হয়। কন্ডেন্সারের পর গ্যাসটিকে একটি কোক-কয়লা অথবা পাথরের নুড়ি ভর্তি স্তম্ভের ভিতর দিয়া প্রেরণ করা হয়। স্তম্ভটির নাম স্ক্রবার। এই স্তম্ভ বহিয়া একটি জলধারা নীচের দিকে নামিতে থাকে। কোল-গ্যাসের মধ্যে থাকে অ্যামোনিয়া প্রভৃতি পদার্থ। এই জলধারার সংস্পর্শে আসিয়া ঐগুলি দ্রবীভূত হয় এবং গ্যাসটিও বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এইভাবে কোল-গ্যাস অ্যামোনিয়ামুক্ত হইলেও উহার মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাইসালফাইড প্রভৃতি গন্ধক

হইতে উদ্ভূত পদার্থ থাকিয়া যায়। কোল-গ্যাসে গন্ধক-উদ্ভূত পদার্থের অস্তিত্ব অবাঞ্ছনীয়। কারণ গ্যাস পুড়িবার সময় এই সব পদার্থ পুড়িয়া সালফার ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এই সব অবাঞ্ছনীয় পদার্থ হইতে মুক্ত করিবার জন্য গ্যাসকে শোধনাগারের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। শোধনাগারগুলি ভিজা চুনে ভর্তি লোহার আধার বিশেষ। ভিজা চুন কোল-গ্যাসের মধ্য হইতে হাইড্রোজেন সালফাইড শোষণ করিয়া ক্যালসিয়াম সালফাইডে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম সালফাইডের একটি গুণ হইতেছে, উহা কার্বন ডাইসালফাইড শোষণ করিয়া লইতে পারে। সুতরাং একই সঙ্গে কোল-গ্যাস, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং কার্বন ডাইসালফাইড হইতে মুক্ত হয়। অবশ্য ইহার পরও যেটুকু হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কোল গ্যাসের মধ্যে থাকিয়া যায় তাহাকে জলসিক্ত আয়রন অক্সাইডের সাহায্যে শোষণ করিয়া লওয়া হয়।

এইভাবে গ্যাসটিকে পরিশুদ্ধ করিয়া পরিমাপক যন্ত্রের মধ্যে চালান দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটিকে বলা হয় ষ্টেসন মিটার। এইখানে উৎপন্ন গ্যাসের আয়তন, অর্থাৎ কত ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন হইল তাহা পরিমাপ করা হয়। ষ্টেসন মিটার হইতে গ্যাসটিকে গ্যাসের আধারের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা লৌহনির্মিত গোলাকার একটি প্রকাণ্ড আধার বিশেষ। কলিকাতায় ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর যে দুইটি প্রকাণ্ড গোল লৌহাধারকে দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায় উহাই হইল গ্যাসাধার। ইহা জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। ইহার মধ্যে গ্যাস প্রবেশ করিতে থাকিলে আধারটি ভাসিয়া উঠে, কারণ কোল-গ্যাস বাতাস অপেক্ষা হাল্কা; আবার গ্যাস নির্গমনের পর নামিয়া পড়ে। লোকের চাহিদা মিটাইবার জন্য অথবা সহরকে আলোকিত করিবার জন্য কোল-গ্যাস যে এই আধার হইতে সরাসরি সহরের চারিদিকে পরিবেশন করা হয় তাহা নহে। এখান হইতে উহাকে আর এক স্থানে প্রেরণ করা হয়; তাহার নাম গভর্ণর। এই গভর্ণর হইতে গ্যাসের চাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে সর্বত্র পরিবেশন করা হয়।

একবার পাতন কার্য শেষ হইতে সময় লাগে চার হইতে ছয় ঘণ্টা। পাতন শেষ হইবার পর পাত্রের মধ্যে যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে কোক কয়লা বলা হয়। এক প্রস্থ কাজ শেষ হইবার পর কোক কয়লাগুলি পাত্রের অভ্যন্তর হইতে সরাইয়া ফেলিয়া পুনরায় কয়লা বোঝাই করা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় প্রস্থ কাজ চালু করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোল-গ্যাস বলিতে কোন একটি বিশেষ গ্যাস বুঝায় না। ইহা কতকগুলি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। ইহার মধ্যে সাধারণতঃ থাকে—

হাইড্রোজেন	৪৯ ভাগ
মিথেন	৩৫ „
ইথিলিন	৪ „
কার্বন মনোক্সাইড	৪ „
কার্বন ডাইঅক্সাইড	৫ „
নাইট্রোজেন	৪ „
অক্সিজেন	০.৫ „

১ টন কয়লা পোড়াইয়া কোন্ কোন্ উপজাত পদার্থ কি পরিমাণে পাওয়া যায় তাহারই একটা মোটামুটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করে, যে তাপে কয়লা পোড়ান হয় তাহার উপর।

কোল-গ্যাস ১০,০০০ ঘনফুট বা	৩৮০ পাঃ	১৭.%
আলকাতরা	১১৫ „	৫.১%
গ্যাস লিকার	১১৭ „	৭.৯%
কোক	১৫১৮ „	৭০.০%

কোল-গ্যাস প্রস্তুত করিতে যে সব উপজাত পদার্থ পাওয়া যায়, ব্যবহারিক জগতে বা দৈনন্দিন কার্য-

ক্ষেত্রে তাহাদের উপযোগিতা বড় কম নহে। যেমন আলকাতরার কথাই ধরা যাক। কালো রঙের দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটিকে রত্নগর্ভা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলকাতরা কোন একটি যৌগিক পদার্থ নহে। ইহা নানাবিধ জৈব পদার্থের মিশ্রণ। ইহার মধ্যে আছে কার্বলিক এবং ক্রিয়োজোট জাতীয় তৈল, হাল্কা এবং মোটা ধরনের তেল, পিরিডিন, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন, পিচ, নানারকমের রং, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি। বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন, ন্যাপথা, ফিনোল, ক্রিসোল, ন্যাপথালিন, অ্যান্থ্রাসিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুতের মূলাধার হইতেছে আলকাতরা।

আলকাতরাকে তির্যকপাতনের দ্বারা এইসব পদার্থ পৃথক করা হয়। তির্যকপাতনেব শেষে তলায় যাহা পড়িয়া থাকে তাহাকে বলা হয় পিচ। পিচকে ন্যাপথার দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া অ্যাস্‌ফালটাম প্রস্তুত করা হয়। এই অ্যাস্‌ফালটাম রাস্তা মেরামতের কার্যে এবং বার্নিশ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

কোল-গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় গ্যাস-লিকার পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ইহাকে চুনের দ্বারা ফুটাইলেই অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। এই অ্যামোনিয়াকে সালফিউরিক অ্যাসিডে শোষণ করিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা হয়।

কোক কয়লা আর একটি উপজাত পদার্থ। কয়লাকে শুষ্কপাতন করিবার পর পাত্রের মধ্যে যে পদার্থটি অবশিষ্ট থাকে তাহাই কোক কয়লা। কোক কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে ভাল এবং শক্ত কোক কয়লা ধাতু নিষ্কাশনের কাজে লাগে।

গ্যাস-কার্বন আর একটি মূল্যবান পদার্থ। তির্যকপাতনের সময় ইহা পাত্রের অভ্যন্তরে, তাহার উভয় পার্শ্বে এবং উপরিভাগে কঠিন পদার্থ হিসাবে সঞ্চিত হয়। ইহা বিশুদ্ধ অঙ্গারের আর একটি রূপ। ইহা বিদ্যুৎ-পরিবাহক। সেই জন্য বিদ্যুৎ-বাহক ইলেক্‌ট্রোড, প্লেট প্রভৃতি প্রস্তুত কবিতে লাগে। ব্যাটারী প্রস্তুতেও গ্যাস-কার্বনকে কাজে লাগান হয়।

উপরোক্ত পদার্থগুলি ছাড়া আরও যেসব পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে গ্যাস-লাইম এবং স্পেণ্ট আযরন অক্সাইডের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্তটি মাটিতে সার হিসাবে এবং দ্বিতীয়টি সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বাঙালীরা কোন্ জাতি?

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

বিশেষজ্ঞদের অনুমান—প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষের সর্বপ্রথম আবির্ভাব হয় হিমালয়ের উত্তরে পামীর মালভূমির নিকট দক্ষিণ-মধ্য এশিয়ায়। সমগ্র মানব জাতির এই আদি জন্মভূমি হইতে ইহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন দলে উত্তর. উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। দক্ষিণে ভারতবর্ষ - বরফাকৃত ও জঙ্গলাকীর্ণ দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের জন্য তাহারা প্রথমতঃ এইদিকে আসিবার চেষ্টা করে নাই। সহজ পথে যেখানে যাওয়া সম্ভব সেখানেই তাহারা প্রথম বসতি স্থাপন করে। যখন সেখানে আর স্থান সংকুলান হইল না তখনই তাহারা সর্বপ্রথম চেষ্টা করে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য। দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বতের উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ দিয়া ইহারা প্রথম এই দেশে আসে। এই স্থানের জল-বায়ু ও খাদ্যের প্রাচুর্য দেখিয়া ক্রমান্বয়ে দলের পর দল এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে।

বিভিন্ন জলবায়ু ও পরিবেশের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতির বেশ কিছু পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতেই পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির (Race) সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন জাতি কাহারা তাহা এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। তবে অনেকের ধারণা নিগ্রোরাই এই দেশের প্রথম অধিবাসী এবং পরে পূর্ব-দ্রাবিড়, দ্রাবিড়, মঙ্গোলিয়ান, ভূমধ্যসাগরীয় ও আলপাইন জাতির আবির্ভাব হয়।

স্যার উইলিয়াম জোন্স্ ভাষা-তত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র মানবকুলের জাতি-বিভাগের সূচনা করেন। পরে ১৯০১ সালের আদমশুমারীতে স্যার হারবার্ট রিজ্‌লে ভারতবাসীদের জাতি নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ দেখিতে পান। যাহাদের পূর্বপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের চুল, মাথা, নাক, মুখের আকার, গায়ের রং, উচ্চতা ইত্যাদি প্রায় একই প্রকারের তাহারাই একটি জাতি গঠন করিয়াছে বলিয়া বলা হয়। স্যার হারবার্ট রিজ্‌লে ভারত বাসীদিগকে ৭টি জাতিতে ভাগ করিয়াছেন—(১) তুর্ক-ইরানিয়ান (বেলুচ, ব্রাহুই, আফগান ইত্যাদি), (২) ইন্দো-এরিয়ান (পাঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ, ক্ষত্রি ইত্যাদি), (৩) সিথোড্রাভিডিয়ান (মারাঠী ব্রাহ্মণ); (৪) আর্য-ড্রাভিডিয়ান (হিন্দুস্থানী, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের লোকেরা); (৫) মঙ্গোলো-ড্রাভিডিয়ান (বাঙালী), (৬) মঙ্গোলয়েড (হিমালয়, আসাম, নেপাল ও ব্রহ্মদেশের বাসিন্দাগণ), ও (৭) ড্রাভিডিয়ান (দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা)।

আমরা যদি বাঙালীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করি তবে দেখিতে পাই যে, তাহাদের গায়ের রং সাধারণতঃ ঈষৎ পিঙ্গল হইতে কৃষ্ণ-পিঙ্গল বর্ণ, চুল কালো, উচ্চতা মাঝারি রকমের, নাক খুব সরুও নয় থ্যাবড়াও নয়, মুখ ঈষৎ চ্যাপ্টা ও ডিম্বাকৃতি, অক্ষিতারকার রং কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণ-পিঙ্গল এবং মাথা সাধারণতঃ চওড়া। রিজ্‌লে বলিয়াছেন যে, মঙ্গোলিয়ান প্রভাবই বাঙালীদের মস্তক প্রশস্ততার কারণ। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদগণ পরবর্তী পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বাংলার চতুর্দিকে যে সব লোক বাস করে তাহাদের সকলের জাতিগত উপাদান এক নহে। বাংলার দক্ষিণ-

পূর্ব অঞ্চলে যাহারা বাস করে তাহাদের মাথা বড় ও নাক থ্যাবড়া, উত্তর দিকের বাসিন্দাদের মাথা বড় বটে, কিন্তু নাক সাধারণতঃ লম্বা।

নৃতত্ত্ববিদ রায়বাহাদুর আর. পি. চন্দ বলিয়াছেন—মঙ্গোলিয়ানদের শরীরের বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের চুলগুলি খাড়া, গায়ের রং হলদে, লম্বালম্বি কাটা অসমান্তরাল বক্র চোখ ও চোখের পাতায় ভাঁজ, লোম-শূন্য শরীর ও দাড়ি-গোঁফ শূন্য মুখ। মঙ্গোলিয়ানদের এই দৈহিক বিশেষত্বের সঙ্গে বাঙালীদের কোনই মিল নাই। সুতরাং রিজ্‌লের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙালী জাতি যে মঙ্গোলিয়ান প্রভাবান্বিত তাহা নির্ভুল বলা যায় না। ডাক্তার ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে, গুজরাটের নগর-ব্রাহ্মণদের পদবীর সঙ্গে বাঙালীর পদবীর অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—বর্মণ, দত্ত, মিত্র ইত্যাদি। রিজ্‌লেই এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, গুজরাটের নগর-ব্রাহ্মণদের শতকরা ৭১ জন এবং বাঙালীদের শতকরা ৭০ জন লোকের মাথা চওড়া। গুজরাটের নগর-ব্রাহ্মণেরা মঙ্গোলিয়ান নয়, সুতরাং বাঙালীদের চওড়া মাথার কারণ খুঁজিতে হইলে ভারতবর্ষের নিকটবর্তী চওড়া মাথাযুক্ত কোন অ-মঙ্গোলীয় জাতির অস্তিত্ব বাহির করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে চীনা-তুর্কিস্থান ও পামীরের নিকটে গল্‌ছা, তাজিক ইত্যাদি জাতি বাস করিত। তাহাদের মাথা চওড়া এবং তাহারা হোমো-আলপিনাস্ জাতিভুক্ত। তাহারা যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে আসে তখন গঙ্গার উর্ধ্ব তীরবর্তী সমতল ভূমিগুলি প্রায় সবই আর্যদের অধিকারে ছিল। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা বোম্বাই প্রদেশে থাকিতে পারিল তাহারা সেখানেই থাকিয়া গেল এবং যাহারা পারিল না তাহারা বাংলাদেশে চলিয়া আসিল। কথিত আছে যে, বৈদিক আর্যদের সঙ্গে বাঙালীর জাতিগত ও সংস্কৃতিগত কোনই মিল ছিল না; এমন কি, বৈদিক যুগের আর্যদের নিকট বাংলা দেশের কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞানা ছিল। পরবর্তী ব্রহ্মণ্য যুগে আর্যেরা বাঙালীদিগকে প্রথম জানিতে পারে। মনুসংহিতায় ইহাদিগকে পুলিণ্ড ও শবর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন যে, বাংলার আদিম অধিবাসীরা আর্যদের বংশধর ছিল না। ইহাদের মধ্যে মঙ্গোলিয়ান ছাড়া দ্রাবিড়, পূর্ব-দ্রাবিড় এবং নিগ্রো জাতির উপাদানও পরিদৃষ্ট হয়।

বৃহৎ ধর্মপুরাণে আমরা দেখিতে পাই—বাংলার লোকেরা সেই সময়ে ৩৬টি বর্ণে বিভক্ত ছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বাঙালীদের মধ্যে কি প্রকার রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। দার্জিলিং, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর ইত্যাদি স্থানে বেশীর ভাগ লম্বা মাথাযুক্ত মঙ্গোলিয়ান উপাদানে গঠিত লোকের বসবাস। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলায় মোটা মাথাযুক্ত আলপিনাস্ জাতিভুক্ত লোকদের বাস। ইহারাই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আসে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। অনুন্নত উপজাতি—সাঁওতাল, ওড়াওঁ, মুণ্ডা ইত্যাদির মধ্যে লম্বা মাথা ও থ্যাব্‌রা নাকযুক্ত পূর্ব-দ্রাবিড়দের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব-দ্রাবিড়দের দৈহিক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মাথা লম্বা, নাক থ্যাব্‌রা ও কোকড়ানো চুল। দ্রাবিড়দেরও মাথা লম্বা এবং চুল তরঙ্গায়িত বটে, কিন্তু তাহাদের নাক থ্যাব্‌রা নয়, বরং মাঝারি বা সরু। বাংলার নিম্নশ্রেণীর লোক, যেমন—বাগ্দী, বাউড়ি, মালি ইত্যাদির মধ্যে পূর্ব-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড়দের দৈহিক লক্ষণ বর্তমান। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি বাংলার উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের সাধারণতঃ চওড়া মাথা, সরু নাক এবং মাঝারি বা লম্বা দেহ। এই দৈহিক লক্ষণগুলি আলপাইন ও ডিনারিকদের

মত। বেঁটে বা মাঝারি রকমের লম্বা দেহ, লম্বা মাথা এবং সরু নাসিকাযুক্ত মধ্য শ্রেণীর বাঙালী—যথা পোদ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত ইত্যাদি ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, বাঙালীরা সর্বপ্রথম আলপিনাস্‌ জাতিভুক্ত ছিল। পরে তাহারা দ্রাবিড়, পূর্ব-দ্রাবিড় এবং আরও বহুজাতির সঙ্গে মিশিয়া একটি নূতন ও ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে বাঙালীরা মিশ্রজাতি।

তালগাছ

বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে—ভাদ্র মাসে নাকি তাল খেলে তাল-বেতাল সন্তুষ্ট হন। এতে বুদ্ধিভ্রংশ হবার আর কোন ভয় থাকে না। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্য নাকি তাল-বেতালের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং বহু অসাধ্য কার্য সম্পাদনে তাঁদের নিয়োজিত করেন। এই ঘটনার মূলে কতটা সত্য আছে তা ঐতিহাসিকদের বিচার্য। তবে আজও ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ ভাদ্র মাসে তাল খেয়ে থাকেন। অনেক হিন্দুর বাসগৃহের দরজার ওপর শিকায় তাল ঝুলতে দেখা যায়।

গ্রীষ্মের গরমে যখন প্রাণ আইঢাই করতে থাকে তখন তালবৃন্তের কদর খুব দেখা যায়। দারুণ গ্রীষ্মে গরীব ও মধ্যবিত্তের প্রধান অবলম্বন হলো তাল-পাখা। এছাড়া তালের কাণ্ড দিয়ে অনেক কাজ হয়ে থাকে। তালগাছের কাণ্ড বেশ মজবুত। এ দিয়ে ঘরের খুঁটি, নৌকা (ডোঙ্গা), লাঙ্গলের ঈষ প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে। তালের পাতা দিয়ে ছাতা, রং-বেরঙের ব্যাগ, মাথার টুপি, সুটকেস, বসবার আসন প্রভৃতি এবং আরও বহুবিধ ব্যবহার উপযোগী সৌখিন দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। অতি প্রাচীনকালে তালপাতায় গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ হতো, এমন কি, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও তালপাতার কিছু কিছু ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

তাল এক বীজপত্রী উদ্ভিদ। পুরুষ ও স্ত্রী—এই দু'রকমের তালগাছ দেখা যায়। পুরুষ-গাছে ফল জন্মায় না। এদের জটা হয় এবং এই জটার মধ্যে অগণিত ফুল ফোটে। স্ত্রী-গাছে কাঁদি জন্মায়। এর মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য তালের গুচ্ছ দেখা যায়। ক্রমশঃ এই সব ছোট ফল বড় হয়। এগুলিকেই আমরা তাল বলে থাকি। তালের মোচা এবং জটা থেকে রস বের করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে তাল পাকতে সুরু করে। পাকা তালের গোলা বের করে ময়দা অথবা পিটুলির সংমিশ্রণে বিবিধ মুখরোচক পিঠা তৈরী হয়।

তালের শাঁস কে না ভালবাসে? গরমের সময় ছেলে-বুড়া সবাই কচি তালশাঁস খেয়ে থাকে। এছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কচি তালশাঁসের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। ইহা নাকি বাত ও পিত্তনাশক। তিক্কা উপশমেও ইহার উপকারিতা যথেষ্ট।

পরিপক্ক অবস্থায় তালশাঁসের ওপরের আবরণটা ভয়ানক শক্ত হয়ে যায়। ভিতরকার শাঁসটাও বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। পাকা তালের আঁঠি কিছুদিন স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ফেলে রাখলে মুখের দিক থেকে শিকরের মত বেশ মোটা একটা পদার্থ বেরিয়ে আসে। এই শক্ত আঁঠিটা দু-টুকরা করে ফেললে বেশ বড় একটা ফোঁপল পাওয়া যাবে। এটি স্পঞ্জের মত নরম এবং খেতে সুস্বাদু। এই

ফোঁপলের সাহায্যেই কিন্তু প্রথমাবস্থায় বৃক্ষ-শিশুর পুষ্টিসাধন হয়ে থাকে।

তালের রস জ্বাল দিয়ে তালের গুড় প্রস্তুত হয়। এছাড়া এই রস দিয়ে তাড়িও তৈরী হয়ে থাকে। তালের গুড় থেকে চিনিও পাওয়া যায়। আমরা যে তালমিছরি খেয়ে থাকি তা এই তালের গুড় থেকেই প্রস্তুত হয়। তাই এর নাম তালমিছরি। চিকিৎসকেরা অনেক রোগে, বিশেষ করে সর্দি-কাশিতে তালমিছরি সেবনের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। জ্বাল দেওয়া রসের চেয়ে টাট্‌কা তালের রস স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ইহা স্নিগ্ধ পানীয়। প্রতি চার সের তালের রসে এক সের গুড পাওয়া যায়। এদেশে প্রতি বছর তাড়ি প্রস্তুতে যে পরিমাণ তালের রসের অপচয় হয়ে থাকে তা দিয়ে গুড প্রস্তুত করলে চিনির অভাব বহুল পরিমাণে দূর হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একটি চিনির কল রয়েছে। এই চিনির কলে গড়ে প্রতি বছর মাত্র ৮ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হয়ে থাকে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা হচ্ছে বার্ষিক প্রায় ৫০,০০০ টন। সুতরাং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উৎপন্ন চিনিব উপরেই পশ্চিমবঙ্গকে নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ রয়েছে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা এবং অন্যান্য বিভিন্ন পূজা-পার্বণে চিনির চাহিদা অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। বর্তমানে কলকাতার বাজারে ৩১।০ থেকে ৩২৷৷০ আনা এবং ৩৩৲ টাকা পাইকারী দরে চিনি বিক্রী হচ্ছে। খুচরা মূল্য ৩৪৲।৩৫৲ টাকার কম নয়।

প্রকাশ যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে এক লক্ষ টন চিনি আমদানীর সিদ্ধান্ত করেছেন। এতে পশ্চিমবঙ্গে চিনির মূল্য কতটা হ্রাস পাবে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কলকাতায় কি পরিমাণ চিনি আমদানী হবে এবং আমদানীকৃত চিনির কতটা পশ্চিমবঙ্গেব জন্যে বরাদ্দ হবে তা এখনও জানা যায় নি। চাহিদামাফিক চিনি যদি বণ্টিত না হয়, তা হলে অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা থেকেই যাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—চিনি সম্পর্কে কিছুটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে তালের রস থেকে চিনি প্রস্তুত সম্পর্কে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে। যাতে তালেব রসের অপচয় না ঘটে তার জন্যে তাড়ি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

—ন—

সঞ্চয়ন

ভারতের আফিম শিল্প

প্রায় স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে আফিম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সঠিক কবে এবং কিভাবে ইহা ভারতে প্রচলিত হয় তাহা জানা যায় না। গত দুই শত বৎসরের মধ্যে আফিমের ব্যবসায় সুসংগঠিত হইয়া উঠে। আফিমের আদি বাসভূমি এশিয়া মাইনর। সেখান হইতে আরবেরা ইহা ভারতে ও চীনে লইয়া আসে। মুঘল যুগে আফিম উৎপাদন বাদশাহদের একচেটিয়া কারবার ছিল এবং ওলন্দাজেরা ছিল আফিমেব বড গ্রাহক। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনেব পব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুপরিকল্পিত পন্থায় আফিমের ব্যবসায় আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা চীনে আফিম রপ্তানী সুরু করে এবং এই ব্যবসায়ে তাহাবা যথেষ্ট লাভবান হয়। এক সময়ে চীনে আফিম রপ্তানীই ছিল ভারতের রাজস্বসংগ্রহের প্রধান পন্থা। গত ৪০ বৎসর যাবৎ চীনে ভারতের আফিম রপ্তানী একেবারের বন্ধ হইয়া গিযাছে।

আফিম প্রধানতঃ নেশার দ্রব্য হইলেও ইহা হইতে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় ঔষধ তৈয়ারী হয়। নেশা হিসাবে ইহার প্রভাব বড মারাত্মক। একবার অভ্যাস হইয়া গেলে মানুষ ইহার দাস হইয়া পড়ে এবং মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটাইযা ইহা মানুষকে চরম বিপর্যয়ের পথে ঠেলিয়া দেয়।

আফিম খাইলে বা ইহার ধূমপান করিলে প্রথমে মধুর আমেজ নামিয়া আসে, তারপর ঘুম পায়। কিন্তু বিষের মতই ইহার ফল খুব ক্ষতিকর।

আফিমের ক্ষতিকর ফলাফল সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। তবে ধূমপান অপেক্ষা আফিম খাওয়া অনেক কম ক্ষতিকারক। বেশী মাত্রায় গ্রহণ করিলে ক্ষুধামান্দ্য হয় এবং ক্রমে আফিম-খোর জীবন্ত কঙ্কালের মত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় চরম আলস্য আসিয়া ভর করে এবং কাজে কিছুমাত্র উৎসাহ থাকে না। ফলে আফিমখোরকে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

আফিমের কতকগুলি রোগ-নিবারক ক্ষমতা থাকায ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কিন্তু নেশা হিসাবে ইহার ফল মারাত্মক হওয়ায় বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আফিমের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে ভারতে আফিম ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ সম্প্রতি আফিম নিয়ন্ত্রণের যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এখন অতি অল্প সংখ্যক আফিমখোর রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার এই ভয়াবহ নেশার মূলোৎপাটন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সেবনের জন্য আফিম বিতরণের পরিমাণ তাঁহারা ধীরে ধীরে হ্রাস করিয়া কয়েক বৎসর পর তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন। তখন ইহা কেবলমাত্র ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। আফিম শিল্প-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আফিমের চাষ করা হইতেছে।

বর্তমানে রাজ্য সরকারসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আফিম পাইয়া থাকেন। তাঁহারা

ভেষজ বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাজারে আফিম বিক্রয় করিয়া থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার আবাদের জন্য লাইসেন্স দিয়া থাকেন। কেবলমাত্র গাজীপুর ও নীমুচের সরকারী কারখানায় আফিম তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। আফিম শোধন করিয়া অতি অল্প পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য রাজ্য সরকার-সমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয়। বাকীটা বৈজ্ঞানিক ও ভেষজ দ্রব্যাদির প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়া থাকে।

কেবলমাত্র ভারত সরকারের লাইসেন্স বলে আফিম বা পোস্ত গাছ আবাদ করিতে দেওয়া হয় এবং তাহাও উত্তর প্রদেশ, মধ্য ভারত, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিলাসপুরেও অল্প কিছু জন্মে।

চাষী তাহার উৎপন্ন সমস্ত কাঁচা আফিম নির্দিষ্ট মূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য থাকে। চাষী নিকটবর্তী ক্রয়-কেন্দ্রে গিয়া সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া দিয়া আসে।

ভারতে তিন জাতের আফিম গাছ জন্মে :—

উত্তর প্রদেশে—বারানসী (সাদা ফুল), মধ্য ভারত ও রাজস্থানে—মালোয়া (গোলাপী ফুল) এবং হিমাচল প্রদেশে—হিমালয় (লাল ফুল)। ১লা অক্টোবর হইতে আফিম আবাদের বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। আবাদের কাজ সুরু হয় নভেম্বর মাসে এবং ফসল উঠে পরবর্তী বৎসরের এপ্রিল ও মে মাসে। একটু বেলে মাটিতে আবাদ ভাল হয়। জমি গ্রামের নিকট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাহাতে জলসেচের সুবিধা হয়। আফিম আবাদের জন্য জমি তৈয়ারী করা খুব শ্রমসাধ্য কাজ। ২০ হইতে ২৫ বার লাঙ্গল দিয়া জলসেচ করিতে হয়। তারপর মাটি সমান করিয়া নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে নির্বাচিত বীজ বপন করা হয়। সাধারণতঃ ১০।১৫ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। ইহার কিছু পরেই জমি কয়েকটি চতুষ্কোণ খণ্ডে ভাগ করিয়া লওয়া দরকার। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সেচের কাজ চলে। দুই হইতে আড়াই মাসের মধ্যে ফুল ফোটে এবং তাহার এক পক্ষকালের মধ্যেই ফল বাহির হইয়া আসে।

কাঁচা ফলের গায়ে আঁচড়াইয়া দিলে যে রস বাহির হইয়া আসে তাহা হইতেই আফিম তৈয়ারী হয়। চারটি ফলাযুক্ত ছুরি (যাকে চাষীরা নাস্তার বলে) দিয়া ফলের উপর হইতে নীচ পর্যন্ত বরাবর আঁচড়াইয়া দেওয়া হয়। আঁচড়ানো অংশ দিয়া রস নির্গত হইয়া ফলের গায়ের উপর জমিয়া থাকে। পরের দিন শিপা বা লোহার ক্ষুদ্রাকৃতি বেলচা দিয়া জমাট অংশ কুড়িয়া সংগ্রহ করা হয়। ইহাই কাঁচা আফিম। চাষীকে ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া সরকারী অফিসারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। সরকারী আফিমের কারখানায় এই দ্রব্য আরও শোধন করিয়া আফিম তৈয়ারী হয়।

১৯০৫-৬ সালে ভারতে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে আফিমের আবাদ হইত। আজ সেখানে মাত্র ৭০ হাজার একর জমিতে আবাদ হয়। আফিমের মারাত্মক নেশা হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতকে বার্ষিক ৮ কোটি টাকা রাজস্ব হারাইতে হইয়াছে। বৈদেশিক চাহিদার উপর ভিত্তি করিয়া আফিমের আবাদ কম বেশী হইয়া থাকে। ১৯৫০-৫১ সালে ৬৯,৭২৫ একর জমিতে আফিমের আবাদ হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৫১-৫২ সালে উহার পরিমাণ কমিয়া ৫৬,১৯০ একর হয়। এই দুই বৎসরে আফিম উৎপাদন হইয়াছে যথাক্রমে ১৩৭০০ মণ ও ৯০৪৫ মণ।

আফিমের কারখানায় দুই রকমের আফিম তৈয়ারী হয়। এক রকম আফিম বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং আর এক রকম আফিম—যার চলতি নাম আবকারী—ভারতে ভেষজ বা অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে

বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কারখানায় আফিম ইটের আকারে তৈয়ারী হয়। এগুলির প্রত্যেকটির ওজন আধ সের হইতে দশ সের পর্যন্ত হইয়া থাকে। ভারতে আফিম আমদানী করা নিষিদ্ধ। ভারত সরকারও কেবলমাত্র ভেষজ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে বিদেশে আফিম রপ্তানী করিয়া থাকেন।

স্বাধীনতা লাভের পর আফিমের রপ্তানী বাড়িয়া যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ২৫ টন, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৩৫ টন, ১৯৪৮-৫০ সালে ১৭২ টন এবং ১৯৫০-৫১ সালে ৩৪৮ টন রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৫০-৫২ সালে রপ্তানী আকস্মিকভাবে হ্রাস পায়। এই বৎসরে ১৬৭ টন রপ্তানী হইয়াছে।

'আবকারী' আফিম কারখানার তৈয়ারী মূল্যে রাজ্য সরকারসমূহের নিকট বিক্রয় করা হইয়া থাকে। ইহার বর্তমান দর সের প্রতি ৫৬ টাকা ১ আনা। এইভাবে আফিম বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোন লাভ হয় না। গাজিপুর বা নীমুচের কারখানা হইতে আফিম পাইবার পর রাজ্য সরকার তাহার উপর উচ্চ হারে শুল্ক ধার্য করিয়া থাকেন। কোনও একটি রাজ্যে এক সের আফিমের উপর ১১২০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। আফিম বিক্রয়ের জন্য অত্যধিক লাইসেন্স ফি-ও আদায় করা হইয়া থাকে। ফলে ক্রেতাদিগকে অত্যধিক মূল্যে আফিম ক্রয় করিতে হয়। ইহাতে স্বভাবতঃই লোকে সহজে আফিমের মারাত্মক নেশার বশীভূত হইতে চাহিবে না। কেবলমাত্র আফিম রপ্তানী করিয়া এবং স্বদেশে ও বিদেশে আফিম-জাত উপক্ষার বিক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের লাভ হইয়া থাকে।

১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গাজীপুরের কারখানার সঙ্গে উপক্ষার তৈয়ারীর একটি কারখানাও খোলেন এবং এই সময় হইতেই আফিমজাত ভেষজ তৈরী আরম্ভ হয়। বর্তমানে উপক্ষার তৈয়ারী একটি লাভজনক ব্যবসায়ে উপনীত হইয়াছে। কালক্রমে এই শিল্পের উন্নতি হইয়া ইহা একটি জাতীয় গবেষণা মন্দিরে পরিণত হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই উপক্ষায় কারখানায় মরফিন, কোডেইন ও নারকোটিন এবং ইহাদের ধাতব লবণ তৈয়ারী করা হইতেছে। ভেষজ হিসাবে এইগুলি খুবই মূল্যবান। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ উপক্ষারজাত যে সকল ভেষজ সরবরাহ করিতেছে তাহার তুলনায় এই কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি অনেক উচ্চ শ্রেণীর এবং সেগুলির দামও অনেক কম। তাই স্বদেশের বাজারে এইগুলির চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই ভেষজগুলি ছাড়াও গাজীপুরের কারখানায় বৃটিশ ও মার্কিন ফার্মাকোপিয়ায় উল্লিখিত মানের থেবাইন, পাপাভেরিন ও কোটারনিন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

আজ ভারতে এমন আফিম উৎপন্ন করা হয় যাহার মধ্যে মরফিনের ভাগ অত্যন্ত বেশী। ভারতের আফিমে কোডেইন ও নারকোটিনের ভাগও খুব বেশী থাকে। এই দিক দিয়া ইরাণ ও তুরস্কে উৎপন্ন আফিমের তুলনায় ভারতের আফিম অনেক বেশী মূল্যবান।

গাজীপুরের কারখানা ভারতের উপক্ষার ও উপক্ষারজাত ভেষজের চাহিদা পুরাপুরি মিটাইয়া গত কয়েক বৎসর হইল মধ্য প্রাচ্য, দূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুরুত্বপূর্ণ বাজারে এই সকল দ্রব্য রপ্তানী করিতেছে। কাঁচা আফিম হইতে আরও বেশী পরিমাণে মরফিন সংগ্রহের জন্য গাজীপুরের কারখানায় ব্যাপকভাবে গবেষণা চলিতেছে। ইহাতে একদিকে চাষীরা যেমন লাভবান হইবে তেমনই বিদেশের বাজারে এই সকল ভেষজ বিক্রয় করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হইবে।

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া দেশে উপক্ষার বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে যেখানে ৫১০ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল,

১৯৫০-৫১ সালে সেখানে ১৪৩০' পাউণ্ড এবং ১৯৫১-৫২ সালে ১১৯৮ পাউণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বিদেশে উপক্ষার বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। অথচ ১৯৫০-৫১ সালে ৩৭৪ পাউণ্ড এবং ১৯৫১-৫২ সালে ১৪৭৯ পাউণ্ড রপ্তানী করা হইয়াছে।

আজ ভারতের উপক্ষার শিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শিল্পের উন্নয়ন ভারতের ভেষজ শিল্প উন্নয়নের সহায়ক হইবে।

আফিমের কুফল এবং আফিমের উপজাত দ্রব্যাদির নিদ্রাকর্ষক শক্তির জন্য বিভিন্ন সরকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইহার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়াছেন। আফিম আয়তনে কম অথচ অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া ইহার উপর চোরাকারবারীদের প্রখর দৃষ্টি। সহজে প্রভূত ধনোপার্জনের উদ্দেশ্যে ইহারা নানা-রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় লইয়া থাকে। সরকারও আফিমের চোরাই চালান বন্ধ করিবার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

আফিমের ব্যবসায় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। পূর্বের লীগ অব নেশনস্ এবং বর্তমান রাষ্ট্রসংঘ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক ও ভেষজ প্রয়োজনে আফিমের ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। প্রধানতঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেল্টের প্রচেষ্টায় ১৯০৯ সালে সাংহাইতে আন্তর্জাতিক আফিম কমিশনের অধিবেশন বসে। ইহারই ফলে ১৯১২ সালে হেগ সম্মেলনে প্রথম আফিম-বিধান রচিত হয়।

হেগ সম্মেলনের পর নিদ্রাকর্ষক দ্রব্যাদি সম্পর্কে অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু আফিম উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রচেষ্টা তেমন সফল হয় নাই। ১৯২৫ ও ১৯৩১ সালে জেনেভায় দুইটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ১৯২৫ সালের সম্মেলনে আফিম এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক ভেষজের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। পরবর্তী অধিবেশনে এই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চুক্তি করা হয়। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রসংঘ নিদ্রাকর্ষক ভেষজের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় একাধিকারে আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু মতানৈক্য হওয়ায় তাহা বানচাল হইয়া যায়।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সদর কার্যালয়ে যে আন্তর্জাতিক আফিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাতে একটি নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি-গণও যোগ দিয়াছিলেন। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝা গিয়াছে যে, সমস্যাটির মূলে আঘাত না করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যাইবে না, অর্থাৎ আফিম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং উৎপন্ন আফিম যাহাতে কোনক্রমে চোরা-কারবারীদের হাতে গিয়া না পড়ে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভারত আন্তর্জাতিক আলোচনা ক্ষেত্রে এবং স্বদেশে অনুসৃত নীতিতে সর্বদাই এই বিষয়ে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছে। আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ ভারত আন্তরিকতার সঙ্গেই পালন করিয়া চলিতেছে।

ভারতীয় বিরলমৃত্তিকার কারখানা

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের অন্তর্গত আলোয়াতে যে ভারতীয় বিরলমৃত্তিকার কারখানা (রেয়ার আর্থ ফ্যাক্টরী) স্থাপিত হইয়াছে সেই কারখানায় বিরলমৃত্তিকা ক্লোরাইড ও কার্বোনেট, ট্রাই সোডিয়াম ফস্ফেট, কষ্টিক লাই, থোরিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পদ্রব্যগুলি উৎপন্ন হইবে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির উৎপাদন ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে।

চকমকি পাথর, অ্যালুমিনিয়াম মিশ্র ধাতু প্রভৃতি

উৎপাদনে বিরলমৃত্তিকা ক্লোরাইড ও কার্বোনেট ব্যবহৃত হয়। ট্রাই সোডিয়াম ফস্‌ফেট ঔষধ-পত্রাদিতে এবং কাপড়ের কলে সুতা শক্ত করিতে ব্যবহৃত হয়। সাবান তৈয়ার করিতে কষ্টিক লাই লাগে। গ্যাস ম্যান্‌টল্‌ শিল্পে থোরিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়। এতদিন বিদেশ, প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র হইতে থোরিয়াম নাইট্রেট আমদানী করা হইত। এই কারখানায় যে থোরিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন করা হইবে তাহা দ্বারা ভারতীয় গ্যাস ম্যান্‌টল্‌ শিল্পের প্রয়োজন মিটাইয়াও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চালান যাইবে এবং বিদেশে উহা রপ্তানী করাও চলিবে। এই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি সিগারেট ধরাইবার যন্ত্র, ইস্পাত ঢালাই, চক্ষুরোগে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে কাজে লাগিবে।

ত্রিবাঙ্কুব-কোচিনে সমুদ্রোপকূলে যে খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত বালুকারাশি পাওয়া যায় ঐগুলি ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। মোনাজাইট ঐ বালুকারাশির অন্যতম। অধুনালুপ্ত কার্তামাক এবং সম্ভবতঃ নীলগিরি পাহাড়ের উপলরাশি বিধৌত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রজলের বেগে উপকূলে আসিয়া সঞ্চিত হয়। বর্ষার জল উপলখণ্ডগুলির উপর পতিত হইলে তাহা হইতে অসংখ্য টুকরা বাহির হইয়া ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সমুদ্রজলে মিশিয়া ঢেউয়েব সঙ্গে তীরে আসিয়া পড়ে। সেগুলি ঐখানে জমা হইতে থাকে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের জলে বিধৌত হইতে থাকে। এই ভাবে বারংবার জলের আঘাতে বিভিন্ন শ্রেণীর বালুকা পৃথক হইয়া পড়ে।

মোনাজাইট সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার অবস্থায় থাকে; কথনও কথনও অবশ্য ইহা জমাট অবস্থায়ও পাওয়া যায়। ইহা অনেকটা হলুদ বর্ণের—জল অপেক্ষা ইহা পাঁচ গুণ ভারী। নদীর জলে বাহিত হইয়া কখনও কখনও মোনাজাইট বালুকা উপকূল হইতে এক মাইল বা দুই মাইল দূরেও পতিত হয়। অনেকদিন যাবৎ এই প্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। তারপর তীরগামী স্রোতের টানে এইগুলি আসিয়া উপকূলে ভীড় জমায়। তখন উহা সাধারণ বালুকা, ইল্‌মেনাইট ও অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। মোনাজাইট বালুকা ও অন্যান্য শ্রেণীর বালুকার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া অনেক সময় মোনাজাইট আলাদা হইয়া যায়।

এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মানুষের কাজের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। তাই কারখানায় লইয়া গিয়া মোনাজাইট কণাকে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া কাজে লাগাইতে হয়।

১৯০৯ সালে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক সি. ডব্লিউ সোমবার্গ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে মোনাজাইটের অস্তিত্বের বিষয় আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা কর্তৃক এখানে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। ১৯১০ সালে প্রথম ভারত হইতে বৃটেনে ইহা রপ্তানী করা হয়। ত্রিবাঙ্কুর সরকার ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই বিষয়ে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার মেয়াদ শেষ হইলে ত্রিবাঙ্কুর সরকার উহার রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

কতকগুলি খনিজ দ্রব্য শোধনের জন্য একটি কোম্পানী পরিচালনকল্পে ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার এক কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সিদ্ধান্তের ফলেই ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড (আলোয়া) গঠিত হয়। ইহার মূলধন ৮০ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে। ভারত সরকার ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকার ৫৫ : ৪৫ হারে এই মূলধন প্রদান করিয়াছেন। একজন শিল্প প্রতিনিধি মিঃ জে. ডি. চোক্‌সী এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ বোর্ডে ভারত সরকারের প্রতিনিধি :

ডাঃ এইচ. জে. ভাবা, (এফ. আর. এস. এবং

অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান) ডাঃ এস. এস. ভাটনগর, (শিল্প, বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অধিকর্তা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী), মিঃ কে. আর. কে. মেনন (অর্থ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী) এবং ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণাণ (জাতীয় পদার্থ গবেষণা মন্দিরের অধিকর্তা)। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকারের চীফ সেক্রেটারী বোর্ডের অপর দুই জন সদস্য।

এই কারখানায় বৎসরে ১৫০০ টন মোনাজাইট বালুকা শোধন করা যাইতে পারে। রেয়ার আর্থ ক্লোরাইড ও রেয়ার অর্থ কার্বোনেটই এই কারখানার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সাধারণতঃ ইহা ১৯৯৯ টন ক্লোরাইড এবং বহু টন কার্বোনেট উৎপন্ন করিবে। উপজাত দ্রব্যের মধ্যে থাকিবে প্রায় ১৮০০ টন ট্রাই সোডিয়াম ফস্‌ফেট এবং ৯,০০,০০০ গ্যালন কষ্টিকসোডা লাই। এই সমস্ত বাহির করিয়া নিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার মধ্য হইতে প্রায় ২২৮ টন থোরিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন করা যাইতে পারে। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম কম্পাউণ্ড উৎপাদনের জন্য যে কারখানা স্থাপন করিতেছেন তাহাতে ঐ অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি উৎপন্ন হইবে। ঐ কারখানায় ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করা হইবে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

১৯৫২-৫৩ সালে ভারতের (স্থল, জল ও বিমান পথে) বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১২৩২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। ১৯৫১-৫২ সালে এবং ১৯৫০-৫১ সালে পরিমাণ ছিল যথাক্রমে .৬৭৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ও ১২২৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।

১৯৫২-৫৩ সালে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫৭৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে উহা ছিল ৭৩২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

১৯৫২-৫৩ সালে মোট আমদানীর পরিমাণ ৬৫৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯৪২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। উহা :৯৫০-৫১ সালের তুলনায় কিন্তু ৩৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বেশী।

১৯৫১-৫২ সালে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর পরিমাণ ছিল ২০৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বেশী। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে আমদানীর পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৩ কোটি টাকা অধিক। ১৯৫০-৫১ সালে এই পরিমাণ ছিল ২২ কোটি ১ লক্ষ টাকা।

ভারতের এই প্রতিকূল বাণিজ্যের জন্য লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ হিসাবে প্রাপ্ত ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ১৯৫১-৫২ সালের আমদানীর হিসাবে ধরা হইয়াছে। এই আমদানীর জন্য টাকা দেওয়ার প্রশ্ন উঠে নাই। বস্তুতঃ ১৯৫২ সালের মার্চ পর্যন্ত ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং হইতে ১৯৫১ সালের জুন হইতে ১৯৫২ সালের জুলাই পর্যন্ত পাওনা সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড লওয়া হয় নাই। এমন কি ১৯৫২ সালের জুন পর্যন্তও ১৯৫১-৫২ সালের জন্য পাওনা একটা মোটা টাকা লওয়া হয় নাই। অনুরূপভাবে ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং হইতে খালাস করা অর্থ লওয়া হয় নাই। আলোচ্য বৎসরে সঞ্চিত পাওনা ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ একই রকম ছিল।

আলোচ্য বৎসরে কাঁচা পাট, কাঁচা কার্পাস ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের আমদানী অনেক পরিমাণে কমিয়াছিল। ফলে বাণিজ্য পরিস্থিতি উন্নত

প্রতীয়মান হইয়াছে। ঐ বৎসরের প্রথম ভাগে ভারতের মাসিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ, বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং বিদেশের বাজারে ভারতের কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাসের জন্য বাড়িতেছিল। এজন্য সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁহারা কোন কোন দ্রব্যের উপর রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করেন, কোন কোন দ্রব্যের উপর উহা রহিত করেন এবং রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ নিয়ম শিথিল করেন।

১৯৫২-৫৩ সালে গড়পড়তা মাসিক আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। ১৯৫১-৫২ সালে ও ১৯৫০ ৫১ সালে উহা ছিল ৭৮ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ও ৫১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫২-৫৩ সালে গডপডতা মাসিক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। ১৯৫১-৫২ সালে ও ১৯৫০-৫১ সালে উহা ছিল ৬১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ও ৫০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা।

ভারতে পণ্য আমদানী

আলোচ্য বৎসরে ভারতে মোট ৬৫৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল। ১৯৫১ ৫২ সালে ও ১৯৫০-৫১ সালে আমদানী হইয়াছিল যথাক্রমে ৯৪৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ও ৬২৮ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার পণ্য। ১৯৫২-৫৩ সালে আমদানীকৃত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মধ্যে ছিল ১৫৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার শস্য, ডাল ও ময়দা, ৮৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি, ৭৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার কাঁচা ও অকেজো কার্পাস, ৮১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার বিভিন্ন তৈল, ৪৩ কোটি ১১ লক্ষ টাকার বিভিন্ন ধাতু, ২৮ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার মোটর গাড়ী ইত্যাদি যান, ২৫ কোটি টাকার রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ, ১৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার কাঁচা পাট, ১৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি, ১৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম এবং ১৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার ফল ও শাক-সবজি।

পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে অধিকাংশ পণ্যের আমদানী কমিয়াছে। কেবল তৈল, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ও ধাতুর আমদানী সামান্য বাড়িয়াছে। যে সকল জিনিষের আমদানী আলোচ্য বৎসরে কমিয়াছে সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শস্য, ডাল ও ময়দা, কাঁচা ও অকেজো কার্পাস ও কাঁচা পাট উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে তৈল আমদানীর পরিমাণ ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বেশী। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের আমদানী ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বেশী। ধাতু আমদানী ৪৮ লক্ষ টাকা বেশী। অন্যান্য খনিজ অধাতব পদার্থের আমদানী ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বেশী।

পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির আমদানীর পরিমাণ কম:—

শস্য, ডাল, ময়দা	৭৭	কোটি	১৫	লক্ষ	টাকা	কম
তুলা	৬০	,,	৫১	,,	,,	,,
কাঁচা পাট	৫০	,,	৬০	,,	,,	,,
যন্ত্রপাতি	১৬	,,	৪৪	,,	,,	,,
ঔষধাদি	১১	,,	৪৮	,,	,,	,,
বয়ন-শিল্পের দ্রব্য	৯	,,	৬৫	,,	,,	,,
কৃত্রিম রেশম	৯	,,	১৪	,,	,,	,,
রং	৮	,,	৮৬	,,	,,	,,
যানবাহন	৬	,,	২৩	,,	,,	,,
ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি	৫	,,	৪৪	,,	,,	,,
মশলা	৫	,,	৪২	,,	,,	,,
ঘানি ইত্যাদি	৫	,,	১৪	,,	,,	,,

বাণিজ্য পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় কোন কোন পণ্য সম্পর্কিত আমদানী-নীতি ঈষৎ শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বাণিজ্য পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পাট ও গম সম্পর্কে এ দেশ অনেকটা আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে।

ভারত হইতে পণ্য রপ্তানী

আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে মোট ৫৬৯

কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে ও ১৯৫০-৫১ সালে রপ্তানী হইয়াছিল যথাক্রমে ৭২৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার ও ৫৯৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার। পূর্ববর্তী দুই বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে রপ্তানীর অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পাটের দড়ি ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর আকস্মিক হ্রাসই মোট রপ্তানী হ্রাসের কারণ। ঐ একমাত্র দ্রব্যেই রপ্তানী হ্রাসের পরিমাণ ১৪০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের রপ্তানী-মূল্যও উল্লেখযোগ্য রকমে কমিয়াছে।

১৯৫২-৫৩ সালে ভারত হইতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে—

পাটজাত দ্রব্য	১২৯ কোটি	৫৩ লক্ষ	টাকা
চা	৮০ ,,	৯৮ ,,	,,
কার্পাস সূতা ও কার্পাস-জাত দ্রব্য	৭০ ,,	০৭ ,,	,,
কার্পাস	২৮ ,,	৯৪ ,,	,,
বিবিধ তৈল	২৭ ,,	৭৭ ,,	,,
মশলা	২০ ,,	৯৫ ,,	,,
ম্যাঙ্গানীজ	২০ ,,	৭৭ ,,	,
চামড়া	২০ ,,	৫৮ ,,	,,

১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ কম—

পাটজাত দ্রব্য	১৩০ কোটি	৬৩ লক্ষ	টাকা	কম
চা	১২ ,,	৮৮ ,,	,,	,,
মশলা	৯ ,,	৮৫ ,,	,,	,,
আটা, ধুনা, লাক্ষা	৭ ,,	৯৮ ,,	,,	,,
তামাক	৭ ,,	৩৪ ,,	,,	,,
বিবিধ বীজ	৩ ,,	৩৮ ,,	,,	,,
চামড়া	৫ ,,	২৭ ,,	,,	,,
অভ্র	৪ ,,	২২ ,,	,,	,,

১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত দ্রব্যের রপ্তানী বেশী ছিল—

কার্পাস সূতা ও কার্পাসজাত দ্রব্য	১ কোটি	৪২ লক্ষ	টাকা	বেশী
কাঁচা কার্পাস ও ছাঁট	৭ ,,	৯২ ,,	,,	,,
ম্যাঙ্গানীজ	৫ ,,	৮ ,,	,,	,,
বিবিধ তৈল	২ ,,	৫ ,,	,,	,,
ফল ও শাক-সবজি	— —	৮১ ,,	,,	,,

বাণিজ্যের গতি

১৯৫২-৫৩ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল। ভারতের পণ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে অধিক গিয়াছিল এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় ঐ দুইটি দেশ হইতে অধিক মাল ভারতে আমদানী হইয়াছিল।

১৯৫১-৫২ সালে অন্যান্য দেশের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পণ্য আমদানী হইয়াছিল। ঐ সালে ৬৫৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী হইয়াছিল ১৮১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার পণ্য। উহা পূর্ববর্তী বৎসরের আমদানীর তুলনায় ১০৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা কম, কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ৬৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৫০-৫১ সালে অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটেন হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের পণ্য ভারতে আসিয়াছিল। এই বৎসরে বৃটেন হইতে আমদানীর পরিমাণ ১৫৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ১৩৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে বৃটেন হইতে আমদানীর পরিমাণ ছিল শতকরা ১৬'৮ ভাগ এবং আলোচ্য বৎসরে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ২১'১ ভাগ। মূল্য ও শতকরা হিসাবে পাকিস্তান হইতে পণ্য আমদানীর পরিমাণ কমিয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে পাকিস্তান হইতে পণ্য আমদানীর পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (শতকরা ৯'৫), ১৯৫২-৫৩ সালে উহা কমিয়া হয় ২১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা (শতকরা ৩'৩)। মিশর হইতে আমদানীর

পরিমাণও ৪০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা (শতকরা ৪ ৩) হইতে কমিয়া ১৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা (শতকরা ২.৩) হয়। জাপানী পণ্য আমদানীর পরিমাণও ২৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা (শতকরা ২.৬) হইতে কমিয়া ১৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা (শতকরা ২.৪) হয়।

পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত দেশসমূহ ভারতের পণ্য অধিক পরিমাণে কিনিয়াছিল

ক্যানাডা	১০ কোটি	৫০ লক্ষ	টাকা	বেশী
ব্রহ্ম	৩ "	১১ "	"	"
কেনিয়া উপনিবেশ	১ "	৯৭ "	"	"
বাহেরিন দ্বীপপুঞ্জ	৮ "	৫৫ "	"	"
ফ্রান্স	২ "	৫১ "	"	"
সৌদি আরব	৪ "	৬৯ "	"	"

শতকরা হিসাবেও এই সকল দেশের অংশ বেশী।

আলোচ্য বৎসরে অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটেন ভারতীয় দ্রব্য বেশী কিনিযাছিল। এদিক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান বৃটেনের ঠিক পরে ও খুব কাছাকাছি। ভাবত হইতে মোট ৫৬৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১২১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকাব পণ্য বৃটেনে গিয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে ৭২৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার রপ্তানীকৃত পণ্যের মধ্যে ১৮৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার পণ্য বৃটেনে গিয়াছিল। আমেরিকায় রপ্তানীকৃত ভারতীয় পণ্যের পরিমাণ ১৯৫১-৫২ সালের ১৩০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ১৯৫২-৫৩ সালে ১১১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু শতকরা হিসাবে উহা ১৭.৮ হইতে বাড়িয়া ১৯.৫ হইয়াছিল। পাকিস্তানেও ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর মূল্যও শতকরা হিসাবের দিক দিয়া কমিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ায়ও পণ্য রপ্তানী কমিয়াছিল। উহা ১৯৫১-৫২ সালেব ৪৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা (শতকরা ৬.৪) হইতে কমিয়া ১৯৫২-৫৩ সালে ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা (শতকরা ২.৭) হইয়াছিল। আর্জেন্টিনায় পণ্য রপ্তানী ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া আলোচ্য বৎসরে ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা হইযাছিল।

নিম্নলিখিত দেশে আলোচ্য বৎসরে পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বাড়িয়াছিল—

জাপান	১৬ কোটি	৮০ লক্ষ	টাকা
ব্রহ্ম	২ "	৪৭ "	"
সিংহল	২ "	৭৮ "	"
সিঙ্গাপুর	৩ "	৫৫ "	"
পশ্চিম জার্মানী	৩ "	৬৭ "	"
ইটালি	৩ "	৫৪ "	"
নেদারল্যাণ্ড	২ "	৩১ "	"
এডেন ও অন্যান্য অঞ্চল	৩ "	— —	"

আলোচ্য বৎসরে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য হইয়াছিল ৮২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার। ১৯৫১-৫২ সালে ঐ পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ডলার এলাকা সম্পর্কে আলোচ্য বৎসরে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। ১৯৫১-৫২ সালে ঐ পরিমাণ ছিল ১৩৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। সুলভ মুদ্রা অঞ্চল সম্পর্কে বলা যায় যে ঘাটতির পরিমাণ ১৯৫১-৫২ সালের ৬২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ১৯৫২-৫৩ সালে ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারে সম্ভাব্য বিপদ

নিউইয়র্কের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাইজিন ডিপার্ট-মেণ্টের মিঃ হ্যারিস বলেন, আজকাল পারমাণবিক যুগে মানুষের দেহ তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিপজ্জনক বিকিরণে উন্মুক্ত হইবার সম্ভবনা দেখা দিয়াছে। বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ধাতব পদার্থের জোড় বা ঢালাইয়ের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরীক্ষার জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে। ঐ সব কার্যের জন্য অনেক সময় অনভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। দেহের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া এবং ঐ সব পদার্থ ব্যবহারের সময় কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ।

মিঃ হ্যারিস বলেন, ক্রমাগত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে আসিবার ফলে দেহের মধ্যে দিনের পর দিন উহা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। মানুষের দেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অনুভব করিবার শক্তি না থাকায় অজ্ঞাতে উহা গুরুতর মাত্রায় দেহের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মারাত্মক হইতে পারে।

মক্ষিকার ডি. ডি. টি-প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণ

ইলিনয়েস ইউনিভার্সিটির বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি সাধারণ মক্ষিকার ডি. ডি. টি.-প্রতিরোধ ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছেন। কীট-বিশেষজ্ঞ ডাঃ কার্ণস্, স্টার্ণবার্গ এবং ভিন্সন লক্ষ্য করেন যে, ঐ মক্ষিকাগুলি বংশানুক্রমে এক প্রকার এনজাইম সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লাভ করে। ঐ এনজাইমের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডি. ডি. টি বিশ্লিষ্ট হওয়ায় উহার আর বিষক্রিয়া থাকে না। বিজ্ঞানীরা মক্ষিকার দেহ হইতে এনজাইমটি মিশ্রিত অবস্থায় পৃথক করিয়াছেন এবং টেষ্ট টিউবের মধ্যে ডি. ডি. টি'র উপর উহার রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি কৃত্রিমভাবে যথাযথ পর্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ছয় শত মক্ষিকা হইতে বিজ্ঞানীরা প্রায় আধ সি. সি. এনজাইম সংগ্রহ করেন। এনজাইমটি অতি সহজেই বিকৃত হইয়া যায় বলিয়া বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনের পরিবেশে এবং শূন্য ডিগ্রি তাপে উহা নিষ্কাশন করা হয়।

আলোকরশ্মির বক্রগতি

তারকা হইতে আলোকরশ্মি মহাশূন্যের মধ্য দিয়া পৃথিবী পর্যন্ত আসিবার সময় কোন কোন অবস্থায় সরল পথে না আসিয়া কিছু বাঁকিয়া আসে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ন্যাশন্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটির একদল গবেষক ১৯৫২ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারি অ্যাংলো ইজিপ্‌সিয়ান সুদানে সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় সূর্যের নিকটবর্তী কতকগুলি তারকার ফটোগ্রাফ তোলেন। ঐ ফটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তারকা হইতে নির্গত আলোক রশ্মি অভিকর্ষের প্রভাবে ভারযুক্ত পদার্থের ন্যায় বাঁকিয়া যায়।

অনেক দিন পূর্বে ডাঃ অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন বলিয়াছিলেন, যে তারকাগুলির রশ্মি সূর্যের অভিকর্ষ-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিবে সেইগুলির অবস্থিতি দৃশ্যতঃ স্থানান্তরিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং ইহাই তাঁহার রিলেটিভিটি মতবাদের অন্যতম প্রমাণ হইবে। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, কোন রশ্মি সূর্যের খুব নিকট দিয়া আসিলে

উহার বক্রতার পরিমাণ হইবে বৃত্তাংশের ১·৭৫ সেকেণ্ড।

ন্যাশন্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটির পূর্ণগ্রহণ অভিজানের নেতা ডাঃ বায়েসব্রোয়েক বাস্তব ক্ষেত্রে পরিমাপ করিয়া দেখাইয়াছেন, ঐ বক্রতার পরিমাণ ১·৭০ সেকেণ্ড। তিনি ইয়েল অবজার-ভেটরীতে একটি ত্রুটিবিহীন সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে এই পরিমাপ করিয়াছেন। এই যন্ত্র সাহায্যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় কতকগুলি তারকার ফটোগ্রাফ তোলা হয় এবং একই স্থানে ছয় মাস চার দিন পরে ১৯৫২ সালে ২৯শে অগাষ্ট রাত্রিতে দ্বিতীয়বার ঐ তারকাগুলির ফটো তোলা হয়। পরে উভয় ফটো মিলাইয়া তারকাগুলির বাস্তব অবস্থিতি এবং গ্রহণের সময়ের দৃশ্যমান অবস্থিতি নির্ণয় করা হয়।

কেবল পূর্ণগ্রহণের সময়েই সূর্যের আশেপাশের তারকাগুলির ফটো লওয়া সম্ভব। সূর্যের করোনার আলোকচ্ছটার প্রতিক্রিয়া রোধ করিবার জন্য বিশেষ ধরনের ফটোগ্রাফির প্লেট ব্যবহার করা হয়। আবার সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবশূন্য অবস্থায় ছবি তুলিবার জন্য একই তারকার হুবহু একই আপেক্ষিক স্থানে রাত্রিতে ফটো লওয়া হয়।

অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি অপসারণে অত্যাশ্চর্য ফল

আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির এক খবরে প্রকাশ, কোন বিশেষ ধরনের চিকিৎসায় নূতন পদ্ধতিতে দেহ হইতে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি অপসারণ করিবার পর অত্যাশ্চর্য ফল দেখা গিয়াছে। রোগের চরম অবস্থায় যখন কোন উপায়ান্তর ছিল না, তখন এই অস্ত্রোপচারের ফলে অর্ধেক সংখ্যক রোগী যে কেবল মাত্র উপকৃত হইয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু মানুষের জীবন ও মনের উপর এই গ্রন্থির অপ্রত্যাশিত প্রভাবের কথাও জানা গিয়াছে।

শিকাগো ইউনিভার্সিটির ডাঃ হাগিন্‌স্‌ এইরূপ আশীটি অস্ত্রোপচার করিয়া পর্যবেক্ষণের ফল প্রকাশ করিয়াছেন—

১। বক্ষ এবং প্রস্টেটের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের অর্ধেক সংখ্যক এই অস্ত্রোপচারে উপকৃত হইয়াছে; কিন্তু দেহের অন্যস্থানে ক্যানসার আক্রমণে ইহা কার্যকরী হয় নাই।

২। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি হইতে প্রায় ছাব্বিশ প্রকার হরমোন নিঃসৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র কর্টিজোন হরমোন বটিকাকারে নিয়মিত সেবন করিলে অ্যাড্রিন্যালবিহীন ব্যক্তি সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনযাপন করিতে পারে। ইতিপূর্বে অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি দেহ হইতে বিযুক্ত হইলে রোগীর বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত না।

৩। অ্যাড্রিন্যালবিযুক্ত রোগীর মানসিক উত্তেজনা কদাচ দেখা যায়। পূর্বে যাহারা ক্রোধপ্রবণ ছিল এখন তাহারা অনেক শান্ত এবং ধীরভাবে জীবনযাপন করে। পূর্বে যে সব বিষয়ে তাহারা ভীত হইত এখন নির্ভয়ে সে সব বিষয়ের সম্মুখীন হইয়া থাকে। মানসিক উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়।

৪। প্রস্টেটের ক্যানসারযুক্ত কতকগুলি পুরুষ রোগীর চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল। এই অস্ত্রোপচারের পর তাহাদের চুল গাঢ় ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

এক্স-রে'র প্রভাবে শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা

নিউ ইয়র্কের প্রেটেক্স পার্ক রিসার্চ ইনষ্টি-টিউট হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, শিশুদের দেহে এক্স-রে প্রয়োগের ফলে তাহাদের হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হইতে পারে। বোস্টনের চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ মেডিক্যাল সেণ্টারে পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে, ক্যানসার নিরাময়ের উদ্দেশ্যে যে সব শিশুদের দেহে কয়েক বৎসর পূর্বে এক্স-রে প্রয়োগ করা হয়েছিল তাহাদের মেরুদণ্ডের বৃদ্ধির

অবনতি ঘটিয়াছে। 'রেডিয়োলজির' এক সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, এক্স-রে প্রয়োগে দেহের ত্বক, রক্ত ও জননেন্দ্রিয়ের ক্ষতি হইবার সম্ভবনার কথা পূর্বে জানা ছিল। উপরন্তু, অস্থি-র উপর ইহার কুফল পরিদৃষ্ট হওয়ায় এখন হইতে অতি সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া শিশুদের দেহে এক্স-রে প্রয়োগ করা সমীচীন হইবে।

ফলসম্ মানবের অস্তিত্বকালের পুণর্নির্ণয়

নৃতত্ত্ববিদদের এক সভায় টেক্সাস্ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ক্রাইজার বলেন, ১৫০০০ বৎসর পূর্বেও আমেরিকায় মানুষ বাস করিত এবং বন্য জন্তু শিকার করিয়া জীবনযাপন করিত। বিশেষজ্ঞেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ফলসম্ মানবই ঐ মহাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী। অধুনা বিলুপ্ত একপ্রকার বাইসনের দেহাবশেষের সহিত ফলসম্ মানবের ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ ধরনের পাথরের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, ফলসম্ মানব ১০০১০ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিল, তেজস্ক্রিয় কার্বন পর্যবেক্ষণ করিয়াও এই অনুমান সমর্থিত হইয়াছে।

কেবল মাত্র বিশেষ ধরনের অস্ত্রের নিদর্শন হইতেও আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন—ক্লোভিস্ ফ্লাটেড্ পয়েন্ট নামে এক বিশেষ ধরনের বর্শা ফলক। ফ্লাটেড্ পয়েন্টের সহিত যে সব জন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি প্রায় সবই অতিকায়। প্রায় ১৫০০০ বৎসর পূর্বে ঐ সব জন্তু আমেরিকায় বিচরণ করিত।

শিশুদের সর্দিজ্বরে সাল্‌ফা ড্রাগ বা অ্যান্টিবায়টিক প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন

শিকাগো চিল্‌ড্রেন্‌স্ মেমোরিয়াল হাসপাতালের ডাঃ ট্রেইস্‌ম্যান ও হার্ডি, ইলিনয়েস ষ্টেট মেডিক্যাল সোসাইটির এক সভায় বিবৃতি দেন যে, শিশুদের সর্দিজ্বরের প্রথম অবস্থায় সাল্‌ফা ড্রাগ বা অ্যান্টিবায়োটিক সহযোগে চিকিৎসা না করিয়া কেবল মাত্র শয্যায় শয়ন করাইয়া অধিক পরিমাণে তরল খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা আরোগ্য লাভ করে।

১৫৯টি শিশু-রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া তাহারা এই বিবৃতি দেন। রোগীদের চার ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগকে পূর্বপ্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় এবং অবশিষ্ট তিন ভাগকে উহার সহিত একটি সাল্‌ফা ড্রাগ বা একটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। রোগীরা সকলেই সর্দিতে ভুগিতেছিল এবং তাহাদের দেহের তাপ দুই দিন যাবৎ ১০১° ছিল।

ডাক্তারেরা দেখেন, ঐ ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে সর্দিজ্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপসর্গ প্রথমে কিছুদিন স্থগিত থাকে বটে, কিন্তু পরে ঐ সব উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই কারণেই সাল্‌ফা ড্রাগ ও অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসিত রোগীদের আরোগ্য লাভ করিতে বেশী সময় লাগে।

ডাঃ হার্ডি বলেন, ডাঃ ট্রেইস্‌ম্যানের মতের সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্যেই প্রধানতঃ এই পরীক্ষাটিতে হাত দেওয়া হয়। ডাঃ ট্রেইস্‌ম্যানের ধারণা ছিল, সাধারণতঃ সর্দিজ্বরে আক্রান্ত শিশুদের কেবল মাত্র শয্যায় বিশ্রাম করিতে দিলে এবং তরল খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া কিছু অ্যাসপিরিন প্রয়োগ করিলে পাঁচটির মধ্যে চারটি আরোগ্য লাভ করে। শতকরা পাঁচ বা ছয় জনের হাম বা ঐ জাতীয় কোন সংক্রমণ প্রকাশ পায়। বাকীগুলির অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব; যেমন—কানের বা গলার গ্রন্থির কোন সংক্রমণ অথবা ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া বা মেনিন্‌জাইটিস্।

শিকাগোর ডাক্তারদ্বয়ের মত এই যে, সর্দিজ্বরে সাল্‌ফা ড্রাগ বা অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ

মোটেই অনুকূল ফলপ্রসূ হয় না। উহা প্রয়োগে আসল রোগ সাময়িকভাবে চাপা থাকে এবং রোগ নির্ধারণের পক্ষেও বাধা সৃষ্টি হয়।

শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বারো বৎসরের বালক পর্যন্ত কয়েক শত রোগী লইয়া আরও বিশদভাবে এই পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ক্ষত-নিরাময়কারী ভিটামিন

বর্তমানে ভিটামিন বি$_{12}$ পানিসাস্ অ্যানিমিয়া রোগ নিরাময়ে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে হয়তো অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর দেহে বা আহত সৈন্যদের দেহে এই ভিটামিন প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন হইবে। ইহার কারণ এই যে, দেহের যে কোন ক্ষত, বিশেষতঃ উহার প্রথম অবস্থায় এই ভিটামিনের সাহায্যে অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির কলেজ অফ ফিজিসিয়ান্স্ অ্যাণ্ড সার্জন্স্-এর ডাঃ ফিণ্ডলে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অল্প বয়স্ক প্রাণীদের দৈহিক বৃদ্ধির পক্ষে ভিটামিন বি$_{12}$ বিশেষ সাহায্য করে বলিয়া জানা গিয়াছে। কয়েকজন গবেষক অনুমান করেন, এই ভিটামিন দেহে প্রোটিন সংশ্লেষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এবং ক্ষত-নিরাময়ে শরীরের প্রোটিনের বিশেষ প্রয়োজন জানা থাকায় ডাঃ ফিণ্ডলে এই পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

পরীক্ষাধীন ইঁদুরগুলিকে প্রয়োজনীয় প্রোটিন খাদ্যের সহিত ভিটামিন বি$_{12}$ প্রয়োগ করায় অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের ক্ষতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভিটামিনটি অস্ত্রোপচারের পূর্বে বা পরে প্রয়োগে উহার কার্যের কোন তারতম্য হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু উপযুক্ত প্রোটিন খাদ্যের অভাব ঘটিলে এই ভিটামিন ক্ষত নিরাময়ে কার্যকরী হয় না।

অভিনব উপায়ে লেরিংস্-এর ক্যানসার চিকিৎসা

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির লস্ এঞ্জেল্স্ মেডিক্যাল স্কুলে লেরিংস-এর ক্যানসারের অস্ত্র-চিকিৎসার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় আশা করা যায়, ঐ রোগে আক্রান্ত রোগীরা অস্ত্রোপচারের পর স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে ও কথা বলিতে সমর্থ হইবে।

ইতিপূর্বে, ক্যানসারঘটিত মাংসপিণ্ড অপসারণের জন্য সমস্ত লেরিংস্‌টিকে বিচ্ছিন্ন করা হইত। কাজেই শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য গলার ভিতর একটি ছিদ্র করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইত। ইহার ফলে সাধারণতঃ রোগীর বাকশক্তি থাকিত না। কেহ কেহ অবশ্য পাকস্থলীর সাহায্যে ক্ষীণ ও অস্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারিত। এইভাবে কথা বলার ক্ষমতা বিশেষ অভ্যাসসাপেক্ষ। ইহাতে পাকস্থলীর মধ্যে বাতাস সংগ্রহ করিবার পরে গলার ভিতর দিয়া উদ্গার করিয়া শব্দ যন্ত্রটিকে কম্পিত করা হয়।

বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ প্রেসম্যান যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাতে লেরিংস্‌টিকে অপসারণ করিয়া পরে রোগীর দেহের অপর স্থান হইতে সুস্থ কার্টিলেজ সংগ্রহ করিয়া উহা পুনর্গঠন করা হয়। ডাঃ প্রেসম্যান বলেন, লেরিংস্ পুনর্গঠিত হওয়ায় রোগী প্রায় স্বাভাবিকভাবেই কথা বলিতে ও শ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতে পারে।

কাণ্ডের নিম্নাংশের পাতার উপর প্রয়োগে ২, ৪ ডি-র ধ্বংসকারী শক্তি বৃদ্ধি

তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ লইয়া গবেষণা করিয়া জানা গিয়াছে, কাণ্ডের নিম্নাংশের পাতার উপর প্রয়োগে ২, ৪-ডি-র ধ্বংসকারী শক্তি অধিকতর দ্রুত গতিতে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির এগ্রিকাল্চারের প্রোফেসর মিঃ ক্রাফ্ট্স্, বিন্ ও মর্নিং-গ্লোরির গাছে তেজস্ক্রিয় ২, ৪-ডি প্রয়োগ করিয়া এক্স-রে ফিল্ম সাহায্যে উদ্ভিদ দেহে ইহার গতিবিধি অনুসরণ করেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত উদ্ভিদের কাণ্ডের নিম্নাংশের পাতার উপর প্রয়োগ করিলে ২, ৪-ডি অল্প সময়ের মধ্যেই শিকড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া উদ্ভিদটির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করে। উপর দিকের অংশে প্রয়োগ করিলে কেবল ডগাটি নষ্ট হয়, কিন্তু শিকড়ের অংশ অটুট থাকায় উহা আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। মিঃ ক্রাফ্ট্স্ আরও দেখেন যে, বাড়ন্ত চারাগাছে উপরের সব অংশ হইতেই ২, ৪-ডি শিকড়ে চলিয়া যায়। তাঁহার মতে, ঐরূপ অবস্থাতেই আগাছার উপর ২, ৪-ডি-র ব্যবহার প্রকৃষ্ট।

ট্রিপারস্যামাইড

আফ্রিকায় পোকামাকড়ের কামড়ের ফলে স্লিপিং সিক্নেস বা নিদ্রারোগ নামে একটি সাংঘাতিক রোগে পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকার মনুষ্য ও জীবজন্তু আক্রান্ত হইয়া থাকে। মার্কিন মহিলা জীবতত্ত্ববিদ ডাঃ লুই পিয়ার্স ট্রিপার-স্যামাইড নামে এই রোগের একটি ঔষধ আবিষ্কার করায় বেলজিয়াম সরকার তাঁহাকে আফ্রিকার কঙ্গোতে যাইয়া গবেষণা করিবার জন্য ১০ হাজার ডলার এবং ক্রস অব দি বেলজিয়াম রয়েল অর্ডার অব দি লায়ন দ্বারা পুরস্কৃত করিয়াছেন।

যক্ষ্মারোগে হাইড্রোজেথাইল সালফোন

হাইড্রোজেথাইল সালফোন একটি নূতন সংশ্লেষিত ভেষজ হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক-বর্গ ৫৭টি যক্ষ্মারোগীর উপর প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। যক্ষ্মারোগ চিকিৎসায় ষ্ট্রেপটোমাইসিনের মত ইহাও বিশেষ কার্যকরী হইবে। সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের মূল গবেষণা কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ-এ এই ঔষধটি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

"কিসে কি হইতেছে, কিসের পর কি ঘটিতেছে, কখন কি ঘটিতেছে ইহা বসিয়া বসিয়া দেখা এবং এই দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে জীবনযুদ্ধের কাজে লাগান বৈজ্ঞানিকের এইমাত্র কার্য্য। মনে করিও না যে, বগলে থার্মোমিটার ও চোখে দূরবীণ না লাগাইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। ষ্টীম ইঞ্জিন, ডায়নামো আর মোটর গাড়ী, গ্রামোফোন দেখিয়া ভুল বুঝিও না যে, যন্ত্রতন্ত্রের বহ্বাড়ম্বর না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। বসিয়া বসিয়া জগদ্‌যন্ত্রের গতিবিধির আলোচনা ও সেই আলোচনাকে আপন জীবনযাত্রায় নিয়োগ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়। এই অর্থে আমরা সকলেই ছোট-বড় বৈজ্ঞানিক।"

—রামেন্দ্রসুন্দর—

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ অষ্টম সংখ্যা
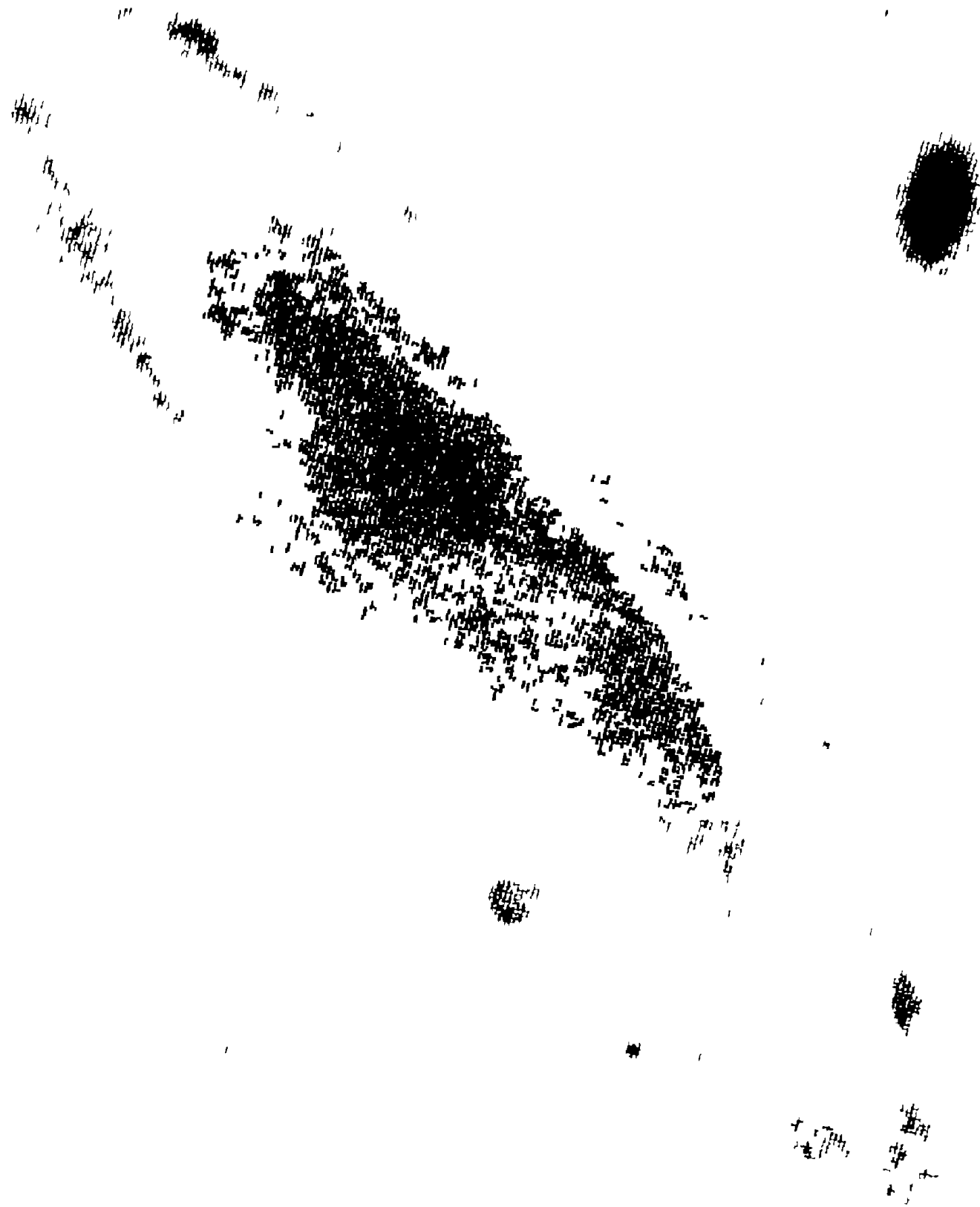
অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা।

পূর্বে জানা ছিল, নীহারিকাটি পৃথিবী থেকে এক মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত : কিন্তু প্যালোমার অবজারভেটরীর ২০০" টেলিস্কোপের সাহায্যে এখন জানা গেছে যে, পৃথিবী থেকে এই নীহারিকাটির দূরত্ব দু' মিলিয়ন আলোকবর্ষ

করে দেখ

মজার আলোকচিত্র

তোমরা জান, আলোকচিত্রের নিগেটিভের সাহায্যে যে কোন প্রতিকৃতি, হাতে-আঁকা ছবি বা লেখা ইত্যাদি যত খুসী ছাপা যেতে পারে। কিন্তু ক্যামেরার সাহায্য না নিয়েও ছবি বা লেখা ইত্যাদি ছাপবার জন্যে আজ আমি তোমাদের এক মজার আলোকচিত্রের কথা বলব। এই ব্যবস্থায় তোমরা হাতের লেখা বা ছবি যতবার খুসী অনায়াসেই ছাপতে পারবে।

(১) প্রথমে পরিষ্কার কাচের উপর কালো রং বা কালো কালি দিয়ে (যেন ঐ রং বা কালি কিছুক্ষণ বাদে কাচের উপর শুকিয়ে যায়) নক্সা, ছবি বা যা ইচ্ছা এঁকে নাও। কাচের উপর ঐ আঁকা ছবি বা লেখা শুকিয়ে গেলে সেই কাচখানি রেখে দাও।

(২) ডাক্তারখানা থেকে কয়েকটা সিলভার নাইট্রেট ষ্টিক কিনে আন। দেখবে, এই ষ্টিকগুলির উপর কালো কাগজ জড়ানো আছে। অল্প আলো আছে এমন একটি জায়গায় ঐ ষ্টিকের উপরের কাগজ খুলে ফেল। ভিতরে সাদা পেন্সিলের মত একটি জিনিষ দেখতে পাবে। এখন এক আউন্স পরিমাণ পরিষ্কার জলে ঐ একটি ষ্টিকের ¼ ভাগ গুলে ফেল। এরপর একটু গোলা গঁদের আঠা ঐ সিলভার নাইট্রেটের জলে মিশিয়ে দাও।

(৩) তোমার কাচের আকারের কতকগুলি সাদা কাগজ নাও। ব্রাস দিয়ে অথবা আঙুল দিয়ে কাগজগুলির এক পিঠে সিলভার নাইট্রেট সলিউসন মাখিয়ে ফেল। প্রতিবার সলিউসনে ব্রাস বা আঙুল ডোবাবার সময় ঐ সলিউসনটাকে ভালভাবে গুলিয়ে নেবে। সলিউসন মাখানো হয়ে গেলে কাগজগুলিকে হাওয়াতে শুকিয়ে নাও।

(৪) এইবার তোমার ঐ কাচের চার কোণে অল্প করে আঠা লাগাও। সলিউসন মাখানো একখানা কাগজ নিয়ে সলিউসনের দিকটা কাচের দিকে রেখে কাচের সঙ্গে এঁটে দাও। এইবার ঐ কাচটিকে সূর্যের দিকে মুখ করে রোদে বসিয়ে দিতে হবে। রোদ লাগবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে, কাগজের রং বাদামী হতে আরম্ভ করেছে। যখন দেখবে কাগজের সব সাদা অংশই ঘোর বাদামী হয়ে গেছে তখন কাচ থেকে কাগজটা খুলে নেবে।

দেখবে ঘোর বাদামী রঙের মধ্যে ঐ কাচের লেখাগুলি সুন্দরভাবে সাদা রঙে আঁকা রয়েছে। ৪নং প্রণালীতে যখন রোদ লাগাতে বলেছি তখন ছাড়া এই জিনিষের কোন কাজ তীব্র রোদে করবে না। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, ঐ কাগজের যেখানে

যেখানে রোদ পড়েছে সেই সেই জায়গার রং বাদামী হয়ে গেছে; বাকী জায়গা পূর্বের মতই সাদা রয়েছে। এবার কাগজখানাকে জলে ডুবিয়ে বার কয়েক নেড়েচেড়ে তুলে নাও। তাহলে যে সব জায়গায় কালো বা বাদামী রং ধরে নি, সে সব জায়গার সিলভার নাইট্রেট ধুয়ে যাবে এবং ছবিটি আলোয় এনে দেখতে পারবে।

শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লী-দৃশ্য
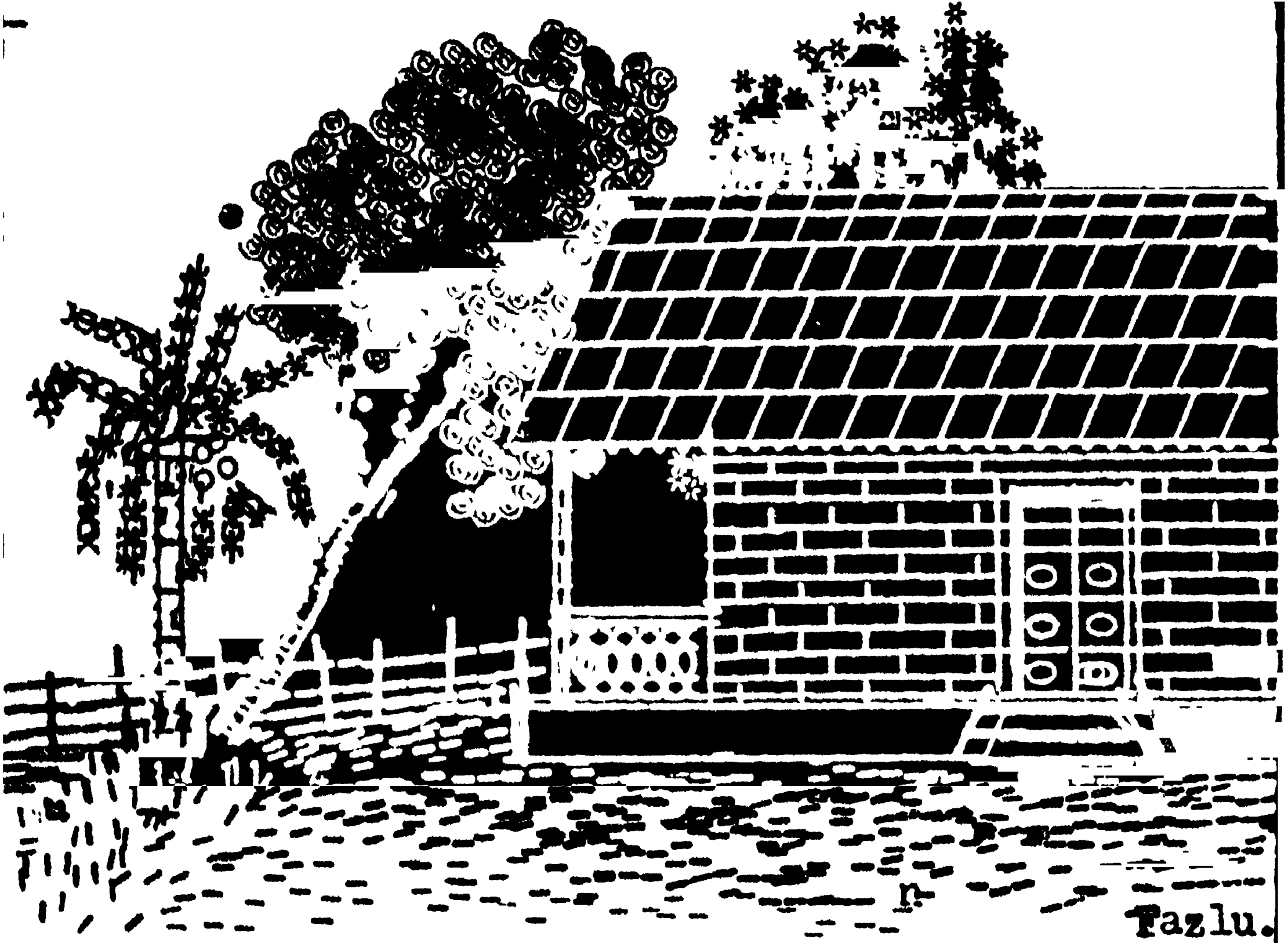
উপরের ছবিখানাকে হঠাৎ দেখে হাতে-আঁকা ছবি বলেই মনে হয়। আসলে কিন্তু ছবিখানা হাতে-আঁকা নয় মোটেই, একটু নজর দিলেই দেখতে পাবে, টাইপ রাইটারের সাহায্যে ছবিখানি আঁকা হয়েছে। ছবিখানি তৈরী করেছে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র, কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরের উৎসাহী কর্মী শ্রীমান ফজলুল রহমান। কিছুকাল আগে এরই হাতে-আঁকা কয়েকখানি ছবি কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে প্রকাশিত হয়েছিল। তোমরাও চেষ্টা করে দেখো—এরকমের ছবি তৈরী করতে পার কি না! —স—

জেনে রাখ

সিন্দ্রিতে কয়েকদিন

১৯৫৩ সাল, ১২ই মে—বাস চলতে আরম্ভ করলো। পেছনে পড়ে রইলো ধানবাদ—ঝরিয়ার মধ্য দিয়ে ছুটে চললো গাড়ি। আশেপাশে অজস্র কয়লার খনি। বিহারের সবচেয়ে কয়লা উৎপাদক অঞ্চল এই ঝরিয়া। সারা ভারতবর্ষ ঝরিয়ার দিকে চেয়ে আছে তার কয়লার জন্যে। তবে ঝরিয়াকে হার মানিয়েছে গিরিডি। গিরিডির মত ভাল কয়লা সারা ভারতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সিন্দ্রির কারখানাতে কয়লা যায় ঝরিয়া, ধানবাদ থেকে। শিল্পপ্রধান অঞ্চল ঝরিয়া—চারদিক কেমন নীরস, রুক্ষ বলে বোধ হলো। সন্ধ্যার ছায়াতে দেখতে পেলাম ফুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। পাঁচীল-ঘেরা বিরাট বাড়ী—দেখতে বেশ চমৎকার। রাস্তার ধার দিয়ে চলে গেছে জলের পাইপ—ধারে ধারে জলের Settling tank-এর একই দৃশ্য। যেন পৌনঃপুনিক দশমিকের অঙ্কের মত বারেবারেই ফিরে আসছে একই সংখ্যা।

১৩ই মে। আশ্চর্য নির্জন এই সহরটি। চারদিকে খোলামাঠ। পিছনে ক্ষীণ দামোদর। দু'পাশের বালুকাবন্ধ্যা চর। তার পাশে দামোদর বয়ে চলেছে আশীর্বাদের মত। কিছুদূরে দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা সমিতির লোকেরা তাঁবু ফেলেছে। এই দামোদর এই সহরের প্রাণ। তার জল শোষণ করে নিয়ে যাওয়া হয় Settling tank-এ, পরিস্রাবণ, পাতন ও আরো নানান ক্রিয়ার শেষে পাঠিয়ে দেওয়া হয় Reservior-এ। তারপর সেই পরিস্রুত জল পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী। কিছুদিন আগে সমস্ত জল শুকিয়ে গিয়েছিল দামোদরের। তখন অন্তর্বাহীজল (underground water) শোষণ করে আনতে হলো শক্তিশালী পাম্প দিয়ে। সেই কর্দমাক্ত জল সুপেয় করে তুলতে হচ্ছে এখানে।

১৫ই মে। ১১৪° ডিগ্রীর কোঠায় পারদস্তম্ভ কাল থমকে দাঁড়িয়েছিল। আরো ওঠার ইচ্ছা ছিল হয়তো। তাই কারখানা দেখতে যাওয়া হলো না। গরম বাতাস আর তামাটে আকাশের রোদ-বৃষ্টি ; তার মধ্যে যাওয়া কষ্টসাধ্য। আজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম তাই।

বহুদূর থেকে দেখা গেল, কারখানার লৌহ-শীর্ষ। প্রবেশপত্র দেখিয়ে ঢুকতে হয় কারখানার ভিতর। শোভন এবং সুদৃশ্য বিরাট কারখানা। ভিতরে রেল লাইন চলে গেছে—ট্রেণ আসছে কয়লা বোঝাই হয়ে। ডানদিকে জিপসাম-এর স্তূপ। এগুলি আনতে হয় যোধপুর অথবা পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানী মাল যোধপুরের মালের

চেয়ে ভাল বলেই জানা গেল। প্রতি মুহূর্তেই মন শুধু বিস্মিত হতে থাকে। যে বিরাট বিরাট ওয়াগন আসছে কয়লা বোঝাই হয়ে, যা খালি করতে সময় লাগে যথেষ্ট, পরিশ্রম করতে হয় অনেক—সেই ওয়াগন বৈদ্যুতিক ক্রেনের সাহায্যে উল্টে যাচ্ছে—কয়লাগুলো চলে যাচ্ছে নীচে। প্রতিদিন লাগে ১২ মিলিয়ন গ্যালন জল। খরাজলে (Hard water) কাজ সম্ভব হবে না। তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। তলা থেকে দেওয়া হচ্ছে প্রবল বেগ। উদ্দাম হয়ে সেই জলরাশি ঘূর্ণীর মত পাক খাচ্ছে—ভেসে উঠছে যা কিছু তলানি—আর পাশের অতি সূক্ষ্ম পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পরিস্রুত এবং পরিষ্কৃত জল বিদ্যুৎ-ঘরে। সেখানে ঘুরছে সব উদ্বাহু যন্ত্র। লোহার বেল্টগুলি কম্পিত হচ্ছে প্রচণ্ড আবেগে। প্রায়ান্ধকার ঘর। ৮০,০০০ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে এখানে। সেই বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেওয়া হয় আশেপাশের সহর থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত। অপচয় নেই বললেই হয়—মাত্র ৫% অপচয় হতে পারে।

বিদ্যুৎ-ঘর থেকে গেলাম অ্যামোনিয়া ফ্যাক্টরীতে। সমস্ত বাতাসে অ্যামোনিয়ার গন্ধ। বাতাস থেকে নেওয়া হয় নাইট্রোজেন। তার সঙ্গে হাইড্রোজেন মিশিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর উৎপাদন সম্ভব। অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরীর জন্যে সালফারের প্রয়োজন খুবই বেশী। কিন্তু সালফার ভারতে খুব কম। অথচ এখানে জিপসাম খরচ হচ্ছে প্রতিদিন প্রায় ১৮০০-১৯০০ টন। সব আনতে হয় বাইরে থেকে। জিপসাম স্তূপ প্রথমে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হয়। সেই চূর্ণিত স্তূপকে আবার আরও সূক্ষ্ম করে চূর্ণ করা হয়। তারপর জলীয় অ্যামোনিয়ার সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্রিয়া হয়। তৈরী হয় অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট। এর সঙ্গে এবার ক্রিয়া হয় জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেটের। নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং পরপর দু-বার বিন্যাস-চ্যুতির (Double Decomposition) শেষে বেরিয়ে আসে অ্যামোনিয়াম সালফেট তরল অবস্থায়। রসায়নশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে এর ফলটি এইভাবে লেখা যায়—

অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট+ক্যালসিয়াম সালফেট=অ্যামোনিয়াম সালফেট+ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।

এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে অপসারিত করা হয়। এখানে এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কাজে লাগাবার জন্যে সিমেণ্ট কারখানা খোলা হবে। তরল অ্যামোনিয়াম সালফেটকে পরে সংহত করে তার বাণিজ্যিক রূপ দেওয়া হয়।

দেখলাম কেমন করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে জিপসামের স্তূপ গ্রাইণ্ডিং মেসিনে। দেখলাম আরো কত সব—চক্-ফিল্টার, সল্ট-ফিল্টার ইত্যাদি। মন্থর গতিতে আবর্তিত হচ্ছে চাকাগুলি। কোথাও বা চলেছে ঘূর্ণী-নৃত্য। মাতালের মত কোথাও বা টল্‌ছে বিশালকায় যন্ত্র-দানব। তার ভিতরের উত্তাপ উঠেছে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তা ভাবাও যায় না।

গেলাম সাল্‌ফেট ষ্টোরেজ রুম অর্থাৎ সারের গুদাম ঘরে। প্যারাবোলিক অর্থাৎ অর্ধচন্দ্রাকার ছাদ। ভিতরে বেশীক্ষণ থাকা যায় না। সমস্ত দেহ সাদা হয়ে যায় সালফেটের গুঁড়ায়। বাতাস ভারী হয়ে আছে সালফেটে। বহু উঁচুতে এক-আধটা আলো জ্বলছে। ১৫০ ফিট বিস্তৃতি এই গুদাম ঘরের। উচ্চতা ৯০ ফিট। তাপনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এর মধ্যে। গঠনভঙ্গী ও স্থায়িত্বের দিক থেকে এরকম ঘর নাকি পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান পায়। এই প্যারাবোলিক গঠনের সুবিধা হলো দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব হয় সঞ্চয়নের সময়।

আর এক জায়গায় দেখলাম বস্তায় সার ভর্তি হচ্ছে। ছবির মতন চমৎকার কাজ হচ্ছে দ্রুত অথচ নিপুণভাবে। কারখানায় একতলায় একটি বোর্ডে লেখা আছে উৎপাদনের তালিকা। কয়েকটা তথ্য বাংলা করে দিলাম।

এ বছর আজ পর্যন্ত যা উৎপাদন হয়েছে	—	১১১১৫৪ টন
এ মাসে " " " " "	—	১৪০২১ টন
গত সপ্তাহে " " "	—	৬৪১৩ টন
প্রতিদিন গড়ে যা উৎপাদন হয় "	—	৯২০ টন

১৬ই মে। সিন্ধ্রিতে আজ আমাদের শেষ দিন। অদ্যই শেষ রজনী। আজ এসেছি সহরপুরায়। সিন্ধ্রির অনতিদূরে এই সহরপুরা। এখানে শিগ্‌গিরই একটি হাস-পাতাল হবে। রাজকুমারী অমৃতকাউর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন। কল্যাণকেন্দ্র বলে বাঙালীদের একটি অবসর বিনোদনের কেন্দ্র আছে সহরপুরায়। ফেরবার পথে চোখে পড়ল Bihar Engineering College-এর সুদৃশ্য বাড়ী। বৈদেশিক আগন্তুক এবং অতিথিদের জন্যে এখানে একটি বাড়ী তৈরী হয়েছে। হঠাৎ চোখ পড়লো দূর থেকে সিন্ধ্রিকারখানার দিকে। সে কি আলো! ওপরে আলোর শর কাঁপতে কাঁপতে নেমে এসেছে নীচে—বাতাসে কাঁপছে আলো। ছাড়িয়ে গেলাম সহরপুরা—ছাড়িয়ে গেলাম সিন্ধ্রি। পেছনে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম আলোময় কারখানা। দূর থেকে মনে হয় যেন সূত্রহীন একখানি মালা!

শ্রীশিশিরকুমার দাশ

রেডিও-টেলিস্কোপ

পৃথিবীর বাইরে বহুদূর থেকে অনেকটা ক্ষীণ রেডিও-তরঙ্গ অনবরত পৃথিবীতে এসে পড়ছে; কিন্তু সেই ক্ষীণ তরঙ্গের অস্তিত্ব সাধারণভাবে আমরা মোটেই উপলব্ধি
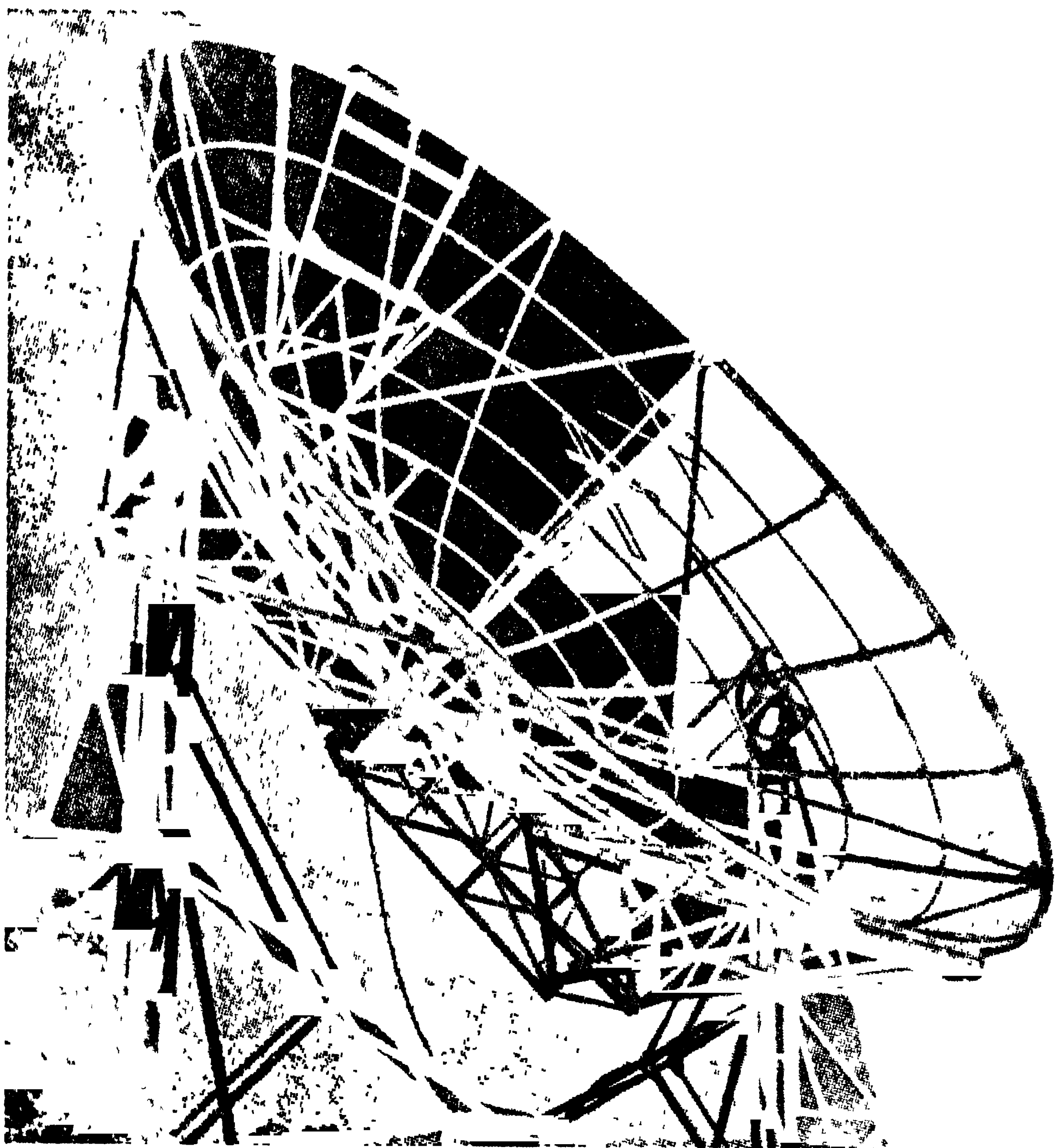
চেসায়ারের জোড্রেল ব্যাঙ্ক এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেসনের রেডিও-টেলিস্কোপ রিফ্লেক্টর। যুদ্ধের সময় এটা রেডার ডিটেক্টর হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সেটাকেই এখন টেলিস্কোপ-রিফ্লেক্টরে পরিবর্তিত করা হয়েছে

করতে পারি না। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের প্রাথমিক উপাদান মৌলিক কণিকাগুলি সর্বদাই গতিশীল অবস্থায় রয়েছে; এর ফলে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গরূপে তারা তেজ

বিকিরণ করে থাকে। এই বিকিরণ আমাদের কাছে সাধারণতঃ পরিচিত হয় তখন, যখন এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলোক এবং উত্তাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান হয়, যেভাবে কোন পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে উত্তপ্ত হলে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে থাকে। কিন্তু গতিশীল পরমাণু থেকেও তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হয় এবং সেগুলি যে রেডিও-গ্রাহক
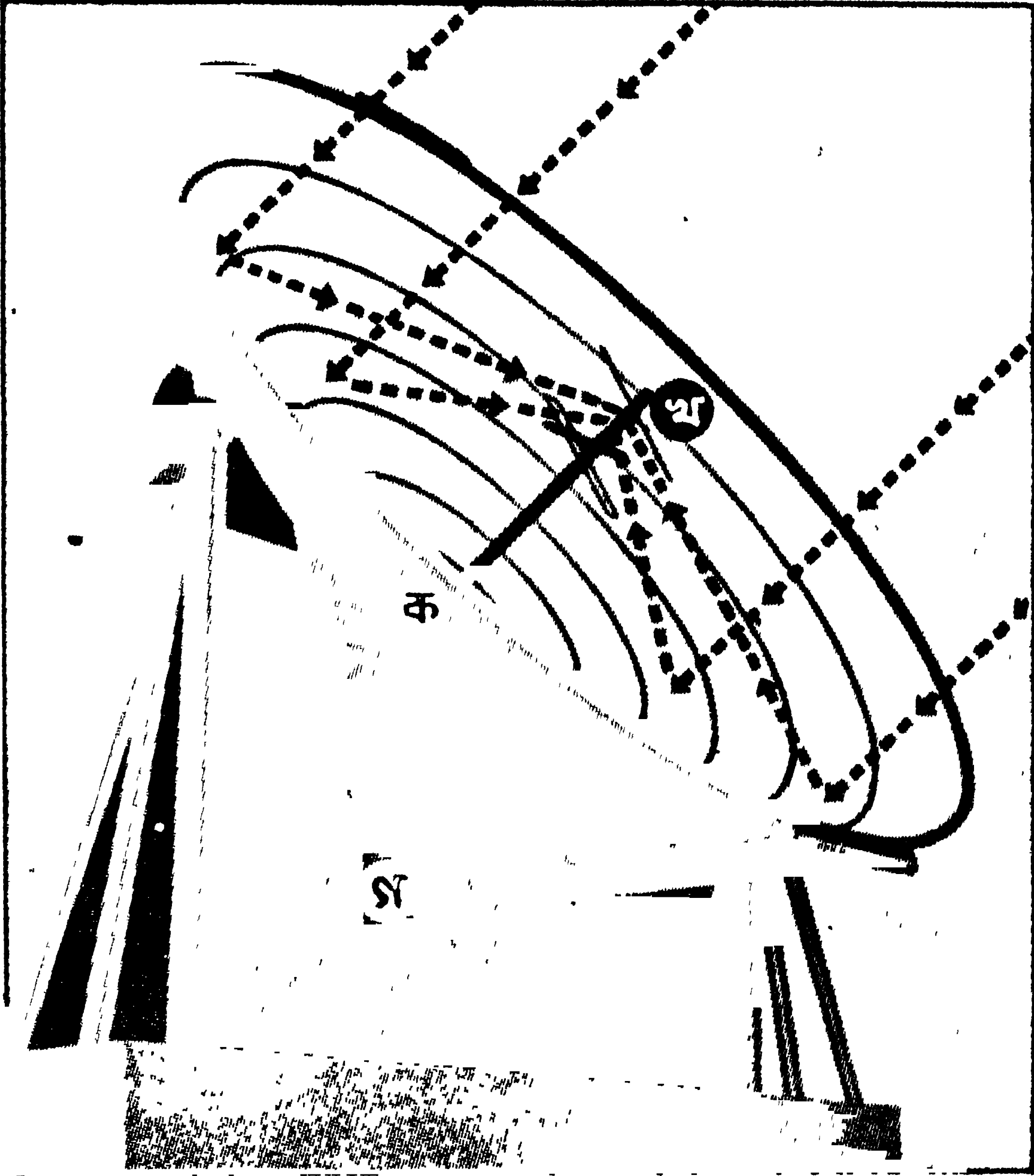
সুদূর জ্যোতিষ্ক থেকে শূন্যপথে আগত রেডিও-তরঙ্গ ক-চিহ্নিত হেলানো প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টরে সংগৃহীত হয় এবং খ-চিহ্নিত ফোকাসিং ইউনিটে সংহত হয়। সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে গ-চিহ্নিত তারের মধ্য দিয়ে রেডিও-গ্রাহক যন্ত্রে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে পরিবর্ধিত হয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়ে থাকে

যন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত হতে পারে, সে কথা তখন কিন্তু কেউ তেমনভাবে চিন্তা করে দেখে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেডিও কল-কৌশলের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

তার ফলে সুক্ষ্মানুভূতিশীল এমন রেডিও-গ্রাহক যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়, যার সাহায্যে অধিকতর শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হলে যে কোন পদার্থ থেকে বিকিরিত রেডিও-স্পন্দন সংগ্রহ ও পরিমাপ করা যায়।

বহু দূরস্থিত কোন জ্যোতিষ্ক থেকে আগত রেডিও-তরঙ্গসমূহ Beamed aerial system-এ সংগৃহীত হয়ে তাদের শক্তি ও বিভিন্ন পরিবর্তন পরিমাপের জন্যে সুক্ষ্মানুভূতিশীল গ্রাহক যন্ত্রে উপনীত হয়। এই এরিয়েল, রিসিভার এবং স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডার সমন্বিত সমগ্র ব্যবস্থাটাকেই রেডিও-টেলিস্কোপ বলা হয়।

যুদ্ধের সময় চেসায়ারের জোড্রেল ব্যাঙ্ক এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেসনে রেডার ডিটেক্টর হিসাবে ন্যুব্জপৃষ্ঠ বিরাট একটা প্রতিফলক ব্যবহৃত হতো। সেটাকেই এখন রেডিও-

নব-পরিকল্পিত বিশাল আকৃতির রেডিও-টেলিস্কোপের নমুনা
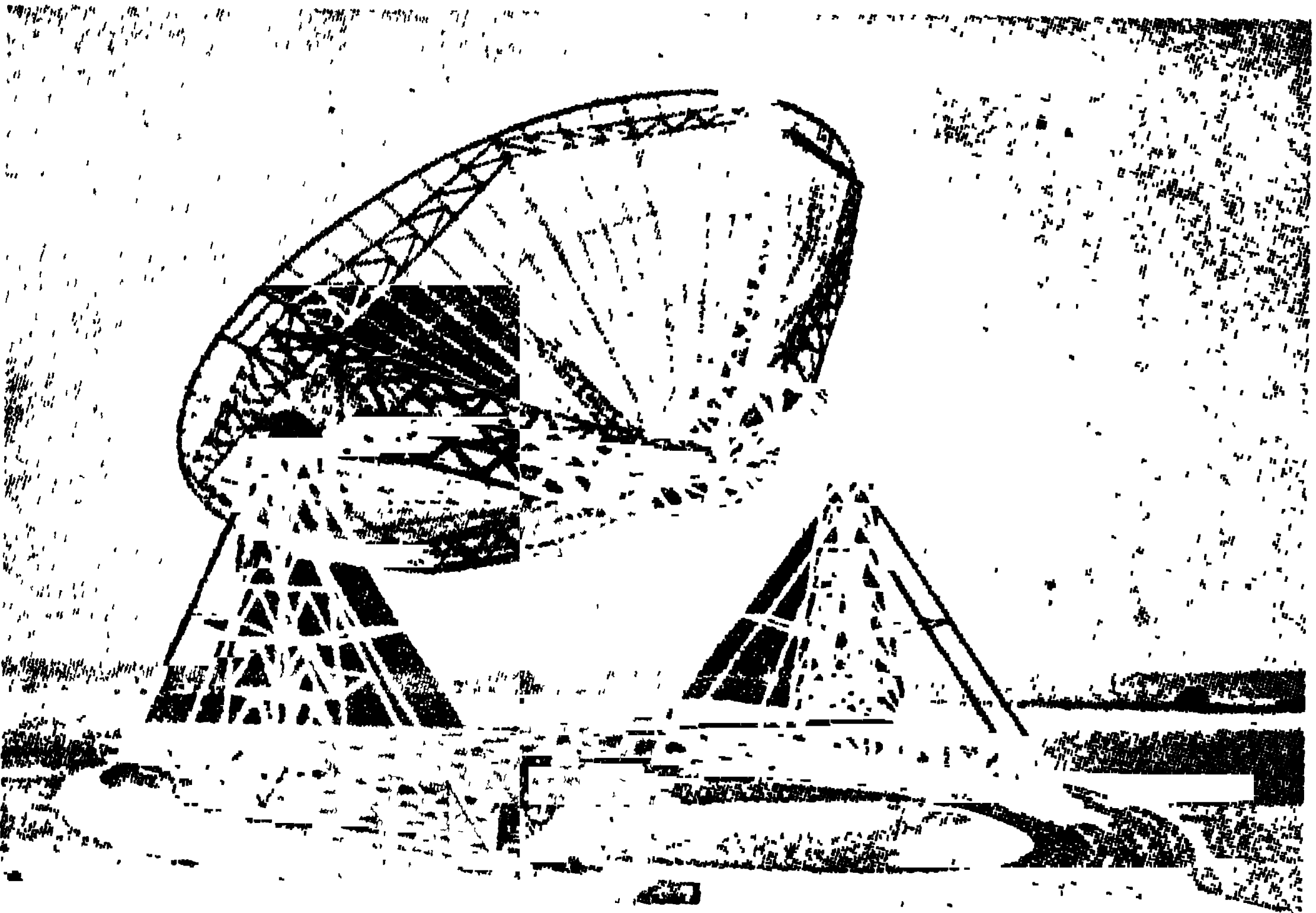
টেলিস্কোপ রিফ্লেক্টরে পরিবর্তিত করা হয়েছে। ডাঃ ক্লেগ কর্তৃক পরিকল্পিত জোড্রেল ব্যাঙ্ক ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর এই বিরাট রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক কর্মীরা পাঁচ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল (এক মিলিয়ন=দশ লক্ষ) দূরবর্তী অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা থেকে আগত রেডিও-স্পন্দন আহরণ করে তাদের তীব্রতা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। দূরবর্তী জ্যোতিষ্ক এবং নীহারিকাসমূহের রেডিও-তরঙ্গ সংগ্রহে সাফল্য অর্জনের ফলে বিজ্ঞানীরা বিপুল অর্থ ব্যয়ে বৃহত্তর আর একটি রেডিও-টেলিস্কোপ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন। এই যন্ত্রটি ১০০ গজ ব্যাসের একটা বৃত্তাকার রেলের উপর স্থাপিত হবে। যন্ত্রটার মোট ওজন ১২৭০ টন। নির্দিষ্ট

জ্যোতিষ্কাভিমুখে স্থাপন করবার জন্যে যন্ত্রটাকে রেলের উপর যে কোন জায়গায় সরানো তো যাবেই, তাছাড়া একচুল এদিক-ওদিক করাও সম্ভব হবে। এর সাহায্যে নক্ষত্র-জগৎ এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সম্পর্কীয় অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

জীবজগতের কিংকং

গ্যালিভারের ভ্রমণ-কাহিনী তোমরা অনেকেই পড়ে থাকবে। বামনের দেশ, দৈত্যের দেশ সম্বন্ধে অনেক আজব ঘটনার কথা এ থেকে তোমরা জানতে পেরেছ। আজ তোমাদের জীবজগতের অতিকায় জন্তু-জানোয়ারদের সম্বন্ধে কিছু বলব। গ্যালিভারের কাহিনীর মত অবশ্য ইহা আষাঢ়ে গল্প নয়।

প্রথমে তিমির কথাই বলা যাক। তোমরা হয়তো জান, তিমি স্তন্যপায়ী জীব এবং সন্তান প্রসব করে। জন্মের সময় বাচ্চা-তিমি লম্বায় প্রায়ই তার মায়ের অর্ধেক হয়ে থাকে। শোনা যায় বত্রিশ ফুট লম্বা একটা স্পার্ম-তিমির পেটে নাকি চৌদ্দ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা একটা শাবক পাওয়া গেছে। আশি ফুট লম্বা একটা নীল-তিমির পেটেও নাকি পঁচিশ ফুট লম্বা একটা বাচ্চা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাচ্চাটার ওজন ছিল প্রায় যোল হাজার পাউণ্ড। এবার হয়তো তোমরা প্রশ্ন করতে পার—পেটের মধ্যে এরূপ একটা ভারী বাচ্চা নিয়ে কি করে তিমি চলাফেরা করে? আসলে জলচর জীব বলেই তিমির পক্ষে এহেন অবস্থায় চলাফেরা করা সম্ভব হয়ে থাকে। জলের মধ্যেই তারা এরূপ ভারী ওজনের শাবক বহন করতে সক্ষম হয়। জলচর না হয়ে যদি স্থলচর প্রাণী হতো, তা হলে তিমি কোন ক্রমেই নড়াচড়া করতে পারত না, এমন কি হয়তো শাবক বহনেও সক্ষম হতো না।

বাচ্চা-তিমি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে থাকে। এক বছরের মধ্যে লম্বায় প্রায় দ্বিগুণ আকার ধারণ করে। আবার কোন কোন জাতীয় স্ত্রী-তিমি দু তিন বছরেই যৌবনে পদার্পণ করে। এরূপ তাড়াতাড়ি বাড়ে বলেই বোধহয় পৃথিবী থেকে এদের অস্তিত্ব আজও লোপ পায় নি। নতুবা প্রতি বছর শিকারীর হাতে যে হারে তিমি নিহত হয়ে থাকে, তাতে এতদিন এদের কোন চিহ্নই থাকতো না। সাধারণতঃ স্ত্রী-তিমি দশ থেকে যোল মাস পর্যন্ত গর্ভে সন্তান ধারণ করে থাকে। তবে এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

নীল-তিমিই নাকি পৃথিবীর সব চাইতে বড় প্রাণী। অতীতেও এদের চেয়ে আর কোন বৃহৎ জীবের কথা শোনা যায় নি বলেই বিজ্ঞানীদের অভিমত। সর্বাপেক্ষা যে

বৃহৎ তিমির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি লম্বায় একশ' আট ফুট এবং ওজনে প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড ছিল।

একদা ডাইনোসোর জাতীয় সরীসৃপ গোষ্ঠীর পদভারে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল। সেগুলিও ছিল অতিকায়। কিন্তু এসব জন্তু নীল-তিমির তুলনায় কিছুটা ছোট বলেই মনে হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এসব বিশালকায় সরীসৃপের কঙ্কালও আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে সাড়ে সাতাশি ফুট লম্বা কঙ্কালও রয়েছে। এইটিই নাকি সবচেয়ে বড়। আর সর্বাপেক্ষা ওজনে ভারী যে ডাইনোসোরের কথা জানা গেছে—সেটি হচ্ছে পঞ্চাশ টন। সুতরাং বিশালতায় এরা নীল-তিমির স্থান দখল করতে পারে নি।

এবার পাখীর কথায় আসা যাক। জীবন্ত পাখীর মধ্যে উটপাখীর ডিমই নাকি সবচেয়ে বড়। এই ডিম লম্বায় ছয় থেকে সাত ইঞ্চি এবং প্রস্থে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি হয়ে থাকে। উটপাখীর ডিমের খোলে নাকি বারো থেকে আঠারটা মুরগীর ডিম রাখা যায়। অবশ্য এর চেয়েও বৃহৎ আকারের পাখীর ডিম ছিল। সেসব পাখী পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এক সময় মাদাগাস্কার দ্বীপে এলিফ্যাণ্ট বার্ড বা রক পাখীর আস্তানা ছিল। তাদের ডিমের খোলস আবিষ্কৃত হয়েছে; খোলসটি লম্বায় তের ইঞ্চি এবং চওড়ায় সাড়ে নয় ইঞ্চি।

আজকের দিনে যে সব পাখী দেখা যায়, তার মধ্যে আফ্রিকার উটপাখীই হচ্ছে সবচেয়ে বৃহৎ। উচ্চতা ও ওজনের দিক দিয়ে কোন পাখীই এদের সমকক্ষ নয়। আট ফুটের চেয়েও বড় আকারের পুরুষ উটপাখী দেখা গেছে। অবশ্য অতীতে এদের চেয়েও বৃহৎ আকারের পাখী ছিল। নিউজিল্যাণ্ডের মোয়াপাখী দেখতে উটপাখীর মতই ছিল। পৃথিবী থেকে এদের বংশ লুপ্ত হয়েছে। এদের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। তা থেকে প্রমাণিত হয়—এদের কোন কোনটা উচ্চতায় বারো ফুটও ছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার নদীগুলিতে এক জাতীয় মাছের (Arapaima) সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি নাকি লম্বায় পনরো ফুট এবং ওজনে পাঁচশ' পাউণ্ডের মত হয়ে থাকে। 'জায়েণ্ট রাশিয়ান ষ্টারজিয়ন' নামক আর এক জাতের মাছ নাকি এদের চেয়েও আকারে বড় হয়ে থাকে। এগুলি মিঠাজলের মাছ। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে—এদের কোন কোনটার ওজন তিন হাজার দু'শ একুশ পাউণ্ড এবং লম্বায় ছাব্বিশ ফুট পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। ক্যাট-ফিসের আকারও নাকি খুব বড়। এগুলিও মিঠাজলেরই বাসিন্দা।

উভচর প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে জায়েণ্ট স্যালাম্যাণ্ডার। জাপান এবং মহাচীনের কোন কোন অংশে এদের দেখা যায়। এরা লম্বায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলি সচরাচর পার্বত্য স্রোতস্বতীর মধ্যে বাস করে। এরা মাছ, জলজ পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে। আগে জাপানীরা খাদ্য এবং ওষুধ তৈরীর জন্যে এগুলিকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতো। পরে গভর্ণমেণ্ট আইন করে স্যাল্যাম্যাণ্ডার

হত্যা করা নিষেধ করে দিয়েছে। নতুবা এই প্রাণীগোষ্ঠী এতদিনে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

পৃথিবীতে দীর্ঘতম সর্প হচ্ছে রিগ্যাল বা পাইথন। এদের দেহ পঁয়ত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে শোনা গেছে। অবশ্য সাতাশ-আটাশ ফুটের চেয়ে বেশী দৈর্ঘ্যের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, এরা বিষাক্ত নয়। তবে অ্যানাকোণ্ডা জাতীয় সাপ ওজনে এর চেয়ে অনেক ভারী। উনিশ ফুট লম্বা ডিটমার নামক একটা সাপের ওজন নাকি দু'শ ছত্রিশ পাউণ্ড। হ্যাগেনবেক আটাশ ফুট লম্বা একটি পাইথনের ওজন দু'শ পঞ্চাশ পাউণ্ড বলে প্রকাশ করেছেন। বিষাক্ত সর্পগোষ্ঠীর মধ্যে শঙ্খচূড় বা কিং কোব্রা লম্বায় সবচেয়ে বৃহৎ। এদের দংশনে মৃত্যু অবধারিত। পৃথিবীর মধ্যে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্-এর র‍্যাট্‌ল্ সাপ ওজনে নাকি সর্বাপেক্ষা ভারী এবং অত্যন্ত বিষাক্ত। এসব সাপ ভয় পেলে কিংবা রাগান্বিত হলে কুণ্ডলী পাকিয়ে সজোরে লেজ আন্দোলন করতে থাকে। এতে ঝন্‌ঝন্ শব্দ উত্থিত হয়। এর কারণ কি জান? এদের লাঙ্গুলের প্রান্তে কতকগুলি অস্থিবলয় থাকে। এজন্যেই সজোরে লাঙ্গুল আন্দোলিত হলে শব্দের সৃষ্টি হয়। তাই এদের র‍্যাট্‌ল্ সাপ বলা হয়। আগেকার দিনের নাবিকদের মুখে সামুদ্রিক সর্প সম্পর্কে রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যেত। এই সব সমুদ্রগামী নাবিকের মুখে যে সব কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায় তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এরা নাকি প্রায় একশ' ষাট ফুট লম্বা সাপও সমুদ্রবক্ষে দেখেছে। ইহা নিছক কাল্পনিক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে; কারণ এর সামর্থনযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

—ন—

ভিটামিন-সি

আজ ভিটামিন-সি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো। জলে দ্রবণীয় যে কয়টি ভিটামিন আছে, ভিটামিন-সি তার মধ্যে একটি। প্রধানতঃ স্কার্ভি (Scurvy) রোগ প্রতিরোধ করবার জন্যে এই খাদ্যপ্রাণটি অপরিহার্য। সেজন্যে এর আর একটি নাম হলো 'স্কার্ভি-প্রতিরোধী' (Anti-scorbutic) ভিটামিন।

কমলালেবু, পাতিলেবু, বাঁধাকপি ইত্যাদির খাদ্যমূল্য নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে Szent Gyorgyi এই ভিটামিনটি বিশুদ্ধরূপে প্রাণীদেহে থেকে প্রস্তুত করেন। সার গোল্যাণ্ড হপ্‌কিন্সের পরীক্ষাগারে এই ভিটামিনটি আবিষ্কৃত হয়। তারপর, এর পরে এই ভিটামিনটি পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করবার জন্যে কয়েকজন বিজ্ঞানী লেগে পড়লেন এবং তাঁদের মধ্যে সাফল্য লাভ করেন হার্ষ্ট সাহেব। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর হাতে ভিটামিন-সি প্রথম প্রস্তুত হলো।

রাসায়নিক বিচার অনুযায়ী ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এই ভিটামিনটির নাম পৃথক; যথা— অ্যাস্করবিক অ্যাসিড ও সেভিট্যামিক অ্যাসিড।

জলে দ্রবণীয় এই খাদ্যপ্রাণটি অক্সিজেন সান্নিধ্যে একশ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। সেজন্যে খোলা পাত্রে রান্না করলে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভিটামিন-সি অতি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। ঢাকা-দেওয়া পাত্রে রেঁধে অবশ্য ভিটামিনটিকে কিছু পরিমাণে রক্ষা করা যেতে পারে।

নিরামিষ পদার্থের মধ্যে লেবুজাতীয় ফল, টোম্যাটো, টাটকা শাক ও কপিতে এর পরিমাণ সব চেয়ে বেশী। অঙ্কুরিত বীজেও ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ ও জ্বাল না-দেওয়া গরুর দুধেও এর পরিমাণ যথেষ্ট। শরীরের মধ্যে রক্ত ও সুপ্রারেনাল গ্রন্থিই এই ভিটামিনের প্রধান বাসস্থান। শেষোক্ত গ্রন্থিটিতে সি-খাদ্যপ্রাণ প্রস্তুতির কাজও চলে।

আগেই বলেছি, শরীরে এই খাদ্যপ্রাণটির অভাবের প্রধান ফল হলো স্কার্ভি রোগ। এই রোগটির প্রথম ও প্রধান চিহ্ন হলো রক্ত-হীনতা বা অ্যানিমিয়া। তাছাড়া আনুসঙ্গিক হিসাবে দেখা যায়, ক্ষরিত রক্তের জমাট বাঁধার কাল বিলম্বিত এবং রক্তে লোহিত কণিকা ও অনুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

দাঁতের গোড়া ফোলায় কষ্ট পান এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে নিতান্ত কম নয়। অনেকের আবার দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। খাদ্যে ভিটামিন-সি-এর অভাবই এর প্রধান কারণ।

অনেকেরই দেখা যায় যে, তাঁরা অতি অল্পেই রোগগ্রস্ত হন এবং শরীরে কোন ক্ষত থাকলে তা থেকে মুক্ত হতেও তাঁদের সময় লাগে সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী। এরও কারণ ঐ একই। এসব ছাড়াও ভিটামিন-সি-এর অভাবে হাড়ের ভঙ্গুরত্ব বেড়ে যায় এবং শরীরের নানারকম গঠন কাজেও বাধা পড়ে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ভিটামিন-সি-এর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। প্রকৃতির বিধানে মাতৃদুগ্ধে এই খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ তাই যথেষ্ট। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাতৃদুগ্ধ পান না করার ফলে অনেক শিশু কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভিটামিন-সি-এর দৈনিক চাহিদা প্রায় পঞ্চাশ মিলিগ্র্যাম। এর কমে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট।

শ্রীঅরূপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আবিষ্কারের কাহিনী

রঞ্জেন-রশ্মি

'দেখ বার্থা, ক্যাথোড-রে'র কথা বলতে গেলে আরম্ভ করতে হয় বায়ুর চাপের কথা থেকে', বিকেলের কফিতে চুমুক দিয়ে ভুজবার্গের পদার্থ-বিজ্ঞানী রঞ্জেন তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললেন।

'সে হচ্ছে ১৬৪৩......'

রঞ্জেনের কথা কেড়ে নিয়ে বার্থা বলে, 'গ্যালিলিও, তাই নয় কি?'

'না, না, গ্যালিলিওর মৃত্যুর এক বছর পরের ঘটনা। টরিসেলি ছিলেন গ্যালিলিওর ছাত্র। একদিন দেখতে পেলেন—বড় একটা একমুখো নলের ভিতর জল পুরে জলের পাত্রে উপুড় করে ধরলে ঠিক ৩৪ ফিটের বেশী উচুতে জল থাকে না। ৩৪ ফিট জলের ওজন বাহিরের বায়ুর ওজনের সমান বলে ৩৪ ফিটের বেশী জল ওঠে না। আচ্ছা বার্থা, বলতে পার টরিসেলি কেমন করে এটা প্রমাণ করেছিলেন?'

স্বামীর প্রশ্নে বার্থার মুখ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কেন? জলের চেয়ে ভারী তরল পদার্থ দিয়ে পরীক্ষা করে!'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! তখন টরিসেলি বড় একটা একমুখো কাচের নলের ভিতর এমন ভাবে পারা পুরে দিলেন যেন একটা বায়ুর বুদ্‌বুদ্‌ও তাঁর মধ্যে না থাকে। নলটা পারার একটা পাত্রে উপুড় করে ধরলেন। কাচের নল থেকে পারা খানিকটা নেমে গেল। নলের ভিতর পারা ঠিক ৩০ ইঞ্চি উঁচু হয়ে রইল। তিনটি বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান পাওয়া গেল এই পরীক্ষার ফলে। টরিসেলির তত্ত্বটি প্রমাণিত হলো, পারার ব্যারোমিটার আবিষ্কারের সন্ধান পাওয়া গেল এবং ভ্যাকুয়ামের কথা জানা গেল।'

বার্থা রঞ্জেনের কথাগুলো শুনতে থাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে।

'এমনি আকস্মিকভাবেই'—রঞ্জেন আরম্ভ করলেন, 'ভ্যাকুয়ামের আবিষ্কার হলো আর এ কথা বিজ্ঞানীদের মাথায় বাসা বাঁধলো। ১৬৫০ সালের কাছাকাছি অটো ভন গেরিক বলে একজন বিজ্ঞানী একটা চমৎকার মজা দেখালেন ভ্যাকুয়ামের সাহায্যে। ভালভাবে পালিস-করা দুটি অর্ধবৃত্ত একসঙ্গে জুড়ে তিনি ফাঁপা একটা পূর্ণ গোলক তৈরী করেন। তারপর পাম্প দিয়ে গোলক থেকে হাওয়া বের করে ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি করেন গোলকটার ভিতর। তামার অর্ধবৃত্ত গোলক দুটিকে আলাদা করবার জন্যে দুটি ঘোড়া দু-দিক থেকে টানাটানি আরম্ভ করলো। কিন্তু কিছুই হলো না। আরও দুটি ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হলো; তবুও খুললো না। এবার চারটে। এবার খুলে গেল

তামার গোলক। রাজাকে বিজ্ঞানী ডেকে এনেছিলেন পরীক্ষা দেখাবার জন্যে। ব্যাপার দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাজা। বায়ুর চাপের কথা প্রমাণিত হলো।'

আবিষ্কারের চমকপ্রদ কাহিনী শুনতে শুনতে বার্থা ভারী উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। বললেন—'এরপর কি হলো ?'

'১৭০৫ সালের কথা। ফ্রান্সিস হক্সবি একটা বেল-জার থেকে হাওয়া বের করে নিলেন পাম্প দিয়ে। তারপর বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা করলেন।' বার্থার মুখপানে চেয়ে রঞ্জেন বলে যেতে লাগলেন তাঁর কাহিনী। 'হক্সবি কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন বেল-জারের ভিতর রক্তিমাভ আলো দেখে। বিজ্ঞানীর মনে সঞ্চারিত হলো নতুন কিছু পাওয়ার আনন্দ।'

রঞ্জেন এবার থামলেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার আরম্ভ করলেন, 'বণের বিখ্যাত হেনরী গাইস্‌লার ভ্যাকুয়াম নলের ব্যাপারটাকে একটা কার্যকরী রূপ দিলেন। ১৮৭৮ সালে ডিমের আকারে একটা ভ্যাকুয়াম নল তৈরী করেন। এই নলের ভিতর দু-দিকে দুটা চাক্‌তি এঁটে দেন। এর একটাকে বলা হয় ক্যাথোড আর একটাকে বলা হয় অ্যানোড। বিজ্ঞানী ক্রুক্‌স্ এই রকম একটা নলের ভিতর অনুপ্রেষ বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এমন সব অদ্ভুত ব্যাপাব ক্রুক্‌সের চোখে পড়ল যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।'

চারটা তিরিশ······

রঞ্জেনের কথায় ছেদ পড়ল। তিনি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গবেষণাগারে যাবার সময় হয়েছে। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠছেন।

বার্থা ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু কিছুই তো বলা হলো না। যে ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলতে গিয়েছিলে, সেটিই তো বাদ পড়ে গেল।'

'কি সম্বন্ধে ?'

'কেন, ক্যাথোড-রে!'

'হায় ভগবান! আমি জানি না!···'—হতাশার সুব বেজে ওঠে অধ্যক্ষের কণ্ঠে।

ঘট্ ঘট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন রঞ্জেন তাঁর গবেষণাগারের দিকে।

মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে এক সুগভীর চিন্তার আভাস। রঞ্জেন তাঁর গবেষণাগারের দিকে এগিয়ে চলেছেন, ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দ সরে দাঁড়াচ্ছে তাঁকে প্রণতি জানিয়ে।

অধ্যাপক ক্রুক্‌স্ ক্যাথোড-রশ্মি আবিষ্কার করেছিলেন অনুপ্রেষ বিদ্যুৎপ্রবাহ ব্যবহার করে। বিশেষ মাত্রায় অনুপ্রেষ বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে গাইস্‌লার নলের ভিতর তিনি দেখতে পেয়েছিলেন—ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে আসে এক রকম রশ্মি। এই রশ্মির নাম দেওয়া হলো ক্যাথোড-রশ্মি বা ক্যাথোড-রে। ক্যাথোড-রে'র স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা গেল। এর পর লেনার্ড নামক একজন বিজ্ঞানী ক্যাথোড-রে'র

পরীক্ষায় গাইস্‌লার নলের এক জায়গায় অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে একটা জানলা তৈরী করলেন। লেনার্ড দেখতে পেয়েছিলেন—অ্যালুমিনিয়ামের ভিতর দিয়ে ক্যাথোড-রশ্মি বেরিয়ে আসে। এদের বলা হলো লেনার্ড-রে বা লেনার্ড-রশ্মি।

১৮৯৫ সালের ৮ই নভেম্বর। অধ্যাপক রঞ্জেন তাঁর গবেষণাগারের সবটা আঁধার করে ফেললেন লেনার্ড-রে সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাবার জন্যে।

ভ্যাকুয়াম নলের পাশেই ছিল একটা প্রতিপ্রভ পর্দা। অধ্যক্ষ রঞ্জেনের পরীক্ষার বিষয় ছিল পর্দাটার প্রতিপ্রভা সম্পর্কে। পরীক্ষা আরম্ভ হলো। অধ্যক্ষ বিস্মিত হয়ে গেলেন ঘরের ভিতর শুধু একফালি আলো দেখে। আবার ভাবলেন, হয়ত কোথায়ও কিছু ভুল হয়ে থাকবে। অনেকক্ষণ পর তিনি নিঃসন্দেহ হলেন; আবছা সবুজ আলোর ফালি বেরিয়ে আসছে ঠিক ভ্যাকুয়াম নল থেকে। চিন্তাধারার জোয়ার তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল গবেষণার অন্তঃস্থলে। বিশ্বজগৎ তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেল।

খট—খট—খট.........।

ল্যাবরেটরীর দরজায় ঘা পড়ল। বিজ্ঞানীর চিন্তাধারায় ছেদ পড়ল। বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি। দরজা খুলে দিলেন।

দরজা খুলেই দেখতে পেলেন ফ্রাউকে। ফ্রাউ রঞ্জেনের চাকর। বললে, 'খাবার যে জুড়িয়ে গেল!'

হিমশীতল নভেম্বরের রাত্রি। খাবার খেয়ে রঞ্জেন নিঃশব্দে উঠে পড়লেন।

এভাবেই অক্লান্ত গতিতে এগিয়ে চললো রঞ্জেনের গবেষণা। অবশেষে অজানার অবগুণ্ঠন খুলে গেল ধীরে ধীরে। নতুন রশ্মির আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। রশ্মির নাম দিলেন একস্‌-রে। মোট কথা, ক্যাথোড-রে একস্‌-রে টিউবের ভিতর প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করে এই রশ্মি।

আলোক রশ্মির মত ধর্ম এই রশ্মির। অনেক জিনিষের মধ্য দিয়ে রশ্মিগুলি চলে যেতে পারে। কিন্তু দেহের হাড়, সীসার ডেলা প্রভৃতিকে এই রশ্মি ভেদ করে যেতে পারে না।

একদিন তিনি একটা আলোকচিত্রের প্লেট নিয়ে এলেন বার্থার সামনে। সমস্ত দেহ বার্থার কাঁটা দিয়ে উঠলো। দেখলেন, প্লেটে একটা কঙ্কালের রূপ।

রঞ্জেন বললেন, 'অমন করছ কেন বার্থা? এটা তোমারই কঙ্কালের ছবি!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো বার্থা।

'কি ভয়ানক উইলহেল্‌ম!' পরম বিস্ময়ে তাঁর দুটি চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'জান', রঞ্জেন বলে চলেন, 'একস্‌-রে দিয়ে আলোকচিত্র গ্রহণ এই প্রথম।'

এ ব্যাপারের আধঘণ্টা আগে বার্থা স্বামীর গবেষণাগারে গিয়েছিলেন। রঞ্জেন-রশ্মির ইতিহাসে বার্থার কঙ্কালের ছবিই হচ্ছে প্রথম এক্স-রশ্মির আলোকচিত্র।

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অস্ত্র হিসাবে রঞ্জেন-রশ্মি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিবিধ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে রঞ্জেন-রশ্মি ঘরোয়া পর্যায়ে এসে পড়েছে। শুধু মাত্র যক্ষ্মারোগে রঞ্জেন-রশ্মির ব্যবহারের কথা চিন্তা করলেই আবিষ্কারের গুরুত্ব এবং তার সুদূর প্রসারী ফলাফল বুঝতে পারা যায়। এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে এই রশ্মি দ্বারা রোগ ধরা যায়। সেই পর্যায়ে চিকিৎসা আরম্ভ হলে রোগমুক্তি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

অভিনব এরোপ্লেনের পরিকল্পনা

তোমরা সবাই জান, এরোপ্লেন মাটি ছেড়ে সোজাসুজি খাড়াভাবে আকাশে উঠতে পারে না। আকাশে ওঠবার সময় মাটির উপর দিয়ে অনেকটা ছুটে যেতে হয়। নানা

খাড়াভাবে উপরে ওঠবার জন্যে নতুন পরিকল্পিত এরোপ্লেনের ডানার ব্যবস্থা

কারণেই সেটা অসুবিধাজনক। মাটি ছেড়ে খাড়াভাবে আকাশে উঠে যেতে পারে—এরকমের এরোপ্লেন তৈরী করবার জন্যে বিশেষজ্ঞেরা অনেক দিন থেকে চেষ্টা করে আসছিলেন। এর ফলে হেলিকপ্‌টার উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু হেলিকপ্‌টার আর এরোপ্লেনে

তফাৎ অনেক। হেলিকপ্‌টারের সাহায্যে এরোপ্লেনের মত কাজ করা সম্ভব নয়। সে জন্যেই বিমান-বিশেষজ্ঞ যন্ত্রকুশলীরা এক নতুন ধরনের যাত্রীবাহী এরোপ্লেনের পরিকল্পনা করেছেন। এই প্লেনের উভয় পার্শ্বে, একটির উপর আর একটি—এভাবে ডানাগুলি সজ্জিত থাকবে। সোজাসুজি উপরে ওঠবার সময় এই অভিনব প্লেনের যাত্রীরা দেখবে, ডানাগুলি নিম্নাভিমুখে পিছনের দিকে গুটিয়ে গেছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে, প্লেনখানি মাটি থেকে ক্রমশঃ সোজাসুজি উপরে উঠে যাচ্ছে। নীচের দিকে তাকালে মনে হবে তারা যেন ঢোকা ষ্ট্যাম্পের মত ছোট্ট একটি বিমান-ঘাঁটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতেই গুটানো ডানাগুলি ক্রমশঃ সমকোণে প্রসারিত হয়ে সাধারণ এরোপ্লেনের রূপ ধারণ করবে এবং শব্দগতিতে ছুটতে থাকবে। অপর পৃষ্ঠার ছবি থেকে এ-ধরনের এরোপ্লেন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবে।

খাড়াভাবে উপরে ওঠবার জন্যে বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য অন্য এক রকম পরিকল্পনার বিষয়ও চিন্তা করছেন। এই পরিকল্পনায় এরোপ্লেনখানি যাত্রীদের তোলবার সময় মাটিতে লেজের উপর খাড়াভাবে অবস্থান করবে। যাত্রীরা ওঠবার পর প্লেনখানি সোজা খাড়া-ভাবেই আকাশে উঠে যাবে। উপরে ওঠবার পর যান্ত্রিক-কৌশলে আপনাআপনি সাধারণ এরোপ্লেনের মত শয়ানভাবে উপনীত হয়ে প্লেনখানি ছুটতে থাকবে।

বিবিধ

আবার হিমালয় অভিযান

সিঙ্গাপুরের এক খবরে প্রকাশ—এভারেষ্ট বিজয়ীদ্বয়ের অন্যতম স্যার এডমণ্ড হিলারী বলেন যে, আগামী বৎসর তিনি নেপালের ভ্যারাম উপত্যকার উপর যেসকল গিরিশৃঙ্গ আছে সেগুলি অতিক্রমের জন্য নিউজিল্যাণ্ডের একটি দল লইয়া অভিযান করিবেন। খুব সম্ভব তেনজিংও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবেন। তবে তিনি বলেন, তাঁহার (তেনজিং-এর) স্ত্রী বোধহয় ইহা তেমন পছন্দ করিবেন না।

তিনি আরও বলেন, এভারেষ্ট অভিযানের নেতা কর্ণেল স্যার জন হাণ্ট ১৯৫৫ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশৃঙ্গে আরোহণের জন্য এক অভিযান করিবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা ২৮১৪৬ ফুট। উচ্চতার দিক দিয়া পৃথিবীতে ইহার স্থান তৃতীয়। এযাবৎ কেহ এই গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারে নাই। ইহা এভারেষ্টের প্রায় দেড়শত মাইল পূর্বে অবস্থিত।

লণ্ডন হইতে সিডনী ফিরিবার পথে স্যার এডমণ্ড সিঙ্গাপুরে এক রাত্রি যাপন করেন।

হুগলী জেলায় প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম, মহানাদ, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল যে সকল দ্রব্য আবিষ্কার

করিয়াছেন তৎসমুদয় রাঢ়অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য অবদান। শ্রীযুক্ত পাল মহানাদস্থ রামকৃষ্ণ কলোনীর বিভিন্নাংশ হইতে গুপ্তযুগের বিবিধ মৃন্ময় দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি সুন্দর কারুকার্যখচিত নারীমূর্তি, একটি মেষের মস্তক, কতিপয় নক্সাদার ঢাকনী, বিবিধ ধরনের জলপাত্র, প্রদীপ ও বাটখারা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাস্থানগড় ও মহানাদ প্রাচীন পুণ্যতীর্থ। কোন এক ধার্মিক হিন্দু নৃপতি কর্তৃক উভয় স্থানের নামকরণ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত পাল রামকৃষ্ণ কলোনীতেই পালযুগের দুই প্রকার প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ এবং কীর্তিমুখ খোদিত প্রস্তর-স্তম্ভের কিয়দংশ, কতিপয় মৃন্ময় দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মুঘল আমলের মাটির কলস, হাঁড়ি এবং আরও কতিপয় পাত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুমিত হয় মহানাদ গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে পাল রাজত্বে ও তৎপরে মুঘল আমলে সমৃদ্ধ ছিল।

মহানাদের পার্শ্ববর্তী শ্রীনগর নামক পল্লীতে এক পুষ্করণীর সংস্কারকালে এক প্রস্তরময় বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে—প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীনগরের কতিপয় বালক-বালিকা মহানাদ হইতে মূর্তিটিকে লইয়া গিয়া ক্রীড়াচ্ছলে পূজা করে এবং পরে উক্ত পুষ্করিণীতে বিসর্জন দেয়। মূর্তিটি পালযুগের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত পাল মহানাদ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্তী সুদর্শন নামক এক পল্লীতে মেঘবরণ নামক এক পুষ্করিণীর পূর্বতীরে ইষ্টক ও প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকা ও মন্দিরের নিদর্শন এবং বিবিধ প্রস্তরমূর্তি ও মৃৎপাত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কতিপয় মূর্তি ও মৃন্ময় দ্রব্য আশুতোষ মিউজিয়ম সংরক্ষিত হইয়াছে। গত মে মাসে উক্ত পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরে বহু ইষ্টক, প্রস্তর ফলক, বহু প্রকার প্রস্তরমূর্তি, কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্র, নরকঙ্কাল, ভস্ম প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মূর্তিগুলির মধ্যে কূর্ম অবতার এবং কলস হস্তে এক নারীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নারীমূর্তি দেখিয়া মনে হয়, ইহা এক বৌদ্ধ মূর্তি। যেন নৈরঞ্জনা নদীতীরে সুজাতা বারিপূর্ণ কলস হস্তে তপঃক্লিষ্ট সিদ্ধার্থের প্রতি করুণনেত্রে চাহিয়া আছেন। ছোট আর এক প্রকার দণ্ডায়মান দ্বিভুজ বিষ্ণুমূর্তি পরীক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত পাল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্রকার বিষ্ণুমূর্তি খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল। বাংলা দেশে সর্বপ্রথম ২৪ পরগণা জেলায় বোড়াল গ্রামে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশ নক্সাদার। এক প্রকার ধূসর বর্ণের কতিপয় ঘট পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার ঘট সাধারণতঃ বৌদ্ধ বিহারে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ সুদর্শনে পালযুগে এক বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে।

কিছুদিন পূর্বে পাণ্ডুয়াগড়ে দুইটি বিষ্ণুমূর্তি এবং একটি গৌরীপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূর্তিদ্বয় সেন রাজত্বের নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়। বালিখাদে প্রাচীন কূপের নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। পাঠান রাজত্বে তুর্কী সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ কতিপয় মৃৎপাত্র, প্রায় অর্ধশত রঙ্গীন মৃৎপাত্র পাত্রখণ্ড এবং সম্রাট সাহ আলমের তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় মৃৎপাত্র মালদহ জেলায় গৌড়ে ব্যবহৃত হইত।

পাণ্ডুয়ার পূর্বপ্রান্তে নিয়ালা নামক পল্লীতে বালিখাদগুলি পরীক্ষাকালে প্রাচীন প্রস্তর-স্তম্ভ, ফলক এবং ইষ্টক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাণ্ডুয়া হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে ইলামপুর নামক পল্লীতে বালিখাদ খননকালে এক মৃন্ময় পাটযুক্ত প্রাচীন কূপের মধ্যে একটি

লৌহনির্মিত কোদাল ও একখানি খন্তা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত খাদেই একটি প্রস্তরের খল ও কতিপয় মৃন্ময় দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দুই বৎসর পূর্বে ইলামপুরে অপর এক বালিখাদে একটি প্রাচীন নৌকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

প্রচুর পরিমাণে গন্ধক প্রাপ্তির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ, ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষার খনি শাখার অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, বিহারের শাহবাদ জেলায় আমজোড়ে পাইরাইটিস ভূস্তর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা যায় যে, এই শ্রেণীর আকর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গন্ধক প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কাঁচামাল হিসাবে গন্ধক বিশেষ প্রয়োজনীয়। সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য নানা শিল্পের মধ্যে রাসায়নিক সার প্রস্তুত কার্যে এই অ্যাসিডের আবশ্যকতা সর্বাধিক। অ্যাসিড প্রস্তুতির জন্য পূর্বে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আমদানী মালের উপর নির্ভরশীল ছিল। দেশজ গন্ধক প্রাপ্তির তখন কোনরূপ সম্ভাবনাই ছিল না। বিগত কয়েক বৎসরে এই দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায় অথচ উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে অনেক সময় মাল আমদানী বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল সঙ্কটের ফলেই অন্য সূত্রে এই দেশে গন্ধক প্রাপ্তির সম্ভাব্য পন্থা বাহির করিবার কাজ সুরু হয়। গন্ধকের তিনটি প্রধান উৎপত্তিস্থল হইল—দেশজ আকর বা ব্রিমষ্টোন, লৌহ আকর পাইরাইটিস এবং বিভিন্ন ধাতু-কারখানার উপজাত গ্যাস। ইহার মধ্যে প্রথমটির প্রাপ্তিস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সেখানে উহার অধিকাংশই কাজে লাগান হয়। লৌহ-গন্ধক বা পাইরাইটিস আকর হইতে বর্তমানে ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ-গুলিতে গন্ধক আহৃত হইতেছে। এক টন গন্ধক আহরণের জন্য সচরাচর দুই টন পাইরাইটিস আকর প্রয়োজন হয়। ১৯৫০-৫১ সালে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তরফে আমজোড়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য চালান হয়। ভূতত্ত্ব সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বস্বামিত্ব গ্রহণান্তে ড্রাইভিং ও বুফ বোর্ণিং প্রথায় পুনরায় কাজ আরম্ভ করে। ভীষণ অসুবিধার মধ্যে সেখানে কাজ চালাইতে হয়। স্থানটিতে পৌছিবার দুর্গম পথে বর্ষার দিনে ভারী যন্ত্রপাতি লইয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। যন্ত্রপাতি ও ডিজেল তৈল ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরবরাহ কলিকাতা বা ডেহরী-অন-শোন হইতে প্রেরণ করা হইত। বাসোপযোগী কোনও স্থান বা ক্যাম্প ফেলিবার মত জমিও সেখানে ছিল না। শ্রমিক সমস্যা না থাকিলেও প্রায় অদক্ষ কারিকরদের পাথর-খোঁড়া ইত্যাদি কাজ শিখাইয়া লইতে হইত।

অনুসন্ধান কার্য শেষ হইতে এখনও কিছু বাকী আছে। তবে লক্ষণসমূহ হইতে দেখা যায় যে, এখানে গন্ধক প্রাপ্তির প্রচুর সম্ভাবনা বর্তমান।

কলিকাতার সহরতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রেন

দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, রেল-মন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী বলেন যে, রেলওয়ে বোর্ড কলিকাতার সহরতলীতে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বোর্ড প্রয়োজনীয় জরিপ কার্য চালাইবার আরও ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রী শাস্ত্রী আরও বলেন যে, এই সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে।

প্রথম অবস্থায় কলিকাতা-বর্ধমান সেক্সনে এবং কলিকাতা-অণ্ডাল সেক্সনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল প্রবর্তিত হইবে। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী এস. পালি স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত হইবেন।

দশ মাইল দীর্ঘ মাছের ঝাঁক

বোম্বাই, ৩রা আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, বিনগুমারু নামক একখানা জাপানী মালবাহী জাহাজ গত ৩১শে জুলাই তারিখে বোম্বাই হইতে প্রায় দুই শত মাইল দূরে দশ মাইল দীর্ঘ একটি মাছের ঝাঁক দেখিতে পায়।

জাহাজের চীফ অফিসার বলেন, ভারতীয় দরিয়ায় এতবড় মাছের ঝাঁক এই প্রথম দেখা গেল, ব্যাপারটি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়।

আরব সাগরের ক্ষুধা

এক সংবাদে প্রকাশ, সুরাট হইতে দশ মাইল দূরে ডুমাসের নিকট সমুদ্রের উপকূলে আড়াই মাইলব্যাপী স্থান আরব সাগরের কবলিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে এই এলাকায় কয়েক শত গৃহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ভীমপুর গ্রামের একাংশ সমুদ্র-কবলিত হইয়াছে। এই এলাকায় অবস্থিত কতকগুলি বাংলো সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই এলাকায় প্রতি বৎসর সমুদ্র কয়েকশত গজ আগাইয়া আসিতেছে। গৃহহারা ব্যক্তিদের জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

ভারতের প্রধান কৃষি-পণ্যের উৎপাদন

(১৯৫২-৫৩ সালের চূড়ান্ত হিসাব)

	জমি (হাজার একর)		হাজার টন	
	১৯৫২-৫৩	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫১-৫২
চাউল	৭,৪৬,৭৪	৭,৩৬,৬৫	২,৩৪,২৪	২,০৭,৪১
জোয়ার	৪,১৯,৪৫	৩,৯১,৪৪	৬০,৩৮	৫৯,৪৪
বাজরা	২,৫২,৮২	২,২৮,৩৯	২৯,২২	২২,৯৯
ভুট্টা	৮৭,৯৬	৮০,৭৩	২৬,০৭	২০,২১
রাগি	৫৩,৭৮	৫৩,৯৯	১২,৩৫	১২,১২

অপরাপর ক্ষুদ্র হিসাব বাদ দিলেও ভারতবর্ষে ১৯৫২-৫৩ সালে চাউল উৎপাদনের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৫,৬০,৮৫ হাজার একর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ৩,৬২,২৬,০০০ টন; ১৯৫১-৫২ সালে ইহা যথাক্রমে ছিল ১৪,৯১,২০,০০০ একর ও ৩,২২,১৭,০০০ টন।

ভারতে পাট ও তুলার উৎপাদন

(১৯৫২-৫৩ সালের চূড়ান্ত হিসাব)

	একর		হাজার গাঁট	
	১৯৫২-৫৩	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫০-৫১
তুলা	১,৫০,৩০	১,৬২,১৩	২৯,০৮	৩১,৩৪
পাট	১৮,৩৪	১৯,৫১	৪৬,৯৫	৪৬,৭৮

টিটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড

এক প্রকার অতি দুষ্প্রাপ্য সর্বোৎকৃষ্ট টিটেনিয়াম ধাতু হাওয়াই দ্বীপে পাওয়া গিয়াছে। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ডাঃ জি ডোনাল্ড শেরম্যান এই টিটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড নামে ধাতু দ্রব্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা জেট ইঞ্জিন প্রস্তুতির পক্ষে অপরিহার্য ধাতব বস্তু।

পরলোকে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

গত ৩১শে জুলাই শারীরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ তাঁহার পার্ক সার্কাসস্থিত বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিছুকাল যাবৎ তিনি রোগ ভোগ করিতেছিলেন।

সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ ১৮৬৭ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক পরলোকগত গুরুচরণ মহলানবীশের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহাদের পৈতৃক বাসভূমি ঢাকা জেলার অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রামে। সুবোধচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৬-৯৭ সাল হইতে এডিনবরার রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স-এর রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন।

পরে তিনি এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৮-৯৯ সালে তিনি ওয়েল্‌সের অন্তর্ভুক্ত কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯০০ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বৎসর সুবোধচন্দ্র কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৪ সাল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ১৯১৬ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত 'বোর্ড অব হায়ার স্টাডিজ ইন ফিজিওলজি'-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ফিজিওলজি বিভাগের অধ্যক্ষের পদও অলঙ্কৃত করেন।

প্রকৃতিজাত মিষ্টান্ন

ভারতে সাদা চিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সাদা চিনিতে যে পুষ্টিকর পদার্থ কিছুই নাই তাহা অনেকেই হয়তো জানেন না।

যে কোন খাদ্যের উপযুক্ততা প্রমাণিত হয় তাহার পুষ্টিকারিতা গুণে। সাদা চিনি কেবলমাত্র শক্তি ও উত্তাপ দেয়। শক্তি প্রদানের পূর্বে ইহাকে শরীরের মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। শরীর প্রধানতঃ চিনির উপর অধিক শক্তি ব্যয় না করিয়া ইহার শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। সেজন্য সাদা চিনিকে খাদ্য বলা হয় না।

তাহা ছাড়া ইক্ষু হইতে চিনি বাহির করিবার সময় সমস্ত খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ দ্রব্য, কাঁচা আখ অথবা লাল্‌চে চিনির ভিতরের সমস্ত খাদ্যমূল্য নষ্ট হইয়া যায়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাদা চিনি দেখিতে বেশ পরিষ্কার এবং টেবিলে খাওয়ার সময় ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক, কিন্তু ইহার খাদ্যমূল্য নাই বলিলেই চলে।

যে কোন খাদ্য বা পানীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিলে অসুবিধা সৃষ্টি হইবে। লঙ্কার মত মুখরোচক দ্রব্য অত্যধিক খাইলে পাকস্থলীর প্রদাহ জন্মে এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়, রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পায় ও মূত্রগ্রন্থির যন্ত্রণা ঘটে। অত্যধিক চিনি খাওয়ার ফলে অনেক সময় বহুমূত্র-ব্যাধি জন্মে। অধিক চিনি খাইলে উহা হজম করিবার জন্য পাকস্থলীকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। এইভাবে শ্রম করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত পাকস্থলীতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক ইনসুলিন প্রস্তুত হইতে পারে না। এই ইনসুলিন এমন একটি পদার্থ যাহা চিনি হজম করিতে শরীরকে সাহায্য করে। অত্যধিক সাদা চিনি ও তজ্জাত মিষ্টান্ন ব্যবহারের ফলে দাঁত ক্ষয় পাইতে দেখা গিয়াছে।

স্বভাবজ মিষ্টান্ন

বিপরীত ক্রমে বলা যায় যে, ডুমুর, খুবানি, খেজুর, পিচ্, কুল প্রভৃতি রৌদ্র-শুষ্ক ফলের মধ্যে শুধু যে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ দ্রব্য অটুট থাকে তাহা নহে, সূর্যকিরণের স্বাস্থ্যপ্রদ গুণ আকর্ষণ করার ফলে ঐ সকল ফলের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়।

প্রকৃতিজাত সর্বোত্তম শক্তিপ্রদ খাদ্যসমূহের মধ্যে মধু অন্যতম। মধুর মধ্যে থাকে ফুলের সুবাস, শর্করা, এনজাইম নামক রাসায়নিক দ্রব্য, যাহা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে। কয়েক প্রকার দ্রাবক - যাহা অম্ল সৃষ্টি না করিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় সাহায্য করে, উদ্বায়ী তৈল যাহা সুগন্ধ বিস্তার করে—রক্ত, অস্থি ও মাংসপেশী গঠনে এই সকল উপাদান আবশ্যক। প্রকৃতিজাত এই মিষ্ট পদার্থের কথাই মানুষ প্রথম জানিতে পারে। এই মিষ্ট দ্রব্য খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে মিশিয়া যায়। ইহা হজম করিবার জন্য শরীরের কিছুমাত্র আয়াস হয় না। সুস্থ ও সবল শরীর গঠনের পক্ষে আবশ্যক কতকগুলি খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ দ্রব্য মধুর মধ্যে রহিয়াছে।

খোসা গুড় প্রকৃতিজাত মিষ্টান্নের মধ্যে অন্যতম। উহা সাদা চিনির তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট। লৌহ প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট যতগুলি প্রকৃতি-জাত সূত্র আছে তন্মধ্যে গুড় একটি। সুস্থ, সবল শরীর পোষণের পক্ষে ইহা একান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবীতে মেষ-সংখ্যা

লক্ষ

	১৯৩৫-৪০ (গড়)	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩
উত্তর আমেরিকা	৫,৯৭	৩,৮১	৩,৯৩	৩,৮৭
তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র	৫,১৪	৩,০৬	৩,২১	৩,১৬
ইউরোপ	১২,৩৮	১১,৮৬	১২,২৬	১২,৫৫
তন্মধ্যে ইটালী	৯৬	..		৯৯
স্পেন	২,০০	...	২,৬০	২,৭০
রুশ গণতন্ত্র	৬,৬০	৮,৬০	৯,০০	৯,০০
এশিয়া	১৫,২৬	১৫,৬২	১৬,২৭	১৬,৫৫
তন্মধ্যে ইরাণ	১,৪৫	১,৪৭	১,৬২	১,৭০
তুরস্ক	২,১৭	২,৩১	২,৫২	২,৬৫
দক্ষিণ আমেরিকা	১০,০৯	১২,০৪	১২,৬২	১২,৯০
তন্মধ্যে আর্জেণ্টাইনা	৪,৪৯	৫,০৫	৫,১৫	৫,১১
আফ্রিকা	৯,৯৭	১১,০৫	১১,২২	১১,৩৩
ওশিয়ানিয়া	১৪,৪০	১৫,০৪	১৫,৩০	১৫,৪৬
তন্মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া	১১,২৬	১১,৫৬	১১,৭৬	১১,৯১
মোট	৭৪,৬৭	৭৮,০২	৮১,৬১	৮১,৬৭

পশ্চিমবঙ্গে পেট্রোলিয়াম প্রাপ্তির সম্ভাবনা

প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রিদপ্তরের সেক্রেটারী ডাঃ এস. এস. ভাটনগর ১৩ই অগাষ্ট দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রদের এক সমাবেশে এই তথ্য প্রকাশ করেন—ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছেন যে, পশ্চিম বঙ্গের ১৮,০০০ বর্গ মাইল স্থান হইতে পেট্রল তুলিবার সম্ভাবনা আছে। এই কোম্পানী সম্পূর্ণ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালাইবার অধিকার চাহেন। ভারত সরকার তাহাতে সম্মত না হইয়া অন্য দুইটি কোম্পানীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। আগামী মাসে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ডাঃ ভাটনগর আরও বলেন যে, আসামের তৈলখনিগুলি ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন ভিত্তি নাই। বরং পূর্বে যেমন ধারণা করা হইয়াছিল, আসামের তৈলসম্পদ তাহা অপেক্ষা অধিক, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ডাঃ ভাটনগর বলেন যে, বোম্বাইর নিকট যে দুইটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি (ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী অধিকৃত) ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের মধ্যেই কাজ চালাইবার উপযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বার্মা অয়েল কোম্পানীর অন্য শোধনাগারটি কাজের উপযুক্ত হইতে আরও কিছু সময় লাগিবে। বিশাখাপত্তনমের নিকট তৃতীয় শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

// জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | সেপ্টেম্বর—১৯৫৩ | নবম সংখ্যা

দুর্লভ ধাতু—থোরিয়াম

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

১৭৮৮ সালে আরহেনিয়াস নামক একজন বিজ্ঞানী সুইডেনের ইটারবি নামক স্থানে এক-প্রকার নতুন ধরনের খনিজ প্রস্তর পেয়েছিলেন। এর বছর ছয়েক পরে ১৭৯৪ সালে ফিনল্যাণ্ডের একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী জোহান গ্যাডোলিন সেই প্রস্তরের ভিতর এক নতুন ধাতুর সন্ধান পান। এই ধাতুর অক্সাইডের নাম দেওয়া হয় ইট্রিয়া। কিন্তু পরে দেখা গেল—ইট্রিয়াতে ১৫।১৬ রকমের ধাতব অক্সাইড বিদ্যমান রয়েছে। গ্যাডোলিনাইট নামক খনিজ প্রস্তরে প্রায় সমধর্মী ১৫।১৬টি ধাতুর আবিষ্কার, রসায়ন-বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। এই ধাতু-গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হলো রেয়ার আর্থ, অর্থাৎ দুর্লভ মৃত্তিকা। ১৮২৮ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস সেই প্রস্তরের ভিতরেই থোরিয়াম নামক আর একটি ধাতুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই ধাতুটিও সেই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত হলো। স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ার যুদ্ধ-দেবতার নাম ওডিন, তার ছেলের নাম থর; এই থর থেকেই নব আবিষ্কৃত দুর্লভ ধাতুটির নাম হয় থোরিয়াম। এর ব্যবহার সম্বন্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়ায় তখনো এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হয় নি। কিন্তু ১৮৮৪ সালে ভন ওয়েলস্‌ব্যাক নামক একজন জার্মান ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম গ্যাসম্যাণ্টল তৈরী করে গ্যাসের স্তিমিত আলোককে উজ্জ্বল করে তোলেন। জারকোনিয়া, ল্যান্থানা এবং ইট্রিয়া—এই তিনটি ধাতব অক্সাইডের মিশ্রণ রেশমের ম্যাণ্টল-জালিতে সংবদ্ধ করা হয়েছিল। সেই ম্যাণ্টল ভাল জ্বলে নি এবং সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে যেতো। এর দু-বছর পরে কেবলমাত্র থোরিয়াম অক্সাইড এবং খুব অল্প পরিমাণে অন্যান্য দুর্লভ ধাতু সহযোগে যে ম্যাণ্টল তৈরী হলো তাথেকে ঔজ্জ্বল্য যেমন বাড়লো, জালিটাও অনেকটা দৃঢ় এবং ঘাতসহ হলো। অবশ্য এই শিল্পের এখন প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আজকাল গ্যাস-লাইট শুভ্র, নীলাভ আলোকে রাস্তা-ঘাট আলোকিত করে তোলে। গ্রামাঞ্চলে উৎসব রজনীতে চণ্ডীমণ্ডপ ডে-লাইট এবং হ্যাসাকের আলোকে দিনের আলোর মতই উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

থোরিয়াম ধাতুর উপযোগিতা লোকচক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হওয়ার পরেই শিল্পজগতে অস্বাভাবিকরূপে এর চাহিদা বেড়ে গেল। বহুপ্রকার খনিজ প্রস্তরের ভিতর থোরিয়াম ধাতুর অবস্থান আবিষ্কৃত হতে লাগল। এই সব খনিজ প্রস্তরের বেশীর ভাগই ছড়িয়ে আছে ব্রেজিল, ভারত, উরাল পর্বত, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অঞ্চল, আমেরিকার ক্যারোলিনা, ভার্জিনিয়া, টেক্সাস, কলোরেডো এবং ইডাহো অঞ্চলে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৭টি বিভিন্ন খনিজ প্রস্তর ও বালুকণায় এই সব দুর্লভ ধাতুর সন্ধান মিলেছে। থোরাইট নামক খনিজ প্রস্তরে থোরিয়াম রয়েছে বালুকণায় সংবদ্ধ হয়ে, থোরিয়াম সিলিকেট রূপে। এর রং কালো, কিন্তু কখনো কখনো এই প্রস্তর পীতাভ বাদামী রঙের স্বচ্ছ স্ফটিকের মত দেখায়। এর নাম অরেঞ্জাইট মণি। এতে রয়েছে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ থোরিয়াম অক্সাইড এবং এর সঙ্গে মেশানো আছে ইউরেনিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। থোরিয়ানাইট নামক আর একটি প্রস্তরে শতকরা ৮০ ভাগ থোরিয়াম অক্সাইড আছে। ম্যাডাগাস্কার এবং সিংহল দ্বীপে এই প্রস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু এত কম পাওয়া যায় যে, এতে সবচেয়ে বেশী থোরিয়াম বর্তমান থাকলেও থোরিয়াম ধাতু প্রচুর পরিমাণে তৈরী করবার জন্যে এই প্রস্তর ব্যবহৃত হয় না। তাছাড়া এই প্রস্তরের দামও অত্যন্ত বেশী। থোরিয়াম এবং আরো কয়েকটি দুর্লভ ধাতুসমন্বিত কয়েকটি খনিজ প্রস্তরের নাম এবং তাতে থোরিয়ামের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো:

খনিজ প্রস্তর বা বালুকণা	থোরিয়ামের পরিমাণ (শতাংশ)	যে সব অঞ্চলে পাওয়া যায়
ফেনোটাইম	০—৩	ব্রেজিল, নরওয়ে
আসচেনাইট	১৫'৭	উরাল পর্বত, নরওয়ে
ফারগুসোনাইট	০—৩	অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, টেক্সাস
সামারস্কাইট	০—৪	উরাল পর্বত, ক্যারোলিনা
অ্যালানাইট	০—৩.৫	গ্রীনল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া
থোরাইট	৬০	নরওয়ে
থোরিয়ানাইট	৮০	ম্যাডাগাস্কার, সিংহল
মোনাজাইট	১—২০	সিংহল, ভারত, ব্রেজিল

এই সব খনিজ প্রস্তর ছাড়া আরও অনেক খনিজ প্রস্তরে থোরিয়াম, সিরিয়াম ইত্যাদি দুর্লভ ধাতু স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। প্রবাল, প্রস্তর, কয়লা, অস্থি, আগ্নেয়গিরির লাভা, মাটি, এমন কি তামাক এবং ধানগাছেও কয়েকটি দুর্লভ ধাতুর উপস্থিতি ধরা পড়েছে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে এর পরিমাণ খুবই নগণ্য।

মোনাজাইট বালুকণাই থোরিয়াম নিষ্কাশনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুলভ খনিজ পদার্থ। পাহাড়ের গায়ের পেগমেটাইট, গ্র্যানাইট, জিনেসেস প্রভৃতি প্রস্তর ঝড়-জল বৃষ্টি এবং সমুদ্রের ঢেউয়ে ক্ষয়ে গিয়ে বালুকণায় পরিণত হয়েছে। পাহাড়-সংলগ্ন নদী বা সমুদ্র-তীরের এই বালুকণার নাম দেওয়া হয়েছে মোনাজাইট। কিন্তু সমুদ্রসৈকতের সব বালুকণাই মোনাজাইট নয়। মোনাজাইটের সঙ্গে অন্যান্য খনিজ প্রস্তরের গুঁড়াও মিশানো থাকে। অনেক সময় বহু নদীর নীচের বালিতেও মোনাজাইট বালুকণা দেখা গেছে; কিন্তু এর পরিমাণ অতি

সামান্য—অনেক ক্ষেত্রে ৩ শতাংশেরও কম। মোনাজাইট থেকে থোরিয়াম সংগ্রহ করতে যে খরচ হবে নদীর তলা থেকে এই বালি আহরণ করতে বোধহয় তার চেয়ে বেশী খরচ পড়বে। সমুদ্র-তীরের মোনাজাইটই সাধারণতঃ থোরিয়ামের প্রধান আকর রূপে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই বালি থেকে থোরিয়াম উদ্ধারের জন্যে চালান দেওয়া হয় কারখানায় বা রাসায়নিক গবেষণাগারে। প্রধানতঃ ভারত এবং ব্রেজিল থেকেই মোনাজাইট পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সরবরাহ হয়ে থাকে।

ধাতু হিসাবে থোরিয়াম অত্যন্ত মূল্যবান। সদ্য তৈরী থোরিয়াম ধাতুর রং সাদা, কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে এলেই রং হয়ে যায় ধূসর। একমাত্র ইউরেনিয়াম ছাড়া এই ধাতুর অণু আর সব ধাতুর অণু অপেক্ষা ভারী, অর্থাৎ ওজনে বেশী। লৌহের ন্যায় এর কিছুটা চৌম্বকত্বও আছে। খুব বেশী তাপে গরম না করলে এই ধাতুটি গলানো যায় না। বিশুদ্ধ লৌহ গলে যায় সাধারণতঃ ১৫০০° সেন্টিগ্রেড তাপে, কিন্তু থোরিয়াম গলে ১৮৪২° ডিগ্রিতে। ধাতুটি এমনিতে বেশ নরম, কিন্তু নানা প্রক্রিয়ায় একে ঘাতসহ করে তোলা যায়।

থোরিয়াম ধাতুর গুঁড়া ঘষলেই জ্বলে ওঠে। এর পাতলা পাত আগুনে ধরলে ম্যাগনেসিয়ামের মত তীব্র আলো বিকিরণ করে এবং তুবড়ীর ফিন্‌কির মত আগুন ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে। পুড়ে যাবার পর যে ছাই অবশিষ্ট থাকে সেটা হলো থোরিয়াম অক্সাইড। এই অক্সাইডরূপেই ধাতুটিকে খনিজ প্রস্তর বা বালুকা থেকে আহরণ করা হয়। থোরিয়াম প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে থাকে। ক্লোরিন গ্যাস, ব্রোমিন, আয়োডিন, গন্ধক ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে থোরিয়াম ধাতু জ্বলে ওঠে ৪৫০° তাপে। প্রায় সব অ্যাসিডেই থোরিয়াম আক্রান্ত হয়-কারো সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে থাকে খুব সহজেই; আবার কারো সঙ্গে মিলন ঘটে অত্যন্ত মন্দগতিতে। ক্ষার জাতীয় জিনিষের সঙ্গে এর ক্রিয়া দেখা যায় না। থোরিয়ামের রয়েছে অসংখ্য কম্পাউণ্ড বা যৌগিক পদার্থ। এস্থলে তাদের বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রোজন।

আণবিক শক্তি আহরণের উৎস হিসাবে ইউরেনিয়ামের পরেই থোরিয়ামের স্থান। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুগুলি অস্থির প্রকৃতির। এর ভিতরকার নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণিকাগুলি পরমাণুর গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকতে চায় না। ফলে পরমাণুগুলি ক্রমশঃ ভাঙ্গতে সুরু করে। এই ভাঙ্গনের ফলে বেরিয়ে আসে তেজ, আলো এবং বিদ্যুৎ কণার ঝড়। প্রচণ্ড তেজ এবং শক্তির আধার বলেই এই সব ধাতুকে তেজস্ক্রিয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সব ধাতু ভাঙ্গতে থাকে অবিরাম গতিতে। ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে বের হয় আলফা কণিকা বা তড়িদ্বাহী হিলিয়াম অণু। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ১ গ্র্যাম ইউরেনিয়াম থেকে ১ কিউবিক সেন্টিমিটার হিলিয়াম গ্যাস বের হতে সময় লাগে ১১০ লক্ষ বছর। এই ভাঙ্গনের ফলে নতুন নতুন ধাতু তৈরী হতে থাকে। থোরিয়াম ধাতুর নিজস্ব তেজস্ক্রিয়তা খুবই কম; কিন্তু এই ধাতুটিও ভাঙ্গতে থাকে। প্রথম ভাঙ্গনের ফলে থোরিয়াম পরিণত হয়ে যায় মেসোথোরিয়াম ধাতুতে, কিন্তু এই রূপান্তরে সময় লাগে কয়েক লক্ষ বছর। ভাঙ্গন এখানেই থামে না; কখনো মন্থর গতিতে কখনো বা দ্রুত গতিতে অণুগুলি ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং বহু লক্ষ বছর পর ভাঙ্গন যখন থেমে যায় তখন দেখা যায় যে, থোরিয়াম সীসায় পরিণত হয়েছে। এই ধাতুতে এসে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা কমে যায়, কাজেই তেজস্ক্রিয়তারও অবসান ঘটে। থোরিয়াম কি ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্রমে সীসায় পরিণত হয়, নীচে তা দেখানো হলো:

থোরিয়াম —আলফা কণিকা→ মেসোথোরিয়াম$_1$ —বিটা কণিকা ও গামা রশ্মি→ মেসোথোরিয়াম$_2$ —বিটা কণিকা ও গামা রশ্মি→

রেডিও থোরিয়াম —আলফা কণিকা→ থোরিয়াম এক্স —আলফা কণিকা→

থোরিয়াম ইমানেসন বা গ্যাস —আলফা কণিকা→ থোরিয়াম-এ —আলফা কণিকা→ থোরিয়াম-বি

—বিটা কণিকা গামা রশ্মি→ থোরিয়াম সি —বিটা কণিকা ও গামা রশ্মি→ থোরিয়াম সি' | আলফা কণিকা → সীসা

আলফা কণিকা → থোরিয়াম সি" —বিটা কণিকা ও গামা রশ্মি→ সীসা

রেডিয়ামের চাহিদা খুব বেশী, কিন্তু এত কম পরিমাণে এই ধাতুটি পাওয়া যায় যে, এর পরিবর্তে অন্য কোন ধাতুকে কাজে লাগানো যায় কিনা, সে সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান সুরু হয়। এই প্রচেষ্টার ফলেই ১৯০৫ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অটো হ্যান্ মেসোথোরিয়াম ধাতুটি আবিষ্কার করেন। থোরিয়াম ভেঙ্গে গিয়েই মেসোথোরিয়ামের সৃষ্টি। কিন্তু মেসোথোরিয়াম আবার দু রকমের। এক নম্বর আর দু-নম্বর। এক নম্বর থেকেই দু নম্বরের জন্ম। দু-নম্বর মেসোথোরিয়াম ভেঙ্গে তৈরী হয় রেডিও থোরিয়াম। এটা থোরিয়ামের সগোত্র এবং এর আণবিক সংখ্যা থোরিয়ামের সমান। রেডিও থোরিয়াম থোরিয়ামসমন্বিত খনিজে বর্তমান থাকলেও তাকে পৃথক করা সম্ভব নয়। দেখা গেছে, মেসোথোরিয়াম রেডিয়াম থেকে বেশী শক্তিসম্পন্ন। হ্যান্ বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, এক মিলিগ্রাম মেসোথোরিয়াম ৩০০ মিলিগ্রাম রেডিয়ামের সমান শক্তিশালী। থোরিয়ামসমন্বিত খনিজ প্রস্তর বা বালুকণাতেই মেসোথোরিয়াম নিহিত থাকে। এক মেট্রিক টন মোনাজাইট বালুকা থেকে ২.৫ মিলিগ্রাম মাত্র মেসোথোরিয়াম পাওয়া যায়। সমগ্র পৃথিবীতে থোরিয়াম নিষ্কাশনের জন্যে বছরে যে পরিমাণ মোনাজাইট সংগৃহীত হয় তার পরিমাণ তিন হাজার টন, এ থেকে প্রায় ৭ গ্রাম মেসোথোরিয়াম পাওয়া যেতে পারে। ২০০ টন রেডিয়ামসমন্বিত খনিজ, পিচব্লেণ্ড ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায় এক গ্রাম রেডিয়াম। আবিষ্কারের পর এ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ৫০ গ্রামের বেশী রেডিয়াম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। রেডিয়াম যে প্রক্রিয়াতে নিষ্কাশন করা হয়—মেসোথোরিয়ামও সেই প্রণালীতে নিষ্কাশন করা যায়। স্বয়ংপ্রভ পেইন্ট তৈরীতে মেসোথোরিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধাতুঘটিত রঙের প্রলেপ কোন জিনিষের গায়ে লাগালে তা অন্ধকারেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মেসোথোরিয়াম ক্রমশঃ ভেঙ্গে গিয়ে পরিণত হয় রেডিও থোরিয়ামে। এর জন্যেই

রঙের দীপ্তি ক্রমশঃ বেড়ে যায়। পাঁচ বছর পরে এই স্বয়ংপ্রভ শক্তি সব চেয়ে বেশী হয়। রেডিও থোরিয়াম থেকে আলফা কণিকা বিচ্ছুরণই এই ঔজ্জ্বল্যের কারণ। এই রেডিও থোরিয়ামও ক্রমশঃ দ্রুতগতিতে ভাঙ্গতে থাকে—প্রতি পাঁচ-ছয় বছর পর পর এই স্বয়ংপ্রভা অর্ধেক কমে যায়। কাজেই এই পেইণ্ট দীর্ঘস্থায়ী নয়।

আণবিক বোমার ধ্বংস-শক্তির কথা আমরা সবাই জানি। পরমাণু ভাঙ্গনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয়, তাকে ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে জনকল্যাণে নিয়োজিত করবার জন্যে বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন। ১৯৩৪ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফার্মি নিউট্রন নামক নিস্তড়িৎ কণিকার আঘাতে ইউরেনিয়াম ধাতুকে ভাঙ্গতে সক্ষম হন। পরে দেখা গেল—যে ইউরেনিয়ামের আণবিক ওজন ২৩৫, সেটাই নিউট্রনের আঘাতে ভেঙ্গে যায়। এই ভাঙ্গনের ফলে তৈরী হয় নতুন নতুন ধাতু এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক নিউট্রন। এই নবোদ্ভূত নিউট্রনগুলি আবার সেই সব ধাতুকে ভাঙ্গতে সুরু করে। এই ভাঙ্গন-প্রক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। ১৮ টন কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, মাত্র এক গ্রাম ইউ-রেনিয়াম ভাঙ্গনে সেই পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হয় মুহূর্তমধ্যে। ২০,০০০ টন টি. এন. টি-র বিস্ফোরণে যে তাপ উৎপন্ন হয়, মাত্র এক সের ইউরেনিয়ামের ভাঙ্গনে উৎসারিত হয় সেই পরিমাণ উত্তাপ। থোরিয়ামকেও এরূপ ভাঙ্গনের দ্বারা প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যেতে পারে। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হান্, মাইটনার এবং আরো অনেকে দেখিয়েছেন যে, নিউট্রন কণিকার আঘাতে থোরিয়ামেরও রূপান্তর ঘটানো যেতে পারে।

২৩২ আণবিক ওজনের থোরিয়াম একটি নিউট্রন কণিকাকে আত্মসাৎ করে রূপান্তরিত হবে ২৩৩-আণবিক ওজনের আর একটি থোরিয়াম ধাতুতে। এর ফলে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হবে। তারপর এই থোরিয়াম থেকে আলফা কণা বেরিয়ে গিয়ে উৎপন্ন হবে অ্যাকটি-নিয়াম ধাতু। এটা রেডিয়ামের সমধর্মী বা সমপদ। এর থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গিয়ে আবার তৈরী হবে প্রোটোঅ্যাকটেনিয়াম ধাতু। এটা থেকে আবার ধীরে ধীরে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে উৎপন্ন হবে ২৩৩-আণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম। কাজেই নিউট্রন সংস্পর্শে থোরিয়ামের রূপান্তর ঘটানো যায় ইউরেনিয়ামে, যার আণবিক ওজন ২৩৩। এই ইউরেনিয়াম সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন সিবর্গ নামক বিজ্ঞানী, ১৯৪২ সালে। এই ইউরেনিয়ামকেও আবার নিউট্রনের আঘাতে ভেঙ্গে দিয়ে আণবিক শক্তির উদ্ভব ঘটানো যেতে পারে। আণবিক শক্তির উৎস হিসাবে আজকাল থোরিয়াম ধাতুর চাহিদা বেড়ে চলেছে। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও আণবিক গবেষণা সুরু হয়েছে। কি করে থোরিয়াম থেকে উৎপন্ন হবে শক্তি এবং কিভাবে এই শক্তিকে নিয়োজিত করা যাবে মানুষের কল্যাণকর কাজে, শান্তিকামী ভারতের এটাই হবে লক্ষ্য।

তেল ও চর্বি

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

তেল ও চর্বি আমাদের সকলেরই পরিচিত। তেল বলতে একমাত্র উদ্ভিজ্জ বীজের তেলকে গণ্য করা হয়, খনিজ পেট্রোলিয়াম বা বিভিন্ন পুষ্পজাত সুগন্ধি তেলও এই পর্যায়ে পড়ে না। জান্তব তেলকে সাধারণতঃ চর্বি বলা হয়, ইংরেজীতে ফ্যাট বলে। চর্বি ও তেলের মধ্যে একরূপ পার্থক্য দেখান হয়—সাধারণ তাপমাত্রায় যে সকল তেল কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয় তাদেরই ফ্যাট বা চর্বি বলা হয়, কিন্তু আবার তরল অবস্থায় উপনীত হলেই তেল বলা হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে নারকেল তেল তরল এবং শীতকালে কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন নারকেল তেলকে উদ্ভিজ্জ চর্বি বা ভেজিটেবল ফ্যাট বলা হয়। ঘি-ও ঠিক এই প্রকারের। শীতকালে উহা ফ্যাট আর গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ তরল, সুতরাং তখন তেল। রাসায়নিকের দৃষ্টিতে কিন্তু তেল ও চর্বির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একই পদার্থের, অর্থাৎ গ্লিসারাইডের সমবায়ে গঠিত। গ্লিসারিন ও বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থকে গ্লিসারাইড বলে। বাংলা ভাষায় তেল ও চর্বিকে স্নেহজাতীয় পদার্থের শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তেল ও চর্বির একটি প্রধান ধর্ম এই যে, উহারা জলের সহিত মিশ খায় না।

তেল ও চর্বির উৎস

যে কোন প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের উপাদান হিসাবে স্নেহজাতীয় পদার্থ অতীব প্রয়োজনীয়। তেল ও চর্বি প্রকৃতির সর্বত্র বিস্তৃত দেখা যায়। যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন-চক্রের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণ তেল ও চর্বি উৎপন্ন ও সঞ্চিত থাকে। যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী ব্যবসায়ের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে তেল ও চর্বি উৎপাদন করে তাদের সংখ্যা কিন্তু অপেক্ষাকৃত খুবই কম।

শস্যের বীজই বর্তমানে তেলের বৃহত্তম উৎস; যেমন—তিসি, সরিষা, রেড়ি, সয়াবিন, কার্পাস বীজ, বাদাম ইত্যাদি। এদের মধ্যে কয়েকটি শস্য, যেমন—তিসি, রেড়ি, সরিষা ইত্যাদি কেবলমাত্র তেলের জন্যে চাষ করা হয়। কিন্তু সয়াবিন ও বাদাম শুধু তেলই উৎপাদন করে না, তাদের খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। কার্পাস ও ভুট্টা চাষ করা হয় তুলা ও শ্বেতসারের জন্যে, এ থেকে তেল উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় মাত্র। সাধারণতঃ এই সকল শস্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মে থাকে।

দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে, কয়েক প্রকার তৈলধারী বৃক্ষ, যেমন—নারকেল, বিভিন্ন শ্রেণীর তাল, জলপাই, টুং ইত্যাদি। টুং তেল চীনদেশের এক-চেটিয়া।

স্থলচর জন্তুর চর্বি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর গৃহ-পালিত পশু থেকে পাওয়া যায়—শূকর, গো-মহিষ ও ভেড়া। এই সকল প্রাণীর মৃতদেহ থেকে যে পরিমাণ চর্বি পাওয়া যায় তা তাদের দুগ্ধজাত চর্বির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নহে।

সমুদ্র থেকেও বহুল পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। সার্ডিন, হেরিং, মেনহাডেন ও অন্যান্য বহু সামুদ্রিক মাছ থেকে এই তেল উৎপাদিত হয়। তিমির তেলের পরিমাণ এই সকল মাছের তেল অপেক্ষা অনেক বেশী এবং প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জ তেলের পরিমাণের প্রায় সমতুল হয়ে থাকে।

তৈলবীজ ও তৈলধারী সামগ্রী উৎপাদনে ভারত

ভারতবর্ষ তৈলবীজ ও তৈলধারী সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে এক উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। পাঁচ শতেরও অধিক বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজ ও তৈলধারী সামগ্রী আমাদের দেশে পাওয়া যায় এবং প্রতি বৎসর এক কোটি টনের মত তৈলবীজ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কয়েক প্রকার তৈলবীজ, যেমন -রেড়ি, নিম, মহুয়া, কাজু-বাদাম প্রভৃতির ব্যবসায়ে ভারতের একাধিপত্য বর্তমান। ভারতের সাবতীয় কৃষিদ্রব্যের মধ্যে তৈলবীজের স্থান দ্বিতীয়।

ভারতের সমুদ্রোপকূলে প্রচুর নারকেল গাছ ও সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়। সামুদ্রিক তেল উদ্ধারের চেষ্টা বর্তমানে সুরু হয়েছে মাত্র। এদেশের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। ভারতের পরেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। ভারতে প্রতি বছর মোটামুটি আড়াই কোটি টনের অধিক ঘি ও মাখন উৎপাদিত হয়। তার মূল্য আন্দাজ ৫০০ কোটি টাকা।

তেল নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত খোল ভাল সার ও গবাদি পশুর আহার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ভারতে তৈলবীজ ও তৈলধারী সামগ্রীর প্রচুর সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসী স্নেহজাতীয় পদার্থের অভাব অনুভব করে থাকে এবং উপযুক্ত সারের অভাবে কৃষিকার্যের উন্নতিও যথোচিত সাধিত হয় না।

মানুষের খাদ্য তালিকায় তেল ও চর্বির স্থান

পৃথিবীতে যে পরিমাণ তেল ও চর্বি উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যয়িত হয়। তেল ও চর্বি থেকে আমরা মূলতঃ তাপ ও শক্তি পেয়ে থাকি। সম ওজনের আমিষ ও শ্বেতসার জাতীয় দ্রব্য অপেক্ষা তেল ও চর্বি দ্বিগুণ পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে থাকে। প্রতি গ্রাম তেল ও চর্বি থেকে মোটামুটি প্রায় ৮ কিলোক্যালরী তাপ উৎপন্ন হয়। অসুস্থ অবস্থায় ও উপবাসের সময় সঞ্চিত চর্বি থেকে শক্তি পাওয়া যায়। ত্বকের সামান্য নীচেই চর্বির একটি আবরণ রয়েছে, এই চর্বি শরীরের তাপ বাইরে বিকিরিত হতে বাধা দেয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্তু গঠনে চর্বির প্রয়োজন আছে, তাছাড়া ইহা শরীরের অন্যান্য তন্তুও শক্তভাবে গঠন করে। যথেষ্ট পরিমাণ চর্বি শরীরে বর্তমান না থাকলে একান্ত উপযোগী খনিজ ক্যালসিয়াম শরীর গঠনের কাজে ঠিকমত লাগতে পারে না। চর্বি, পাকাশয় ও অন্ত্রের মত নরম ও স্পর্শকাতর তন্তুকে অনুপযুক্ত বা বিকৃত খাদ্যজাত বিভিন্ন অম্লের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাকে। প্রাকৃতিক তেল ও চর্বির মধ্যে এ, ডি এবং ই প্রভৃতি নানাবিধ ভিটামিন বর্তমান। তারা বিভিন্ন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে থাকে।

পুষ্টির কথা বাদ দিলেও তেল ও চর্বি আমাদের রন্ধনকার্যে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে থাকে। রান্না-করা উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্য—স্যালাড, সস্ ইত্যাদি টিনের মধ্যে সংরক্ষণ করতে তেলের আবশ্যক হয়। তাছাড়া কেক্, রুটি, বিস্কুট পেষ্ট্রি, ক্র্যাকার প্রভৃতি যে সকল খাদ্যদ্রব্য সেঁকে তৈরী করা হয় তাতেও চর্বির দরকার। খাদ্যসামগ্রী ভাজতে হলেও তেলের প্রয়োজন। তেল খুব দ্রুত ও সমভাবে তাপ পরিবহন করে থাকে এবং খাদ্যদ্রব্যের উপরিভাগে একটি সংরক্ষক আবরণ সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের তেল রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলা দেশে সরিষা, দক্ষিণ ভারতে নারকেল, ইউরোপে জলপাই, আমেরিকায় তুলাবীজ ও ভুট্টা, জার্মেনীতে পোস্ত, চীন, ভারত ও ব্রহ্মদেশে চিনাবাদাম ও তিল প্রভৃতির তেল প্রচলিত।

বৃটিশ খাদ্যমন্ত্রী দপ্তরের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা

বিভাগের ১৯৪৫ সালের পুষ্টি বার্ষিকীতে বলা হয়েছে—"খাদ্য হিসাবে সকল তেল ও চর্বি সমমূল্যের। যদিও কয়েক প্রকার প্রাকৃতিক তেল ও চর্বিতে অন্যবিধ পুষ্টিকর পদার্থ নিহিত আছে, কিন্তু তেল ও চর্বির কথা ধরতে হলে, তাদের সকলকে একই গুণসম্পন্ন বলে গ্রহণ করতে হবে।"

শিল্প-জগতে তেল ও চর্বির স্থান

বনস্পতি শিল্প—কয়েক প্রকার তেলকে হাইড্রোজেন সংযুক্ত করলে সেগুলি কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। বাজারে সাধারণতঃ উহা উদ্ভিজ্জ ঘৃত বা বনস্পতি নামে পরিচিত। ভারতে বর্তমানে মোট চল্লিশের উপর হাইড্রোজেনেশন কারখানা গড়ে উঠেছে। দৈনিক প্রায় এক হাজার টন বনস্পতি উৎপাদিত হয়। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে চিনি শিল্পের পরই এই শিল্পের স্থান। ১৫,০০০ হাজারের অধিক লোক এবং প্রায় ২৫ কোটি টাকা এই শিল্পে নিয়োজিত আছে।

চিনাবাদাম, কার্পাস বীজ, মহুয়া প্রভৃতি তেল এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাবান শিল্প সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সাবানের ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। বর্তমানে অনেক সাবানের কারখানা আমাদের দেশে আছে। আজকাল দেশী ও বিদেশী সাবানের গুণাগুণ একই স্তরের।

তেল ও চর্বিকে কষ্টিক সোডা সহযোগে রাসায়নিক বিক্রিয়া করলে সাবান উৎপন্ন হয় এবং গ্লিসারিন মুক্ত হয়। নারকেল, তাল, মহুয়া, চর্বি, বাদাম ইত্যাদি তেল সাবান শিল্পে নিয়োজিত হয়।

রং, ভার্নিশ ইত্যাদি শিল্প—তিসির তেল যদি কোন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, কিছুদিন পরে দেখা যাবে সেখানে একটা হাল্কা অথচ শক্ত আবরণের সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল তেলে এইরূপ শুকিয়ে যাবার ধর্ম বর্তমান তাদের 'ড্রাইং' তেল বলা হয়। চীনদেশের টুং তেল এইরূপ একটি ড্রাইং তেল। এই তেলে রং গুলে পেণ্ট করে দিলে তা শুকিয়ে গিয়ে এক স্থায়ী সুন্দর আবরণের সৃষ্টি করে থাকে।

রং, ভার্নিশ, ছাপাখানার কালি, ওয়াটার প্রুফ, ত্রিপল, লিনোলিয়াম, অয়েল ক্লথ প্রভৃতি শিল্পে তিসির তেলের একাধিপত্য। ল্যাটিন ভাষায় তিসিকে লিনসিড্ এবং তেলকে ওলিয়াম বলা হয়। এই লিনসিড ও ওলিয়াম শব্দের মিলনে লিনোলিয়াম কথাটির সৃষ্টি হয়েছে।

আরও যে সকল ক্ষেত্রে তেল ও চর্বির প্রয়োজন হয় সংক্ষেপে তাদের কয়েকটি কথা বলা হচ্ছে। ঔষধ হিসাবে জোলাপ রূপে রেড়ি বা ক্যাষ্টর অয়েল, ক্রোটন তেল, ভিটামিনের উৎসরূপে কড্, হ্যালিবাট এবং চর্মরোগে চালমুগরা প্রভৃতির তেল, কেশবিন্যাসে নারকেল, তিল, ম্যাকাসার, রেড়ির তেল, হাইড্রোলিক প্রেস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে লুব্রিক্যাণ্ট হিসাবে রেড়ির তেল, কার্পাস বীজের তেল, ঘড়ির মত সূক্ষ্ম যন্ত্রাদিতে 'নিটস্ ফুট অয়েল', জলপাই তেল ইত্যাদি, প্রদীপ জালাতে রেড়ি, সরিষা ও সিমূল বীজের তেল প্রচলিত আছে।

বিজ্ঞান-শিক্ষায় বীক্ষণাগার

শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্থান আজ সর্বোচ্চে। সভ্যতার সংগঠক ও পরিবাহক হিসাবে বিজ্ঞানের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষালাভের আশায় শিক্ষার্থীরা দলে দলে শিক্ষামন্দিরের প্রাঙ্গনে আসিয়া সমবেত হইতেছে। বর্তমান ছাত্রসমাজের একটা প্রধান অংশ হইল বিজ্ঞানের ছাত্র। অথচ আমাদের দেশে বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থাই বিশেষভাবে অবহেলিত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিতেছে প্রতি বছর বহু ছাত্রই, কিন্তু তাহার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহার মূলে রহিয়াছে আমাদের ত্রুটীপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা।

অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ, প্রতিভা উন্মেষের প্রকৃষ্ট সময় বাল্যকাল; কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে তেমন কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই যাহাতে ছাত্রগণেব চিন্তাধারা বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। যদিও বিদ্যালয়ের দারিদ্র্যই ইহার মূল কারণ, তথাপি শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটীও ইহার জন্য দায়ী কম নয়। বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকার বিরাট বোঝা শিশুদের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটী অনেক এবং সংস্কারও তাহার বহু করিতে হইবে, সুতরাং বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা খুব শীঘ্রই কিছুই হইবে বলিয়া মনে হয় না। শান্তিও শৃঙ্খলারক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহশীল সরকার যদি এই দিকে একটু দৃষ্টিদান করেন তবে হয়তো কিছুটা আশা করিতে পারা যায়।

বস্তুতঃ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কলেজে আসিলে ছাত্রেরা বিজ্ঞানের সহিত সম্যক পরিচিত হইবার প্রথম সুযোগ পায়। কিন্তু এখানেও তাহাদের নিস্তার নাই। পাঠ্যতালিকার বিরাট বোঝার ভার তাহাদের মৌলিক চিন্তাধারাকে পঙ্গু করিবার কাজে এখানেও নিযুক্ত। মাধ্যমিক পর্যায়ের (I. Sc.) ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্য শিক্ষা করিবার বিরাট বোঝা চাপাইয়া বিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তা করিবার মনকে সংকুচিত করিয়া ফেলা হয়। শিক্ষালাভ করা নহে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাহাদের চরম লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের নম্বর ও উত্তীর্ণ হইবার প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব দান করিতে তাহারা বাধ্য হয়। বিদেশী ভাষা, বিদ্যালয়ের ত্রুটীপূর্ণ শিক্ষা এবং পরীক্ষায় সর্বাপেক্ষা বেশী নম্বর রাখিবার জন্য কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, ছন্দ, মৌলিক প্রবন্ধ রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয় বলিয়া ইংরাজী মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান ছাত্রদের নিকট সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং ভীষণ একটা বিভীষিকার বস্তু। অথচ বিপরীত কারণে বীক্ষণাগার ছাত্রদের নিকট অবহেলিত। ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেক্সপিয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাঠে কাটাইতে হয় এবং তাহা যদি না করে তবে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইলেও বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে গৌণ ইংরাজী সাহিত্যে সম্যক জ্ঞানের অভাব, এই অজুহাতে তাহাদের উত্তীর্ণ করা হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কয়েক বৎসরের মাধ্যমিক বিজ্ঞান পরীক্ষায় বহু সংখ্যক ছাত্রকে কেবলমাত্র ইংরাজীর জন্য পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইতে

দেখিয়া বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটা ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজীর জন্য পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইতে হইবে—এই ভয়ে বর্তমান ছাত্রগণ বিজ্ঞানের বিষয়ে অধিকতর উৎকর্ষতার পরিচয় দিবার জন্য এবং বীক্ষণাগারের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি মননশীলতার অভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষারক্ষেত্রে বীক্ষণাগার তাই আজ অবহেলিত হইতেছে। বীক্ষণাগারের শিক্ষার মধ্যে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে বলিয়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আসিয়া বিরাট ব্যর্থতার পরিচয় দিতেছে। স্নাতকোত্তর পরীক্ষাদিতে সাফল্য অর্জনের পরেও বহু ছাত্রের মধ্যে এ জন্যই বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে তাহাদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বিজ্ঞানের ছাত্রদের একটি বিরাট অংশ ভবিষ্যৎ জীবনে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে, ইহাও তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। আবার বিজ্ঞানের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও অনেক সময় সাধারণ যন্ত্রপাতি পরিচালনা করিবার জ্ঞানের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁহারা কেবল যন্ত্রপাতির ব্যবহারযোগ্য জ্ঞানের অভাবে নিজেদের গবেষণা সঠিকভাবে করিতে অথবা কোন মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হন না।

বীক্ষণাগারের শিক্ষাও ছাত্রগণের মৌলিক গবেষণা করিবার স্পৃহা জাগ্রত করে না এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া তাহার কলকৌশল আয়ত্বের দ্বারা ভবিষ্যতে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইবার মত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে না। বিজ্ঞানের মূল সূত্রাদির পরীক্ষা করিবার নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী ছাত্রদের কাজ করিতে হয় এবং ঐ পরীক্ষাগুলি কিরূপে করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বহু সাহায্য-পুস্তক আছে। কোন একটি পরীক্ষণীয় বিষয়ের তথ্য কি, কিরূপ যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে হইবে, পরীক্ষালব্ধ ফল কিভাবে লিখিতে হইবে—ইত্যাদি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় এমনভাবে এই সমস্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যে, যে কোন ছাত্র কিছু না জানিয়াই বইয়ের নির্দেশমত কাজ করিতে পারিলে পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করিতে পারিবে। কাজেই পরীক্ষণীয় বিষয়টির জন্য মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজনই তাহারা বোধ করে না। এই সুবিধার জন্য অধিকাংশ ছাত্র যান্ত্রিকভাবে কাজ করিয়া বীক্ষণাগার হইতে কোন শিক্ষাই লাভ করিতে পারে না। একদিকে পাঠ্যতালিকার বিরাট বোঝা, অপরদিকে এইরূপ সুবিধা—ছাত্রগণের নিকট বীক্ষাণাগারকে অবহেলার বস্তু করিয়া তুলিতেছে।

অথচ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস হইতে দেখা যায়, বিজ্ঞান-শিক্ষার কেন্দ্র হইল—শিক্ষাব্যবস্থায় অবহেলিত এই বীক্ষণাগার। প্রাচীন কাল হইতে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের সময় হইতে গ্যালিলিও, নিউটনের সময় পর্যন্ত দেখা যায়—বৈজ্ঞানিকেরা অভিনব তথ্যাদি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রয়োগের জন্য নিজস্ব বীক্ষাগারে নিজেরাই যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেন এবং সেইজন্য তাঁহারা বিজ্ঞান সাধনা করিতেন বীক্ষণাগারেই। পরবর্তী যুগে তরুণ বৈজ্ঞানিকদের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাগারে সাহায্যকারী হিসাবে শিক্ষালাভ করিতে দেখা যায়। বর্তমানে ব্যাপক প্রসারের জন্য যদিও এই শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা প্রায় লোপ করিয়া দিয়া সকল দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় ইহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তবুও অনেকেই স্বীকার করেন যে, শিক্ষানবিশী শিক্ষা বর্তমান ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর। বিজ্ঞান-শিক্ষা সহজলভ্য হওয়ায় বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, সেই তুলনায় প্রকৃত

বিজ্ঞান-সাধকের সংখ্যা বাড়িয়াছে অতি অল্প। তবু বিদেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যাহাতে পরিস্ফুট হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পর যাহাতে ছাত্রদের বহুলাংশ বিজ্ঞানের মৌলিক সাধনা করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষানীতিকে পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এই সকল বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশই পান না।

বিজ্ঞান-শিক্ষাক্ষেত্রে বীক্ষণাগারকে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া উচিত। বীক্ষণাগারের শিক্ষা এইরূপ হওয়া উচিত যে, ছাত্রগণের নিকট বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও তথ্যাদির ধারণা সুপরিস্ফুট হইয়া যায় এবং মৌলিক গবেষণার জন্য স্বতস্ফূর্তভাবেই আগ্রহ জন্মায়। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের বিরাট পাঠ্যতালিকার বোঝা হ্রাস করিয়া তাহাদের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার বেশী সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক মূল সূত্রাদির পরীক্ষা করিবার পাঠ্যতালিকা এবং পরীক্ষা গ্রহণের প্রশ্ন এইরূপ হওয়া উচিত যে, ছাত্রদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি কাজে লাগাইবার প্রয়োজন হইবে এবং তাহাদের মৌলিক চিন্তা করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। যান্ত্রিক উপায়ে কোন রকমে পরীক্ষা সমাধা করিয়া দেওয়াই যেন ছাত্রদের লক্ষ্য না হয়, সে বিষয়ে অবহিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রেরা যাহাতে নিজেরাই বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় পরীক্ষা করিতে আগ্রহান্বিত হয়, সে বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া কর্তব্য এবং উন্নত সভ্যদেশের ছাত্রেরা যেমন বিজ্ঞান-গবেষণার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে, তাহার জন্যও তাহাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য সভ্যদেশের মত আমাদের দেশের ছাত্রদের নিজস্ব বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান বা বীক্ষণাগার নাই। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া ছাত্রগণ যদি নিজস্ব বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান এবং বীক্ষণাগার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে তবে কেবল তাহাদের বিজ্ঞান-শিক্ষাই যে সম্পূর্ণ হইবে তাহা নহে, তাহাদের বিজ্ঞান-সাধনা দ্বারা দেশ ও জাতি প্রত্যক্ষভাবে ফললাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

পাঁউরুটির কথা

শ্রীউমাতোষ সরকার

গত বছর বড়দিনের ছুটিতে আমার এক বন্ধু, কলিকাতার নামকরা এক কলেজের অধ্যাপক, হপ্তাখানেকের জন্য আমার গাঁয়ের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। স্থানটি একেবারে অজ পাড়াগাঁ—নাগরিক সভ্যতার ছোটখাট কোন ঢেউও সেখানে গিয়া পৌছায় নাই।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া নবীন মুদির দোকানে পাউরুটি দেখিয়া বন্ধুবর অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন—সে কি হে! তোমাদের এখানে পাউরুটি পাওয়া যায় দেখছি! আমার তো ধারণা ছিল—চাল, ডাল, নুন, তেল ও হাঁটু পর্যন্ত কাপড় ছাড়া তোমার গাঁ আর কিছুই জানে না।

আমি বলিলাম—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমার ঠাকুরদাদার আমলেও এ অঞ্চলে রুটি তৈরী হতে দেখেছি।

বন্ধু বলিলেন—বল কিহে? তাহলে তো তোমার গাঁ রীতিমত সভ্যতার আলোক পেয়েছে, বলতে হবে।

এবার আশ্চর্য হবার পালা আমার। বলিলাম—তুমি পাউরুটি তৈরী করাটাকে সভ্যতার একটা মস্ত বড় নিদর্শন বলে মনে কর নাকি?

বন্ধু বলিলেন—নিশ্চয়ই।

শিক্ষিত বন্ধুটির অজ্ঞতায় নির্বাক হইয়া গেলাম।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এমন কি প্রস্তর যুগেও যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা পাউরুটি প্রস্তুত করিতে জানিতেন, সুইজারল্যাণ্ডের কতকগুলি হ্রদের তীরে খননকার্য চালাইবার সময় তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কেবল যে গম পেষণ করিবার ও রুটি সেঁকিবার প্রস্তরনির্মিত সরঞ্জামই পাওয়া গিয়াছে এমন নহে, প্রচুর রুটিও ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। ঐ রুটিগুলির উপরিভাগ অগ্নির সাহায্যে পোড়াইয়া সংরক্ষণ করা হইয়াছিল বলিয়া এখনও ঐ সমস্ত রুটির ভিতরের অংশ অবিকৃত আছে। Robenhausen-এ Meiskomer ৮ পাউণ্ড ওজনের এরূপ একটি পোড়া রুটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর অর্ধপিষ্ট গমের মাখা তাল রাখিয়া এবং তাহার উপর জলন্ত ছাই চাপাইয়া ঐগুলি প্রস্তুত করা হইত।

লিখিতভাবে পাউরুটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জেনেসিসের অষ্টাদশ অধ্যায়ে—যেখানে আব্রাহাম ম্যামার-এর সমতল ভূমিতে তিনটি পরীকে পাউরুটি খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সোডোম নগরীতে লট্ দুইজন দেবদূতকে খমির দ্বারা স্ফীত নহে এইরূপ রুটির ভোজ দিয়াছিলেন। খমির দ্বারা স্ফীত নহে—এই কথাটির উল্লেখ হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তখনকার দিনেও খমির বা অন্য উপায়ে স্ফীত এবং স্ফীত নহে, আধুনিক কালের এই দুই প্রকার প্রধান রুটিরই প্রচলন ছিল।

প্রাচীনকালে খুব সম্ভবতঃ মিশরেই রুটি প্রস্তুতের কৌশল সবচেয়ে উন্নত ছিল এবং তখনকার দিনের ফ্যারাও র প্রধান রুটি প্রস্তুত-কারকের রুটি প্রস্তুতের কৌশল মোটামুটিভাবে এখনকার শ্রেষ্ঠ রুটি প্রস্তুতকারকের কৌশল হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। মিশরবাসীরা নানা আকারের রুটি প্রস্তুত করিতেন এবং

ঐগুলিতে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্যও ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসও এবিষয়ে খুব বেশী পশ্চাৎপদ ছিল না। The Deipnosophists of Athenaeus নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে—প্রাচীন গ্রীক রুটি-শিল্পীরা বাষট্টি রকমের রুটির প্রস্তুতপ্রণালী জানিতেন। অতঃপর ক্রমশঃ উত্তরাঞ্চলে রুটি-শিল্প ছড়াইয়া পড়ে; কিন্তু এখনও এশিয়া ও ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে কেবল মাত্র উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই রুটির প্রচলন সীমাবদ্ধ আছে।

বন্ধুকে অবশ্য এ সব কথা বলি নাই। কিন্তু এত কথা লিখিবার পর রুটি প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে দুই-একটি কথা উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রুটি-প্রস্তুত শিল্পে গমের ময়দা ব্যবহারের তুলনায় অন্যান্য শস্যচূর্ণের ব্যবহার নগণ্য। ওট বা যইচূর্ণ দ্বারা তৈয়ারী রুটি অবশ্য বহু স্থানে প্রচলিত আছে। উত্তর ইউরোপের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাইচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত খমির দ্বারা স্ফীত এবং স্ফীত নহে—এই দুই রকমের রুটির বহুল প্রচলন আছে। চীন ও ভারতবর্ষে রুটি প্রস্তুতের জন্য গমের ময়দা ব্যতীত যবাদি শস্যচূর্ণও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গমের ময়দায় প্রস্তুত রুটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) সাধারণ রুটি

(২) খমির দ্বারা বা অন্য উপায়ে স্ফীত রুটি।

যে সমস্ত রুটি অগ্নিতে সেঁকা হইবার পূর্বে খমির দ্বারা বা অন্য উপায়ে ভিতরে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস উৎপন্ন করিয়া স্ফীত বা ছিদ্রবহুল করা হয় না, তাহাকে সাধারণ রুটি বলে। বর্তমান প্রসঙ্গে কিন্তু খমির দ্বারা বা অন্য উপায়ে স্ফীত রুটি বা পাঁউরুটির সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

পাঁউরুটি প্রস্তুত করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে, যথা—

(১) মাখা ময়দা খমির দ্বারা গাঁজাইয়া উহাতেই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস উৎপন্ন করা—ইহাই রুটি প্রস্তুত করিবার সাধারণ এবং প্রধান উপায়।

(২) পূর্ব হইতেই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস দ্বারা বাতান্বিত জলের সহিত মাখা ময়দা মিশ্রিত করা। ডাঃ ডগ্‌লিশের পেটেণ্ট বাতান্বিত রুটি এই ভাবেই প্রস্তুত হইত।

(৩) মাখা ময়দার সহিত মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস মুক্ত করিয়া। ডড্‌সনের পেটেণ্ট রুটি এই পর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, খমির সাহায্যে গাঁজানো রুটির প্রচলনই সর্বাধিক। প্রাচীনকালে সাধারণতঃ মাখা ময়দা গাঁজাইতে পূর্বে প্রস্তুত রুটিরই খানিকটা অংশ ব্যবহার করা হইত। এখনও পারস্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। ঈষ্ট নামক আধুনিক কালের বহুল প্রচলিত খমির ব্যবহার সম্ভবতঃ ফ্রান্সেই প্রথম হয়।

পাঁউরুটি প্রস্তুত-প্রণালী মোটামুটি এইরূপ:—প্রায় ৬ পাউণ্ড আন্দাজ খোসা ছাড়ানো সিদ্ধ ও পিষ্ট আলু এবং এক বস্তা ময়দা উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি বড় পাত্রে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া লওয়া হয়। উহার উষ্ণতা নামাইয়া ৭০° ফাঃ—৯০° ফাঃ-এর মধ্যে রাখা হয়। পূর্ব হইতেই একটি স্বতন্ত্র পাত্রে প্রায় ২½ পাউণ্ড ঈষ্ট ও ১২ পাউণ্ড ময়দা গরম জলে ভাপাইয়া রাখা দরকার। তারপর মাখা ময়দা ও আলুর তালের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দেওয়া হয়। মিশ্রণের পর সমগ্র জিনিষটি কয়েক ঘণ্টা ফেলিয়া রাখা প্রয়োজন। এই সময় উহার মধ্যে সন্ধান (fermentation) চলিতে থাকে। অল্পক্ষণ পরেই সন্ধানের ফলে উৎপন্ন কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বুদ্বুদের মত বাহিরে আসিতে থাকে এবং মাখা ময়দার তালের ভিতর দিয়া গ্যাসটি সজোরে বাহির হইবার ফলে সমগ্র জিনিষটি ছিদ্রবহুল ও হাল্কা হইয়া যায়।

ঠিক কোন সময় উহা সেঁকিবার উপযুক্ত হয়, তাহা রুটি প্রস্তুতকারকেরা বুঝিতে পারে। তখন উহাকে সাইজ মত কাটিয়া টুকরা টুকরা করা হয় এবং সেঁকিবার জন্য দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ৫৫০° ফাঃ—৬০০° ফাঃ উত্তাপে ১ ঘণ্টা হইতে ১½ ঘণ্টা যাবৎ রুটি সেঁকা হয়।

সেঁকিবার ফলে রুটির বাহিরের অংশেরই কেবল মাত্র পরিবর্তন হয়, ভিতরের অংশের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। তবে ইহাতে রুটির সমগ্র অংশই ফাঁপিয়া উঠে এবং তাহার ফলে রুটি সহজ-পাচ্য হইয়া থাকে। রাইকেনবাক্-এর মতে সেঁকিবার ফলে রুটির উপরিভাগে assamar নামক একটি পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহা টিস্যুর ক্ষয় নিবারণ করে।

ভাল ভাবে প্রস্তুত সেঁকা রুটির পোড়া অংশটি হরিদ্রাভ পিঙ্গলবর্ণ, ভিতরের অংশ নিখুঁত-ভাবে ছিদ্রসমন্বিত এবং 'eye' বা বড় বড় বায়ু-প্রকোষ্ঠবিহীন হয়। ভাল টাট্‌কা রুটি নরম হওয়া উচিত। স্বাদে কোনও প্রকার অম্লত্ব থাকা উচিত নহে; অন্ততঃ দুই-তিন দিন স্বাদে ও গন্ধে অপরিবর্তিত থাকা উচিত। ভাল রুটি চার-পাচ দিনের বাসি হইলেও আগুনে একবার সেঁকিয়া লইলে আবার নরম ও সুস্বাদু হয়। দ্বিতীয়বার সেঁকিবার পর কিন্তু রুটির দ্রুত পরিবর্তন হয়।

বাসি হইলে রুটির যে পরিবর্তন হয় তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, রুটি কিভাবে প্রস্তুত এবং সেঁকা হইয়াছে, তাহার উপর। রুটি বাসি হইবার লক্ষণ হইল, ভিতরের অংশ নরম এবং বাহিরের অংশ শক্ত হইয়া যাওয়া। বাসি হইলে জলীয় অংশ কমিয়া যাওয়া রুটির রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরি-বর্তনের একটি কারণ। অন্যান্য কারণগুলি আঠালো শ্বেতসারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।

রুটির অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণভাবে বীজাণুমুক্ত করা যায় না। যে উত্তাপে রুটি সেঁকা হয় তাহাতেও কিছু কিছু সূক্ষ্ম জীবাণু অভ্যন্তরভাগে থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ ল্যাক্‌টিক ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতিই রুটিকে অম্ল করিয়া তোলে এবং রুটির গায়ে রঙ্গীন ছাতা ধরায়। আর্দ্র ও ঈষদোষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে থাকিলে রুটিতে আর একপ্রকার জীবাণু জন্মায়, ফলে রুটিতে একপ্রকার ক্ষীণ মিষ্ট গন্ধ হয় এবং সমগ্রভাবে রুটিটি অত্যন্ত নরম, আঠালো ও পিঙ্গলবর্ণের দানাসমন্বিত হয়। জীবাণু সংক্রমণের একেবারে শেষ অবস্থায় রুটির মধ্যভাগ একপ্রকার ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, উগ্রগন্ধী, অর্ধতরল অবস্থাতেও পরিণত হইতে পারে।

কিন্তু ভাল ভাবে প্রস্তুত করা, সেঁকা ও রক্ষা করা হইলে জীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা বহুলাংশে রহিত হয়। তদ্ভিন্ন রুটি প্রস্তুতকালে মাখা ময়দার তালে অ্যাসিড ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট মিশ্রিত করা যাইতে পারে। উহা ঐ প্রকার জীবাণু সংক্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। রুটির সহজপাচ্যতা সর্বজন-বিদিত। খুব কঠিন ব্যাধি হইতে সরিয়া উঠিবার পরও প্রথম পথ্য হিসাবে চিকিৎসকগণ রুটির বিধান দিয়া থাকেন।

ডাঃ অডলিং রুটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন—

রুটিতে জল থাকে প্রায় ...... ৪৩·৪৩%
জৈব পদার্থ „ „ ....৫৫·২৬%
খনিজ পদার্থ „ „ ... ১·৩০%
সদ্য প্রস্তুত
রুটিতে নাইট্রোজেন থাকে প্রায় ...১·২৬%
বাসি „ „ „ „ ...২·২২%

ডাঃ ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন—১৩৩৩ টন ভারী কোন বস্তুকে মাটি হইতে এক ফুট উচ্চে তুলিতে যতটা শক্তি ব্যয়িত হয়, এক পাউণ্ড রুটি খাইয়া ঠিক হজম করিতে পারিলে দেহে ততটা শক্তির সঞ্চার হয়। ২৬৭ টন ভারী কোন বস্তুকে মাটি হইতে এক ফুট উচ্চে তুলিতে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় এক পাউণ্ড রুটি মানুষকে ততটা কাজ করিবার ক্ষমতা যোগাইয়া থাকে এবং উহা দ্বারা শরীরে ১⅜ আউন্স মাংসপেশী গঠিত হইতে পারে।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবন

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

প্রয়োজনানুযায়ী রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা বাড়ানো বা কমানো দরকার হইয়া পড়ে। তাপ ও পরিবর্তনে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি পরিবর্তন সম্ভব। চাপের তাছাড়া অন্য উপায়েও এই ক্রিয়ার গতি পরিবর্তন হয়। বিক্রিয়ক পদার্থ ছাড়া অন্য বিজাতীয় পদার্থ অথবা যৌগের সাহায্যে বিক্রিয়ার গতি বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। কোন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেখা যায়, বিক্রিয়া-নিরপেক্ষ অন্য বস্তর উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার হার বহুগুণ বেড়ে যায় অথবা কমে যায়। এ জাতীয় বিক্রিয়ার হার পরিবর্তনকে প্রভাবন (Catalysis) বলে।

পটাসিয়াম ক্লোরেট থেকে উত্তাপ দিয়ে অক্সিজেন বের করা হয়—ক্লোরেট বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ সাধারণ উত্তাপে হয় না—উত্তাপে গলে যাওয়ার (৩৫৭° সেঃ গ্রেঃ) পূর্বে তো নয়ই, বরং ৩৮০° সেঃ গ্রেঃ উত্তাপে সামান্য অক্সিজেনই বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই সময় ক্লোরেট দ্রুতগতিতে পারক্লোরেটে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং অক্সিজেন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। আরো বেশী উত্তপ্ত করলে ৬১০° সেঃ গ্রেঃ উষ্ণতায় পারক্লোরেট গলে যায় এবং আবার অক্সিজেন বের হতে সুরু করে। শুধু পটাসিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন পেতে হলে ৬৩০° সেঃ গ্রে-এর উপরে উত্তাপ দরকার হয়। অথচ এই ক্লোরেটের সঙ্গে সামান্য ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত (২৪০° সেঃ গ্রেঃ) করলেই অক্সিজেন পাওয়া যায়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ডুবেরেইনার সর্বপ্রথম এ ব্যাপার লক্ষ্য করেন। এক্ষেত্রে গলনাঙ্কে পৌছাবার বহু পূর্বেই অক্সিজেন বেরুতে আরম্ভ করে। ঠিক যে উত্তাপে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতিতে ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন পাওয়া যায়, ঠিক সে উত্তাপে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড থেকে কখনই অক্সিজেন পাওয়া যায় না। গলনাঙ্কে ক্লোরেট থেকে যে সামান্য অক্সিজেন বেরুতে থাকে, তা ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করলে বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তখন যদি সামান্য ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দেওয়া হয় তবে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে অক্সিজেন বেরুতে থাকে। তাছাড়া বিক্রিয়া শেষে দেখা যায় যে, যতটুকু ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ব্যবহৃত হয়েছিল, তা একটুও কমে যায় নি বা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের কোন রাসায়নিক পরিবর্তনও হয় নি। এখানে পটাসিয়াম ক্লোরেটের রাসায়নিক বিশ্লেষণের হারকে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড প্রভাবিত করে বলে এই প্রক্রিয়াকে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের প্রভাবন বলে এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডকে প্রভাবক (catalyst) বলে। তাই যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ বা যৌগ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অতি অল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে (হারকে) প্রভাবিত করে, অথচ নিজে পরিমাণের দিক থেকে বা রাসায়নিক প্রকৃতিতে অপরিবর্তিত থেকে যায় তাদের প্রভাবক বলে।

প্রভাবকের সাধারণতঃ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। উপরোক্ত সংজ্ঞানুসারে কোন প্রভাবন-প্রক্রিয়াতে প্রভাবক অতি অল্প পরিমাণে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দশ লক্ষ ভাগের একভাগ পরিমাণ প্রভাবক থাকলেও প্রভাবন-প্রক্রিয়া হয়। যেমন দশ লক্ষ ভাগে একভাগ কপার যৌগের দ্রবণ, বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে সোডিয়াম সালফাইটের দ্রবণকে জারিত করতে

পারে। প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে ১×১০^{-৯} ভাগ কলোয়ড্যাল প্ল্যাটিনাম প্রভাবক হিসাবে উপস্থিত থাকলে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। সামান্যতম আর্দ্রতা, যার অস্তিত্ব কোন যান্ত্রিক বা রাসায়নিক উপায়ে বের করা সহজ নয়, সেই সামান্যতম আর্দ্রতাও (moisture) প্রভাবন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ প্রভাবকগুলির কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না। ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে যাওয়ার পর ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড উদ্ধার করা সম্ভব এবং দেখা যায় যে, ওজনের দিক দিয়ে তো বটেই, এমন কি রাসায়নিক দিক দিয়েও সেই ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে, রাসায়নিক দিক দিয়ে পরিবর্তিত না হলেও উহারা কোন কোন ক্ষেত্রে ভৌতিক (Physical) দিক দিয়ে পরিবর্তিত হয়। টুক্‌রা টুক্‌রা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রভাবক হিসাবে অক্সিজেন বের করবার পর আরো ছোট হয়ে যায়—পাউডারের মতও হয়। প্রভাবন ক্রিয়ার পূর্বে যা ছিল কঠিন, বিক্রিয়া শেষে তা হয়ে যায় তরল বা বায়বীয়—দানাদার পদার্থ ভেঙ্গে গিয়ে হয় অদানাদার।

রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না সত্য, কিন্তু বিজাতীয় দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে প্রভাবকের ক্ষমতা কমে আসে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবন ক্ষমতা একেবারে হ্রাস পায়, অর্থাৎ বিজাতীয় দূষিত পদার্থগুলি প্রভাবককে বিষিয়ে (catalyst poisoning) দেয়। তাই রসায়ন শিল্পে এ জাতীয় দূষিত পদার্থের বিষ-ক্রিয়া থেকে মূল্যবান প্রভাবককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যেমন চেম্বার প্রণালীতে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে হাইড্রোজেন সালফাইড, আর্সেনিয়াস অক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, আয়োডিন ইত্যাদি মূল্যবান প্ল্যাটিনামকে বিষিয়ে দেয় বলে সর্বপ্রকার সতর্কতার সঙ্গে মূল বিক্রিয়ক সালফার ডাইঅক্সাইডকে এ সব থেকে মুক্ত করা হয়। বিষ-ক্রিয়া দু-রকমের। স্থায়ী এবং অস্থায়ী। অস্থায়ী বিষ-ক্রিয়ায় পরিশোধনের পর প্রভাবক পুনরায় ব্যবহার করা হয়, কিন্তু স্থায়ী বিষ-ক্রিয়ায় পরিশোধন করে ব্যবহার করা যায় না প্রভাবক অকেজো হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ প্রভাবক বিক্রিয়ার সূচনা করতে পারে না—শুধু বিক্রিয়ার হারকে প্রভাবিত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া এত নিম্ন হারে চলে যে—মনে হয়, প্রবেশক প্রভাবকই বুঝি বিক্রিয়ার সূচনা করে। আসলে কিন্তু তা নয়, রাসায়নিক বিক্রিয়া সব সময়ই হয়, কিন্তু এত কম যে, বুঝতেই পারা যায় না। এ রকম অবস্থায় প্রভাবক বিক্রিয়ার হারকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

চতুর্থতঃ বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন যৌগভেদে প্রভাবক নির্দিষ্ট। একটি রাসায়নিক ব্যবস্থায় যে প্রভাবক কাজ করে, অন্য ব্যবস্থায় তা কার্যকরী নয়। তবে একই রাসায়নিক ব্যবস্থায় একাধিক প্রভাবক থাকা বিচিত্র নয়—বরং স্বাভাবিক। প্রভাবক-ভেদে একই বিক্রিয়াশীল পদার্থ থেকে যে বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন হয় তা লক্ষ্যণীয়। যেমন—কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন থেকে, প্রভাবক কপারের উপস্থিতিতে ৩০০° সেঃ গ্রেঃ উত্তাপে ফর্ম্যালডিহাইড, প্রভাবক ক্রোমিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে ৩০০°-৩৬০° সেঃ গ্রেঃ উত্তাপে মিথাইল অ্যাল্‌কোহল এবং প্রভাবক নিকেল বা নিকেল চূর্ণের উপস্থিতিতে ১৫০°-২০০° সেঃ গ্রেঃ উত্তাপে মিথেন হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি পরিবর্তনের প্রকৃতি-ভেদে প্রভাবকগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যে সব মৌলিক পদার্থ বা যৌগ বিক্রিয়ার গতিকে বাড়িয়ে দেয় তাদের বলা হয় ত্বরন প্রভাবক। যেমন—প্ল্যাটিনামের প্রভাবনে অক্সিজেন ও হাই-

ড্রোজেন সংযোগ, সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণ ইত্যাদি।

আবার যে সমস্ত প্রভাবক রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিকে কমিয়ে দেয় তাহাদের বলা হয় মন্থর প্রভাবক। যেমন—ফস্‌ফরিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের ভাঙ্গনকে মন্দীভূত করে; অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্মের জারণকে ব্যাহত করে। এ জাতীয় মন্থর প্রভাবকের দ্বারা প্রয়োজনীয় ভঙ্গুর যৌগকে সংরক্ষণ করা হয়।

কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন একটি পদার্থ বা যৌগ উৎপন্ন হওয়ার পরই প্রভাবকের কাজ করে। এগুলিকে স্বতঃপ্রভাবক বলা হয়। এই স্বতঃপ্রভাবনের বেলায় রাসায়নিক বিক্রিয়া যতই অগ্রসর হতে থাকে, ততই প্রভাবনের গতি বেড়ে যায়। যেমন—সোডিয়াম বাইসালফাইটের সহায়তায় পটাসিয়াম ক্লোরেট থেকে ক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। ক্লোরেটে বাইসালফাইটের দ্রবণ দিলে সামান্য ক্লোরিক অ্যাসিড বের হয়। এই ক্লোরিক অ্যাসিড জারক পদার্থ; তাই উহা তৎক্ষণাৎ বাইসালফাইটকে বাইসালফেটে জারিত করে। ফলে বাইসালফাইট থেকে অধিক শক্তিশালী বাইসালফেট, ক্লোরেট থেকে খুব অধিক পরিমাণে ক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদন করে। এখানে উৎপন্ন ক্লোরিক অ্যাসিড প্রভাবকের কাজ করে বিক্রিয়ার হারকে বাড়িয়ে দেয়। আর একটি স্বতঃপ্রভাবকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, অক্‌জ্যালিক অ্যাসিডের দ্বারা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বিরঞ্জন। অ্যাসিড দ্রবণে উহাদের বিক্রিয়া অত্যন্ত মন্থরগতিতে হয় এবং বিক্রিয়া অনুযায়ী যতই ম্যাঙ্গানাজ যৌগ উৎপন্ন হতে থাকে, ততই উহার প্রভাবনে বিক্রিয়ার গতি বেড়ে যায়। অক্‌জ্যালিক অ্যাসিড ও পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে সামান্য পরিমাণে কোন ম্যাঙ্গানাজ যৌগ বাইরে থেকে দিলে তৎক্ষণাৎ বিরঞ্জন হয়ে যায়। তাই উপরোক্ত বিক্রিয়াতে উৎপন্ন ম্যাঙ্গানাজ যৌগ স্বতঃপ্রভাবকের কাজ করে।

সোডিয়াম সালফাইট বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়; কিন্তু একই অবস্থায় সোডিয়াম আর্সেনাইট জারিত হয় না। কিন্তু উহাদের মিশ্রিত দ্রবণে উহারা বাতাসের অক্সিজেনের দ্বারা সহজেই জারিত হয়ে যায়, অথচ আর্সেনাইট কখনই সোডিয়াম সালফাইটের দ্বারা জারিত হতে পারে না, বরং বিজারিত হওয়ারই সমূহ সম্ভাবনা। এই জাতীয় প্রভাবনকে আবেশিত প্রভাবন বলে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রভাবকেরও আবার প্রভাবক আছে—তাদের প্রোমোটার বলা হয়। এরা রাসায়নিক বিক্রিয়াতে প্রভাবকের কাজ করতে পারে না, কিন্তু ক্রিয়াশীল প্রভাবকের কাজ খুবই ত্বরান্বিত করে দেয়। অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির ব্যাপারে হ্যাবারের প্রণালীতে বিজারিত লৌহ প্রভাবকের কাজ করে, কিন্তু এ প্রভাবকের ক্রিয়া অ্যালুমিনিয়াম ও সোডিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে খুব বেড়ে যায়। অ্যামোনিয়ার জারনে আবার আয়রন অক্সাইড ও বিসমাথ অক্সাইড প্রোমোটারের কাজ করে। কার্বন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন থেকে মিথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে ক্রোমিয়াম অক্সাইড প্রভাবক দস্তার ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

প্রভাবন ক্রিয়া কি ভাবে হয়, তা দুটি মতবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে মধ্যবর্তী অদৃঢ়-যৌগ-গঠন সূত্র এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে গাত্র-শোষণ সূত্র।

প্রথম সূত্র অনুসারে বলা হয় যে, প্রভাবকটি বিক্রিয়াকালে অন্যান্য বিক্রিয়ক পদার্থের সঙ্গে মধ্যবর্তী যৌগ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই যৌগগুলি খুব অস্থির এবং ভঙ্গুর। তাই এরা সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এভাবে এক বা একাধিক যৌগ সৃষ্টির পর বিক্রিয়া শেষে ঐ অস্থির যৌগগুলি ভেঙ্গে মূল প্রভাবকটি পাওয়া যায় - ফলে ওজনের দিক থেকে এবং রাসায়নিক দিক থেকে কোন পরিবর্তনই হয় না। যেমন নাইট্রিক অ্যাসিডে সালফার বা গন্ধক

ফুটাইলে সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, কিন্তু উৎপাদন হার খুবই কম, অথচ সামান্য ব্রোমিন দিলে প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী যৌগ উৎপন্ন হয় বলে মনে করা হয়। প্রথমে সালফার ও ব্রোমিন মিশে সালফার ব্রোমাইড হয়। এই সালফার ব্রোমাইড জলের সঙ্গে মিশে সালফার ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড হয়। তারপর সালফার ডাইঅক্সাইড অ্যাসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন করে। মধ্যপথে উৎপন্ন হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে ব্রোমিন পৃথক হয়ে যায়। এই ব্রোমিন আবার সালফারের সঙ্গে পূর্বোক্তভাবে ক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে, অথচ নিজে ব্যয়িত হয় না। তাছাড়া চেম্বার প্রণালীতে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে প্রভাবক হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড। প্রথমতঃ নাইট্রিক অক্সাইড অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডে জারিত হয়। এই পার-অক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইডকে জারিত করে এবং নিজে আবার নাইট্রিক অক্সাইডে বিজারিত হয়ে যায়। এই প্রকার জারণ ও বিজারণের ফলেই নাইট্রিক অক্সাইডের প্রভাবন ক্রিয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে এই জাতীয় মধ্যবর্তী যৌগ পৃথক করা সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয় মতবাদ হচ্ছে গাত্র-শোষণ সূত্র। কতকগুলি মৌলিক পদার্থ ও যৌগের বিশেষগুণ হচ্ছে তাদের গায়ে বিক্রিয়ক পদার্থগুলি শোষিত হয় বা জমে যায়। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল পদার্থগুলির অণু অতিশয় নিকটবর্তী হওয়ার ফলে উহাদের মিলন অত্যন্ত দ্রুত হয়। প্রভাবকের গায়ে কতকগুলি 'সক্রিয় অংশ' থাকে সেখানে বিক্রিয়ক পদার্থগুলি পাশাপাশি শোষিত হয়ে নিকট সংস্পর্শের জন্যে নতুন যৌগ সৃষ্ট হয়। এই নতুন যৌগ সৃষ্টি হওয়া মাত্রই সেখান থেকে সরে যায়; ফলে বিক্রিয়ক পদার্থগুলি আবার শোষিত হতে পারে। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, প্রভাবকের গায়ে শোষণস্থল যতই বেশী হবে ততই দ্রুত প্রভাবন হবে। যেমন, প্ল্যাটিনামের প্রভাবন উহার তল-বিস্তৃতির উপর নির্ভরশীল। প্ল্যাটিনাম ধাতু যতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করা যায়, অর্থাৎ যতই তার তল-বিস্তৃতি বাড়ানো যায় ততই প্রভাবন ক্ষমতা বেড়ে যায়। সদ্য উত্তপ্ত প্ল্যাটিনাম পাতের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগ সাধন করা হয়, কিন্তু তার চেয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্ল্যাটিনাম ব্ল্যাকের উপস্থিতিতে এ সংযোগ অত্যন্ত তীব্রভাবে হয়। প্ল্যাটিনাম ব্ল্যাকের চেয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্ল্যাটিনাম কলোয়ড্যাল ঠাণ্ডা অবস্থাতেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগ সাধন করে। এক ঘন সেন্টিমিটার প্ল্যাটিনামের তল-বিস্তৃতি হচ্ছে প্রায় ৬ বর্গ সেঃ মিটার। উহাকে যদি ১×১০^{-৩} সেঃ মিটার বাহুবিস্তৃত ঘন বর্গে চূর্ণ করা সম্ভব হয় তবে তার তল-বিস্তৃতি হবে ৬০০০ বর্গ সেঃ মিটার এবং কলোয়ড্যাল অবস্থায় তার তল-বিস্তৃতি হয় ৬০০ বর্গ মিটার। এথেকে বুঝা যায় যে, প্রভাবক যতই চূর্ণ করা হয় ততই তার তল-বিস্তৃতি বাড়ে। ফলে গায়ে শোষিত পদার্থের পরিমাণ বাড়ে এবং প্রভাবনও খুব বেশী হয়।

যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ও যৌগ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে তাদের এভাবে ভাগ করা হয়েছে:—

প্রথমতঃ যে সব মৌলিক পদার্থ ও যৌগ অতি সহজে জারিত ও বিজারিত হয়ে যায়, সে সব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন যোজ্যতা আছে—প্রধানতঃ ট্র্যান্‌জিসন্যাল পদার্থসমূহ। এই সমস্ত মৌলিক পদার্থ ও যৌগ প্রায় ক্ষেত্রেই মধ্যবর্তী অদৃঢ় যৌগ সৃষ্ট করে।

দ্বিতীয়তঃ এমন সব রাসায়নিক ক্রিয়া আছে যাদের জলহীন অবস্থায় বিক্রিয়া অত্যন্ত মন্থর এবং কখনও বা বিক্রিয়া একেবারেই হয় না; অথচ অল্প পরিমাণ জল থাকলে বিক্রিয়া অত্যন্ত

দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু বিক্রিয়াশীল পদার্থসমূহের সঙ্গে জলের কোন প্রত্যক্ষ ক্রিয়া নেই। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিক্রিয়াশীল কঠিন পদার্থ শুষ্ক অবস্থায় চূর্ণ করা হলে বিক্রিয়ার গতি অতি মন্থর হয়, অথচ জলে দ্রবীভূত করে মিশালে তাদের এই বিক্রিয়া অতিশয় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। জলে দ্রবীভূত অবস্থায় বিক্রিয়াশীল পদার্থসমূহ, অর্থাৎ উহাদের আয়নগুলি খুবই নিকটবর্তী হয়; ফলে বিক্রিয়া সহজতর হয়। আর্দ্রতার মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা অত্যন্ত বেড়ে যায়, অথচ আর্দ্রতা প্রক্রিয়াতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে না বলে অনুমান করা হয় যে, জল বা আর্দ্রতা একটি সাধারণ প্রভাবক।

সহজদাহ্য ফস্‌ফরাস বায়ুর সংস্পর্শে এলেই জলে উঠে, কিন্তু বায়ু যদি আর্দ্র না হয় তবে তত সহজে সাধারণ উত্তাপে জলে না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডিক্‌সন সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্বারা অতি শুষ্কীকৃত অক্সিজেন ও কার্বন মনোক্সাইড বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের দ্বারা সংযোগ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। কিন্তু যেই সামান্যতম আর্দ্রতা প্রবেশ করানো হয়, তখনই সংযোগ সাধিত হয় অতি তীব্রভাবে। আর্দ্র হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন সূর্যালোকে মিলিত হয়। কিন্তু যখন এই দুই গ্যাসের আর্দ্রতা দশ লক্ষ ভাগের একভাগ পর্যন্ত কমানো হয় তখন সূর্যালোক তো দূরের কথা, অতিবেগুনী আলো বা অত্যধিক উত্তাপেও তেমন ফল পাওয়া যায় না। তেমনি অতি শুষ্ক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বেলায়ও উহাদের জলনাঙ্ক থেকে উত্তাপ কয়েক শত গুণ বৃদ্ধি করা হলেও সংযোগ সাধিত হয় না।

আর্দ্র বায়ুতে লোহায় মরচে ধরে; কিন্তু শুষ্ক বাতাসে তা হয় না। জলে বাতাস (বা অক্সিজেন) দ্রবীভূত থাকলে মরচে ধরে; কিন্তু জল যদি দ্রবীভূত অক্সিজেনবিহীন হয় তবে তা হয় না। লোহার উপর কোন প্রকার তৈল মেখে রাখলেও তাতে মরচে ধরে না—অথচ জলে যে পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়, তার ৯।১০ গুণ অক্সিজেন তৈলে দ্রবীভূত হয়; কিন্তু জল বা আর্দ্রতা নেই বলে অক্সিজেন লোহাতে মরচে ধরতে দেয় না। তাই এ থেকে মনে হয়, মরচে ধরার ব্যাপারে জল প্রভাবকের কাজ করে।

ঠিক এমনিভাবে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ও অন্যান্য যৌগিক লবণ, কার্বন মনোক্সাইড ও চূর্ণ, অ্যালুমিনিয়াম ও ক্যালসিয়াম-কার্বোনেটের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের; সালফার, কার্বন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ আর্দ্র অবস্থায় হয়; অত্যন্ত শুষ্ক অবস্থায় হয় না বললেই চলে।

তৃতীয়তঃ কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাসিডের মাধ্যমে রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভাবিত হয়। সম্ভবতঃ অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন প্রভাবকরূপে কাজ করে। ইথাইল অ্যাসিটেট জলের সহযোগে ইথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসেটিক অ্যাসিডে পরিণত হয় সাধারণ অবস্থায়, কিন্তু অতি অল্প পরিমাণ। কিন্তু সামান্যতম অ্যাসিডের উপস্থিতিতে, অর্থাৎ অ্যাসিডঘটিত হাইড্রোজেন আয়নের উপস্থিতিতে এই পরিণতি কয়েক শত গুণ বেড়ে যায়।

চতুর্থতঃ পর্যায়বৃত্ত তালিকার, বিশেষতঃ অষ্টম পরিবারের ট্র্যান্‌জিসন্যাল ধাতুগুলি প্রভাবক হিসাবে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়াতে হাইড্রোজেন একটি উপাদান, সেগুলিতে প্রভাবক হিসাবে প্ল্যাটিনাম, নিকেল, প্যালেডিয়াম, কোবাল্ট, আয়রন, কপার প্রভৃতি কাজ করে। প্রভাবক ধাতুগুলির ক্রিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী যৌগ উৎপাদন সূত্রানুসারে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গাত্র শোষণ সূত্রানুসারে হয়ে থাকে।

কি ভাবে এই প্রভাবন-ক্রিয়া চলে তা অস্পষ্ট হলেও আশা করা যাচ্ছে যে, সকল প্রকারের

রাসায়নিক প্রক্রিয়াকেই উপযুক্ত প্রভাবকের দ্বারা প্রভাবিত করা সম্ভব। যদিও এই প্রভাবকদের সামান্য কয়েকটির বিষয় মাত্র জানা গেছে কিন্তু অধিকাংশই অজ্ঞাত। তাই রসায়নবিদদের নতুন প্রভাবক বের করবার চেষ্টার অন্ত নেই। নিত্য নতুন প্রভাবক বের হচ্ছে এবং আরো বের হবে।

প্রভাবক আবিষ্কারের ফলে রাসায়নিক শিল্পে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়েছে। পূর্বে রাসায়নিক ক্রিয়ার মন্থরতার জন্যে অপেক্ষা করতে হতো, প্রভাবকের জন্যে আজ অপেক্ষা করার সময় কমে গেছে, ফলে উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। প্রভাবক পরিমাণে অল্প ব্যবহৃত হয় এবং এর কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না বলেই মূল্যবান প্রভাবকের ব্যবহার বেড়ে গেছে এবং একই প্রভাবক দীর্ঘ দিন ধরে পুনঃপুন ব্যবহার করা সম্ভব। প্রভাবকের বিষ-ক্রিয়া সম্বন্ধে শিল্পে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এই বিষ-ক্রিয়া কিন্তু অন্যভাবে শিল্পের পরিচালনা ব্যবস্থায় সাহায্য করে। যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় সস্তা প্রভাবক ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ করবার জন্যে অনেক সময় বাইরে থেকে দূষিত বিষকারী পদার্থ উক্ত ব্যবস্থায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এই দূষিত পদার্থ প্রভাবককে বিষিয়ে মুহূর্তে বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। এভাবে বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ সহজ ও সুবিধাজনক। এমন সব মূল্যবান রাসায়নিক যৌগ আছে, যা অতি সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, এগুলিকে সংরক্ষণ করবার অনেক অসুবিধা। বিশ্লেষণকে ব্যাহত করে এমন প্রভাবকের দ্বারা আজকাল এদের সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এমন সব রাসায়নিক ক্রিয়া আছে যাদের মধ্যবর্তী যৌগগুলি অবাঞ্ছিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্ফোরক; কাজেই রাসায়নিক শিল্পে ভয়েরও কারণ আছে। এমন সব প্রভাবক আবিষ্কৃত হয়েছে যারা অবাঞ্ছিত ও বিস্ফোরক যৌগ-গঠনকে মন্দীভূত করে নষ্ট করে দেয়। তাই রাসায়নবিদের কাছে প্রভাবক একটি মূল্যবান জিনিষ।

'ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি যে বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে তাহা অনেকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। যুদ্ধজয় বা উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য এত বাড়ে নাই, যতটা হইয়াছে বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসারেব ফলে। আজ যে পৃথিবীর বাজার ইংলণ্ডের পণ্যসম্ভারে পূর্ণ তাহার কারণ—এই বিজ্ঞান।···তাহার যত কিছু দাবী এই বিজ্ঞানের কল্যাণে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে।'

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

আর্গন গ্যাস

ফজলুর রহমান

আমাদের চারদিকে যে বাতাস রয়েছে সেটা যে কোন একটা মৌলিক পদার্থ নয়—একথা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের আগে মানুষ জানতো না। বাতাস কতগুলি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র–কোন একটা বিশেষ মৌল নয়। ঐ বছরই বিজ্ঞানী Schee'e প্রমাণ করেন, আমাদের এই বাতাস দুটি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। একটি হলো অক্সিজেন। এই গ্যাসটি দহনকার্যে সহায়তা করে থাকে। অপরটি হলো নাইট্রোজেন, অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অবশ্য অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন—এ নাম তাদেব পরে দেওয়া হয়েছিল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরী ক্যাভেণ্ডিস বাতাসে এই দুটি গ্যাস ছাড়া আরো অন্য গ্যাস আছে বলে সন্দেহ করেন। বিজ্ঞানীদের সন্দেহ মানেই সঙ্গে সঙ্গে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। তিনি একটি ইংরেজী V অক্ষরেব আকৃতি বিশিষ্ট কাঁচের টিউবে অক্সিজেন ও বাতাস নিয়ে সেটিব খোলা মুখ দুটি 'লিভার অব সালফার' নামক ক্ষারদ্রবণ পূর্ণ পাত্রে উবুড় করে রেখে তার ভিতর বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্ট করেন। তখনকার দিনে বিদ্যুৎ এত সহজলভ্য ছিল না। হেনরী ক্যাভেণ্ডিস ও তার সহকারী ক্রমাগত ২১ দিন ধরে উইমহার্স্ট মেসিন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্ট করতে লাগলেন। বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের উচ্চতর অক্সাইড সৃষ্টি হতে লাগলো। উৎপন্ন অক্সাইড সঙ্গে সঙ্গে ক্ষার-দ্রবণ দ্বারা শোষিত হতে লাগলো। এই উভয় গ্যাস শোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে V নলের দুই বাহুর দ্রবণ ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠতে লাগলো। ২১ দিন পরীক্ষার শেষে ঐ উবুড়-করা নলের শীর্ষদেশে একটি মাত্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ রয়ে গেল। কোন ক্রমেই ঐ বুদ্বুদটিকে শোষণ করা সম্ভব হলো না। ক্যাভেণ্ডিস এই সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিঃসন্দেহে পরীক্ষায় বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে Phlogisticated-বায়ুকে (নাইট্রোজেন) Dephlogisticated-বায়ুর (অক্সিজেন) সঙ্গে রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটিয়ে নাইট্রাস অ্যাসিডে রূপান্তরিত করা হলো। এটাই (নাইট্রিক অ্যাসিড) ক্ষার দ্রবণের সঙ্গে মিশে সোরা লবণের সৃষ্টি করে। কারণ এই পরীক্ষায় দেখা গেল, ঐ দুই প্রকার বায়ু সত্য সত্যই অদৃশ্য হয়ে তাদের স্থলে নাইট্রাস অম্লের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া তিনি একথাও বলেন যে, বাতাসে যদি অন্য কোন গ্যাসের অস্তিত্ব থাকে তবে তার পরিমাণ বাতাসের $\frac{1}{120}$ ভাগ মাত্র। তবে এসম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।

এর পর প্রায় এক শতাব্দী পার হয়ে গেল—বিজ্ঞানীদের নজব এদিকে আর বিশেষভাবে পড়ে নি। তখন পদার্থের গুরুত্ব, পারমাণবিক ওজন ইত্যাদি নির্ভুলভাবে মাপবার যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, বিদ্যুৎও সহজলভ্য। বিজ্ঞানের সাধনায় পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তখন ১৮৯৪ সাল। লর্ড র‍্যালে বায়বীয় পদার্থের নির্ভুল গুরুত্ব মাপবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন, বায়ু থেকে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের গুরুত্ব–রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রোজেনের গুরুত্ব অপেক্ষা কিছু বেশী। এই 'বেশী' খুব সামান্যই। প্রথম ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাওয়া গেল ১.২১০৫, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাওয়া গেল ১.২৫৭২। এই সামান্য পার্থক্য সাধারণ বিজ্ঞানীর কাছে

রাসায়নিক প্রক্রিয়াকেই উপযুক্ত প্রভাবকের দ্বারা প্রভাবিত করা সম্ভব। যদিও এই প্রভাবকদের সামান্য কয়েকটির বিষয় মাত্র জানা গেছে কিন্তু অধিকাংশই অজ্ঞাত। তাই রসায়নবিদদের নতুন প্রভাবক বের করবার চেষ্টার অন্ত নেই। নিত্য নতুন প্রভাবক বের হচ্ছে এবং আরো বের হবে।

প্রভাবক আবিষ্কারের ফলে রাসায়নিক শিল্পে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়েছে। পূর্বে রাসায়নিক ক্রিয়ার মন্থরতার জন্যে অপেক্ষা করতে হতো, প্রভাবকের জন্যে আজ অপেক্ষা করার সময় কমে গেছে, ফলে উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পেয়েছে। প্রভাবক পরিমাণে অল্প ব্যবহৃত হয় এবং এর কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না বলেই মূল্যবান প্রভাবকের ব্যবহার বেড়ে গেছে এবং একই প্রভাবক দীর্ঘ দিন ধরে পুনঃপুন ব্যবহার করা সম্ভব। প্রভাবকের বিষ-ক্রিয়া সম্বন্ধে শিল্পে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এই বিষ-ক্রিয়া কিন্তু অন্যভাবে শিল্পের পরিচালনা ব্যবস্থায় সাহায্য করে। যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় সস্তা প্রভাবক ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রক্রিয়া কোন নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ করবার জন্যে অনেক সময় বাইরে থেকে দূষিত বিষকারী পদার্থ উক্ত ব্যবস্থায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এই দূষিত পদার্থ প্রভাবককে বিষিয়ে মুহূর্তে বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। এভাবে বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ সহজ ও সুবিধাজনক। এমন সব মূল্যবান রাসায়নিক যৌগ আছে, যা অতি সহজেই বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, এগুলিকে সংরক্ষণ করবার অনেক অসুবিধা। বিশ্লেষণকে ব্যাহত করে এমন প্রভাবকের দ্বারা আজকাল এদের সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এমন সব রাসায়নিক ক্রিয়া আছে যাদের মধ্যবর্তী যৌগগুলি অবাঞ্ছিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্ফোরক; কাজেই রাসায়নিক শিল্পে ভয়েরও কারণ আছে। এমন সব প্রভাবক আবিষ্কৃত হচ্ছে যারা অবাঞ্ছিত ও বিস্ফোরক যৌগ-গঠনকে মন্দীভূত করে নষ্ট করে দেয়। তাই রাসায়নবিদের কাছে প্রভাবক একটি মূল্যবান জিনিষ।

'ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি যে বিজ্ঞান-চর্চার ফলে তাহা অনেকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। যুদ্ধজয় বা উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য এত বাড়ে নাই, যতটা হইয়াছে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের ফলে। আজ যে পৃথিবীর বাজার ইংলণ্ডের পণ্যসম্ভারে পূর্ণ তাহার কারণ—এই বিজ্ঞান।...তাহার যত কিছু দাবী এই বিজ্ঞানের কল্যাণে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে।'

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

আর্গন গ্যাস

ফজলুর রহমান

আমাদের চারদিকে যে বাতাস রয়েছে সেটা যে কোন একটা মৌলিক পদার্থ নয়—একথা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের আগে মানুষ জানতো না। বাতাস কতগুলি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র-কোন একটা বিশেষ মৌল নয়। ঐ বছরই বিজ্ঞানী Scheele প্রমাণ করেন, আমাদের এই বাতাস দুটি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। একটি হলো অক্সিজেন। এই গ্যাসটি দহনকার্যে সহায়তা করে থাকে। অপরটি হলো নাইট্রোজেন, অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস। অবশ্য অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন—এ নাম তাদের পরে দেওয়া হয়েছিল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরী ক্যাভেণ্ডিস বাতাসে এই দুটি গ্যাস ছাড়া আরো অন্য গ্যাস আছে বলে সন্দেহ করেন। বিজ্ঞানীদের সন্দেহ মানেই সঙ্গে সঙ্গে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। তিনি একটি ইংরেজী V অক্ষরের আকৃতি বিশিষ্ট কাঁচের টিউবে অক্সিজেন ও বাতাস নিয়ে সেটির খোলা মুখ দুটি 'লিভার অব সালফার' নামক ক্ষারদ্রবণ পূর্ণ পাত্রে উবুড় করে রেখে তার ভিতর বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্ট করেন। তখনকার দিনে বিদ্যুৎ এত সহজলভ্য ছিল না। হেনরী ক্যাভেণ্ডিস ও তার সহকারী ক্রমাগত ২১ দিন ধরে উইমহার্স্ট মেসিন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্ট করতে লাগলেন। বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের উচ্চতর অক্সাইড সৃষ্টি হতে লাগলো। উৎপন্ন অক্সাইড সঙ্গে সঙ্গে ক্ষার-দ্রবণ দ্বারা শোষিত হতে লাগলো। এই উভয় গ্যাস শোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে V নলের দুই বাহুর দ্রবণ ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠতে লাগলো। ২১ দিন পরীক্ষার শেষে ঐ উবুড়-করা নলের শীর্ষদেশে একটি মাত্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ রয়ে গেল। কোন ক্রমেই ঐ বুদ্বুদটিকে শোষণ করা সম্ভব হলো না। ক্যাভেণ্ডিস এই সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিঃসন্দেহে পরীক্ষায় বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে Phlogisticated-বায়ুকে (নাইট্রোজেন) Dephlogisticated-বায়ুর (অক্সিজেন) সঙ্গে রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটিয়ে নাইট্রাস অ্যাসিডে রূপান্তরিত করা হলো। এটাই (নাইট্রিক অ্যাসিড) ক্ষার দ্রবণের সঙ্গে মিশে সোরা লবণের সৃষ্টি করে। কারণ এই পরীক্ষায় দেখা গেল, ঐ দুই প্রকার বায়ু সত্য সত্যই অদৃশ্য হয়ে তাদের স্থলে নাইট্রাস অম্লের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া তিনি একথাও বলেন যে, বাতাসে যদি অন্য কোন গ্যাসের অস্তিত্ব থাকে তবে তার পরিমাণ বাতাসের ১/১২০ ভাগ মাত্র। তবে এসম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না।

এর পর প্রায় এক শতাব্দী পার হয়ে গেল—বিজ্ঞানীদের নজর এদিকে আর বিশেষভাবে পড়ে নি। তখন পদার্থের গুরুত্ব, পারমাণবিক ওজন ইত্যাদি নির্ভুলভাবে মাপবার যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়েছে; বিদ্যুৎও সহজলভ্য। বিজ্ঞানের সাধনায় পৃথিবী অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তখন ১৮৯৪ সাল। লর্ড র‍্যালে বায়বীয় পদার্থের নির্ভুল গুরুত্ব মাপবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন, বায়ু থেকে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের গুরুত্ব—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইট্রোজেনের গুরুত্ব অপেক্ষা কিছু বেশী। এই 'বেশী' খুব সামান্যই। প্রথম ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাওয়া গেল ১.২১০৫, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাওয়া গেল ১.২৫৭২। এই সামান্য পার্থক্য সাধারণ বিজ্ঞানীর কাছে

হিসাবের ভুল বলে হয়তো নিষ্কৃতি পেত, কিন্তু তীক্ষ্নদর্শী লর্ড র‍্যালের চোখে তা এড়িয়ে গেল না। তাঁর সন্দেহ হলো—বায়ুর নাইট্রোজেনের সঙ্গে অন্য কোন বেশী গুরুত্বসম্পন্ন বায়বীয় পদার্থ আছে। ঠিক এই সময়েই আর একজন বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম র‍্যামজে আবিষ্কার করেন যে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ ম্যাগ্‌নেশিয়াম ধাতুর ওপর দিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করালে সেই গ্যাস, ওই ধাতুতে বিশোষিত হয়ে যায়। তিনি বায়ুজাত নাইট্রোজেনকে বার বার ঐরূপ ধাতুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করাতে লাগলেন। নাইট্রোজেন গ্যাসের গুরুত্ব ১৪, কিন্তু উক্ত প্রক্রিয়ায় যখন সমস্ত নাইট্রোজেন গ্যাস ম্যাগ্‌নেসিয়াম দ্বারা বিশোষিত হলো, তখন অবশিষ্ট গ্যাসের গুরুত্ব মেপে দেখা গেল—তার গুরুত্ব ক্রমশঃ বেড়ে প্রায় ২০-এর কাছাকাছি (১৯.৯৪) গিয়ে পৌঁচেছে। তখন র‍্যামজেও ঠিক ঐ ধারণা করলেন যে, বায়ুর নাইট্রোজেনের সঙ্গে বেশী গুরুত্ব-সম্পন্ন অন্য কোন পদার্থ আছে। নাইট্রোজেন বিশোষিত হওয়ায় এর শতকরা অনুপাত কমে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব বাড়তে থাকে। অবশেষে ঐ বেশী গুরুত্বসম্পন্ন গ্যাসের গুরুত্বে এসে দাঁড়ায়।

এবার এই উভয় বিজ্ঞানীই মিলিতভাবে পরীক্ষা কার্য আরম্ভ করবার জন্যে তৈরী হন। তাঁরা পুরানো পুঁথিপত্র ঘেঁটে দেখতে লাগলেন, এর আগে কেউ এ পরীক্ষা করেছেন কিনা। পাওয়া গেল, এক শতাব্দী আগে হেনরী ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা। তখন তাঁরা হেনরী ক্যাভেণ্ডিসের পদ্ধতিকে সামান্য একটু পরিবর্তন করে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ৫০ লিটার পরিমাণ একটা বিরাট ফ্লাস্কে ৯ ভাগ বাতাস ও ১১ ভাগ অক্সিজেন নিলেন। বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনের জন্যে ফ্লাস্কের ভিতর প্ল্যাটিনামের তৈরী দুটা বেশ মোটা গোছের বিদ্যুৎপ্রান্ত বসানো হলো। ঐ স্ফুলিঙ্গের ঠিক ওপর থেকে কষ্টিক সোডা-দ্রবণ ঝর্ণার মত পড়বার জন্যে একটি টিউব ফ্লাস্কের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। একটি ৬০০০-৮০০০ ভোল্টের ট্রান্সফরমার থেকে বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণ করে ফ্লাস্কের ভিতর বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ উৎপাদনের ব্যবস্থা করলেন। বায়ুর নাই-ট্রোজেন ও অক্সিজেন রাসায়নিকভাবে মিলিত হয়ে NO এবং পরে NO_2 গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে $NaOH$ দ্রবণের ধারায় বিশোষিত হতে লাগলো। এইভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনকে বিতাড়িত করা হলো। পরিশেষে যে গ্যাসটি পড়ে রইলো, তা নিয়ে অনেক পরীক্ষা চললো। দেখা গেল গ্যাসটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ অন্য কোন মৌলের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোজন ঘটে না। র‍্যামজে বহু গবেষণা করলেন, উত্তপ্ত ধাতু $-CuO$, KOH, K_2MnO_4, NaO_2 বা ফস্‌ফরাস প্রভৃতি কারো সঙ্গে কোন ক্রিয়া নেই। এমন কি সবচেয়ে সক্রিয় ক্লোরিনের সঙ্গে স্পার্ক দিয়েও মিলিত করা গেল না। র‍্যামজে এর নাম দিলেন আর্গন। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হলো নিষ্ক্রিয়। এই হলো আর্গন গ্যাস আবিষ্কারের মোটামুটি ইতিহাস।

ব্যবহারের জন্যে আর্গন গ্যাস প্রথম প্রথম তৈরী করা হতো লোহার তৈরী বকযন্ত্রের ভিতর ৯০ ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও ১০ ভাগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত অবস্থায় ৮০০°C উত্তপ্ত করে তার ভিতর দিয়ে বাতাস চালিয়ে। এতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বিশোষিত হতো। বাকী গ্যাসটি উত্তপ্ত লালবর্ণ তামার ওপর দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে CO-কে CO_2-তে রূপান্তরিত করবার পর পটাস দ্রবণ দ্বারা বিশোষিত করিয়ে আর্গন গ্যাস পাওয়া যেত। আজকাল এই গ্যাস পাওয়া যায় দ্রবীভূত বায়বীয় অক্সিজেনের আংশিক পাতনক্রিয়ার দ্বারা। এইরূপ দ্রবীভূত বায়বীয় অক্সিজেনে প্রায় ৩% আর্গন গ্যাস থাকে। এই পাতনক্রিয়ার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে Claude's apparatus বলে। এইভাবে প্রাপ্ত আর্গন গ্যাস শতকরা ৮৮ ভাগ খাঁটি। এর সঙ্গে

হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন্, নিয়ন ইত্যাদি অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস মিশ্রিত থাকে। এসব নিষ্ক্রিয় গ্যাস-গুলি পরে আবিষ্কৃত হয়।

আর্গন গ্যাস সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সেজন্যে একে ইলেকট্রিক বাল্বে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কোন গ্যাস থাকলে উত্তপ্ত ফিলামেণ্ট ঐ গ্যাসের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। অথচ যদি বাল্বটি সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য করা হয় তবে উত্তপ্ত ফিলামেণ্ট থেকে ইলেকট্রন ও ধাতুকণা বিচ্ছুরিত হয়ে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করতে চেষ্টা করে; তার ফলেও ফিলামেণ্টটি শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আর্গন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভরে দিলে স্থায়িত্ব বেড়ে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসব নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অন্যান্য বহুবিধ ব্যবহার আছে।

তৃণের শক্তি

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

আকারের দিক হইতে তৃণ উদ্ভিদ-জগতে নগণ্য সন্দেহ নাই। আমরা যখন গগনবিস্তারী বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি মহীরুহের বিরাটত্বে মুগ্ধ হই তখন আমাদের পদতলে দলিত, ধরণীর বক্ষসংলগ্ন তৃণকে তুচ্ছজ্ঞান করা স্বাভাবিক। এই জন্যই উপমাক্ষেত্রে তুচ্ছার্থে আমরা তৃণ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তৃণ শক্তিতে দীন নহে। তৃণের শক্তির সম্যক পরিচয় লাভ করিলে তাহাকে আর ক্ষুদ্র মনে হইবে না।

সংখ্যার বিপুলতায় তৃণ তাহার দৈহিক ক্ষুদ্রতা সংশোধন করিয়া লইয়াছে। ১০০ একর পরিমাণ একটি তৃণ-ভূমির তৃণরাজি সৌরতেজ হইতে দিনে ২০ হাজার টন টি. এন. টি, অর্থাৎ একটি অ্যাটম বোমার সমতুল্য শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে। ভূ-ভাগের এক পঞ্চমাংশ জুড়িয়া তৃণরাজি অবস্থান করিতেছে; কাজেই প্রতিদিন এই তৃণরাজি কি পরিমাণ সৌরশক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তৃণের এই শক্তির আশ্রয়েই আমাদের জীবনধারণ সম্ভব হইতেছে। আলো-বাতাসের মতই তৃণ মানুষের জীবনধারণে একান্ত প্রয়োজনীয়।

শুধু সৌরশক্তি আহরণের দিক হইতেই নয়, ভূমিক্ষয় ও বন্যা প্রতিরোধেও তৃণের শক্তি অপরিসীম। বিশেষজ্ঞদের মতে বন্যা-নিরোধকল্পে মানুষ এ পর্যন্ত যত বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে, উহাদের মোট শক্তি অপেক্ষা তৃণরাজির সমষ্টিগত কার্যকারিতা অন্ততঃ দশ সহস্র গুণ অধিক।

জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার মত যথেষ্ট শক্তিও তৃণে বর্তমান। তৃণ সহজে ধ্বংস হয় না, প্রতিকূল পরিবেশে সহজে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করিবার শক্তিও ইহাদের যথেষ্ট আছে। এই কারণে মেরু প্রদেশ, পর্বতশৃঙ্গ, মরুভূমি, এমন কি জলের মধ্যে পর্যন্ত ইহাদিগকে জন্মাইতে দেখা যায়। প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করিবার অদ্ভুত শক্তি হইতে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তৃণবংশ ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ ভাবেই পৃথিবীর বুকে তাহার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিবে।

সপুষ্পক উদ্ভিদের একটি বৃহৎ পরিবার গ্র্যামিনীর যাবতীয় উদ্ভিদই তৃণ নামে পরিচিত। তৃণরাজি ছয় হাজার বিভিন্ন বংশে বিভক্ত। ইহারা সকলেই ক্ষুদ্রাকৃতি নয়। ভুট্টা, ইক্ষু, বাঁশ—ইহারা বৃহৎ জাতীয় তৃণ। বাঁশ ৫০।৬০ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাই বৃহত্তম তৃণ। আবার দৈর্ঘ্যে

মাত্র ২।৩ সেণ্টিমিটার, এরূপ ক্ষুদ্র জাতীয় তৃণও আছে। ধান, গম, যব, প্রভৃতি শস্য, তৃন পরিবার-ভুক্ত। সমস্ত তৃণেরই গঠন-প্রকৃতি খুব সরল। কাণ্ড বিভিন্ন গ্রন্থিতে বিভক্ত এবং প্রতি গ্রন্থিতেই একটি করিয়া পত্র। কোন কোন তৃণের মাটির নীচের কাণ্ডাংশ এবং প্রবহনী হইতে পৃথক গাছের সৃষ্টি হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে। অনেক তৃণের মূল ও কাণ্ডের সংযোগস্থল হইতে একাধিক কাণ্ড নির্গত হওয়ায় একটি তৃণগুচ্ছের সৃষ্টি হয়। অনেক তৃণের কাণ্ডগ্রন্থি হইতে অস্থানিক শিকড় বাহির হয়। ভূমিসংলগ্ন হইলে বা কাটিয়া লাগাইলে ঐ স্থান হইতে নূতন গাছের সৃষ্টি হয়। সমস্ত তৃণেরই গুচ্ছমূল থাকে। অল্লাধিক পরিমাণে সবরকম তৃণের পত্রই দীর্ঘাকৃতি। শিরাগুলি পত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত পরস্পর প্রায় সমান্তরাল রেখায় বিস্তৃত। তৃণ-পুষ্পের সুদৃশ্য বর্ণচ্ছটা বা গন্ধ নাই। পরাগ-সংযোগের জন্য তৃণ-পুষ্পের কীট-পতঙ্গাদির আকর্ষণের প্রয়োজন হয় না। তৃণের পরাগ-মিলন বায়ুর উপর নির্ভর করে। চারি হাজার ফুট ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলেও তৃণের পরাগ পাওয়া যায়। ঐ সব পরাগকোষ বায়ুচালিত হইয়া দেশদেশান্তরে বংশ বিস্তারে সাহায্য করিয়া থাকে। বহু ক্ষুদ্র জাতীয় তৃণ-বীজও বায়ুতাড়িত হইয়া ঐরূপ ঊর্ধ্ব বায়ু-স্তরে পৌঁছিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। এইভাবে ঐ সব বীজ অনায়াসে এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হইয়া স্ববংশ বিস্তার করিতে পারে। অপরাপর উদ্ভিদের মত বিভিন্ন শ্রেণীর তৃণ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে জন্মিয়া থাকে। তবে অন্য উদ্ভিদের তুলনায় অধিকাংশ তৃণ প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সহিত সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে।

তৃণ গো, মহিষাদি পশুর প্রধান খাদ্য। মৃত্তিকা হইতে তৃণ পশুখাদ্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। পশুদেহ হইতে সেই খাদ্য আবার আমরা লাভ করিতেছি। বীজ-গঠনের পর খাদ্যের সারাংশ পত্রকাণ্ডাদি হইতে সঞ্চালিত হইয়া বীজে সঞ্চিত হইতে থাকে। পরিপক্ক অবস্থায় তৃণ-বীজ একটি অতি উচ্চগুণসম্পন্ন খাদ্যে পরিণত হয়। পত্র এবং কাণ্ডগুলি তখন অনেক পরিমাণে নিঃসার হইয়া পড়ে। বংশবিস্তারে এই সকল বীজ ছড়াইয়া পড়িলে পশুরা একটি মূল্যবান খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাযাবর মানব যখন খাদ্যান্বেষণে বিভিন্ন রকমের পদার্থ যাচাই করিয়া ফিরিতেছিল সেই অবস্থায় এই তৃণ-বীজের উপর তাহাদের দৃষ্টি পতিত হয়। এই তৃণ-বীজ হইতেই যে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে ইহা তাহাদের উপলব্ধি হইয়াছিল। এখন কি করিয়া এই ক্ষুদ্র তৃণ-বীজ নিজেদের প্রয়োজন মত প্রচুরভাবে সংগ্রহ করা যায়-সেই উপায় উদ্ভাবিত হইতে থাকে। এইভাবেই ক্রমে বীজের জন্য তৃণের কর্ষণ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতীয় তৃণের কর্ষণ হইতে থাকে। চাষ-আবাদের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গম, ধান, ভুট্টা, যব, যই, রাই প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর তৃণের উদ্ভব হইতে থাকে। যে সব বন্য তৃণ হইতে এই সব উন্নত শ্রেণীর তৃণের উদ্ভব হইয়াছে উহারা এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আখও একটি বন্য তৃণ, মানুষের চেষ্টায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া বর্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে। এই সব কর্ষিত তৃণের একদিকে যেমন উন্নতি হইয়াছে আবার বহুকালাবধি মানুষের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার ফলে কোন কোন দিকে আবার অবনতিও ঘটিয়াছে। পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গেলে এই সব তৃণরাজির অধিকাংশই জীবনসংগ্রামে টিকিতে না পারিয়া লোপ পাইবে।

তৃণের কর্ষণ হইতেই মানব-সভ্যতার অভ্যুত্থান হইয়াছে। তৃণ-কর্ষণ ও খাদ্য-সংরক্ষণের জন্যই মানুষের স্থায়ী বসবাসের প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং তাহাদের যাযাবরত্ব ঘুচিয়া যায়। গমের মাধ্যমেই ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার জন্ম হয়; সেইরূপ ধানের

দৌলতেই ভারতীয় ও চৈনিক কৃষ্টির উন্মেষ লাভ ঘটে।

প্রথমতঃ এই সব কর্ষিত তৃণ সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিলেও পরে দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। মিশরীয় সভ্যতার বাহন গম ভূমধ্যসাগরের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া বহুকাল পূর্বেই ইউরোপ ও মধ্য এসিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পরে আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান খাদ্যরূপে পরিগণিত হয়। ধানও এখন আর উহার আদি বাসস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, সমস্ত মহাদেশেই ইহার প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে। ভুট্টার জন্ম আমেরিকায়; কিন্তু এখন সর্বত্রই ভুট্টার চাষ হয়। সৌরশক্তির শ্রেষ্ঠ ধারক ইক্ষু। ভারত হইতেই ইক্ষু ক্রমে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য কর্ষিত তৃণের ইতিহাসও একইরূপ।

খাদ্য-গঠনে তৃণ একদিকে সৌরশক্তি আহরণ করে এবং মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন পদার্থ শুষিয়া লয়। আমাদের দেহ ধারণে এই উভয়বিধ উপাদানেরই একান্ত প্রয়োজন।

ঐ রূপান্তরিত সৌরশক্তি হইতে আমরা দেহ যন্ত্রের কার্যকরী শক্তি লাভ করি। আমাদের সমস্ত কর্মশক্তির মূলে রহিয়াছে সৌরশক্তি।

একমাত্র উদ্ভিদই এই শক্তি আহরণে সক্ষম। আমরা সরাসরিভাবে উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে এই শক্তি লাভ করি; আবার মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি প্রাণী-দেহজাত খাদ্যের মাধ্যমেও এই শক্তি আহৃত হইয়া থাকে।

পশু-খাদ্যের উপযোগী এক পাউণ্ড তৃণের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি বা ক্যালোরি থাকে, একজন লোকের দেড় ঘণ্টা হাঁটার পক্ষে উহা যথেষ্ট। ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যে উহার প্রায় চতুর্গুণ শক্তি থাকে।

তৃণরাজি শুধু শক্তিরই উৎস নহে, দেহের ক্ষয় পূরণের উপাদানও সরবরাহ করে। তৃণ মৃত্তিকার গভীরে, এমন কি বিশ ফুট পর্যন্ত নীচে শিকড় চালাইয়া নাইট্রোজেন ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে। এই সব পদার্থ হইতে তৃণের পাতায় প্রোটিন প্রস্তুত হয়। সমস্ত জীবন্ত কোষের প্রধান উপাদান প্রোটিন। এই প্রোটিনের সরবরাহ হইতেই নিয়ত আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে।

তৃণ-দেহের এই প্রোটিন প্রধানতঃ আমরা সরাসরি গ্রহণ করি না; গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি তৃণভোজী জন্তুর মাধ্যমে আমরা লাভ করি। আমরা তৃণের এই প্রোটিনের অংশটি আহরণ করিবার জন্যই পশু-পালন করি।

উন্নত দেশসমূহ জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে দেশের সর্বত্রই অসংখ্য পশুপালনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে পশুপালনের নিমিত্ত মোট ছয়শত বিলিয়ন ডলার মূলধন খাটিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মোটর অথবা লৌহ শিল্পের মোট মূলধনের পরিমাণও ইহা অপেক্ষা অনেক কম। প্রতি বছর পশুপালনের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে বার বিলিয়ন ডলার মূল্যের মাংস ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশুর মাধ্যমে কি বিপুল তৃণশক্তি সে দেশে আহরণের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সেখানে পশু-খাদ্যের জন্য বৎসরে দুই বিলিয়ন মূল্যের শুষ্ক তৃণ উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদনের পরিমাণ গম, ভুট্টা ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের অন্য যে কোন শস্য অপেক্ষা অধিক। ইক্ষু, গম, ভুট্টা প্রভৃতি তৃণ জাতীয় শস্য হইতেও বৎসরে নয় বিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্য উৎপন্ন হয়।

ভারতের গৌরবময় যুগে গোধন দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজন্যবর্গের বড় বড় গোশালা থাকিত। সাধারণ্যের জন্যও গোচারণ ভূমির ব্যবস্থা থাকিত। সে যুগের লোকের বল, বীর্য, মেধা ইত্যাদি উন্নতির মূলে যে দেশের গো-সম্পদই প্রধান উৎস ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমানে আমরা গোপালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। গোচারণ ভূমি

অদৃশ্য হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানে খাদ্য ও যত্নের অভাবে গো-সম্পদ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। ফলে আমরা স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছি।

দেশের স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পশু-পালন সম্পর্কে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একমত।

পশুপালন সম্পর্কিত বিষয়ে উন্নতি বিধান করিতে হইলে প্রথমেই পশু খাদ্যের প্রচুর ব্যবস্থার প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অভাব আছে। সেই অভাব পূরণ করিতে হইলে অন্যান্য দেশে পরীক্ষিত অধিক ফলনশীল উন্নতশ্রেণীর তৃণ এদেশে আমদানী করিয়া ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা করা উচিত।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ ১৯২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাজাত নেপিয়ার ঘাস এদেশে প্রথম আমদানী করে। গো-খাদ্য হিসাবে ইহা অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহার ফলনও খুব বেশী। নেপিয়ার ঘাস বিঘা প্রতি বৎসরে ৬।৭ শত মণ, এমন কি ভাল-ভাবে চাষ করিলে হাজার মণ পর্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। চারিটি গাভীর সম্বৎসরের খাদ্যের পক্ষে ঐ পরিমাণ ঘাস যথেষ্ট। একমাত্র চারিটি গাভী প্রতিপালনের দ্বারা একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ হইতে পারে। এক বিঘা পরিমিত জমির তৃণ হইতে একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ হওয়া কম কথা নয়।

জাতির স্বাস্থ্য ও সম্পদ নির্ভর করে খাদ্যের প্রাচুর্যের উপর। খাদ্যের প্রাচুর্য প্রধানতঃ নির্ভর করে তৃণ-শক্তির সদ্ব্যবহারের উপর।

খাদ্যোৎপাদনের দিক হইতে আমরা তৃণের-শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত বন্যা ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের শক্তিও তৃণে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বৃষ্টির ধারা যখন ভূমিতে পড়ে, তৃণমূল উহা ধরিয়া রাখে। এই উপায়েই তৃণ বন্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকার দানা মূল দ্বারা আটকাইয়া রাখিয়া ভূমিক্ষয় নিবারণ করে।

তৃণের মূল খুব সূক্ষ্ম, শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একটি তৃণের মূলের শাখা-প্রশাখা পর পর জুড়িলে কয়েক মাইল দীর্ঘ একটি রেখার সৃষ্টি হইতে পারে। মূলের ঐ সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা মৃত্তিকার দানাগুলিকে শক্ত করিয়া স্বস্থানে আটকাইয়া রাখে। জলবিন্দু ঐ সূক্ষ্ম মূলের সংস্পর্শে আসিলেই আটক পড়ে এবং জমির মধ্যেই সংরক্ষিত হয়।

মৃত্তিকা-কণা তৃণের মূল আটকাইয়া রাখে বলিয়া তৃণভূমির ঝরণার জল খুব স্বচ্ছ হয়। তৃণহীন স্থানের জল ঘোলা ও পানের অনুপযুক্ত। ঐ জলের সঙ্গে মৃত্তিকার কণা বিনা বাধায় মিশিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে। পরীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, ভূমি সংরক্ষরণে কর্ষিত শস্যক্ষেত্র অপেক্ষা সাধারণ তৃণভূমির শক্তি হাজার গুণ বেশী এবং উহার জল ধারণের শক্তিও তিনশত গুণ অধিক।

তৃণ যে শুধু জল ও বায়ুর প্রকোপ হইতে ভূমি সংরক্ষণ করিতেছে তাহাই নহে, অনেক স্থানে উপকূল ভাগে মৃত্তিকা গঠন করিয়াও চলিয়াছে। কয়েক জাতীয় শক্ত তৃণ জলপ্লাবিত উপকূলভাগের বালিতে জন্মে। ঢেউগুলি তৃণের গায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং ঢেউ বাহিত প্রস্তরকণা তৃণের গোড়ায় আটকাইয়া যায়। এইভাবে প্রস্তরকণা জমিয়া একটি দৃঢ় স্তরের সৃষ্টি হয় এবং ভূভাগ ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে ঐ প্রস্তরগঠিত জলাভূমি ভরাট হইয়া আবাদী জমিতে পরিণত হয়। নদীর নূতন চড়ায় কাশবন জন্মিতে দেখা যায়। কাশের মূল নবগঠিত পলিমাটিতে বাঁধন সৃষ্টি করিয়া উহাকে দৃঢ় করে।

বিবিধ শিল্পেও তৃণের ব্যবহার হয়। গৃহ রচনায়

বাঁশ ও খড়ের ব্যবহার বহু দেশের হইয়া থাকে। দড়ি, ঝুড়ি, ঝাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক স্থানে জুতা, টুপি প্রস্তুতে পর্যন্ত তৃণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিমন, সিট্রোলেনা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় তৃণ হইতে গন্ধদ্রব্য বাহির করিয়া তেল, সাবান ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। বাঁশ হইতে ভারতবর্ষে, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার অনেক স্থানে ও ফরাসী দেশে কাগজ প্রস্তুত হয়। একর প্রতি পাইন গাছ হইতে যে পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হয় প্রতি একরের বাঁশ হইতে উহার তিন গুণ অধিক কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেলুলোজ ও রেয়ন প্রস্তুতেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। ত্রিবাঙ্কুরে প্রথম বাঁশ হইতে রেয়ন প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হয়।

তৃণ ধরিত্রীর রুক্ষতার উপর শ্যামল আভরণ সৃষ্টি করিয়া আমাদের নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। তৃণাচ্ছাদিত মাঠে দেহ এলাইয়া আমরা বিশ্রামসুখ লাভ করি। তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর আমরা ক্রীড়ার আনন্দ উপভোগ করি। তৃণহীন মাঠে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার অনুষ্ঠান আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ তৃণগত, আমাদের স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্পদ, সুখ প্রভৃতি তৃণের উপর নির্ভরশীল।

শিলাস্তরে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে দুই কোটি বৎসর পূর্বেও তৃণ পৃথিবীতে বর্তমান ছিল এবং এক সময় ইহা পৃথিবীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এক হিসাবে ইহারা বর্তমান পৃথিবীতেও প্রাধান্য করিতেছে; কারণ তৃণ ব্যতীত মানুষের জীবনধারণ সম্ভব হইত না। বিজ্ঞানীদের মতে মানব-বংশের চির অবলুপ্তির পরেও তৃণ পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিবে।

জাফরানের কথা

জাফরান কথাটি আরবী শব্দ। সার জর্জ ওয়াট্ জাফরান ও কুঙ্কুম সমপর্যায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। দেশভেদে এই কুঙ্কুম ত্রিবিধ, যথা—

কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধিতৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ।
কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥
কুঙ্কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥
—(ভাবপ্রকাশ)।

বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে—

লোরে মিটায়ল পীন পয়োধর
মৃগমদ কুমকুম রেখা।

'বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে' জাফরান ঘুসৃণ বলে অভিহিত হয়েছে; যথা—

যত্র স্ত্রীণাং মসৃণঘুসৃণালেপনোষ্ণা কুচশ্রীঃ।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যেও জাফরানের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের নাট্যশালা, সভাগৃহ, রাজদরবার প্রভৃতিতে গন্ধদ্রব্য হিসাবে জাফরান ব্যবহৃত হতো। রোমকদের স্নানাগারেও জাফরানের ব্যবহার ছিল। সম্রাট নীরো যখন অভিযান শেষে সসৈন্য রোমে প্রবেশ করেন সেই সময় জাফরান ছড়িয়ে রাজপথ সুরভিত করে তোলা হয়েছিল।

গ্রীক এবং ফিনিসীয়দের প্রধান রঞ্জক পদার্থ ছিল এই জাফরান। গ্রীকগণ বিবাহ-উৎসবে কনের মস্তকে জাফরান ফুলের মুকুট পরিয়ে দিত। মুঘল যুগেও জাফরানের যথেষ্ট কদর ছিল।

জাফরানের আদিভূমি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া। মধ্যযুগে ক্রুশেডের সময় খৃষ্টান ধর্ম-

যোদ্ধারা উত্তর ইউরোপে জাফরানের আমদানী করে। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীতে আরব যোদ্ধারা স্পেনে জাফরান নিয়ে যায়। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডেও যে জাফরানের চাষ হতো তার প্রমাণ চসারের কাব্যে পাওয়া যায়। বোধহয় মঙ্গোল জাতি কর্তৃক মহাচীনে জাফরান নীত হয়েছিল।

মধ্যযুগে জাফরান একমাত্র গন্ধদ্রব্য এবং রঞ্জক মাত্রাতিরিক্ত গ্রহণ করলে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সম্ভ্রান্তবংশের মহিলারা মুখ ও শরীরের কোন কোন অংশ ফিকে হলদে রঙে রঞ্জিত করবার জন্যে জাফরান ব্যবহার করতেন। খাদ্যদ্রব্যের মশলা হিসাবে জাফরানের যথেষ্ট সমাদর ছিল; তাছাড়া ভাত এবং বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্য রং
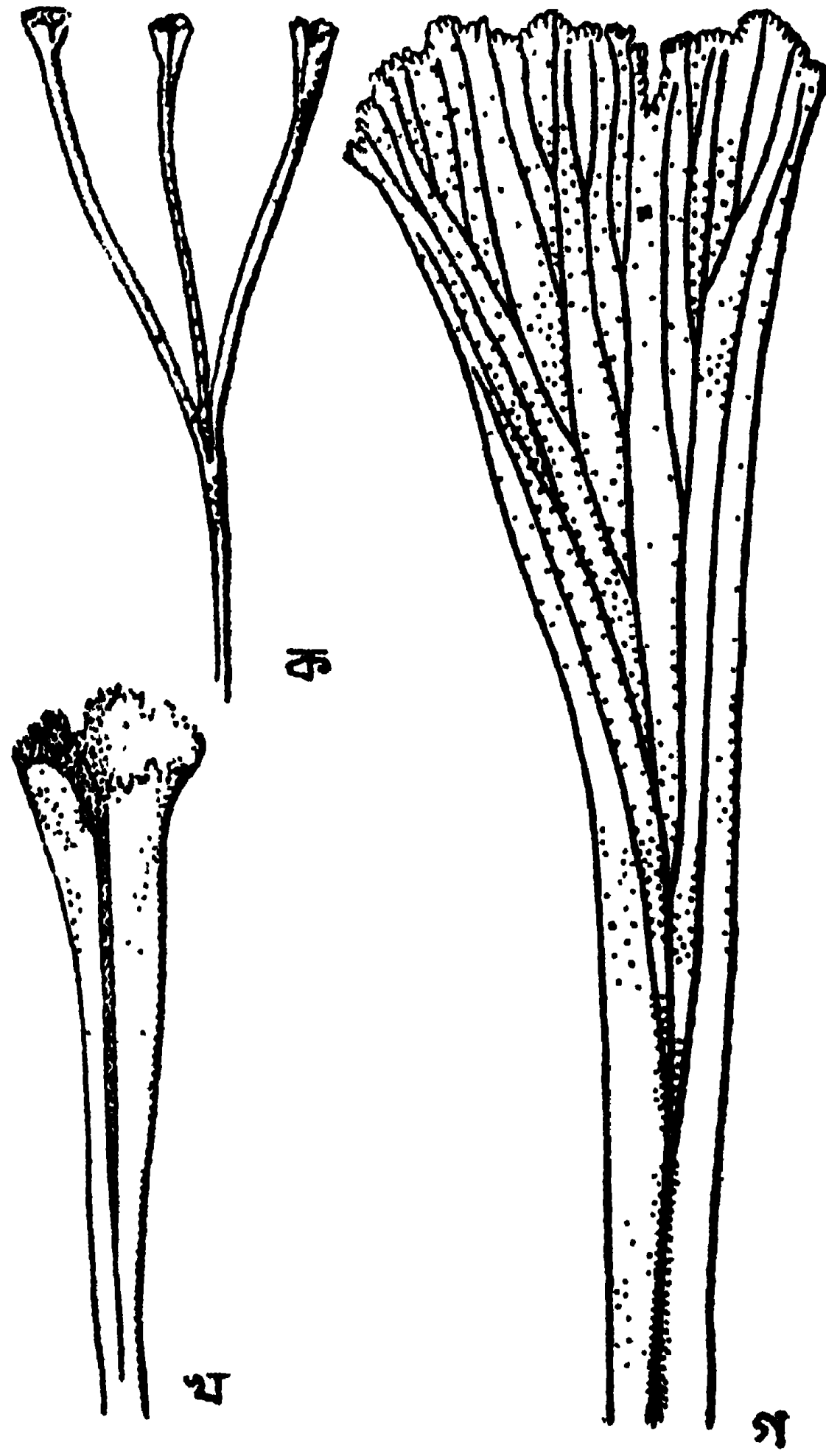
ক—তিনটি গর্ভমুণ্ডসহ গর্ভদণ্ডের উপরের অংশ, খ—গর্ভমুণ্ড, গ—গর্ভমুণ্ড (বিস্তৃত ও বর্ধিতাকারে)

পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হতো না। ওষুধের উপাদান রূপেও ইহার প্রয়োগ ছিল। জ্বর, অবসাদ, যকৃতের বৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে চিকিৎসকেরা জাফরান ব্যবহার করতেন। ইহা উত্তেজক এবং অগ্নিবর্ধক। শিশুদের সর্দি-জ্বরে ইহা উপকারী। এতদ্ব্যতীত ইহা বলকারক, হিক্কানিবারক ও রজোনিঃসারক। করবার জন্যেও ইহা ব্যবহৃত হতো। অনেক সময় রাজারাজড়াদের নৃত্য-গীতাদি উৎসবে কুঙ্কুম-বিস্তারের ওপর পাতা হতো মখমলের বস্ত্র। তার ওপর গুরু গুরু মুরজ-ধ্বনির তালে তালে আর বীণার ঝঙ্কারে নৃত্যপটিয়সী নর্তকীরা পা ফেলত। তাদের চরণের আঘাতে উত্থিত কুঙ্কুম-রজ রক্ত-রাঙা করে তুলত শ্রোতৃবর্গকে।

শোনা যায়, ভারতের অনেক গুণী ব্যক্তি জাফরান দিয়ে এক ধরনের কালী তৈরী করে তন্ত্র-মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ করতেন। এতে নাকি মন্ত্রের কার্য-কারিতা সবিশেষ বৃদ্ধি পেত।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরকে জাফরানের দেশ বলা হয়। কিন্তু কাশ্মীরে জাফরানের আমদানী কখন হয়েছিল তা সঠিক বলা যায় না। খুব সম্ভব মুসলমানেরাই এখানে জাফরান আমদানী করেছিল। মহারাজ ললিতাদিত্যের সময় এই জাফরানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় ৭৫০ অব্দ। 'আইন-ই-আকবরী'-তেও জাফরান ফুলের গুণগরিমা বর্ণিত হয়েছে; দর্শকমাত্রেই জাফরান ফুলের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পড়ে।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর জাফরান ফুলের দেশ হলেও সব জায়গায় জাফরান উৎপন্ন হয় না। একমাত্র পামপুরে জাফরানের চাষ হয়। সমুদ্র থেকে ৫,০০০ ফুট উচ্চে ইহা অবস্থিত। অবশ্য কিস্তোয়ারেও জাফরান হয়; তবে পামপুরের তুলনায় নগণ্য। কিস্তোয়ার জম্মুর অন্তর্গত। লালচে দোঁয়াশ মাটি জাফরান চাষের পক্ষে উপযোগী। আবাদী জমি খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়। এই খণ্ড জমিগুলি চতুষ্কোণ থাকে। বীজ বপনের পূর্বে এই জমি আবার আট বছর পতিত ফেলে রাখা হয়। এই সময় জমিতে কোন সার দেওয়া বা জল সেচ করা হয় না। অতঃপর মার্চ এবং জুলাই মাসের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জমি চাষ দিয়ে মাটি নরম করে নিতে হয়। চতুষ্কোণী খণ্ড-জমিগুলির চারধারে নালা কাটা হয়; এদ্বারা জলসেচের পক্ষে সুবিধা হয়। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জমিতে চারা লাগান হয়। তিন-চার সপ্তাহ পর ফুল দেখা দেয়। তখন জাফরানের ক্ষেত পরিবর্তিত হয় ফুলের বাগিচায়। শুধু ফুল আর ফুল। বিচিত্র বর্ণের

জাফরান গাছ

পুষ্পসম্ভারে উপত্যকা অপরূপ শ্রী ধারণ করে। ফুলের তীব্র গন্ধে মত্ত-মদির হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। এর সঙ্গে সংযোজিত হয় মজদুরদের গান। প্রভাতে স্ত্রী-পুরুষেরা দল বেঁধে ফুল তোলে আর মনের আনন্দে গান গেয়ে চলে। জাফরান ফুলের রং তাদের মনেও রং লাগায়।

সব ফুল তুলে নিয়ে থলের মধ্যে ভরা হয়। তারপর সেগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। জাফরান ফুলের ঝাড়া হয়, তারপর সেগুলি জলভর্তি পাত্রে ফেলা হয়। তখন ফুলের পাপড়িগুলি জলে ভাসতে থাকে; আর আসল পদার্থগুলি জলে ডুবে যায়। ভাসমান অংশ পৃথক করে তলানিটুকু (নিওয়াল) ছেঁকে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর জাফরান তৈরী করা হয়; একে বলা হয় লাচা। এই একই পদ্ধতি তিনবার অনুসৃত হয়ে থাকে।

পরিশ্রমের তুলনায় জাফরানের উৎপাদন হার
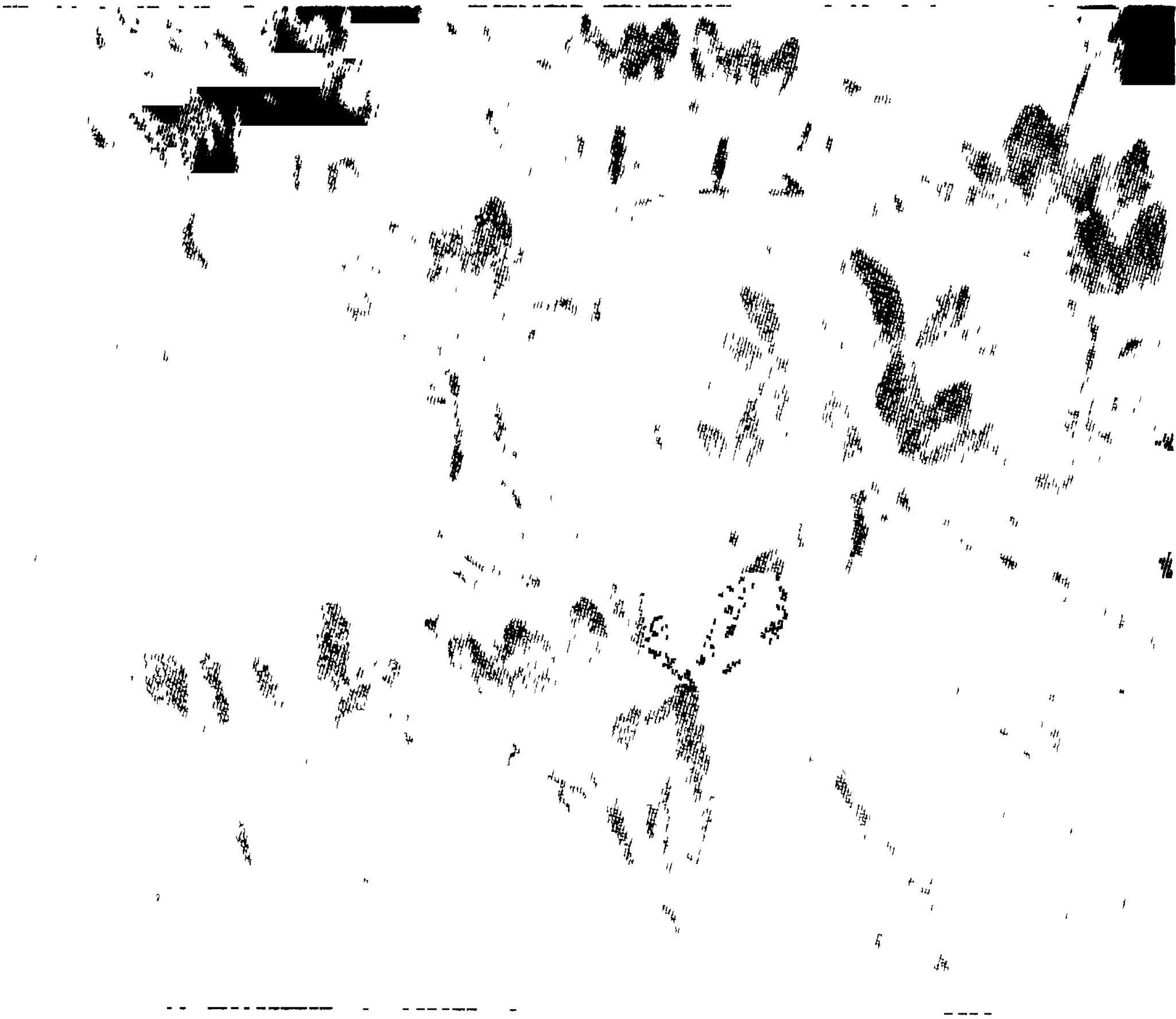
ক্ষেতে অসংখ্য জাফরান ফুটে রয়েছে

তিনটি লম্বা গর্ভমুণ্ড থাকে; এগুলির অগ্রভাগে টোপরের ন্যায় রক্তপীতাভ অংশ দেখা যায়। শুধু এই অংশ থেকে যে জাফরান তৈরী হয় তাকে শাহী জাফরান বলে। ইহাই নাকি বিশুদ্ধ জাফরান এবং প্রথম শ্রেণীর বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। গর্ভদণ্ড থেকে যে জাফরান পাওয়া যায় তাকে মোঙ্গলা বলে। মোঙ্গলা জাফরান তৈরীর পর রৌদ্র-শুষ্ক ফুলগুলি লাঠি দিয়ে ধুনে নিয়ে কুলার সাহায্যে

খুবই কম। প্রায় আট হাজার ফুল থেকে মাত্র চার আউন্স শুষ্ক জাফরান তৈরী হয়। 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর'-এ উল্লেখ আছে—ভাল সনে কাশ্মীরে চার শ' মণ জাফরান উৎপন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে স্পেন, ফ্রান্স, সিসিলি, গ্রীক, তুরস্ক, মহাচীন প্রভৃতি দেশও জাফরানের চাষ করে থাকে।

অভ্যস্ত না হলে জাফরানের ক্ষেতে বেশীক্ষণ কাজ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সম্রাট

জাহাঙ্গীরের রোজনামচায় দেখা যায়—ফুল তোলবার সময় জাফরানের তীব্র গন্ধে তাঁর ভৃত্যবর্গের ভীষণ মাথা ধরে। এমন কি মদ্যপান করা সত্ত্বে সম্রাটেরও মাথা ধরেছিল। কাশ্মীরী কিষাণদের জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন—জীবনে তাদের কারো মাথা ধরে নি।

জাফরানে ভেজালও দেওয়া হয়। তৃতীয় বারের নিওয়ালের সঙ্গে প্রথম বারের নিওয়াল মিশ্রিত করে ভেজাল জাফরান তৈরী হয়ে থাকে। এ জাতীয় জাফরানের রং ফিকে হয় এবং গন্ধ ততটা তীব্র থাকে না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে নুরেম্বার্গে জনৈক অপরাধীকে তার ভেজাল জাফরানের সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা হয়। আরও জানা যায়—জাফরানে ভেজাল দিতে গিয়ে আরও তিন ব্যক্তি ধরা পড়ে। তাদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। তৎকালে অপরাধীর শাস্তি এমনই কঠোর ছিল। ইদানীং জাফরানে হলুদ ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য পূর্বেও ভেজাল হিসাবে হলুদ ব্যবহৃত হতো। খৃষ্টীয় ১২৮০ অব্দে মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই হলুদের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—'এক জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়, যার মধ্যে খাঁটি জাফরানের সকল গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে; বর্ণে গন্ধে ইহা জাফরানের দোসর। আসলে কিন্তু ইহা জাফরান নয়।' ক্যালেনডুলা, কার্থামাস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের ফুলের শুকনো পাঁপড়িও জাফরানের সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। ওজন বৃদ্ধি করবার জন্যে চিনি, মধু, গ্লিসারিন, খনিজ তৈল প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়। ভেজাল জাফরানের রং অনেক সময় ফিকে হয়ে যায়; তাই কোন কোন জৈব রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে এগুলি রং করা হয়।

জাফরানের দুর্মূল্যতার দরুণ আজকাল ইহার ব্যবহার ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ইহা অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মঠ-মন্দিরেও গন্ধদ্রব্য হিসাবে জাফরানের ব্যবহার দেখা যায়।

—ম—

গো-খাদ্য

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

অনেকেই হয়তো মনে করিবেন, যেখানে মানুষেরই অনাহারে, অর্ধাহারে জীবন যাপন করিবার প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেখানে আবার গো-খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন কি? তাঁহারা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখেন তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, গো-জাতির উন্নতির সঙ্গে মানুষের অন্যান্য উন্নতি ব্যতীতও বিশেষ করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা সকলেই আজ সমস্বরে ধ্বনি তুলিয়াছেন – খাদ্য-শস্য বাড়াও। এই বাণী আকাশে, বাতাসে, দিগ-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হইলে গো-খাদ্য ও গো-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ করিয়া চিন্তা করা প্রয়োজন। এই প্রশ্ন সমাধানের উপর আমাদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান অনেকটা নির্ভর করে।

বাংলার গরু পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট—এইরূপ একটা অপবাদ আছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই বলেন যে, গো-জাতির উন্নতির পক্ষে এখানকার আবহাওয়া সুবিধাজনক নয়, কিন্তু ইহা ভুল ধারণা মাত্র। আমাদের দেশে গরুর যেরূপ অযত্ন হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও আর সেরূপ দেখা যায় না। প্রথমাবস্থা হইতেই আমরা গো-বৎসের অযত্ন করিতে আরম্ভ করি। আমাদের দেশে প্রতিটি গরু গড়ে মাত্র এক সের করিয়া দুধ দেয়; কিন্তু একটি বাছুরকে স্বাস্থ্যবতী গাভী বা স্বাস্থ্যবান ষাঁড়রূপে দেখিতে হইলে প্রত্যহ তিন সের করিয়া দুগ্ধ খাওয়ান প্রয়োজন। দুগ্ধের পরিবর্তে অন্যবিধ খাদ্যও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অন্য খাদ্য দূরের কথা, আমরা সাধারণতঃ ঐ এক সের দুধের সবটুকুই আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে অথবা বিক্রয় করিবার জন্য দোহন করিয়া লই। পরিমিত দুগ্ধের অভাবে গো-বৎস যে দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িবে সে কথা একটি বারও চিন্তা করিয়া দেখি না। ইহা অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই প্রকারে পালিত বৎস বড় হইয়া কখনও শক্তিশালী হইতে পারে না।

অপরিমিত আহারই বাংলার গরুর অবনতির প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত দুর্বল পিতা-মাতার স্বাস্থ্যবান বাছুরও আমরা আশা করিতে পারি না। গরুর অবনতির আরও অনেকগুলি কারণ আছে—অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অল্প বয়সে প্রজনন-ক্রিয়া, অসুখ, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় গো-খাদ্য, এবার সেই বিষয়ই বলিব।

দেশের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে কৃষকদেরই গো-খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রীতিমত আহার দিয়া চাষের গরু বা বলদকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সোনার বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে আবার সোনা ফলাইতে হইলে শক্তিশালী গরুর দ্বারা ভালভাবে চাষ আবাদ করিতে হইবে। রুগ্ন গরুর দ্বারা চাষ করিলে ভাল ফসল পাওয়া সম্ভব নহে। যতদিন যথেষ্ট পরিমাণে ট্র্যাকটরের বন্দোবস্ত না হইতেছে ততদিন জমি চাষের জন্য শক্তিশালী গরুর প্রয়োজন রহিয়াছে।

আমাদের দেশে গোচারণ-ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। যাহাও আছে তাহা এত সামান্য যে, তাহাতে যথেষ্ট গো-খাদ্য পাওয়া সম্ভব নয়। বৈদিক যুগে গোচারণ ভূমিকে 'খিল্য' বলা হইত। সেই সময় খিল্য ছিল সর্বসাধারণের সম্পত্তি। অবাধে

অসংখ্য গরু সেখানে বিচরণ করিত। সেযুগে শক্তিশালী ও দুগ্ধবতী গাভীর কোন অভাবই ছিল না। গো-জাতির উন্নতিকল্পে প্রত্যেক পল্লী-মঙ্গল সমিতির একটি করিয়া বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। পল্লীগ্রামে সুবিধামত অন্ততঃ একটি বা দুইটি করিয়া গোচারণ-ক্ষেত্র সমিতির তত্বাবধানে রাখা উচিত। এই গোচারণ-ক্ষেত্রে যাহাতে গ্রামের সকল গরু চরিতে পারে, সেই বন্দোবস্তও করা দরকার। মাত্র ১ একর জমি হইতে ১৫০/ মণ মটর কলাই, ২৭০/ মণ ভুট্টা বা জোয়ার গাছ এবং ১৫০/ মণ বরবটি গাছ উৎপন্ন হইতে পারে। সর্বসমেত এই ৫৭০/ মণ কাঁচা ও সবুজ খাদ্য-দ্বারা ১০ সের হিসাবে ৬টি গাভীকে সারা বৎসর খাওয়ান যাইতে পারে।

অনেকেই মনে করেন—বাড়ীব চাবিদিকে যে পরিমাণ ঘাস থাকে তাহাই নিজ নিজ গরুর খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট। তাই অনেকেই গরুর পিছনে এক কপর্দকও খরচ না করিয়া বেশী দুধ পাইতে এবং ভালভাবে চাষ-আবাদের কাজ চালাইতে আশা করেন; কিন্তু তাহাতে ফল হয় বিপরীত। গরুর জন্য প্রথমতঃ কিছু পয়সা খরচ করিতে হয়। পরিনামে এই পয়সাই অন্ততঃ দ্বিগুণ পয়সা ঘরে আনে। কিন্তু এই দিকে অনেকেই সহজে নজর দিতে চান না।

বাংলাদেশে চুণিভুষি, চাউল, সরিষার খইল এবং মাটির কলাই সর্বত্রই পাওয়া যায়। গাভীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সবুজ ঘাস এবং অন্য খাদ্য ছাড়াও চুণিভুষি ৪ ছটাক, সিদ্ধ চাউল ১ সের, মাটি কলাই ১ সের, সরিষার খইল ৫ ছটাক এবং লবণ ২ ছটাক প্রত্যহ খাওয়ান প্রয়োজন। অনেকগুলি রুগ্ন বলদ রাখার চেয়ে দুই একটি স্বাস্থ্যবান বলদ রাখা ভাল। অনাহারক্লিষ্ট দুই জোড়া বলদের স্থলে এক জোড়া শক্তিশালী বলদ রাখিলেই দুই জোড়ার কাজ চলিতে পারে। অনেকদিন ধরিয়া বেকার পড়িয়া না থাকিলে বলদের খাদ্য কমাইয়া দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। ধান-জমি কাদা করিবার বহু পূর্ব হইতেই বলদকে পূর্ণ মাত্রায় খাদ্য দেওয়া উচিত। তাহাতে পূর্ব হইতেই ইহারা শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়। খড় ব্যতীত প্রত্যেক বলদকে দেড় সের চুণিভুষি, আধসের মাটি কলাই, আধসের সরিষার খইল এবং ২ ছটাক লবণ প্রত্যহ খাইতে দেওয়া দরকার।

বর্ষাকালে দুধের বড়ই অভাব দেখা যায়। অনেক জায়গায় এই অভাব সর্বদা লাগিয়াই থাকে। ইহার একমাত্র প্রধান কারণ গো-খাদ্যের অভাব। পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালে গোপালন খুবই অসুবিধাজনক। বর্ষাঋতুতে খাওয়ার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অনেকদিনের ঘাস তাজা রাখিবার উপায় আছে। যাহাদের গরু আছে তাহাদের প্রত্যেকের সেই উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। গরুর যে কোন মুখরোচক ঘাস টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ৬½ হাত গোল এবং ৬½ হাত গভীর গর্তে খুব চাপিয়া ভরিয়া রাখিলেই ৩।৪ মাস পরে জীবাণু দ্বারা তাজা জলপুর্ণ গাছগুলি পরিবর্তিত হইয়া পুষ্টিকর খাদ্যে পরিণত হয়। এই গর্তের নাম 'সাইলো' এবং এই খাদ্যের নাম 'সাইলেজ'। ইহাতে জল নামিবার ভয় থাকিলে পাকা গাঁথুনির প্রয়োজন।

সাইলোর ভিতরে ঘাসগুলিকে খুব ভাল করিয়া চাপিয়া ভরিতে হয়। গর্তে গাছগুলি ফেলিবার পূর্বে উহার তলায় ১ ফুট গভীর করিয়া অকেজো খড় বা অন্য কোন বাজে পদার্থ সাজিয়ে দিতে হয়। ইহাতে সাইলেজ অনেকটা কম নষ্ট হয়। যখন সাইলোটি ভর্তি হইয়া যায় তখন মাটির চাবড়া দিয়া মুখটা এরূপভাবে আটকাইয়া দিতে হয় যেন বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। বর্ষাকালে যখন টাটকা ঘাস দুর্লভ হয় তখন প্রত্যেক গরুকে রোজ ১০ সের করিয়া উহা খাইতে দিতে হয়। উহাতে ২৭০/ মণ ঘাস ধরে।

ইহা দ্বারা ৬টি গরুকে ৬ মাসের খোরাক দেওয়া যায়। সাইলেজ তৈয়ারী না হওয়া পর্যন্ত সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ভিতরে বাতাস প্রবেশ না করে। মুখের মাটির চাবড়া ফাটিয়া গেলে জোড়া দিয়া দিতে হয়।

ভাল চাষের জন্য বলবান ও শক্তিশালী বলদের প্রয়োজন আর মানুষের শরীরপুষ্টির জন্য ভাল দুধের প্রয়োজন। ইহা পাইতে হইলে উপরোক্ত উপায়ে গো-খাদ্য সমস্যার সমাধানকল্পে সকলের মনোযোগী হওয়া একান্ত দরকার।

বিজ্ঞান-সংবাদ

এক কোষ হইতে অন্য কোষে নিউক্লিয়াস স্থানান্তরের ব্যবস্থা

আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় জীবন্ত প্রাণী-কোষের নিউক্লিয়াস অপসারিত করিয়া তাহার স্থলে অন্য কোষের নিউক্লিয়াস সংস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। অ্যামিবা অপেক্ষা জটিলতর প্রাণী-কোষে নিউক্লিয়াস কোষান্তরীকরণ প্রচেষ্টার ইহাই প্রথম সাফল্য। দেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কোষের কোন্ অংশটির জন্য উহার বিশেষ ধর্ম প্রকাশিত হয় এবং ক্যানসার-কোষে ঐ বিশেষ ধর্মের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ কি—ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণের পক্ষে নিউক্লিয়াসের কোষান্তরীকরণের ব্যবস্থা যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

ফিলাডেলফিয়ার ক্যানসার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাঃ ব্রিগস্ ও ডাঃ কিং ব্যাঙের ডিমের উপর পরীক্ষা করিয়া নিউক্লিয়াস কোষান্তরীকরণের কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। পরে ন্যাশনাল ক্যানসার ইনষ্টিটিউট এবং আমেরিকান সোসাইটি হইতেও এই কৌশলের কার্যকারিতা সমর্থিত হইয়াছে।

জীবন্ত কোষের নিউক্লিয়াসের গঠন অতি সূক্ষ্ম; ইহা অল্প আঘাতে বা কৃত্রিম পরিবেশে নীত হইলে সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে বিজ্ঞানীরা ভাবিয়াছিলেন, নিউক্লিয়াসকে এক কোষ হইতে অন্য কোষে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। কিন্তু পূর্বোক্ত অভিনব কৌশলে এই কার্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইয়াছে।

এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, অন্য নিউক্লিয়াস সংযোগে নবগঠিত কোষ স্বাভাবিক কোষের ন্যায় বিভাজনক্ষম থাকে। কোষের বৈশিষ্ট্য নিউক্লিয়াসের উপর নির্ভরশীল, না কোষমধ্যস্থিত সাইটোপ্লাজম কর্তৃক নির্ধারিত হয়—তাহা নির্ধারণ করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বর্ধনশীল স্নায়ুকোষ হইতে নিউক্লিয়াস সংগ্রহ করিয়া অন্য কোষের মধ্যে সংস্থাপন করিয়াছেন। ঐ কোষগুলি যদি স্নায়ুকোষে পরিণত হয় তবে বুঝিতে হইবে, নিউক্লিয়াসই কোষের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ধর্ম নিয়ন্ত্রণ করে; অন্যথায় বুঝিতে হইবে, সাইটোপ্লাজমের দ্বারাই কোষের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হইয়া থাকে।

অত্যধিক ভিটামিন-এ ব্যবহারের কুফল

আজকাল অনেকেরই ভিটামিনের উপর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। কোন খাদ্যদ্রব্যে বেশী ভিটামিন আছে শুনিলে তাঁহারা ঐ দ্রব্য বেশী পরিমাণে খাইতে আরম্ভ করেন এবং অপরকেও ঐরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ঐ দ্রব্য তাঁহার পক্ষে রুচিকর না হইলেও কষ্ট করিয়া উহাতে অভ্যস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ডাক্তারখানা

হইতে ভিটামিন ট্যাবলেট কিনিয়া খাইয়া থাকেন, এরূপ লোকের অভাব নাই। ভিটামিন যত খাওয়া যায় স্বাস্থ্যের ততই উন্নতি হইবে—ইহাই সাধারণের ধারণা। অতিরিক্ত ভিটামিন সেবন করিলে শরীরের কোন ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া কেহ সন্দেহ করেন না।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কলেজ অব মেডিসিনের ডাঃ কোলানের এক পরীক্ষা হইতে আভাস পাওয়া যায় যে, গর্ভাবস্থায় অত্যধিক ভিটামিন-এ সেবন করিলে মৃত বা বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা আছে।

ডাঃ কোলান ইঁদুরের উপর এই পরীক্ষা করেন। একশতটি ইঁদুরকে অধিক পরিমাণে ভিটামিন-এ খাওয়াইবার ফলে কেবলমাত্র দশটি পূর্ণকাল গর্ভ-ধারণে সক্ষম হয়। সেই স্থলে স্বাভাবিক খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া পঞ্চাশটি ইঁদুরের মধ্যে শতকরা ৮৮টি পূর্ণকাল গর্ভধারণ করে।

অতিরিক্ত ভিটামিন খাওয়ান হইয়াছে এরূপ দশটি ইঁদুরের ৭৪টি বাচ্চা হয়। তন্মধ্যে ৩৪টি বিকৃত করোটি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার ইঁদুরের ৪১০টি বাচ্চার কোনটিরই কোন অঙ্গবিকৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

বিকৃতাঙ্গ বাচ্চার সবগুলিরই মস্তিষ্ক মাথার বাহিরে ডেলা বাঁধিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহার উপর কতকগুলির আবার অন্যান্য অঙ্গবৈকল্যও পরিদৃষ্ট হয়; যেমন—কাহারও জিভ বাহির হইয়া থাকে, কাহারও ঠোঁট কাটা, কাহারও বা তালু দ্বিধা বিভক্ত, আবার কাহারও চোখের গঠন বিকৃত।

রক্ত-চাপের আধিক্য নিবারণে উদ্ভিদজাত ঔষধ

রায়োল্‌ফিয়া সার্পেন্টিনা নামে উষ্ণ অঞ্চলের এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে অবসাদক ও রক্ত-চাপের আধিক্য নিবারক একটি ঔষধ নিষ্কাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অবসাদক হিসাবে এই উদ্ভিদের কাঁচা রস পূর্বে ভারতে ব্যবহৃত হইত। নিদ্রা আকর্ষণের জন্য মহাত্মা গান্ধী কিছুদিন এই রস সেবন করিয়াছিলেন। এই ঔষধের নির্মাতা সিবা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্ট্‌স্ ইহার নাম দিয়াছেন—সার্পাসিল। এই প্রতিষ্ঠানের ডাঃ মিটলার-এর গবেষণার ফলে উদ্ভিদটির সারাংশ নিষ্কাশন সম্ভব হইয়াছে।

সিবা প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি ডাঃ ইয়ঙ্কম্যান প্রকাশ করেন, হাসপাতালগুলিতে ও ডাক্তারদের নিকট এই ঔষধটি যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া রোগীদের উপর এই ঔষধের ক্রিয়া আরও বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

করোটির ভগ্ন স্থান পুনর্গঠনে প্লাষ্টিকের ব্যবহার

রচেষ্টারের মেয়ো ক্লিনিকের গবেষণালব্ধ সন্তোষজনক ফল হইতে আশা করা যায়, প্লাষ্টিক দ্বারা সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে করোটির ভগ্ন স্থান পুনর্গঠন করা যাইবে।

নকল দাঁতের মাড়ি নির্মাণ করিতে পেন্টোক্রিল নামে যে অ্যাক্রাইলিক প্লাষ্টিক ব্যবহৃত হয়, তাহার মণ্ড প্রস্তুত করিয়া করোটির ভগ্ন স্থানে ঢালিয়া দিবার পর আঙ্গুলের দ্বারা প্রয়োজনমত চাপ দিয়া ভগ্ন অংশের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হয়। শুষ্ক হইলে উহা যথেষ্ট কঠিন হইয়া যায়। পূর্বে ভগ্ন করোটি পুনর্গঠনে লৌহ বা ট্যান্টেলাম ব্যবহৃত হইত। ধাতব পদার্থ ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা এই যে, আবহাওয়ার তাপ পরিবর্তনে ব্যবহারকারী অস্বস্তি অনুভব করে। ভগ্ন স্থানের হুবহু মাপ মত ধাতব টুক্‌রা তৈয়ার করাও খুব কষ্টসাধ্য। প্লাষ্টিকের ব্যবহারে এই সব অসুবিধা দূর হইবে। প্লাষ্টিকের কিছু স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকায় ধাতব পদার্থের ন্যায় উহা সহজে বাঁকিয়া যায় না।

প্লাষ্টিকের দ্বারা ঢালাই করিয়া সাতটি রোগীর

ভগ্ন করোটি মেরামত করা হইয়াছে। উহাদের কয়েকটির ভগ্ন স্থানের পরিমাণ এক হইতে চার বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত ছিল। তন্মধ্যে দুইজনের ভগ্ন অংশ এমনই বেয়াড়া রকমের ছিল যে, ধাতব টুকরা দ্বারা তাহা নিখুঁতভাবে পুনর্গঠন করা সম্ভব হইত না।

এই অভিনব ব্যবস্থাটি উদ্ভাবন করিয়াছেন আলসেস্‌লোরেনের ডাঃ ওরিঙ্গার। মেয়ো ক্লিনিকের ডাঃ উড্‌ ও ডাঃ ক্রেগ রোগীদের উপর ইহা পরীক্ষা করিয়াছেন। এই ভাবে চিকিৎসা করিবার পর রোগীদের পাচ মাস পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখা হইয়াছিল। এখন পর্যন্ত ইহার ফল সন্তোষজনক বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে।

নূতন রাসায়নিক উপায়ে সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি সঞ্চয়

আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির এক সভায় ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজির দুই জন রাসায়নিক প্রকাশ করেন যে, সূর্যরশ্মি হইতে সহজ উপায়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজন-মত তাহা ব্যবহারোপযোগী করিবার নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইহার উদ্ভাবক, ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রির প্রফেসর ডাঃ হাইট এবং মিঃ ম্যাকমিল্যান বলেন, এই উপায়ে সূর্যরশ্মির সাহায্যে জল হাইড্রোজেন ও অক্সি-জেনে বিশ্লেষিত হইয়া যায়। পরে ঐ গ্যাস দুইটিকে দহন করিয়া প্রয়োজনমত উত্তাপ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। প্রায় ·১% সূর্যরশ্মি শোষিত হইয়া রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। এত অল্প হারে সংগৃহীত হইলেও ক্ষেত্রায়তন বৃদ্ধি করিলে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদ্বয় আশা করেন। এই প্রক্রিয়া মূলতঃ জলের মধ্যে সেরিক ও সেরাস আয়নের দ্রবণ ও পারক্লোরিক অ্যাসিড সংমিশ্রণের ফলেই সংঘটিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের ফটোসিন্থেসিস্‌ প্রক্রিয়ায় জল ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে শ্বেতসার ও অক্সিজেনে পরিবর্তিত করিতে ক্লোরোফিল যেমন সূর্যরশ্মি বাহকের ন্যায় কাজ করে, এখানেও সেরিক ও সেরাস আয়নগুলি প্রায় সেইরূপই কাজ করিয়া থাকে।

সেরিক ও সেরাস আয়নের দ্রবণে সূর্যরশ্মি পড়িলে দুই প্রকার প্রক্রিয়া যুগপৎ চলিতে থাকে। প্রথমে সেরিক আয়নগুলি সেরাস আয়নে পরি-বর্তিত হইয়া জল হইতে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয়। যুগপৎ আসল সেরাস আয়নগুলি সেরিক আয়নে রূপান্তরিত হইয়া হাইড্রোজেন নির্গত হইতে থাকে। প্রক্রিয়াটি যতক্ষণই চলিতে থাকুক না কেন, দ্রবণটিতে সেরিক ও সেরাস আয়ন বরাবরই থাকিবে এবং সূর্যরশ্মি যতক্ষণ থাকিবে প্রক্রিয়াটি ততক্ষণই চলিবে। এই ভাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া উহাদের একত্রে দহন করিলে খুব উচ্চ তাপ পাওয়া যায়। গবেষকেরা বলেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন দহন করিয়া ২৫০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। বিশেষ ধরনের ইঞ্জিনের সাহায্যে এই শক্তির ৮৬% কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মানুষ ও গৃহপালিত পশুর পক্ষে নিরাপদ কীটঘ্ন

আমেরিকান কেমিকাল সোসাইটির এক বিবৃতিতে প্রকাশ, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সাইট্রাস এক্সপেরিমেন্ট্যাল ষ্টেসনের গবেষণার ফলে কয়েকটি উগ্র কীটঘ্ন প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। মানুষ ও গৃহপালিত পশুর উপর এইগুলির কোন বিষক্রিয়া নাই। ইহাই এই কীটঘ্নের বিশেষত্ব।

হাইড্রোকার্বন জাতীয় এই নূতন কীটঘ্ন, কীটের দেহে অতি প্রয়োজনীয় কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার দেহ-ক্রিয়ার গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করে। একজাতীয় ময়দার

পোকার উপর কার্যকরী এই নূতন ধরনের একপ্রকার কীটঘ্ন ডি. ডি. টি অপেক্ষা শত গুণ ফলপ্রদ হইতে দেখা গিয়াছে। মশার বাচ্চা ধ্বংসের উপযোগী ঐ জাতীয় আর একটি কীটঘ্ন উগ্রতায় ডি. ডি. টি-র সমকক্ষ হইলেও অন্য জাতীয় কীটের উপর নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ডি. ডি. টি-র মধ্যে ক্লোরিনের অণুই কীটের উপর বিষক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে বলিয়া পূর্বে অনুমিত হইত। নূতন কীটধ্বংসী দুটির রাসায়নিক গঠন প্রায় ডি. ডি. টি-র অনুরূপ হইলেও ইহাদের মধ্যে বিষাক্ত ক্লোরিনের অণু নাই।

ছারপোকার উপর বিষক্রিয়ার সহিত কীটঘ্নের রাসায়নিক গঠনের কি সম্বন্ধ আছে, সেই বিষয়ে গবেষণা করিবার সময় ঘটনাক্রমে উক্ত কীটঘ্ন দুটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির ডাঃ পাউলিং কীটদেহে এনজাইমের ক্রিয়া সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহারই মতবাদ অনুসরণ করিয়া এই ফল পাওয়া গিয়াছে। গবেষকেরা অনুমান করেন যে, কোন বিশেষ আকার ও আয়তনের অণুবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কীটদেহে এনজাইমের ক্রিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে। উপযুক্ত আকার ও আয়তনের কোন অণু, প্রোটিন বা এনজাইমের মধ্যে যে ফাঁক থাকে, তাহার মধ্যে দৃঢ়ভাবে খাপ খাইয়া সংযুক্ত হইলে জীবদেহে স্বাভাবিক এনজাইমের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং তাহারই ফলে উহার জীবনাবসান ঘটিয়া থাকে। বিভিন্ন কীট ধ্বংসে বিভিন্ন পদার্থের স্বতন্ত্র ক্রিয়া হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দুই প্রকার কীটদেহে এনজাইমের ক্রিয়া ভিন্ন।

সাইট্রাস এক্সপেরিমেণ্ট্যাল ষ্টেশনের গবেষণার ফলে কেবল যে কীট ধ্বংসে ডি. ডি. টি-র রাসায়নিক ক্রিয়ার কারণ পরিদৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্লোরিনমুক্ত রাসায়নিকও কীটদেহে উগ্র বিষক্রিয়া ঘটাইতে পারে।

প্ল্যাসেণ্টার রক্তের সিরাম প্রয়োগে আর্থ্রাইটিস-এর উপশম

ব্রুকলিনের ডাঃ স্পায়েলবার্গ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, আর্থ্রাইটিস রোগীর দেহে প্ল্যাসেণ্টার রক্তের সিরাম প্রয়োগে রোগীদের গাঁটের ফুলা, যন্ত্রণা এবং অন্যান্য উপসর্গের উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। প্রসবের পর প্ল্যাসেণ্টার রক্ত হইতে সিরাম সংগ্রহ করা হয়।

পনেরোটি রোগীর উপর একবারমাত্র এই চিকিৎসা করিয়া যে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, পরে ছয় মাস পর্যন্ত আর কোন চিকিৎসা না করিয়া উহা ঐরূপই থাকিয়া যায়। ঔষধটি প্রয়োগের দ্বিতীয় দিনেই তিনটি রোগীর উপর অনুকূল প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। সাতজনের মধ্যে ছয় জনের এক সপ্তাহের মধ্যেই উন্নতি দেখা যায় এবং দশম ব্যক্তির দশম দিনে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত পনেরোটি রোগীর মধ্যে তিনজনের সম্পূর্ণরূপে, তিন জনের অনেকাংশে এবং চার জনের অল্পাংশে রোগের উপশম হয়। অবশিষ্ট পাঁচজনের উপর ঔষধটির কোন ক্রিয়া দেখা যায় নাই।

ছাব্বিশ হইতে আরম্ভ করিয়া পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত এইসব আর্থ্রাইটিস রোগীরা সকলেই স্ত্রীলোক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বহু বৎসর যাবৎ ঐ রোগে ভুগিতেছিলেন। অল্পবয়স্কাদের ক্ষেত্রেই এই চিকিৎসার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। ছাপ্পান্ন হইতে পঁচাত্তর বৎসর বয়সের রোগীদের উপর ইহা কার্যকরী হয় নাই।

প্ল্যাসেণ্টার রক্তের সিরামের ভিতরের কোন্ অংশটি আর্থ্রাইটিস্ রোগের উপশম ঘটায় তাহা এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। ডাঃ স্পায়েলবার্গ বলেন, ইহা যে এ. সি. টি. এইচ নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর শৈশবকালীন আবহাওয়ায় জৈব পদার্থের সৃষ্টি

অতি প্রাচীনকালে যে সময় পৃথিবীতে প্রথম জীবনের আবির্ভাব হয়, পৃথিবীর সেই শৈশবকালীন আবহাওয়ার নকল সৃষ্টি করিয়া জীবদেহ গঠনোপযোগী কয়েকটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে।

শিকাগো ইউনিভার্সিটির রাসায়নিক গবেষণাগারে একটি যন্ত্রের মধ্যে মিথেন, অ্যামোনিয়া, জল ও হাইড্রোজেন শক্তিশালী বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়া ক্রমাগত প্রবাহিত করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীর শৈশবকালীন আবহাওয়া ঐরূপই ছিল। পৃথিবীতে প্রথম জীবনের আবির্ভাব সম্বন্ধে গবেষণারত, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ হ্যারল্ড সি. উরে-র নির্দেশে ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের ফেলো, ডাঃ মিলার এই পরীক্ষাটি করেন।

পরীক্ষালব্ধ পদার্থটিকে ক্রোম্যাটোগ্রাফিক প্রথায় বিশ্লেষণ করিয়া গ্লাইসিন এবং অপর দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গিয়াছে এবং ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলির পদার্থ গঠনের আভাস পাওয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা চলিতেছে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

অভিনব শিল্প-প্রতিষ্ঠান

কৃত্রিম কাঠ প্রস্তুতের নূতন যন্ত্র

ক্রমবর্ধনশীল চাহিদার জন্য কৃত্রিম উপায়ে কাঠ তৈয়ারী করিবার জন্য একরকম নূতন যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ফিলিস ডেভিস লিখিয়াছেন—

যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দাবানল ইত্যাদির ফলে কাষ্ঠের সরবরাহ যতই হ্রাস পাইতেছে সমগ্র বিশ্বে কাষ্ঠের চাহিদার পরিমাণ দিন দিন ততই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বস্তুতপক্ষে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রতি তিন বৎসরে বিশ্বে প্লাইউড ও তক্তার চাহিদা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ অরণ্য হইতে যে পরিমাণ কাষ্ঠ আহরণ করা হয় এযাবৎকাল তাহার শতকরা ৬০ ভাগই সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে। কাষ্ঠশিল্পের একটি পুরাতন ও প্রধান সমস্যা হইল—গাছ কাটিবার পর অথবা তক্তা ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার পর বিপুল পরিমাণ পরিত্যক্ত কাঠের টুকরা, চোকলা ইত্যাদিকে ফেলিয়া না দিয়া অথবা পোড়াইয়া নষ্ট না করিয়া অন্য কিভাবে কাজে লাগান সম্ভব। বৃটেনের দুই শত ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ ও পদার্থবিদ গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য অক্লান্তভাবে গবেষণা করিতেছেন এবং তাঁহাদের গবেষণার ফলে সম্প্রতি লণ্ডন হইতে ৫০ মাইল দূরে কলচেষ্টার নামক স্থানে এমন একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে যাহাকে একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্রমশিল্পের অগ্রদূত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এসেক্সের ভিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর বিশেষজ্ঞগণ প্রায় দশলক্ষ পরীক্ষাকার্য, ৮৪০০০ ড্রয়িং ও ১১০০০ এপ্লিকেসন ষ্টাডির পর এমন একটি অভিনব যন্ত্র নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যাহার সাহায্যে গৃহনির্মাণ সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্পের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিপুল পরিমাণ কাঠের তক্তা নির্মাণ করা সম্ভব হইবে। ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বে এক নূতন শ্রমশিল্পের প্রবর্তন হইবে। কারণ উপরোক্ত কোম্পানী যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কেবল মনুষ্য-

নির্মিত কাষ্ঠই সরবরাহ করিবেন তাহা নয়, বারট্রেভ প্রেস নামক কাষ্ঠ প্রস্তুতের যন্ত্রটিও সরবরাহ করিবে। যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সুইডেন, জার্মেনী, ইটালী, স্পেন, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, ব্রেজিল, আর্জেন্টাইন প্রভৃতি দেশ ইতিমধ্যেই ভিয়ার কোম্পানীর নিকট উপরোক্ত যন্ত্রটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মত ইহাতে সহজে উই ও অন্য পোকা বা ছাতা ধরিতে পারে না। ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্র অপরিসীম। গৃহনির্মাণ, অফিস ও কারখানা নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈয়ার করা, জাহাজ ও রেলগাড়ী নির্মাণ প্রভৃতির কাজে ইহার উপযোগিতা স্বাভাবিক কাঠ অপেক্ষা একতিল কম নয়।

একটি সম্পূর্ণ গৃহের মেঝে, ছাদ, দরজা-জানালা, পার্টিশন ও আসবাবপত্রের জন্য যে পরিমাণ তক্তার
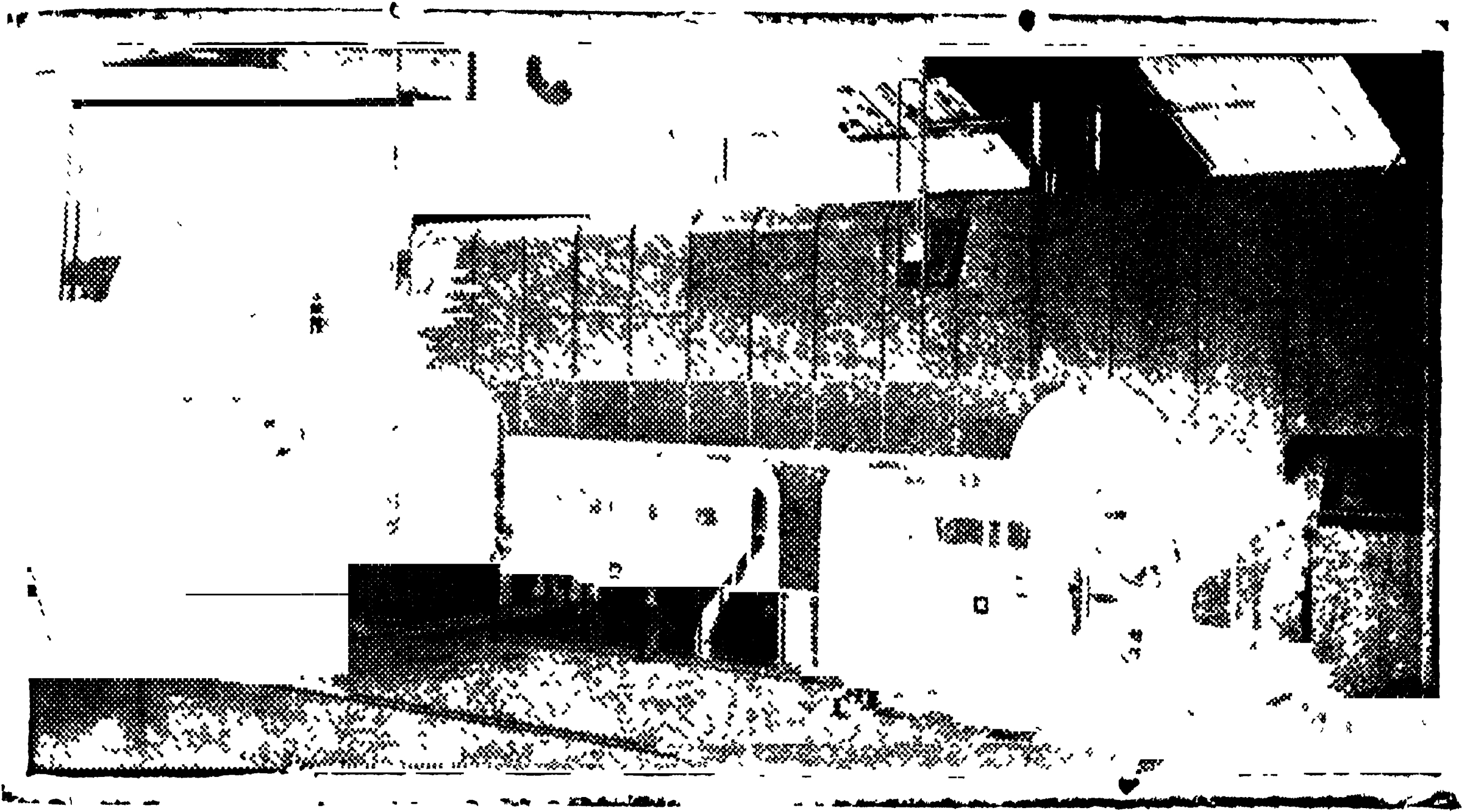
কৃত্রিম তক্তা

প্রায় চৌদ্দ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে যন্ত্র-বিজ্ঞানীরা যে কোন দৈর্ঘ্যের কৃত্রিম তক্তা নির্মাণের জন্য বারট্রেভ প্রেস নামে যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন। ছবিতে এই বারট্রেভ প্রেসের সাধারণ দৃশ্য দেখা যাইতেছে

বারট্রেভ যন্ত্রের সাহায্যে যে তক্তা প্রস্তুত করা হয় তাহার উপাদান হইল কাঠের টুকরা বা চোকলা এবং একপ্রকার বিশেষ ধরনের আঠা। এগুলিকে একত্র মিশাইয়া উত্তাপ ও চাপের সাহায্যে যে কোন আয়তনের তক্তা প্রস্তুত করা হয়। কৃত্রিম তক্তাগুলি দেখিতে ঠিক সাধারণ কাঠের তক্তার মতই হয়, উপরন্তু একপ্রকার বিশেষ ধরনের আঠা ব্যবহারের ফলে সাধারণ কাঠের

প্রয়োজন একটি প্ল্যাণ্ট মাত্র এক ঘণ্টায় মধ্যেই তাহা উৎপাদন করিতে পারে। জাহাজ ও রেলগাড়ীর দেওয়াল, মেঝে প্রভৃতির নির্মাণকার্যে বারট্রেভ বোর্ড অতিশয় সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ইহার উপর যে কোন রং এবং স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ পালিশ লাগান চলে।

বারট্রেভ বোর্ড করাত দিয়া কাটা যায়, তুরপুন দিয়া ফুটা করা যায়, র‍্যাঁদা চালাইয়া ধারগুলি

সমান করা যায় এবং একটির সহিত আর একটি জোড়া দেওয়া যায়। ২০০ টনের একটি প্রেস বৎসরে ২,৫০,০০,০০০ বর্গফুট হইতে ৩,৫০,০০,০০০ বর্গফুট পর্যন্ত তক্তা উৎপাদন করিতে পারে। আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জামসহ ইহার দাম পড়ে ১,৮৫,০০০ পাউণ্ড (২৪.৭ লক্ষ টাকা) হইতে ২,১৫,০০০ পাউণ্ড (২৮.৭ লক্ষ টাকা)। এই যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচা কাঠের টুকরা বা চোকলাগুলিকে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে উৎকৃষ্ট তক্তায় রূপান্তরিত করা যায়। ১৯৫৪ সালের মধ্যে বৃটেনে ১২টি সম্পূর্ণ প্ল্যাণ্ট বসাইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে বৃটেন বিদেশে ২৫,০০,০০০ পাউণ্ড (৩.৩ কোটি টাকা) মূল্যের কৃত্রিম কাঠের তক্তা রপ্তানি করিতে পারিবে।
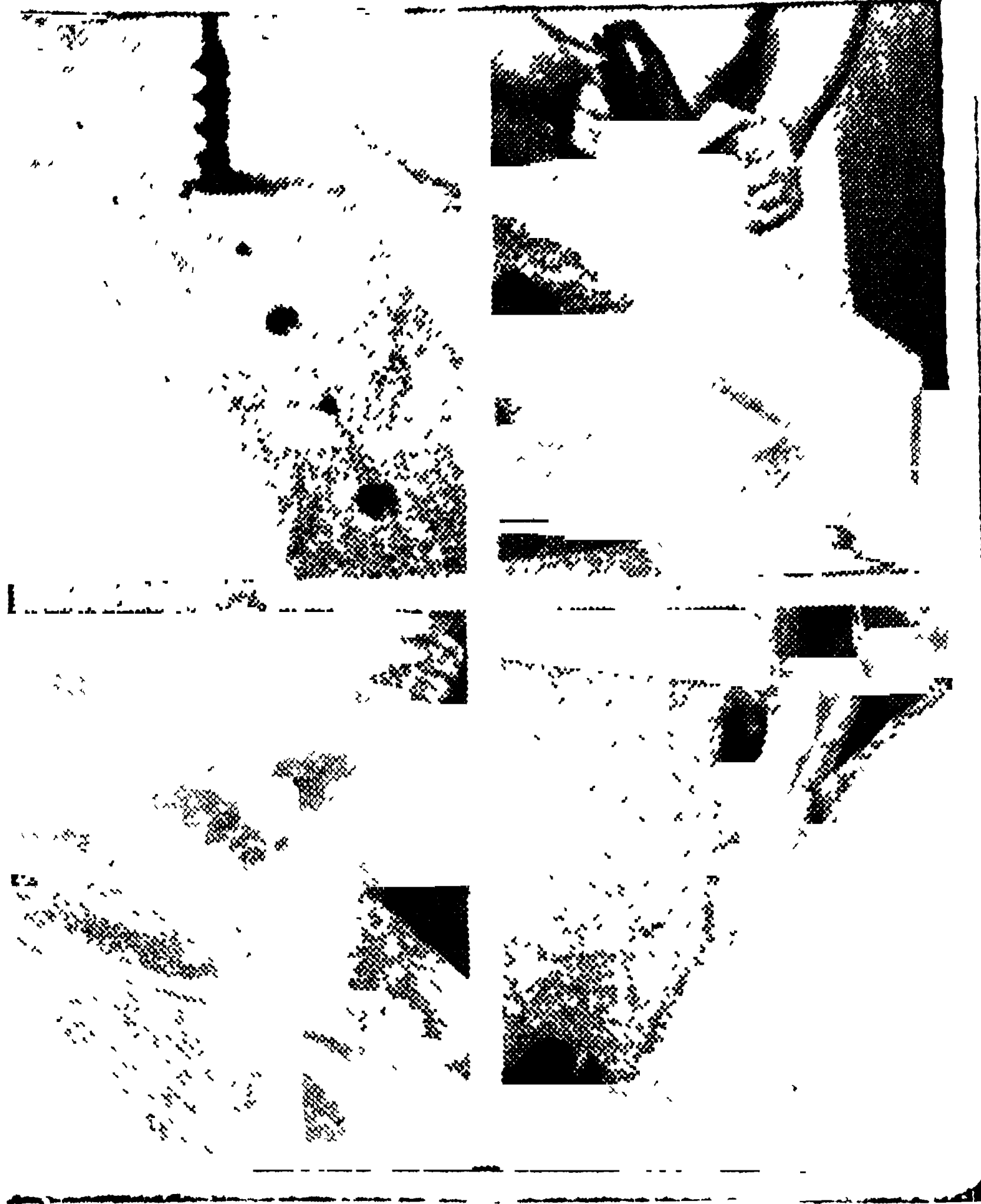
সাধারণ তক্তাকে কার্যোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, বারট্রেভ প্রেসে তৈয়ারী কৃত্রিম তক্তাকেও সেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন কাজের জন্য গড়িয়া তোলা হইতেছে

একটি প্রেস মিনিটে ১৪ ফুট গতিতে কাজ করিয়া প্রতিঘণ্টায় ৩/৮ ইঞ্চি পুরু ৩৩৬০ বর্গফুট বোর্ড উৎপাদন করিতে পারে। একটি সম্পূর্ণ প্ল্যাণ্ট চালাইতে ১৭ জন লোকের প্রয়োজন হয় এবং তাহার মধ্যে প্রেসটি চালাইতে মাত্র তিন জন লোক লাগে। পুরা প্ল্যাণ্টটি বসাইতে

৬০০৫ বর্গফুট স্থান লাগে; কিন্তু পুরা প্ল্যান্ট না বসাইয়া যদি টুক্‌রা টুক্‌রা কাজ করিয়া অল্প অল্প উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে স্থানও বেশী লাগিবে, উৎপাদন ব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি পাইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক একটি প্রেস স্বদেশজাত পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলি হইতে মোটর গাড়ীর অভ্যন্তর, জাহাজের অংশ; বিমানের প্যানেল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ তক্তা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। বারট্রেভ বোর্ড অগ্নিনিরোধক; বৃটেনের অগ্নি গবেষণাগার পরীক্ষা। করিয়া ইহাকে তৃতীয় গ্রুপে স্থান দিয়াছে কিন্তু ফরমাসমত সম্পূর্ণ অগ্নিনিরোধক বোর্ড প্রস্তুত করাও সম্ভব হইবে।
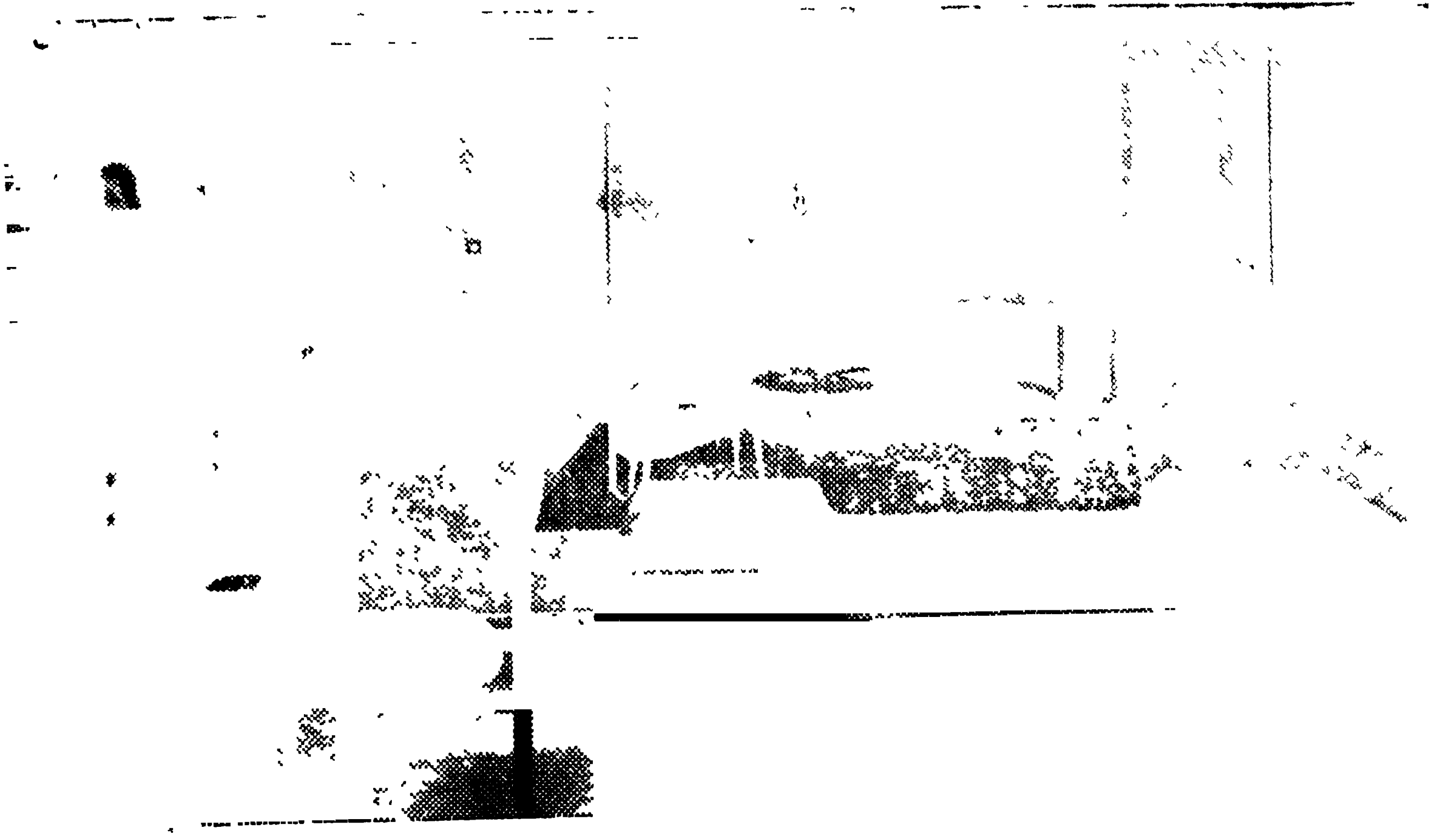
ছবিতে একটা জাহাজের অভ্যন্তরভাগ দেখানো হইয়াছে। এখানকার মেঝে, দেয়াল, আসবাবপত্র ইত্যাদি বারট্রেভ প্রেসে তৈয়ারী কৃত্রিম তক্তার সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে

যে পরিমাণ তক্তা প্রস্তুত করিবে তাহার ফলে বৃটেনের ৫,০০,০০০ পাউণ্ড (৬৭ লক্ষ টাকা) মূল্যের আমদানী বাঁচিয়া যাইবে। ইহার ফলে বৃটেনের গৃহনির্মাণ শিল্প যে কতটা উপকৃত হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতিশয় সুলভ কাঁচামাল হইতে নূতন যন্ত্রটি চার পেনী বর্গফুট হারে দেওয়াল, মেঝে, দরজা, জানালা, ছাদ, টেবিল, চেয়ার, প্রদর্শনীর ষ্ট্যাণ্ড, গাড়ীর বডি,

বারট্রেভ প্রেস আবিষ্কারের মূলে রহিয়াছে ভিয়ার কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ উইলিয়াম ফিসবাইনের অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়সংকল্প এবং তাঁহার দলের বৈজ্ঞানিক বাহিনীর অক্লান্ত-গবেষণা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাত্রিকালে গবেষণার কাজ চালান হয়; কারণ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই দিবাভাগে অন্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের গবেষণাগার

তিনবার বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু প্রত্যেকবারই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে যন্ত্রপাতি উদ্ধার করিয়া নূতন করিয়া কাজ সুরু করা হয়। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ অরণ্যকে সংরক্ষণ করিবার জন্য বৃটেনের বৈজ্ঞানিকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে চেষ্টা করিতেছিলেন, বারট্রেড প্রেস আবিষ্কারের ফলে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়।

"রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে আমরা চাই কিঞ্চিৎ আলোক, যৎকিঞ্চিৎ শক্তি। আকাশ বা ঈথরের মধ্যে কিয়ৎকাল ধরিয়া গোটাকতক কম্পনতরঙ্গ উৎপাদন করিলেই আমাদের কাজ চলে। কিন্তু তজ্জন্য আমরা তেল পোড়াইয়া, বাতি পোড়াইয়া, গ্যাস পোড়াইয়া, দস্তা পোড়াইয়া সহস্র গুণ পরিমাণ শক্তিকে অপচয় করিয়া তাহার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়া ফেলি। চাই আমরা একখানা হাত পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করিতে, আমাদের উদ্ভাবিত উপায় একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলে। শক্তির এই অপচয় দেখিলে বুদ্ধিমান লোকে ব্যথা পায়, দূরদর্শী লোকে ব্যাকুল হয়। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর। আচমনে এক গণ্ডূষ জল আবশ্যক; আমরা হিমালয় হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত করি এবং তজ্জন্য একটা রাজ্যের তহবিল অপব্যয় করি। বিশল্যকরণীর একটা শিকড়ের জন্য আমরা প্রকাণ্ড গন্ধমাদনকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের আয়োজন করি। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রহসন; কিন্তু এই প্রহসনের পরিণাম যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে হাস্যরস অপেক্ষা করুণরসের সঞ্চার হওয়াই উচিত।

ভরসা করি, এখনও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া মনুষ্যজাতিকে সমস্ত কলকারখানা, এঞ্জিন বন্ধ করিতে উপদেশ দিবেন, রাত্রিতে অন্ধকারে কারবার করিতে বলিবেন এবং পাকশালার উনানগুলির অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া মনুষ্যজাতিকে সত্যযুগোচিত আমান্ন ভোজনে প্রবৃত্তি দিবেন। এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সেদিন কিছুকাল বিলম্বিত হইতে পারিবে।

বিলম্বিত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। প্রকৃতি সর্ব্বদা বিলাসী ধনি-সন্তানের মত সঞ্চিত শক্তি-সম্পত্তি দুই হাতে অজস্র অপব্যয় ও অপচয় করিতেছেন, তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখা যায় না। প্রকৃতিকে এই অপব্যয়ে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিবে, এমন লোক কোথায়? মনুষ্যের পক্ষে ইহার প্রতিবিধান আপাততঃ অসাধ্য।"

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ নবম সংখ্যা
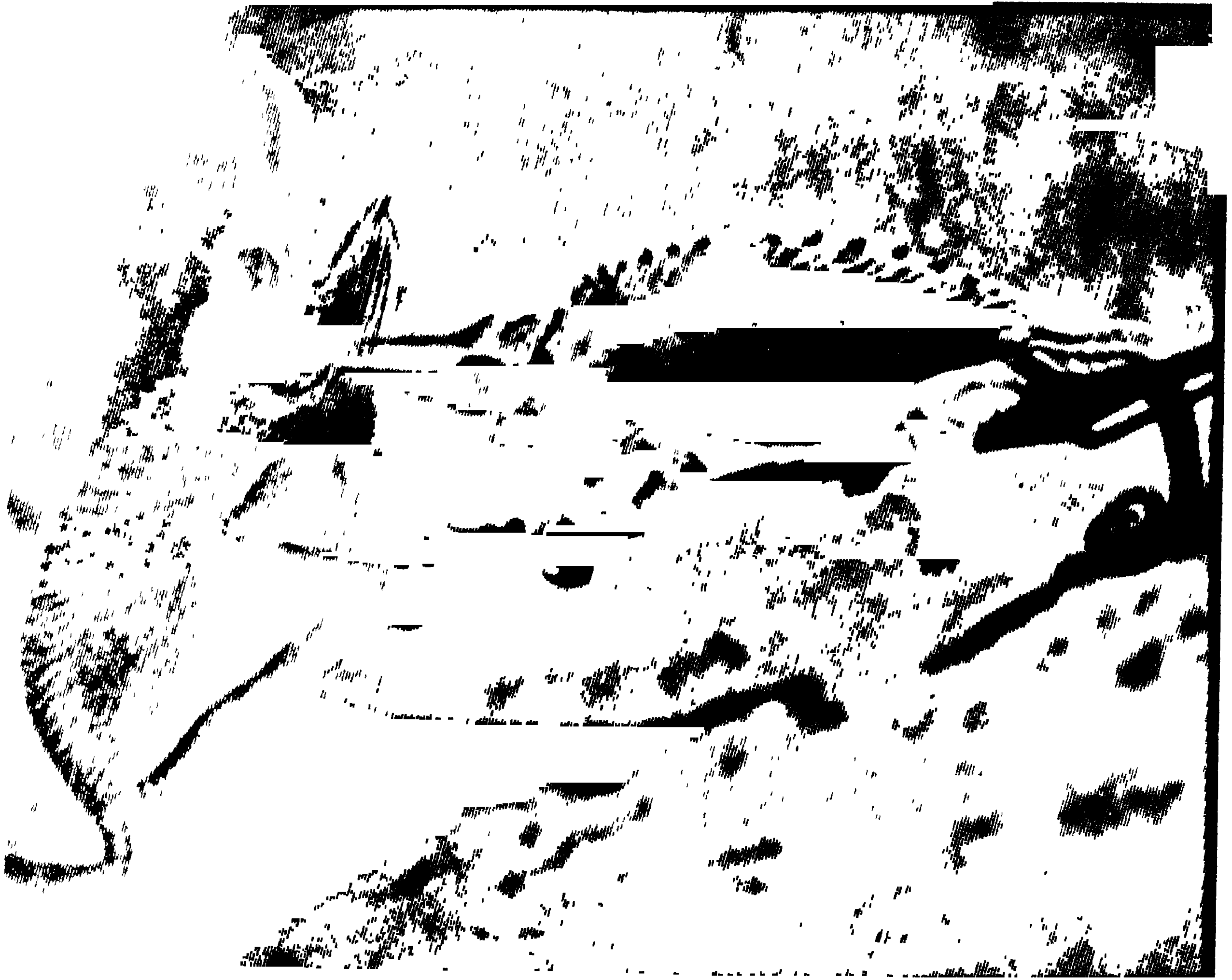
বহুরূপীর লড়াই

আমাদের দেশে কয়েক রকমের বহুরূপী দেখা যায়। এরা পোকা-মাকড় শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। শিকার ধরবার আশায় গাছের ডালে এমন নিশ্চলভাবে বসে থাকে যে, অনেকক্ষণ ধরে দেখলেও মাটির তৈরী পুতুল ছাড়া জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হবে না। এরা একটা চোখ একদিকে স্থির রেখে অপর চোখটাকে ইচ্ছামত যে কোন দিকে ঘুরাতে পারে। নাগালের মধ্যে শিকার দেখলেই ফড়িং ধরবার আঠাকাঠির মত প্রকাণ্ড জিভটা বের করে শিকারের গায়ে ছুঁইয়ে দেয়। জিভের ডগায় আটকে গিয়ে শিকার তার উদরগহ্বরে স্থান লাভ করে। মিলন-ঋতুতে এদের মধ্যে ভয়ানক লড়াই বেধে যায়। এখানে এক জাতের শিংওয়ালা বহুরূপীর লড়াইয়ের কায়দা দেখানো

করে দেখ

অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র

বাতাস না পেলে আগুন জ্বলে না, আবার জ্বলন্ত আগুন থেকে বাতাসের সংস্পর্শ বিচ্ছিন্ন করলেও আগুন নিবে যায়—একথা তোমরা সবাই জান।

ছোটখাটো অগ্নিকুণ্ড বা অগ্নিশিখার উপর ঢাক্‌না চাপা দিয়ে বায়ুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে আগুন নেবানো যায় বটে, কিন্তু বিস্তৃত আগুন আয়ত্বে আনা যায় না। সে সব ক্ষেত্রে ভিজা বালি ছড়িয়ে বাতাসের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করে আগুন

জেট

সালফিউরিক অ্যাসিড

সোডিয়াম কার্বোনেট বা ওয়াসিং সোডার তীব্র দ্রবণ

সীসার তার
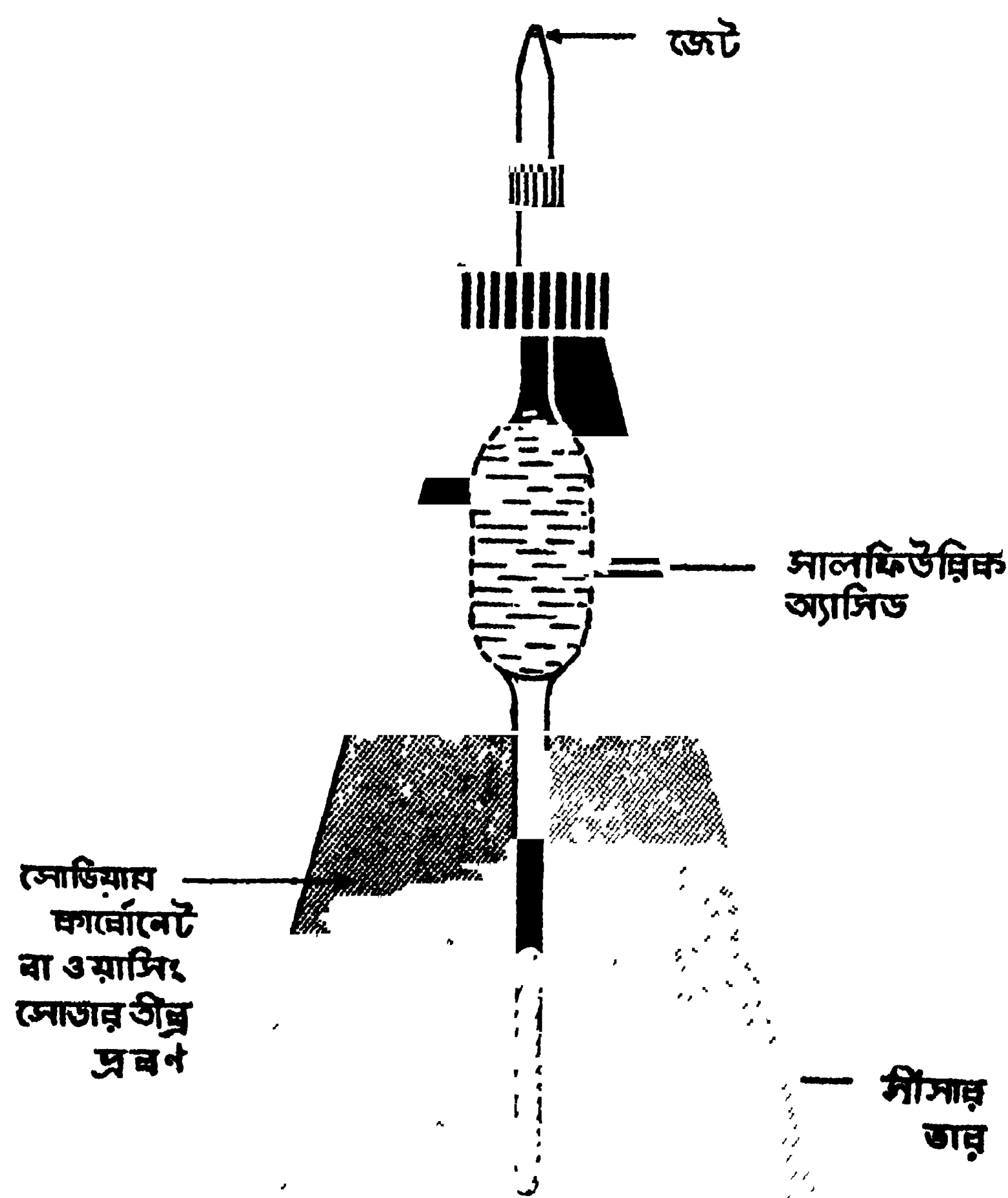
নেবানো হয়, অথবা আগুনের উপর বেকিং পাউডার (বেশীর ভাগ বাইকার্বোনেট অব সোডা, অর্থাৎ খাবার সোডা) ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গরম হওয়ার ফলে বেকিং পাউডার থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়ে আগুন নিবিয়ে দেয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই বেকিং পাউডার ছড়িয়ে আগুন নেবানো সম্ভব নয়, তবে প্রচুর পরিমাণ কার্বন

ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ব্যবস্থা থাকলে যথাসময়ে আগুন আয়ত্বে আনা সম্ভব। কিভাবে এ ব্যবস্থা করা যায় তার একটা সহজ উপায়ের কথা বলছি। চেষ্টা করলে তোমরা অনায়াসে এ রকমের একটা যন্ত্র তৈরী করে হাতের কাছে রাখতে পার।

ধাতুর পাত দিয়ে ফ্লাস্কের মত সরু মুখওয়ালা মাঝারি গোছের একটা পাত্র তৈরী করে নাও। পাত্রটার ভিতরের দিকে পিচের আস্তরণ দেওয়া থাকবে। পাত্রটার খাড়াই যতখানি প্রায় ততখানি লম্বা একটা কাচের নল সংগ্রহ কর। গ্লাস ব্লোয়ারের সাহায্য নিয়ে কাচের নলটার এক মুখ বন্ধ করে তার মধ্যে একটা সীসার ভার পুরে দিতে হবে। তারপর উপরের দিকে নলটাকে বেশ পাতলা করে ফুলিয়ে নীচের মুখ বন্ধ করে সালফিউরিক অ্যাসিড ভর্তি কর। নলের খোলা মুখটাকে ড্রপারের মত সূচালো করে দাও।

এবার পাত্রটার গলার প্রায় কাছাকাছি অবধি সাধারণ কাপড়-কাচা সোডার তীব্র দ্রবণ ভর্তি করে কাচের নলটাকে ছিপির সাহায্যে তার মধ্যে বসিয়ে দাও। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, কিভাবে যন্ত্রটা তৈরী করতে হবে, সহজেই বুঝতে পারবে।

এভাবে তৈরী করে যন্ত্রটা এক জায়গায় বসিয়ে রাখ। প্রয়োজন উপস্থিত হলে যন্ত্রটাকে একদিকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কাৎ করলেই সালফিউরিক অ্যাসিডৎভর্তি কাচনলের ফুলানো জায়গাটা ভেঙ্গে গিয়ে অ্যাসিড সোডার সঙ্গে মিশবে। এর ফলে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে নলের সরু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে আগুন নেবাতে সাহায্য করবে।

জেনে রাখ

মনোবিজ্ঞানে কমপ্লেক্স

কতকগুলি লোককে তোমরা সইতে পারো না। এসব লোক এমনি মজার যে, কোন বিশেষ ধরনের কথা উঠলে তারা কিছুতেই থামতে চান না। খালি খালি নিজের গল্প, কি করেছেন—না করেছেন, কি ভালবাসেন না বাসেন—এই সব এবং আরও কত কি অনর্গল বকে যান; তা কেউ শুনুক আর নাই শুনুক। কোন খেলার কথা উঠল—ব্যস্, আর পায় কে! অনবরত ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ চালাচালি হলো, খেলার মারপ্যাচ এবং নিজে কি সুন্দর খেলেন—তারই কথা। সিনেমার কথা নিয়ে কেউ কেউ সারাক্ষণ মেতে থাকেন। আর কেউ বা রাজনীতি নিয়ে

বিতর্ক জুড়ে দেন। এছাড়া, অন্যান্য বিষয় নিয়েও অনেকে মশ্‌গুল থাকেন। এই সবের অতি বাড়াবাড়ি কিন্তু সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়। কথা বলা বা শোনাবার বা ব্যবহারের একটা সীমা আছে। এই সীমারেখা পেরিয়ে গেলে মনস্তত্ত্বে মনের বিকারের পর্যায়ে পড়ে। এই জাতীয় মনের বিকারকে মনোবিজ্ঞানে কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা বলে; অর্থাৎ কোন বিশেষ ধরনের কথাবার্তায় বা ব্যবহারে অতিমাত্রায় ভাবাবেশ জড়িয়ে থাকে। তাই কমপ্লেক্স কথাটির আজকাল বহুল প্রচলন হয়েছে। কথায় বলে, লোকটি কমপ্লেক্সগ্রস্ত।

কেন এরকম হয়, হয়তো জিগ্যেস করবে। সব কথা তো খুঁটিয়ে বলা যাবে না, তাই সংক্ষেপে বলছি। তোমরা বড় হয়ে পড়ে নেবে। এ জাতীয় ভাবাবেগের সঙ্গে নিজের জীবনের বিফলতার একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। যখন জীবনে কোন ব্যর্থতা আসে—সেই ব্যর্থতামূলক অশান্তি মনকে বিব্রত করে তোলে এবং সেগুলি আমরা দাবিয়ে রাখতে চাই। এই দাবিয়ে রাখার ফলে কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়। কমপ্লেক্স তখন সরাসরি না এসে নানারকম ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়। যিনি এই রোগে ভুগছেন তিনি মোটেই এই সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারেন না। তুমি যদি জিগ্যেস কর, তিনি নানান্ যুক্তি দেখিয়ে যাবেন। তিনি যা যা করেছেন বা বলেছেন—তা সবই ঠিক; নিজের মনের কাছে যুক্তি থাকা দরকার, নইলে বিবেক মানবে কেন?

কিন্তু মনোবিদ্‌গণ যখন আসল কারণ খুঁজে বার করেন তখন কিন্তু খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়। ডাঃ য়ুঙ্গ নামে একজন মনোবিজ্ঞানী কমপ্লেক্সগ্রস্ত রোগীর বিশেষ ধরনের কথার সাহায্যে রোগের কারণ ধরতে পারতেন। মনের কালো যবনিকার আড়ালে যে সব কারণ আত্মগোপন করেছিল, বিজ্ঞানীদের হাতে তা ধরা পড়লো। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একজন স্কুলমাষ্টার হঠাৎ বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তিনি নাস্তিক হয়ে গেছেন। কারণ জিগ্যেস করা হলে বলতেন, অনেক পড়াশুনা করে, ভেবেচিন্তে ঐ রকম হয়েছেন। আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয়। যখন তার মনের বিশ্লেষণ করা হলো তখন দেখা গেল—একজনের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হচ্ছিল, সে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এতে তার মনের ভিতর যে আলোড়ন হয়, তারই ফলে তিনি নাস্তিক হন; অথচ কেন যে তিনি ওরকম, নিজে তার হদিস্ পাচ্ছিলেন না। কমপ্লেক্স কি রকম চেহারা নিয়ে আসে তাহলে সেটা বুঝতে পারলে। কেউ কেউ বিশেষ নামে চটে যান—যেমন মামা কিংবা দাদা বললেই ভীষণ রাগ করেন। এই সব কেন সইতে পারেন না—ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এর পিছনে বিরাট এক অর্থ লুকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই এমন কোন ব্যাপার ঘটেছে যার জন্যে ঐ নাম বা ঐ সব বিশেষ সম্বন্ধের কথা বরদাস্ত করতে পারেন না। কেউ কেউ আবার বড় দোকান

থেকে জিনিষ-পত্তর কিনতে সাহস পান না—মুখে-চোখে কি রকম যেন একটা আড়ষ্ট ভাব থাকে। বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে হয়তো গেলেন, কিন্তু ফিরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এই সব অতি তুচ্ছ ঘটনা—কিন্তু এগুলি কমপ্লেক্সের পরিচায়ক।

এসব ছোটখাট ব্যাপার থেকে অনেক খারাপ জিনিষ দাঁড়াতে পারে। কাজেই প্রথম থেকে সাবধান না হলে অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলছি। সে অনেক বছর আগেকার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়তে এলো। কিছুদিন পড়ার পর উনি একজন বিশেষ প্রোফেসারের বিরুদ্ধে বলে বেড়াতে লাগলেন। ওর জন্যে প্রোফেসার পাল্টে দেওয়া হলো। কিন্তু তাতেও সুবিধা হলো না। তিনি যে কমপ্লেক্স-রোগে আক্রান্ত, সেটা তখন ধরা পড়লো এবং সময়মত চিকিৎসা হওয়ার ফলে তিনি ভাল হয়ে গেলেন। সেই সময়ে রোগ যদি ধরা না পড়তো তাহলে জীবনটি নষ্ট হয়ে যেত না কি? আমাদের দেশে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকেই এখনও বিশেষ সচেতন নন, সেটাই দুঃখের বিষয়। তারা মনে করেন যে, মনের রোগ মোটেই সারবার নয়, এর কোন চিকিৎসাও নেই। কিন্তু একথা মোটেই ঠিক নয়। মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট অবদান আছে, মনের রোগ সারানো যায়। আমাদের দেশেও মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে রোগ নিরাময় করা হচ্ছে এবং এর আরও ব্যাপক প্রচলন হোক, এই কামনা করি।

শ্রীদীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সাধারণ সর্দি-কাশি

সাধারণ সর্দি-কাশি কি সত্যিই সাধারণ? ইদানীং বিজ্ঞানীরা কুষ্ঠব্যাধি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ-জীবাণুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, সালফোন, হেট্রাজেন প্রভৃতি কত রকমের নতুন ওষুধ সরবরাহ করছেন আমাদের অসুখ ভাল করবার জন্যে! তাছাড়া আরও নতুন ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন। কিন্তু সাধারণ সর্দি-কাশি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'কমন কোল্ড', তার জন্যে জীবাণুবিদেরা হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন। যদি ভাল করে অনুসন্ধান চালানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে, মনীষী বার্নার্ড শ' যা ঠাট্টা করে বলেছেন, তা কতকটা সত্য। তিনি বলেছেন—"আমাদের দিদিমারাও জানতেন হাওয়া বদলাতে হবে।" ঠাট্টাচ্ছলে তা বৈজ্ঞানিক ডাক্তারের মুখ দিয়ে বলালেন, "But, they did not know the Science in it" অর্থাৎ তথ্যটি দিদিমারাও জানতেন, তবে এর মধ্যে কত কি জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, তা তো দিদিমারা জানতেন না!

এখন বিজ্ঞানের কথায় আসা যাক। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন জীবাণু

রোগীর হাঁচি-কাশি-গয়ের থেকে পেয়েছেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধের শেষে প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী সুরু হলো। এক হাঁচির দরুণই কত যে ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক মারা গেল তার হিসাব নেই। সেবারের জীবাণু কেবল ইনফ্লুয়েঞ্জারই ছিল। কত ওষুধ বের হলো। কিন্তু সমগ্র মহামারী থেমে গেল মাস্ক পরিধান, থাইমল আর নুনজলের কুলকুচি করে। অবশ্য ব্যাধির প্রতিকার বা প্রতিরোধকারী উপায়ও অবলম্বিত হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বেশী দিন কোনও জীবাণু কার্যকরী থাকে না—সেটাও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের কথা। কিছুকাল পরে জীবাণুগুলি অকেজো হয়ে যায়; যেমন, কলেরা ব্যাধির জীবাণু শীত ও বৃষ্টির আবহাওয়ায় কলেরা সৃষ্টি করতে পারে না।

সাধারণ সর্দি-কাশির জীবাণুর অন্ত নেই এবং এর ওষুধেরও অভাব নেই। ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু, মাইক্রোককাস্ ক্যাটারেলিস্, ষ্ট্যাফাইলোককাস্, ষ্ট্রেপ্‌টোককাস্, ডিপথিরিয়া জীবাণু ও নানাপ্রকার ডিপথেরয়েড জীবাণু অসাধারণ বলেই ভয় পাই। এর কত কারণই না দিন দিন জানা যাচ্ছে। তাই বৈজ্ঞানিক মহল এই সাধারণ সর্দি-কাশি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

বর্ষাকালের শেষ থেকে হেমন্ত ও শীতকাল পর্যন্ত কয়েকটি নিয়ম পালন করলে এই ভীতিপ্রদ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

গা ম্যাজম্যাজ করা, নাক দিয়ে জল গড়ানো বা সর্দি লাগা প্রভৃতি কোন কিছু টের পেলেই ঘরে আবদ্ধ থাকা এবং রুমালে ইউক্যালিপ্‌টাস্ তৈল মাখিয়ে নাকে ধরা কর্তব্য। কারো সামনে হাঁচি বা কাশি না দেওয়া, একলা ঘরে থাকা এবং নাক দিয়ে থাইমল ভিজানো জল টানা ও নুন হলে কুলকুচি করা একান্ত প্রয়োজন। অন্ততঃ তিন দিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম দিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

পৃথিবী-রহস্য

বিচিত্র এই পৃথিবী! মানুষ যুগযুগান্ত ধরে এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কতই না ব্যাখ্যা করে আসছে। এই যে পৃথিবী তার স্বরূপ কি? কি করেই বা এর জন্ম হলো? এর শেষই বা কি? এরূপ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে আসছে।

ভগবানই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা—এ কথার পিছনে রয়েছে লোকের ধর্মবিশ্বাস। বিজ্ঞানের যুগে এ ধরনের কথা তৃপ্তি দিতে পারে না। মানুষ ভেবেছিল যে, পৃথিবী ও মানুষ প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৬৫৪ সালের শেষের দিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের

আর্চ বিশপ উশার প্রচার করেন—তিনি যে সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করেছেন তাতে দেখা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ অব্দে ২৬শে অক্টোবর সকাল ৯টায় সৃষ্টির সুরু হয়েছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-বিদ্যা যতই প্রসারিত হতে লাগলো, পৃথিবীর রহস্য মানুষের মনকে ততই দোলা দিতে আরম্ভ করলো। ভূ-তত্ত্ববিদেরা বিভিন্ন রকম স্তরের পরীক্ষার দ্বারা অনেক তথ্য খুঁজে পেলেন। তাঁরা দেখলেন যে, প্রত্যেকটি স্তরের বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাণী ও উদ্ভিদের শিলীভূত অবস্থারও একটা স্বকীয়তা আছে।

তারপর এল ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ। ডারউইন কর্তৃক সে সময় বিশ্ব-রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে। তিনি সময়ের একটা পর্যায়ক্রমিক ইতিবৃত্ত খুঁজে পেলেন। ফসিলের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখানো হলো যে, সৃষ্টির আরম্ভ হয়েছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে। প্রকৃত পক্ষে ১৯০০ সালের কাছাকাছি তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হলো। তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটা ধর্ম হলো এই যে, তাদের একটা নির্দিষ্ট ছন্দে রূপান্তর ঘটে থাকে। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি পদার্থগুলি একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে ক্ষয় পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সীসায় পরিণত হয়। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি পৃথিবীর নানা স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। ভূ-তত্ত্ববিদেরা এই ধরনের বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থের ওজন বের করেছেন। এই পদার্থগুলি একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে ক্ষয় পেতে থাকে; সেজন্যে তাদের শেষ অবস্থা, অর্থাৎ সীসা থেকে নির্ধারিত ওজনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ পেতে হলে যে সময় পিছিয়ে যেতে হবে তা থেকে বুঝা যাবে, কত আগে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি জমতে আরম্ভ করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্তরের পরীক্ষামূলক গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে কঠিন স্তরে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা করা হলেও এটা বেশ বোঝা গেছে যে, অন্ততঃ এ ধরনের অবস্থা ২০০ কোটি বছরের আগে হয় নি। তবে সাধারণের অনুমানের চেয়ে পৃথিবী অনেক পুরানো।

এই হচ্ছে পৃথিবী-পৃষ্ঠের একটা মোটামুটি বিবরণ। কিন্তু এর ভিতরে কি হচ্ছে? দুঃখের বিষয় মানুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব বেশী দূর প্রবেশ করতে পারে নি। কাজেই পরীক্ষামূলক বিবৃতিও সীমাবদ্ধ। আফ্রিকার কোন এক স্বর্ণখনিতে মানুষ ৭৬৩০ ফুট নীচে গিয়ে কাজকর্ম করে। এই দূরত্বটাই নাকি সবচেয়ে বেশী যেখানে মানুষ আজ পর্যন্ত যেতে পেরেছে। তবে ভূ-কেন্দ্রের দূরত্বের সঙ্গে এ দূরত্বের তুলনাই চলে না—এটা হলো চার হাজার মাইলের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ খুবই গরম। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, প্রতি ৬০ ফুট অন্তর তাপমাত্রা ১° ডিগ্রী ফারেনহাইট করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে দু-মাইল নীচে গেলে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায়, সেখানে জল ফুটে যাবে, অর্থাৎ এই তাপমাত্রা হলো জলের স্ফুটনাঙ্ক। আবার ৩০ মাইলের কাছাকাছি গেলে ২২০০° ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা পাওয়া যায়, অর্থাৎ এখানে কঠিন স্তরও গলতে সুরু করবে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে গলিত লাভা বের হতে থাকে তা সাধারণতঃ এ সব জায়গা থেকেই উঠে আসে। সবচেয়ে বেশী যে তাপমাত্রা পাওয়া গেছে সেটা হলো ১০,০০০° ফারেনহাইটের মত, অর্থাৎ সূর্যের বহিরাবণের তাপমাত্রা বলা চলে।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন যে, পৃথিবী প্রধানতঃ তিনটি এককেন্দ্রিক গোলক বা স্ফীয়ার নিয়ে গঠিত। আমরা পৃথিবী-পৃষ্ঠে সাধারণতঃ যে স্তরের চিহ্ন দেখতে পাই, পৃথিবী আগাগোড়া সেই স্তরেই গঠিত নয়; কারণ তাহলে পৃথিবীর ওজনের সঙ্গে এর ব্যতিক্রম হতো না। পৃথিবী-পৃষ্ঠের স্তরের বিশ্লেষণ থেকে যে ওজন পাওয়া যাবে তা পৃথিবীর স্থিরীকৃত ওজনের অর্ধেকেরও কম হবে। তা হলে স্তরগুলি কি ধরনের? বিভিন্ন রকম পরীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রভাগ আগাগোড়া একটা বৃহৎ গলিত লৌহের গোলক দ্বারা আবৃত। তবে এই গোলক বা স্ফীয়ার কেবলমাত্র যে লোহা দ্বারাই গঠিত তা নয়, বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পদার্থও এতে আছে। উদাহরণস্বরূপ নিকেলের কথা বলা যায়। এই গোলকের সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের তুলনা করা চলে। এখানে চাপের এত আধিক্য (৪৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে) যে, এই বিশালকায় গোলকটির কোন রকম প্রাকৃতিক ধর্ম জানা সম্ভব নয়।

এই স্তরের চতুর্দিক আবৃত করে রয়েছে যে গোলকটি তার অন্যতম অংশ হলো অলিভিন। এটা হলো লৌহ ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম সিলিকেটের একটা স্তর। রংটা দেখতে অনেকটা ধুসর ও নীলাভ।

এর উপরেই হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ। এখানে আবার স্তরটি দু-ভাগে বিভক্ত। নীচেরটা হলো কালো রঙের বেসাল্ট, আর উপরেরটা হলো গ্র্যানাইট স্তরের। এটিই হচ্ছে আমাদের আবাসস্থল।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এই সব ব্যাপার হলো অনেকটা ভাসমান অবস্থার মত। এই সব স্তরের উপরের স্তর নীচের স্তরের চেয়ে হাল্কা বলে মনে করা যেতে পারে। তারা একটি যেন অপরটির ওপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। গ্র্যানাইট হলো বেসাল্টের চেয়ে হাল্কা; আর অলিভিনও লোহার চেয়ে হাল্কা। কাজেই মনুষ্য-অধ্যুষিত স্তরটি হলো সবচেয়ে হাল্কা। এই অদ্ভুত ব্যাপার থেকে বেশ বোঝা যায় যে, পৃথিবী এককালে বেশ গরম ছিল এবং ধীরে ধীরে এখনও ঠাণ্ডা হচ্ছে।

১৯৫১ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্ জেরার্ড কুইপার পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত জনপ্রিয় করে তুলেছেন। প্রায় সমস্ত জ্যোতির্বিদের মতে, গ্রহগুলির নানা-রকম পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর জন্ম হয়। আদিম মেঘ থেকেই গ্রহের উৎপত্তি। এই গ্রহগুলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে ঘুরতে থাকে; ফলে অভ্যন্তরস্থ চাপ ও তাপমাত্রার বিশেষ বৃদ্ধি দেখা যায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেগুলি বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে শুধু যে তারা বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা নয়; পদার্থের বণ্টন ও শক্তির তারতম্য অনুযায়ী কদাচিৎ কোন মেঘ একক কেন্দ্রীনেরও সৃষ্টি করতে পারে।

এদের একটা হলো আমাদের সূর্য। এই সূর্য সৌরজগতের ব্যাস পরিমিত বিপুল পদার্থের একটা ডিস্কের কেন্দ্রে থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে আর জ্বলজ্বল করছে। ডিস্কটা ঘোরার দরুণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে আরও কতকগুলি ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়। আর বিভিন্ন রকমের পরিবর্তনের ফলে এরাই নক্ষত্র, ধুমকেতু, গ্রহাণুপুঞ্জ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়। এই সব ঘূর্ণী থেকেই পৃথিবী জন্ম গ্রহণ করে ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছে।

শ্রীসুনীলকুমার বিশ্বাস।

এক্স-রে

এক্স-রে বা রঞ্জেন-রশ্মির কথা তোমরা সবাই শুনেছ। এক্স-রে'র সাহায্যে আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে, সেকথাও তোমাদের অজানা নয়। উর্জবার্গের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক উইলহেল্‌ম কন্‌রাড রঞ্জেন ১৮৯৫ সালে আকস্মিকভাবে এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কার করেন। আকস্মিকভাবে বলছি এই কারণে, তিনি যে এই অদ্ভুত রশ্মি আবিষ্কার করবার জন্যেই গবেষণা করছিলেন তা নয়। ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়ভাবেই তিনি এই অভিনব রশ্মির সন্ধান পান।

এক সময়ে অনেকেই বায়ুশূন্য কাচ-গোলকের মধ্যে অল্প ব্যবধানে স্থাপিত দুটি তড়িৎ-দ্বারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করবার পরীক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। কাচ-গোলককে বেশীর ভাগ বায়ুশূন্য করবার উপায় তখনও উদ্ভাবিত হয় নি। কাচ-গোলক থেকে অধিক পরিমাণে বায়ু-নিষ্কাশন সম্ভব হলে তার মধ্য দিয়ে আরও সহজে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয় এবং গোলকটি স্নিগ্ধ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনকার দিনে কোন আবদ্ধ পাত্রকে অনেকাংশে বায়ুশূন্য

করবার কোন উপায় জানা ছিল না। তারপর জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী জুলিয়াস প্লুকার কাচ-গোলক থেকে এত বেশী পরিমাণে বায়ু-নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন, যা এর আগে আর কেউ করতে পারেন নি। এ-রকমের বায়ুশূন্য একটা কাচ-গোলকের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পরিচালনার ফলে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। তড়িৎপ্রবাহ কাচ-গোলকের অ্যানোড (পজিটিভ) প্রান্ত দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ক্যাথোড (নিগেটিভ) প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ক্যাথোড থেকে উদ্ভূত এক রকম অদ্ভুত রশ্মির প্রভাবে গোলকের কাচের দেয়ালটি সবুজাভ স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এটা হলো ১৮৫৯ সালের কথা। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন—কাচ-গোলকের বাইরে থেকেই চুম্বকের সাহায্যে এই ক্যাথোড-রশ্মির গতিপথ পরিবর্তন করা যেতে পারে। তখন কিন্তু অন্য কেউ দূরের কথা, তিনি নিজেই এ আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। প্রকৃতপ্রস্তাবে এর প্রায় ৩৬ বছর পরে এই রশ্মির বিস্ময়কর ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। যাহোক, প্লুকারের পর ১৮৬৯ সালে হিটর্ফ এবং ১৮৭৯ সালে সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ ক্যাথোড-রশ্মি সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। ক্রুক্‌স্-ই কাচ-গোলককে সবচেয়ে বেশী বায়ুশূন্য করে জোরালো ক্যাথোড-রশ্মি উৎপাদনে সক্ষম হন। ১৮৯৪ সালে লেনার্ড আরও বেশী জোরালো ক্যাথোড-রশ্মি সৃষ্টি করেন। ক্যাথোড-রশ্মির গবেষণায় লেনার্ড যতখানি অগ্রসর হয়েছিলেন সে সম্পর্কে কাজ করে পরের বছরেই অধ্যাপক রঞ্জেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিক ভাষায় কোন অজ্ঞাত পরিমাণকে বলা হয়—'X'। ক্যাথোড-রশ্মি থেকে উদ্ভূত এই বিস্ময়কর দ্বিতীয় রশ্মির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরেই রঞ্জেন এর নাম দিয়েছিলেন—X-ray।

ক্যাথোড-রশ্মিই এই অভিনব রশ্মি উৎপন্ন করে। ক্যাথোড-রশ্মি কোন কিছুর উপর গিয়ে পড়লে সেখান থেকে এক্স-রে উদ্ভূত হয়। বায়ুশূন্য কাচ-গোলকের মধ্যে ক্যাথোড-রশ্মি প্রতিহত হয়ে কাচটা যখন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন তাতে এক্স-রে'রও অস্তিত্ব থাকে। এক্স-রে কাচের দেয়াল ভেদ করে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, ক্যাথোড-রশ্মি কর্তৃক উৎপন্ন এই দীপ্তি খালি চোখেই দেখা যায়, অথচ এক্স-রে একেবারে অদৃশ্য—খালি চোখে তার কিছুই দেখা যায় না। মোটের উপর, বেশী পরিমাণে বায়ু-নিষ্কাশিত কোন কাচ-গোলকের ভিতর দিয়ে তড়িৎস্রোত পরিচালন করলেই ক্যাথোড-রশ্মি দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে সবুজাভ একটা স্নিগ্ধ আলোর আভা দেখা যায় এবং যতই আরও বেশী বায়ু নিষ্কাশিত হতে থাকে ততই সেই আলোর আভা ক্রমশঃ হরিদ্রাভ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য এক্স-রে'ও নির্গত হতে থাকে।

১৮৯৫ সালের শেষের দিকে অধ্যাপক রঞ্জেন এই রশ্মি নিয়েই পরীক্ষা করছিলেন।

সূর্য-রশ্মির মধ্যে অদৃশ্য আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি সম্পর্কে পরীক্ষার জন্যে একখণ্ড কার্ডবোর্ডের গায়ে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়নাইডের প্রলেপ মাখিয়ে তিনি একটা পর্দার মত জিনিষ তৈরী করেছিলেন। বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের একটা অদ্ভুত ধর্ম এই যে, এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানাগুলি অদৃশ্য রশ্মির অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে বৃহত্তর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে, অর্থাৎ দৃশ্য আলোয় পরিবর্তিত করতে পারে। ক্যাথোড-রে উদ্ভাসিত কাচ-গোলকের কাছে সেই কার্ডবোর্ডের পদার্থটাকে নিয়ে যেতেই তিনি দেখলেন—পর্দাটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। তিনি ভাবলেন, ক্যাথোড-রে'র জন্যেই হয়তো পর্দাটা এরূপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ক্যাথোড-রশ্মির আভা বন্ধ করবার জন্যে কাচ-গোলটাকে কালো কাগজে মুড়ে দিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন—কালো কাগজ ঢাকা দেওয়ার ফলে ক্যাথোড-রশ্মির সেই দীপ্তি অদৃশ্য হলো বটে, কিন্তু বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইডের পর্দাখানি অন্ধকারের মধ্যে আগের মতই জ্বলতে লাগলো। তখন তিনি কালো কাগজ-মোড়া কাচ-গোলক ও উজ্জ্বল পর্দার মধ্যস্থলে নানারকম জিনিষ রেখে যা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। দেখলেন, কোন কোন জিনিষ মাঝখানে ধরলে পর্দার উপর বেশ ছায়া পড়ে, আবার কতকগুলি জিনিষের ছায়া প্রায় পড়েই না—এই অভিনব রশ্মি সে সব পদার্থ ভেদ করে চলে যায়। কাচ-গোলক ও পর্দার মধ্যস্থলে তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিতেই দেখা গেল, চামড়া ও মাংসের ভিতর দিয়ে কেবল আঙুলের হাড়গুলিই দেখা যাচ্ছে। এভাবেই উর্‌জ্‌বার্গ ইউনিভার্সিটির গবেষণাগারের অন্ধকার কক্ষের মধ্যে আকস্মিকভাবেই পদার্থ-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার সংঘটিত হয়েছিল।

আজকাল বিভিন্ন ক্লিনিক বা হাসপাতালসমূহে বৃহদাকৃতির এক্স-রে যন্ত্রাদি দেখে তোমাদের স্বভাবতঃই মনে হতে পারে—এক্স-রে উৎপাদনের ব্যবস্থাটা না জানি কতই গুরুতর জটিলতাপূর্ণ। অবশ্য আধুনিক উন্নত ধরনের এক্স-রে যন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন রকমের নিখুঁত ছবি তোলবার জন্যে অনেক জটিল যান্ত্রিক কৌশল রয়েছে। তথাপি এক্স রে উৎপাদনের মূল যান্ত্রিক ব্যবস্থাটা মোটেই জটিল নয়। ল্যাবরেটরীর সাহায্য পেলে তোমরা অনায়াসেই এক্স-রে উৎপাদন করে দেখতে পার। এক্স-রে উৎপাদন করতে হলে একটা ক্রুক্‌স্‌-টিউবের দরকার। অতিমাত্রায় বায়ুশূন্য বিশেষ রকমের একপ্রকার কাচ-গোলককে বলা হয় ক্রুক্‌স্‌-টিউব। এই কাচ-গোলকের মধ্যে অনেকটা ব্যবধানে দুদিকে দুটি তড়িৎ-দ্বার বসানো থাকে। এদের একটিকে বলা হয়—অ্যানোড অপরটিকে বলা হয় ক্যাথোড। অ্যানোড ও ক্যাথোড তড়িৎ-দ্বার দুটিকে রুমকর্ফ কয়েলের সেকেণ্ডারী তারকুণ্ডলীর উভয় প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ব্যাটারী অথবা ডায়নামো থেকে রুমকর্ফ কয়েলের প্রাইমারীতে প্রয়োজনানুযায়ী তড়িৎস্রোত প্রবাহিত করালেই তড়িৎস্রোত ক্যাথোডের অ্যালুমিনিয়াম চাকতির উপর পড়ে ক্যাথোড-রশ্মি সৃষ্টি করবে।

সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে'ও উৎপন্ন হবে। ধর, তখন যদি তোমার হাতের ভিতরকার হাড়-গুলিকে দেখতে চাও, তাহলে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়েনাইডের পর্দা ও ক্রুক্‌স্‌-টিউবের মাঝখানটায় হাতখানা বাড়িয়ে দাও। দেখবে পর্দার উপর তোমার হাতের ভিতরকার
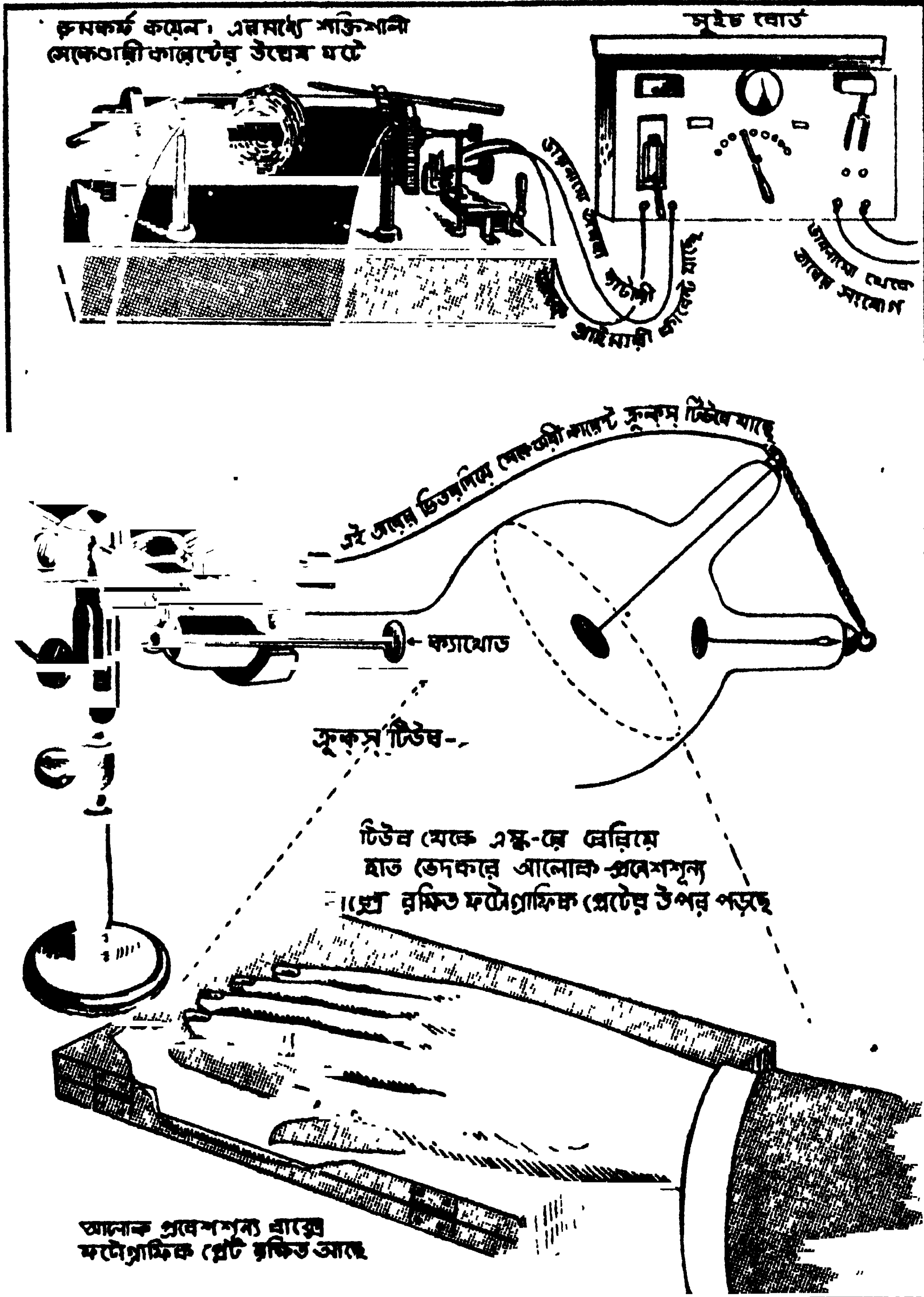
হাড়গুলির ছায়া পড়েছে। আর যদি এক্স-রে ফটো তুলতে চাও তবে একখানা ফটো প্লেট আলোক-প্রবেশশূন্য বাক্সে আবদ্ধ করে তার উপর হাতখানা রেখে ক্রুক্‌স্‌-টিউবের কাছে ধর। এরপর প্লেটখানা ডেভেলপ করলেই দেখবে—তোমার হাতের ভিতরকার হাড়ের ছবি উঠে গেছে। উপরের ছবিখানি ভাল করে দেখে নাও, ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

—গ—

মনুষ্যেতর প্রাণীদের অপত্যস্নেহ

মানুষ কোলে-পিঠে করে সন্তান পালন করে। ক্যাঙ্গারু, অপোসাম প্রভৃতি জানোয়ার পেটের থলেয় এবং পিঠের উপরে সন্তান বয়ে নিয়ে বেড়ায়। গরু, ঘোড়া, ছাগল, গাধা প্রভৃতি জন্তুরা সন্তান সঙ্গে নিয়ে বিচরণ করে। পাখীদের অপত্যস্নেহের কথা তোমাদের অজানা নয়। কিন্তু মাছ, ব্যাং, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যে এ রকম অপত্যস্নেহের কোন পরিচয় পেয়েছ কি? সাধারণতঃ নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে উন্নতস্তরের প্রাণীদের মত সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সন্তান-বাৎসল্য উন্নতস্তরের প্রাণীদের চেয়ে কোন অংশেই হীন বলে মনে হয় না।

কথায় বলে—মৎস্যের মায়ের আবার পুত্রশোক! কথাটা অনেকাংশেই সত্য—মাছ, ব্যাং, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরা অজস্র ডিম পাড়ে। তারা ডিম পেড়েই খালাস, ভবিষ্যৎ সন্তানদের কোন খোঁজখবর লয় না। কিন্তু আমাদের দেশেই এমন অনেক মাছ আছে যারা বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বাসা তৈরী করে, তাদের যত্ন করে, তদারক করে, এমন কি তাদের সঙ্গে নিয়েও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। আমাদের দেশের আড়মাছ বোধ হয় তোমাদের কাছে অপরিচিত নয়। আড়মাছ গভীর জলের তলায় মাটি খুঁড়ে প্রকাণ্ড ফানেলের মত গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর কিছুদিন পর্যন্ত বাচ্চাদের ছেড়ে কোথাও বড় একটা যায় না। ভয় পেলে কোন কোন জাতের আড়মাছের বাচ্চাগুলি মায়ের মুখগহ্বরে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে।

শোলমাছ ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকে নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কোন নিরাপদ জায়গা পেলেই মা জলের নীচে চুপটি করে থাকে, আর বাচ্চাগুলি তখন কিলবিল করে জলের উপরে ভেসে ওঠে। কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হলে সবাই একসঙ্গে জলের নীচে চলে যায় এবং মায়ের পাশে চুপটি করে লুকিয়ে থাকে। চেতল মাছেরও সন্তানবাৎসল্য খুব প্রবল। ডিম অথবা বাচ্চার নিরাপত্তার জন্যে অন্য প্রাণী তো দূরের কথা, মানুষকে পর্যন্ত তারা বেপরোয়া আক্রমণ করে।

ব্যাং তার ডিম পেড়েই খালাস—বাচ্চাদের কোন খোঁজখবর লয় না। কিন্তু সুরিনাম টোড নামে একজাতীয় ব্যাঙের অদ্ভুত অপত্যস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় পুরুষ ব্যাঙের পিঠের উপর পকেটের মত ছোট ছোট গর্ত থাকে। বাচ্চাগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত ব্যাং সেগুলিকে পিঠের গর্তের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কাঁকড়া-বিছা তোমাদের কাছে অপরিচিত নয়। যথেষ্ট বড় না হওয়া পর্যন্ত কাঁকড়া-বিছা তার বাচ্চাগুলিকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। আমাদের দেশের কয়েক জাতীয় স্ত্রী-কাঁকড়ার বুকের উপর বেশ বড় এবং চওড়া একটা ঢাকনা থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে এরকমের একটা কাঁকড়ার বুকের ঢাকনাটা একটু টেনে তুললেই দেখবে, তার ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চা গাদাগাদি করে রয়েছে। স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার মত উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মা তার বাচ্চাগুলিকে এভাবেই বুকে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।

এ তো গেল অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের প্রাণীদের কথা, কিন্তু আরও নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে অপত্যস্নেহের যে সব দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তা সত্যসত্যই অপূর্ব—অনেক ক্ষেত্রে উন্নত স্তরের প্রাণীদেরও হার মানায়। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমাদের দেশে খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয়ের ধারে ধারে ঘাস-পাতার উপর সাদা-কালো ডোরাওয়ালা এবং ধূসর রঙের মাকড়সারা শিকার ধরবার আশায় চুপটি করে বসে থাকে। এদের স্ত্রী-মাকড়সার অপত্যস্নেহ এমনই প্রবল যে, ডিমগুলিকে মটর দানার মত একটা থলিতে রেখে সেটাকে শরীরের পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন করে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। প্রাণান্তেও ডিম ছাড়ে না। কেবল ডিম বয়ে নিয়ে বেড়ানোই নয়, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে এলে সেগুলিকেও পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ডিম ফোটবার পর বাচ্চাগুলি মায়ের পিঠের উপর স্তূপাকারে আঁকড়ে পরে থাকে। বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত পিঠ থেকে নামে না। এই মাকড়সাগুলি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের নীচে ডুবে থাকতে পারে। ভয়ের কারণ ঘটলেই মা তার বাচ্চাগুলিকে পিঠে নিয়েই জলের নীচে ডুবে যায় এবং লতাপাতা আঁকড়ে ধরে চুপটি করে বসে থাকে। বিপদের আশঙ্কা কেটে গেলেই আবার জলের উপর ভেসে ওঠে। ডিমটাকে আট্‌কে রেখে দেখো, হাত-পা ছিড়ে ফেললেও মাকড়সাটা ডিম ছেড়ে পালাবে না। এমনই এদের মাতৃস্নেহ।

খালে-বিলে গোলাকার এবং চ্যাপ্টা একরকমের জলপোকা দেখা যায়। স্ত্রী-পোকা পুরুষ-পোকাটার পিঠের উপর ডিম পাড়ে। আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলি পিঠের উপর আট্‌কে থাকে। ডিম না ফোটা পর্যন্ত পুরুষ-পোকাটা ডিম বয়ে নিয়ে বেড়ায়। নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে অপত্যস্নেহের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়; উৎসাহ থাকলে তোমরাও এসব ব্যাপার নিজের চোখেই দেখতে পার।

—গ—

বিবিধ

সোনারপুর-আড়াপাঁচ জলনিকাশ পরিকল্পনা

গত ৩১শে মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই পরিকল্পনাটি উদ্বোধন করেন। উক্ত পরিকল্পনার পাম্পিং ষ্টেশনে চারিটি বিদ্যুচ্চালিত জলনিষ্কাশন যন্ত্র স্থাপিত হয়। এই চারিটি যন্ত্র এককালে চালিত হইলে উহারা প্রতি মিনিটে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার গ্যালন জল নিষ্কাশিত করিতে পারে। এক্ষণে একটি অথবা দুইটি যন্ত্র চালু রাখা হইতেছে। কারণ অপ্রয়োজনীয় জল ইতিপূর্বেই নিষ্কাশিত হইয়াছে।

সোনারপুর-আড়াপাঁচ জলনিকাশ পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার ফলে ঐ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলাভূমি আজ শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বৎসর মজা নদী পিয়ালীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত ২৬ বর্গ মাইল স্থানের জল নিষ্কাশিত হয়। যে সব জমি বিগত ১৪।১৫ বৎসরব্যাপী জলমগ্ন ও হোগলা বনে পরিপূর্ণ ছিল, সেই সব জমিতে এক্ষণে সোনা ফলাইবার চেষ্টা চলিয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ-আবাদ করিয়া উপরোক্ত ২৬ বর্গ মাইলের মধ্যে ১৭ বর্গ মাইল জমিতে এই বৎসর ২ লক্ষ ৪০ হাজার মণ ধান উৎপন্ন হইবে বলিয়া সরকারী কৃষিবিভাগ আশা করেন। ইহা ছাড়া ৩ লক্ষ মণ খড়ও পাওয়া যাইবে। ধান ও খড় ছাড়া ঐ অঞ্চলে রবিশস্য উৎপাদনের চেষ্টা হইবে।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রথম বৎসর সরকার নিজেদের চেষ্টায় ২॥ বর্গ মাইল জমিতে (১২০০ একর) ধানের চাষ করিয়াছেন। বাকী ১৪ বর্গ মাইল (১০,০০০ একর) জমিতে চাষীরা নিজেরাই চাষ-আবাদ করিতেছে।

এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ জলনিষ্কাশন পরিকল্পনা-রূপে পরিগণিত সোনারপুর-আড়াপাঁচ পরিকল্পনার ফলে এক্ষণে ঐ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যও গড়িয়া উঠিতেছে। মজা নদী পিয়ালীর ক্ষীণধারা এক্ষণে প্রবল বেগে দূরবর্তী মাতলা নদী হইয়া বঙ্গোপ-সাগরের সহিত মিলিত হইতেছে।

১৪টি ট্রাক্টরের সাহায্যে কৃষিবিভাগের (সম্প্রসারণ) জয়েণ্ট ডিরেক্টর ডাঃ এস. সি. রায়ের পরিচালনায় উপরোক্ত সরকার অধিকৃত জমিতে কাজ চলে।

ভারতের টিটেনিয়াম

টিটেনিয়াম ধাতুর পরিচয় খুব পুরাতন নয়; মাত্র ১৯১০ সালে ওহ্‌লার (Wohler) ইহার স্বতন্ত্র রূপ প্রকাশ করেন। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইহার অবস্থিতির বিষয় জানা ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার নিতান্ত আধুনিক বলা যাইতে পারে।

টিটেনিয়ামের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পর হয়তো মোট এক হাজার টন ধাতু উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে; তাহাও ইদানীং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত চেষ্টা ছাড়া সম্ভব হইত না। কালের গতিতে টিটেনিয়ামের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং টিটেনিয়াম উদ্ধার করিবার কলকারখানা দেশে দেশে স্থাপিত হইতেছে।

টিটেনিয়াম ধাতু দেখিতে উজ্জ্বল ইস্পাতের মত; ধাতুটি অত্যন্ত তাপসহ এবং ইস্পাত বা অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইলে ইহার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিমানপোত নির্মাণে ইহার চাহিদা

প্রচুর। খাদ হিসাবে ব্যবহৃত হইলে মিশ্রিত ধাতুর প্রতি-ইঞ্চিতে সত্তর টন ওজন সহ্য করিবার শক্তি সঞ্চিত হয়। সুতরাং স্বল্প ওজনে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য টিটেনিয়াম ধাতু একান্ত প্রয়োজনীয়।

ত্রিবাঙ্কুরে প্রতি বৎসর ৩,৫০০ টন ইলমেনাইটকে টিটেনিয়াম অক্সাইডে পরিণত করিবার জন্য এক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। টিটেনিয়াম উদ্ধার করিবার পক্ষে ইলমেনাইট ও রুটাইল 'প্রস্তর' প্রধান, তন্মধ্যে ইলমেনাইট প্রথম। অপরাপর অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত খনিজের মধ্যে ব্রুকলাইট ও অ্যানটেজ-এর নাম করা চলিতে পারে। ইলমেনাইট বালি ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। ত্রিবাঙ্কুরের তীর ধরিয়া কুইলন হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সকল স্থানে মোনাজাইট, জিরকন ও রুটাইল-এর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ইলমেনাইট পাওয়া যায়। এরূপ যোগাযোগ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমেরিকায় ভার্জিনিয়া, আরকানসাস, ক্যালিফোর্ণিয়া (ও ফ্লোরিডা), টাসমানিয়া (ওশিয়ানিয়া) প্রভৃতি দেশ মিলিয়া যে ইলমেনাইট উৎপাদন করে তাহা ভারতের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু তৎসত্বেও আমেরিকায় দুইটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং গত বৎসর প্রচুর টিটেনিয়াম উদ্ধার করিয়াছে। নরওয়ে ও ক্যানাডা হইতে কিছু পরিমাণ ইলমেনাইট পাওয়া যায়, ক্যানাডাও একটি বড় কারখানা স্থাপন করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে অনেক কিছুই পাওয়া না গেলেও তাহারা কাঁচামাল আমদানী করিয়া কারখানা চালায় এবং শিল্পজগতে সেদিন পর্যন্ত প্রধান স্থান অধিকার করিয়া ছিল। সেখানেও একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখন পৃথিবীর বাজারে প্রতি পাউণ্ড টিটেনিয়াম চাঁই প্রায় সাতাশ টাকায় বিক্রয় হয়। আর ব্যবহারের উপযোগী পেটাই পাত প্রভৃতির দাম প্রতি পাউণ্ডে প্রায় সত্তর টাকা।

ভারতে যে টিটেনিয়াম অক্সাইড উৎপাদিত হইবে তাহাতে ইস্পাত দৃঢ় করা এবং ধাতু জোড়াই করিবার উপযোগী ছড় প্রস্তুত হইবে। রং, ছাপার বালি, চীনামাটির পাত্রাদি, রবার, যৌগিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্পে টিটেনিয়াম প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে কাঁচামালের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ভারতবর্ষে এত দিন কারখানা স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল।

ভারতের ইলমেনাইট ও রুটাইল লইয়া গিয়া অপর দেশ টিটেনিয়াম উদ্ধার করিয়া লয়; সুতরাং ইহাদের নাম বাণিজ্যের পণ্যতালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রীত হইবার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা অপচয় বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। ভারতে কারখানা স্থাপিত হওয়ায় এ অসুবিধা বহুল পরিমাণে দূর হইবে। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—বৎসরে ইলমেনাইট রপ্তানীর পরিমাণ ২,৫০,০০০ টন আর ভারতের কারখানা ৩,৫০০ টন মাত্র ইলমেনাইট ব্যবহার করিতে পারিবে। সুতরাং ইলমেনাইটের রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইবার কথা নহে।

৮০,০০০ ফুট উপর হইতে সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণ

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ একটি অতিকায় প্লাষ্টিকের বেলুন নির্মাণ করিতেছেন। ইহাতে একটি দূরপাল্লার ক্যামেরা বসাইয়া ৮০,০০০ ফুট উপর হইতে সূর্যের কতকগুলি অভিনব আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভব হইবে। বৈজ্ঞানিকদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল করোনা, অর্থাৎ সূর্যমুকুটের কতকগুলি সুস্পষ্ট আলোকচিত্র গ্রহণ করা। করোনা হইল সূর্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষীণ আলোর পরিমণ্ডল। ইহা সাধারণতঃ একমাত্র পূর্ণগ্রাসের সময়েই দেখা যায়।

একটি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহিত একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা লাগাইয়া উপরোক্ত বেলুনের সাহায্যে তাহাকে ৮০,০০০ ফুট উর্দ্ধে পাঠাইয়া দেওয়া

হইবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, এই উপায়ে সূর্যের যেরূপ স্পষ্ট আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাইবে ইতিপূর্বে কখনও তাহা সম্ভব হয় নাই।

কৃত্রিম দুগ্ধ

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে (৮ই অগাষ্ট) প্রকাশ, যুদ্ধের শেষভাগে যখন ইউরোপে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় তখন জনৈক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক এমন একটি দ্রব্য আবিষ্কার করেন যাহা সমগ্র বিশ্বের শিশুদের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। ১৯৪৪ সালে রোমে দুগ্ধের অভাবে বহুসংখ্যক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোমের ডাক্তার জি ক্যাপ্রিনো অঙ্কুরিত গম ও সয়াবিন হইতে এমন একটি খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করেন যাহা দুগ্ধের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করিয়া শিশুদের প্রাণ রক্ষা সম্ভব হয়।

মিত্রশক্তির দখলাধীন রুর-এর অন্তর্গত ডর্ট মুণ্ডের একটি ভাঁটিখানায় কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে বহু জার্মান শিশুর প্রাণরক্ষা হয়। অতঃপর বৃটিশ লিস্টার ইনষ্টিট্যুটের ডাঃ হ্যারিয়েট চিক কৃত্রিম দুগ্ধ সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং ১৯৪৬ সালে তিনি ও তাঁহার সহযোগীরা গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন।

বৃটিশ মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ সম্প্রতি ডাঃ চিকের গবেষণার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে সকল দেশে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য সেই সকল দেশের শিশুদের যথোচিত পুষ্টির জন্য অন্যান্য খাদ্যে সহজলভ্য প্রোটিন কাজে লাগাইয়া কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত করা সম্ভব।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের গুণাবলী সম্পর্কে অবশ্য আরও গবেষণা চালাইবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বর্তমানে যে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে তাহা শিশুদের কেবল প্রাণরক্ষা নহে, পুষ্টিসাধনের পক্ষেও যথেষ্ট। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে মানুষ যে সকল কল্যাণকর দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছে, কৃত্রিম দুগ্ধ তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

দশ হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তিক একটি পল্লী এলাকায় মৃত্তিকা খননের ফলে দশ হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ওয়াশিংটন ষ্টেট কলেজের নৃতত্ত্ব বিভাগের উপদেষ্টা রিচার্ড ডোয়াটি উল্লিখিত ঘোষণা করিয়াছেন। ওয়াশিংটন রাজ্যে যে একদা সুপ্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্র ছিল তাহা এই আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে এবং এশিয়া হইতে প্রথম মানুষ যে উত্তর আমেরিকায় আসিয়াছিল, নৃতত্ত্ববিদগণের এই ধারণা ও দাবী ইহা দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

সেই আদিম মানবেরা আগুনের ব্যবহার জানিত। তাহাদের প্রস্তুত ছুরী, নানা প্রকার উৎক্ষেপণ যন্ত্র, পাথরের খণ্ড প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ঐ এলাকা জুড়িয়া হয়তো সেই সময়ে একটি হ্রদ ছিল। বর্তমানে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।

গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে ভয়াবহ ভূকম্পন

এথেন্স, ১৩ই অগাষ্টের সংবাদে প্রকাশ—আইওনিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পনের ফলে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গ্রীসের ইতিহাসে এইরূপ ভয়াবহ ভূকম্পনের দৃষ্টান্ত আর নাই।

সংবাদে প্রকাশ, সেফালোনিয়া দ্বীপের ৬টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। প্রথমে ভূকম্পন এবং পরে অগ্নিকাণ্ডে আর্গোষ্টোলি ও জান্তে সহরও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভূকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও বিক্ষুব্ধ হইয়া

দ্রুত এবং তাহার উন্মত্ত তরঙ্গমালায় বিপন্নদের উদ্ধারকার্য অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জান্তে সহরের জনসাধারণ পাহাড় অঞ্চলে পলাইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পল্লী 'ডাথি অব ইথাকা'য় যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা তাহাদের রক্ষার জন্য সেণ্ট নিকোলাসের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছে।

আইওনিয়ান সাগরের দ্বীপমালায় রাত্রেও ভূকম্পন চলিতে থাকে এবং তাছাড়া বহু স্থানে আগুন জলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভীতিবিহ্বল জনসাধারণ ঘরের বাহিরে এবং অধিকাংশই সমুদ্রসৈকতে রাত্রিযাপন করে।

এথেন্স মানমন্দির হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাত্রে উক্ত দ্বীপমালায় ২২ বার ভূকম্পন হয় এবং তন্মধ্যে সবচেয়ে তীব্র কম্পন অনুভূত হয় ভোর ৫-২২টায়।

জান্তে দ্বীপের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজধানী জাকিন্থস্ এবং সেফালোনিয়া দ্বীপের রাজধানী আর্গো-স্টোলিতে আগুন জলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সকাল হইতে উক্ত দ্বীপপুঞ্জের বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলিতে খাদ্য ও মেডিক্যাল দ্রব্যাদি গ্রীক সৈন্যবাহিনীর ৮ খানি বিমানযোগে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

সেফালোনিয়া, জাকিন্থস্ ও ইথাকার জনসংখ্যা ১২০,০০০।

গ্রীক অর্থদপ্তরের এক মুখপাত্র বলেন যে, এই ভূকম্পনে ক্ষতির পরিমাণ অনুমান মোট ২০ হাজার কোটি ড্রাকমা (৮৪০০০ ড্রাকমা এক পাউণ্ডের সমান)।

বৃটিশ রণতরীগুলি দ্রুত চিকিৎসক দল, শুশ্রূষা-কারী দল এবং ঔষধপত্র দ্বীপগুলিতে পাঠাইতেছে। দ্বীপগুলিতে চারিদিনে কম পক্ষে ৪০০ জন নিহত ও ৩০০০ গৃহহীন হইয়াছে।

প্রথম যে দল পিরিউগে পৌছিয়াছেন তাহারা বলিয়াছেন—গতকল্য যে ৫ বার কম্পন হয়, তাহাতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতলে দ্বীপগুলি যেন নিমজ্জিত হইতেছে। দ্বীপের দুইটি সহর আর্গোস্টোলি ও লিকসৌরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

দিল্লী ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লীর ২৯শে অগাষ্টের খবরে প্রকাশ—আজ প্রাতে ৭-৩০ মিনিটের সময় দিল্লী ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, কাশী, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানেও ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছে।

গোরক্ষপুর অঞ্চলে ভূকম্পন আধ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল এবং লোকে বাড়ীঘর ছাড়িয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কোন ক্ষতির সংবাদ তখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাশীতে ৫।৬ বার কম্পন অনুভূত হয়। টালির ছাদযুক্ত কয়েকটি বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এলাহাবাদে কম্পন ১৬ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল। পাটনা সহরে সকাল সাড়ে সাত ঘটিকার সময় কম্পন অনুভূত হয়। লোকজন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সকাল ৮টা পর্যন্ত কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ভূকম্পনের উৎপত্তি-স্থান তিব্বত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মজঃফর-পুর ও উত্তর বিহারের বিভিন্ন সহরে ভূকম্পন হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কোন স্থান হইতে কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কানপুরে ভূমিকম্প ৫ সেকেণ্ড স্থায়ী হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভাগলপুর, শিলং গোয়া-লিয়র, লক্ষ্মৌ, মজঃফরপুর, গয়া, কাঠমাণ্ডু প্রভৃতি স্থানেও প্রায় কাছাকাছি সময়ে ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

রং প্রস্তুতির অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার

শিকাগোর একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রং প্রস্তুতি সম্পর্কে একটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে হাজার রঙের মধ্যে যে কোন একটি রং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মিশ্রণ করিয়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটির সম্মুখভাগে একটি ডায়েল থাকে। এই ডায়েলের কাঁটা ঘুরাইয়া ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে যে কোন রং পাওয়া যাইতে পারে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট উইলিয়াম এম. স্টুয়ার্ট বলেন—বর্তমানে আমরা সকলেই রং সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এমন একটি যন্ত্র আমরা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি যাহার সাহায্যে অতিদ্রুত ও অতি অল্প ব্যয়ে বহু প্রকার রং প্রস্তুত করিয়া গৃহ-নির্মাণকারীদের চাহিদা মিটানো যাইতে পারে। রং ব্যবসায়ীদের রং মিশ্রণের জন্য কারখানা রাখিবার বর্তমানে আর প্রয়োজন নাই, অথবা মিশ্রিত রং বিক্রয় না হইবার ফলে ব্যবসায়ীর যে ক্ষতি হইয়া থাকে সেই ক্ষতিও আর হইবে না।

এই যন্ত্রটির আকৃতিও খুব বড় নয়। ইহা দৈর্ঘ্যে মাত্র ৯ ফুট, প্রস্থে ৩ ফুট এবং উচ্চতায় সাড়ে ছয় ফুট। যে কোন টোনের ও শেডের রং ইহার সাহায্যে প্রস্তুত করা যাইবে। হাতে রং মিশ্রণের জন্য যে শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয় তাহার পরিমাণও অনেকখানি হ্রাস পাইবে।

উত্তর আসামে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ

গৌহাটীর এক সংবাদে প্রকাশ (২৩শে অগাষ্ট)—উত্তর আসামের উপর দিয়া প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। পক্ষকালের মধ্যে দুইজন নারীসহ ৬ জন লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, জোড়হাট মহকুমায় তিনজন এবং উত্তর লখিমপুর মহকুমায় তিনজন মারা গিয়াছে। শীঘ্র বারিপাত না হইলে পাট, ধান ও চা আবাদের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

পাতায় ফুল

রত্নগিরি, ২২শে অগাষ্ট—এখানে একটি বাড়ীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় 'পূর্ণপুষ্পী' নামক ফুলগাছের পাতায় ফুল ফুটিতেছে।

ফুলগুলি বেশ বড় বড়। মধ্যরাত্রে সেগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনার কোন কারণ জানা যায় নাই।

কার্পাস বস্ত্র

১৯৫২ সালে পৃথিবীতে কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। রাশিয়া ব্যতীত পূর্ব বৎসরের ৩,৫১০ কোটি বর্গ গজের স্থলে ৩,২৮০ কোটি বর্গ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ হ্রাসের হার শতকরা ৭ ভাগ। ১৯৩৭ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ, অর্থাৎ যাহা কয় বৎসরে বাড়িয়াছিল তাহা এক বৎসরেই ক্ষয় পাইয়াছে। বৃটেন এই দুরবস্থায় প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে। উৎপাদন হ্রাসের হার সেখানে শতকরা ২১ ভাগ, পশ্চিম ইউরোপের হার শতকরা ১২ ভাগ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ শতকরা ৯।

বয়ন-শিল্পে নারী শ্রমিক

অন্যান্য শিল্পের তুলনায় বয়ন-শিল্পে নারী শ্রমিকের হার অনেক বেশী। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা যে কয়টি দেশের তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ পাওয়া যায়—এক ভারতবর্ষ ছাড়া অপর সকল দেশের হার পুরুষের সহিত সমান অথবা তাহা অপেক্ষাও বেশী। যে সকল দেশে যন্ত্রপাতি যত উন্নত এবং কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কম, সেই সকল দেশে নারী শ্রমিকের

হারও তত বেশী। কায়িক শ্রম, রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার ও কারিগরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকের স্থান নারী শ্রমিক অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাহা ছাড়া নিতান্ত বৃদ্ধ ও অশক্ত না হইলে সকল বয়সের পুরুষ শ্রমিক যেখানে কাজ করে সেখানে মধ্য বয়স অতিক্রান্ত হইলেই নারী শ্রমিক ঘর-সংসারে মন দেয় এবং কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করে।

বিভিন্ন রাজ্যের নারী শ্রমিকের সংখ্যা ও মোট শ্রমিকের সহিত তাহার অনুপাত নিম্নে প্রদত্ত হইল :

রাজ্য	নারী সংখ্যা	মোট শ্রমিকের শতকরা অংশ
ফিনল্যাণ্ড	২৮,৮৩৩	৮৩
ইটালী	. . .	৭৪
ডেনমার্ক	১৯,০৩৮	৬৪
সুইজারল্যাণ্ড	৪৩,৯০০	৬২
জাপান	১২,৭০,০০০	৫৯
ইউনাইটেড কিংডম	৫,২৮,০০০	৫৮
ফ্রান্স	৩,৪৪,০০০	৫৭
পঃ জার্মাণী	৩,৬৬,৫৩৩	৫৬
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫,৫৩,৩০০	৪৩
ক্যানাডা	২৪,২৪৭	৩৬
ভারতবর্ষ	১০৮,০৬৮	১০

পৃথিবীর চিনির ভাণ্ডার

হাজার টন

সাল	বৎসরের গোড়ায় মজুত	উৎপাদন	ব্যবহার	বৎসরের শেষে মজুত
১৯৩৮-৩৯	১,১৬,০৯	৩,১১,৪৩	৩,১১,৬৩	১,১৫,৮৯
১৯৩৯-৫০	৭৯,০০	৩,২৪,৬৯	৩,৩১,০৭	৭৭,৯৬
১৯৫০-৫১	৭৭,৯৬	৩,৬২,১২	৩,৪৭,১০	৯৭,৩৯
১৯৫১-৫২	৯৭,৩৯	৩,৮৯,৫৮	৩,৬১,৬৭	১,২৪,৮৬
১৯৫২-৫৩	১,২৪,৮৬	৩,৬৯,৫৫	৩,৭১,৭০	১,২২,৭১

ভারতে নির্মীয়মাণ তৈল শোধনাগার

ভারতে যে তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে ঐগুলি একযোগে বৎসরে মোট ৩৭,১০,০০০ টন (পাকী) অপরিশোধিত তৈল, ১৪,৬৯,০০,০০০ গ্যালন মোটর গ্যাসোলিন এবং ১,২০,৩০০ গ্যালন কেরোসিন তৈল শোধন করিতে পারিবে।

আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম ও ক্যালটেক্স কোম্পানী যথাক্রমে বোম্বাইতে ও বিশখাপত্তনে শোধনাগার নির্মাণ করিতেছে। বৃটেনের বার্মা শেল কোম্পানী বোম্বাইতে তৃতীয় শোধনাগারটি স্থাপন করিবে। শোধনাগারগুলির কাজ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইলে দেশের বর্তমান মোটর গ্যাসোলিনের চাহিদা শতকরা ৬০ ভাগ এবং কেরোসিনের চাহিদা প্রায় অর্ধেক পরিমাণে মিটাইতে পারিবে।

১৯৫২-৫৩ সালে ভারত ২৪,৩৪,০০,০০০ গ্যালন মোটর স্পিরিট (মূল্য ২৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা) আমদানী করিয়াছে।

পাকিস্তান-ভারত বাণিজ্য

(১৯৫২-৫৩)

ভারতে আমদানী

	পরিমাণ	লক্ষ টাকা
খাদ্যতণ্ডুল (দ্বিদল)	—	৪০
ফলমূল দিঃ	—	৮৬
কাঁচা চামড়া দিঃ হাজার টন	৩০	৫৬
তৈলবীজ হাজার টন	২·৪	১০
পাট হাজার গাঁট	১৩,২৩	১৬,৪৮
অপরাপর	—	৩,৪৮
মোট		২১,৮৮

ভারত হইতে রপ্তানী

	পরিমাণ	লক্ষ টাকা
ফলমূল দিঃ	—	১,৯১
মশলা হাঃ হন্দর	১,২১	৬৭
কাঁচা তামাক লক্ষ পাউণ্ড	৪৫	৭৭
প্রস্তুত তামাক লক্ষ পাউণ্ড	২৪	১,৫৭
কয়লা হাজার টন	৭,৫৬	৩,২১
সঃ তৈল হাজার হন্দর	১,৬১	১,৮৯
সংস্কৃত চামড়া	—	৩০
কার্পাস সুতা লক্ষ পাউণ্ড	১২	২৮
কার্পাস বস্ত্র লক্ষ গজ	৪,৫৪	৪,৬৪
পাট থলে	—	২,৮৭
পাট বস্ত্র	—	২০
অপরাপর	—	১২,৭৯
মোট		৩১,১০

পৃথিবীতে ইস্পাত উৎপাদন

যুদ্ধপূর্বকাল হইতে বর্তমানে ইস্পাতের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; একেবারে দ্বিগুণ না হইলেও প্রায় কাছাকাছি হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, ১৯৫১ ও '৫২ সালের উৎপাদনে বিশেষ তারতম্য নাই। কিন্তু একথাও স্মরণ করা ভাল যে, আমেরিকায় আট সপ্তাহ ধর্মঘটের ফলে অন্ততঃ এক কোটি ষাট লক্ষ টন ইস্পাতের উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নলিখিত সংখ্যাতালিকা হইতে পাওয়া যাইবে :

লক্ষ টন

	১৯৩৭-৩৮ (গড়)	১৯৪৮	১৯৫১	১৯৫২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩,৯৪.৬	৭,৯১.৪	৯,৩৯.৩	৮,৩১.৮
ইংল্যাণ্ড	১,১৬.৮	১,৪৮.৮	১,৫৬.৪	১,৬৪.২
'স্যুম্যান-সংযুক্ত' দেশ	৩,৫০.৪	২,২৮.৩	৩,৭১.০	৪,১১.৬
পঃ ইউরোপ, অপরাপর	২৩.৮	৩২.৩	৪৪.৮	৪৮.৩
মোট পশ্চিম ইউরোপ	৪,৯১.০	৪,০৯.৪	৫,৭২.২	৬,২৪.১
রুশ গণতন্ত্র	১,৭৬.২	১,৮৬.০	৩,০৮.০	৩,৪৪.৫
পূর্ব ইউরোপ অপরাপর	৪৪.২	৫৬.১	৯৩.৯	১,০৬.৬
মোট পূর্ব ইউরোপ	২,২০.৪	২,৪২.১	৪,০১.৯	৪,৫১.১
মোট কমনওয়েলথ	৩৬.৭	৬১.৮	৭০.৮	৭৭.১
মোট দক্ষিণ আমেরিকা	১.৫	৯.৫	১৭.১	১৮.৬
জাপান	৬০.৪	১৬.৯	৬৪.০	৬৯.৭
অপরাপর	৫.৪	১.৫	৮.৭	—
অপরাপর দেশসমূহ	৬৫.৮	১৮.৪	৭২.৭	৮০.০
পৃথিবীর মোট	১২,১০.০	১৫,৩২.৬	২০,৭৪.০	২০,৮২.৭

নূতন ইস্পাত কারখানা

দিল্লীর খবরে প্রকাশ—ভারতে ৫ লক্ষ টন ইস্পাত নির্মাণোপযোগী একটি নূতন কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আগামী নবেম্বর মাসের মধ্যেই একটি কোম্পানী গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দুইটি জার্মান প্রতিষ্ঠান, ক্রুপ্‌স্ এবং ডেমাগ প্রস্তাবিত কোম্পানীতে যোগদান করিবেন। এই জার্মান প্রতিষ্ঠান দুইটির একটি বিশেষজ্ঞ দল এই মাসের মধ্যে ভারতে আসিয়া পৌছাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই নূতন ইস্পাত কারখানা পত্তনে প্রায় ৭১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ইহার মধ্যে জার্মান প্রতিষ্ঠান দুইটি ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা নিয়োগ করিবেন। কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ভারতের হস্তেই থাকিবে। কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পৃথিবীর খাদ্য-শস্যের অবস্থা

রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা হইতে '১৯৫৩ সালের খাদ্য ও কৃষির অবস্থা' নামে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক লোকসহ দূর প্রাচ্যের খাদ্য-সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই। গত বছর ভাল ফসল হওয়ায় পৃথিবীতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৩-৫৪ সালে ফসল ভালই হইবে বলিয়া আশা করা যায়; তবে ভবিষ্যতে খারাপ আবহাওয়া চলিলে বিশ্বের খাদ্যাবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটিতে পারে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে—বিশ্বের খাদ্যাবস্থার অন্যতম সমস্যা হইল, দূরপ্রাচ্যের কয়েকটি এলাকায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দূর প্রাচ্য খাদ্যশস্য রপ্তানী করিবার পরিবর্তে আমদানী করিতেছে। তাছাড়া কয়েকটি স্থানে প্রধান খাদ্য-শস্য প্রচুর পরিমাণ মজুত থাকায় ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, গুরুতর দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কিছু হ্রাস পাইয়াছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ নরিস ডড রিপোর্টের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, খাদ্য সম্পর্কে ঘাটতি দেশসমূহকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করাই হইল এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আগামী ২৩শে নভেম্বর খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বৈঠকে উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে আলোচনা হইবে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এইমর্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, উপরোক্ত সামগ্রিক চিত্রে বিশ্বের বহু এলাকা, বিশেষ করিয়া এশিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। ঐসব স্থানে বহুকাল ধরিয়া অপুষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় কৃষি উৎপাদন আদৌ আশানুরূপ নহে।

মিঃ ডড তাঁহার ভূমিকায় আরও বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলে বসবাস করে। পৃথিবীর বর্তমান

গড়পড়তা হারে তাহাদের খাদ্যের পরিমাণ (যদিও উত্তর আমেরিকার গড়পড়তা হারের অর্ধেক এবং উহাও পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নহে) বৃদ্ধি করিতে হইলে ১৯৫২-৫৩ সালে উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড মিলিয়া যে মোট খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিবে সেই পরিমাণ অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

দূর প্রাচ্যে শতকরা ৯১ ভাগেরও বেশী অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন হইবে।

উত্তর আসামের বন্যা

উত্তর আসামের ব্রহ্মপুত্র, লোহিত, ডিবং, বঙ্গানই ও সুবর্ণশ্রী নদী এবং উহাদের শাখা ও উপনদীসমূহের জলরাশি স্ফীত হইতে থাকায় ডিব্রুগড় ও উত্তর লক্ষীমপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পুনরায় গুরুতর বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

ডিব্রুগড় ও উত্তর লক্ষীমপুর মহকুমায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ধান্যক্ষেত্র বৃহদাকার হ্রদে পরিণত হইয়াছে। ডিব্রুগড় ও সৈখোয়াঘাটের সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বন্যার করাল কবল হইতে রক্ষার জন্য শত শত লোককে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। লক্ষীমপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার মিঃ মহম্মদ সুলতান সৈখোয়াঘাট এলাকায় দুর্গতদিগকে সাহায্যের জন্য দ্রুত নৌকা ও খাদ্যসম্ভার প্রেরণ করিতে সরকারী কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়াছেন। দরং জেলার ধনশিরি নদীর দুই কূল বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে এবং কালং ও হালেন মৌজার কয়েকটি গ্রাম আংশিকভাবে বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে। আর একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লক্ষীমপুর জেলার সৈখোয়াঘাট এলাকায় বন্যার ফলে ৯টি গ্রামের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

পাহাড় অঞ্চল ও সমতল ভূমিতে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের জল দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে ডিব্রুগড় সহরে প্রবল বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। আমলাপট্টি, গ্রাহাম বাজার, ষ্টেশন রোড, কালীবাড়ী ও পার্ক অঞ্চলসহ সহরের কতকগুলি অংশ ইতিপূর্বেই জলমগ্ন হইয়াছে। বন্যার জলের জন্য কলেজ ও কয়েকটি স্কুল অদ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জল ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সহরের অন্যান্য অঞ্চলও ডুবিয়া যাইবে। আমলাপট্টি অঞ্চলে নৌকা চলাচল করিতেছে এবং লোকে মাছ ধরিতেছে।

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর-তীর অঞ্চল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রবল বন্যার ফলে তথায় জনগণ ও গৃহপালিত পশুগুলির অবর্ণনীয় ক্লেশ হইয়াছে এবং ডিব্রুগড়ের সহিত উত্তর-তীরের সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড, হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

// জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ অক্টোবর—১৯৫৩ দশম সংখ্যা

মেসন-কণিকার জন্মকথা

শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ

ক্ষণস্থায়িত্বের নিদর্শনস্বরূপ অনেকেই জলবুদ্বুদের তুলনা দিয়ে থাকেন। জলের উপর ক্ষণিকের মধ্যেই বুদ্বুদ সৃষ্টি হয়, আবার মিলিয়ে যায়। তবুও সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্যে সূর্যকিরণে কত রং ফলিয়ে এক নিমেষের জীবন সার্থক করে নেয়। পদার্থ-বিজ্ঞানের এইরূপ একটি ক্ষণস্থায়ী বস্তুর কথাই আলোচনা করছি। তবে এই বস্তুটির জীবনকাল দু-এক সেকেণ্ড নয়; দু-তিন সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ড মাত্র। এক সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ড হলো এক সেকেণ্ডের দশকোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। এক সেকেণ্ডের দশকোটি ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র বেঁচে থেকেই এর বিনাশ হয়। কিন্তু এটুকু যার পরমায়ু তার যে কত শক্তি, আর তার আবিষ্কারই বা কিভাবে সম্ভব হলো তা বুঝতে হলে আগের কথা একটু জানা প্রয়োজন।

পরমাণু যে পদার্থের শেষ অবিভাজ্য বস্তু নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তা জানা গেছে। টমসন, রাদারফোর্ড, বোরপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেন যে, যাবতীয় পদার্থের পরমাণুই দুই প্রকার মৌলিক কণিকার সমষ্টি। তাঁরা এই মৌলিক কণিকাগুলির নাম দেন—প্রোটন ও ইলেকট্রন। প্রোটন হলো একমাত্রা পরিমাণ ধনতড়িতাবিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণিকা, আর ইলেকট্রন হলো একই পরিমাণ ঋণতড়িতাবিষ্ট আরও অনেক ক্ষুদ্রতর কণিকা। বিপরীতধর্মী তড়িৎ-ভাবাপন্ন হলেও কণিকা দুটির তড়িৎ-মাত্রা কিন্তু সমান। প্রোটন ও ইলেকট্রনের ভর কিন্তু সমান নয়। একটি প্রোটনের ভর ঠিক ১৮৪০টি ইলেকট্রনের ভরের সমান। পরমাণুর গঠনের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী স্থির হলো যে, সকল পরমাণুর অভ্যন্তরেই ধনতড়িতাবিষ্ট একটি কেন্দ্রীনকে (nucleus) কেন্দ্র করে এক বা একাধিক ইলেকট্রন আবর্তিত হচ্ছে। কেন্দ্রীনটি কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমষ্টি এবং এর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার চেয়ে অধিক থাকায় কেন্দ্রীনটি সব সময়েই ধনতড়িতান্বিত হয়ে থাকে। তবে এই ধনতড়িৎ-মাত্রা কেন্দ্রীনটির চতুর্দিকে আবর্তিত ইলেকট্রনগুলির মোট ঋণতড়িৎ মাত্রার সমান হবেই। নচেৎ সমগ্র পরমাণুটি

নিস্তড়িৎ হতো না। পরমাণু-কেন্দ্রীন যে কতকগুলি প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমষ্টি, এ ধারণা বহুদিন প্রচলিত ছিল। ১৯৩২ সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যাডউইক আবিষ্কার করেন যে, কেন্দ্রীনে প্রোটন ব্যতীত আরও এক প্রকার ক্ষুদ্র কণিকার অস্তিত্ব রয়েছে, যার ভর প্রায় প্রোটনের সমান, কিন্তু এগুলিতে ধন বা ঋণ কোনও প্রকার তড়িৎ দিয়েই তৈরী। আরও দেখা গেল—পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের অনেক দূরে থেকে সর্বদাই তার চারদিকে ঘুরছে। কেবল মাত্র প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে কেন্দ্রীন তৈরী হওয়ার ফলে গোটা পরমাণুর ভার পরমাণুটির কেন্দ্রীনের মধ্যেই নিহিত থাকে। কারণ তার মধ্যে আবর্তনশীল ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনস্থিত প্রোটন, নিউট্রনগুলির

হিডেকী ইউকাওয়া
মেসন-কণিকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে ইনি নোবেল পুরস্কার পান

বর্তমান নেই। কণিকাগুলি সম্পূর্ণ নিস্তড়িৎ হওয়ায় স্যাডউইক এগুলির নাম দেন নিউট্রন।

নিউট্রন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীনের উপাদান সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠলো। তিন-চারটি বিভিন্ন তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কেন্দ্রীনে ইলেকট্রন থাকা অসম্ভব এবং পরমাণুর কেন্দ্রীন কেবলমাত্র প্রোটন ও নিউট্রন তুলনায় প্রায় দু-হাজার গুণ হাল্কা। একটি পরমাণুর ভার প্রায় সবটিই তার কেন্দ্রীনের ভারের সমান হলেও কেন্দ্রীনের আয়তন সমগ্র পরমাণুটির তুলনায় নিতান্তই অল্প। পরমাণুর কেন্দ্রীনের আয়তন সমগ্র পরমাণুটির মাত্র একলক্ষ ভাগের এক ভাগের সমান; অর্থাৎ কেন্দ্রীনটি অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট কতকগুলি নিউট্রন, প্রোটনের সমষ্টি। পরীক্ষায়

দেখা যায় যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে নিউট্রন-প্রোটনগুলির দূরত্ব এক ইঞ্চির দশলক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান।

কেন্দ্রীনের এইরূপ অসাধারণ ঘনত্ব বৈজ্ঞানিকদের বিষম চিন্তার কারণ হয়ে উঠলো। বিদ্যুৎ-শক্তির সাধারণ নিয়ম এই যে, সমভাবাপন্ন তড়িৎ সর্বদাই একটি অন্যটির কাছ থেকে বিকর্ষিত বা বিক্ষিপ্ত হবে। সমতড়িৎভাবাপন্ন পদার্থ দুটি যত কাছাকাছি আসবে ততই তাদের মধ্যে বিকর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এখন কেন্দ্রীনের অভ্যন্তরে প্রোটনগুলির কথা এবং তাদের পরস্পরের নিকটত্বের বিষয় চিন্তা করলেই বোঝা যায়—কত প্রচণ্ড শক্তিতে এই সমতড়িৎভাবাপন্ন প্রোটনগুলির বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অথচ কেন্দ্রীনের প্রোটনগুলির বিক্ষিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, তারা এমনভাবে গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে যে, তাদের পৃথক করা খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতির কোন্ অদৃশ্য শক্তি যে প্রোটনগুলির প্রচণ্ড বিকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে সেগুলিকে অত ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ করে রেখেছে তা বৈজ্ঞানিকদের বহুদিন বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীনের প্রোটনগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও আকর্ষণী শক্তি ক্রিয়া করছে। কিন্তু এই আকর্ষণী শক্তির ধর্ম কি? সাধারণ অবস্থায় যখন কোনও প্রোটন অন্য একটি প্রোটন থেকে দূরে থাকে তখন সত্যিই তারা পরস্পরকে বিক্ষিপ্ত করে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রোটনগুলি যখন একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের ভিতর এসে পড়ে তখনই এই আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া সুরু হয়। এ জন্যেই কেন্দ্রীনের প্রোটনগুলির কোনও একটিকে যদি কোনও উপায়ে এই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই সেটি তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে কেন্দ্রীন থেকে বিচ্যুত

প্রোফেঃ সি. এফ. পাওয়েল
পাই-মেসন আবিষ্কারের জন্যে ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন

হয়ে যাবে। কারণ তখন এই আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়াই যে শুধু নিঃশেষিত হয়ে যাবে তা নয়, পরন্তু ধনতড়িতাবিষ্ট সমগ্র কেন্দ্রীনটি সমতড়িৎভাবাপন্ন প্রোটনটিকে সাধারণ নিয়মানুযায়ী বিকর্ষণ করবে।

এই তো গেল প্রোটনের কথা। কেন্দ্রীনস্থিত নিউট্রনগুলিও একই নিয়মে কেন্দ্রীনের মধ্যে আকর্ষিত হচ্ছে। কতকগুলি পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া প্রোটন ও নিউট্রনের উপর বিভিন্ন নয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীনের সবগুলি কণিকাই পরস্পর এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে প্রভাবান্বিত হয়ে রয়েছে। এই শক্তিকে nuclear force বা কেন্দ্রিক শক্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এই শক্তির আধার নিউট্রন ও প্রোটনগুলিকে একটি মাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। এই সংজ্ঞাটি হলো নিউক্লিয়ন (nucleon)। নিউক্লিয়ন বলতে প্রোটন এবং নিউট্রন দুই-ই বুঝায়।

কেন্দ্রিক শক্তির স্বরূপ কি, তথ্যের দ্বারা আজও তার সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নি। তবে এই শক্তি সম্পর্কে গবেষণারত জাপানী বৈজ্ঞানিক হিডেকি ইউকাওয়া ১৯৩৫ সালে আবিষ্কার করেন যে, নিউক্লিয়নের মধ্যে এই আকর্ষণী শক্তি (nuclear force বা কেন্দ্রিক শক্তি) একপ্রকার নতুন কণিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি গাণিতিক সমাধানের দ্বারা প্রমাণ করেন যে, প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে স্বল্প দূরত্ববিশিষ্ট আকর্ষণী শক্তি বর্তমান থাকলে আরও একপ্রকার মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব কল্পনা না করে উপায় নেই। আর এই নতুন কণিকাগুলি ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় ২০০ গুণ ভারী হওয়া আবশ্যক। তাই ইউকাওয়া এই কণিকার নাম দিয়েছিলেন ভারী-ইলেকট্রন। পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা একমত হয়ে এই কণিকার নাম দিলেন মেসোট্রন বা মেসন কণিকা (mesotron or meson)। কেন্দ্রিক শক্তির উৎসস্বরূপ এই নতুন কণিকার ভর দু'শো ইলেকট্রনের ভরের কাছাকাছি হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী করেই ইউকাওয়া ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরও বললেন যে, এই কণিকাটি নিউট্রন বা প্রোটনের সঙ্গে ঠিক যেমন জলে সঙ্গে ঢেউ মিশে থাকে সেরূপ অদৃশ্যভাবে মিশে রয়েছে এবং কেন্দ্রীনের মধ্যে এক নিউক্লিয়ন থেকে অন্য নিউক্লিয়নে অবাধে যাতায়াত করছে। কিন্তু যখনই এই মেসন, প্রোটন বা নিউট্রন থেকে পৃথক হয়ে আসবে তার অত্যল্প কালের মধ্যেই এর বিনাশ ঘটবে। অথচ যতক্ষণ মেসনটি তরঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে ততক্ষণ কণিকাটি অদৃশ্য হয়েই থাকে এবং তার প্রভাব নিউট্রন ও প্রোটনের পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। ইউকাওয়ার তথ্য অনুযায়ী একটি মেসন কণিকার জন্ম-মৃত্যুর ব্যবধান দু-তিন সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ডের বেশী হওয়া চলবে না। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী কোন বস্তুরই ধ্বংস হতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে বিনাশ বলে ভ্রম হয় বটে, আসলে কিন্তু তা বিনাশ বা মৃত্যু নয়, রূপান্তর মাত্র। মেসন কণিকার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। ইউকাওয়ার সমাধান থেকে দেখা গেল—মেসন কণিকার বিনাশের অব্যবহিত পরেই তাথেকে প্রচুর শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবে। ইউকাওয়ার গবেষণা থেকে মোটামুটি তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল—

(১) নিউক্লিয়নগুলির স্বল্প দূরত্ববিশিষ্ট আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া মেসন নামক প্রায় ২০০ ইলেকট্রন-ভরবিশিষ্ট একপ্রকার কণিকার মাধ্যমে হতেই হবে।

(২) নিউক্লিয়ন থেকে বিচ্যুত অবস্থায় এই মেসন কণিকার জীবনকাল দু-তিন সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ডের বেশী হবে না।

(৩) মেসন-কণিকার বিনাশের পর তা থেকে প্রচুর শক্তিসম্পন্ন একটি ইলেকট্রনের উৎপত্তি ঘটবে।

এই সিদ্ধান্তগুলি কিন্তু সবই গণনার ফল। সত্যিই পরীক্ষার দ্বারা তখনও মেসন-কণিকার আবিষ্কার হয় নি। ইউকাওয়ার এইরূপ চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণীর পর মেসন-কণিকার সত্যিই অস্তিত্ব আছে কিনা, পরীক্ষার সাহায্যে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করবার চেষ্টা হতে লাগলো। কিন্তু মুস্কিল এই যে, মেসন-কণিকার পরমায়ু এতই অল্প যে, তাকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ঠিক সময়মত খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়। কিন্তু আশাতীত-ভাবে পদার্থ-বিজ্ঞানের এক ভিন্ন শাখার গবেষণায় মেসনের অস্তিত্ব সত্যিই খুঁজে পাওয়া গেল এবং ইউকাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটিই সঠিক বলে স্থিরীকৃত হলো। ইউকাওয়া তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। কিরূপে যে এই আবিষ্কার সম্ভব হলো সংক্ষেপে সে কথা আলোচনা করছি।

অনেক দিন থেকেই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছিলেন যে, আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর সর্বদাই এক-প্রকার রশ্মি এসে পড়ছে। সূর্য যে এই রশ্মির উৎস নয় তা বোঝা গেল এই দেখে যে, এই রশ্মির তীব্রতা দিনে-রাত্রিতে প্রায় সমান থাকে। এই রশ্মির নাম দেওয়া হলো, ব্যোমরশ্মি বা নভোরশ্মি (Cosmic rays)। বিভিন্ন দেশে গবেষণায় নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নভোরশ্মি মোটামুটি দু-রকমের কণিকার সমষ্টি। একভাগ ঠিক ইলেকট্রন
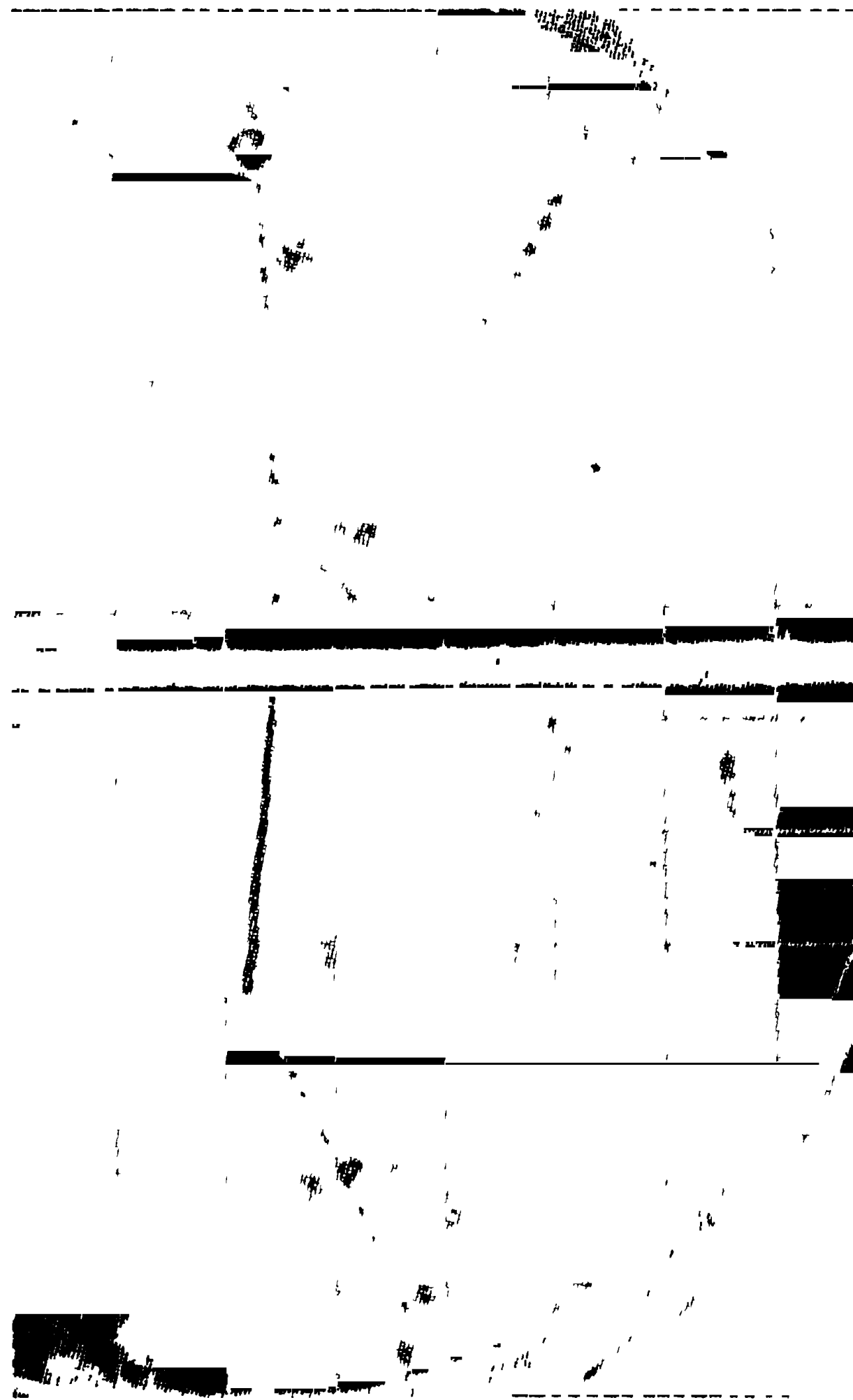
১নং চিত্র

মেঘ-প্রকোষ্ঠে গৃহীত মেসন-কণিকার পথচিহ্ন

বা ঐ জাতীয় কণিকার মত অতি সহজেই শক্তি হারিয়ে ফেলে। আর একভাগ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কোনও বস্তুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের শক্তিক্ষয় খুব কমই হয়ে থাকে। মৌলিক কণিকাগুলি কেমন করে শক্তিক্ষয় করে, অর্থাৎ কি উপায়ে তাদের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে তা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। পূর্বেই প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রনের কথা বলা হয়েছে। এগুলি সবই মৌলিক কণিকা। কোনও শক্তিসম্পন্ন মৌলিক কণিকা কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সেই পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে শক্তিক্ষয় করতে থাকে। এই সংঘর্ষজনিত শক্তিক্ষয় মৌলিক কণিকাটির ভরের উপর নির্ভর করে। কণিকাটি যতই ভারী হবে তার শক্তিক্ষয়ের মাত্রা ততই কম হবে। এমন কি, এই শক্তিক্ষয়ের মাত্রা থেকেই বিজ্ঞানীরা কণিকাটির ভর নির্ণয় করতে পারেন। ইলেকট্রন হলো সর্বাপেক্ষা অল্প ভরবিশিষ্ট মৌলিক কণিকা, সুতরাং কোনও বস্তুর মধ্যে কিছুদূর প্রবেশ করলেই তার পরমাণুগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রনেরই সব চেয়ে বেশী শক্তিক্ষয় হবে। কিন্তু ইলেকট্রনের চেয়ে প্রোটন ১৮৪০ গুণ ভারী হওয়ায় সেই অনুপাতে প্রোটনের শক্তিক্ষয় অনেক কম হবে। ১৯৩৯ সালে প্রায় একই সঙ্গে তিন-চার জন বৈজ্ঞানিক এই শক্তিক্ষয়ের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখালেন যে, নভোরশ্মির মধ্যে এমন অনেক কণিকা আছে যাদের শক্তিক্ষয়ের মাত্রা ইলেকট্রনের চেয়ে কম হলেও প্রোটনের চেয়ে অনেক বেশী। নিখুঁতভাবে এই কণিকাগুলির ভরমাত্রা নির্ণয় করবার জন্যে মেঘ-প্রকোষ্ঠ নামক যন্ত্রে এই কণিকাগুলির পথচিহ্নের ছবি নেওয়া হতে লাগলো। মেঘ-প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে কোনও তড়িতাবিষ্ট কণিকা ছুটে গেলেই এক অদ্ভুত উপায়ে কণিকাটির পথচিহ্নের ছবি তুলে নেওয়া যায়। এরূপ মেঘ-প্রকোষ্ঠ যদি একটি বৃহদায়তন চুম্বকের মধ্যে স্থাপিত করা হয় তাহলে দেখা যায় যে, তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলি চুম্বকের আকর্ষণে বেঁকে যাচ্ছে এবং তার ফলে কণিকাটির পথচিহ্নও বাঁকা হয়ে উঠেছে। ১নং ছবিতে এরূপ একটি তড়িতাবিষ্ট কণিকার পথচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। উপর থেকে নীচে আসবার সময় কণিকাটির পথ বেঁকে গেছে। পরে কণিকাটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে। এই অ্যালুমিনিয়াম পাতটুকু ভেদ করে প্রভূত শক্তিক্ষয় হওয়ায় কণিকাটির পথচিহ্ন মোটা হয়ে গেছে। পথচিহ্ন কতটুকু বেঁকেছে তা থেকে কণিকাটির শক্তি নিখুঁতভাবে মাপ করা গেল, আর কণিকাটির শক্তিক্ষয়ের মাত্রাও নির্ভুলভাবে নির্ণীত হলো। সামান্য গণনার পর দেখা গেল, কণিকাটির ভর ২১৫টি ইলেকট্রনের সমান। এটাই যে ইউকাওয়ার অনুমান-করা মেসন-কণিকা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা সেই সময় একরকম নিশ্চিত হয়ে গেলেন। সবশেষে পথচিহ্নটি হঠাৎ একটি বিন্দুতে আবার সরু হয়ে গেছে (১নং চিত্র)। ঐ বিন্দুতেই মেসন-কণিকাটি ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ঐ সরু দাগটিই হলো মেসন-কণিকা থেকে নির্গত ইলেকট্রনের পথচিহ্ন। ইউকাওয়ার প্রথম ও তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষার দ্বারা সত্য প্রমাণিত হলো।

ইউকাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর এই জয়জয়কার কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হলো না। মেসন-কণিকার অস্তিত্ব পাওয়া গেল বটে, কিন্তু কেন্দ্রীনের ভিতর থেকেই যে তার জন্ম হচ্ছে তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেল কই? শুধু তাই নয়, নিউক্লিয়ন থেকেই যদি নভোরশ্মির এই মেসন-কণিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে যখনই এই মেসন-কণিকা কোনও নিউক্লিয়নের আকর্ষণের আওতায় প্রবেশ করবে তখনই তার সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ভূপৃষ্ঠে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে এই মেসনগুলিকে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে হয়েছে। অতএব এই মেসনগুলি জন্মের পর থেকে বায়ুর মধ্যে বহু নিউক্লিয়নের আকর্ষণী

শক্তির বেষ্টনী ভেদ করতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয়েছে। ইউকাওয়া যে মেসন-কণিকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন

কোটি অক্সিজেন-নাইট্রোজেন পরমাণুর-মধ্যে অবস্থিত নিউক্লিয়নগুলির আকর্ষণী শক্তির আওতায় প্রবিষ্ট

২নং চিত্র

ফটোপ্লেটে π-মেসনের μ-মেসন ও ইলেকট্রনে রূপান্তর

নভোরশ্মির ২১৫ ভরমাত্রাবিশিষ্ট এই মেসন-কণিকা যদি সেই মেসনই হতো তাহলে বায়ুমণ্ডলের কোটি

হয়ে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবার বহু পূর্বেই সেগুলির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল,

ভূপৃষ্ঠে আগত নভোরশ্মির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই এই ২১৫ ভরমাত্রাবিশিষ্ট মেসন-কণিকার সমষ্টি। সুতরাং ২১৫ ভরমাত্রাবিশিষ্ট এই মেসন যে ইউকাওয়ার অনুমিত মেসন সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মনে দ্বিধা উপস্থিত হলো।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু হতাশ হবার পাত্র নন। সমস্যা যতই দুরূহ হয় তাঁদের চেষ্টা ও ঐকান্তিকতা ততই বৃদ্ধি পায়। নভোরশ্মির এই মেসন নিয়ে অনেক গবেষণা চলতে লাগলো। ইংল্যাণ্ডের ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে সি. এফ পাওয়েল ফটোপ্লেটে নভোরশ্মির পথচিহ্ন পরীক্ষা করছিলেন। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, আলোক চিত্রের প্লেটে photographic emulsion-এর যে পাতলা আস্তরণ থাকে তার উপর দিয়ে কোনও তড়িতাবিষ্ট কণিকা গেলেই তার পথচিহ্নের ছাপ এর উপর অঙ্কিত হয়ে যায়। ফটো তোলবার কয়েকটি প্লেট বেলুনের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উর্ধ্বে পাঠিয়ে সেগুলির উপর তীব্রতর নভোরশ্মির ছাপ নিয়ে আসা হলো। তারপর সেগুলিকে ডেভেলপ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখতে পেলেন যে, ২১৫ ভরযুক্ত মেসন-কণিকা, যা পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ছাপ তো রয়েছেই অধিকন্তু আরও একপ্রকার কণিকার বহু পথচিহ্ন প্লেটের উপর পাওয়া যাচ্ছে—যাদের ভরমাত্রা প্রায় ৩০০টি ইলেকট্রনের সমান। এরপর পাওয়েল আরও আলোকচিত্রের প্লেট বায়ুমণ্ডলের বহু উর্ধ্বে পাঠিয়ে সেগুলিতে অনেক উচু স্তরের নভোরশ্মির ছাপ ধরে নিয়ে এসে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করে আরও গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করেন। দেখা গেল যে, ৩০০ ভরযুক্ত মেসন-কণিকাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ২১৫ ভরবিশিষ্ট মেসনে রূপান্তরিত হয়েছে। পাওয়েল নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে একেবারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, নভোরশ্মির মধ্যে দু-রকম মেসন-কণিকা বর্তমান রয়েছে এবং তাদের সঠিক ভরমাত্রা হলো ২৭৫ এবং ২১৫টি ইলেকট্রনের সমান। এই দু-রকমের মেসনের তিনি নাম দিলেন পাই-মেসন (π-meson) ও মিউ-মেসন (μ-meson)। পাই-মেসনের (ভর ২৭৫) যতগুলি পথচিহ্ন তিনি পেলেন তার প্রায় অর্ধেকগুলিতে মিউ-মেসনে (ভর ২১৫) রূপান্তরের চিহ্নও দেখা গেল।

আমরা পূর্বে মেঘ-প্রকোষ্ঠে যে মেসন আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেছি (যার ছবি ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে), তার ভরও ঠিক ২১৫টি ইলেকট্রনের সমান, অর্থাৎ প্রথমে যে মেসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেগুলি সবই মিউ-মেসন। পূর্বাবিষ্কৃত মিউ-মেসনই যে ইউকাওয়ার অনুমান-করা মেসন, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। সন্দেহের কারণ আগেই বলা হয়েছে। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ইউকাওয়ার অনুমিত মেসনের ভূপৃষ্ঠে এসে পৌছানোর সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। পাওয়েল ভূপৃষ্ঠেই কতকগুলি ফটোপ্লেটে নভোরশ্মির পথচিহ্ন ধরে দেখলেন যে, সেগুলিতে পাই-মেসনের ছাপ খুব কমই আছে, অথচ মিউ-মেসনের ছাপ প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে বহু পাই-মেসনের অস্তিত্ব পূর্বেই পাওয়া গেছে। নিঃসন্দেহ হয়ে পাওয়েল তখন ঘোষণা করলেন যে, পাই-মেসনগুলিই ইউকাওয়ার অনুমান করা মেসন কণিকা; পূর্বাবিষ্কৃত মিউ মেসন নয়। আর পাই-মেসন একবার কোনও নিউক্লিয়নের আকর্ষণী শক্তির আওতায় প্রবেশ করলেই তাথেকে এর আর বেরুবার পথ নেই, তৎক্ষণাৎ নিউক্লিয়নটির সঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এজন্যেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে যে পাই-মেসনগুলিকে দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলের কোটি কোটি নিউক্লিয়ন এড়িয়ে সেগুলি মাটিতে এসে পৌছুতে পারে না। ইউকাওয়ার অনুমিত মেসন সঠিকভাবে আবিষ্কারের জন্যে পাওয়েল ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পাই-মেসন আবিষ্কারের চেয়ে পাই-মেসনের মিউ-মেসনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

পাওয়া আরও চমকপ্রদ আবিষ্কার। ১নং চিত্রে মিউ-মেসনের ইলেক্‌ট্রনে রূপান্তরিত হওয়ার ছবি দেখানো হয়েছে। ২নং চিত্র পাওয়েলের নেওয়া একটি ছবি। এখানে পাই-মেসনটি প্রথমে মিউ-মেসনে এবং মিউ-মেসনটি কিছুদূর অগ্রসর হয়েই ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়েছে। ২নং চিত্রের মত যেখানে এসে থেমে যায় সেখানে একটি ছোট্ট "তারার" (Star) মত ছবির সৃষ্টি করে। ৩নং চিত্রে দেখা যায়—এরূপ একটি পাই-মেসন যেখানে এসে থেমেছে সেখানে একটি "তারা"র সৃষ্টি হয়েছে। পাই-মেসনের এই দু-রকম আচরণের কারণ হলো এই যে, এগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধেক ধনতড়িতাবিষ্ট
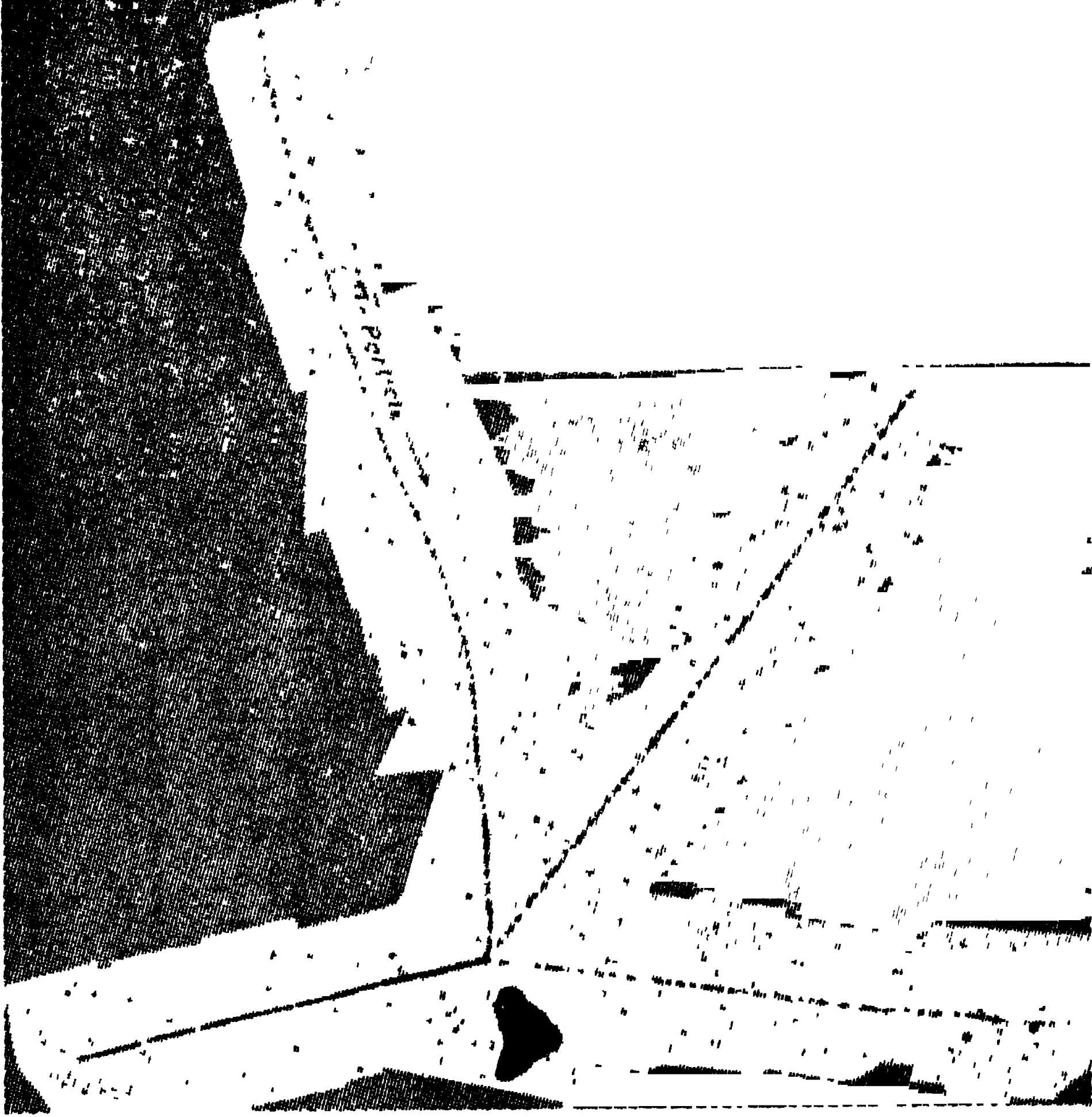
৩নং চিত্র

π-মেসন কর্তৃক কেন্দ্রীন বিদীর্ণ হওয়ার ফলে তড়িতাবিষ্ট তিনটি কণিকা তিন দিকে ধাবিত হয়েছে

বহু ছবি পাওয়েল পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, পাই-মেসনগুলি জন্মাবার পর মাত্র ২।৩ সেন্টি-মাইক্রো সেকেণ্ডের মধ্যেই মিউ-মেসনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু সব পাই-মেসনই মিউ-মেসনে রূপান্তরিত হয় না। অর্ধেক ক্ষেত্রে মিউ-মেসনে রূপান্তর দেখা যায়, বাকী অর্ধেক পাই-মেসন ও বাকী অর্ধেক ঋণতড়িতাবিষ্ট। এজন্যে এই দু-রকমের পাই-মেসনের নাম দেওয়া হলো, পাই-পজিটিভ (π^+) এবং পাই-নেগেটিভ (π^-)। পাই-পজিটিভ কণিকাগুলি সাধারণতঃ পরমাণুর কেন্দ্রীনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না; কারণ কেন্দ্রীনের ধনতড়িৎ π^+-কে প্রবলবেগে বিকর্ষিত

করে। এজন্তে π^+ কণিকাগুলি পরমাণুর ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ক্রমশঃ শক্তিক্ষয় করে অবশেষে স্থির হয়ে যায়; আর সেগুলি থেকে μ^+ কণিকা (পজিটিভ মিউ-মেসন) নির্গত হয়; অর্থাৎ π^+ মেসন μ^+ মেসনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু পাই-নেগেটিভ মেসনগুলি অতি সহজেই কেন্দ্রীনের ধনতড়িৎ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কেন্দ্রীনে প্রবেশ করবামাত্রই π^- মেসনটি নিউট্রন বা প্রোটনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তার সব শক্তি ঐ কেন্দ্রীনটিকে দেওয়ার ফলে কেন্দ্রীনটি তৎক্ষণাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ৩নং চিত্রে দেখা যায় একটি π^- মেসন একটি কেন্দ্রীনে প্রবেশ করে কেন্দ্রনটিকে তিন টুক্‌রা করে ভেঙ্গে ফেলেছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে—(১) কেন্দ্রীনে প্রবেশ করেই হোক কিংবা (২) মিউ-মেসনকে জন্ম দিয়েই হোক পাই-মেসনের বিনাশ ঘটবেই। কোনও নিউক্লিয়নের সংস্পর্শে এলেই যেমন পাই মেসন অদৃশ্য হয়ে যায়, সেরূপ দুটি নিউক্লিয়নের সংঘর্ষের ফলেই আবার পাই-মেসনের জন্ম হয়। নভোরশ্মির মধ্যে নিউ-ক্লিয়নের সংখ্যা প্রচুর। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে অন্য নিউক্লিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই নভোরশ্মির নিউক্লিয়নগুলি বহুসংখ্যক পাই-মেসন সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে জন্মগ্রহণ করে দু-তিন সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ডের মধ্যেই পূর্বোক্ত দুটি উপায়ে পাই-মেসনগুলি ইহলীলা সম্বরণ করে। π^+ কণা সাধারণতঃ μ^- কণিকার জন্ম দিয়ে এবং π^- কণিকা সাধারণতঃ নিউক্লিয়নের মধ্যে আকৃষ্ট হয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দু তিন সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ডের ভিতর কোনও নিউক্লিয়নের সংস্পর্শে না এলে π^- কণিকা μ^- কণিকার জন্ম দিয়ে থাকে। মিউ-মেসনগুলি আবার (μ^+ এবং μ^-) বেশীর ভাগ সময়েই পজিটিভ এবং নেগেটিভ ইলেকট্রনের জন্ম দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মিউ-মেসনগুলি কিন্তু পাই-মেসনের চেয়ে অনেক বেশী সময় স্থায়ী। মিউ-মেসনের পরমায়ু পাই-মেসনের প্রায় একশো গুণ বেশী; অর্থাৎ প্রায় ২.১ মাইক্রো সেকেণ্ড (এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগ)।

মেসন-কণিকার আবিষ্কার হয় নভোরশ্মির মধ্যে, যে রশ্মি বিজ্ঞানীদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে। গবেষণাগারেই যাতে মেসন-কণিকা সৃষ্টি করা যায় বৈজ্ঞানিকেরা সে চেষ্টাও সুরু করলেন। ১৯৪৮-এর শেষের দিকে আমেরিকার বারক্লে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বৃহৎ সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে পাই-মেসন সৃষ্টি করা সম্ভব হলো। গবেষণাগারে পাই-মেসন সৃষ্টি সম্ভব হওয়াতে বৈজ্ঞানিকদের এখন আর নভোরশ্মির পাই-মেসনের উপর নির্ভর করতে হয় না। কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন পাই-মেসন সম্বন্ধে অনুশীলন করে পাই-মেসনের আচরণ সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যের আবিষ্কাব সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে সর্বপ্রধান আবিষ্কার এই যে, তড়িতাবিষ্ট পাই-মেসন (π^+ এবং π^-) ছাড়াও নিস্তড়িৎ পাই-মেসনও এই যন্ত্রে উৎপন্ন হতে দেখা গেল। বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা নিস্তড়িৎ পাই-মেসনের ভরমাত্রা নির্ণয় করে দেখা গেল ২৬২টি ইলেকট্রনের সমান। এর নাম দেওয়া হলো π^0 পাই-নট মেসন। পাই-পজিটিভ এবং পাই-নেগেটিভ মাত্র দু-তিন সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ড বেঁচে থাকে আর পাই-নট মেসন কতক্ষণ বাঁচে, শুনলে অবাক হতে হবে। এক সেন্টিমাইক্রো সেকেণ্ডের এক কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়। সময়টা কল্পনা করে দেখুন।

পেট্রোল দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

পৃথিবীর অভ্যন্তরে পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয় অফুরন্ত নয়, একদিন না একদিন উহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবেই। সেদিনের ছবি কল্পনা করিলে দেখা যাইবে, পথে ঘাটে যানবাহনের গতি রুদ্ধ এবং আকাশমার্গে বিমানপোতের কর্ণবিদারী শব্দ দূরীভূত হইয়াছে। মোট কথা, বর্তমান সভ্যতার অনেকখানি সুখ-সুবিধা আমাদের আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া যাইবে। সেদিনের সেই শোচনীয় অবস্থার সহিত যাহাতে আমাদের পরিচয় না ঘটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা পেট্রোলিয়ামের স্থান অধিকার করিতে পারে এমন একটি পদার্থের সন্ধানে তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি বহুদিন হইতেই নিয়োজিত করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া যে সকল দেশে পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয় অত্যন্ত অল্প বা কিছুমাত্র নেই—যেমন ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী প্রভৃতি দেশ—সেই সকল দেশের বৈজ্ঞানিকেরা পেট্রোলিয়ামের অভাব দূরীকরণের জন্য বহু পূর্বেই নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কয়লা হইতে পেট্রোলের মত পদার্থ তৈয়ারী করিবার সম্ভাবনা এই সকল প্রচেষ্টার মূলে উৎসাহ যোগাইয়াছে। কয়লা হইতে পেট্রোলের সদৃশ পদার্থ তৈয়ারী করিবার যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

কয়লাজাত গ্যাস হইতে বেঞ্জোল উদ্ধার

ধাতুশিল্পে ব্যবহারের জন্য কোক উৎপাদন করিবার সময় কয়লাকে উচ্চ তাপে পাতন করিলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসের মধ্যে বহু প্রকার উদ্বায়ী পদার্থ থাকে। এই গ্যাসকে ঠাণ্ডা করিলে ঐ সকল উদ্বায়ী বস্তু তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং উহারা নানাবিধ সংশ্লেষিত রসায়ন শিল্পে রসদ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল তরল পদার্থের মধ্যে বেঞ্জোলও পাওয়া যায়। বিমানপোতের ইঞ্জিনে ব্যবহৃত জ্বালানী তৈলে এই বেঞ্জোল একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। শুধু মাত্র বেঞ্জোলই জ্বালানী হিসাবে পেট্রোলের স্থান অধিকার করিতে পারে। সেইজন্য যে সকল দেশে পেট্রোলের অভাব সেখানে কয়লা হইতে উদ্ভূত গ্যাসকে প্রাথমিক পরিশোধনের পর অ্যাক্টিভেটেড্ চারকোল বা স্ট্র অয়েলের সাহায্যে গ্যাস হইতে বেঞ্জোল শোষণ করিয়া লইবার পদ্ধতি প্রচলিত তালিকাভুক্ত কার্যের মধ্যে গণ্য করা হয়। ষ্টীম প্রবাহিত করিয়া অ্যাক্টিভেটেড্ চারকোল হইতে এবং পাতন করিয়া স্ট্র অয়েল হইতে শোষিত বেঞ্জোল উদ্ধার করা হয়। প্রতি টন কয়লা কোকে পরিণত করিবার সময় তিন গ্যালন বেঞ্জোল পাওয়া যায়।

নিম্ন তাপে কয়লার পাতন

যদিও এই পদ্ধতি অতি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি ইংল্যাণ্ডে ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের স্থান অধিকার করিয়াছে। ৬০০° সেন্টিগ্রেড বা তাহার কাছাকাছি তাপমাত্রায় কয়লাকে কোকে পরিণত করিলে প্রধানতঃ ধূম্রবিহীন কোক পাওয়া যায় এবং তাহার সহিত গ্যাসের মধ্যে নিহিত আলকাতরার মত এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। এই আলকাতরা সদৃশ পদার্থ পাতন করিয়া কয়লাজাত পেট্রোল পাওয়া যায়। এক টন কয়লা এইরূপ নিম্নতাপে পাতন করিলে প্রায় ১৫ গ্যালন পরিমাণ পেট্রোল পাওয়া যায়।

১৯৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল এয়ার ফোর্সে সর্ব প্রথম এই পেট্রোল সরবরাহ করা হয় এবং ১৯৩৪-এর শেষের দিকে বৃটেনের নিজস্ব এয়ার স্কোয়াড্রনকে সম্পূর্ণরূপে এই পেট্রোলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

হাইড্রোজেন সংযোগে কয়লা তরলীকরণ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে ডাঃ বার্জিয়াস সর্বপ্রথম কয়লাকে হাইড্রোজেন সংযুক্ত করিবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া সেখানে মোটর স্পিরিটের চাহিদা বহুল পরিমাণে দূর করেন।

চূর্ণীকৃত কয়লা ভারী তৈলের সহিত আঠালো-ভাবে মিশাইয়া ও উচ্চ চাপে হাইড্রোজেন গ্যাস অনুঘটকের সান্নিধ্যে উহার মধ্যে প্রবাহিত করিলে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের এক মিশ্রণ পাওয়া যায়। ঐ মিশ্রণ হইতে গ্যাসীয় পদার্থ পৃথক করিয়া প্রাপ্ত তরল পদার্থকে চাপের সাহায্যে পাতন করিলে পেট্রোল পাওয়া যায় এবং তাহার সহিত কিছু মধ্যম ও ভারী তৈলও আসে। উহাদিগকে পেট্রোল হইতে পৃথক করিবার পর পুনরায় হাইড্রোজেন ঘটিত করিলে পেট্রোলের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। অবশিষ্ট ভারী তেল কয়লা-চূর্ণকে আঠালো পদার্থে পরিণত করিতে ব্যবহার করা হয়।

এক টন পেট্রোল পাইতে হইলে প্রায় সাড়ে তিন টন কয়লার প্রয়োজন।

ফিসার-ট্রোপোস পদ্ধতি

১৯৩৬ সাল হইতে এই পদ্ধতি জার্মেনীতে প্রচলিত আছে। ১৯৪০ সালে প্রায় এক লক্ষ গ্যালন পেট্রোল এই পদ্ধতিতে পাওয়া গিয়াছিল।

ওয়াটার গ্যাস (যাহা কার্বন মনক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ) এই পদ্ধতির মূল রসদ। উচ্চ তাপমাত্রায় দীপ্তিমান কোকের উপর ষ্টীম প্রবাহিত করিলে ওয়াটার গ্যাস পাওয়া যায়। উপযুক্ত পরিশোধনের পর ওয়াটার গ্যাসকে অনুঘটকের সান্নিধ্যে প্রবাহিত করিলে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের এক সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। উহাকে বাজিয়াসের পদ্ধতি অনুযায়ী তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে পৃথক করিয়া তরল পদার্থটিকে পাতন করিলে পেট্রোল পাওয়া যায়।

জার্মেনীর বাজারে এই পেট্রোল সিন্থিন, কোসাজিন, সিন্থোল ইত্যাদি নামে প্রচলিত।

আমাদের দেশে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই পদ্ধতিতে কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ারীর প্রচেষ্টা চলিতেছে।

পাওয়ার অ্যালকোহল

এ পর্যন্ত যে সকল পদ্ধতির বর্ণনা করা হইল তাহার প্রত্যেকটিই বেশ চমৎকার বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইজন্য যে, পেট্রোলের কাজ কয়লা হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু কয়লার সঞ্চয়ও অফুরন্ত নয়, উহাও একদিন নিঃশেষিত হইবেই। এইসব বিষয় চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিকরা এমন পদার্থের সন্ধানে আছেন যাহা পেট্রোলের স্থান সহজেই অধিকার করিতে পারে এবং যাহার সরবরাহ চিরকাল ধরিয়া মানুষের আয়ত্বে থাকিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অ্যালকোহলের ব্যবহার প্রস্তাবিত হইয়াছে। পেট্রোলের বহু দেশে পেট্রোলের সঙ্গে অ্যাল্কোহল ব্যবহার করিতে হইবে—এইরূপ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কেবলমাত্র অ্যালকোহল ব্যবহার করিয়াও মোটর চালনা করা সম্ভব; কিন্তু সেইরূপ ইঞ্জিনে একটু বিশেষ ধরণের কারবুরেটর দরকার হইয়া থাকে। অ্যালকোহলের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ অন্য কোন পদার্থ, যেমন অ্যাসিটোন, ইথার ইত্যাদি মিশাইয়া ব্যবহার করিলে সচরাচর ব্যবহৃত সাধারণ কারবুরেটরেই কাজ চলিয়া যায়। এইরূপ ভাবে অ্যালকোহলের দ্বারা গতি-শক্তি উৎপাদন করা হয় বলিয়া ইহাকে পাওয়ার অ্যালকোহল বলা হয়। বস্তুতঃ কিউবাতে অ্যালকোহলের সহিত শতকরা ৩৩ ভাগ ইথার মিশাইয়া মোটরের জ্বালানী তৈলরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই

জ্বালানী তৈল সেখানে অ্যালকোলেটার নামে পরিচিত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, যেমন ভারতবর্ষে এইপ্রকার জ্বালানী তৈলের বিশেষ একটি অর্থ আছে। এখানে চিনি ব্যবসায়ীদের নিকট উপজাত হিসাবে ঝোলা বা চিটা গুড় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই চিটা গুড় গাঁজাইয়া চোলাই করিলে অ্যালকোহল পাওয়া যায়। ইহাতে শুধু যে দেশের পেট্রোল সমস্যার সমাধান হইবে তাহাই নহে; চিনি ব্যবসায়ীদেরও ইহাতে উন্নতি হইবে। উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে চিটা গুড় তাহাদের নিকট এক বিরাট সমস্যায় পরিণত হয়। সুতরাং চিটা গুড় হইতে অ্যালকোহল তৈয়ারী করিয়া নূতন ব্যবহার দেখা দিলে শর্করা শিল্পের বনিয়াদও শক্ত হইবে এবং উহা বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে পেট্রোল উৎপাদন

জাতীয় সরকারের অধীনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চীন দেশে পেট্রোলের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাহারা তখন নিজেদের অভাব দূর করিবার জন্য টুং তৈলকে পেট্রোলের মত পদার্থে পরিণত করিবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। অত্যধিক চাপে ও তাপে অনুঘটকের সান্নিধ্যে তৈলকে 'ক্র্যাক্' করিলে পেট্রোলের মত তৈল পাওয়া যায়। তাহারা এই প্রক্রিয়াটিকে বিরাট আকারে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ইহাতে তাহাদের দেশের পেট্রোলের চাহিদা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়।

ভারতে তৈলবীজের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। যদি অখাদ্য তৈলকে পেট্রোলের মত পদার্থে পরিণত করা সম্ভব হয় তবে আমাদের দেশের অয়েল মিলিং শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং আমাদের পেট্রোল সমস্যাও দূরীভূত হয়।

কিরূপে তৈলকে পেট্রোলে রূপান্তরিত করা যায় তাহার বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাঃ জে. কে. চৌধুরী ও বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এম এস. গোস্বামী ও তাঁহাদের সহযোগীরা অতীতে কিছু প্রাথমিক গবেষণা করিয়াছিলেন। যাহাতে এই গবেষণা পুনরায় চলিতে পারে সে বিষয়ে দেশের বৈজ্ঞানিক ও সরকারের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

যদি এই পদ্ধতির রহস্য উদ্ঘাটিত হয় ও উহা কৃতকার্য হয় তবে এইরূপ সুবিধাগুলি পাওয়া যাইতে পারে—

যেহেতু তৈলবীজ বৎসরে বৎসরে চাষ করিয়া উৎপাদন করা সম্ভব, ইহার সরবরাহ কোনদিনই নিঃশেষিত হইবে না। ইহা খুবই সস্তা হইবে এবং প্রাকৃতিক পেট্রোল নিঃশেষিত হইয়া গেলেও এই পদ্ধতিতে তৈয়ারী পেট্রোলের সরবরাহ অফুরন্ত হইবে।

মনোবিদের চোখে শিশুদের আঁকা ছবি

শ্রীতপোধন গঙ্গোপাধ্যায়

শিশুরা কাজ করে আপন মনে। বাস্তব জগতের মলিনতা সহজে তাদের আনন্দময় জীবনকে বিষময় করতে পারে না। শিশুরা তাই আনন্দে নাচে, গায়, ছবি আঁকে। হিজিবিজি রেখার মধ্য দিয়েই তারা প্রকাশ করে নিজেদের মনোভাব। ছোটদের অনিপুণ হাতের আঁকা ছবি দেখে আমরা হাসি, অবজ্ঞা করি। কিন্তু শিশুর কাছে তার এই সৃষ্টি মূল্যহীন নয়; কারণ এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার জীবনের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার ইতিহাস। শিশু-মনোবিদ্‌দের কাছে ছোটদের আঁকা ছবির একটা বিশেষ অর্থ আছে। ভাষা যেমন মনোভাব প্রকাশ করে, শিশুর আঁকা ছবিও তেমনি তার শিল্পী মনোভাব প্রকাশে সক্ষম। শিশুদের ছবি-আঁকার মুখ্য উদ্দেশ্য—আলোকচিত্রের মত নিখুঁত, সুন্দর চিত্র সৃষ্টি নয়; শিশুশিল্পীর মনোভাব প্রকাশই এর প্রধান লক্ষ্য। ভাষার মত ছবিও ভাবের প্রতীক। তাই বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে শিশুদের আঁকা ছবি বিশ্লেষণ করে শিল্পীর মানসিক গঠনের একটা আভাস পাওয়া খুব কঠিন নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। শিশুদের আঁকা ছবি পরীক্ষা করে স্রষ্টাদের মানসিক গঠন, মানসিক গুণাগুণের পরিমাপ করা অভিজ্ঞ শিশুমনোবিদ্‌দের পক্ষে যেমন সম্ভব তেমনই শিশুদের বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, ধারণাশক্তি, অনুরাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট অভিমত প্রদান করাও অসম্ভব নয়। বয়সের সঙ্গে ধারণা-শক্তির একটা সম্পর্ক আছে। সুতরাং বয়স কম-বেশীর জন্যে শিশুদের আঁকা ছবির বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। বয়স এবং অঙ্কন শক্তি বিকাশের সম্পর্ক নির্ণয় বিষয়ে Kerschensteiner-এর গবেষণা বিশেষ মূল্যবান। তাঁর মতে অঙ্কন-শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ তিনটি পর্যায়ে সমাপ্ত হয়। যথা—

নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে আঁকা ছবি

যেমন ধরুন, তিন-চার বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা গরু, বেড়াল, কুকুর প্রভৃতির ছবি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গরুর শিং, লেজ অথবা পাগুলি হয়তো ঠিকই আছে, কিন্তু কোন বস্তু থাকলেই যে একটা পরিবেশ থাকবে—তখনও নবীন শিল্পীর এ ধারণা জন্মায় নি; অর্থাৎ বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুর অবস্থান উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তখনও হয় নি। এ পর্যায়ে শিশুদের আঁকা ছবির একটা প্রধান বিশেষত্বই হলো এই যে, শিল্পী তার কল্পনাপ্রসূত ভাবকেই রেখায় রূপ দিতে চেষ্টা করে। বাস্তবের প্রতি তার দৃষ্টি থাকে খুবই কম। Verworn এরূপ পর্যায়কে বলেছেন—Ideoplastic Stage in Drawing.

বাস্তবতাপ্রবণ শিশুদের আঁকা ছবি

একই বস্তু বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে যে একইরকম দেখায় না—এ বোধ ধীরে ধীরে শিশুর মধ্যে জাগে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্পী-দের কয়েকটি আঁকা ছবি দেখলেই বেশ বুঝা যায় যে, ক্ষুদে শিল্পীরা এখন কল্পনা-রাজ্য ছেড়ে বাস্তব-রাজ্যে এসে হাজির হয়েছে। এক পাশ থেকে দেখা গরুর যে একটা চোখই আঁকতে হবে, দুটা নয়—এ জ্ঞান এখন তাদের হয়েছে। তাছাড়া ছবির একটা অংশের সঙ্গে অপর অংশের সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষমতাও কিছুটা দেখা যায়। Ver-

worn এই দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম দিয়েছেন—Physioplastic Stage.

প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা ছবি

আট-নয় বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির মধ্যে বাস্তবতা এবং পরিপূর্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। এই তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষত্বই হলো প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুর উপলব্ধি ও প্রকাশ। এ বয়সের শিশুদের আঁকা ছবিতে আকাশ, গোলাকার সূর্য, সবুজ মাঠ, গাছপালা, এমন কি দু-এক খণ্ড মেঘের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায়। এক কথায়, পরিবেশের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সমন্বয়ই এই পর্যায়ের বিশেষত্ব।

উপরোক্ত তিনটি পর্যায়ে শিশুদের অঙ্কন-শক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ হয়। তাছাড়া বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও যে বাড়ে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

এখন দেখা যাক আঁকা ছবি থেকে কেমন করে বিশেষজ্ঞেরা শিশুদের মানসিক বিকাশ পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। নির্দিষ্ট বয়সের শিশু এক বিশেষ ধরনের ছবি আঁকতে পারে, এই সত্যের উপর ভিত্তি করে একদল বৈজ্ঞানিক মানসিক বিকাশ পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে তিন থেকে চৌদ্দ বছরের শিশুদের আঁকা ছবি স্রষ্টার বয়সের অনুপাতে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন চার বছরের শিশুদের আঁকা ছবিগুলি বিশ্লেষণ করলে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাবে। আবার পাঁচ বছরের বেলায় আর একটি বিশেষত্ব দেখা যাবে। এমনি করে প্রত্যেক বয়সের শিশুদের আঁকা ছবির বৈশিষ্ট্য দেখে তাদের মানসিক বিকাশের পরিমাপ সম্ভব। অবশ্য সকল বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে একমত নন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এরূপ মানসিক পরিমাপ রীতির পরিপন্থী। Partridge বিভিন্ন বয়সের ইংরেজ শিশুদের আঁকা মানুষের ছবি বিশ্লেষণ করে বয়সের সঙ্গে অঙ্কন-নিপুণতার একটা সম্পর্ক দেখতে পান। তাঁর মতে শিশুদের আঁকা মানুষের ছবিকে কেন্দ্র করে মানসিক বিকাশ পরিমাপের একটা রীতি প্রচলিত হতে পারে। মাত্র অল্পদিন হলো Goodenough পাচ হাজারেরও বেশী শিশুদের আঁকা ছবি পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে অঙ্কন-নিপুণতার সঙ্গে বুদ্ধিবিকাশের একটা সম্পর্ক নির্ণয় করেন। এ ছাড়া শিশুদের আঁকা ছবি থেকে মনোবিকাশ পরিমাপের এক বিশেষ পদ্ধতির প্রচলন সর্বপ্রথম তিনিই করেন। শিশুদের আঁকা ছবি থেকে মনোবিকাশ পরিমাপের চেষ্টা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ভারতবর্ষেও এ নিয়ে গবেষণা সুরু হয়েছে।

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অঙ্কন-নিপুণতার যেমন একটা সম্পর্ক আছে ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গেও একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য একটু বেশী বয়সের, অর্থাৎ দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়েদের বেলায় এটা সত্য নয়। কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মন থেকে ছবি আঁকার স্পৃহা সাধারণতঃ নয় বছরের পর আর থাকে না। তবে বিশেষ কয়েকজনের ক্ষেত্রে অঙ্কন একটি মানসিক গুণরূপে বর্তমান থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন-নিপুণতাও উন্নতিলাভ করে।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদে শিশুদের আঁকা ছবির প্রকাশ ভঙ্গীর প্রভেদের কথা প্রায় সকল মনোবিদই স্বীকার করেন। তবে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অথবা মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এ বিষয়ে বেশী পারদর্শী, সেকথা বলা কঠিন। ছেলেদের আঁকা মানুষের ছবির কতকগুলি বিশেষত্ব থাকে; যেমন—মাথা ছোট, হাত-পা লম্বা লম্বা এবং সেগুলিও আবার এমন ভঙ্গীতে আঁকা, যা দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, মানুষটি কিছু না কিছু করছে; অর্থাৎ কর্মরত

প্রকাশভঙ্গীতে ছবি আঁকতে ছেলেরা ভালবাসে। মেয়েদের বেলায় কিন্তু অন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তারা সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয় মুখমণ্ডলের উপর। চোখ, নাক, দাঁত, চুল ইত্যাদি ছাড়াও কানের দুল গলায় হার প্রভৃতি মেয়েদের আঁকা ছবির বিশেষত্ব। মেয়েদের আঁকা মানুষের ছবিগুলিতে প্রায়ই দেহের তুলনায় হাত-পায়ের অনুপাতের অভাব দেখা যায়। মুখটি বড় এবং হাত-পাগুলি ছোট করে আঁকা মেয়েদের ছবিতে খুবই দেখা যায়। একথাটা ঠিক যে, মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আঁকা ছবিতে বিভিন্ন অংশের আনুপাতিক সমতা বেশী চোখে পরে। রঙের দিক থেকেও দেখা যায়, ছেলেরা সাধারণতঃ উজ্জ্বল বর্ণই বেশী ব্যবহার করে, আর মেয়েরা হাল্‌কা বা ফিকে রঙের পক্ষপাতী। সূক্ষ্ম কারুকার্যের দিকে মেয়েদের নজর থাকে খুবই বেশী এবং এ বিষয়ে তারা ছেলেদের চেয়ে পারদর্শী।

ছোটদের আঁকা ছবি কেবলমাত্র মনোবিকাশেরই নয়, অনেক সময় মনোবিকারেরও প্রকাশক। মানসিক বিকারগ্রস্ত শিশুদের আঁকা ছবির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা থেকে মনোবিদেরা এগুলিকে সাধারণ শিশুদের আঁকা ছবি থেকে পৃথক করতে পারেন। অভিজ্ঞ মনোবিদ, বিকারগ্রস্ত শিশুর আঁকা দেখে রোগ নির্ণয় করেছেন এমন কথাও শোনা গেছে। মনোবিদের চোখে শিশুর আঁকা ছবি—শিল্পীর বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, ভাবপ্রবণতা, ধারণা ও কল্পনা শক্তি, অনুভূতি—এক কথায় মানসিক গঠনের পূর্ণপ্রকাশ। সুতরাং ছোটদের আঁকা ছবি সাধারণের কাছে মূল্যহীন হিজিবিজি রেখার টান বলে মনে হলেও বিশেষজ্ঞের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

"জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত আলোকিত প্রদেশ অপেক্ষা জ্ঞানের পরিধির বাহিরে অন্ধকারময় দেশের প্রসার চিরদিনই অধিক থাকিবে। অতএব এই ব্যাপার প্রাকৃত নিয়মের বহির্ভূত, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দ্দেশ করিতে কাহারও সাহসে কখন কুলাইবে বোধ হয় না। এটা প্রাকৃত, ওটা অতিপ্রাকৃত, এরূপ নির্দ্দেশ কখনই চলিবে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, যাহা আপাততঃ অসাধারণ, অপরিচিত ও নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কালক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে তাহা সাধারণ পরিচিত ও নিয়মানুযায়ী স্বরূপে প্রকাশিত হইবে। আমাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে এখন মনে হইতে পারে, প্রকৃতির নিয়ম এইখানে ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হইলে দেখা যাইবে, প্রকৃতির নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। নিয়ম এই ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, ঐ ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, তাহা লইয়া তর্ক করিতে ইচ্ছা হয় কর; কিন্তু তাহার মিমাংসায় উপনীত হইবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই পর্য্যন্ত আশা করেন যে, কালে প্রতিপন্ন হইবে, প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গে না। অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই, মিরাকলের স্থান নাই, প্রকৃতিতে খেয়াল নাই, নিয়ম আছে। প্রকৃতির চপলতা নাই—ইহা একটা সত্য।"

—রামেন্দ্রসুন্দর

কয়লা

শ্রীননীগোপাল পাল

বর্তমানে ভারতের খরস্রোতা নদীগুলিকে মানবের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করিবার জন্য সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। নদীগুলির উদ্দাম গতিপথের মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়া তার প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। কয়েকটি ইতিমধ্যেই কার্যকরী হইয়াছে। সবগুলি কার্যকরী হইলে অদূর ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য কাঁচা কয়লার চাহিদা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে সত্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইবে এবং তাহার জন্য লৌহের চাহিদাও বাড়িয়া যাইবে। এই ক্রমবর্ধমান লৌহের চাহিদা মিটাইতে এবং ভারতের লৌহ আকরিকগুলিকে পুরাপুরি কাজে লাগাইতে উৎকৃষ্ট কোকের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। কাঁচা কয়লাকে কোকে পরিণত করিবার সময় উহার উপজাত দ্রব্য হিসাবে বহু মূল্যবান রাসায়নিক সামগ্রী, বহু প্রকার তৈল ও রঞ্জন দ্রব্য, জমির সার অ্যামোনিয়াম সালফেট, এমন কি বর্তমান যুগবিপ্লবকারী রেয়ন প্রস্তুতের উপকরণও পাওয়া যায়। কাঁচা মাল হিসাবে কয়লার গুরুত্ব ভবিষ্যতে বাড়িবে বৈ কমিবে না।

কয়লা দহন করিলে উহা হইতে যে তেজ বিকিরিত হয় তাহার উৎস আসলে আমাদের সূর্য। পত্রের সবুজ কণিকা সূর্যালোক হইতে শক্তি শোষণ করিয়া বাতাস হইতে গৃহীত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং শিকড় দ্বারা গৃহীত জল এবং যৌগ নাইট্রোজেনকে মূলতঃ সেলুলোজ ($C_{12}H_{20}O_{10}$) এবং অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত করে। উদ্ভিদ অক্সিজেন গ্যাসকে পুনরায় বাতাসে ফিরাইয়া দেয়। সেলুলোজ (যাহার উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন) কাষ্ঠরূপে জমা হয় কাণ্ডে। এমনি করিয়া দিনের পর দিন সূর্যশক্তি পুঞ্জীভূত হয় উদ্ভিদের মধ্যে। কিন্তু উদ্ভিদের মৃত্যুর পর সঞ্চিত কার্বন, হাইড্রোজেন এবং কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন পচনক্রিয়ার ফলে বাতাসে ফিরিয়া যায়। খোলা বাতাসে পড়িয়া থাকিলে বাতাস হইতে অক্সিজেন লইয়া কার্বন এবং হাইড্রোজেনের খুব ধীরে দহন ক্রিয়া চলিতে থাকে—অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু খানা, ডোবা বা মাটির মধ্যে গাছপালা পড়িয়া থাকিলে বাতাস সরবরাহ কম পড়ে; ফলে পচনক্রিয়াও কম হয়। মাটির উত্তাপে খুব ধীরে ধীরে উহার মধ্যে মার্স, মিথেন প্রভৃতি দাহ্য গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কালে উহাই মাটির নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিয়া মাটির চাপে ও তাপে হাজার হাজার বৎসর পরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। কলিকাতার পূর্বাঞ্চলে ৩০/৪০ ফুট নিম্নে যে কয়লা পাওয়া যায় উহাতে সুঁদরী ও গরাণ কাঠের ব্রাউন রং এবং গাছের জীবাশ্ম এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

সরাসরি খনি হইতে যে কয়লা পাওয়া যায় তাহাকে কাঁচা কয়লা বলা হয়। বিভিন্ন খনি হইতে প্রাপ্ত কয়লার প্রকৃতিও বিভিন্ন। গাছের জাতি, মাটির স্তর, চাপ, তাপ এবং সময়ের উপর উহার গুণাগুণ বহুলাংশে নির্ভর করে। কয়লা অল্প কালের হইলে উহাতে জল এবং উদ্বায়ী বস্তুর প্রাচুর্য ঘটে। কিন্তু যত পুরাতন হইবে ততই উহার জলীয় এবং উদ্বায়ী বস্তুর পরিমাণ কম পড়িবে এবং কার্বনের পরিমাণ বাড়িবে। কার্বনের অংশ বেশী থাকিলে দহনের সময় প্রচুর

উত্তাপ দেয়। কিন্তু উহার মধ্যে যে উদ্বায়ী বস্তু থাকে তাহাতে সহজে জলিবার সাহায্য করে। কয়লাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১। পীট—ইহা উদ্ভিজ্জ পদার্থের কয়লায় রূপান্তরের প্রথম অবস্থা। আমাদের দেশে পুকুর বা কূপ খননের সময় কোথাও কোথাও কালো, ফোঁপরা বোদ মাটি পাওয়া যায়। উহা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন পীট কয়লা। উহাতে ৭০।৮০ ভাগ জল থাকে। উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া পাতন ক্রিয়ার দ্বারা উহা হইতে জ্বালানী গ্যাস এবং মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ বাহির করা যায়।

২। লিগ্‌নাইট—ইহা কয়লার দ্বিতীয় অবস্থা। পাঞ্জাব, বিকানীর এবং আসামের কয়েক জায়গায় ব্রাউন রঙের যে কয়লা পাওয়া যায় তাহা লিগ্‌নাইট জাতীয়। এই কয়লা বড় ভঙ্গুর। সেইজন্য এই কয়লাকে সরাসরি খনি হইতে চালান দিতে বড় অসুবিধা হয়। ইহাতে জলীয় অংশ থাকে শতকরা ৪০ ভাগ। আর উদ্বায়ী পদার্থ থাকে প্রচুর পরিমাণে। তাহা সহজে জলে এবং প্রচুর ধোঁয়া উৎপন্ন করে। নিকৃষ্ট জাতীয় কয়লা কোল গ্যাস ও আলকাতরা তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। উৎকৃষ্ট জাতীয় কয়লা কলকারখানা ও রেলওয়ে ইঞ্জিন চালাইবার কাজে লাগে। উহা পোড়াইয়া রন্ধন কার্যেও ব্যবহৃত হয়।

৩। বিটুমিনাস—ইহা কয়লার তৃতীয় অবস্থা। এই জাতীয় কয়লা ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বাংলায় রাণীগঞ্জে, বিহারে ঝরিয়া, গিরিডি এবং বোখারো প্রভৃতি খনিতে যে কয়লা পাওয়া যায় তাহা বিটুমিনাস জাতীয়। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং আসামের কোন কোন অঞ্চলে এই জাতীয় কয়লা পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষাকৃত কম ভঙ্গুর। সহজে জলে ও হরিদ্রাভ ধোঁয়া উৎপন্ন করে। ইহাতে শতকরা ৪।৫ ভাগ জল থাকে। উদ্বায়ী পদার্থ থাকে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ, আর কার্বন থাকে শতকরা ৫০।৬০ ভাগ। বিটুমিনাস কয়লাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

৩ (ক)। কেকিং—এই জাতীয় কয়লায় হাইড্রোজেনের অংশ প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই উহা জ্বালাইলে খুব বেশী উত্তাপ দেয়; ফলে সমস্ত কয়লাটা গলিয়া জমাট বাধিয়া যায়। উহার অনেকখানি কার্বন না জলিয়াই জমাট তালের মধ্যে থাকিয়া যায়। এই জাতীয় কয়লা জ্বালাইতে হইলে প্রচুর গতিশীল বাতাসের প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় কয়লা বয়লারে ব্যবহার করা যায়।

৩ (খ)। নন্ কেকিং—ইহাতে হাইড্রোজেনের অংশ অপেক্ষাকৃত কম। তাই জলিবার সময় জমাট হইয়া তাল বাঁধিয়া যায় না। ষ্টিম উৎপাদনের জন্য ইহা বয়লারে ব্যবহার করিবার খুব সুবিধা। তাই ইহাকে ষ্টিম কোল বলে। ইহাতে ছাইও অপেক্ষাকৃত কম হয়।

৪। এন্‌থ্রাসাইট—ইহা কয়লার চতুর্থ বা শেষ অবস্থা। ইহা খুব শক্ত ও কালো। ইহাতে উদ্বায়ী পদার্থ কম থাকে এবং শতকরা ৯০ ভাগ কার্বন থাকে। তাই প্রথমে জ্বালাইতে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু একবার জলিলে প্রচুর উত্তাপ দেয়। জলিবার সময় ফাটিয়া ফাটিয়া যায়। ধোঁয়া এক রকম হয় না বলিলেই চলে। ষ্টিম উৎপাদনের জন্য এই কয়লা বয়লারে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ভারতে এই জাতীয় কয়লা বেশী পাওয়া যায় না। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে এই কয়লা যথেষ্ট পাওয়া যায়।

নিম্নোক্ত তালিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার উপাদান এবং উত্তাপের পরিমাণ দেওয়া হইল।

কয়লার শ্রেণী	কার্বন	হাইড্রোজেন	নাইট্রোজেন	অক্সিজেন	গন্ধক	ছাই	১ পাঃ কয়লায় উত্তাপের পরিমাণ। ব্রিঃ থাঃ ইঃ
পীট	৫৪·৫	৬·০	২·০	৩৩·০	০·৫	৪ ০	৯,০০০
লিগনাইট	৭০·০	৫·০	১·০	২০·০	—	৪·০	১৩,০০০
বিটুমিনাস							
কেকিং	৮০·০	৫ ৫	১·৫	৭·০	১·০	৪·৭	১৪,৩০০
নন্ কেকিং	৮৪·০	৪·০	১·৫	৫·০	·৫	৪ ৬	১৪,৫০০
এনথ্রাসাইট	৮৮·০	৪·২	১·০	৩·০	০·৮	৬ ০	১৫,০০০

এক পাউণ্ড জল সাধারণ বায়বীয় চাপে ১° ডিগ্রি ফারেনহাইট গরম করিতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে ব্রিটিশ থারম্যাল ইউনিট (ব্রিঃ থাঃ ইঃ) বলা হয়। এখানে বলিয়া রাখা অবান্তর হইবে না যে, কয়লা পোড়াইলে যে উত্তাপ পাওয়া যায় তাহা কার্বন এবং হাইড্রোজেনের দহনক্রিয়ার ফলেই সৃষ্টি হয়। গন্ধক দহন করিলেও কিছু উত্তাপ হয় বটে, কিন্তু গন্ধক লোহার শত্রু। তাই বেশী গন্ধক যুক্ত কয়লা লোহা গালাইবার কাজে অথবা বয়লারে ব্যবহার করা চলে না।

কয়লা উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে নবম স্থান অধিকার করিয়া আছে। Geological Survey of India-র তথ্য অনুসারে ভারতের গর্ভে ৬০০০ কোটি টন কয়লা আছে। ইহার মধ্যে মাত্র ২,০০০ কোটি টন কয়লা খনি হইতে উত্তোলন করিবার যোগ্য। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ২৩০ লক্ষ টন কয়লা খরচ হয়। ইহার একটা মোটা অংশ—প্রায় ৭৫ লক্ষ টন (শতকরা ৩২ ভাগ) রেল কোম্পানী ব্যবহার করে। প্রায় ৩০ লক্ষ টন ধাতু গালাইবার কাজে লাগে। ২০ লক্ষ টন কয়লা গৃহে রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়। বাকী অংশটুকু বিদ্যুৎ তৈয়ারীর কলকারখানা এবং জাহাজ চালাইবার কাজে লাগে।

ভারতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই আকরিক শোধন এবং লোহা গালাইবার জন্য হার্ড কোকের প্রয়োজন। হার্ড কোক প্রস্তুত হয় বিটুমিনাস এবং উৎকৃষ্ট লিগ্নাইট কয়লা হইতে। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন কাঁচা কয়লা হইতে হার্ড কোক প্রস্তুত হয়। স্বাধীন ভারতে নানাপ্রকার শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোহার চাহিদা যথেষ্ট বাড়িয়া চলিয়াছে। লোহার এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে বিটু-মিনাস প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কয়লা রক্ষার প্রয়োজন হয় সর্বাগ্রে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ভারতে মোট উত্তোলিত কয়লার উৎকৃষ্ট অংশের অধিকাংশই কাঁচা অবস্থায় রেল-ইঞ্জিন এবং কলকারখানা চালাইবার কাজে লাগান হয়। এই সব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত খারাপ কয়লা সহজেই ব্যবহার করা চলে। পাতনক্রিয়ার দ্বারা কাঁচা কয়লাকে কোক করিবার প্রথা প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। আবদ্ধ পাত্রে কাঁচা কয়লাকে উত্তপ্ত করিয়া উহার উদ্বায়ী বস্তুসমূহ আলাদা করিয়া লওয়া হয় এবং ঐ আবদ্ধ পাত্রের মধ্যেই উত্তপ্ত কয়লা ঠাণ্ডা করিয়া কোক তৈয়ারী হয়। কোক কয়লা বহু ছিদ্রযুক্ত এবং হাল্কা। জ্বলিবার সময় সমস্ত কার্বনটুকু ভাল ভাবে জ্বলিতে পারে। তাই প্রচুর উত্তাপও দেয়। ইহাতে লোহার ক্ষতিকারক কোন উপাদান না থাকায় লোহা গালান এবং শোধনের কাজে ব্যবহার করা হয়। ১৯২০ সালে প্রথমে

"এমা কোক ওভেন" তৈয়ারী হয়। ১৯১৭ সালে প্রতিদিন এই ওভেনে ৩,৫০০ টন কয়লাকে কোক করা হইত।

বিটুমিনাস এবং উৎকৃষ্ট লিগ্নাইট জাতীয় কয়লাকে উচ্চ তাপে (১০০০°/১২০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) কোক করা হয়। ইহাকে "উচ্চ তাপে কোক-করণ" বলা হয়। এই প্রথায় শক্ত ও ডেলা আকারের কোক পাওয়া যায়। এই জন্য ইহাকে হার্ড কোক বলে। ইহা কাঁচা কয়লার ওজনের শতকরা ৭৫ ভাগ। উদ্বায়ী অংশ ঠাণ্ডা করিয়া ঘনীভূত করিলে উহা হইতে আলকাতরা এবং গ্যাস লিকার পাওয়া যায়। উহা হইতে পুনরায় তির্যকপাতনের সাহায্যে উপজাত দ্রব্য হিসাবে বহু মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়। কোক-করণের সময় যথেষ্ট কোল গ্যাসও পাওয়া যায়। উহা সহরের রাস্তা আলোকিত করে এবং গবেষণা মন্দিরেও কাজে লাগে। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া এবং গিরিডিতে যে কয়লা পাওয়া যায় তাহা উচ্চ তাপে কোক করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভারতের বিভিন্নস্থানে যেসব নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায় সেগুলিকে উচ্চ তাপে কোক করিলে কোক গুঁড়া হইয়া যায়। ইহাদিগকে নন্-কোকিং কোল বলা হয়। এই গুঁড়া কোক ধাতু গালাইবার কাজে ব্যবহার করা যায় না। তাই ভারতের প্রচুর লৌহ আকরিক কাজে লাগাইবার জন্য হার্ড কোকের উপযোগী ভাল কয়লা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে সাববিটুমিনাস ও নিকৃষ্ট লিগ্নাইট প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত খারাপ কয়লাকেও কোকে পরিণত করিবার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কয়লাকে নিম্ন তাপে (৪০০।৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) কোক করিতে হয়। কোক-করণের সময় যে আলকাতরা ও গ্যাস লিকার পাওয়া যায় তাহাদের প্রকৃতি কোক-করণের তাপের উপরে বহুলাংশে নির্ভর করে। নিম্ন তাপে কোক প্রস্তুত করিবার সময় যে আলকাতরা পাওয়া যায় তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বেঞ্জিন তৈল বা মোটর স্পিরিট পাওয়া যায়। উহা আই সি ইঞ্জিনে জ্বালানী তৈল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পেট্রোলের জন্য আমাদের দেশকে যেরূপ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে কয়লা হইতে মোটর স্পিরিট সংগ্রহ করিবার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকিলে দেশে পেট্রোলের অভাব কিছুটা মিটিতে পারে। কয়লা হইতে মোটর স্পিরিট সংগ্রহের জন্য ১৯৩৮ সালে জার্মেনীতে ৭৩৬টি যন্ত্র বসান হয়। উহা লিগ্নাইট জাতীয় ব্রাউন কয়লাকে কোকে পরিণত করিত। যন্ত্রগুলির মধ্যে Rotary Oven of Salerno এবং Brassert Knowless Process বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উচ্চ তাপে কোক করিলে কিন্তু উক্ত মোটর স্পিরিট ভাল পাওয়া যায় না।

ভারতে যাহারা কয়লা লইয়া গবেষণা করেন তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত ডাঃ এইচ. কে. সেন অন্যতম। তিনি নিম্নতাপে কোক-করণ লইয়া গবেষণা করেন। বিশেষ করিয়া বাংলা ও বিহারের কয়লা লইয়াই তাঁহার গবেষণার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ১৯৩৭ সালে তিনি এইরূপ একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন যাহাতে প্রতিদিন ১৫ টন কয়লাকে নিম্নতাপে কোক করা যাইত। তিনি নিম্নতাপে কোক করিবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪০ সালে Iudian Chemical Society-র সভাপতির অভিভাষণে বলেন—ভারতে প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টন কাঁচা কয়লা ধাতু গালাইবার জন্য হার্ড কোকে পরিণত করা হয়। বাকী ২০০ টন কয়লাই সফ্ট কোক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। তাহাতে বহু উপজাত দ্রব্য উদ্ধার করা চলিবে। সেই সঙ্গে ইঞ্জিন চালাইবার জন্য যে জ্বালানী তৈল পাওয়া যাইবে তাহাতে আমাদের দেশে পেট্রোলের অভাব মিটিবে।

নাগপুরে Indian Science Congress-এর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে মিঃ এন. এন.

চ্যাটার্জি বলেন—ভারতের বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল ধরিয়া কল্পনা করিয়া আসিতেছেন যে, রন্ধন কার্যের জন্য যে ২০ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহার করা হয় তাহা নিম্নতাপে কোক করিয়া তাহা হইতে মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থগুলি বাহির করিয়া বাজারে ছাড়া হইবে। কিন্তু এতটুকু এখনও কার্যকরী করা হয় নাই। এই কয়লাকে সাধারণ-ভাবে পোড়াইয়া সফ্‌ট কোক করিয়া বাজারে ছাড়া হয়। এই সফ্‌ট কোক তৈয়ারী করিবার সময় প্রতি বৎসর ভারতে যে বহুমূল্যের প্রয়োজনীয় পদার্থ নষ্ট হয় তাহা মোটামুটি এইরূপ -৭৫০,০০০ গ্যালন মোটর স্পিরিট, ১৫,০০,০০০ গ্যালন হাল্কা তৈল, ৩০,০০,০০০ গ্যালন মেসিন লুব্রিকেটিং তৈল, ১০,৫০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট, ১৫,০০০ টন পিচ এবং ৭,৫০,০০০ কোটি ঘনফুট কোল গ্যাস। এই গ্যাস ৫০০ লক্ষ অশ্বশক্তির সমান শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে।

বিটুমিনাস প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কয়লাকে হার্ড কোকে পরিণত করিলে উল্লিখিত হাল্কা ও সহজদাহ্য তৈলগুলির গুণ এবং পরিমাণ উভয় খুবই কম হয়। কিন্তু যে আলকাতরা পাওয়া যায় উহা হইতে অন্যান্য বহুমূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ মিলে। এক টন কাঁচা কয়লাকে হার্ড কোকে পরিণত করিলে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায়।

হার্ড কোক—১৬০০ পাঃ	৭২·০%
কোল-টার—১৩১ পাঃ	৫%
গ্যাস লিকার—১৭৯ পাঃ	৮·%
কোল গ্যাস—৮,৬০০ ঘনফুট বা ৩৩০ পাঃ	১৫%

তির্যকপাতনের সাহায্যে কোল-টার হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে টলুইন, বেঞ্জিন, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন, জাইলিন, ফিনোল, ক্রিসোল, কয়েক প্রকার মোটা ধরনের তৈল, কিছু গন্ধ দ্রব্য ও পিচ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও বহুপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। ন্যাপথালিন হইতে নানা রকমের রং এবং টলুইন হইতে বিস্ফোরক তৈয়ারী হয়। তির্যকপাতনের অবশিষ্ট যে পিচ পড়িয়া থাকে তাহাকে ন্যাপথায় সহিত দ্রবীভূত করিয়া রাস্তার জন্য অ্যাসফালটাম প্রস্তুত হয়। গ্যাস লিকার হইতে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হয়। ইহা জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই কাঁচা কয়লার মূল্য যে কতটা তা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতের মহামূল্য সম্পদ এই কাঁচা কয়লার অপচয় নিবারণের কোন চেষ্টাই নাই। আমাদের দেশে শিল্পপতিরা অথবা সরকার কয়লা হইতে অমূল্য সম্পদগুলি উদ্ধার করিবার কোন যন্ত্র তেমন আমদানী করেন না। সম্ভবতঃ ইহাতে বর্তমানে তাহাদের মুনাফার আশা কম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো এমন একদিন আসিবে যখন তাহাদের মুনাফার একটা মোটা অংশ কয়লার উক্ত সম্পদ হইতেই পাওয়া যাইবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নিকৃষ্ট ধরনের অথবা গুঁড়া কয়লাকে কোক করিলে কোক গুঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। উহা ধাতু গালান কিংবা বয়লারে ব্যবহার করা চলে না, এমন কি গৃহস্থালীর কাজেও লাগে না। তবে উহাকে তেঁতুল বিচির গুঁড়ার সহিত মাখিয়া ডেলায় পরিণত করিলে শুষ্ক করিয়া রন্ধনকার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অথবা ঐ গুঁড়া কোককে সমপরিমাণ মোটা খনিজ তেলের সঙ্গে কিংবা ফুটন্ত আলকাতরার সঙ্গে মিশাইয়া পুনরায় উচ্চ তাপে কোক করিলে হার্ড কোকে পরিণত করা যায়। ইহাকে Knowless Oven Cook in Oil Process বলা হয়। এই-রূপে হার্ড কোক করিবার সময় যে উপজাত দ্রব্যগুলি পাওয়া যায় তাহার মধ্যে গ্যাসোলিন (এক প্রকার মোটা তৈল) এবং কোল গ্যাসই প্রধান। গ্যাসোলিন পুনরায় কোক করিবার কাজে লাগে। কোল গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে নিকৃষ্ট ধরনের এবং গুঁড়া কয়লাকে প্রথমে নিম্ন

তাপে সফ্‌ট্‌কোক করিয়া লইলে হাল্কা এবং অল্প ভারী তৈল ও টার অ্যাসিড উদ্ধার করা যায়। পরে ঐ গুঁড়া কোককে মোটা খনিজ তৈলের সহিত মিশাইয়া হার্ড কোক করিয়া লইলে কয়লার উপযুক্ত ব্যবহার হয়।

হায়দ্রাবাদে যে Fuel Resarch Committee রহিয়াছে তথায় ডাঃ এইচ, কে, সেন এবং জি, রামারাও যুক্তভাবে যে গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহার ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ১ টন গুঁড়া কয়লাকে কোক করিবার সময় নিম্নলিখিত বস্তুগুলি পাইয়াছিলেন।

অ্যানহাইড্রাস টার—২২ গ্যালন
মোটর স্পিরিট — ৬ „
সফ্‌ট্‌ কোক — ০·৭৫ টন
অল্প ভারী তৈল — ৯ গ্যালন
টার-অ্যাসিড — টারের শতকরা ১৮ ভাগ
কোল গ্যাস — ৭৫০০ ঘনফুট

গুঁড়া সফ্‌ট্‌ কোককে ডেলায় পরিণত করিয়া বয়লারে ব্যবহার করা হইয়াছিল। সাধারণ কয়লার মত ইহাতে সমপরিমাণ ষ্টিম দিত।

জাপানীরা প্রতি বৎসর আমাদের দেশ হইতে নিকৃষ্ট ধরনের ও গুঁড়া কয়লা খুব সস্তা দরে ক্রয় করিয়া তাহাদের দেশে লইয়া যায়। তথায় উহারা ঐ কয়লাকে কোকে পরিণত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে।

সুখের বিষয় ভারত সরকার বর্তমানে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বহু অর্থব্যয়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। ভারত সরকার যত শীঘ্র কয়লার অপচয় নিবারণে তৎপর হইবেন ততই দেশের মঙ্গল। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া কয়লার উপযুক্ত ব্যবহার করিলে দেশের শ্রী ও সম্পদ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাইবে।

সৈকত-বালুকা মোনাজাইট

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মেনীতে প্রচুর পরিমাণে নারকেল ছোবড়ার দড়ি চালান যেত। একবার এই ধরনের চালানী দড়ির গাঁট ভারত থেকে জার্মেনীর এক কারখানায় এসে পৌছলো। দড়িগুলির গায়ে হলুদ রঙের একপ্রকার সূক্ষ্ম বালুকণা চিক্‌চিক্ করছে দেখে আশ্চর্য হয়ে কারখানার কর্তা সেই বালুকণা খুঁটিয়ে বের করে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে পাঠালেন গবেষণাগারে। খুব সম্ভব তিনি ভেবেছিলেন—এই বালুকণায় সোনা পাওয়া যাবে। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেল—এই বালুকায় রয়েছে বহুপ্রকার দুর্লভ ধাতু—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে রেয়ার আর্থ। এই বালুকণা কোথা থেকে এল? খুঁজতে খুঁজতে জার্মানরা এসে উপস্থিত হলো ত্রিবাঙ্কুরে। ১৯০৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী সেমবার্গ ত্রিবাঙ্কুর সমুদ্র-সৈকতের বালুকণায় এই বিশেষ ধরনের বালুকার সন্ধান পেলেন। এই বালুকার নাম মোনাজাইট। ভারতীয় জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই বালুকণার উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান সুরু করেন। দেখা গেল, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের বিস্তীর্ণ সমুদ্র-সৈকতে অনন্ত বালুরাশির ভিতর মেশানো রয়েছে এই মূল্যবান বালুকণা মোনাজাইট।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের সমুদ্র-উপকূলের বালি-

রাশিতে মোনাজাইট জমেছে বহু লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক ক্ষয়কার্যের ফলে। ঝড়-বৃষ্টি ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ এই ধ্বংসকার্য সাধন করেছে বছরের পর বছর ধরে। দক্ষিণ ভারতের কার্তামার্ক পর্বত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই ক্ষয়কাযের ফলে—নীলগিরি পাহাড়ের প্রস্তরাকীর্ণ দেহ ক্ষযে গেছে জলঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে। প্রবল জলস্রোত পাহাড়ের গা বেয়ে প্রচণ্ড গতিতে নেমে এসেছে—বড় বড় প্রস্তর শতধা খণ্ডিত হয়ে গেছে—ছোট ছোট পাথর গুঁড়িয়ে পরিণত হয়েছে বালুকণায়। পাহাড়ী স্রোতস্বিনী এসব বয়ে এনেছে সমুদ্রে। সমুদ্রতরঙ্গ আবার এদের উপর হেনেছে আঘাত। চূর্ণীকৃত প্রস্তরখণ্ড, বালুকণা তরঙ্গ-তাড়িত হয়ে কখনো জমে উঠেছে বেলাভূমিতে, কখনো বা জলের টানে চলে গেছে সমুদ্র-গর্ভে। জলে ধুয়ে বিভিন্ন রকমের বালুকণা পৃথক হয়ে পড়েছে। নদীর জলে বাহিত হয়ে কখনো এই বালুকা সমুদ্রতীর থেকে বহুদূরে এক মাইল, দু-মাইল দূরে গিয়ে জমা হয়েছে। পেগমেটাইট, গ্র্যানাইট ইত্যাদি প্রস্তর ক্ষযে গিয়েই মোনাজাইটের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সমুদ্রোপকূলের প্রায় ১৪২৬ একর অঞ্চল জুড়ে এই বালুকণা ছড়িয়ে আছে। কোন কোন জায়গায় প্রায় ২০ ফিট গভীর হয়ে জমে আছে এই বালুকণা। মোটামুটি হিসাব করে দেখা গেছে, ভারতের এই মোনাজাইট বালুকার সঞ্চয়ের পরিমাণ হবে প্রায় ১৭৭৬০০০ টন। কিন্তু জিওলজিক্যাল সার্ভের সাম্প্রতিক হিসাবে জানা গেছে, এই বালুকার পরিমাণ এত বেশী নয়—অনেক কম।

ব্রেজিলের সমুদ্র-সৈকতেও মোনাজাইট বালুকা বিদ্যমান আছে। অনেক নদীগর্ভেও বর্তমান রয়েছে এই বালুকণা অতি সামান্য পরিমাণে। বহুবৎসর ধরে ব্রেজিলের মোনাজাইট সমগ্র পৃথিবীর থোরিয়াম ইত্যাদি ধাতুর চাহিদা মিটিয়েছে। ক্যারোলিনার নদীতীরের মোনাজাইট প্রায় ৪ ফিট মাটির নীচে ছড়ানো আছে। এই বালুকা ১ থেকে ১০ ফিট পর্যন্ত গভীর হয়ে জমে রয়েছে সেখানে।

সিংহল এবং নাইজেরিয়াতেও মোনাজাইট পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের এসব মোনাজাইটের মধ্যে সিংহলীয় মোনাজাইটেই সবচেয়ে বেশী থোরিয়াম বিদ্যমান রয়েছে। ব্রেজিল এবং ক্যারোলিনার বালুকণায় এর পরিমাণ খুবই কম। নীচের তালিকায় বিভিন্ন দেশের মোনাজাইটের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দেওয়া হলো—

মোনাজাইট নিহিত রাসায়নিক পদার্থ	সিংহল শতাংশ	ভারত	ব্রেজিল	নাইজেরিয়া	ক্যারোলিনা
থোরিয়াম অক্সাইড	৯·৫—১৮·২	৮·৭—১০·২	৬·১	৩·২—৮	৪·৩২
সিরিয়াম অক্সাইড	২০·৬—২৭·২	৩১·৯	৬২·৯২ (সিরিয়াম ও অন্যান্য দুর্লভ ধাতব অক্সাইড একত্রে)	৩০·৫—৩৬·৫	৩৪·৬২
অন্যান্য দুর্লভ ধাতব অক্সাইড	২২·৫—৩৩·৫	২৮·৬		৩০·২	৩২·৩
লৌহ—অক্সাইড	·৯—১·১	১·১—১·৫	·৯৭	·৮—১·২	৩২·৩
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	·১৭—·২৯	·১২—·১৭	·১০	·১—·২	—
চুন	·১—·৪৫	·১৩—·২০	·২১	·১৭—·২১	—
সিলিকা বা সাধারণ বালি	১·৬৭—৬·১	·৯—১	·৭৫	·৬৩—১·৮	·৮৬
ফস্‌ফরাস অক্সাইড	২০·২—২৬·১২	২৬·৮—৫০·৩	২৮·৫	২৮·৩	২৯·৩

সাগরতীরের বালুকায় মোনাজাইটের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে ইলমেনাইট, জারকন, গারনেট, সিলমেনাইট এবং রিউটাইল প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ প্রস্তরের গুঁড়া। কাজেই মোনাজাইটকে এসব জিনিষ থেকে বিবিধ প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করে নিতে হয়। বালুকণা থেকে স্বর্ণ আহরণের জন্যে, অবশ্য সেই বালুকায় যদি স্বর্ণ বিদ্যমান থাকে, তাকে যেমন বার বার জলে ধুয়ে নিতে হয়, সেরূপ জলে ধুইয়ে বা বায়ু প্রবাহের দ্বারা মোনাজাইট থেকে অবাঞ্ছিত ময়লা দূর করা হয়ে থাকে। মোনাজাইট জল থেকে পাঁচগুণ ভারী এবং রং হাল্কা পীত, ব্রেজিলীয় মোনাজাইট বাদামী এবং ধূসর বর্ণের। জলের সাহায্যে মোনাজাইট থেকে অপেক্ষাকৃত হাল্কা সাধারণ বালুকা জারকন, ইলমেনাইট ইত্যাদি ধুয়ে দূর করা যায়। ঘূর্ণায়মান টেবিলের সাহায্যে উইফ্‌লে প্রণালীতেও মোনাজাইটকে অন্যান্য খনিজ থেকে পৃথক করা সম্ভব। সব চেয়ে সুবিধাজনক উপায় হচ্ছে তড়িচ্চুম্বক প্রণালীর সাহায্য নেওয়া। থোরিয়াম এবং অন্যান্য দুর্লভ ধাতুসমন্বিত মোনাজাইট চুম্বকের সাহায্যে কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে থাকে; কিন্তু অন্যান্য খনিজগুলি ততটা হয় না।

১৮৯৩ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ক্যারোলিনা থেকেই সবচেয়ে বেশী মোনাজাইট বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হতো। এই মোনাজাইট সেখানে উৎপন্ন হতো বছরে ৩০০ টন। ব্রেজিলের মোনাজাইট খুব কম খরচে সংগৃহীত হওয়ায় এবং এতে থোরিয়ামের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায় এরপর ব্রেজিলীয় মোনাজাইটের চাহিদা বেড়ে গেল। ১৯০২ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত এখানকার মোনাজাইটের বাৎসরিক রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪৫০০ টন। তারপর প্রতিযোগিতায় দাঁড়ালো ভারতীয় মোনাজাইট। ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ভারত থেকে ৪০০০ টন মোনাজাইট পরিষ্কৃত হয়ে বিদেশে রপ্তানী হয়। এই মোনাজাইটে থোরিয়ামের পরিমাণ ব্রেজিলীয় বালুকার প্রায় দ্বিগুণ এবং এখানে শ্রমিক খরচও কম; কাজেই ভারতীয় মোনাজাইট পৃথিবীর বাজারে দাঁড়িয়ে গেল। ১৯১৩ থেকে ১৯২০ সালের ভিতর ব্রেজিলের মোনাজাইটের বাৎসরিক রপ্তানীর পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়ালো মাত্র ৫০০ টনে। ১৯১৮ সালে ভারত মোনাজাইটের ব্যবসায়ে একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে দাঁড়ালো। ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানী হলো ৫৩০০ টন মোনাজাইট, কিন্তু ব্রেজিল থেকে রপ্তানী হলো না কিছুই। এই বালুকার যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে এ দেশ থেকে মোনাজাইট রপ্তানী একেবারে বন্ধ করে দিলেন এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে এই বালুকা সংগ্রহ হতে লাগলো। কিন্তু ইতিমধ্যে ৫০ হাজার টন মোনাজাইট ইউরোপের বিভিন্নদেশে এবং আমেরিকায় চালান হয়ে গেছে। ভারতের বাজার বন্ধ হওয়াতে ব্রেজিল এবং ক্যারোলিনা মোনাজাইটের ব্যবসায় আবার সুরু করেছে।

মোনাজাইটে নিহিত সিরিয়াম প্রভৃতি দুর্লভ ধাতুসমূহের প্রয়োজনীয়তা এবং বিশেষ করে থোরিয়ামের আণবিক শক্তি এই বালুকাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ বা কাঁচা মালে পরিণত করেছে। এই সব ধাতুগুলিকে মোনাজাইট থেকে নিষ্কাশিত করে তাদের কাজে লাগাবার জন্যে ভারত সরকার ১৯৫০ সালে ত্রিবাঙ্কুরের আলোয়া নামক স্থানে 'ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ ফ্যাক্টরী নামে একটি কারখানা স্থাপন করেছেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সেই কারখানার উদ্বোধন করেছেন। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্তভাবে এই কারখানার মূলধন বহন এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। কারখানার পরিচালক মণ্ডলীতে উভয় সরকারেরই প্রতিনিধি আছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে

আণবিক গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর ডাঃ হোমী ভাবা, শিল্প বিজ্ঞান পরিষদের ডিরেক্টর ডাঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর, জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ কৃষ্ণান এবং আরো অনেকে এই পরিচালন পরিষদে রয়েছেন।

মোনাজাইটে নিহিত আছে থোরিয়াম ফস্‌ফেট এবং সিরিয়াম গোষ্ঠীভুক্ত প্রায় সব ধাতুরই ফস্‌ফেট। মোনাজাইটকে পরিষ্কার করে তাথেকে এই সব ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। ভারতের এই ফ্যাক্টরীতে বছরে ৫০০ টন মোনাজাইট শোধন করা যাবে। থোরিয়াম ছাড়াও এখান থেকে উৎপাদিত হবে রেয়ার আর্থ ক্লোরাইড ও কার্বনেট, ট্রাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট এবং কষ্টিক সোডা দ্রাবণ। রেয়ার আর্থ ক্লোরাইডের বাৎসরিক উৎপাদন হবে আনুমানিক ১০০০ টন এবং কার্বনেট হবে প্রায় ৪৫০ টন। ট্রাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট এবং কষ্টিক সোডা দ্রাবণ এ দুটা জিনিষ উপজাত পণ্য; অর্থাৎ প্রধান পণ্য থোরিয়াম ছাড়াও অতিরিক্ত পণ্য হিসাবে পাওয়া যাবে। প্রথমটির পরিমাণ ১৮০০ টন এবং দ্বিতীয়টির আনুমানিক উৎপাদন হতে পারে ৯ লক্ষ গ্যালন। আর সবচেয়ে প্রধান যে জিনিষটি তার উৎপাদন হবে ২৩০ টন। এর সঙ্গে কিছুটা ইউরেনিয়ামও পাওয়া যেতে পারে।

সিরিয়াম ও অন্যান্য যে সব ধাতু মোনাজাইট থেকে পাওয়া যায় সেগুলির বিবিধ শিল্পে নানারূপ ব্যবহার আছে। অন্যান্য দুর্লভ ধাতু একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রধাতু তৈরী হয়। থোরিয়াম বের করে নেওয়ার পর মোনাজাইটে সিরিয়াম ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকে প্রায় ৬০।৬৫ ভাগ। সমগ্র বিশ্বে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ৮৮০০০ টন মোনাজাইট ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এথেকে প্রচুর পরিমাণে সিরিয়াম ইত্যাদি ধাতু পাওয়া গেছে। থোরিয়াম নিষ্কাশনের পর মোনাজাইট নির্যাসের সিরিয়াম ইত্যাদি ধাতুগুলিকে ক্লোরাইডে পরিণত করা হয়। এগুলিকে শুকিয়ে এর সঙ্গে মেশানো হয় ক্যালসিয়াম, বেরিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদির ক্লোরাইড। তারপর একটা লোহার পাত্রে এই মিশ্রণকে গালিয়ে তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালে পাত্রের তলায় সব ধাতুগুলি একসঙ্গে মিশে জমা হবে। তারপর এই মিশ্র ধাতুকে ছাঁচে ঢেলে দিতে হয়। এই ধাতুতে থাকে ১ থেকে ৫ ভাগ লৌহ, কিছুটা অক্সাইড, কার্বাইড এবং প্রধানতঃ সিরিয়াম, ল্যান্থানাম, নিউডিমিয়াম, প্রোসোডিমিয়াম প্রভৃতি ধাতু। এই মিশ্রধাতুর একটি অদ্ভুত গুণ দেখা যায়— উখা দিয়ে একটু ঘষলেই এর গা থেকে আগুনের ফিন্‌কি বের হয়। একে চকমকি পাথর তৈরীতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই মিশ্রধাতুর সঙ্গে লোহা, কোবাল্ট, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, টিন ইত্যাদি মেশালে এর অগ্নি-উৎপাদিকা শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। ৩৫ ভাগ লোহা, ৬৫ ভাগ সিরিয়াম মিশ্রধাতুতে মিশিয়ে যে ধাতু তৈরী হয় তার অগ্নি উৎপাদন-শক্তি খুব বেশী। সিগারেট লাইটার এবং গ্যাস লাইটারে এর খুব ব্যবহার হয়। যুদ্ধের সময় মাইন এবং সঙ্কেত দেখাবার কাজে, ট্রেসার বুলেট তৈরীতে, রাত্রিকালীন গুলি চালনার উপযোগী গোলা তৈরীতে এই মিশ্রধাতু ব্যবহৃত হয়েছিল। বাতাসের ঘর্ষণে এই ধাতুটি জ্বলে উঠে গোলাটির পথ আলোকিত করে তুলতো। চকমকি পাথর তৈরীতে খুব অল্প পরিমাণে এই সিরিয়াম মিশ্রধাতুর দরকার হয়। এক পাউণ্ড পরিমাণ এই ধাতু থেকে ১৩০০-১৮০০টি চকমকি পাথর তৈরী করা যায়। তার প্রত্যেকটি থেকে আবার ২০০০-৬০০০ বার পর্যন্ত আলো জ্বালানো যায়। এই সিরিয়াম মিশ্রধাতুর আরো উপযোগিতা রয়েছে। ·০৫ থেকে ·১ শতাংশ মাত্র এই ধাতু লৌহ শোধনকার্যে অক্সিজেন দূরীকরণে সাহায্য করে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে এই ধাতু অল্প

পরিমাণে মেশালে তার গুণ বেড়ে যায় অনেকখানি। নিয়ন বাতির গ্যাস পরিশোধনে এই ধাতু ভাল কাজ দেয়।

মোনাজাইট থেকে পাওয়া যায় ট্রাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট। একে পরিশোধিত করে বিবিধ কাজে লাগানো যায়। ওষুধ তৈরীতে, সুতা শক্ত করবার জন্যে কাপড়ের কলে এর ব্যবহার আছে। কষ্টিক-সোডা দ্রাবণ বা লাই ব্যবহৃত হয় সাবান তৈরীতে। সিরিয়াম ধাতুর অন্যান্য ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আর্ক-লাইটের ইলেকট্রোডে সিরিয়ামের যৌগিক লবণ ঢুকিয়ে দিলে সেই ইলেকট্রোড থেকে আরো উজ্জ্বল আলো নির্গত হয়। আলোটা খুব ধীরে এবং সমভাবে জ্বলতে থাকে। অতিবেগুনী আলো এবং সূর্য-বাতির জন্যে যে কার্বন ব্যবহৃত হয় তাতে অনেক সময় মেশানো থাকে সিরিয়াম ফ্লুওরাইড। গ্যাস লাইটের ম্যান্টল তৈরীতে থোরিয়ামের সঙ্গে সিরিয়াম নাইট্রেটও ব্যবহৃত হয়। রং খুব শীঘ্র শুকাবার জন্যে পেইন্ট-এর সঙ্গে সিরিয়াম অক্সাইড মেশানো যেতে পারে। কাঁচ রং করবার কাজেও সিরিয়াম আর্থ-এর দরকার হয়। এক শতাংশ বর্তমান থাকলে কাঁচের রং হয় স্বচ্ছ পীত, একটু বেশী হলে রং হয় বাদামী। এনামেল তৈরীতে ব্যবহৃত হয় ফ্লুওরাইড, ডাইঅক্সাইড এবং সিলিকো-ফ্লুওরাইড। চীনামাটির বাসনপত্রে এনামেল প্রলেপের কাজে উজ্জ্বল পীত রং এনে দেয় সেরিক-টাইটানেট, মলিবডেট তৈরী করে উজ্জ্বল নীল—টাংষ্টেট নীলাভ সবুজ এবং ম্যাঙ্গানিজ-সেরিক-টাইটানেট সৃষ্টি করে কমলা রঙের এনামেল। তাছাড়া রাসায়নিক গবেষণার নানা কাজে সিরিয়াম সালফেট প্রয়োজন হয়। কাজেই মোনাজাইট থেকে পাওয়া থোরিয়াম ছাড়াও অন্যান্য উপজাত দ্রব্যাদির মূল্যও কম নয়।

নাড়ীর গতি

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

রোগীর অবস্থা নির্ণয়ে চিকিৎসক প্রথমেই রুগ্ন ব্যক্তির মনিবন্ধের কাছে আঙ্গুল চাপিয়া নাড়ী পরীক্ষা করেন। রোগীর অবস্থা নির্ণয়ে নাড়ী-পরীক্ষা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কার নহে, ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোন্ সুদূর অতীতে নাড়ী-পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয় তাহা জানা না গেলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই আয়ুর্বেদজ্ঞেরা যে নাড়ী-পরীক্ষায় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন চিকিৎসকদের নাড়ীজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মুসলমান আমলে হারেম-বাসীনীর মাণবন্ধে সূতা বাঁধিয়া বাহির হইতে সেই সূতার অপর প্রান্ত ধরিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসক নাড়ীর গতি বুঝিয়া রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেন—এরূপ গল্পও শোনা যায়। পাশ্চাত্য জগতেও নাড়ী-পরীক্ষা বহুকাল পূর্বেই প্রচলিত হইয়াছে। খৃষ্টের জন্মের চারশত বৎসর পূর্বেও রোগীর অবস্থা নির্ণয়ে নাড়ী-পরীক্ষায় প্রচলন ছিল, এরূপ নজির পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব প্রাচীন পদ্ধতিতে নাড়ী-পরীক্ষায় ধমনীকে জীবনবায়ুর বাহক হিসাবেই ধরা হইত; কিন্তু ধমনীতে যে রক্তধারা প্রবাহিত হয় এবং ধমনীর স্পন্দন যে হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ইহা অজ্ঞাত ছিল।

খৃষ্টের জন্মের পূর্বে অ্যারিষ্টোটল প্রচার করেন যে, খাদ্য হইতে যকৃতে রক্ত গঠিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে চালিত হয় এবং সেখান হইতে শিরার ভিতর দিয়া শরীরের নানাস্থানে প্রবাহিত হয়। অতঃপর ইরাসিষ্ট্রেটাস ও হেরোফিলাস নামক প্রাচীন আলেকজেণ্ড্রিয়ার দুই জন বিখ্যাত চিকিৎসক প্রচার করেন যে, শিরার ভিতর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয় আর ধমনী একপ্রকার বায়ুর বাহক। গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের পূর্বে প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত এই মতবাদই চলিয়া আসিতেছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুই শত বৎসর পরে গ্যালেন আবিষ্কার করেন যে, ধমনী শুধু বায়ুর বাহক নয়, ইহার মধ্যে রক্তও বর্তমান। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই মতবাদই চলিয়া আসিয়াছিল, ইহার অধিক আর অগ্রসর হয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীতে গ্যালেনের মতবাদকে আশ্রয় করিয়া রক্ত চলাচল সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা গড়িয়া উঠে, যেমন—(১) দেহের মধ্যে রক্ত স্থির থাকে না, নানাদিকে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু কোন কেন্দ্র হইতে রক্ত ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া আবার সেই কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিতে পারে, এইরূপ কোন ধারণা তখন পর্যন্ত কাহারও হয় নাই। (২) যকৃৎ হইতে একপ্রকার রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ নিম্ন প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত হয় এবং সেখান হইতে ফুস্‌ফুস হইয়া শিরার মধ্যে সঞ্চালিত হয়। যকৃৎ হইতে অন্যপ্রকার রক্ত বাম নিম্ন-প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুস হইয়া ধমনীতে সঞ্চালিত হয়। হৃৎপিণ্ড যে পেশীবহুল এবং উহার কোন সঞ্চালন শক্তি থাকিতে পারে, এই উপলব্ধিও তখন হয় নাই। (৩) হৃৎপিণ্ডের বাম ও দক্ষিণ ভাগের মধ্যে সংযোগ পথ আছে, এইরূপ ধারণা ছিল; কিন্তু উহারা যে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভক্ত, ইহা জানা ছিল না। (৪) ধমনীর স্পন্দনকে তন্মধ্যস্থ বায়ুর সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ মনে করা হইত।

১৬২৮ খৃঃ অব্দে উইলিয়াম হার্ভি দেহের রক্ত-চলাচল ও তৎসঙ্গে ধমনী-স্পন্দন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, রক্তসঞ্চালনের কেন্দ্র যকৃৎ নয়, হৃৎপিণ্ডই উহার প্রকৃত কেন্দ্র। শিরা ও ধমনীর রক্তে কোন প্রকার প্রভেদ নাই। হৃৎপিণ্ডের বাম ও দক্ষিণ ভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভক্ত এবং উহাদের মধ্যে কোন সংযোগ পথ নাই। হৃৎপিণ্ডের বাম ও দক্ষিণ ভাগের নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয়ের একই সময়ে পেশী সঙ্কোচনের ফলেই হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত অ্যাওরটা (Aorta) ও শ্বাসযন্ত্রের ধমনীতে pulmonary artery) বেগে প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের রক্ত গ্রহণ ও বহিষ্করণ ব্যবস্থায় উভয় পার্শ্বের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয় ও তন্মধ্যবর্তী ভাল্‌ভের কার্যকারিতা একইরূপ।

কৈশিক নাড়ীর কার্যকারিতা ব্যতীত রক্ত-সঞ্চালন ব্যবস্থার অনেক তথ্যই হার্ভির আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে। দেহের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া মোটামুটি এইরূপ—শিরাবাহিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ঊর্ধ্ব কক্ষে প্রবেশ করিলে, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন কক্ষের মধ্যবর্তী ভাল্‌ভের ভিতর দিয়া উহা নিম্ন কক্ষে প্রবাহিত হয়। নিম্ন কক্ষের পেশী সঙ্কোচনে ঐ রক্ত শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে। শ্বাসযন্ত্রে রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়িয়া ও অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হয় এবং বাঁ-দিকের ঊর্ধ্ব কক্ষে প্রবেশ করে। ঐ বিশুদ্ধ রক্ত বাঁ-দিকের নিম্ন কক্ষে প্রবেশ করিলে উহার সঙ্কোচনের ফলে অ্যাওর্টায় প্রক্ষিপ্ত হইয়া ধমনীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। নিম্ন কক্ষের সঙ্কোচনের ফলেই ধমনীতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়া ধমনীর স্ফীতি ঘটে। ধমনীবাহিত রক্ত কৈশিক নাড়ীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া শিরার মধ্যে প্রবেশ করে এবং হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। দেহের মধ্যে রক্ত এইভাবেই নিয়ত আবর্তিত হইতেছে। বাঁ-দিকের নিম্ন কক্ষের পেশীসমন্বিত প্রাচীর দক্ষিণের নিম্ন কক্ষ হইতে অধিকতর পুরু। কারণ উহাকে

অধিকতর বেগে রক্ত প্রক্ষেপ করিয়া শরীরের সমস্ত স্থানের ক্ষুদ্র রক্তাধারগুলিতে রক্ত পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

হার্ভির আবিষ্কারের পর হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারেই নাড়ী-পরীক্ষা হয়। নাড়ীর স্পন্দন হইতে হৃৎস্পন্দনের গতি প্রকাশ পায়। নাড়ীর সতেজভাব বা ক্ষীণতা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনবেগ নির্দেশ করে। অসম নাড়ীর গতি হইতে হৃৎস্পন্দনের বেগ বা স্পন্দনের অসমতা নির্দেশিত হয়। নাড়ীর স্পন্দনে টান অনুভূত হইলে উহা হইতে ধমনী প্রাচীরের অবস্থা এবং হৃৎস্পন্দনের প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ পায়।

নাড়ীর গতি বলিতে প্রতি মিনিটে যতবার ধমনী স্পন্দিত হয় তাহাই ধরা হইয়া থাকে। জীব-জন্তুর নাড়ীর গতি হইতেও তাহাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনুধাবন করা যায়। মানুষের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি ৭০ হইতে ৯০-এর মধ্যে থাকে। বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে স্বাভাবিক নাড়ীর গতিতে যথেষ্ট ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। জীবজন্তুর মধ্যে আকৃতিতে যাহারা বৃহত্তর তাহাদের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি তদনুযায়ী কম হইতে দেখা যায়। যেমন হাতীর স্বাভাবিক নাড়ীর গতি ২৪ হইতে ২৮-এর মধ্যে, ঘোড়া, গরুর ৩৬ হইতে ৫০, ছাগলের ৬০ হইতে ৮০, কুকুরের ১০০ হইতে ১২০, ইঁদুরের ৭০০, এবং ক্যানারি পাখীর নাড়ীর গতি মিনিটে ১০০০ বার।

মানুষের অসুস্থাবস্থায় নাড়ীর গতির পরিবর্তন ঘটে। আবার সুস্থ অবস্থায়ও নানাকারণে স্বাভাবিক নাড়ীর গতিতে অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়, যেমন—শ্রম ও বিশ্রাম, আবহাওয়ার তাপ, বায়ুর চাপ, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি। স্ত্রী-পুরুষভেদে এবং বয়স অনুসারেও স্বাভাবিক নাড়ীর গতিতে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের নাড়ীর গতি মিনিটে প্রায় ১৫০ বার। বালক-বালিকাদের নাড়ীর গতিও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় অনেক অধিক। দেহের ক্ষুদ্রতা ও অধিক সক্রিয়তাই বালক-বালিকাদের নাড়ীর গতির আধিক্যের কারণ। নাড়ীর গতি ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং নাড়ীর গতি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চাপ বাড়িতে থাকে। কোন কোন ব্যক্তির ৪৫ বৎসর বয়সের পরে নাড়ীর গতি সামান্য বৃদ্ধি পায়। তবে সাধারণভাবে মনুষ্যের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নাড়ীর গতি ক্রমশঃ কমের দিকেই যায়।

জন্মের পর হইতে বয়স অনুযায়ী নিম্নোক্ত-ভাবে নাড়ীর গতি হ্রাস পায়।

বয়স—	সদ্যজাত	১ বৎসর	২ বৎসর	৭ বৎসর	১৪ বৎসর	পরিণত বয়স	বৃদ্ধ বয়স
নাড়ীর গতি—	১৪০-১৩০	১৩ -১১৫	১১৫-১০০	৯০-৮৫	৮১-৮০	৮০-৭০	৭০-৬০

সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি অধিক। নারীদেহের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতাই ইহার কারণ। বৃহৎকায় রমণীর নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। অপরদিকে ক্ষুদ্রকায় পুরুষের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি অধিক হইয়া থাকে।

হৃৎযন্ত্রের উপর সবরকম পরিবর্তনের প্রতি-ক্রিয়াই খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়। ঠাণ্ডা হাওয়া দেহে লাগিলে নাড়ীর গতি মন্থর হয়। ঐরূপ অনেক জামাকাপড় চাপাইয়া শরীর গরম করিলে সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। যে কোনরূপ দৈহিক শ্রমেই নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী বর্ধিত গতির তারতম্য ঘটে। কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক নাড়ীর গতি ৬৮ থাকিলে, ধীরে হাটিলে সেই স্থলে ১০০, জোরে হাটিলে ১৪০ এবং দৌড়াইলে ১৫০ পর্যন্ত উঠিতে পারে।

নাড়ীর গতি সাধারণতঃ প্রাতঃকাল অপেক্ষা অপরাহ্নে অধিক হইয়া থাকে। ভোজনের পরেও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। সম্ভবতঃ খাদ্যগ্রহণে

আভ্যন্তরীণ তাপ বৃদ্ধির ফলেই ঐরূপ হয়। গরম জল পান করিলে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়, আবার ঠাণ্ডা জল পান করিলে নাড়ীর গতি মন্থর হয়।

কেহ কেহ স্বাভাবিক নাড়ীর গতিতে একটা জাতিগত পার্থক্য আছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, উত্তর আমেরিকার অনেক আদিম জাতির স্বাভাবিক নাড়ীর গতি শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের তুলনায় কম। জাতিবিশেষে স্বাভাবিক নাড়ীর গতিতে পাঁচ হইতে বিশটি স্পন্দন কম হয় বলিয়া প্রকাশ। অপর দিকে আফ্রিকার নিগ্রোদের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ঋতুভেদেও নাড়ীর গতিব কিছু পরিবর্তন হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক পরীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় স্বাভাবিক নাড়ীর গতির কিছু পরিবর্তন ঘটে। তবে এই পরিবর্তনের মাত্রা এত কম যে, সাধারণ পরীক্ষায় তাহা অনুভূত হয় না।

স্বাভাবিক অবস্থায়ও নাড়ীর গতি প্রত্যহ যে একইরূপ থাকে, এমন নয়। একই ব্যক্তির বিভিন্ন দিনের নাড়ীর গতিতে কিছু প্রভেদ থাকিতে পারে। এইভাবে কোন প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীতও নাড়ীর গতিতে ১০।১৫টি স্পন্দন কম-বেশী হইতে পারে। দিনের পর দিন দেহের ভিতরে ও বাহিরে নানারূপ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে; এমন কি, একই দিনের মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় দেহের কোন আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার পূর্ণ সমতা রক্ষা সম্ভব নয় বলিয়াই নাড়ীর গতিতে ঐরূপ প্রভেদ ঘটে।

দেহের ওজনের সঙ্গে নাড়ীর গতির একটা সম্বন্ধ আছে। একই ব্যক্তির ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতির হ্রাস ঘটে। পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি পাইলে একই ব্যক্তির পূর্ব স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা মিনিটে ২০৫টি স্পন্দন কম হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নাড়ীর গতির উপর ব্যায়ামের ফল খুব প্রত্যক্ষ। পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ব্যায়াম শিক্ষার প্রথম চার সপ্তাহের মধ্যে নাড়ীর গতি ৩০।৭০ হইতে ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ৬০ হইতে ৫৫ মধ্যে নামিয়া আসে। ঐ সময় রক্তের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৬০ হইতে ১৮৫ পর্যন্ত উঠে। অবশ্য ব্যায়ামের কার্যকারিতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইলেই এরূপ হয়। অতিরিক্ত ব্যায়ামে দেহের অবনতি ঘটিলে ঐরূপ অবস্থায় নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১০০ পর্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং রক্তের চাপও .২ পর্যন্ত নামিয়া যায়। ব্যায়ামের ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইতেছে কিনা, নাড়ীর গতি ও রক্তের চাপ পরীক্ষা হইতে তাহা স্পষ্টভাবে জানা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইলে রক্তের চাপের আধিক্য ও নাড়ীর গতির মন্থরতা প্রকাশ পাইবে। তদবস্থায় নাড়ীর গতি মন্থর হইলেও সতেজ থাকিবে। পক্ষান্তরে ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল হইলে রক্তে চাপ হ্রাস পাইবে ও নাড়ীর গতিবৃদ্ধি পাইবে এবং নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পাইলেও উহা ক্ষীণ হইবে।

বসা, দাঁড়ান বা শোয়া, এইসব বিভিন্ন অবস্থায়ও নাড়ীর গতির তারতম্য প্রকাশ পায়। ভর দিয়া দাঁড়ান অপেক্ষা সোজাভাবে দাঁড়াইলে নাড়ীর গতি অধিক হয়। আবার বসা অবস্থা অপেক্ষা দাঁড়ান অবস্থায় নাড়ীর গতি অধিক হয়। নিশ্চলভাবে শোয়া অবস্থায় নাড়ীর গতি সর্বাপেক্ষা কম থাকে।

জীবিকানির্বাহের কর্মের সঙ্গে লোকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি সম্বন্ধযুক্ত। সাধারণতঃ অফিসের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা বাহিরের কাজে ব্যাপৃত লোকের নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কাজ যত শ্রমসাধ্য হয় স্বাভাবিক নাড়ীর গতিও তদনুপাতে কম হয়। বসা কাজে নাড়ীর গতি অধিক হয়।

দেহের অবস্থা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে নাড়ীর গতির নিকট সম্বন্ধ। নাড়ীর গতি হইতে অনেক ব্যাধির অনুমান করা সহজ হয়। নাড়ীর গতি নিয়ত ৯০-এর উপর থাকিলে ঐ ব্যক্তির যক্ষ্মা, বিষাক্ত গলগণ্ড, নেফ্রাইটিস্ প্রভৃতি কোন দুরূহ ব্যাধি থাকিতে পারে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। অবশ্য মদ, তামাক বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবনেও ঐরূপ উচ্চাহারে নাড়ীর গতি প্রকাশ পাইতে পারে। নাড়ীর গতি ৩০ হইতে ৫০-এর মধ্যে থাকিলে হৃৎস্পন্দনের প্রতিবন্ধকতা, হৃৎপিণ্ডের পেশীস্ফীতি বা মাইওকারডাইটিস্, ধমনী প্রাচীরের কোনরূপ পরিবর্তন অথবা ব্রেইন টিউমার প্রভৃতি কোন না কোন ব্যাধি থাকিতে পারে বলিয়া সন্দেহ হয়।

এতদ্ব্যতীত দেহের অন্য কতকগুলি অবস্থার উপর স্বাভাবিক নাড়ীর গতির পরিবর্তন নির্ভর করে। অম্লাত্মক পেটের পীড়ায় অনেক ক্ষেত্রেই নাড়ীর গতিতে মন্থরতা প্রকাশ পায়। ঐরূপ পৌষ্টিকনালীতে ক্যান্সার হইলেও নাড়ীর গতি মন্থর হইবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত অথবা ভীরু প্রকৃতির লোকের নাড়ীর গতি অধিক হইয়া থাকে।

নাড়ী-পরীক্ষায় এইরূপ দেহের কতকগুলি অবস্থার নির্দেশ পাওয়া গেলেও রোগ অনুমানে চিকিৎসক শুধু ইহার উপরই নির্ভর করেন না, অন্য উপসর্গের সঙ্গে ইহার কোন সঙ্গতি আছে কিনা চিন্তা করিয়া দেখেন। কাজেই কোন রোগের বিষয় অনুমান করিতে হইলে নাড়ীর গতি একমাত্র নির্দেশক নয়, লক্ষ্যণীয় নানা উপসর্গের মধ্যে ইহাও একটি বিশেষ স্থান পাইয়া থাকে।

জীবনবীমা কোম্পানীগুলি বীমাকারী ব্যক্তির নাড়ীর গতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। হাজার হাজার বীমাকারী ব্যক্তির নাড়ীর গতির সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হইতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। যে সব লোকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি ৫০ হইতে ৬৫-এর মধ্যে থাকে, সেই সব ব্যক্তির মধ্যে মৃত্যুর হার সাধারণ অপেক্ষা শতকরা ২০ জন কম। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, যেসব লোকের স্বাভাবিক নাড়ীর গতি কম তাহাদের দীর্ঘ পরমায়ু লাভের সম্ভাবনা অধিক। অসম নাড়ীর গতি-বিশিষ্ট লোকের মৃত্যুর হার সাধারণ অপেক্ষা অধিক বলিয়াও জানা গিয়াছে।

সুস্থ অবস্থায় নাড়ীর গতির সঙ্গে শ্বাসক্রিয়ার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রতিটি শ্বাসের সঙ্গে চার হইতে পাঁচ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়। আহার অথবা পরিশ্রান্ত নাড়ীর গতির পরিবর্তন ঘটিলে শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে উহার আনুপাতিক সম্বন্ধ বজায় থাকে। অসুস্থ অবস্থায় অবশ্য এই আনুপাতিক সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

কৃষি বিজ্ঞানে রসায়নের ব্যবহার

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ

গত কয়েক শতাব্দীতে রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। রাসায়নিকদের গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রসায়ন-শিল্পের মত কৃষিও আজকাল একটা লাভজনক কারবারে পরিণত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করা একদিকে যেমন ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ ছিল, তেমনি উহা হইতে লাভও হইত খুব সামান্য। এজন্য সব দেশেই কৃষকেরা দরিদ্র ছিল। কিন্তু ফলিত রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

কৃষি-বিজ্ঞানকে যেদিন হইতে বৈজ্ঞানিকেরা রসায়নের অংশরূপে গ্রহণ করিলেন, সেদিন হইতেই এই পরিবর্তনের সূত্রপাত। উনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক লিবিগের দৃষ্টি সর্বপ্রথম এইদিকে আকৃষ্ট হয়। লিবিগ দেখিলেন, গাছ মাটি এবং বাতাস হইতে জীবনধারণোপযোগী সকল প্রকার অজৈব পদার্থ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে যৌগিক পদার্থে পরিণত করিয়া দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত করে। মাটির উপর গাছপালার নির্ভরশীলতার মূল সূত্র আবিষ্কৃত হইল। ইহার পর লিবিগ গাছের পুষ্টিসাধনের উপযোগী বিশেষ উপাদানের সংমিশ্রণে কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করেন; যদিও বিশেষ কারণে তাঁহার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

বৃক্ষদেহ যে সব রাসায়নিক উপাদানে প্রস্তুত সেগুলির আধার মাটি। গাছ কিভাবে মাটি হইতে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, পটাস, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঐগুলিকে নানা মিশ্রণে রূপান্তরিত করিয়া দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত করে, তাহা রাসায়নিকদের জানা আছে। সুতরাং কিভাবে উপরোক্ত উপাদানগুলি মাটিতে বর্তমান থাকিলে গাছের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য হইবে তাহা সহজেই বলা যাইতে পারে। রাসায়নিকদের এই আবিষ্কার কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম সার ব্যবহারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। বৃক্ষদেহে যে প্রোটিন থাকে তাহার প্রধান উপাদান অ্যামোনিয়াঘটিত নাইট্রোজেন জমি হইতে কতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহার উপর সার ব্যবহারের সার্থকতা নির্ভর করে।

রাসায়নিকদের গবেষণা আজকাল ভূমি-বিজ্ঞানে যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য ভূমি-বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। জমির রাসায়নিক অবস্থা বিচার না করিয়া ভূমিতে ফসল লাগান একটা ভয়ানক ভুল। ক্রমাগত এই ভুল করাই এদেশে কৃষির অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ। অধুনা সরকার এদেশে জমির রাসায়নিক অবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যাপক কাজ সুরু করিয়াছেন। প্রত্যেক ফসলই জমি হইতে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস প্রতি উপাদান সংগ্রহ করে। ফসল উৎপাদন দ্বারা ভারতের জমি হইতে যে সব উপাদান সংগৃহীত হয় তাহার বাৎসরিক পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ২১ লক্ষ টন ফস্‌ফরিক অ্যাসিড, ৭৩ লক্ষ টন পটাস ও ৪৮ লক্ষ টন চুন। জমির রাসায়নিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই সারবস্তুর ঘাটতির পরিমাণ সঠিক নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

কৃষিকর্মে কৃত্রিম সারের ব্যবহার আজকাল সকল দেশেই বৃদ্ধির দিকে। যুদ্ধের পূর্বে ইউরোপে ১০৮টিরও অধিক কারখানায় রাসায়নিক সার প্রস্তুত হইত। বর্তমানে ভারতে সিন্দ্রীতে একটি বৃহদাকার রাসায়নিক কারখানা বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ টন কৃত্রিম অ্যামনসাল্‌ফ প্রস্তুত করিতেছে। বর্তমান অবস্থায় এদেশের জমিতে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের প্রয়োজন সর্বাধিক। সিন্দ্রীতে যে পরিমাণ অ্যামন-সাল্‌ফ প্রস্তুত হয় তাহা দেশের জমির নাইট্রোজেন চাহিদা মিটায় বটে, কিন্তু দেশের প্রয়োজন অপেক্ষা ইহা অনেক কম।

পৃথিবীর সর্বত্র কৃষিকর্মের যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, ভূমি-বিজ্ঞানের উন্নত জ্ঞান ও ব্যাপক রাসায়নিক সার প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কারের জন্যই তাহা সম্ভব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-কর্ম করিতে হইলে উহাকে রাসায়নিক গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। জমির রাসায়নিক অবস্থা, জলধারণ ক্ষমতা, জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা ফসল উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য। এবিষয়ে কৃষি-বিজ্ঞান রসায়নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

ভারতে বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণ কৃত্রিম সার প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার সঙ্গে জীবাণুনাশক, আগাছা ধ্বংসকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনও যথেষ্ট আছে। বীজ হইতে চাড়াগাছের উৎপত্তি এবং ফসলের বিকাশ পর্যন্ত গাছের দেহাভ্যন্তরে রাসায়নিক পরিণতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্য-দিকে ফলিত রসায়নের অতি আধুনিক আবিষ্কারও নানাভাবে কৃষির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইতেছে। সুতরাং এই উভয়ের সহযোগিতায় অদূর ভবিষ্যতে কৃষি যে আরও উন্নত ধারা অবলম্বন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান সংবাদ

খাদ্যাভাব প্রতিকারে অ্যালগি

ওয়াশিংটনের কার্ণেগি ইন্‌ষ্টিটিউসনের অ্যালগি-চাষের প্রথম বিবরণ হইতে আশা করা যায় যে, উন্নত ধরনের অ্যালগি-চাষ করিয়া ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্যাভাব অনেকাংশে দূর করা যাইবে। অ্যালগি এক প্রকার সূক্ষ্ম এককোষী জলজ উদ্ভিদ। পুকুরের জলে অনেক সময় সবুজ বা রক্তাভ কয়েক প্রকার সর ভাসিতে দেখা যায়; উহাই সাধারণতঃ অ্যালগি নামে পরিচিত। সারা পৃথিবীতে প্রোটিন খাদ্যেরই সর্বাপেক্ষা বেশী অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এককোষী অ্যালগি যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। খাদ্য গঠনকার্যে ইহা অন্যান্য উদ্ভিদ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সূর্যরশ্মি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্যকরীভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

এ সম্বন্ধে কার্ণেগি ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বুশের অভিমত এই যে, সারা পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে অধিক প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের চাহিদা খুব বেশী। এরূপ অবস্থায় এই সমস্যা সমাধানকল্পে যে কোন সম্ভাব্য উপায়ের উপরেই যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োলজির সমবায়ে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে যাহাতে মনে হয়, কোন কোন অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে মুখ্যতঃ শিল্পায়ন হইতেই খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হইবে। এই ভাবে খাদ্য উৎপাদনে অধিক

পরিমাণে অ্যালগি-চাষের ব্যবস্থা প্রথম স্থান অধিকার করিবে।

পৃথিবীর ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে স্বভাবতঃ উপযুক্ত পরিমাণ উর্বর জমির অভাব হইয়া পড়ে। শিল্পায়নে খাদ্য উৎপাদিত হইলে ঐ সব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূর হইবে। অ্যালগি কাল্‌চার দ্বারা এই কার্য সাধিত হইবার আশা থাকিলে ইহার উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

দশ বৎসর পূর্বে ভেনেজুয়েলাতে সর্বপ্রথম চাষ-করা অ্যালগির ঝোল কুষ্ঠরোগীদের খাওয়াইয়া দেখা যায় হয় যে, মনুষ্য-খাদ্য হিসাবে ইহা স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে পারে। বহুকাল হইতেই প্রাচ্যের লোকদের মধ্যে কয়েক প্রকার উপাদেয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ খাওয়া প্রচলিত ছিল।

মানুষের পক্ষে কিরূপ রুচিকর তাহা নির্ধারণের জন্য আমেরিকা ও জাপানের উৎপাদন-কেন্দ্রে শুষ্ক ক্লোরেলা অ্যালগির গুঁড়া লইয়া পরীক্ষা করা হয়। আমেরিকানদের মতে, ক্লোরেলার গন্ধের তীব্রতার জন্য উহা বেশী পরিমাণে খাওয়া সম্ভব নয়। মুরগীর ঝোলের সহিত শতকরা পনেরো ভাগ মিশ্রিত করিয়া বেশ খাওয়া চলে। জাপানীদের মতে, ইহার স্বাদ তাহাদের দুইটি সুখাদ্য সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও গুঁড়া সবুজ চা-এর অনুরূপ।

বর্তমানে প্রায় ১৭০০০ বিভিন্ন জাতীয় অ্যালগির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অ্যালগি হইতে স্নেহ, প্রোটিন, ভিটামিন জাতীয় পদার্থ, এমন কি অ্যান্টিবায়োটিকও পাওয়া যাইতে বলিয়া আশা করা যায়। বিভিন্ন জাতীয় অ্যালগির মধ্যে কোন্‌গুলি মানুষের খাদ্যের উপযোগী, সে বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে।

সূক্ষ্ম অ্যালগির কোষের বিশেষত্ব এই যে, ইহার সমস্তটাই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উন্নত ধরনের উদ্ভিদের মত ইহার পাতা, ডাঁটা বা শিকড়ের বালাই নাই। শুষ্ক উদ্ভিদে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক প্রোটিন থাকে। অন্য কোন উদ্ভিদে এত অধিক পরিমাণ প্রোটিন নাই। আবহাওয়া বা ঋতু নির্বিশেষে সারা বৎসরই ইহার উৎপাদন হইতে পারে।

ব্যাপক পরীক্ষায়, নাইট্রোজেনযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ ও অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড সংযোগে সূর্যালোকের সাহায্যে প্লাষ্টিকের স্বচ্ছ টিউবের মধ্যে সাফল্যের সহিত অ্যালগি উৎপাদন করা হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন সূর্যালোক অপেক্ষা বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত সূর্যালোক ফটোসিন্থেসিসের পক্ষে অনুকূল বলিয়া জানা গিয়াছে। পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া এক একর জমির উপর অ্যালগি উৎপাদনের একটি প্রদর্শনী-ক্ষেত্র নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মৃতদেহ হইতে সংগৃহীত অ্যায়োর্টা মানুষের শরীরে সংযোগ

আমেরিকার হাউস্টনের ডাঃ বেকি এবং ডাঃ কোলি প্রকাশ করেন, এক ব্যক্তির দেহের অ্যায়োর্টা বা প্রধান ধমনী ছয় ইঞ্চি পরিমাণ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই স্থলে মৃতদেহ হইতে সংগৃহীত অ্যায়োর্টার অংশ সাফল্যের সহিত সংযোগ করা হইয়াছে।

একুশ বৎসর বয়সের এক ব্যক্তি আহত হইয়া মারা যাওয়ার পর তাহার দেহ হইতে অ্যায়োর্টা বিচ্ছিন্ন করিয়া শূন্য ডিগ্রি তাপে ছয় দিন রক্ষিত হইয়াছিল। ৪৬ বৎসর বয়সের এক কাউন্টি সেরিফের দেহে উহা সংযোজিত করা হয়। অস্ত্রোপচারের এক মাস পরে তিনি তাঁহার কর্মস্থলে ফিরিয়া যান এবং প্রায় চার মাস হইল তিনি সুস্থ ও কর্মঠ জীবন যাপন করিতেছেন।

অস্ত্রোপচার শেষ করিতে চার ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। সেরিফের অ্যায়োর্টা বেলুনের মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তারেরা অনুমান করেন, সিফিলিসের সংক্রমণেই ঐরূপ হইয়াছিল। হৃৎপিণ্ডের পিছন দিক হইতে ঐ অ্যায়োর্টা পাকস্থলী ও গলনালীর উপর গুরুতর

চাপ দেওয়ায় রোগী পিঠে ও পেটে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন। অস্ত্রোপচারের সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট যাবৎ, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন অ্যায়োর্টা সংযোগ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যায়োর্টার উপরের অংশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। ইহাতে পয়তাল্লিশ মিনিট কাল ধমনীর মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি রোগীর স্পাইন্যাল কর্ড, কিড্‌নি বা অন্য কোন দেহযন্ত্রের রক্তাভাবজনিত কোন স্থায়ী ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

বজ্রপাতের বিপদ হইতে এরোপ্লেন রক্ষা

আকাশে উড়িবার সময় এরোপ্লেনে বজ্রপাত হইলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। ধাতু-নির্মিত প্লেনে বিপদের সম্ভাবনা অল্প হইলেও অনেক সময় এরিয়্যাল সাহায্যে পরিচালিত হইয়া বজ্র, রেডিও যন্ত্র নষ্ট করিয়া দেয় এবং উহা হইতেই আগুন লাগিয়া প্লেনের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে। এইরূপ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আজকাল অনেক প্লেনে কণ্ডেন্সার ও স্পার্ক-গ্যাপ ব্যবহার করা হইতেছে। প্লেনে প্রবেশ পথে এরিয়্যালের মাঝে একটি কণ্ডেন্সার বসান থাকে। বজ্র, বিদ্যুৎ ঐ কণ্ডেন্সার ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু রেডিও-বার্তা উহার মধ্য দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। স্পার্ক-গ্যাপের কৌটাটিকে কণ্ডেন্সারের উপরের অংশের এরিয়াল ও প্লেনের খোলের সহিত সংযুক্ত করা হয়। এরিয়্যালে বজ্র পড়িলে কণ্ডেন্সার উহা প্লেনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। উহা তখন স্পার্ক-গ্যাপ অতিক্রম করিয়া প্লেনের খোলের উপর পড়িয়া নিরাপদে বিলীন হইয়া যায়। মিঃ নিউম্যান ও মিঃ রব্ আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স-এর এক সভায় এইরূপ বিবৃতি দিয়া বলেন, গত দুই বৎসর যাবৎ প্রায় পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন যন্ত্র প্লেনে ব্যবহার করিয়া উহাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হইতেছে।

রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে ক্যান্সার কোষের বিনাশ

ইঁদুরের ছোট অন্ত্র হইতে নিষ্কাশিত একপ্রকার চর্বি জাতীয় পদার্থ প্রয়োগে ক্যান্সার রোগ নিরাময় হইতে পারে বলিয়া আভাস পাওয়া গিয়াছে। ইহা প্রয়োগে টেষ্টটিউবে রক্ষিত একপ্রকার ক্যান্সার রোগ ধ্বংস হয়। ক্যালি-ফোর্নিয়ার লস্ এঞ্জেল্‌স্ স্কুল অফ মেডিসিনের প্রফেসর ডাঃ বেনেট বলেন, ঐ পদার্থটির সঠিক গঠন বৈশিষ্ট্য এখনও নির্ধারিত হয় নাই। টেষ্ট-টিউব পরীক্ষায় অন্যান্য স্বাভাবিক তন্তুর উপর পদার্থটির কোন ক্ষতিকারক ক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই।

সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে, দেহের ছোট অন্ত্র ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয় না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অন্ত্রের মধ্যে কোন বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব ক্যান্সার উৎপন্নের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। চর্বির মত যে পদার্থটি অন্ত্র হইতে পৃথক করা হইয়াছে উহা ক্যান্সার-প্রতিরোধক পদার্থের মধ্যে অন্যতম।

ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত প্রাণীর উপর এই পদার্থটি এখনও প্রয়োগ করিয়া দেখা হয় নাই।

কুষ্ঠরোগ প্রসারের কারণ

সানফ্রান্‌সিস্‌কোর লেটারম্যান আর্মি হাস-পাতালের দুইজন ডাক্তার কর্ণেল ক্রুইট্ ও কর্ণেল ক্লিভ্ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, ত্বকের সহিত ত্বকের ছোঁয়া লাগার ফলেই কুষ্ঠরোগীর দেহ হইতে শিশু-দেহে ঐ রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। বহুকাল প্রচলিত বৌদ্ধরীতি অনুযায়ী সদ্যোজাত শিশুদের মস্তক মুণ্ডন করা হয়; ইহা হইতেই উক্ত ডাক্তারদ্বয় প্রথম সন্দেহ করেন যে, সরাসরি ত্বক হইতে ত্বকে এই রোগ সংক্রামিত হয়।

জাপান, কোরিয়া, ফরমোজা এবং চীনে সন্তান জন্মাইবার এক সপ্তাহ পর হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিন ব্যবধানে ক্রমাগত তাহার মস্তক মুণ্ডন করিতে থাকে। কন্যার ক্ষেত্রে চার ও পুত্রের ক্ষেত্রে আট বৎসর পর্যন্ত ঐভাবে মস্তক মুণ্ডন করা হইয়া থাকে।

জাপান, কোরিয়া ও ফরমোজার কুষ্ঠাশ্রমের ১৩৬৯ জন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কুষ্ঠব্যাধি সংক্রমণের জন্য শতকরা ৩৫ জনের মস্তক কেশবিহীন। যে সব দেশে শিশুদের মস্তক মুণ্ডনের রীতি প্রচলিত নাই ঐরূপ ১১টি দেশের কুষ্ঠরোগীদের মাত্র ৩% রোগীর মস্তকে কুষ্ঠ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন, কুষ্ঠরোগের জীবাণু রোগীর ঘর্ম-গ্রন্থি হইতে কোন কোন সময় বাহির হইতে থাকে। মুণ্ডনের ফলে প্রথমতঃ মস্তকের স্বাভাবিক রক্ষা আবরণটি অপসারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ মুণ্ডনের সময় অল্পবিস্তর ছড়িয়া বা কাটিয়া যাওয়াই সম্ভব। কুষ্ঠ-রোগীর সংস্পর্শে আসিলে ঐ সব কাটা স্থানের মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক জীবাণু প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়।

সরাসরি ত্বক হইতে ত্বকে কুষ্ঠরোগ সংক্রমণের আর একটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ফিলি-পাইনের কিউলিন লেপ্রোসি কলোনিতে উক্ত ডাক্তারেরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিশুদের কোলে বহন করিবার সময় তাহাদের দেহের যে অংশগুলি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মাতার দেহের সংস্পর্শে আসে, সেই সব অংশেই কুষ্ঠ-ক্ষত প্রথম প্রকাশ পায়।

তাঁহারা আরও বলেন যে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহে কুষ্ঠরোগের সংক্রমণ খুবই বিরল। যে সব ক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্কদের কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পায়, খুবসম্ভব শৈশবা-বস্থাতেই তাহাদের দেহে উহা সংক্রমিত হইয়া বহুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল।

এন্‌সেফালাইটিস্ রোগের চিকিৎসা

এন্‌সেফালাইটিস্ রোগে মস্তিষ্ক ফুলিয়া উঠে; ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকিয়া মারা যায়। রোগের মাত্রা অল্প হইলে রোগীর মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিতে দেখা যায়। আমেরিকান মেডি-ক্যাল এসোসিয়েসনে প্রাপ্ত এক বিবৃতি হইতে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, টাইফয়েড ভ্যাক্সিন প্রয়োগে এই রোগে নিরাময় হইতে পারে। গুরুতর হাম বা মাম্পস্ রোগে ভুগিবার পর অনেক শিশুর এন্‌সেফালাইটিস-জনিত মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতিষেধক হিসাবেও টাইফয়েড ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্যাসাডোনার ডাঃ নফ ও ডাঃ বাওয়ার এই পদ্ধতির চিকিৎসা ও ইহার ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ বিবৃতি দিয়াছেন—

হামে ভুগিবার পর ৫০টি রোগী এন্‌সেফালাইটিসে আক্রান্ত হয়। উহাদের অবস্থা এমনই গুরুতর হইয়াছিল যে, তাহারা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে বলিয়া আশা ছিল না। অর্ধেক সংখ্যক রোগী জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সময়সাপেক্ষ হইলেও শেষ পরিণতি হিসাবে মৃত্যু অথবা উন্মাদ-আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণই উহাদের পক্ষে অবধারিত ছিল। ঐ সব রোগীদের পেশী বা শিরার মধ্যে টাইফয়েড ভ্যাক্সিন ইন্‌জেক্সন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। রোগের গুরুত্ব হিসাবে দুই সপ্তাহ হইতে চার মাস পর্যন্ত এই চিকিৎসা চলিতে থাকে।

এই চিকিৎসায় এন্‌সেফালাইটিসের গুরুতর অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন এতই চমকপ্রদ যে, মস্তিষ্ক একবার বিকল হইলে উহা চিরদিনের মতই নষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ প্রচলিত ধারণা এখন আর সমর্থন করা যায় না। এন্‌-সেফালাইটিস্ যতই গুরুতর হউক না কেন, রোগীকে টাইফয়েড ভ্যাক্সিন দ্বারা চিকিৎসা না করিয়া তাহার আরোগ্যের আশা ত্যাগ করা উচিত নয়।

উপরোক্ত চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ১৭ বৎসর বয়স্ক একটি বালকের বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে বলা হইয়াছে। বালকটি হামে ভুগিবার পর এন্‌সেফালাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হয়। টাইফয়েড ভ্যাক্সিন প্রয়োগের পূর্বে বালকটি হতচেতন ও সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল। কয়েক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের পর সে হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি নাড়িতে আরম্ভ করে। পরে সে কথা বলিতে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিতে সক্ষম হয়। দুই মাস চিকিৎসার পরে সে মানসিক স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়। এক পায়ে সামান্য কিছু দুর্বলতা ছিল বটে, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে তাহাও দূর হয়। তিন মাস পরে ছেলেটি স্কুলে যাইতে আরম্ভ করে এবং পরে স্কুলের পরীক্ষায়ও সাফল্য লাভ করে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বায়ুমণ্ডলের বিরল গ্যাস

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

বায়ু রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ নয়—কতকগুলি মৌলিক ও যৌগিক গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। বায়ু প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণে গঠিত হলেও উহাতে সামান্য পরিমাণে অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ধূলাবালি ইত্যাদি থাকে। এছাড়াও বায়ুতে অতি সামান্য পরিমাণে কতকগুলি বিরল গ্যাস আছে যাদের অস্তিত্ব ৫০।৬০ বছর পূর্বেও অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে বায়ুর উপাদান বের করেছেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বে কেউ বায়ুর বিরল গ্যাসের অস্তিত্ব জানতে পারেন নি, এমন কি অনুমানও করতে পারেন নি। স্বল্পতা এবং রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার জন্যেই বোধ হয় বিজ্ঞানীদের হাতে এ গ্যাসগুলি ধরা পড়ে নি। প্রতি ১০০ ভাগ বায়ুতে এসব বিরল গ্যাস কি পরিমাণে আছে তা দেখানো হলো—

বিরল গ্যাসের নাম	% (আয়তন)
আর্গন	০.৯৩৩৪
হিলিয়াম	০.০০০৫
নিয়ন	০.০০১৫৪
ক্রিপ্টন	০.০০০১
জেনন	০.০০০০০৯১

উপরোক্ত তালিকা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহারা কত সামান্য পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত! যেসব বিরল গ্যাস এতদিন বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ে নি তাদের আবিষ্কার খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এসব গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে র‍্যালে, র‍্যামজে, ট্র্যাভার্স, জ্যানসেন, লকিয়াবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অথচ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ বিরল গ্যাস আবিষ্কারের প্রায় ১০০ বছর পূর্বে বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিসের কাছে ধরা পড়েছিল একটি বিরল গ্যাস (আর্গন), যার কথা তিনি শুধু লিপিবদ্ধ করে গেছেন, অধিক পরীক্ষা করেন নি। ক্যাভেণ্ডিসের এই উল্লেখ থেকেই ১০ বছর পরে র‍্যামজে ও র‍্যালে বিরল গ্যাসের অস্তিত্ব-সন্ধানে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিরল গ্যাস আবিষ্কারে বুনসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত স্পেক্ট্রোস্কোপের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বায়ুমণ্ডলের এই বিরল গ্যাসগুলি রাসায়নিক দিক থেকে একেবারেই নিষ্ক্রিয়; সাধারণ অবস্থায় উহার কোন যৌগ সৃষ্টি করে না। মেণ্ডেলিফের পর্যায়বৃত্ত সারণীতে তাদের কোন স্থান ছিল না। দেখা গেল, উহারা ১ম পরিবারের ধনাত্মক এবং ৭ম পরিবারের ঋণাত্মক মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যবর্তী- অর্থাৎ উহারা ধনাত্মকও নয়, আবার ঋণাত্মকও নয়। অথচ উহাদের ভৌতিক ও রাসায়নিক গুণাবলী লক্ষ্য করে বুঝা গেল যে, উহারা নিজেরাই একটি পরিবার- এজন্যে তাদের নাম দেওয়া হলো শূন্য পরিবার। মেণ্ডেলিফের পর্যায়বৃত্ত সারণীতে এদের স্থান হলো।

এই বিরল গ্যাসগুলির আণবিক গঠন থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, উহাদের সর্বশেষ ইলেকট্রন বেষ্টনী সম্পৃক্ত—হিলিয়ামের দুটি এবং অন্যান্য গুলির হচ্ছে আটটি করে :—

	হিলিয়াম	নিয়ন	আর্গন	ক্রিপ্টন	জেনন
আণবিক সংখ্যা	২	১০	১৮	৩৬	৫৪
ইলেকট্রন সংস্থিতি	২	২,৮	২,৮,৮	২,৮,১৮,৮	(২৮),১৮,৮

এই ইলেকট্রনগুলি খুবই দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ; উহাদের হ্রাস ও বৃদ্ধি হওয়ার কোন উপায় নেই। একমাত্র ইলেকট্রিক ডিচ্চার্জ টিউবে আয়নিত হওয়া ছাড়া, সাধারণ অবস্থায় উহারা আয়ন সৃষ্টি করে না; ফলে উহাদের যৌগ সৃষ্টি করবার কোন উপায় নেই। সম্প্রতি "ক্ল্যাথ্রেট কম্পাউণ্ড" বলে কুইনল অণুর সঙ্গে আর্গন ও ক্রিপ্টনের এক প্রকার কেলাসিত যৌগ হয় বলে জানা গেছে। জলে কুইনলের উত্তপ্ত দ্রবণে আর্গন ও ক্রিপ্টনকে অত্যধিক চাপে প্রবেশ করিয়ে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দিলে নাকি আর্গন ও ক্রিপ্টন পরমাণুগুলি বৃহৎ কুইনল অণুর ফাঁকে ফাঁকে অন্তরীণ হয়ে থাকে।

আপেক্ষিক তাপের অনুপাতের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি বিরল গ্যাসের অণু একটি মাত্র পরমাণুর দ্বারা গঠিত। উহাদের স্ফুটনাঙ্ক অত্যন্ত কম। তাই উহারা সর্বদাই গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। উহাদের তরল করতে অত্যধিক নিম্নতাপের প্রয়োজন। এই গ্যাসগুলির প্রত্যেকটি অণু বা পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ (cohesion) অত্যন্ত কম, সে জন্যেও উহাদের তরল করতে খুব নিম্নতাপের প্রয়োজন হয়।

আর্গন হচ্ছে বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। উহার আণবিক ওজন হচ্ছে ৩৯.৯৪৪। এই হিসাবে উহা পর্যায়বৃত্ত তালিকায় পটাসিয়ামের (আণবিক ওজন ৩৯.০৯৬) পরে বসা উচিত ছিল —কারণ পটাসিয়ামের আণবিক ওজন কম। এর কারণ হচ্ছে আর্গনের কতকগুলি আইসোটোপ আছে—উহাদের মধ্যে যেগুলি বেশী ভারী সেগুলির সংখ্যা বেশী। তাই গড়ে উহার আণবিক ওজন পটাসিয়ামের ওজন থেকে বেশী হয়ে পড়েছে। এই কারণেই উহা পটাসিয়ামের পূর্বে বসলেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। তরল বায়ুর সাহায্যে উহাকে তরলীকৃত (−১৮৫.৭২° সেঃ গ্রেঃ) করা যায়। তরল আর্গন বর্ণহীন এবং উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'৪। তরল আর্গনকে আরও ঠাণ্ডা করে (−১৮৮'৫২° সেঃ গ্রেঃ) কঠিন আর্গন পাওয়া যায়; উহা দানাদার।

লোহিততপ্ত ম্যাগ্নেসিয়ামের উপর আর্গন প্রবাহিত করে এবং বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে অক্সিজেনের সঙ্গে, ক্লোরিনের সঙ্গে, এমন কি ফ্লোরিনের সঙ্গে আর্গনের সংযোগ সাধনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সালফার, ফস্ফরাস, সোডিয়াম, টেলুরিয়ামের বাষ্পের সঙ্গে লোহিততপ্ত উত্তাপেও আর্গনের কোন বিক্রিয়া নেই—তেমনি লোহিত-তপ্ত, সোডিয়াম পারঅক্সাইড ও পটাসিয়াম নাইট্রে-

টের সঙ্গেও উহার কোন ক্রিয়া-নেই। এমন কি সোডিয়াম ও ক্যালসিয়ামের পারসালফাইডের আক্রমণেও আর্গন অনাক্রান্ত থাকে। টাইটেনিয়াম ও ইউরেনিয়ামকে আর্গনের সঙ্গে রেখে যতদূর সম্ভব উত্তপ্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। খুব ধনাত্মক রুবিডিয়াম ও সিজিয়ামকে আর্গনের মধ্যে বাষ্পীভূত করেও কোন ফল পাওয়া সম্ভব হয় নি। ১৫০ পরিমিত বায়ুর চাপে বরফগলা জলের সঙ্গে আর্গন একটি দানাদার পদার্থ ($A.5H_{20}$ অথবা $A\,6H_{20}$) গঠন করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

হিলিয়ামও আর্গনের মত বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদহীন গ্যাস। হাইড্রোজেনকে এক ধরে এর ঘনত্ব হচ্ছে ২·০০১। সুতরাং হাইড্রোজেনের পরেই উহা লঘুভার পদার্থ। হিলিয়াম কোন রাসায়নিক যৌগ উৎপন্ন করে না—তবে টাংষ্টেনের উপস্থিতিতে ইলেকট্রনের আঘাতে উহার সঙ্গে এবং গ্লো ডিচ্‌চার্জের ফলে মারকারীর সঙ্গে যৌগ সৃষ্ট হয় বলে জানা গেছে।

হিলিয়ামকে অতি কষ্টে তরল করা সম্ভব হয়েছে (১৯০৭ খৃঃ) এবং কঠিন করাও হয়েছে (১৯২৬ খৃঃ)। -২৫৮° সেঃ গ্রেঃ ঠাণ্ডায় নিয়ে গিয়ে জুল-টমসনের ক্রিয়ানুসারে উহাকে তরল করা হয়েছে। যে তরল হিলিয়াম পাওয়া গেছে তা বর্ণহীন এবং তরল হাইড্রোজেনের পরেই উহা লঘুতম তরল পদার্থ। তরল হিলিয়ামের আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে ০·১২২ এবং উহা-২৬৯°' সেঃ গ্রেডেই গ্যাসীয় হয়ে যায়। এই তরল হিলিয়ামকে দ্রুত বাষ্পীভূত করে-২৭২·১৮° সেঃ গ্রেঃ পর্যন্ত নিম্নতাপ পাওয়া গেছে—তখনও হিলিয়াম তরল। তরল হিলিয়াম আবার দু-রকমের আছে—আপেক্ষিক তাপ ও আপেক্ষিক গুরুত্বের দিক দিয়ে পৃথক। -২৭২° সেঃ গ্রেঃ নিম্নতাপ ও চাপে তরল হিলিয়াম থেকে কঠিন হিলিয়াম পাওয়া যেতে পারে—কঠিন হিলিয়াম ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী।

নিয়নও বর্ণ, গন্ধ, স্বাদহীন গ্যাস। নিয়নের তিনটি আইসোটোপ আছে—তাদের আণবিক ওজন যথাক্রমে ২০, ২১ ও ২২। জেনন ও ক্রিপ্টনও তেমনি নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

বায়ুমণ্ডলের এই বিরল গ্যাসগুলিকে শুধু বায়ুমণ্ডলেই পাওয়া যায় না, উহাদের পৃথিবীর মাটিতেও পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে হিলিয়ামের অস্তিত্ব বর্ণালীতে ধরা পড়ে, তার প্রায় ২৭ বৎসর পর পৃথিবীর বুকে হিলিয়ামের আবিষ্কার হয়।

আর্গনের পরিমাণ স্থানভেদে কম-বেশী হয়—সমুদ্রের উপরিভাগের বায়ুতে সামান্য কিছু বেশী আর্গন থাকে। তাছাড়া, আগ্নেয়গিরির গ্যাসে, খনিজ প্রস্রবণের গ্যাসে এবং জারকোনিয়াম-ঘটিত খনিজে আর্গন থাকে। বৃষ্টির জল উত্তপ্ত করে যে পরিমাণ আর্গন পাওয়া যায় তা বায়ুর আর্গন থেকে প্রায় দ্বিগুণ—কারণ আর্গন বেশী দ্রবণীয়।

বায়ুতে প্রায় ০·০০১৫% (আয়তন) ভাগ হিলিয়াম আছে। জিনস্ অনুমান করেছিলেন যে, প্রায় ৫০ মাইল উপরে অক্সিজেনের দ্বিগুণ হিলিয়াম আছে, ১০০ মাইল উপরে বায়ুমণ্ডল শুধু হিলিয়াম ও হাইড্রোজেনে পূর্ণ। খনিজ প্রস্রবণের কোন কোনটিতে, যেমন ইংল্যাণ্ডের কিংস্ ওয়েল থেকে বছরে প্রায় ১০০০ লিটার হিলিয়াম গ্যাস বের হয়। কোন কোন প্রস্রবণ থেকে নির্গত গ্যাসে এত বেশী হিলিয়াম থাকে যে, উহা কখনও প্রায় ৮-১০% পর্যন্ত হয়। আমেরিকার 'ন্যাচারেল গ্যাসে' সাধারণতঃ ১% হিলিয়াম থাকে; কোন কোন ক্ষেত্রে উহা প্রায় ৬-৮% পর্যন্ত হয়। ক্যান্সাস, টেক্সাস, কলোর‍্যাডো প্রভৃতিতে নির্গত ন্যাচারেল গ্যাসে বেশী হিলিয়াম থাকে। আমেরিকাতে এই ন্যাচারেল গ্যাস থেকেই হিলিয়াম পৃথক করে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া, তেজস্ক্রিয় ধাতব পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয়তার ফলে হিলিয়াম

নির্গত হয়; তাই মোনাজাইট, ফার্গোসোনাইট, থোরিওনাইট, পিচব্লেণ্ড প্রভৃতি খনিজে হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যায়। প্রতি গ্র্যাম মোনাজাইটে এক সি. সি. হিলিয়াম পাওয়া যায়।

নিয়ন ও ক্রিপ্টন, বায়ু ছাড়াও ন্যাচারেল গ্যাস ও প্রস্রবণ থেকে নির্গত গ্যাসে কম-বেশী পাওয়া যায়।

বায়ুমণ্ডলের এই বিরল গ্যাসগুলি রাসায়নিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয় হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে কিন্তু খুবই সক্রিয়। পরিমাণে এই গ্যাস খুবই কম, কিন্তু বর্তমানে এই গ্যাসগুলির ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে আজ এই গ্যাসের দরকার। তাই পৃথিবীতে বিরল গ্যাস উৎপাদনের জন্যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

আর্গনের প্রধান ব্যবহার হচ্ছে ইলেকট্রিক বাল্বে। এই বাল্বের ভিতরের টাংষ্টেন তারটি যাতে বায়ুর সংস্পর্শে জারিত না হয় তার জন্যে পূর্বে নাইট্রোজেনের ন্যায় নিষ্ক্রিয় গ্যাসে পূর্ণ করা হতো। আর্গনের আবিষ্কারের পর নাইট্রোজেনের পরিবর্তে আর্গন দিয়ে এই বাল্বগুলি পূর্ণ করা হচ্ছে। নাইট্রোজেন অপেক্ষা আর্গনের লঘু তাপ-পরিবাহিতা, সম্পূর্ণ রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার ফলে অধিক তাপে টাংষ্টেন তার বাষ্পীভূত হয়ে যেতে পারে না। ফলে বাল্বগুলির আয়ুষ্কাল অত্যন্ত বেড়ে যায়—যে সব বাল্ব অত্যন্ত বেশী কারেণ্টে জ্বলে তাদের পক্ষে ইহা খুব সুবিধাজনক।

পৃথিবীতে আজকে হিলিয়ামের ব্যবহার অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। হিলিয়াম দ্বিতীয় লঘুতম গ্যাস এবং উহা অদাহ্য বলে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বিজ্ঞানী র‍্যামজে এই গ্যাসের সাহায্যে বেলুন, এয়ারশিপ ইত্যাদি পূর্ণ করবার সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৪৭০০০ ঘনফুট হিলিয়াম সংগৃহীত হয়েছিল—তার খরচ ছিল প্রতি ঘনফুটে ২০০০ ডলার—আজ সেখানে প্রতি ঘনফুট হিলিয়ামের দাম মাত্র ৬ সেণ্টের কাছাকাছি। হাইড্রোজেনের অনুপাতে হিলিয়ামের ভারোত্তলন ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় ৯২%, তথাপি উহার অদাহ্যতা এবং হাইড্রোজেন অপেক্ষা গ্যাস ব্যাগ থেকে কম ব্যাপন (Diffusion) হয় বলে বেলুন ও এয়ার-শিপ হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বা অন্য সময় হাইড্রোজেন-পূর্ণ বেলুন ও এয়ারশিপের অগ্নি-সংযোগের ভয় হিলিয়ামের ব্যবহারের দ্বারা তিরোহিত হয়েছে। তাছাড়া, ডুবুরীদের শ্বাস-গ্রহণের যন্ত্রে আগে বায়ু লওয়া হতো, জলের নীচে অত্যধিক চাপে বায়ুর নাইট্রোজেন রক্তে সামান্য দ্রবীভূত হতো এবং চাপ কমলেই এই দ্রবীভূত নাইট্রোজেন বুদ্বুদাকারে বেরিয়ে আসবার ফলে ডুবুরীদের অস্বস্তিজনিত একপ্রকার রোগ (Caisson Disease) হতো। আজকাল ডুবুরী-দের শ্বাসগ্রহণ যন্ত্রে অক্সিজেন ও হিলিয়াম দেওয়া হচ্ছে। সুবিধা এই যে, হিলিয়াম অত্যধিক চাপে নাইট্রোজেনের মত রক্তে দ্রবীভূত হয় না; কাজেই এই রোগের আশঙ্কা থাকে না। যারা সুড়ঙ্গ ও খনি গর্ভে কাজ করে তাদেরও শ্বাসগ্রহণ যন্ত্রে অক্সিজেন ও হিলিয়াম মিশ্রণ ব্যবহার সুবিধাজনক। শ্বাসনালীর কতকগুলো রোগের চিকিৎসায় অক্সিজেন-হিলিয়াম মিশ্রণ খুব আরামদায়ক। যাতে পচে না যায় সে জন্যে খাদ্যদ্রব্য হিলিয়াম গ্যাসের মধ্যে রেখে ফল পাওয়া যায়। ধাতু নিষ্কাশনে যে সব ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ দরকার তথায় নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নাইট্রোজেন গলিত ধাতুতে খানিকটা দ্রবণীয়। তাই অদ্রবণীয় হিলিয়াম দিয়ে আজকাল নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

নিয়নের ব্যবহার আজকাল সর্বত্র—নিয়ন টিউব এতদিন বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন গৃহস্থালীতে, অফিসে, প্রেক্ষাগৃহে, হাস-

পাতালে সর্বত্র নিয়ন আলোর ছড়াছড়ি। এর কারণ হচ্ছে নিয়ন টিউবে বিদ্যুৎ-শক্তি কম লাগে এবং টিউবটি অনেকদিন পর্যন্ত কাজ করে। ১০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ-শক্তিতে এবং ২ মিলিমিটার চাপে নিয়ন গ্যাস উজ্জ্বল লাল আলো দেয়। নৌ ও বিমান বিভাগে কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকাতে নিয়ন আলোর সাহায্যে সিগন্যালের কাজ করা হয়। পারদ বাষ্পের সঙ্গে নিয়ন বা আর্গন নীল বা সবুজ আলো দেয়। কোন কোন জৈব যৌগের উপস্থিতিতে নিয়ন গ্যাস থেকে আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। অটোমোবাইল মেসিনে নিয়ন গ্যাস নির্মিত "স্পার্ক প্ল্যাগ টেষ্টার"-এর সাহায্যে কোথায় স্ফুলিঙ্গ বা আগুন লাগে তা বের করা হয়। নিয়ন লাইট বিদ্যুতের পোটেনসিয়াল পরিবর্তনে খুবই সচেতন বলে উহার সাহায্যে বিভিন্ন মেসিনে কোথায় ঘর্ষণ জনিত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে তা নিরূপণ করা হয়। টেলিভিসন যন্ত্রেও নিয়ন আলোর সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রীন হাউসগুলিতে নিয়ন আলো গাছের বৃদ্ধিতে এবং সবুজকণা উৎপাদনে সাহায্য করে।

বাল্‌বে ব্যবহারের জন্যে আর্গনের চেয়ে ক্রিপ্টন আরও উৎকৃষ্ট। জেনন ও ক্রিপ্টন ডিচ্‌চার্জ টিউবে ব্যবহৃত হয়—নীল ও সবুজ আলো দেয়।

সঞ্চয়ন

কয়লা হইতে পেট্রোল

কয়লা হইতে তৈল উৎপাদন যেমন এক অর্থ-নৈতিক সমস্যা তেমনই তাহা এক বৈজ্ঞানিক সমস্যাও বটে। বিশ্বের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সম্বন্ধে ডাঃ টি. আই. উইলিয়ামস্ লিখিয়াছেন—

বর্তমানে বিশ্বে খনিজ তৈলের অভাব লক্ষিত হইতেছে না, যদিও উৎপাদন, পরিশোধন এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃ ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়। অপর পক্ষে সংশ্লেষণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ উপজাত পদার্থের ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য সংশ্লেষিত খনিজ তৈলের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে।

খনিজ তৈল সরবরাহ হ্রাস পাইবার আশু সম্ভাবনা না থাকিলেও যুদ্ধের জন্য বহুদেশ সংশ্লেষিত পেট্রোল-শিল্পকে চালু রাখিবার চেষ্টা করে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সংশ্লেষিত তৈলের উৎপাদনের পরিমাণ এখনও বিশ্বের মোট পেট্রোলের ব্যবহার-যোগ্য পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম।

এই অবস্থায় কয়লা হইতে তৈল উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে ব্যাপক গবেষণা হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। আজ সেইজন্য বিশ্বের নানাদিকে মূল Fischer-Tropsch পদ্ধতির উন্নতি সম্পর্কে পরীক্ষা চলিয়াছে এবং এ-সম্পর্কে কিছু কিছু সাফল্যের লক্ষণও ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা বিশেষভাবে সংশ্লেষিত পেট্রোলের দিক দিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলে কয়লা সুলভ এবং সেই তুলনায় আমদানী খনিজ তৈল মহার্ঘ। সংশ্লেষণ ব্যবস্থা আশানুরূপ লাভ-জনক না হইলেও তাহা যে ক্ষতির কারণ হইবে এরূপ মনে হয় না। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের কোলক্রকে যে কারখানা স্থাপিত হইতেছে তাহার তরল ইন্ধন সম্পর্কে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ হইবে

২,০০,০০০ টন। এ সম্পর্কে ব্যয় হইবে আনুমানিক ১৮,০০০,০০০ পাউণ্ড। অবশ্য এই ব্যয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এই ব্যয়ের পরিমাণ যে অত্যধিক তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রতিরক্ষা এবং আফ্রিকার অভ্যন্তরে তৈল প্রেরণের ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ায় সংশ্লেষিত তৈল উৎপাদন সম্পকিত সমগ্র ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। ইহার ফলে দক্ষিণ রোডেশিয়াও এই ধরনের এক কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে।

Fischer-Tropsch পদ্ধতির উন্নতি সম্পর্কে পরিচালিত গবেষণার কোন ফলাফল জানিবার সুবিধা না থাকিলেও অনুমান করা যায় যে, অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। যুক্তরাজ্যে বিগত যুদ্ধের সময় কয়লা হইতে তৈল উৎপাদন সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা লক্ষিত হয় এবং এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলে বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্প বিষয়ক গবেষণা বিভাগের ইন্ধন গবেষণাগারে। এক্ষণে বিশেষ বিশেষ উপজাত রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে সেখানে কাজ হইতেছে; কারণ এই সকল রাসায়নিক পদার্থের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে।

নূতন অনুঘটক

ভবিষ্যতে সংশ্লেষিত পেট্রোল-শিল্পের পক্ষে ক্রম-প্রসারিত জৈব রাসায়নিক শিল্পের জন্য উপজাত পদার্থ উৎপাদনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইবে। নূতন অনুঘটক উৎপাদন সম্পর্কেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এই পদার্থগুলি নিজেদের অস্তিত্ব না হারাইয়া পেট্রোল উৎপাদন সম্পর্কে মূল কাঁচা মালের কাজ করিতে পারে।

সন্তোষজনক অনুঘটক প্রস্তুত করা অত্যন্ত জটিল কাজ। যুক্তরাজ্যে প্রধানতঃ শুষ্ক পদ্ধতিতে "ফিউজ্‌ড্‌ ম্যাগ্‌নেটিক" অনুঘটক সম্পর্কে কাজ হইয়া থাকে; জার্মেনী এবং অন্যত্র হইয়া থাকে আর্দ্র পদ্ধতিতে।

অধিকাংশ Fischer-Tropsch যন্ত্রগুলিতে গ্যাস সঞ্চালিত করা হয় একটি শুষ্ক অনুঘটকের মধ্য দিয়া; কিন্তু বৃটেনে বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্প বিভাগের গবেষণা সম্পকিত কিছু কিছু কাজ পরিচালিত হইতেছে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে। এই ব্যবস্থাধীনে অনুঘটক তরল দ্রব্যের মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় থাকে। এই ধরনের দৈনিক ৫০ গ্যালন উৎপাদন-ক্ষম একটি যন্ত্র সম্পর্কে এখন ব্যাপক পরীক্ষা চলিয়াছে।

গ্যাসের মিশ্রণের ব্যয়হ্রাস সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে। এই গ্যাসের মিশ্রণ হইতেই উৎপন্ন হয় পেট্রোল। পেট্রোল উৎপাদন ব্যবস্থার এই পর্যায়ে ব্যয়হ্রাস সম্ভব হইলে সমগ্রভাবে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। গ্যাসের মধ্য হইতে যৌগিক গন্ধক অপসারণ ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা গ্যাসের মধ্যে থাকিয়া গেলে অনুঘটক কার্যকরী হয় না।

পেট্রোল সংশ্লেষণ ব্যাপকতর পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হইলে, যে পরিকল্পনার মধ্যে অতিরিক্ত উত্তাপ হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকিবে, সে ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় আরও হ্রাস পাইতে পারিবে। অন্য দিক দিয়া Fischer-Tropsch পদ্ধতির সহিত হয়তো কয়লা হইতে ভূগর্ভস্থ গ্যাস উৎপাদন ব্যবস্থার সংযোগ সম্ভব হইবে। অবশ্য শেষোক্ত ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রহিয়া গিয়াছে।

কয়লা হইতে তৈল উৎপাদনের আগ্রহ আন্তর্জাতিক। জার্মান গবেষকগণের কাজকর্ম হইতে বোঝা যায় যে, ব্লাস্ট ফার্নেস হইতে প্রাপ্ত গ্যাস কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। সুইটজারল্যাণ্ড Fischer-Tropsch পদ্ধতি এমন-ভাবে সংস্কার করা হইয়াছে, যাহার ফলে সহজে ব্যবহারের উপযোগী সাধারণ গ্যাসের উৎকর্ষ সাধন

এবং তরল ইন্ধন উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ফ্রান্স এবং জার্মেনীতে গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির পরীক্ষা চলিয়াছে। আমেরিকার বিরাট ব্রাউন্‌স্‌ভিল কারখানায় (এই কারখানাটি পরিকল্পিত হইয়াছে বৎসরে ৩ ০,০০০ টন পেট্রোল এবং ১০,০ ০ টন বহুমূল্য রাসায়নিক উপজাত পদার্থ উৎপাদনের জন্য) চূর্ণীকৃত অনুঘটক একরূপভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে যাহা অত্যন্ত জোরের সহিত আন্দোলিত করিলে তরল পদার্থের আকার ধারণ করিতে পারে।

শেষ অঙ্ক না প্রথম অঙ্ক ?

শ্রীবুদ্ধদেব সেন

স্থান—নিউমেক্‌সিকোর উষর মরুপ্রান্তরের আলামোগোরডো, কাল—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই। শেষরাত, আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন, মুষল-ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুদূরে একটি সুউচ্চ লৌহমঞ্চ দেখা যাচ্ছে। মঞ্চের উপরে কি আছে দূর থেকে তা বোঝা যাচ্ছে না। বহু দূরে দূরে কতকগুলি বিশেষভাবে তৈরী আস্তানার মত দেখা যাচ্ছে। নিকটতম আস্তানাটি লৌহমঞ্চ থেকে ১০,০০০ গজ দূরে; ১৭০০০ গজ দূরে আরও একটি আস্তানা দেখা যাচ্ছে। এই আস্তানাগুলির ভিতর এ যুগের কয়েকজন প্রথিত-যশা বৈজ্ঞানিক বসে উৎসুকভাবে মঞ্চের দিকে চেয়ে আছেন। আজ এখানে ১০,০০০,০০,০০১ টাকা (একশ' হাজার কোটি) ও বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে বস্তুটি তৈরী হয়েছে তার সার্থকতা পরীক্ষা করে দেখা হবে। বেতার-ঘোষক প্রতি মিনিটে সময় ঘোষণা করে যাচ্ছেন; কুড়ি মিনিট···উনিশ মিনিট···আঠারো মিনিট··· এক মিনিট···তিরিশ সেকেণ্ড···। সময়ের শুন্য-মান ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দিগন্ত যেন শত সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, দূর দূরান্তের পর্বতমালা পর্যন্ত সেই চোখ-ঝল্‌সানো আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এর পরেই পর্যবেক্ষকগণ কর্ণবিদারী গর্জন শুনতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ বায়ুর চাপে কয়েক-জন পর্যবেক্ষক ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হলেন। এর পরেই সমস্ত আকাশ অপূর্ব বর্ণচ্ছটাযুক্ত মেঘে ভরে গেল। নাটকীয় মুহূর্ত শেষ হয়ে গেলে পব পর্যবেক্ষণকারীরা দেখতে পেলেন, লৌহ-মঞ্চটি সম্পূর্ণরূপে বাষ্পীভূত হয়েছে এবং সেখানে আছে বিরাট এক গহ্বর; আর আছে এক মৃত্যুবাহী অমোঘ শক্তিশালী রশ্মি। এই নাটক পর্যবেক্ষকদের দলে ছিলেন বিখ্যাত আণবিক বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফারমি, ওপেনহাইমার প্রভৃতি এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমেরিকান সামরিক কর্মকর্তা। নতুন যুগের প্রথম উষার সূর্যোদয় এঁরাই প্রথম দেখলেন। বহির্বিশ্বে নিউমেক্‌সিকোর এই নাটকের খবর তখনও কেউ জানে না! এর পরের দৃশ্যের স্থান নিউমেক্‌-সিকোর মরুপ্রান্তর থেকে বহু হাজার মাইল দূরে। জাপানী নগরী, ইতিহাস বিখ্যাত হিরোসিমা, কাল—৬ই অগাষ্ট, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ; প্রথম দৃশ্যের একুশ দিন পরের ঘটনা। সুপ্তিমগ্ন নগরীর উপর নেমে এল সর্বগ্রাসী মৃত্যু। মুহূর্তের মধ্যে নিউমেক্‌সিকোর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল। কিন্তু এখানে যে মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হলো তা নিউমেক্‌সিকোতে হয় নি। তার পরের দিন খবরের কাগজে দেখা গেল,

হিরোশিমাতে একটি মাত্র আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; তার ফলে সমস্ত সহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সাধারণ লোক কিন্তু সেদিন বুঝতে পারে নি যে, তারা নতুন এক যুগে এসে পড়েছে। সুদূর ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন ছোট্ট একটি সমীকরণের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বস্তুর অণু-পরমাণুর মধ্যেই লুকানো আছে অমিত শক্তির উৎস। চল্লিশ বছর পরে সেই উক্তি ও সমীকরণের সত্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল।

$E=mc^2$, অর্থাৎ শক্তি = বস্তু × আলোর গতি × আলোর গতি। আইনষ্টাইনের এই সমীকরণের প্রতিটি মানকে প্রকাশ করবার জন্যে বিভিন্ন মাত্রা আছে। যেমন শক্তিকে প্রকাশ করা হয় আর্গ-এ। এক ওয়াটের একটি টর্চের বাল্ব এক সেকেণ্ড জাললে এক কোটি আর্গ খরচ হয়। বস্তুর মাত্রা যেমন গ্রাম (এক হাজার গ্র্যাম ও এক সের প্রায় সমান)। আলোর গতি হলো এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। উপরের সমীকরণে আলোর গতিকে, প্রতি সেকেণ্ডে কত কোটি সেন্টিমিটার যায় সেইভাবে প্রকাশ করা হয়। (২½ সেন্টিমিটার = ১ ইঞ্চি), এবং আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০০,০০০,০০০ সেন্টিমিটার। বস্তুকে এই বিরাট অঙ্ক দ্বারা দু-বার গুণ করলে সামান্য এক কণা বস্তু থেকে কি অপরিমেয় শক্তির উৎপত্তি হতে পারে তা জানা যায়। শুধু কতকগুলি অঙ্ক দিয়ে প্রকাশ করার চাইতে একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। একশ' ওয়াটের আলো অনেকের বাড়ীতেই দু-একটি আছে। এরূপ একটি বাতি দশ ঘণ্টা জললে যে শক্তি খরচ হয় সেটা এক কিলোওয়াট আওয়ার। সেটাকে এক ইউনিট ইলেকট্রিসিটি বলে। আইনষ্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে দেখা যায়, এক পাউণ্ড বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হলে তা দিয়ে আমাদের একশ' ওয়াটের আলোটিকে প্রতিদিন দশ ঘণ্টা হিসাবে ১১৪০০,০০০,০০০ দিন অর্থাৎ ৩ কোটি ১২ লক্ষ বছরেরও বেশী দিন জ্বালানো যায়। আইনষ্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে হিসাব করে দেখা গেছে, আমাদের একবারের নিশ্বাসে যে পরিমাণ বস্তু থাকে তাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে ঐ শক্তির সাহায্যে একটা বড় জাহাজকে বেশ কয়েক বছর চালানো যেতে পারে।

আমরা আবার হিরোসিমায় ফিরে যাই। সেখানকার নরমেধ যজ্ঞের হিসাবটা নিলে বোঝা যাবে, আণবিক শক্তি কি জিনিষ! হিরোশিমাতে বোমার প্রত্যক্ষ আঘাতে ৬৬,০০০ লোক মারা গিয়েছিল এবং হতাহতের সংখ্যা হয়েছিল ১৩৫,০০০। তদন্তকারী অফিসার জেনারেল গ্রোভসের বিবৃতিতে জানা যায়, যেখানে বোমা পড়েছিল তার চতুর্দিকে ১½ মাইলের মধ্যে সব কিছুই পুড়ে ও উড়ে গিয়েছিল। ধ্বংসের সীমা বারো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পরবর্তী পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ থেকে হিসাব করে দেখা গেছে যে, দু-মাইল দূরের লোকেরও মনে হবে যেন দারুণ গ্রীষ্মের রোদে দাঁড়িয়ে আছে। দু-মাইল দূরেও উত্তাপ এত প্রখর হতে পারে যে, কাঠের বাড়ীঘর পুড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়! পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি যাবতীয় দাহ্য পদার্থ তিন মাইল দূরে থাকলেও জলে উঠবে। বায়ুর গতি ঘণ্টায় ৪০ মাইলেরও বেশী হতে পারে। প্রায় ১ মাইল দূরের ৯ ইঞ্চি দেয়ালের কোঠাবাড়ীও আস্ত থাকবে না। চার মাইলের মধ্যে সমস্ত বাড়ীঘর এমনভাবে নষ্ট হবে যে, সেগুলি মেরামত করা যাবে না। এই সামান্য বিবরণ থেকে আণবিক বোমার ধ্বংসশক্তির খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

আইনষ্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ আবিষ্কারের তারিখ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অনেক দীর্ঘকালের কাহিনী। কিন্তু শেষের পনেরো বছর উত্তেজনাময় এবং চরম উত্তেজনাপূর্ণ সময় হলো শেষের পাঁচ

বছর। উত্তেজনার চরম মুহূর্ত হলো ১৯৪৫ সালের ১৬ই অগাষ্ট।

১৮০৮ সালে ইংরেজ স্কুলমাষ্টার ও দার্শনিক জন ডাল্টন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা বলে মৌলিক পদার্থের গঠন সম্বন্ধে কতকগুলি সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। এই সংজ্ঞাগুলি বিজ্ঞানের যে কোন প্রাথমিক ছাত্রের নিকটও ডাল্টনের অ্যাটমিক থিওরী নামে সুপরিচিত। ডাল্টনের থিওরীর মূল কথা হলো, যে কোন মৌলিক পদার্থ কতকগুলি অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণিকা দ্বারা গঠিত এবং সেগুলিই হলো অ্যাটম বা পরমাণু। ডাল্টনের মতে, একই পদার্থের পরমাণুগুলি সর্বতোভাবে একই রকমের কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি সর্বতোভাবে বিভিন্ন। বিজ্ঞানে ডাল্টনের মতবাদের দান অসামান্য। আধুনিক কালে দেখা গেছে, যদিও পরমাণুগুলি অবিভাজ্য নয় তথাপি পরমাণুর অন্যান্য গুণ সম্বন্ধে ডাল্টনের মতবাদ মোটামুটি ঠিক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৭৪ খৃঃ) ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্রুকসের আবিষ্কার হইতে সুরু করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই বেকারেল, কুরি দম্পতি, রন্টগেন, রাদারফোর্ড, মিলিকান প্রভৃতির গবেষণায় একথা অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পরমাণু অবিভাজ্য নয়। এঁদের গবেষণার ফলে আরও প্রমাণিত হয় যে, পরমাণুগুলি প্রধানতঃ কতকগুলি ধনাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুৎ সমন্বিত কণিকা দ্বারা গঠিত। এগুলিকে বৈজ্ঞানিকরা প্রোটন ও ইলেকট্রন নামে অভিহিত করেছেন। মিলিকান, রাদারফোর্ড ও বোর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ইলেকট্রনের ওজন একটি পরমাণুর ওজনের তুলনায় নগণ্য এবং প্রোটনগুলিই পরমাণুর ওজনের জন্য দায়ী। এর অনেক পরে অবশ্য শ্যাড্উইক পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন নামে আরও এক প্রকারের কণিকা আবিষ্কার করেন। নিউট্রন ওজনে অবশ্য প্রোটনের সমান, কিন্তু এরা নিস্তড়িৎ কণিকা। রাদারফোর্ড ও বোরের মতে, পরমাণুর গঠনের সঙ্গে আমাদের সৌরমণ্ডলের গঠনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে আছে সূর্য এবং চারদিকে বিভিন্ন কক্ষে গ্রহগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্যের তুলনায় গ্রহগুলি ওজনে ও আয়তনে একেবারেই নগণ্য। সৌরমণ্ডলের অধিকাংশস্থানই হচ্ছে ফাঁকা। পরমাণুর ভিতরের অধিকাংশ স্থানও তেমনি ফাঁকা। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে শুধু প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত একটি নিউক্লিয়াস। পরমাণুর ওজন এই প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার উপরই নির্ভর করে। এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রনগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমগ্র পরমাণুটির তুলনায় নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনগুলির আয়তন অতি নগণ্য। একটি ইলেকট্রনের ওজন একটি প্রোটনের ওজনের ১৮৪৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সব চাইতে হাল্কা পরমাণু হাইড্রোজেনের ওজন হলো এক। হাইড্রোজেন পরমাণুটির সমস্ত ওজনটাই নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত, আর চারদিকে অতি ক্ষুদ্র ও প্রায় ওজনশূন্য একটি ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমস্ত কাঠামোটি বেশ ফাঁকা ধরনের। ৯২টি মৌলিক পদার্থের ওজন এক থেকে সুরু করে ২৩৮ পর্যন্ত। এই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে আছে বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন সমন্বিত নিউক্লিয়াস এবং চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কি আছে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করবার জন্যে বহু বৈজ্ঞানিকই চেষ্টা করেছেন। এঁদের পথপ্রদর্শক হলেন রাদারফোর্ড। কোন জিনিষকে ভাল করে দেখতে হলে সে জিনিষটাকে নানাভাবে আঘাত করে ভেঙ্গে দেখতে পারলেই দেখাটা ভাল হয়। রাদারফোর্ড

এই সহজ রাস্তাটিই বেছে নিলেন। তিনি পরমাণুর কেন্দ্রের উপর বিভিন্ন ধরনের গোলাগুলি ছুড়ে মারতে সুরু করলেন। পরমাণুর নিউক্লিয়াস যেমন সূক্ষ্ম তাকে আঘাত করবার গোলাগুলিও সেই রকমই সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। রাদারফোর্ড আল্‌ফা কণিকা (α-particles) নামে এক প্রকারের কণিকা আঘাত করবার ঢিল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। এর পর থেকে বৈজ্ঞানিকদের পেয়ে বসলো এক অদ্ভুত চাঁদমারির নেশায়! চারদিকে সব বড় বড় মহারথী নেমে পড়লেন চাঁদমারির খেলায়। এই চাঁদমারির নিশানা হলো পরমাণুর কেন্দ্র এবং এর গোলাগুলি হলো ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, ডয়টারন, আল্‌ফা কণিকা প্রভৃতি। এই সকল গোলাগুলি খুব জোরে ছোড়বার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার যন্ত্র তৈরী করলেন। ভ্যান ডি গ্রাফের তৈরী ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর, লরেন্সের তৈরী সাইক্লোট্রন, তা ছাড়া অধুনা আবিষ্কৃত বিটাট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন হলো পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র। ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড থেকে সুরু করে ৯৪১ সাল পর্যন্ত, এমন কি আজও বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণুর উপর যে গোলাগুলি বর্ষণ করে যাচ্ছেন তার ফলে পরমাণুর ভিতরকার বহু রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। ১৯১৪ সালে রাদারফোর্ড লক্ষ্য করেন, নাইট্রোজেন পরমাণুকে নিশানা করে যদি আল্‌ফা কণার গুলি বর্ষণ করা যায় তবে এ দুটাই ভেঙ্গে গিয়ে একটি অক্সিজেন ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। সাধারণ যোগ-বিয়োগের সাহায্যেই এদের পারস্পরিক ওজনের হিসাব করা যায়; তবে মনে রাখতে হবে, সমস্ত ওজনই হাইড্রোজেনকে এক ধরে করা হয়। আমরা জানি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কতকগুলি নিস্তড়িৎ নিউট্রন ও ধনতড়িতাবিষ্ট কতকগুলি প্রোটন। এই পরমাণু ভাঙ্গা-গড়ার হিসাবের মূল সূত্র হলো, যে দুটা ভেঙ্গে যাচ্ছে তাদের মোট ওজন ও তড়িতের মাত্রা, যা নতুন তৈরী হচ্ছে তাদের মোট ওজন ও তড়িৎ-এর মাত্রার সমান। এই সূত্রটির সত্যতা সম্বন্ধে কারও মনেই কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। এই হিসাবটা হচ্ছে এরূপ—

আল্‌ফা কণা + নাইট্রোজেন → অক্সিজেন + হাইড্রোজেন
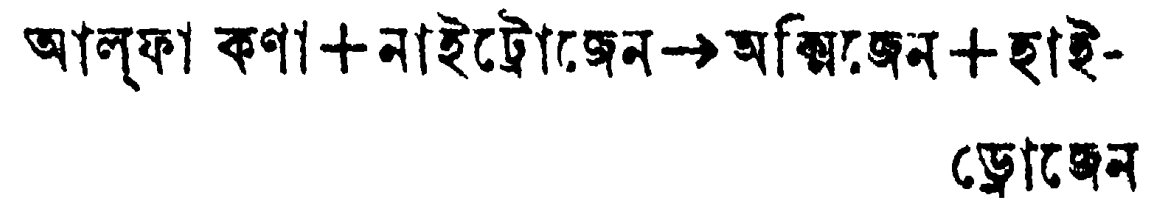
	আল্‌ফা কণা	নাইট্রোজেন	অক্সিজেন	হাইড্রোজেন
প্রোটন	২	৭	৮	১
নিউট্রন	২	৭	৯	
	৪	১৪	১৭	
মোট ওজন	১৮		= ১৮	
মোট ধনতড়িৎ	২+৭		= ৮+১	
	৯		৯	

কাজেই দেখা যাচ্ছে হিসাবে কোন গড়মিল নেই। এতদিন পরে প্রমাণ হয়ে গেল যে, ডাল্টনের আণবিক মতবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পরমাণু অবিভাজ্য নয় তা অনেক দিন আগেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু রাদারফোর্ডের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারে পরমাণুরও যে রূপান্তর সম্ভব তা একেবারে হাতে-কলমে প্রমাণিত হয়ে গেল। এই ধরনের বিক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক বিক্রিয়া বলেন। গত তিরিশ বছরে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর, সাইক্লোট্রন, বিটাট্রন ইত্যাদি দ্বারা আল্‌ফা কণা, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি নানারকমের গোলাগুলি ছুড়ে বহু রকমের পারমাণবিক বিক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। এ সব আবিষ্কারের ফলে, পৃথিবীতে অস্তিত্বই ছিল না এমন কয়েকটি মৌলিক পদার্থ গবেষণাগারে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। যেমন প্লুটোনিয়াম, নেপচুনিয়াম, কুরিয়াম, আমেরিসিয়াম ইত্যাদি। এর ভিতরে প্লুটোনিয়াম নামক মৌলিক পদার্থটি আণবিক বোমার জন্যে বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ বহুল পরিমাণে তৈরী করছে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে লোকে ধারণাও করতে পারতো না

যে, গবেষণাগারে কোন মৌলিক পদার্থের জন্ম হতে পারে।

যখন লিথিয়াম নামক মৌলিক পদার্থকে প্রোটন দ্বারা আঘাত করা হয় তখন লিথিয়াম ও প্রোটন মিলে দুটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরী হয়; কিন্তু দেখা গেল যে, হিসাবে মিলছে না।

লিথিয়াম + প্রোটন → ২টি হিলিয়াম + শক্তি

ওজন ৭.০১৮২ + ১.০৪১ = ২ × ৪.০০৪০ + শক্তি

মোট ওজন ৮.০২৬৩ = ৮.০০৮: + শক্তি

বাঁ-দিকে দেখা যাচ্ছে, ওজনের খানিকটা ঘাটতি হয়েছে। তবে ৮.০২৬৩ − ৮.০০৮০ = ০.০১৮৩ পরিমাণ জিনিষ কোথায় গেল? এই পরিমাণ জিনিষ সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আইনষ্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে দেখা যায়, এই পরিমাণ বস্তু থেকে ১৭ এম ই. ভি (million electron volt) শক্তি তৈরী হয়েছে। এই শক্তির বলেই নবজাত হিলিয়াম পরমাণু দুটি বিক্রিয়ার স্থান থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই ভাবে শক্তি উৎপাদন করা মোটেই লাভজনক নয়; কারণ একটি মাত্র পারমাণবিক সংঘাত ঘটাতে অনেক বেশী পরিমাণ শক্তি আমাদের ব্যয় করতে হয়। কারণ পরমাণুকে আঘাত করবার চেষ্টা, একটা মস্ত বড় অন্ধকার ঘরে একটি মৌমাছিকে গুলি করারই সমতুল্য। কোটি কোটি গুলি ছুড়লে হয়তো মৌমাছিটি গুলিবিদ্ধ হবে। সেই রকম কোটি কোটি আণবিক গুলি নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি ছুড়লে হয়তো একটি পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত করবে। কাজেই এভাবে আণবিক শক্তিকে ব্যবহার করবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

১৯৩৪ সালে আবার একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ হাল্কা ধরনের পরমাণুর উপরই চাঁদমারি অভ্যাস করছিলেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফ্রেডারিক জোলিও, তদীয় পত্নী মাদাম জোলিও কুরি, এনরিকো ফার্মি, অটো হান, লিজে মাইট্‌নারপ্রমুখ বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য ভারী পরমাণুর উপর গোলাবাজি সুরু করলেন। বৈজ্ঞানিকেরা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে আশা করছিলেন যে, ইউরেনিয়ামের কাছাকাছি ওজনেরই কোন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে অটো হান এবং স্ট্রাস্‌ম্যান আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন আঘাত করবার ফলে একটি বেরিয়াম পরমাণু ও একটি ল্যানথেনাম পরমাণুর জন্ম হয়। এরা ওজনে ইউরেনিয়ামের প্রায় অর্ধেক। নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারটাকেই বলে ইউরেনিয়াম ফিসন। একটি ইউরেনিয়াম ভেঙে দিলে ২০০ এম ই ভি শক্তির সৃষ্টি হয়। একটি কার্বন পরমাণু পুড়লে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, এই শক্তি হয়:তার প্রায় পাঁচ কোটি গুণ বেশী। ১৯৩৯ সালে অটো হানের এই আবিষ্কারের পর থেকে আণবিক শক্তির গবেষণার কাজ অনেকটাই গোপনে চলে। এর পর থেকেই সুরু হয় যুদ্ধে ব্যবহার করবার জন্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আণবিক মারণাস্ত্র তৈরীর তীব্র প্রতিযোগীতা। এই প্রতিযোগীতায় মিত্রপক্ষের জয় হয় এবং হিরোসিমায় সেই জয় প্রথম সূচিত হয়; ফলে মানব সভ্যতা ধ্বংসের কবল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

আণবিক বোমার সাফল্য নির্ভর করে ইউ-

রেনিয়াম ফিসনের একটি বৈশিষ্ট্যের উপর। দেখা গেছে, একটি নিউট্রন একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে ভেঙ্গে দিলে বেরিয়াম ও ল্যানথেনাম ছাড়াও তিনটি নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। এই তিনটি নিউট্রন আবার তিনটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে ভেঙ্গে দিতে পারে। তা থেকে আবার ন'টি নিউট্রনের সৃষ্টি হবে। এরা আবার ন'টি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে ভেঙ্গে দেবে। তা থেকে আবার সাতাশটি নিউট্রন সৃষ্টি হবে। এইভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ নিউট্রন সৃষ্টি হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙ্গে যাচ্ছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বোমার ভিতরের সবগুলি ইউরেনিয়াম পরমাণুই ভেঙ্গে প্রচণ্ড শক্তি, তাপ, আলো উদ্ভূত বিস্ফোরণের আকারে প্রকাশ পাবে। ইউরেনিয়াম ভাঙ্গবার এই পদ্ধতিটিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় চেন্-রিঅ্যাকসন বলা হয়। ইউরেনিয়াম ফিসনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ফিসনের ফলে নিউট্রনের উৎপত্তি এবং এই নিউট্রনের দ্বারা চেন-রিঅ্যাকসনের দরুণ মুহূর্ত মধ্যে সবগুলি ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। আণবিক শক্তির বিকাশ কি শুধু আণবিক বোমার মাধ্যমে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করবে—না, এই অভূতপূর্ব শক্তির উৎস মানব-কল্যাণেও ব্যবহৃত হবে? বৈজ্ঞানিকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ আণবিক শক্তিকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়েছে। মানুষের কাজে নিয়োজিত করবার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ইউরেনিয়াম ফিসনের চেন্-রিঅ্যাকসনকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা এবং ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা। আয়ত্তাধীন চেন্-রিঅ্যাকসন করা হয় অ্যাটমিক পাইল নামক যন্ত্রের সাহায্যে। অ্যাটমিক পাইল হলো আণবিক শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র। শক্তি উৎপাদনে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও মানব-কল্যাণে এই অ্যাটমিক পাইলের গুরুত্ব অনেক।

আণবিক শক্তি যদি বোমার মাধ্যমেই আত্ম-প্রকাশ করে তবে মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। আর যদি মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হয় তবে মানব জাতির ইতিহাস সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন ধারায় প্রবাহিত হবে।

পুস্তক পরিচয়

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান—শ্রীআদিনাথ সেন; প্রকাশক গুরুদাস ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, ১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷৹

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য লেখককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। 'খাদ্যাখাদ্য বিচার, দৃঢ় সংকল্প ও নিয়ন্ত্রিত জীবনে ক্ষয় ও জরা নিবারণ বিষয়ক এই পুস্তকখানি আমাদিগকে প্রীত করিয়াছে। নাম দেখিয়া প্রথমে ইহাকে একখানি বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহা পাঠ্যপুস্তক রচনার বাঁধাধরা নিয়মের আড়ষ্টতা-বর্জিত। বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশে পুস্তকের উপযোগিতা বর্ধিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পুস্তকের ভাষা কিঞ্চিৎ দুর্বল হইলেও দুর্বোধ্য নহে। লেখক ভূমিকায় উপযুক্ত পরিভাষার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পরিভাষা থাকিতেও 'প্যানক্রিয়াস' বা সুপ্রচলিত শব্দের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দ যথা 'ক্ষুধাপ্রদানকারী (apetiser)' ব্যবহারের যৌক্তিকতা ঠিক বোধগম্য হইল না। কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদ চোখে পড়িল। কিন্তু এ সব সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বইখানির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

Essays on Education in India—শ্রীআদিনাথ সেন। গুরুদাস ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স, ১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত লেখকের ৭টি রচনা এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। লেখক কলিকাতা, ঢাকা ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়-ত্রয়ের একজন কৃতী ছাত্র। জীবনের দীর্ঘ বারো বৎসর তিনি শিক্ষকতাকার্যে ও ১৮ বৎসরকাল অবিভক্ত বঙ্গের টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউশনসমূহের পরিদর্শকরূপে যে বিপুল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত রচনাগুলিতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই রচনাগুলি চিন্তাশীল পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। শিক্ষানুরাগীদিগকে আমরা এই পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

বাংলা বর্ষলিপি—(দশম বর্ষ) ১৩৬০। সম্পাদক—শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী বি, এ,। প্রকাশক—সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। মূল্য ২৷৷৹

৩৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই বাংলা বর্ষলিপিখানিকে একখানি ছোটখাট পকেট এনসাইক্লোপীডিয়াও বলা যাইতে পারে। কি সাহিত্যিক, কি সাংবাদিক, কি ব্যবসায়ী জীবনের সকল স্তরের মানুষের উপযোগী করিয়া সংকলিত প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল এই সংকলন-খানি আশা করি, সকলের নিকটেই সমাদৃত হইবে। মনোরম প্রচ্ছদপট, সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই পুস্তকের উৎকর্ষতা অনেকখানি বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ : দশম সংখ্যা

সারস পাখীর নৃত্য
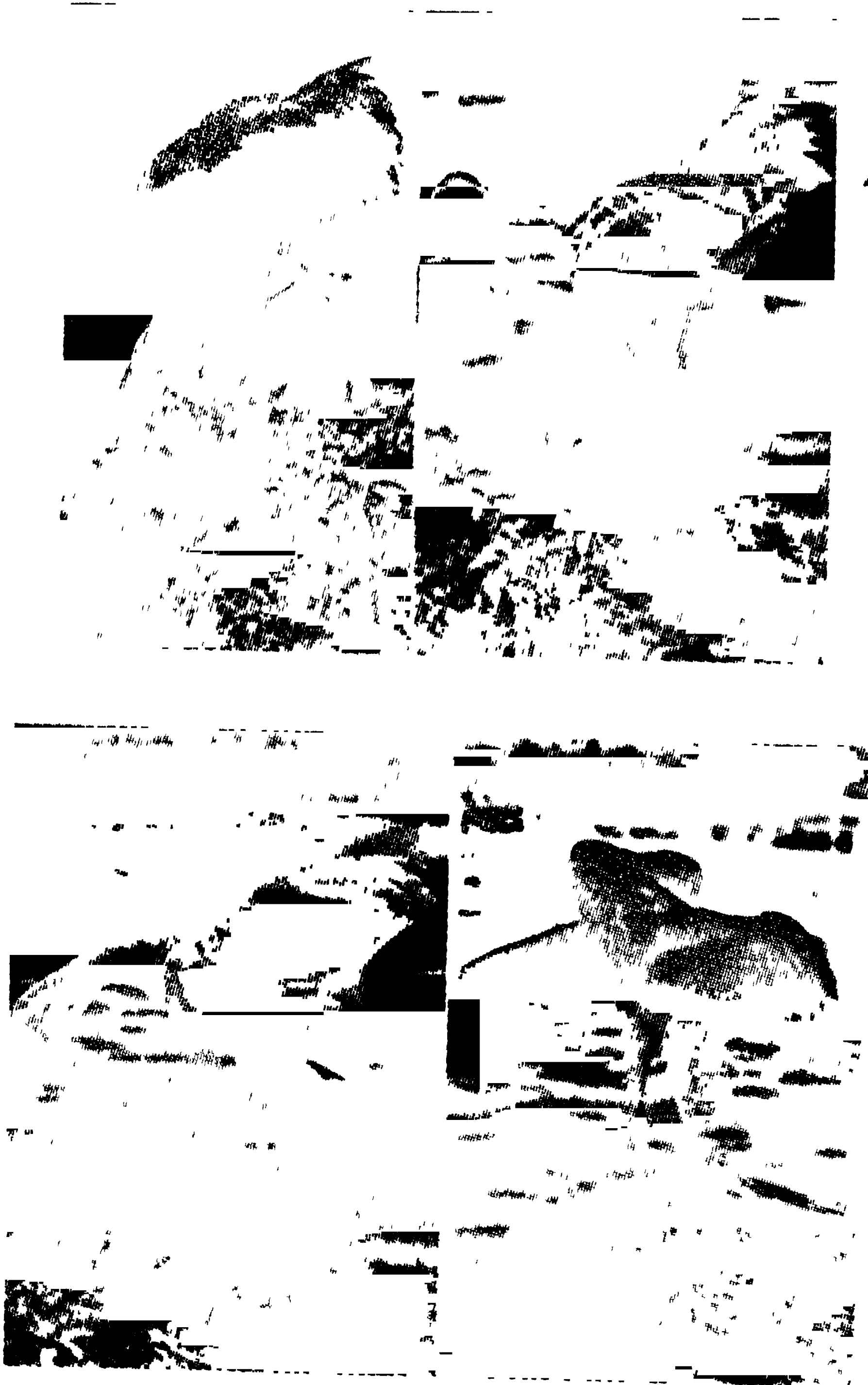
করে দেখ

অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী

অক্সিজেন গ্যাসের কথা তোমাদের অজানা নয়। এর বহুবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা না জানলেও একটা কথা বোধহয় সবাই জান যে, অক্সিজেন ছাড়া আমরা শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারি না। যতই ঊর্ধ্বে ওঠা যায় বাতাস ততই বিরল হতে থাকে; কাজেই অক্সিজেনও কম পড়ে। এজন্যেই প্রথম এভারেষ্ট অভিযাত্রীদের ২৭,০০০. ফিট উপরে ওঠবার পর এক পা চলতে প্রায় ৭।৮ বার শ্বাসগ্রহণ করতে হয়েছিল। পরবর্তী অভিযাত্রীরা সেজন্যেই অক্সিজেন সিলিণ্ডার সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করেন। গত যুদ্ধের সময় অতি ঊর্ধ্বে বিচরণকারী বোমারু বিমানের আরোহীদেরও অক্সিজেন সিলিণ্ডার
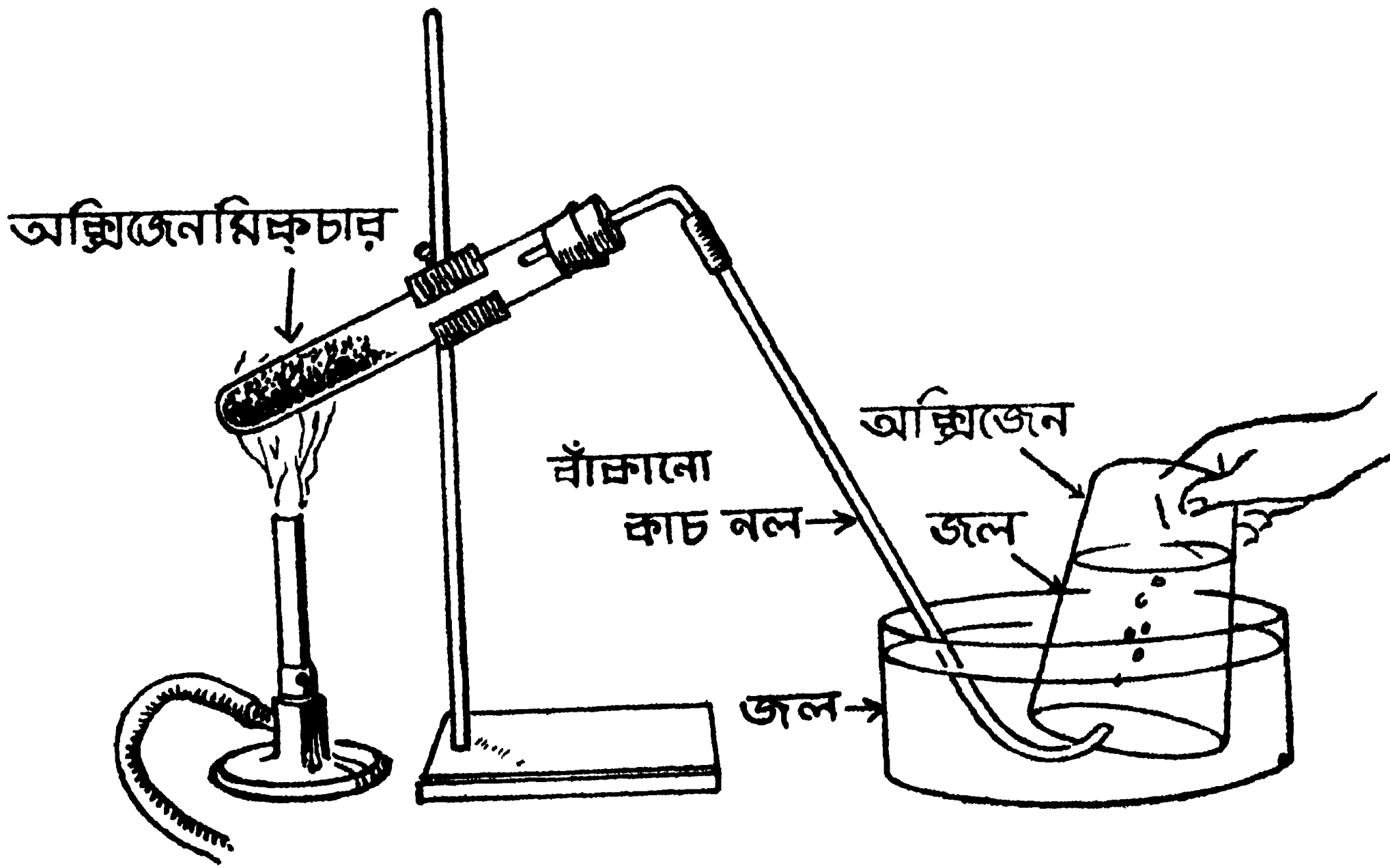
অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালী

ব্যবহার করতে হয়েছিল। ডিষ্টিল করে তরল বায়ু থেকে অল্প খরচায় প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। তোমরা যদি অক্সিজেন নিয়ে কোন পরীক্ষা করতে চাও তবে সহজেই যাতে অক্সিজেন গ্যাস তৈরী করে নিতে পার তার ব্যবস্থার কথা বলছি।

ব্যবস্থাটা খুব জটিল নয়, সহজেই প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যোগাড় করতে পারবে, তবে কোন লেবরেটরীতে করতে পারলেই সব চেয়ে সুবিধা হবে। যাহোক, প্রথমে একটা শক্ত কাচের টেষ্টটিউব যোগাড় করতে হবে। টেষ্টটিউবের মুখে বেশ এঁটে বসতে পারে, এরকমের একটা কর্কের ছিপি এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করে তার মধ্যে

ছবির মত দু-মুখ বাঁকানো লম্বা একটা কাচের নলের একটা মুখ ঢুকিয়ে দিতে হবে। এবার টেষ্টটিউবটার মধ্যে খানিকটা পটাসিয়াম ক্লোরেট রেখে নলসমেত কর্কটাকে টিউবের মুখে এঁটে দাও। মুখটা উপরের দিকে রেখে কাৎভাবে টেষ্টটিউবটাকে ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আট্‌কে দিতে হবে। কানাউঁচু একটা পাত্রে জল ভর্তি কর। টেষ্টটিউবের বাঁকানো নলটার অপর মুখটাকে সেই জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। কানায় কানায় জল-ভর্তি একটা কাচের গ্লাস জলে-ডুবানো নলটার মুখের উপর উবুড় করে ধর। এবার গ্যাস বার্নার দিয়ে টেষ্টটিউবের পটাসিয়াম ক্লোরেট উত্তপ্ত করলেই বুদ্বুদের আকারে গ্লাসের মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস উঠতে থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসের জলও কমতে থাকবে। পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশিয়ে নিলে আরও তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নির্গত হতে থাকবে। তিন ভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশাতে হবে। এই মিশ্রিত পদার্থকে বলা হয়—অক্সিজেন মিক্‌চার। —গ

জেনে রাখ

অ্যালুমিনিয়ামের পাহাড়ে

পুরুলিয়া জংসন থেকে যে ছোট লাইনটি বেরিয়েছে তার শেষপ্রান্তে লোহারডাগা। পথে দুটি বিখ্যাত ষ্টেশন পড়ে—প্রথমে মুরী জংসন তারপর রাঁচী। পুরুলিয়া থেকে ৫৮ মাইল, মুরী থেকে লোহারডাগা (রাঁচী হয়ে) ৭৯ মাইল।

বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময় গাড়ী রাঁচীতে পৌছলো। রাঁচীতে অধিকাংশ যাত্রীই নেমে পড়লো। আমরা সব লোহারডাগার যাত্রী। আগে লোহারডাগার যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম থাকতো। কিন্তু এখন ওখানে অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী হওয়ার পর থেকে যাত্রীর সংখ্যা কিছু বেড়েছে।

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় গাড়ী লোহারডাগায় পৌছলো। ষ্টেশন থেকে দূরে অনেক পাহাড় দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, ঐ পাহাড়গুলির মধ্যে বগরু নামে একটি পাহাড়ই আমাদের গন্তব্য স্থান। পাহাড়ে যেতে হলে কোম্পানীর বাসে করে যেতে হয়। বগরু পাহাড় থেকে অ্যালুমিনিয়াম-পাথর (বক্সাইট) রোপওয়ে দিয়ে আসে। লোহারডাগা ষ্টেশন এই রোপওয়ের একটি প্রান্ত। যে পাথর রোপওয়ে দিয়ে আসছে তাকে একটা উঁচু জায়গা থেকে নীচের রেলওয়ে ওয়াগনে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এই সব পাথর এখান থেকে মুরীর কারখানায় যাচ্ছে। আমরা ট্রেন থেকে নেমে মোটরে

চললাম। এখান থেকে পাহাড় প্রায় ১১ মাইল। পথ দুর্গম। অনেকক্ষণ চলবার পর গাড়ী পাহাড়ের পাদদেশে এসে গেল। এখান থেকে স্পষ্ট দেখলাম যে, পাহাড়ের ওপর থেকে ঠিক সাদা সুতার মত রোপওয়ের থামগুলি সোজা নেমে এসে ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে। গাড়ী পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলো। মাঝে মাঝে অনেকখানি করে খাড়াই পথ উঠতে হচ্ছিল। চারদিকে গভীর জঙ্গল। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে রোপওয়ের তার চলে গেছে। সেই জন্যে অনেক জায়গায় মাথার ওপর লোহার জালতি দেওয়া আছে, পাছে কোন বাল্‌তি পড়ে গিয়ে কারুকে জখম করে!

পাহাড়ে পৌঁছলাম। পাহাড়ের ওপর দু-দিকে দু-সারি কোম্পানীর কোয়ার্টার্স। একদিকে অফিস ঘর ইত্যাদি। পাওয়ার হাউসে দুটি ডাইনামো (ডিজেল) আছে। একটি জনসাধারণকে আলো জোগায়, অন্যটির বিদ্যুতে রোপওয়ে চালানো হয়। দ্বিতীয় ডাইনামোটি বিশেষ শক্তিশালী। এখানে বাঘ-ভালুকের উপদ্রব খুব বেশী। রাত্রে মাঝে মাঝে ভালুক মোকাই (ভুট্টা) খেতে আসে।

অ্যালুমিনিয়াম প্রাপ্তির প্রধান উৎস হচ্ছে ক্রায়োলাইট আর বক্সাইট। এখানকার সমস্ত পাথর উৎকৃষ্ট ধরনের বক্সাইট। এতে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা থাকে। বক্সাইট, জমানো সিমেন্টের মত ছাই রঙের পাথর। যেখানে বক্সাইট পাওয়া যায় সেখানে প্রথমে সাধারণ লাল কাঁকরের স্তর ও পরে বক্সাইট পাওয়া যায়। এখানে নানা জায়গা থেকে পাথর কাটা হচ্ছে। কাছাকাছি পাহাড় থেকে পাথর কাটার কথাও হচ্ছে। পাথর নানাভাবে কাটানো হয়। কোন জায়গায় সাধারণভাবে কুলির সাহায্যে কাটানো হয়, কোথাও বা মেসিন দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বারুদের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আগে ডিনামাইট দিয়েও পাথর ফাটানো হতো। এখন তার জায়গায় গিলেগনাইট দিয়ে পাথর ফাটানো হয়। এসব প্রয়োজন মিটানোর জন্যে এখানে দুটি বারুদ ঘর আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এখান থেকে পাথর মুরীতে যায়। মুরীতে এদের একটি বিরাট কারখানা আছে। সেখানে বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনা বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয়। তারপর অ্যালুমিনাকে বৈদ্যুতিক উপায়ে বিশ্লেষণ করলেই বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। এই কারখানায় যে জলের প্রয়োজন হয় তা পাশের সুবর্ণ-রেখা নদী থেকে পাওয়া যায়।

বগরু পাহাড়ে যে জলের প্রয়োজন হয় তা পাহাড়ের নীচের ছোট নদী থেকে পাম্প করে তুলে রাখা হয়। এখানকার নানারকম নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি, যেমন নতুন ধরনের ট্রাক, নতুন ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিন (ধাতু জোড়ার মেশিন) ইত্যাদির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কাজ হচ্ছে।

শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারস পাখীর নৃত্য

তোমরা অনেকেই হয়তো সারস পাখী দেখে থাকবে। না দেখলেও আলিপুরের বাগানে গেলেই দেখতে পাবে। এই সারস পাখীর নৃত্য এক অপূর্ব দর্শনীয় বস্তু। পায়রা, চড়ুই প্রভৃতি সাধারণ পাখীদের নৃত্যও খুব উপভোগ্য বটে; কিন্তু তাদের নৃত্য অনেকটা একঘেয়ে—অনেকক্ষণ ধরে একই তালে, একই ভঙ্গীতে তারা নৃত্য করে থাকে। সারস পাখীর নৃত্য কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এদের নাচের মধ্যে শোয়া-বসা, দৌড়-ঝাঁপ সব কিছুই আছে। তবে সব ক্ষেত্রে সব রকম পরিবেশেই সারস পাখীর নৃত্যের উৎসাহ দেখা যায় না। যাহোক, সারস পাখীর নৃত্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কথা তোমরা সবাই জান। সাধারণতঃ লোকের ধারণা—তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানচর্চাতেই জীবন অতিবাহিত করেছেন, অন্যদিকে তেমন নজর দেন নি; কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। তাঁর ছিল কবি-মন। সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, ললিতকলায় ছিল তার অকৃত্রিম অনুরাগ। তাছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্য, জীব-জন্তু, পশু-পাখী সম্বন্ধে তাঁর ছিল অদম্য কৌতূহল। এজন্যে তিনি বিজ্ঞানমন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনের পার্শ্বে পশুশালা ও পক্ষিগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রকমের পাখীর মধ্যে একজোড়া সারসও ছিল। এখন সেই পশুশালাও নেই, পক্ষিগৃহও নেই; কিন্তু সারস দুটি না থাকলেও তাদের আস্তানাটি এখনও আছে। সারস দুটি প্রাঙ্গনের চতুর্দিকে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতো, আর সকালে-বিকালে অপূর্ব নৃত্যের ভঙ্গীতে দু-জনে ছুটাছুটি লাফালাফি করে দর্শকদের আনন্দবর্ধন করতো। কিছুদিন পরে একটি সারস মারা যায়। সঙ্গীহীন অপর সারসটি কিছুদিন পর্যন্ত ম্রিয়মাণ অবস্থায় পিঠের উপর ঠোঁট গুঁজে একস্থানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপর ধীরে ধীরে সে ভাবটা কেটে গেল। দক্ষিণদিকের কক্ষগুলিতে ছিল খুব নীচু কাচের জানালা। সারসটা সারাদিনের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ সময়ই সেসব জানালার কাছে এসে ঘোরাফেরা করতো এবং সার্সির উপর প্রতিফলিত নিজের প্রতিচ্ছবিকে তার সঙ্গী ভেবে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য করতো। ইতমধ্যেই ওখানকার একটা পোষা কুকুরের নজর পড়ে পাখীটার উপর। সকাল-বিকাল দু-বেলাই পাখীটার সঙ্গে তার ছুটাছুটি করা চাই! পাখীটা মাঠের মধ্যে হয়তো চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে—কুকুরটা এসেই ছুটে গেল তাকে ধরতে। সঙ্গে

সঙ্গে সেও ছুটতে থাকতো। অত বড় মাঠটার চতুর্দিকে বহুবার চক্কর দেওয়ার পর খেলা শেষ হতো।

এর কিছুকাল পর থেকে আরম্ভ হলো তার একক নৃত্য। প্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য রং-বেরঙের ফুল ফুটে থাকতো। অনেক সময়ই দেখা যেতো, গাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে অথবা নিজেরই ঝরে-পড়া একটা পালক ঠোঁটে করে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলতো তার অদ্ভুত নাচ। একবার শুয়ে আবার বসে—কখনও বা লাফিয়ে উঠে নাচের প্রথম পর্ব সুরু হতো। ডানা অর্ধপ্রসারিত করে অদ্ভুত গ্রীবাভঙ্গী সহকারে মন্থর গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতো সেই নাচ। সে নাচ একটা অপূর্ব দর্শনীয় বস্তু। দেশী, বিদেশী বহু দর্শক সঙ্গীহীন সেই সারসটার অপূর্ব নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। দর্শকদের সামনে তার নৃত্যের উৎসাহ যেন বেড়ে যেত; আর মাঝে মাঝে কর্কশ চীৎকার!

আর্ট পেপারের ছবিতে সারস পাখীর নৃত্যের প্রাথমিক কয়েকটি ভঙ্গীমা দেখা যাচ্ছে। সুবিধা পেলে কোন পোষা সারস পাখীর নাচ দেখবার চেষ্টা করো। সেই নৃত্য দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবে। —গ—

উড়ন্ত পিরিচ

তোমাদের অনেকেই হয়তো Flying Saucer, অর্থাৎ উড়ন্ত পিরিচের কথা শুনে থাকবে। কারণ বিগত কয়েক বছর ধরেই খবরের কাগজে মাঝে মাঝে উড়ন্ত পিরিচের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকার আকাশে সময় সময় অনেকেই থালার মত একটা জ্বলন্ত পদার্থকে ছুটে যেতে দেখেছে। লোকে এই অদ্ভুত পদার্থটারই নাম দিয়েছে—Flying Saucer বা জ্বলন্ত পিরিচ। অথচ এই উড়ন্ত পিরিচটা যে কি—সে কথা কেউ বলতে পারে না। কারুর ধারণা—ভৌতিক দৃশ্য, কারুর ধারণা—নতুন কোন আণবিক অস্ত্র; কিন্তু অনেকেরই অনুমান—রাশিয়া কোন অভিনব অস্ত্রের পরীক্ষা করছে।

কিন্তু সবই অনুমান মাত্র; এতে অনুসন্ধিৎসু মনের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় নি। তবে একটা ব্যাপার থেকে উড়ন্ত পিরিচের প্রকৃত রহস্য বুঝা গেছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি উইণ্ডসর লক্স্-এ বিমান বাহিনীর একটি দ্রুতগামী বিমানে Hell Roarer নামে একটা যন্ত্রের পরীক্ষা হচ্ছিল। নৈশ আকাশে এই দৃশ্য দেখে অনেকেই সেখানকার পুলিশ ষ্টেশনে ফোন করে জানায়। কেউ বলে আকাশে উড়ন্ত পিরিচ দেখা যাচ্ছে, আবার কেউ বলে প্লেনে আগুন লেগেছে। বুঝা গেল, উড়ন্ত বিমানের Hell Roarer-কেই লোকে

উড়ন্ত পিরিচ বলে ভুল করেছে। Hell Roarer এক রকমের অভিনব ফটোগ্রাফিক যান্ত্রিক কৌশল। শত্রুপক্ষের কার্যকলাপ জানবার জন্যে দ্রুতগামী বিমানে করে এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে ফটো তোলা হয়। টর্পেডোর মত আকৃতিবিশিষ্ট ১২ ফুট লম্বা একটা সিলিণ্ডারে যন্ত্রটা বসানো থাকে। সেটাকে এরোপ্লেনের ডানার সঙ্গে

নৈশ আকাশে দ্রুতগামী এরোপ্লেনে Hell Roarer-এর দৃশ্য

জুড়ে দেওয়া হয়। পাইলট ইচ্ছামত যন্ত্রটাকে খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। আকাশ থেকে রাত্রির অন্ধকারে ফটো তোলবার জন্যে Hell Roarer-এ বিশেষ ধরনের ক্যামেরার ব্যবস্থা আছে। অন্ধকারে ছবি তোলবার জন্যে অতি উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন। ম্যাগ্নেসিয়াম পাউডারের সাহায্যে অতি তীব্র আলো উৎপন্ন করা হয়। এই আলো তিন-চার মিনিটেরও বেশী সময় থাকে। এই আলোর তীব্রতা প্রায় ১০,০০০,০০০ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের সমান। চালু থাকবার সময় যন্ত্রটাতে ভীষণ শব্দ হতে থাকে। এই জন্যে যন্ত্রটাকে Hell Roarer নাম দেওয়া হয়েছে। অন্ধকারে বিমানটা দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ Hell Roarer-এর আলোক প্রতিফলকটাকে নৈশ আকাশে দূর থেকে উজ্জ্বল একটা উড়ন্ত থালার মত প্রতীয়মান হয়। এখানে দেওয়া ছবি থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবে। এই ঘটনা থেকে মনে হয়, উড়ন্ত পিরিচ সম্বন্ধে যতকিছু খবর শোনা গেছে তার সবটার মূলেই এরকমের কোন না কোন একটা ব্যাপার রয়েছে।

—গ-

আবিষ্কারের কাহিনী

(পেনিসিলিন)

১৯৪১ সাল।

র‍্যাডক্লিফ্ ইন্‌ফারমারি। ষ্ট্রেপটোককৃকাস জীবাণু আক্রান্ত হয়ে একটি বালিকা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আর একটি শিশু আক্রান্ত হয়েছে অষ্টিওমাইলিটিস রোগে। মরণের গ্রাস থেকে তাদের রক্ষা করতে চিকিৎসকগণ অক্ষম বলে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। একখানি বাইসাইকেলে চড়ে হাসপাতাল প্রাঙ্গনে এলেন এক ভদ্রমহিলা। অষ্ট্রেলিয়া থেকে ডাক্তারী পাশ করে তিনি তাঁর স্বামী হোয়ার্ড ফ্লোরীর কর্মস্থল অক্সফোর্ডে এসেছেন অল্পদিন হলো। মহিলা চিকিৎসক নতুন রকমের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলেন ওই দুটি রোগীকে। মরণোন্মুখ দু'জন রোগীই প্রাণ ফিরে পেল পেনিসিলিন চিকিৎসায়।

এই থেকে আরম্ভ হলো পেনিসিলিনের বিজয় অভিযান। প্রভাতের সূর্যোদয় হয় তমসাচ্ছন্ন রজনীর অবসানে। পেনিসিলিনের ইতিহাসেরও তমসাচ্ছন্ন পর্যায় শেষ হলো।

১৯২৮ সাল।

সেপ্টেম্বরের আর্দ্র আবহাওয়াতে সেন্ট মেরী হাসপাতালে জীবাণু-বিজ্ঞানী ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং তাঁর দৈনন্দিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন রকমের জীবাণু উপনিবেশ সৃষ্টি করা ছিল জীবাণু-বিজ্ঞানীর দৈনন্দিন কার্যের অঙ্গ। কিন্তু সেদিন ষ্ট্যাফাইলোককৃকাস উপনিবেশ সৃষ্টি ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। জীবাণু-কালচারের স্লাইড, অর্থাৎ কাঁচের উপর ছাতা ধরে ষ্ট্যাফাইলোককৃকাস উপনিবেশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ডাঃ ফ্লেমিং-এর গবেষণার ফলে ককৃকাই গোষ্ঠীর জীবাণু ধ্বংসের এক অভিনব পন্থার সন্ধান পাওয়া গেল। পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীর ছত্রাক থেকে পাওয়া জীবাণু-ধ্বংসকারী বস্তুর নতুন নাম হলো পেনিসিলিন। এর পর আট মাস কেটে গেল। ডাঃ ফ্লেমিং অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ধৈর্য নিয়ে নতুন বিষয়ে নানারকম তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। এই অভিনব আবিষ্কারের ফলে ষ্ট্যাফাইলোককৃকাস, ষ্ট্রেপটোককৃকাস, নিউমোককৃকাস এবং অন্যান্য কতকগুলি গোষ্ঠীর জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব হলো।

ডাঃ ফ্লেমিং-এর আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হলো। তাঁর সম্মান, প্রতিপত্তি বেড়ে গেল; কিন্তু এর পর এল আবিষ্কারের পরিপূর্ণ প্রকাশে বাধা। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে তখন আশানুরূপ সাহায্য পেলেন না। কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্য তাঁকে গৌরবের চরম শিখরে নিয়ে যেতে এসে দাঁড়ালো।

১৯৩৮ সাল।

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সুচনা দেখা দিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ডের হাসপাতালগুলি আহত রোগীতে ভরে উঠতে লাগলো। চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্যা উৎকট হয়ে উঠলো। আহতদের মৃত্যুর হার ভয়াবহভাবে বেড়ে চললো। ডাঃ ডোমাগ আবিষ্কৃত প্রোণ্টোসিল প্রভৃতি সাল্‌ফা ড্রাগ আশানুরূপে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিজ্ঞানী-দের মানসিক চাঞ্চল্য চরমে পৌঁছে গেল।

অক্সফোর্ডের প্যাথোলজির অধ্যাপক হোয়ার্ড ফ্লোরি সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। ডাঃ ফ্লোরির মনে পড়ে গেল ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর ১৯২৮-এর জীবাণু-ধ্বংসকারী ছত্রাক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের কথা।

সেণ্ট মেরী হাসপাতাল। শুভ্রকেশ ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর কাছে ফ্লোরি এলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তথ্যাদি বিশদভাবে জানবার উদ্দেশ্যে এবং বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা করবার জন্যে উপদেশ গ্রহণ করতে। ডাঃ ফ্লেমিং তাঁর অভিজ্ঞতা সব কিছুই তাঁকে বললেন।

ডাঃ ফ্লোরি গবেষণার পর আশ্বস্ত হলেন যে, ডাঃ ফ্লেমিং-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণ সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মহাযুদ্ধ এগিয়ে চলছে, আহতদের প্রাণহানির সংখ্যাও বেড়ে উঠছে। বিজ্ঞানীর মনে দেখা দিল আশার আলো—সমস্যাকে হয়তো জয় করা যাবে। পেনিসিলিনের গবেষণার কাজ এগিয়ে চললো।

১৯৪০ সাল।

লণ্ডন পুলিশের একজন কর্মচারী সেফ্‌টিক রোগগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে ছট্‌ফট্‌ করছেন। নব আবিষ্কৃত পেনিসিলিন প্রয়োগ করা হলো রোগীর উপর। তৃতীয় দিনেই রোগীর সমস্ত ব্যথা এবং গ্লানির অবসান হলো। চিকিৎসকগণের দৃঢ়বিশ্বাস হলো—রোগী বেঁচে উঠবে; কিন্তু সন্ধিক্ষণে সরবরাহ গেল ফুরিয়ে। তখন পেনিসিলিন উৎপাদনের সমস্যাই বড় হয়ে উঠলো। এরপর আর একটি রোগীর উপর পরীক্ষা চালান হলো। এবারও সরবরাহ ফুরিয়ে গেল, কিন্তু রোগী বেঁচে ওঠবার পর।

ডাঃ ফ্লোরি এই নতুন ওষুধ উৎপাদনের জন্যে আত্মনিয়োগ করবেন ঠিক করলেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন চিকিৎসা-ব্যবসায়ের কি হবে? আর একটা সমস্যা!

সমস্যার সমাধানে ডাঃ ফ্লোরির সহধর্মিণী এগিয়ে এলেন।

বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যাথার অবসান হলো ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এবং ডাঃ ফ্লোরির যুক্তপ্রচেষ্টায়।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

বিবিধ

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ

রয়টারের খবরে প্রকাশ—পশ্চিম জার্মেনীর অন্তর্গত ফ্রিব্যুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭২ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক হারম্যান ষ্টডিঙ্গার রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি অ্যালবুমেন, সেলুলোজ ও ভারতীয় রবার প্রভৃতি জৈব পদার্থের আণবিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করিয়া সারা পৃথিবীতে প্লাষ্টিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

পদার্থবিদ্যায় এই বৎসর নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন ডাঃ ফ্রিট্‌স্ জেরনিকে। তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর। এই ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক ইলেক্‌ট্রো-মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন।

তিনি হল্যাণ্ডের গ্রোনিজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং বৃটিশ রয়্যাল সোসাইটি অব মাইক্রোস্কোপির সদস্য।

তিনি রিভোলভিং স্পুল গ্যালভ্যানোমিটার নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কারক।

প্রাণের সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধানে

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তেইশ বয়স্ক বিজ্ঞানের ছাত্র ষ্ট্যানলী মিলার গবেষণাগারে পরীক্ষা চালিয়ে প্রাণময় এক রকমের জৈব পদার্থ সৃষ্টি করেছেন। এই জৈব পদার্থটি পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত প্রাণের অনুরূপ।

বিশ্ববিখ্যাত নিউক্লিয়ার-বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারল্ড সি. উরের অধীনে এই তরুণ বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন। তিনশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল, মিলার তাঁর পরীক্ষাগারে সেই অবস্থারই সৃষ্টি করেছিলেন। সাধারণতঃ বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় প্রথম যখন প্রাণময় পদার্থের উদ্ভব ঘটে তখনকার পরিবেশে ছিল মার্স গ্যাস, অ্যামোনিয়া এবং জল।

মিলার তাঁর পরীক্ষাগারে একটি কৃত্রিম পৃথিবী তৈরী করেন। এই পৃথিবীটাকে রাখা হলো কাচের ফ্লাস্কে। ফ্লাস্কের মধ্যে জল রেখে সেই জল জ্বাল দেওয়া হলো, জলীয় বাষ্প মিশে গেল বিশেষ বিশেষ কয়েকটি গ্যাসের সঙ্গে। তারপর এই কৃত্রিম জলবায়ুতে তড়িৎশক্তি পরিচালন করা হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষায় ইতিহাস সৃষ্টি

তড়িতাহত ঐ জল-বায়ু সমন্বিত কৃত্রিম পৃথিবীটিতে এবার দেখা গেল, অসংখ্য সূক্ষ্ম কণিকায় অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হচ্ছে। এই অ্যামিনো অ্যাসিডের কণিকাগুলিই হচ্ছে প্রাণময় পদার্থের মৌলিক অণু। এই কণিকাগুলিই প্রোটিন, মাংস, ডিমের শ্বেতাংশ, ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড এবং দেহযন্ত্র গঠনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সৃষ্টির মূল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রসায়নবিদ এবং জীববিজ্ঞানী প্রোটিনের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি। এবার বোধ হয় তাঁরা এতদিনের অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধান পেতে পারেন।

মিলার কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের মিলন ঘটিয়েছেন এবং এভাবে রাসায়নিক জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি আশা করছেন যে, অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টির একটা উন্নততর প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারবেন এবং গবেষণাগারে সেটা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

এই প্রাথমিক গবেষণার ফলে হয়তো ডিমের শ্বেতাংশ অথবা এক টুকরা মাংস সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কৃত্রিম মাংসপেশী সৃষ্টি করাও হয়তো অসম্ভব নয় এবং সেগুলি স্বাভাবিক মাংসপেশীর মতই হবে। জীবন্ত মাংসপেশীর মতই সেগুলির সঙ্কোচন-প্রসারণ ঘটানো যাবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্প্রসারণ

ভারত সরকার দেশে বেকার সমস্যা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় ঊর্ধ্বে ১৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহিত ১৫০ কোটি হইতে ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়সাধ্য নূতন নূতন স্কিমসমূহ সংযোজিত হইবে। তাহা হইলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয় ২২১৯ হইতে ২২৪৪ কোটি টাকা হইবে। বর্তমানে ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া নির্ধারিত আছে।

গত ৭ই অক্টোবর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনের শেষ দিনে উহার উপসভাপতি শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ সম্প্রসারিত কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে সমস্ত স্কিম প্রেরণ করিয়াছিলেন তৎসমুদয়ের কতক পরিষদ কর্তৃক আলোচিত হয়।

জনসাধারণের সাড়া

পরিষদের সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু একবার আলোচনায় যোগ দিয়া বলেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, বিশেষতঃ উহার কোন কোন বিষয়ে জনসাধারণের নিকট হইতে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন্তোষজনক এবং কতকটা বিস্ময়কর। তিনি আশা করেন যে, পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার সময়ে এই বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখা হইবে। কারণ গণতন্ত্র একা সরকারের পক্ষ হইতে চালু থাকিতে পারে না।

শ্রী কৃষ্ণমাচারী পরিকল্পনা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া বলেন যে, যে সমস্ত স্কিম সম্প্রসারিত কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে তৎসমুদয়ের নিম্নোক্ত তিনটি সর্ত পূরণ করা চাই :—(১) স্কিমসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া দরকার, (২) সমুদয় পরিকল্পনা রূপায়িত করা মেয়াদের মধ্যে ফলপ্রসূ হওয়া দরকার, (৩) লোককে ট্রেনিং দেওয়া সম্পর্কিত স্কিমসমূহ পরিকল্পনার প্রয়োজনের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া দরকার।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নে ওভারসিয়ার, মেকানিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের অভাব অনুভূত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্কিমসমূহের লক্ষ্য হইবে এই অভাব দূরীকরণ।

অর্থ সংগ্রহের উপায়

পরিষদের অধিবেশনে স্কিমসমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রশ্নও আলোচিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রস্তাব করেন। পরিষদ আরও অর্থ সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন কর ধার্যের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। উপসভাপতি প্রস্তাব করেন যে, এইরূপ কর ধার্য করিবার জন্য রাজ্য সরকারসমূহের যথাসম্ভব সত্বর আইন প্রণয়ন করা উচিত। তাহা হইলে বিভিন্ন স্কিম কেবল লাভজনক হইবে না, পরন্তু এইভাবে লভ্য অর্থ অন্যান্য অনুমোদিত স্কিমের জন্য ব্যয় করা যাইবে।

এই সম্পর্কে তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহের আবশ্যকতা বিবৃত করেন। তিনি অন্যান্য রাজ্যকে মাদ্রাজ সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন।

বেকার সমস্যার সমাধান অতি জরুরী বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন সম্প্রসারিত কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত স্কিমসমূহ কমিশনের নিকট পেশ

করিবার মেয়াদ নির্ধারণ করিতে পারেন। জানা গিয়াছে যে, কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার সময়ে কতকগুলি স্কিম সম্প্রসারিত কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নাহারকাটিয়ার মৃত্তিকার ১০ হাজার ফুট নিম্নে তৈলের সন্ধান প্রাপ্তি

আসাম অয়েল কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পলিময় মৃত্তিকাস্তরের নীচে কোথায় তৈল সঞ্চিত থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝিবার জন্য বৃষ্টির সময় চলিয়া গেলে পেট্রোলিয়াম শিল্পে পরিজ্ঞাত সর্বাধুনিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসারে পদার্থবিদ্যাসম্পর্কিত ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হইবে। যেরূপ তন্ন তন্ন করিয়া তৈলের উৎস অনুসন্ধান করা হইবে, সেরূপ অনুসন্ধান ভারতে আর কখনও হয় নাই।

কোম্পানী আকাশ হইতে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য হেলিকপটার বিমান এবং চুম্বক যন্ত্র সমন্বিত সাধারণ বিমান ব্যবহার করিবেন। এশিয়ার তৈলের উৎস অনুসন্ধানের কার্যে এই সর্বপ্রথম হেলিকপটার বিমান ব্যবহৃত হইবে।

আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত মিসমী পাহাড় হইতে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মিকির পাহাড় পর্যন্ত ৫ সহস্রাধিক বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে এই অনুসন্ধান-কার্য চালান হইবে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পলিময় সমতল ক্ষেত্র অবস্থিত। এই সমতল ক্ষেত্রে ডিগবয়ের আসাম অয়েল কোম্পানীকে তৈলের উৎস অনুসন্ধানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

ডিগবয়ের মূল তৈলক্ষেত্রের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পলিময় উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত নাহারকাটিয়ায় তৈল-অনুসন্ধান পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্য আরম্ভ হইবে। এই অঞ্চলে সম্প্রতি ১০ হাজার ফুট গভীরতায় অবস্থিত মৃত্তিকাস্তর পর্যন্ত একটি তৈলকূপ খনন করিয়া তথায় তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলেই এই উপত্যকায় তৈলের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নূতন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আসাম অয়েল কোম্পানী ঐ একই অঞ্চলে আরও তৈলকূপ খননের ব্যবস্থা করিতেছেন। ২নং নাহারকাটিয়া তৈলকূপ খননের কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। সরকারের অনুমতি পাওয়া গেলে ৩নং তৈলকূপ খননের কার্য আরম্ভ হইবে। অতঃপর আরও তৈলকূপ খননের সম্ভাবনা আছে।

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রসার

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা আন্তঃরাজ্য সম্মেলনে কলিকাতা, পাটনা ও গয়া পর্যন্ত দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রসারণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে রচিত না হইলেও এইটুকু জানা গিয়াছে যে, উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে দুই বৎসরের মধ্যেই কলিকাতায় ৪৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে এবং ক্রমশঃ সরবরাহের পরিমাণ বাড়াইয়া চার বৎসরের মধ্যে ৮৫ হাজার কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিবে এবং শিল্প-প্রসারণও হইবে। এই নূতন বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা কলিকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার সহিত যুক্ত হইবে এবং কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এই বিদ্যুৎ ক্রয় করিয়া সরবরাহ করিবে।

আশা করা যায়, বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা প্রসারণের পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের বেকারসমস্যা সমাধানে বহুলাংশে সাহায্য করিবে। বোকারো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

এখানে যে তিনটি বিপুলায়তন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে দেড় লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে। বোকারো বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র হইতে মোট ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে।

বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রসার পরিকল্পনার আর্থিক দিকটি এখন পরীক্ষাধীন রহিয়াছে। এক বৎসর পর কলিকাতা ও দামোদর উপত্যকা এলাকার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থাদির পর্যালোচনা করা হইবে।

সম্মেলনে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন পরিকল্পনার সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ আলোচিত হইয়াছে। বর্তমানে স্থির হইয়াছে, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ৮৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

যন্ত্রপাতির মূল্যবৃদ্ধি এবং মূল পরিকল্পনার প্রসারের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিবে। কোণার পরিকল্পনায় কয়েকটি ব্যবস্থা বাদ দিয়া ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বাঁচাইবার জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে কোণারে সাবসয়েল হাইড্রো-ইলেকট্রিক ষ্টেশনের কাজে হাত দেওয়া হইবে না। কোণার কেন্দ্রের কাজ এই বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে।

ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এলাকায় উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্নও সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে। জমির বদলে জমি, বাড়ীর বদলে বাড়ী— এই ব্যবস্থার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যতদূর সম্ভব উদ্বাস্তুদের পূর্বেকার জমি ও বাড়ীর নিকটবর্তী এলাকায় জমি ও বাড়ী দিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

রাও কমিটির রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকার এবং দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মন্তব্য সহ রাও কমিটির রিপোর্ট আলোচিত হইয়াছে। সম্মেলনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সংসদের আগামী অধিবেশনে রিপোর্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থার প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে।

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কর্তৃক আদর্শ খামার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনাও সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে।

পঁচাত্তর বছরে বিদ্যুৎ-শিল্পের অগ্রগতি

এই বছরেই আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিকের ৭৫তম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

অনেক দিন আগের কথা। ১৮৭৯ সালে টমাস আলভা এডিসন তাঁর প্রথম বিজলী বাতির জন্যে এক টুকরো কার্বনের তার লাগিয়ে দেন, আর সেই আলো এডিসনের মেনলো পার্কের গবেষণাগারে ৪৮ ঘণ্টা ধরে জ্বলেছিল। বিদ্যুৎশক্তি সেদিন থেকে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

তার পরের বছরগুলি বিদ্যুৎশক্তির দ্রুত অগ্রগতির প্রচেষ্টার জন্য স্মরণীয়। এই সময়ে অনেকগুলি ছোটখাটো ফার্মের পত্তন হয় এবং এদের অনেকেই এই নতুন বিদ্যুৎ-শিল্প প্রসারে জেনারেল ইলেকট্রিকের পূর্বগামী হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই ধরনের অনেকগুলি সংস্থা ১৮৮৯ সালে যুক্ত হয়ে একটি নতুন সংস্থা গড়ে তোলেন এবং তার নামকরণ হয়—দি এডিসন জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী।

অপর একটি বিখ্যাত বিদ্যুৎ-শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম হলো, টমসন-হাউস্টন কোম্পানী। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮৩ সালে চার্লস এ. কফিনের পরিচালনাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক টমসন ও তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক এডউইন জে. হাউস্টনের

নামানুসারে প্রতিষ্ঠানটির উক্ত নামকরণ হয়। এই সংস্থার ষোল বছরের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, সেণ্ট্রাল ষ্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে রেলচলাচল ব্যবস্থায় পরবর্তীকালে এই সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। তারপর উক্ত দুটি কোম্পানীর একত্রীকরণ হয়। কফিন জেনারেল ইলেকট্রিকের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হন।

এভাবে বিদ্যুৎ-শিল্পের অগ্রগতি চলতে থাকে। সে সময়ে বিদ্যুৎ-শিল্পের যে পরিণতি মানুষের উৎসাহের সঞ্চার করেছিল, তা হলো এডিসনের বিজলী বাতি। নিউইয়র্ক সহরের আনুমানিক এক বর্গ মাইলে এই আলোর ব্যাবস্থা করা হয়েছিল।

বিদ্যুৎ-শিল্পের এই অগ্রগতি কণ্টকমুক্ত ছিল না, নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সুনির্ধারিত হলো ১৮৯২ সালে। এই সময় জেনারেল ইলেকট্রিক অব ইউ. এস. এ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালের অর্থনৈতিক দুর্যোগে যখন সমস্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়, সেই সময় প্রেসিডেণ্ট কফিন জেনারেল ইলেকট্রিক সংস্থাকে সমস্ত বিপদের উর্ধ্বে তুলে রাখেন। জেনারেল ইলেকট্রিকের ইতিহাসে কফিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যখন উপযুক্ত পরিচালকের অভাব অনুভূত হচ্ছিল, তখন তার যোগ্য পরিচালনা।

কফিনের পরবর্তী এডউইন রাইস প্রধানতঃ একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনিই চার্লস এফ ষ্টেইনমেট্জকে নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ষ্টেইনমেট্জ বিদ্যুতের যাদুকর নামে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ষ্টেইনমেট্জ গাণিতিক নিয়মে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষমতা ও যোগ্যতা আগে থেকে নির্ধারিত করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

১৯০০ সালে রাইস একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন, যার সঙ্গে ব্যবসায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ ধরনের একটি পরিকল্পনা তখনকারদিনে শিল্প-জগতে অভিনব বলে মনে হয়েছিল।

রাইসের পরবর্তী জেরার্ড্ সোপ জেনারেল ইলেকট্রিক অব ইউ. এস-এর সম্প্রসারণ করেন।

আমেরিকার এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে চলেছে; প্রতি পদক্ষেপে নতুন ও আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

জেনারেল ইলেকট্রিক অব ইউ এস. এ এই বছরে ইণ্টারন্যাশনাল জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের মাধ্যমে ভারত সেবার পঞ্চাশৎ বার্ষিক অণুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন।

বিশ্বের অর্ধেক স্ত্রী-পুরুষ নিরক্ষর

প্যারিসের খবরে প্রকাশ, রাষ্ট্রপুঞ্জ দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর অর্ধেক সংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ নিরক্ষর এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক শিশুর শিক্ষার নিমিত্ত কোনরূপ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নাই।

কোন কোন দেশে নূতন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের অনুপাতে জন্মের হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই হেতু নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিতেছে।

রাশিয়ার দক্ষিণস্থ এশিয়ার প্রায় সর্বত্র, প্রায় সমগ্র আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দ্বীপে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা বিশেষ অসন্তোষজনক।

অপঙ্গ শিশু-হাসপাতাল

কলিকাতায় অপঙ্গ শিশুদের (পোলিও রোগাক্রান্ত) জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার এই প্রথম চেষ্টা হইতেছে। হাসপাতালটির নাম হইবে ডাঃ বি. সি. রায় অপঙ্গ শিশু-হাসপাতাল। প্রস্তাবিত হাসপাতালের

সাধারণ সদস্যদের এক সভা. আলিপুর বিজয়-মঞ্জিলে বর্ধমানাধিপতি স্যার উদয়চাঁদ মহতাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উক্ত কমিটির সভাপতি।

উক্ত কমিটির আহ্বায়ক ডাঃ সন্তোষ বসু জানান, আগামী জানুয়ারী মাসে হাসপাতালটি খোলা হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ইহার জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। হাসপাতালটি নির্মাণ করিবার জন্য বেলেঘাটা অঞ্চলে গংরবাগ নামে পরিচিত বিস্তৃত স্থানটি পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতায় এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতে মাত্র দুইটি এইরূপ হাসপাতাল হইবে। অপর হাসপাতালটি বোম্বাইতে অবস্থিত।

ভারতে রবিশস্যের উৎপাদন

কলাই	জমি—হাজার একর		পরিমাণ—হাজার টন	
	১৯৫২-৫৩	১৯৫১ ৫২	১৯৫২-৫৩	৯৪৯-৫০
ছোলা	১,৭২,৬৭	১,৬৮,৫৭	৩৭,৭১	৩২,৯৩
তুর (অড়হর)	৫৮,৫২	৬০,৬৫	১৬,০২	১৮,০১
মাষ কলাই	২৯,৩০	৩১ ৩৫	৩,০৫	৩,৬৬
মুগ	২৫,২০	২৬,৯৭	১,০২	২,৫৪
মসুর	১০,৯৯	১১,০৭	১,৯১	১,৮৪
কুলথি	২৭,১১	২৫,৩১	১,৮৬	১,৮২
বটবটী দিঃ	২২,৪২	২৩,৫২	৬,১২	৬, ৮
খেসারি	১৭,৭৮	১৭,৫৯	২,৪৬	২,২১
অপরাপর	১,০২,৭০	৯৮,৯৬	১৩,৯১	১৩,৩০
মোট	৪,৬৬,৬৯	৪,৬৩,৭৯	৮৪,৬৬	৮২,৪৯

১৯৫২-৫৩ সালে যে পরিমাণ ফসল হইয়াছে, ১৯৪৯-৫০ হইতে এরূপ আর হয় নাই। পূর্ব বৎসর হইতে জমির পরিমাণ যখন শতকরা ০·৬ ভাগ বাড়িয়াছে, সেখানে ফলন বাড়িয়াছে ২·৭ ভাগ; জমি অপেক্ষা ফলনের বৃদ্ধির হার একটা বিশেষ শুভ লক্ষণ।

কার্পাস তন্তু

ভারতবর্ষে যে কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশের আঁশ বা তন্তু অত্যন্ত হ্রস্ব। অভাব মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে দীর্ঘ-তন্তু তুলা আমদানী করিতে হয়। যাহারা হ্রস্ব তন্তুর সম্যক ব্যবহার জানে, তাহারা ভারতীয় তন্তু কিছু ক্রয় করিয়া থাকে। বিদেশী তুলা ক্রয় করিতে যে প্রচুর অর্থব্যয় হয়, তাহার সামান্য অংশ মাত্র বিদেশে তুলা বিক্রয় করিয়া পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কঠিন মুদ্রা অঞ্চল হইতে তুলা ক্রয় করিতে গিয়া অসুবিধার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়।

সাধারণতঃ তন্তুর দৈর্ঘ্য ৭/৮ ইঞ্চি হইতে ৩১/৩২ ইঞ্চি হইলে দীর্ঘ-তন্তু কার্পাস বলা হয়।

জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ তুলা দ্বীপজ বা সাগর-দ্বীপীয় (Sea island) কার্পাস নামে পরিচিত। ইহার আঁশ যে কেবল ১ ৫/৮ হইতে ২ ১/৪ ইঞ্চি দীর্ঘ তাহা নহে, ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল। উচ্চ ভূমিজ—আপল্যাণ্ডস্ কার্পাস ৭/১০ হইতে ১১/১০ ইঞ্চি পর্যন্ত দীর্ঘ তন্তুযুক্ত।

ভারতীয় তুলার মধ্যে সিন্ধুসুধার পাঞ্জাব ও আমেরিকান তুলার তন্তু এক ইঞ্চি বা ততোধিক দীর্ঘ। সুতি, কাম্বোডিয়া, ধারোয়াড় ও গাওরাণীতে ৭/৮ হইতে ১ ইঞ্চি পর্যন্ত দীর্ঘ তন্তু পাওয়া যায়।

ভারতীয় তুলার মধ্যে তন্তুর মাপ, মোট পরিমাণ এবং তাহার শতকরা অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

৩৯২ পাঃ ওজনের গাঁট

	১৯৫১-৫২		১৯৫০-৫১	
	হাজার	শতকরা	হাজার	শতকরা
"সরেশ" দীর্ঘ তন্তু (১ ইঞ্চি ও ততোধিক)	৪৭	২	৪৭	২
দীর্ঘ তন্তু (৭/৮ হইতে ৩১/৩২ ইঞ্চি)	৮,৭২	২৮	৬,৩৭	২১
"সরেশ" মাঝারি (১৩/১৬ হইতে ২৭/৩২ ইঞ্চি)	৭,৯২	২৫	৭,৯৩	২৭
মাঝারি (১৩/১৬ হইতে ১১/১৬ ইঃ ও তন্নিম্ন)	৪,৩৯	১৪	৬,৫৫	২২
হ্রস্ব তন্তু (১১/১৬ ইঞ্চি ও তন্নিম্নে)	৯,৮৪	৩১	৮,৩৯	২৮
মোট	৩১,৩৪		২৯,৭১	

মোট উৎপাদিত তুলার শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ দীর্ঘ-তন্তু বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এক ইঞ্চি বা ততোধিক দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার কদর খুবই বেশী। কেবল হ্রস্ব-তন্তু তুলার অংশ শতকরা ৩১ ভাগ (১৯৫১-৫২); মাঝারি-তন্তু তুলা সমেত ইহার পরিমাণ লইয়া একটা বড় সমস্যা।

জেটচালিত বিমান, না ধূমকেতু?

আঃ প্রিঃ, ৪ঠা নভেম্বর—আজ বেলা ১ টা ২৫ মিনিটের সময় আকাশে প্রায় দশ হাজার ফুট উপর দিয়া একটি শ্বেতবর্ণ চোঙের মত গোলাকার পদার্থকে প্রচণ্ডবেগে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। শ্বেতবর্ণ এই পদার্থটি দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে উত্তর পশ্চিম দিক যাইতে তিন মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়, আর পিছনে রাখিয়া যায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা ও বরাবর চার ফুট চওড়া একটি পুচ্ছ। এই পুচ্ছটিও কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়।

মানমন্দিরের পর্যবেক্ষকগণ অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ রহস্যময় পদার্থটিকে বেলা ১২টা ২৫ মিনিটের সময় দেখা গিয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়া তাঁহারা অধিক কিছু বলিতে পারেন নাই।

এই আশ্চর্য পদার্থটি পশ্চিম আলেপ্পিতে বেশ কয়েকজন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নানা লোকে এই সম্পর্কে নানা মত প্রকাশ করিতেছে। কেহ বলিয়াছে যে, ইহা একটি ধূমকেতু, আবার কেহ বলিতেছে, ইহা জেটচালিত অতিশয় দ্রুতগামী একখানি বিমান।

পৃথিবীতে পশমের ব্যবহার

	লক্ষ পাউণ্ড মিলে ব্যবহার		পাউণ্ড মাথা পিছু	
	১৯৩৪-'৮ গড়	১৯৫০-৫২ গড়	১৯৩৮	১৯৫০
পৃথিবী	২০৫,৮০	২৪০,৭০	০'৯	১'১
আমেরিকা	৩৩,০০	৫৩,৯০	২'২৭	৪'৪
ইংল্যাণ্ড	৪৩,৫০	৪৩,০০	৬'৯৭	৬'৬
ফ্রান্স	২৩,২০	২২,০০	৪'৩৭	৩'৭
জার্মেনী	১৮,০০	১২,৪০	৩'১	৩'৪
ইটালী	৫,৭০	১১,৬০	০'৩৩	২'০
জাপান	১০,৮০	৮,৪০	০'৯	০'৭
আর্জেন্টিনা	৪,৬০	৭,১০	৩'১	৪'৪
অষ্ট্রেলিয়া	৩,৫	৫,৩০	৭'৭	৭১'১
বেলজিয়াম	৬,০০	৬,৫০	৪'৩৭	৪'০
নেদারল্যাণ্ড	১,০০	২,৯০	৩'৭	৭'৫
কানাডা	২,০০	২,৮০	৩'৭	৪'৮
ভারতবর্ষ	—	—	০'১৩	০'০৪
পাকিস্থান				০'০২

পৃথিবীতে সোনা উৎপাদন

	হাজার আউন্স		
	১৯৪০	১৯৫১	১৯৫২
কমনওয়েলথ	১,৮৭,৭৮	১,৮৫,০৪	১,৯১,০৮
অষ্ট্রেলিয়া	৮,৬১	৮,৯৬	৯,৭৮
গোল্ডকোষ্ট	৬,৮৯	৬,৯৯	৬,৯৯
কানাডা	৪৪,৪১	৬৩,৯২	৬৪,৫০
ভারত	১,৯৭	২,২৬	২,৫৩
নিউজিল্যাণ্ড	৭৭	৭৫	৭৫
দক্ষিণ রোডেশিয়া	৫,১১	৪,৮৭	৪,৯৭
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,১৬,৬৪	১,০৫,১৬	১,১৮,০০
অপরাপর	৩,১৮	৩,১৩	৩,৫৬
দক্ষিণ আমেরিকা			
ব্রেজিল	১,৯২	২,০০	১,৮০
চিলি	১,৮৬	১,৭৪	১,৮০
কলম্বিয়া	৩,৭৯	৪,৩১	৪,২২
মেক্সিকো	৪, ৬	৩,৯৪	৪,০০
পেরু	১,৪৮	১,৪২	১,৪০
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	২২,৮৯	১৮,৯৫	১৯,৩৮
মোট	২,৬১,৭৯	২,৬ ,১৮	২,৬৪,০০

১৯৫২ সালের উৎপাদন পরিমাণ আনুমানিক।

পৃথিবীতে খনিজের উৎপাদন

	লক্ষ টন		
	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২
কয়লা	১৩০,৭৫	১৩৬,৭৮	১৩২,৯১
পেট্রোলিয়াম (অপরিশুদ্ধ)	৪৮,৬৬	৫৫,০৪	৫৭,৬৪
কাঁচা লোহা	১১,২৮	১২,৬২	১২,৪৭
ইস্পাত	১৬,১০	১৭,৮১	১৭,৫০
সিমেন্ট	১২,২৪	১৩,৫৮	১৪,২২
তামা	২২·৮৯	২৩·৯৫	২৪·০৩
দস্তা	১৮·৬৩	১৯·৭৪	২০·৬৫
সীসা	১৫·৪৫	১৪·৯৩	১৬·২২
রাঙ	১·৭৬	১·৭০	১·৭১
অ্যালুমিনিয়াম	১৩·১৪	১৫·৯৪	১৭·৯৮

পৃথিবীতে তামা উৎপাদন

	হাজার টন		
	১৯৪৮	১৯৫০	১৯৫২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯,৪৩	৯,৯৩	৯,৮৫
চিলি	১৭	১৯	২৬
উঃ রোডেশিয়া	২,১০	২,৮১	২,৯২
কানাডা	১,৯০	২,০৭	২,০০
কঙ্গো (বেলজিয়াম)	১,৫৩	১,৭৩	২,০২
জার্মেনী	৬১	২,১২	২,১৫
ইউরোপ (অপরাপর)	৮৯	১,০৬	১,০৬
জাপান	৫৪	১,০৬	১,০৬
অপরাপর	১,২১	১,৩৭	১,৭৬
মোট	২২,৪৩	২৫,২৩	২৬,১০

পৃথিবীতে তামার ব্যবহার

	হাজার টন		
	১৯৪৮	১৯৫০	১৯৫২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১২,০০	১২,২৫	১২,৯১
চিলি	৪,১৮	৩,৪০	৩,৭৭
কানাডা	৯৮	৯৬	১,৭৬
ইংল্যাণ্ড	৩,৫৭	৩,৩৫	৩,৪৮
জার্মেনী	৬১	১,৮৯	১,৯২
ইউরোপ (অপরাপর)	৩,৭৯	৩,৩১	৩,৫১
জাপান	৬৪	৬২	০২
অপরাপর	১,২৫	১,৫১	১,৬৩
মোট	২০,৯৭	২৪,২৩	২৫,৮৬

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | নভেম্বর—১৯৫৩ | একাদশ সংখ্যা

ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান প্রধানতঃ গত দু-তিন শতকের মধ্যে দেওয়া পাশ্চাত্যের অবদান। এসিযাতে বিজ্ঞানের চর্চা মোটেই যে ছিল না তা নয়; এক সময়ে রসায়ন, শরীরতত্ত্ব, ভেষজতত্ত্ব, জ্যোতিষ-শাস্ত্র ইত্যাদির যথেষ্ট চর্চা হযেছিল। কিন্তু বর্তমান ইউরোপ বা আমেরিকায় বিজ্ঞান যেভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমস্ত সমাজকে অধিকার করে বসেছে, প্রাচীন এসিয়াতে সে ধরনেব চর্চা কোন সময়েই হয় নি। মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস ছেড়ে ইউরোপ যখন নব্যযুগে পদার্পণ করে, অর্থাৎ রেণেশাঁসের সময় থেকেই ইউরোপে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞানচর্চা স্বরু হয়। প্রথম প্রথম সমাজের বহু-লোক বিজ্ঞান-চর্চাকে ভাল চোখে দেখেন নি। অনেক বিজ্ঞানীকে শাস্তিও পেতে হয়েছে নতুন মতবাদ প্রচারের জন্যে। গ্যালিলিওকে চার্চের কঠোর বিচারে আসামী হতে হয়েছিল এবং তিনি নিজ দেশ থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। ফরাসী বিজ্ঞানী দে-কার্তে হল্যাণ্ড দেশে তাঁর আবিষ্কার-গুলি প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে সেখানকার ধর্মযাজকেরা নির্মমভাবে তাঁকে সেই দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। স্থখের বিষয়, এই নির্যাতন অনেককাল চলতে পারে নি। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যখন ধীরে ধীরে মানুষের সেবায় আসতে লাগলো, সমাজের চোখে বিজ্ঞান তখন অপরিহার্য এক নতুন সহায় বলে প্রতিভাত হলো। তারপর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের আদর দ্রুত বেড়ে ওঠে। বর্তমানকালে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান-সাধককে সেখানকার সমাজ বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ভারতবর্ষে এই বিজ্ঞান-শিক্ষা খুব বেশী দিন আরম্ভ হয় নি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমাদের সমাজ এখনও একে তেমন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না। ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞান যেমন একাঙ্গীভূত হয়ে গেছে, এখানে এখনও তেমন হয় নি। এক একজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীর লেখা পড়লে মনে হয়, বিজ্ঞানকে তাঁরা কত আপনার করে নিয়েছেন! এদেশে কিন্তু এরূপ বিজ্ঞান-সাধক খুব কমই দেখা যায়। বিগত কয়েক

শতাব্দীর মধ্যে আমাদের দেশে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদির অনেক চর্চা হয়ে গেছে। এদের যেমন আমরা নিজস্ব করে নিয়েছি, বিজ্ঞানকে সে রকম করে নেবার পক্ষে আমাদের দ্বিধা এখনও কাটে নি। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সংমিশ্রণে জল উৎপন্ন হয়, অথবা জলকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়—এসব তথ্য আমরা বিজ্ঞানের ক্লাশে কৌতুহলের সঙ্গে শুনি বটে, কিন্তু পরে দেখতে পাই—অন্তরের সঙ্গে যেন এসব তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। আমাদের অন্তরাত্মা যেন এসব তত্ত্ব থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে চলে। কিছুটা যেন কর্তব্যের খাতিরে এবং নিজেদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যেই আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিজ্ঞানের গবেষণা করতে হয়। সে জন্যেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠা লাভ করে আমরা আর বিজ্ঞানের গবেষণাকে তেমন বাঞ্ছনীয় অথবা প্রয়োজনীয় মনে করি না।

দেশব্যাপী দারিদ্র্য যে আমাদের বিজ্ঞান-সাধনায় একাগ্রতার পথে একটি বাধা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আহার ও আশ্রয় সংস্থানের চিন্তায় বিজ্ঞানের গবেষণার দিকে আমরা গভীর মনোযোগ দিতে পারি না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশে সাধারণতঃ অনেকের মনে বিজ্ঞানের প্রতি তেমন একটা শ্রদ্ধা নেই, এমন কি, অনেক সময় সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে এর প্রতি একটা বিরূপ ভাবও দেখা যায়। এর প্রধান কারণ এই যে, আমাদের জীবন-যাত্রায় বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ কতদূর হয়েছে এবং আরও কতদূর হতে পারে, দেশের সর্বাবিধ বৈষয়িক উন্নতিতে বিজ্ঞান কি ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে, এসব বিষয়ে তাঁদের চিন্তাধারা খুব স্বচ্ছ নয়।

অনেকের ধারণা, বিজ্ঞানের মারণাস্ত্রগুলি আবিষ্কৃত না হলে যুদ্ধ-বিবাদ আরও কম হতো এবং পৃথিবীর শান্তি বজায় থাকতো। দেশে দেশে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত বেশী হতো না এবং মনোমালিন্যও হতো কম। এই প্রসঙ্গ এখন অবান্তর বলে মনে হয়। বিজ্ঞানকে কোন্ কাজে লাগাব—দেশের ফসল বৃদ্ধি করতে কিংবা অন্য দেশের ফসল ধ্বংস করতে—সেটা তো আমাদের নিজেদের হাতেই আছে! চোর সিঁধকাঠি দিয়ে চুরি করলে আমরা চোরকেই দোষী করি, সিঁধকাঠিকে নয়! একই জিনিস বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আগুনে ঘর পোড়াতে পারে, কিন্তু রন্ধনেও লাগে। একই বস্তু কখনও ঔষধের, কখনও বা বিষের ক্রিয়া করে। মানুষ যদি শক্তিসামর্থ্য আয়ত্তে না রাখতে পারে তাহলে সেটা তার নিজের দোষ বলেই গণ্য হবে।

ভারতের মাটিতে ধর্মভীরুতা ও দার্শনিক চিন্তা এমনভাবে মিশে আছে যে, বিজ্ঞান জনসাধারণের মনে তেমন শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারে না। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে বা যে সব অনুসন্ধানের কাজ করছে তা কেবল জড়জগৎ নিয়েই। বার্ট্রাণ্ড রাসেল্‌কে এক সময়ে ভারতবর্ষে কমিউনিজম-এর সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "On religious grounds alone, India will defy communism"। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বলা যায়—ভারতবাসীর পরলোক চিন্তা ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে একটি দুস্তর বাধা হয়ে আছে। এই পার-লৌকিক এবং ইহলৌকিক চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য না আনতে পারলে বর্তমানে আমাদের কোন দিকেই উন্নতি হবে না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লেখার মধ্যে বিশেষ জোরের সঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য করে গেছেন। গত কয়েক শতকের মধ্যে আমাদের দেশে কয়েকজন কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজ-নৈতিক নেতা ও ধর্মগুরুর জন্ম হয়েছে। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে চিন্তাধারা এবং কর্মের দ্বারা দেশকে জগতের চক্ষে বরণীয় করে গেছেন। কিন্তু দেশের

অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি ?

বলিষ্ঠ চিন্তাধারা বা কর্মের জন্যে সুস্থ এবং সবল দেহ-মন অপরিহার্য। বৈষয়িক উন্নতিতে হোক, শিল্প, সাহিত্য বা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে হোক, সুস্থ দেহ-মনের একান্ত প্রয়োজন। অন্ন-সমস্যা, গৃহ-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, কন্যা অথবা ভগ্নীর বিবাহ-সমস্যা ইত্যাদি অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের অনেক পরিবারেই দেখা যায়। এগুলির জন্যে অনেক সময় ঋণগ্রস্তও হতে হয়। দেশব্যাপী এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানকে কি আরও অনেক বেশী কাজে লাগানো সম্ভব নয় ? আমাদের শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্যে আমাদের দীর্ঘদিনের পরাধীনতা অবশ্য অনেকাংশে দায়ী। বিদেশী শাসকবর্গ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কাজ যতটা করতে পারতেন তার কিছুই করেন নি। অনেক সময় দেশের শাসন ব্যাপারে তাঁরা খুব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শোষণও খুব ভালভাবেই করে গেছেন। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো বহুলাংশে বৈদেশিক শাসকদের সৃষ্টি– একথা বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না। কিন্তু সে যাই হোক্, আমরা যদি সত্যিকার বিজ্ঞান-মনোভাবাপন্ন হতাম তাহলে এতদিনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নিশ্চয়ই লাঘব করা সম্ভব হতো। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের ঘরে ঘরে ছোট-বড় কুটির শিল্পের প্রবর্তন করতে পারতাম। আমাদের নারীসমাজের কতটুকু অংশ দেশের বৈষয়িক উন্নতির কাজে নিয়োজিত হয় ? গৃহকর্মের অবসরে তাঁরা খানিকটা সময় অন্ততঃ এদিকে ব্যয় করতে পারেন। পুরুষদের মধ্যেও অনেকের হাতেই কিছু কিছু সময় থাকে যা তারা সার্থক কোন কাজে ব্যয় করতে ইচ্ছুক; কিন্তু অনেকেই সে সুযোগ পান না।

আমাদের দেশে কো-অপারেটিভ সোসাইটির সংখ্যা খুব কম। প্রায়ই দেখা যায়, যেগুলি আছে সেগুলিও খুব ম্রিয়মাণ অবস্থা। এগুলির সংস্কার বা পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন। সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তার অন্তর্গত "কমিউনিটি প্রোজেক্ট" সম্বন্ধে প্রচারকার্য এত কম হয়েছে যে, অশিক্ষিতদের তো কথাই নেই, শিক্ষিত লোকের মধ্যেও অনেকে এগুলির বিষয় খুব কম জানেন। এই সব পরিকল্পনায় বিজ্ঞান প্রয়োগের যে উল্লেখ আছে সেগুলি বেশীর ভাগই বৃহৎ শিল্প বা সংগঠনের কাজের জন্যে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যেও যে বিজ্ঞানকে নানাভাবে কাজে লাগানো যায় সে, সম্বন্ধে পরিকল্পনায় স্পষ্ট কোন কার্যসূচী নেই। জাপানে এবং সুইজারল্যাণ্ডে ঘরে ঘরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কুটির শিল্পের প্রবর্তন হয়েছে। ভারতবর্ষে যে সব বিরাট হাইড্রো-ইলেকট্রিক পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেগুলি থেকে সম্ভবতঃ আমরা প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি পাব, কিন্তু সে শক্তি কোন্ কোন্ সার্থক উপায়ে জনসাধারণের দ্বারা ব্যবহৃত হবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করা বিশেষ দরকার। এবিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে সরকারের উচিত ছিল দেশের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতামত সংগ্রহ করা। সরকার এ কাজটি না করাতে ফল এই হবে যে, প্রচুর শক্তি হাতে পেলেও আমরা সেগুলি বিশেষ কোন লাভের কাজে ব্যবহার করতে পারব না।

পাশ্চাত্য দেশগুলিকে আমরা অনেকে নিছক জড়বাদী এবং ভোগসর্বস্ব মনে করি; কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, সেখানে দার্শনিক তত্ত্বের চর্চাও যথেষ্ট হয়। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদের দেশ যে স্তরে উঠেছিল, তাঁরা এখনও সে স্তরে উঠতে পারেন নি বটে, কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় তাঁরা মোটেই নিশ্চেষ্ট ন'ন। কাণ্ট, হেগেল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগে রাসেল পর্যন্ত সকল মনীষীই সর্বদেশের নমস্য। বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতিগুলি শিল্প, সাহিত্য, কলা,

দর্শন, এমন কি—কোন কোন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চেতনায়ও অত্যন্ত সতেজ এবং বলিষ্ঠ জীবনের পরিচয় দিয়েছে। ভগবদ্ভক্তি বা ধর্মপিপাসা তাঁদের স্ত্রী-পুরুষ অনেকের মধ্যে আছে। টলষ্টয় বা রোমাঁ রোলাঁ্যার জীবনী ধর্মপ্রাণতার নিদর্শন। টমাস্ কেমপিস্-এর "ইমিটেশন্ অব ক্রাইষ্ট" বইখানাতে ভগবদ্ভক্তির মনোজ্ঞ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আছে। বস্তুতঃ আমাদের দেশের ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে "ইমিটেশন্ অব ক্রাইষ্ট"-এর মূল তত্ত্বের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই।

অবশ্য এটা খুবই সত্যকথা যে, আমাদের দেশে অন্য কোন দেশ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সাধু ও যোগী ব্যক্তি আছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা না ঘুচলে আমরা কোন উচ্চ আদর্শ নিয়ে চলতে পারব কি? দারিদ্র্য দুরীভূত না হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যায় এবং অসত্যের প্রভাব বেড়েই যাবে। আমাদের ব্যবসায় জগতের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যাবে, সেখানে কি পরিমাণ অসাধুতা প্রশ্রয় পেয়েছে। পণ্যদ্রব্যে এত ভেজাল দেওয়া পাশ্চাত্যের কোথাও চলে কিনা সন্দেহ। দুধ, ঘি, মাখন, তেল, আটা, চা'ল, ওষুধপত্র এবং রাসায়নিক দ্রব্যে নির্বিচারে ভেজাল মেশানর কি রকম রেওয়াজ হয়েছে, চিন্তা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। দেশ যদি শিল্পে, বিজ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ হতো, তাতে সাধারণ সমাজের মোটামুটি অভাবগুলি ঘুচতো এবং এসব ভেজাল দেওয়ার প্রথা অনেক কমে যেত।

আমাদের দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসন্ধানে তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করেন বটে, কিন্তু ঐগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগে কি কি উপকার হতে পারে, সে বিষয়ে প্রায়ই বড় উদাসীন। তাঁদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি বিদেশে কিছু খ্যাতি অর্জন করে, কিন্তু দেশের বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ কোন কাজে লাগে না। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে বিজ্ঞানের বহুল প্রয়োগ আমাদের দেশে হতে পারে এবং তাছাড়া আমাদের বোধ হয় উপায়ও নেই। স্কুল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল করে জানিয়ে দেওয়া দরকার—কিভাবে বিজ্ঞান অন্যান্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে, রোগভয় নিবারণ করে, দেশের সাধারণ জনের মধ্যে হাসি ফুটিয়ে তোলে। আমাদের সাধারণ স্কুল, কলেজে বর্তমানে যে বিজ্ঞান-শিক্ষা চলছে, তাকে আমরা 'কেতাবী শিক্ষা' বলতে পারি। ব্যবহারিক দিকে আরও বেশী নজর দিয়ে হাতেকলমে শিক্ষার কাজকে ব্যাপক কার্যকরী করলে তবেই শিক্ষার্থীর মনে এর প্রতি সত্যিকার একটা আকর্ষণ হতে পারে। এদিকে আমাদের নজর দেওয়া খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানকে যদি আমরা ছেলেমানুষি চর্চা অথবা জড়বাদীর শাস্ত্র বলে উপেক্ষা করি তাহলে আমাদের স্বার্থই উপেক্ষিত হবে।

জড় ও জীবন

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

আপাতদৃষ্টিতে জড় ও জীবনের কোন মৌলিক সাদৃশ্য নেই। আধুনিক বিজ্ঞানে জড় ও তেজের অভিন্নতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে বটে, কিন্তু জড়কে আশ্রয় করে জীবনের অভিব্যক্তি হলেও জীবনের ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। জন্ম, মৃত্যু, প্রজনন, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি জীবনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। জীববিজ্ঞানে জীবনের এই সব ধর্মকে জড়ের যান্ত্রিক স্বরূপ থেকে পৃথক করে রাখা হয়। ক্রমশঃ জড়বিজ্ঞানীরা জটিল যান্ত্রিক নিয়মে জীবনের আসল রূপ ধরবার চেষ্টা করেন। জিন্ (gene) ও ভাইরাস্ প্রভৃতি মৌলিক জীবকণা যে জটিল রাসায়নিক গঠনের অণু ছাড়া কিছু নয়, এই তথ্যটি জীব ও জড়বিজ্ঞানের প্রথম যোগসূত্র রচনা করে। জীব ও জড়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা শুধু জীবের প্রাণশক্তিকে কেন্দ্র করে। এই প্রাণশক্তিই জীবকে বর্ধিত করে, গতি দেয়, প্রজননের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে, তার চিন্তাশক্তির স্ফুরণ করে। জড়ের মধ্যে এই শক্তি নেই বলেই জীব ও জড় পৃথক।

জড়বিজ্ঞানীরা এই ধারণার প্রতিবাদে জড়-বিজ্ঞানের নিয়মে জীব ও জড়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের মতে, জীবের মৌলিক কণিকা তার জটিল রাসায়নিক গঠনের জন্যেই জড় থেকে পৃথক বলে মনে হয়। নতুবা একই যান্ত্রিক নিয়মে উভয়ের অভিব্যক্তি সম্ভব। জড়বিজ্ঞানে এন্ট্রপি (entropy) কথাটি খুবই পরিচিত। আমাদের আশেপাশে এই যে বিচিত্র জড়জগৎ—তার প্রত্যেকটি অণু গতিশীল। তাপের প্রভাবে এই অসংখ্য অণু অবিরত চঞ্চল। এই চঞ্চলতা সব বস্তুতে সমান নয়। বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি সবচেয়ে বেশী চঞ্চল; তরল পদার্থের অণুতে আণবিক আকর্ষণ একটু বেশী বলে ইচ্ছামত উড়ে চলে না বটে, কিন্তু তার আধারের নির্দি আয়তনে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কঠিন পদার্থে

১নং চিত্র

অন্তর্নিহিত আণবিক আকর্ষণ তাকে নির্দিষ্ট আকারে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট; তাই তার অণুগুলির তাপজনিত উদ্দাম চঞ্চলতা বাইরে প্রকাশিত হয় না। অণুর তাপজনিত চঞ্চলতার একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, এর প্রভাবে পদার্থের ভিতর অণুগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাপ যত বেশী হয়, এই বিশৃঙ্খলা ততই বাড়তে থাকে। খুব কম তাপ-মাত্রায় কৃষ্ট্যালের মত পদার্থে অণু তবু কিছুটা সুসজ্জিত থাকে; তাও তাদের কম্পনের গতি হয় বিভিন্ন দিকে। তরল অবস্থায় অণুগুলির কোন শৃঙ্খলাই থাকে না। আরও অধিক তাপমাত্রায় বস্তু বায়বীয় পদার্থে পরিণত হলে এই বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। এ থেকে দেখা যায়, তাপ বাড়লে অণুগুলি আরো বেশী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন তাপ-মাত্রায় এই বিশৃঙ্খলার মাত্রাও হয় বিভিন্ন। ১নং চিত্রে কয়েকটি অণুর গতি দেখানো হয়েছে। এতে তবু কিছুটা শৃঙ্খলা আছে; কিন্তু বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, এই অণুগুলি পরস্পরের সংঘাতে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। ২নং চিত্রে এই সব অণুর গতিবেগ দেখানো হয়েছে। এই দুটি চিত্রে পদার্থের অণুসমূহের শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মোটামুটি আভাস পাওয়া যাবে। এদের মাঝামাঝি বিশৃঙ্খলার বিভিন্ন মাত্রাও থাকতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানে বিশৃঙ্খলার এই সম্ভাবনাকে বলা হয় এন্ট্রপি। যে পদার্থে অণুসমূহের বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বেশী, তাতে এন্ট্রপিও বাড়ে। বিশৃঙ্খলার মাত্রা কমলে এন্ট্রপিও কমে।

জড় জগতের একটা বিশেষ নিয়ম হচ্ছে, পদার্থের এন্ট্রপি ক্রমশঃ বেড়েই চলে, অর্থাৎ শৃঙ্খলার চাইতে বিশৃঙ্খলার দিকেই যেন জড় পদার্থের ঝোঁক বেশী। একটা সাধারণ উদাহরণ থেকে এই তত্ত্বটি বোঝা যাবে। একটা বাড়ী তৈরী করতে নিপুণ কারিগরকে বহু পরিশ্রম করতে হয়, বহু সময়েরও প্রয়োজন হয়; কিন্তু ঐ বাড়ী ভেঙে ফেলতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন নেই—অনায়াসে অল্প সময়েই এ কাজ করা যায়। নিষ্প্রাণ জড়দের রাজ্যে সৃষ্টির নৈপুণ্য নেই—তাই সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে তার অণু-পরমাণুকে ছন্নছাড়া করবার দিকেই জড়জগতের ঝোঁক বেশী। জড়জগতের এরকম ঝোঁক না থাকলে কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার ঘটতো। বাতাসের

২নং চিত্র

প্রতিটি অণুর গতি যদি একমুখী হতো তবে তাদের গতিবেগে বিনা জ্বালানীতেই প্লেনগুলি উড়ে যেতে পারতো। কিন্তু বাতাসের প্রত্যেকটি অণু ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন দিকে গতিশক্তি হারিয়ে ফেলে, তাই একটা সামান্য কঠিন বস্তুকেও উড়িয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। মোটর গাড়ী চললে রাজপথ উত্তপ্ত হয়, এই তাপের প্রভাবে পথের প্রতিটি অণুর গতিবেগ বেড়ে যায়। এই সমস্ত অণুর গতিবেগ একমুখী হলে বিনা পেট্রোলেই গাড়ী চালানো সম্ভব হতো। এইরূপ অবিরাম গতির এঞ্জিন বাস্তবে পাওয়া সম্ভব নয়। তার কারণই হলো—ক্রমবর্ধমান এন্ট্রপি।

জৈব পদার্থের অণুতেও এন্ট্রপি বর্তমান, কিন্তু জীবজগতের ঝোঁক হচ্ছে এন্ট্রপি কমবার দিকে। জীবনের প্রত্যেকটি অণুতে রয়েছে সৃষ্টির উন্মাদনা; তাই জড়জগতের মত তার অণুগুলি ছন্নছাড়া নয়। তাই জীবের ধর্ম হলো নিজের অণুগুলিকে আরো সুশৃঙ্খল করে সাজিয়ে রাখা। তাই একটি ছোট বট গাছের বীজ সাধারণ অজৈব কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল প্রভৃতির অণু শোষণ করে যেসব জটিল রাসায়নিক জৈব অণুর সৃষ্টি করে, সে সব অণুর শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। প্রাণবাদীরা বলবেন, প্রাণশক্তিই জীবের জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে। জড়জগতের ক্রমবর্ধমান এন্ট্রপির নিয়ম জীবজগতে অণুগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার ক্ষমতা প্রাণশক্তির রয়েছে। কিন্তু ঐ শক্তির ক্রিয়াকলাপের সুষ্ঠু নিয়ম প্রাণবাদীরা আবিষ্কার করতে পারেন নি।

৩নং চিত্র

জড়বিজ্ঞানীরা তাঁদের যান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের প্রয়োগ করে এই প্রাণশক্তির স্বরূপ ও ক্রিয়া ধরে ফেলেছেন। এই শক্তির আধার সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছুই নয়। সূর্যের আলো না হলে জীবজগৎ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। এই আলোতে জীবজগতের জীবন-ক্রিয়া কিভাবে চলে, অর্থাৎ জীবজগতের অণু গঠনে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ক্রিয়া ও ঐ অণুসমূহের

এন্ট্রপি হ্রাসের গোড়ার কথা জানতে হলে সূর্যালোক বিকিরণের নিয়ম সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

চরম শূন্য (absolute zero) তাপমাত্রায় কোন বস্তু থেকে তেজের বিকিরণ হয় না। ক্রমশঃ তাপ বাড়লে বস্তুপৃষ্ঠ থেকে তেজ বিকিরিত হয়। বরফ থেকেও এই বিকিরণ হয়, কিন্তু আমাদের শরীর থেকে বেশী তাপ বিকিরণ হয় বলেই আমাদের কাছে বরফ ঠাণ্ডা। বিশেষ তাপমাত্রায় কোন বস্তু নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তেজ বিকিরণ করে। তাপ বাড়লে এই বিকিরিত তেজের তীব্রতা বাড়ে; কিন্তু ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তেজের তীব্রতা বাড়ে বেশী। দীর্ঘতর তরঙ্গগুলির তেজ হ্রাস পায়। প্রায় ৮০০° সেঃ নিম্ন তাপমাত্রায় কোন বস্তু যে তেজ বিকিরণ করে তা দৃশ্য আলোক-তরঙ্গের চাইতে দীর্ঘতর তাপ-তরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। এর চেয়ে তাপমাত্রা বেশী হলে বস্তুটি লাল হয়ে ওঠে। তাপ-মাত্রা আরো বাড়লে ক্রমশঃ হল্‌দে ও নীল রং ধারণ করে। দৃশ্য আলোর ভিতর লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশী। তাই প্রথমে লাল রং দেখা যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্যের অন্যান্য তরঙ্গগুলি প্রকাশিত হয়। ৩নং রেখা চিত্রে বিভিন্ন তাপমাত্রায় কোন্ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তেজ কত তীব্র তা' দেখানো হয়েছে। এই চিত্র থেকে বোঝা যাবে যে, একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তেজের মোট তীব্রতা নির্দিষ্ট থাকে। বেশী তাপমাত্রায় এই তীব্রতার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। তাপজনিত তেজ-তরঙ্গের দিক ও তীব্রতা এত বিভিন্নমুখী যে, পদার্থের অণুর মত এসব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে পারে না। বেশী তাপমাত্রায় তেজের মোট তীব্রতা বাড়লেও তাদের তরঙ্গের বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়; অর্থাৎ জড়পদার্থের অণুর মত তাদের এন্ট্রপিও বাড়ে। জড়জগতে বায়বীয় পদার্থের এন্ট্রপি যেমন সর্বোচ্চ হয়, তেজের ক্ষেত্রে উচ্চ তাপজনিত বিকিরিত তেজের এন্ট্রপি হয় সব চেয়ে বেশী।

সৌরমণ্ডলের ফটোস্ফিয়ারের সান্নিধ্যে ৬০০০° সেঃ তাপমাত্রায় যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও তীব্রতার তেজ-তরঙ্গ বিকিরিত হয়, ৩নং রেখাচিত্রে তা দেখানো হয়েছে। এই সৌরতেজ-তরঙ্গ পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌছুতে সৌর-ব্যাসার্ধের প্রায় ২১৪ গুণ বেশী পথ অতিক্রম করে। শূন্যপথে আসবার সময় এই তেজের ঘনত্ব কমে যায়; কারণ একই পরিমাণ তেজ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে বিরাট শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। তেজের ঘনত্ব কমে গেলেও বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-জনিত তেজের পরিমাণ ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমানই থাকে। ফলে যে সূর্যালোক পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছে তার ভিতর ৬০০০°সেঃ তাপজনিত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তেজ-তরঙ্গ বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু আলোকের ঘনত্ব নিম্নতর তাপমাত্রাজনিত বিকিরিত তেজের ঘনত্বের সঙ্গে সমান হয়ে পড়ে। এ থেকে দেখা যায় যে, সূর্যালোক পৃথিবী-পৃষ্ঠে আসবার সময় বিকিরিত তেজ-তরঙ্গের কিছু এন্ট্রপি যেন হারিয়ে ফেলে। কারণ নিম্নতর তাপমাত্রায় অণুর অথবা তেজ-তরঙ্গের বিশৃঙ্খলা কমে যায় অথচ জড়-বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী এন্ট্রপি বৃদ্ধির দিকেই জড়-জগতের ঝোঁক বেশী। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই সূর্যালোক এই কম্‌তি এন্ট্রপিটুকু গাছপালার সবুজ পাতা থেকে আহরণ করে নিয়ে ক্ষতিপূরণ করে। আর এন্ট্রপি কমে যাওয়ায় গাছপালারও জৈবধর্ম বিকাশের সুযোগ হয়। সূর্যালোকে এই এন্ট্রপিটুকু চাপিয়ে দিয়ে জৈবধর্মের স্বরূপ রক্ষা নির্ভর করে ফটোসিন্থেসিস্ নামক ক্রিয়ার উপর, যা কেবল জীবজগতেরই একটা বিশেষ ধর্ম।

গাছপালার পাতায় যে জীবকোষ (cell) আছে তা কতকগুলি ক্লোরোপ্লাষ্ট নামক উপকোষের সমষ্টিমাত্র। এই উপকোষে গ্রানা নামে যে পদার্থ থাকে তার ক্লোরোফিল অংশটুকু সূর্যালোক থেকে প্রাণশক্তি আহরণের মাধ্যমরূপে কাজ করে। দহনক্রিয়া হলো ফটোসিন্থেসিসের বিপরীত। দহন-

ক্রিয়ায় কার্বন ও হাইড্রোজেন সমন্বিত জটিল জৈব অণু বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন সহযোগে তেজ বিকিরণ করে এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলের অণু গঠিত হয়। ফটোসিন্থেসিস্ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল সূর্যালোকের সমবায়ে শর্করা, ষ্টার্চ প্রভৃতি জটিল জৈব অণু গঠন করে এবং অক্সিজেন নির্গত হয়ে যায়। দহনক্রিয়ায় যেমন বিভিন্ন অণুর বাঁধন ভেঙ্গে গিয়ে তাদের বন্ধন-তেজ বাড়তি তেজরূপে পাওয়া যায়, ফটোসিন্থেসিস্ প্রক্রিয়ায় সেরূপ হয় না, বরং বাইরের কিছু তেজ এই রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজন হয়। সূর্যালোক সেই তেজের যোগান দেয়। তাছাড়া ফটোসিন্থেসিস্ প্রক্রিয়ায় জটিল অণু গঠনের জন্যে পদার্থ থেকে যে এন্ট্রপিটুকু বিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন, সূর্যালোক সে কাজটুকুও সম্পন্ন করে।

পদার্থ-বিজ্ঞানে তেজের কণিকাবাদ স্বীকৃত হয়েছে। এই কণিকাকে বলা হয় কোয়ান্টা। প্রত্যেকটি কোয়ান্টার তেজমাত্রা তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। ক্লোরোফিলের লাল আলো শোষণ করবার ক্ষমতা বেশী। লাল আলোর প্রত্যেকটি কোয়ান্টার তেজ হলো ১.৯ ইলেকট্রন ভোল্ট। ফটোসিন্থেসিস্ প্রক্রিয়ায় এ রকম দুটি কোয়ান্টা অংশ গ্রহণ করে। প্রথম কোয়ান্টামটি জলের অণু থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ক্লোরোফিলের সঙ্গে সংযুক্ত করে, দ্বিতীয় কোয়ান্টামটি ক্লোরোফিল থেকে এই হাইড্রোজেন পরমাণুকে বিযুক্ত করে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণুর সঙ্গে যোগ করে দেয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় ১.৩ ইলেকট্রন ভোল্ট তেজ ব্যয়িত হয়ে রাসায়নিক তেজে পরিণত হয়। এই তেজ হলো দুটি কোয়ান্টার মোট তেজ ৩.৮ ইলেকট্রন ভোল্টের শতকরা ৩৫ ভাগ। সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিয়োজিত তেজের এত বড় অংশ কখনও কাজে লাগে না। এন্ট্রপি হ্রাস পায় বলে জীবজগতে এ রকম ঘটনা সম্ভব হয়। অবশ্য ক্লোরোফিল না থাকলে এই প্রক্রিয়া সম্ভব হতো না।

গন্ধকযুক্ত ঝর্ণার জলে একরকম ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া যায়। তাদের গায়ে সাধারণ সবুজ ক্লোরোফিলের পরিবর্তে ব্যাক্টেরিও ক্লোরোফিল নামে একরকম পদার্থ থাকে। সূর্যালোকের সাহায্যে এই ক্লোরোফিল হাইড্রোজেন সালফাইডকে ভেঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে জৈব অণু গঠন করে এবং অক্সিজেনের পরিবর্তে গন্ধক নির্গত হয়।

এখন মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সূর্যালোকই তেজের যোগান দিয়ে ও এন্ট্রপি হরণ করে জীবকে প্রাণশক্তি প্রদান করে। ফলে তার বিকাশ সম্ভব হয়; অর্থাৎ প্রাণশক্তি—সৌর-তেজ - এন্ট্রপি। সূর্যালোকের এই প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে গাছপালার উপর। তাদের মধ্যে সঞ্চিত সূর্যালোকজনিত রাসায়নিক তেজ ও হ্রাসপ্রাপ্ত এন্ট্রপি জীবজন্তুর খাদ্যের ভিতর দিয়ে প্রাণীর জৈব ধর্ম বজায় রাখে। মানুষও শাকসব্জী থেকে এই প্রাণশক্তি আহরণ করে; মাংস, দুধ ইত্যাদি প্রাণীজ খাদ্যের ভিতর দিয়েও আমরা এই প্রাণশক্তি পেয়ে থাকি।

তাই প্রাণশক্তি অতীন্দ্রিয় কোন বস্তু নয়—জড়ের জটিলতর গঠনেই প্রাণের প্রকাশ। জড়-বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন জীবজগতেও প্রয়োগ করা সম্ভব। সেই সম্ভাবনাই ক্রমশঃ সূচিত হচ্ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর জীবজগৎ নির্ভরশীল। তাপ, জল, বায়ু, জীবনের পক্ষে যেখানেই সহায়ক সেখানেই জীবজগতের বিস্তার সম্ভব।

পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও প্রাণের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে; কাজেই সেখানেও উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে অজৈব পদার্থ থেকে কিভাবে জীবনের আবির্ভাব হলো তা অবশ্য এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি; তবে সমস্ত জীবজগতের আদিম উৎস হলো প্রোটোপ্লাজম নামে জীবকণা। এই প্রোটোপ্লাজমই জৈব বিবর্তনের ধারায় উচ্চস্তর জীবে উন্নীত হয়েছে। মহাসাগরের বিভিন্ন অজৈব

বস্তুর সুদীর্ঘ দিনের জটিল রাসায়নিক মিলনে একদিন সৃষ্টি হয়েছিল প্রোটোপ্লাজম। অবশ্য এ রকম রাসায়নিক ক্রিয়া আমাদের পরীক্ষাগারে সম্ভব নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকৃতিতে এখন আর ঐরূপ প্রক্রিয়ায় নতুন জীবের সৃষ্টি হয় না কেন? সম্ভবতঃ জীবকণা সৃষ্টির সমস্ত উপকরণই সৃষ্টির প্রথম যুগে নিঃশেষিত হয়ে গেছে—তাই ঐরূপ প্রক্রিয়ায় আর নতুন জীবের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, যদিও মহাসাগরের গর্ভে ঐ প্রক্রিয়ায় কদাচিৎ নতুন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই অরক্ষিত জীবকণা তৎক্ষণাৎ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্রাণীদের আহারে পরিণত হয়। তাই বিজ্ঞানীদের চোখে এই নতুন জীব ধরা পরে না এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় অজৈব পদার্থ প্রাণীতে পরিণত হয় তাও অজ্ঞাত থেকে যায়। জৈব ও অজৈব সমন্বয়ী মূল সূত্রটি প্রথম সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে গেছে। সেই হারানো সূত্রটি খুঁজে পাওয়ার সুযোগ কোন দিন হবে কিনা জানি না। তবে জড় ও জীবন যে একই যান্ত্রিক নিয়মে চলে, প্রাণশক্তির প্রকাশ যে জড়েরই অভিব্যক্তি—এই তথ্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তাই ভাববাদী দর্শনের চিন্তাধারার স্থলে গড়ে উঠছে নতুন জীবন-দর্শন, যেখানে কোন অতীন্দ্রিয়ের স্থান নেই। মার্ক্সীয় দর্শনের পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের সূত্রটি তাই বৈজ্ঞানিক দর্শনের মূলভিত্তি রচনা করেছে। ক্রমশঃ বিজ্ঞানের গবেষণায় জীববিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হলে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক জড়-বিজ্ঞানের নিয়মেই রচিত হবে জীবন-দর্শন। হয়তো আগামী যুগের জড়বিজ্ঞানীরা হবেন সেই জীবন-দর্শনের রচয়িতা।

জীবজগতে বংশরক্ষার প্রকৃতি

শ্রীদিলীপকুমার দাস

বংশরক্ষার প্রচেষ্টা জীবজগতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বংশরক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে জীব-জগতের অস্তিত্বই থাকতো না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকেই জীব-বিজ্ঞান উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলেই প্রজননক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রজননক্রিয়া সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে অ্যারিষ্টোটলের মতবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাণীর প্রজননক্রিয়া সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় অ্যারিষ্টোটলের 'হিষ্টোরিয়া অ্যানিমেলিয়াম' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের কতকগুলি বিবরণে গ্রন্থকার একদিকে যেমন তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি আবার যথার্থ সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন। কিন্তু কতকগুলি ঘটনার বিবরণী এবং তা থেকে উপনীত সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার ফলে তাঁর ঐ সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির অপপ্রয়োগ হয়েছে।

যৌনমিলনের ফলে যাদের বংশরক্ষা হয়ে থাকে, অতীতে কেবল সে সব প্রাণীদের ক্ষেত্রেই যৌন-পার্থক্য স্বীকৃত হতো। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বতঃজনন মতবাদের সাহায্যে জীবোৎপত্তির ব্যাখ্যা করা হতো। অ্যারিষ্টোটলের মতবাদেও এই কথাই বলা হয়েছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই স্বতঃজনন মতবাদ ও যৌন-পার্থক্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। স্বতঃজনন মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিমত প্রদান করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে রেডি ও ভ্যালিস্‌নেরি নামক দুজন ইটালীয়ান বিজ্ঞানী। ঐ শতাব্দীতেই লিউয়েনহোয়েক কর্তৃক প্রাণীদেহের পুং-কোষ আবিষ্কৃত হয়। মোটের উপর রেডি, ভ্যালিসনেরি ও লিউয়েনহোয়েকের প্রচেষ্টার ফলেই প্রজননক্রিয়া সম্পর্কিত মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠালাভের সূত্রপাত হয়।

উদ্ভিদজগতেও যে যৌন-পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু এই তথ্য বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে অবশ্য একপ্রকার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল যাতে খেজুর ফুলের পরাগসংযোগে সহায়তা করা হতো। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হতো যৌন-পার্থক্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই। পরাগবাহী পুরুষ খেজুর ফুল নিয়ে পরাগবিহীন স্ত্রী খেজুর ফুলের কাছে ঝেড়ে দেওয়া হতো। এর ফলে সহজেই পরাগনিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হতো। প্রাচীন গ্রীসবাসীরা উক্ত উপায়ে গাছকে ফলবতী করবার সময় অলৌকিক শক্তির সহায়তা কামনা করে বিশেষ সমারোহে এই কার্য সমাধা করতো। বিস্তৃত বিবরণ না থাকলেও, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে উদ্ভিদের যৌন-পার্থক্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বেহেমিয়া গ্রু রচিত 'অ্যানাটমি অফ প্ল্যান্টস্' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয় যে, ফুলের পরাগ প্রাণীর বীজকোষের কাজ সম্পন্ন করে থাকে এবং ফুলের পুং-কেশর হলো পুং-জননযন্ত্র ও গর্ভকেশর হলো স্ত্রী-জননযন্ত্র। জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ক্যামেরিয়াস কর্তৃক এই মতবাদ নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়।

এভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতে যৌন-পার্থক্যের বিষয় অবগত হওয়ার পর জীবজগতের বংশরক্ষায় প্রজননক্রিয়ার আধুনিক মতবাদ রচনায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীবজগতে প্রধানতঃ যৌন ও অযৌন উপায়ে প্রজননক্রিয়া সম্পন্ন হতে দেখা যায়। প্রাণী অথবা উদ্ভিদ, প্রত্যেকেরই যৌন উপায়ে পুং ও স্ত্রী জননকোষদ্বয়ের মিলনের দ্বারা প্রজননক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই তথ্য মূলতঃ যৌন উপায়ে সংঘটিত প্রজননক্রিয়ার সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যে সমস্ত প্রাণীর দেহে বীজকোষ উৎপন্ন হয় তাদের বলা হয় পুরুষ, আর যে সমস্ত প্রাণীর দেহে ডিম্বকোষ উৎপন্ন হয় তাদের বলা হয় স্ত্রী। বীজকোষগুলি অতি ক্ষুদ্র কতকগুলি সচল পদার্থ। স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বকোষ উৎপন্ন হয় তার দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত ডিম্বাশয়ে। বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন আকারের ডিম্বকোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে। বীজকোষ ও ডিম্বকোষকে একত্রে গোনাড বলা হয়।

সাধারণতঃ স্ত্রী প্রাণীদের দেহাভ্যন্তরেই ডিম্ব নিষিক্ত হয়ে থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীদের ডিম্ব নিষিক্ত হয় দেহের বাইরে। আবার কতকগুলি সামুদ্রিক প্রাণী আছে যারা কোনও প্রকার যৌনমিলন ব্যতীরেকেই জলের মধ্যে বীজকোষ ও ডিম্বকোষ নিঃস্রব করে। নিষিক্ত হওয়ার পর বিভাজন প্রক্রিয়ায় ডিম্বকোষগুলি ভ্রূণের আকার প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তী আরও বিভাজনের দ্বারা ঐ ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়।

মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতির অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অনিষিক্ত ডিম থেকে সন্তান উৎপত্তির ব্যাপারটাকে জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অপুংজনি। প্রাণীজগতে স্বাভাবিকভাবে অপুংজনি ঘটতে দেখে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে অপুংজনির সাহায্যে সন্তান-জননের পরীক্ষা করে কিছুটা সফলতা লাভ করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকান বিজ্ঞানী জ্যাক্‌স্ লোয়েব সি-আর্চিনের ডিম নিয়ে বহু গবেষণা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি দেখতে পান যে, অম্লাত্মক সমুদ্র-জলে ডিম রাখলে বীজকোষ ছাড়াই তার নিসিক্তকরণ সম্ভব হয়। এরপর কৃত্রিম উপায়ে অপুংজনি ঘটবার আরও পরীক্ষা করে দেখা গেছে—আঁশের মত সূক্ষ্ম কাঁচের সূত্র দ্বারা অনিষিক্ত ব্যাঙের ডিম বিদ্ধ করলে বীজকোষের সংশ্রব ছাড়াই সেই ডিম থেকে যথাযথ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পিতৃহীন পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙাচি জন্মগ্রহণ করে।

প্রাণীজগতে যৌন উপায়ে প্রজননের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। কেঁচো, জোঁক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীর প্রত্যেকটির দেহেই বীজাশয় ও গর্ভাশয় আছে, অর্থাৎ একই দেহে যৌন পার্থক্যের বৈশিষ্ট্যদ্বয় বর্তমান। আরেক ধরনের প্রাণী আছে যারা জীবনের এক সময়ে পুরুষ ও অন্য সময়ে স্ত্রীরূপে জীবনযাপন করে থাকে।

শুধু কোষ-বিভাজনের দ্বারা যৌন সম্পর্কবিহীন যে প্রজনন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে দেখা যায় তাকে ইংরেজীতে ভেজিটেটিভ পদ্ধতি বলে। এই ভেজিটেটিভ পদ্ধতিতে প্রজনন যৌন সম্পর্কবিহীন হলেও একে অযৌন না বলে ভেজিটেটিভ আখ্যাই সব সময়ে দেওয়া হয়ে থাকে। আবার উদ্ভিদজগতে একপ্রকার রেণুর সাহায্যে অযৌন উপায়ে এক বিশেষ ধরনের প্রজনন সংঘটিত হতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিকেই অযৌন বলা হয়। কাজেই প্রাণীজগতে অযৌন উপায়ে প্রজনন বললে ভেজিটেটিভ পদ্ধতিই বোঝায়।

নিম্নস্তরের কতকগুলি প্রাণীর মধ্যেও ভেজিটেটিভ পদ্ধতিতে প্রজনন সংঘটিত হতে দেখা যায়। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতি প্রাণীদের এই পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে কেবল কোষ-বিভাজন হয়ে থাকে। অ্যামিবাকে অনুকূল পরিবেশে রেখে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একসময় সে ডাম্বেলের আকৃতি ধারণ করেছে। তারপর দেখা যাবে, অ্যামিবার মাঝখানের অংশটুকু ক্রমশঃ সরু হতে হতে এক সময়ে দুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। নিম্নস্তরের কয়েকটি প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই বিচ্ছিন্ন অংশও পৃথকভাবে জীবনযাপন করতে পারে। তাছাড়া হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণীদের দেহের এখান-ওখান থেকে ঠিক উদ্ভিদের মুকুলের মত নতুন হাইড্রা জন্মগ্রহণ করে। এইভাবেই ভেজিটেটিভ পদ্ধতিতে প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে।

ভেজিটেটিভ পদ্ধতিতে উদ্ভিদজগতে যেভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে প্রাণীজগতেও প্রায় সেইভাবেই ঘটে; উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কোষ-বিভাজনের দ্বারা যখন এককোষী উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি হয় তখন ভেজিটেটিভ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে বলতে হবে। কলম করার প্রথায় যে গাছ জন্মানো হয় সেটাও ভেজিটেটিভ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। তাছাড়া উদ্ভিদ দেহের কোনও অংশ থেকে উদ্গত মুকুল (যেমন পাথরকুচি পাতার মুকুল) অথবা কোন বিশেষ আঙ্গিক বিন্যাস (যেমন মারকেনসিয়া ও মস-এ দেখা যায়) থেকেও ভেজিটেটিভ পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

না-উদ্ভিদ না-প্রাণী কতকগুলি জীবকে এক পৃথক জাতিভুক্ত করা হয়েছে, যেমন—ব্যাকটিরিয়া। বংশবৃদ্ধিকালে এদের মধ্যে কোষ-বিভাজনের দ্বারা ভেজিটেটিভ পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। অনুকূল অবস্থায় এদের মধ্যে কতকগুলি আবার প্রতি আধঘণ্টায় একবার করে বিভাজিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, অযৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত উদ্ভিদজগতেই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হলো, একপ্রকার রেণুর উৎপত্তি। ইউলোথ্রিক্‌স্ নামে একপ্রকার সবুজ শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ, ছোট নদীতে অথবা পরিষ্কার

জলা জায়গায় এগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করে। এদের দেহকোষগুলি লম্বা-লম্বিভাবে এক সারিতে সাজানো থাকে। সারিতে অবস্থিত যে কোনও কোষের ভিতরে বিভাজনের ফলে নতুন কতকগুলি কোষের সৃষ্টি হয়; এরাই হলো পূর্বোক্ত রেণু। রেণুগুলি জনয়িতা কোষের প্রাচীরের একটি ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ জলের মধ্যে সাঁতার কেটে বেড়ায়। সিলিয়া নামে, সাঁতার কেটে বেড়াবার উপযোগী চারটে শুং এদের দেহে থাকে। সাঁতার কেটে সুবিধাজনক জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার পর রেণুর বিভাজন ঘটে এবং তাথেকে এক নতুন ইউলোথ্রিক্স সংঘ উদ্গত হয়। ঠিক এই উপায়ে না হয়েও যে কোনও ইউলোথ্রিক্স সরাসরি কোষরেণুতে রূপান্তরিত হতে পারে। স্পাইরোগাইরা নামে আরেক প্রকার সবুজ অ্যালগা আছে, যারা যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু স্পাইরোগাইরার যে কোনও জননকোষ অপর জননকোষটির সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে, অপুংজনির ন্যায় ঐ জননকোষ রেণুতে রূপান্তরিত হয়ে একটি স্পাইরোগাইরার সৃষ্টি করতে পারে।

ফার্ণ গাছের পাতার নীচে কালো বিন্দুর ন্যায় কতকগুলি রেণু দেখতে পাওয়া যায়। এই রেণু-গুলি অযৌন উপায়ে উৎপন্ন। ফার্ণ গাছের জীবন, আরও কয়েকটি উদ্ভিদের ন্যায় দুটা অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। একটি হলো লৈঙ্গিক, অপরটি হলো অলৈঙ্গিক অবস্থা। যখন পাতায় রেণু জন্মায় তখন ফার্ণ গাছ অলৈঙ্গিক অবস্থায় জীবনযাপন করে। এই রেণু থেকে আবার উদ্গত হয় যে অঙ্গ, তা থেকে সুরু হয় ফার্ণ গাছের জীবনে লৈঙ্গিক অবস্থা। উক্ত বর্ণনানুসারে উদ্ভিদজগতে অযৌন উপায়ে প্রজননক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

উদ্ভিদজগতকে প্রধানতঃ দুটা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—অপুষ্পক উদ্ভিদ ও সপুষ্পক উদ্ভিদ। সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন উপায়ে প্রজনন-কার্য ফুলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু অপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন উপায়ে প্রজননক্রিয়া জননকোষের মিলনের মধ্য দিয়ে ঘটে। অযৌন উপায়ে প্রজনন সম্পর্কে ইউলোথ্রিক্স ও স্পাইরোগাইরা—এই দুটা অপুষ্পক উদ্ভিদের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে যৌন উপায়েও প্রজনন হয়ে থাকে। অযৌন উপায়ে প্রজননকালে যেভাবে রেণু উৎপন্ন হয়, যৌন উপায়ে প্রজননকালে অনুরূপভাবেই জননকোষের উদ্ভব হয়। তবে জননকোষ রেণুর চাইতে অপেক্ষাকৃত ছোট হয় ও চারটার পরিবর্তে দুটা সিলিয়া জননকোষে থাকে। দুটা জনন-কোষের মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় একটি জাইগো-স্পোর (সাধারণ ভাষায় একে বীজ বলা যেতে পারে) এবং কালক্রমে তাথেকে উৎপন্ন হয় নতুন একটি ইউলোথ্রিক্স সঙ্ঘ।

পুকুরে লম্বা সুতার মত এক রকমের সবুজ শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদই হলো স্পাইরোগাইরা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্পাইরোগাইরার কোষগুলি এক সারিতে সাজানো থাকে। প্রজননকালে দুই সারি স্পাইরোগাইরা পরস্পরের সম্মুখীন হলে বিপরীত দিকে অবস্থিত কোষ থেকে নল নির্গত হয়ে একত্র মিলিত হয়। এই সময়েই ঐ দুটা কোষ জননকোষে পরিবর্তিত হয় এবং মধ্যবর্তী প্রাচীর লোপ পেয়ে গেলেই ঐ নল বেয়ে একটি জননকোষ অপর জননকোষের দিকে অগ্রসর হয়ে মিলিত হয়ে যায়। এভাবেই যৌন উপায়ে স্পাই-রোগাইরার প্রজনন হয়ে যায়।

আকৃতিগতভাবে ইউলোথ্রিক্স বা স্পাই-রোগাইরা এর কোনটির ক্ষেত্রেই জননকোষগুলির যৌনভেদ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে স্পাইরো-গাইরার প্রজননকালে যে জননকোষকে সচল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় পুরুষ এবং স্থির অবস্থার অপর জননকোষটিকে বলা হয় স্ত্রী। জননকোষের এরূপ অনির্ধারিত যৌনভেদ কয়েকটি ছত্রাকের মধ্যেও দেখা যায়।

অযৌন উপায়ে ফার্ণ গাছের পাতায় উৎপন্ন

রেণু থেকে যে অঙ্গ উদ্গত হয়, যাকে উদ্ভিদবিদেরা বলেন—প্রোথ্যালাস, তাতে অ্যানথেরিয়া ও আর্কিগোনিয়া নামে যথাক্রমে পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আর্কিগোনিয়া উর্ধ্বদিকে উন্মুক্ত নলবিশিষ্ট একটি অঙ্গ। এর তলদেশে থাকে ডিম্বকোষ এবং এখানেই এর সঙ্গে মিলিত হয় যে কোনও একটি পুং-জননকোষ। এই নিষিক্ত ডিম্বকোষ থেকে যথাকালে উদ্ভূত হয় ফার্ণ গাছ।

এভাবেই সাধারণতঃ অপুষ্পক উদ্ভিদে যৌন উপায়ে প্রজনন ঘটে। যৌনপ্রজনন উৎকর্ষলাভ করেছে সপুষ্পক উদ্ভিদে। সপুষ্পক উদ্ভিদে যৌন অঙ্গগুলি ফুলের মধ্যে থাকে। কোন কোন ফুল উভলিঙ্গ, অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী অঙ্গগুলি একই ফুলে থাকে, আবার কতকগুলি ফুল একলিঙ্গ, অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী অঙ্গগুলি পৃথক ফুলে থাকে। যেসব গাছে স্ত্রী-ফুল ও পুং-ফুল দুই-ই থাকে তাদের বলা হয় সহবাসী; আবার যে সব গাছ শুধু পুং অথবা শুধু স্ত্রী ফুল ফোটে তাদের বলা হয় ভিন্নবাসী। কিন্তু কোনও গাছে যখন উভলিঙ্গ ও একলিঙ্গ উভয় প্রকারের ফুল ফোটে তখন তাকে বলা হয় মিশ্রবাসী।

ফুলে বৃতি ও দলমণ্ডল ছাড়া পুং-কেশর ও গর্ভ-কেশর নামে অপর যে দুটি অংশ থাকে, প্রজননকার্যে তাদেরই প্রয়োজন হয়। পুং-কেশরে দেখা যায়, একটা সূত্রের উপর অবস্থিত পরাগধানী। পরাগধানীর ভিতরে থাকে অসংখ্য পরাগ। গর্ভকেশরের উপরের অংশকে বলে গর্ভমুণ্ড, তারপর দণ্ডের আকৃতিবিশিষ্ট খানিকটা অংশকে বলে গর্ভদণ্ড, ও সর্বনিম্নস্থিত অপেক্ষাকৃত স্থূল অংশকে বলে গর্ভাশয়। গর্ভাশয়ের ভিতরে থাকে অসংখ্য ডিম্বাণু।

সপুষ্পক উদ্ভিদে পরাগ-সংযোগের দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়। কীটপতঙ্গ, বাতাস অথবা জলের সাহায্যে গর্ভমুণ্ডের সঙ্গে যখন পরাগ মিলিত হয়, তখন পরাগ থেকে একটা নল বেরিয়ে এসে গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে ডিম্বাণুর কাছে পৌছায়। ঐ নল বেয়ে পরাগের কোষকেন্দ্র ডিম্বাণুর কোষকেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়। এভাবে নিষিক্ত ডিম্বাণু বীজে পরিণত হয়ে উদ্ভিদের বংশবিস্তার করে।

কেবল যে এসব উপায়েই অবলম্বিত হয়ে থাকে তা নয়, এর ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়।

বিগত মহাযুদ্ধে নদী-বিজ্ঞানের অবদান

শ্রীসুরথনাথ সরকার

বিগত মহাযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে এবং মিত্রপক্ষের জয়লাভের ব্যাপারে নদী-বিজ্ঞানের সহায়তা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল, সে সম্পর্কে কয়েকটা ঘটনার কথা এস্থলে উল্লেখ করবো। সমর ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে ও আক্রমণ পরিকল্পনা রচনায় নদী-বিজ্ঞানের অবদান বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। প্রাক্‌যুদ্ধকালীন নদী-বিজ্ঞানলব্ধ ব্যবস্থাবলী (যথা, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন) একদিকে সমরসম্ভার উৎপাদনে যেমন সাহায্য করেছে এবং যুদ্ধকালীন আবিষ্কারসমূহ সেই সময়কার বিশেষ চাহিদা মিটিয়েছে, তেমনি তারা ভবিষ্যৎ শান্তির পক্ষেও কল্যাণকর হয়ে উঠেছে।

বস্তুতঃ যুদ্ধকালীন বিবিধ জটিল সমস্যা সমাধানে নদী-বিজ্ঞানের অবদান এতই বেশী যে, তার সব কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। এখানে মাত্র কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কথাই উল্লেখ করছি।

১৯৪৪ সালের জুন মাস। মিত্রশক্তি কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণকালে উপকূলে অবতরণের জন্যে ভাসমান পোতাশ্রয় নির্মাণের কথা আজ হয়তো অনেকেরই মনে নেই। নরম্যাণ্ডি উপকূলে তখন যে দুটি কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈরী হয়েছিল, কিছুদিনের মধ্যেই ঝঞ্ঝাবাত্যার মুখে তার একটি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পোতাশ্রয়টি এরূপ কার্যকরী হয়েছিল যে, একমাত্র তার সাহায্যেই বিপুল সমরসম্ভার সহ মিত্রপক্ষবাহিনীর ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই কৃত্রিম পোতাশ্রয় নির্মাণে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। এই ব্যাপারের যাবতীয় পরিকল্পনা, কংক্রীট কেশন (Caisson) প্রভৃতি, সমস্তই ইংল্যাণ্ডে তৈরী করে অকুস্থলে নিয়ে কাজে লাগানো হয়েছিল এবং তরঙ্গক্রিয়া প্রভৃতির ফলাফলও পূর্বেই স্থির করা হয়েছিল। এ রকম ব্যবস্থা থেকে কতটা নিরাপত্তা সম্ভব তা-ও অনুকৃতির সাহায্যে পরীক্ষান্তে নির্ণীত হয়েছিল। মডেলের সাহায্যে এ রকম পরীক্ষার গুরুত্ব অন্যত্রও অনুভূত হয়েছে। জার্মান সাবমেরিণ আক্রমণের তীব্রতার সময় তৈলবাহী জাহাজগুলিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্যে আমেরিকার স্যাভানা পোতাশ্রয়ের উপকূলবর্তী জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থার অনুকৃতির সাহায্যে পরীক্ষান্তে সঠিক উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল। কালিফোর্নিয়ায় সান পেড্রো অঞ্চলের নৌঘাঁটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এ সম্বন্ধে পরিকল্পনাসমূহ যথার্থ wave and surge model-এর সাহায্যে স্থিরীকৃত হয়েছিল। এরকম আরো অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে।

আক্রমণ পরিকল্পনার ব্যাপারে নদী প্রভৃতি অতিক্রম করবার জন্যে ইউরোপের নদীগুলির বন্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণেরও একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। যে সব জায়গায় নদী অতিক্রম করতে হবে তথায় সেতুনির্মাণ, উভচর যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যে নদীর গভীরতা, ঢাল, চওড়া, স্রোতের বেগ, বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলসমূহের বিশদ বিবরণ ইত্যাদিও জানা দরকার ছিল। ভাবী বন্যার সম্ভাবনার হিসাবটাও ছিল অপরিহার্য; কারণ তার উপর নির্ভর করেই হাসপাতাল, ছাউনি প্রভৃতি স্থাপন করতে হয়েছিল। এর জন্যে নদীগুলির দীর্ঘদিনের ইতিহাস প্রয়োজন হলেও তখন তা পাওয়ার উপায় ছিল না। স্বল্পকালীন hydrological তথ্যের উপর নির্ভর করে এসব

কাজে অগ্রসর হওয়ায় বিশেষ সতর্কতারও প্রয়োজন ছিল। তদুপরি নদীতে যদি বাঁধ থাকে তবে তো কথাই নেই; তাতে বিপদের সম্ভাবনা আরো অনেকগুণ বেশী। যে কোন সময়ে শত্রুপক্ষ বাঁধ ভেঙ্গে দিলে আক্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবার কথা। এ রকম অবস্থায় বন্যার স্থিতিকাল ও ব্যাপকতা সম্পর্কেও নদী-বিশেষজ্ঞদের গবেষণা করতে হয়েছিল। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিপদ ঘটে নি, তবু সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। তবে রোর নদী অতিক্রমের সময় শত্রুকর্তৃক বাঁধের নালামুখ খুলে দেওয়ায় এ রকম বিপদ সত্যিই এসেছিল, কিন্তু বন্যার মাত্রা ও তার স্থিতিকাল জানা থাকায় আক্রমণ পরিকল্পনায় আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছিল এবং বিশেষ জটিল কোনরূপ অসুবিধার কারণ ঘটে নি।

মিত্রপক্ষের রাইন নদী অতিক্রম সামরিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ কাজে হাজার হাজার উভচর যান, সামরিক সাজসরঞ্জামের ব্যবহার ও সামরিক সেতুনির্মাণ প্রভৃতি অনেক কিছু করতে হয়েছিল। হিসাবে সামান্যমাত্র ভুল-ভ্রান্তি হলে কি মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল, সেকথা সহজেই অনুমেয়। আক্রমণ সুরু হওয়ার পর বন্যা হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কারণ এ অবস্থায় আক্রমণ স্থগিত রাখা একরূপ অসম্ভব। তাই রাইন নদী অতিক্রমের নির্ধারিত দিনটির অবস্থাটা যতদূর সম্ভব ভালভাবেই জানতে হয়েছিল। রাইন নদীর যে যে অঞ্চল বন্যার কোপে পতিত হয় তার অধিকাংশই শত্রু নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে তথায় প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণকার্য চালানো সম্ভব ছিল না। ষ্ট্রাসবুর্গের উপরের দিকে কয়েকটি জায়গায় মাত্র এ রকম পরীক্ষাকার্য চলেছিল। তাছাড়া এসব জায়গায় দীর্ঘ দিনের বারিপাতের বিবরণও পাওয়া যায় নাই। বিমানচালনার জন্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তাকেই বিশ্লেষণ করে এ কাজে লাগানো হয়েছিল। এ থেকেই রাইন উপত্যকার বিভিন্ন অংশের বারিপাতের পরিমাণ এবং তার ফলে উদ্ভূত বারিলেখের (hydrograph) প্রকৃতি কিরূপ হবে তার হিসাব করা হয়েছিল। আক্রমণ সুরু হবার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত এই বন্যাবিষয়ক পূর্বাভাসের ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখতে হয়েছে, যাতে সাময়িকভাবে নির্মিত সেতুর সাহায্যে পারাপারের ব্যবস্থায় কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে। তবে একথা হয়তো সহজেই বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ-যুদ্ধে এ রকম বিরাট ব্যবস্থার বিশেষ কোন প্রয়োজনই হবে না। কারণ বর্তমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং তার সঙ্গে রেডার প্রভৃতির সাহায্যে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস বিষয়ক জ্ঞানলাভের ফলে জটিলতা অনেক কমে যাবে। তথাপি এ সব উন্নততর ব্যবস্থা সত্ত্বেও নদীপ্রবাহ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন থাকবেই।

যুদ্ধের সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে কিংবা শত্রুপক্ষের সমরসম্ভার উৎপাদন ব্যাহত করবার জন্যে বরুণাস্ত্রের প্রয়োগও হয়েছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানরা যখন হল্যাণ্ড আক্রমণ করে তখন তাদের অগ্রগতি রোধ করবার জন্যে তথাকার লোকেরা বাঁধের সাহায্যে রক্ষিত নীচু জায়গাগুলিকে বাঁধ ভেঙ্গে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ইটালীতে অভিযানকালেও শত্রুকর্তৃক গ্যারিগ্লিয়ান নদীর বাঁধের মুখ খুলে দেওয়ায় মিত্রপক্ষের নদী-অতিক্রম বিলম্বিত হয়েছিল। রোর নদী অতিক্রম কালেও জার্মানরা Schwammenauel বাঁধের নালামুখ খুলে দেওয়ায় একই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। তবে সবচেয়ে যে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি হচ্ছে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বহর কর্তৃক রুঢ় উপত্যকায় Mohne Dam-এ বোমাবর্ষণ। এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসরবরাহ বন্ধ করে রুঢ় এলাকায়

শত্রুপক্ষের যুদ্ধ-শিল্পের ধ্বংসসাধন করা। নদীর খাত থেকে ১০৫ ফুট উচ্চ এবং একলক্ষ একর ফুট আয়তনবিশিষ্ট কংক্রীট নির্মিত বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত এই জলধারে সঞ্চিত তিন চতুর্থাংশ জলই প্রায় ১৭ ঘণ্টার মধ্যে বোমাবর্ষণের ফলে বের হয়ে যায়। তার ফলে এর নিম্নাঞ্চলে যে প্রবল বন্যা ও স্রোতের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে রাস্তাঘাট, সেতু প্রভৃতি বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বস্তুতঃ এই বাঁধ ভেঙ্গে দেবার ফলে রূঢ় এলাকার নিম্নাঞ্চলে রাইন নদীর জলপ্রবাহের মাত্রা দেড়লক্ষ ঘনফুট-সেকেণ্ড পরিমাণ বেড়ে যায়।

যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলেও এরকম বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে যে বন্যাতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই এখনও জানবার আছে, যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ ক্ষেত্রে সেসব তথ্যের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মিত্রপক্ষীয় বৈজ্ঞানিকেরা কতকগুলি তথ্যকে তখনই কাজে লাগিয়ে ছিলেন। যেমন বেল্ থেকে চল্লিশ মাইল উজানে রাইন নদীর একটি শাখায় Schlucht Dam নামে যে বাঁধ রয়েছে, শত্রুপক্ষ যদি তাকে তখন ভেঙ্গে দিত তাহলে তার পরিণতি কি হতো মিত্রপক্ষকে তার হিসাব নিতে হয়েছিল। এই বাঁধ Mohne Dam এর প্রায় সমান এবং নদীর ঢালও রূঢ় অঞ্চলের নদীর অনুরূপ। কাজেই উভয় নদীর উপত্যকার বৈশিষ্ট্যকে ধরে নিয়ে বাঁধ ভাঙ্গলে যে বন্যাতরঙ্গ সৃষ্টি হতো তার গতি কিংবা উচ্চতা সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব হয়েছিল। আরও মজার কথা এই যে, এই তুলনামূলক গবেষণা থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেল তা ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের তৈরী অনুকৃতি থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে অবিকল মিলে গিয়েছিল।

যুদ্ধকালীন আবিষ্কারসমূহের মধ্যে রেডার যে একটি বিশিষ্ট অবদান তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর সাহায্যে যে সব বিস্ময়কর কার্য সাধিত হয়েছে এস্থলে তার উল্লেখ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক। তবে ঝঞ্ঝাবাত্যার গতিপথ নিরূপণে এবং তার প্রকৃতি ও পরিবর্তন নির্ধারণে এর যে বিশেষ উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে রেডার-বিশেষজ্ঞেরা এর সাহায্যে ঝড়ের পূর্বাভাস ও সঠিকভাবে গতিপথ নির্ণয় করতে সমর্থ হন। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্লোরিডা উপদ্বীপে প্রবল ঝড়ের সময় এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে ভালভাবে জানবার সুযোগ ঘটে। এই প্রসঙ্গে জলপথ পরিমাপের জন্যে প্রতিধ্বনি-প্রয়োগ পদ্ধতিরও (Echo sounding device) উল্লেখ করা প্রয়োজন। অতি অল্প সময়ে অথচ সঠিকভাবে নদীর ছেদ আয়তন নির্ণয়ে অথবা পোতাশ্রয় বা জলধারে সঞ্চিত পলিমাটির মাত্রা নিরূপণে এর উপযোগীতা অপরিসীম। জলের মধ্যে শব্দ চলে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০০ ফুট হিসাবে। কাজেই জলের ভিতর দিয়ে শব্দ নদীর খাতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসার কাল থেকে সহজেই নদীর গভীরতা পাওয়া যেতে পারে। জলের তলার কঠিন পদার্থ, পলিমাটির স্তর কিংবা মাছের ঝাঁক প্রভৃতির খবর এর সাহায্যে পাওয়া যায়। যুদ্ধের সময় এ-বিষয়ে বিস্তর উন্নতি ঘটেছে এবং আজকাল এ ব্যাপারেও রেডার যন্ত্রের প্রয়োগ হচ্ছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় আর একটা বিশেষ সমস্যা ছিল—সাবমেরিনের পেরিস্কোপ স্পন্দন। সাবমেরিনের এই যন্ত্র ব্যবহারকারীরা জানেন যে, জলের নীচে সাবমেরিনের গতিবেগ একটা সর্বোচ্চ মাত্রায় না উঠলে এ রকম সমস্যা দেখা দেয়। তার ফলে সাবমেরিন থেকে বাইরের কিছু তো দেখা যাবেই না বরং পেরিস্কোপ ভেঙ্গে যাবারই আশঙ্কা থাকে খুব বেশী। আগে সাধারণতঃ পেরিস্কোপের দৈর্ঘ্য যতটা সম্ভব হ্রাস করে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত David Taylor Model Basin-এ এ সম্পর্কে গবেষণার ফলে দেখা গেল এই স্পন্দনের মূল হচ্ছে দু-রকমের

ঘূর্ণী-সংঘাত। এটাকে দূর করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের পেরিস্কোপের নলের চারদিকের প্রবাহ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হয়েছে। ফলে অনেকটা নতুন রকমের ব্যবস্থারই সূত্রপাত হয়েছে। এ সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার – সমচাপবিশিষ্ট সীমা সৃষ্টি। এর লক্ষ্য হচ্ছে, যাতে জল কিংবা বায়ুর মধ্য দিয়ে দ্রুত সঞ্চরণশীল কোন পদার্থের উপর সঙ্কোচন-চাপ কিংবা cavitation effect না ঘটে। এ সম্বন্ধে জার্মেনীতে যে বিস্তর গবেষণা হয়েছিল পরবর্তী কালে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

স্থলভাগের মানচিত্র অঙ্কন ব্যাপারে আকাশ থেকে চিত্র গ্রহণের পদ্ধতি অনেকদিন থেকেই সুরু হয়েছিল। কিন্তু জলের নীচেকার স্থানসমূহের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এর প্রয়োগ বড় বেশী হয় নি। বিগত যুদ্ধের সময় তারাওয়ায় অবতরণ কালে মগ্নশৈল থাকার দরুণ যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল তা যথাযথ অনুধাবন না করায় বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সেসব অসুবিধা দূর করবার জন্যে গভীর জলরাশির তলদেশের বিবরণ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সামরিক বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার জন্যে প্রায় দশহাজার চিত্র গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাপারে colour filter প্রণালীই প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোন রঙীন ফিল্টারের মাধ্যমে যদি আকাশ থেকে সাগর-সৈকতের সরাসরি চিত্র গ্রহণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, চিত্রের স্বচ্ছতা জলের গভীরতা এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। জলের স্বচ্ছতাজ্ঞাপক সংখ্যাটি জানা থাকলে চিত্রের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক স্বচ্ছতা থেকে জলের গভীরতা পাওয়া সম্ভব। আর পূর্বোক্ত সংখ্যা জানা না থাকলেও বিভিন্ন colour filter-এর মাধ্যমে একই সময়ে গৃহীত চিত্র থেকে তা পাওয়া যেতে পারে। স্থির এবং স্বচ্ছ জলরাশিতে ত্রিশ ফুটেরও বেশী গভীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিমজ্জিত গাছপালা, পাহাড়-পর্বতের বিস্তৃত বিবরণ সহজেই এ থেকে পাওয়া গেছে।

প্রতিনিধিত্বমূলক মাতৃত্ব

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

যে গর্ভধারণ করে সে-ই মাতা, যে পালন করে সেও মাতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্তমান আলোচনার সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক মাতৃত্ব বলিতে গর্ভস্থ ভ্রূণ ধারণের ব্যাপারে প্রতিনিধিত্বকেই বুঝাইবে। বিষয়টি অদ্ভুত মনে হওয়া স্বাভাবিক, কাজেই একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ডিম্বাধার হইতে ডিম্বাণু নির্গত হইয়া ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে বৃদ্ধি পায় এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক স্তন্যপায়ী জীবের মাতাকেই কিছুকাল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতে হয়। যদি এমন একটি অবস্থা কল্পনা করা যায় যাহাতে গর্ভসঞ্চারের পরেই ডিম্বাণুটিকে অন্য গর্ভে স্থানান্তরিত করা যায় তাহা হইলে সেই গর্ভেই ভ্রূণটি বৃদ্ধি পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে। সেই অবস্থায় সন্তানের প্রকৃত মাতা কে হইবে, সে সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে যে, দ্বিতীয় মাতা উহাকে গর্ভে ধারণ করিলেও ভ্রূণের উদ্ভব হইয়াছে অন্য মাতৃগর্ভে। দ্বিতীয় মাতা গর্ভে ধারণ করিয়া প্রকৃত মাতাকে গর্ভধারণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে মাত্র। কাজেই গর্ভে ধারণ করিলেও দ্বিতীয় মাতা প্রকৃত জননী নয়, সে শুধু জননীর প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে।

এই অবস্থায় প্রকৃত মাতৃত্ব নির্ধারণে যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হউক না কেন, প্রকৃত-প্রস্তাবে এরূপ ব্যাপার অসম্ভব ও আজগুবিই মনে হইবে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অসম্ভব বলিয়া কিছু স্বীকার করে না। অসম্ভবকে সম্ভব করাই উহার সাধনা। বাস্তবিকই এইভাবে ডিম্বাণুকে গর্ভান্তরিত করিয়া শাবক উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। প্রায় ১৭ বৎসর পূর্বে ডাঃ গ্রেগরি উইস্কন্সিন গবেষণা কেন্দ্রে খরগোসের উপর এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য হন। তারপর ইঁদুর ও ভেড়া হইতেও এইভাবে শাবক উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি এক গাভী হইতে অপর গাভীর গর্ভে এইভাবে ডিম্বাণু স্থানান্তরিত করিয়া ৮৪ পাউণ্ড ওজনের একটি গোবৎস জন্মান সম্ভব হইয়াছে। বৎসটি দ্বিতীয় মাতার গর্ভে বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ণভাবে উহার প্রকৃত মাতার গুণাবলী লাভ করিয়াছে।

গো-প্রজননে অন্য রকমের কৃত্রিমতা অনেক কাল পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষ-ভাবে বৃষসংযোগ ব্যতীতও গাভীর গর্ভাধান সম্ভব। গো-প্রজননে এই কৃত্রিম ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় অনেক স্থানে লোক বৃষ পোষার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। অপরদিকে এই ব্যবস্থায় গোবংশের উন্নয়নও সহজসাধ্য হইয়াছে। উন্নত শ্রেণীর বৃষ সংযোগে নিকৃষ্ট জাতীয় গাভী হইতেও উন্নত জাতীয় গোবৎস পাওয়া যাইতে পারে। অনেকাংশে পিতৃগুণের অধিকারী হওয়াতে গোবৎস মাতৃবংশ হইতে অনেক উন্নত হয়। এইভাবে গোবংশের উন্নতিকল্পে যত্র তত্র অধিক ব্যয়ে উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ পোষার প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে। একস্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় বৃষ পালন করিয়া উহাদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রয়োজনমত কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত বীজ প্রয়োগেই বৃষসংযোগের ফললাভ হইতে পারে। আমেরিকা ও ইউরোপে এই ব্যবস্থা বহুল প্রসার লাভ করিয়াছে। আমেরিকায় বর্তমানে শতকরা ১০টি গাভী হইতে এইভাবেই বৎস

উৎপাদিত হইতেছে। চুঁচুড়া সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে এইভাবে উন্নত ধরনের বৃষের বীজ সংরক্ষণ ও কৃত্রিম প্রয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। লোকে খুব অল্প ব্যয়ে সাধারণ গাভী হইতেও উৎকৃষ্ট জাতীয় বৎস লাভ করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় বৃষের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হয়। প্রত্যক্ষভাবে বৃষ-সংযোগে একটি বৃষ হইতে যত সংখ্যক বৎস লাভ করা সম্ভব, এই ব্যবস্থায় তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বৎস উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। আমেরিকায় এই কৃত্রিম ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রতিটি বৃষ হইতে বৎসরে প্রায় ১৩০০ গোবৎস উৎপন্ন হইতেছে।

বৃষ সংযোগের কৃত্রিম ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় গো-প্রজননে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও উন্নত শ্রেণীর বৃষের বীজ নিকৃষ্ট জাতীয় গাভীতে প্রয়োগ করিলে গোবৎস সম্পূর্ণভাবে পিতৃগুণের অধিকারী হইতে পারে না, মাতার নিকৃষ্ট গুণও উহাতে বর্তাইয়া থাকে। ডিম্বাণুর গর্ভান্তরীণের ব্যবস্থায় এই ত্রুটি সহজে সংশোধনের সম্ভাবনা রহিয়াছে; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বীজ দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভীর গর্ভাধান করা হইলে ঐ ডিম্বাণু গর্ভান্তরিত করিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাভীর গর্ভ হইতেও পূর্ণ গুণসম্পন্ন বৎস লাভ করা যাইবে।

সাধারণ অবস্থায় একটি গাভী হইতে প্রতি দেড় বৎসরে একটি করিয়া বৎস লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই গর্ভান্তরকরণের ব্যবস্থায় একটি গাভী হইতে প্রতিনিধির মাধ্যমে বৎসরে ২০টি বৎস লাভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বিশেষ একটি উন্নত শ্রেণীর গাভী হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর গাভীর সহায়তায় এইভাবে বৎসরে ২০টি উন্নত জাতীয় বৎস উৎপাদন যে বিশেষ লাভজনক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে উন্নত শ্রেণীর গোবংশের যে দ্রুত বিস্তার লাভ ঘটিবে, সে বিষয়ে কোন মতান্তর থাকিতে পারে না। উইসকনসিন ব্যতীত টেক্সাস প্রভৃতি আমেরিকার অন্যান্য গবেষণাগারেও এই গর্ভান্তর-করণের ব্যবস্থাটিকে বিশেষ সহজ ও ত্রুটি বিমুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা চলিয়াছে।

খরগোসের মত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জীবে এইরূপ গর্ভান্তরকরণ যত সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে, গাভীর পক্ষে তত সহজসাধ্য নয় বলিয়া জানা গিয়াছে। গাভীর গর্ভে ৩৫ দিন পর পর একটি ডিম্বাণু নির্গত হয়। এই ডিম্বাণুটিকে খুঁজিয়া বাহির করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিশেষতঃ গর্ভান্তরকরণের পূর্বে ডিম্বাণুটিতে যে ভ্রূণাঙ্কুর স্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ গাভীটির যে গর্ভাধান হইয়াছে সে সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। পিটুইটারী গ্রন্থির রস অন্তর্নিক্ষেপের ফলে ডিম্বাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতিবারে একটির স্থলে ২৫টি ডিম্বাণু উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই ডিম্বাণুগুলি দেখিতে সাধারণ ডিম্বাণুর মত তত দৃঢ় নয় এবং ঐ সব ডিম্বাণু হইতে উৎপন্ন বৎস অধিকাংশই মাতৃগর্ভে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশেষজ্ঞ-দের মতে, এইরূপ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পূর্বক গর্ভান্তরিত করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত গো-প্রজননের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রচলন এখনও সময়সাপেক্ষ।

স্তন্যপায়ী কোন কোন জীবে অন্য আর এক-ভাবেও এইরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক মাতৃত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। একের গর্ভাশয় অপর দেহে সংযোজন করিয়া এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। ডাঃ হুইট্‌নে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে এক কুকুরের ডিম্বা-ধার অন্য কুকুরে সংযোজন করিতে সক্ষম হন। এইরূপ করিবার ফলে ডিম্বাধারটি যে জাতীয় কুকুরের, উৎপন্ন বাচ্চাটিও সেই জাতীয়ই হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটি গ্রেহাউণ্ডের ডিম্বাধার যদি একটি অ্যাল্‌সেসিয়া কুকুরে সংযোজিত হয় তবে ঐ

অ্যাল্‌সেসিয়া কুকুরের গর্ভে যে সন্তান হইবে উহা গ্রেহাউণ্ড জাতীয় হইবে। ডিম্বাধার হইতে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়; কাজেই গ্রেহাউণ্ড কুকুরের ডিম্বাধার স্থানান্তরিত হইলেও তাহা হইতে উৎপন্ন ডিম্বাণু গ্রেহাউণ্ডের গুণসম্পন্নই হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে অ্যাল্‌সেসিয়া কুকুর গর্ভে ধারণ করিলেও উহাকে নিশ্চয়ই গ্রেহাউণ্ড বাচ্চার জননী বলা চলিবে না। এখানেও অপরের ডিম্বাধার বহন করিয়া সন্তান ধারণে সে প্রকৃত জননীর প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।

ডাঃ হুইট্‌নের গবেষণা হইতে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, বয়োবৃদ্ধ কুকুরের ডিম্বাধার বহুকাল সন্তান প্রসবে শ্লথ ও সন্তান সৃজনে অক্ষম হইয়া পরিলেও ঐ ডিম্বাধার অল্প বয়সের কুকুরে সংযোজিত হইলে উহাতে নবযৌবন সঞ্চারিত হয়। উহাব সাহায্যেই অল্পবয়স্ক কুকুর সন্তান ধারণে সক্ষম হয় এবং এইভাবে বয়স্ক কুকুরের মৃত্যুর পরেও উহারই সন্তান বৎসরের পর বৎসর প্রসব করিয়া চলে।

পাশ্চাত্যের কোন কোন স্থানে সংরক্ষিত বীজের কৃত্রিম প্রয়োগে সন্তানেচ্ছু রমণীর সন্তান লাভ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় সমাজে সন্তানহীনার সন্তান লাভে অনেক বাধা আছে। বহুকালের সংস্কারে আঘাত লাগে। ক্ষেত্রজ সন্তানের ব্যবস্থা এ যুগে অচল। কিন্তু ডিম্বাধারের গর্ভান্তরণ দ্বারা মানুষের মধ্যে সন্তান সৃজন সম্ভব হইলে সন্তানহীনার এইভাবে সন্তান লাভে সামাজিক ও সংস্কারগত বাধার পরিমাণ যে কম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সে ক্ষেত্রে সন্তান গর্ভে ধারণ করিলেও সে সেই সন্তানের প্রকৃত জননী নয়, জননীর প্রতিনিধি মাত্র। এই ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত থাকিয়াই সে সন্তান লাভ করিয়া সন্তান তৃষা মিটাইতে পারিবে।

উচ্চচাপে মানুষের অনুভূতি

শ্রীরণজিৎকুমার দাস

প্রাণীজগতে আমরা স্থলচর, জলচর, উভচর ও খেচর—মোটামুটি এই কয়টা প্রধান ভাগ দেখতে পাই। এগুলি ছাড়া, অবশ্য আরো কয়েকটা পর্যায়ের প্রাণী আছে—যেগুলিকে কোন বিশেষ ভাগে ফেলা যায় না। যেমন বিভিন্ন রকমের রোগের জীবাণু ইত্যাদি। এদের মধ্যে যে সমস্ত প্রাণী ভূপৃষ্ঠে বাস করে তাদের সকলের উপরই সমান হারে বায়ুর চাপ পড়ছে—যার পরিমাপ হচ্ছে প্রত্যেক বর্গইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই পরিমাণ চাপকে এক অ্যাটমোস্‌ফিয়ার বলে। দিনরাত এই চাপে থেকে থেকে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা মোটেই কিছু অনুভব করতে পারি না। মাছ ও অন্যান্য যে সব প্রাণী জলে বাস করে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সাধারণ বায়ুর চাপের চেয়ে বেশী চাপ বহনের উপযোগী। জলের নীচে প্রত্যেক ৩৩ ফুট গভীরতার চাপ বায়ুর চাপের সমান হয়, অর্থাৎ এই গভীরতায় যে সমস্ত জলচর আছে তাদের উপর মোট চাপ পড়ছে ২ অ্যাটমোস্‌ফিয়ার। এভাবে জলের নীচে প্রত্যেক ৩৩ ফুট গভীরতা বৃদ্ধিতে মোট চাপ এক অ্যাটমোস্‌ফিয়ার হারে বাড়তে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি কোন ভূচরকে—ধরা যাক মানুষকেই হঠাৎ সাধারণ বায়ুর চাপ থেকে বেশী চাপে রাখা যায়, তাহলে মানুষের উপর কি কি প্রতিক্রিয়া হবে?

এক অ্যাটমোস্ফিয়ারের চেয়ে বেশী চাপ পাওয়ার জন্যে আমরা দুটি উপায় অবলম্বন করতে পারি। আমরা ডাইভিং-বেল এ করে জলের নীচে অনেক দূর যেতে পারি। বেলটা খুব মজবুত ধাতব পাতে তৈরী—যা জলের নীচে কয়েক অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ সহন করতে সক্ষম। ভিতরে যে লোক থাকে তাকে বিশেষভাবে তৈরী ধাতব নলের সাহায্যে জলের উপর থেকে বাতাস সরবরাহ করা হয়। এই বাতাসের চাপ বায়ুর সাধারণ চাপের সমান থাকে, কাজেই পরীক্ষাকারী ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন অসুবিধা ঘটে না। আর একটি উপায় হচ্ছে, সাঁজোয়া ডুবুরী পোষাক পরে জলের নীচে নামা। এই সাঁজোয়া পোষাকটিকে মোটামুটি দুটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। পা থেকে বুক পর্যন্ত রবার-মোড়া কাপড়ে তৈরী জামা। ডুবুরী এই অংশে ঢুকে যাওয়ার পর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত ধাতব বর্মে ঢেকে দেওয়া হয়। পোষাকের এই দুটি অংশকে স্ক্রু দিয়ে এমনভাবে এঁটে দেওয়া হয় যাতে কয়েক অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপেও বিন্দুমাত্র জল পোষাকের ভিতর ঢুকতে না পারে। এই ধাতব বর্মের মুখোসের সামনের দিকে থাকে একখণ্ড মোটা স্বচ্ছ কাঁচ—যার ভিতর দিয়ে জলের নীচে কিছুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। সিঁড়ির সাহায্যে ফুট ছয়েক নামবার পর ডুবুরী দড়ি ধরে নামতে থাকে। দড়ির প্রান্তদেশে একখণ্ড ভারী সীসা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জলের নীচে নামবার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চাপে বাতাস সরবরাহ করা হয়। জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই চাপ বাড়ানো হয়। বিশেষভাবে নির্মিত পাম্পের সাহায্যে এই চাপ বাড়ানোর কাজ চলে।

ডুবুরীকে বাতাস সরবরাহ করবার জন্যে বিশেষ ভাবে নির্মিত নল ব্যবহার করা হয়। এই নল ডুবুরীর মুখোসের কাছ থেকে বরাবর জলের উপরে উঠে যায় এবং জলের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নলের দৈর্ঘ্যও বাড়তে থাকে। মুখোসের সঙ্গে এই নল একখানা একমুখী ভাল্‌ভের সাহায্যে সংযুক্ত থাকে। ডুবুরীর নিরাপত্তার জন্যে এই একমুখী ভাল্‌ভের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যদি কোন কারণে পাম্প বিগড়ে যায় এবং ভাল্‌ভের মধ্য দিয়ে বায়ু উল্টা দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে, তাহলে জলের চাপ ডুবুরীকে তার পোষাকের মধ্যে ভীষণভাবে চেপ্টে দেয়। এর ফলে ডুবুরীর রক্ত-মাংসের প্রায় সবটুকুই নলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং পোষাকের মধ্যে পড়ে থাকে হাড় ও কিছু মাংস। এ রকমের কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আজকাল যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবার ফলে অবশ্য এরকম দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। মুখোসের কাছে একটা স্ক্রুর সাহায্যে ডুবুরী অনায়াসেই বাতাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একজন সাইকেল আরোহীর পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করবার চেয়ে এই নিয়ন্ত্রণ বেশী কঠিন নয়।

বিপদের সময় ডুবো জাহাজের কর্মীদের এবং সাধারণভাবে ডুবুরীদের কি কি শারীরিক বিপদের সম্ভাবনা আছে তা নিয়ে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর জে. বি. এস. হলডেন এবং আরও অনেকে গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক গবেষণা করেন। অধিকাংশ গবেষণাই ন্যাভেল ফিজিয়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ ডুবুরী পোষাক বিক্রেতা মেসার্স সিব্‌ গোরম্যান্‌ এণ্ড কোং ও নিজেদের ল্যাবরেটরীতে এ ধরনের গবেষণার কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

জলের নীচে না নেমেও গভীর জলের চাপে শরীরের উপর যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া হয় তা নিয়ে পরীক্ষা করা চলে। এ ধরনের পরীক্ষার জন্যে সিব্‌ গোরম্যান্‌ কোম্পানী লৌহনির্মিত সিলিণ্ডার ব্যবহার করেন, যার আকার অনেকটা বয়লারের মত। এর দৈর্ঘ্য আট ফুট এবং ব্যাস চার ফুট। তিন জন লোক এর ভিতরে বসতে পারে; কিন্তু দাঁড়ানো চলে না। সিলিণ্ডারের একদিকে

আছে একটা লোহার দরজা। এটা সিলিণ্ডারের ভিতর দিকে খোলে। দরজার একদিকে রবারের চাদর শক্তভাবে আঁটা থাকায় ভিতরে বায়ুর চাপ কিছুটা তুলতে পারলেই দরজাখানা খুব শক্তভাবে সিলিণ্ডারের গা য় লেগে যায়। সিলিণ্ডারের গায়ে বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলি কাঁচের জানালা আছে। তাছাড়া বাতাস প্রবেশ ও নির্গমণের জন্যে দুটি নল আছে। সিলিণ্ডারের ভিতর আলো কিংবা টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা নেই। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে সিলিণ্ডারের গায়ে টোকা দিয়ে কোড্ ব্যবহার করা হয়, অথবা বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখে কাঁচের জানালার কাছে ধরা হয়। গভীর জলে ডুব দিবার অবস্থা অনুকরণ করবার জন্যে দশ ফুট উঁচু ও ছয় ফুট ব্যাসের একটা সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। সিলিণ্ডারের মধ্যে প্রায় সাত ফুট জলে পরীক্ষাকারী ব্যক্তি দাঁড়াতে, বসতে কিংবা শুতে পারে। কপিকলের সাহায্যে একটা ভারী ওজন ঝুলানো থাকে। এটাকে উঠিয়ে-নামিয়ে পরীক্ষা-কারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে পারে। উচ্চচাপে কাজ করবার সময় কি রকম শারীরিক অবসাদ হয় দেখবার জন্যে এই ব্যবস্থা। জলের উপরের তিন ফুট পরিমিত জায়গায় একটা মাচান আছে। সেখান থেকে একজন সহকর্মী পরীক্ষাকারী ডুবুরীর ওপর সব সময় নজর রাখে। ডুবুরীর কোন রকম বিপদ ঘটেছে বুঝতে পারলেই সে তাকে জলের উপরে টেনে তুলে নেয়।

লৌহ সিলিণ্ডারের মধ্যে যথোপযুক্ত চাপে বাতাস প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে ডুবুরীর উপর গভীর জলের চাপে যেসব অস্বাভাবিক অনুভূতি হয় সেগুলি সৃষ্টি করা সম্ভব। এই সিলিণ্ডারে পরীক্ষার ফলে আরো একটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়—সেটা হচ্ছে আবদ্ধ স্থানের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ভীতি (claustrophobia)। সিলিণ্ডারের পরীক্ষার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত এই অস্বাভাবিক অনুভূতি থেকে যায়। এখন দেখা যাক, এ ধরনের কাজে কি কি বিপদের সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ এবং সম্ভবতঃ সব চেয়ে কম ক্ষতিকর যে সব বিপদের সম্ভাবনা আছে, সে গুলির উদ্ভব হয় অতি দ্রুত চাপ পরিবর্তন থেকে। কানের পর্দার দুদিকে চাপের তারতম্য হওয়ায় পর্দায় অস্বাভাবিক রকমের টান পড়ে। কানের এই পাতলা পর্দা অস্থিময় কর্ণনালীর ভিতর আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। কর্ণনালী গলার ভিতর পর্যন্ত প্রসারিত। এর যে দিকটা গলার দিকে শেষ হয়েছে তাকে বলা হয় ইউষ্টেকিয়ান টিউব (Eustachian tube। স্বাভাবিক অবস্থায় এই টিউব বন্ধ থাকে। কানের পর্দায় বাইরের দিকে চাপ বেড়ে গেলে তাকে কমাবার একটা সহজ উপায় হচ্ছে, ইউষ্টেকিয়ান টিউবের মুখ খুলে দেওয়া। পেশাদার ডুবুরীরা ইউষ্টেকিয়ান টিউবের মুখ খোলার জন্যে ক্রমাগত ঢোক গেলার অভ্যাস আয়ত্ত করেন। কোন গভীর চৌবাচ্চার জলে কিংবা পুকুরে ডুব দিয়ে এই পরীক্ষাটি আমরা সহজেই করে দেখতে পারি। ইউষ্টেকিয়ানের মুখ খোলা ও বন্ধ হওয়ার জন্যে একটা টিক্ টিক্ শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাবে। চাপ বৃদ্ধির জন্যে শুধু যে কানের পর্দায় তীব্র বেদনা বোধ হয় তা নয়, কপালের নীচেও বেদনা অনুভূত হয়।

বিমান চালকদের কানের উপর চাপ বৃদ্ধির জন্যে কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হয়; তবে ডুবুরীদের তুলনায় এই অসুবিধা তেমন কিছুই নয়। কারণ, অতি উর্দ্ধগামী জেট্ প্লেনও ১৪ মাইলের বেশী উপর দিয়ে যেতে পারে না এবং এই উচ্চতায় কানের পর্দার দুদিকে বায়ুর চাপের তারতম্যও খুব বেশী নয়। অধ্যাপক হলডেন দ্রুত ডুব পরীক্ষা করতে গিয়ে ৯০ সেকেণ্ডে নিজেকে সাধারণ এক অ্যাটমোসফিয়ার চাপ থেকে ৭ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে নিয়ে যান। পরীক্ষাটি তিনি সিব গোরম্যান্ কোম্পানীর লৌহ সিলিণ্ডারে করেছিলেন। এই হারে চাপ বৃদ্ধি করতে হলে বিমান চালককে ঘণ্টায় ১৫০০ মাইল বেগে সোজাসুজি পৃথিবীর

দিকে মুখ করে চালিয়ে আসতে হবে। এ রকম উচ্চহারে সঙ্কোচন কিংবা প্রসারণের ফলে বোজানো কীটদষ্ট দাঁতের গোড়ায় তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। সঙ্কুচিত বায়ু বোজানো দাঁতের গোড়ার গর্তে তাড়াতাড়ি ঢুকতে পারে না, ফলে বোজানো দাঁতটি বসে যেতে পারে। অধ্যাপক হলডেনের এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

বায়ুর চাপ খুব দ্রুত কমিয়ে নিলে অনেক ডুবুরীর ফুস্‌ফুস ফেটে যায় এবং পাঁজর ও ফুস্‌ফুসের মধ্যবর্তী স্থানে হাওয়া ঢুকে ফুস্‌ফুসকে অকর্মণ্য করে দেয়। দুটি ফুস্‌ফুসেরই যদি এই অবস্থা ঘটে তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। একটি মাত্র সুস্থ ফুস্‌ফুস নিয়ে অবশ্য সাধারণভাবে বেঁচে থাকা যায়—তবে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করা যায় না।

বিভিন্ন কারণে ডুবুরীর মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু তা ছাড়াও এই রকম কাজে অনেক নৈসর্গিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। সিব গোরম্যান লৌহ সিলিণ্ডারে সাধারণতঃ ১০০ থেকে ১২০ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে ভর্তি বোতল থেকে বাতাস জোগান দেওয়া হয়। বোতল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় এই বাতাস অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে; কিন্তু ডুবুরীর সিলিণ্ডারে বায়ুর চাপ বাড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দ্রুত সঙ্কোচনের ফলে সিলিণ্ডারে বায়ুর চাপ ৬০° ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে ১১০° ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। সিলিণ্ডার থেকে যদি খুব দ্রুত বায়ু বের করে নেওয়া যায়, তাহলে ভিতরের বায়ুর তাপ অনেকটা কমে যাবে; ফলে ভিতরে কৃত্রিম কুয়াসার সৃষ্টি হবে।

দশ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে এক ঘনইঞ্চিতে সাধারণ চাপের তুলনায় দশ গুণ বেশী বায়ু থাকে। মনে করুন, লৌহ সিলিণ্ডারে ঢুকে আপনি উচ্চচাপে পরীক্ষা করেছেন। হঠাৎ গরম বোধ হওয়ায় যদি ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, কাগজখানা ছিঁড়ে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে, সাধারণ চাপে বায়ুতে ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে বাতাস করতে যতটা প্রতিবন্ধকতা পড়ে, দশ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে সেটা প্রায় দশ গুণ বেড়ে যায়। এই পরিমাণ চাপে ক্যানারী পাখী ভাল করে উড়তে পারে না; ছোট ছোট মাছির ওড়বার ক্ষমতা এই চাপে একেবারে লোপ পায়; তবে এরা ধীরে ধীরে হেঁটে চলতে পারে। ১০।১২ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে মানুষের গলার স্বর বেশ কিছুটা বদলে যায়। এই চাপে শুধু কথা থেকে একজন ইংরেজকে আমেরিকান বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। বাদ্যযন্ত্রের বেলায়ও ঐ একই কথা খাটে। ১১ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে একটা টিনের বাঁশী বাজাতে অনেক বেশী জোরে ফুঁ দিতে হয়। অন্যান্য নানান ধরনের ধাতব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক মূল শব্দের আংশিক বিকৃতি ঘটে।

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, সাধারণ চাপে মানুষ যে ঘন পরিমাণ বায়ু নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে টেনে নেয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয়—উচ্চচাপে সেই ঘন পরিমাণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। তবে এই নির্দিষ্ট ঘন পরিমাণ বায়ুর ওজন তার চাপের সমানুপাতিক হয়। ১০ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে বাতাসে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

উচ্চচাপে অস্বাভাবিক অনুভূতির উদ্রেক হয়। মাত্রাধিক নেশা করবার ফলে অনেক সময় এরূপ হওয়া সম্ভব। পোড়ানো পেট্রোলের ধোঁয়া এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস অনেকটা ভিতরে টেনে নিলেও কিছুটা এ ধরনের অনুভূতি হয়। চিন্তা-শক্তির আংশিক বিলুপ্তি ঘটে এবং বাল্যবয়সের নানা রকমের স্মৃতি চেতনায় ভেসে ওঠে। কোন একজন মহিলা ডুবুরী দশ অ্যাটমোসফিয়ার চাপে ভগবানের অস্তিত্ব এবং আত্মার মুক্তির জন্যে ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধনে বিশ্বাস করেন; অথচ ইনি এক অ্যাটমোস-

ফিয়ার চাপে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেই নিজেকে ঘোর বস্তুতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। অনেকের মনে হয়, তাঁরা মরে যাচ্ছেন, আবার অনেকের মনে অস্বাভাবিক উল্লাস জেগে উঠে। কেউ কেউ আবার ঠোঁটের উপর একটা অস্বাভাবিক কোমল স্পর্শের অনুভূতি পাচ্ছেন বলে মনে করেন। স্পেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নেগ্রিন সর্বপ্রথম এই কোমল স্পর্শানুভূতির উল্লেখ করেন। কারো কারো সব জিনিষকেই হাতীর দাঁত বলে মনে হয় কিংবা তাঁরা নিজেদের অঙ্গুলী ও কদলীর মধ্যে কোন পার্থক্যই খুঁজে পান না। কারো কারোর মনে হয়, তাঁরা সব কিছু যেন ঘন কুয়াসার মধ্য দিয়ে দেখছেন।

যে সব কাজে বুদ্ধিমত্তা বা সাধারণ কর্ম-কুশলতার দরকার হয়, উচ্চচাপে তার কি অবস্থা ঘটে, দেখবার জন্যে অধ্যাপক হলডেন ও তাঁর সহকর্মীরা দুটি পরীক্ষা করেন। প্রথমটি হচ্ছে—ভিন্ন ভিন্ন গর্তে লোহার বল রেখে সেগুলিকে প্রথমে আঙুল দিয়ে এবং পরে বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে উত্তোলন করা। এক ও দশ অ্যাটমোস-ফিয়ার চাপে পরীক্ষাকারীর কাজের নির্ভুলতা ও তৎপরতা দেখে নম্বর দেওয়া হয়। সাধারণতঃ দেখা গেছে—যাদের স্নায়বিক গোলযোগ অপেক্ষাকৃত কম তাঁদের এক ও দশ অ্যাটমোফিয়ার চাপে কর্মতৎপরতার বিশেষ কোন তারতম্য হয় না। অন্য পরীক্ষাটিতে যে কোন একটি গুণন—যেমন ধরুন, ৭৪৮৬×৫১৩৭ কত তাড়াতাড়ি নির্ভুলভাবে করা যায়—তা লক্ষ্য করা হয়। বায়ুর সাধারণ চাপে শতকরা ৯০ জন এই গুনটি নির্ভুল-ভাবে করতে পারেন; কিন্তু দশগুণ বেশী চাপে শতকরা ৩০ জনের বেশী গুণনটি নির্ভুলভাবে করতে পারেন না। রয়েল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সভ্যকে গুণনটি করতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি পাঁচ মিনিটে মাত্র দুটি সংখ্যা লিখতে পেরেছিলেন—আর সে দুটির একটি ছিল ভুল।

এই ধরনের পরীক্ষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, সিলিণ্ডারের মধ্যস্থিত পরীক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষাকারীর মতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তিনি হয় ষ্টপওয়াচের বোতাম টিপতে ভুল করেন, নয়তো ভুল নোট করেন।

ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ ন্যাভেল মেডিক্যাল কোরের ক্যাপ্টেন বেহ্নে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, সাধারণ বাতাসের পরিবর্তে চারভাগ হিলিয়াম ও একভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে ব্যবহার করলে ঐ উপসর্গগুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, অর্থাৎ, সাধারণ বায়ুর নাইট্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম ব্যবহার করলে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। হিলিয়ামের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাসও ব্যবহার করা চলে।

তিন অ্যাটমোসফিয়ার চাপে অক্সিজেন গ্যাসে ফুস্ফুসের জ্বালা সৃষ্টি না করেও অনেকক্ষণ জলের নীচে থাকা যায়। অবশ্য এই চাপে খুব বেশী-ক্ষণ জলের নীচে থাকার ফলে প্রথমে অল্প অল্প কাশি হয়, তারপর বুকে বেদনা বোধ হতে থাকে। অনেক সময় আবার সাংঘাতিকভাবে নিউমোনিয়া রোগও আক্রমণ করতে পারে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, উচ্চচাপে স্নায়ুকেন্দ্রে অক্সিজেনের বিষময় প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন পরীক্ষাকারীর বিভিন্ন সময়ে আরম্ভ হয়। আবার একই পরীক্ষাকারীর উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হতে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময় লাগে। জলের নীচে অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে প্রায় একশ'বার পরীক্ষা করার ফলে হলডেনের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সাধারণ বায়ুর চাপে পাঁচ মিনিট নিশ্বাস নিলেই তার মুখের পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণ আরম্ভ হতো।

ব্যক্তিগত অনুভূতির বৈচিত্র্য ছাড়াও বিভিন্ন লোকের অনুভূতি বিভিন্ন রকম হতে দেখা যায়। যে সব ডুবুরীর কাজে অক্সিজেন গ্যাস নিশ্বাসের জন্য ব্যবহার করা হয়, সে সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ডুবুরী নির্বাচন এক সমস্যার ব্যাপার। যারা অত্যধিক স্নায়বিক স্পর্শকাতর, তারা মোটেই এই কাজের

উপযুক্ত নয়। এই সমস্ত অতি স্পর্শকাতর লোকদের সব সময় বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, জলের নীচে উচ্চচাপ অক্সিজেন গ্যাসে এক জনের আচরণ কি রকম দাঁড়াবে, আগে থেকেই তা কিছু ঠিকভাবে বলা সব সময় সম্ভব নয়। এমনও দেখা গেছে, যেসব বিমানবীর শত্রু এলাকায় পর পর অনেকবার হানা দিয়ে আকাশ যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন, তাঁদের অনেকেই ডুবুরীর পোষাক পরে জলের নীচে কিছুটা নামবার পরেই উঠে আসবার জন্যে কাতর আবেদন জানান। আবার এও দেখা গেছে যে, একজন আপাত ভীরু মহিলা কিংবা একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় অধ্যাপক স্বচ্ছন্দে ডুবুরীর পোষাকে জলের নীচে নেমে যান এবং অনেকক্ষণ থাকতে সমর্থ হন। সব চেয়ে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, সাধারণ বায়ুতে পরীক্ষা করে জলের নীচের অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না; ফলে নানা রকমের ছোটখাটো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

সাত-আট অ্যাটমোসফিয়ার চাপে অক্সিজেনের একটা বিশেষ স্বাদ আছে বলে মনে হয়। এটা বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। রসায়নের পাঠ্যপুস্তকে লেখে যে, অক্সিজেন একটি স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। উক্ত চাপে হলডেনের মনে হয়, অক্সিজেনের স্বাদ অনেকটা চিনি মেশানো পাতলা কালির মত। তাঁর সহকর্মী ডাঃ কালমুসের মতে, এই চাপে অক্সিজেনের স্বাদ অনেকটা জল মেশানো জিঞ্জার বিয়ারের মত। যাহোক, দুজনের মতেই এই স্বাদে টক ও মিষ্টির সমন্বয় পাওয়া যায়। সাধারণ চাপে এক ঘনইঞ্চি বায়ুতে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, ছয় অ্যাটমোসফিয়ার চাপে থাকে তার প্রায় ৩০ গুণ বেশী। নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ চিনি বা নুন না গুলে যাওয়া পর্যন্ত চিনির মিষ্টতা বা নুনের তিক্ততা বোঝা যায় না। ঠিক সেভাবে অক্সিজেনের স্বাদ পেতে হলে দ্রাবণ পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো প্রয়োজন। মোটামুটি দেখতে গেলে এই ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বলেই মনে হয় যে, অক্সিজেনের মত একটা গ্যাস সাধারণ চাপে যার বিশেষ কোন একটা গুণের অভাব, উচ্চচাপে সেই গুণ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে! অ্যামোনিয়া কিংবা মিথেন গ্যাস নিয়ে এই ধরনের উচ্চচাপের পরীক্ষা করলে এদের বিশেষ বর্ণ আছে বলে মনে হয়। যারা সর্বপ্রথম শনিগ্রহে যেতে পারবেন তাঁরা এই ব্যাপরটা লক্ষ্য করতে সমর্থ হবেন। কারণ, সৌরজগতের অপেক্ষাকৃত দূরের গ্রহগুলির পরিমণ্ডল এই সব গ্যাস থাকবার জন্য বিশেষ বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

ডুবুরীকে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, এবার সে কথা বলছি। সাধারণ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস আছে। দুই অ্যাটমোসফিয়ার চাপে বাতাসে ছয় ঘণ্টা থাকলে এই নাইট্রোজেনের পরিমাণ দাঁড়াবে দুই লিটার এবং প্রত্যেক এক অ্যাটমোসফিয়ার চাপ বৃদ্ধি জন্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ এক লিটার হিসাবে বেড়ে যাবে। মনে করা যাক, কোন একটা গ্যাসকে উচ্চচাপ দিয়ে কোন একটা দ্রাবকের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া হলো। এখন যদি হঠাৎ চাপ কমিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, অনেকটা পরিমাণ গ্যাস বুদ্‌বুদের আকারে দ্রাবণ থেকে বেরিয়ে আসছে। সোডা ওয়াটার বা লেমনেডের বোতলের ছিপি খুললে যে ফেনা বেরিয়ে আসে তারও এই একই কারণ। ধরা যাক, কোন একজন ডুবুরী মাত্র ১০০ ফুট জলের নীচে আছেন, অর্থাৎ তাঁর উপর মোট চাপ পড়ছে প্রায় ৪ অ্যাটমোসফিয়ারের কাছাকাছি। এক ঘণ্টা এই চাপে থাকবার পর অসাবধানতাবশতঃ যদি ডুবুরী হঠাৎ গ্যাস নির্গমণের পথটি বন্ধ করে দেন তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পোষাকটি ফুলে উঠবে। ফলে হঠাৎ একসময় ডুবুরী জলের উপর ভেসে উঠবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবুরীর মুখ নীল হয়ে যাবে,

তার চেতনার বিলুপ্তি ঘটবে। এই অবস্থায় যদি কেউ ডুবরীকে ডুবুরী-পোষাক থেকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে আসে তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার নির্ঘাৎ মৃত্যু ঘটবে এবং শব ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যাবে যে, সব শিরা-উপশিরা ফেনায় ভর্তি। হৃদ্‌যন্ত্র কৈশিক শিরার মধ্য দিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ পাম্প করে পাঠাতে পারে না; ফলে অক্সিজেনের অভাবে ডুবরীর মৃত্যু ঘটে। এই রকম পরিস্থিতিতে ডুবুরীকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, পোষাকের গ্যাস নির্গমণ ভাল্‌ভটি খুলে দিয়ে ডুবরীকে আবার জলের নীচে ঠিক আগের গভীরতায় নামিয়ে দেওয়া। ব্যাপারটি একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে নয় কি ? একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, চাপ বৃদ্ধির অনুযায়ী বুদ্‌বুদ্‌গুলি ক্ষুদ্রাকার হয়ে শিরা-উপশিরাগুলিকে গ্যাসমুক্ত করে স্বাভাবিক রক্ত-প্রবাহকে চালু করে দেবে; ফলে ডুবুরী অপমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবেন। ঠিক এভাবে কয়েকটি জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

মানব-সভ্যতার দ্রুত অভিযানের নতুন নতুন পথে দুর্জয়কে জয় করা ও অজানাকে জানবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে। এই কঠিন সাধনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানুষের নিত্যসহচর। অক্লান্ত গবেষণার ফলে আধুনিক ডুবুরী-যন্ত্রের আশাতীত উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজ তাই মানুষ সমুদ্রতলের সমস্ত বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করে শুধু যে মণি-মুক্তা কুড়িয়ে আনছে তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মুখে খুলে দিচ্ছে চির রহস্যময় এক বিচিত্র জগতের দ্বার।

ইথারের কথা

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

সাধারণভাবে ইথারকে অ্যালকাইল অক্সাইড বলা হয়। অক্সিজেনের দুটি সংযুক্তির (valency) সঙ্গে এক বা বিজাতীয় দুটি বা ততোধিক অ্যালকাইল র‍্যাডিকেল যুক্ত হয়ে ইথার উৎপন্ন হয়। যখন একই জাতীয় অ্যালকাইল র‍্যাডিকেল যোগে ইথার তৈরী হয়, তখন তাকে সরল গঠনের ইথার বলে, আর দুই বা ততোধিক বিজাতীয় অ্যালকাইল র‍্যাডিকেল যোগে উৎপন্ন ইথারকে বলা হয় মিশ্র ইথার। যেমন, ডাইমিথাইল ইথার (CH_3OCH_3) হচ্ছে সরল ইথার, আর মিথাইল ইথাইল ইথার ($CH_3OCH_2CH_3$) হচ্ছে মিশ্র ইথার। সাধারণভাবে ইথার বলতে ডাই ইথাইল বা ইথাইল ইথারকেই (CH_3CH_2-OCH_2CH_3) বুঝায়।

ইথার তৈরীর যতগুলি পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে উইলিয়ামসনের প্রণালীই বিশেষ কার্যকরী ও বহুল প্রচলিত। এই প্রণালীতে সরল ও মিশ্র উভয় প্রকার ইথারই প্রস্তুত করা যায়। এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম অ্যালকোক্‌সাইডের সঙ্গে যে কোন অ্যালকাইল হ্যালাইডের ক্রিয়া হয় ($C_3H_7ONa+CH_3I-CH_3CH_2OCH_2C$-$H_3+NaCl.$)। বিশুদ্ধ অ্যালকোহল থেকে যখন বাজারের জন্যে প্রচুর পরিমাণে ইথার তৈরী করা হয়, তখন তাতে অতি অল্পমাত্রায় অ্যালকোহল এবং অ্যাসিটেলডিহাইড (CH_3CHO) থাকে এবং সেটা জল সম্পৃক্ত থাকে। সস্তা মেথিলেটেড স্পিরিট বা ডিনেচার্‌ড্‌ অ্যালকোহল থেকে উৎপন্ন সাধারণ ইথারে সামান্য পরিমাণে মিথাইল ইথার ও মিথাইল ইথাইল ইথার থাকে। সাধারণ ব্যবহারিক কাজে এগুলি তেমন বিঘ্ন সৃষ্টি করে

না।· ইথার যখন চৈতন্যাপহারকরূপে ব্যবহৃত হয় তখন সেটা যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন—সর্বপ্রকারের খাদ থেকে বিমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই সাধারণ ইথারকে বিশুদ্ধ করতে হলে প্রথমতঃ উহাকে শুষ্ক ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের উপর রেখে বিশুষ্ক করতে হয়; ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সঙ্গের জলটুকু টেনে নেয়। তারপর এই বিশুষ্ক ইথারকে সোডিয়ামের পাতের উপর রাখা হয়। পাতের উপর যে সামান্য ক্ষার জমে তাই খাদরূপে উপস্থিত সামান্য অ্যালডিহাইডকে রেজিনে রূপান্তরিত করে দূর করে দেয়। আর অ্যালকোহল দূর হয়ে যায় সোডিয়াম ইথোক্সাইড রূপে। অ্যালডিহাইড এবং অ্যালকোহল দূর করবার জন্যে অন্য পদ্ধতিও আছে—যেমন ইথারকে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে মিলিয়ে ঝেঁকে নেওয়া হয়।

ইথারের সাধারণ ধর্মের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর ইথারের স্ফুটনাঙ্ক অত্যন্ত কম—এমন কি, যে সব অ্যালকোহল থেকে এগুলি উৎপন্ন, তাদের স্ফুটনাঙ্কের চেয়েও কম। যেমন, মিথাইল ইথারের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে—২৩·৬° সেঃ গ্রেঃ, মিথাইল অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ৬৪·৭° সেঃ গ্রেঃ, ইথাইল ইথারের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ৩৪·৬° সেঃ গ্রেঃ, কিন্তু ইথাইল অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে ৭৮° সেঃ গ্রেঃ।

সাধারণ ইথারের বাষ্পীভবনের লুপ্ত তাপ খুব কম থাকার ফলে ইথারের সাহায্যে নিম্নতাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ইথার, —৮০° সেঃ গ্রেঃ পর্যন্ত নিম্নতাপ সৃষ্টি করতে পারে।

রাসায়নিক দিক থেকে ইথারগুলি সম্পৃক্ত এবং দৃঢ়—অ্যালকোহলের চেয়েও দৃঢ়। ক্ষার-ধাতুর সঙ্গে এদের কোন বিক্রিয়া নেই; ক্ষারধাতু এদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কম উত্তাপে এরা অ্যাসিডের দ্বারাও অনাক্রান্ত থাকে। কিন্তু হ্যালোজেন হাইড্রা অ্যাসিডের দ্বারা এরা সহজেই আক্রান্ত হয়। কিন্তু হ্যালোজেন অ্যাসিডগুলির মধ্যে হাইড্রিওডিক অ্যাসিড খুব বেশী বিক্রিয়াশীল, তারপরেই হলো হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড। হাইড্রিওডিক অ্যাসিডের দ্বারা ঠাণ্ডা অবস্থায় ইথার, অ্যালকোহল ও অ্যালকাইল আয়োডাইডে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থায় অ্যালকাইল আয়োডাইড-ই হয়।

ইথাইল ইথার ($C_2H_5OC_2H_5$) — যতদূর জানা যায় ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ভ্যালেরিয়াস কোর্ডাস ভিট্রিয়ল এবং স্পিরিটস্ অব ওয়াইন-এর বিক্রিয়ার দ্বারা প্রথম ইথার তৈরী করেন।

ইথার অত্যন্ত সহজদাহ্য, উদ্বায়ী, বর্ণহীন তরল পদার্থ। উহার একটি বিশেষ গন্ধ আছে। ২০° সেঃ গ্রেঃ উত্তাপে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে ০·৭১৪। ইথার সহজে জলে দ্রবণীয় নয়; ১০০ ভাগ জলে প্রায় ৭·৫% দ্রবণীয়। আবার ১০০ ভাগ ইথারে ১·১৫% জল দ্রবণীয়। হাইড্রোক্লোরিক, হাইড্রোব্রোমিক, সালফিউরিক অ্যাসিডে বেশী দ্রবণীয়। ইথার, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অ্যামোনিয়াকে দ্রবীভূত করতে পারে। ইথার-বাষ্প বাতাসের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ ভারী; সেজন্যেই বাষ্পীভূত হয়ে ঘরের মধ্যে জমতে পারে এবং সামান্য অগ্নিসংযোগেই বিস্ফোরণ ঘটে। বাতাসের মধ্যে এর দাহ্যতার সীমা হচ্ছে ১·৮৫—৩৬·৫%, অক্সিজেনে হচ্ছে ২১—৮২%। এর জ্বলনাঙ্ক হচ্ছে বায়ুতে ৩০০°—৩৮০° সেঃ গ্রেঃ এবং অক্সিজেনে ১৮২° সেঃ গ্রেঃ। ইথার যখন বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুতে মিশে গিয়ে ঘরে জমতে থাকে এবং আয়তনের দিক থেকে শতকরা ১—১৬ ভাগ হয় তখনই বিস্ফোরণ ঘটবার সম্ভাবনা। বায়ুর চেয়ে ভারী বলে এর ব্যাপন হার অত্যন্ত কম। এর ফলে ঘরের মধ্যে ইথার খুব বেশী জমতে থাকে এবং বিপজ্জনক বিস্ফোরণের সম্ভাবনা ঘটে বেশী। ইথার অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মধ্যে অনুরূপ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

ইথার অনেকক্ষণ বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় থেকে

বাষ্পীভূত হতে থাকলে বায়ু এবং আলোর বিক্রিয়ার ফলে পারঅক্সাইডে পরিণত হয়ে যায়। এই ইথার পারঅক্সাইড উদ্বায়ী নয়। পারঅক্সাইড অধিক উত্তাপে বা অধিক বাষ্পীভবন কালে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়। ইথার ব্যবহার করে পুনরুদ্ধার করবার জন্যে পাতন ক্রিয়া অবলম্বন করা হয়; তখন উহা উন্মুক্ত অগ্নিশিখা অথবা ইলেকট্রিক হিটারের দ্বারা উত্তপ্ত করা হয় না; বিস্ফোরণ এড়াবার জন্যে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। পারঅক্সাইডের বিস্ফোরণ এড়াবার জন্যে ইথার ব্যবহার করবার পূর্বে তাকে ফেরাস সালফেটের দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হয়। ইথারে পারঅক্সাইড থাকলে ফেরাস সালফেট জারিত হয়ে ফেরিক সালফেটে পরিণত হয় এবং পটাসিয়াম থায়োসায়ানেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রক্তবর্ণ উৎপাদন করে। তাই উক্ত পরীক্ষায় রক্তবর্ণ ধারণই হচ্ছে পারঅক্সাইড উপস্থিতির ইঙ্গিত। সংরক্ষণের সময় যাতে পারঅক্সাইড না হয়, তার জন্যে কাচের বোতলে ইথারের মধ্যে লৌহ শলাকা ডুবিয়ে রাখা হয়।

পরীক্ষাগারে ও শিল্পে ইথারের প্রধান ব্যবহার হচ্ছে দ্রাবক হিসাবে। শিল্প ব্যবস্থায় আলকাতরা, চর্বি, তৈল, রেজিন, ওয়াক্স হাইড্রোকার্বন ইত্যাদির দ্রাবক রূপে প্রচুর পরিমাণে ইথারের প্রয়োজন হয়। জৈব যৌগের জলীয় দ্রবণ থেকে জৈব যৌগ নিষ্কাশন করবার জন্যে ইথার ব্যবহৃত হয়। ইথার জলে কিছুটা দ্রবনীয়, তাই যখন জলীয় দ্রবণ থেকে জৈব যৌগ নিষ্কাশন করা হয় তখন সেই দ্রবণে সাধারণ খাবার লবণ দিয়ে তাকে সম্পৃক্ত করে নেওয়া হয়। ফলে, জলে ইথারের দ্রবণীয়তা কমে যায়। নিষ্কাশক হিসাবে ইথাইল ইথারের মস্তবড় অসুবিধার কারণ হচ্ছে, এর সহজ উদ্বায়ী ধর্ম। ফলে, সবটুকু ইথার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না, কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করা হয় উচ্চ শ্রেণীর ইথার ব্যবহার করে; যেমন বিউটাইল ইথার, আইসোপ্রোপাইল ইথার, গ্লিসেরাইল ইথার ইত্যাদি। কারণ এরা ততটা উদ্বায়ী নয় এবং এদের স্ফুটনাঙ্ক আরোও উপরে। বস্ত্রশিল্প ও কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে ইথার ব্যবহৃত হচ্ছে। স্মোকলেস পাউডার (নাইট্রোসেলুলোজ) উৎপাদনে ইথারের প্রয়োজন হয়। মোটর প্রভৃতি যানের লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদনে একটি বিশিষ্ট দ্রাবকরূপে ইথারের ব্যবহার প্রচুর। ডাই আইসোপ্রোপাইল ইথার পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে Anti-knock-এর কাজ করে। কতকগুলি অসম্পৃক্ত ইথার—যেমন ভিনাইল ইথার, যাদের পলিমারিজেসন হয়—অনেকগুলি অণু একত্রিত হয়ে বিশেষ গুণসম্পন্ন বৃহত্তর অণুর সৃষ্টি করে। অসম্পৃক্ত ইথারের এ রকম পলিমারিজেসনের ফলে যেসব পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলি প্লাষ্টিক শিল্পে কাজে লাগে।

বিশুদ্ধ ইথার সাময়িকভাবে চৈতন্য লোপ করবার জন্যে অস্ত্র চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়ায় লং নামক একজন অস্ত্রচিকিৎসক ইথার প্রথম ব্যবহার করেন। এর বাষ্প নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবার ফলে স্নায়ুমণ্ডলীর কার্যকারিতা সাময়িকভাবে লোপ পায়। চৈতন্য হারক ওষুধ হিসাবে বিভিন্ন ইথারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা হয়েছে। ডাই ইথাইল ইথারের চেয়ে মিথাইল ইথাইল ইথার ও ডাই মিথাইল ইথারের কার্যকারিতা কম। আবার মিথাইল বিউটাইল ইথার ও প্রোপাইল ইথাইল ইথার চৈতন্যহারক ওষুধ হিসাবে কিছুটা বিষক্রিয়া করে। আইসো বিউটাইল ইথাইল ইথার খুবই উৎকৃষ্ট এবং এর কোন পরবর্তী উপসর্গ নেই। (বিটা) প্রোপাইল ইথারেরও তেমনি কোন পরবর্তী উপসর্গ নেই; তবে এটা এতই বেশী কার্যকরী যে, ব্যবহারের সময় বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

(আল্ফা) প্রোপাইল ইথাইল ইথার ও (বিটা) প্রোপাইল ইথাইল ইথার খুবই উৎকৃষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে কোন ইথারই চৈতন্যহারক হিসাবে ব্যবহৃত হোক না কেন, সেটা খুব বিশুদ্ধ এবং সামান্যতম বিজাতীয় বিঘ্নকারী পদার্থ থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞান সংবাদ

মরু অঞ্চলে জলের সন্ধান

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তারতম্যের পরিমাপ করিয়া মরু অঞ্চলের কোন্ স্থানে কত নিম্নে জলের অস্তিত্ব আছে তাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে নির্ণয় করা সম্ভব বলিয়া জানা গিয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ভূতাত্ত্বিক মিঃ ম্যাক্-কুলো, মোজাভি মরুভূমি পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত আছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তর বহু প্রকার পদার্থের সমবায়ে গঠিত হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের আপেক্ষিক গুরুত্বের পার্থক্য দেখা যায়। ঐ কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাণেরও তারতম্য লক্ষিত হয়। গ্র্যাভিমিটার নামক এক রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের অতি সামান্য তারতম্যও পরিমাপ করা যায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন গুরুত্ববিশিষ্ট স্থান এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণীত হইতে পারে এবং ঐ সব অঞ্চলের গঠনবৈশিষ্ট্যেরও অনুমান করা সম্ভব। ভূ-নিম্নে পেট্রোল অথবা কোন কোন খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব এই ভাবে নির্ধারিত হইতে পারে।

মোজাভি মরুভূমির পর্যবেক্ষণ কার্যে উল্লিখিত যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে। ভূ-নিম্নে প্রস্তরের স্তরের উপর অবস্থিত বালি ও কাঁকরের স্তরের অস্তিত্ব এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে উহার আনুমানিক দূরত্ব গ্র্যাভিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সব লক্ষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, কোন স্থানে গভীর নলকূপ খনন করা সুবিধাজনক।

উটের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ

জলশূন্য উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে উট কি উপায়ে বহু দিন টিকিয়া থাকিতে পারে তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য কয়েক জন বিজ্ঞানী সাহারা মরুভূমিতে যাত্রা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ঐ মরুভূমির বালি ও কঙ্করময় কোন এক অঞ্চলে আবহাওয়ার উত্তাপ দিবাভাগে প্রায় ১৪০° ফাঃ পর্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং সেখানে কয়েক বৎসর যাবৎ মোটেই বৃষ্টিপাত হয় না। এইরূপ নির্মম প্রাকৃতিক পরিবেশে উট কেমন করিয়া জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় তাহা পর্যবেক্ষণ করাই বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য। মরুভূমির ঐরূপ প্রচণ্ড উত্তাপ এবং নিদারুণ জলাভাব সব প্রাণীর পক্ষেই মারাত্মক। উট কেমন করিয়া ঐরূপ প্রতিকূল আবহাওয়ায় বাঁচিয়া থাকে তাহা প্রাণী-বিজ্ঞানীদের এখনও অবিদিত।

যাবতীয় পরীক্ষার জন্য গাড়ীর মধ্যে পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি সাজাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। অভিযানটির নেতৃত্ব করিবেন ডিউক ইউনিভার্সিটির ডাঃ নাট্‌ ও স্মিড-নিল্সন। পেনসিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ হাউট এবং কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটির ডাঃ জার্নাম কতকগুলি প্রচলিত প্রশ্নের সমাধানের প্রয়াস করিবেন - যেমন, রক্ত ও দেহতন্তু হইতে কত পরিমাণ অপচয় হওয়া পর্যন্ত উট টিকিয়া থাকিতে পারে? জল সংরক্ষণের জন্য উটের শরীরে কোন গঠনবৈশিষ্ট্য বা উপায় আছে কি না? ঘর্ম নির্গমণে উটের শরীর কতটা শীতল

হয়? উটের স্বাভাবিক আবাসস্থলে এই পরীক্ষা চালাইবার জন্য গবেষকগণ, আলজিয়ার্স হইতে ৫০০ মাইল দূরবর্তী বেনি-আব্বাস নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাঃ শ্মিড-নিল্সন বলেন, মরুভূমির প্রাণী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলে মানবদেহের উপর উষ্ণ আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্পষ্টতর হইবে।

নৌকা-জুতা

নিউইয়র্কের মিঃ লাড্উইগ এ. গাইগার এক অভিনব নৌকা-জুতা নির্মাণ করিয়াছেন। উহা পরিয়া লোকে স্বচ্ছন্দে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে বা জলের উপর দাঁড়াইয়া কাজকর্ম করিতে পারিবে। অতঃপর দেখা যাইবে, নদীর উপর সাময়িক সেতু নির্মাণের জন্য ইউ. এস. ইঞ্জিনিয়ার ও সৈনিকেরা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া কাজ করিতেছে। জুতাগুলি এমনই কায়দায় প্রস্তুত যে, ব্যবহারকারী জলের উপর এক পায়ে ভর দিয়া অন্য পা বাড়াইবার সময় এক পায়ের জুতাই তাহার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করিবে।

আবিষ্কারক বলেন, ঐ জুতা কয়েক রকম আকৃতির করা যাইতে পারে। এক রকম হইল—চার পাশে বাতাস ভরা রবারের টিউববিশিষ্ট গভীর চৌকা পাত্রের মত। জলের উপর পা ফেলিবার সময় উবুড় করা পাত্রটির ভিতরেও অনেকটা বাতাস আবদ্ধ হয়ে থাকে। চার পাশের বাতাসপূর্ণ টিউব এবং মাঝের খোলের আবদ্ধ বাতাস ব্যবহারকারীকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখে।

মহাশূন্য-অভিযানে অ্যালগির সাহায্যে অক্সিজেন সরবরাহ

টেক্সাস ইউনিভার্সিটির এক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ হইলে আশা করা যায় যে, পুকুরে ভাসমান সবুজ সরের ন্যায় এক জাতীয় অ্যালগির সাহায্যে মহাশূন্যে অভিযাত্রীদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করা যাইবে। প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডাঃ মায়ার্স ও ডাঃ ফিলিপ্স্ আমেরিকান ইন্স্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্স-এর নিকট এক বিবৃতিতে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানীরা সূর্যালোকের সাহায্যে অ্যালগির দ্রুত বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিচ্ছিন্ন সূর্যালোকে ঐ সূক্ষ্ম জলজ উদ্ভিদগুলি অধিকতর কার্যকরীভাবে আলোক-রশ্মি ব্যবহার করিয়া দ্রুত বর্ধিত হয় এবং প্রচুর অক্সিজেন বাহির করিতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় উপায়ে অ্যালগি কালচারটি আলোড়িত হওয়ার ফলে বিচ্ছিন্নভাবে আলোকরশ্মি পতিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া অ্যালগি কালচারটি যাহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘন না হইয়া পড়ে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই পরীক্ষার আশাপ্রদ ফল দেখিয়া ইউ. এস. স্পেস্ মেডিসিন ডিপার্টমেণ্ট এই গবেষণা চালাইবার পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কৃত্রিম পাকস্থলীর সাহায্যে গরুর পরিপাক-ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ

গরুর পাকস্থলীতে এক বিশেষ ধরনের সেলুলোজ কি উপায়ে হজম হয় তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য আইয়োয়া কলেজের একদল বিজ্ঞানী এক কৃত্রিম পাকস্থলী নির্মাণ করিয়াছেন। ডাঃ কিট্স্ ও ডাঃ আণ্ডারকফ্লার এ সম্বন্ধে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, গরুর পাকস্থলীর ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

গরুর অতিরিক্ত পাকস্থলী রুমেন-এর ভিতর সেলুলোজ হজম হইয়া থাকে। জীবাণুর ক্রিয়ার ফলে রুমেন-এর ভিতরের সেলুলোজ, শর্করা জাতীয় পদার্থে পরিণত হইয়া গো-দেহের পুষ্টিসাধন করে।

সেলুলোজ হইতে শর্করায় রূপান্তর কি কি স্তরে হইয়া থাকে তাহা নকল পাকস্থলীর সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হইয়াছে। কিছুক্ষণ পর পর উহা হইতে জটিল রাসায়নিক পদার্থের নমুনা বাহির করিয়া ক্রোম্যাটোগ্রাফির সাহায্যে সেগুলির বিশ্লেষণ করা হয়।

দেখা গিয়াছে, নকল পাকস্থলীর মধ্যে জীবাণু ধ্বংসী থাইমল বা সোডিয়াম ফ্লুরাইড বিষ প্রয়োগ করিলে পরিপাক ক্রিয়া মন্থর হইয়া পড়ে। আবার দেখা গিয়াছে যে, কার্বক্সিমিথাইল নামক এক প্রকার নকল সেলুলোজ ঐ কৃত্রিম পাকস্থলীর মধ্যে পরিপাক হইয়া যায়। পরিপাক ক্রিয়ার শেষে সেলুলোজ গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

উৎকৃষ্টতর সঙ্কর-উদ্ভিদ সৃষ্টি

এক অভিনব উপায়ে নিষ্ক্রিয় পরাগ-কোষ সমন্বিত কতকগুলি সব্জী জাতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। ঐ উদ্ভিদের পুষ্পে ইপ্সিত অন্য সাধারণ উদ্ভিদের পরাগ সংযোগে সঙ্কর উৎপাদন করা খুব সহজসাধ্য। এই উপায়ে সৃষ্ট সঙ্কর-বীজ হইতে শীঘ্রই উন্নত ধরনের অধিক ফলনশীল পিঁয়াজ, বীট, গাজর ও বহুবিধ সপুষ্পক উদ্ভিদ উৎপন্ন হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

উইস্কন্‌সিন ইউনিভার্সিটির হর্টিকালচারিষ্ট মিঃ গাবেলম্যান আমেরিকান ইন্‌স্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্স-এর এক সভায় বলেন, বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে নিষ্ক্রিয় পরাগ-কোষ সমন্বিত উদ্ভিদ উৎপাদন করা হইয়াছে। হাতের সাহায্যে পরাগ-কেশর বিচ্ছিন্ন করিয়া যে সব উদ্ভিদ হইতে ব্যাপকভাবে সঙ্কর উৎপাদন সম্ভব নয়, এই উপায়ে তাহা সম্ভব হইয়াছে। বীজপ্রসূ উদ্ভিদ নিষ্ক্রিয় পরাগ সমন্বিত হইলে উহাতে নিকটবর্তী বাঞ্ছিত উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত পুং-কোষ সংযোগ করিয়া সহজেই ব্যাপকভাবে উন্নত ও অধিক ফলনশীল সঙ্কর উৎপাদন সম্ভব। এই ভাবে উৎপন্ন সঙ্করের মধ্যে প্রথমে ভুট্টা, পিঁয়াজ, গাজর, বীট ও পিটুনিয়া পাওয়া যাইবে। শিম, টোম্যাটো, লঙ্কা, লেটুস, মটর ও গমের একই পুষ্পের মধ্যে পরাগ নিষেক ক্রিয়া হয়ে থাকে। উল্লিখিত উপায়ে এগুলির সঙ্কর উৎপাদন বোধহয় কখনও সম্ভব হইবে না।

মেক্সিকোতে প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ ভুট্টার চাষ হইতেছে এবং সেখানে প্রায় পঁচিশটি বিভিন্ন রকমের ভুট্টার মোচা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ফুট পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। আবার ইউনাইটেড ষ্টেটে অধিক ফলনশীল এবং শুষ্কতা ও রোগ সহনশীল ভুট্টা বর্তমান। দুই দেশের ভুট্টার সংমিশ্রণে সঙ্কর সৃষ্টি করিলে এক অভিনব উন্নত ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যাইবে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রোফেসার মিঃ মাঙ্গেলস্‌ডর্ফ এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১৯৪৩ সাল হইতে রকফেলার ফাউণ্ডেসন ও মেক্সিকো গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় ঐ দেশে ভুট্টার বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মেক্সিকোর কোন কোন ভুট্টার সাহত টিয়োসিণ্টি নামক এক প্রকার ঘাসের সংমিশ্রণে কষ্টসহিষ্ণু এক রকমের ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছে। এই সঙ্কর উদ্ভিদই ইউনাইটেড ষ্টেটের ভুট্টার সহিত সংমিশ্রণের উপযুক্ত।

ম্যালিক হাইড্রাজাইড নামক উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক এক রকম রাসায়নিক পদার্থও সঙ্কর উৎপাদন ব্যবহৃত হইতেছে। শিকাগো ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রোফেসার ম্যাক্‌-ইলরাৎ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে পুং-পুষ্পকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব হইলে সরগাম ফলন এরূপ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইবে যে, উহা ভুট্টার বৃদ্ধিকে অতিক্রম করিবে। উক্ত পদার্থ প্রয়োগে পুষ্পের পরাগগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিয়া যায়। সরগাম বার্লির মতই একটি প্রয়োজনীয় শস্য।

প্লাষ্টিক ব্যবহারে বিপত্তি

আজকাল অস্ত্র চিকিৎসায় অনেক সময় প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ঐ সব পদার্থ দেহের মধ্যে বরাবরের জন্য সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। ক্রমাগত দেহের সহিত সংলগ্ন থাকায় প্লাষ্টিকের পদার্থ হইতে দেহের যে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, এরূপ সন্দেহ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি বহুদিন দেহ-সংলগ্ন থাকিলে ঐ স্থানে ক্যানসার উৎপত্তি হইতে পারে—সম্প্রতি কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটির কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স ও সার্জন্স-এর কতিপয় বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে এরূপ আশঙ্কা নতুন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

ডাঃ ও মিসেস ওপেনহাইমার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেন, অস্ত্রচিকিৎসায় দেহাভ্যন্তরে প্লাষ্টিকের জিনিষ থাকে। এর ফলে মানুষের দেহে ক্যানসার উৎপত্তির কোন সঠিক প্রমাণ নাই বটে, তবে ইঁদুরের ক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থায় শতকরা পঁয়তাল্লিশটির ক্যানসার হইতে দেখা গিয়াছে। ইঁদুরের দেহে প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি সংযোগের এক হইতে দুই বৎসর পরে ক্যানসার উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয়, মানুষের দেহে ঐরূপ ক্ষেত্রে দশ হইতে পনের বৎসর পরে ক্যানসার আক্রমণ হইতে পারে।

কলোম্বিয়ার বিজ্ঞানীরা কয়েক বৎসর পূর্বেও একবার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি ঘটনাচক্রেই পরিদৃষ্ট হয়। রক্তের চাপ সংক্রান্ত এক পরীক্ষায় ইঁদুরের কিড্‌নির উপর সেলোফেন জড়াইবার ফলে যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞানীরা তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুই বৎসর পরে ঐ ইঁদুরগুলির দেহ পরীক্ষার সময় সাতটি ইঁদুরের সেলোফেন জড়ানো কিড্‌নির চারিদিকে ক্যানসার পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় মানবদেহে করোটির নীচের পাতলা পর্দা বদলান, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টেণ্ডন সংযোগ, কর্তিত স্নায়ু বা ধমনী জোড়া লাগা এবং নানা স্থানের হাড়ের সন্ধিস্থলে প্লাষ্টিক সার্জারি উপলক্ষে অস্ত্রচিকিৎসকেরা সেলোফেন ও পলিইথাইলিন প্লাষ্টিক ব্যবহার করিতেছিলেন।

কলোম্বিয়ার বিজ্ঞানীরা পুনরায় বলিয়াছেন যে, ইঁদুরের দেহের ভিতর প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে ঐ পদার্থ সংলগ্ন বা উহার নিকটবর্তী তন্তুতে ক্যানসার উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। এই পরীক্ষায় তাঁহারা বহু প্রকার সাধারণ ও শোধিত প্লাষ্টিক ব্যবহার করিয়াছিলেন।

হাত-ঘড়ির মত ছোট রেডিও যন্ত্র

আমেরিকার সিগ্‌ন্যাল কোর্ ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবোরেটরি হইতে কব্জীতে পরিবার উপযোগী এক প্রকার ক্ষুদ্র রেডিও গ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। উহাতে ভ্যাকুয়াম টিউবের বদলে তিনটি ট্র্যান্‌জিস্‌টার ব্যবহার করা হইয়াছে। চল্লিশ মাইল দূর হইতে নিউইয়র্ক বেতার কেন্দ্রের রেডিও প্রোগ্রাম ইহার সাহায্যে পরিষ্কার শুনা যায়।

যন্ত্রটির সঙ্গে সংলগ্ন সাধারণ পেন্সিলের অগ্রভাগের আকারের মার্কারি ব্যাটারির সাহায্যে উহা চালিত হয়। ব্যবহারকারীর জামার আস্তিনের উপর একটি ছোট এরিয়্যাল সংযুক্ত থাকে এবং তাহার কানের সঙ্গে ছোট একটি হেড-ফোন আছে।

রেডিও যন্ত্র কত ছোট আকারে নির্মাণ করা যাইতে পারে, এই পরীক্ষার ফলেই বর্তমান যন্ত্রটি সিগ্‌ন্যাল কোর্ হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে। স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের বাক্সে নির্মিত যন্ত্রটি দৈর্ঘ্যে ২ ইঞ্চি, প্রস্থে ১ ইঞ্চি এবং খাড়াই ½ ইঞ্চি। উহার ভিতরের তার সংযোগের জটিল নক্‌সা খোলের উপরে মুদ্রিত আছে।

সিগ্‌ন্যাল কোর্-এর কর্মীদের মতে ট্র্যান্‌জিস্‌টার আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই এইরূপ ক্ষুদ্র যন্ত্র নির্মাণ

করা সম্ভব হইয়াছে। দুষ্প্রাপ্য ধাতু জার্মেনিয়ামের সাহায্যে ট্র্যান্‌জিস্‌টার প্রস্তুত হয়। সাধারণ ছোলা বা মটরের আকারের এই ট্র্যান্‌জিস্‌টার রেডিও যন্ত্রে ভ্যাকুয়াম টিউবের মতই কাজ করে এবং ইহাতে অতি সামান্য শক্তিরই প্রয়োজন হয়।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ষট্‌ত্রিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

[১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য বারের মত এবারেও বিজ্ঞান মন্দিরের ষট্‌ত্রিংশৎ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসে আচার্যদেব বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মীদের প্রতি বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে দীক্ষার যে বাণী প্রদান করিয়াছিলেন এই উপলক্ষে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সঃ]

দীক্ষা

আমরা সকলেই শিক্ষার্থী, কার্যক্ষেত্রে প্রত্যহই শিখিতেছি, দিন দিন অগ্রসর হইতেছি এবং বাড়িতেছি।

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই যে, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেইদিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধেও একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড় হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'গাছের উপর যে পাখীটি বসিয়া আছে তাহাই লক্ষ্য ; পাখীটি কি দেখিতে পাইতেছ?' অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, 'না পাখী দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষুমাত্র দেখিতেছি।' এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।

তবে সেই লক্ষ্য কি? লক্ষ্য, শক্তি সঞ্চয় করা যাহা দ্বারা অসাধ্যও সাধিত হয়।

জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে কোনরূপ সঞ্চয় করে না, যে পরমুখাপেক্ষী, সে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।

যে সঞ্চয় করিয়াছে সেই-ই শক্তিমান, সেই-ই তাহার সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিবে। কে এই সাধনার পথ ধরিবে?

এজন্য কেবল অল্প কয়জনকেই আহ্বান করিতেছি। দুই এক বৎসরের জন্য নহে; সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার জন্য। দেখিতেছ না ধূলিকণার ন্যায়, কীটের ন্যায় জীবন পেষিত হইতেছে!

ভীষণ জীবনচক্রের গতি দেখিয়া ভীত হইয়াছ? স্বভাবের নির্ম্মম, কাণ্ডারীহীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছ? কিন্তু

তোমাদেরই অন্তরে দৈব দৃষ্টি আছে, তাহা উজ্জ্বল কর। হয়ত প্রকৃতির মধ্যে একটা দিশা, একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে যে, এই বিশ্ব জীবন্ত, জড়পিণ্ড মাত্র নহে। তাহার আহার উল্কাপিণ্ড, তাহার শিরায় শিরায় গলিত ধাতুস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সামান্য ধূলিকণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুদ্র শক্তিও বিনাশ পায় না; জীবনও হয়ত তবে অবিনশ্বর। মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোচ্ছ্বাস। দেখ, তাহারই বলে এই পুণ্য দেশ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা একই স্থানে উপনীত হই। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ কর। জীবন ও তাহার পরিণাম, এই জগৎ ও অপর জগৎ তোমাদের সাধনার লক্ষ্য হউক। নির্ভীক বীরের ন্যায় জীবন মহাহবে নিক্ষেপ কর।

সৌরজগতের জন্মকথা

শ্রীকার্তিক লাহিড়ী

সৌরজগত সম্বন্ধে মানুষ চিরদিনই কৌতূহলী। সূর্য এবং গ্রহ-উপগ্রহ চিরদিনই মানুষের বিস্ময়ের বস্তু। কেউ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা দেখেছেন, কেউ আবার গ্রহ-উপগ্রহ এবং সূর্যের ভ্রমণের মধ্যে আশ্চর্য এক নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা দেখে মন্তব্য করেছেন, সৌরজগতের জন্ম আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে নয়। ল্যাপ্‌লাস মন্তব্য করেছেন, গ্রহ-উপগ্রহ ঠিক একই দিকে, একই পথে এবং একই তলে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তাঁর ধারণা, সূর্যের চারধারে প্রথমে একটি উষ্ণ বাষ্পমণ্ডল ছিল যা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হয়েছে। নিরক্ষ রেখার কাছে কেন্দ্রাতিগ শক্তি যতক্ষণ না অভিকর্ষ শক্তির বেশী হয় ততক্ষণ সঙ্কোচনের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘোরবার হারও বাড়তে থাকে। এর ফলে বস্তুর একটি বলয় ছিট্‌কে পড়ে এবং এই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি হওয়ার ফলে পর্যায়ক্রমে অনেকদিন পর্যন্ত বস্তুবলয় ছিট্‌কে পড়তে থাকে। বলয়গুলির কেন্দ্রটিই হচ্ছে আমাদের সূর্য। প্রত্যেকটি বস্তুবলয় ঠাণ্ডা হয়ে এক একটি ছোট ছোট নীহারিকার রূপ নেয় এবং তাথেকেই গ্রহ-উপগ্রহ জন্ম গ্রহণ করে।

কিন্তু ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৯৫ সালে প্রমাণ করে দেখান যে, ল্যাপ্‌লাসের তত্ত্ব অযৌক্তিক হয়ে পড়ে কয়েকটি কারণে। তিনি বলেন যে, কোন একটি বস্তুবলয় উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পর সঙ্কুচিত হলে কেবল একটিমাত্র বস্তুপিণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে না, তাথেকে এক ঝাঁক গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি হওয়ারই কথা; অতএব গ্রহের জন্ম সেক্ষেত্রে অসম্ভব।

গ্রহগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করে দেখা গেল, অভ্যন্তরের গ্রহগুলির ভর অপেক্ষাকৃত কম, ঘনত্ব বেশী, ঘূর্ণনের বেগও কম এবং এদের উপগ্রহের সংখ্যাও কম। কিন্তু বহির্ভাগের গ্রহগুলির ভর বেশী। অবশ্য প্লুটো অপেক্ষাকৃত বহির্ভাগের একটি গ্রহ হয়েও এর ব্যতিক্রম।

যাহোক, এ সম্বন্ধে কাণ্টের মতবাদটি প্রণিধানযোগ্য। কাণ্ট বলেছেন—সূর্যের অবস্থিতি প্রথমে কোন একটি নীহারিকার কেন্দ্রে ছিল এবং নীহারিকাটি অভিকর্ষের বলে সূর্যের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিভিন্ন কণিকার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে নীহারিকাটি চ্যাপটা হতে থাকে এবং এই থালার মত আকৃতিবিশিষ্ট নীহারিকার মধ্যে বস্তুপুঞ্জগুলি ঘন অংশের দিকে জমা হয়ে কতকগুলি ধারা-

ক্রমের সৃষ্টি করে এবং এমনভাবে অভিব্যক্ত হতে থাকে যার ফলে অন্ততঃ গ্রহ না হলেও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই উপধারাটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিকর্ষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ফলে উপগ্রহের সংখ্যাধিক্য ঘটতে থাকে। যদিও এই তত্ত্বের অনেকগুলি ত্রুটি আছে তথাপি এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ সম্প্রতি সংশোধিত আকারে কান্টের মতবাদের প্রতিই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে।

১৯১০ সালে চেম্বারলেন ও মাউণ্টন সিদ্ধান্ত করেন যে, অন্য একটি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সূর্যের কাছে এসে পড়ে এবং নিজদের অভিকর্ষের টানে আকর্ষিত হয়ে একে অন্যের পরাবৃত্ত কক্ষে (hyperbolic orbit) ঘুরতে থাকে এবং তারপরে কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। চলমান নক্ষত্রটি সূর্যের মধ্যে একটি বিরাট তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং চাপে সঙ্কুচিত উত্তপ্ত সৌর গ্যাসের আয়তন হঠাৎ প্রসারিত হওয়ার ফলে ভীষণ বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। বিস্ফোরণের ফলে উৎক্ষিপ্ত বস্তুগুলি চলমান নক্ষত্রটির অভিকর্ষের টানে উৎকেন্দ্রিক কক্ষে সূর্যের চারধারে ঘুরতে আরম্ভ করে। তাঁরা আরো বলেন, এই বস্তুপুঞ্জগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাকণিকায় ঘনীভূত হয় এবং অতি শীঘ্র কঠিন আকার ধারণ করে। অভিকর্ষ শক্তির বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কণিকাগুলি লেগে থাকবার ফলে বড় বড় কণিকার উৎপত্তি ঘটে। অবশিষ্ট বস্তুপুঞ্জ একটি প্রতিরোধ মাধ্যম তৈরী করে কক্ষের উৎকেন্দ্রিকতা হ্রাস করে। কতকগুলি এই ধারাক্রমের বাইরে চলে যায়, কতকগুলি আবার সূর্যের দিকে ফিরে আসে এবং কক্ষ-গতির ঠিক একই দিকে ঘুরতে থাকে।

জেফরিস বলেন, এদের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে এত ঘন ঘন সংঘর্ষ হয় যে, বড় একটি কঠিন বস্তুতে পরিণতি লাভ করবার আগেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। এরপর জীনস্ এবং জেফরিস একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁদের, ধারণা নক্ষত্রটি সূর্যের কাছে আসবার সময় সূর্যের মধ্যে এমন এক স্ফীতির সৃষ্টি হয় যার এককোণ থেকে বস্তুপ্রবাহ সিগারেটের মত লম্বা হয়ে সূত্রাকারে বেরিয়ে আসে। অভিকর্ষের ফলে এই সূত্রগুলি বারংবার ভেঙ্গে আলাদা আলাদা সূত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সেগুলি সূর্যের চারধারে উপবৃত্ত কক্ষে ঘুরতে থাকে। এর ফলে সূতার মত বস্তুপিণ্ডগুলি বেগ অর্জন করে বটে, কিন্তু এই জোয়ারীশক্তি এদের ঘোরাতে পারে না। জেফরিস গাণিতিক হিসাবে দেখালেন, বৃহস্পতিকে ঘোরানোর জন্য যে পরিমাণ বস্তুকে আবার এর মধ্যে ফিরে আসতে হবে এবং পুনঃশোষিত হতে হবে তা প্রায় সবগুলি উপগ্রহের চারশো গুণেরও বেশী, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

জেফরিস তাই তাঁর অভিমত সংশোধন করে বললেন যে, নক্ষত্রটি কেবল সূর্যের নিকটে আসা নয়, সত্যিকারের একটা সংঘর্ষই ঘটেছিল। সংঘর্ষটা কতকটা অর্ধ-বৃত্তাকার পদার্থের সংঘর্ষের মত। দুটি বস্তু অতি দ্রুত বেগে নিকটবর্তী হওয়ার ফলে জোয়ারের উৎপত্তি হয় এবং আসল সংঘর্ষ ঘটবার পূর্বেই সূর্যের স্ফীতি থেকে বস্তুপুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। সংঘর্ষের সময় বস্তু দুটির ভারী অংশগুলি বক্রপথে একে অন্যকে বেষ্টন করে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আলাদা হয়ে পড়ে। সূর্য এবং নক্ষত্রের কাছের অংশ মিশে যায় এবং অতিরিক্ত চাপে সঙ্কুচিত হয়ে কয়েক কোটি ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যখন দুটি বস্তু আলাদা হয়ে পড়ে তখন উষ্ণ বাষ্পের সূত্র সৃষ্টি হয় এবং তাদের ঘূর্ণীপাকের হারও দ্রুততর হয়।

রাসেল অতঃপর সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্য একটি যুগ্মতারা। এখনকার তুলনায় তার সঙ্গীর সংখ্যাও ছিল কম এবং এদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধানও ছিল যথেষ্ট। তাঁর ধারণা, সূর্যের সঙ্গে নক্ষত্রটির সংঘর্ষ ঘটে নি, সঙ্গীদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ

ঘটেছিল। এই সিদ্ধান্তের পর লিটল্‌টন অভিমত প্রকাশ করেন যে, সূর্যের সঙ্গী এবং সংঘর্ষকারী নক্ষত্রটি উভয়েরই সূর্যের কাছ থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব; তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রচুর পরিমাণ উৎক্ষিপ্ত বস্তুরাশি রেখে যাবে। এই বস্তুরাশি থেকেই গ্রহাদির জন্ম হয়ে থাকে।

লিটল্‌টন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দু-ধাপে গ্রহগুলির উৎপত্তি হয়েছে। যদি সংঘর্ষের ফলে নক্ষত্রটি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায় তবুও সেখানে কোন অংশ আলাদাভাবে থাকতে পারে না, অভিকর্ষের বলে একটি অন্যটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। এরূপ টুক্‌রা অংশ যখন ঠাণ্ডা এবং সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন ঘূর্ণনের হার এত দ্রুত হয় যে, স্থিতিসীমার নিম্নে চলে যাবার ফলে আবার খণ্ড দুটি আলাদা টুক্‌রায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় একটি বাধার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি ভেঙ্গে মুখ্য বস্তুটির সঙ্গে উপগ্রহ সৃষ্টির সহায়তা করে। অন্যান্য অংশগুলি ভিতরের গ্রহ এবং চন্দ্রের উৎপত্তি করে। এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হলো অস্থায়িত্ব এবং ভাঙ্গনের জন্যে ঘূর্ণনের যে হার আবশ্যক, যে কোন গ্রহের ঘূর্ণনের হার তার চেয়ে অনেক কম। এই প্রক্রিয়া সৃষ্টির জন্যে ভাঙ্গনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। লিটল্‌টন তাই আবার মত প্রকাশ করেন, সূর্য তিনটি তারার সমষ্টি এবং দুটি সঙ্গী অতি নিকটে অবস্থান করছে। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত মতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি এই মতের বিরুদ্ধে সেই কথাগুলিই প্রযোজ্য।

হোয়েলি বলেন, সূর্য একদা যুগ্মতারা ছিল এবং ধীরে ধীরে সুপার নোভায় পরিণত হয়েছে। এই রকম একটি নক্ষত্র অস্থায়িত্বের স্তরে বেশ কিছুদিনের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত শক্তি নির্গত হয়, যে শক্তি ব্যয়িত হতে সূর্যের কয়েক কোটি বছরও লাগতে পারে। কোটি কোটি ডিগ্রি উষ্ণতায় এমন বেগে জড়-পদার্থ নির্গত হয় যে, সবকিছু মিলিয়ে তা সূর্যের ভরের চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়। প্রাথমিক স্তরে বস্তুর নির্গমণ এত দ্রুত হয় যে, তা সূর্যের আওতার বাইরে চলে যায়; কিন্তু উৎক্ষেপণ যখন শেষ স্তরে এসে পৌঁছায় তখন গতি যায় কমে এবং বস্তুটির একাংশ সূর্যের সীমার মধ্যে এসে যায় এবং ঘনীভূত হয়ে গ্রহের জন্ম দেয়। এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আপত্তি হচ্ছে এই যে, উচ্চ তাপমাত্রায় উৎক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ড সূর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হবার আগেই ছড়িয়ে পড়বে এবং ঘনীভূত হবার সময় তত্ত্বানুসারে আরো বেশী বলের প্রয়োজন হবে। হোয়েলির ধারণা, পৃথিবী এবং অন্যান্য কোন কোন গ্রহে কম পরিমাণে হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাস আছে এবং সুপার নোভার এত উত্তাপ রয়েছে যে, এরা ভারী মৌলিক পদার্থ তৈরী করতে সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ করে ফেলেছে। দেখা গেছে, কতকগুলি গ্রহ হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন নিঃশেষ করে ফেলেছে; আবার আরো দেখা যায় যে, কম ঘনত্বের গ্রহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস দুটি বর্তমান।

কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, নক্ষত্রসমূহের ব্যবধান স্থলে বাষ্প এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মেঘ দল বেঁধে আছে। উইলপোল স্থির করেছেন—সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলি এই রকম বাষ্প এবং কণার সমবায়েই জন্মলাভ করেছে। অভিকর্ষের ফলেই এই মেঘগুলি ঘনীভূত হয় এবং ঘনীভূত মেঘের বৃহত্তর সম্মিলন থেকেই সূর্যের উৎপত্তি হয়েছে।

অ্যালফ্‌ভেন আর একটি নতুন মতবাদের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন যে, সাধারণতঃ সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাখর্য প্রায় ৫০ গস্ এবং পৃথিবীর কক্ষে সমদিকে ধাবিত একটি প্রোটনের উপর তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি সূর্যের অভিকর্ষ বলের চেয়ে প্রায় ষাট হাজার গুণ বেশী। তাঁর ধারণা,—সূর্য মহান সীমায় পরিভ্রমণকালে আন্তর্নক্ষত্রীয় বাষ্পীয় মেঘে প্রবেশ করে এবং প্রচুর পরিমাণ

সাম্যধর্মী পরমাণুর সন্ধান পায়। অভিকর্ষের ফলে পরমাণুগুলি বর্ধিত গতিবেগে সূর্যের মধ্যে পতিত হয় এবং এর ফলে সূর্যের নিকটস্থ মেঘমণ্ডল উষ্ণ হয়ে উঠে। পরমাণুর চলচ্ছক্তি যখন আয়ন প্রক্রিয়ার শক্তির সমান হয় তখন পরমাণুর সংঘর্ষে আয়নিত হয়ে পড়ে। পজিটিভ এবং নিগেটিভ আয়নগুলি সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্র থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি পেয়ে থাকে।

গাণিতিক গবেষণার ফলে অ্যালফ্‌ভেন এর এক হিসাব বের করেছেন যে, আন্তর্নাক্ষত্রিক মেঘমণ্ডলীতে ধূম্র-কণিকা এবং পরমাণুসমূহ সূর্যের দিকে ধাবিত হয়ে এমন এক দূরত্বের মধ্যে আসে যে, বাষ্পীভূত হবার পূর্বেই সেগুলি আয়নিত হয়ে পড়ে। এই তড়িৎযুক্ত কণিকাগুলি লাইন্‌স্ অব ফোর্স-এর অভ্যন্তরে ঘনীভূত হয়ে গ্রহের সৃষ্টি করে।

ter Haar দেখিয়েছেন যে, সংঘর্ষের ফলে সূর্যের চতুর্দিকের বাষ্পীয় মেঘমণ্ডলের মধ্যে আয়ন-প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সৌরতেজ বিকিরিত হওয়ার ফলে আয়ন-প্রক্রিয়া বাইরের গ্রহগুলির দূরত্বের মধ্যে তো নয়ই, অভ্যন্তরস্থ গ্রহগুলির সীমার মধ্যেও ঘটা অসম্ভব।

সম্প্রতি Weizsacker এক নতুন মতবাদ প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আদিম সূর্য একটি ঘূর্ণায়মান খোলস দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই খোলসটি পরমাণু এবং ধূম্র-কণিকার সম্মিলনে সৃষ্ট এবং এর ভর কেন্দ্রীয় সূর্যের প্রায় দশমাংশ। প্রতিটি কণা নিজস্ব কক্ষে সূর্যের চারধারে বিচরণ করে। মেঘমণ্ডলীতে শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস এবং একভাগ ভারী মৌলিক পদার্থ বিদ্যমান। আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে কণিকাগুলির আকৃতি এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথ বদলে দিতে পারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই কক্ষপথগুলি গোলাকার না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। এর ফলে তা চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এই চ্যাপ্টা পদার্থটি প্রধানতঃ বাষ্প দ্বারা গঠিত এবং এর মধ্যে মধ্যে ধূম্রকণিকার অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু প্রতিটি কণিকার উষ্ণতা সর্বদা সাম্যাবস্থায় থাকে। যে কোন অংশে সূর্য থেকে আগত এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ সমান থাকবার ফলে বর্তমান গ্রহ-উপগ্রহের ধারার মধ্যেকার উত্তাপ থেকে এই উত্তাপের বেশী তারতম্য হয় না।

ঘনীভবন প্রক্রিয়াটি তখনই সম্ভব যখন বড় বড় কণিকাগুলির বাষ্পীয় চাপ গ্যাসের ভিতরকার চাপের চেয়ে কম হয়। এর ফলে বেশী সংখ্যক পরমাণু বাষ্পীভূত না হয়ে ঘনীভূত হয়ে পড়ে। এই ঘনীভূত কণিকাগুলির ধর্ম উত্তাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে বহিঃসীমায় জল, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি যৌগিক পদার্থগুলি ঘনীভূত হয় এবং অন্তঃসীমায় কেবল মাত্র ধাতু ও যৌগিক পদার্থগুলি ঘনীভূত হয়। এই জন্যে ঘনীভবন প্রক্রিয়ার প্রথম স্তরে অন্তর্বলয়ে সৃষ্ট নিউক্লিয়াসগুলির ঘনত্ব বেশী। দ্বিতীয় স্তরে নিউক্লিয়াসগুলি বড় হওয়ার ফলে বাইরের বলয়ে তাড়াতাড়ি কার্যটি সমাপ্ত হয় এবং শেষ স্তরে অভিকর্ষের ফলে প্রসারতা লাভ করে।

Weizsacker গণনা করে দেখলেন যে, ঘনীভবন সমাপ্ত হতে প্রায় সহস্র কোটি বছর সময় লাগে। তবে এটাও পরিষ্কার নয় যে, কেন প্রতিটি বলয়ে একটি করে গ্রহ থাকবে? তিনি বলেছেন, প্রতিটি বলয়ে ঘনীভবন এমনভাবে হয় যা প্রত্যক্ষ করা যায় না। ter Haar দেখিয়েছেন, ঘনীভবন প্রক্রিয়া যে ভর বিতরণ করে তা সত্যিকারের সৌরজগতের ভর বিতরণের সমান। তবে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়; কারণ তত্ত্বানুযায়ী সূর্য থেকে মঙ্গল গ্রহের দূরত্বের মধ্যে যে গ্রহের প্রয়োজন, মঙ্গল গ্রহ তার চেয়ে অনেক ছোট। এই মতানুসারে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে আর একটি গ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে এরকম ঘনীভবন-প্রক্রিয়ার

ফলে উপগ্রহের জন্ম হয়। চাঁদ এবং মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ এবং বড় বড় গ্রহের উপগ্রহগুলির উৎপত্তি এই প্রক্রিয়ার কিছুকাল পরে হয়েছিল।

সৌরজগতের জন্ম-সমস্যা সম্বন্ধে Weizsacker-এর মতবাদ যদিও যথেষ্ট নয় তথাপি এই মতবাদের সাহায্যে মোটামুটি গ্রহ-উপগ্রহাদির গতিবিধি যাচাই করা চলে। তিনি হিসাব করবার সহজ পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে একটি কথা—কেন্দ্রীয় নক্ষত্রের তাপ বেশী হওয়ার কথা নয়; কারণ তাহলে ঘনীভবন-প্রক্রিয়া সম্ভব হতে পারে না। এজন্যে অনুমান করা হয়েছে, খুব উত্তপ্ত নক্ষত্রের কোন গ্রহ-উপগ্রহ নেই।

সঙ্কলন

খাদ্যপ্রাণ ও জনস্বাস্থ্য

শরীর সুস্থ ও সবল রাখবার জন্যে খাদ্যপ্রাণ অত্যাবশ্যক। প্রকৃতিজাত তাজা খাদ্যদ্রব্যে খাদ্যপ্রাণ পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যে এর পরিমাণ যেরূপ সামান্য জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও এর চাহিদা নিতান্ত কম। উদাহরণস্বরূপ কড্‌লিভার তেলের উপাদান দেখা যাক। ডি-খাদ্যপ্রাণের দ্বারা কড্‌লিভার তেল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এতে ঐ খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ ৪ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পরিমাণ যতই তুচ্ছ হোক না কেন, দেহযন্ত্র অক্ষুন্ন রাখতে খাদ্যপ্রাণ একান্ত অপরিহার্য।

ভেষজ গবেষণাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিকেরা খাদ্যের তিনটি প্রধান উপাদান—যথা, প্রোটিন বা মাংসজাতীয় উপাদান, চবি বা স্নেহজাতীয় উপাদান এবং শর্করাজাতীয় উপাদান আবিষ্কার করেন। তখনও কিন্তু তাঁরা সঠিক পথের সন্ধান পান নি। ১৮৪৭ সাল জেম্‌স্ লিণ্ড নামে একজন জাহাজী ডাক্তার পরীক্ষামূলকভাবে স্কার্ভি রোগে লেবু অথবা অন্যান্য জম্বীর রসে আশাতীত সুফল লাভ করেন। ১৮৮৭ সালের কাছাকাছি সময়ে জাপানী নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল তাকাকি প্রমাণ করেন যে, কড়াইশুঁটি বেরিবেরি রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধক। যাভার কারা বিভাগীয় চিকিৎসক আইক্‌ম্যান জানতে পারেন যে, মুরগীকে কল-ছাঁটা চা'ল খাওয়ালে তাদের বেরিবেরি রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কারের গৌরব লাভ করেন স্যার ফ্রেডারিক গাউল্যাণ্ড হপ্‌কিন্‌স্। মানবদেহের পক্ষে খাদ্যপ্রাণ যে একান্ত অপরিহার্য তাও তিনিই প্রথমে জানতে পারেন।

গুণানুযায়ী খাদ্যপ্রাণের সংখ্যাও কম নয়। তবে অত্যধিক গুরুত্ব পূর্ণ এ, বি, সি ও ডি শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ সম্পর্কে সকলেরই একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ভারতের অধিকাংশ রোগই 'এ' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের অভাবের জন্যে দেখা দেয়। ঘি, মাখন, দুধ, দই, ডিম, মাছ ও লিভারে এই শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ থাকে। উন্মুক্ত পাত্রে অনেকক্ষণ জ্বাল দিলে ঘৃতের এই খাদ্যপ্রাণ বিনষ্ট হয়ে যায়। বনস্পতি এবং উদ্ভিজ্জ তেলে ইহা বিন্দুমাত্রও থাকে না। কড্, হালিবাট, হাঙ্গর এবং কয়েক জাতীয় ভারতীয় মাছের লিভারের তেলে 'এ' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ বেশী পরিমাণে থাকে। এই খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ জান্তব খাদ্য বিশেষ দুর্মূল্য। পর্যাপ্ত পরিমাণে 'এ' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ গ্রহণের সহজ ও সুলভ উপায় হচ্ছে সবুজ পাতাবিশিষ্ট শাকসব্‌জি গ্রহণ করা।

'বি' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের অভাবে বেরিবেরি,

পক্ষাঘাত, হৃদ্‌রোগ ও স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়। অচূর্ণ খাদ্যশস্য, ডাল এবং চীনাবাদামে এই শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। এমন কি, দৈনিক মাত্র দু-আউন্স ডাল গ্রহণ করলে বেরিবেরির ভয় হ্রাস পায়। এই শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের অভাবে মুখ ও জিহ্বায় ঘা এবং চোখের অসুখ দেখা দিতে পারে। ডাল, চীনাবাদাম, লিভার, ডিম এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করলে ঐ সকল রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

শরীরে 'সি' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে স্কার্ভি, চুলকানি, রক্তপাত, মাড়ি থেকে পুঁজ ও রক্তক্ষরণ, কাটা, ঘা প্রভৃতি সারতে বিলম্ব হয় এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। তাজা ফল ও শাক-সব্‌জিতে এই শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ থাকে। কিন্তু শুষ্ক শাক-সব্‌জি, ডাল ও খাদ্যশস্যের খাদ্যপ্রাণ বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার অঙ্কুরিত মুগ অথবা ছোলায় এরা নতুনভাবে জন্মে।

আমলকিতে 'সি' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। একটি আমলকি এই খাদ্যপ্রাণের দিক থেকে দুটি কমলালেবুর সমান। অন্যান্য শুষ্ক ফলের মত আমলকিতে এই শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের তারতম্য ঘটে না। পেয়ারা এবং আমেও 'সি' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

'ডি' শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণের অভাবে মানবদেহের হাড় শীর্ণ ও বিকৃত হয়। লিভার ও লিভারের তেল, ডিম, দুধ, ঘি ও তেলে এই শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সূর্যের আলো থেকেও এই খাদ্যপ্রাণ মানবদেহে সঞ্চারিত হয়।

ম্যাগনেসাইট

অতিমাত্রার তাপসহ ইষ্টকাদি ও বিশেষ গুণ-বিশিষ্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত, ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর উদ্ধার ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ উৎপাদনে ম্যাগনে-সাইটের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় খনিজ ম্যাগনেসাইট প্রস্তর থেকেই তাপসহ ইট তৈরী করা হয় অথবা চুল্লীর অন্তর্ভাগের প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। চুল্লী নির্মাণে ম্যাগনেসাইট ইষ্টকের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় নেই বললেই চলে। এরূপ তাপে ইষ্টকের আয়তন বৃদ্ধি এবং চুল্লীর উপরিভাগ নির্মাণের অসুবিধা দূর করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়।

দস্তা অ্যালুমিনিয়মের সঙ্গে খাদরূপে সংযুক্ত হলে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু, হাল্কা ও সমধিক কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়; কাজেই বিমানপোতের যন্ত্রাংশ নির্মাণে এর ব্যবহার ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। এই কারণেই হাল্কা যন্ত্রপাতি, বিশেষতঃ ক্যামেরা, সঙ্গীতযন্ত্র বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি নির্মাণে ইহার বিশেষ প্রয়োজন।

ম্যাগনেসিয়াম লবণ ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র দেখা যায়। নিম্ন গুণসম্পন্ন সালফেট লবণ সার হিসাবে এবং উচ্চাঙ্গের লবণ কৃত্রিম রেশম, ওষুধ এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে লাগে। বরারের সঙ্গে সংমিশ্রণে তাপরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে কার্বনেট একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, ম্যাগনেসিয়াম বোরেট, নাইট্রেট, স্যালিসিলেট ও ল্যাক্‌টেটের ব্যবহার নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারতে প্রচুর ম্যাগনেসাইট ভাণ্ডার দেখা যায়। মাদ্রাজ (সালেম), কাশ্মীর, মহীশূর (দুধকন্যা), রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ (আলমোড়া) প্রভৃতি অঞ্চলে ম্যাগনেসাইটের অস্তিত্ব রয়েছে। এ ছাড়া আরও নানাস্থানে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। মাদ্রাজের সালেম জেলায় ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ম্যাগনেসাইট ভাণ্ডার অবস্থিত।

ভারতে মোট ভাণ্ডারের আনুমানিক পরিমাণ

দশ কোটি টন। বর্তমানে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৫০,০০০ টন; তন্মধ্যে অন্ততঃ ১০,০০০ টন দেশেই নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ম্যাগনেসাইট পৃথিবীর অপরাপর স্থানেও পাওয়া যায়। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া এবং ক্যালিফোর্ণিয়ায় অনিয়তাকার (amorphous) ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়। আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে ক্রিষ্ট্যাল আকৃতির খনিজ আছে। সাধারণতঃ এই দুটিই ম্যাগনেসাইট প্রস্তরের প্রধান প্রাকৃতিক রূপ। ভারতে এই দু-রকমের খনিজই পাওয়া যায়।

ভারতে এখনও খোলা খাদের সাহায্যে ম্যাগনেসাইট উৎপাদিত হয়ে থাকে; কিন্তু হয়তো আর বেশীদিন এটা সম্ভব হবে না। যৌগিকভাবে এবং সামুদ্রিক জীব, চুনা পাথর বা ডলোমাইটের সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াম লাভ করবার চেষ্টা হচ্ছে। ম্যাগনেসাইট সম্পর্কে তথ্যসম্বলিত পুস্তিকায় ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে এ সব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দেশের মধ্যেই যাতে নানা শিল্পে অধিকাংশ ম্যাগনেসাইট ব্যবহৃত হতে পারে, এখন থেকে তার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে প্রায় প্রতি বৎসর ৩৫,০০০ টন ম্যাগনেসাইট রপ্তানী হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্ততঃ ২০,০০০ টন দগ্ধ ম্যাগনেসাইট। এই শ্রেণীর ২০,০০০ টন ম্যাগনেসাইট প্রস্তুত করতে অন্ততঃ ৪০,০০০ টন ম্যাগনেসাইট লাগে, অর্থাৎ ২০,০০০ টনের অধিকাংশই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হিসাবে অপচয় হয়। ইহাতে স্বচ্ছন্দে প্রচুর শুষ্ক বরফ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

ম্যাগনেসাইট যে সব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিস্তৃতি লাভ করছে। রপ্তানী না হলে দেশের মধ্যেই বিভিন্ন শিল্পে যাতে ভারতে উৎপাদিত সব ম্যাগনেসাইট ব্যবহার করা যায়, তার চেষ্টা করা বিধেয়।

পরিপাক ও পরিপাক যন্ত্র

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি রাসায়নিক বিচারে তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থের পার্থক্য কি, তাহা সকলেই জানেন। যৌগিক পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পরমাণু একত্র সন্নিবিষ্ট থাকে। পরমাণুর সংখ্যা যত বেশী হয় এবং তাহাদের সংস্থান যত জটিল হয় পদার্থটিও তত জটিল হইয়া পড়ে। শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন বা আমিষ প্রভৃতি যে সকল খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তাদের সবগুলিই অত্যন্ত জটিল যৌগিক পদার্থ। পরিপাক ক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—যৌগিক পদার্থগুলিকে ভাঙ্গিয়া এমন সহজ পদার্থে পরিণত করা যাহাতে ঐগুলি সহজেই আমাদের শরীরের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে।

মুখ, দাঁত, জিহ্বা, লালা নিঃসরণকারী গ্রন্থি, খাদ্যনালী, পাকাশয় এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্রাদির অন্তর্গত। খাদ্যের অসার অংশ বৃহদন্ত্রের মাধ্যমে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

লালা নিঃসরণকারী গ্রন্থি হইতে মুখের লালা বাহির হয়। ইহার অনেক গুণ। ইহা মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখে; ফলে খাদ্য-কণিকা জমিয়া রোগ-বীজাণুর সৃষ্টি করিতে পারে না। তদুপরি ইহা মুখ ও ঠোঁট আর্দ্র রাখে—ইহাতে কথা বলার সুবিধা হয়। মুখের লালা শুকাইয়া গেলে কথা বলা দুষ্কর হয়। খাদ্যের সঙ্গে লালা মিশিয়া ইহাকে আরও পিচ্ছিল করিয়া তোলে; ফলে ইহা

গলাধঃকরণ করা সহজতর হয়। ইহার সঙ্গে মিশ্রণের ফলে খাদ্য গলিয়া যায় এবং তাহাতে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ সম্ভব হয়। এই লালার মধ্যে টায়ালিন নামে এক প্রকার এন্‌জাইম আছে। এই এন্‌জাইমের সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর হয়। লালাতে যে এন্‌জাইম আছে সেইগুলি শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করে।

দন্তের সাহায্যে খাদ্য চর্বিত হয় এবং লালার সাহায্যে তাহা গলাধঃকরণ করা সহজ হয়। তখন তাহা জিহ্বার সাহায্যে খাদ্যনালীর ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে পৌছে।

পাকস্থলী হইতে কয়েকটি খাদ্য-পরিপাককারী রস নিঃসৃত হয়। পাকস্থলীর কোনও কোন গ্রন্থি হইতে এমন একপ্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাতে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। পাকস্থলীর এন্‌জাইমগুলি অধিক পরিমাণে অ্যাসিড পাইলেই ভালভাবে কাজ করিতে পারে। পাকস্থলীতে রেনিন এবং পেপ্‌সিন নামক দুই প্রকারের এন্‌জাইম উৎপন্ন হয়। দুধের প্রোটিন অংশ বাহির করিয়া আনা রেনিনের অন্যতম কাজ। গৃহীত খাদ্যের প্রোটিনগুলি ভাঙ্গিয়া হজমের পথ করিয়া দিতে পেপ্‌সিনের প্রয়োজন হয়।

পাকস্থলী হইতে খাদ্য ক্ষুদ্র অন্ত্রে চলিয়া যায়। ইহা একটি ক্ষুদ্র গুটানো নল বিশেষ। অন্ত্র-রসে এমন সব এন্‌জাইম আছে যেগুলি শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্য দ্রব করিয়া দেয়। লিভার বা যকৃৎ হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহাকে পিত্ত বলে। এই পিত্ত ক্ষুদ্র অন্ত্রে যায়। প্যাংক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় বলিয়া পরিচিত আর একটি যন্ত্র হইতেও একপ্রকার রস আসিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে জমা হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থের সঙ্গে পিত্ত মিশিয়া উহাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র বটিকায় পরিণত করে। ফলে স্নেহজাতীয় পদার্থের মোট আয়তন বাড়িয়া যায় এবং অন্যান্য পরিপাক কার্য সুরু হয়। প্যাংক্রিয়াস হইতে নিঃসৃত এক শ্রেণীর এন্‌জাইম দ্বারা এই কাজটি সাধিত হয়। এই রসের অন্যান্য এন্‌জাইম শ্বেতসার ও প্রোটিনগুলি ভাঙ্গিয়া দেয়।

খাদ্য শরীরের সঙ্গে মিশিয়া যায় প্রধানতঃ অন্ত্রেই। এই নলের গায়ে উভয়দিকে অঙ্গুলি পরিমাণ বর্ধিত স্থান আছে—এইগুলির সাহায্যেই খাদ্য শরীরের মধ্যে মিশিয়া যায়। এই প্রত্যেকটি অঙ্গুলিসদৃশ স্থানের মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র রক্তবাহী শিরা আছে। অপর আর একটি শিরা দিয়া দেহের রস বা লিম্ফ্‌ বাহিত হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থগুলি এই শিরা দিয়া যায়। অন্যান্য শ্রেণীর খাদ্যগুলি (হজম হইবার পর) পূর্বোক্ত রক্তবাহী শিরা দিয়া পরিচালিত হয়।

লবণ এবং জলও এখানেই রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। অবশ্য জলের অধিকাংশ বৃহদন্ত্রে গিয়াই শরীরের সঙ্গে মিশে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের পরেই এই পরিপাক যন্ত্রাংশটি অবস্থিত। এখান হইতে অসার অংশ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৫১ সালের লোক-গণনা সম্পর্কে সেন্সাস কমিশনার আর. এস. গোপালস্বামী সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন এবং পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে, উৎপাদনের পরিমাণ তদপেক্ষাও বৃদ্ধির প্রতি মনোনিবেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

লোক-গণনার রিপোর্টটি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১৯৫১ সালের লোক-গণনায় যে সকল

তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে উহাতে তৎসমুদয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং উহার ভিত্তিতে আগামী ৩০ বৎসরের অবস্থাও অনুমান করা হইয়াছে।

বিগত লোক-গণনায় সংগৃহীত তথ্যতালিকা পর্যালোচনা এবং গত ৩০ বৎসরের অবস্থায় সহিত উহার তুলনাক্রমে শ্রীগোপালস্বামী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিগত ৩০ বৎসরে লোকে যেভাবে খাদ্য পাইয়াছে, আগামী ৩০ বছরেও যদি সেইভাবে খাদ্য পায় তাহা হইলে ভারতের লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালে প্রায় ৩৬ কোটি হইবে, ১৯৬১ সালে ৪১ কোটি, ১৯৭১ সালে ৪৬ কোটি এবং ১৯৮১ সালে ৫২ কোটিতে দাঁড়াইবে।

যন্ত্রাদির সাহায্যে দেশে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রকার সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনার পরও সেন্সাস কমিশনার এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খাদ্যের সরবরাহ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে—এইরূপ অনুমান না ও টিকিতে পারে। দেশে খাদ্য ঘাটতি এবং উহার পরিণতিতে খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে। এইরূপ ঘটিলে ১৯২১ সালের পূর্ববর্তী ২০ বৎসরে দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়া যেভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহারই পথ পুনরায় উন্মুক্ত হইতে পারে।

সরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসরণে খাদ্যশস্যের ব্যবসায় চালাইয়া গেলে এইরূপ ব্যাপার হয়ত ঘটিতে পারিবে না। ফলতঃ স্থায়ীভাবে খাদ্য ঘাটতি এড়াইবার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা যথোপযুক্তভাবে কার্যকরীকরণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাইবে। এই জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে, আগামী ১৫ বৎসরে ঐ বিষয়ে আরও বেশী তৎপর হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে মৃত্যুর হারের সহিত জন্মের হারের সামঞ্জস্য বিধানের মোটামুটিভাবে ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হইবে। উহার ফলে জনসংখ্যা প্রায় একই অবস্থায় থাকিয়া যাইবে।

যে সকল মায়ের তিনটি অথবা তাঁহার বেশী সন্তান হইয়াছে এবং অন্ততঃ একটি সন্তান জীবিত আছে, তাহারা সকলে অথবা বেশীর ভাগ দম্পতি যদি আরও সন্তানের জন্মদান হইতে বিরত থাকেন তাহা হইলে ফললাভ করা সম্ভব হইবে। শ্রীগোপালস্বামী বর্তমানে বার্ষিক উৎপন্ন ৭০ কোটি টন কৃষিজাত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৯৪ কোটি টন উৎপাদনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্তমানের শতকরা ৪০ ভাগ অপরিণামদর্শী মাতৃত্বের সংখ্যা হ্রাস করিয়া শতকরা ৫ ভাগের কম দাঁড় করাইতে হইবে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পূর্বাহ্নেই মাতৃ-সদন এবং শিশুকল্যাণ-সদন স্থাপন এবং স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে অপরিণামদর্শী মাতৃত্বের নির্দিষ্ট সংখ্যার হ্রাস সম্ভব হইবে না। ইহা কষ্টকর হইলেও সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়। কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অপরিণামদর্শী মাতৃত্ব হ্রাসের প্রশ্নকে যদি সমান অগ্রাধিকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে লোকসংখ্যা ৪৫ কোটি বেশী হইবার পূর্বেই এই দুইটি বিষয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে এবং মোট জনসংখ্যা ৪৫ কোটির কাছাকাছি স্থিতিলাভ করিবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বিশ্লেষণক্রমে ১৯২১ সালকে রিপোর্টে বিরাট বিভাগ-রেখারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। ১৯২১ সালের পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারার মধ্যে বিরাট প্রভেদ রহিয়াছে। ১৯২১ সালের পূর্ববর্তী ৩০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা ১ কোটি ২২ লক্ষ বৃদ্ধি পায়, অপরপক্ষে, ১৯২১ সালের পরবর্তী ৩০ বৎসরে জনসংখ্যা ১১ কোটি বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬ কোটিতে

দাঁড়ায়। ফলে, ১৮৯১ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত প্রতি দশ বৎসরে জনসংখ্যা ১০৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরপক্ষে ১৯২১ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে ১২ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে। এই দুই সময় কালের মধ্যে এইরূপ বিস্ময়কর পার্থক্যের কারণ এই যে, ১৯২১ সালের পূর্বে বহুলোক দুর্ভিক্ষ ও মড়কে মরিয়াছে, অপরপক্ষে ১৯২১ সালের পর একমাত্র ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ ছাড়া আর দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে নাই।

১৯২১ সালের পূর্ববর্তী তিনটি দশকে বার-কয়েক দুর্ভিক্ষাবস্থা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী দেখা দিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক ধারায় নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। ১৯২১ সাল পর্যন্ত এই সকল স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা চালু হয়। তাহা ছাড়া কৃষি ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়ে প্রকৃতিও ভারতের প্রতি সদয় ছিল এবং ১৮৯১ সাল হইতে ১৯২০ সালের মধ্যে অনাবৃষ্টি যেভাবে দেখা দিয়াছে, ১৯২১ হইতে ১৯৫০ সালের মধ্যে তত ঘন ঘন দেখা দেয় নাই।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে, বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে ১৯২১ সালের পর কার্য সম্পাদনের পদ্ধতির একটা দুঃখজনক বৈপরীত্যের সূচনা হইয়াছে, কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষও আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার একটা নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে।

ভারতের জনসংখ্যার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের জনসংখ্যার তুলনা করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম ইউরোপে মৃত্যুর হার ভারতের তুলনায় কম হইলেও তথায় ভারতের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত কম; কারণ তথায় জন্মের হারও অপেক্ষাকৃত কম।

জনসংখ্যা সম্পর্কে বিলাতের রয়্যাল কমিশনের রিপোর্ট এবং অন্যান্য স্থানে অনুরূপ তদন্তের বিষয় উল্লেখ করিয়া ভারতীয় সেন্সাস কমিশনারের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক ব্যক্তির জন্মনিরোধক পদ্ধতি অবলম্বনই জন্মের হার হ্রাসের হেতু। জনগণ ইচ্ছা করিলে সন্তান উৎপাদনের হার অধিক রাখার সহিত পুষ্টির মান ও জীবনযাত্রার অন্যান্য মানের উন্নয়ন করিতে পারিলে কোন প্রকারে সামঞ্জস্যবিহীন হইবে না।

এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে, জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং জীবিত ও মৃতের সংখ্যা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জাতক ও জীবিতের সংখ্যা অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে—তাহার অর্থ এই যে, মৃত্যুর হার কমিয়া যাইতেছে। প্রসূতিদের সংখ্যাতত্ত্ব পর্যালোচনায় দেখা যায়, জন্মনিরোধক পন্থা প্রয়োগ না করিলে পূর্বের তুলনায় জন্মের হারে বিশেষ কোনও তারতম্য হইবে না। বর্তমানে বহু মৃত্যুর কারণ হইতেছে প্রতিরোধযোগ্য কতকগুলি রোগ। অতএব ভবিষ্যতে যে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইবে, ইহাও আশা করা যায়। অতএব ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ৩০ বৎসরে জনসংখ্যা ১৯২১-৫০ সালের তুলনায় অনেক দ্রুততর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ১৯২১-৫০ সালের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম করিয়া ধরিলেও ১৯৬১ সালে লোকসংখ্যা ৪১ কোটি, ১৯৭১ সালে ৪৬ কোটি এবং ১৯৮১ সালে ৫২ কোটি হইবে।

দুইটি সম্ভাব্য পরিণতি যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে ১৯৮১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৫২ কোটি। দুইটির মধ্যে প্রথম পরিণতিটি হইবে শোচনীয়। তাহা হইতেছে এই—খাদ্যাভাব যদি অনবরত চলিতেই দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে এবং ১৯৪৩ সালে বাংলায় যেমন খাদ্য সরবরাহ বানচাল হইয়া গিয়াছিল, ঠিক তেমন অবস্থা দেখা দিবে।

ইহাতে মৃত্যুর হারও পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আর দ্বিতীয় পরিণতিটিকে অত্যাশ্চর্য বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে। তাহা হইতেছে ভারতীয় নারীগণ কর্তৃক স্বেচ্ছায় জন্ম-নিরোধের পন্থা অবলম্বনপূর্বক নবজাতকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। যদি প্রথমোক্ত দুর্গতি না ঘটে এবং দ্বিতীয়োক্ত অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দানপূর্বক গণনার মধ্যে আনা না হয়, তবে ভারতে ১৯৮১ সালে অন্যূন ৫২ কোটি লোককে খাওয়াইবার উপযোগী কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু ইঁহাতে আশানুরূপ ফললাভ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অতএব সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, আমাদিগকে উপরোক্ত অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটির উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং অতিদ্রুত কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই পন্থাটিকেও কার্যকরী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

যদি বর্তমানের ঘাটতি পূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে ৩৩ কোটি লোককে খাদ্য ও পরিধেয় সরবরাহ করিবার জন্য ভারতের সাড়ে সাত শত বার্ষিক টন প্রয়োজন হইবে। বর্তমানের হার যদি বজায় রাখিতে হয়, তবে এই প্রয়োজনীয় পরিমাণকে বর্ধিত করিয়া ১৯৬১ সালে সাড়ে আট শত টন, ১৯৭১ সালে ৯৬০ বার্ষিক টন, ১৯৮১ সালে ১০৮০ বার্ষিক টন করিতে হইবে। অতএব ১৯৬১ সালের পূর্বে শতকরা ২১ ভাগ, ১৯৭১ সালের পূর্বে শতকরা ৩৭ ভাগ এবং ১৯৮১ সালের পূর্বে শতকরা ৫৪ ভাগ বর্ধিত করিতে হইবে।

সেচ এলাকা সম্প্রসারণ

কৃষি সম্পর্কিত উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ সেচ এলাকা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারতে সমগ্র আয়তনের শতকরা ১৫.৫ অংশে সেচ ব্যবস্থায় আবাদ করা হয়। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর মধ্যে এরূপ ব্যাপক হার আর কোথাও নাই; আর বিশেষভাবে একমাত্র চীন ছাড়া এত অধিক হারে জমি সেচ আর কোথাও হয় না। এক শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ শাসনে ১৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ১৬০ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে সেচের পরিকল্পনাগুলির ফলে যে পরিমাণ বর্ধিত উৎপাদন পাওয়া যাইবে, তাহা হইবে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশেরও কম। ছোটখাট সেচ পরিকল্পনাগুলিতে ১১৩ লক্ষ একর জমিতে সিঞ্চন হইবে। বড়-ছোট উভয় ধরনের পরিকল্পনার ফলে যে উৎপাদন দাঁড়াইবে, তাহা হইবে ১৯৬১ সালের প্রয়োজনের মাত্র দুই-পঞ্চমাংশ।

অধিক মাত্রায় সার দেওয়া প্রভৃতি অন্যান্য উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থাগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, আমরা যথেষ্ট সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই অগ্রগতির অসম্ভাব্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইতেছি। এই সকল উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা গ্রহণ সত্ত্বেও মাত্র .৪৯ লক্ষ বার্ষিক টন উৎপাদিত হইবে। কিন্তু এই বৃদ্ধিও ১৯৭১ সালের পূর্বেই ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় কম হইবে এবং ১৯৬০ সালে দেশের লোকসংখ্যা ৪৫ কোটি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিছক বর্তমান ঘাটতি পূরণ করিতে পারিবে।

বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে যে, অবারিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া চলিবার জন্য আমাদের চেষ্টা কোনও এক পর্যায়ে গিয়া ব্যর্থ হইবেই। লোক সংখ্যা ৪৫ কোটির অধিক হইলেই এই বিপর্যয় দেখা দিবার আশঙ্কা আছে।

ভ্রান্ত ধারণার নিরসন: জন্ম নিয়ন্ত্রণই একমাত্র প্রতিকার

ব্যাপক শিল্পায়ন ও খাদ্য আমদানী, এই দুইটি ব্যবস্থা একত্রে দেশের সমস্যা সমাধান করিতে পারে,

এইরূপ অভিমতকে বানচাল করিয়া দিয়া রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইতিহাস হইতে ভুল শিক্ষালাভ করিলেই এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। বিগত শতকে বিশ্বের যে সকল ঘটনা বৃটেন ও ইউরোপকে এই পথে সাফল্য অর্জনে সাহায্য করিয়াছিল, সেইরূপ অবস্থা বর্তমানে আর নাই। অতএব এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কোনও একটা পন্থা আবিষ্কার করিতেই হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় এই ব্যাপারে অন্যান্য দেশে যেমন ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস আছে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মনেই তাহা নাই। ধর্ম, নীতি ও পারিবারিক জীবনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াও একথা আমাদেব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সঙ্কটের কথা বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি লইয়া জন্ম-নিরোধ সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে।

অনেকে বলেন, জন্ম-নিরোধের কোনও প্রয়োজন নাই। খণ্ড খণ্ড জমির একীকরণ এবং কারিগরি বিদ্যার প্রচলন—এতদুভয়ের দ্বারাই খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ধারণা আসল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিজ্ঞান যে মানুষের হাতে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৃত্যু সংখ্যা হ্রাসের উপায় দিয়াছে তাহাই নহে, প্রয়োজনমত জন্মের সংখ্যা হ্রাসেরও উপায় দিয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ হওয়া উচিত। কৃষি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সহিত জন্ম-নিরোধ সংক্রান্ত অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে এক করিয়া ফেলা কোনক্রমেই উচিত নহে।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শুধু যে প্রয়োজনীয় তাহাই নহে, সরকার যদি ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ দ্রুত কার্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। জন্মের হার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, যেন উহা মৃত্যুর হার ছাড়াইয়া না যায় এবং এইভাবে লোকসংখ্যা গড়-পড়তায় সমানই থাকিয়া যায়।

কয়টি সন্তান হইলে ভাল হয়?

রিপোর্টে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক দম্পতীর সর্বাধিক তিনটি করিয়া সন্তান হইলেই তাঁহারা জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি না করিয়া পারেন। ইহার অধিক সংখ্যক সন্তান যে সকল নারীর হইবে, তাঁহারা এই পরিস্থিতিতে দায়িত্বহীন মাতৃত্বের অপরাধে অপ-রাধিনী হইবেন। দায়িত্বহীন মাতৃত্ব নিরোধ হইলেই জন্মের হার হাজার করা ৪০ হইতে হ্রাস পাইয়া হাজার করা ২৩ দাঁড়াইবে। বর্তমানে এক হাজারে ২৭ জনের মৃত্যুর মধ্যে ২৭টি শিশুই থাকে পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক। জন্মের হার হ্রাস পাইলে তদনুপাতে এই মৃত্যুর হারও হ্রাস পাইয়া ৬-তে দাঁড়াইবে। এইভাবে মোট মৃত্যুর হার হাজার-করা ২৭ হইতে হ্রাস পাইয়া ১২-তে নামিয়া আসিবে। এই হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি দশকে জন্মের হার শতকরা ১৩ হইতে হ্রাস পাইয়া প্রতি দশকে শতকরা ১-এ দাঁড়াইবে। প্রসূতি ও নবজাতকদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণাদি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা সংগঠনের অপেক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। স্বাস্থ্যোন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচীর মধ্যে প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ সাধনের অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া উহাকে সেচ কার্যের মতই গুরুত্ব দান করিতে হইবে।

পুস্তক পরিচয়

ক্ষয়রোগ কথা—ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী প্রণীত। প্রকাশক—নিউ গাইড, ১২ কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲।

সাময়িক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপক্রমণিকারূপে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক চিকিৎসক সমাজে বিশেষ সুপরিচিত; ক্ষয়রোগবিশেষজ্ঞ বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও বহুদর্শী চিকিৎসাব্রতী জনসাধারণ্যে সমাজকল্যাণমূলক জ্ঞানবিস্তারের কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা জাতির শুভ সূচনা করে।

ভাষা সম্বন্ধে লেখক বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানির ভাষা সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-সিঞ্চিত হওয়ায় লেখকের বক্তব্য সহজেই পাঠকের হৃদয়স্পর্শ করে, আলোড়ন তোলে।

বাঙ্গালীর পূর্বগৌরবের অনেক লাঘব হইয়াছে। "সহজে বাঙ্গালী জাতি অলস বা ছোট কাজ করতে নারাজ"—এ ধারণা যাঁহাদের বদ্ধমূল বা এই যাঁহাদের কৈফিয়ৎ, এই বইখানি তাঁহাদের পড়িয়া দেখা দরকার। পুষ্টিবিজ্ঞান, বিশেষতঃ ভারতীয় পুষ্টি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য ও বক্তব্যগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ব্যাধির উৎপত্তি ও বিস্তারের সহিত পারি-পার্শ্বিকতার নিবিড় সংযোগের সুনিপুণ বিশ্লেষণ সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণে বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে। দুরন্ত ক্ষয়রোগ জাতির জীবনকে বিধ্বস্ত করিতে বসিয়াছে; একক চেষ্টায় ইহার সামগ্রিক প্রতিরোধ কল্পনা করাও বাতুলতা। জাতিকে সমগ্রভাবে ইহার প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন সমাজচেতনা, আর এই সমাজ-চেতনা সম্পাদনের কালে আলোচ্য পুস্তকখানির দান শুধু অসাধারণ নয়—অপরিসীম। এইরূপ একখানি বইয়ের প্রচার যত বাড়ে, ততই দেশের কল্যাণ।

পুস্তকের মুদ্রণ পরিপাট্য ও সুসঙ্গত প্রচ্ছদ পরিকল্পনা প্রশংসনীয়।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য

"ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব, কখনও আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ে আদালত বিদেশে; সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এদেশের প্রিভি কাউন্সেলের রায় না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয়ত এই জীবনে দেখিব না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে।"

* * * *

"হে বঙ্গবাসী, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা এখন ভাবিয়া দেখ। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, অকূল জলধি এবং হিমাচল তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবী হইতে নিঃসম্পর্ক রাখিতে পারিবে না! তুমি কি বুঝিতে পার না যে, অতিমানুষী শক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন পরাক্রান্ত জাতির প্রতিযোগিতার দারুণ সংঘর্ষের মধ্যে তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছ? তুমি কি তোমার ক্ষীণশক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরজীবনের মত প্রবাহিত রাখিবে আশা করিতেছ? তুমি কি জান না যে, ধরিত্রীমাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি-জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ? প্রকৃতি-মাতার এই আপাত ক্রুর নির্ম্মম প্রকৃতিতেই তাঁহার স্নেহের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। রুগ্ন ও দুর্ব্বল কতকাল জীবনের যন্ত্রণা বহন করিবে? বিনাশেই তাহার শান্তি, ধ্বংসই তাহার পরিণাম। আসিরিয়া, বেবিলন, মিশর ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তোমার কি আছে, যাহার বলে তুমি জগতে চিরজীবী হইতে আকাঙ্ক্ষা কর? বোধ হয় পূর্ব্বপিতৃগণের অর্জ্জিত পুণ্য এখনও কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চিত আছে; সেই পুণ্য বলেই বিধাতা তোমার অবসন্ন মস্তক হইতে তাঁহার অমোঘ বজ্র সংহৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ একাদশ সংখ্যা

গঙ্গা ফড়িং

করে দেখ

গ্র্যাফোস্কোপ

ম্যাপ, ছবি বা নক্সা আঁকবার সময় তোমরা অনেকেই হয়তো খুব অসুবিধা ভোগ কর। অভ্যস্ত হলেও ভারতবর্ষ বা বাংলা দেশের একখানা ম্যাপ আঁকতে গলদঘর্ম হতে হয়; কাজেই কপি করা ছাড়া উপায় থাকে না। সাধারণ ছবির উপর পাতলা কাগজ চেপে তার উপর পেন্সিল বুলিয়ে কপি করার ব্যবস্থা তোমাদের জানা আছে—তাতে কিন্তু সব জিনিষ পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। এসব জিনিষ নিখুঁৎভাবে কপি করবার সহজ ব্যবস্থা হয়তো তোমাদের অনেকেরই জানা নেই। খুব সহজে এসব জিনিষ কপি করবার একটা ব্যবস্থার কথা বলে দিচ্ছি। করে দেখো—কত সহজে অথচ সুন্দরভাবে কপি করা যায়। কপি করবার এই যন্ত্রটাকে বলা হয়
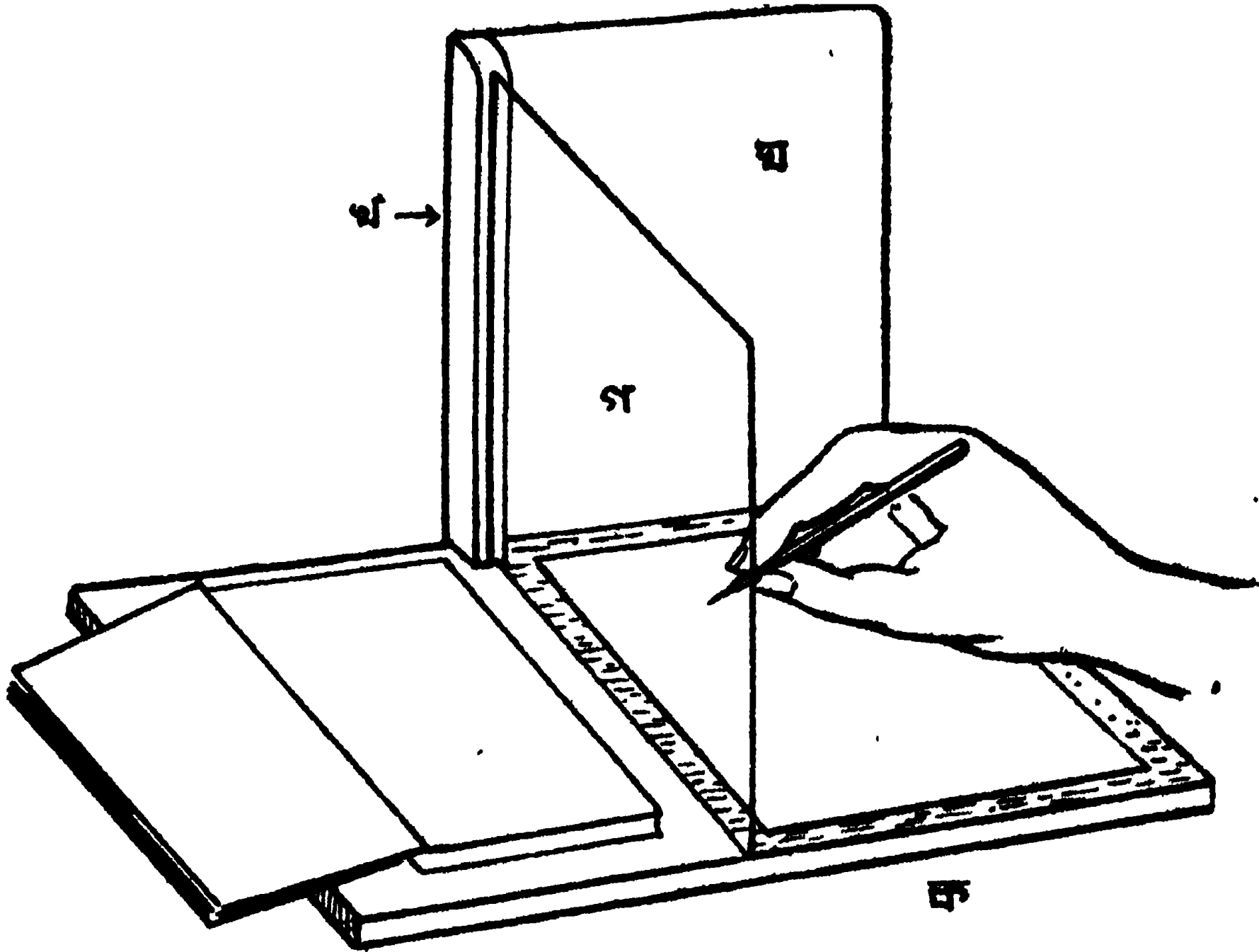
গ্র্যাফোস্কোপ। নিজের হাতেই এরূপ একটা গ্র্যাফোস্কোপ তৈরী করে নিতে পার, মাত্র কয়েক টুক্‌রা কাঠ আর একখানা চৌকা কাচ মাত্র দরকার হবে।

প্রায় ১৪ ইঞ্চি লম্বা ৯ ইঞ্চি চওড়া এবং আধ ইঞ্চি পুরু ক চিহ্নিত একখানা তক্তার লম্বা দিকটার মাঝামাঝি এক ইঞ্চি চওড়া এবং দশ ইঞ্চি লম্বা খ চিহ্নিত একখণ্ড কাঠ খাড়াভাবে বসিয়ে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। করাত দিয়ে এই খ চিহ্নিত লম্বা কাঠখানার সামনের দিকে বরাবর খানিকটা চিরে দাও। এই চেরা জায়গাটার মধ্যেই (গ চিহ্নিত)

পরিষ্কার একখানা চৌকা কাচ ছবির মত করে বসিয়ে দিতে হবে। ঘ চিহ্নিত তিন পিস্ কাঠের একখানা চৌকা বোর্ড ক চিহ্নিত তক্তার ধারের গায়ে কাচখানার সমকোণে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দাও। এবার ক চিহ্নিত তক্তা এবং ঘ চিহ্নিত বোর্ডের সামনের দিকটাতে ভূষা কালি বা অন্য কোন কালো রং মাখিয়ে নিলেই যন্ত্রটা তৈরী হলো। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও, কি ভাবে যন্ত্রটা তৈরী করতে হবে সেকথা বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না।

ম্যাপ অথবা যে বই থেকে কিছু কপি করতে চাও সেটাকে খাড়া কাচখানার বাঁ-দিকে রাখ। এর উপর বেশ আলো পড়া চাই। কাচের ডান দিকে থাকবে সাদা কাগজ, যার উপর ছবিটা আঁকবে। যে দিকে বই বা ম্যাপখানা রয়েছে সেদিক থেকে কাচের ভিতর দিয়ে তাকালেই দেখতে পাবে, সাদা কাগজের উপর ম্যাপ বা নক্সার পরিষ্কার ছবিটি পড়েছে। ডান হাতে পেন্সিল নাও, কাচের ভিতর দিয়ে পেন্সিল ও হাতখানাকে পরিষ্কার দেখা যাবে। এবার ছায়া-রেখার উপর পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর দাগ বুলিয়ে যাও, দেখবে অবিকল ম্যাপ বা নক্সাটি এঁকে ফেলেছ। কিন্তু এর একটা অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, তোমার আঁকা ছবিখানা হবে উল্টো। কিন্তু অতি সহজেই এই ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে। কাগজখানার তলায় একখানা কার্বন পেপার চিৎ করে রেখে পেন্সিল বা অন্য কোন সূক্ষ্মমুখ শলাকা দিয়ে সাদা কাগজের উপর দাগ বুলিয়ে গেলেই কার্বন পেপারের দরুণ কাগজের অপর পৃষ্ঠে ঠিক ছবিটি অঙ্কিত হয়ে যাবে। কাগজ-খানাকে উল্টালেই দেখবে, সোজা ছবিই হয়েছে। —গ—

জেনে রাখ

আবিষ্কারের কাহিনী

ডিপথেরিয়া প্রতিবিষ

১৮৮৮ সালে ইউরোপে ডিপথেরিয়া মহামারী আকারে দেখা দেয়। ডিপথেরিয়া রোগের ফলে শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে গেল। শোকার্ত জননীদের চোখের জল মোছাবার কোনও রকম প্রতিকার নেই। পাস্তুরের নিকট অশ্রুসিক্ত জননীদের চিঠি আসতে লাগলো, সন্তানদের বাঁচাবার জন্যে। পাস্তুর কিন্তু নিরুপায়। ডিপথেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার কোনও জিনিষই তাঁর কাছে নেই; তাছাড়া বার্ধক্য এসে তাঁকে অক্ষম করে ফেলেছে। পাস্তুরের ক্ষোভের সীমা থাকে না।

এর চার বছর আগের কথা। রবার্ট ককের ছাত্র লোয়েফার ডিপথেরিয়া রোগের

জীবাণু নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, 'ক্লেব' জীবাণু দ্বারা ডিপথেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয়। একটা জিনিষ তাঁর লক্ষ্য এড়িয়ে গেল না যে, জীবাণুর অস্তিত্ব ডিপথেরিয়া রোগগ্রস্ত জীবের সারা দেহে পাওয়া যায় না। জীবাণু ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে তিনি নতুন জীবের দেহে রোগ সংক্রামিত করেন। দেখতে পেলেন যে, রোগ জীবাণু শুধুমাত্র ইন্‌জেক্‌শনের জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে।

খুব বিস্ময়ের ব্যাপার! জীবাণুর সংখ্যা রোগীর দেহে বেড়ে যায় না অথচ পেশী এবং হৃদ্‌যন্ত্র বিকল করে রোগীকে ধ্বংস করে ফেলে। মরণ ডেকে আনবার ক্ষমতা এই জীবাণুর অন্যান্য যে কোনও ভয়াবহ রোগ-জীবাণুর সমান—লোয়েফার তাঁর সহকারীকে বলেন—আর কোনও রোগ-জীবাণু বোধহয় এরকমভাবে কাজ করে না।

—তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, অন্যান্য রোগ-জীবাণুর মত ডিপথেরিয়া জীবাণু দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয় না; কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রকে অবশ করে ফেলে।

—নিশ্চয়ই রোগ-জীবাণু দেহের ভিতর বিষ সৃষ্টি করে রক্তস্রোত বিষাক্ত করে··· বলতে বলতে সহকারী এমিল রক্‌স্ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

ইউরোপের ডিপথেরিয়া মহামারীর সময় এমিল রক্‌স্ পাস্তুরের গবেষণাগারে ডিপথেরিয়ার সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ডিপথেরিয়া জীবাণু দেহের ভিতর বিষ সৃষ্টি করে রোগীর মৃত্যু ডেকে আনে।

সহকারী ইয়ারসিনের সঙ্গে রক্‌স্ কাজ করে চলেন। এমিল রক্‌স্ একদিন ডিপথেরিয়া জীবাণু কালচার করে রস সৃষ্টি করলেন। তারপর জীবাণুগুলিকে রস থেকে আলাদা করলেন।

—সিরিঞ্জটা ষ্টেরিলাইজ করা রয়েছে।

—আবার ষ্টেরিলাইজ করে নাও, এমিল রক্‌স্ উত্তেজিত হয়ে বলেন।

অল্প কয়েক ঘন সেন্টিমিটার রস একটি গিনিপিগের দেহে প্রবেশ করানো হলো। রক্‌সের মনে উৎসাহের প্রাবল্য দেখা যায়; কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো তিনি প্রমাণ করতে পারবেন তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়।

চারদিন কেটে গেল। গিনিপিগটি সুস্থ দেহেই চলাফেরা করছিল। রক্‌স্ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন। তথাপি আরও খানিকটা জীবাণু-রস প্রবেশ করানো হলো। কয়েকদিন কেটে গেল; কিন্তু কিছুই হলো না। এমিল রক্‌স্ বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। স্নায়বিক বিপর্যয়ে তিনি মরিয়া হয়ে উঠলেন। ৩৫ ঘন সেন্টিমিটার জীবাণু-রস তিনি ইন্‌জেক্‌শন দিলেন একটি গিনিপিগের দেহে।

পরের দিন গিনিপিগটি ডিপথেরিয়া রোগাক্রান্ত হলো। পাঁচ দিন পরে প্রাণীটি মারা গেল। রক্‌সের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত হলো—ডিপথেরিয়া জীবাণু বিষ সৃষ্টি করে রোগীকে মেরে ফেলে। কিন্তু রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা হলো না কিছুই।

রবার্ট ককের গবেষণাকক্ষের কাছাকাছি কাজ করতেন তাঁর শিষ্য এমিল বেরিং। তিনি কোনও রাসায়নিক যৌগিক তৈরী করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন, যার সাহায্যে ডিপথেরিয়া রোগের প্রতিকার সম্ভব।

একদিন ডিপথেরিয়া রোগগ্রস্ত একটি গিনিপিগের দেহে আইয়োডিন ট্রাই-ক্লোরাইড নামক একটি রাসায়নিক যৌগিক ইন্‌জেক্‌শন করেছিলেন। কয়েকদিন পরে প্রাণীটি রোগমুক্ত হলো। আইয়োডিন্ ট্রাইক্লোরাইডের ডিপথেরিয়া ধ্বংস করবার ক্ষমতা বিদ্যমান; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীদেহে দূষিত ক্ষত সৃষ্টি করে। তাই তিনি আয়োডিন ট্রাইক্লোরাইড দিয়ে রোগ প্রতিকার করবেন বলে আশা করেন নি।

বেরিং-এর মনে হলো একটা সধারণ জনপ্রবাদের কথা। লোকে বলে, একবার ডিপথেরিয়া-মুক্ত হলে কোনও শিশু পুনরায় ঐ রোগগ্রস্ত হয় না। রোগমুক্ত প্রাণী বেরিং-এর পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে। তাই তিনি সেটা নিয়ে পরীক্ষা করবেন, স্থির করলেন।

—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, এই প্রাণীটি অনাক্রম্য?—বেরিং তার সহকারী ফ্রাঙ্কল্‌কে বলেন।

—কেন হবে না?

—সেটা ঠিক—সিরিঞ্জে খানিকটা ডিপথেরিয়া জীবাণু-রস ভর্‌তে ভর্‌তে বেরিং বলে চলেন।

রোগমুক্ত গিনিপিগের দেহে জীবাণু-রস প্রবেশ কারানো হলো। কয়েকদিন পরেও গিনিপিগটি সুস্থ দেহেই চলাফেরা করতে লাগলো। গবেষণার ফলে বেরিং-এর চোখে সফলতার আলো দেখা দিল।

এর পর সেই গিনিপিগের দেহ থেকে খানিটা রক্ত বের করে নিলেন। রক্ত কোষগুলি আলাদা করে রক্ত-রস প্রস্তুত করলেন। সেই প্রতিবিষ রক্ত-রসে (Anti-toxin Serum) খানিকটা ডিপথেরিয়ার বিষ মিশিয়ে দিলেন, যাতে সাধারণ আক্রম্য পশুর দেহে ডিপথেরিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞানাগারের নতুন জীবের উপর মিশ্রিত রক্ত-রস প্রবেশ করানো হলো। প্রাণীটি রোগাক্রান্ত হলো না। ডিপথেরিয়া প্রতিবিষের আবিষ্কার হলো এবং প্রমাণিত হলো তার সক্রিয়তা। বেরিং আরও পরীক্ষা করে তার প্রতিপাদ্য বিষয়টার সত্যতা নিরূপণ করেন।

১৮৯০ সালে জার্মান মেডিক্যাল জার্নালে জাপানী সহকর্মী কিটাস্পাটো-এর সঙ্গে এমিল. বেরিং ডিপথেরিয়া এবং ধনুষ্টঙ্কারের অনাক্রম্যতা সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন।

তাঁরা প্রমাণ করেন যে, কোনও জীবের ডিপথেরিয়া রোগের অনাক্রম্যতা নির্ভর করবে, তার কোষবিহীন রক্তের বিষ জাতীয় (toxin) পদার্থকে ধ্বংস করবার ক্ষমতার

উপর। যে সমস্ত জীবের অনাক্রম্যতা কম তাদের দেহে প্রতিবিষ (Anti-toxin) প্রবেশ করিয়ে রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যেতে পারে।

মনুষ্যদেহে ডিপথেরিয়া প্রতিবিষ কি রকম কাজ করে তার পরীক্ষা আরম্ভ হলো। প্রথমে গিনিপিগের রক্ত-রস থেকে তৈরী প্রতিবিষ ব্যবহৃত হতে লাগলো। তারপর হলো ভেড়ার রক্ত থেকে ; কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না।

ডিপথেরিয়া রোগের প্রতিকারের শেষ পর্যায়ে এমিল রক্স্ এ কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি ঘোড়ার রক্ত দিয়ে প্রতিবিষ তৈরী করেন। তাঁর ধারণা হলো যে, এতেই ডিপথেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করা যাবে।

১৮৯৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি। এমিল রক্স্ প্যারিসের শিশু হাসপাতালে এলেন ঘোড়ার রক্ত থেকে তৈরী প্রতিবিষ পরীক্ষার জন্যে। ৪৪৮টি রোগীকে তিনি ইন্‌-জেক্‌শন দিলেন। ৩৩৯ জন বেঁচে উঠলো।

সে বছর সেপ্টেম্বরে বুডাপেষ্টের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মহাসভায় ঘোষিত হলো রক্‌স্, বেরিং, ইয়ারসিন এবং কিটাস্পাটোর যুক্তগবেষণার ফলাফল।

ডিপথেরিয়ার প্রতিবিষের জয় হলো।

পৃথিবীর সর্বত্র রক্‌স্ এবং বেরিং লক্ষ লক্ষ জননীর চোখের জল মুছিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন নতুন ওষুধ নিয়ে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

খাদ্যপ্রাণ-ডি

রিকেট-প্রতিরোধী ভিটামিনের অনুসন্ধান আধুনিক জৈব-রাসায়নিকদের কাছে একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যতদূর মনে হয়, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে Troussean-ই প্রথম কড্‌লিভার তেল দিয়ে রিকেটের চিকিৎসা করেন। তার বহুকাল পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে Huldchinsky পারদ-বাষ্পের বাতির বেগনীপারের আলোর সাহায্যে রিকেটের রোগী সুস্থ করেন। বছর দুই পরে হেস ও অ্যাঙ্গার নামে দুজন বিজ্ঞানী পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, সৌররশ্মিও রিকেট-প্রতিরোধী।

ভিটামিনের সাধারণ নামকরণের তালিকায় রিকেট প্রতিরোধী খাদ্যপ্রাণকে বলা হয় ভিটামিন-ডি। রসায়নের বিচারে ভিটামিন-ডি'র দুটি প্রকার আছে বলে মনে করা হয়। এদের মধ্যে ডি$_2$, ডি$_3$ ও ডি$_4$ ই প্রধান। তবে কর্মক্ষমতায় ভিটামিন-ডি বা ক্যালসিফেরলই এদের সেরা। গোষ্ঠীগত ভাবে সব কটিই ষ্টেরল। সূর্যের আলো কিংবা বেগনীপারের আলোয় আর্গষ্টেরল থেকে অতি সহজে ক্যালসিফেরল তৈরী

হয়। সেজন্যে বহু বিজ্ঞানী আর্গস্টেরলকে প্রাগ-ভিটামিন-ডি বলে থাকেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙের ছাতা থেকে সর্বপ্রথম এই ষ্টেরলটিকে উদ্ধার করা হয়।

চর্বিতে দ্রবণীয় যে কটি খাদ্যপ্রাণ আছে তাদের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ-ডি একটি। অ্যালকোহল ইত্যাদি চর্বি-দ্রাবক পদার্থগুলিতেও ভিটামিন-ডি দ্রবণীয়। উত্তাপ বা বাতাসের সংস্পর্শে এর কর্মক্ষমতা নষ্ট হয় না, কাজেই রান্নার সময়ে খাদ্যপ্রাণ-ডি সমন্বিত উপাদানগুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত সতর্কতা নিষ্প্রয়োজন।

কড্, হ্যালিবাট ইত্যাদি সামুদ্রিক মাছের যকৃৎ-নিষ্কাশিত তেলেই ভিটামিন ডি-এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। মাখন, দুধ বা ডিমের কুসুমেও ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ-ডি'র সবচেয়ে বড় কাজ হলো রিকেট প্রতিরোধ করা। দু-বছরের কম বয়স্ক শিশুদেরই সচরাচর এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

রিকেট রোগের প্রধান উপসর্গ হলো—হাড়ের ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্তি। আমাদের দেহের অস্থিসমূহের কাঠিন্য মূলতঃ ঐসব পদার্থগুলির জন্যেই হয়ে থাকে। ঐগুলির অভাবে হাড় নরম হয়ে গিয়ে তাতে নানারূপ শৈথিল্য দেখা দেয়; ফলে হাত-পা বেঁকে যেতে থাকে এবং উপযুক্ত সাবধনতা অবলম্বন না করলে শরীরের আকৃতি অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায়। এই দুষ্ট রিকেট রোগের প্রধান প্রতিষেধক হলো ভিটামিন-ডি। এর অভাবে রক্তের ক্যালসিয়ামও মল-মূত্রে নিঃসারিত হতে থাকে। সূর্যের আলোয় দেহের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ-ডি প্রস্তুত হতে পারে অতি সহজে। আমাদের দেশে তাই নবজাত শিশুদের গায়ে তেল মাখিয়ে রৌদ্রে রাখবার প্রথা আছে। প্রাপ্তবয়স্কেরাও এই রোগ থেকে সবসময়ে মুক্তি পান না। ভারতের পর্দানশীন মুসলমান, উচ্চবংশীয় হিন্দুনারী এবং চীনাদের মধ্যেই সাধারণতঃ এই ব্যাধিটি লক্ষিত হয়। খাদ্যপ্রাণ-ডি ও রৌদ্রের অভাবই প্রধানতঃ এর কারণ।

দাঁতের গঠনের ক্ষেত্রেও ভিটামিন-ডি'র প্রয়োজন খুব সামান্য নয়। এর অভাবে দুধে-দাঁত পড়ে পাকা-দাঁত উঠতে দেরী হয়, দন্তসজ্জা কুৎসিত হয়ে ওঠে এবং দাঁতের এনামেলও সুগঠিত হয় না। খাদ্যে ভিটামিন-ডি'র অভাব ঘটলে চোয়ালের অস্থিতন্তুও ঘনীভূত হতে থাকে।

একজন প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে প্রতিদিন ঠিক কতটা ভিটামিন-ডি প্রয়োজন তা বলা শক্ত; তবে আড়াই-শ' ইউনিট যে যথেষ্ট, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তবে নবজাত শিশু ও তাদের মায়েদের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক-দেরও ঐরকম, প্রায় আড়াই হাজার ইউনিট।

খাদ্যে ডি-খাদ্যপ্রাণের আধিক্যও অনেক সময় ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। রক্তে

ক্যালসিয়াম ও 'ফস্‌ফরাসের পরিমাণ বাড়তে থাকে আর তার সঙ্গে দেখা দেয় মানসিক' ক্লান্তি, মাথাব্যাথা, গা বমি বমি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানা উপসর্গ। ভিটামিন-ডি গ্রহণ সম্পর্কে সকলেরই সতর্ক থাকা উচিত, নইলে বিপদের আশঙ্কা ঘটবে। তবে দু-একদিন কিছু কম বা বেশী হলে কোন ক্ষতি নেই।

শ্রীঅরূপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অম্ল দূরীকরণে ক্ষারের ব্যবহার

ক্ষারের সাহায্যে কিভাবে অম্ল দূর করে রসায়ন বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারা যায় সে কথাই বলছি।

অনেকেই জানেন, অম্ল আর ক্ষারে যেন সাপে নেউলে সম্বন্ধ। অম্ল দিয়ে ক্ষারকে এবং ক্ষার দিয়ে অম্লকে সহজেই নষ্ট করা যায়। তখন আর কারুর গুণের প্রাধান্য থাকে না। উভয়ে মিলে তৈরী হয় নানারকম নিস্তেজ লবণ। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিড + সোডিয়াম কার্বোনেট = সোডিয়াম সালফেট + জল + কার্বনডাইঅক্সাইড।

অনেকদিন পড়ে থাকলে তেল, ঘি ইত্যাদিতে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন পড়ে থাকলে গুড় টক হয়ে যায়। এসব নষ্টপ্রায় জিনিষকে ক্ষারের সাহায্যে কাজের উপযুক্ত করে নেওয়া চলে।

মাৎগুড় অনেকদিন পড়ে থাকলে ঈষ্ট প্রভৃতি জৈব পদার্থের ক্রিয়ায় ঐ গুড়ের খানিকটা শর্করা, অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিডের জন্যেই গুড় টক লাগে। ঐ গুড়কে অল্প জলে বেশ করে গুলে নিয়ে কিছু সোডি-বাইকার্ব মিশাতে হবে। তারপর ফুটিয়ে নিলেই ঐ গুড়ের টক স্বাদ অনেক কমে যাবে। এর কারণ, গুড়ের কিছুটা অ্যাসিড সোডার সঙ্গে মিশে সোডিয়াম লবণ তৈরী করে এবং এই লবণ গুড়ের পরিমাণের তুলনায় খুবই কম বলে গুড়ে খুব কম টক স্বাদ লাগবে। অবশ্য বেশী সোডা দিলে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাবে আর গুড়ে একটা বিশ্রী স্বাদ এসে পড়বে।

অনেক সময় তেল বা ঘি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে। একটি লোহার পাত্রে ঐ তেল বা ঘি রেখে তাতে অল্প কষ্টিক সোডার দ্রবণ মিশিয়ে ওয়াটার বাথের অভাবে জলের ভাপে গরম করতে হবে। তারপর দু-একদিন এক জায়গায় রেখে দিয়ে উপরের ঘি বা তেলটা ঢেলে নিলে তাতে কোন খারাপ গন্ধ থাকবে না। তেল বা ঘিয়ের মধ্যস্থিত ফ্যাটি গ্লিসারাইড জীবাণুর ক্রিয়ায় দুর্গন্ধযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই জন্যেই ঐ সব জিনিষে দুর্গন্ধ হয়। ঐ ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে কষ্টিক সোডার ক্রিয়ায়

সোডিয়াম লবণ তৈরী হবে। এই লবণ ঘি বা তেলের তলায় পড়ে থাকবে। সুতরাং ফ্যাটি অ্যাসিড দূর হওয়ার ফলে আর দুর্গন্ধ থাকবে না।

ঘরে বসে অনায়াসেই লেমোনেড তৈরী করে খাওয়া যায়। দু-ভাগ সোডি-বাইকার্ব ও এক ভাগ টারটারিক অ্যাসিড একত্রে মিশিয়ে শুক্‌নো এয়ার-টাইট শিশিতে রেখে দিতে হবে। ঐ মিশ্রণের এক চামচ এক গ্লাস (৭ আউন্স) জলে মিশালে সুন্দর লেমোনেড তৈরী হবে। এক্ষেত্রেও অম্ল আর ক্ষারের মিলন ঘটে।

আমাদের শরীরের কোন জায়গায় যদি অ্যাসিড লেগে যায় তবে সেখানে কিছু কাপড়-কাচা সোডা বা অন্য কোন ক্ষার দিলে অ্যাসিড ও ক্ষারে মিলে নিস্তেজ লবণ তৈরী করবে, সুতরাং অ্যাসিড আর ক্ষতি করতে পারবে না। শরীরের কোন স্থলে কড়া ক্ষার লেগে গেলে সেই জায়গায় কিছু জল মিশানো অ্যাসিড দিলে ক্ষার তত ক্ষতি করতে পারবে না।

অম্বল হলে আমরা সোডি-বাইকার্ব খাই। কারণ আমাদের পাকস্থলীর রসে প্রায় ২% হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। যদি এই রসে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকে তবেই অম্বল হয়। সোডা অথবা চুনের জল খেলে এই অতিরিক্ত অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায় ও হজম-ক্রিয়া সাধারণভাবে চলতে থাকে। এখানেও আমরা ক্ষারের সাহায্যে অম্লকে দূর করি। এভাবে অম্লের দ্বারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন অনেক জিনিষকে আমরা ক্ষার দিয়ে বাঁচাতে পারি।

শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌর চুল্লী

সূর্য-রশ্মি সংহত করে তার সাহায্যে রান্নার কাজ চালাবার জন্যে কিছু কাল পূর্বে আমাদের দেশে সৌর চুল্লী বা সান-কুকার নামে একপ্রকার যন্ত্র তৈরী হয়েছে—এ খবর হয়তো তোমরা সবাই শুনেছ। রিডিং গ্লাস, অর্থাৎ আতসী কাচের মধ্য দিয়ে সূর্য-রশ্মি সংহত করে আগুন জ্বালানো যায়—একথা তোমাদের অজানা নয়। রিডিং গ্লাস ছোট জিনিষ, তাতে সামান্য রশ্মিই সংহত হয়; কিন্তু যদি বড় প্যারাবোলিক মিরারের (অবতল দর্পণ) সাহায্যে আরও বেশী রশ্মি সংহত করা যায় তবে তার সাহায্যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদিও রন্ধন করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায়ই সৌর চুল্লী তৈরী হয়েছে। এখানে যে সৌর চুল্লীর ছবিটি দেখছ, সেটি আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয়েছে। ছাতার মত যে রশ্মি প্রতিফলকটিকে দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকেই সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে

উপরের দিকে একটা নির্দিষ্টস্থানে সংহত হয়ে প্রচুর তাপ উৎপাদন করে। এখানেই রন্ধনপাত্র রাখবার ব্যবস্থা আছে। সূর্যের স্থান পরিবর্তন অনুযায়ী প্রতিফলকটিকে

সূর্য চুল্লী

এদিক-ওদিক ঘোরানো চলে। প্রতিফলকটিকে ছাতার মত গুটিয়ে রাখা যায়।

সূর্যের আলো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই এতে রান্না করা চলে। এতে নাকি আধ ঘণ্টায় ভাত রান্না করা যায় এবং তরিতরকারী সিদ্ধ হতে প্রায় ২৫ মিনিট সময় লাগে।

বিবিধ

পোষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের দারিদ্র্য

ভারতের দারিদ্র্যের নৈরাশ্যকর চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া সেন্সাস কমিশনার ১৯৫১ সালের লোক-গণনা রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, স্বকীয় উপার্জনের উপর নির্ভরশীল প্রত্যেক ভারতীয় উপার্জনহীন অন্ততঃ আরও দুই ব্যক্তির ভরণপোষণ করিয়া থাকেন; তাহা ছাড়া, প্রতি তিনজন আত্ম-নির্ভরশীল লোকের মধ্যে গড়ে একজন অপর একজন উপার্জনকারী পোষ্যের আংশিক ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন। লোক-গণনার সুবিধার জন্য ভারতকে যে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে, তৎসমূহের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যত দিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন, লাভজনকভাবে কাজে লোক নিয়োগের সংখ্যা দক্ষিণ ভারতেই সর্বাপেক্ষা কম।

সেন্সাস রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে,

আলোচ্য বর্ষের পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, ভারতের পল্লীঅঞ্চলে পর্যন্ত যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

ভারতে প্রতি এক হাজার আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি স্বকীয় চেষ্টায় নিজেদের এবং আরও ২৫০৪ ব্যক্তির ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে প্রতি হাজার ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ১৫৪৭ জন এবং গ্রেট বৃটেনে ১২০৭ জন। মুখ্যতঃ ইহার কারণ এই যে, ভারতে শিশু ও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নাবালকদের শতকরা হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের তুলনায় অধিক। প্রতি এক হাজার আত্মনির্ভরশীল ও লাভজনকভাবে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির অনুপাতে ভারতে ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক পোষ্যের সংখ্যা ১৩১৭ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭০২ জন এবং গ্রেট বৃটেনে ৪৯৬ জন। তাহা ছাড়া, ভারতে কাজ করবার উপযোগী বয়সের লোকেরা বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম কাজ পাইয়া থাকে।

প্রতি হাজার লোকের মধ্যে কোন্ বৃত্তিতে কত লোক ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনে রত রহিয়াছে, তাহার তুলনামূলক হিসাব দিয়া রিপোর্টে যথাক্রমে উক্ত তিনটি দেশের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভারতে হাজার করা ১৫৩, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৫৬, বৃটেনে ৫৫৫ জন। অন্যান্য শিল্প ও চাকুরীতে যথাক্রমে ১৪১ জন, ৪১৬ জন এবং ৩৯৫ জন। শিল্পায়ন, চাকুরি সংস্থান প্রভৃতির দিক দিয়া উল্লিখিত তিনটি দেশের মধ্যে যে কতখানি প্রভেদ রহিয়াছে, উক্ত হিসাবে তাহাই প্রমাণিত হয়।

ভারতের ৩৫ কোটি ৬৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ কোটি ৪৪ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ২৯.৩ জন নির্ভরশীল উপার্জনকারী, পক্ষান্তরে ২১ কোটি ৪৩ লক্ষ লোক, অর্থাৎ শতকরা ৬০.১ জন কোনরূপ উপার্জন না করিয়াই পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

নির্ভরশীল উপার্জনকারীর সংখ্যা সহরাঞ্চলের তুলনায় পল্লীঅঞ্চলে অধিক। পল্লীতে নারীদের মধ্যেই এই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। নারীরা কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহাতে পরিবারের ভরণপোষণে অনেকটা সহায়তা হয়। পল্লীঅঞ্চলে শতকরা ১৬ জন নারী এবং ৭৯ জন পুরুষ নির্ভরশীল উপার্জনকারী; আর সহরাঞ্চলে শতকরা ৪.৫ জন নারী এবং ৪৬ জন পুরুষ নির্ভরশীল উপার্জনকারী।

ভারতে মোটামুটিভাবে পুরুষ রুটি-রুজীকারীদের সংখ্যা সহরাঞ্চলে শতকরা ৫১.৩ জন এবং গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪৯.৭ জন।

আঞ্চলিক হিসাব পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরুষ রুটি-রুজীকারীদের শতকরা সংখ্যা নিম্নোক্ত রূপ :— উত্তর ভারত—৫৪.৭; উত্তর-পশ্চিম ভারত—৫৩.১, মধ্যভারত—৫২.৪; পূর্ব ভারত—৪৯.১; পশ্চিম ভারত—৪৮.৭ এবং দক্ষিণ ভারত—৪৪.৭ জন। অতএব দেখা যায় রুটি-রুজীকারী পুরুষের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তর ভারতে, আর সর্বাপেক্ষা কম দক্ষিণ ভারতে।

শিশু জন্মের হার

রিপোর্টে প্রসঙ্গক্রমে শিশু জন্মের হারের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভারতে প্রতি বৎসর প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে ৪০ জন করিয়া শিশু জন্ম গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে ৮টি প্রথম প্রসবের, ১৬টি প্রথম বা দ্বিতীয় প্রসবের, ২৩টি প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রসবের এবং ১৭টি চতুর্থ বা তদূর্ধবার প্রসবের। এইরূপ দায়িত্বহীন মাতৃত্ব বা সন্তান প্রসবের হিসাব ধরিলে দেখা যায়, এই ব্যাপারের সংখ্যা ভারতে শতকরা ৪২.৮টি। ইহাই পৃথিবীতে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

ইহার তুলনায় উক্ত সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯.২টি, গ্রেট বৃটেনে ১৪.৩টি, ফ্রান্সে ১৯.৭টি এবং পশ্চিম জার্মেনীতে ১২.৩টি। এই সংখ্যা জাপানে আবার একটু বেশী, শতকরা ৩৩.৯টি।

ভারতীয় তণ্ডুল মিশন

জাপানের ধান-চাষের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের জন্য ভারত হইতে আগত প্রতিনিধি দল স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন। গত ১৪ সপ্তাহকাল তাঁহারা জাপানের সর্বত্র ঘুরিয়া কৃষকগণ যে পদ্ধতিতে চাষ করে তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহারা বিভিন্ন তণ্ডুল গবেষণা-কেন্দ্র, কৃষির যন্ত্রপাতি উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং গ্রাম্য সমবায় সমিতির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কটকস্থ কেন্দ্রীয় তণ্ডুল গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডাঃ পার্থসারথী, মাদ্রাজ রাজ্য সবকারের ধান্য-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম. বি. ভি. নরসিংহ রাও এবং বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রী এ. বি. শরণ—এই তিন জনকে লইয়া এই প্রতিনিধি দল গঠিত।

প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ পার্থসারথী বলেন যে, জাপানের ধানের চাষ ও গবেষণার ফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লইয়াই তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। এখানের অভিজ্ঞতা এবং ভারতে এখানকার চাষ-পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁহারা ভারত সরকারের নিকট বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করিবেন।

এখানকার ধান-চাষ সংক্রান্ত নিম্নের তিনটি বিষয়ে প্রতিনিধি দলের মনে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে—(১) সর্ববিষয়ে কৃষকদের সুবিধার্থ গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলির বহুমুখী কার্যকলাপ (২) গবেষণাগারে লব্ধ ফল কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং (৩) তণ্ডুল সম্পর্কে জাপানী কৃষি-বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং এই বিষয়ে উন্নতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রচেষ্টা।

প্রতিনিধি দল দেখিয়াছেন যে, এখানকার গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলি কেবল কৃষি-পণ্যের বিক্রয়, বণ্টন ইত্যাদি ব্যবস্থাই করে না, কৃষকদের সার এবং কৃষির সাজসরঞ্জামাদিও সরবরাহ করিয়া থাকে।

মাসাঞ্জোড় বাঁধ নির্মাণ ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

বিহারের সেচমন্ত্রী শ্রীরামচরিত্র সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি এক বৈঠকে মিলিত হইয়া ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁহারা মাসাঞ্জোড় বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ করিবার সময়-তালিকা এবং বাস্তুচ্যুত লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বিহারের রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় এবং দুই রাজ্যের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন।

উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ফলে বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলার ১২ সহস্রাধিক লোক বাস্তুচ্যুত হইবে। কার্যসূচী অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের জুন মাসের মধ্যে মাসাঞ্জোর বাঁধের নির্মাণকার্য শেষ হইবে। প্রকাশ, বিহার সরকার নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে জমির বদলে জমি লওয়ার জন্য বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদিগকে রাজী করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সব লোকের অধিকাংশকেই সাঁওতাল পরগণা জেলার রণেশ্বর থানা এলাকায় পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। এতদুদ্দেশ্যে পশ্চিবঙ্গ সরকার ঐ এলাকায় তিন হইতে চার হাজার একর পতিত জমি ও বনভূমি দখল করিয়া বসবাসের যোগ্য করিয়া তুলিবেন।

প্রকাশ, উভয় সরকার রণেশ্বরের সেচ পরিকল্পনার ব্যয়ভার ভাগ করিয়া বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পুনর্বাসনের জন্য যে জমি ব্যবহৃত হইবে সেই জমি সহ প্রায় ২০ হাজার একর

ভূমিতে সেচকার্য করা হইবে। যে সব লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে, তাহাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিদ্যালয়, মন্দির প্রভৃতি করিয়া দিতে হইবে।

বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ লোক প্রয়োজনীয় খাদ্য হইতে বঞ্চিত

অন্য জাতীয় ভৌগোলিক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত খাদ্যাভাবপীড়িত অঞ্চলের এক মানচিত্র অনুসারে জানা যায় যে, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক যথেষ্ট আহার্যদ্রব্য পায় না।

কিন্তু মানচিত্রে বলা হইয়াছে যে, উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা হইলে সকলে যথেষ্ট আহার্যদ্রব্য পাইতে পারে।

মানচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, সুদূর প্রাচীন দেশগুলির মধ্যে ভারত, সিংহল, চীন, ইন্দোনেশিয়া পাকিস্থান এবং ফিলিপাইন নিজেদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ নহে।

পশ্চিম গোলার্ধে কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার দুই-তৃতীয়াংশ লোক যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পায়।

পশ্চিম ইউরোপের পর্তুগাল, স্পেন, ইতালী এবং পূর্ব জার্মেনীর অধিবাসীরা প্রয়োজনারূপ খাদ্যদ্রব্য পায় না।

মস্কো হইতে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, সোভিয়েট রাশিয়ার অধিবাসীরা প্রয়োজনানুরূপ আহার্যদ্রব্য পায়।

গ্রীস, তুরস্ক, কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত, থাই-ল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, ফরমোজা, সোমালিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের লোকেরা প্রয়োজনা-নুরূপ আহার্যদ্রব্য পায়।

ভারতে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন প্রস্তুত

গত ১৯২৩ সালে ডক্টর ব্যান্টিং এবং বেস্টের সমবেত চেষ্টায় ডায়াবেটিস রোগের ঔষধ ইনসুলিন আবিষ্কৃত হয়। তদাবধি এই ঔষধটি ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। কিছুদিন হইল দুইটি সুবিখ্যাত বিদেশী প্রতিষ্ঠান যুক্তভাবে ভারতে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন প্রস্তুত করিতেছেন। ইহাদের নাম, অ্যালন অ্যাণ্ড হ্যানবেরি লিমিটেড এবং ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড। ভারতে ইহারা যে ইনসুলিন প্রস্তুত করেন তাহার নমুনা ইহারা নিজেদের লণ্ডনস্থ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন, যাহাতে লণ্ডনে এবং ভারতে প্রস্তুত ইনসুলিন একই গুণসম্পন্ন হয়।

সয়াবীন

১৯৫২ সালে পৃথিবীতে সয়াবীন জন্মিয়াছে ৬৬'৯০ কোটি বুশেল, ১৯৫০ সালে ইহা অপেক্ষা ১০ লক্ষ বুশেল কম ছিল; ১৯৫১ সালের পরিমাণ ৬৩'৪৯ কোটি বুশেল ছিল। ১৯৫২ সালে পরিমাণ হিসাবে ৩'৩৬ কোটি বুশেল বেশী হইয়াছে; বৃদ্ধির হার শতকরা ৫ ভাগ। আমেরিকা ও চীনেই অধিকাংশ চাষ হইয়া থাকে।

বি-সি-জি'র কারখানা

বি-সি-জি বা যক্ষ্মা-প্রতিষেধক ইঞ্জেকশনের নাম আজকাল অনেকেরই জানা আছে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র ভারতবর্ষেই এই ওষুধ তৈরীর একটি কারখানা আছে।

মাদ্রাজ সহরের এক জনবসতিবিরল অঞ্চলে এই বি-সি-জি তৈরীর কারখানা বা গবেষণাগারটি অবস্থিত। গবেষণাগারটি প্রতিষেধক-উৎপাদক একটি প্রতিষ্ঠানের (কিং ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ মেডিসিন) অঙ্গীভূত। ছোট একখানা পাকা বাড়ীর মধ্যে এই গবেষণাগারে প্রতিসপ্তাহে বি-সি-জি সিরাম উৎপন্ন হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। প্রতি সপ্তাহে ২০ লক্ষ ডোজ (এক মাত্রা ইঞ্জেকশন), বি-সি-জি তৈরী করে ব্রহ্ম, মালয়,

শ্যাম ও সিংহল এই চারটি দেশে সরবরাহ করা হয়; তাছাড়া ভারতবর্ষের নিজস্ব চাহিদা মিটাতে হয়।

আন্তর্জাতিক যক্ষ্মানিবারণী অভিযানের (ইণ্টারন্যাশনাল টিউবারকিউলোসিস ক্যাম্পেন) সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার সম্প্রতি মাদ্রাজে এই গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিষেধকরূপে বি-সি-জি'র ব্যবহারকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ভয়ঙ্কর রকমের যক্ষ্মাবীজাণুকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত নম্র করে নিয়ে সেই বীজাণু থেকে যক্ষ্মা-প্রতিষেধক (বি-সি-জি) ওষুধটি তৈরী করা হয়। মানুষের শরীরে এই ওষুধ (ইঞ্জেকৃশন-রূপে) প্রবেশ করাবার ফলে শরীরে ঐ রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মায়। কিন্তু ঐ ওষুধের মধ্যে যক্ষ্মাবীজের পরিমাণ অতটা থাকে না যাতে ইঞ্জেকৃশন দেবার ফলে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেটুকু বীজ শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, সেই বীজ শরীরের ভিতরে পাহারাদারের কাজ করে; যদি কখনো কারো শরীরে যক্ষ্মার বিষ বা জীবাণু এসে আক্রমণ করে তখনই এই পাহারাদার তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে' লড়াই সুরু করে দেয়।

হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, ভারতবর্ষে সহর অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যারা যক্ষ্মারোগে ভুগছেন, তাদের শতকরা ৯০ জনই আক্রান্ত হয়ে থাকেন ২০ বছর বয়সের ভিতরে।

বি-সি-জি তৈরী করবার নানাবিধ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। মাদ্রাজের গবেষণাগারে এই সব জিনিষ সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন আন্তর্জাতিক জরুরী শিশুরক্ষা তহবিল। গেল বছর তাঁরা যেসব জিনিষ পাঠিয়েছেন তার দাম হবে ১০ হাজার ডলার (৪৭ হাজার টাকা)। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর বিদেশে বি-সি-জি পাঠাবার জন্যে ৬০০ বাক্স মাদ্রাজের গবেষণাগারে সরবরাহ করে থাকেন। প্রতিটি বাক্সের মাপ হচ্ছে ৮ ইঞ্চি×৮ ইঞ্চি×২৪ ইঞ্চি এবং প্রতিটি বাক্সে প্রায় ২৫হাজার ডোজ করে ওষুধ থাকে। গবেষণাগারে তৈরী হবার পর বি-সি-জি দু-সপ্তাহ পর্যন্ত সতেজ থাকে। এই কারণে বিদেশে চালান দেবার কাজটা যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে হয়ে থাকে।

যেসব কেন্দ্র থেকে বি-সি-জি ইঞ্জেকৃশন দেওয়া হয় তাঁদের অনুরোধ অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে সাহায্য করা হয়। দিল্লীতে এইরূপ একজন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ যেসব কেন্দ্র আছে সেগুলি পরিচালিত হচ্ছে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রাদেশিক সরকার দ্বারা এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সহায়ক সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেলের উপদেশ অনুযায়ী।

পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা

আমেরিকায় পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তি কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন। বর্তমানে কয়লা, তেল, গ্যাস ও জল হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। অদূর ভবিষ্যতে ইহাদের স্থান পরমাণু গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া কমিশন আশা করেন।

যে যন্ত্র দ্বারা পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে তাহার কাজ সুরু হইয়াছে এবং আগামী তিন চার বছরের মধ্যেই হয়তো তাহা সম্পন্ন হইবে। এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিঅ্যাক্টার বা পরমাণু হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র ৬০,০০০ কিলোওয়াটেরও অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবে। ৫০,০০০ অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত কোন নগরীর পক্ষে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ যথেষ্ট।

পরমাণুকে অনেক সময়েই ধ্বংসের কারণ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু পারমাণবিক যুগের এগারো বৎসরের মধ্যেই ইহাকে শিল্পোৎপাদনে,

চিকিৎসা ব্যাপারে এবং অন্যান্য নানাবিধ মানব-কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ খনিজের উৎকর্ষ সাধন

জাতীয় ধাতু গবেষণা মন্দির এবং ব্যুরো অব মাইনস্ গবেষণা করিয়া নিম্নশ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ খনিজের উৎকর্ষ সাধনের এক সহজ পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই বেশ লাভবান হইয়াছেন।

১৮৯২ সাল হইতে ভারতে ম্যাঙ্গানিজ খনিজ উত্তোলন করা হইতেছে। কিন্তু ইহার সবটাই বিদেশে রপ্তানী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অতি উচ্চশ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ খনিজের দর ছিল টন প্রতি ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা। বর্তমানে দর হইতেছে ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা। খনিজে শতকরা ৪৫ ভাগের উপর ম্যাঙ্গানিজের ভাগ যত বেশী হয় দামও তত বেশী হইতে থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর খনিজের দাম আবার খুবই কম। ইহার ফলে ভারতের ম্যাঙ্গানিজ খনিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নিম্নশ্রেণীর খনিজ জমিয়া রহিয়াছে। ১৯৪৮ সালের পর সোভিয়েট রাশিয়া ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে ভারতের ম্যাঙ্গানিজ খনিজের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এখন শতকরা ৩২ ভাগের খনিজের জন্যও ভাল দাম পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের খনিগুলিতে ৩৭॥ লক্ষ টন এবং অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম জেলার খনিগুলিতে ১২ লক্ষ টন জমিয়া রহিয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যায়ও মোট প্রায় ২ লক্ষ টন জমিয়া আছে।

বহু গবেষণার পর ধাতু গবেষণা মন্দির ও ব্যুরো অব মাইনস্ নিম্নশ্রেণীর খনিজের উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। দৈনিক ৫০ টন উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিতে কয়েক লক্ষ টাকা লাগে। মাঝারি ধরনের যন্ত্র স্থাপন করিতে ৭০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টাকা লাগে। এক্ষণে তাঁহারা ৫ হইতে ১০ টন উৎপাদনের উপযোগী এবং অতি অল্প মূল্যের যন্ত্র উদ্ভাবনে নিযুক্ত আছেন। কিওনঝার অঞ্চলে এই পদ্ধতিতে শতকরা ৩৫ ভাগের খনিজ হইতে শতকরা ৪৭ ভাগের খনিজ উৎপাদন করা হইয়াছে এবং তাহাতে খরচা হইয়াছে খুবই কম। অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে।

কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নূতন অস্ত্র

পশ্চিম আফ্রিকায় কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যক্ষ্মা-নিরোধক বি-সি-জি ভেষজ লইয়া নূতন এক পরীক্ষার পরিকল্পনা হইয়াছে। একই ভেষজ যক্ষ্মা এবং এবং কুষ্ঠরোগের সংক্রমণ কিভাবে রোধ করিতে পারে তাহার এক বিবরণী সম্প্রতি ১৯৫২-৫৩ সালের ঔপনিবেশিক গবেষণা সংক্রান্ত বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ এই দুই রোগের সম্পর্ক নির্ধারণে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বি-সি-জি কুষ্ঠরোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধেও সমানভাবে কার্যকরী হইতে পারে। যক্ষ্মা বীজাণু (এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, বি-সি-জি ইহাতে অনেকটা সাহায্য করিয়া থাকে) কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধে সক্ষম হওয়ার জন্যই কোন কোন দেশ হইতে কুষ্ঠরোগ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

পশ্চিম আফ্রিকার কুষ্ঠরোগ গবেষণা ইউনিট এ সম্পর্কে যে পরীক্ষা কার্য চালাইয়াছে তাহা হইতেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, বি-সি-জি কুষ্ঠরোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে যথেষ্ট ফলপ্রদ হইতে পারে। এ সম্পর্কে পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। এক্ষণে নাইজেরিয়ার উজুয়াকোলি কুষ্ঠাশ্রমে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পিতামাতার নিরোগ সন্তানদের বি-সি-জি টিকা দেওয়া হইতেছে।

ভেষজ নিয়ন্ত্রণের ইতিকথা

চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় রহিয়াছে। সর্বপ্রথমে ছিল বিশ্বাসের দ্বারা রোগ নিরাময়ের সংস্কার, তারপর ভেষজের উদ্ভব এবং সর্বশেষে দেখা যায় স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় রোগ নিবারণের চেষ্টা।

বিশ্বাসের দ্বারা রোগ নিরাময় ছিল আদিম মানুষের কুসংস্কার। তবে বর্তমানকালে মানসিক চিকিৎসায় ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করা হইয়াছে। আধুনিক উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞানে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং রোগ-নিরাময় ক্ষমতাকে সর্বোপরি স্বীকৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার পদ্ধতি যখন প্রথম উদ্ভাবিত হয় তখন তাহা খুব বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। দুষ্প্রাপ্য কোন জিনিষের সন্ধান মিলিলেই তাহার রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা অপরিসীম বলিয়া বিবেচিত হইত। ইউরোপে গোলআলু যখন প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন তাহা ছিল দুর্মূল্য। কারণ গোলআলু তখন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত না, উহা ছিল দুষ্প্রাপ্য ঔষধ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের অভিজাত মহলে মৃগনাভি, অ্যাম্বার, হীরক, স্বর্ণ ও উপকথা খ্যাত ইউনিকর্ণের শিং মূল্যবান ঔষধ হিসাবে প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত জিনিষটি, অর্থাৎ ইউনিকর্ণ বা এক শৃঙ্গবিশিষ্ট কল্পিত অশ্বের শিং আসলে কিন্তু হস্তীদন্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু ইহার রোগ-নিরাময় ক্ষমতা অভূতপূর্ব বলিয়া তখন ব্যাপক বিশ্বাস ছিল। ড্রেসডেনে ইউনিকর্ণের শিঙের যে নমুনা ছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে তাহার আনুমানিক মূল্য ছিল ৭৫ হাজার ডলার। প্রত্যেক জীবজন্তুর দাঁত একই রাসায়নিক উপাদানে গঠিত; হাতীর দাঁত বা মানুষের দাঁতের মূলতঃ কিছুই পার্থক্য নাই। তৎসত্ত্বেও উহার রোগ-নিরাময় ক্ষমতা খুব বেশী বলিয়া তখন সকলেরই বিশ্বাস ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থা যখন প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন তৎকালে প্রচলিত অনেক মহৌষধিরই মুখোস খুলিয়া পড়ে। দেখা যায়, বাস্তবিকপক্ষে সেগুলির রোগ-নিরাময়ের কোন ক্ষমতাই নাই। আজ প্রত্যেক সভ্যদেশেই ভেষজের মান-নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি ব্যবস্থা চালু আছে। সর্বত্রই ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা, ঔষধ প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন রহিয়াছে। অবিশুদ্ধ দ্রব্য মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে তাহা যে শুধু রোগ নিরাময়ে অক্ষম তাহা নহে, ইহা মানুষের শরীরে গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে।

ভারতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার আমদানীকৃত ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি ঔষধ নির্দিষ্ট মানের সমপর্যায়ের হওয়া চাই। জীবাণুঘটিত ঔষধ এবং অন্যান্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় ঔষধ আমদানীর জন্য লাইসেন্স লইতে হয়। ইহা ছাড়া সাধারণ ঔষধপত্র আমদানী করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। ঔষধ আমদানী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ভেষজ নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করিয়াছেন। ইনিই ঔষধ আমদানীর লাইসেন্স দিবার অধিকারী। কেবলমাত্র কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দর দিয়া ঔষধ আমদানী করিতে দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত তিনটি বন্দরে ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার অফিসারগণ রহিয়াছেন। কোচিনেও শীঘ্রই অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। আমদানীকৃত ঔষধ বন্দরে পৌঁছিলে ইহারা নমুনা লইয়া অনুমোদিত গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠান। পরীক্ষায় ঔষধের মান

সরকার নির্দিষ্ট মানের সমপর্যায়ের হইলে উহা দেশের অভ্যন্তরে লইতে দেওয়া হয়। যে সকল ঔষধ তাপ বা আবহাওয়ার প্রভাবে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে সেইগুলির নমুনা রাখিয়া আমদানীকারককে তাহাদের নিজস্ব গুদামে মজুদ করিয়া রাখিতে অনুমতি দেওয়া হয়। তাহাদের নিকট হইতে এই মর্মে বণ্ড আদায় করা হয় যে, ভেষজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার বিনানুমতিতে তাঁহারা উহা বিক্রয় বা অন্যত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন না। পরীক্ষিত ঔষধের মান যদি নির্দিষ্ট মানের মত না হয় তবে আমদানীকারককে সম্ভব হইলে ঔষধের দোষ-ত্রুটি শোধন করিয়া লইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় যে দেশ হইতে ঔষধ আসিয়াছে সেই দেশেই ফেরৎ পাঠাইয়া দিতে হয়।

ভেষজ নিয়ন্ত্রণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল দেশে যে ঔষধ নিষিদ্ধ সেই ঔষধ এই দেশেও আমদানী করিতে দেওয়া হয় না। নূতন কোন ঔষধ হইলে আমদানীকারকের ঔষধের কার্যকারিতা সম্পর্কে ভেষজ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে নিঃসন্দেহ করিতে হইবে। যে দেশে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে সেই দেশে উহার পরীক্ষার ফলাফল জানাইতে হইবে এবং সেখানে অবাধ বিক্রয়ের সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে। তবে শুধু পরীক্ষার জন্য অতি অল্প পরিমাণে নূতন ঔষধ আমদানী করিতে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা মন্দির

১৯৪০ সালের ভেষজ আইন অনুযায়ী ভারত সরকার কলিকাতায় ভেষজ গবেষণা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এবং আদালতের মামলা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল নমুনা পাঠান, এখানে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। দেশে উদ্ভাবিত নূতন ঔষধের পেটেন্ট-অধিকারের সার্টিফিকেটও ইহারা দিয়া থাকেন। ঔষধের পরীক্ষা এবং মান সম্পর্কে বিরোধের উদ্ভব হইলে কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা মন্দিরের অভিমতই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সিরাম, ভ্যাক্সিন প্রভৃতি ঔষধ পরীক্ষার ভার কসোলির কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

নরসিংদাস আগরওয়ালা পুরস্কার

বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নরসিংদাস আগরওয়ালা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই পুরস্কারের মূল্য এক হাজার টাকা। ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ডি. এস-সি (এডিন), এম. এস-সি., এম বি, (ক্যাল), এম. আর. সি. পি., এফ. আর. এস. ই., কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত 'শারীর বিদ্যা' নামক পুস্তকখানি ১৯৫১ সালের বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে বিবেচিত হওয়ায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বপ্রথম এইবার তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি হর্মোন বা উত্তেজক রস, বাঙালীর খাদ্য, রোগীর পথ্য, ভাইটামিন প্রভৃতি অন্যান্য পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। ডাঃ পাল হর্মোন-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। বর্তমানে তিনি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের শারীর বিদ্যার অধ্যাপক এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য।

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

[illegible] বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষষ্ঠ বর্ষ | ডিসেম্বর—১৯৫৩ | দ্বাদশ সংখ্যা

ফোলিক অ্যাসিড

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ

ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স গোষ্ঠীর একটি উপাদান হলো ফোলিক অ্যাসিড। বর্তমানে ফোলিক অ্যাসিড রক্তাল্পতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও মানবদেহের ওপর এর সঠিক কার্যকারণ সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু জানা যায় নি; বরং বিজ্ঞানের নবতম অবদান হিসেবে চিকিৎসায় ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োগ সম্পর্কে এখনও ব্যাপক গবেষণা চলছে। এই ভিটামিনটি সবুজ পাতা থেকে পাওয়া যায় বলে ল্যাটিন ভাষায় পাতার নাম অনুযায়ী ফোলিক অ্যাসিড রাখা হয়েছে। অবশ্য এই ফোলিক অ্যাসিডের অন্য অনেকগুলো পরিচিতি আছে—যেমন ভিটামিন বি-সি, ভিটামিন এম্‌, এলুয়েট ফ্যাক্টর, এল-কেজাই ফ্যাক্টর, অ্যান্টি-অ্যানিমিয়া ফ্যাক্টর প্রভৃতি।

ফোলিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন টেরিলগ্লুটামিক অ্যাসিড বলে পরিচিত। এই অ্যাসিড জলে দ্রবণীয়। ফোলিক অ্যাসিড আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। সবুজ তরিতরকারি, ফুলকপি আর তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যে ফোলিক অ্যাসিড আছে। এ ছাড়া ঈষ্ট, যকৃৎ, বৃক্ক ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়। এই সব স্বাভাবিক খাদ্যাদি ছাড়াও আমাদের শরীরে ফোলিক অ্যাসিড মিশ্র অবস্থাতে পাওয়া যায়। তবে এককভাবে ফোলিক অ্যাসিড প্রকৃত কাজ করতে পারে—মিশ্রিত অবস্থায় মোটেই কার্যকরী নয়। শরীরে এই মিশ্রিত অবস্থা থেকে ফোলিক অ্যাসিডকে স্বতন্ত্রীকরণে ব্যাক্টিরিয়াই একমাত্র সম্বল। আমাদের শরীরের অন্তর্গত অন্ত্রে ফোলিক অ্যাসিড স্বাভাবিকভাবেই তৈরী হয়। তবে দেখা গেছে, সাল্‌ফা জাতীয় ওষুধের বেশী ব্যবহারে অন্ত্রে ফোলিক অ্যাসিড উৎপাদন ব্যাহত হয় অনেকখানি। ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে কৃত্রিমভাবে ফোলিক অ্যাসিড তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে এর তিনটি কৃত্রিম অনুকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বাভাবিক পর্যায়ে আমাদের দেহে ফোলিক

অ্যাসিডের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানা না গেলেও মজ্জার কোষ গঠনে এই উপাদানটি অপরিহার্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের ওপর এই ভিটামিনটির প্রয়োগ এদের শরীর গঠনে ব্যাপক সাহায্য করে বলে প্রকাশ।

ফোলিক অ্যাসিড সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষণাই রিসাস জাতীয় বানরের ওপর ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই জাতীয় বানরকে কেবলমাত্র কেজিন, ছাঁটা চাল, গম, নুন, কড্‌লিভার তেল, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড খেতে দিলে এরা বেশী দিন বাঁচে না। এমন কি, দেখা গেছে—রিবোফ্লেভিন, নিয়াসিন দিলেও ২৬ দিন থেকে ১০০ দিনের মধ্যেই এই বানর স্প্রু-রোগে মারা যায়। অথচ ঈষ্ট্‌ কিংবা যকৃতের রস খেতে দিলে এদের স্বাভাবিকভাবে শরীর গড়ে উঠতে থাকে; রক্ত কিংবা রক্তবাহী প্রণালীর কোন অনিষ্ট হয় না।

এই অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা স্থির করেন যে, ঈষ্ট্‌ বা যকৃতের রসের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন পুষ্টিকর উপাদান আছে। এই উপাদানটির নাম দিলেন তাঁরা ভিটামিন-এম্‌। এর পরে যকৃতের রস ও ঈষ্ট্‌ থেকে একটি পদার্থ নিষ্কাশন করা হলো। দেখা গেল, এই পদার্থটি ল্যাক্টোব্যাসিলাস কেজাই বা ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস্‌ ল্যাকটিস বীজাণু গঠনে অতি প্রয়োজনীয়। আরও গবেষণার ফলে মুরগীর ছানার রক্ত ও সেই সঙ্গে শরীর গঠনে এর উপকারীতা সব ক্ষেত্রেই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।

এ ভাবে ক্রমশঃ অনুসন্ধান ও অনুশীলন করে বিজ্ঞানীরা মানবদেহে এই ভিটামিনটির কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, রক্তাল্পতার একটি বিশেষ ক্ষেত্রে—যেখানে রক্তের কোষগুলি কয়েকটি কারণে স্বাভাবিক চেহারার চাইতে বড় হয়ে যায়—সেই সব অবস্থায় ফোলিক অ্যাসিডের ব্যবহার একান্ত ভাবে দরকার। তা ছাড়া স্বাভাবিক সুস্থ দেহে মজ্জার অন্তর্গত কোষগুলি ও সেই সঙ্গে রক্তের উপাদান গঠনে ফোলিক অ্যাসিড সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে।

এই তো গেল বিভিন্ন গবেষণার পরিণতির কথা। ফোলিক অ্যাসিড সম্পর্কে গবেষণার ইতিহাস বেশী দিনের পুরানো নয়। মানবদেহে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে সামান্য কতকগুলো তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে বিরাট গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল, তার মূলে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ সুব্বারাও-এর দানের কথা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ডাঃ সুব্বারাও'র অকাল মৃত্যু—ফোলিক অ্যাসিড সম্বন্ধে গবেষণার পথে খানিকটা বাধা সৃষ্টি করলেও, তাঁর গবেষণালব্ধ এই ভিটামিন সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানীই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। স্বাভাবিক খাদ্যের মাধ্যমে দৈনিক কতটা ফোলিক অ্যাসিডের দরকার, সে সম্বন্ধে আজও কোন সঠিক পরিমাণ স্থির করা সম্ভব হয় নি। তবে রক্তাল্পতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যে ফোলিক অ্যাসিডের অনুপান স্থির করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে মানবদেহে অসুস্থ অবস্থায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় এর ব্যাপক কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আরও সংবাদ পাওয়া যাবে, এ আশা করা যায়।

বেতার-তরঙ্গ ও বিশ্বজগৎ

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

ক্ষুদ্রতম গামারশ্মি থেকে দীর্ঘতম বেতার-তরঙ্গ একই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ হলেও তাদের তেজ ও অন্যান্য আচরণ সম্পূর্ণ পৃথক। পৃথিবীর চারদিকে এই যে আলো ও তাপের খেলা তারা সমগোত্রীয় হলেও এদের দলের কোন কোন শ্রেণীর তরঙ্গ যে বায়ুমণ্ডল ও আয়ন-স্তর ভেদ করে আসতে পারে না, সে খবর অনেকেই জানেন না। ১নং চিত্রে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ শ্রেণীর কোন্ কোন্ অংশ পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে তার রেখাচিত্র দেখানো হয়েছে। এই চিত্র থেকে দেখা যায়—দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ ও তাপ-তরঙ্গ ছাড়া ক্ষুদ্রতর বেতার-তরঙ্গগুলিও বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে পারে। দীর্ঘতর বেতার-তরঙ্গ আয়ন-স্তরে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। ঠিক একই কারণে পৃথিবীতে উৎপাদিত বেতার-তরঙ্গ আয়ন-স্তরে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে বলেই আমরা বেতার গ্রাহকযন্ত্রে তাদের ধরতে পারি। সূর্য ও বিশ্বজগৎ থেকে পৃথিবীতে যে সব তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ এসে পড়ছে তাদের মধ্যে বেতার-তরঙ্গের প্রকৃতিটা খুবই রহস্যজনক। আমাদের সূর্যের মত কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে যে ছায়াপথ তার আলো পৃথিবীতে আসে দেখতে পাই; কিন্তু এই ছায়াপথ থেকে যে বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পড়ে তার খুঁটিনাটি পরীক্ষায় ছায়াপথের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করা যায়।

১০৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে বিজ্ঞানী জান্স্কি ছায়াপথ থেকে নির্গত ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করেন। নক্ষত্রজগতের সঙ্গে পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি হলো ২৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট। ছায়াপথের এই বেতার-তরঙ্গও ঠিক এই সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীতে আসে। আরও পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে, এই তরঙ্গের প্রধানতম উৎস হলো ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল অবশ্য সমস্ত ছায়াপথ ছড়িয়ে এই তরঙ্গ অল্পবিস্তর নির্গত হয়।

কোনও দেশের বা পৃথিবীর মানচিত্র আমরা কল্পনা করতে পারি। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের রেখা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনও ক্ষুদ্রতম স্থানের অবস্থিতি নির্ভুলভাবে বলা যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র সমন্বিত দীর্ঘ ছায়াপথ আমাদের কল্পনার বাইরে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষায় এই ছায়াপথের নির্ভুল মানচিত্র এঁকেছেন। এই মানচিত্রের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দিয়ে আমরা

১নং চিত্র

ছায়াপথের যে কোনও নক্ষত্রের অবস্থান সঠিকভাবে জানতে পারি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রেবার ছায়াপথ থেকে নির্গত ১৮৫ মিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করেন। ছায়াপথের মানচিত্রে যে সব জায়গা থেকে সমান তীব্রতার এই তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে তা একটি রেখা দিয়ে যোজনা করে তিনি যে চিত্র আঁকেন তা ২নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। ৩নং চিত্রে হে, ফিলিপস্ ও পার্সন্ অঙ্কিত ৪.৭ মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরীক্ষার অনুরূপ মানচিত্র দেওয়া হলো। এই দুটি মানচিত্র তুলনা নির্গত বেতার-তরঙ্গের তীব্রতা সময়ের অনুপাতে দেখানো হয়েছে। চিত্রের সরলরেখাটি হলো ছায়াপথের বেতার-তরঙ্গের তীব্রতা জ্ঞাপক। পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যে ছায়াপথের কেন্দ্র বেতার যন্ত্র থেকে ক্রমশঃ সরে যাওয়ার ফলে এই তীব্রতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। কিন্তু অজ্ঞাত বেতার নক্ষত্রটি ছায়াপথের বেতার-তরঙ্গকে ছাপিয়ে প্রতিসেকেণ্ডে তার নিজস্ব বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি প্রদর্শন করে। কিছুদিন পরে বিজ্ঞানী বোল্টন ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীতে অনুরূপ একটি বেতার-

২নং চিত্র
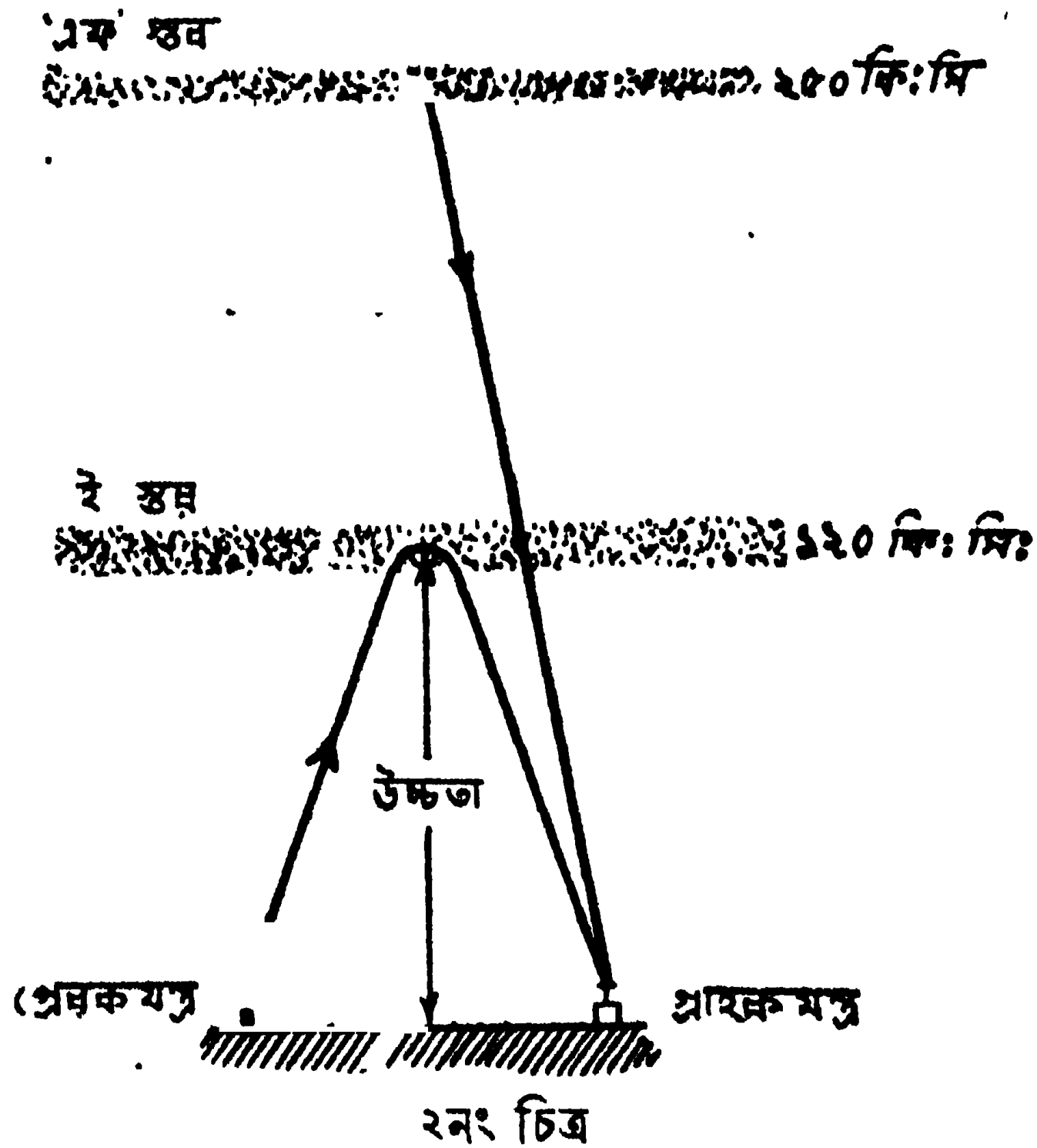
করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত স্যাজিটারিয়াস্ নক্ষত্রমণ্ডলীতে বেতার-তরঙ্গের তীব্রতা বেশী। তাই এই স্থানকে বেতার-তরঙ্গের প্রধানতম উৎস বলা যায়। ছায়াপথের অন্যান্য স্থানেও এই তরঙ্গের অল্পবিস্তর তীব্রতা এই চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয়। এই সব পরীক্ষার সময় হে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ সিগ্নাস্ নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটি অদৃশ্য বেতার-নক্ষত্রের সন্ধান পান। ৪নং চিত্রে বিজ্ঞানী বোল্টন্ ও ষ্ট্যান্লীর পরীক্ষায় প্রাপ্ত এই বেতার-নক্ষত্র নক্ষত্রের সন্ধান পান। ৫নং চিত্রে বোল্টনের পরীক্ষালব্ধ সিগ্নাস্ ও ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীর দুটি বেতার-নক্ষত্রের সময়ের অনুপাতে তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষার ফলে এই সব বেতার-নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে আঙ্কিক ভুলত্রুটি ও পার্থক্য থাকলেও এদের অস্তিত্ব সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বৃহত্তম দূরবীণ যন্ত্রেও এই সব নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু বেতার-বিজ্ঞানীর কাছে ক্ষীণ নক্ষত্রগুলিও তাদের আবরণ উন্মোচন

করেছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানীরা এরূপ আরও প্রায় ত্রিশটি বেতার-নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন। হয়তো আরও বহু ক্ষীণতর বেতার-তরঙ্গের উৎস এ রকম ক্ষুদ্র নক্ষত্র আমাদের ছায়াপথে লুকিয়ে আছে। উন্নততর বেতার যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে এদের অস্তিত্ব ধরা পড়তে পারে।

এসব তরঙ্গ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করতে হলে ছায়াপথ বা এসব বেতার-নক্ষত্রের কোন্ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ কত তীব্র তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ছায়াপথের ক্ষুদ্রতর বেতার-তরঙ্গগুলি এত ক্ষীণ যে তাদের তীব্রতার সঠিক মাপ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ১.৫ থেকে ৭.৫ মিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ছায়া-পথের সমতলে তীব্রতা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ভেদ (variation) প্রদর্শন করে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা
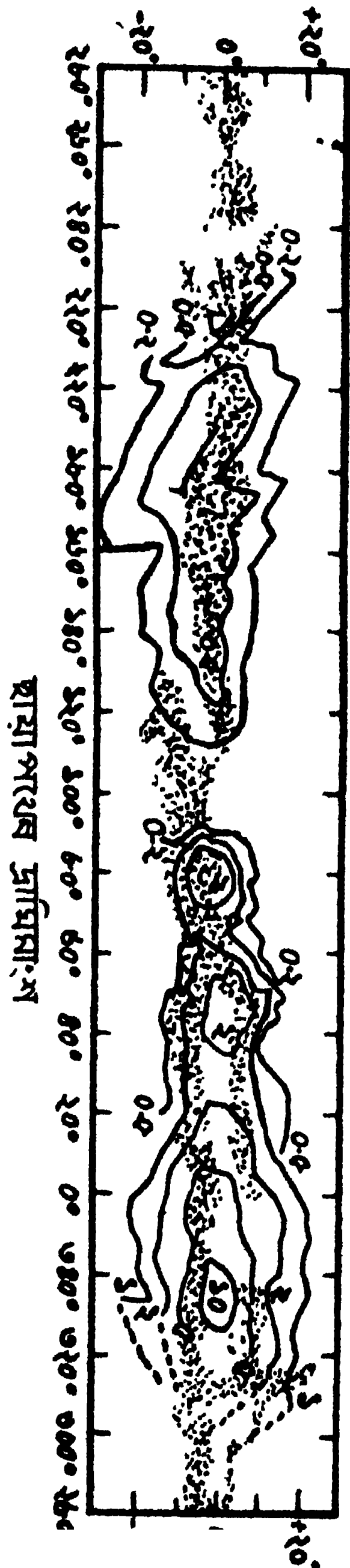
ছায়াপথের দ্রাঘিমাংশ

ছায়াপথের অক্ষাংশ

৩নং চিত্র

ছায়াপথের দ্রাঘিমাংশ

ছায়াপথের অক্ষাংশ

৪নং চিত্র

যায় যে, তীব্রতা ∝ (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য)$^{০·১}$ থেকে (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য)^{১}।

সূর্যের মত ছায়াপথের সমস্ত নক্ষত্র বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করলেও তার তীব্রতার বহুগুণ বেশী বেতার-তরঙ্গ আমরা ছায়াপথ থেকে পেয়ে থাকি। অদৃশ্য বেতার-নক্ষত্রগুলির বেতার-বিকিরণ হয়তো এই বাড়তি তরঙ্গ বিকিরণ করে। সবগুলি বেতার-নক্ষত্র আবিষ্কৃত না হলে এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। তাই বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানকে এই বেতার-তরঙ্গের উৎস হিসাবে প্রমাণের চেষ্টা করেন। নক্ষত্রসমূহের মধ্যবর্তী স্থানের হাইড্রোজেন গ্যাস নক্ষত্র-বিকিরিত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে আয়নিত অবস্থায় থাকে। সাধারণ বর্ণালী ইলেকট্রনটি যদি পরমাণুর কোন বহিঃস্থ কক্ষে বাঁধা পড়ে যায় তবে যে তেজ পাওয়া যায়, তার স্পন্দন-সংখ্যা বেতার-তরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। সাধারণ রেখা-বর্ণালী ও অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মধ্যস্থলে এই বেতার তেজ উৎপাদিত হয়, নক্ষত্রের মধ্যবর্তী আয়নিত হাইড্রোজেনের রাজ্যে। আমরা তাকেই ছায়াপথ থেকে আগত বেতার-তরঙ্গরূপে ধরতে পারি। এই মতবাদের বিপক্ষে বহু যুক্তি রয়েছে। এর প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে এই তত্ত্বের গরমিল। পরীক্ষায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ কত তীব্র তা জানা গেছে। কিন্তু উপরোক্ত তত্ত্বের উপর নির্ভর করে কোন্ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ কত তীব্র হবে তা যদি গণনা করা যায় তবে সেই গণনার

উচ্চতা
২৩:০০
২২:০০
← সময়
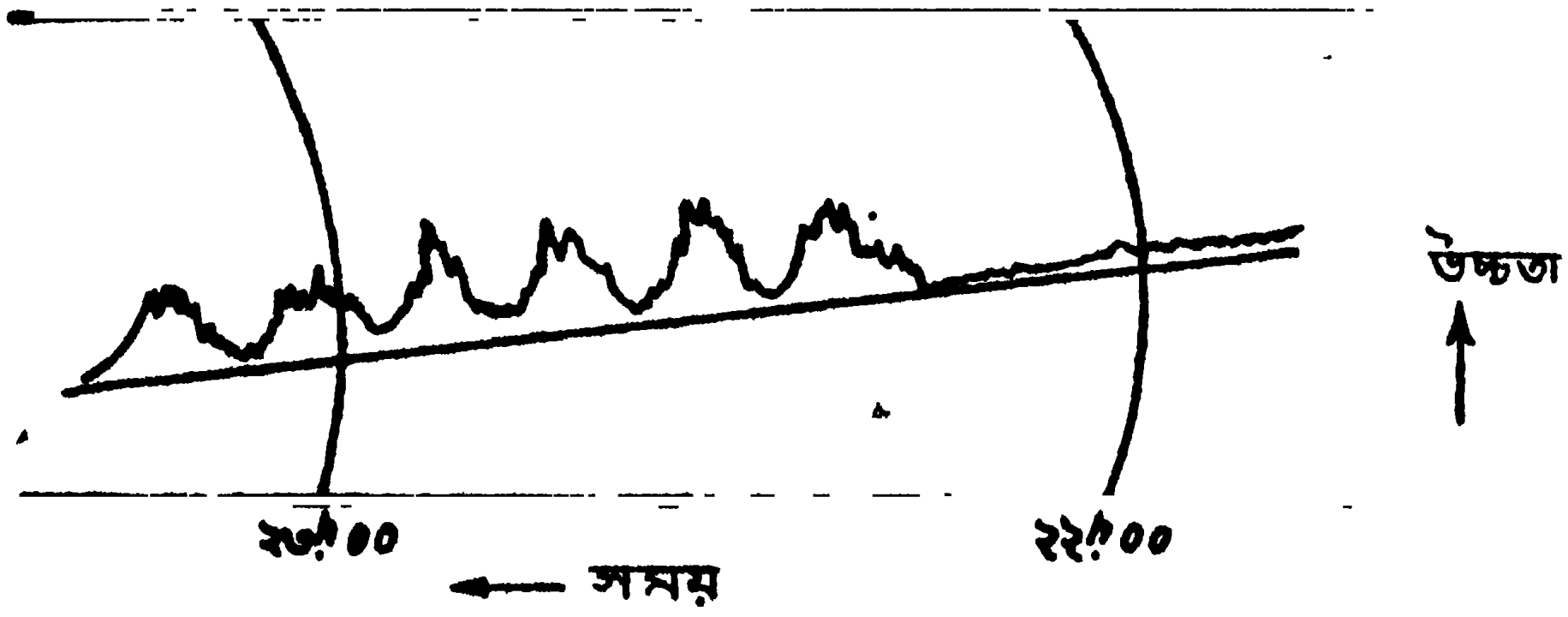
৫নং চিত্র

থেকে জানা যায় যে, হাইড্রোজেন পরমাণু উত্তেজিত হলে তার কক্ষের ইলেকট্রনটি ঊর্ধ্বতর কক্ষে লাফিয়ে যায় এবং নিজ কক্ষে ফিরে আসবার সময় তেজ বিকিরণ করে। বিভিন্ন কক্ষে এরূপ গতিবিধির ফলে হাইড্রোজেন বর্ণালীতে কতকগুলি রেখা পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি রেখা বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রনের গতায়াতজনিত তেজের তীব্রতা ও স্পন্দন-সংখ্যা নির্দেশ করে। কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণু আয়নিত হলে আর রেখা দেখা যায় না, তখন বর্ণালী হয় অবিচ্ছিন্ন। এই অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী আর রেখা-বর্ণালীর মধ্যপথে একটা অবস্থা আছে। বাইরের কোন ইলেকট্রন আয়নিত হাইড্রোজেন পরমাণুর কাছাকাছি এলে পরাবৃত্ত পথে তার বিকিরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই সঙ্গে পরীক্ষার ফল আদৌ মিলে না। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, সমস্ত ছায়াপথের আলো যেমন তার প্রত্যেকটি নক্ষত্রের মিলিত আলোর সমষ্টি, তেমনি প্রত্যেকটি বেতার-নক্ষত্রের বেতার-তরঙ্গের মিলিত সমষ্টিই ছায়াপথ থেকে নির্গত বেতার তেজরূপে আমাদের বেতার গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে। এই মতবাদের পক্ষে ক্রমশঃ বিজ্ঞানীরা সচেতন হয়ে উঠেন। বিজ্ঞানী বোল্টন ও ষ্ট্যান্লী তরায়ুস্-এ নক্ষত্রমণ্ডলীর বেতার-নক্ষত্রটি ও ক্র্যাব্ নীহারিকাটিকে একই বলে মনে করেন। এই নীহারিকাটি পূর্বে একটি নক্ষত্র ছিল। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে এতে এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলে এই নক্ষত্রের বিচ্ছিন্ন বহির্দেশ বায়বাকারে স্ফীত হতে থাকে। এই স্ফীতির গতিবেগ

সারাদিনে প্রায় ৭০০ লক্ষ মাইল। এর কেন্দ্র স্থলের তাপমাত্রা প্রায় ৫০০,০০০ ডিগ্রি (অ্যাবসলিউট)। অবশ্য এই তাপের ফলে যে বেতার-তরঙ্গ উৎপাদিত হবে তার তুলনায় পরীক্ষালব্ধ বেতার-তরঙ্গের তীব্রতা অনেক বেশী। তাই এই নক্ষত্রের আশেপাশে অদৃশ্য কোন বেতার-নক্ষত্র মিলিত-ভাবে এই বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার জন্যে দায়ী হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া তাপীয় প্রভাব ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যদি বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন সম্ভব হয়, তবে নির্গত বেতার-তরঙ্গের তীব্রতা নক্ষত্রের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল হবে না। কোন কোন নক্ষত্রের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। নক্ষত্রের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই সব

তরঙ্গের তীব্রতার সমন্বয় এখনও সম্ভব হয় নি। তবে বিভিন্ন পরীক্ষায় এই তত্ত্বই অনেকাংশে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১০০০০ কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। এদের আলোই ছায়াপথের আলোরূপে প্রতীয়মান হয়। সেরূপ প্রায় এই পরিমাণ বেতার-নক্ষত্রের সাহায্যে ছায়াপথের সমগ্র বেতার তরঙ্গ উৎপাদিত হতে পারে। তাই ছায়াপথে আরও প্রায় ১০০০০ কোটি বেতার-নক্ষত্র লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়। কোনও দূরবীণ কোন দিন তাদের আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে না।

আমাদের ছায়াপথের বাইরে আরও অসংখ্য ছায়াপথ রয়েছে। সে সব ছায়াপথেও আছে কোটি কোটি নক্ষত্র; তাদের আলো দূরবীণে ধরা

তীব্রতা
সিগনাস
ক্যাসিওপিয়া
04h 05h 06h 07h → সময় ইউ, টি
মে ২৮, ১৯৪৮

৬নং চিত্র
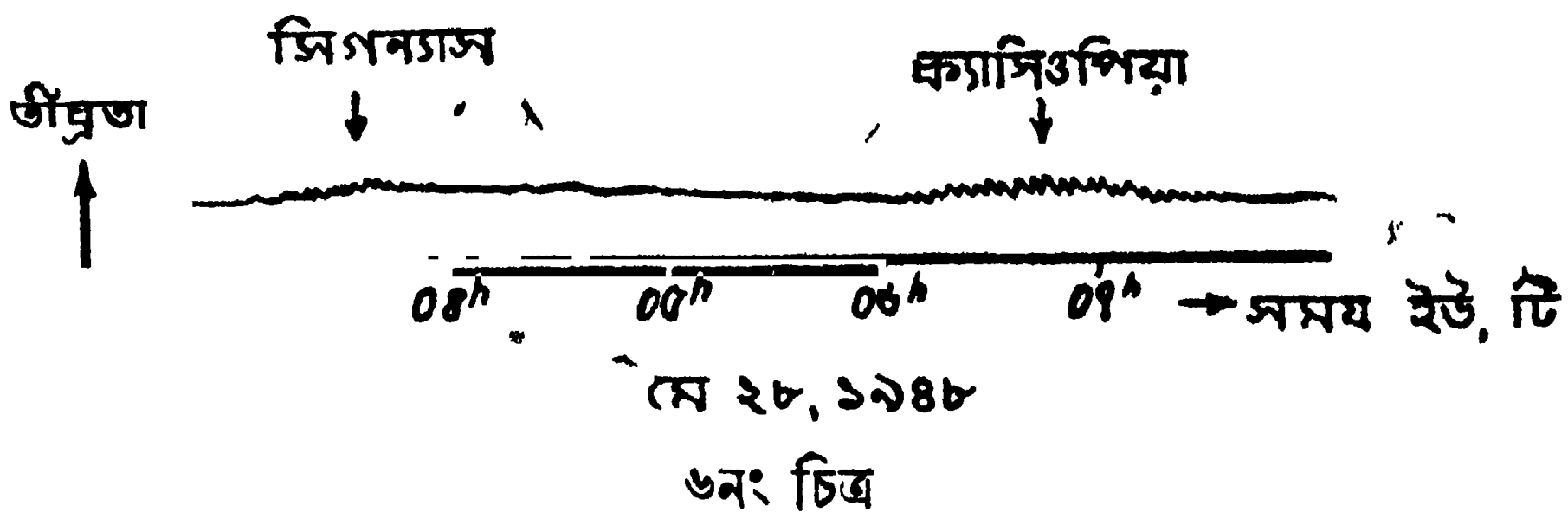
নক্ষত্রে বিপুল বৈদ্যুতিক বিভবের সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রের ইলেকট্রনসমূহ এই বিভবের দ্বারা ত্বরিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করতে পারে। সূর্যের বেলায় ঠিক এই তত্ত্বের সাহায্যে বেতার-বিকিরণের ব্যাখ্যা করা যায়। নক্ষত্রের বেলায়ও এই তত্ত্ব সমান-ভাবে গ্রহণীয়। আবার বিদ্যুৎ-বিভবের প্রভাবে ত্বরিত ইলেকট্রনসমূহ নক্ষত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানী রাইলের মতে, এসব ইলেকট্রনই নভোরশ্মির আকারে পৃথিবীতে এসে পড়ে। তাই এই বৈদ্যুতিক বিভব তত্ত্বকে নভো-রশ্মি ও বেতার-তরঙ্গের জনয়িতা বলে মনে করা যেতে পারে। অবশ্য সবগুলি বেতার-নক্ষত্রে চুম্বকক্ষেত্র আছে কিনা এবং তার প্রভাবে যে বিদ্যুৎ-বিভব উৎপাদিত হয় তার সঙ্গে নির্গত বেতার-

পড়ে। কিন্তু এসব নক্ষত্রের বেতার-তরঙ্গ ধরতে হলে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বেতার যন্ত্রের প্রয়োজন। এরূপ বেতার যন্ত্রে আমাদের ছায়াপথের বাইরের এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা থেকে নির্গত বেতার-তরঙ্গ ধরা পড়েছে। এই বেতার-তরঙ্গের তীব্রতা থেকে মনে হয়, আমাদের ছায়াপথের মত অন্যান্য ছায়াপথ থেকেও বেতার-তরঙ্গ বিকিরত হয়। বেতার-তরঙ্গ-বিকিরণকারী এরূপ কোটি কোটি নক্ষত্র এসব ছায়াপথেও লুক্কায়িত রয়েছে; কিন্তু এই অসংখ্য বেতার-নক্ষত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ আজও আমাদের অজ্ঞাত। এরা দৃশ্য নক্ষত্রের চেয়ে পৃথক অথবা সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর কিনা, সে প্রশ্নেরও সমাধান হয় নি। হয়তো এরা বিশাল নক্ষত্র-জগতে নবজাতক, উজ্জ্বলতায় এখনও আমাদের

দূরবীণে ধরা পড়বার মত অবস্থায় আসে নি; অথচ বেতার-বিকিরণের মাধ্যমে বিশ্বে তাদের আগমন-বার্তা জানিয়ে দিচ্ছে। এসব নক্ষত্রের আয়তন বা পৃথিবী থেকে দূরত্ব এখনও আমাদের অজ্ঞাত। আরও সূক্ষ্মতর বেতার যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে হয়তো এদের গোপনীয়তার আবরণ উন্মোচিত হবে।

৪ ও ৫নং চিত্রে সিগ্‌নাস ও ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলীর বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। দূরবীণে অনেক নক্ষত্রের মিটমিটে আলোও দেখা যায়। ৬নং চিত্রে আয়ন-স্তরের 'ই' ও 'এফ' অঞ্চল দেখানো হয়েছে। ১০০ মিটার থেকে দীর্ঘতর বেতার-তরঙ্গ ই-অঞ্চল ভেদ করে এফ-অঞ্চল থেকে প্রতিফলিত হয়। ৪০ মিটারের চেয়ে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ এফ-অঞ্চল ভেদ করে যেতে পারে। ঠিক এই কারণে ৪০ মিটার থেকে দীর্ঘতর বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ পৃথিবীতে সম্ভব হয়। আবার ক্ষুদ্রতর বেতার-তরঙ্গ এই কারণেই অনায়াসে বহির্বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারে। আয়ন-স্তরের এফ-অঞ্চলের বিশেষত্ব এই যে, এখানে আয়নের ঘনত্ব অসমান। নক্ষত্রের আলো অসমান ঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করবার সময় অপবর্তিত হয়ে তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির সৃষ্টি করে; ফলে মিট্‌মিটে দেখায়। শুধু আলো নয়, যে কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই এই প্রকার অপবর্তনের ফলে তীব্রতায় কম বেশী হতে পারে। মনে হয় একই কারণে সিগ্‌নাস ও ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রের বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। তবে সাধারণ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের পক্ষে যেমন সাধারণ বায়ুমণ্ডলের অণুর অসম ঘনত্বই যথেষ্ট। তেমনি বেতার-তরঙ্গের বেলায়ও আয়ন-স্তরের এফ-অঞ্চলের আয়নের অসম ঘনত্বই অপবর্তনের জন্যে দায়ী বলে মনে হয়।

বিভিন্ন তত্ত্ব ও পরীক্ষা থেকে যে লক্ষ লক্ষ বেতার-নক্ষত্রের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তাদের আচরণ ও গঠনের খুঁটিনাটি যদি ক্রমশঃ উন্নততর পরীক্ষায় ধরা পড়ে তবে বিশ্বজগতের একটা নতুন দিক আমাদের কাছে উন্মুক্ত হবে।

জল

শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা

জল অতি সাধারণ পদার্থ। ইহার প্রাচুর্য ও সহজপ্রাপ্যতাই ইহাকে অতি সাধারণ পদার্থের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। নতুবা জলের এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য জল অসাধারণ বস্তুর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ স্থান লাভেরই অধিকারী। সর্বোপরি জীবনের বাহক হিসাবে যাবতীয় পদার্থের মধ্যে জল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীতে জল আছে বলিয়াই জীবের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞানীরা গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার সময় ঐসব পরিবেশে জলের অস্তিত্ব আছে কিনা প্রধানতঃ তাহাই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

প্রাণপঙ্কই জীবনের ধারক। প্রাণপঙ্ক জলে মিশ্রিত কতকগুলি পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাণপঙ্ক ব্যতীত যেমন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়, জল ব্যতীতও সেইরূপ প্রাণপঙ্ক ও তথা জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মনুষ্যাদি প্রাণী ও উদ্ভিদ হইতে ক্ষুদ্র ব্যাকৃটিরিয়া পর্যন্ত সমস্ত জীবদেহেরই একটি প্রধান উপাদান—জল। জল বিমুক্ত হইলে জীবদেহের প্রাণশক্তি অন্তর্হিত হয়।

জল যে শুধু জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাহাই নহে, অধিকাংশ জীবের আবাস স্থলও জল। বিজ্ঞানীদের মতে, ভূচর প্রাণীদের তুলনায় প্রায় নয় গুণ অধিক প্রাণী ও উদ্ভিদ জলে বাস করে। পৃথিবীতে প্রথম জীবনের উন্মেষ ঘটে সমুদ্রের জলে। জলেই যে জীবনের প্রথম উদ্ভব ঘটে, পুরাণ-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—প্রথমে সব কিছু তমসাচ্ছন্ন ছিল, বিরাট পুরুষ নিজ তেজে সেই অন্ধকার দূর করিয়াই জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ স্বর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে তন্মধ্যে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থিতি করেন। হিন্দু শাস্ত্রের অবতারবাদের মধ্যে একটি বিবর্তনবাদের পরিকল্পনাও অন্তর্নিহিত আছে। প্রথমোক্ত দুই অবতার মৎস্য ও কূর্ম জলেরই অধিবাসী। জলেই জীবনের প্রথম প্রকাশ ও ব্যাপ্ত সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে নানারকম নিদর্শন পাওয়া যায়।

কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় এই তিন অবস্থাতেই জল পৃথিবীতে বর্তমান। প্রাকৃতিক পরিবেশে আপন হইতেই নিয়ত ইহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্র তুষারকণা হইতে বিশাল বারিধি পর্যন্ত সর্ব অবস্থাতেই জল এক বিস্ময়ের বস্তু। ইহার প্রভাবেই ভূমণ্ডলের আবহাওয়া ও তাপের সমতা রক্ষিত হইতেছে। বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্পের অবস্থিতি একদিকে দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর তেজ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে, আবার উহার আচ্ছাদনেই রাত্রিবেলায় মহাশূন্যের শীতলস্পর্শ হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতেছি। জলের মাধ্যমে চিরকাল পৃথিবীর অধিকতর উত্তপ্ত অংশ হইতে শীতল অংশে তাপ বাহিত হইয়া থাকে; ইহার ফলেই অসহনীয় তাপের চরম অবস্থা হইতে জীবজন্তু ও উদ্ভিদ প্রভৃতি রক্ষা পাইতেছে।

যৌগিক পদার্থের মধ্যে জলের গঠন সর্বাপেক্ষা সরল। দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণুর সম্মিলনে জলের অণু সৃষ্টি হয়। একটি জলের অণুতে সর্বশুদ্ধ দশটি ইলেক্ট্রন, দশটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন আছে। হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক তাপই সর্বাধিক। জলও হাইড্রোজেন হইতে এই গুণটি লাভ করিয়াছে; জলেরও আপেক্ষিক তাপ খুব বেশী।

হাইড্রোজেন দগ্ধ হইলে বাষ্পাকারে জল উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেনের দহনক্রিয়া প্রচণ্ড তাপ উৎপাদন করে। এক পাউণ্ড হাইড্রোজেন দহনের ফলে ৫১৫০০ থারম্যাল ইউনিট তাপ সৃষ্টি হইয়া থাকে (এক থারম্যাল ইউনিট = ২৫২ ক্যালোরি)। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলন অগ্ন্যুৎপাদনকারী ব্যাপার হইলেও ঐ মিলনের ফলে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় উহাই আবার অগ্নি নির্বাপণের শক্তি ধারণ করে।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সম্মিলনে আমাদের দেহাভ্যন্তরেও জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জল ব্যতীত কোন প্রাণী জীবনধারণ করিতে পারে না—ইহা সত্য হইলেও এমন অনেক প্রাণী আছে যাহারা কখনও জল পান করে না, এমন কি উহাদের ত্বক অথবা দেহের আবরণের ভিতর দিয়াও জল শুষিয়া লয় না। এইরূপ প্রাণী জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণরূপে দেহের অভ্যন্তরে সৃষ্ট জলের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

আমরা সাধারণতঃ যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তাহার অধিকাংশের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত ঐ জল দেহের প্রয়োজন সম্পাদনে ব্যবহৃত হয়, সন্দেহ নাই। খাদ্যের ঐ জলীয় অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ হইতেও দেহের মধ্যে জল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষ এবং মনুষ্যেতর সকল প্রাণীই দেহের মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থের দহন হইতে তাপ ও প্রাণধারণোপযোগী শক্তি লাভ করে। শ্বাসক্রিয়ায় গৃহীত অক্সিজেন অথবা দেহের মধ্যে অন্যভাবে উৎপন্ন অক্সিজেনের সাহায্যে এই দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই শর্করা জাতীয় পদার্থের দহনকালে হাইড্রোজেন বিমুক্ত হয়। ঐ বিমুক্ত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সম্মিলনে দেহের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ জল উৎপন্ন হয়। আমাদের দেহে দিনে প্রায় এক পাইণ্ট জল এইভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে সব প্রাণী বাহির হইতে জল গ্রহণ করে না তাহারা কেবলমাত্র এই আভ্যন্তরীণ জলের উপর নির্ভর করিয়াই জীবনধারণ করে। কার্পেট মথ নামে এক জাতীয় পতঙ্গ বাহির হইতে জল গ্রহণ করে না। যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া উহারা জীবনধারণ করে তাহাও সম্পূর্ণ শুষ্ক ও জলবর্জিত, অথচ উহাদের ডিমের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ জল থাকে। এই পতঙ্গের জীবনধারণের জন্য সম্পূর্ণরূপে আভ্যন্তরীণ জলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

আমাদের জীবনধারণের জন্য দেহে নিয়ত জলের যোগান অপরিহার্য। আমাদের দেহের রক্ত, তন্তু ও চর্মের, মধ্যে জলীয় অংশই অধিক। তন্তুর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই জল। সাধারণ অবস্থায় মল, মূত্র, ঘর্ম ও নিশ্বাসের সঙ্গে দিনে প্রায় ৩½ লিটার জল আমাদের দেহ হইতে বাহির হয়। শ্রম বা উত্তাপ বৃদ্ধিতে ঘর্মের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দেহের এই জলের যোগান আবশ্যক। আমাদের খাদ্যে মুক্ত ও গুপ্তভাবে যে পরিমাণ জল থাকে তাহা দ্বারা দেহের জলক্ষয় পূরণ হয় না বলিয়াই দেহে জলের চাহিদা তৃষ্ণায় প্রকাশ পায়। কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইলে আমরা তৃষ্ণা বোধ করি। তন্তুর মধ্যে জলীয় অংশ কমিলে লালা নিঃস্রাব হ্রাস পায় বলিয়াই ঐরূপ হয়। লজেন্স, চিউইংগাম প্রভৃতি গ্রহণে সাময়িকভাবে লালা নিঃস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ হয় বটে; কিন্তু উহাতে দেহের জলের চাহিদা পূরণ হয় না। কোন কারণে দেহে জলের সমতা বিপর্যস্ত হইয়া দেহের জলের পরিমাণ যদি শতকরা ১০ ভাগ হ্রাস পায় তবে আমাদের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠে এবং শতকরা ২০ ভাগ কমিলে রক্ত ঘন হইয়া পড়ে; ফলে আমাদের প্রাণসংশয় হইয়া থাকে। শুধু মানুষ নয়, সবরকম জীবনকেই প্রাণধারণের জন্য দেহের মধ্যে জলের এই সমতা রক্ষা করিতে হয়। উদ্ভিদের দেহেও জলের সমতা রক্ষিত না হইলে উহা বৃদ্ধি পায় না, নিস্তেজ

হইয়া পরে। উদ্ভিদ হইতে নিয়ত জল মোক্ষণ হইতেছে, উদ্ভিদ জল সংগ্রহ করিয়া সেই ক্ষয় পূরণ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে গলিয়া মৃত্তিকা হইতে নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করিতেছে। মোক্ষণ অপেক্ষা শোষণের পরিমাণ কম হইলে উদ্ভিদ-দেহে জলের সমতা ব্যাহত হয়। জলাভাবে কোষসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কোষসমূহ পূর্ণভাবে স্ফীত না থাকিলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখিতে নিয়ত জলের যোগান অত্যাবশ্যক।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য নিয়ত জলের যোগান ব্যতীত দীর্ঘকাল জীবন সংরক্ষিত হইলে, বহু পরেও উহা হইতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হইতে পারে। বীজের সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিয়া ভ্রূণের জল নিঃশেষে মুক্তি পাইতে পারে না বলিয়াই ঐরূপ সম্ভব হয়। বীজের জলীয় অংশ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইলে উহার জীবন-দীপ চিরতরে নির্বাপিত হয় এবং উহার অঙ্কুরোদ্গমের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

জল সকল পদার্থেরই একটি সাধারণ দ্রাবক; সকল পদার্থই অল্পাধিক পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হয়। ফলে সম্পূর্ণরূপে অবিমিশ্র খাঁটি জল পাওয়া খুবই দুষ্কর। প্রকৃতিলব্ধ কোন জলই এইরূপ পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হইতে পারে না। এমন কি, বৃষ্টির জলেও বায়ুমণ্ডল হইতে সংগৃহীত ধূলিকণা ও নানাপ্রকার গ্যাসীয় পদার্থ বর্তমান থাকে। ল্যাবরেটরিতে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল উৎপাদন করা কঠিন। সাবধানতা অবলম্বনে বিশুদ্ধ জল উৎপাদন সম্ভব হইলেও উহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংরক্ষণের কোন উপায় নাই; কারণ জলে সামান্য ভাবেও দ্রবণীয় নয় এমন কোন পদার্থের পাত্রই সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। জলে সহজে দ্রবীভূত হয় বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ জলের সঙ্গে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিয়া উহার খাদ্য গঠনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের ভোজ্যবস্তু পরিপাকেও জলের প্রয়োজন হয়। পরিপাক যন্ত্রে নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে খাদ্যবস্তু চূর্ণীকৃত হইয়া জলে মিশ্রিত তরল অবস্থায় শরীরের শোষণোপযোগী হয়। আবার জলে দ্রবীভূত হইয়াই প্রয়োজনাতিরিক্ত নানাপ্রকার পদার্থ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। কোন কারণে ঐ সকল পদার্থের নিষ্ক্রমণে বিঘ্ন ঘটিলে ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

কৈশিক আকর্ষণে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে জল উঠিয়া উপরিভাগ সিক্ত হয়। দুই দিক খোলা একটি সূক্ষ্ম কাচের নল জলপূর্ণ পাত্রের উপর দাঁড় করাইলে ঐ নলের ভিতরে জল, পাত্রের জলের উপরিতল ছাড়াইয়া কিছু ঊর্ধ্বে উঠিয়া থাকে। জলের কৈশিক আকর্ষণের জন্যই দৃশ্যতঃ মাধ্যাকর্ষণের শক্তি উপেক্ষা করিয়া নলের ভিতরে জল এইভাবে উঠিয়া থাকে। জলের এই কৈশিক আকর্ষণের মূলে রহিয়াছে নলের ভিতর প্রাচীরের টান; ভিতরের প্রাচীরের টানেই জল নলের ভিতরে ঊর্ধ্বে উঠিয়া থাকে। নল যত সূক্ষ্ম হয় জলের ঊর্ধ্বগতিও তত অধিক হয়। দণ্ডায়মান বা আঁড়াআড়ি যে ভাবেই অবস্থিত থাকুক না কেন, এইভাবে নলের গা বাহিয়া জল অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। মৃত্তিকার অন্তর্বর্তী ফাঁক বা সূক্ষ্ম নালী বাহিয়া এইরূপেই জল নীচ হইতে উপরের মৃত্তিকার চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। শুধু মৃত্তিকা নয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহেও জলীয় পদার্থ সঞ্চালনে জলের এই কৈশিক ধর্ম সাহায্য করিয়া থাকে।

স্থির জলের উপরিভাগের ত্বকে স্থিতিস্থাপকতা ও তল-টান রহিয়াছে। স্থির জলের উপরে সূচ রাখিলে উহা ভাসিয়া থাকে, কিন্তু ঐ জলের উপরের স্তর আন্দোলিত হইলেই সূচটি ডুবিয়া যায়। বাহ্যত্বকের তল-টানের বলে চারদিকের জল টানিয়া রাখার ফলে জলের ফোঁটা গোলাকার অবস্থায় ঝুলিয়া থাকিতে পারে। ওয়াটার বাগ প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র কীট আমাদের অনেক

পূর্বেই জলের এই গুণটির পরিচয় পাইয়াছে। উহারা নির্বিবাদে জলের উপর দিয়া হাটিয়া যায়; উহাদের পায়ের চাপে ঐ ত্বক বিচ্ছিন্ন হয় না এবং উহাদের পা-ও সিক্ত হয় না।

কঠিন অবস্থায় উপনীত হইলেই জলকে বলা হয় বরফ। এই অতি সাধারণ কঠিন পদার্থটির কিছু বিশেষত্ব আছে। অধিকাংশ পদার্থই কঠিন অবস্থায় আয়তনে হ্রাস পায়, অর্থাৎ সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু জল জমিয়া কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

বরফ জলে ভাসে; কিন্তু অন্য পদার্থের মত হইলে ইহা জলে ডুবিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় মেরুঅঞ্চলে যেখানে জল জমিয়া বরফ হয় সেখানে ঐ বরফ নদী, হ্রদ ও সাগরের তলদেশে জমিয়া থাকিত এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপ গভীর জলের তলদেশে প্রবেশ করিতে না পারায় উহা গলিবার অবকাশ পাইত না। শীঘ্রই হিমাঞ্চলের সমস্ত জল বরফে পরিণত হইত। যে সমুদ্র স্রোতের মাধ্যমে পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলের তাপ শীতল অংশে সঞ্চালিত হয়, তাহাও বন্ধ হইয়া যাইত। ফলে পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলে অসহ্য উত্তাপের সৃষ্টি হইত এবং বাকী অংশ তুষার মরুতে পরিণত হইত। উত্তাপের এইরূপ চরম অবস্থায় জীব সৃষ্টি আদৌ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহের বিষয়।

পৃথিবীর উপরিভাগের তিন চতুর্থাংশই জল; কাজেই সূর্যের তেজের অধিকাংশই সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে পতিত হয়। প্রধানতঃ এই ভাণ্ডারেই তাপরূপে সৌরশক্তি সঞ্চিত হইয়া চতুর্দিকে সরবরাহ হয়। সমপরিমাণ জল পৃথিবীর অন্য যে কোন পদার্থ অপেক্ষা অল্প উত্তপ্ত হইয়া অধিক পরিমাণে তাপ শুষিয়া লইতে পারে এবং অন্য পদার্থের তুলনায় জলের বাষ্পীভবনে অধিক তাপ প্রয়োজন হয়। এই কারণেই সমুদ্র বিপুলভাবে সৌরশক্তি সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন করিতে পারে।

সমুদ্র পৃথিবীর জলের ভাণ্ডার। পৃথিবীর স্থল ভাগের প্রয়োজন সম্পাদনে সমুদ্রজলের বাষ্পীয় অবস্থা পরিগ্রহ একান্ত আবশ্যক। এই রূপান্তরণের শক্তি দান করে সৌরতেজ; আর বাষ্প পরিচালনার শক্তি দান করে ঝড়-বাতাস। এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা না থাকিলে পৃথিবীর স্থলভাগ মরুভূমিতে পরিণত হইত, আমাদের জীবনধারণও সম্ভব হইত না।

ভূমণ্ডলের প্রতি বর্গমাইল পরিমাণ স্থান সৌররশ্মি হইতে প্রায় ৩·৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশই সমুদ্রের জল উত্তপ্ত করিতে ও বাষ্পীভবনে ব্যয়িত হয়। ঐ শক্তির পরিমাণ অর্ধেক হইলেও প্রতিবর্গমাইল সমুদ্র হইতে ঘণ্টায় প্রায় ৫৪·৫ টন জল বাষ্পীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে।

জলীয় বাষ্প হাওয়ায় চালিত হইয়া উপরে উঠে ও নানা দিকে ধাবিত হয়। উপরে উঠিলে বায়ুর চাপ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প সম্প্রসারিত হয়। ইহার ফলে বায়ু ও জলীয় বাষ্প উভয়েরই তাপমাত্রা হ্রাস পায়। বায়ু যত শীতল হয় উহার জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতাও তত হ্রাস প্রায়। এক ঘনফুট বায়ু ৫১° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে, ৩২° ডিগ্রিতে পারে মাত্র উহার অর্ধেক। বায়ু আরও শীতল হইয়া যখন সম্পৃক্ত হয়, জলীয় বাষ্প তখন তরল অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। তাপমাত্রা আরও কমিলে এবং বায়ু অতিসম্পৃক্ত হইলে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জলকণাগুলি আকারে এত ক্ষুদ্র যে, এইরূপ প্রায় ৮০ লক্ষ জলকণার সম্মিলনে একটি বৃষ্টির ফোঁটা সৃষ্টি হইতে পারে। এই অবস্থায় জলকণাগুলি অক্লেশে বায়ুর উপর ভর করিয়া চলিতে পারে।

বায়ুর অতিসম্পৃক্ত অবস্থায় বাষ্পাবস্থা হইতে জলকণার সৃষ্টির জন্য একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়। ধূলিকণা এই কেন্দ্রের স্থান পূরণ করে। এক

একটি ধূলিকণাকে আশ্রয় করিয়াই জলের ক্ষুদ্র কণাগুলি গঠিত হয়। বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার অভাব হয় না। খুব নির্মল বায়ুও ধূলিকণা বর্জিত নহে। এক বার মাত্র সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিলে আট বিলিয়ন সূক্ষ্ম কণা হাওয়ায় ভাসিয়া যায়। পৃথিবীতে নিয়ত কত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কত ঝড় বহিতেছে, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটিতেছে; কাজেই বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার কখনই অভাব ঘটিতে পারে না। এমন কি, গ্রহ-নক্ষত্র যে মহাশূন্যে ভাসিতেছে, সেই মহাশূন্যও ধূলিকণা বর্জিত নহে।

কোন কারণে বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণ ধূলিকণার অভাব ঘটিলে বায়ুর অতিসম্পৃক্ত অবস্থায়ও কতক পরিমাণে জলীয় বাষ্প তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া সেই অবস্থাতেই বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করিতে পারে। বিশুদ্ধ স্থির জলের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের নীচে নামিলেও উহা না জমিয়া যেমন তরল অবস্থাতেই থাকিতে পারে, বায়ুর অতিসম্পৃক্ত অবস্থায় ধূলিকণার অভাবে জলীয় বাষ্পও সেইরূপ তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া বাষ্পাবস্থাতেই থাকিতে পারে। বায়ু অধিকতর শীতল হইলে অবশ্য সমস্ত বাষ্পই ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয়।

বায়ুমণ্ডলে যখন বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলকণায় পরিণত হয় তখনই মেঘরূপে উহা আমরা দেখিতে পাই। বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে শীতল হইলে ক্ষুদ্র জলকণাগুলি সম্মিলিত হইয়া বৃহৎ বিন্দুর সৃষ্টি হয়; তখন আর বায়ু উহাদের ভার বহন করিতে পারে না এবং এই অবস্থাতেই বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির ফোঁটার আকার ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহের গতির উপর নির্ভর করে। বৃষ্টির ফোঁটার ব্যাস এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ হইতে পাঁচ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত যে কোন আকারের হইতে পারে। ঊর্ধ্বোত্থিত বায়ুর গতি ক্ষীণ হইলে বৃষ্টির ফোঁটার আকার ক্ষুদ্র হয়। বায়ুর গতি অধিক হইলে ফোঁটাগুলি বেশীক্ষণ বায়ুতে ভর করিয়া থাকিতে পারে এবং বড় হয়। এইরূপ অবস্থায় প্রায়শঃই বৃষ্টির সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়।

যে স্থানে বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টির বাস্তব গঠন সেই স্থানের ঊর্ধ্ব আকাশেই সংঘটিত হইয়া থাকে। বৃষ্টির ফোঁটা অন্যত্র সৃষ্টি হইয়া হাওয়ায় ভাসিয়া আসে, এরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। জলকণা খুব সূক্ষ্ম অবস্থাতেই মেঘরূপে হাওয়ায় ভাসিয়া চলিতে পারে। বৃষ্টির ফোঁটা গঠিত হইলে আর ঐরূপ ঘটা সম্ভব নয়। কাজেই যে স্থানে বৃষ্টিপাত হয় প্রকৃতপক্ষে ঐ স্থানের ঊর্ধ্ব আকাশের বায়ুর অবস্থার উপরই বৃষ্টির ফোঁটার গঠন নির্ভর করে।

প্রকৃতির এই বহুরূপী পদার্থ নানাভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইহা আমাদের দেহের অংশ এবং বায়ুর মতই আমাদের জীবন ধারণে নিত্যপ্রয়োজনীয়। জলের উপর শুধু যে আমাদের জীবন নির্ভর করে তাহাই নহে, আমাদের সুখ-সৌভাগ্যের মূলেও আছে জল। কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য জলের উপর নির্ভরশীল। নানাভাবে জলের শক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানবসভ্যতা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বাষ্পীয় শক্তিতে আমাদের রেল, জাহাজ, কলকারখানা চলে। স্থানে স্থানে নদীর জলপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগাইয়া নানাভাবে মানব-কল্যাণের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইতেছে। জল সমস্ত জীবের জীবন, জল মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির প্রধান উৎস।

সাপ

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য

প্রত্যেকেই আমরা সাপের সঙ্গে পরিচিত। হঠাৎ সাপ দেখলেই তাদের বিষাক্ত ছোবলের কথা ভেবে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই ধর্মবিশ্বাসে সাপের পূজা করে থাকে। পৃথিবীতে প্রতিবছর সাপের কামড়ে প্রায় দেড় লক্ষ লোক মারা যায়; তন্মধ্যে ভারতবর্ষে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিবছরে প্রায় কুড়ি হাজার।

সাপ শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী। পারিপার্শ্বিক উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাপের দেহের উষ্ণতারও পরিবর্তন হয়। সাপের কানের কাজ তাদের সমস্ত শরীরের দ্বারা সূচিত হয়। এদের চোখ খুব সজাগ। চোখের সামনে কোন বস্তু সচল অবস্থায় দেখলেই তাদের চোখ সেই বস্তুর প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখে এবং সুযোগ মত ছোবল মারবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। প্রত্যেক সাপই কোন ভীতিজনক বস্তু দেখলে বা শব্দ অনুভব করলে আত্মরক্ষার জন্যে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে থাকে। সাপ সাধারণতঃ ডাঙাতেই বাস করে; কিন্তু অনেকেই স্বচ্ছন্দে জলে সাঁতার কাটতে পারে। তবে জলচর সাপও অনেক রকমের আছে। জলচর সাপ সাধারণতঃ খুব বিষাক্ত। অধিকাংশ সাপই ডিম পাড়ে। এরা আলগা মাটি বা বালির গাদার মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে। সূর্যের উত্তাপে ডিমে তা' দেবার কাজ সম্পন্ন হয়। কোন কোন জাতের সাপ ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ডিমগুলোকে পাহারা দেয়। কয়েক জাতের সাপের বাচ্চা তাদের মাতৃগর্ভের ভিতরেই ডিম থেকে ফুটে বেরিয়ে আসে। সাপের চোখের পাতা নেই; চোখ দুটি কঠিন স্বচ্ছ চাক্‌তি দ্বারা ঢাকা থাকে। সাপের জিভ্ সরু ও লম্বা এবং মাঝখান দিয়ে চেরা। জিভ্‌টা একটি খাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং ইচ্ছামত ভিতরে বা বাইরে আনতে পারে।

সাপ তার দেহের পাঁজর ও আঁশের সাহায্যে আঁকাবাঁকা ভাবে চলাফেরা করে। সাপের চলাফেরার সময় কোন শব্দ শোনা যায় না, অথচ চলে খুব দ্রুতগতিতে।

সাপের উপর ও নীচের চোয়ালে দাঁত আছে। নির্বিষ সাপের উপরের চোয়ালে দু-সারি সরু, তীক্ষ্ণাগ্র বঁড়শীর মত বাঁকানো দাঁত আছে। বিষাক্ত সাপের উপরের চোয়ালে ভিতরের দিকে একসারি দাঁত থাকে। নীচের চোয়ালে কেবল-মাত্র একসারি একই রকমের দাঁত আছে। সব রকম বিষাক্ত সাপের দুটি মাত্র বিষদাঁত থাকে। বিষদাঁত ছাড়া অন্যান্য দাঁতগুলি মাড়ির মাংসে আবৃত থাকে। সাপের বিষদাঁত দুটি বাঁকানো, ভিতরে ফাঁপা, তীক্ষ্ণাগ্র ও ছিদ্রযুক্ত। বিষদাঁত দুটি বিষগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। উপরের চোয়ালে, চোখের একটু নীচে ও পিছনের দিকে বিষগ্রন্থি দুটি চোয়ালের পেশী দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সাপ যখন ছোবল মারতে উদ্যত হয় তখন এসব পেশীর সঙ্কোচনের ফলে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ একটি সরু নালী দিয়ে দাঁতের ভিতরে আসে। সাপের বিষ হলদে রঙের আঠালো তরল পদার্থ। বাতাসের সংস্পর্শে বিষ ছোট ছোট দানায় পরিণত হয়। সাপের বিষদাঁত দুটি ভেঙে দিলে দিন কয়েকের মধ্যেই নতুন বিষ দাঁত উদ্গত হয়।

সাপ স্বভাবতঃ হিংস্র প্রকৃতির সরীসৃপ এবং সহজে কারোর পোষ মানে না। বহুদিন সাপ পোষার পরেও সুযোগ পেলেই সাপ প্রতিপালককে

ছোবল মারতে ইতস্ততঃ করে না। সাপ মোটামুটি কতদিন বাঁচে, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা নেই। সাপের দেহ অনেক দিন পর্যন্ত সবল ও সুস্থ থাকে বলে মনে হয়। পাতঞ্জল যোগদর্শনে গোখ্‌রা সাপের আয়ুকাল দু-শ' বছর লেখা আছে। বয়স বিশেষে অবশ্য সাপ দুধ পান করে। শীতকালে সাধারণতঃ সাপ দেখা যায় না, কারণ শীত এরা সহ্য করতে পারে না। ঐ সময় যে যার গর্তের মধ্যে বা অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায় তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত কিছু না খেয়ে শীতঘুমে কাটিয়ে দেয়।

গোখরা সাপ

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাপের কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলেও বিষদাঁতের কার্যকারিতা বরাবর সমান থাকে। সাপ দুধ-কলা খেতে ভালবাসে বলে একটা কথা আছে। কিন্তু সর্প বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সাপ মোটেই দুধ-কলা পছন্দ করে না। সময়

সাপের দেহের তলার আঁশগুলো অপেক্ষাকৃত বড়। এর সাহায্যেই সাপ মাটির উপর চলাফেরা করে। সাপের চোয়াল আল্‌গাভাবে যুক্ত থাকে; এর ফলে সাপ আস্ত শিকারকে গিলে ফেলতে পারে। নীচের চোয়ালের দুটি অংশ চিবুকের

সঙ্গে একসঙ্গে যুক্ত থাকে না। একটার সঙ্গে আর একটা অংশ স্থিতিস্থাপক তন্তুর সাহায্যে জোড়া লাগানো থাকে।

অজগরই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সাপ। ভারতবর্ষের অজগর সাপ সাধারণতঃ ২৪।২৫ ফুট লম্বা হয়। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপের অজগর সাপ প্রায় ৩০ ফুট লম্বা হয়। এরাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অজগর। অজগর বিষাক্ত শ্রেণীর সাপ নয় বটে, কিন্তু ভয়ানক শক্তিশালী। সুযোগ পেলেই শিকারের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ফেলে এমন প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই শিকার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এর পরে শিকারকে মাথার দিক থেকে ধীরে ধীরে আস্ত গিলে ফেলে। মাঝারি ধরনের হাতী বা ঘোড়ার মত বড় বড় জন্তুকেও বাগে পেলে অজগর তাদের পিষে মেরে ফেলতে পারে। কিছুদিন আগে আসামের জঙ্গলে অজগরের বুনো হাতীর ঠ্যাং গিলে ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার অদ্ভুত ঘটনার কথা খবরের কাগজে অনেকেই পড়ে থাকবেন। অজগরের হজমশক্তি অদ্ভুত। এরা ভেড়া, বাচ্চা হরিণ, বাছুর প্রভৃতি গিলে খায়। অজগর ঘোড়া, মহিষ প্রভৃতি বড় বড় জন্তু গিলে খায় বলে শোনা যায়, তবে এসব কথার সত্যতা নির্ধারণ করা কঠিন। অজগর নিশাচর সাপ। আহারের পর এরা খুব অলস ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অবশ্য হজম হয়ে যাবার পর অজগর আবার শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়। শিকার অন্বেষণের সময় মানুষ অজগরের সামনে পড়লে তাদের আক্রমণ হাত থেকে রেহাই পায় না। দেখা গেছে বন্দী অবস্থায় অজগর অনাহারে প্রায় আড়াই বছর সুস্থভাবে বেঁচে থাকে। অজগর বেশীর ভাগই পাহাড় অঞ্চলে বাস করে; কিন্তু সময় সময় জলেও দেখা যায়।

গাছের ডালে জড়িয়ে ময়াল সাপ শিকার ধরবার জন্যে তৈরী হয়েছে

বৃক্ষচর বোড়া সাপ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অংশে বেশীর ভাগ দেখা যায়। সাধারণতঃ এরা ১২ থেকে ১৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের স্বভাবও অজগরের মত।

ভারতবর্ষের গোখরা সাপ সাধারণতঃ ৫/৬ ফুট লম্বা হয়। এরা বনেজঙ্গলে বাস করে। গোখরা অত্যন্ত মারাত্মক প্রকৃতির সাপ। এদের দংশনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দষ্ট জীব মারা যায়। গোখরা বেশীর ভাগ রাত্রিতে শিকার করে থাকে।

সাধারণতঃ বাদামী, কালো এবং সাদা রঙের গোখরা দেখা যায়। এদের ফণার উপর চশমার মত একটা দাগ থাকে। সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের গোখরা সাপ যখন ফণা বিস্তার করে উঁচু হয়ে ওঠে তখন ফণার গায়ে অদ্ভুত কতকগুলি দাগ পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। উত্তর ভারতের গোখরা সাপের ফণায় কতকগুলো কালো দাগ দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গোখরা সাপের ফণা গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের হয়ে থাকে। এসব সাপ নিয়ে নাড়া-চাড়া করবার পূর্বে তাদের বিষগ্রন্থিগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়। গোখরা সাপ উত্তেজিত হলে গলার দিকটা প্রসারিত করে ফণা বিস্তার করে। মিশর দেশের গোখরা সাপ ভারতীয় গোখরার চেয়ে অনেক বড় হয় এবং তারা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির। দক্ষিণ আফ্রিকার রিংহল কোব্রা শিকারের চোখে বিষ ছিটিয়ে তাকে অন্ধ করে ফেলে; তারপর তাকে আক্রমণ করে। গোখরা সাপ প্রায় সর্বভুক। এরা ছোট ছোট স্তন্যপায়ী জীব, ব্যাঙ, পাখী, ডিম, ইঁদুর প্রভৃতি আহার করে থাকে। শিকারের সন্ধান পেলে এরা ফণা বিস্তার করে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। দেহের সম্মুখভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খাড়া করে রাখে এবং পিছনের দুই-তৃতীয়াংশ দ্বারা নড়াচড়া করতে থাকে। ওই সময় গোখরা সাপ অত্যন্ত সতর্ক থাকে এবং সোজাভাবে ফণা তুলে মুখটিকে সর্বদাই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত রাখে। এই সময় এরা খুব জোরে হিস্-হিস্ শব্দ করতে থাকে এবং জলজলে চোখ দুটি শিকারের উপর নিবদ্ধ রাখে।

পাইথন জাতীয় সাপ তার ডিমে তা দিচ্ছে

ভারতবর্ষে গোখরা সাপের কামড়েই মৃত্যু হয় বেশী। ১/৮ গ্রেণ পরিমাণ গোখরা সাপের বিষ রক্তে প্রবেশ করলে মানুষের মৃত্যু অবধারিত। মানুষের মৃত্যুর পক্ষে এই হচ্ছে সব চেয়ে কম পরিমাণ বিষ।

শঙ্খচূড় অত্যন্ত মারাত্মক হিংস্র জাতের সাপ। এরা প্রায় ১৮ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। এদের ফণা খুব বেশী চওড়া হয় না। শরীরে কিছুটা অন্তর অন্তর পাত্‌লা সাদা রঙের বন্ধনীর মত দাগ দেখা যায়। ভারতবর্ষ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি

দেশে শঙ্খচূড় সাপ দেখা যায়। এদের বিষ অত্যন্ত মারাত্মক। রাসেল্‌স্ ভাইপার আর একটি বিষাক্ত শ্রেণীর সাপ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের গায়ের রং সাধারণতঃ গাঢ় বাদামী। এদের গায়ে লম্বালম্বিভাবে তিনটি কালো রঙের পাত্‌লা চক্র থাকে। মধ্যের চক্রটি সব চেয়ে বড়। এদের দেহের তলদেশ ফ্যাকাশে হল্‌দে, সাদা বা পাংশুটে রঙের হয়। এদের মাথাটা খুব বড় এবং মাথার উপর কতকগুলো কালো দাগ দেখা যায়। এরা নিশাচর সরীসৃপ। ক্রুদ্ধ হলে হিস্‌-হিস্ শব্দ করতে থাকে। ভারতবর্ষের রাসেল্‌স্ ভাইপার খুব জোরে হিস্-হিস্ শব্দ করে। এরাও অত্যন্ত মারাত্মক প্রকৃতির সাপ। এদের বিষ অত্যন্ত মারাত্মক এবং পরিমাণেও খুব বেশী থাকে। গরু প্রভৃতি প্রাণীর মস্তকের নরম অংশে ছোবল মেরে তাদের মেরে ফেলে। এদের দংশনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

চিতি সাপও বিষাক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের দংশনে মানুষ ১২ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে কদাচিৎ এদের দংশনের সংবাদ শুনা যায়। এরা তিন বা চার ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এদের গায়ের রং মিশকালো এবং তার উপর কতকগুলো আড়াআড়ি সাদা বন্ধনী দেখা যায়। এদের দেহের নিম্নভাগের কিছুটা সাদা বন্ধনী-যুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে কালো রং থাকে। ভারত-বর্ষের চিতি সাপের শরীরের সামনের দিকে অনেকটা পর্যন্ত কালো রঙের মধ্যে সাদা সাদা বিন্দু দেখা যায়। এগুলি পিছনের দিকে বন্ধনীর আকার ধারণ করে। চিতির দেহে ও মাথায় কোন পার্থক্য নেই। যে চিতি সাপের গায়ের রং একেবারে কালো তাদের বলা হয় কালনাগিনী। চাঁদ-সদাগরের কাহিনীতে এর উল্লেখ আছে।

আর এক জাতের চিতি সাপ আছে তারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬।৭ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের লেজ অনেকটা চ্যাপ্টা ফিতার মত এবং গায়ে হল্‌দে রঙের ডোরা কাটা থাকে। এদের বিষও মারাত্মক। এদের বলা হয় শাঁখামুটি

তিন চার ফুট লম্বা, ত্রিকোণ মস্তক সবুজ বা বাদামী রঙের একজাতের সাপ প্রায়ই গাছের উপর দেখা যায়। এরা এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে যেতে পারে। এদের দাঁত ও মাথা বড় এবং শরীরের মধ্য অংশে V-এর মত দাগ থাকে। এদের বলা হয় ল্যাকোসিস জাতীয় সাপ। আর এক জাতের সাপ দেখা যায় তাদের শরীর অত্যন্ত সরু এবং রং কালো। এরা বিষাক্ত শ্রেণীর সাপ নয়। এদের ডিপ্‌সেডোমরফাস বলা হয়। শরীরে অনেকগুলো সাদা রঙের V-চিহ্ন থাকে। ঘন মেটে রঙের উপর হল্‌দে বন্ধনীযুক্ত এক জাতের সাপ দেখা যায়। বন্ধনীগুলো পরপর সাজানো থাকে। এরা নির্বিষ সাপ। এদের বলা হয় লাইকোডন।

দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯।১০ ফুট, ফণাশূন্য, নির্বিষ, বাদামী বা সাদা রঙের সরু একজাতের সাপ আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়। এরা ঢ্যামনা সাপ নামে পরিচিত। লাউডগা সাপের কোন বিষ নেই। তাদের গায়ের রং সবুজ; দেহ অত্যন্ত সরু ও মুখ অত্যন্ত সূচালো। হেলে সাপ নির্বিষ। তাদের গায়ের রং হল্‌দে-কালোয় মিশানো। চন্দ্রবোড়া বিষধর সাপ। এরা ৩।৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গায়ের রং মেটে এবং তার উপর সোনালী রং আছে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় এরা ভীষণভাবে হিস্-হিস্ শব্দ করে।

র‍্যাট স্নেক ভারতবর্ষে ও সিংহলে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এরা বিষাক্ত জাতের সাপ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ক্রুরস্বভাব। আক্রান্ত না হলে কোন মানুষ বা প্রাণীকে এরা আক্রমণ করে না। উত্তেজিত হলে গলাটাকে চ্যাপ্টা করে দেয়, কিন্তু ফণা ধরে না। এরা একবারে কুড়িটি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ভারতবর্ষের কোন কোন অংশের লোক এ জাতীয় সাপ বাড়ীর মধ্যে থাকা শুভ ঘটনা বলে মনে করেন।

ক্যাট স্নেক বিষাক্তজাতের সাপ; সাধারণতঃ গাছে থাকে, লম্বায় প্রায় ৬ ফুট পর্যন্ত হয়। এরা গোখরো, চিতি বা আফ্রিকার মাম্বা সাপের মত বিষধর নয়।

আফ্রিকার মাম্বা, আমেরিকার র‍্যাটেল সাপ ও রাসেল্‌স্‌ ভাইপার হলো সর্বাপেক্ষা উগ্র প্রকৃতির বিষধর সাপ।

এছাড়া কানা সাপ, উড়ন্ত সাপ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের গায়ের রং ঘন সাদা, লাল, সবুজ, নীল প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। দেহ ও অস্থির গঠন পদ্ধতি সকল জাতের সাপের প্রায় একই রকম হয়ে থাকে।

সকল জাতের সাপই একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর খোলস ত্যাগ করে। খোলসগুলো অত্যন্ত পাত্‌লা ও স্বচ্ছ হয়। পাহাড়, গাছ বা ঘাসের উপর সাপ খোলস ত্যাগ করে।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বিভিন্ন জাতের সাপের খোঁজ পাওয়া গেছে। বিষাক্ত জাতীয় সাপের সংখ্যা হলো প্রায় ষোলশত। সাধারণতঃ ভারবর্ষ, সিংহল, মালয় প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন জাতীয় সাপ দেখা যায়।

সাপে-কাটা রোগী ভাল করবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণা হচ্ছে সর্পবিষ প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছেন।

অ্যাসিটিলিন

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

কার্বন পরমাণুর চারটি সংযুক্তির (Valency) মধ্যে প্যারাফিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনগুলিতে সব কয়টিই সম্পৃক্ত। কিন্তু ইথিলিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনগুলিতে পার্শ্ববর্তী পরমাণুর দুটি করে এবং অ্যাসিটিলিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনে তিনটি করে সংযুক্তি অসম্পৃক্ত থাকে। অ্যাসিটিলিনের কার্বন পরমাণুর সংযুক্তির অসম্পৃক্ততার জন্যে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে অ্যাসিটিলিনের বহুবিধ বিক্রিয়া আছে এবং বিভিন্ন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অ্যাসিটিলিন থেকে উৎপন্ন এই বিবিধ রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে অনেকগুলি বর্তমান রাসায়নিক ও ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই অ্যাসিটিলিন শ্রেণীর অন্যান্য হাইড্রোকার্বনগুলি খুব প্রয়োজনীয় না হলেও উক্ত শ্রেণীর মুখপাত্রটির (C_2H_2) ব্যবহার অত্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগে। কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্যের সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই অ্যাসিটিলিন গ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

অ্যাসিটিলিন গ্যাস প্রথম উৎপন্ন করেন এড্‌মণ্ড ডেভি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে। পটাসিয়াম ধাতু তৈরী করবার সময় পরিত্যক্ত অবিশুদ্ধ তলানিতে জল দিয়ে ডেভি এই গ্যাস তৈরী করেছিলেন এবং উহার নাম দিয়েছিলেন বাইকারবুরেট অব হাইড্রোজেন। বর্তমান নাম অ্যাসিটিলিন দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী বার্থেলো ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। তিনিই প্রথম এই গ্যাসের ধর্ম ও তার উপাদান বের করেন। বছর দুই পর উহ্‌লার প্রথম দেখান, ক্যালসিয়াম কারবাইড ও জলের বিক্রিয়ার দ্বারা এই গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব। উইলসন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সর্বপ্রথম এই ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) তৈরী করেন।

সাধারণতঃ অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার দ্বারা। ক্যালসিয়াম কার্বাইড হচ্ছে এক রকম কঠিন ধূসর বর্ণের পাথর। চুনের (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) সঙ্গে কার্বনকে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ২৫০০°-৩০০০° সেঃ গ্রেঃ উত্তপ্ত করলে পাথরের মত কঠিন কার্বাইড পাওয়া যায়। সামান্যতম জলের সংস্পর্শে এলেই এই কঠিন কার্বাইড থেকে অ্যাসিটিলিন বের হতে থাকে এবং কঠিন কার্বাইড ভেঙ্গে পাউডারের মত ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়। এই কার্বাইড থেকে উৎপন্ন অ্যাসিটিলিন বিশুদ্ধ নয়, বিশ্রী গন্ধযুক্ত; কিন্তু বিশুদ্ধ অ্যাসিটিলিন গন্ধহীন। কার্বাইড থেকে উৎপন্ন অ্যাসিটিলিনের বিশ্রী গন্ধের কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া, ফস্‌ফিন, আর্সিন প্রভৃতির উপস্থিতি। এ ছাড়াও কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সামান্য মাত্রায় থাকে। কার্বাইডের অবিশুদ্ধ খাদ (যেমন ক্যালসিয়াম সালফাইড, ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফাইড, ক্যালসিয়াম সিলিসাইড, ক্যালসিয়াম আর্সেনাইড প্রভৃতি) অনুসারে এদের সংখ্যা ও পরিমাণ কম বেশী হয়। রাসায়নিক ও শারীরিক দিক থেকে অ্যাসিটিলিনের এই খাদগুলি অনিষ্টকর। জল দিয়ে ধুইয়ে দিলে অনেকগুলিই দূর হয়ে যায়। এই গ্যাসকে বিশুদ্ধ করবার জন্যে অনেক রকম পদ্ধতি আছে—যেমন, হাইড্রোক্লোরিক ও মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশ্রিত দ্রবণের মধ্য দিয়ে চালিত করান; অ্যাসিড মিশ্রিত কপার সালফেট দ্রবণ, অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত ক্রোমিক অ্যাসিড, ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম, লিথিয়াম, বেরিয়াম, ষ্ট্রন্‌সিয়াম প্রভৃতি কার্বাইড থেকেও অনুরূপভাবে জলের বিক্রিয়ায় সাহায্যে অ্যাসিটিলিন পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ অ্যাসিটিলিন পাওয়া সম্ভব লিথিয়াম কার্বাইড থেকে।

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও অন্য উপায়ে অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করা হয়। হাইড্রোজেনের মধ্যে কার্বন ইলেকট্রোডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-আর্ক সৃষ্টি করলে শতকরা ১০ ভাগ অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন হয়। কষ্টিক পটাসের সাহায্যে ১-২-ডাইক্লোরোইথেন (CH_2Cl-CH_2Cl) ও ১-১-ডাইক্লোরোইথেন (CH_3CHCl_2) থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অপসারণ দ্বারা অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন হয়। অসম্পৃক্ত ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (ম্যালিক ও ফিউম্যারিক অ্যাসিড) ও তাদের লবণকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করেও অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করা হয়। খুব বেশী উত্তাপে কম অক্সিজেনে মিথেনকে আংশিক দাহন করে জার্মেনীতে অ্যাসিটিলিন তৈরী করা হয়েছে। এখানে উৎপাদন প্রায় ৩০%। এর চেয়ে বেশী উৎপাদন হয় (প্রায় ৪৫%)। এরূপ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটিলিন উৎপাদিত হয়েছিল। কয়লার হাইড্রোজেনেশন থেকে উৎপন্ন মিথেনকে ক্র্যাকিং পদ্ধতিতে বিজারিত করে অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করা হয়েছিল। ন্যাচার্যাল গ্যাসে যে সব গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায় তাদের উত্তাপে বিভাজন (Pyrolysis) করে অ্যাসিটিলিন পাওয়া সম্ভব। হয়তো ভবিষ্যতে এই সম্ভাব্যতা কার্যে রূপান্তরিত হবে।

বিশুদ্ধ অ্যাসিটিলিন বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। সামান্য পরিমাণে ইহা বিষাক্ত নয়, তবে বাতাসে ৪০% গ্যাস থাকলে শ্বাসরোধ ঘটে। অ্যাসিটিলিন বাতাসের মধ্যে খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে এবং কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হয়। দহনের উত্তাপে অ্যাসিটিলিন আংশিকভাবে ভেঙ্গে কার্বন কণায় পরিণত হয় এবং প্রজ্বলন কালে কার্বন কণাগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে বলে

অ্যাসিটিলিন এখনও আলোক বর্তিকা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বায়ু ও অ্যাসিটিলিনের মিশ্রণ খুবই বিস্ফোরক। বায়ুতে শতকরা ৫-৮০ ভাগ পর্যন্ত অ্যাসিটিলিন থাকলেই এই মিশ্রণ বিস্ফোরক হবেই। ৫%-এর নীচে এবং ৮০%-এর উপরে থাকলে সাধারণতঃ বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিনের মিশ্রণ আরও বেশী বিস্ফোরক।

অ্যাসিটিলিনকে তরল ও কঠিন করা যায়। তরল বায়ুতে অ্যাসিটিলিন জমে গিয়ে দানাদার কঠিন পদার্থ হয়ে যায় এবং তখন তাকে মোমবাতির মত জ্বালানো যায়। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক খুব কাছাকাছি বলে কঠিন অ্যাসিটিলিন সাধারণ উত্তাপে তরল অ্যাসিটিলিনে পরিণত না হয়েই বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হতে থাকে।

অ্যাসিটিলিন শতকরা ১ ভাগ (আয়তন) জলে দ্রবণীয় (১৫° সেঃ গ্রেঃ)। কিন্তু এই দ্রবণীয়তা চাপ ও অধিক ঠাণ্ডায় বাড়ে—উহা জলের সঙ্গে কঠিন দানাদার পদার্থ (C_2H_2, $6H_2O$) গঠন করে। তেমনি বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় দানাদার পদার্থ তৈরী করে। বেঞ্জিন ও ক্লোরোফর্ম নিজেদের আয়তনের চার গুণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস শোষণ করতে পারে (১৮° সেঃ গ্রেঃ); অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহল প্রায় ৬ গুণ শোষণ করতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে অ্যাসিটোন। সাধারণ চাপে (১৫° সেঃ গ্রেঃ) অ্যাসিটোন প্রায় ২৫ গুণ, ১২ গুণ পরিমিত বায়ুর চাপে প্রায় ৩০০ গুণ এবং -৮০° সেঃ গ্রেঃ ঠাণ্ডায় প্রায় ২০০০ গুণেরও বেশী অ্যাসিটিলিন শোষণ করতে পারে।

গ্যাসীয় অ্যাসিটিলিনকে তরল করে ইস্পাতের পিপায় ভর্তি করে প্রচুর পরিমাণে রাখা বা বিদেশে পাঠানো অসুবিধাজনক। কারণ তাপগ্রাহী যৌগ বলে তরল অবস্থায় অ্যাসিটিলিনের বিস্ফোরণের সম্ভাবনা আছে। যে কোন আঘাত বা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সংস্পর্শে তরল অ্যাসিটিলিন আলোক এবং উত্তাপ সহ বিস্ফোরিত হয়ে বায়ু এবং কার্বন ও হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলোক-বর্তিকার জন্যে প্রথম যখন তরল অ্যাসিটিলিন ব্যবহার করা হতো তখন উক্ত কারণে বহু মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে আইন করে অ্যাসিটিলিন তরল করা ও তরল অ্যাসিটিলিন সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। বর্তমানেও আইনের সাহায্য অ্যাসিটিলিনের তরলীকরণ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিস্ফোরণ এড়াবার জন্যে ষ্টিলের পিপায় অ্যাসিটোন, অ্যাসবেস্টস এবং অন্যান্য যে সব সছিদ্র পদার্থ তরল অ্যাসিটিলিন শোষণ করতে পারে, তাদের মধ্যে ভর্তি করে রাখা হয়। এভাবে পিপায় রক্ষিত অ্যাসিটিলিনের সাহায্যে কোন কোন যানবাহনে এখনও আলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং অক্সিজেনের সঙ্গে ব্যবহার করে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার কাজ হয়। প্রয়োজনানুসারে পিপায় গ্যাসকে সোডিয়াম বাই-সালফাইটের দ্রবণের দ্বারা ধুইয়ে অ্যাসিটোন সরিয়ে দিয়ে চুনের (ক্যালঃ অক্সাইড) সাহায্যে বিশুদ্ধ করা হয়।

অ্যাসিটিলিনের কার্বন পরমাণুর তিনটি করে সংযুক্তি অসম্পৃক্ত বলে হ্যালোজেন, হ্যালোজেন অ্যাসিড, হাইড্রোজেন প্রভৃতির সঙ্গে অ্যাসিটিলিনের অনেকগুলি অতিরিক্ত বিক্রিয়া হয়ে থাকে। অসম্পৃক্ততার জন্যে উহার পলিমেরিজেশনও হয়; অর্থাৎ অনেকগুলি অ্যাসিটিলিন অণু একত্রিত হয়ে ভিন্ন গুণসম্পন্ন বৃহত্তর অণু সৃষ্টি করে।

বার্থেলো প্রথমে মনে করেছিলেন অ্যাসিটিলিন কোল-গ্যাসের স্থান দখল করবে। কিন্তু তা হলো না। তারপর দ্রাবক হিসেবে ব্যবহারের জন্যে ক্লোরিন-ঘটিত জৈব যৌগ উৎপাদনের চেষ্টা করা হলো। কিন্তু দেখা গেল অ্যাসিটিলিন থেকে অ্যালডিহাইড তৈরী করা সম্ভব। তখন শিল্প-ব্যবস্থায় অ্যাসিটিলিনের মূল্য বেড়ে গেল। প্রথম মহাযুদ্ধ ও

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অ্যাসিটিলিন থেকে কৃত্রিম প্লাষ্টিক ও রাবার তৈরীর প্রারম্ভিক দ্রব্যসমূহ তৈরী করবার দিকে বিজ্ঞানীদের ঝোঁক গেল। একদিকে ভিনাইল ইষ্টার তৈরী করে তা থেকে পলিমেরাইজ করে বিভিন্ন প্লাষ্টিক এবং অন্যদিকে অ্যাসিটিলিন থেকে ভিনাইন অ্যাসিটিলিন করে তা থেকে পলিমেরাইজ করে ক্লোরোপ্রিন, আইসোপ্রিন, ডিউপ্রিন প্রভৃতি কৃত্রিম রাবার তৈরীর চেষ্টা সফল হলো। এই অ্যাসিটিলিন থেকে যে কত রকমের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হচ্ছে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো।—

অ্যাসিটিলিন (C_2H_2)

- ভিনাইল অ্যাসিটেট
  - ইথিলিডিন-ডাই-অ্যাসিটেট
  - প্লাষ্টিক পলিমার
- ভিনাইল ক্লোরাইড
  - প্লাষ্টিক পলিমার
- অ্যালডিহাইড
  - অ্যাসিটিক অ্যাসিড → অ্যাসিটোন, অ্যাসিটিক অ্যান-হাইড্রাইড
  - অ্যালডল
  - ইথাইল অ্যাসিটেট
  - বিউটাইল অ্যালকোহল
  - বিউটাডাইন → (সিন্‌থেটিক) রাবার
- বেঞ্জিন
- কিউপ্রিন
- ভিনাইল অ্যাসিটিলিন
  - ক্লোরোপ্রিন → আইসোপ্রিন → (সিন্‌থেটিক) রাবার
  - ফর্মোপ্রিন
  - ডাই-ভিনাইল অ্যাসিটিলিন → সিন্‌থেটিক ড্রাইং অয়েল
- টেট্রা-ক্লোরো-ইথেন
  - ট্রাই-ক্লোরো-ইথিলিন
- ভিনাইল ইথার
- ইথিলিন
  - গ্লাইকল
  - ষ্টাইরিন
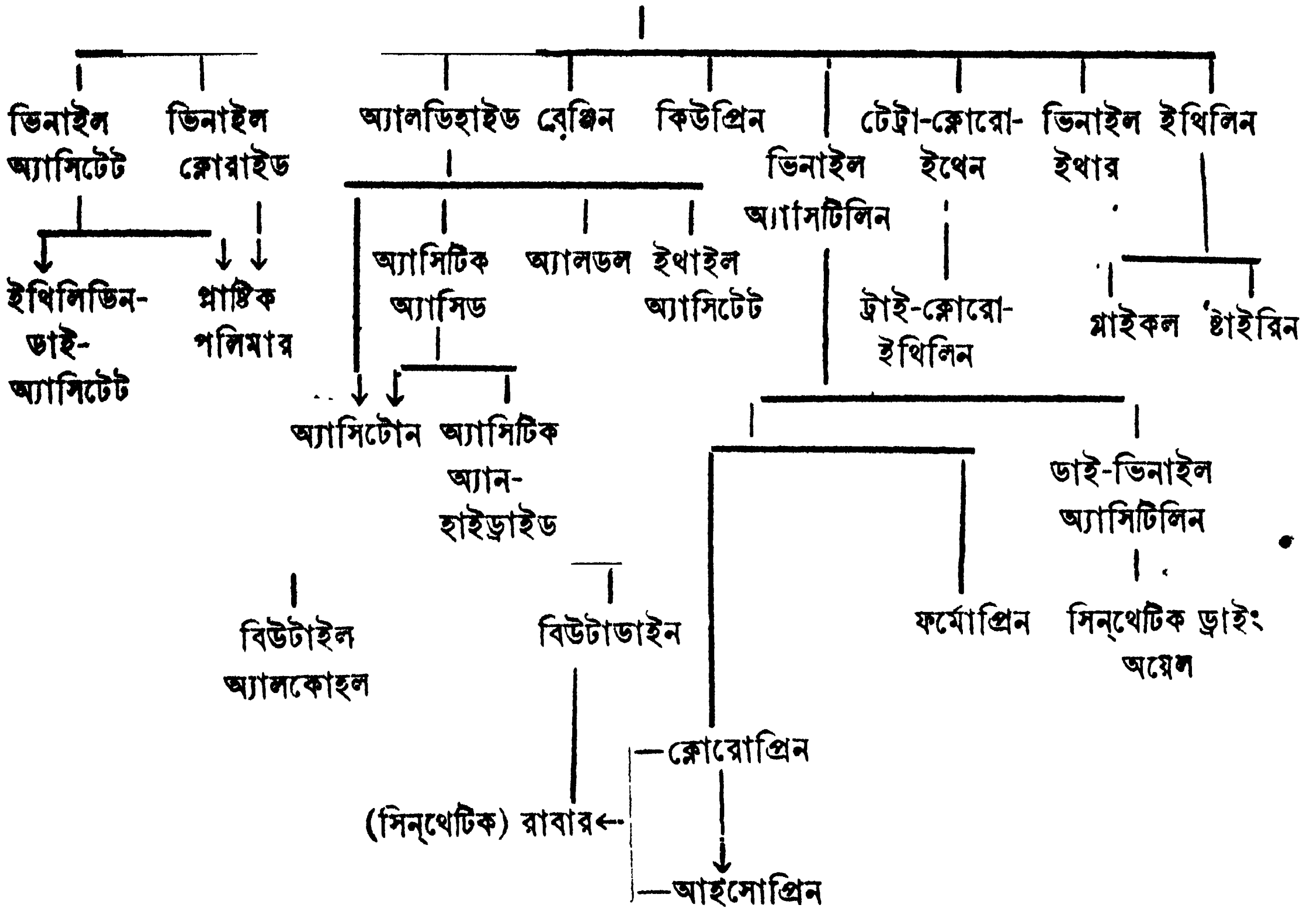
লোহিত তপ্ত লৌহ-চোঙের মধ্য দিয়ে অ্যাসিটিলিন গ্যাস চালনা করালে পরিমেরিজেশনের ফলে বেঞ্জিন (C_6H_6) তৈরী হয়।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড ও অ্যামোনিক ক্লোরাইড দ্রবণে অ্যাসিটিলিন চালনা করে ভিনাইল অ্যাসিটিলিন ($CH_2=CH-C\equiv CH$) ও ডাই-ভিনাইল-অ্যাসিটিলিন ($CH_2=CH-C\equiv C-CH=CH_2$) উৎপাদন করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে যে রাবার তৈরী হচ্ছে তাতে প্রারম্ভিক পদার্থ হিসেবে এই দুটি অ্যাসিটিলিন বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

অ্যাসিটিলিন থেকে অ্যালডিহাইড তৈরী করা হয়। প্রথমতঃ সদ্য উত্তপ্ত কাঠ-কয়লাতে অ্যাসিটিলিন শোষণ করে নেওয়া হয়। তারপর আবদ্ধ পাত্রে এই কাঠ-কয়লাকে জলে উত্তপ্ত করলে প্রথমে ভিনাইল অ্যালকোহল এবং পরে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়াকে প্রভাবনের দ্বারা (মারকিউরিক অক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিড) প্রভাবিত করে শিল্প ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণ অ্যালডিহাইড পাওয়া যায়। প্রভাবক মারকারি ঘটিত লবণের মধ্য দিয়ে কম উত্তাপে (প্রায় ৫০° সেঃ গ্রেঃ) সালফিউরিক অ্যাসিডে

রক্ষিত মারকিউরিক অক্সাইডের দ্রবণের মধ্য দিয়ে অ্যাসিটিলিন চালনা করা হয়। এভাবে উৎপন্ন অ্যালডিহাইডকে ম্যাঙ্গানিজ অ্যাসিটেটের সংস্পর্শে বায়ুর সাহায্যে জারিত করে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) পাওয়া যায়। এই অ্যালডিহাইড থেকে অ্যাসিটোন, অ্যালডল, অ্যাসিটেট, অ্যালকোহল ইত্যাদি পাওয়া যায় বলে অ্যালডিহাইড উৎপাদনের জন্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটিলিন ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৃত্রিম রাবার ও প্লাষ্টিক হিসাবে যে ভিনাইল রেজিনসমূহ ব্যবহৃত হয় সেগুলিও অ্যাসিটিলিন থেকে পাওয়া যায়। মারকারি-ঘটিত লবণ বা অ্যাসিটিল সালফিউরিক অ্যাসিডের (৮০%) প্রভাবনের দ্বারা অ্যাসিটিক অ্যাসিড সহযোগে অ্যাসিটিলিন থেকে ভিনাইল অ্যাসিটেট তৈরী হয়। কৃত্রিম রাবার ও প্লাষ্টিক শিল্পে ব্যবহৃত ভিনাইল রেজিন উৎপন্ন হয় ভিনাইল অ্যাসিটেট থেকে।

অ্যাসিটিলিনের ক্লোরিনঘটিত যৌগসমূহ দ্রাবকের কাজ করে। অ্যাসিটিলিনের শিল্পে উপ-উৎপাদন হিসেবে যে হেক্সা-ক্লোরো-ইথেন পাওয়া যায়, সেগুলি সহজেই ঊর্ধ্বপাতনে কর্পূরের মত দানাদার পদার্থে পরিণত হয়।

অ্যামোনিয়া মিশ্রিত কপার-ঘটিত বা সিলভার-ঘটিত দ্রবণে অ্যাসিটিলিন চালনা করলে কপার অ্যাসিটিলাইড (C_2Cu_2, লালচে) ও সিলভার অ্যাসিটিলাইড (C_2Ag_2, সাদা) হয়। শুষ্ক অবস্থায় উহারা সামান্য স্পর্শেই বিস্ফোরিত হয়। অনেক সময় বিস্ফোরক হিসাবেও উহারা কাজে লাগে। যুদ্ধে ব্যবহৃত মাষ্টার্ড গ্যাসের ন্যায় লিউইসাইট (বিটা-ক্লোরো-ভিনাইল-ডাই-ক্লোরো-আরসিন) তৈরী করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিলিন ও আর্সেনিক ট্রাই-ক্লোরাইডের বিক্রিয়ার দ্বারা।

রাসায়নিক দিক ছাড়াও অ্যাসিটিলিনের ব্যবহার হচ্ছে কলকারখানায়, গৃহস্থালিতে এবং চিকিৎসায়। কলকাতার রাস্তায় রাত্রিবেলায় হকারেরা যে গ্যাসবাতি নিয়ে বসে তা অ্যাসিটিলিনের আলো। গ্যাসবাতির নীচের অংশে বদ্ধ কৌটায় ক্যালসিয়াম কারবাইড থাকে এবং কৌটার চারপাশে জল রাখবার ব্যবস্থা আছে। এই জল চুইয়ে চুইয়ে কারবাইডের সংস্পর্শে এসে গ্যাস নির্গত হয় এবং জ্বালিয়ে দিলে বার্ণারের মুখে উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে। বৈদ্যুতিক আলো বিস্তারের পূর্বে সাইকেল, ট্রাক, মোটর প্রভৃতি যানবাহনে গ্যাসবাতির মতই অ্যাসিটিলিন আলোর ব্যবস্থা ছিল।

অ্যাসিটিলিনের বেশী ব্যবহার হচ্ছে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখায়। এই শিখার সাহায্যে ৩৫০০° সেঃ গ্রেঃ পর্যন্ত তাপ পাওয়া সম্ভব। বড় বড় ধাতব শিল্পের কারখানায় অক্সিঅ্যাসিটিলিন শিখার সাহায্যে ধাতবখণ্ড জোড়া লাগানো হচ্ছে। সম্পূর্ণ দহনের জন্যে প্রতি দু-ভাগ অ্যাসিটিলিনের জন্যে ৫ ভাগ (আয়তন) অক্সিজেনের দরকার [$2C_2H_2 + 5O_2 = 4CO_2 + 2H_2O$]; কিন্তু অক্সিঅ্যাসিটিলিন শিখায় সমপরিমাণ অ্যাসিটিলিন ও অক্সিজেন লওয়া হয়। বাকী অক্সিজেন দহনকালে বায়ুমণ্ডল থেকে পাওয়া যায়।

তারপর গুরুত্বের দিক দিয়ে অক্সিঅ্যাসিটিলিন-কাটিং-এর কথা বলা যেতে পারে। ভারী ভারী ধাতবপাত এই শিখার সাহায্যে কাটা হচ্ছে। যে স্থানে কাটা হবে বা ছিদ্র করা হবে প্রথমে তা অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার সাহায্যে অধিক উত্তাপে কোমল করা হয়। তারপর উচ্চচাপে একটি দ্রুতগতি প্রবাহ (jet) ঐ কোমল অংশে বিদ্ধ করা হয়। ফলে কোমল ধাতবখণ্ড কাটা হয়ে যায়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উপরিভাগে কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, টাংষ্টেন, মোলিবডিনাম ধাতুর শক্ত আবরণ দেওয়া হয়। এই আবরণ দেওয়ার সময় অক্সিঅ্যাসিটিলিন শিখার সাহায্য নেওয়া হয়।

মোটরের অন্তর্দাহন যন্ত্রে পেট্রোলিয়ামের পরি-

বর্তে অ্যাসিটিলিন ব্যবহারের সম্ভাব্যতার পরীক্ষা হচ্ছে। হয়তো ভবিষ্যতে পেট্রোলিয়ামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

অ্যাসিটিলিনের নিদ্রাকর্ষক গুণ আছে বলে নারসাইলিন নামে অত্যন্ত বিশুদ্ধ অ্যাসিটিলিন ওষুধে ব্যবহৃত হয়। প্রভাবক রেণী নিকেলের সাহায্যে অ্যাসিটিলিন যৌগকে আংশিক হাইড্রোজেন-যুক্ত করে যৌন-হর্মোন উৎপাদন করা হচ্ছে।

মেষ ও অষ্ট্রেলিয়াজাত মেরিণো পশম

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য

বোনা তন্তুকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; যথা—প্রাকৃতিক তন্তু এবং কৃত্রিম তন্তু। আবার প্রাকৃতিক তন্তুকে তিন ভাগে, যথা—অ্যানিমেল (প্রোটিন)—পশম, পশুজ লোম ও রেশম, ভেজিটেবল (সেলুলজিক্)—তুলা, কেপক; পাট, সিসেল ইত্যাদি; মিনারেল—এস্‌বেস্টস্, এইরূপে ভাগ করা হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, পশম যাহা মেষের লোম হইবে তাহা প্রাকৃতিক পশুজ এবং ইহা প্রোটিন জাতীয় পদার্থ।

সাধারণতঃ প্রোটিনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা—অ্যানিমেল প্রোটিন ও ভেজিটেবল প্রোটিন। পশম একটি অ্যানিমেল বা জৈব প্রোটিন। প্রোটিনের প্রধান মূল হইতেছে এমিনো অ্যাসিড যাহা এককভাবে অবস্থান না করিয়া রাসায়নিক সংযোগে লম্বা মালার মত অবস্থান করে। এই লম্বা মালা "পলিপেপ্‌টাইড চেইন্" নামে অভিহিত হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় পশমে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার বা গন্ধক পাওয়া যায়।

একটি পশম তন্তুর ব্যাস ঊর্ধ্বে ৬০ মাইক্রন এবং নিম্নে ৬ মাইক্রন হইবে। এক মাইক্রন $=\frac{1}{10,000}$ সেন্টিমিটার। মেষশাবকের লোম প্রাপ্তবয়স্ক ভেড়ার লোম অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম। পশম টানিলে শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। এই প্রসারিত টানের চাপ অল্পক্ষণ থাকিলে এই প্রসারনের জন্য লোমের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইবে না। পশমের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রায় হয় না বলিলেই চলে। পশম সমস্ত তন্তুর চাইতে হাল্‌কা এবং সমপরিমাণ জলের ওজনের ১.৩ গুণ মাত্র ভারী। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ হিসাবে নাইলন ১.১৪, রেশম ১.২২-১.২৫, কেজিন ১.২৯, পশম ১.৩০, অ্যাসিটেটেড্ রেয়ন ১.৫৪ ও ফাইবার গ্লাস ২.৫৪।

আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তুলা, রেশম, রেয়ন নাইলনের যে কোনও একটি তন্তু অপেক্ষা পশম বেশী আর্দ্রতা শোষণ করিতে পারে। শতকরা ১০০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পশম শতকরা ৩৩ ভাগ পর্যন্ত আর্দ্রতা শোষণ করে। পশম সমান মাপের লৌহ তারের অনুরূপ শক্ত বলা যায়। তন্তুর গড় আর্দ্র শক্তি পরিমাপ হিসাবে (১০০ শুষ্ক অবস্থার শক্তি ধরিয়া) তুলা ও লিনেনের ১১০-১২২, গ্লাসের ৯৫, পশমের ৮০-৯০, নাইলনের ৮৫, রেশমের ৭৫-৮৫, অ্যাসিটেটেড রেয়নের ৬৫-৭০ ও ভিস্‌কাস্ রেয়নের ৪৫-৫৫ হইয়া থাকে।

পশমে ময়লা খুব গভীর ভাবে বসিয়া যাইতে পারে না এবং ইহা তাপ অপরিচালক।

পশমী বস্ত্র ধুইবার জল ঈষদুষ্ণ হওয়া প্রয়োজন; কারণ জলের তাপের আকস্মিক পরিবর্তন পশমী বস্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। কাজেই পশমী বস্ত্র ধুইবার বা ইস্ত্রি করিবার পদ্ধতি অন্যান্য বস্ত্রের মত হইবে না। ইস্ত্রির তাপ ৩০০ ডিগ্রী বা ইহার কম হওয়া প্রয়োজন; তাহা না হইলে পশমী বস্ত্র পুড়িয়া যাইতে পারে। জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়, যাহাতে সাবান লাগিয়া না থাকে। পশমের বস্ত্র কখনও আগুনের আঁচে শুকাইতে নাই, ইহাতে পশমের রং ও মসৃণতা নষ্ট হয়। অত্যধিক রগড়াইলে, অনেকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে, জল অত্যধিক গরম হইলে বা ক্ষার দ্রব্যের প্রয়োগে, যথাযথ টানা দেওয়া বা প্রসারিত করিবার অব্যবস্থায়
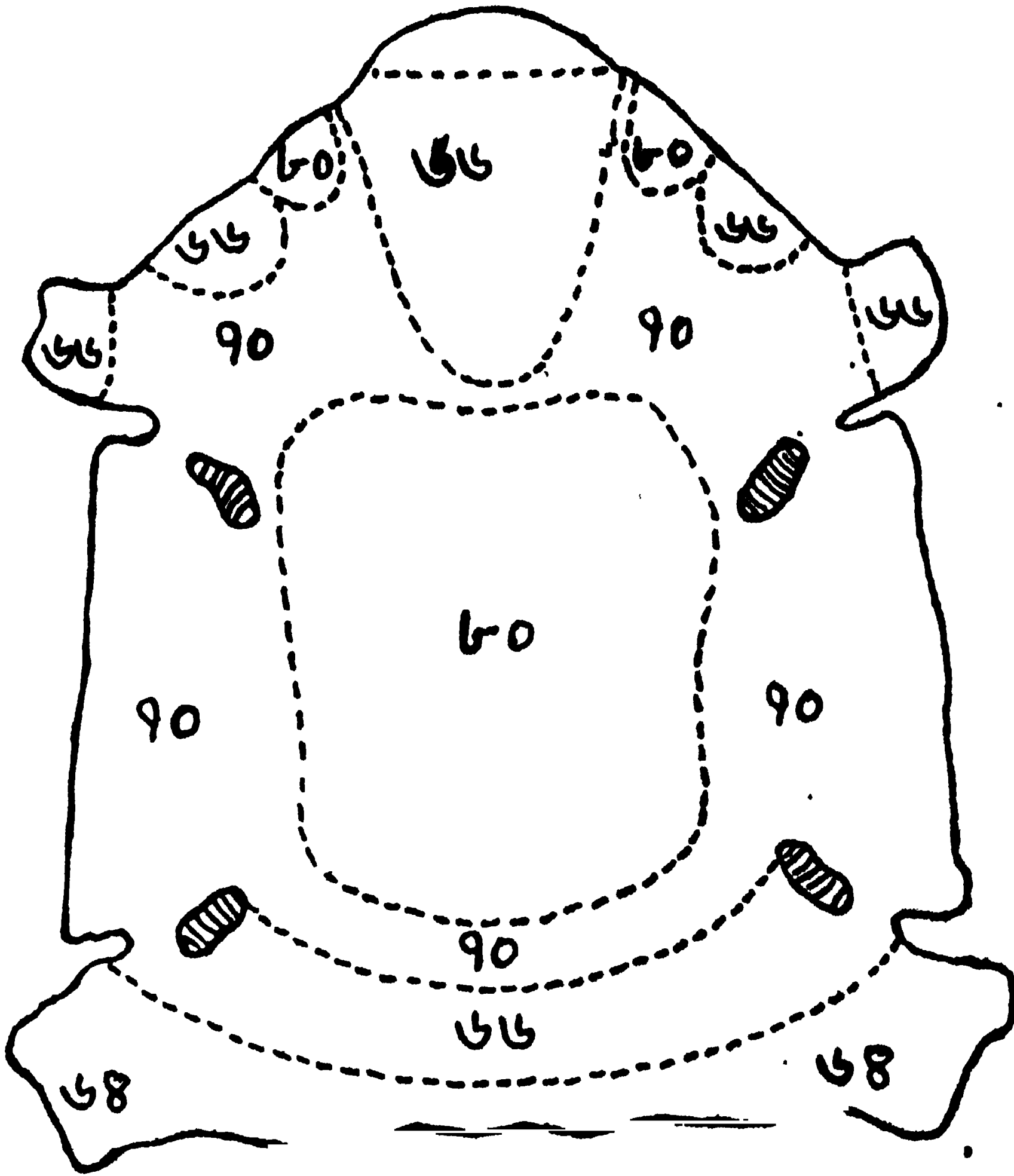
উন্নত মেরিণো মেষের চামড়ার বিভিন্ন অংশের পশম
হইতে যত প্রকার নম্বরি সুতা প্রস্তুত হইয়া থাকে

পশমী বস্ত্র অল্প ভিজা থাকিলেও সহজে অনুভূত হয় না, সেইজন্য ইস্ত্রি করিবার পর কিছুক্ষণ হাওয়ায় রাখিতে হয়। পশমী বস্ত্রে সাবান ঘষিয়া দেওয়া ঠিক নয়, উহাতে পশমের আঁশগুলি কুঞ্চিত হইয়া সরিয়া যাইতে পারে। আবার সাবান হইতে ক্ষার টানিয়া লইবার ক্ষমতা পশমের অদ্ভুত; এই কারণে বার বার পশমের কাপড় ধুইবার পর কুঁচকাইয়া যায়। পশমী বস্ত্রে (বিশেষতঃ সাদা রঙের) অ্যামোনিয়া ব্যবহার করিতে নাই; ইহাতে পশমের উজ্জ্বল রং নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রকমের পশমের মধ্যে মেরিণো মেষের পশমই প্রধান। এই পশম অষ্ট্রেলিয়া-

জাত মেরিণো মেষ হইতে পাওয়া যায়। মেরিণো জাতীয় প্রসিদ্ধ মেষের আদিভূমি স্পেন দেশ বলিয়া কথিত। কিন্তু এই মেরিণো আদি স্পেন মেরিণো হইতে অনেক উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। এই মেরিণো মেষ উৎপাদন করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন দেশ হইতে উন্নত ধরণের মেষের সমাবেশ করিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ উত্তমাশায় স্পেন মেরিণো, ফ্রান্সের রেম্বোলেট্, জার্মেনীর নিগ্রেটি মেরিণো ও যুক্তরাষ্ট্রের ভারমন প্রভৃতি উন্নত মেষের সমন্বয়ে অষ্ট্রেলিয়ার মেরিণো মেষের উৎপত্তি হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে কি-রকমের মেষ কত পালন করা হইয়া থাকে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল—

মেষের নাম	১৯৩৯ (বৎসরের প্রথম) সংখ্যা (১,০০০)	১৯৩৯ মোট সংখ্যার শতকরা ভাগ	১৯৪৭ (মার্চ মাস পর্যন্ত) সংখ্যা (১,০০০)	১৯৪৭ মোট সংখ্যার শতকরা ভাগ
মেরিণো···	৮৭,৫০০	৭৮·৮	৬৬,৯৬১	৭০·০
কমবেক্স্···	৮,৯৫৫	৮·১	৫,৭১২	৬·০
অন্যান্য উন্নত পিওর				
ব্রিড্স্···	১,৬৫৪	১·৫	৪,৮৬৭	৫·১
অন্যান্য···	১২,৯৪৯	১১·৬	১৮,১৮৩	১৮·৯
মোট···	১১১,০৫৮	১০০·০	৯৫,৭২৩	১০০·০

একটি ভেড়ার চামড়ার পরিমাণ ১২ স্কোয়ার ফুট ধরিলে মেষপ্রতি কত মিলিয়ন লোম সংগ্রহীত হইতে পারে তাহার মোটামুটি হিসাব—হেম্সায়ারে ১৬-৪৩, রেম্বোলেটে ২১-৫৯ বা ২৯-৯৭, অষ্ট্রেলিয়ান মেরিণোতে ১২০ পাউণ্ড, মেরিণো মেষশাবক হইতে ২০ এবং পূর্ণ বয়স্ক মেরিণো হইতে ১২৬ মিলিয়ন লোম পাওয়া যায়। গড় প্রতি ভেড়ায় এক স্কোয়ারের মত চামড়া হইতে উর্ধ্বে ৮০ হাজার এবং নিম্নে ১৫ হাজার লোম পাওয়া যায়। যে কোনও উন্নত মেষ হইতে গড়ে ৪০ হাজার লোম (এক স্কোয়ার ইঞ্চি স্থান হইতে) পাওয়া যায়; কিন্তু সেই স্থলে মেরিণো মেষে ৫০ হাজার পর্যন্ত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের মোট মেষের সংখ্যার ৭০·০ ভাগ মেরিণো মেষ হইলেও ৮টি রাষ্ট্রের জলবায়ু ও খাদ্যের তারতম্য হিসাবে মেরিণো মেষরও তারতম্য হইয়া থাকে। কাজেই বেশীর ভাগ মেষ হইতে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চি চামড়াতে ৩০,০০০ পর্যন্ত লোম পাওয়া যায়। অবশ্য এইরূপ তুলনায় অন্যান্য মেষের লোমও হিসাবে কমিয়া যাইবে।

পশম কখনও সোজা হয় না বা থাকে না; ইহা কোঁকড়ান হইবে। লোমের এই কোঁকড়ান অবস্থার জন্যই পশমের তাপরক্ষণ ক্ষমতা বেশী হইয়া থাকে। উন্নত মেরিণো মেষের লোম হইতে ৮০-১০০ পর্যন্ত, এমন কি তাহারও বেশী নম্বরের সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে লোমে যত সূক্ষ্ম সূতা হইবে তাহার ব্যাস এবং প্রতি ইঞ্চিতে কি পরিমাণ কোঁকড়ান থাকিবে তাহা দেখান হইল—

লোমে যত নম্বর সূতা হইবে	লোমের কোঁকড়ান (ইঞ্চি প্রতি)	লোমের ব্যাস (মাইক্রন—১/১০০০মিঃ মিটার)
১০০	২২—২৪	৮—১৬
৯০	২০—২১	১৬—১৭
৮০	১৭—১৮	১৮—১৯

পশমের সূতার নম্বর না বুঝিলে সূতা কিরূপ মিহি বা মোটা তাহা জানা যাইবে না। ৮০ নম্বর (৪০'s) সূতা বলিলে ৮০টি হ্যাঙ্ক বুঝাইবে এবং প্রতিটি হ্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য হইবে ৫৬০ গজ। এইরূপে ৮০ নম্বর সূতা বলিলে ৮০ × ৫৬০ = ৪৪,৮০০ গজ সূতা বুঝাইবে। যত নম্বর সূতা ততটি হ্যাঙ্ক এবং তত গুণন ৫৬০ গজ ইহাই সূতার নম্বরের হিসাব। সকল সময়েই সূতা প্রস্তুতের উপযুক্ত এক পাউণ্ড পশম হইতে প্রস্তুত মোট সূতার পরিমাণ ধরিতে হইবে। ভেড়ার লোম যত সূক্ষ্ম হইবে সূতাও তত মিহি হইবে এবং সূতার নম্বরও বাড়িয়া যাইবে। অবশ্য একটি ভেড়ার মোট চামড়ার উৎপন্ন লোম হইতে একই রকমের মিহি সূতা প্রস্তুত হইবে না। দেহের চামড়ার পার্থক্য হিসাবে লোমেরও তারতম্য হয়। ভেড়ার দেহের কোন্ জায়গার লোম হইতে কিরূপ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা চিত্রে দেখান হইয়াছে।

আজ যদি অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের গর্ব করিবার বা বিদেশীয়দের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিবার মত কিছু থাকে তাহা মেরিণো পশম। প্রকৃতপক্ষে মেরিণো জাতীয় মেষপালনের উপযুক্ত আবহাওয়া থাকায় এবং ইংল্যাণ্ডে এই মিহি পশমের চাহিদা থাকায় অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের যথেষ্ট সমৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে। ক্যাপটেন জন্ ম্যাক-আর্থার—যিনি নিউ সাউথওয়েল্‌স্ রক্ষিদলপতি ছিলেন—তিনি নিজেই এই মহাদেশকে মেরিণো মেষ-পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডের এই জাতীয় পশমের চাহিদা মিটাইতে পারে বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন। ফলে ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা দলে দলে মেষপালনের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পায়ের সাহায্যে পশমী কম্বলের গাঁইট চাপিয়া বাঁধা হইতেছে

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার মেষ-পালনের ব্যবসায় কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, নিম্নের বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে—

বৎসর	লোক সংখ্যা (১,০০০)	মেষ সংখ্যা (১,০০০)	জন প্রতি মেষ সংখ্যা
১৮৬০	১,১৪৬	২০,১৩৫	১৭·৬
১৮৮০	২,২৩২	৬১,১৮৪	২৭·৯
১৯০০	৩,৭৬৫	৭০,৬০৩	১৮·৮
১৯২০	৫,৪১১	৮১,০৯৬	১৫·১
১৯৪০	৭,০১০	১১৯,৩০৫	১৭·০৪

এই মহাদেশ পশুপালনের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে পশুপালন বলিতে মেষের চাষই প্রধান বলিয়া ধরিতে হইবে। কারণ ১৯৩৯ সালের হিসাবে মোট পশু-সংখ্যার শতকরা ৮৯ ভাগ মেষ এবং মোট ১,৯০৩.৭ লক্ষ একর জমির মধ্যে মাত্র ২৩.৫ লক্ষ একর শস্য উৎপাদনের জন্য এবং ৬৫৫ লক্ষ একর, অর্থাৎ মোট জমির শতকরা ৩৩.৪ ভাগ জমি মেষ-চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

মেষচারণ যে শুধু পশম উৎপাদনের জন্যই হইয়া থাকে, তাহা নয়। এই মহাদেশ বৎসরে গড়ে ১৯০ লক্ষ মেষ ও মেষশাবক বধ করিয়া থাকে মাংসের জন্য এবং এই মাংসের শতকরা ৭৩ ভাগ অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা ব্যবহার করে। আর পশুচারণের জন্য এই মহাদেশ উৎকৃষ্ট বলিয়া অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা বেশী মাংসাহারী। কোন্ দেশ গড়ে কত পাউণ্ড মাংস জনপ্রতি ব্যবহার করে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

	অষ্ট্রেলিয়া	গ্রেট ব্রিটেন	যুক্তরাষ্ট্র
	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৭	১৯৩৭
মেষ মাংস	৭৬.১১	৩০.০০	৬.৫
অন্য জাতীয় মাংস	১৫৭.৯৮	১১১.০০	১১৭.৮
মোট	২৩৪.০৯	১৪১.০০	১২৪.৪

এই মেষজাত দ্রব্যই (পশম, মাংস, চর্বি ইত্যাদি) অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের বহির্বাণিজ্যের একটি প্রধান অঙ্গ। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ১৯৫১-'৫২ ও '৫৩ সালে গড়ে ১১০,১০ লক্ষ পাউণ্ড বসাযুক্ত পশম বা ৫৫,০৫ লক্ষ পাউণ্ড পরিষ্কৃত (শতকরা ৫০ ভাগ ধরিয়া) পশম উৎপাদন করিয়া ১৯৫১-'৫২ সালে গড়ে বৎসরে মাত্র ৪,৯০ লক্ষ পাউণ্ড পরিষ্কৃত পশম ব্যবহার করিয়াছিল। এইরূপে উদ্বৃত্ত পরিষ্কৃত পশম বৎসরে গড়ে ৫০,১৫ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশে চালান দিয়া থাকিবে। ১৯৪৮-'৪৯ সালে বসাযুক্ত পশম ১৮.৭ কোটি পাউণ্ড মূল্যের ৩১ লক্ষ বেল্ এবং ৭৫.৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ১ লক্ষ ৩৪ হাজার বেল্ পরিষ্কৃত পশম বিক্রয় করিয়াছিল। একটি বেল্ মাপে ৪'-৬"×২'-৩" ইঞ্চি এবং ওজনে পশমের শ্রেণী হিসাবে ১৫০-২৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ৮টী রাষ্ট্রেই মেষপালনের বিরাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্ রাজ্যে কত মেষ পাওয়া যায় তাহার হিসাব দেওয়া হইল—

রাষ্ট্রের নাম	১৯৩৯-৪০ (১,০০০)	১৯৪৭ (মার্চ পর্যন্ত)
নিউ সাউথ ওয়েল্স্	৫৪,৬৩২	৪৩,১০৫
ভিক্টোরিয়া	১৮,২৫২	১৬,৫৯৮
কুইন্সল্যাণ্ড	২৪,১৯১	১৬,০৮৪
দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া	১৯,৫১৫	১৭,৭৪৬
অন্যান্য রাজ্য	২,৭১৬	২,১৮৯
মোট	১১৯,৩০৬	৯৫,৭২২

এই মহাদেশের নিউ সাউথ ওয়েল্স্ রাজ্য মেষ-পালনের একটি প্রধান কেন্দ্র। মোট মেষ সংখ্যার শতকরা ৪৫.০৩ ভাগ এই কেন্দ্রে পাওয়া যায়। ১৯৪৬ (মার্চ পর্যন্ত) সালের হিসাবে এই কেন্দ্রের মেষ-সংখ্যা ৪৪,০৭৬ হাজার এবং ২৮২ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তেলা বা বসাযুক্ত পশম ৪৪৮,৬৮৩ হাজার পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। আর মোট মেষ-সংখ্যার শতকরা ৮৬ ভাগ মেরিণো মেষ। এই রাজ্যকে পৃথিবীর মেরিণো উৎপাদনের আধার আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম মেরিণো মেষের ঘুনটি। এই স্থানে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার পালের মেষ (stud merino) আছে এবং ইহাদের বিচরণ করিবার জন্য প্রায় ৫ লক্ষ একর জমি সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের হিসাবে এই কেন্দ্রের মেষের মোট সংখ্যা হইবে ৪৬,০৬৫ হাজার।

এই রক্ষিত অঞ্চলের আবহাওয়া উন্নত মেরিণো মেষ জন্মাইবার সহায়ক হইয়াছে। ইহা বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ এবং পাইন বৃক্ষের দ্বারা সজ্জিত। গ্রীষ্মে ১১৮° এবং শীতে ৩০°-৪০° উত্তাপ পরিলক্ষিত

হইয়া থাকে। গড়ে বৃষ্টি মাত্র ১৫" ইঞ্চি। এই আবহাওয়ায় মেষগুলি প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। আর এই দেশের তৃণ ব্যাধিমুক্ত এবং সুস্বাদু।

মেরিণো পশম সকল দিক হইতে উন্নত হইলেও অন্যান্য মেষের সমন্বয়ে গড় উৎপাদন হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ায় ভেড়াপ্রতি ৯ পাউণ্ড বসাযুক্ত পশম

মেষপালন ও পশম উৎপাদন ক্ষমতায় অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় বলা যায়। পৃথিবীর মোট মেষ-সংখ্যার শতকরা ১৪.৫৭ ভাগ ও মোট বসা-যুক্ত পশম উৎপাদনের শতকরা ২৮.৬৬ ভাগ অষ্ট্রেলিয়া দাবী করিতে পারে। পৃথিবীর মোট হিসাবে দেখা যায় যে, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আর্জেন্টাইন এই তিনটি দেশই উন্নত
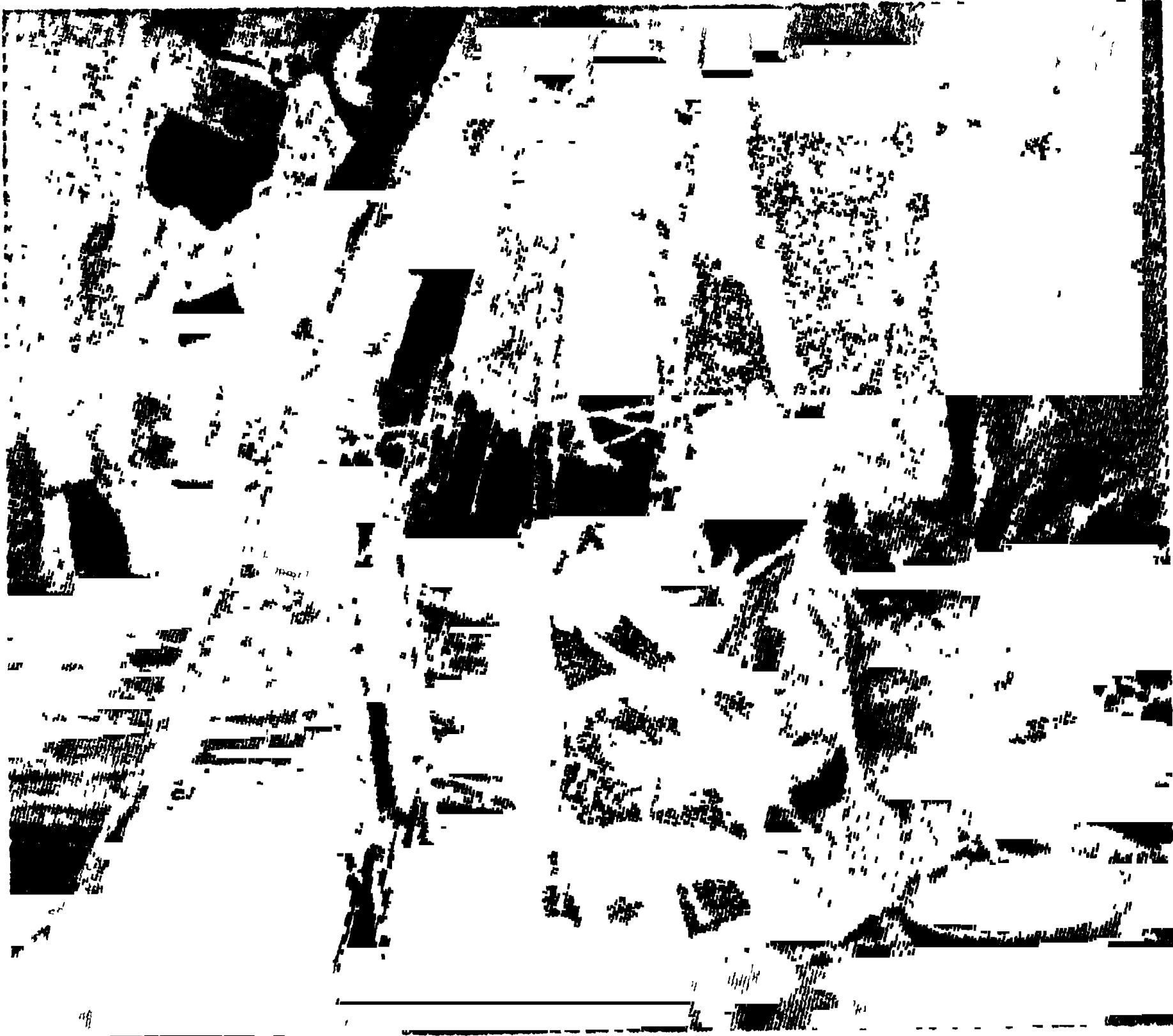
হস্ত-চালিত তাঁতে পশমের কম্বল প্রস্তুত হইতেছে

পাইয়া থাকে এবং প্রস্তুতিতে শতকরা ৫০ ভাগ বাদ দিয়া ৪½ পাউণ্ড বিশুদ্ধ পশম পাওয়া যায়। এই হিসাবে প্রতি ভেড়ায় গড়ে ১০ বর্গ ফুট পরিমিত চামড়ায় উৎপন্ন লোমের ঘনত্ব প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০,০০০ হিসাবে ধরা হয়। এইরূপ প্রতিটি লোম লম্বায় ৩" ইঞ্চি হইয়া থাকে এবং এই লোমে গড়ে ৬৪ নম্বরের সূতা প্রস্তুত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার সকল প্রকার পশমের গড় মূল্যমান ইহাই ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

পশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। নিম্নে হিসাব দেওয়া হইল :—

(ক) মেষ সংখ্যা

(লক্ষ হিসাবে)

	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩
অষ্ট্রেলিয়া	১১,৫৬	১১,৭৬	১১,৯০
নিউজিল্যাণ্ড	৩,৪৮	৩,৫৪	৩,৫৬
আর্জেন্টাইন	৫,০৫	৫,১৫	৫,১০
মোট	২০,০৯	২০,৪৫	২০,৫৬
পৃথিবীর মোট	৭৮,০২	৮০,৬০	৮১,৬৭

(খ) পশম (বসা-যুক্ত)

(১০ লক্ষ পাউণ্ড হিসাবে)

	১০৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩
অষ্ট্রেলিয়া	১,০৯৩	১,০৫২	১,১৭৫
নিউজিল্যাণ্ড	৩৯০	৪০৭	৪১৩
আর্জেণ্টাইন	৪৩০	৪২০	৪০৭
মোট	১,৯১৩	১,৮৭৯	১,৯৯৫
পৃথিবীর মোট	৩,৯২৭	৩,৯৩৮	৪,১০০

১৯৫১-৩ সালের গড় হিসাবে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আর্জেণ্টাইনা ২০,৩৭ লক্ষ মেষ প্রালন করিয়াছে। ইহা পৃথিবীর মোট মেষ-সংখ্যার শতকরা ২৫ ৪৪ ভাগ হইলেও এই তিনটি দেশ মিলিতভাবে (১৯৫০-'৫১, ১৯৫২-'৫৩) বৎসরে গড়ে ১৯২,৯০ লক্ষ পাউণ্ড বসা-যুক্ত পশম উৎপাদন করিয়াছে যাহা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪৮'৩৭ ভাগ।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে বিভিন্ন মেষের সংমিশ্রণে উন্নত শ্রেণীর মেষ পাওয়া গেলেও উন্নত প্রণালীর খাদ্যে পূর্ণ চারণভূমিতে অধিক সংখ্যক মেষ পালন করিলে এবং অন্তরূপে সাধারণ খাদ্য সহযোগে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাম্রখাদ্য খাওয়ান হইলে মেষপ্রতি অধিক লোম পাওয়া যায়। উপরন্ত তাম্রখাদ্যে প্রতিপালিত ভেড়ীর লোম অধিক মূল্যবান হইয়া থাকে।

উন্নত প্রণালীতে খাদ্য উৎপাদিত এক একর চারণভূমিতে তিনটি এবং সমপরিমাণ সাধারণ চারণভূমিতে একটি মেষ এক বৎসর পর্যন্ত একই পরিবেশে পালন করিয়া যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল—

	উন্নত চারণ-ভূমি	সাধারণ চারণ ভূমি
ভেড়াপ্রতি ওজন বৃদ্ধি	৪১'০৯ পাঃ	২১'০১ পাঃ
ভেড়াপ্রতি পশমের পরিমাণ	১১'১২ „	৮'৯২ „
একর প্রতি পশম	৩৩'৩৬ „	৮'৯২ „

উপরন্ত সাধারণ চারণভূমি অপেক্ষা উন্নত চারণভূমির মেষের লোম ০'৩০" ইঞ্চি অধিক লম্বা হয়। ইহা ছাড়া আবার সাধারণ খাদ্য সহযোগে তাম্রখাদ্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে দৈনিক ৭'৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া এক বৎসর পরে যেরূপ ফল পাওয়া যায়—

	তাম্র সহযোগে খাদ্য	সাধারণ খাদ্য
ভেড়ী প্রতি পশম	৬'০ পাঃ	৪'৩ পাঃ
প্রতি পাউণ্ড পশমের মূল্য	২৭½ পেন্স	২৫ পেন্স
ভেড়ীর মোট পশমের মূল্য	১৬১ পেন্স	১০৬ পেন্স

উন্নতশ্রেণীর মেষপালনে এবং পশম উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইলেও বর্তমানে উন্নত মেষপালনে যে পিছাইয়া পড়িতেছে তাহা দেখান হইল—

	মেষ-সংখ্যা (লক্ষ-১৯৫২)	পশম উৎপাদন বসা-যুক্ত (লক্ষ পাউণ্ড) ১৯৫২-৫৩	মেষপ্রতি পশম উৎপাদন (পাউণ্ড)
নিউজিল্যাণ্ড	৩,৫৪	৪১,৩০	১১ ৬৬
অষ্ট্রেলিয়া	১১,৭৬	১১৭,৫০	৯'৯৯
যুক্তরাষ্ট্র	৩,২১	২৭,৫০	৮'৫৭
আর্জেণ্টাইন্	৫,১৫	৪০,৭০	৭'৯০

উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, নিউজিল্যাণ্ডে বর্তমানে উন্নত ধরনের মেষ-চাষ হয় এবং গড়ে মেষ প্রতি ১'৬৬ পাউণ্ড পশম যাহা অষ্ট্রেলিয়ার হিসাবে প্রায় ২ পাউণ্ডের উর্ধ্বে পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে মেষপালন খুব অল্পদিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৮টি মেষ ছিল এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা ৬,১২৪টিতে দাঁড়ায়। কিন্তু মেষপালন ও পশম-শিল্পের প্রচলন ভারতবর্ষে বহু পূর্ব হইতেই ছিল, যাহা ঋকবেদ, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়। পশমের সুতা রং করা এবং ইহার বয়নপ্রণালী সম্বন্ধে ঋকবেদে উল্লিখিত আছে। পশম উৎপাদন ছাড়াও

মেষের নানাবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন কালে জানা ছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মেষের মাংস, ভেড়ীর দুধ ও এই দুধে প্রস্তুত ঘৃতের গুণাগুণ উল্লিখিত আছে। খাসী মেষের মাংস অন্যান্য মেষের মাংস অপেক্ষা লঘুপাচ্য বলা হইয়াছে। উক্ত শাস্ত্রে ভেড়ীর দুগ্ধ বাতজ কাশি ও বায়ুরোগে হিতকর এবং এই দুগ্ধে প্রস্তুত ঘৃত উর্ধ্ব শ্লেষ্মাজনিত জিহ্বাদির ঘায়ে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বলিয়া বর্ণিত আছে।

প্রতি ১০০ গ্রাম ভেড়ার মাংসে ১৮.৫ প্রোটিন, ১৩.৩ চর্বি, ভিটামিন-এ (৩১ ইউনিট) ও বি (৬০ ইউনিট) থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম চর্বিশূন্য মেষ-শাবকের মাংসে বি (১)—০.২১-০.৪৪, বি (২)—০.১৮-০.৩৩ ও নিয়াসিন—৫.৬-৮.৫ মিলিগ্রাম খাদ্যপ্রাণ রহিয়াছে। সমপরিমাণ মেষ-যকৃতে মিলিগ্রাম খাদ্যপ্রাণ থাকে: এ—৬৭,৬০০-১১৩,১০০ (ইণ্টারন্যাশন্যাল ইউনিট), বি (১) -০.২৩-০.৪১, বি (২)—২.৬-৫.৪, নিয়াসিন ১৭.২, সি - ৩৮ ও ডি—১৭। মেষের চর্বিও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই চর্বিতে যে সকল মিশ্রিত অ্যাসিড থাকে তাহা মোট চর্বির পরিমাণ শতকরা এইরূপ হইবে: মাইরিস্‌টিক—২, প্যামিটিক—২৫.০, ষ্টিয়ারিক—২৩.০ ওলেইক—৪৭.৩ ও লাইনোলেইক—২.৭। এই মিশ্রিত ফ্যাটি অ্যাসিডের টাইটার—৪৩-৪৬° এবং মেল্টিং পয়েণ্ট—৪৯-৫৪° ডিগ্রী; কিন্তু মেষের চর্বির আপেক্ষিক গুরুত্ব—০.৯৩৭-০.৯৫৩/১৫° এবং এই চর্বি ৪৪-৪৯° ডিগ্রী তাপে গলিয়া যায়।

মেষের চামড়াও অতি প্রয়োজনীয়। জুতার লাইনিং বা স্থ-সকৃস্ এবং কারুকার্য খচিত নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুতিতে মেষের চামড়া আবশ্যক। সকৃস্-এর জন্য চামড়াকে চারভাগ বাবুল ছাল এবং একভাগ হরিতকী মিশ্রিত কাথ দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু কারুকার্যের জন্য এই চামড়াকে আভরণ বা ওয়াটেল ছালের কাথ দিয়া পাকা করা হইয়া থাকে। মেষের শিং দিয়া বোতাম প্রস্তুত হইতে পারে।

বিজ্ঞান সংবাদ

দুর্ভিক্ষ অঞ্চলের মানচিত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া কতকগুলি নূতন ধরনের মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থনীতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের এই মানচিত্র বিশেষ কাজে লাগিবে। আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির মেডিক্যাল জিয়োগ্রাফি বিভাগের দ্বারা পৃথিবীর বুভুক্ষু মানবের পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাহাদের সংগৃহীত তথ্যাদি এই মানচিত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

মানচিত্রগুলির একটিতে দেখান হইয়াছে, কোন্ কোন্ অঞ্চলের অধিবাসীরা উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকে, কোথায় খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনোপযোগী ক্যালরী এবং প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদির অভাব ও কোথায় অধিবাসীরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবজনিত রোগে ভুগিয়া থাকে। কোন্ অঞ্চলে কি কি খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরিমাণই বা কত, তাহা অন্য এক মানচিত্রে দেখান হইয়াছে।

মানচিত্রগুলির প্রণেতা উক্ত সোসাইটির মেডিক্যাল জিয়োগ্রাফির অধ্যক্ষ ডাঃ মে বলেন, জনসাধারণের ব্যাপকভাবে অর্ধ-পুষ্টির বহুবিধ কারণ

বর্তমান। কোন একটি মাত্র উপায় দ্বারা পৃথিবী-ব্যাপী এই অনশন ক্লেশ দূর করা সম্ভব হইবে না, কারণ বিভিন্ন দেশের সমস্যা বিভিন্ন।

আর একটি মানচিত্র হইতে প্রতীয়মান হয়, পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী আজ অনশন-ক্লিষ্ট। অথচ সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা উপযুক্তভাবে বণ্টিত হইলে কাহাকেও খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতে হইত না।

ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, ইণ্ডোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং ফিলিপাইনের অধিবাসীরা প্রয়োজনীয় ক্যালরি-যুক্ত এবং উপযুক্ত ভিটামিন প্রভৃতি সংযুক্ত খাদ্য প্রত্যেকে পায় না। পশ্চিম গোলার্ধে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, কানাডা, উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী যথোপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকে। পোর্টুগ্যাল; স্পেন, ইটালি এবং পূর্ব জার্মেনী ব্যতীত পশ্চিম ইউরোপে সকল দেশের অধিবাসীরা উপযুক্ত খাদ্য পাইয়া থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়া হইতে প্রকাশিত খবর হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গভর্ণমেণ্ট ঐ দেশের অধিবাসীদের পর্যাপ্ত খাদ্য যোগাইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকান জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে প্রকাশ, রাশিয়ার বহু অঞ্চলে খাদ্যাভাব বর্তমান। রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলসমূহ এবং যে সব স্থানে অধিবাসীদের জোর করিয়া কাজ করানো হয়, তাহা উক্ত মানচিত্রে চিহ্নিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত দেশগুলিরও খাদ্যের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক—গ্রীস্, তুরস্ক, কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, ফরমোসা, আফ্রিকার অন্তর্গত সোমালিল্যাণ্ড ও পোর্টুগিজ গিনি, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড।

বাদবাকী অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্য ক্যালরি, প্রোটিন ও ভিটামিন প্রভৃতি পদার্থ হিসাবে অপ্রতুল।

সূর্যরশ্মি দুধের সুগন্ধ বিনাশের কারণ

সাধারণ কাঁচের বোতলে দুধ ভর্তি করিয়া সূর্যালোকে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দেখা যায়, উহার সুগন্ধ নষ্ট হইয়া এক অপ্রীতিকর গন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে। পেন্‌সিলভ্যানিয়া এগ্রিকাল্‌চার্যাল এক্সপেরিমেণ্ট্যাল স্টেশনের ডাঃ প্যাটন ও ডাঃ জোসেফ্‌সন ইহার কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, সূর্যালোকের ক্রিয়ায় দুধের ভিতরের মিথায়োনিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের আংশিকভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। দুধের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-বি এবং রিবোফ্ল্যাভিনও থাকে। এই রিবোফ্ল্যাভিনের অস্তিত্ব মিথায়োনিনের উপর সৌর-রশ্মির প্রতিক্রিয়াকে দ্রুততর করে এবং এই প্রতিক্রিয়া সংঘটনকালে বহুল পরিমাণ রিবোফ্ল্যাভিনও নষ্ট হইয়া যায়।

আবার দেখা গিয়াছে, সাধারণ কাঁচের বোতলের দুধ আধ ঘণ্টা সূর্যালোকে রাখিলে দুধের ভিটামিন-সি-ও প্রভূত পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তবে ইহার সহিত মিথায়োনিনের সৌর-রশ্মির প্রতিক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানা যায় নাই।

জলের সহিত মিথায়োনিনের পাত্‌লা দ্রাবণ সূর্যালোকে স্থাপন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দুধের উপর আলোকপাতে যেরূপ গন্ধ উদ্ভূত হয়, উহার গন্ধ তাহারই অনুরূপ। এই পরীক্ষার ফলেই মিথায়োনিন ও রিবোফ্ল্যাভিনের উপর সৌর-রশ্মির প্রতিক্রিয়াটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন মিথায়োনিন-এর উপর সূর্যরশ্মির প্রতিক্রিয়ার রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের প্রয়াস চলিতেছে।

সাধারণ ফুলের গাছ হইতে বিবর্তনের রহস্য প্রকাশ

বিবর্তনের ফলে কেমন করিয়া বিভিন্ন জাতীয়

জীবের সৃষ্টি হইয়াছে, ক্যালিফোর্ণিয়ার এক রকম গোলাপী ফুলের গাছ হইতে তাহার কিছু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ক্যালিফোর্ণিয়া ইউনিভার্সিটির ডাঃ লুই লক্ষ্য করেন, ক্লার্কিয়া নামক গাছে ক্রোমোসোম বিভাজন কালে কখনও কখনও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। ইহার ফলে কোন কোষে একটি ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া নূতন জাতীয় উদ্ভিদ সৃজনের পথ উন্মুক্ত করে।

ক্লার্কিয়ার কোষগুলিতে স্বভাবতঃ নয়টি করিয়া ক্রোমোসোম থাকে। বিভাজিত হইবার পরও প্রত্যেকটিতে নয়টি করিয়া ক্রোমোসোম থাকা উচিত। কিন্তু কখনও কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া একটি কোষে আটটি ও অপরটিতে দশটি ক্রোমোসোম দেখা যায়। আটটি ক্রোমোসোমযুক্ত কোষটি নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দশটি ক্রোমোসোম-বিশিষ্ট কোষটি বর্ধিত হইতে থাকে এবং কোন কোনটি কার্যকরী যৌনকোষে পরিণত হয়। ইহা হইতে উদ্ভূত গাছের আশু বাহ্যিক পরিবর্তন প্রকাশ না পাইলেও ক্রোমোসোম সংখ্যার বৃদ্ধির জন্য পরিব্যক্তির অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। কালক্রমে উহা নয়টি ক্রোমোসোমবিশিষ্ট মাতৃউদ্ভিদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্ভিদে পরিণত হয়। জীবজগতে এই উপায়ে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ডাঃ লুই পরীক্ষার সাহায্যে দেখাইয়াছেন, ক্লার্কিয়া গাছে এই উপায়ে পরিব্যক্তি হইয়া থাকে। ক্রোমোসোমের সংখ্যা বর্ধিত হইয়া যে প্রকৃতিতে বিভিন্ন জাতীয় জীবের উদ্ভব হয়, এই অনুমান নূতন নয়, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম ইহা সমর্থিত হইল।

নিরীহ জীবাণুর ধ্বংসক্রিয়া প্রকাশিত

ভায়োলেট জার্ম নামে পরিচিত একপ্রকার জীবাণু এতকাল নিরীহ বলিয়াই জানা ছিল। এক্ষণে মানব ও অন্যান্য প্রাণীদেহে ইহার দ্বারা গুরুতর সংক্রমণ ও জীবনহানি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা সংক্রমণের অব্যবহিত পরে কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক সহযোগে চিকিৎসা করিলে ইহার বিষময় ফল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে।

জনৈক ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ বেগুনে জীবাণুর সংক্রমণে মৃত্যু বরণ করে। যে চারজন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করেন তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলেই এই তথ্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরীক্ষাগারে কালচার করিলে ঐ জীবাণু হইতে বেগুনে রং নিঃসৃত হয়; এই জন্যই উহা ভায়োলেট জার্ম নামে পরিচিত। ইহার সংক্রমণ মারাত্মক হইবার প্রধান কারণ, ইহার দেহ হইতে হাইড্রোজেন সায়ানাইড বিষ নির্গত হইতে থাকে। এই জাতীয় জীবাণুর অন্তর্ভুক্ত কয়েক প্রকার জীবাণু কালচার মিডিয়ামকে বেগুনে রঙে পরিবর্তিত না করিলেও হাইড্রোজেন সায়ানাইডের গন্ধ-বৈশিষ্ট্য হইতে উহার অবস্থিতি বুঝা যায়।

কোয়ালালামপুরের বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতাল ও ইনষ্টিটিউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চের ডাক্তার পি এইচ. এ. স্মিথ, আর. ভগবান সিং, জে. পি. এফ. হুইলার এবং ডি. এড্ওয়ার্ডস্ এই সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়াছেন। সাধারণতঃ জল ও মাটির মধ্যে এই বেগুনে জীবাণু থাকে এবং পচা জৈব পদার্থ দেহসাৎ করিয়া জীবনধারণ করে। ১৯০৪ সালে এই জীবাণুর মারাত্মক ক্রিয়া প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। তিনটি মহিষ ইহার সংক্রমণে মারা যায় বলিয়া ডাঃ পি. জি. উলে প্রকাশ করেন। জানা গিয়াছে, তারপর হইতে তেরোটি মানুষ এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। উহাদের মধ্যে দুইজন মাত্র পরিত্রাণ পায় এবং তিন জনের কোন খবর পাওয়া যায় নাই। যাহারা ইহার সংক্রমণে মারা যায়, উক্ত ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। লিভারের মধ্যে অ্যামিবা সংক্রমণ সন্দেহে তাঁহাকে 'এমিটিন দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। পরে অরিয়োমাইসিন ও ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ক্লোরোকুইনও প্রয়োগ করা হয়।

ইহাতে তাঁহার অবস্থার কিছু উন্নতি লক্ষিত হওয়ায় ঐ চিকিৎসা স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু পরে আবার সংক্রমণের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। তখন ঐ চিকিৎসায় আর কোন ফল হয় নাই।

মৃত্যুর পূর্ব দিনে তাঁহার লিভার হইতে সবুজ পুঁজ বাহির করা হয়। উহার মধ্যে কোন অ্যামিবার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় নাই; কিন্তু উহাতে বেগুণে জীবাণুর অবস্থিতি ধরা পড়ে। এত দিন যে জীবাণু নিরীহ বলিয়া জানা ছিল এখন তাহাই সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্ধারিত হয়।

পরবর্তী পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিন, ফেনিকল, অরিয়োমাইসিন ও টেরামাইসিন প্রয়োগে বেগুনে জীবাণু বিনষ্ট হয়; কিন্তু পেনিসিলিন ও সাল্‌ফাডায়াজিন প্রয়োগে কোন ফল হয় না। চিকিৎসার প্রথম অবস্থায় সৈন্যাধ্যক্ষের যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা এমিটিন প্রয়োগের ফল বলিয়া তখন অনুমিত হইয়াছিল। পরে স্পষ্টই বুঝা গেল, অরিয়োমাইসিন প্রয়োগের ফলেই প্রথম উপশমের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ডাক্তারেরা বলেন, যুগপৎ একাধিক বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের কুফলের ইহা একটি বিশেষ উদাহরণ। বেগুনে জীবাণুর সংক্রমণ সত্বর নির্ধারিত হইলে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগে উহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া সম্ভব বলিয়া উক্ত চার জন ডাক্তার মত প্রকাশ করেন।

ভূপৃষ্ঠের ক্রমশঃ তাপ বৃদ্ধি

জন্ হপ্‌কিন্স ইউনিভার্সিটির ডাঃ গিলবার্ট এন. প্লাস হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, সারা পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টন কয়লা জালানো হইয়া থাকে। উহা হইতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় তাহার ফলে প্রতি শতাব্দীতে ১½ ডিগ্রি হিসাবে ভূপৃষ্ঠের স্তরের তাপ বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে। ঐ পরিমাণ কয়লার দহনক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে স্বাভাবিক কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্তরটি ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে এবং তাহার ফলে, কাঁচ আচ্ছাদিত গৃহের যেমন তাপ বর্ধিত হয়, সেই ভাবেই পৃথিবীর উপরের স্তর ক্রমশঃ অধিকতর উত্তপ্ত হইতেছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ২০৮০ সালে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে এবং তাহাতে ভূপৃষ্ঠের তাপ শতকরা চার ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। মানুষের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বহুকাল যাবৎ অল্প অঞ্চলের মধ্যে সন্নিবেশিত না থাকিয়া যদি সারা পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া থাকিত তাহা হইলে অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের অধিকাংশ সমুদ্রে শোষিত হইতে পারিত। এই সুযোগ না থাকায় এবং গত এক শত বৎসর যাবৎ মানুষের ধূম উৎপাদনের ক্ষমতা বর্ধিত হওয়ায় সমুদ্রের সাহায্যে বাতাসের অতিরিক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পায় নাই।

দেহ হইতে রক্তমোক্ষণের নূতন পদ্ধতি

দাতার দেহ হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া প্রয়োজনমত রোগীর দেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট করিবার প্রথা খুবই প্রচলিত। তবে একই ব্যক্তির দেহ হইতে বৎসরে পাঁচ-ছয় বারের অধিক রক্তমোক্ষণ করা দাতার পক্ষে নিরাপদ নয়। কারণ একবার রক্তমোক্ষণে দাতার শরীরের যে ক্ষতি হয় তাহা পুরণ করিতে প্রায় দুই মাস সময় লাগে।

ফিলাডেলফিয়ার চিলড্রেন্স হাসপাতালে এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইবার ফলে দাতার দেহ হইতে বৎসরে ৫২ বার পর্যন্ত রক্তমোক্ষণ করা চলিবে; ইহাতে তাহার দেহের কোন ক্ষতি হইবে না। রক্ত সংগ্রহ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে ঘুরানো হয়। ইহার ফলে রক্তের জলীয় অংশ অর্থাৎ প্লাজ্‌মা লোহিত কণা হইতে পৃথক হইয়া যায়। লোহিত কণাগুলি তৎক্ষণাৎ দাতার শরীরে পুনরায় প্রবিষ্ট করানো হয়।

উক্ত হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ জোসেফ ষ্টোক্স বলেন রক্তমোক্ষণের নূতন পদ্ধতিটি এখনও পরীক্ষাধীন। ব্যাপকভাবে ইহা প্রচলিত হইলে অধিক পরিমাণে গামা গ্লোবিউলিন সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। রক্তের প্লাজ্‌মা হইতে গামা গ্লোবিউলিন নিষ্কাশিত হয়। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ইহা পোলিয়ো নামক পক্ষাঘাত সাময়িকভাবে প্রতিরোধে সক্ষম।

বরফ জীবাণুমুক্ত নয়

গ্রীষ্মের সময় কলিকাতার রাস্তায়, রেষ্টুরেণ্টে এবং সোডা ফাউণ্টেনে বরফ মিশ্রিত জল, সরবৎ, সোডা ইত্যাদি পান করিবার জন্য সারা দিনই লোকের ভীড় দেখা যায়। বরফের মধ্যে যে জীবাণু থাকিতে পারে, এ সন্দেহ বোধ হয় কাহারও নাই। কান্‌সাস এগ্রিকালচার‍্যাল এক্স-পেরিমেণ্ট্যাল ষ্টেশনের মিঃ ভি. ডি. ফোণ্টস্‌ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধারণ বরফের মধ্যে অনেক সময় জীবাণু থাকায় উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হইয়া দাঁড়ায়।

তিনি বিভিন্ন হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, সোডা ফাউ-ণ্টেন ও হাসপাতাল হইতে গুঁড়া ও ডেলা বরফের ১১৪টি নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করেন। ঐ গুলির মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ জীবাণুমুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। আমেরিকান পাবলিক হেলথ্‌ অ্যাসোসিয়েসনের নিকট বিবৃতিতে মিঃ ফোণ্টস্‌ বলেন, পরিস্রুত জীবাণুমুক্ত জল হইতেই বরফ প্রস্তুত হয় এবং ঐ অবস্থায় বরফও জীবাণুমুক্ত থাকে। কিন্তু প্রস্তুতের পর হইতে পানীয় ব্যবহারের সময় পর্যন্ত ঐ বরফের অবস্থা কি হয় তাহা কেহই পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই।

আমেরিকার পরিস্রুত জল হইতে প্রস্তুত বরফেরই যখন এই অবস্থা, আমাদের দেশের সাধারণ জল হইতে প্রস্তুত বরফ অযত্ন রক্ষিত অবস্থায় গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতখানি অনুকুল তাহা সহজেই অনুমেয়!

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

সঞ্চয়ন

তিলাপিয়া মাছের চাষ

মৎস্যের জগতে অতি আধুনিক আগন্তুক প্রাণীটির নাম 'তিলাপিয়া'। ক্ষুদ্র অথচ দ্রুত বর্ধনশীল এই মৎস্য যে একদিন ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানে অনেকখানি সহায়তা করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতীয় মৎস্যভোজীরা এর আস্বাদ আজও গ্রহণ করেন নি বটে, কিন্তু আশা করা যায়, একদিন উহা মৎস্যভোজীদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য হয়ে উঠবে। মাদ্রাজের মৎস্য গবেষণা মন্দির, মন্দাপামে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা মন্দির এবং মাদ্রাজ রাজ্যের আরও ৯টি মৎস্য গবেষণা মন্দিরে তিলাপিয়া মাছ সম্পর্কে গবেষণা করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে।

কারিগরী সহযোগিতা পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকারকে সাহায্য করবার কাজে নিযুক্ত মার্কিন মৎস্য-বিশেষজ্ঞ মিঃ ওলে হেগেন বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই 'আশ্চর্য মাছ' সম্পর্কে ভারত সরকারের পরিকল্পনার বিষয় পরম আগ্রহ-ভরে লক্ষ্য করছেন।

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ যদি ভারতের জলে এই মাছের চাষ করবার সিদ্ধান্ত করেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সম্ভাব্য যে সাহায্য আসতে পারে তা হলো এই সম্পর্কে

গবেষণার জন্যে জলাভূমি ও পুরনো মজা পুকুরগুলির সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। কারণ, যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের খাদ্য-বৃদ্ধি পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, সেই হেতু ঐ ধরণের যে-কোন পরিকল্পনা সাফল্যলাভ করুক উহাই আমরা কামনা করি।

আফ্রিকা দেশের মৎস্য হিসাবে পরিচিত তিলাপিয়া ইতিমধ্যেই শ্যামদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা, মালয় ও সিংহলের প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই মৎস্যের চাষ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। যে-কোন রকমের খাল, বিল, পুকুর, জলা জমি এবং ধান ক্ষেতের স্বল্প জলের মধ্যেও এর চাষ করা চলে। গৃহ সংলগ্ন ডোবাতেও এই মাছগুলি বেশ বেড়ে উঠে। একবার পোনা ফেললে, এক বছরের মধ্যেই এক একটি মাছ এক-পাউণ্ড ওজনের হয়ে উঠে এবং ঝাল, ঝোল, ভাজা যে কোনভাবে এর আস্বাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। তিলাপিয়ার বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত হয়। এক জোড়া মাছ পুকুরে ছাড়া হলে এক বছরের মধ্যেই উহা ১০ হাজারে পরিণত হয় এবং মাত্র চার মাসের মধ্যেই অর্ধ পাউণ্ড ওজনের এক একটি মাছ সুস্বাদু খাদ্যের উপযোগী হয়ে উঠে। মাত্র চারমাস বয়স থেকেই এগুলি ডিম পাড়তে সুরু করে এবং প্রতি দুই বা তিন মাস অন্তর অন্তর ডিম পেড়ে যায়।

মাদ্রাজ রাজ্যের মৎস্য বিভাগের অধিকর্তা মিঃ কে, এন, অনন্তরামন তিলাপিয়া মাছ সম্পর্কে বলেছেন যে, ভারতের পক্ষে ইহা মহাকল্যাণকর।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্বপ্রথম কলম্বোর মৎস্য গবেষণা মন্দির থেকে প্রথম ৫ শত তিলাপিয়া মাছকে জীবন্ত অবস্থায় বিমানযোগে মাদ্রাজের মৎস্য গবেষণা মন্দিরে আনা হয় এবং ১ শতটি কাৎলা মাছ মাদ্রাজ থেকে সিংহলে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ৭০টি পথে মারা যায়। অপর দিকে তিলাপিয়া দীর্ঘসময় জীবিত থাকে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাবার জন্যে বেশী যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় আবহাওয়ায় এই মৎস্যের চাষ ও বৃদ্ধি সম্পর্কে গবেষণা করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের যে সব জলাশয় গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় সে সব জলাশয়ে সেপ্টেম্বর মাসে এই মাছের চাষ করা যাবে এবং গ্রীষ্মকাল সুরু হবার পূর্বেই ৯ মাস পর্যন্ত উহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, যে সব জলাভূমি চাষের অযোগ্য সে সব জলাভূমিতেও এর চাষ করা চলবে। অনুসন্ধানের ফলে আরও জানা গেছে যে, তিলাপিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের ক্ষতি তো করেই না, পরন্তু এরা নিরামিষাশী; এমন কি মৎস্যের ডিমও ভক্ষণ করে না।

মানুষ কবে থেকে যে তিলাপিয়াকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে আসছে, তা আজও জানা যায় নি। ১৯৩৬ সালে সর্বপ্রথম এই মাছকে ইন্দোনেশিয়ার পুকুরে দেখতে পাওয়া যায়। একজন কৃষক এগুলিকে চিনতে না পেরে এর কয়েকটি নমুনা একজন মৎস্যবিশেষজ্ঞকে দেন। তিনি অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে, পূর্ব-আফ্রিকার মোজাম্বিক উপকূলবর্তী সমুদ্রেই মাত্র এ ধরনের দুর্লভ মৎস্য দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

ল্যাটেরাইট থেকে লোহা

কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চলে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা পর্যবেক্ষণ কাজ চালিয়েছিলেন। এই পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টের এক স্থানে সাধারণ ল্যাটেরাইট থেকে লোহা নিষ্কাশনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উদ্দেশ্য স্থানীয় আগরিয়া নামক উপজাতির অবস্থার উন্নতি করা। ল্যাটেরাইট গলিয়ে লোহা বের করা হলো আগারিয়াদের আদিম বৃত্তি।

ল্যাটেরাইট গলিয়ে লোহা বের করে যে লোহা পাওয়া যেত, তার দ্বারাই লৌহশিল্প চালু ছিল বহু প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু বড় বড় কারখানায় তৈরী লোহা আমদানী হওয়ার ফলে আগারিয়াদের এই ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অনেকে এই আমদানি বৃত্তি ছেড়ে চাষবাস আরম্ভ করে দিয়েছে। অথচ স্থানীয় কারখানাগুলি এই ল্যাটেরাইট থেকে গালানো লোহাই বেশী পছন্দ করে, কারণ এগুলি সহজে ইচ্ছামত ঢালাই করা যায়। যদি এই শিল্পের পুনঃপ্রচলন হয় তাহলে উক্ত অঞ্চলের লৌহসম্পদ বাড়বে, আগারিয়ারাও খেয়ে পরে বাঁচবে।

ল্যাটেরাইট ভারতের বহু স্থানে পাওয়া যায়; যথা—উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত। ল্যাটেরাইট এক রকমের পাথর, কিন্তু উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, জল আর বাতাসের প্রভাবে ব্যাসাল্ট বা আগ্নেয়শিলা বিকৃত হয়ে ল্যাটেরাইটে পরিণত হয়েছে। ল্যাটেরাইটের প্রধান উপাদান অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহ হাইড্রক্সাইড, তাছাড়া অল্পাধিক ম্যাঙ্গানিজ, টাইটানিয়াম ও সিলিকা থাকে। ল্যাটেরাইটের রং অনেকটা সুরকির মত, দেখতে ফোঁপরা। খনি থেকে তোলবার সময় নরম থাকে, কিন্তু কালক্রমে শক্ত হয়ে যায়। ভাঙা ল্যাটেরাইটে চাপ দিলে ক্রমশঃ জুড়ে যায়। দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে ল্যাটেরাইট দিয়ে বাড়ী তৈরী হয়। সদ্য খনি থেকে তোলা ল্যাটেরাইট দিয়ে বাড়ী তৈরী করবার সময় চুণ-সুরকি লাগে না।

বৃটেনে-চিকিৎসা গবেষণার অগ্রগতি

মৃগীরোগ সম্বন্ধে সকলেই জানেন যে, ইহা একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু লণ্ডন প্রদর্শনীতে সম্প্রতি ইহার একটি কার্যকরী ঔষধ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে লিওনার্ড রুলের বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত লোক মস্তিষ্কের একপ্রকার 'অদ্ভুত বৈদ্যুতিক বিক্ষোভ, অর্থাৎ মৃগীরোগে ভুগিতেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই রোগে মস্তিষ্কের বিদ্যুৎবাহী স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে কিছু গোলমাল ঘটে এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীনকালে এই রোগকে বলা হইত 'পবিত্র' রোগ এবং অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই রোগে ভুগিতেন। রোগীদের কষ্ট লাঘবের জন্য দুই-চারটি ঔষুধ যে নাই তাহা নহে, তবে মাত্র দুই-তিন বৎসর হইল এই রোগের সত্যকারের কার্যকরী ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৃগীরোগ সারান অসম্ভব নয়—এখন চিকিৎসকেরা জোরের সহিত একথা বলিতে পারেন।

মৃগীরোগের ঔষধটির নাম মাইসোলিন। মৃগীরোগের চিকিৎসা সম্পর্কে কানাডার ডাঃ এ. বোস্কালো ও ডাঃ আর জি. এস. আর্থার্স্ অনেক গবেষণা করেন এবং কানাডীয় মেডিকেল পরিষদের জার্নালে তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়। মাইসোলিন' ঔষধটি এখন বিশ্বের সর্বত্র পাওয়া যায় এবং সম্প্রতি লণ্ডনের মেডিকেল প্রদর্শনীতে অন্যান্য বহু নূতন ঔষধের সহিত এই ঔষধটিও প্রদর্শিত হয়।

মৃগীরোগের চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণা গত বহু বৎসর যাবৎ চলিতেছে; কিন্তু মাইসোলিনের ফরমূলা আবিষ্কৃত হয় মাত্র তিন-চার বৎসর পূর্বে, ১৯৪৯ সালে। অতঃপর বৃটেন, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ঔষধটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে গ্র্যাণ্ডমল জাতীয় মৃগীরোগ সম্পূর্ণভাবে সারে, কিন্তু পেটিটমল জাতীয় মৃগীরোগে উহার কার্যকারিতা এখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় নাই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এত দ্রুতহারে হইতেছে যে, চিকিৎসকেরাও তাহার সহিত তাল

রাখিয়া চলিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে, কোন নতুন ঔষধ বা চিকিৎসা পদ্ধতির নির্দোষিতা বা রোগনিরাময় ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতে এত সময় লাগে যে, যখন ঔষধটি সাধারণে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে তখন তাহা পুরাতন বলিয়াই মনে হয়। বৃটেনের চিকিৎসকেরা ও ঔষধ সরবরাহকারীরা নতুন ঔষধগুলি সম্পর্কে একটু বেশী সাবধানী। ইহার কারণ হইল এই যে, কোন নবাবিষ্কৃত ঔষধের কার্যকারিতার চূড়ান্ত ও নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহারা তাহা স্বীকার করিয়া লইতে চাহেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর পরীক্ষা চালাইয়া যাইতে প্রস্তুত। কোন রোগ চিকিৎসার জন্য গবেষণাগারের অভিনব আবিষ্কারের ফলাফল সেই রোগ অপেক্ষাও মারাত্মক হইতে দেখা গিয়াছে। চিকিৎসকদের অপরিসীম সতর্কতা ও সাবধানতার জন্য মানবজাতির তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ভিটামিন বি-১২ সম্পর্কিত গবেষণাও অতিশয় মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। পূর্বে রক্তাল্পতা রোগের কোন চিকিৎসাই ছিল না। অতঃপর জনৈক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন যে, এই রোগে খণ্ডিত লিভার খাইলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগীরা প্রাণের ভয়ে প্রচুর পরিমাণ লিভার খাইতে বাধ্য হয়। তাহার পর বহু বৎসর ধরিয়া গবেষণা চলিতে থাকে এবং অবশেষে লিভার নির্যাস আবিষ্কৃত হয়।

ষ্ট্রেপটোমাইসিন সংক্রান্ত গবেষণা চলিবার কালে উক্ত গবেষণা আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়। ষ্ট্রেপটোমাইসিন সংক্রান্ত গবেষণা চালাইবার কালে আবিষ্কৃত হয় যে, খণ্ডিত লিভার বা লিভার নির্যাসের উপকারিতার প্রধান কারণ হইল একজাতীয় ভিটামিন এবং এই ভিটামিনকে পৃথক করিয়া লওয়া যায়। ভিটামিন বি-১২ লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু গবেষণা ও পরীক্ষা চলিয়াছে, কিন্তু এখনও বৃটেনের সাবধানী ঔষধ-প্রস্তুতকারকগণ কেবল এই কথাই বলেন যে, ভিটিভিট বি-১২ নামে যে ঔষধ চলিতেছে তাহার রাসায়নিক গুণাগুণ লিভার হইতে পৃথকীকৃত ভিটামিন বি-১২ এর গুণাগুণ হইতে অভিন্ন।

রক্তাল্পতা রোগ ছাড়াও অন্যান্য রোগের চিকিৎসাতেও ভিটিভিট ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। যেমন, ট্রিগিমিনাল নিউর্যালজিয়া নামক একপ্রকার খুব খারাপ ধরনের স্নায়ুরোগের পক্ষে ইহা অতিশয় উপকারী। এই রোগ মাঝে মাঝে এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে যে, তখন উপশমের জন্য মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। ভিটামিন বি-১২-এর আরও বহুপ্রকার গুণ আছে এবং মানবদেহের পক্ষে ইহার মূল্য অপরিসীম। সম্প্রতি লণ্ডনের প্রদর্শনীতে অনেকগুলি ঔষধ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের দ্বারা প্রস্তুত ভিটামিন বি-১২ প্রদর্শন করেন।

বসন্ত, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টীকার কার্যকারিতা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু টীকার একটি অসুবিধা হইল এই যে, শিশুরা ইহা ভীষণভাবে অপছন্দ করে। এই সমস্যা সমাধানের একটি উপায় হইল, একসঙ্গে অনেকগুলি রোগের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। সমস্যাটির পূর্ণ সমাধান এখনও করা সম্ভব হয় নাই। তবে সম্প্রতি লণ্ডনের প্রদর্শনীতে দুইটি ফার্ম কয়েকটি ভ্যাক্সিন প্রদর্শন করে যাহা একসঙ্গে ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার ও হুপিংকাসির প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৫৩

ষষ্ঠ বর্ষ : দ্বাদশ সংখ্যা

রিংহল্‌স্ কোব্রা—আফ্রিকার এই বিষধর সাপ মানুষ বা অন্য কাকেও দেখলে দূর থেকেই তার চোখে বিষ ছিটিয়ে সাময়িকভাবে তাকে অন্ধ করে দেয়।

করে দেখ

জলের উপাদান বিশ্লেষণের ব্যবস্থা

তোমরা সবাই জান, জল একরকম যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমবায়ে উৎপন্ন, সে কথার প্রমাণ কি? জল বিশ্লিষ্ট হলে যদি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়া আর কিছু না পাওয়া যায় তবেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই সহজে একটা পরীক্ষা করতে পার। এই পরীক্ষার সাহায্যেই দেখতে পাবে—জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কি ভাবে পরীক্ষাটা করতে হবে তার ব্যবস্থার কথা বলছি।

হাইড্রোজেন
অক্সিজেন
টেষ্টটিউব
অ্যাসিড মিশ্রিত জল
কার্বন বা প্লাটিনাম তড়িৎ প্রান্ত
ব্যাটারী
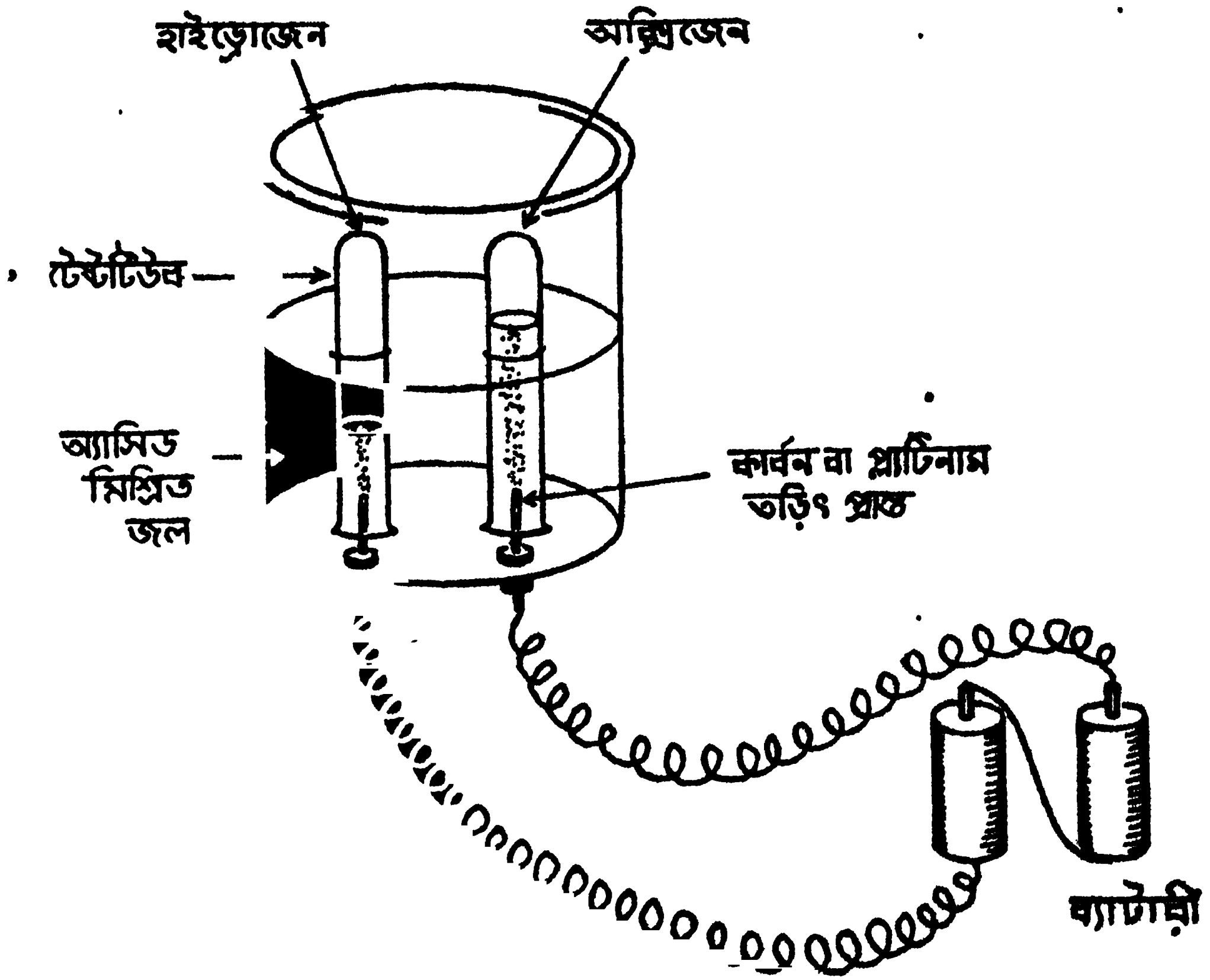
জল বিশ্লেষণের পরীক্ষা

বাজারে আজকাল সাদা প্লাষ্টিকের নানারকম পাত্র কিনতে পাওয়া যায়। ওই রকম সাদা প্লাষ্টিকের গ্লাসের মত একটা পাত্র (পাত্রটি ছবির মত হলেই ভাল হয়) সংগ্রহ কর। পাত্রের তলায় দুটা মোটা ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্র দুটার ভিতর দিয়ে দু-টুক্‌রা মোম ছিপির মত করে বসিয়ে দাও। এবার টর্চের পুরনো ব্যাটারি ভেঙে ভিতর থেকে দুটা কার্বন-পেন্সিল সংগ্রহ কর। পেন্সিল দুটাকে মোমের ছিপির মধ্যে

দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় ঢুকিয়ে দাও। খানিকটা গরম একটা লোহার তার দিয়ে মোমটাকে নরম করে পেন্সিলের গায়ে এবং পাত্রের ছিদ্রের মধ্যে বেশ এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। এবার গ্লাসটাতে আধাআধি জল ভর্তি কর। ছুটা টেষ্ট টিউব যোগাড় করতে হবে। টেষ্ট টিউব ছুটাতেই সম্পূর্ণরূপে জল ভর্তি করে হাতের বুড়ো আঙ্গুলে মুখ টিপে উবুড় করে গ্লাসের জলের মধ্যে কার্বন-পেন্সিল ছুটার উপর বসিয়ে দাও। এবার টর্চ লাইটের ছুটা ব্যাটারি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে ছবির মত ব্যবস্থায় কার্বন-পেন্সিল ছুটার সঙ্গে তারের সংযোগ করে দিলেই দেখবে—জলের মধ্যে ছুটা কার্বন-পেন্সিল থেকেই গ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুদ্বুদ উঠে টেষ্ট টিউবের উপরে জমা হচ্ছে। আরও লক্ষ্য করে দেখো—নিগেটিভ তড়িৎ-প্রান্ত থেকে যে গ্যাস উঠছে সেটা পজিটিভ তড়িৎ-প্রান্ত থেকে উদ্ভুত গ্যাসের দ্বিগুণ। জলের মধ্যে দু-এক ফোঁটা অ্যাসিড অথবা সামান্য একটু নুন মিশিয়ে দিলে খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে—নেগেটিভ তড়িৎ-প্রান্তে জমেছে হাইড্রোজেন এবং পজিটিভ তড়িৎ-প্রান্তে জমেছে অক্সিজেন গ্যাস। শিখাশূন্য জ্বলন্ত খড়কুটা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে। আর আগুন ধরিয়ে দিলে হাইড্রোজেন নীল বর্ণের শিখা বিস্তার করে জ্বলতে থাকে। তাছাড়া হাইড্রোজেনের সঙ্গে সামান্য বাতাস মিশ্রিত করে প্রজ্জ্বলিত করবার সময় সামান্য বিস্ফোরণ ঘটবে। এথেকই বুঝা যায়, দু-ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিলেই জল উৎপন্ন হয়। এই জন্যেই রসায়নের সাঙ্কেতিক ভাষায় জলকে লেখা হয় H_2O।

জেনে রাখ

কীট-পতঙ্গের অদ্ভুত সংস্কার

জীবজগতে নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে যতটা সংস্কারের প্রভাব দেখা যায়, উন্নত স্তরের প্রাণীদের মধ্যে সংস্কারের প্রভাব তার চেয়ে অনেকটা কম। ছেলেবেলা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে মানুষ গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করে নতুন নতুন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাবুইপাখী বংশানুক্রমে একই রকমের বাসা তৈরী করে থাকে। টুনটুনি পাখীর বাসা নির্মাণের কৌশল যতই কৌতুহলোদ্দীপক হোক না কেন, আবহমানকাল তারা কিন্তু সেই একই ধারা অনুসরণ করে চলেছে। যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কাকের অসংলগ্ন বাসা-নির্মাণ কৌশলের কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। মর্কট জাতীয় প্রাণীদের অনুকরণশক্তি কৌতুহল উদ্রেক করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধিরও তারিফ না করে পারা যায় না।

কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তাদের জন্মগত সংস্কার, অর্থাৎ গতানুগতিকতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। জাতিগত একপ্রকার সংস্কারের সুযোগ নিয়ে সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসীরা খুব সহজ উপায়ে বানর ধরে। সরু করে মুখ-কাটা ডাব-নারকেলের খোলের মধ্যে চিনি রেখে সেগুলোকে ইতস্তত: ছড়িয়ে দিয়ে লোকগুলো আড়ালে লুকিয়ে থাকে। চিনির লোভে দলে দলে বানর এসে দু-হাতই দুটা ডাবের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে মুঠো করে চিনি বের করে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুঠো করে ধরবার দরুণ খোলের ভিতর থেকে হাত আর বের করে আনতে পারে না। যখন দেখা যায় অনেক বানরই দু-দুটা ডাবের ভিতর হাত ঢুকিয়ে চিনি মুঠো করে ধরেছে অথচ হাত বের করে আনতে পারছে না, তখন চারদিক থেকে লোকগুলো হল্লা করে তাদের দিকে তাড়া করে আসে। ভয় পেয়ে বানরগুলো এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে, অনেকে গাছে উঠতে চেষ্টা করে—কিন্তু এমনই অদ্ভুত ব্যাপার কেউ মুঠা ছাড়ে না। দু-হাতে দুটা নারকেল নিয়ে তারা না পারে ছুটতে, না পারে গাছে চড়তে ; কাজেই অতি সহজে মানুষের হাতে বন্দী হয়।

বাসা তৈরী করবার জন্যে ভোমরা গোলাপ গাছের পাতা কেটে নিয়েছে

বিড়ালের পায়ে ময়লা লাগলে সে জিভ্ দিয়ে চেটে ফেলে, তাছাড়া পা দিয়ে ঘষে মুখ পরিষ্কার করে। বিড়ালের এ স্বভাব হয়তো সবাই তোমরা লক্ষ্য করেছ! বাঘেরও ঠিক এমনিই স্বভাব। বাঘের এ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে একসময়ে ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা নাকি বাঘ শিকার করতো। জঙ্গলের মধ্যে বাঘের চলার পথে তারা একোনাইটের আঠা মাখানো পাতা বিছিয়ে রাখতো। আঠা মাখানো পাতা পায়ের তলায় লেগে গেলে জিভ্ দিয়ে চেটেই হোক, কি মুখে ঘষেই হোক বাঘ

সেটাকে ফেলে দেবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। এর ফলে এদিক-ওদিক ছড়ানো অন্যান্য পাতা পায়ে, মুখে লেগে যায়। অস্থির হয়ে বাঘ তখন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে আপদ দূর করবার চেষ্টা করে। ফল হয় বিপরীত। সর্বাঙ্গে তো পাতা লাগেই, তাছাড়া চোখে-মুখে লেগে যাবার ফলে কিছুই দেখতে পায় না। তখন ক্রোধে, বিরক্তিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেবল গর্জন করতে থাকে। এ অবস্থায় আড়াল থেকে লোকজন ছুটে এসে তাকে জীবন্ত বন্দী করে অথবা লাঠিপেটা করে মেরে ফেলে। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদেরও সংস্কারগত এরূপ অনেক অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যার ফলে তারা শত্রুর কবলে পড়ে প্রাণ হারাতে বাধ্য হয়। এগুলো হলো উন্নত পর্যায়ের প্রাণীদের
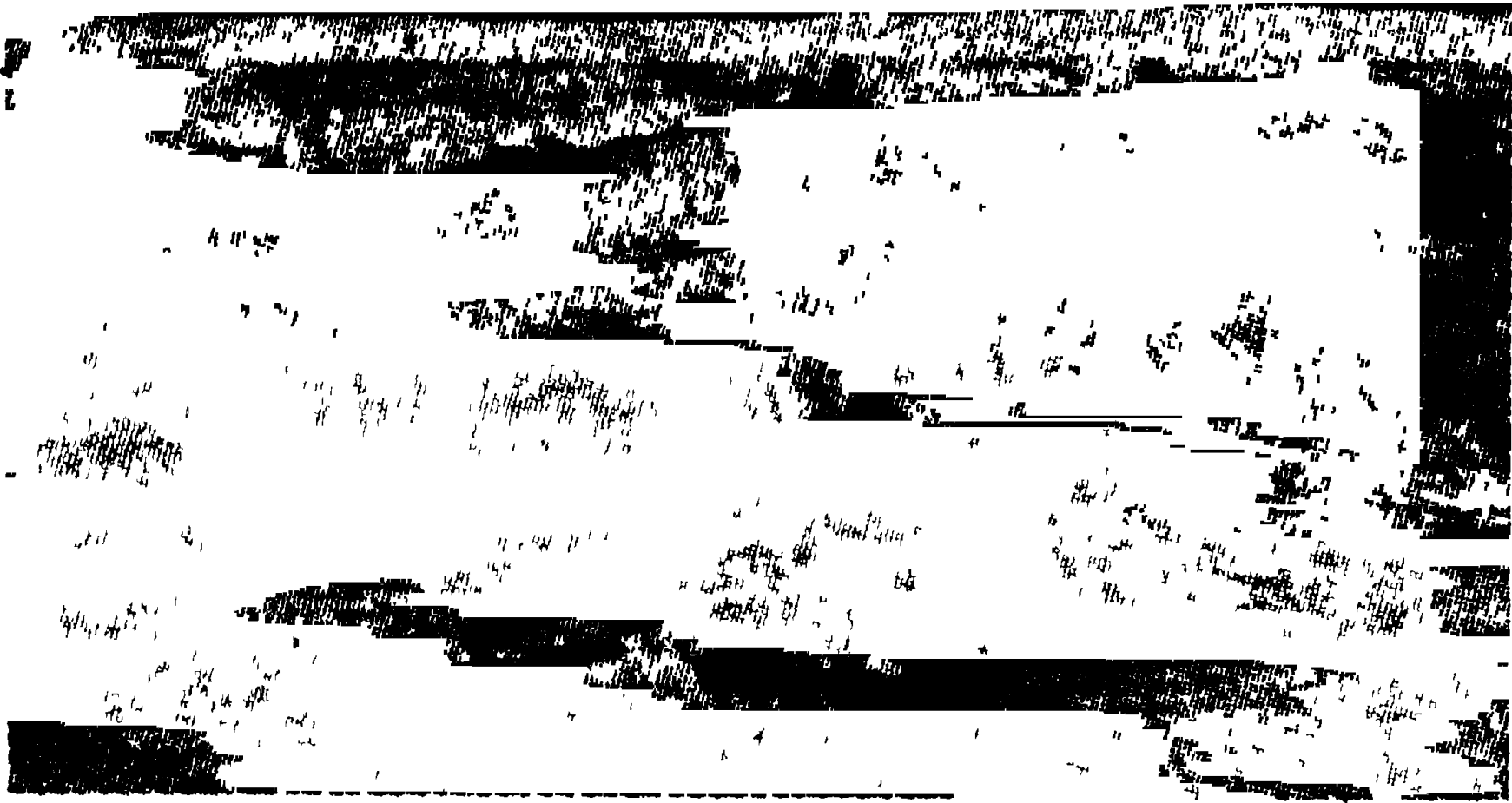
ভোমরা পুরনো কড়িকাঠের মধ্যে পাতার টুকরা দিয়ে বাসা নির্মাণ করেছে

সংস্কারমূলক বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্বভাবের কথা। কিন্তু এসব ছাড়াও প্রাণীজগতে জীবিকার্জন, সন্তানপালন বা আত্মরক্ষার সহায়ক কতকগুলো অদ্ভুত সংস্কার দেখা যায় এবং নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যেই এসব অদ্ভুত সংস্কারের আধিক্য লক্ষিত হয়ে থাকে। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

তোমরা মাকড়সার জাল সবাই দেখেছ। অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ নিখুঁত জাল তৈরী করা নিশ্চয়ই অপূর্ব দক্ষতার পরিচায়ক। এরূপ নিপুণভাবে কোন কিছু তৈরী করতে হলে মানুষের পক্ষে দীর্ঘকালের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হতো। মাকড়সার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর কিন্তু সেরূপ কোন অভ্যাস বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজনই হয় না; ডিম ফুটে বেরিয়ে আসবার মাত্র ৭।৮ দিন পরেই মাকড়সা ঠিক পরিণত বয়স্ক মাকড়সাদের মতই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অবলীলাক্রমে নিখুঁত জাল বুনে থাকে। এজন্যে তাদের কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় না বা অভ্যাস করবারও প্রয়োজন হয় না। রেশম-

প্রজাপতির বাচ্চারা কেমন সুন্দরভাবে সূতা বুনে গুটি তৈরী করে, সে কথা হয়তো তোমরা সবাই জান। বাচ্চাদের বোনা এই গুটি থেকেই রেশমী বস্ত্রাদি তৈরী হয়। সদ্য ভাঙা বোল্‌তার চাক লক্ষ্য করে দেখো—বাচ্চাগুলো অনবরত মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেমন সুন্দরভাবে গর্তের মুখের ঢাকনা তৈরী করে। এসব কাজের জন্যে এদের কারুরই কোন অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার দরকার হয় না।

গুবরে পোকা গোবরের ডেলাটাকে গড়িয়ে গর্তের দিকে নিয়ে যাচ্ছে

আমাদের দেশে কোন অপরিচ্ছন্ন পতিত জায়গায় লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে—ছোট-বড় কয়েক জাতের গুবরে পোকা মার্বেলের মত বড় বড় গোবরের ডেলা স্ত্রী-পুরুষ দুজনে মিলে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এদের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই দেখবে—গোবরের ডেলাটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে বহুদূরে নিয়ে, আগে থেকেই তৈরী-করা কোন গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে। গোবরের ডেলা গর্তের মধ্যে নিয়ে যায় কেন, জান? বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্যে। ডিম পাড়বার সময় হলেই এরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এভাবে খাদ্যসঞ্চয় করে রাখে।

আমাদের দেশে মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে রকমারি কুমুরে পোকা দেখা যায়। এরা অনেকেই মাটি দিয়ে ঘরের কোণে, আনাচে-কানাচে রকমারি বাসা তৈরী করে। অনেকে আবার মাটিতে গর্ত খুঁড়েও বাসা বাঁধে। জাতীয় রুচি অনুযায়ী কুমুরে পোকারা মাকড়সা, আরসোলা, উইচিংড়ি, পঙ্গপাল, শুঁয়াপোকা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের কীট-পতঙ্গ শিকার করে গর্তে নিয়ে যায়। শিকারকে মেরে ফেলে না, হুল ফুটিয়ে শরীরের মধ্যে বিষ ঢেলে অসাড় করে রাখে। শিকার যত বড়ই হোক না কেন, তাকে টেনে গর্তে নিয়ে

যায় এবং তার গায়ে ডিম পেড়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে চলে আসে। ডিম ফুটে
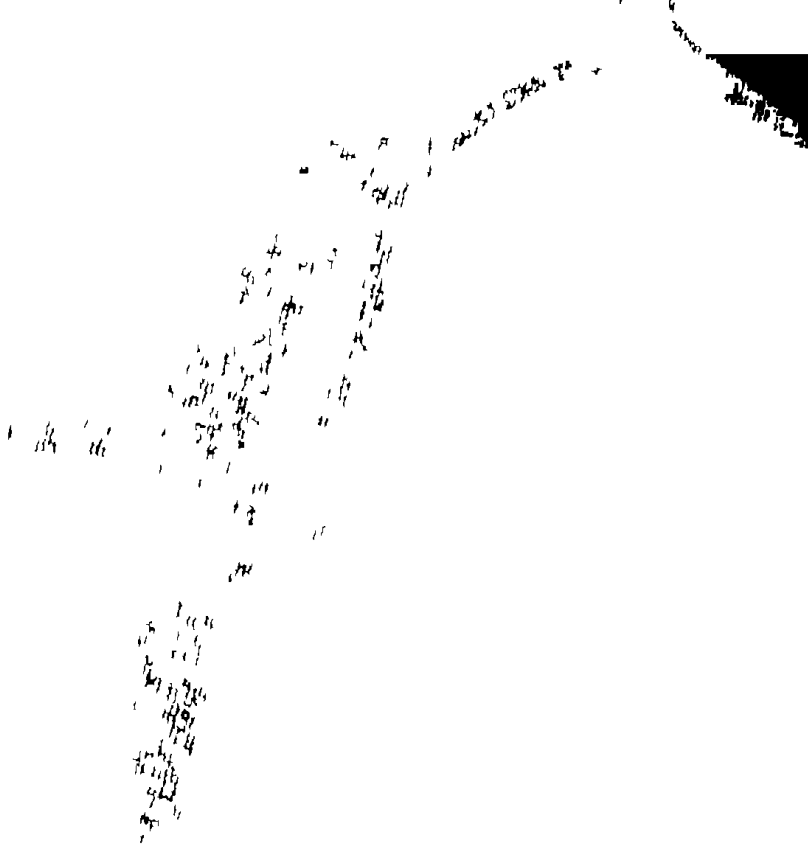
শুঁয়োপোকা পাতা মুড়ে বাসা তৈরী করেছে। পাতার বোঁটাটাকে লালা দিয়ে শক্ত করে এঁটে দিয়েছে

বাচ্চা বেরুবার পর শিকারের দেহ উদরসাৎ করে ক্রমশঃ বড় হয় এবং যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ কুমুরে পোকার রূপ পরিগ্রহ করে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।

কুমুরে পোকা ক্যাটারপিলারকে হুল ফুটিয়ে অসাড় করে গর্তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে

তোমরা ভ্রমর দেখেছ নিশ্চয়ই! চলতি কথায় বলে ভোমরা। এরাও বাচ্চাদের

জন্যে বাসা নির্মাণে সংস্কারমূলক অদ্ভুত কৌশলের পরিচয় দেয়। এরা সাধারণতঃ গোলাপ গাছের পাতা গোল করে কেটে নিয়ে পুরনো কড়ি-বরগার মধ্যে ভাঁজে ভাঁজে সাজিয়ে এক এক সারিতে অনেকগুলো করে কুঠুরি তৈরী করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। কুঠুরির মধ্যে বাচ্চাদের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ মধু ও রেণু সঞ্চয় করে রাখে। বাচ্চাগুলি যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে কুঠুরির মুখ কেটে বেরিয়ে এসে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায় এবং ডিম পাড়বার সময় যথারীতি পাতা কেটে বাসা তৈরী করে। তাদের মাতাপিতার সঙ্গে কোন কালেই দেখা সাক্ষাৎ হয় না অথচ বংশানুক্রমে একই কৌশলে বাসা নির্মাণ করে যায়। সংস্কারবশে এরূপ সুনিপুণ কৌশলের পরিচয় দেওয়া কিরূপ বিস্ময়কর তা সহজেই বুঝতে পার।

এক জাতের মথ-প্রজাপতির বাচ্চা গুটি তৈরী করবার সময় যে রকম বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয় তা সত্যিই অপূর্ব। এই জাতের শুঁয়াপোকা পাতা মুড়ে তার মধ্যে গুটি তৈরী করে। পাতার মধ্যে গুটি তৈরী করবার আগে পাতার বোঁটাটিকে মুখের লালা দিয়ে গাছের সঙ্গে শক্ত করে এঁটে দেয়। কারণ গুটির মধ্য থেকে পূর্ণাঙ্গ মথরূপে বেরিয়ে আসবার জন্যে যত দিনের দরকার হবে ততদিনের মধ্যে পাতাটা বোঁটা খসে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই বোঁটাটা গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকলে কোন রকমেই সেটা পড়ে যেতে পারবে না। ব্যাপারটা সামান্য হলেও খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক; কিন্তু যতই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হোক না কেন—কাজটা করে এরা সম্পূর্ণ সংস্কারবশেই। কীট-পতঙ্গের মধ্যে এ রকমের সংস্কারমূলক আরও যে কত রকমের কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তার ইয়ত্তা নেই। এস্থলে তার কয়েকটি মাত্র কৌশলের কথা উল্লেখ করা হলো। তোমরা যদি আশেপাশে একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে লক্ষ্য কর তবে এ ধরনের আরও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়বে। —গ—

শব্দের কথা

পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের কাছে প্রথমে উদ্ভট, অসম্ভব বলে বোধ হয়। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—সব কিছুর না হোক, অনেক কিছু আপাতঃ অসম্ভব ব্যাপারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আমার এক বন্ধুর পিসীমা একবার বলেছিলেন—"ওরে, তোরা হারমনিয়াম বন্ধ কর, আমার গরম হচ্ছে।" সে কথায় হাসির ধূম পড়েছিল—আমিও ছিলুম এবং হেসেওছি। কিন্তু আজকে বুঝেছি; পিসীমার উক্ত কথায় হাসির প্রকৃত কারণ কিছু নেই; অর্থাৎ কথাটা খুবই সত্য।

বহুকাল আগে, আকবরের সভায় বিখ্যাত গায়ক তানসেন নাকি দীপক রাগে আগুন ধরিয়ে দিতেন, আবার মেঘমল্লারের সুরে চতুর্দিকে বারিপাত ঘটিয়ে সে আগুন নির্বাপিত করতেন।

প্রায় দু-বছর আগে সংবাদপত্রে অনেকে দেখে থাকবে অনুরূপ আর একটি খবর। খবরটি হলো—গুজরাট অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হেতু স্থানীয় জনসাধারণ পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকে গুজরাটে আমন্ত্রণ করেন—সঙ্গীতের সাহায্যে বারিপাত ঘটানোর আশায়। ওঙ্কারনাথজী শিষ্যসমভিব্যাহারে. দিনতিনেক বিরামবিহীন রাগরাগিনী আলাপ করে চতুর্থ দিনে বারিপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করে নিতে পারি, গান বাজনার মধ্য দিয়ে তান, লয়, মান প্রভৃতির সঠিক সমন্বয় ঘটলে আবহাওয়া উষ্ণতর হয়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু সুরের সঙ্গে উত্তাপের কি সম্বন্ধ। কি ভাবেই বা গানের সুরে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমাদের ছোট্ট একটুখানি আলোচনা করতে হবে—শব্দ কি ও শব্দ কি ভাবে সৃষ্ট হয়।

প্রথমেই বলে রাখি শব্দ একটা শক্তি। তাপশক্তি, আলোকশক্তির মত শব্দও শক্তির কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। আলোকরশ্মির মত শব্দও বাতাসের মধ্য দিয়ে ঢেউয়ের মারফৎ সঞ্চারিত হয়। তবে পার্থক্য একটু আছে। আলোক-তরঙ্গের জন্যে বাতাসের উপস্থিতি বাধারই সৃষ্টি করে—কিন্তু শব্দ-তরঙ্গের অভিন্ন বন্ধু বাতাস। বাতাস না থাকলে শব্দ-তরঙ্গ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে—অর্থাৎ বায়ুশূন্য স্থানে আমরা কোন শব্দই শুনতে পাই না—তা চিৎকারই করি—আর অ্যাটম্ বোমাই ফেলি।

শব্দের গুণাগুণ অধিকাংশই আলোক আর তাপ শক্তির মত। অন্যান্য শক্তির মত শব্দও সঞ্চারিত হয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে—একথা আগেই বলেছি। প্রতিফলন, প্রতি-সরণ আলোকরশ্মির এই দুইটি সাধারণ গুণের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। শব্দ-তরঙ্গও এই নিয়মের অধীন। প্রতিধ্বনির যে সব কৌতুককর কাহিনী আমরা শুনি এবং যা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির মনে অশরীরীর উপস্থিতি সম্বন্ধে বিশ্বাস ধরিয়ে দেয়, সে সবই শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলনের ফলে ঘটে থাকে। ইটালির একটি গুহার সামনে দাঁড়িয়ে নাতিদীর্ঘ একটি কবিতা পাঠ করে দেখা গেছে—আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে গুহা থেকে গম্ভীর স্বরে কেউ যেন সেই কবিতাটি আবৃত্তি করছে এবং ভয় না পেয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে সম্পূর্ণ কবিতাটি শোনা যাবে। লণ্ডনের "হুইস্‌পারিং গ্যালারী"তে বসে দর্শকদের পক্ষে অনুচ্চ স্বরে কথা বলায় বিপদ আছে। কারণ বক্তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর প্রতিফলনের সাহায্যে বহুগুণে শব্দায়মান হয়ে সকলেরই কর্ণগোচর হওয়ার সম্ভাবনা।

এখন শক্তিমাত্রেরই একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, তার বিনাশ নেই। শক্তি সৃষ্টি

করাও অসম্ভব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময়ে মোট যে পরিমাণ শক্তি সৃষ্ট হয়েছিল—আজও বলা যেতে পারে, চিরকালই সমুদয় শক্তির পরিমাণ সে একই আছে এবং থাকবে। কথাটা এখন বুঝতে একটু দেরী হলেও বড় হয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে। তোমরা শুধু জেনে রাখ—শক্তির বিনাশ নেই।

আমি জানি, তোমরা প্রশ্ন তুলবে—একি কথা। তাপ-শক্তিকে তো হামেশাই দেখি বিনষ্ট হতে। জল গরম করে কিছুক্ষণ রেখে দিলেই আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অর্থাৎ তাপ নষ্ট হয়ে যায়। প্রতি মাসে লাইট, ফ্যান, রেডিও বাবদ আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি ও তার দাম দিই—সেই বিদ্যুৎ কি আর ফিরে পাওয়া যায়? যতটা কারেন্ট খরচ হয় সে সবই তো নষ্ট হলো—ফুরিয়ে গেল!

তোমাদের এ প্রশ্নের উত্তরে বলব—নষ্ট হওয়া কথাটা আপেক্ষিক। সাধারণ হিসাবে জলের তাপ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নষ্ট হলেও ফুরিয়ে যায় নি মোটেই! একটু লক্ষ্য করলে দেখবে—ঐ তাপ বা বিদ্যুৎ-শক্তি কেবল স্থান, আধার বা রূপ পরিবর্তন করেছে। কেটলির জল যখন ঠাণ্ডা হয়ে গেল—ঘরের আবহাওয়ার মধ্যে সেই জলের তাপ সঞ্চারিত হলো। আবার ওদিকে বিদ্যুৎ-শক্তি নষ্ট হলো বটে—তবে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তির বিকাশ ঘটলো অন্যভাবে—বিজলী বাতির আলোয়, ফ্যানের যান্ত্রিক শক্তি আর রেডিওর তাপ ও শব্দ শক্তির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপায়িত হলো মাত্র, ফুরিয়ে গেল না। তোমার হাতের হাতুড়ি দিয়ে একটা লোহা পিটলে দেখবে, লোহাটা গরম হয়ে উঠেছে! এই উত্তাপ কোথা হতে এল?

ফুটবলের ব্লাডারে সিরিঞ্জের মারফৎ হাওয়া ভর্তি করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে তুমি সিরিঞ্জের মুখটা ধরেই মুখ বিকৃত করেছ কয়েকবার, নয় কি? তোমার অন্যমনস্কতার ফলে হাতে ছেঁকা লেগেছে—কেমন? কিন্তু তুমি কি ভেবেছ কখনো—কি করে এই উত্তাপ এলো?

লোহা পিটতে ও ফুটবলে হাওয়া ভর্তি করতে তোমার হাতের পরিশ্রম হয়েছে। সেই পরিশ্রম হলো যান্ত্রিক শক্তি। ঐ যান্ত্রিক শক্তি উপযুক্ত ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করল তাপ-শক্তিতে। এক কথায়—তুমিই ঐ তাপের সৃষ্টিকর্তা।

শব্দের বেলাতেও ঠিক এই কথাই খাটে। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে—প্রথমে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই তাপ-শক্তিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আবার যান্ত্রিক ও রাসায়নিক শক্তিতেও রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এখানে একটা কথা বলে রাখি—সব শক্তিই পরিণামে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শব্দের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

আমরা শব্দের বিশিষ্ট গুণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন শব্দ কি ভাবে সৃষ্ট হয় সে কথা জানতে পারলে—শব্দ-শক্তি থেকে তাপের সৃষ্টি কেমন করে ঘটে তা অনায়াসেই বুঝতে পারবো।

আমরা জানি শব্দ বিভিন্ন প্রকার। কোনও শব্দ শ্রুতিমধুর, কোনটি বা নিতান্তই বেসুরো কর্কশ। উঁচু, নীচু, একটানা, বিলম্বিত, দ্রুত, মোলায়েম, মধুর, কম্পিত, এসব শব্দ প্রায়ই শুনি। সাইরেনের প্রাণঘাতী শব্দ আর রেডিও শিল্পীর মনোমুগ্ধকর কণ্ঠস্বর—দুই-ই শব্দ, কিন্তু পার্থক্য কি ভয়ানক! তবে পার্থক্য যতই থাক, শব্দ সৃষ্টির গোড়ার কথা এক ও অদ্বিতীয়। কোনও দ্রব্যের দ্রুত স্পন্দনের ফলে বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্ট হয় সেই তরঙ্গসমষ্টি আমাদের কানের পর্দায় অনুরূপ স্পন্দন জাগিয়ে তোলে; ফলে শব্দ শ্রুত হয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে, বস্তুর দ্রুত স্পন্দন ছাড়াও শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটতে পারে এমন স্থিতিস্থাপক বস্তুরও প্রয়োজন। বাতাস এমনি এক স্থিতিস্থাপক পদার্থ। তাই আমরা আগেই বলেছি—আলোকের পক্ষে বাতাস কিছুটা বাধারই সৃষ্টি করে; পক্ষান্তরে শব্দ-তরঙ্গের অভিন্ন বন্ধু এই বাতাস।

আমরা জানি সেতার কিংবা এস্রাজের তারে আঘাত করলেই একটা বিশেষ সুর ধ্বনিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—অঙ্গুলীর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তারের দ্রুত স্পন্দন ঘটে। অতি দ্রুত এই স্পন্দন বাতাসের মধ্যে একবার ঘন পরের বার হাল্‌কা, এই রকম অনেকগুলি ঢেউ তোলে। বাতাসের সেই ঢেউ স্থানচ্যুত না হয়েই যে আলোড়ন তোলে তার আঘাতে আমাদের কানের পর্দায় সেতারের তারের সেই স্পন্দনের অনুরূপ কম্পন জাগে। এই স্পন্দন কানের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থের মধ্যেও অনুরূপ আলোড়ন জাগায়। ফলে, মস্তিষ্কের মধ্যে শব্দ-সঙ্কেত উপলব্ধি হয়। শব্দের গতি অত্যন্ত দ্রুত—সাধারণতঃ সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট হওয়ায় এই ব্যাপার ঘটতে এক সেকেণ্ডের একশ' ভাগেরও কম সময় লাগে। ফলে, সেতারে টঙ্কার দিলেই আমরা তার মধুর সুরে মুগ্ধ হই।

মানুষ যখন কথা বলে, গান গায় তখন তার গলায়, বুকে অথবা পিঠে হাত দিলে বা একটু লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়—অভ্যন্তরে কোথাও দ্রুত কম্পন সংঘটিত হচ্ছে। ব্যাঙের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে তার গলার দিকে লক্ষ্য করে দেখবে—গলার কাছটা দ্রুততালে কাঁপছে। মশার ডাক আমরা রোজ রাত্রেই শুনি; কিন্তু আমরা যা শুনি তা মশার ডাক নয় মোটেই—দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনের ফলে ঐ শব্দ সৃষ্ট হয়।

আমরা দেখেছি, আলো ও শব্দের একটা বিশেষ পার্থক্য। মহাশূন্যে আলোকের গতি স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু বায়বীয়, জলীয় বা কঠিন পদার্থের সংস্পর্শে আলোর গতি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। খোলা মাঠে রাত্রে যে টর্চের আলো দু'শো হাত দূরের বস্তুকে দৃষ্টির গোচরে আনে—পরিষ্কার পুকুরের জলে সেই আলোতে জলের মধ্যে মাত্র কয়েক হাত অবধি দেখা যাবে। আবার কঠিন পদার্থ হিসাবে একখানা খুব পাতলা খাতার কাগজ সেই আলোর সামনে ধরলে অপরদিকে মোটেই আলোর রশ্মি দেখা যাবে না—কাগজ-খানাই শুধু আলোকিত হবে।

শব্দ ঠিক এর বিপরীতধর্মী। বাতাসের মধ্যে শব্দের গতিবেগ, তরল পদার্থের মধ্যকার গতিবেগের প্রায় অর্ধেক ও কঠিন পদার্থের ভিতরের এর গতির চেয়ে প্রায় একচতুর্থাংশ মাত্র; অর্থাৎ বস্তু যত ঘন হবে—তার মধ্য দিয়ে শব্দের গতিও বেড়ে যাবে। আবার একেবারে শূন্যস্থানে—মহাব্যোমে—শব্দের গতি কিছু নেই; অর্থাৎ সেখানে শব্দের অচলবস্থা!

আমরা দেখেছি, শব্দ সৃষ্টির জন্যে চাই দ্রুত স্পন্দনশীল উৎস (বস্তু) ও স্থিতিস্থাপক মাধ্যম (বাতাস, জল প্রভৃতি)। এখন উৎসটি যত দ্রুত স্পন্দিত হবে—বাতাসের মধ্যে ততই দ্রুত পর পর ঘন ও পাতলা চাপের তরঙ্গ সৃষ্ট হবে। এই শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগের ফলে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, সেই শক্তি ক্রমশঃ তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। ফলে শব্দের সমাপ্তিতে তাপের আবির্ভাব ঘটা বিচিত্র নয়। অবশ্য বাতাসে আগুন জ্বলে ওঠবার মত তাপের সৃষ্টি যে ঘটবেই, এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সঠিকভাবে রাগ-রাগিণীর আলাপজনিত সুর সংঘাতে গায়কের নিজদেহ উত্তপ্ত হবেই এবং দর্শকবৃন্দেরও বেশ উত্তাপ অনুভূত হওয়া খুবই সম্ভব।

আরও একটি মজার কথা এই যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে সময়বিশেষে বিভিন্ন শব্দের সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ স্তব্ধতা সংঘটিত হতে পারে। 'আবোল তাবোল' বইটিতে ৺সুকুমার রায় বলেছেন—

> "আলোয় ঢাকা অন্ধকার
> ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।"

কথাগুলি সত্যই আজগুবি নয়। দুটি আলোকরশ্মিকে বিশেষ অবস্থায় একত্রীভূত করে জোরালো আলোর বদলে একেবারে অন্ধকার সৃষ্টি করা সম্ভব। অনুরূপভাবে, দুটি শব্দের ঢেউকে বিশেষ অবস্থায় এক করে স্তব্ধতার সৃষ্টি করা যায়—এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। তাছাড়া এমন শব্দ আছে যাতে মোটেই আওয়াজ হয় না; অর্থাৎ যে শব্দের কোনও শব্দ নেই! কথাটা হঠাৎ শুনতে অদ্ভুত নয় কি? কিন্তু তোমরা এতক্ষণে দেখেছ—বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা অনেক কিছু রহস্যময়, তথাকথিত অসম্ভব, অদ্ভুত ব্যাপারের সহজ ব্যাখ্যা করতে পারি। ধ্বনির এবম্বিধ আরও অনেক বৈচিত্র্য আছে যা খুবই বিস্ময়কর; কিন্তু শিক্ষাপ্রদ।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ বসু

গণিতের সূত্র

দুটা সংখ্যার যোগফল এবং বিয়োগফল থেকে আমরা পাটিগণিতে সূত্র সাহায্য সংখ্যা দুটা বের করতে পারি। অনুরূপভাবে অন্য সূত্র বিশেষের উপর নির্ভর করে আমরা দুটা সংখ্যার ভাগফল ও বিয়োগফল কিংবা যোগফল অথবা গুণফল এবং ভাগফল অথবা গুণফল এবং যোগফল কিংবা বিয়োগফল থেকে সংখ্যা দুটা নির্ণয় করতে পারি। মনে কর (ক) দুটা সংখ্যার ভাগফল এবং (খ) অপর দুটা সংখ্যার ভাগফল এবং বিয়োগফল দেওয়া আছে—সংখ্যাগুলি নির্ণয় করতে হবে। বীজগণিতের সাহায্যে নির্ণয় করা সব সময় সম্ভব নয়; কেন নয় সে কথা পরে বলছি।* দুটা সংখ্যার ভাগফল এবং যোগফল দেওয়া থাকলে—

(ক) ছোট সংখ্যা $= \dfrac{\text{যোগফল}}{\text{ভাগফল} \times ১}$ এবং

দুটা সংখ্যার ভাগফল ও বিয়োগফল দেওয়া থাকলে—

(খ) ছোট সংখ্যা $= \dfrac{\text{বিয়োগফল}}{\text{ভাগফল} - ১}$

এর প্রমাণ পরে দেওয়া হবে। আগে কতকগুলি সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রশ্ন (ক) ১। দুটা সংখ্যার ভাগফল ১৩ এবং যোগফল ১৮২। সংখ্যা দুটা কত? (সোমেশ বসু)†

২। দুটা সংখ্যার যোগফল ৪৪০০ এবং ভাগফল ১৭৫। সংখ্যা দুটা কত? (ডি. এন্. মল্লিক)†

৩। দুটা সংখ্যার যোগফল ৮২৩৪৮৯৭৮২ এবং ভাগফল ৮৩২০৫। সংখ্যা দুটা নির্ণয় করতে হবে। (গঙ্গোপাধ্যায় ও বসু)†

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। ঐগুলিকে এখন উল্লিখিত সূত্রে বসিয়ে দেখা যাক।

উত্তর: ১। সূত্রানুযায়ী ছোট সংখ্যা $= \dfrac{১৮২}{১৩+১} = \dfrac{১৮২}{১৪} = \dfrac{১৩}{}$ এবং

∴ বড় সংখ্যা = ১৩ × ১৩ (যেহেতু ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল এখানে ভাজক হলো = ছোট সংখ্যা = ১৩) = ১৬৯ উত্তর।

২। সূত্রানুযায়ী ছোট সংখ্যা $= \dfrac{৪৪০০}{১৭৫+১} = \dfrac{৪৪০০}{১৭৬} = \dfrac{২৫}{}$ এবং

বড় সংখ্যা = ২৫ × ১৭৫ = ৪৩৭৫ উত্তর।

---

* অবশ্যই বিভাজ্য।

† ভাগ করতে দেওয়া প্রশ্নগুলি থেকে—ভাগ ও যোগ করে নেওয়া হয়েছে।

৫। উল্লিখিত সূত্রানুযায়ী ছোট সংখ্যা $= \frac{৮২৩৪৮৯৭৮২}{৮৩২০৫+১} =$ ৯৮৯৭ এবং

বড় সংখ্যা $=$ ৯৮৯৭ $\times$ ৮৩২০৫ $=$ ৮২৩৪৭৯৮৮৫ উত্তর।

(খ) এবার বিয়োগফল এবং ভাগফলের বেলা দেখা যাক।

প্রশ্ন। ১। দুটা সংখ্যার ভাগফল ১৭৫ এবং বিয়োগফল ১৫৬৬০। ছোট সংখ্যাটি কত?

২। দুটা সংখ্যার বিয়োগফল ২৪৬৬৬৬৪৫০ এবং ভাগফল ৩২৭৬। ছোট সংখ্যাটি বের করতে হবে।

উত্তর। ১। সূত্রানুযায়ী ছোট সংখ্যা $= \frac{১৫৬৬০}{১৭৫-১} = \frac{১৫৬৬০}{১৭৪} =$ ৯০ *

২। সূত্রানুযায়ী ছোট সংখ্যা $= \frac{২৪৬৬৬৬৪৫০}{৩২৭৬-১} =$ ৭৫৩১৮ *

এবার প্রমাণের বিষয় বলছি। (ক) ধরা যাক x বড় সংখ্যা এবং y ছোট সংখ্যা এবং a ও b যথাক্রমে তাদের ভাগফল ও যোগফল। তাহলে—

$$\frac{x}{y} = a \text{ and } x+y=b$$

$$\text{Or, } x - ay = o \text{ and} \cdots\cdots\cdots(i)$$

$$x + y = b \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots(ii)$$

(i) ও (ii) বিয়োগ করে: $-y(a+1) = -b$

$$\text{Or, } y(a+1) = b$$

$$\therefore y = \frac{b}{a+1} = \text{Constant.}$$

অর্থাৎ, ছোট সংখ্যা $= \frac{\text{যোগফল}}{\text{ভাগফল}+১} =$ ধ্রুবক।

[যেহেতু, x, y, a, b, p ইত্যাদি যে কোন মান নির্দেশ করতে পারে।]

(খ) আবার ভাগফল ও বিয়োগফলের বেলায়—

ধরা যাক x ও y যথাক্রমে বড় ও ছোট সংখ্যা; এবং a ও x যথাক্রমে x ও y-এর ভাগফল এবং বিয়োগফল। তাহলে—

$$\frac{x}{y} = a \qquad \text{and} \qquad x - ay = o \cdots\cdots(i)$$

$$x - y = p \qquad \text{Or, } x - y = p \cdots\cdots(ii)$$

---

* পূর্বোক্ত উপায়ে বড় সংখ্যাও নির্ণয় করা যাবে; অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বড় সংখ্যা $=$ ছোট সংখ্যা $\times$ ভাগফল ($\therefore$ ভাজ্য $=$ ভাজক $\times$ ভাগফল; এখানে ভাজক $=$ ছোট সংখ্যা)।

† অবশ্যই বিভাজ্য।

(i) ও (ii) বিয়োগ করে: $-y(a-1) = -p$

$$y(a-1) = p$$

$$\text{Or, } y = \frac{p}{a-1} = \text{Constant}$$

অর্থাৎ ছোট সংখ্যা = $\frac{\text{বিয়োগফল}}{\text{ভাগফল} - ১}$ = ধ্রুবক।

উক্ত সূত্র দুটা থেকে আমরা সহজেই যোগফল কিংবা বিয়োগফল এবং ভাগফল থেকে সংখ্যা দুটা নির্ণয় করতে পারি। বীজগণিতের সাহায্যে করা বিশেষ শ্রম তথা সময়সাপেক্ষ। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সূত্রদ্বয় ব্যবহার করলে সুবিধা হবে বলেই বিশ্বাস।

শ্রীমিহিরকুমার রায় চৌধুরী

বিবিধ

ক্যাজুয়েলটি হাসপাতাল

সম্প্রতি বাংলার মেডিক্যাল এডুকেশন সোসাইটির কর্মপরিষদ একটি বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০ বেড সমন্বিত অতি-আধুনিক ধরনের ক্যাজুয়েলটি হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম অনুসারে তাহার নামকরণ করা হইবে। তিনি বহু বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও পর্যন্ত তিনি এই কলেজের ডিপার্টমেণ্ট অব মেডিসিনের ইন্ চার্জ পদে (বর্তমানে ছুটিতে আছেন) বহাল আছেন।

এই ক্যাজুয়েলটি হাসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এশিয়ার ইতিহাসে একটি অভিনব ব্যাপার হইবে। দুই বিঘা জমির উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে এবং উহার সম্মুখে পড়িবে বেলগাছিয়া রোড। এই স্থানটির একদিকে এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল এবং অন্যদিকে আর. জি. কর কলেজ হোষ্টেলের মধ্যস্থলে শীঘ্রই হাসপাতালের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। জমি খরিদ করিয়া ইমারত নির্মাণ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি খরিদের জন্য আনুমানিক মোট ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। ইহার মধ্যে আর. জি. কর কলেজ হাসপাতাল উন্নয়ন কমিটি ইতমধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হাসপাতালের নির্মাণকার্য সুরু করিবার জন্য উক্ত কমিটি সমপরিমাণ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ক্যাজুয়েলটি হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠার জন্য আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই নূতন হাসপাতালের কাগজপত্র ও নক্সা কর্তৃপক্ষ ইতমধ্যেই প্রস্তুত করিয়াছেন। হাসপাতালটি ষ্ট্রীম-লাইনযুক্ত চারতলা ইমারত হইবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি-আধুনিক নক্সাসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ তাহারই অনুকরণে নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের এই হাসপাতালে গ্রহণের ও চিকিৎসার

সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে। দুর্ঘটনায় আহতগণের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হইয়া আহত, রাস্তায় পতিত, জলমগ্ন, সর্পদষ্ট, খাদ্যে বিষক্রিয়া, অস্থিসংক্রান্ত ব্যাধিগ্রস্তগণ অন্যতম। এই হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডসমূহে এই সকল রোগীর চিকিৎসা করা হইবে। এই হাসপাতালে দিবারাত্রি মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার, হৃদ্‌পিণ্ডে অস্ত্রোপচার, রোগীর দেহে রক্তদান এবং রঞ্জনরশ্মি প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইবে। এই হাসপাতালে অতি-আধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকিবে এবং ১০০ ইন্‌ডোর বেড থাকিবে। যে সকল রোগীর দক্ষ মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন, কেবলমাত্র তাহাদেরই জন্য ঐ সকল বেড নির্দিষ্ট থাকিবে।

গুঁড়া কয়লার সদ্ব্যবহার

সরকারী রেলওয়ে কয়লাখনি হইতে যে গুঁড়া কয়লা পাওয়া যায় তাহার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে জিয়ালগোড়ার জ্বালানি গবেষণাগারে পরীক্ষা চালান হইয়াছিল। ঐ পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, যে-সকল থার্মাল বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্রে ঝাঁঝরিবিশিষ্ট অগ্নি প্রজ্বালক আছে সেগুলিতে ঐ কয়লার গুঁড়া উত্তম জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

রেলওয়ে বোর্ডের উদ্যোগে ঐ পরীক্ষা চালান হয়। বোখারা ও গিরিডির কয়লাখনি হইতে যে গুঁড়া কয়লা পাওয়া যায় তাহার তিন-চতুর্থাংশ পোড়া কয়লায় পরিণত করা যায় এবং তাহাতে শতকরা ১৭-২৫ ভাগ ছাই থাকে। ঐ গুঁড়া কয়লা সদ্ব্যবহারের উত্তম উপায় হইতেছে, ঐ কয়লা ধুইয়া উহাকে কার্বোনাইজ করিয়া উৎকৃষ্ট কয়লায় পরিণত করা। গিরিডির কয়লায় কিছু পরিমাণ গন্ধক ও ফস্‌ফরাস থাকে। ঐ কয়লা কারবাইড ও ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত।

বাকী এক-চতুর্থাংশ নন্‌-কোকিং গুঁড়া ইটকের আকারে প্রস্তর তৈয়ারীর উপযুক্ত। এই কয়লায় অপেক্ষাকৃত কম ছাই থাকে এবং সেজন্য ধুইবার প্রয়োজন হয় না। এই কয়লায় আল্‌কাতরা মিশাইয়া জল-নিরোধক শক্ত ইট তৈয়ারী করা যায়।

ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

ভেষজ আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারই ভেষজ প্রস্তুত, বিক্রয় এবং বিতরণ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। এক্ষণে 'খ' শ্রেণী সহ সকল রাজ্যেই এই আইন চালু করা হইয়াছে। 'ক' শ্রেণীর রাজ্যে এবং 'গ' শ্রেণীর কতকগুলি রাজ্যে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। 'খ' শ্রেণীর রাজ্যে উক্ত সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। লাইসেন্স কর্তৃপক্ষের উপর রাজ্যে ভেষজ আইন কার্যকরী করিবার ভার থাকে। পরিদর্শকগণ ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং সেখানে কোন ত্রুটি দেখিলে তাঁহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে আদালতে অভিযুক্ত করিতে পারেন।

ভেষজ আইনে এইরূপ একটি বিধান আছে যে, রোগবিশেষ আরোগ্য করিতে পারে দাবী করিলেই তাহা আমদানী, প্রস্তুত বা বিক্রয় করা চলিবে না। তবে এই ধারা অনুযায়ী আপত্তিকর বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করা যায় না। যেমন কবচ, মাদুলী, দৈবশক্তি বলে রোগ আরোগ্যের

বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। দেশীয় মতে প্রস্তুত তথাকথিত আমোঘ ঔষধও এই ধারার আওতায় পড়ে না। ভেষজ আইনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার শীঘ্রই প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তন করিবেন।

ভেষজ বিজ্ঞানের জন্য সেণ্ট ভিনসেণ্ট পুরস্কার

ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ইটালীর টিউরিনস্থ একাডেমি অব মেডিসিন ভেষজ গবেষণার উন্নয়নের জন্য একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করিয়াছেন। ভেষজ বিজ্ঞানের যে কোনও শাখার উন্নতি সম্পর্কে ১৯৫০ সালের পরে ইটালীয়, ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরেজী, স্পেনিশ, পর্তুগীজ, জার্মান, অথবা রুশ ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রাহ্য হইবে। পাঁচ কপি প্রবন্ধ বর্তমান বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উক্ত একাডেমীতে টিউরিন পো, ১৮, ইটালী ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল ১৯৫৪ সনের জুন মাসের পরে নির্ধারিত তারিখে ঘোষণা করা হইবে। যাহার প্রবন্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবে, তাহাকে ৭৫,০০,০০০ লিরা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন দেশে রেশম উৎপাদন

লক্ষ টন

	১৯৩৮	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২
চীন ...	৬'০৮	৪'০০	৪'৩০	২'৬৮	৩'০৩	৪'৩৩
ভারত ...	০'৬৯	১'০০	০'৯৫	১'০৩	১'০১	—
ইটালী ...	২'৭৪	১'৯৭	১'১৫	১'৩৭	১'২২	১'৪০
জাপান ...	৪৩'১৫	৮'৬৬	১০'৫২	১০'৬২	১২'৯২	১৫'০০
কোরিয়া ...	২'১৩	১'৭০	১'৭০	০'৭০	০'৭০	—
তুরস্ক ...	০'২৭	০'৫২	০'৩৬	০'৩৬	০'৪০	—
রুশ ...	১'৮১	১'৫০	১'৬০	১'৭০	১'৭০	—
অপরাপর দেশ সমেত মোট	৫৭'৭৩	২০'০০	২১'৩০	১৯'৪০	২১'৮০	২৫'০০

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ৯৩, আপার সারকুলার রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস

৩৭-৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত